বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৪১

১ম সংখ্যা

কৈশোরিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে কৈশোরের প্রিয়া,
ভোরবেলাকার আলোক-আঁধার-লাগা
চলেছিলে তুমি আধঘুমো-আধজাগা
মোর জীবনের ঘন বনপথ দিয়া।
ছায়ায় ছায়ায় আমি ফিরিতাম একা,
দেখি দেখি করি শুধু হয়েছিল দেখা
চকিত পায়ের চলার ইসারাখানি।
চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে মিলে
পিছে পিছে তব বাতাসে চিহ্ন দিলে
বাসনার রেখা টানি'॥

প্রভাত উঠিল ফুটি'
অরুণ রাঙিমা দিগন্তে গেল ঘুচে,
শিশিরের কণা কুঁড়ি হ'তে গেল মুছে,
গাহিল কুঞ্জে কপোত-কপোতী জুটি,
ছায়াবীথি হ'তে বাহিরে আসিলে ধীরে
ভরা জোয়ারের উচ্ছল নদীতীরে,
প্রাণ-কল্লোলে মুখর পল্লিবাটে।

আমি কহিলাম, "সময় হয়েছে, চলো,
তরুণ রৌদ্র জলে করে ঝলমলো,
নৌকা রয়েছে ঘাটে ॥"

স্রোতে চলে তরী ভাসি'।
সে তরী আমার চিরজীবনের স্মৃতি;
দিনরজনীর সুখের দুখের গীতি
কানায় কানায় ভরা তাহে রাশি রাশি।
যৌবন প্রাণের প্রথম পসরা নিয়ে
সে তরণী 'পরে পা ফেলেছ তুমি প্রিয়ে,
পাশাপাশি সেথা খেয়েছি ঢেউয়ের দোলা।
কখনো বা কথা কয়েছিলে কানে কানে,
কখনো বা মুখে ছলোছলো দু'নয়ানে
চেয়েছিলে ভাষা ভোলা ॥

বাতাস লাগিল পালে
ভাঁটার বেলায় তরী যবে যায় থেমে,
অচেনা পুলিনে কবে গিয়েছিলে নেমে,
মলিন ছায়ার ধূসর গোধূলিকালে।
ফিরে এলে যবে অভিনব সাজে সাজি'
ডালিতে আনিলে নূতন কুসুমরাজি,
নয়নে আনিলে নূতন চেনার হাসি।
কোন্ সাগরের অধীর জোয়ার লেগে
আবার নদীর নাড়ি নেচে ওঠে বেগে,
আরবার যাই ভাসি' ॥

তুমি ভেসে চলো সাথে।
চিররূপখানি নবরূপে আসে প্রাণে;
নানা পরশের মাধুরীর মাঝখানে
তোমারি সে হাত মিলেছে আমার হাতে।

গোপন গভীর রহস্যে অবিরত
ঋতুতে ঋতুতে সুরের ফসল কত
ফলায়ে তুলেছ বিস্মিত মোর গীতে।
শুকতারা তব কয়েছিল যে কথারে
সন্ধ্যার আলো সোনায় গলায় তারে
সকরুণ পূরবীতে ॥

চিনি নাহি চিনি তবু।
প্রতি দিবসের সংসারমাঝে তুমি
স্পর্শ করিয়া আছ যে-মর্ত্ত্যভূমি
তার আবরণ খ'সে পড়ে যদি কভু
তখন তোমার মূরতি দীপ্তিমতী
প্রকাশ করিবে আপন অমরাবতী,
সকল কালের বিরহের মহাকাশে।
তাহারি বেদনা কত কীর্ত্তির স্তূপে
উচ্ছ্রিত হয়ে ওঠে অসংখ্য রূপে
পুরুষের ইতিহাসে ॥

হে কৈশোরের প্রিয়া,
এ জনমে তুমি নব জীবনের দ্বারে
কোন্ পার হ'তে এনে দিলে মোর পারে
অনাদি যুগের চির মানবীর হিয়া।
দেশের কালের অতীত যে মহা দূর,
তোমার কণ্ঠে শুনেছি তাহারি সুর,
বাক্য সেথায় নত হয় পরাভবে।
অসীমের দূতী ভরে এনেছিলে ডালা
পরাতে আমারে নন্দন ফুলমালা
অপূর্ব্ব গৌরবে ॥

সাহিত্যতত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি আছি এবং আর সমস্ত আছে আমার অস্তিত্বের মধ্যে এই যুগল মিলন। আমার বাইরে কিছুই যদি অনুভব না করি তবে নিজেকেও অনুভব করিনে। বাইরের অনুভূতি যত প্রবল হয় অন্তরের সত্তাবোধও তত জোর পায়।

আমি আছি এই সত্যটি আমার কাছে চরম মূল্যবান। সেই জন্য যাতে আমার সেই বোধকে বাড়িয়ে তোলে তাতে আমার আনন্দ। বাইরের যে-কোনো জিনিষের 'পরে আমি উদাসীন থাকতে পারিনে, যাতে আমার ঔৎসুক্য, অর্থাৎ যা আমার চেতনাকে জাগিয়ে রাখে সে যতই তুচ্ছ হোক তাতেই মন হয় খুশী, তা সে হোক না ঘুড়ি-ওড়ানো হোক না লাটিম-ঘোরানো। কেন-না, সেই আগ্রহের আঘাতে আপনাকেই অত্যন্ত অনুভব করি।

আমি আছি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র ক'রে তুলছে, আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে জানছি নানা ভাবে। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা আমার আত্মবোধ সর্ব্বদা উৎসুক হয়ে থাকে। বাইরের অবস্থা একঘেয়ে হ'লে মানুষকে মন-মরা করে।

শাস্ত্রে আছে, এক বললেন, বহু হব, নানার মধ্যে এক আপন ঐক্য উপলব্ধি করতে চাইলেন। এ'কেই বলে সৃষ্টি। আমাতে যে এক আছে সেও নিজেকে বহুর মধ্যে পেতে চায়, উপলব্ধির ঐশ্বর্য্য সেই তার বহুলত্বে। আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্চে বহুর ধারা, রূপে রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে; তারি প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলছে 'আমি আছি'—এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ। অস্পষ্টতাতেই অবসাদ।

একলা কারাগারের বন্দীর আর কোনো পীড়ন যদি নাও থাকে তবু আবছায়া হয়ে আসে তার আপনার বোধ, সে যেন নেই-হওয়ার কাছাকাছি আসে। আমি আছি এবং না-আমি আছে এই দুই নিরন্তর ধারা আমার মধ্যে ক্রমাগতই একীভূত হয়ে আমাকে সৃষ্টি ক'রে চলেছে; অন্তর বাহিরের এই সম্মিলনের বাধায় আমার আপন-সৃষ্টিকে কৃশ বা বিকৃত ক'রে দিলে নিরানন্দ ঘটায়।

এইখানে তর্ক উঠতে পারে যে, আমির সঙ্গে না-আমির মিলনে দুঃখেরও তো উদ্ভব হয়। তা হতে পারে। কিন্তু এটা মনে রাখা চাই যে, সুখেরই বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত নয়; বস্তুত দুঃখ আনন্দেরই অন্তর্ভূত। কথাটা শুনতে স্বতোবিরুদ্ধ কিন্তু সত্য। যা হোক এ আলোচনাটা আপাতত থাক্, পরে হবে।

আমাদের জানা দু-রকমের, জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানা। অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্য কিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা; শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয় অন্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা। বাইরের পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে বিশেষ রসে বিশেষ রূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অনুভব করা। সেই জন্যে উপনিষদ বলেছেন, পুত্রকে কামনা করি বলেই যে পুত্র আমাদের প্রিয় তা নয়, আপনাকেই কামনা করি বলেই পুত্র আমাদের প্রিয়। পুত্রের মধ্যে পিতা নিজেকেই উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ।

আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ। অনুভূতির গভীরতা দ্বারা বাহিরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতটা সত্য হয় সেই পরিমাণে জীবনে আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে, অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা। প্রতিদিনের ব্যাবহারিক ব্যাপারে ছোটো ছোট ভাগের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রসারণকে অবরুদ্ধ করে, মনকে বেঁধে রাখে বৈষয়িক সঙ্কীর্ণতায়, প্রয়োজনের সংসারটা আমাদের আপনকে ঘিরে রাখে কড়া পাহারায়; অবরোধের নিত্য অভ্যাসের জড়তায় ভুলে যাই যে, নিছক বিষয়ী মানুষ অত্যন্তই কম মানুষ,—সে প্রয়োজনের কাঁচি-ছাঁটা মানুষ।

প্রয়োজনের দাবি প্রবল এবং তা অসংখ্য। কেন-না

যতটা আয়োজন আমাদের জরুরি তা আপন পরিমাণ রক্ষা করে না। অভাব মোচন হয়ে গেলেও তৃপ্তিহীন কামনা হাত পেতে থাকে, সঞ্চয়ের ভিড় জমে, সন্ধানের বিশ্রাম থাকে না। সংসারের সকল বিভাগেই এই যে চাই-চাইয়ের হাট বসে গেছে, এরই আশপাশে মানুষ একটা ফাঁক খোঁজে যেখানে তার মন বলে চাইনে, অর্থাৎ এমন কিছু চাইনে যেটা লাগে সঞ্চয়ে। তাই দেখতে পাই প্রয়োজনের এত চাপের মধ্যেও মানুষ অপ্রয়োজনের উপাদান এত প্রভূত ক'রে তুলেছে, অপ্রয়োজনের মূল্য তার কাছে এত বেশি। তার গৌরব সেখানে, ঐশ্বর্য্য সেখানে, যেখানে সে প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়; তার যে রস সে অহৈতুক। মানুষ সেই দায়মুক্ত বৃহৎ অবকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার-কাঠি-ছোঁওয়া সামগ্রীকে জাগ্রত করে জানে আপনারই সত্তায়। তার সেই অনুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলব্ধিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ-দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে ব'লে জানিনে।

লোকে বলে সাহিত্য যে আনন্দ দেয় সেটা সৌন্দর্য্যের আনন্দ। সে কথা বিচার করে দেখবার যোগ্য। সৌন্দর্য্য-রহস্যকে বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা করবার অসাধ্য চেষ্টা করব না। অনুভূতির বাইরে দেখতে পাই সৌন্দর্য্য অনেকগুলি তথ্যমাত্রকে অর্থাৎ ফ্যাক্ট্স্কে অধিকার ক'রে আছে। সেগুলি সুন্দরও নয় অসুন্দরও নয়। গোলাপের আছে বিশেষ আকার আয়তনের কতকগুলি পাপড়ি বোঁটা, তাকে ঘিরে আছে সবুজ পাতা। এই সমস্তকে নিয়ে বিরাজ করে এই সমস্তের অতীত একটি ঐক্যতত্ত্ব, তাকে বলি সৌন্দর্য্য। সেই ঐক্য উদ্বোধিত করে তাকেই, যে আমার অন্তরতম ঐক্য, যে আমার ব্যক্তি-পুরুষ। অসুন্দর সামগ্রীরও প্রকাশ আছে, সেও একটা সমগ্রতা, একটা ঐক্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার বস্তুরূপী তথ্যটাই মুখ্য, ঐক্যটা গৌণ। গোলাপের আকারে আয়তনে তার সুষমায় তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর সামঞ্জস্যে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করে দিচ্চে তার সমগ্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এককে, সেইজন্যে গোলাপ আমাদের কাছে কেবল একটি তথ্যমাত্র নয়, সে সুন্দর।

কিন্তু শুধু সুন্দর কেন, যে-কোনো পদার্থই আপন তথ্যমাত্রকে অতিক্রম করে সে আমার কাছে তেমনি সত্য হয় যেমন সত্য আমি নিজে। আমি নিজেও সেই পদার্থ যা বহু তথ্যকে আবৃত ক'রে অখণ্ড এক।

উচ্চ অঙ্কের গণিতের মধ্যে যে একটি গভীর সৌষম্য, যে একটি ঐক্যরূপ আছে, নিঃসন্দেহ গাণিতিক তার মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে। তার সামঞ্জস্যের তথ্যটি শুধু জ্ঞানের নয়, তা নিবিড় অনুভূতির; তাতে বিশুদ্ধ আনন্দ। কারণ জ্ঞানের যে উচ্চ শিখরে তার প্রকাশ সেখানে সে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজননিরপেক্ষ, সেখানে জ্ঞানের মুক্তি। এ কেন কাব্য-সাহিত্যের বিষয় হয়নি এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। হয়নি যে তার কারণ এই যে, এর অভিজ্ঞতা অতি অল্প লোকের মধ্যে বদ্ধ, এ সর্ব্বসাধারণের অগোচর। যে ভাষার যোগে এর পরিচয় সম্ভব তা পারিভাষিক, বহুলোকের হৃদয়বোধের স্পর্শের দ্বারা সে সজীব উপাদানরূপে গড়ে ওঠেনি। যে-ভাষা হৃদয়ের মধ্যে অব্যবহিত আবেগে প্রবেশ করতে পারে না সে ভাষায় সাহিত্যরসের সাহিত্যরূপের সৃষ্টি সম্ভব নয়। অথচ আধুনিক কাব্যে সাহিত্যে কলকারখানা স্থান নিতে আরম্ভ করেছে। যন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজনগত তথ্যকে ছাড়িয়ে তার একটা বিরাট শক্তিরূপ আমাদের কল্পনায় প্রকাশ পেতে পারে, সে আপন অন্তর্নিহিত সুঘটিত সুসঙ্গতিকে অবলম্বন ক'রে আপন উপাদানকে ছাড়িয়ে আবির্ভূত। কল্পনাদৃষ্টিতে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গভীরে যেন তার একটি আত্মস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। সেই আত্মস্বরূপ আমাদেরই ব্যক্তিস্বরূপের দোসর। যে মানুষ তাকে যান্ত্রিক জ্ঞানের দ্বারা নয় অনুভূতি দ্বারা একান্ত বোধ করে সে তার মধ্যে আপনাকে পায়, কলের জাহাজের কাপ্তেন কলের জাহাজের অন্তরে যেমন পরম অনুরাগে আপন-ব্যক্তিপুরুষকে অনুভব করতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন তত্ত্ব এ জা'তের নয়। এ সব তত্ত্ব জানার দ্বারা নিষ্কাম আনন্দ হয় না তা নয়। কিন্তু সে আনন্দ হওয়ার আনন্দ নয়, তা পাওয়ার আনন্দ; অর্থাৎ এই জ্ঞান জ্ঞানীর থেকে পৃথক, এ তার ব্যক্তিগত সত্তার অন্দর মহলের জিনিষ নয়, ভাণ্ডারের জিনিষ।

আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে বলেছে বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। সৌন্দর্য্যের রস আছে, কিন্তু এ কথা বলা চলে না যে, সব রসেরই সৌন্দর্য্য আছে। সৌন্দর্য্যরসের সঙ্গে

সকল রসেরই মিল হচ্চে ঐখানে, যেখানে সে আমাদের অনুভূতির সামগ্রী। অনুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার ক'রে তাকে অনির্ব্বচনীয় ভাবে অতিক্রম করে। রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা।

বস্তুর ভিড়ের একান্ত আধিপত্যকে লাঘব করতে লেগেছে মানুষ। সে আপন অনুভূতির জন্যে অবকাশ রচনা করছে। তার একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিই। ঘড়ায় ক'রে সে জল আনে, এই জল আনায় তার নিত্য প্রয়োজন। অগত্যা বস্তুর দৌরাত্ম্য তাকে কাঁধে ক'রে মাথায় ক'রে বইতেই হয়। প্রয়োজনের শাসনই যদি একমাত্র হয়ে ওঠে তা হ'লে ঘড়া হয় আমাদের অনাত্মীয়। মানুষ তাকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তুল্‌ল। জল বহনের জন্য সৌন্দর্য্যের কোনো অর্থ ই নেই। কিন্তু এই শিল্পসৌন্দর্য্য প্রয়োজনের রূঢ়তার চারিদিকে ফাঁকা এনে দিলে। যে ঘড়াকে দায়ে পড়ে মেনেছিলেম, নিলেম তাকে আপন ক'রে। মানুষের ইতিহাসে আদিম যুগ থেকেই এই চেষ্টা। প্রয়োজনের জিনিষকে সে অপ্রয়োজনের মূল্য দেয় শিল্পকলার সাহায্যে, বস্তুকে পরিণত করে বস্তুর অতীতে। সাহিত্যসৃষ্টি শিল্পসৃষ্টি সেই প্রলয়লোকে যেখানে দায় নেই, ভার নেই, যেখানে উপকরণ মায়া, তার ধ্যানরূপটাই সত্য, যেখানে মানুষ আপনাতে সমস্ত আত্মসাৎ করে আছে।

কিন্তু বস্তুকে দায়ে পড়ে মেনে নিয়ে তার কাছে মাথা হেঁট করা কা'কে বলে যদি দেখতে চাও তবে ঐ দেখো কেরোসিনের টিনে ঘটস্থাপনা; বাঁকের দুই প্রান্তে টিনের ক্যানেস্তা বেঁধে জল আনা। এতে অভাবের কাছেই মানুষের একান্ত পরাভব। যে-মানুষ সুন্দর ক'রে ঘড়া বানিয়েছে সে-ব্যক্তি তাড়াতাড়ি জলপিপাসাকেই মেনে নেয় নি, সে যথেষ্ট সময় নিয়েছে নিজের ব্যক্তিত্বকে মানতে।

বস্তুর পৃথিবী ধুলোমাটি পাথর লোহায় ঠাসা হয়ে পিণ্ডীকৃত। বায়ুমণ্ডল তার চারদিকে বিরাট অবকাশ বিস্তার করেছে। এরই পরে তার আত্মপ্রকাশের ভূমিকা। এইখান থেকে প্রাণের নিশ্বাস বহমান; সেই প্রাণ অনির্ব্বচনীয়। সেই প্রাণ-শিল্পকারের তুলি এইখান থেকেই আলো নিয়ে রং নিয়ে তাপ নিয়ে চলমান চিত্রে বার-বার ভরে দিচ্চে পৃথিবীর পট। এইখানে পৃথিবীর লীলার দিক, এইখানে তার সৃষ্টি, এইখানে তার সেই ব্যক্তিরূপের প্রকাশ, যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না, যার মধ্যে তার বাণী, তার যাথার্থ্য, তার রস, তার শ্যামলতা, তার হিল্লোল। মানুষও নানা জরুরি কাজের দায় পেরিয়ে চায় আপন আকাশমণ্ডল, যেখানে তার অবকাশ, যেখানে বিনা প্রয়োজনের লীলায় আপন সৃষ্টিতে আপনাকে প্রকাশই তার চরম লক্ষ্য, যে-সৃষ্টিতে জানা নয় পাওয়া নয় কেবল হওয়া। পূর্ব্বেই বলেছি অনুভব মানেই হওয়া। বাহিরের সত্তার অভিঘাতে সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন সৃষ্টিলীলায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। আমাদের হৃদয়বোধের কাজ আছে জীবিকানির্ব্বাহের প্রয়োজনে। আমরা আত্মরক্ষা করি, শত্রু হনন করি, সন্তান পালন করি, আমাদের হৃদয়বৃত্তি সেই সকল কাজে বেগ সঞ্চার করে, অভিরুচি জাগায়। এই সীমাটুকুর মধ্যে জন্তুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ নেই। প্রভেদ ঘটেছে সেইখানেই যেখানে মানুষ আপন হৃদয়ানুভূতিকে কর্ম্মের দায় থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে কল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে দেয়, যেখানে অনুভূতির রসটুকুই তার নিঃস্বার্থ উপভোগের লক্ষ্য, যেখানে আপন অনুভূতিকে প্রকাশ করবার প্রেরণায় ফললাভের অত্যাবশ্যকতাকে সে বিস্মৃত হয়ে যায়। এই মানুষই যুদ্ধ করবার উপলক্ষ্যে কেবল অস্ত্রচালনা করে না, যুদ্ধের বাজনা বাজায়, যুদ্ধের নাচ নাচে। তার হিংস্রতা যখন নিদারুণ ব্যবসায়ে প্রস্তুত তখনও সেই হিংস্রতার অনুভূতিকে ব্যবহারের ঊর্দ্ধে নিয়ে গিয়ে তাকে অনাবশ্যক রূপ দেয়। হয়ত সেটা তার সিদ্ধিলাভে ব্যাঘাত করতেও পারে। শুধু নিজের সৃষ্টিতে নয় বিশ্বসৃষ্টিতে সে আপন অনুভূতির প্রতীক খুঁজে বেড়ায়। তার ভালবাসা ফেরে ফুলের বনে, তার ভক্তি তীর্থযাত্রা করতে বেরোয় সাগর-সঙ্গমে পর্ব্বতশিখরে। সে আপন ব্যক্তিরূপের দোসরকে পায় বস্তুতে নয়, তত্ত্বে নয়। লীলাময়কে সে পায় আকাশ যেখানে নীল, শ্যামল যেখানে নবদূর্ব্বাদল। ফুলে যেখানে সৌন্দর্য্য, ফলে যেখানে মধুরতা, জীবের প্রতি যেখানে আছে করুণা, ভূমার প্রতি যেখানে আছে আত্মনিবেদন, সেখানে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের চিরন্তন যোগ অনুভব

করি হৃদয়ে। এ'কেই বলি বাস্তব, যে বাস্তবে সত্য হয়েছে আমার আপন।

যেখানে আমরা এই আপনকে প্রকাশের জন্য উৎসুক, যেখানে আমরা আপনের মধ্যে অপরিমিতকে উপলব্ধি করি সেখানে আমরা অমিতব্যয়ী, কী অর্থে কী সামর্থ্যে। যেখানে অর্থকে চাই অর্জ্জন করতে, সেখানে প্রত্যেক সিকি পয়সার হিসাব নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকি; যেখানে সম্পদকে চাই প্রকাশ করতে সেখানে নিজেকে দেউলে করে দিতেও সঙ্কোচ নেই। কেন-না সেখানে সম্পদের প্রকাশে আপন ব্যক্তিপুরুষেরই প্রকাশ। বস্তুত, আমি ধনী এই কথাটি উপযুক্তরূপে ব্যক্ত করবার মত ধন পৃথিবীতে কারও নেই। শক্রর হাত থেকে প্রাণরক্ষা যখন আমাদের উদ্দেশ্য তখন দেহের প্রত্যেক চাল প্রত্যেক ভঙ্গী সম্বন্ধে নিরতিশয় সাবধান হতে হয়, কিন্তু যখন নিজের সাহসিকতা প্রকাশই উদ্দেশ্য তখন নিজের প্রাণপাত পর্য্যন্ত সম্ভব, কেন-না এই প্রকাশে ব্যক্তিপুরুষের প্রকাশ। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমরা খরচ করি বিবেচনাপূর্ব্বক, উৎসবের সময় যখন আপনার আনন্দকে প্রকাশ করি, তখন তহবিলের সসীমতা সম্বন্ধে বিবেচনাশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ যখন আমরা আপন ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে প্রবলরূপে সচেতন হই, সাংসারিক তথ্যগুলোকে তখন গণ্যই করিনে। সাধারণত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে আমরা পরিমাণ রক্ষা করেই চলি। কিন্তু যাকে ভালবাসি অর্থাৎ যার সঙ্গে আমার ব্যক্তিপুরুষের পরম সম্বন্ধ তার সম্বন্ধে পরিমাণ থাকে না। তার সম্বন্ধে অনায়াসেই বলতে পারি—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

তথ্যের দিক থেকে এত বড় অদ্ভুত অত্যুক্তি আর কিছু হ'তে পারে না, কিন্তু ব্যক্তিপুরুষের অনুভূতির মধ্যে ক্ষণকালের সীমায় সংহত হ'তে পারে চিরকাল। "পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে" বস্তুজগতে এ কথাটা অতথ্য, কিন্তু ব্যক্তি-জগতে তথ্যের খাতিরে এর চেয়ে কম ক'রে যা বলতে যাই তা সত্যে পৌছয় না।

বিশ্বসৃষ্টিতেও তাই। সেখানে বস্তু বা জাগতিক শক্তির তথ্য হিসাবে কড়াক্রান্তির এদিক-ওদিক হবার জো নেই। কিন্তু সৌন্দর্য্য তথ্যসীমা ছাপিয়ে ওঠে, তার হিসাবের আদর্শ নেই পরিমাণ নেই।

উর্দ্ধ আকাশের বায়ুস্তরে ভাসমান বাষ্পপুঞ্জ একটা সামান্য তথ্য কিন্তু উদয়াস্তকালের সূর্য্যরশ্মির স্পর্শে তার মধ্যে যে অপরূপ বর্ণলীলার বিকাশ হয় সে অসামান্য, সে "ধূমজ্যোতিঃ-সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ" মাত্র নয়, সে যেন প্রকৃতির একটা অকারণ অত্যুক্তি, একটা পরিমিত বস্তুগত সংবাদ-বিশেষকে সে যেন একটা অপরিমিত অনির্ব্বচনীয়তায় পরিণত ক'রে দেয়। ভাষার মধ্যেও যখন প্রবল অনুভূতির সংঘাত লাগে তখন তা শব্দার্থের আভিধানিক সীমা লঙ্ঘন করে।

এই জন্যে সে যখন বলে "চরণনখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে" তখন তাকে পাগলামি বলে উড়িয়ে দিতে পারিনে। এই জন্য সংসারের প্রাত্যহিক তথ্যকে একান্ত যথাযথভাবে আর্টের বেদীর উপরে চড়ালে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। কেন-না আর্টের প্রকাশকে সত্য করতে গেলেই তার মধ্যে অতিশয়তা লাগে, নিছক তথ্যে তা সয় না। তাকে যতই ঠিকঠাক করে বলা যাক্ না, শব্দের নির্ব্বাচনে ভাষার ভঙ্গীতে ছন্দের ইসারায় এমন কিছু থাকে যেটা সেই ঠিকঠাককে ছাড়িয়ে যায় যেটা অতিশয়। তথ্যের জগতে ব্যক্তিস্বরূপ হচ্ছে সেই অতিশয়। কেজো ব্যবহারের সঙ্গে সৌজন্যের প্রভেদ ঐখানে; কেজো ব্যবহারে হিসেব করা কাজের তাগিদ, সৌজন্যে আছে সেই অতিশয় যা ব্যক্তিপুরুষের মহিমার ভাষা।

প্রাচীন গ্রীসের প্রাচীন রোমের সভ্যতা গেছে অতীতে বিলীন হয়ে। যখন বেঁচে ছিল তাদের বিস্তর ছিল বৈষয়িকতার দায়। প্রয়োজনগুলি ছিল নিরেট নিবিড় গুরুভার, প্রবল উদ্বেগ প্রবল উদ্যম ছিল তাদের বেষ্টন করে। আজ তার কোনো চিহ্ন নেই। কেবল এমন সব সামগ্রী আজও আছে, যাদের ভার ছিল না, বস্তু ছিল না, দায় ছিল না, সৌজন্যের অত্যুক্তি দিয়ে সমস্ত দেশ যাদের অভ্যর্থনা করেছে; যেমন করে আমরা সম্ভ্রমবোধের পরিতৃপ্তি সাধন করি রাজচক্রবর্ত্তীর নামের আদিতে পাঁচটা শ্রী যোগ করে। দেশ তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল অতিশয়ের চূড়ায়, সেই নিম্নভূমির সমতল-ক্ষেত্রে নয় যেখানে প্রাত্যহিক ব্যবহারের ভিড়। মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের যে পরিচয় চিরকালের দৃষ্টিপাত সয়, পাথরের

রেখায় শব্দের ভাষায় তারি সম্বর্দ্ধনাকে স্থায়ী রূপ ও অসীম মূল্য দিয়ে রেখে গেছে।

যা কেবলমাত্র স্থানিক সাময়িক, বর্ত্তমান কাল তাকে যত প্রচুর মূল্যই দিক্, দেশের প্রতিভার কাছ থেকে অতিশয়ের সমাদর সে স্বভাবতই পায়নি যেমন পেয়েছে জ্যোৎস্না রাতে ভেসে-যাওয়া নৌকোর সেই সারিগান,—

মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না।

যেমন পেয়েছে নাইটিঙ্গেল পাখীর সেই গান, যে গান শুনতে শুনতে কবি বলেছেন তাঁর প্রিয়াকে :—

Listen Eugenia,
How thick the burst comes crowding through the leaves.
Again—thou hearest ?
Eternal passion !
Eternal pain !

পূর্ব্বেই বলেছি রস মাত্রেই অর্থাৎ সকল রকম হৃদয়-বোধেই আমরা বিশেষভাবে আপনাকেই জানি সেই জানাতেই বিশেষ আনন্দ। এইখানেই তর্ক উঠতে পারে যে-জানায় দুঃখ সেই জানাতেও আনন্দ এ কথা স্বতোবিরুদ্ধ। দুঃখকে ভয়ের বিষয়কে আমরা পরিহার্য্য মনে করি তার কারণ তাতে আমাদের হানি হয়, আমাদের প্রাণে আঘাত দেয়, তা আমাদের স্বার্থের প্রতিকূলে যায়। প্রাণরক্ষার স্বার্থরক্ষার প্রবৃত্তি আমাদের অত্যন্ত প্রবল, সেই প্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হ'লে সেটা দুঃসহ হয়। এই জন্যে দুঃখবোধ আমাদের ব্যক্তিগত আত্মবোধকে উদ্দীপ্ত করে দেওয়া সত্ত্বেও সাধারণত তা আমাদের কাছে অপ্রিয়। এটা দেখা গেছে, যে-মানুষের স্বভাবে ক্ষতির ভয় প্রাণের ভয় যথেষ্ট প্রবল নয় বিপদকে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক আহ্বান করে, দুর্গমের পথে যাত্রা করে, দুঃসাধ্যের মধ্যে পড়ে ঝাঁপ দিয়ে। কিসের লোভে? কোনো দুর্লভ ধন অর্জ্জন করবার জন্যে নয়, ভয় বিপদের সংঘাতে নিজেকেই প্রবল আবেগে উপলব্ধি করবার জন্যে। অনেক শিশুকে নিষ্ঠুর হ'তে দেখা যায়, কীট পতঙ্গ পশুকে যন্ত্রণা দিতে তারা তীব্র আনন্দ বোধ করে। শ্রেয়োবুদ্ধি প্রবল হ'লে এই আনন্দ সম্ভব হয় না, তখন শ্রেয়োবুদ্ধি বাধা রূপে কাজ করে। স্বভাবত বা অভ্যাসবশত এই বুদ্ধি হ্রাস হ'লেই দেখা যায় হিংস্রতার আনন্দ অতিশয় তীব্র; ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ আছে এবং জেলখানার এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীর মধ্যেও তার দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই দুর্লভ নয়। এই হিংস্রতারই অহৈতুক আনন্দ নিন্দুকদের—নিজের কোন বিশেষ ক্ষতির উত্তেজনাতেই যে মানুষ নিন্দা করে তা নয়। যাকে সে জানে না, যে তার কোনো অপকার করেনি তার নামে অকারণ কলঙ্ক আরোপ করায় যে নিঃস্বার্থ দুঃখজনকতা আছে দলেবলে নিন্দা-সাধনার ভৈরবীচক্রে বসে নিন্দুক ভোগ করে তাই। ব্যাপারটা নিষ্ঠুর এবং কদর্য্য কিন্তু তীব্র তার আস্বাদন। যার প্রতি আমরা উদাসীন সে আমাদের সুখ দেয় না, কিন্তু নিন্দার পাত্র আমাদের অনুভূতিকে প্রবল ভাবে উদ্দীপ্ত করে রাখে। এই হেতুই পরের দুঃখকে উপভোগ্য সামগ্রী করে নেওয়া মানুষ-বিশেষের কাছে কেন বিলাসের অঙ্গরূপে গণ্য হয়। কেন মহিষের মত অত বড় প্রকাণ্ড প্রবল জন্তুকে বলি দেবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাখা উন্মত্ত নৃত্য সম্ভবপর হ'তে পারে, তার কারণ বোঝা সহজ। দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়ে ওঠে। দুঃখের কটুস্বাদে দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকলেও তা উপাদেয়। দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়ে প্রবলতর। ট্র্যাজেডির মূল্য এই নিয়ে। কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন, মন্থরার উল্লাস, দশরথের মৃত্যু, এর মধ্যে ভাল কিছুই নেই। সহজ ভাষায় যাকে আমরা সুন্দর বলি এ ঘটনা তার সমশ্রেণীর নয় একথা মানতেই হবে। তবু এই ঘটনা নিয়ে কত কাব্য নাটক ছবি গান পাঁচালি বহু কাল থেকে চলে আসছে, ভিড় জমছে কত, আনন্দ পাচ্চে সবাই। এতেই আছে বেগবান অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিপুরুষের প্রবল আত্মানুভূতি। বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

একদিন এই কথাটি আমার কোনো একটি কবিতায়

লিখেছিলেম। বলেছিলেম, আমার অন্তরের আমি আলস্যে আবেশে বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, নির্দ্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে, তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ।

এতকাল আমি রেখেছিনু তারে যতন ভরে
শয়ন 'পরে ;
ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসর শয়ন করেছি রচন কুসুম থরে,
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে গোপন ঘরে
যতন ভরে।
শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরাণ আলসরসে
আবেশ বশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর,
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার নিশিদিবসে ;
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ মরমে পশে
আবেশ বশে।
তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রসিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা,
প্রাণেতে আমাতে খেলিব দুজনে ঝুলন খেলা
নিশীথ বেলা।

আমাদের শাস্ত্র বলেন, "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।" "সেই বেদনীয় পুরুষকে জানো যাতে মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দিক।" বেদনা অর্থাৎ হৃদয়বোধ দিয়েই যাঁকে জানা যায় জানো সেই পুরুষকে অর্থাৎ পার্সোন্যালিটিকে। আমার ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিত অনুভূতি দিয়ে জানে অসীম পুরুষকে, জানে হৃদা মনীষা মনসা, তখন তাঁর মধ্যে নিঃসংশয়রূপে জানে আপনাকে। তখন কী হয়? মৃত্যু অর্থাৎ শূন্যতার ব্যথা চলে যায়, কেন-না বেদনীয় পুরুষের বোধ পূর্ণতার বোধ, শূন্যতার বোধের বিরুদ্ধ।

এই আধ্যাত্মিক সাধনার কথাটাকেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনা চলে। জীবনে শূন্যতাবোধ আমাদের ব্যথা দেয়, সত্তাবোধের ম্লানতায় সংসারে এমন কিছু অভাব ঘটে যাতে আমাদের অনুভূতির সাড়া জাগে না, যেখানে আমাদের ব্যক্তিবোধকে জাগ্রত রাখবার মত এমন কোনো বাণী নেই যা স্পষ্ট ভাষায় বলছে আমি আছি। বিরহের শূন্যতায় যখন শকুন্তলার মন অবসাদগ্রস্ত তখন তাঁর দ্বারে উঠেছিল ধ্বনি "অয়মহং ভোঃ"। এই যে আমি আছি, সে বাণী পৌঁছল না তাঁর কানে, তাই তাঁর অন্তরাত্মা জবাব দিল না এই যে আমিও আছি। দুঃখের কারণ ঘটল সেইখানে। সংসারে আমি আছি এই বাণী যদি স্পষ্ট থাকে তাহলেই আমার আপনার মধ্য থেকে তার নিশ্চিত উত্তর মেলে, আমি আছি। আমি আছি এই বাণী প্রবল সুরে ধ্বনিত হয় কিসে? এমন সত্যে যাতে রস আছে পূর্ণ। আপন অন্তরে ব্যক্তি-পুরুষকে নিবিড় করে অনুভব করি যখন আপন বাইরে গোচর হয়েছে রসাত্মক রূপ। তাই বাউল গেয়ে বেড়িয়েছে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।

কেন-না আমার মনের মানুষকেই একান্ত করে পাবার জন্যে পরম মানুষকে চাই, চাই তং বেদ্যং পুরুষং, তা হ'লে শূন্যতা ব্যথা দেয় না।

আমাদের পেট ভরাবার জন্যে, জীবনযাত্রার অভাব মোচন করবার জন্যে আছে নানা বিদ্যা নানা চেষ্টা ; মানুষের শূন্য ভরাবার জন্যে, তার মনের মানুষকে নানা ভাবে নানা রসে জাগিয়ে রাখবার জন্যে, আছে তার সাহিত্য তার শিল্প। মানুষের ইতিহাসে এর স্থান কী বৃহৎ, এর পরিমাণ কী প্রভূত। সভ্যতার কোনো প্রলয় ভূমিকম্পে যদি এর বিলোপ সম্ভব হয় তবে মানুষের ইতিহাসে কী প্রকাণ্ড শূন্যতা কালো মরুভূমির মত ব্যাপ্ত হ'য়ে যাবে। তার কৃষ্টির ক্ষেত্র আছে তার চাষে বাসে আপিসে কারখানায় ; তার সংস্কৃতির ক্ষেত্র সাহিত্যে, এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি, সে তাতে

আপনাকেই সম্যকরূপে করে তুলছে, সে আপনিই হয়ে উঠছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাই বলেছেন, "আত্ম-সংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।"

ক্লাস ঘরের দেয়ালে মাধব আরেক ছেলের নামে বড় বড় অক্ষরে লিখে রেখেছে "রাখালটা বাঁদর।" খুবই রাগ হয়েছে। এই রাগের বিষয়ের তুলনায় অন্য সকল ছেলেই তার কাছে অপেক্ষাকৃত অগোচর। অস্তিত্ব হিসাবে রাখাল যে কত বড় হয়েছে তা অক্ষরের ছাঁদ দেখলেই বোঝা যাবে। মাধব আপন স্বল্প শক্তি অনুসারে আপন রাগের অনুভূতিকে আপনার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেইটে দিয়ে দেয়ালের উপর এমন একটা কালো অক্ষরের রূপ সৃষ্টি করেছে যা খুব বড় করে জানাচ্ছে মাধব রাগ করেছে, যা মাধব চাচ্ছে সমস্ত জগতের কাছে গোচর করতে। ঐটেকে একটা গীতি-কবিতার বামন অবতার বলা যেতে পারে। মাধবের অন্তরে যে অপরিণত পঙ্গু কবি আছে, রাখালের সঙ্গে বানরের উপমার বেশি তার কলমে আর এগোলো না। বেদব্যাস ঐ কথাটাই লিখেছিলেন মহাভারতের পাতায় শকুনির নামে। তার ভাষা স্বতন্ত্র, তা ছাড়া তার কয়লার অক্ষর মুছবে না যতই চুনকাম করা যাক্। পুরাতত্ত্ববিদ নানা সাক্ষ্যের জোরে প্রমাণ করে দিতে পারেন শকুনি নামে কোনো ব্যক্তি কোনো কালেই ছিল না। আমাদের বুদ্ধিও সে কথা মানবে, কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি সাক্ষ্য দেবে সে নিশ্চিত আছে। ভাঁড়ু দত্তও বাঁদর বই কি, কবিকঙ্কণ সেটা কালো অক্ষরে ঘোষণা করে দিয়েছেন। কিন্তু এই বাঁদরগুলোর উপরে আমাদের যে অবজ্ঞার ভাব আসে সেই ভাবটাই উপভোগ্য।

আমাদের দেশে এক প্রকারের সাহিত্যবিচার দেখি যাতে নানা অবান্তর কারণ দেখিয়ে সাহিত্যের এই প্রত্যক্ষ-গোচরতার মূল্য লাঘব করা হয়। হয়ত কোনো মানব-চরিত্রজ্ঞ বলেন, শকুনির মত অমন অবিমিশ্র দুর্বৃত্ততা স্বাভাবিক নয়, ইয়াগোর অহৈতুক বিদ্বেষবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহদ্‌গুণ থাকা উচিত ছিল; বলেন যেহেতু কৈকেয়ী বা লেডি ম্যাক্‌বেথ হিড়িম্বা বা শূর্পনখা নারী, মায়ের জাত, এইজন্যে এদের চরিত্রে ঈর্ষা বা কদাশয়তার অত নিবিড় কালিমা আরোপ করা অশ্রদ্ধেয়। সাহিত্যের তরফ থেকে বলবার কথা এই যে এখানে আর কোনো তর্কই গ্রাহ্য নয় কেবল এই জবাবটা পেলেই হোলো যে-চরিত্রের অবতারণা হয়েছে তা সৃষ্টির কোঠায় উঠেছে, তা প্রত্যক্ষ। কোনো এক খেয়ালে সৃষ্টিকর্ত্তা জিরাফ জন্তুটাকে রচনা করলেন। তাঁর সমালোচক বলতে পারে এর গলাটা না-গোরুর মত না-হরিণের মত, বাঘ ভালুকের মত তো নয়ই, এর পশ্চাদ্‌ ভাগের ঢালু ভঙ্গীটা সাধারণ চতুষ্পদ সমাজে চলতি নেই অতএব ইত্যাদি। সমস্ত আপত্তির বিরুদ্ধে একটিমাত্র জবাব এই যে, ঐ জন্তুটা জীবসৃষ্টিপর্য্যায়ে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ; ও বলছে আমি আছি, না থাকাই উচিত ছিল বলাটা টিঁকবে না। যাকে সৃষ্টি বলি তার নিঃসংশয় প্রকাশই তার অস্তিত্বের চরম কৈফিয়ৎ। সাহিত্যের সৃষ্টির সঙ্গে বিধাতার সৃষ্টির এইখানেই মিল; সেই সৃষ্টিতে উট জন্তুটা হয়েছে বলেই হয়েছে, উটপাখীরও হয়ে ওঠা ছাড়া অন্য জবাবদিহী নেই।

মানুষও একেবারে শিশুকাল থেকেই এই আনন্দ পেয়েছে, প্রত্যক্ষ বাস্তবতার আনন্দ। এই বাস্তবতার মানে এমন নয় যা সদাসর্ব্বদা হয়ে থাকে, যা যুক্তিসঙ্গত। যে-কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব। ছন্দে ভাষায় ভঙ্গীতে ইঙ্গিতে যখন সেই বাস্তবতা জাগিয়ে তোলে, সে তখন ভাষায় রচিত একটি শিল্পবস্তু হয়ে ওঠে। তার কোনো ব্যাবহারিক অর্থ না থাকতে পারে, তাতে এমন একটা কিছু প্রকাশ পায় যা tease us out of thought as doth eternity।

ওপারেতে কালো রং
বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্,
এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্‌টুক্ করে,
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।

এর বিষয়টি অতি সামান্য। কিন্তু ছন্দের দোল খেয়ে এ যেন একটা স্পর্শ-যোগ্য পদার্থ হয়ে উঠেছে।

ডালিম গাছে পরভু নাচে,
তাক্ ধুমাধুম বাদ্যি বাজে।

শুনে শিশু খুশি হয়ে ওঠে। এ একটা সুস্পষ্ট চলন্ত জিনিষ, যেন একটা ছন্দে-গড়া পতঙ্গ, সে আছে, সে উড়ছে, আর কিছুই নয়, এতেই কৌতুক।

তাই শিশুকাল থেকে মানুষ বলছে গল্প বলো, সেই গল্পকে বলে রূপকথা। রূপকথাই সে বটে, তাতে না থাকতে

পারে ঐতিহাসিক তথ্য, না থাকতে পারে আবশ্যক সংবাদ, সম্ভবপরতা সম্বন্ধেও তার হয়ত কোনো কৈফিয়ৎ নেই। সে কোনো একটা রূপ দাঁড় করায় মনের সামনে, তার প্রতি ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলে, তাতে শূন্যতা দূর করে ; সে বাস্তব। গল্প সুরু করা গেল :—

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ
গায়ে তার কালো কালো দাগ।
বেহারাকে খেতে গিয়ে ঘরে
আয়নাটা পড়েছে নজরে।
এক ছুটে পালালো বেহারা,
বাঘ দেখে আপন চেহারা।
গাঁ গাঁ করে রেগে ওঠে ডেকে,
গায়ে দাগ কে দিয়েছে এঁকে।
ঢেঁকিশালে মাসি ধান ভানে
বাঘ এসে দাঁড়ালো সেখানে।
পাকিয়ে ভীষণ দুই গোঁফ
বলে, "চাই গ্লিসেরিন সোপ !"

ছোটো মেয়ে চোখ দুটো মস্ত করে হাঁ করে শোনে। আমি বলি আজ এই পর্য্যন্ত। সে অস্থির হয়ে বলে, না, বল তারপরে। সে নিশ্চিত জানে, সাবানের চেয়ে, যারা সাবান মাখে বাঘের লোভ তাদেরি 'পরে বেশি। তবু এই সম্পূর্ণ আজগবী গল্প তার কাছে সম্পূর্ণ বাস্তব, প্রাণীবৃত্তান্তের বাঘ তার কাছে কিছুই না। ঐ আয়না-দেখা ক্ষ্যাপা বাঘকে তার সমস্ত মনপ্রাণ একান্ত অনুভব করাতেই সে খুশি হয়ে উঠেছে। এ'কেই বলি মনের লীলা, কিছুই-না-নিয়ে তার সৃষ্টি, তার আনন্দ।

সুন্দরকে প্রকাশ করাই রস-সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য নয়, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। সৌন্দর্য্যের অভিজ্ঞতায় একটা স্তর আছে, সেখানে সৌন্দর্য্য খুবই সহজ। ফুল সুন্দর, প্রজাপতি সুন্দর, ময়ূর সুন্দর। এ সৌন্দর্য্য একতলাওয়ালা, এর মধ্যে সদর অন্দরের রহস্য নেই, এক নিমেষেই ধরা দেয়, সাধনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই প্রাণের কোঠায় যখন মনের দান মেশে, চরিত্রের সংস্রব ঘটে তখন এর মহল বেড়ে যায়, তখন সৌন্দর্য্যের বিচার সহজ হয় না। যেমন মানুষের মুখ। এখানে শুধু চোখে চেয়ে সরাসরি রায় দিতে গেলে ভুল হবার আশঙ্কা। সেখানে সহজ আদর্শে যা অসুন্দর তাকেও মনোহর বলা অসম্ভব নয়। এমন কি সাধারণ সৌন্দর্য্যের চেয়েও তার আনন্দ-জনকতা হয়ত গভীরতর। ঠুংরির টপ্পা শোনবামাত্র মন চঞ্চল হয়ে থাকে, টোড়ির চৌতাল চৈতন্যকে গভীরতায় উদ্‌বুদ্ধ করে। "ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন" মধুর হ'তে পারে কিন্তু "বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তী" মনোহর। একটা কানের আর একটা মনের, একটাতে চরিত্র নেই লালিত্য আছে, আর একটাতে চরিত্রই প্রধান। তাকে চিনে নেবার জন্যে অনুশীলনের দরকার করে।

যাকে সুন্দর বলি তার কোঠা সঙ্কীর্ণ, যাকে মনোহর বলি তা বহুদূরপ্রসারিত। মন ভোলাবার জন্যে তাকে অসামান্য হ'তে হয় না, সামান্য হয়েও সে বিশিষ্ট। যা আমাদের দেখা অভ্যস্ত, ঠিক সেইটেকেই যদি ভাষায় আমাদের কাছে অবিকল হাজির করে দেয় তবে তাকে বলব সংবাদ। কিন্তু আমাদের সেই সাধারণ অভিজ্ঞতার জিনিষকেই সাহিত্য যখন বিশেষ করে আমাদের সামনে উপস্থিত করে তখন সে আসে অভূতপূর্ব্ব হয়ে, সে হয় সেই একমাত্র, আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র। সন্তানস্নেহে কর্ত্তব্যবিস্মৃত মানুষ অনেক দেখা যায়, মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র আছেন সেই অতি সাধারণ বিশেষণ নিয়ে। কিন্তু রাজ্যাধিকারবঞ্চিত এই অন্ধ রাজা কবিলেখনীর নানা সূক্ষ্ম স্পর্শে দেখা দিয়েছেন সম্পূর্ণ একক হয়ে। মোটা গুণটা নিয়ে তাঁর সমজাতীয় লোক অনেক আছে, কিন্তু জগতে ধৃতরাষ্ট্র অদ্বিতীয়, এই মানুষের একান্ততা তাঁর বিশেষ ব্যবহারে নয়, কোনো আংশিক পরিচয়ে নয়, সমগ্রভাবে। কবির সৃষ্টি-মন্ত্রে প্রকাশিত এই তাঁর অনন্য-সদৃশ স্বকীয় রূপ প্রতিভার কোন্ সহজ নৈপুণ্যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে, ক্ষুদ্র সমালোচকের বিশ্লেষণী লেখনী তার অন্ত পাবে না।

সংসারে অধিকাংশ পদার্থ প্রত্যক্ষত আমাদের কাছে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত। রাস্তা দিয়ে হাজার লোক চলে ; তারা যদিচ প্রত্যেকেই বিশেষ লোক তবু আমার কাছে তারা সাধারণ মানুষমাত্র, এক বৃহৎ সাধারণতার আস্তরণে তারা আবৃত, তারা অস্পষ্ট। আমার আপনার কাছে আমি সুনিশ্চিত আমি বিশেষ, অন্য কেউ যখন তার বিশিষ্টতা

নিয়ে আসে তখন তাকে আমারই সমপর্য্যায়ে ফেলি, আনন্দিত হই।

একটা কথা স্পষ্ট করা দরকার। আমার ধোবা আমার কাছে নিশ্চিত সত্য সন্দেহ নেই এবং তার অনুবর্ত্তী যে বাহন সেও। ধোবা ব'লেই প্রয়োজনের যোগে সে আমার খুব কাছে, কিন্তু আমার ব্যক্তিপুরুষের সম্যক্ অনুভূতির বাইরে।

পূর্ব্বে অন্যত্র এক জায়গায় বলেছি যে, যে-কোনো পদার্থের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারের সম্বন্ধই প্রধান, সে-পদার্থ সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়, তার বিশিষ্টতা আমাদের কাছে অগোচর হয়ে পড়ে। কবিতায় প্রবেশ করতে সজনে ফুলের বিলম্ব হয়েছে এই কারণেই, তাকে জানি ভোজ্য বলে একটা সাধারণ ভাবে; চালতা ফুল এখনও কাব্যের দ্বারের কাছেও এসে পৌঁছয় নি। জামরুলের ফুল শিরীষ ফুলের চেয়ে অযোগ্য নয়; কিন্তু তার দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখন সে আপন চরমরূপে প্রকাশ পায় না, তার পরপর্য্যায়ের খাদ্য ফলেরই পূর্ব্বপরিচয় রূপে তাকে দেখি। তার নিজেরই বিশিষ্টতার ঘোষণা যদি তার মধ্যে মুখ্য হ'ত তা হ'লে সে এতদিনে কাব্যে আদর পেত। মুরগী পাখীর সৌন্দর্য্য বঙ্গসাহিত্যে কেন যে অস্বীকৃত সে কথা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। আমাদের চিত্ত এদেরকে নিজেরই স্বরূপে দেখে না, অন্য কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে তার দ্বারা আবৃত করে দেখে।

যাঁরা আমার কবিতা পড়েছেন তাঁদের কাছে পুনরুক্তি হ'লেও একটা খবর এখানে বলা চলে। ছিলেম মফস্বলে, সেখানে আমার এক চাকর ছিল তার বুদ্ধি বা চেহারা লক্ষ্য করবার যোগ্য ছিল না। রাত্রে বাড়ী চলে যায়, সকালে এসে ঝাড়ন কাঁধে কাজকর্ম্ম করে। তার প্রধান গুণ, সে কথা বেশী বলে না। সে যে আছে সে তথ্যটা অনুভব করলুম যেদিন সে হ'লো অনুপস্থিত। সকালে দেখি স্নানের জল তোলা হয়নি, ঝাড়পোছ বন্ধ। এল বেলা দশটার কাছাকাছি। বেশ একটু রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় ছিলি! সে বললে, আমার মেয়েটি মারা গেছে কাল রাতে। ব'লেই ঝাড়ন নিয়ে নিঃশব্দে কাজে লেগে গেল। বুকটা ধক্ করে উঠল। ভৃত্যরূপে যে ছিল প্রয়োজনীয়তার আবরণে ঢাকা, তার আবরণ উঠে গেল; মেয়ের বাপ বলে তাকে দেখলুম, আমার সঙ্গে তার স্বরূপের মিল হ'য়ে গেল, সে হ'লো প্রত্যক্ষ, সে হ'লো বিশেষ।

সুন্দরের হাতে বিধাতার পাসপোর্ট আছে, সর্ব্বত্রই তার প্রবেশ সহজে। কিন্তু এই মোমিন মিঞা, একে কী বলব? সুন্দর বলা তো চলে না। মেয়ের বাপও তো সংসারে অসংখ্য, সেই সাধারণ তথ্যটা সুন্দরও না অসুন্দরও না। কিন্তু সেদিন করুণরসের ইঙ্গিতে গ্রাম্য মানুষটা আমার মনের মানুষের সঙ্গে মিল্‌ল, প্রয়োজনের বেড়া অতিক্রম ক'রে কল্পনার ভূমিকায় মোমিন মিঞা আমার কাছে হ'লো বাস্তব।

লক্ষপতির ঘরে মেজো মেয়ের বিবাহ। এমন ধুম পাড়ার অতিবৃদ্ধেরাও বলে অভূতপূর্ব্ব। তার ঘোষণার তরঙ্গ খবরের কাগজের সংবাদ-বীথিকায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। জনশ্রুতির কোলাহলে ঘটনাটা যতই গুরুতর প্রতিভাত হোক্, তবু এই বহুব্যয়সাধ্য বিপুল সমারোহেও ব্যাপারটাকে মেয়ের বিয়ে নামক সংবাদের নিতান্ত সাধারণতা থেকে উপরে তুলতে পারে না। সাময়িক উন্মুখরতার জোরে এ স্মরণীয় হয়ে ওঠে না। কিন্তু কন্যার বিবাহ নামক অত্যন্ত সাধারণ ঘটনাকে তার সাময়িক ও স্থানিক আত্মপ্রচারের আত্মম্লানতা থেকে যদি কোনো কবি তাঁর ভাষায় ছন্দে দীপ্তিমান সাহিত্যের সামগ্রী করে তোলেন তা হ'লে প্রতিদিনের হাজার লক্ষ মেয়ের বিবাহের কুহেলিকা ভেদ করে এ দেখা দেবে একটি অদ্বিতীয় মেয়ের বিবাহরূপে, যেমন বিবাহ কুমার-সম্ভবের উমার, যেমন বিবাহ রঘুবংশের ইন্দুমতীর। সাঙ্কোপাঞ্জা ডন্‌কুইক্‌সোটের ভৃত্যমাত্র, সংসারের প্রবহমান তথ্যপুঞ্জের মধ্যে তাকে তর্জ্জমা করে দিলে সে চোখেই পড়বে না—তখন হাজার লক্ষ চাকরের সাধারণশ্রেণীর মাঝখানে তাকে সনাক্ত করবে কে? ডন্‌কুইক্‌সোটের চাকর আজ চিরকালের মানুষের কাছে চিরকালের চেনা হ'য়ে আছে, সবাইকে দিচ্ছে তার একান্ত প্রত্যক্ষতার আনন্দ; এ পর্য্যন্ত ভারতের যতগুলি বড়লাট হয়েছে তাদের সকলের জীবনবৃত্তান্ত মেলালেও এই চাকরটির পাশে তারা নিষ্প্রভ। বড় বড় বুদ্ধিমান রাজনীতিকের দল মিলে অস্ত্রলাঘব ব্যাপার নিয়ে যে বাদবিতণ্ডা তুলেছেন তথ্যহিসাবে সে একটা মস্ত তথ্য, কিন্তু যুদ্ধে পঙ্গু একটি মাত্র সৈনিকের জীবন যে-বেদনায় জড়িত

তাকে সুস্পষ্ট প্রকাশমান করতে পারলে সকল কালের মানুষ রাষ্ট্রনীতিকের গুরুতর মন্ত্রণা ব্যাপারের চেয়ে তাকে প্রধান স্থান দেবে। এ কথা নিশ্চিত জানি যে-সময়ে শকুন্তলা রচিত হয়েছিল তখন রাষ্ট্রিক আর্থিক অনেক সমস্যা উঠেছিল, যার গুরুত্ব তখনকার দিনে অতি প্রকাণ্ড উদ্বেগরূপে ছিল; কিন্তু সে সমস্যার আজ চিহ্নমাত্র নেই, আছে শকুন্তলা।

মানবের সামাজিক জগৎ দ্যুলোকের ছায়াপথের মত। তার অনেকখানিই নানাবিধ অবচ্ছিন্ন তত্ত্বের অর্থাৎ য়্যাব্‌-স্ট্র্যাকশনের বহুবিস্তৃত নীহারিকায় অবকীর্ণ; তাদের নাম হচ্চে সমাজ, রাষ্ট্র, নেশন, বাণিজ্য এবং আরও কত কি। তাদের রূপহীনতার কুহেলিকায় ব্যক্তিগত মানবের বেদনাময় বাস্তবতা আচ্ছন্ন। যুদ্ধ নামক একটি মাত্র বিশেষ্যের তলায় হাজার হাজার ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়দাহকর দুঃখের জলন্ত অঙ্গার বাস্তবতার অগোচরে ভস্মাবৃত। নেশন নামক একটা শব্দ চাপা দিয়েছে যত পাপ ও বিভীষিকা তার আবরণ তুলে দিলে মানুষের জন্যে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকে না। সমাজ নামক পদার্থ যত বিচিত্র রকমের মূঢ়তা ও দাসত্বশৃঙ্খল গড়েছে তার স্পষ্টতা আমাদের চোখ এড়িয়ে থাকে, কারণ সমাজ একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব, তাতে মানুষের বাস্তবতার বোধ আমাদের মনে অসাড় করেছে, সেই অচেতনতার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে রামমোহন রায়কে, বিদ্যাসাগরকে। ধর্ম্ম শব্দের মোহ-যবনিকার অন্তরালে যে-সকল নিদারুণ ব্যাপার সাধিত হয়ে থাকে তাতে সকল শাস্ত্রে বর্ণিত সকল নরকের দণ্ডবিধিকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। ইস্কুলে ক্লাস নামক একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব আছে সেখানে ব্যক্তিগত ছাত্র অগোচর থাকে শ্রেণীগত সাধারণতার আড়ালে, সেই কারণে যখন তাদের মন নামক সজীব পদার্থ মুখস্থ বিদ্যার পেষণে গ্রন্থের পাতার মধ্যে পিষ্ট ফুলের মত শুকোতে থাকে আমরা থাকি উদাসীন। গবর্মেণ্টের আমলা-তন্ত্র নামক অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব মানুষের ব্যক্তিগত সত্যবোধের বাহিরে, সেইজন্য রাষ্ট্রশাসনের হৃদয়সম্পর্কহীন নামের নীচে প্রকাণ্ড আয়তনের নির্দ্দয়তা কোথাও বাধে না।

মানবচিত্তের এই সকল বিরাট অসাড়তার নীহারিকা ক্ষেত্রে বেদনাবোধের বিশিষ্টতাকে সাহিত্য দেদীপ্যমান করে তুলছে। রূপে সেই সকল সৃষ্টি সসীম, ব্যক্তিপুরুষের আত্মপ্রকাশে সীমাতীত। এই ব্যক্তিপুরুষ মানুষের অন্তরতম ঐক্যতত্ত্ব, এই মানুষের চরম রহস্য। এ তার চিত্তের কেন্দ্র থেকে বিকীর্ণ হয়ে বিশ্বপরিধিতে পরিব্যাপ্ত, আছে তার দেহে, কিন্তু দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে, আছে তার মনে, কিন্তু মনকে অতিক্রম ক'রে, তার বর্ত্তমানকে অধিকার ক'রে অতীত ও ভবিষ্যতের উপকূলগুলিকে ছাপিয়ে চলেছে। এই ব্যক্তিপুরুষ প্রতীয়মানরূপে যে সীমায় অবস্থিত, সত্যরূপে কেবলি তাকে ছাড়িয়ে যায়, কোথাও থামতে চায় না! তাই এ আপন সত্তার প্রকাশকে এমন রূপ দেবার জন্যে উৎকণ্ঠিত যে রূপ আনন্দময়, যা মৃত্যুহীন। সেই সকল রূপসৃষ্টিতে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা। এই সকল সৃষ্টিতে ব্যক্তিপুরুষ পরমপুরুষের বাণীর প্রত্যুত্তর পাঠাচ্চে, যে পরমপুরুষ আলোকহীন তথ্যপুঞ্জের অভ্যন্তর থেকে আমাদের দৃষ্টিতে আপন প্রকাশকে নিরন্তর উদ্ভাসিত করেছেন সত্যের অসীম রহস্যে সৌন্দর্য্যের অনির্ব্বচনীয়তায়।*

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত।

রাম ও বালী

(আর্য্য ও অনার্য্যে সংঘাত)

শ্রীরজনীকান্ত গুহ

দুর্ম্মুখেরা বলে, শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষগণ প্রাচ্য ভূখণ্ডে আসিবার কালে তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলখানি সুয়েজ প্রণালীতে নিঃক্ষেপ করেন ; তাহার কারণ এই যে, ঐ শাস্ত্রের উপদেশগুলি স্বদেশেই অচল হইয়া উঠিতেছে, বিজিত দেশগুলিতে উহার এক বর্ণও ব্যবহারে আসিতে পারে না।

এই নিন্দা শুধু শ্বেতবর্ণ খ্রীষ্টশিষ্যদিগেরই প্রাপ্য নয়। প্রাচীন ও আধুনিক কোন যুগেই জয়গর্ব্বিত প্রবলতর জাতি দুর্ব্বলতর জাতির সহিত আদানপ্রদান করিতে গিয়া ধর্ম্মানুশাসন গ্রাহ্য করিয়া চলে নাই। পরাজিত জাতির শাসন-সংরক্ষণে বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি মানিয়া চলিয়াছে, এমন জাতির নাম ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতের আর্য্যজাতি যদি এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হইতেন, তবে আজ এ-দেশে অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণের জন্য মহা সংগ্রাম আরম্ভ হইত না।

আর একটা কথা। সকল সভ্য দেশেই শাস্ত্রে উৎকৃষ্ট বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে ; কিন্তু কাজের বেলায় সেগুলি পদে পদে লঙ্ঘিত হইতেছে। বর্ত্তমান কালের ইতিহাস আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই—যাহা সকলেই প্রতিনিয়ত চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইতেছে, তাহা দেখাইয়া দিবার প্রয়াস নিরর্থক। মহাভারত হইতে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রাক্‌কালে কুরু, পাণ্ডব ও সোমকগণ যুদ্ধের কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারণ করিলেন—

"আরব্ধ যুদ্ধ নির্ব্বাপিত হইলে আমাদের পরস্পর প্রীতি সংস্থাপিত হইবে। সমযোগ্য ব্যক্তিরাই পরস্পর ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিবে কদাচ প্রতারণা করা হইবে না। যাহারা বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত বাক্য দ্বারাই যুদ্ধ করিবে। যাহারা সেনার মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে কদাপি প্রহার করিবে না। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা, অভিলাষ, উৎসাহ ও বল অনুসারে যুদ্ধ করিবে। অগ্রে বলিয়া পরে (প্রতিপক্ষকে) প্রহার করিবে। বিশ্বস্ত ও ভীত ব্যক্তিকে প্রহার করিবে না। যে একজনের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছে ; যে শরণাগত ; যে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ, যাহার অস্ত্রশস্ত্র নিঃশেষ হইয়াছে, যে ধর্ম্মবিহীন, তাহাকে কখনও প্রহার করা হইবে না। সারথি, ভারবাহী শস্ত্রোপজীবী, ভেরীবাদক ও শঙ্খবাদককে কদাপি আঘাত করিবে না।"

(ভীষ্মপর্ব্ব। ১।২৭-৩২। প্রতাপ রায়ের অনুবাদ, স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত।)

কুরুপাণ্ডবগণ ধর্ম্মযুদ্ধের নিয়মাবলি অঙ্গীকার করিয়া লইলেন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সব নিয়ম মানিয়া চলিলেন কি ? কৌরবেরা ছয় রথীতে মিলিয়া কিশোর অভিমন্যুকে সংহার করিলেন। পাণ্ডবপক্ষে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, তিন জনেই কোন-না-কোনও নিয়ম পদদলিত করিয়া জয়ের পথ সুগম করিয়া তুলিলেন। "কদাচ প্রতারণা করা হইবে না," এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্যের বধসাধনে সহায় হইলেন। "যে এক জনের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাকে কদাপি আঘাত করিবে না," এই নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া অর্জ্জুন সাত্যকির শিরশ্ছেদোদ্যত ভূরিশ্রবার বাহু ছেদন করিয়া পরাজিত শত্রুর দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করাইলেন। ভীম অন্যায়পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের ঊরু ভঙ্গ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সসাগরা পৃথিবীর অসপত্ন অধিকার প্রদান করিলেন। ক্রোধান্ধ অশ্বত্থামা গভীর নিশীথে সুপ্ত শত্রুশিবিরে উৎপতিত হইয়া এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র প্রভৃতি বীরগণকে সংহার করিয়া এই অধর্ম্মের প্রতিশোধ লইলেন ; মাতুল কৃপাচার্য্যের "ন বধঃ পূজ্যতে লোকে সুপ্তানামিহ ধর্ম্মতঃ"—(প্রসুপ্ত ব্যক্তিদিগের বধ ইহলোকে ধর্ম্মানুগত কার্য্য নহে)—এই নিষেধ বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। পরিশেষে, ন্যস্তশস্ত্রভীষ্মবধে ধর্ম্মযুদ্ধের কোন্ কোন্ নিয়ম অটুট ছিল, তাহা নির্ণয় করা এক দুরূহ সমস্যা। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, "সারথিকে প্রহার করা হইবে না," এই নিয়ম দুই পক্ষই প্রতিদিন লঙ্ঘন করিয়াছেন।

তবেই দেখা যাইতেছে, ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশগুলি তত্ত্বের দিক্ দিয়া উপাদেয় হইলেও ব্যবহারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, সেগুলি

সম্যক্ প্রতিপালিত হয় নাই। রাম-বালীর কাহিনীতেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। "অন্যের সহিত যুদ্ধে আসক্ত ব্যক্তিকে যোদ্ধা কদাপি বধ করিবে না" (ন পরেণ সমাগতম্ .. হন্যাৎ। ৭।৯২)—এই নিয়ম মনুর যুদ্ধবিষয়ক বিধানের মধ্যেও স্থান পাইয়াছে। অথচ বালী যখন সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে হীনবল করিয়া ফেলিতেছিলেন, তখন সহসা রাম অলক্ষিতে থাকিয়া তাঁহাকে কালান্তক বাণে বিদ্ধ করিলেন। বালী এই অধর্ম্মকর্ম্মের জন্য রামকে তিরস্কার করিলেন, রামের উত্তরে অনার্য্যগণের প্রতি আর্য্যজাতির মনোভাব সুস্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া উঠিল; ধর্ম্মনীতির তুলাদণ্ড অনার্য্য বালী না আর্য্য জাতির আদর্শ পুরুষ রামের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, তাহা বুঝিবার সাহায্য হইবে বলিয়া আমরা উভয়ের কথোপকথনটি সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বালী রামের শরে আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন; তাঁহার সংজ্ঞা প্রায় লুপ্ত হইল। কিয়ৎকাল পরে দেখিলেন, রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন তিনি গর্ব্বিত ভাবে ও পরুষ বাক্যে বলিতে লাগিলেন—

"রাম, আমি তোমার সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলাম না; আমাকে বধ করিয়া তোমার কি লাভ হইল? আমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলাম অথচ তোমার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলাম। রাম সদ্বংশজাত, বলবান, তেজস্বী, ব্রতনিষ্ঠ, দয়ালু, প্রজাগণের হিতে রত—এইরূপ তোমার গুণের আরও কত খ্যাতি আছে। আমি তারার নিষেধ না মানিয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলাম। তোমাকে দেখিবার পূর্ব্বে আমার এই প্রত্যয় হইয়াছিল যে, আমি যখন অন্যের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিব, তোমার সম্বন্ধে সাবধান থাকিব না, তখন তুমি আমাকে কখনই বাণবিদ্ধ করিবে না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তুমি ছদ্মবেশী অধার্ম্মিক; জানিলাম, তোমার আত্মা নষ্ট হইয়াছে, কেন-না, তুমি ধর্ম্মধ্বজী অধার্ম্মিক, সজ্জনের বেশ ধরিয়া পাপাচরণ করিতেছ তুমি তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায়, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়; আমি জানিতাম না, যে, তুমি ধর্ম্মের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়াছ। আমি তোমার দেশে বা পুরীতে কোনও অন্যায় কর্ম্ম করি নাই, তোমাকে অবজ্ঞাও করি নাই তবে তুমি আমাকে কেন বধ করিলে? আমি নিত্য ফলমূলভোজী বনবাসী বানর তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে যাই নাই, অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম; কেন আমায় বধ করিলে? তুমি রাজপুত্র, সুবিখ্যাত ও প্রিয়দর্শন; তোমার অঙ্গে জটাবল্কলাদি অহিংসাসূচক ধর্ম্মচিহ্নও বর্ত্তমান আছে। কোন্ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ ও সংশয়-শূন্য হইয়া এবং ধর্ম্মচিহ্নে আপনাকে আচ্ছাদিত রাখিয়া এই প্রকার নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়া থাকে? তুমি রাঘবকুলে জাত ও ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত; তবে তুমি কি জন্য অভব্য হইয়া ভব্যের বেশে বিচরণ করিতেছ? সাম দান, ক্ষমা, ধর্ম্ম, সত্য, ধৈর্য্য, পরাক্রম, অপকারীর দণ্ডবিধান—এইগুলি রাজার গুণ। আমরা বনচর, ফলমূলাশী বানর—ইহাই আমাদিগের প্রকৃতি; হে নরেশ্বর, তুমি তো গ্রামবাসী অন্ন-ভোজী পুরুষ! ভূমি, স্বর্ণ ও রৌপ্য (অপরকে) বধ করিবার কারণ; তবে বনে এবং আমার ফলে তোমার লোভ কিরূপে থাকিতে পারে? (বনচর ও পুরচর, বানর ও মনুষ্য, ফলমূলভোজী ও অন্নভোজী, বানরেশ্বর ও নরেশ্বর—উভয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্ম্মী; ইহাদের মধ্যে বিরোধের স্থল কোথায়?) নীতি ও অনীতি, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ—এই সকল বিষয়ে রাজার আচরণ বিপরীত; রাজা কখনও স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না। কিন্তু তুমি স্বেচ্ছাচারী, ক্রোধী ও অস্থিরচিত্ত; তোমার রাজব্যবহারে ঔদার্য্য নাই তুমি কেবল যেখানে সেখানে শর নিক্ষেপ করিতে পটু। তোমার ধর্ম্মে আস্থা নাই, অর্থে স্থির বুদ্ধি নাই; তুমি কামনার অধীন হইয়া ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ইতস্ততঃ আকৃষ্ট হইতেছ। আমি নিরপরাধ, আমাকে তুমি বাণ দ্বারা হত্যা করিলে এই নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়া সাধুগণের মধ্যে তুমি কি বলিবে? সাধুলোকেরা আমার চর্ম্ম ধারণ করেন না, রোম ও অস্থি বর্জ্জন করেন তোমার ন্যায় ধার্ম্মিকের পক্ষে আমার মাংসও অভক্ষ্য। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরা শল্যক, শজারু, গোধা, শশ ও কূর্ম্ম—এই পাঁচটি পঞ্চনখ প্রাণী ভক্ষণ করিতে পারেন। পণ্ডিতেরা আমার চর্ম্ম ও অস্থি স্পর্শ করেন না; আমার মাংসও অভক্ষ্য; তথাপি পঞ্চনখ আমি (অভক্ষ্য হইলেও) হত হইলাম। সর্ব্বজ্ঞ তারা আমাকে সত্য ও হিত বাক্যই বলিয়াছিলেন; আমি মোহবশতঃ তাহা অবহেলা করিয়া কালের কবলে পতিত হইলাম। সুশীলা রমণী বিধর্ম্মী পতি বিদ্যমান থাকিতেও যেমন অনাথা, তেমনি তুমি নাথরূপে বিদ্যমান থাকিতেও বসুন্ধরা অনাথা হইয়াছেন। তুমি শঠ, গোপনে অপরের অনিষ্ট করিয়া থাক; তুমি পরের অপকারী, ক্ষুদ্রান্তঃকরণ, অসংযতচিত্ত মহামনাঃ দশরথ হইতে তোমার ন্যায় পাপিষ্ঠ কিরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিল? তোমার সহিত আমাদিগের কোনও সংস্রব ছিল না আমাদিগের প্রতি তুমি এই বিক্রম প্রকাশ করিলে; কিন্তু, যাহারা তোমার অপকারী, যাহারা তোমার স্ত্রীকে অপহরণ করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি তো তোমাকে বিক্রম প্রকাশ করিতে দেখিলাম না। রাম, তুমি যদি দৃষ্টিপথে থাকিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে, তবে তোমাকে অদ্যই বধ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিতাম। সর্প যেমন সুপ্ত ব্যক্তিকে দংশন করে, তেমনি তুমি অন্তরালে থাকিয়া দুর্জ্জয় আমাকে হত্যা করিলে। তুমি সুগ্রীবের প্রিয় কার্য্য করিবার বাসনায় আমাকে বধ করিলে কিন্তু যদি তুমি সীতাকে উদ্ধার করিবার কথা পূর্ব্বে আমাকে বলিতে, তবে আমি একদিনেই তাঁহাকে আনিতে পারিতাম এবং তোমার ভার্য্যাপহারী সেই দুরাত্মা রাক্ষস রাবণকে কণ্ঠে বন্ধন করিয়া জীবিত অবস্থায় তোমার হস্তে সমর্পণ করিতাম। আমি স্বর্গে গমন করিলে সুগ্রীব রাজ্য পাইবে, ইহা ন্যায়সঙ্গত বটে, কিন্তু তুমি যে যুদ্ধে অধর্ম্ম করিয়া আমাকে হত্যা করিলে, ইহা অন্যায় হইল। সকল প্রাণীই মৃত্যুর অধীন, কালবশে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় সুতরাং মরণের জন্য আমার খেদ নাই; কিন্তু আমাকে বধ করিয়া তোমার কি লাভ হইল, ইহাই এখন চিন্তা কর।"

বালীর কটূক্তিগুলি বর্জ্জন করিয়া তিনি কি কি কারণে রামের কার্য্য গর্হিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। (১) রাম ধর্ম্মযুদ্ধের একটি সনাতন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন; (২) বালী রামের রাজ্যে গিয়া কোনও উৎপাত করেন নাই, তাঁহার

প্রতি অবজ্ঞাও প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং অপকারের প্রতিশোধ, অথবা আত্মসম্মান বোধের প্ররোচনা (lese majeste)—আলোচ্যস্থলে এই দুইটির কোন হেতুই বর্ত্তমান ছিল না; (৩) বালী ও রাম সম্পূর্ণ ভিন্নধর্ম্মী—বনচর ও পুরচর; ফলমূলভোজী ও অন্নভোজী; বানরেশ্বর ও নরেশ্বর—ইহাদের পরস্পরের স্বার্থ বিভিন্ন, সুতরাং স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষের অবসর নাই; (৪) ভূমি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের লোভে এক রাজা অন্য রাজাকে আক্রমণ করেন। রাম বালীর রাজ্যে লোভ করিতেছেন, ইহার কোনও প্রমাণ নাই; তিনি জটাবল্কলধারী তপস্বী, স্বর্ণ-রৌপ্যে লোভ আছে, ইহাও সম্ভবপর নহে। (বালী বানর, তাঁহার স্বর্ণরৌপ্য থাকিবেই বা কি প্রকারে? যদিচ কিষ্কিন্ধ্যার বর্ণনায় দেখা যায়, তথায় স্বর্ণরৌপ্য-মণিমুক্তার অভাব ছিল না।) সুতরাং ধনলিপ্সাও বালীবধের হেতু হইতে পারে না। (৫) কিন্তু রাজারা মৃগয়াপ্রিয়, মাংসার্থে বিবিধ প্রাণী হত্যা করেন। সে-হেতুও এস্থলে বিদ্যমান নাই; কেন-না, বানরের মাংস রামের পক্ষে অভক্ষ্য।

(আমরা এতক্ষণ বালীকে একটা অনার্য্য জাতির রাজা বলিয়া ভাবিতেছিলাম; মাংস, চর্ম্ম ও রোমের কথা তুলিয়া কবি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, বালী সত্য সত্যই পঞ্চনখ বানর, রূপক বানর নহেন। এই বস্তুতন্ত্রতা (realism) পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারিয়াছে কি-না পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।)

এক্ষণে দেখা যাক্, রাম তাঁহার উত্তরে বালীর অভিযোগগুলি খণ্ডন করিতে পারিলেন কি-না।

রাম বালী দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মসঙ্গত, অর্থসম্পন্ন ও গুণমণ্ডিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন—

"তুমি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এবং লোকাচার না জানিয়া কেন আজ অজ্ঞানতাবশতঃ আমার নিন্দা করিতেছ? তুমি বুদ্ধিমান্ বয়োবৃদ্ধ আচার্য্যগণের উপদেশ শ্রবণ না করিয়াই বানরসুলভ চপলতা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমাকে এইরূপ বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। পর্ব্বতবন-কানন সমন্বিত এই পৃথিবী ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতিগণের অধিকারভুক্ত; পশুপক্ষীমনুষ্যের নিগ্রহানুগ্রহেও তাঁহারাই প্রভু। সত্যবাদী, সরল-স্বভাব, মহাত্মা ভরত এক্ষণে পূর্ব্বপুরুষাগত এই পৃথিবী পালন করিতেছেন। তিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম অবগত আছেন এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে রত রহিয়াছেন। তাঁহাতে নীতি, বিনয় ও সত্য বিদ্যমান; তিনি দেশকাল বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং যতদূর দেখা যাইতেছে, তাঁহাতে বিক্রমও যথেষ্ট আছে। আমরা ও অন্যান্য পার্থিবগণ তাঁহার ধর্ম্মানুগত আদেশে ধর্ম্মবিস্তারের মানসে সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতেছি। যখন সেই ধর্ম্মবৎসল নৃপতিশ্রেষ্ঠ ভরত অখিল পৃথ্বী শাসন করিতেছেন, তখন কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিতে পারে? আমরাও ভরতের আদেশানুসারে পরম স্বধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তির যথাবিধি বিচার করিতেছি। তুমি গর্হিত কর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্মকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছ এবং কামপরবশ হইয়া রাজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছ। যাঁহারা ধর্ম্মপথে চলেন, তাঁহাদিগের নিকটে পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও বিদ্যাদাতা—এই তিন জন পিতা বলিয়া গণ্য। কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আপনার পুত্র এবং গুণবান্ শিষ্য—এই তিন জনকে পুত্র মনে করিবে; ধর্ম্মই ইহার কারণ। বানর, সাধুদিগের ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম, সদ্গুরুর উপদেশ ভিন্ন উহা অবগত হওয়া যায় না। সর্ব্বভূতের হৃদ্স্থিত আত্মাই শুভাশুভ জানিতেছেন। যে নিজে জন্মান্ধ, সে কি অন্য জন্মান্ধকে পথ দেখাইতে পারে? তেমনি তুমি চপল, তুমি চপল ও মূর্খ বানরগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কিরূপে ধর্ম্ম অবগত হইবে? আমি এই বাক্যের তাৎপর্য্য তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি: শুধু ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে ভর্ৎসনা করা তোমার উচিত হইবে না। যে জন্য আমি তোমাকে হত্যা করিয়াছি, তাহার এই কারণ তোমাকে বলিতেছি, তুমি শুন:—

"তুমি সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃজায়ার সহিত বাস করিতেছ। মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত থাকিতেই তুমি পুত্রবধূস্থানীয়া রুমাকে কামপরবশ হইয়া শয্যাসঙ্গিনী করিয়াছ—তুমি পাপাচারী। রে বানর, তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট, কামপরবশ: ভ্রাতৃজায়ার এই দূষণে মৃত্যুই একমাত্র দণ্ড, তাহাই তোমাকে প্রদান করিয়াছি। বানরেশ্বর, যে ব্যক্তি লোকবিরুদ্ধ কর্ম্মে লিপ্ত হয় এবং লোকব্যবহারের মর্য্যাদা অতিক্রম করে, মৃত্যুদণ্ড ভিন্ন তাহার অন্য নিগ্রহ দেখিতে পাইতেছি না। আমি সৎকুলোদ্ভব দণ্ডদাতা ক্ষত্রিয় হইয়া তোমার এই পাপ ক্ষমা করিতে পারিলাম না। যে ব্যক্তি কামবশতঃ কন্যা, ভগিনী বা কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূতে প্রসক্ত হয়, শাস্ত্রে বধই তাহার দণ্ড বলিয়া বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে ভরত মহীপাল, আমরা তাঁহার আদেশ বহন করিয়া চলিতেছি; তুমি ধর্ম্মপথচ্যুত তোমাকে আমরা কিরূপে উপেক্ষা করিব?

"তৎপরে, লক্ষ্মণের সহিত আমার যে প্রকার সৌহার্দ্দ, সুগ্রীবের সহিতও সেই প্রকার সৌহার্দ্দ। সুগ্রীব নিজের স্ত্রী ও রাজ্য প্রাপ্তির বাসনায় আমার হিতসাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, আমিও সেই সময়ে বানরগণের সমক্ষে তাহাকে (সাহায্য করিবার) প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। আমার মত লোকে কি কখনও প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে? এই সকল গুরুতর ধর্ম্মানুগত কারণে তোমার দণ্ড শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে কি-না, তাহা তুমি ভাবিয়া দেখ। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম মানিয়া চলে, সে বলিবে, যে, তোমার নিগ্রহও সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মকার্য্য, সখার উপকার করাও কর্ত্তব্যকর্ম্ম। ধর্ম্মদৃষ্টিতে দেখিলে তুমিও তাহা স্বীকার করিবে। চরিত্রোন্নতির সহায় মনুর দুইটি শ্লোক আছে।—মানুষ পাপ কার্য্য করিলে রাজার দণ্ড গ্রহণ করিয়া নিষ্পাপ হয় এবং পুণ্যকর্ম্মা সাধুদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে। দণ্ড সহিয়াই হউক বা মুক্তি পাইয়াই হউক, পাপী পাপ হইতে মুক্ত হয়; কিন্তু রাজা যদি পাপীকে শাসন না করেন, সেই পাপ রাজাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"হে বানরশ্রেষ্ঠ, ইহার আর একটি কারণ আছে, তাহা তুমি শুন; তাহা শুনিলে তুমি আর (আমার উপরে) ক্রোধ করিবে না। তোমাকে প্রচ্ছন্নভাবে বধ করিয়া আমার মনস্তাপ বা শোক হইতেছে না। (কেন-না, তাদৃশ ভাবে পশু বধ করা রাজগণের স্বাভাবিক কর্ম্ম।) লোকে দৃশ্য বা অদৃশ্য থাকিয়া বাগুরা, পাশ প্রভৃতি বিবিধ কূট উপায়ে বহু মৃগ ধরিয়া থাকে। ঐ সকল মৃগ পলায়নের উদ্দেশ্যে ধাবমান হউক,

মত্ত হউক, পালিত পশুর সহিত যুদ্ধে নিরত থাকুক, প্রমত্ত হউক বা অপ্রমত্ত হউক, অথবা তাহারা সংগ্রামে বিমুখ হউক, মাংসাশী মানুষ তাহাদিগকে কত কত বধ করে। ইহাতে কিছুই দোষ নাই। তৎপরে, রাজ্ঞ রাজর্ষিরা মৃগয়া করিতে গিয়া থাকেন। মৃগয়াচ্ছলেই তুমি যুদ্ধে আমার বাণে নিহত হইয়াছ; যেহেতু তুমি শাখামৃগ। তুমি আমার সহিত যুদ্ধ নাই কর অথবা অন্যের সহিত যুদ্ধেই নিযুক্ত থাক, তোমাকে বধ করিয়া আমি অধর্ম্ম করি নাই।) হে বানরশ্রেষ্ঠ, রাজগণ দুর্লভ ধর্ম্ম, জীবন ও কল্যাণ প্রদাতা, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদিগকে হিংসা করিবে না, নিন্দা করিবে না, অপমান করিবে না, অপ্রিয় বাক্য বলিবে না। তুমি ধর্ম্ম না জানিয়া কেবল ক্রোধের বশীভূত হইয়া আমাকে দোষ দিতেছ, আমি কুলাগত ধর্ম্মই পালন করিয়াছি।"

এখন আমরা বালীর অভিযোগের এক একটি ধারা এবং রামের উত্তর পাশাপাশি রাখিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। তৎপূর্ব্বে রামের উক্তিগুলির বিশ্লেষণ আবশ্যক।

(১) কিষ্কিন্ধ্যা ভরতের অর্থাৎ রামের রাজ্যভুক্ত, সুতরাং বালীকে দণ্ড দিবার অধিকার তাঁহার আছে।

(২) বালী কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে গ্রহণ করিয়া ঘোরতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন; মৃত্যুদণ্ডই উহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

(৩) রাম স্বকার্য্য-সাধন অর্থাৎ সীতার উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন এই সর্ত্তে যে, রাম বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করিবেন, সুগ্রীব সীতার উদ্ধারে সহায় হইবেন। রাম এই সন্ধি বা প্যাক্ট (pact) অনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য, কেন-না, কথা দিয়া কথা রক্ষা না-করা গুরুতর অধর্ম্ম।

(৪) রাম কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি, বালী তাঁহার প্রজা; অপরাধী প্রজার দণ্ডবিধান না করিলে রাজা পাপে পতিত হইয়া থাকেন।

(৫) বালীকে প্রচ্ছন্ন ভাবে বধ করিয়া রাম কিছুই অন্যায় করেন নাই, কেন-না, বালী বানর, মৃগয়াতে এইরূপে পশুবধ সর্ব্বদাই হইতেছে।

(৬) পশুবধে ধর্ম্মযুদ্ধের নিয়ম খাটে না।

১। বালী রামের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া উপদ্রব করেন নাই, তবে রাম তাঁহাকে মারিলেন কেন? ইহার উত্তরে রাম বলিতেছেন, কিষ্কিন্ধ্যা তাঁহাদেরই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত, সুতরাং বালী অপকর্ম্ম করিলে রামের কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া তাঁহাকে শাসন করিবার অধিকার আছে; শুধু অধিকার আছে, তাই নয়; তিনি ধর্ম্মতঃ রাজকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে, অর্থাৎ অপরাধী বালীকে দণ্ড দিতে, বাধ্য।

কিষ্কিন্ধ্যা রঘুবংশীয়দিগের রাজ্যভুক্ত, ইহা আমরা এই প্রথম শুনিলাম। রাম ও সুগ্রীবের সখ্যবন্ধনের সময়ে ইহার উল্লেখ থাকিবার কথা, কিন্তু প্রাসঙ্গিক স্থলে তাহার নাম-গন্ধও নাই। ইহাতে মনে হইতেছে, এখানে কবি প্রাচীন ও আধুনিক কালে সুপরিচিত সাম্রাজ্যবাদীদিগের নীতি (imperialistic policy) স্থাপন করিতেছেন। "আমি তোমার রাজ্য আক্রমণ করি নাই, তবে তুমি আমার রাজ্য আক্রমণ করিলে কেন"—ইহার উত্তর, "তোমার রাজ্য আবার কি? উহা আমার"—অর্থাৎ "জোর যার, মুলুক তার।" আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়ার শ্বেতাঙ্গ-উপনিবেশগুলি এই নীতির প্রতিমূর্ত্তি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভরত নন্দিগ্রামে রামের পাদুকা অভিষেক করিয়া তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজ্য পালন করিতেছিলেন। (অযোধ্যা, ১১৫ অধ্যায়)। কিন্তু রাম বলিতেছেন, এক্ষণে ভরত সসাগরা বসুন্ধরার অধিপতি, তিনি ভরতের আজ্ঞাবহ হইয়া দুষ্টের দমন করিতেছেন। এই উক্তিতে রামের মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যই প্রকাশ পাইতেছে। রাম চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য জটাবল্কলধারী বনবাসী হইয়াছেন; বনবাসের প্রতিশ্রুত সময় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি আপনাকে রাজা বলিয়া প্রচার করিবেন না। কবি কি রাম ও ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম ও রাজ্যের প্রতি অলোভ দ্বারা বালী ও সুগ্রীবের রাজ্যলোভ ও জিঘাংসাকে ধিক্কার দিতেছেন? যদি তাহাই হয়, তবে বলা যাইতে পারে, ইহা চারুশিল্পে বৈসাদৃশ্যমূলক চিত্রাঙ্কনের (a study in contrast) একটা দৃষ্টান্ত।

২। বালীর দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, রাম ও তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম্মী; উভয়ের স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ ঘটিবে, ইহা সম্ভবপর নহে; রাম তাঁহার রাজ্যের বা ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাহারও কোন নিদর্শন নাই; তবে তাঁহাকে বধ করিলেন কেন?

রাম এই অভিযোগ খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, হাঁ, স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ ঘটিয়াছে বইকি। তিনি যখন একেবারে নিঃসহায়, তখন সীতার উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সাহায্য একান্ত আবশ্যক জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, যে, বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে

কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্য দান করিবেন। বালীর স্বার্থ, আপনার জীবনরক্ষা; রামের স্বার্থ সীতার উদ্ধার। এইখানে স্বার্থে স্বার্থে বিরোধ রহিয়াছে।

কিন্তু বালী বলিতেছেন, সীতার উদ্ধারের জন্য তাঁহাকে বধ করিবার প্রয়োজন ছিল না। তাঁহাকে বলিলে তিনি অনায়াসে সীতাকে উদ্ধার করিয়া রামের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিতেন।

রাম স্পষ্ট করিয়া এ-কথার উত্তর দেন নাই। উত্তরটা বোধ হয় এই যে, তিনি যখন নিঃসহায় অবস্থায় সীতার অন্বেষণে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন তাঁহারই ন্যায় রাজ্য-ভ্রষ্ট ও নিঃসহায় সুগ্রীবের সহিত তাঁহার অগ্রে সাক্ষাৎ হয়, অবস্থাসাম্যের জন্য সহজেই উভয়ের সখ্যবন্ধন হইয়াছিল। 'আমি সুগ্রীবকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, তাহা কদাপি ভঙ্গ করিতে পারি না"—এই উক্তিতে ঐ উত্তর অনুস্যূত আছে।

তারপর সহায়শূন্য বনবাসী ব্রহ্মচারী রামের সহিত দুর্দ্ধর্ষ বানরপতি বালী যে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইতেন, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ছিল?

আর একটা কথা। পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য রাম বনবাসী হইয়াছিলেন। তিনি কি নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে পারেন? সত্যপালন রামায়ণের মূলমন্ত্র; উহার মুখ্য অর্থ, যে-বাক্য একবার উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেই হইবে।

৩। বালী বলিতেছেন, তিনি বানর; বানরের মাংস ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অভক্ষ্য; অতএব রাম তাঁহাকে নিরর্থক হত্যা করিয়াছেন। রাম এই অভিযোগের স্পষ্ট উত্তর দেন নাই; বোধ হয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

৪। বালীর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ, রাম ধর্ম্মযুদ্ধের একটি সুবিদিত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছেন।

রাম এই অভিযোগের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ, তিনি বালীকে কেন বধ করিলেন, তাহার কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপরে ধর্ম্মযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার যে প্রত্যবায় হয় নাই, তাহাই বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আত্মসমর্থনের এই দুই ভাগ পরস্পরবিরোধী।

(ক) বালী কনিষ্ঠ ভ্রাতার জীবদ্দশায় তাঁহার পত্নী রুমাকে শয্যাসঙ্গিনী করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছেন; মৃত্যুই উহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। এজন্য রাম স্বয়ং রাজা বা রাজা ভরতের প্রতিনিধিরূপে বালীকে বধ করিয়াছেন।

এই যুক্তি বিচারসহ নহে। যদি মনে করি, বালী অনার্য্য, একটা অনার্য্য জাতির অধিপতি, তবে আর্য্যধর্ম্মনীতির দ্বারা তাঁহার বিচার করা কিরূপে ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে? "কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুত্রতুল্য, তাহার পত্নী পুত্রবধূস্থানীয়া"—ইহা আর্য্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা। অনার্য্যেরা ইহা শুনে নাই, শুনিলেও মানিত না। বালীর কার্য্য কিষ্কিন্ধ্যায় পাপাচার বলিয়া গণ্য হইলে বানরেরা তাঁহার নিন্দা করিত, রাজ্যে বিদ্রোহ হইত। কবি নিন্দা বা বিদ্রোহের কোনই আভাস দেন নাই। যাঁহারা রামের এই যুক্তিটির অনুমোদন করেন, তাঁহারা বলুন ভারতবর্ষের আইনে যখন জাল করিবার অপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না, তখন ইংলণ্ডের বিধান মতে ঐ অভিযোগে নন্দকুমারকে ফাঁসি দিয়া হেষ্টিংস ও ইম্পী কি কুকর্ম্ম করিয়াছিলেন? ফলতঃ আর্য্য ও অনার্য্য, সভ্য ও অসভ্য, প্রবল ও দুর্ব্বল—ইহাদিগের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে ন্যায়ধর্ম্মের এই প্রকার ব্যভিচার অহরহই ঘটিয়া থাকে।

আবার আমরা ধরিয়া লই, বালী সত্য সত্যই পঞ্চনখ বানর, অর্থাৎ পশু। তবে তাঁহার প্রতি শাস্ত্রোক্ত বিধির প্রয়োগ কি একটা অযৌক্তিক, হাস্যজনক ব্যাপার নহে? পশুদিগের কি বিবাহপ্রথা বা গম্যাগম্য বিচার আছে? একটা বানর "সনাতন ধর্ম্ম" ত্যাগ করিয়াছে, ইহার অর্থ কি?

(খ) রাম ধর্ম্মযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন, এখন আমরা এই অভিযোগের উত্তর পাইতেছি। বালী শাখামৃগ, পশু। তিনি মৃগয়ার কথা তুলিয়াছেন, রামও মৃগয়ার দৃষ্টান্ত দ্বারাই আত্মসমর্থন করিতেছেন। মৃগয়াতে ধর্ম্মযুদ্ধের কোন বিধানই প্রযোজ্য নহে। বালী একটি নিষেধবচন উল্লেখ করিয়া রামের নিন্দা করিয়াছেন; রাম আরও কয়েকটি নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, পশুবধে সেগুলি নিয়তই লঙ্ঘিত হইতেছে, তাহাতে মৃগয়াকারীদিগকে কোনও দোষই স্পর্শ করিতেছে না।

রামায়ণের কবি অনার্য্য জাতিসমূহকে বানর ভল্লুক ইত্যাদি নামে আখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বর্ণনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহারা প্রকৃতপক্ষে পশু ছিল

না। ঐশ্বর্য্যে ও বিলাসসামগ্রীতে কিষ্কিন্ধ্যা অযোধ্যার নিকটে পরাজয় স্বীকার করিত না। হনুমান্ শুধু বল বুদ্ধি ও পরাক্রমে বিখ্যাত ছিলেন, তাহা নহে; তিনি দেশ, কাল বুঝিয়া কার্য্য করিতে জানিতেন এবং নীতিশাস্ত্রেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল; এজন্য সুগ্রীব তাঁহাকে "নয়পণ্ডিত" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (কিষ্কিন্ধ্যা। ৪৪।৭॥) ইন্দ্রপুত্র বালী ইন্দ্রের তুল্যই পরাক্রমশালী ছিলেন (১৯।২৩॥)। তিনি ইন্দ্রপ্রদত্ত রত্নখচিত স্বর্ণহারে অলঙ্কৃত হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন (১৭।৫॥)। বানরেরা বস্ত্র পরিধান করিত (১২।১৫); বালী সুগ্রীব প্রভৃতি মহার্হ পর্য্যঙ্ক, মণিমুক্তা ব্যবহার করিতেন। (৩৩।১৯,২০,২৩)। বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। রামের উক্তি হইতেও প্রতিপন্ন হয়, তিনি বালীকে মানুষ বলিয়াই দণ্ড দিয়াছিলেন।

কিন্তু রাম অন্যের সহিত যুদ্ধরত বালীকে বধ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধের একটি নিষেধবাণী পদদলিত করিয়াছেন, এই অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়া তাঁহাকে বালীর মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়া বানরত্বের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। প্রাণদণ্ড সহিবার সময় বালী মানুষ; অধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইবার সময় বালী বানর বা পশু। ইহার পোষকতার জন্য বালীর দ্বারাও কবি একবার বলাইয়াছেন, তিনি বানর। এই অসঙ্গতি বানরবর্ণনায় পূর্ব্বাপর রক্ষিত হইয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। হনুমান্ জ্ঞানে ও গুণে কোনও মানুষ অপেক্ষা হীন ছিলেন না; কবি যেন তাঁহার চিত্র আঁকিতে আঁকিতে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। সহসা তাঁহার মনে পড়িল, "ওঃ, হনুমান্ তো বানর," সুতরাং বহু বিলম্বে হঠাৎ একবার হনুমানের লাঙ্গুলটি উল্লেখ করিতে হইল। (কিষ্কিন্ধ্যা ৬৭।৪॥)।

মহাকবিদিগের অসঙ্গতি ধর্ত্তব্য নহে। মিল্টন তাঁহার মহাকাব্যে দেবাত্মা ও দুষ্টাত্মাদিগকে শরীরী ও অশরীরী, দুই প্রকারই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইয়ুরোপীয়েরা আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে পশু জ্ঞান করিত। তথাকার যুক্তরাজ্যের একটি প্রদেশে (Pennsylvaniaতে) তাম্রবর্ণ জাতির এক এক জনের মস্তকের উপরে বয়ঃক্রমানুসারে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এদেশে যেমন বিষাক্ত সর্প মারিতে পারিলে লোকে পুরস্কার পাইয়া থাকে, তেমনি তথায় এক একটা রেড ইণ্ডিয়ানের মাথা আনিতে পারিলে শিকারীরা রাজসরকার হইতে যথেষ্ট অর্থ লাভ করিত। রামায়ণের কবি কি বালী-বধের কাহিনীদ্বারা ইঙ্গিত করিলেন, আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে পশুর অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করিতেন না?

কাহিনীটির উপসংহার চমৎকার। রামের উত্তর শুনিয়া বালীর প্রবোধ জন্মিল; তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া রামের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

বালীর প্রবোধ জন্মিল বটে, কিন্তু প্রাচীন কালে ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সকলের প্রবোধ জন্মে নাই। দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের মুখে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ"—এই কথা শুনিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন। অর্জ্জুন তখন দূরে সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। আচার্য্যদেবের এই নৃশংস বধের বৃত্তান্ত শুনিয়া বিলাপ করিতে করিতে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,

> চিরং স্থাস্যতি চাকীর্ত্তিস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
> রামে বালিবধাদ্‌যদ্বদেবং দ্রোণে নিপাতিতে॥
>
> দ্রোণপর্ব্ব। ১৯৫।৩৫॥

"বালী-বধে রামের যেরূপ অকীর্ত্তি হইয়াছিল, দ্রোণ-বিনাশের জন্য আপনারও সেইরূপ অকীর্ত্তি চিরকাল সচরাচর ত্রিভুবনে বিদ্যমান থাকিবে।"

দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্বানুবৃত্তি :—

জিতু, নীতু ও সীতার পিতা চা-বাগানে কাজ করিতেন ও স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া বিদেশেই থাকিতেন চিরকাল। তিনি নাস্তিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, ধর্ম্মকর্ম্ম মানিতেন না, পানদোষও ছিল। চা-বাগানে থাকিবার সময় মিশনরী মেমেরা বাসায় আসিয়া ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেলাই শিখাইত। মদ খাইয়া কাজে অবহেলা করার দরুণ হঠাৎ তার চাকরি যায়। এ অবস্থায় দাঁড়াইবার বা মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় তিনি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া গেলেন। অবশেষে নিরুপায় অবস্থায় দেশে ফিরিয়া জ্ঞাতি ভ্রাতার আশ্রয় লইতে বাধ্য হন।

২

বাবা কলকাতা থেকে দুপুরে বাড়ি ফিরলেন। কাপড় জামা এত ময়লা কখনও বাবার গায়ে দেখিনি। আমায় কাছে ডেকে বললেন,—শোন্ জিতু, এই পুঁটুলিটা তোর মাকে দিয়ে আয়, আমি একবার ও-পাড়া থেকে আসি। ভটচায্যিদের নসির কারখানায় একটা লোকের নামে চিঠি দিয়েচে—ওদের দিয়ে আসি।

আমি বললাম—এখন যেও না বাবা। চিঠি আমি দিয়ে আসবো'খন, তুমি এসে চা-টা খাও,—বাবা শুন্‌লেন না, চলে গেলেন। বাবার মুখ শুকনো, দেখে বুঝলাম যে-জন্যে গিয়েছিলেন তার কোনো জোগাড় হয়নি, অর্থাৎ চাকরি। চাকরি না হলেও আর এদিকে চলে না।

হাতের টাকা ক্রমশঃ ফুরিয়ে এসেচে। আমরা নীচের যে ঘরে থাকি, গরুবাছুরেরও সেখানে থাকতে কষ্ট হয়। আমরা এসেছি প্রায় মাস-চারেক হ'ল, এই চার মাসেই যা দেখেচি শুনেচি, তা বোধ করি সারা জীবনেও ভুলবো না। যাদের কাছে জ্যেঠিমা, কাকীমা দিদি ব'লে হাসিমুখে ছুটে যাই, তারা যে কেন আমাদের ওপর এমন বিরূপ, কেন তাঁদের ব্যবহার এত নিষ্ঠুর, ভেবেই পাই নে এর কোনো কারণ। আমরা তো আলাদা থাকি, আমাদের খরচে আমাদের রান্না হয়, ওঁদের তো কোনই অসুবিধের মধ্যে আমরা ফেলিনি, তবু কেন বাড়িসুদ্ধু লোকের আমাদের ওপর এত রাগ?

আমার বাবার আপন ভাই নেই, ওঁরা হ'লেন খুড়তুত-জ্যাঠতুত ভাই। জ্যাঠামশায়ের অবস্থা খুবই ভাল—পাটের বড় ব্যবসা আছে, দুই ছেলে গদিতে কাজ দেখে, ছোট একটি ছেলে এখানকার স্কুলে পড়ে, আর একটি মেয়ে ছিল, সে আমাদের আসবার আগে বসন্ত হয়ে মারা গিয়েচে। মেজকাকার তিন মেয়ে—ছেলে হয়নি, বড় মেয়ের বিয়ে হয়েচে—আর দুই মেয়ে ছোট। ছোটকাকার বিয়ে হয়েছে বেশী দিন নয়—বৌও এখানে নেই। ছোটকাকা অত্যন্ত রাগী লোক, বাড়িতে সর্ব্বদা ঝগড়াঝাঁটি করেন, গানবাজনার ভক্ত, ওপরের ঘরে সকাল নেই সন্ধ্যে নেই হারমোনিয়ম বাজাচ্ছেন।

জ্যাঠাইমার বয়স মায়ের চেয়ে বেশী, কিন্তু বেশ সুন্দরী—একটু বেশী মোটাসোটা। গায়ে ভারী ভারী সোনার গহনা। এঁর বিয়ের আগে নাকি জ্যাঠামশায়ের অবস্থা ছিল খারাপ—তারপর জ্যাঠাইমা এ বাড়িতে বধূরূপে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারে উন্নতিরও সূত্রপাত। প্রতিবেশীরা খোসামোদ ক'রে বলে—আমার সাম্‌নেই আমি কত বার শুনেচি—তোমার মত ভাগ্যিমানি ক'জন আছে বড়-বৌ? এদের কি-ই বা ছিল, তুমি এলে আর সংসার সব দিক থেকে উথ্‌লে উঠলো, কপাল বলে একেই বটে!...সাম্‌নে বলা নয়—এমন মন আজকাল ক'জনের বা আছে? দেওয়ায়-থোওয়ায়, খাওয়ানোয়-মাখানোয়—আমার কাছে বাপু হক্ কথা।...মেজখুড়ীমা ওর মধ্যে ভাল লোক। কিন্তু তিনি কারুর সপক্ষে কথা বলতে সাহস করেন না, তাঁর ভাল করবার ক্ষমতা নেই, মন্দ করবারও না। মেজকাকা তেমন কিছু রোজগার করেন না, কাজেই মেজখুড়ীমার কোনো কথা এ বাড়িতে খাটে না।

বছরখানেক কেটে গেল। বাবা কোথাও চাকরি পেলেন না। কত জায়গায় হাঁটাহাঁটি করলেন, শুক্‌নো মুখে কত বার বাড়ি ফিরলেন। হাতে যা পয়সা ছিল ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে এল।

সকালে আমরা বাড়ির সামনে বেলতলায় খেল্‌ছিলাম। সীতা বাড়ির ভেতর থেকে বার হয়ে এল, আমি বললুম—চা হয়েচে সীতা?

সীতা মুখ গম্ভীর ক'রে বললে—চা আর হবে না। মা বলেচে চা চিনির পয়সা কোথায় যে চা হবে? কথাটা আমার বিশ্বাস হ'ল না. সীতার চালাকি আমি যেন ধরে ফেলেচি, এই রকম সুরে তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললুম,—যাঃ, তুই বুঝি খেয়ে এলি? চা-বাগানে আমাদের জন্ম, সকালে উঠে চা খাওয়ার অভ্যাস আমাদের জন্মগত, চা না খেতে পাওয়ার অবস্থা আমরা কল্পনাই করতে পারিনে। সীতা বললে—না দাদা, সত্যি, তুমি দেখে এসো চা হচ্চে না। তারপরে বিজ্ঞের সুরে বললে বাবার যে চাকরি হচ্চে না, মা বল্‌ছিল দু-দিন পরে আমাদের ভাতই জুটবে না তো চা!...আমরা এখন গরিব হয়ে গিয়েচি যে।

সীতার কথায় আমাদের দারিদ্র্যের রূপটি নূতনতর মূর্ত্তিতে আমার চোখের সাম্‌নে ফুটল। জানতুম যে আমরা গরিব হয়ে গিয়েচি, পরের বাড়িতে পরের মুখ চেয়ে থাকি, ময়লা বিছানায় শুই, জলখাবার খেতে পাইনে, আমাদের কারুর কাছে মান নেই. সবই জানি। কিন্তু এসবেও নিজেদের দারিদ্র্যের স্বরূপটি তেমন ক'রে বুঝিনি, আজ সকালে চা না খেতে পেয়ে সেটা যেমন ক'রে বুঝলুম।

বিকেলের দিকে বাবা দেশি পথ বেয়ে কোথা থেকে বাড়িতে আসচেন। আমায় দেখে বললেন—শোন্ জিতু, চল্ শিমুলের তুলো কুড়িয়ে আনি গে—

আমি শিমুল তুলোর গাছ এই দেশে এসে প্রথম দেখেচি—গাছে তুলো হয় বইয়ে পড়লেও চোখে দেখেচি এখানে এসে এই বৈশাখ মাসে। আমার ভারি মজা লাগল—উৎসাহ ও খুশীর সুরে বললুম—শিমুল তুলো? কোথায় বাবা?...চল যাই—সীতাকে ডাক্‌বো?...

বাবা বললেন—ডাক্, ডাক্. সবাইকে ডাক্—চল্ আমরা যাই—

বাবাও আমার পেছনে পেছনে বাড়ি ঢুকলেন। পরের দিন ষষ্ঠী ও দাদার জন্ম-বার। মা কোথা থেকে খানিকটা দুধ জোগাড় ক'রে রান্নাঘরের দাওয়ার উনুনে বসে বসে ক্ষীরের পুতুল গড়ছিলেন—বাবার স্বর শুনেই মুখ তুলে চেয়ে এক চমক বাবার দিকে দেখেই একবার চকিত দৃষ্টিতে ওপরে জ্যাঠাইমাদের বারান্দার দিকে একবার কি জন্যে চাইলেন—তারপর পুতুল-গড়া ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে এসে বাবার হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। আমার দিকে ফিরে বললেন—যা জিতু, বাইরে খেলা কর গে যা—

আমি অবাক হয়ে গেলুম। বল্‌তে যাচ্ছিলাম—মা, বাবা যে শিমুল তুলো কুড়োবার- কিন্তু মার মুখের দিকে চেয়ে আমার মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। একটা কিছু হয়েচে যেন—কিন্তু কি হয়েচে আমি বুঝলাম না। বাবা মদ খেয়ে আসেন নি নিশ্চয়—মদ খেলে আমরা বুঝতে পারি—খুব ছেলেবেলা থেকে দেখে আস্‌চি, দেখলেই বুঝি। তবে বাবার কি হ'ল?...

অবাক্ হয়ে বাইরে চলে এলুম।

৩

এখানকার স্কুলে আমি ভর্ত্তি হয়েচি. কিন্তু দাদা আর পড়তে চাইলে না ব'লে তাকে ভর্ত্তি করা হয়নি। প্রথম কয় মাস মাইনের জন্যে মাষ্টার-মশায়ের তাগাদার চোটে আমার চোখে জল আস্‌ত—সাড়ে ন' আনা পয়সা মাইনে—তাও বাড়িতে চাইলে কারুর কাছে পাইনে, বাবার মুখের দিকে চেয়ে বাবার কাছে তাগাদা করতে মন সরে না।

শনিবার, সকালে সকালে স্কুলের ছুটি হবে। স্কুলের কেরাণী রামবাবু একখানা খাতা নিয়ে আমাদের ক্লাসে ঢুকে মাইনের তাগাদা সুরু করলেন। আমার মাইনে বাকী দু-মাসের—আমায় ক্লাস থেকে উঠিয়ে দিয়ে বললেন—বাড়ি গিয়ে মাইনে নিয়ে এস খোকা. নইলে আর ক্লাসে বস্‌তে দেবো না কাল থেকে। আমার ভারি লজ্জা হ'ল—দুঃখ তো হ'লই। আড়ালে ডেকে বললেই তো পারতেন রামবাবু, ক্লাসে সকলের সাম্‌নে—ভারি—

দুপুরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করচে। স্কুলের বাইরে একটা নিমগাছ। ভারি সুন্দর নিমফুলের ঘন গন্ধটা। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম কি করা যায়। মাকে বল্‌ব বাড়ি গিয়ে? কিন্তু জানি মায়ের হাতে কিছু নেই, এখুনি পাড়ায় ধার করতে বেরুবে, পাবে কি না-পাবে, ছোট মুখ ক'রে বাড়ি ফিরবে—ওতে আমার মনে বড় লাগে।

হঠাৎ আমি অবাক্ হয়ে পথের ওপারে চেয়ে রইলুম—ওপারে সামু নাপিতের মুদীখানার দোকানটা আর নেই, পাশেই সে ফিতে ঘুন্সির দোকানটাও নেই—তার পাশের জামার দোকানটাও নেই—একটা খুব বড় মাঠ, মাঠের ধারে বড় বড় বাঁশগাছের মত কি গাছের সারি কিন্তু বাঁশগাছ নয়। দুপুরবেলা নয়, বোধ হয় যেন রাত্রি—জ্যোৎস্না রাত্রি—দূরে সাদা রঙের একটা অদ্ভুত গড়নের বাড়ি, মন্দিরও হ'তে পারে।

নিমগাছের গুঁড়িটাতে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে ভাল দেখতে পাওয়া গেল, তখনও তাই আছে জ্যোৎস্নাভরা একটা মাঠ, কি গাছের সারি—দূরের সাদা বাড়িটা। দু-মিনিট..পাচ মিনিট। তাড়াতাড়ি চোখ মুছলাম আবার চাইলুম—এখনও অবিকল তাই। একেবারে এত স্পষ্ট, গাছের পাতাগুলো যেন গুণ্‌তে পারি, পাখীদের ডানার সব রং বেশ ধরতে পারি।...

তার পরেই আবার কিছু নেই, খানিকক্ষণ সব শূন্য—তার পরেই সামু নাপিতের দোকান, পাশেই ফিতে ঘুন্সির দোকান।

বাড়ি চলে এলুম। যখনই আমি এই রকম দেখি, তখন আমার গা কেমন করে—হাতে পায়ে যেন জোর নেই, এমনি হয়। মাথা যেন হালকা মনে হয়। কেন এমন হয় আমার? কেন আমি এ-সব দেখি, কাউকে একথা বল্‌তে পারিনে, মা, বাবা, দাদা, সীতা, কাউকে নয়। আমার এমন কোনো বন্ধু বা সহপাঠী নেই, যাকে আমি বিশ্বাস ক'রে সব কথা খুলে বলি। আমার মনে যেন কে বলে—এরা এ-সব বুঝবে না। বন্ধুরা হয়ত হেসে উঠবে কি ওই নিয়ে ঠাট্টা করবে।

ওবেলা খেয়ে যাইনি। রান্নাঘরে ভাত খেতে গিয়ে দেখি শুধু সিমভাতে আর কুমড়োর ডাঁটা চচ্চড়ি। আমি ডাঁটা খাইনে—সিম যদি বা খাই সিমভাতে একেবারেই মুখে ভাল লাগে না। মাকে রাগ ক'রে বললুম—ও দিয়ে ভাত খাবো কি ক'রে? সিমভাতে দিলে কেন? সিমভাতে আমি খাই কখনও?

কিন্তু মাকে যখন আমি বক্‌ছিলুম আমার মনে তখন মায়ের ওপর রাগ ছিল না। আমি জানি আমাদের ভাল খাওয়াতে মায়ের যত্নের ত্রুটি কোনো দিন নেই, কিন্তু এখন মা অক্ষম, অসহায়—হাতে পয়সা নেই, ইচ্ছে থাক্‌লেও নিরুপায়। মায়ের এই বর্ত্তমান অক্ষমতার দরুণ মায়ের ওপর যে করুণা সেটাই দেখা দিল রাগে পরিবর্ত্তিত হয়ে। চেয়ে দেখি মায়ের চোখে জল। মনে হ'ল এ সেই মা—চা-বাগানে থাক্‌তে মিস নর্টনের কাছ থেকে আমাদের খাওয়ানোর জন্যে কেক্ তৈরী করবার নিয়ম শিখে বাজার থেকে ঘি-ময়দা কিচমিচ ডিম চিনি সব আনিয়ে সারা বিকেল ধরে পরিশ্রম ক'রে কতকগুলো স্বাদগন্ধহীন নিরেট ময়দার ঢিপি বানিয়ে বাবার কাছে ও পর দিন মিস্ নর্টনের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন। তারপর অবিশ্যি মিস্ নর্টন ভাল ক'রে হাতে ধরে শেখায় এবং মা ইদানীং খুব ভাল কেক্ই গড়তে পারতেন।

মা বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ের ধরণ-ধারণ, রান্না, আচার-ব্যবহার ভাল জান্‌তেন না। অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে চা-বাগানে চলে গিয়েছিলেন, সেখানে একা একা কাটিয়েছেন চিরকাল সমাজের বাইরে—পাড়াগাঁয়ের ব্রত নেম্ পুজো আচ্ছা আচার এ-সব তেমন জানা ছিল না। এঁদের এই ঘোর আচারী সংসারে এসে পড়ে আলাদা থাক্‌লেও মাকে কথা সহ্য করতে হয়েচে কম নয়। পয়সা থাক্‌লে যেটা হয়ে দাঁড়াত গুণ—হাত খালি থাকাতে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠাট্টা, বিদ্রূপ, শ্লেষের ব্যাপার—জংলীপনা খিরিষ্টানি বা বিবিয়ানা। মার সহ্যগুণ ছিল অসাধারণ, মুখ বুজে সব সহ্য করতেন, কোনদিন কথাটিও বলেন নি। ভয়ে ভয়ে ওঁদের চালচলন, আচার-ব্যবহার শিখবার চেষ্টা করতেন—নকল করতে যেতেন—তাতে ফল অনেক সময়ে হ'ত উল্টো।

আরও মাসকতক কেটে গেল। এই ক-মাসে আমাদের যা অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো, জীবনে ভাবিনিও কোনো দিন যে অত কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে। দু-বেলা ভাত খেতে আমরা ভুলে গেলাম। স্কুল থেকে এসে বেলা তিনটের সময় খেয়ে রাত্রে আর কিছু খাওয়ার ইচ্ছেও হ'ত না। ভাত খেয়ে স্কুলে যাওয়া ঘটত না প্রায়ই, অত সকালে মা চালের জোগাড় করতে পারতেন না, সেটা প্রায়ই ধার ক'রে নিয়ে আসতে হ'ত। সব সময় হাতে পয়সা থাকৃত না—এর মানে, আমাদের চা-বাগানের সৌখীন জিনিষপত্র, দেরাজ, বাক্স—

এই সব বেচে চল্‌ছিল—সব সময়ে তার খদ্দের জুটতো না। মা বৌমানুষ, বিশেষতঃ এটা অপরিচিত স্থান, নিজের শ্বশুর-বাড়ি হলেও এর সঙ্গে এত কাল কোনো সম্পর্কই ছিল না—কিন্তু মা ওসব মান্‌তেন না, লজ্জা ক'রে বাড়ি বসে থাকলে তাঁর চলত না, যে-দিন ঘরে কিছু নেই, পাড়ায় বেরিয়ে যেতেন, দু-একটা জিনিষ বেচবার কি বন্ধক দেবার চেষ্টা করতেন পাড়ায় মেয়েদের কাছে—প্রায়ই সৌখীন জিনিষ, হয়ত একটা ভাল কাচের পুতুল, কি গালার খেল্‌না, চন্দনকাঠের হাতপাখা—এই সব। সেলাইয়ের কলটা ছোটকাকীমা সিকি দামে কিনেছিলেন। বাবার গায়ের ভারি পুরু পশমী ওভারকোটটা সরকাররা কিনে নিয়েছিল আট টাকায় মোটে এক বছর আগে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বাবা তৈরি করেছিলেন।

চাল না-হয় একরকম ক'রে জুটলো, কিন্তু আমাদের পরণের কাপড়ের দুর্দ্দশা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। আমাদের সবারই একখানা ক'রে কাপড়ে এসে ঠেকেচে—তাও ছেঁড়া, আমার কাপড়খানা তো তিন জায়গায় সেলাই। সীতা বল্‌ত তুই বড় কাপড় ছিঁড়িস্ দাদা। কিন্তু আমার দোষ কি? পুরোনো কাপড়, একটু জোরে লাফালাফি করাতেই ছিঁড়ে যেত, মা অম্‌নি সেলাই করতে বসে যেতেন।

বাবা আজকাল কেমন হয়ে গেচেন, তেমন কথাবার্ত্তা বলেন না—বাড়িতেও থাকেন না প্রায়ই। তাঁকে পাওয়াই যায় না যে কাপড়ের কথা বলি। তা ছাড়া বাবার মুখের দিকে চেয়ে কোনো কথা বলতেও ইচ্ছে যায় না। তিনি সব সময়ই চাকুরির চেষ্টায় এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু কোথাও এপর্য্যন্ত কিছু জোটেনি। মাস দুই একটা গোলদারী দোকানে খাতাপত্র লেখ্‌বার চাকুরি পেয়েছিলেন, কিন্তু এখন আর সে চাকুরি নেই—সেজজ্যাঠামশায়ের ছেলে নবীন বল্‌ছিল নাকি মদ খেয়ে গেছে। কিন্তু এখানে এসে বাবা এক দিনও মদ খেয়েছেন ব'লে আমার মনে হয় না, বাবা মদ খেলেই উৎপাত করেন আমরা ভাল করেই জানি, কিন্তু এখানে এসে পর্য্যন্ত দেখ্‌চি বাবার মত শান্ত মানুষটি আর পৃথিবীতে বুঝি নেই। এত শান্ত, এত ভালমানুষ স্নেহময় লোকটি মদ খেলে কি হয়েই যেতেন! চা-বাগানের সে-সব রাতের কীর্ত্তি মনে হলেও ভয় করে।

রবিবার। আমার স্কুল নেই, আমি সারাদিন বসে বসে ম্যাজেন্টা গুলে রং তৈরি করেছি, দু-তিনটে শিশিতে ভর্ত্তি করে রেখেছি, সীতার পাঁচ-ছখানা পুতুলের কাপড় রঙে ছুপিয়ে দিয়েছি—ক্লাসের একটা ছেলের কাছ থেকে অনেকখানি ম্যাজেন্টার গুঁড়ো চেয়ে নিয়েছিলুম।

সন্ধ্যার একটু পরেই খেয়ে শুয়েচি। কত রাত্রে যেন ঘুম ভেঙে গেল - একটু অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখি আমাদের ঘরের দোরে জ্যোঠাইমা, আমার খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোনের দল, ছোটকাকা—সবাই দাঁড়িয়ে। মা কাঁদচে—সীতা বিছানায় সবে ঘুম ভেঙে উঠে বসে চোখ মুছচে। আমার জ্যাঠতুত ভাই হেসে বললে - ঐ দ্যাখ্ তোর বাবা কি করছে! চেয়ে দেখি ঘরের কোণে খাটে বাবা তিনটে বালিসের তুলো ছিঁড়ে পুঁটুলি বাঁধচেন। তুলোতে বাবার চোখমুখ, মাথার চুল, সারা গা এক অদ্ভুত রকম হয়েচে দেখতে। আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলুম - কি হয়েচে বাবা?

বাবা বললেন—চা-বাগানে আবার চাকরি পেয়েচি—ছোট সাহেব তার করেচে; সকালের গাড়ীতে যাব কি-না তাই পুঁটুলিগুলো বেঁধেছেঁদে এখন না রাখলে—ক'টা বাজল রে খোকা?

আমার বয়েস কম হলেও আমার বুঝতে দেরি হ'ল না যে এবার বাবা মাতাল হন্ নি। এ অন্য জিনিষ। তার চেয়েও গুরুতর কিছু। ঘরের দৃশ্যটা আমার মনে চিরকালের একটা ছাপ করে দিয়েছিল—জীবনে কখনও ভুলিনি—চোখ বুজলেই উত্তরজীবনে আবার সে রাত্রির দৃশ্যটা মনে এসেচে। একটা মাত্র কেরোসিনের টেমি জলচে ঘরে—তারই রাঙা ক্ষীণ আলোয় ঘরের কোণে বাবার তুলো-মাখা চেহারা—মাথায় মুখে, কানে পিঠে সর্ব্বাঙ্গে ছেঁড়া বালিসের লাল্‌চে পুরানো বিচি-ওয়ালা তুলো মেজেতে বসে মা কাঁদচেন—দরজার কাছে কৌতুক দেখতে খুড়ীমা জ্যোঠাইমারা জড় হয়েচেন—খুড়তুতো ভাই বোনেরা হাস্‌চে।...দাদাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেলাম না, বোধ হয় বাইরে কোথাও গিয়ে থাকবে।

পর দিন সকালে আমাদের ঘরের সাম্‌নে উঠানে দলে দলে লোক জড় হ'তে লাগল। এদের মুখে শুনে প্রথম বুঝলাম বাবা পাগল হয়ে গিয়েচেন। সংসারের কষ্ট, মেয়ের বিয়ের ভাবনা, পরের বাড়ির এই যন্ত্রণা—এই সব দিনরাত ভেবে ভেবে

বাবার মাথা গিয়েচে বিগড়ে। অবিশ্যি এ-সব কারণ অনুমান করেছিলুম বড় হ'লে অনেক পরে।

বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়তে লাগল, যারা কোনো দিন এর আগে বাবার সঙ্গে মৌখিক ভদ্র আলাপটা করতেও আসেনি তারা মজা দেখতে আসতে লাগল দলে দলে।

বাবার মূর্ত্তি হয়েচে দেখতে অদ্ভুত। রাত্রে না ঘুমিয়ে চোখ বসে গিয়েচে—চোখের কোনে কালি মেড়ে দিয়েচে যেন। সর্ব্বাঙ্গে তুলো মেখে বাবা সেই রাতের বিছানার ওপরই বসে আপন মনে কত কি বক্‌চেন। ছেলেপিলের দল এপাড়া-ওপাড়া থেকে এসেছে। তারা ঘরের দোরে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে। কেউ বা উঁকি মেরে দেখচে—হাসাহাসি করচে। আমাদের সঙ্গে পড়ে এই পাড়ার নবীন বাঁড়ুয্যের ছেলে শান্টু—সে একবার উঁকি মেরে দেখতেই বাবা তাকে কি একটা ধমক দিয়ে উঠলেন। সে ভাণ করা ভয়ের সুরে ব'লে উঠল—ও বাবা! মারবে না কি?—বলেই পিছিয়ে এল। ছেলের দলের মধ্যে একটা হাসির ঢেউ পড়ে গেল।

এক জন বললে—আবার কি রকম ইংরিজি বল্‌চে দ্যাখ—

আমি ও সীতা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি। আমরা কেউ কোনো কথা বল্‌চি নে।

আর একটু বেলা হ'লে জ্যাঠামশায় কি পরামর্শ করলেন সব লোকজনের সঙ্গে—আমার মাকে উদ্দেশ ক'রে বললেন—বৌমা সবই তো দেখতে পাচ্চ—তোমাদের কপাল ছাড়া আর কি বলব। ভূষণকে এখন বেঁধে রাখতে হবে—সেই মতই সবাই করেচেন। ছেলেপিলের বাড়ি—পাড়ার ভেতরকার কাণ্ড—ওরকম অবস্থায় কখন কি ক'রে বসে, তা বলা যায় না...তা তোমায় একবার বলাটা দরকার তাই—

আমার মনে বড় কষ্ট হ'ল—বাবাকে বাঁধবে কেন? বাবা তো এক বকুনি ছাড়া আর কারুর কিছু অনিষ্ট করতে যাচ্ছেন না? কেন তবে—

আমার মনের ভাষা বাক্য খুঁজে পেলে না প্রকাশের—মনেই রয়ে গেল। বাবাকে সবাই মিলে বাঁধলে। আহা, কি কসে কসেই বাঁধলে! অন্য দড়ি কোথাও পাওয়া গেল না বা ছিল না—জ্যাঠামশায়দের খিড়কী পুকুর ধারের গোয়াল বাড়ি থেকে গরু বাঁধবার দড়া নিয়ে এল—তাই দিয়ে বাঁধা হ'ল।

আমার মনে হ'ল অতটা জোর ক'রে বাবাকে বাঁধবার দরকার কি! বাবার হাতের শির দড়ির মত ফুলে উঠেচে যে। সেজকাকাকে চুপিচুপি বললুম—কাকাবাবু, বাবার হাতে লাগচে, অত কসে বেঁধেচে কেন? বলুন না ওদের?

কাকা সে-কথা জ্যাঠামশায়কে ও নিতাইয়ের বাবাকে বললেন—তুমিও কি খেপলে নাকি রমেশ? হাত আল্‌গা থাকবে পাগলের?...তা হলে পা খুলতে কতক্ষণ—তারপরে আমার দিকে চেয়ে জ্যাঠামশায় বললেন—যাও জিতু বাবা—তুমি বাড়ির ভেতর যাও—নয় তো এখন বাইরে গিয়ে বসো।

আবার বাবার হাতের দিকে চেয়ে দেখলুম—দড়ির দাগ কেটে বসে গিয়েচে বাবার হাতে। সেই রকম তুলো-মাখা অদ্ভুত মূর্ত্তি!...

বাইরে গিয়ে আমি একা গাঁয়ের পেছনের মাঠের দিকে চলে গেলুম—একটা বড় তেঁতুলগাছের তলায় সারা দুপুর ও বিকেল চুপ ক'রে বসে রইলুম।

৪

দিনকতক এই ভাবে কাট্‌ল। তার পর পাড়ার দু-পাঁচ জন লোকে এসে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কি পরামর্শ করলে। বাবাকে কোথায় তারা নিয়ে গেল সবাই বললে কলকাতায় হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তারা ফিরেও এল, শুনলুম বাবাকে নাকি হাসপাতালে ভর্ত্তি ক'রে নিয়েচে। শীগ্‌গিরই সেরে বাড়ি ফিরবেন। আমরা আশ্বস্ত হলুম।

দশ-বার দিন পরে একদিন বিকেলের দিকে আমি ও সীতা পথে খেলা করচি, এমন সময়ে সীতা বললে—ঐ যে বাবা!... দূরে পথের দিকে চেয়ে দেখি বাবাই বটে। ছুটে আমরা বাড়িতে মাকে খবর দিতে গেলুম। একটু পরে বাবা বাড়ি ঢুকলেন—এক হাঁটু ধুলো, রুক্ষ চুল। ওপর থেকে জ্যাঠাইমা নেমে এলেন, কাকারা এলেন। বাবাকে দেখে সবাই চটে গেলেন। সবাই বুঝ্‌তে পারলে বাবা এখনও সারেন নি, তবে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসার কি দরকার?

বাবা একটু বসে থেকে বললেন ভাত আছে? কাল ওই দিকের একটা গাঁয়ে দুপুরে দুটো খেতে দিয়েছিল, আর কিছু খাইনি সারাদিন, খিদে পেয়েচে। কলকাতা থেকে পায়ে

হেঁটে আসচি—ছেলেপিলে ছেড়ে থাক্‌তে পারলাম না—চলে এলাম।

একটু পরেই বোঝা গেল বাবা হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছেন এবং যেমন পাগল তেমনি আছেন। এবার আমাদেরও রাগ হ'ল—মায়ের কথা বলতে পারিনে, কারণ তাঁকে রাগ প্রকাশ করতে কখনও দেখিনি—কিন্তু আমি সীতা দাদা তিন ভাই বোনে খুবই চটলাম।

আমাদের চটবার কারণও আছে—খুব সঙ্গত কারণই আছে। আমাদের প্রাণ এখানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেচে। বাবা আবার পুরোমাত্রায় পাগল হয়ে উঠলেন—তিনি দিন রাত বসে বসে বকেন আর কেবল খেতে চান। মা দুটি বাসি মুড়ি, কোনো দিন বা ভিজে চাল, কোনো দিন শুধু একটু গুড়—এই খেতে দেন। তাও সব দিন বা সব সময় জোটানো কষ্টকর। আমরা দুপুরে খাই তো রাতে আর কিছু খেতে পাইনে—নয়ত সারাদিন পরে হয়ত সন্ধ্যার সময় খাই। মা কোথা থেকে চাল জোগাড় করে আনেন আমরা জানিনে- কখনও জিগ্যেস্‌ও করিনি। কিন্তু বাড়িতে আর আমাদের তিষ্ঠবার যো নেই। বাড়িসুদ্ধ লোক আমাদের ওপর বিরূপ—দু-বেলা তাদের অনাদর আর মুখনাড়া সহ্য করা আমাদের অসহ্য হয়ে উঠেছে। চা-বাগানের দিনগুলোর কথা মনে হয়, সেখানে আমাদের কোনো কষ্ট ছিল না—অবস্থা ছিল অত্যন্ত সচ্ছল—ছেলেবেলায় সীতাকে ভুটিয়া চাকরে নিয়ে বেড়াত আর থাপা মানুষ করেছিল আমাকে। ছ-বছর বয়েস পর্য্যন্ত আমি থাপার কাঁধে উঠে বেড়াতাম মনে আছে। আমাদের এই বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য বাবাকে আমরা মনে মনে দায়ী করেছি। বাবা কেন আবার ভাল হয়ে সেরে উঠুন না? তা হ'লে আর আমাদের কোনো দুঃখই থাকে না। কেন বাবা ওরকম পাগ্‌লামি করেন? ওতে লজ্জায় যে ঘরে-বাইরে আমাদের মুখ দেখাবার যো নেই।

সে-দিন সকালে সেজখুড়ীমা এসে আমাদের সঙ্গে খুব ঝগড়া বাধালেন। মেজখুড়ীমাও এসে যোগ দিলেন। তাঁদের বাগানে বাতাবী নেবুগাছ থেকে চার-পাঁচটা পাকা নেবু চুরি গিয়েচে। খুড়ীমা এসে মাকে বললেন--এ আমাদেরই কাজ—আমরা খেতে পাইনে, আমরাই লেবু চুরি ক'রে ঘরে রেখেচি। তাঁরা সবাই মিলে আমাদের ঘর খানাতল্লাসী করতে চাইলেন।

মা বললেন—এসে দেখে যান মেজদি, আমার ঘরে তো লোহার সিন্দুক নেই যেখানে আমার ছেলেমেয়েরা নেবু লুকিয়ে রেখেচে—এসে দেখুন—

শেষ পর্য্যন্ত বাবা ঘরে আছেন ব'লে তাঁরা ঘরে ঢুক্‌তে পারলেন না, কিন্তু সবাই ধরেই নিলেন যে, নেবু আমাদের ঘরেই আছে, খানাতল্লাসী করলেই বেরিয়ে পড়ত। খুব ঝগড়া-ঝাঁটি হ'ল—তবে সেটা হ'ল একতরফা, কারণ এ-পক্ষ থেকে তার জবাব কেউ দিলে না।

জ্যাঠাইমা এ-বাড়ির কর্ত্রী, তাঁকে সবাই মেনে চলে, ভয়ও করে। তিনি এসে বললেন—হয় তোমরা বাড়ি থেকে চলে যাও নয়ত ঘরের ভাড়া দাও।

সীতা এসে আমাকে বললে—জ্যাঠাইমা এবার বাড়িতে আর থাকতে দেবে না, না দেবে না দেবে, আমরা কোথাও চলে যাই চল দাদা।

দিন দুই পরে জ্যাঠামশাইদের সঙ্গে কি একটা মিটমাট হ'ল। ঠিক হ'ল যে দাদা চাকরির জোগাড় করতে কল্‌কাতায় যাবে, ঘরে আমরা আপাততঃ কিছুকাল থাকতে পাব। কিন্তু বাড়ির ওপাড়ার সবাই বললে—পাগলটাকে আর বাড়ি রেখে দরকার নেই, ওকে জলেজঙ্গলে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আয়।

সত্যি কথা বলতে গেলে বাবার ওপর আমাদের কারুর আর মমতা ছিল না। বাবার চেহারাও হয়ে উঠেচে অদ্ভুত। একমাথা লম্বা চুল জট পাকিয়ে গিয়েচে—আগে আগে মা নাইয়ে দিতেন, আজকাল বাবা কিছুতেই নাইতে চান না, কাছে যেতে দেন না, কাপড় ছাড়েন না—গায়ের গন্ধে ঘরে থাকা অসম্ভব। মা এক দিনও রাত্রে ঘুমুতে পারেন না—বাবা কেবলই ফাইফরমাজ করেন—জল দাও, পান দাও—আর কেবলই বলেন খিদে পেয়েচে। কখনও বলেন চা ক'রে দাও। না পেলেই তিনি আরও খেপে ওঠেন—এক মা ছাড়া তখন আর কেউ সামলে রাখতে পারে না—আমরা তখন ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাই, মা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করে চুপ করিয়ে রাখেন, নয়ত জোর ক'রে বালিশে শুইয়ে দিয়ে বাতাস করেন, পা টিপে দেন—কিন্তু তাতে বাবা সাময়িক চুপ ক'রে থাকেন বটে, ঘুমোন না। পাগল হয়ে পর্য্যন্ত বোধ হয় একদিনও বাবার ঘুম হয়নি। নিজেও

ঘুমুবেন না, কাউকে ঘুমুতে দেবেনও না—সারারাত চীৎকার, বকুনি, ইংরিজি বক্তৃতা, গান—এই সব করবেন। সবাই বলে ঘুমুলে না-কি বাবার রোগ সেরে যেত।

শেষ পর্য্যন্ত হয়ত মা মত দিয়েছিলেন, হয়ত বলেছিলেন—তোমরা যা ভাল বোঝ করো বাপু। মোটের ওপর এক দিন স্কুলে দাদা এসে বললে—সকাল সকাল বাড়ি চল আজ জিতু—আজ বাবাকে আড়াগাঁয়ের জলার ধারে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে—তুই আমি নিতাই সিধু আর মেজকাকা যাব।

একটু পরে আমি ছুটি নিয়ে বেরুলাম। গিয়ে দেখি মা দালানে বসে কাঁদচেন, আমরা যাবার আগেই নিতাই এসে বাবাকে নিয়ে গিয়েচে। আমরা খানিক দূরে গিয়ে ওদের নাগাল পেলাম—পাড়ার চার-পাঁচ জন ছেলে সঙ্গে আছে, মধ্যিখানে বাবা। ওরা বাবার সঙ্গে বাজে বকচে—শিকারের গল্প করচে, বাবাও খুব বকচেন। নিতাই আমাকে বাবার সামনে যেতে বারণ করাতে আমি আর দাদা পেছনেই রইলাম। ওরা মাঠের রাস্তা ধরে অনেক দূর গেল, একটা বড় বাগান পার হ'ল, বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঘেমে আমরা সবাই নেয়ে উঠলাম। রোদ যখন পড়ে গিয়েচে তখন একটা বড় বিলের ধারে সবাই এসে পৌছলাম। নিতাই বললে—এই তো আড়াগাঁয়ের জলা—চল্, বিলের ওপারে নিয়ে যাই—ওই হোগলা বনের মধ্যে ছেড়ে দিলে আর পথ খুঁজে পাবে না রাত্তিরে। আমরা কেউ ওপারে গেলুম না—গেল স্রধু সিধু আর নিতাই। খানিকটা পরে ওরা ফিরে এসে বললে চল্ পালাই—তোর বাবাকে একটা সিগারেট খেতে দিয়ে এসেচি—বসে বসে টানচে। চল্ ছুটে পালাই—

সবাই মিলে দৌড় দিলাম। দাদা তেমন ছুটতে পারে না, কেবলই পেছনে পড়তে লাগল। সন্ধ্যার ঘোরে জলা আর জঙ্গলের মধ্যে পথ খুঁজে পাওয়া যায় না—এক প্রহর রাত হয়ে গেল বাড়ি পৌঁছুতে। কিন্তু তিন দিনের দিন বাবা আবার বাড়ি এসে হাজির। চেহারার দিকে আর তাকানো যায় না—কাদা-মাখা ধুলো-মাখা অতি বিকট চেহারা। বেল না কি ভেঙে খেয়েচেন—সারা মুখে, গালে বেলের আটা ও শাস মাখানো। মা নাইয়ে-ধুইয়ে ভাত খেতে দিলেন, বাবা খাওয়া-দাওয়ার পর সেই যে বিছানা নিলেন, দু-দিন চার দিন ক'রে ক্রমে পনের দিন কেটে গেল, বাবা আর বিছানা থেকে উঠলেন না। লোকটা যে কেন বিছানা ছেড়ে ওঠে না—তার কি হয়েচে—এ-কথা কেউ কোনো দিন জিগ্যেস্ও করলে না। মা যে-দিন যা জোটে খেতে দেন, মাঝে মাঝে নাইয়ে দেন—পাড়ার কোনো লোকে উঁকি মেরেও দেখে গেল না।

জ্যাঠামশাইরা হতাশ হয়ে গিয়েচেন। তাঁরা আর আমাদের সঙ্গে কথা কন না, তাঁদের ঘরে-দোরে ওঠা আমাদের বন্ধ। আমরা কথা বলি চুপি চুপি, চলি পা টিপে টিপে চোরের মত, বেড়াই মহা অপরাধীর মত—পাছে ওঁরা রাগ করেন, বিরক্ত হন, আবার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে আসেন।

এক দিন না খেয়ে স্কুলে পড়তে গিয়েচি—অন্য দিনের মত টিফিনের সময় সীতা খাবার জন্যে ডাকতে এল না। প্রায়ই আমি না খেয়ে স্কুলে আসতাম, কারণ অত সকালে মা রান্না করতে পারতেন না—রান্না শুধু করলেই হ'ল না, তার জোগাড় করাও তো চাই। মা কোথা থেকে কি জোগাড় করতেন, কি ক'রে সংসার চালাতেন, তিনিই জানেন। আমি কখনও তা নিয়ে ভাবিনি। আমি ক্ষুধাতুর অবস্থায় বেলা একটা পর্য্যন্ত ক্লাসের কাজ ক'রে যেতাম আর ঘন ঘন পথের দিকে চাইতাম এবং রোজই একটার টিফিনের সময় সীতা এসে ডাক দিত—দাদা ভাত হয়েচে, খাবে এস।

এ-দিন কিন্তু একটা বেজে গেল, দুটো বেজে গেল, সীতা এল না। ক্লাসের কাজে আমার আর মন নেই—আমি জানালা দিয়ে ঘন ঘন বাইরে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচি। আরও আধ ঘণ্টা কেটে গেল, বেলা আড়াইটা। এমন সময় কলুদের দোকানঘরের কাছে সীতাকে আসতে দেখতে পেলাম। আমার ভারি রাগ হ'ল, অভিমানও হ'ল। নিজেরা সব খেয়েদেয়ে পেট ঠাণ্ডা ক'রে এখন আসচেন!

মাষ্টারের কাছে ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম। সীতার দিকে চেয়ে দূর থেকে বললাম—বেশ দেখচি—আমার বুঝি আর খিদে-তেষ্টা পায় না? কটা বেজেচে জানিস?

সীতা বললে—বাড়ি এস ছোড়দা, তোমার বই দপ্তর নিয়ে ছুটি ক'রে এস গে—

আমি বললাম—কেন রে?

সীতা বললে—এস না, ছুটির আর দেরি বা কত? তিনটে বেজেচে।

আমার মনে হ'ল একটা কি যেন হয়েচে। স্কুল থেকে বেরিয়ে একটু দূর এসেই সীতা বললে—বাবা মারা গিয়েচে ছোড়দা।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম—সীতার মুখের দিকে চেয়ে সে যে মিথ্যে কথা বলচে এমন মনে হ'ল না। বললাম—কখন?

সীতা বললে বেলা একটার সময়—

নিজের অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—নিয়ে গিয়েচে তো?

অর্থাৎ গিয়ে মৃতদেহ দেখতে না হয়। কিন্তু সীতা বললে—না, নিয়ে এখনও কেউ যাইনি। মা একা কি করবে?... জ্যাঠামশাই বাড়ি নেই—ছোটকাকা একবার এসে দেখে চলে গেলেন—আর আসেন নি। মেজকাকা পাড়ায় লোক ডাকতে গেছেন।

বাড়িতে ঢুকতেই মা বললেন—ঘরের মধ্যে আয়—মড়া ছুঁয়ে বসে থাকতে হবে, বোস্ এখানে। কেউই কাঁদচে না। আমারও কান্না পেল না—বরং একটা ভয় এল—একা মড়ার কাছে কেমন ক'রে কতক্ষণ বসে থাকব না জানি!

অনেকক্ষণ পরে শুনতে পেলুম আমাদের পাড়ার কেউ মৃতদেহ নিয়ে যেতে রাজী নয়, বাবা কি রোগে মারা গেচেন কেউ জানে না, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করানো হয়নি মৃত্যুর পূর্ব্বে—এ অবস্থায় কেউ সৎকার করতে রাজী নয়। প্রায়শ্চিত্ত এখন না করালে কেউ ও-মড়া ছোঁবে না।

প্রায়শ্চিত্ত করাতে পাঁচ-ছ টাকা না-কি খরচ। আমাদের হাতে অত তো নেই? মা বললেন। কে যেন বললে—তা এ অবস্থায় হাতে না থাকলে লোকের কাছে চেয়ে-চিন্তে আনতে হয়, কি আর করা?

দাদাকে মা ও-পাড়ায় কার কাছে যেন পাঠালেন টাকার জন্যে। খানিকটা পরে ও-পাড়া থেকে জনকতক যণ্ডামত লোক এল—শুনলাম তারা গালাগালি দিতে দিতে বাড়িতে ঢুকচে—এমন ছোটলোকের পাড়াও তো কখনও দেখিনি? কোথায় পাবে এরা যে প্রাচিত্তির করাবে? প্রাচিত্তির না হ'লে মড়া কি সারা দিন রাত ঘরেই পড়ে থাকবে? যত ছোট লোক সব—কোনো ভয় নেই, দেখি মড়া বার হয় কি-না।

আমি উত্তেজনার মাথায় মড়া ছুঁয়ে বসে থাকার কথা ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি দোরের কাছে এসে দাঁড়ালাম। এদের মধ্যে আমি এক জনকে কেবল চিনি—মাঠবাড়ির ফুটবল খেলার ময়দানে দেখেছিলাম।

ওরা নিজেরাই কোথা থেকে বাঁশ কেটে নিয়ে এল—পাট নিয়ে এসে দড়ি পাকালে, তারপর বাবাকে বার ক'রে নিয়ে গেল দাদা গেল সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে। একটু পরে সন্ধ্যা হ'ল। সেজখুড়ীমা এসে বললেন—মুড়ি খাবি জিতু? আমি ও সীতা মুড়ি খেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

* * *

তিন বছর আগেকার কথা এ-সব। তারপর থেকে এই বাড়িতেই আছি। জ্যাঠামশাইরা প্রথমে রাজী হননি, দাদা ষষ্ঠীতলায় বটগাছের নীচে মুদীখানার দোকান করেছিল—সামান্য পুঁজি, আড়াই সের চিনি, পাঁচ সের ডাল, পাঁচ সের আটা, পাঁচ পোয়া ঝাল-মসলা—এই নিয়ে দোকান কতদিন চলে? দাদা ছেলেমানুষ, তা ছাড়া ঘোরপেচ কিছু বোঝে না, এক দিক থেকে সব ধারে বিক্রী করেচে, যে ধারে নিয়েচে সে আর ফিরে দোকানের পথ মাড়ায় নি। দোকান উঠে যাওয়ার পরে দাদা চাকরির চেষ্টায় বেরুলো সে তার ছোট মাথায় আমাদের সংসারের সমস্ত ভাবনা-ভার তুলে নিয়ে বাবার প্রতিনিধি রূপে আমাদের খাওয়া পরানোর দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুমুতো না, সারা দিন চাকরি খুঁজে বেড়াত। নস্যির কারখানায় একটা সাত টাকা মাইনের চাকরি পেলেও—কিন্তু বেশী দিন রইল না, মাস দুই পরে তারা বললে—ব্যবসার অবস্থা খারাপ, এখন লোকের দরকার নেই।

সুতরাং জ্যাঠামশায়দের সংসারে মাথা গুঁজে থাকা ছাড়া আমাদের উপায়ই বা কি? নিতান্ত লোকে কি বলবে এই ভেবে এঁরা রাজী হয়েছেন। কিন্তু এখানে আমাদের খাপ খায় না—এখানে মাত্র যে শুধু এ বাড়িতে তা নয়, এ দেশটার সঙ্গেই খাপ খায় না। বাংলা দেশ আমাদের কারও ভাল লাগে না—আমার না, দাদার না, সীতার না, মায়েরও না। না দেশটা দেখতে ভাল, না এখানকার লোকেরা ভাল। আমাদের চোখে এ দেশ বড় নীচু, আঁটাসাঁটা,

ছোট ব'লে মনে হয়— যে-দিকেই চাই চোখ বেধে যায়, হয় ঘরবাড়িতে, না-হয় বাঁশবনে আমবনে। কোথাও উঁচু-নীচু নেই— একঘেয়ে সমতলভূমি, গাছপালারও বৈচিত্র্য নেই। আমাদের এ গাঁয়েই যত গাছপালা আছে, তার বেশীর ভাগ এক ধরণের ছোট ছোট গাছ, এরা নাম বলে আশশেওড়া, তাদের পাতায় এত ধুলো যে সবুজ রং দিনরাত চাপা প'ড়ে থাকে। এখানে সব যেন দীনহীন, সব যেন ছোট মাপকাঠির মাপে গড়া।

আমাদের দিক থেকে তো গেল এই ব্যাপার। ওঁদের দিক থেকে ওঁরা আমাদের পর ক'রে রেখেছেন এই তিন-চার বছর ধরেই। ওঁদের আপনার দলের লোক ব'লে ওঁরা আমাদের ভাবেন না। আমরা খিরিষ্টান, আচার জানিনে, হিঁদুয়ানী জানিনে— জংলী জানোয়ার সামিল, গারো পাহাড়ী অসভ্য মানুষদের সামিল। পাহাড়ী জাতিদের সম্বন্ধে ওঁরা যে খুব বেশী জানেন, তা নয়— এবং জানেন না ব'লেই তাদের সম্বন্ধে ওঁদের ধারণা অদ্ভুত ও আজগবী ধরণের।

এদেশে শীতকাল নেই— মাস দুই তিন একটু ঠাণ্ডা পড়ে। তা ছাড়া সারা বছর ধরে গরম লেগেই আছে—আর সে কি সাংঘাতিক গরম। সে গরমের ধারণা ছিল না কোনো কালে আমাদের। রাতের পর রাত ঘুম হয় না, দিনমানেও ঘামে বিছানা ভিজে যায় ব'লে ঘুম হয় না। গা জ্বলে, মাথার মধ্যে কেমন করে, রাত্রে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে এক এক দিন। তার ওপরে মশা। কি সুখেই লোকে এ-সব দেশে বাস করে!

(ক্রমশঃ)

সিংহলের চিত্র

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার

দেবনামপিয় তিস্স ৩০৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে সিংহলের সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহার বন্ধু ভারত-সম্রাট অশোককে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন। সম্রাট অশোকও বহুমূল্য উপহার পাঠাইয়া তিস্সকে নিজের সৌহার্দ্দ্য জানান এবং সঙ্গে এই সংবাদও পাঠান "আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের আশ্রয় লইয়াছি, শাক্যবংশীয়দের ধর্ম্মে আমার আস্থা ও ভক্তি। হে নৃপতি, এই সত্য ধর্ম্মে আপনার বিশ্বাস হউক এবং মুক্তির জন্য আপনি ইহাতে আশ্রয় লউন।" এই বার্ত্তা লইয়া অশোকের পুত্র মহেন্দ্র সিংহলে গমন করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের লঙ্কাদ্বীপে আগমন

প্রাচীন ইতিহাস মহাবংশে উল্লেখ আছে, বুদ্ধ অনেক বার সিংহলে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার যদিও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, তবুও সিংহলের বৌদ্ধগণ এই আখ্যায়িকা বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

উল্লেখ আছে যে বুদ্ধ মহেন্দ্রের জন্য পূর্ব্ব হইতেই স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখেন, কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল, লঙ্কাদ্বীপে তাঁহার ধর্ম্ম গৌরবান্বিত হইবে। লঙ্কাদ্বীপে পূর্ব্বে ছিল যক্‌খদের (যক্ষ) বাস। বুদ্ধ তাঁহাদিগকে দ্বীপ হইতে বাহির করিয়া দেন। যক্‌খরা যেখানে সমবেত হইত বুদ্ধ সেখানে আকাশপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আকাশে ঝড় বিদ্যুৎ অন্ধকার আনিয়া যক্‌খদের মনে শঙ্কা জন্মাইলেন।* যক্‌খরা ভীত হইয়া কৃপা প্রার্থনা করিল, বুদ্ধ বলিলেন, "তোমাদের মুক্তি দিব, যেখানে আমি তোমাদের সকলের অনুমতি অনুসারে অবতরণ করিতে পারি এমন স্থান

* যবদ্বীপবাসীরা বিশ্বাস করে বুদ্ধ পদ্মপত্রে ভাসিয়া যবদ্বীপে আসিয়াছিলেন ধর্ম্ম প্রচার করিতে; বরভুধরে এরূপ মূর্ত্তি খোদিত আছে।

দাও।” যক্ষরা বলিল সমগ্র দ্বীপই তাহারা বুদ্ধের জন্য ছাড়িয়া দিতে পারে। বুদ্ধ তখন মাটিতে অবতরণ করিয়া আসনে বসিলেন, অমনি আসনের চারিধারে আগুন জলিয়া উঠিল এবং ক্রমশঃ দূরে দূরে ছড়াইতে লাগিল। তখন যক্ষরা ভীত হইয়া সমুদ্রতীরে দৌড়াইয়া গেল। বুদ্ধ তখনি সমুদ্রের সুন্দর 'গিরি' দ্বীপকে তীরের নিকট লইয়া আসিলেন; যক্ষরা সেই দ্বীপে গিয়া প্রাণরক্ষা করিল। 'গিরি' দ্বীপ তখন এই নূতন অধিবাসীদের লইয়া সমুদ্রের ভিতর পূর্ব্বস্থানে সরিয়া গেল, যক্ষরা তাড়িত হইলে বুদ্ধ নিজের আসন গুটাইয়া লইলেন। দেবতা-সকল তখন বুদ্ধের নিকটে সমবেত হইলেন। বুদ্ধ তাঁহাদিগকে নিজের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। বর্ত্তমানে যে শৈল এডাম্‌স্ পিক্ নামে অভিহিত তার অধিপতি ছিল দেবতা 'সুমন', বুদ্ধ তাঁহাকে নিজের কেশের এক গুচ্ছ দান করিলেন। সুমন সোনার কৌটায় কেশের গুচ্ছ রাখিয়া তাহার উপর মরকত মণির স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিল

আদিম অধিবাসীরা ছিল নাগপূজক। বুদ্ধ দ্বিতীয় বার

বোধিবৃক্ষ—অনুরাধাপুর

যখন আসেন তখন নাগরাজকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, বৎসর কয়েক পর বুদ্ধ লঙ্কাদ্বীপে আবার আসিলে নাগরাজ কেলানীতে (কলম্বো হইতে ৬ মাইল দূরে, এখানে একটি পুরাতন বিহার আছে) একটি ভোজ দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। এই আগমন চিরস্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য বুদ্ধ আকাশে উঠিলেন এবং সুমন পর্ব্বতের (এডাম্‌স্ পিক্) শিখরে পায়ের ছাপ
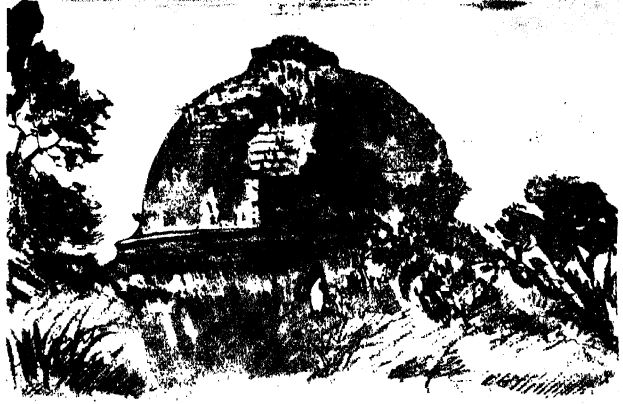
মহাসেয়া দাগোবা—মিহিনতাল

রাখিয়া গেলেন। আড়াই হাজার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, এখনও হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এই পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করে এবং বুদ্ধের পদচিহ্নকে পূজা করিয়া থাকে।

এডাম্‌স্ পিক

এডাম্‌স্ পিক্ সিংহলের মধ্যভাগে অবস্থিত, সাড়ে সাত হাজার ফুট উচ্চ হইবে। উপরিভাগ সমতল, কোণাকৃতি—কতকটা জাপানের ফুজিয়ামার মত দেখিতে। নরম মাটির উপরে যে রকম পাঁচ আঙুলের ছাপ পড়ে, সে রকম পাথরের উপরে পায়ের ছাপ—গোড়ালি হইতে আঙুলের ডগা পর্য্যন্ত চার-পাঁচ ফুট লম্বা হইবে। বৌদ্ধরা এই পায়ের ছাপকে বুদ্ধের বলিয়া উল্লেখ করে, হিন্দুরা বলে বিষ্ণুর, মুসলমান ও খৃষ্টানেরা বলিয়া থাকে আদমের। মানবের আদিপিতা আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া স্বর্গ হইতে দেবদূত কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া এই শৈলশিখরে পতিত হন, তাই আদমের পায়ের ছাপ। বছরের বিশেষ

সময়ে তীর্থযাত্রীরা বৌদ্ধ হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই এখানে দর্শন করিতে আসে। অন্য সময়ে ঝড় বজ্রপাত ও হিংস্র পশুর আধিক্যের জন্য এডাম্‌স্ পিক্ দুরধিগম্য। অতি প্রত্যূষে শৈলশিখরে পৌঁছিতে হয়, সেজন্য রাত্রে মশালহস্তে

দেবানামপিয় তিস্‌স-এর মূর্ত্তি—মিহিনতাল

পর্ব্বতারোহণ করিতে হয়। সে এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য—অন্ধকারে পাহাড়ের গায়ে দীপের মালা মেঘে ঢাকিয়া অদৃশ্য হইতেছে, ক্ষণেক পরে প্রকাশিত হইতেছে; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন দৃশ্যের অবতারণা! মাঝে মাঝে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য পান্‌শালা অর্থাৎ পান্থশালা আছে, এগুলি পুণ্যাভিলাষী সিংহলীরা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে; নারিকেল পাতায় ছাওয়া, ভিতরে বসিবার জন্য বাঁশের বেঞ্চ আছে। পান্‌শালাতে গরম কাফি বিতরিত হয়। পথশ্রমে ক্লান্তি এবং রাত্রে পাহাড়ের শৈত্যের ভিতর এই গরম কাফিটুকু যে কি আরামপ্রদ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অতি প্রত্যূষে শৈলশিখরে আরোহণ করিলে দেখা যায় আলোর খেলা, রঙের মেলা—চতুর্দ্দিকে দিকচক্রবাল ঘিরিয়া আলোর বন্যা। এডাম্‌স্ পিক্ হঠাৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে—চতুর্দ্দিকে অনেক নীচে—সমুদ্রের মত নানা রঙের পাহাড়ের ঢেউ দিকচক্রবালে গিয়া মিশিয়াছে। কোথাও সব মেঘের যবনিকায় ঢাকা—কোথাও বা যবনিকা ছিঁড়িয়া ঘন নীল শৈলশ্রেণীর প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতির সম্মিলিত যাত্রা এবং সকলের একই স্থানে পূজা। পৃথিবীতে এবং কোন কালে বোধ হয় এরূপ ঘটনার সমাবেশ হয় নাই। সকলেই নিজের অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশে চলিয়াছে; কারও সঙ্গে কারও বিবাদ-বিসম্বাদ নাই।

মিহিনতালের সিঁড়ি

যাত্রাকালে বৌদ্ধরা উচ্চারণ করিতেছে "সাধু" "সাধু", হিন্দুরা "হর" "হর", মুসলমানেরা "আল্লা হো আকবর"।

মিহিনতাল

মিহিনতাল শৈল ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রের স্মৃতিপূত। এখানেই প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। অনুরাধাপুর হইতে মিহিনতাল শৈল ৮ মাইল দূরে, অরণ্যের ভিতর দিয়া পথ।

বৃহৎ সরোবর নুয়র বেওয়া (Nuwara Wewa) পথের ধারে। রাজধানী অনুরাধাপুর হইতে মিহিনতালের পথে এক সময় নৃপতি ভটিকাভয় (১৯ পুঃ খৃঃ) চাদর বিছাইয়া দিয়াছিলেন—যাহাতে তীর্থযাত্রীরা ধূলা না মাড়াইয়া রুয়ানবেলি দাগোবা হইতে মিহিনতালে যাইতে পারে। মিহিনতাল শৈল ১০০০ হাজার ফিট উচ্চ। ১৮৪০ খানা পাথরের সিঁড়ি পার হইয়া উপরে পৌছিতে হয়। রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি কোথাও দেখা যায় না—এই সিঁড়িকে "স্বর্গের সিঁড়ি' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। দুই পাশের বৃক্ষরাজি এবং মাঝে মাঝে বিহারের ধ্বংসাবশেষ এই সোপানাবলিকে একটা গাম্ভীর্য্য দান করিয়াছে। ইটালীর শিল্পী লরেঞ্জো ঘিবার্টি (Lorenzo Ghiberty) নির্ম্মিত দুইটি ব্রোঞ্জের দ্বারকে মাইকেল এঞ্জেলো 'স্বর্গদ্বার' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, এই সোপানাবলিকে ঠিক তেমনি 'স্বর্গের সিঁড়ি' বলা যায়।

মিহিনতালের একটি গুহা

সমগ্র মিহিনতাল এক সময় বিহার ও স্তূপে ভরিয়া গিয়াছিল। তিস্‌স হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বৌদ্ধ নৃপতিই মিহিনতালকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ভিক্ষু, চিকিৎসক, ভাস্কর, স্থপতি, চিত্রকর, কারুশিল্পী, ভৃত্য ও নানা শ্রেণীর কর্ম্মচারী—সকলের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ ছিল। রাজকোষ হইতে সকলের বেতন ও বিহার প্রভৃতির জন্য অর্থ নির্দ্দিষ্ট ছিল। মিহিনতালে অনেক শিলালেখ পাওয়া যায়—তাহাতে প্রাচীনকালের বিধিব্যবস্থা অনেক জানা যায়। প্রাচীন চিকিৎসাশালা ও পাকশালার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মিহিনতালের অধিবাসীদের জন্য জলনিষ্কাশনের সুব্যবস্থা ছিল। পাহাড়ে মাঝে মাঝে ছোট স্বাভাবিক জলাশয় আছে—সিংহলী ভাষায় তাহাকে পোকুন (পুকুর) বলে। মিহিনতালের নাগ পোকুন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাহাড়ের গায়ে পাঁচ ফণা-ওয়ালা এক বিষধর সর্প খোদাই করা, সাপের লেজ জলের ভিতরে রহিয়াছে, সাপ যেন জলের উপরে মাথা তুলিয়া বিষ উদ্গীরণ করিতেছে। চারি দিকের শ্যামল বৃক্ষরাজি, ঝিঁঝি-পোকার একটানা শব্দ এবং নির্জ্জনতা এ স্থানকে রহস্যময় করিয়াছে। সাপ হইতেই 'নাগ পোকুন' এই নামের উৎপত্তি। এই পোকুন হইতে পাথরের পয়ঃপ্রণালী ও লোহার নলের সাহায্যে অন্যত্র জল লওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এসব অবশ্য এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নাগ পোকুনের জল অনেক দূরে একটা চৌবাচ্চায় লওয়া হইত। চৌবাচ্চার গায়ে একটা সিংহের মূর্ত্তি খোদাই করা; ৭ ফিট ৪ ইঞ্চি উচ্চ। সিংহ সামনের দুই পা তুলিয়া গর্জ্জন করিতেছে, কারও উপর যেন ঝাঁপ দিয়া পড়িবে এই ভাব। এই চৌবাচ্চার নাম 'সিংহ পোকুন'। চৌবাচ্চা হইতে একটা লোহার নল সিংহের মাথার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, মুখের ভিতর দিয়া জল পড়ার ব্যবস্থা। ইহার শিল্পনৈপুণ্য এবং মৌলিকতা নিশ্চয়ই খুব প্রশংসার বিষয়। পর্ব্বতশিখরে দাগোবা এট বিহার (Et Vihara); বুদ্ধের কপালে বামচক্ষুর ভ্রূর উপরে যে একটি কেশ তার উপরে এট স্তূপ নির্ম্মিত। আর একটি প্রাচীন দাগোবা—মহাসেয়া দাগোবা। এই দুই দাগোবা খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে প্রস্তুত। মিহিনতালে মহেন্দ্র দেহরক্ষা করেন; তাঁহার দেহাবশেষের উপর 'আম্বাস্থল' দাগোবা নির্ম্মিত। আম্বাস্থল দাগোবার চারিদিকে পঞ্চাশটি সরু পাথরের স্তম্ভ আছে। মিহিনতালের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য 'মহিন্দগুহা'—মহেন্দ্র যেখানে
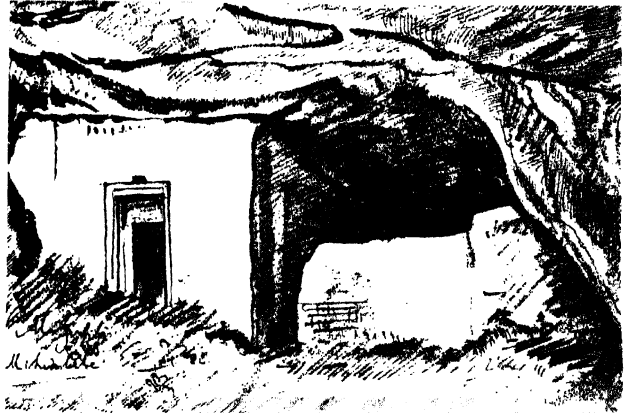
শয়ন করিতেন। গুহার দুই দিক খোলা, উপরে পাথর ছাদের মত রহিয়াছে, ভিতরে স্থান মোটেই প্রশস্ত নয়। একজন মানুষ কোনো রকমে শয়ন করিতে পারে। 'মহিন্দ-গুহা' হইতে দূরের উপত্যকার দৃশ্য অতিশয় মনোরম।

নাগ পোকুন—মিহিনতাল

সমুদ্রের মত উপত্যকা দিগন্তবিস্তৃত, হরিৎ পীত ও নীল রঙের অপূর্ব্ব সমাবেশ। অনেক দূরে সবুজ বনের মধ্যে সরোবর দেখা যায়; রূপালী জলরেখা মকমলের মধ্যে যেন তরবারি। যোগী মহেন্দ্র প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব নয়নস্নিগ্ধকর শোভার মধ্যে ধ্যানমগ্ন থাকিতেন।

মিহিনতালে মহেন্দ্র ও দেবানামপিয় তিস্‌স

মহাবংশে উল্লেখ আছে মিহিনতাল পর্ব্বতে অনেক সহস্র সঙ্গী লইয়া নৃপতি তিস্‌স মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যেখানে আম্বাস্থল দাগোবা তাহার নিকটেই আমগাছের নীচে মহেন্দ্র বসিয়াছিলেন। নৃপতি মহেন্দ্রকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন। মহেন্দ্র সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে রাজন্, এই যে গাছ, এর নাম কি ?"

"ইহাকে আম্বোগাছ (আম) বলে।"

"এই গাছ ছাড়া আরও আম্বোগাছ আছে কি ?"

"আরও অনেক আম্বোগাছ আছে।

"এই আম্বো এবং আর ঐ সব আম্বো ছাড়া পৃথিবীতে আরও আম্বোগাছ আছে কি ?"

"প্রভু! আরও অনেক গাছ আছে, কিন্তু সে-সব আম্বোগাছ নয়।

"অন্য সব আম্বোগাছ এবং অন্য সব গাছ, যারা আম্বো-গাছ নয়, সে-সব ছাড়া আরও কিছু আছে কি ?"

"কি আশ্চর্য্য! এই যে আম্বোগাছ।"

"হে নরপতি, আপনি জ্ঞানী।"

মহেন্দ্র তখন তিস্‌স-এর কাছে বুদ্ধের বাণী প্রচার করিলেন, তিস্‌স সদলবলে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

পুরবাসী সকলে যাহাতে "থেরো"-এর দর্শন পায়, সেজন্য মহেন্দ্রকে রাজধানীতে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। রাজ-প্রাসাদের প্রাঙ্গণে পুরবাসীদের ভিড়। রাজা জনতা দেখিয়া বলিলেন, "এই প্রাসাদে যথেষ্ট স্থান নাই, রাজকীয় বিরাট হস্তীশালায় স্থান হউক।" লোকেরা বলিয়া উঠিল, "হস্তীশালাও যথেষ্ট প্রশস্ত নয়," কাজেই সকলে "নন্দন" নামক প্রমোদ-উদ্যানে গমন করিল। নন্দনের দক্ষিণদ্বার খোলা ছিল, "নন্দন" সুরম্য অরণ্যে অবস্থিত, গভীর ছায়া এবং কোমল শ্যামল তৃণের জন্য শীতল। পুরবাসী-সকল "নন্দন" উদ্যানে থেরো-এর দর্শন পাইল। তাঁহার নিকট বুদ্ধের অমৃতবর্ষী বাণী শুনিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিল।

মহেন্দ্র সমবেত জনমণ্ডলীকে উপদেশ দান করিয়া "নন্দন" উদ্যানের দক্ষিণ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া "মহামেঘ" প্রমোদ-উদ্যানে উত্তর-পশ্চিম দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক মনোরম রাজপ্রাসাদ, অনুপম শয্যা, আসন প্রভৃতি আরামোপযোগী উপকরণ দ্বারা সজ্জিত করিয়া রাজা মহেন্দ্রকে বলিলেন "এখানে আরামে বাস করুন।" রাজা তখন মহামেঘ প্রমোদ-উদ্যান ভিক্ষুদের জন্য উৎসর্গ করিলেন। রাজা নিজের হাতে সোনার লাঙ্গল দিয়া মাটিতে দাগ কাটিয়া চারিদিকের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সীমারেখা সমাপ্ত হইবার সময় ভূমিকম্প হইয়াছিল।

নৃপতি তিস্‌স-এর প্রধান কীর্ত্তি অনুরাধাপুরের বোধিবৃক্ষ।
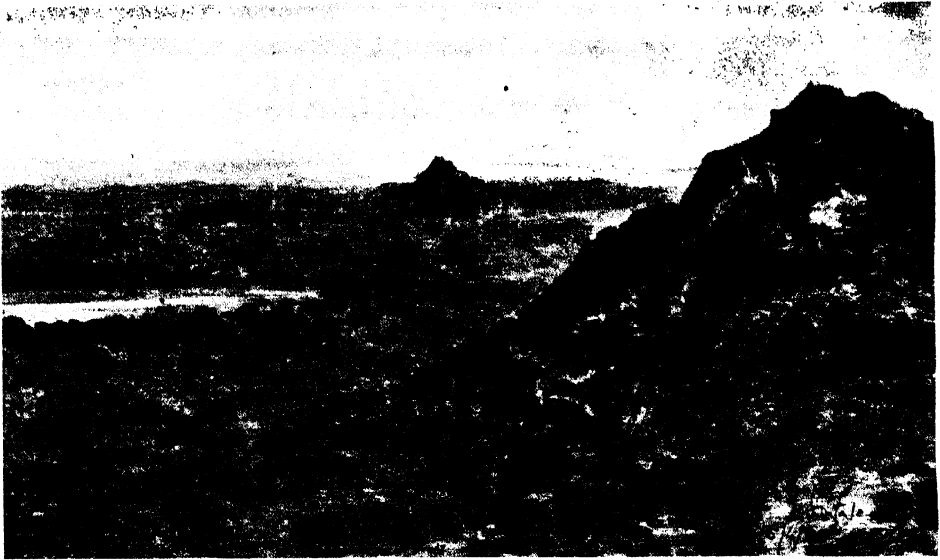
মিহিনতাল হইতে বাহিরের দৃশ্য

বুদ্ধগয়াতে যে-বৃক্ষের নীচে বুদ্ধ নির্ব্বাণলাভ করিয়াছিলেন, তিস্‌স তাহার শাখা আনাইয়া রোপণ করিয়াছিলেন। দুই হাজার বৎসরেরও অধিক হইয়া গিয়াছে, আজও এই বৃক্ষ অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে— এই বৃক্ষই এখন পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম।

রাজা এবং রাজ্যের অপরাপর সকলে বুদ্ধের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে স্ত্রীলোকেরাও দীক্ষালাভের ইচ্ছা জানায়। রাজকুমারী অনুলা ও তাঁহার সঙ্গীরা ভিক্ষুণীর ব্রত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন। মহেন্দ্র বলেন ধর্ম্মে দীক্ষাদানে তাঁহার অধিকার আছে, কিন্তু ভিক্ষুণীর ব্রতে দীক্ষা দেওয়া স্ত্রীজাতির এক জনের পক্ষেই সম্ভব। অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা ছিলেন পাটলীপুত্রের ভিক্ষুণীদের মঠের অধিনেত্রী, তাঁহাকে আনয়ন করার প্রস্তাব হইল। তাঁহাকে লঙ্কাদ্বীপে আনিতে তিস্‌স মন্ত্রী অরিত্থকে পাঠান এবং অশোককে অনুরোধ করিয়া পাঠান যে, অশোক যেন এই সঙ্গে বোধি-বৃক্ষের শাখা পাঠাইয়া দেন। ইহার পরে রাজকুমারী ভিক্ষুণী সংঘমিত্রা বোধিবৃক্ষের শাখা লইয়া লঙ্কাদ্বীপে আগমন করেন। সংঘমিত্রা ও তাঁহার সঙ্গিনীদের বাসের জন্য এক সুরম্য প্রাসাদ দেওয়া হইয়াছিল, তার নাম ছিল হত্থালোক।

সিংহলে বোধিবৃক্ষের শাখা আনয়ন

বোধিবৃক্ষের শাখা আনয়নের অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনা মহাবংশে আছে। শাখা স্থাপন করার জন্য ১৪ ফুট পরিধি এবং ৮ ইঞ্চি পুরু এক সোনার পাত্র নির্ম্মিত হইল। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় এই পাত্র দীপ্তি পাইতেছিল। সৈন্য, সামন্ত ও ভিক্ষুদের লইয়া বোধিবৃক্ষের নিকট অশোক গমন করিলেন। বিরাট উৎসবের অনুষ্ঠান,—মণি, মুক্তা নানাপ্রকার অলঙ্কার এবং পতাকা দ্বারা বোধিবৃক্ষকে সাজান হইয়াছিল। নানা বর্ণের পুষ্পসজ্জায় চতুর্দ্দিক আমোদিত। হাত তুলিয়া সম্রাট অশোক আট দিকে প্রণাম করিলেন, পরে সোনার পাত্রটি একটি সোনার আসনে রাখিয়া নিজে বোধি-বৃক্ষের উচ্চ শাখায় আরোহণ করিলেন এবং স্বর্ণলেখনী দ্বারা শাখায় লাল সিন্দুরের দাগ টানিয়া বলিলেন, "বোধিবৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখা যদি লঙ্কাদ্বীপে গমন করে এবং আমার যদি

বুদ্ধের ধর্ম্মে অবিচলিত বিশ্বাস থাকে তবে এই শাখা নিজে নিজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া এই সোনার পাত্রে আসিয়া পড়ুক।" তৎক্ষণাৎ শাখা, যেখানে সিন্দুরের দাগ টানা ছিল, সেখানে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুগন্ধ তৈলে পূর্ণ পাত্রে আসিয়া পড়িল।

সিংহ পোকুন—মিহিনতাল

অশোক এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; সমবেত জনমণ্ডলীও আনন্দের প্রতিধ্বনি করিল। ভিক্ষুগণ 'সাধু' 'সাধু' উচ্চারণ করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিল। চারিদিকে নানা প্রকার গীতবাদ্য ধ্বনিত হইল।

স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে, দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, দেবযোনি, ভূত, প্রেত, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকল প্রাণীর শব্দে সকল বিশ্ব নিনাদিত হইল। তার সঙ্গে প্রকৃতিও যোগ দিল, ভূমিকম্প—সব মিলিয়া যেন তুমুল প্রলয়কাণ্ড!

রাজবংশের অনেকের উপর এই শাখার ভার দিয়া পোতের উপর তুলিয়া দেওয়া হইল। সম্রাট অশোক গঙ্গাপথে এই সঙ্গে সমুদ্রসঙ্গম অবধি অনুগমন করিয়া পোত হইতে অবতরণ করিলেন। তারপর তিনি উপরের দিকে হাত তুলিয়া তীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন; বোধিবৃক্ষের শাখার বিদায়জনিত শোকে অধীর হইয়া গভীর আবেগে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে অশান্ত হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বহুদিন সমুদ্রযাত্রার পর সিংহলের তীরে পোত উপস্থিত হইল। তিস্‌স এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বোধিবৃক্ষের শাখার অভ্যর্থনার জন্য সমুদ্রতীরে বাস করিতেছিলেন। সমুদ্রপোত দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বুদ্ধ যে-বৃক্ষের নীচে নির্ব্বাণলাভ করিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের শাখা আসিতেছে।" তিস্‌স অধীর হইয়া সমুদ্রজলে নামিলেন এবং গলাজলে দাঁড়াইলেন। ষোল জন বিভিন্ন জাতির লোকদের দ্বারা শাখাকে পোত হইতে নামাইয়া, এক সুরম্য রথে স্থাপন করিলেন। পথে পরিষ্কার শাদা বালি ছড়ান ছিল। চৌদ্দ দিন চলার পর রথ অনুরাধাপুরে প্রবেশ করিল। পতাকা ও তোরণে পথ সাজান ছিল। দিনের শেষে ছায়া যখন দীর্ঘ, তখন এই শোভাযাত্রা মহামেঘ উদ্যানে থামিল।

স্বর্ণপাত্র রথ হইতে নামান হইলে শাখা মুহূর্ত্তের মধ্যে ৮০ হাত উর্দ্ধে উঠিয়া গেল এবং স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ছয় রঙের জ্যোতি প্রকাশ পাইল। পৃথিবী আলোকিত করিয়া সে দীপ্তি স্বর্গ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল; সমুদ্রের ভিতরে সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত সে আলোক প্রকাশিত ছিল।

বোধিবৃক্ষ (অনুরাধাপুর)

রোহিণী নক্ষত্রে বৃক্ষশাখা পুনরায় স্বর্ণপাত্রে প্রবেশ করিল এবং বৃক্ষমূল পাত্রের উপরে উঠিয়া মাটির দিকে চলিল, স্বর্ণপাত্রসমেত মূল মাটির ভিতর প্রবেশ করিল। সকলে তখন ফুল ও নানাবিধ উপাদানে বৃক্ষকে পূজা করিল। গভীর ধারায় আকাশ হইতে বৃষ্টি নামিল এবং ঘনশীতল

মেঘে বৃক্ষকে ঢাকিয়া রাখিল। সাত দিন পরে বৃষ্টি থামিলে বৃক্ষের জ্যোতি প্রকাশ পাইল।

সিংহলের বৌদ্ধদের মতে আটটি প্রধান তীর্থ আছে, তাহার মধ্যে এই বোধিবৃক্ষ অন্যতম। সিংহলী ভাষায় এই আট তীর্থকে বলে "অটম স্থান"।

নৃপতি তিস্‌স-এর অন্যান্য কীর্ত্তি—মহাবিহার, থূপারাম দাগোবা, মাহয়ঙ্গন দাগোবা, ইস্থরু মুনিয়া বিহার, বেস্‌সা গিরি দাগোবা, তিস্‌স বেওয়া (সরোবর) ইত্যাদি।

তিস্‌স ৩০৭ খৃঃ পূঃ হইতে ২৬৭ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার দীক্ষার উনিশ বছর পরে অর্থাৎ ২৮৮ পূঃ খৃঃ-তে সংঘমিত্রা বোধিবৃক্ষ লইয়া সিংহলে অবতরণ করেন। তিস্‌স-এর মৃত্যুর আট বৎসর পর পর্য্যন্ত মহেন্দ্র বাঁচিয়াছিলেন অর্থাৎ ২৫৯ খৃঃ পূঃ-তে দেহত্যাগ করেন। সংঘমিত্রা আরও এক বৎসর বেশী বাঁচিয়াছিলেন, অর্থাৎ ২৫৮ খৃঃ পূঃ-তে সংঘমিত্রা দেহত্যাগ করেন। অনুরাধাপুরে থূপারাম দাগোবার নিকটে একটি ছোট স্তূপ আছে তাহা "সংঘমিত্রা সোহন" নামে খ্যাত। সকলের বিশ্বাস যে, সংঘমিত্রার দেহাবশেষ এই স্তূপের নীচে আছে।
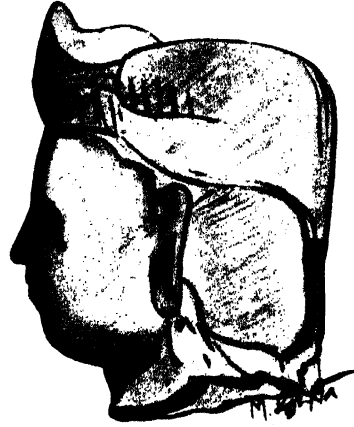
দেবানাম্‌পিয় তিস্‌স-এর মূর্ত্তি—মিহিনতাল

ভুবনেশ্বর

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

ভারতবর্ষের মধ্যে স্থাপত্যের জন্য যে-সকল স্থান প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর তাহার মধ্যে অন্যতম। পুরীর পথে পড়ে বলিয়া এখানে যত যাত্রীর পদধূলি পড়ে, খাজুরাহা, ওসিয়াঁ প্রভৃতি স্থানে তত পড়ে না। অথচ দুঃখের বিষয়, এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও ভুবনেশ্বরের প্রাচীন ইতিহাসের সম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই জানি।

ভুবনেশ্বরের প্রাচীন কীর্ত্তিরাজি প্রায় চার-পাঁচ ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। লিঙ্গরাজ মন্দিরকে যদি কেন্দ্র ধরা যায় তাহা হইলে তাহার অগ্নিকোণে চার-পাঁচ মাইল দূরে ধউলি পাহাড়ে মহারাজ অশোকের শিলালিপি অবস্থিত, অপর পার্শ্বে প্রায় অনুরূপ দূরে খারবেল নরপতির শিলালিপিবিশিষ্ট খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি পর্ব্বত বিদ্যমান। এই দুই স্থানেই খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় অথবা দ্বিতীয় শতকের নিদর্শন রহিয়াছে। অথচ উভয়ের মধ্যস্থলে ভুবনেশ্বর গ্রামে এখন পর্য্যন্ত অত পুরাতন কিছু বিশেষ পাওয়া যায় নাই। যাহা আছে, এবং যাহার সন তারিখ ঠিকমত বলা যায়, তাহাও নবম খৃষ্টাব্দের চেয়ে প্রাচীন নয়। অথচ এখানে যে ধউলি ও খণ্ডগিরির সমসাময়িক কিছুই ছিল না, একথা জোর করিয়া বলা চলে না। অন্ততঃ কিছু ছিল কি-না তাহা আমাদের আরও ভাল করিয়া এবং নিয়মিতভাবে অনুসন্ধান করা দরকার।

মন্দিরের স্থাপত্যরীতির বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি মন্দিরের গঠন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পশাস্ত্রে যাহাকে রেখ-দেউল এবং যাহাকে ভদ্র-দেউল বলে বর্ত্তমান মন্দিরটি তাহার কোনটির

মধ্যেই পড়ে না। ইহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে মনে হয় যে মন্দিরের মধ্যে যে অতিকায় শিবলিঙ্গটি আছে, তাহাকে আচ্ছাদন করিবার জন্যই যেন কোনও রকমে, শিল্পশাস্ত্রের রীতি লঙ্ঘন করিয়া ইহা গঠিত হইয়াছিল। মন্দিরটি

চিন্তান্বিতা নারী

ভাস্করেশ্বর নামে খ্যাত। ইহা কে কবে রচনা করিয়াছিলেন তাহা কিছুই জানা যায় না। তাহা সত্ত্বেও নানা কারণে ইহা ঐতিহাসিকের নিকট ভুবনেশ্বরের অপর অনেক মন্দির অপেক্ষা সমধিক মূল্য লাভ করিয়াছে।

ভাস্করেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে যে লিঙ্গটি পূজিত হইতেছে তাহা প্রায় নয় ফুট উচ্চ এবং গৌরীপট্টের উপরে তাহার ব্যাস প্রায় চার ফুট। লিঙ্গের উপরের অংশ ভাঙা বলিয়া মনে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, লিঙ্গটি যে-পাথরে তৈয়ারী, গৌরীপট্ট সে-পাথরের নয়। দ্বিতীয়তঃ গৌরীপট্টের আয়তনের সঙ্গেও লিঙ্গের আয়তনের কোনও সামঞ্জস্য নাই। বহুদিন পূর্ব্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইহা অশোকের স্থাপিত কোনও স্তম্ভ ছিল এবং পরে কোনও সময়ে স্তম্ভটিকে শিবলিঙ্গে পরিণত করিয়া উপরে আচ্ছাদন স্বরূপ একটি মন্দির রচনা করা হয়।

ভুবনেশ্বর ষ্টেশন হইতে যে পথটি লিঙ্গরাজ মন্দিরের দিকে গিয়াছে তাহার উপর যাত্রীরা প্রথমে যে মন্দিরটি দেখিতে পান, তাহার নাম রামেশ্বরের মন্দির। রথযাত্রার সময়ে ভুবনেশ্বর-মহাদেবের রথ এই মন্দির পর্য্যন্ত আনা হয়। এই রামেশ্বর মন্দিরের পশ্চিমে অশোকা কুণ্ড নামে একটি কুণ্ড আছে। কুণ্ডের উত্তর তটে সারনাথের অশোকস্তম্ভের শীর্ষের মত, কিন্তু তাহা অপেক্ষা আয়তনে অনেক বড়, একটি স্তম্ভশীর্ষ আছে। ইহার উপরে হয়ত কোনও জীবমূর্ত্তি বা অন্যবিধ মূর্ত্তি ছিল। দুঃখের বিষয়, তাহা হারাইয়া গিয়াছে। শুধু ইহার গায়ে সামান্য লতাপাতা কারুকার্য্য করা আছে, উপরে মূর্ত্তি বসাইবার জন্য সমতল আসন আছে এবং নীচে স্তম্ভের উপরে খাপ খাইয়া বসিবার মত একটি অর্দ্ধ বর্ত্তুলাকার খাঁজ কাটা আছে।

ভাঙ্গা স্তম্ভশীর্ষটি ৪′ ৫″ উচ্চ এবং তাহার ঘের ১৯ ফুট, অর্থাৎ তাহার ব্যাস ৫′ ফুটেরও অধিক। ইহার নীচে যে

মন্দির দ্বারে প্রাচীন অলঙ্কার

খাঁজটি আছে তাহার কানার ব্যাস ৩′ ৩॥″ ইঞ্চ। ভাস্করেশ্বর লিঙ্গের সহিত ইহাকে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, সে লিঙ্গটির যাহা মাপ এবং তাহার উপরের দিকে মারেণী (batter)

যতটুকু তাহাতে তাহাকে সবসুদ্ধ জমি হইতে ১৫′ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা করিলেই অশোকা কুণ্ডের শীর্ষটি তাহার উপর বসিতে পারে। কিন্তু ১৫′ ফুট স্তম্ভের উপর ৭॥০′ ফুট শীর্ষ এবং হয়ত বা তাহারই অনুরূপ একটি জীবমূর্ত্তি অতিশয় বিসদৃশ দেখায়। যদি স্তম্ভশীর্ষটি সত্যই ভাস্করেশ্বরের তথা-কথিত লিঙ্গের উপরিভাগ হয় তবে বলিতে হইবে যে স্তম্ভটি মাটির ভিতরে নিশ্চয়ই অনেক খানি পুঁতিয়া আছে। কতখানি পুঁতিয়া গিয়াছে তাহাই প্রশ্ন।

ভারতবর্ষে বহু স্থানে প্রাচীন স্তম্ভ পাওয়া যায়। মহারাজ অশোক ছাড়াও সমুদ্রগুপ্ত, হেলিওদোরস প্রমুখ অনেকে সে সময়ে স্তম্ভ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেগুলির শীর্ষ ও দেহের অনুপাত বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে মনে হয় ভাস্করেশ্বর স্তম্ভটি আরও ২৯′ হইতে ৩১′ ফুট মাটির মধ্যে লুক্কায়িত আছে। অতএব তখন জমি এখনকার জমি হইতে ঐ জায়গায় প্রায় ৩০′ ফুট নীচে ছিল।*

এই অনুমানে নানাবিধ ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে অন্ততঃ আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমরা অন্ততঃ এইটুকু বুঝিতে পারি যে, জমির উপরের চেয়ে নীচের দিকেই বেশী খোঁজ করা দরকার। ঐতিহাসিকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট লাভ।

এই অনুমানের ইঙ্গিত অনুসারে আমরা কিছুদিন ধরিয়া আশপাশের জমি খুঁজিতে লাগিলাম। জমির নীচের স্তরে খোঁজার কৌশল হইল নিকটে যদি কোনও নদী, নালা অথবা পুষ্করিণী থাকে তবে তাহার পাড় ভাল করিয়া সন্ধান করা। অনেক সময়ে এরূপ ক্ষেত্রে জমি স্তরে স্তরে সজ্জিত দেখা যায় এবং সহজবুদ্ধিতে ইহাই বলে যে নীচের স্তরের মাটি এবং সেখানে পাওয়া জিনিষ উপরের স্তরের মাটি অপেক্ষা প্রাচীন। এই ভাবে সন্ধান করিতে করিতে একদা আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। ভাস্করেশ্বর মন্দিরের অনতিদূরে এক ভদ্রলোক একটি কুটীর নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। তাঁহার বাড়িতে কুয়া খুঁড়িবার সময়ে নীচের স্তর হইতে হঠাৎ দুইটি

ভাস্করেশ্বর মন্দির

মূর্ত্তি পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে একটি বুদ্ধদেবের, অপরটি কোনও জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি। বুদ্ধমূর্ত্তির চালচিত্রে "যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা ইত্যাদি" শিলালিপি খোদিত আছে। তাহার অক্ষর পরীক্ষা করিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে মূর্ত্তিটি খৃষ্টীয় নবম শতকের হইবে। ইহা কম লাভের কথা নয়। অন্ততঃ বুঝা গেল মাটির নীচে কিছুদূরে খৃষ্টীয় নবম শতকের জমির স্তর বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে সেই স্তরে হয়ত আরও কিছু জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে।

ভাস্করেশ্বরের কাছে জমির নীচের স্তরে যেমন সন্ধান

* *Journal of the Bihar and Orissa Research Society* পত্রিকার Vol. XV-এ পৃঃ ১৯৯-২০২ দেখুন।

চলিতে লাগিল, উপরের দিকেও তেমনি কিছু দৃষ্টি রাখা হইল। অশোকের স্তম্ভ ও স্তূপের মধ্যে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল, তাহার চারিদিকে প্রদক্ষিণের পথ ছাড়িয়া গোলাকার একটি পাথরের বেড়া দেওয়া থাকিত। এই

কূপের মধ্যে প্রাপ্ত জৈনমূর্ত্তি

বেড়ার গায়ে নানাবিধ মূর্ত্তি ও চিত্র দিয়া প্রদক্ষিণকালে যাত্রীর মনোরঞ্জনও করা হইত, ধর্ম্মশিক্ষাও দেওয়া হইত। সাঁচিস্তূপের চতুর্দ্দিকে অথবা ভরহুতের পাথরের বেড়া যেমন, ভাস্করেশ্বরের সন্নিকটে সৌভাগ্যক্রমে আমরা তেমনি বেড়ার তিনটি টুকরা কুড়াইয়া পাইলাম। তিনটিকে আনিতে দুইটি গরুর গাড়ী বোঝাই করিতে হইয়াছিল; অতএব সেগুলি যে কত বড় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইবে।

এই বেড়ার ভগ্নাবশেষ পাওয়ার পর ভাস্করেশ্বরের লিঙ্গটি যে স্তম্ভ, এবং হয়ত বা অশোক-স্তম্ভ ছিল, তাহা অনেকটা স্থিরীকৃত হইল। বেড়ার গায়ে যে মূর্ত্তিগুলি আছে তাহাদের গঠন, পরিচ্ছদ, মাথার উষ্ণীষ, হাতের দস্তানা প্রভৃতি দেখিলে উদয়গিরির রাণীগুম্ফার সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়। এগুলি হয়ত ভরহুতের কিছু পরের হইবে।

ভাস্করেশ্বরের লিঙ্গ ও পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি

যাহাই হউক, একটি স্তম্ভের ইতিহাস সন্ধান করিতে গিয়া এতখানি পাওয়া ভাগ্যের কথা। ভাস্করেশ্বরের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে আরও কতকগুলি বস্তু প্রসঙ্গক্রমে দেখা গিয়াছিল। মন্দিরের উত্তর দিকে, একটু পশ্চিম ঘেঁসিয়া,

রামেশ্বরের নিকট স্তম্ভশীর্ষ

কতকগুলি গিরিগুহা আছে। তাহার মধ্যে দু-একটি ক্ষুদ্র জৈনমূর্ত্তি দেখা গেলেও তাহাদের বয়স সম্বন্ধে ঠিকমত কিছু বলা যায় না। গুহাগুলির মেজে মাটিতে বুজিয়া গিয়াছে,

মার্কণ্ডেয়েশ্বরের মন্দির-গাত্রে মূর্ত্তি-শ্রেণী

মাটি খুঁড়িয়া মেজে বাহির করিতে করিতে হয়ত বা হঠাৎ কোনও নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইয়া যাইতে পারে।

কিছুকাল পূর্ব্বে আমার জনৈক বন্ধু এই পদ্ধতি অনুসারে ধউলির নিকট অশোকের পুরাতন রাজধানী অনুসন্ধান

পাথরের বেষ্টনীর অংশ

করিতে গিয়াছিলেন। প্রায় একমাস পরিশ্রমের পর তিনি বহু ভাঙা মাটির বাসন, মুদ্রা এবং মাটির তৈয়ারী বৃষ ও হস্তী-অঙ্কিত চাক্‌তিও পান। সেই বৃষ ও হস্তীর অঙ্কনপদ্ধতি দেখিয়া তাহাকে বহু প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। যেখানে তাহা পাওয়া গিয়াছিল সেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে গবেষণা করিলে পাটলিপুত্রের মত অনেক নূতন তথ্য মিলিবার সম্ভাবনা আছে।

একদিকে ধউলি, অপরদিকে খণ্ডগিরি-উদয়গিরির মত ভুবনেশ্বরেও তাহা হইলে প্রাচীন স্তম্ভ, স্তম্ভশীর্ষ এবং পাথরের বেষ্টনীর টুক্‌রা পাওয়া গেল। কিন্তু ইহার পরে প্রাচীনতম মন্দিরে আসিলে একেবারে খৃষ্টীয় নবম শতকে নামিতে হয়।

কূপের মধ্যে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তি

যে শৈলীতে উড়িষ্যায় প্রাচীনতম মন্দির সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে স্থানীয় প্রভাব থাকিলেও তাহা যে উত্তর-ভারতের কোথাও

হইতে আমদানী, উড়িষ্যাতেই প্রথম সৃষ্ট হয় নাই, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ওসিয়াঁ, খাজুরাহো, কাংড়া, পট্টাদকল প্রভৃতি স্থানে সমকালে উৎকৃষ্ট মন্দির দেখা যায় এবং সেগুলির মোট গড়ন উড়িষ্যারই মত। খৃষ্টীয় নবম-দশম শতকেই যখন এই ব্যবস্থা তখন শৈলীটি নবম শতকের পূর্ব্বে কোনও সময়ে উত্তর-ভারতের

বেষ্টনীর গায়ে প্রাচীন মূর্ত্তি

কোনও স্থানে আবিষ্কৃত হইয়া নবম শতক নাগাদ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। সেই অনুমিত কেন্দ্রের সহিত ভুবনেশ্বরের যোগ নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় নবম ও খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের মধ্যে ছিল। গোড়ার চেয়ে শেষের দিকেই তাহা ঘনিষ্ঠ থাকা বেশী সম্ভব। সেই যোগ কিরূপ ছিল এবং কোন পথেই বা সেই শিল্পসম্বন্ধের সূত্র ছিল তাহা আমাদের এখন অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

মহানদীর উভয় কূলে সোনপুর, বৌদ, নরসিংপুর প্রভৃতি করদরাজ্যে কতকগুলি পুরাতন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের কোন কোন লক্ষণ ভুবনেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরগুলির মত। অতএব উত্তর-ভারতের যে অনুমিত কেন্দ্রের কথা আমরা বলিয়াছি তাহার সহিত উড়িষ্যার যোগাযোগ হয়ত বা মহানদীপথেই হইত। মহানদী ছাড়াইয়া পথটি হয় সম্বলপুর ও বরগড়ের ভিতর দিয়া, নয় ত গাংপুরের দিক দিয়া গিয়াছিল।

যাহাই হউক, ভুবনেশ্বরের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া আমরা প্রথমে কয়েকটি অনুমান, পরে ইঙ্গিত ও তৎপরে কতকগুলি নূতন তথ্যের সন্ধান পাইলাম। উড়িষ্যার সঙ্গে উত্তর-ভারতের কোনও প্রাচীন শিল্পকেন্দ্রের যোগসূত্রের অনুমান তেমনই পাওয়া গেল এবং কোন্ পথে অগ্রসর হইলে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যাইতে পারে তাহারও নূতন ইঙ্গিত লাভ করা গেল।

ইতিহাসে নূতন তথ্য লাভ করিবার ইহাই হইল পন্থা। ঐতিহাসিক তখনই বলিতে পারেন যে তিনি সত্য পাইয়াছেন যখন তিনি একটি যুগের মানুষের প্রধান কীর্ত্তিগুলি এবং সেই কীর্ত্তি-রচনার পিছনে যে উদ্দেশ্য কার্য্য করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। তাহার কম যাহাই হইবে তাহা অনুমান। অনুমান লইয়া কেহ বড়াই করে না। তাহার মূল্য হইল এই যে, তাহা আমাদিগকে নূতন তথ্য-ভাণ্ডারের দিকে ইঙ্গিত দেয়। হয়ত সে-তথ্য আবিষ্কৃত হইলে পুনরায় শুদ্ধতর অনুমান গঠন করিতে হয়, আবার সেই অনুমানে নূতন ইঙ্গিত দেয়। এমনি একটির পর একটি পা করিয়া ঐতিহাসিক অনাবিষ্কৃত তথ্যের অন্ধ-বনানীর মধ্যে বিচরণ করেন। যে অনুমান দূরের সন্ধান দেয়, গভীরতম লোকের সন্ধান দেয় তাহাই মূল্যবান। কিন্তু অনুমান চিরকালই অনুমান। সত্য সম্পূর্ণ। লোকে সহজে তাহাকে পায় না। হয়ত ঐতিহাসিককে চিরজীবন ব্যাধের মত সেই মায়ামৃগের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতে হয়। ইহাই তাঁহার লাভ, ইহাতেই তাঁহার আনন্দ।

মুহূর্ত্তের মূল্য

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মাসের শেষ। দুটি হাতে জিনিষপত্র বোঝাই করিয়া শম্ভু বাড়ি ফিরিতেছিল। গতি দ্রুততর। কোথায় লালবাজারের মোড়—আর কোথায় মাণিকতলা! মাঝপথে বৌবাজারের মশলার দোকান হইতে জিনিষগুলি সে কিনিয়াছে। মাণিকতলার চেয়ে হিসাবে আনাদুই সস্তাই হইয়াছে। ওদিকে সন্ধ্যা আসিবার বহু পূর্ব্বে রাস্তায় আলো জ্বলিয়া গৃহমুখী পথিককে সত্বর গৃহে ফিরিবার ইঙ্গিত জানাইতেছে।

আপিসের বিপুল প্রাসাদকক্ষ; চেয়ার, টেবিল, আলো, পাখার যেন স্বর্গভবন। খোলা বড় জানালার ধারে দাঁড়াইলে নিম্নের চলমান জনস্রোত চিত্রলেখার মত চক্ষুতে বিভ্রম জন্মায়। নিজেকে বহু উর্দ্ধে কল্পনা করিয়া কিছু যে গর্ব্ব বোধ হয় না তাহাই বা কে বলিবে? তবু আশ্চর্য্য! শম্ভুর মত মাসমাহিনার অঙ্ক কষিতে যাহারা এই কক্ষগুলিতে আসিয়া বসে তাহাদের প্রয়োজন বাহিরের আলো বাতাস বা সৌন্দর্য্যকে লইয়া মিটে না। স্তূপীকৃত ফাইলের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া লাল এবং কাল কালির সাহায্যে অঙ্কগুলির মাথায় দাগ মারে, আপিস-নোটে বাঁধা গৎ লিখিয়া দিনের কর্ত্তব্য শেষ করে। কর্ম্ম-অবসরে দৃষ্টি ফিরাইলে পড়ন্ত রৌদ্রের পানে চাহিয়া মনটা চঞ্চল হইয়া উঠে। কর্ম্মবাহু মেলিয়া এই দুরন্ত কর্ত্তব্য যেন তাহার বন্দীভবন রচনা করিয়াছে। সৌষ্ঠবশূন্য কক্ষে চেয়ার, টেবিল, ট্রে, ফাইল, র‍্যাক্—এমন কি ক্ষুদ্রকায় চকচকে পিনগুলি পর্য্যন্ত কাজের কদর্য্য মূর্ত্তি লইয়া অনবরত দৃষ্টিকে বিঁধিতে থাকে। চঞ্চল মন চাহে মুহূর্ত্তের পাখায় ভর করিয়া বদ্ধ গলির আলোকবঞ্চিত বায়ুরুদ্ধ বাড়িতে একখানি জীর্ণপ্রায় কক্ষে ছুটিয়া যাইতে।

সেখানে নীলের টুকরা ঢাকিয়া সন্ধ্যার ধূম-কুণ্ডলী। স্যাঁতা মেঝেয় ভাঙা তক্তপোষের উপর বসিয়া প্রাণ ভরিয়া সেই গাঢ় ধোঁয়া টানিবার মধ্যেই প্রচুরতর উল্লাস। কর্ম্মের রূঢ়তা হইতে মুক্তিলাভ! ধোঁয়ার মধ্যে আরাম বিলাইতে যে দু-খানি মমতাস্নিগ্ধ করের নিপুণ কর্ম্মপ্রয়াস,—কর্ম্মক্লান্ত কেরাণী কি বলিয়া সে-দিক হইতে মুখ ফিরাইবে!

ধোঁয়ার মধ্যেই ছেলেমেয়েরা আসিয়া পাশে বসিবে, ধোঁয়ার মধ্যেই কাপড় জামা টানিয়া নূতনতর খেলনার খোঁজ করিবে। পিতার দীর্ঘ অনুপস্থিতির মধ্যে ক্ষুদ্র সংসারের ক্ষুদ্রতর ঘটনাগুলি একনিঃশ্বাসে বলিয়া যাইবে,—যে কোনো কৌতূহলজনক গল্পের চেয়ে তাহা কি কম রোমাঞ্চকর? তারপর ধোঁয়া পাতলা হইতে হইতে মিলাইয়া যাইবে। হাসিমুখে জলখাবার সাজাইয়া গৃহিণী আসিয়া দাঁড়াইবেন। দুখানা রুটি, অল্প একটু হালুয়া বা এক কাপ চা। চারিধারের প্রসাদ-পিপাসুদের মুখে অল্প ঢালিয়া দিয়া যেটুকু মুখে যায়, তাহার প্রত্যেকটি কণায় অমৃত।

তারপর রোগা তাকিয়াটায় হেলান দিতে গিয়া তক্তপোষে মচ্‌মচ্ শব্দ উঠিবে হয়ত। আর! মণ্টু পিঠে সুড়সুড়ি লাগাইবে। হরি দ্বিতীয়ভাগের যুক্তাক্ষর শিখিয়াছে; বাপের পিঠে পায়রার পালক বা আঙুল দিয়া অধীত বিদ্যার পরিচয় দিবে। বাপ সে লেখা বুঝিতে পারিয়াও বলিতে পারিবে না। হরি হাসিবে,—আবার লিখিবে। পিঠের সঙ্গে মনটি পর্য্যন্ত তন্দ্রাতুর হইয়া উঠে। পালকের চেয়ে কচি আঙুলগুলির স্পর্শ আরও মনোরম। ছোট মেয়েটা ইত্যবসরে দুরন্ত হাতে মাথার চুলগুলি এলোমেলো করিয়া দিবে। তা দিক। এমন মধুর উৎপীড়নের মধ্যে নিজেকে সঁপিয়া দিয়া কি যে তৃপ্তি! কোথায় লাগে খোলা মাঠ, উদার বিস্তৃত আকাশ, আকাশপটে অসংখ্য তারাবিন্দু, চাঁদ বা অস্তগামী সূর্য্য! বায়ুর সাধ্য কি এমন সুখস্পর্শ বহিয়া আনে!

দ্রুত চল—দ্রুত চল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী মিলাইয়া গেলে স্বর্গের সুষমা থাকিবে না। গাঢ়তর ব্যাপ্তির মধ্যেই কল্পনার প্রখরতা। কোথায় চূণবালি খসিয়া ইট বাহির হইয়াছে, কড়িকাঠে ঘুণ জন্মিয়াছে প্রচুর, মেঝেয় পা চালাইতে গেলে

খোয়া ফুটে, আসবাবপত্র মলিন, একটি মাত্র জানালায় অপ্রচুর আলোর ব্যঙ্গ—এ-সব বাস্তবকে আড়াল করিয়া ধূমময়ী সন্ধ্যা এ-বাড়িতে আবির্ভূতা হন। শঙ্খরোলে নিয়মিত সময়ের বহু পূর্ব্বেই তিনি আসেন,—প্রত্যহ। এমন মুহূর্ত্তগুলি পাছে পলাইয়া যায়—এই জন্য শম্ভুর গতি দ্রুততর।

কলেজ ষ্ট্রীট ছাড়াইতেই কে পিছন হইতে কাঁধে হাত দিয়া ডাকিল।

শম্ভু ফিরিলে সে হাসিয়া বলিল, "চিনতে পার?"

না চিনিবার কথা নহে। তবে কয়েকটি বৎসরের ব্যবধান। অজিত তেমনই লম্বা ছিপছিপে—গৌরবর্ণ। মাথার চুল ও জুলপির ফ্যাসানটি যা নূতন। মুখে সেই অল্প হাসি, কপালে কয়েকটি রেখা, চোখের কোমল চাহনিটুকু পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত। কথা বলিবার সময় ঘন ভ্রূতে অল্প একটু তরঙ্গ খেলে; ডান হাতখানি নাড়িয়া কথার সঙ্গে সেই সঙ্কেতময়তা। বয়সের কোঠায় পড়িয়াও মাথার চুলে শুভ্র বিন্দু ফুটে নাই।

অজিত বলিল, "আরে হাঁ ক'রে কি দেখ্‌চিস? চিনতেই পারলি নে। আমি অজিত,—ক্লাসের মধ্যে গাধা ছেলে।"

শম্ভু ম্লান হাসিয়া বলিল, "ভাল ত?"

"তবু ভাল যে জিজ্ঞাসা করেছিস! তোর ত দেখ্‌চি প্রকাণ্ড সংসার। মাসকাবারি বাজার বুঝি? সরস্বতীর মত লক্ষ্মীও যে অতি মাত্রায় কৃপালু! আহা! একটু আস্তে। ছুটি যখন পেয়েছিস বাসায় তখন পৌঁছবিই। কি আশ্চর্য্য! পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে কত দিন পরে দেখা, চল কমিয়ে একটু গল্পই না-হয় করলি।"

শম্ভু অপ্রতিভভাবে কহিল, "গল্প করতে কি আমার অনিচ্ছা? তারপর—তোর খবর? বিয়ে করেছিস? ছেলে-পুলে—"

অজিত হাসিয়া বলিল, "হাঁ, ও দুর্ঘটনা বাঙালী মাত্রেরই একবার না একবার হয়। তবে ফলেফুলে জীবনতরু এখনও বিকশিত হয়নি। যাবি?—চ' না!—এই ত কালীতলার ওপাশে দু-মিনিটের রাস্তা।"

শম্ভু ব্যস্ত হইয়া কহিল, "দূর, তা কি হয়। হাতে একরাশ বোঝা—"

অজিত কহিল, "এ তো আর কুটুমবাড়ি যাচ্ছ না, থাকলোই বা বোঝা?"

শম্ভু বলিল, "এই ময়লা কাপড়, আপিসের খাটুনীর পর দেহ টলছে।"

অজিত তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "তা হোক, চল্ একটু জিরিয়ে—"

আতঙ্কে দুই পা পিছাইয়া শম্ভু হাত ছাড়াইবার জন্য রীতিমত ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। বিস্মিত অজিত হাত ছাড়িয়া দিল। ফাঁক পাইবামাত্র শম্ভু কয়েক পা আগাইয়া গিয়া কহিল, "আজ থাক, আর এক দিন আসব। গুড বাই।"

কয়টি বৎসরেরই বা ব্যবধান? কলেজ-জীবনের কথাই ধরা যাক। অজিত যদি বলিত, "আমাদের এ-জীবনে ছাড়াছাড়ি হবে যে-দিন—"

শম্ভু উত্তেজিত কণ্ঠে প্রতিবাদ করিত, "সে-দিন বন্ধুত্বের সঙ্গে আমরাও ম'রব। ও ভাবনা মিছে। পৃথিবীতে একটি মাত্র পথ আছে, যেখানে সুস্থ, সবল দেহে ও মনে প্রচুর কর্ম্ম-প্রেরণা নিয়ে আমরা জন্মীর মত চলতে পারি। সে-পথ বন্ধুত্বের।"

অজিত হাসিয়া বলিত, "তুই বড় সেণ্টিমেণ্ট্যাল। রোমান্সের মোহে তোরাই যাবি আগে ভেসে।"

শম্ভু হাসিত না। মুখ গম্ভীর করিয়া কহিত, "আমার মত মনের জোর থাকলে ও-কথা তুলতিসই না।"

সে কথা সত্য। কত বার এমন কত বিপদ আসিয়াছে, পাতলা অজিতের পিছনে বলিষ্ঠ শম্ভু—দেহের অনুবর্ত্তী ছায়ার মতই নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অজিতের দেহে আঁচড় লাগিবার পূর্ব্বে তার পেশীপুষ্ট বাহু আততায়ীর উদ্দাম পণ্ড করিয়া দিয়াছে। কেহ কাহাকেও কৃতজ্ঞতা জানায় নাই, শুধু অন্তরগ্রন্থিতে ফাঁসের পর ফাঁস পড়িয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে—নিত্য চায়ের পিপাসার মত, উভয়ের সঙ্গ উভয়ের কাছে—প্রতীক্ষামুখর। মাঝে মাঝে তর্ক তুমুল হইয়া কলহে রূপান্তরিত হইত এবং ভালবাসার ওজনে সেই কলহসঙ্কুল মুহূর্ত্তগুলি তৌল নিরূপণ করিত।

অজিত যদি জোরে কথা কহিত, শম্ভু টেবিল চাপড়াইত আরও জোরে। অজিত হাসিলে শম্ভু গম্ভীর ভাবে বই পড়িত। অন্তর-তারে চড়া স্বর। আঙুলের আঘাত

অপেক্ষা করিয়া আছে। চড়চাপড় বা হাসি—এমনই একটা দুরন্ত মাতামাতির মধ্যেই তন্দ্রী উঠিত বাজিয়া। কুয়াসার মত অভিমান মিলাইয়া যাইত।

কিন্তু সে বন্ধুত্বের সূত্রপাত স্কুলেই। কতকগুলি ক্ষুদ্র ঘটনা দু জনকে নিকটে টানিয়া বন্ধুত্বের বার্ত্তাটি কানে কানে জানাইয়া দিয়াছিল।

ম্যাট্রিক পাস করিবার পর কি করিবে এই ভবিষ্যৎ ভাবনার মধ্যে দু-জনেই স্থির করিয়াছিল, যদি পড়িতে হয় দু-জনে একই কলেজে পড়িবে, চাকুরি করিতে হয় একই আপিসে ঢুকিবে। বিধাতা সে সুযোগ উভয়কে দিয়াছিলেন।

দুটি বাড়ির দূরত্ব অনেকখানি হইলেও ব্যবধান বিশেষ ছিল না। উত্তর পাড়া হইতে দক্ষিণ পাড়া এক মাইল। মাঝখানে জেলা স্কুল। স্কুলের প্রকাণ্ড মাঠে ছেলের দল প্রতিদিন খেলার কোলাহল জমাইত। খেলাশেষে নদীর ঘাটে পা ধুইয়া বাঁধানো চাতালে বসিয়া এ-দেশ ও-দেশের নানা গল্প করিত। তারপর সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনিতে গৃহে ফিরিত। অজিত ও শম্ভু কোলাহলময় নদীর ঘাটে না বসিয়া অদূরে বটতলে যাত্রীপূর্ণ খেয়ার নৌকা যেখানে পারাপার করিত সেইখানে আসিয়া বসিত। গোধূলিবেলার আবছা অন্ধকারে নদীপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া কল্পনার অশ্ব ছুটিত দেশদেশান্তরে।

"আচ্ছা শম্ভু, এই একঘেয়ে জীবন তোর ভাল লাগে?"

শম্ভু উত্তর দিত, "মন্দ কি।"

অজিত বলিত, "চমৎকার! সামনের নদীটার মতই মন্থর অলস। না-ঢেউ, না-স্রোত। জীবন হবে পদ্মার মত। বেগমত্ততায় সে যেমন ভাঙবে এক হাতে, দানের গৌরবে অন্য হাতে করবে সৃষ্টি। আমি যুদ্ধে যাব।"

"তাতে লাভ?"

"লাভ? সে লাভ বোঝাতে পারব না। কত দেশ দেখব, গোলার সামনে বুক পেতে দাঁড়াব। এরোপ্লেন, বোমা,—"

শম্ভু হাসিয়া অজিতের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিত, 'দেহের কাঠামো আর একটু শক্ত হোক, নার্ভগুলো উঠুক মজবুত হ'য়ে তবে ত! আমার ইচ্ছে—ডাক্তারী শিখব। মানুষকে মারার চেয়ে শুশ্রূষা করা ঢের বেশী শক্ত।"

অজিত হাসিয়া উত্তর দিত, "তবে এস দু-জনের ইচ্ছাটা বদল ক'রে নিই। আশ্চর্য্য! দেহে অত ক্ষমতা থাকতে বেছে বেছে নিতে হবে করুণার কাজ!"

শম্ভু উত্তর দিত, "ক্ষমতা যার আছে—সে-ই করুণা করে, দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত আনে উত্তেজনা। যারা খুনী তারা শতকরা নব্বই জন দুর্ব্বল। আমি ছবি দেখেছি।"

অজিত সে তর্কের শেষ করিয়া কহিত, "চল্, এখন ওঠা যাক। উঁহু, ও-পথে নয়, আমাদের বাড়ি হয়ে। আজ একটা মস্ত খাওয়া আছে, তুই না গেলে খাওয়াই আমার মাটি।

বিনা নিমন্ত্রণে এমন কত দিন বন্ধুর বাড়ি শম্ভু খাইয়া আসিয়াছে।

আর এক দিনের কথা।

"এত ময়লা কাপড় প'রে আসতে তোর ঘেন্না হয় না?"

শম্ভু হাসিয়া জবাব দিত, 'তুই ত আর কুটুম্ব নোস? তোর কাছে আমার লজ্জা-ঘেন্না কি?"

"বটে। চ' দেখি আমাদের বাড়িতে মা কি বলেন?"

"বলবেন না-হয় ওটা আমার চাকর। কিন্তু সত্যি কথা কি জানিস, অজু, একজোড়া ছাড়া কাপড়ই নেই আমার।

"চ' তবে আমাদের দোকান থেকে আর একজোড়া নিবি। লজ্জা হবে না ত? যে বীরপুরুষ! আবার আত্ম-সম্মানে না বাধে!"

হাসিয়া শম্ভু কহিত, "তোর কাছে ত আত্মাকেও বিক্রয় করেছি, সম্মান দেবে কে?"

বন্ধুর দেওয়া কাপড় লইতে এতটুকু কুণ্ঠা সেদিন জাগে নাই।

তারপর কলেজ হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বদিন অজিত শম্ভুকে টানিয়া আনিল সেই ছায়াস্নিগ্ধ বটতলে। গ্রীষ্মের দুপুর। পারযাত্রির কোলাহল নাই, কর্ম্মের ব্যস্ততা নাই। তীব্র রৌদ্রের তাপে সারা জগৎ ম্রিয়মাণ।

বহুক্ষণ পরে শম্ভু কথা কহিল, "কালই চলে যাচ্ছি। বাবা বদলী হলেন কি-না।"

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, "পড়বি নে?"

"কি জানি! জানিস ত সংসারের সব কথা। হয়ত পড়া আর হবে না।"

"আমিও কলেজ ছাড়ব।"

'দূর পাগল! তোর এ সমবেদনার মূল্য কি?"

অজিত ধরাগলায় বলিল, "সমবেদনা নয়, আমার উৎসাহ—"

বাধা দিয়া শম্ভু বলিল, "পাগলা! না, না, ভাল ক'রে মন দিয়ে পড়বি।"

"কিন্তু পাস না করতে পারলে দোষ দিস্ না।"

"আচ্ছা সে দেখা যাবে। চিঠি লিখবি ত?"

"না।"

"না! তুই রাগ করছিস, অজিত। চিঠি না লিখলে—"

"কেন? আমিও ত তোর সঙ্গে চাকরি করতে পারি একই আপিসে। পারবি নে জোগাড় ক'রে দিতে?" মাথা নাড়িয়া শম্ভু কহিল, "কিন্তু তোর পড়া ছাড়া হবে না। না, কিছুতেই না।"

ম্লান হাসিয়া অজিত কহিল, "ও বুঝি আমার শাস্তি! আর তোর শাস্তি কি?"

শম্ভু তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া কহিল, "এখান থেকে চলে যাওয়ার শাস্তি যে কত বড়—"

আশ্চর্য্য! কথাও ভাল করিয়া কহা যায় না। প্রতি বাক্যের শেষে অশ্রু কণ্ঠ রোধ করে। বুকের মাঝে ভারী নিঃশ্বাস-গুলিতে এত অশ্রুর তরঙ্গ কে জানিত?

"তুই হয়ত ভুলে যাবি?"

"তুই-ও।"

শম্ভু পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া বলিল, "তবে একটা চিহ্ন ক'রে রাখি। কেমন? এইটে দেখলেই কেউ কাউকে ভুলব না।"

অজিত হাত আগাইয়া দিয়া কহিল, "তোর নামের আদ্যাক্ষর থাক আমার হাতে—তুই লেখ। আমি লিখব তোর হাতে।"

লেখা শেষ হইলে দু-জনে সেই রক্তচিহ্নিত হাত দুখানি একত্র করিয়া শপথের ভঙ্গীতে উচ্চারণ করিল, "বন্ধু"।

চমকিত শম্ভু ভূপতিত জিনিষগুলির পানে না চাহিয়া জামার আস্তিন তুলিয়া দেখিল, কালো রেখায় এখনও সেই নাম লেখা।—কত বৎসর গত হইয়াছে, কে জানে, স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল সেই খেয়াঘাট—ঝুরিনামা ছায়াঘন বটতল—গ্রীষ্মের সেই বিষণ্ণ মধ্যাহ্ন! তাহারা একেবারে মরে নাই। লাল রক্ত যেমন দেহে শুকাইয়া কালো হরফের জন্ম দিয়াছে, তেমনই সেই দিনের বিদায়ক্ষণ অপার বিস্মৃতির বালুগর্ভে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। আছে মাত্র একটা রেখা—বৈচিত্র্যহীন টানা লাইনের মত নির্জ্জীব রূপহীন!

বিজ্ঞান,—এতটুকু তার মিথ্যা নহে। পৃথিবী প্রতি-নিয়ত ঘুরিতেছে—জীবনকে ঘুরাইতেছে।

শৈশবের নির্জ্জন দৃষ্টিতে ধরণীর যে আলোক ফুটিয়া উঠে, আজি জীবনমধ্যাহ্নে প্রত্যূষের সে প্রীতি কোথায় গেল! অনুত্তীর্ণ বাল্যের পরম সম্পদ ছিল একখানি হাসিভরা মুখ—প্রতিটি রেখা যার স্নেহ-সমাকুল, প্রতিটি আবেগ যার লালন-গৌরবে তটপরিপ্লাবী।

সেই শৈশব যেন একটি ক্ষুদ্র কক্ষ; মাতৃস্নেহের মাটির দীপ জ্বলিয়া অপরিণত আশা ও সসীম কামনাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিত। বিদ্যায়তনের পরিধিতে সে-কক্ষ হইল বৃহত্তর। মৃণ্ময় দীপ ঘুচিয়া লণ্ঠনের আলোয় আসিলেন বন্ধু। তারপর শহর। প্রদীপ গেল, লণ্ঠন গেল, বিজ্ঞানে বাঁধা পড়িয়া উপর হইতে নামিলেন বিজলী। সারা শহর বিদ্যুতে ভরিয়া গিয়াছে। মাটির প্রদীপের অন্তরালে মায়ের স্নেহ সত্যই কি মরিয়া গেল? না, স্মৃতিতে তিনি নবজীবন লাভ করিলেন? যাহার হাত ধরিয়া প্রথম যৌবনের জয়ধ্বনি গাহিয়াছিল সেই বন্ধুই বা কোথায়?

আজ দামিনীর দীপ্তিতে যে-সমস্ত আবেগ কেন্দ্রীভূত করিয়াছে—সে প্রিয়া। মাতৃ-অঙ্কের সুখশৈশব মরিয়াছে, কৈশোরাকাশের সুহৃদ্-সূর্য্যও অস্তমিত, রাত্রির রোমান্সে শশী-সৌন্দর্য্যে প্রিয়ার আবির্ভাব; চারি পাশে নক্ষত্ররূপী পুত্রকন্যা। আকাশের অবকাশ কোথায়? উদয়গিরির বর্ণচ্ছটায় সে অনুরঞ্জিত হইবে না, অস্তসমারোহেও তাহার স্থান নাই। ঐ ধোঁয়া, ঐ বদ্ধতা, ঐ কোলাহল। অথবা এই বর্ত্তমান।

"আহা-হা—! সব ফেলে দিলেন যে?"

ডাক্তার সে হুঁস নাই। যে দুঃখ এক দিন অগ্নির স

দগ্ধ করিয়াছিল, আজ নাই। বিশ্বের হিত? নিজের মঙ্গল-মূলে যে জল ঢালিতে না পারে সে সাধিবে বিশ্বের হিত? হাসি পায়। একটি ঘণ্টা পরের ঘণ্টার মুখ চাহিয়া আসে না। সময় ও স্রোতস্বিনী ছুটিয়াছে। অসংখ্য দেশকে ছুঁইয়া সৌন্দর্য্য বিলাইয়া ভ্রূকুটি করিয়া ছুটিয়াছে। সে কি বদ্ধ গহ্বরে গহিন লালদায় গতি সংহত করিয়াছে?

আশ্চর্য্য-হাতের রক্তরেখায় যে-অক্ষর আঁকা প্রাণের স্পন্দন সেখানে আজ কোথায়?

মায়ের স্মৃতি সে ভুলে নাই, ভুলিবে না। কিন্তু সেই স্মৃতির ধ্যান করিয়া জীবনযাপন মৃত্যুর মতই বর্ণস্বাদহীন নহে কি? সে বাঁচিয়া আছে—এইটিই ত পরম সত্য।

আপিসের ত্রিতল গৃহে উপরিতন কর্ম্মচারীর তাড়না খাইয়া এই ত ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে তাহার একটুও দুঃখ হয় নাই। প্রত্যহের পাওনার মতই সে ভ্রূকুটি বা শাসন সহজ হইয়া গিয়াছে। লালদীঘি হইতে মাণিকতলার এই জনবহুল সুদীর্ঘ পথ যেমন সহজ। তেমনই সহজ বদ্ধ ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার প্রাণান্তকর ধোঁয়া, দৈনন্দিন দুঃখ, অভাব অভিযোগ!

জীবন যেন নদ। সমুদ্র অভিমুখী আবর্ত্তসঙ্কুল উগ্রগতি নদ। যে জনপদ বন্দর দিয়া বন্দনা করিবে সেইখানেই সে বাণিজ্যের বেসাতি বসাইবে। যে জনপদ অনন্তবিস্তারী রুক্ষ মাঠ মেলিয়া ধরিবে, সে দানের বঞ্চনা তাহারই। মানুষ একটি মুহূর্ত্তের নহে, প্রতিটি মুহূর্ত্তের আয়ু তার নিঃশ্বাস-তরঙ্গে।...বৃথা জামার আস্তিন গুটাইয়া শুষ্ক রক্তলেখার পানে চাহিয়া নিঃশ্বাস ফেল কেন? ওই বন্ধুত্ব অবসর-মুহূর্ত্তের বিলাস হইয়া থাক্।—হাঁ, কাল—কালই আসিও। বেশে, প্রসাধনে নবীন হইয়া মুখের কথায় অতীতকে অজস্র ধারে উচ্ছ্বসিত করিয়া পুরাতন স্মৃতির রোমন্থন করিও। একফোঁটা অশ্রু, কতকগুলি দীর্ঘনিঃশ্বাস, কিছু বা হাসি, সামান্যতর কোলাহল! কাল, কালই ভাল। আজ পায়ের গতি দ্রুত কর। সন্ধ্যা বহুক্ষণ আসিয়াছেন। ধোঁয়ায় সে বাড়ি ভরিয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে তার গাঢ় অনুভব। তোমার হাতের অতগুলি জিনিষ সেখানে আনন্দের শ্রাবণধারায় ঝরিয়া পড়িবে। তুমি আকাশাংশের পানে চাহিও না, আলোর পানেও না, শুধু চল দ্রুত, আরও দ্রুত। আরও।

জামার হাতাটা ঝুলাইয়া শম্ভু জিনিষগুলি তুলিয়া লইল।

ছুটি কথা

শ্রীবীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

যে-ফুলে রয়েছে মধু—
সে-ফুল চুমিয়ো।
পথ চলিবার আগে—
পাথেয় গুণিয়ো॥

মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম বিচার—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বলদেবপ্রসাদ পাণ্ডেয় যোগশাস্ত্রী, মৈয়া, শান্তি-আশ্রম, মুর্শিদাবাদ। ৬১ পৃঃ মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

গ্রন্থকারের স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার নিকট পুনর্জ্জন্ম বিষয়ক আলোচনা শুনিতে চান; এবং তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই এই পুস্তিকাখানি সমাপ্ত হয়, কিন্তু অর্থাভাবে ছাপা হইতে একটু দেরি হয়। তারপর, গ্রন্থকারের শিষ্য 'চারুচরিত্র,' 'নম্রমূর্ত্তি', 'পুণ্যব্রত' শ্রীমান্ কালিদাস পালের অর্থসাহায্যে উহা মুদ্রিত হয় (পৃষ্ঠা ।০)।

পুত্রশোকাতুর পিতা শোকাপনোদনের জন্য যেখানে শাস্ত্রচর্চ্চা করেন, সেখানে হয়ত তিনি সমালোচকের নিকটও কতকটা সহানুভূতি আশা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকাশিত গ্রন্থ কি অবস্থায় লিখিত হইয়াছে তাহা শুনিয়া সমালোচকে উহার মূল্য নিরূপণ করা উচিত কি-না সন্দেহ। এই বইয়ের লেখক কতকগুলি সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়া আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য দর্শনে যে পুনর্জ্জন্ম স্বীকৃত হয় নাই, তাহার বিরুদ্ধেও যুক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা প্রশংসনীয়, কিন্তু সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শুধু শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রশ্ন মীমাংসার যুগ চলিয়া গিয়াছে, এই কথাটা গ্রন্থকারের মনে রাখা উচিত ছিল। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের মতই হউক কিংবা এক-কালজ্ঞ আধুনিক কাহারও মতই হউক,—অন্যের মত উদ্ধৃত করার নাম যুক্তি নয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পথের পথিক—শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

এখানি উপন্যাস। একদল নিতান্ত স্বর্গের দেবতা আর একদল একেবারেই নরকের কীট—এই চরিত্রবৃন্দ। মাঝখানের পৃথিবীর মানুষকে কোথাও বড়-একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

একটু বৈচিত্র্য ফুটিয়াছে শেষের দিকে, যেখানে দুঃখক্লিষ্ট নায়িকা সারা পৃথিবীর উপর অভিমানভরে, বন্ধুর সমবেদনায়-বাড়ান হাতটি প্রত্যাখ্যান করিল। বাকীটা সব একটানা স্রোত। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ বেশ ভাল।

বধূ—শ্রীভারতকুমার বসু প্রণীত। নিউ ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী, ২৫।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

একটি ছোট অনাড়ম্বর সংসারের সুখদুঃখ মান-অভিমান লইয়া উপন্যাস। মোটের উপর একটি স্নিগ্ধতা আছে বটে, তবে একটি দোষ বড় চোখে ঠেকে,—তাহা এই যে অধ্যায়গুলি বড়ই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন; এক এক জায়গায় নেহাৎ যেন খণ্ডিত ঘটনার তালিকা পড়িয়া যাইতেছি বলিয়া মনে হয়। ছাপা, বাঁধাই চলনসই।

হরগৌরী—শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়, বি-ই, সি-ই, এম্-আর-স্যান্-আই—প্রণীত। প্রকাশক কালীপদ সিংহ, এম্-এ। ৩২৮, রাসবিহারী এভিনিউ।

চার অঙ্কের পৌরাণিক নাটক; অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। দক্ষযজ্ঞের সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া যজ্ঞস্থলে সতীর দেহত্যাগ, আবার হিমালয়কন্যা উমারূপে শিবের সহিত বিবাহ—এই নাটকের বিষয়বস্তু। আজকাল অবশ্য লোকে সাতকাণ্ড রামায়ণ আর অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত এক বৈঠকে নাটকাকারে দেখিয়া আসিতেছে তবু বলিতেই হয়, দুইটি নাটকের মালমসলা একটিতেই ঠাসিয়া দেওয়ায় নাটকের মর্য্যাদা নষ্ট করা হইয়াছে। দেবীর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বাভাবিক যতি বা বিরাম আছে, এইখানে মনের একটি রসতৃপ্তি ঘটে; ইহার পর আবার তাহাকে উমার বিবাহ দেখাইতে গেলে নাট্যকারের নিজের উদ্দেশ্যই এক দিক দিয়া বিফল হয়।

লেখকের ছন্দে হাত এখনও একটু কাঁচা আছে, এবং হাস্যরসসৃজনে আর একটু সংযম রক্ষা করিলে ভাল হয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শরীর সামলাও—শ্রীজগৎকান্ত শীল প্রণীত। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থকার স্বয়ং একজন সুনিপুণ মুষ্টিযোদ্ধা। কিন্তু তিনি কেবল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসম্পদ লাভকেই যথেষ্ট মনে করেন না আমাদের দেশের বালক, যুবক ও প্রৌঢ়ের মনেও যাহাতে নিয়মিত ব্যায়ামানুশীলন-স্পৃহা জাগে, তাঁহাদের অপরিপুষ্ট, দুর্ব্বল দেহ যাহাতে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ হয়, প্রাণশক্তিতে তাঁহারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠেন, সে-বিষয়েও সবিশেষ যত্নবান। এতদুদ্দেশ্যে তিনি এই সুন্দর পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সহজ ভাষায় শরীরগঠনবিষয়ক নানা কার্য্যকরী উপদেশ ও সেগুলিকে আরও স্পষ্ট করিতে অনেকগুলি চিত্রে পরিপূর্ণ। ইহার উপদেশমালা নিয়মিত পালন করিলে অনেকেই যে স্বাস্থ্যসম্পদ লাভ করিবেন, ক্রমে জাতির একটি পরম দৈন্য বিদূরিত হইবে, ইহাতে আমরা নিঃসন্দেহ।

মোটা বোর্ডে বাঁধানো, ছাপা ও কাগজ ভাল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সমাজ-বীণা—শ্রীঅধরচন্দ্র ঘটক প্রণীত।

কবিতাগুলির উদ্দেশ্য সমাজের উদ্বোধন করা। গ্রন্থকার বর্ণাশ্রমের শাসনকে চূর্ণ করিবার জন্য জাতিভেদের বুকে লাথি মারিতে বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ব্যক্তিগণের এ বইখানি মন্দ লাগিবে না, কারণ এই ছোট বইখানি আগাগোড়া ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। কবিতার ছন্দ কাঁচা। ছাপা ও কাগজ বিশ্রী।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মোপাসাঁর গল্প—শ্রীননীমাধব চৌধুরী, এম-এ। মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা। ১৯৩৩

পাশ্চাত্য সাহিত্যের ইতিহাসে মোপাসাঁর নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত। অনুবাদক মহাশয় মোপাসাঁর আটটি গল্প বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন; ইহাদের মধ্যে সাতটি ইতিপূর্ব্বে 'ভারতী' ও 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ দুরূহ ব্যাপার এবং গ্রন্থ যত উৎকৃষ্ট হইবে তাহার অনুবাদ ততই কঠিন হওয়ার কথা। গল্পগুলির নির্ব্বাচনে রুচি ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় এবং মূল রচনার সৌন্দর্য্য যে অনুবাদের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহাতে অনুবাদক মহাশয়ের কৃতিত্ব বলিতে হইবে। শেষের গল্পটি কথ্য ভাষায় নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কোনও হানি হয় নাই; রসবোধের দিক হইতে বাংলা-রচনায় লেখ্য ও কথ্য ভাষার প্রভেদ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা রচনা-কৌশলে দূর হইয়াছে। 'মোপাসাঁর গল্প' বাংলা অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সাম্যবাদের গোড়ার কথা—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। আত্মশক্তি লাইব্রেরী, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা। ।/০ + ১২০ পৃষ্ঠা।

বার্ণাড শ-র An Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism বইখানি যেমন প্রাঞ্জল তেমনই সরস। বর্ত্তমান লেখক উপরিউক্ত গ্রন্থখানিতে তাহারই সারভাগ আপন ভাষায় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবির ভাষা প্রাঞ্জল, কিন্তু বার্ণার্ড-শ'র পুস্তকে মুদ্রানীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির সম্বন্ধে যে-সকল অত্যন্ত জটিল বিষয়ও সরলভাবে আলোচিত হইয়াছে, এই পুস্তকে সেগুলির প্রতি ঠিক তেমন সুবিচার করা হয় নাই। মূল গ্রন্থে ভাব অপেক্ষা বুদ্ধি যেমন বেশী স্থান পাইয়াছে, কবির গ্রন্থে তাহার পরিবর্ত্তে বুদ্ধি অপেক্ষা ভাবের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য তাহাতে সাম্যবাদের জটিল তত্ত্বগুলি অনেকাংশে বাদ পড়িয়াছে।

তাহা সত্ত্বেও মনে হয় যে হয়ত এমন গ্রন্থেরও প্রয়োজন আছে। জাতির বর্ত্তমান দুঃখের যুগে, মানুষ যখন নিজের হাতে-গড়া দুঃখকেও বুদ্ধির আলস্যে ভগবানের দেওয়া দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, তখন হয়ত তাহাদের জাগ্রত করিতে হইলে প্রথমে ভাবের দিকেই জোর দেওয়া দরকার। সেইজন্য এই পুস্তকখানির যাহাতে প্রচার হয় আমরা তাহা কামনা করি।

বইখানির দাম কিছু বেশী হইয়াছে। এত সুন্দর বাঁধাই সংস্করণের পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত কম দামে কোনও সুলভ সংস্করণ বাহির করিলে প্রচারের দিক হইতে হয়ত আরও ভাল হইত।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

আমীর আলী—মুহম্মদ হবীবুল্লাহ, বি-এ প্রণীত। "বুকসেলফ" খান বাহাদুর ভবন "তামাকুমুণ্ডি" চট্টগ্রাম, মূল্য ॥০ আনা, পৃ. ৪৮।

লেখক ভাষার দোষে ও অনুপ্রাসের ব্যর্থ চেষ্টায় আমীর আলীর জীবনী লিখিতে সমর্থ হন নাই। বইখানিতে তথ্য অপেক্ষা লেখকের কথ্য বেশী হইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বেদসার—শ্রীদীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী, বেদোপদেশক, বঙ্গ-আসাম আর্য্য প্রতিনিধি সভা। ৩১ মুক্তারাম রো, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা দুই আনা। আকার ডবল ক্রাউন ষোলপেজী—/০—॥০ + ১ —১৯৬।

বৈদিক মন্ত্র ও প্রার্থনাদির সংগ্রহাত্মক একাধিক গ্রন্থ আজকাল বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যাদির সহিত প্রচারিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। সমালোচ্যমান গ্রন্থখানিও এই জাতীয় একখানি গ্রন্থ। ইহাতে সর্ব্বসমেত চারি শত বৈদিক মন্ত্র বিষয়বিভাগানুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সকলগুলি মন্ত্রেরই আকরের সূচনা, প্রতি পদের অর্থ ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। অনুবাদকার্য্যে সর্ব্বত্র পূর্ব্বাচার্য্য প্রচলিত অর্থের অনুসরণ না করিয়া দয়ানন্দ সরস্বতী মহোদয় প্রবর্ত্তিত অভিনব ভাষ্য অবলম্বিত হইয়াছে। দুই-এক স্থলে (পৃঃ ১৩৮-৪০) তুলনার জন্য সায়ণভাষ্য ও তাহার অনুবাদও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই অনুবাদ ভাষ্যানুগত না হইয়া ভাষ্যবিরোধী হইয়াছে। এইরূপ বিকৃতি গ্রন্থকারের স্বেচ্ছাকৃত কি অনবধানতাপ্রযুক্ত তাহা বলিতে পারি না। তবে আমাদের মনে হয়, গ্রন্থকারের ব্যাখ্যার সহিত সর্ব্বত্র সায়ণানুমোদিত অর্থের নিখুঁত অনুবাদ থাকিলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে অর্থ নিরূপণ বিষয়ে বিশেষ উপকার হইত। গ্রন্থের সংস্কৃত অংশে অনেক মুদ্রাকরপ্রমাদ দেখিতে পাওয়া যায়। যে-সকল স্থলে পদচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য, সেরূপ বহুস্থলে পদচ্ছেদ করা হয় নাই। এজাতীয় গ্রন্থে এরূপ প্রমাদ সর্ব্বথা পরিহার্য্য। মন্ত্রগুলির বিষয়বিভাগ তেমন সন্তোষজনক ও সুবোধ্য হয় নাই। গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। দেশের প্রাচীন চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রার সহিত আধুনিক সম্প্রদায়ের পরিচয় ও যোগস্থাপনের জন্য এ-জাতীয় গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

রাজা রামমোহন—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ইউ এন ধর এণ্ড কোং, ৫৮ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ও ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

বত্রিশ বৎসর বয়সে অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। রসগ্রাহী সুনিপুণ কাব্যসমালোচকরূপে তিনি ঐ বয়সেই সুপরিচিত হইয়াছিলেন। জীবন-চরিত রচনাতেও তাঁহার কৃতিত্ব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী রচনায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তিনি আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সাহায্যে ও উপদেশ অনুসারে রামমোহন রায়ের একখানি বৃহৎ জীবনচরিত ইংরেজীতে লিখিতেছিলেন। তাহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। যতটুকু লিখিয়াছিলেন, তাহাও হারাইয়া গিয়াছে। রামমোহন সম্বন্ধে তিনি ছোটখাট যে-সব প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা এই পুস্তকখানিতে সংগৃহীত হইয়াছে। রচনাগুলির নাম রাজা রামমোহন রায়, রাজা রামমোহনের স্বরূপ, এবং রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ। রামমোহন রায়কে বুঝিবার ও চিনিবার এবং রামমোহনের যুগকে বুঝিবার পক্ষে এই সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধগুলি বিশেষ সাহায্য করিবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে বুঝিবারও সুবিধা হইবে। পুস্তকখানি ভাল কাগজে বড় অক্ষরে সুমুদ্রিত। ইহাতে রামমোহনের, দেবেন্দ্রনাথের এবং লেখকের তিনটি ছবি আছে।

প্রাচীন কীর্ত্তি—আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার, এম্-এ, ডি-ডি প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী, এম-এ, সম্পাদিত। সচিত্র। মূল্য আট আনা। ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

ইহাতে ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরি, ত্রিচিনপল্লী, মালব, তক্ষশিলা, তাজমহল, আগ্রার মোগল প্রাসাদ, খাসমহল, সিকন্দারা, ফতেপুর সিক্রী (১), ফতেপুর সিক্রী (২), ইৎমাৎউদ্দৌলা, আম্বের রাজপ্রাসাদ, দিল্লী (১), দিল্লী (২), দিল্লী (৩)—এই প্রবন্ধগুলি আছে। বালক-বালিকারা এই বইটি হইতে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবে, অধিকবয়স্কদেরও ইহা পাঠের যোগ্য। ভাল কাগজে ছাপা। পুরস্কার দিবার উপযোগী।

জীবনীগুচ্ছ—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য যথাক্রমে আট আনা ও এক টাকা। আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী সম্পাদিত। ২১১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা কেবল বিদেশী বিখ্যাত লোকদের জীবনচরিত হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, দেশী লোকদের জীবনচরিত হইতে কিছু শিখিতে পারে না, ইহা যেমন সত্য নহে, তেমনি ইহাও সত্য নহে যে, কেবল দেশী লোকদের জীবনীইতাহাদের পঠনীয় ও তাহা হইতেই তাহারা শিক্ষা পাইতে পারে। দেশী ও বিদেশী সকল রকম জীবনী হইতেই জ্ঞান লাভ, নৈতিক উপদেশ ও আনন্দ পাওয়া যায়। স্বর্গীয় হেমচন্দ্র সরকার 'জীবনীগুচ্ছে'র দুই ভাগে চল্লিশ জন বিদেশী পুরুষ ও মহিলার জীবনী গল্পের মত করিয়া বলিয়াছেন। বহি দু-খানি ছেলে-মেয়েদের হাতে দিলে তাহারা পড়িয়া প্রীত ও উপকৃত হইবে। বহি দুখানি সচিত্র। ছাপা ও কাগজ ভাল। পুরস্কার দিবার উপযোগী।

নানা প্রবন্ধ—২য় ভাগ। আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য লেখা নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

ইহাও বালকবালিকাদের উপযোগী ভাল বই। ছাপা ও কাগজ ভাল।

মেরু প্রদেশ—আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী সম্পাদিত। মূল্য লেখা নাই। প্রাপ্তিস্থান সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ কার্য্যালয়, কলিকাতা। ছবি আছে। ছাপা ও কাগজ ভাল।

উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর এবং তথাকার মানুষদের বিবরণ, কি প্রকারে ঐ সব ভূখণ্ড আবিষ্কৃত হইল, ইত্যাদি বড়ই কৌতুকাবহ ব্যাপার। বালকবালিকারা আগ্রহের সহিত পড়িবে।

আচার্য্য হেমচন্দ্রের এই সমুদয় বহি নির্ভয়ে বালকবালিকাদের হাতে দেওয়া যায়। এ-গুলিতে জ্যাঠামি নাই, অথচ এগুলি উপদেশপূর্ণ নীরস বক্তৃতাও নহে।

জীবনতরঙ্গ—আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী সম্পাদিত। কাপড়ে বাঁধান। ৩৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য লেখা নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

স্বর্গীয় আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার আত্মজীবনী যতটুকু লিখিয়াছিলেন তাহা আছে এবং বাকী, পুস্তকের অধিকাংশ, তাঁহার দৈনন্দিন লিপি অর্থাৎ ডায়েরী। তাঁহার পালিতা বিদুষী কন্যা পিতৃভক্তিমতী শকুন্তলা ইহা এবং অন্যান্য বহিগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন। এই "জীবনতরঙ্গ" প্রাপ্ত-বয়স্ক ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিদের ভাল লাগিবে। তাঁহারা ইহা পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

কবি ও কাব্যের কথা—স্বর্গীয়া লাবণ্যপ্রভা সরকার প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী সম্পাদিত। মূল্য লেখা নাই। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। ছাপা ও কাগজ ভাল।

স্বর্গীয়া লাবণ্যপ্রভা সরকার বিদুষী ও সুলেখিকা ছিলেন। তাঁহার লিখিত কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, দীনবন্ধু মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং তাঁহার স্বামী স্বর্গীয় হেমচন্দ্র সরকারের লেখা রবার্ট ব্রাউনিং ও আলফ্রেড টেনিসনের সাহিত্যিক পরিচয় এই বহিখানিতে আছে। ইহা অল্পবয়স্ক ও অধিকবয়স্ক স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর পড়িবার উপযোগী ভাল বহি ত বটেই, যাঁহারা ছাত্রাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন ইহা তাঁহাদেরও অধ্যয়নের উপযুক্ত।

পৌরাণিক কাহিনী—তৃতীয় ভাগ (গ্রীক পুরাণ)। স্বর্গীয়া লাবণ্যপ্রভা সরকার প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী সম্পাদিত। মূল্য আট আনা। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। ছবি আছে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

গ্রীক পুরাণের চৌদ্দটি মনোহর আখ্যায়িকা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলি সরল সরস ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় শব্দকোষ—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। প্রথম ভাগ, একাদশ খণ্ড। শান্তিনিকেতনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৷৷০, ডাকমাশুল ⁄০।

প্রথম ভাগ, একাদশ খণ্ডে "আওয়াজ" হইতে "আগ্রহায়ণ" শব্দগুলির অর্থ প্রভৃতি আছে।

এই অভিধানের পরিচয় গত কোন কোন সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছে।

চ।
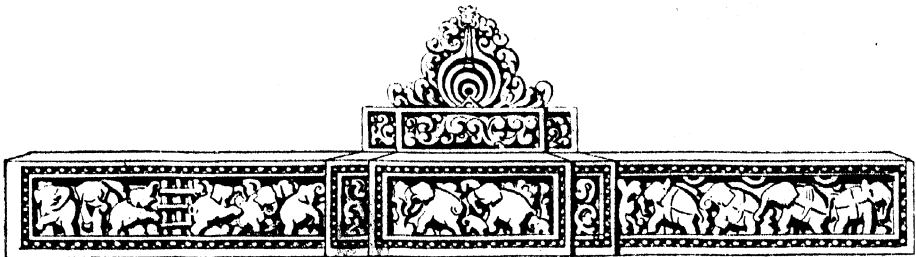
লুই পাস্তয়র ও তাঁহার গবেষণা

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ডি-এস্‌সি

১

লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে বৈজ্ঞানিক তাঁহার পরীক্ষাগারে যে-সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করেন, তাহা চিরস্থায়ী এবং সমস্ত মানব তাহার ফল ভোগ করে। যে-সকল স্বনামধন্য মনীষী নিজেদের ঐকান্তিক সাধনা বলে জগতের বিজ্ঞান-ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাশি সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, মানুষ যুগযুগান্তর ধরিয়া তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দান করিতেছে। লুই পাস্তয়র ইঁহাদেরই অন্যতম।

১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ফ্রান্সের অন্তর্গত ডোল্ নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে পাস্তয়রের জন্ম হয়। পাস্তয়রের পূর্ব্বপুরুষগণ

লুই পাস্তয়র

চর্ম্মব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার পিতা জিন্ যোসেফ্ বংশানুগত চর্ম্মকারের বৃত্তি অবলম্বন করেন, কিন্তু নেপোলিয়নের রাজত্ব কালে প্রায় তিন বৎসর 'তৃতীয় সৈনিকবিভাগে' সৈনিকের কার্য্য করিয়া সম্রাট কর্ত্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মানিত হন। পাস্তয়রের শৈশবকালে জিন্ যোসেফ্ আর্‌বোয়া শহরে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন এবং এই স্থানেই পাস্তয়রের প্রথম বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি প্রথমে একোল্ প্রিমিয়ারে এবং পরে আর্‌বোয়া কলেজে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। কলেজের পরীক্ষায় পদক, পুরস্কার প্রভৃতি লাভ করা সত্ত্বেও শিক্ষকের মনে 'তিনি ভাল ছাত্র' বলিয়া দৃঢ় ধারণা ছিল না—কারণ তিনি কোন বিষয়ই তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করিতে পারিতেন না। পাস্তয়রের সদাই ইচ্ছা হইত যে তিনি প্যারীর বিখ্যাত একোল্ নর্ম্যাল্ (Ecole Normale) নামক প্রথিতনামা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া সেখানকার প্রথম উপাধি পরীক্ষায় (bacclaureat—Bachelor's degree) কৃতকার্য্য হন। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার এই সুযোগ ঘটে এবং তিনি এক বন্ধুর সহিত প্যারীতে উপস্থিত হন। কিন্তু বাল্য সুখস্মৃতি-জড়িত গ্রাম হইতে শহরের বিলাসভূমিতে আসিয়া তাঁহার অত্যন্ত মনঃকষ্ট হয়—এবং তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও প্যারীর আবহাওয়া তাঁহার সহ্য হইল না—সুতরাং বাধ্য হইয়াই একোল্ নর্ম্যালে বিদ্যালাভ করার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পুনরায় স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। প্যারীতে শিক্ষালাভের আশা সুদূরপরাহত দেখিয়া তিনি দুই বৎসর পরে পিতার অনুমতিক্রমে আর্‌বোয়া হইতে পঁচিশ মাইল দূরে বেসাকোঁ (Besacon) কলেজে শিক্ষা লাভ করিতে যান এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই অতিরিক্ত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া আহারাদির ব্যয় ব্যতীত প্রতি বৎসর তিন শত ফ্রাঙ্ক বৃত্তিলাভ করেন। এই সময়ে তিনি কি প্রকার পরিশ্রম করিতেন তাহা তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর নিকট লিখিত এক পত্র হইতে জানা যায়।

"তোমরা পরস্পরকে ভালবাসিবে এবং অলস হইবে না। একবার কাজ করার অভ্যাস হইয়া গেলে বিনা কাজে বসিয়া থাকা যায় না। আর জানিও যে পৃথিবীর সমস্তই মানুষের কর্ম্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে।"

এইখানে শার্ল শাপুই (Charles Chappuis)এর সঙ্গে

পাস্তুয়রের আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা নিজেদের ভবিষ্যতের জীবনধারা নিরূপণ করেন। শার্ল শাপুই একোল্ নর্ম্যালে প্রবেশ লাভ করার এক বৎসর পরে পাস্তুয়রও সেইখানে ভর্ত্তি হন। বাইশ বৎসর বয়সে পাস্তুয়র সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তিনি পরীক্ষায় খুব উচ্চ স্থান লাভ করেন নাই এবং পরীক্ষকগণ তাঁহাকে রসায়ন শাস্ত্রে মাঝারি রকম (moderate in chemistry) বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতঃপর পাস্তুয়র তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক এবং ব্রোমিন্ (Bromine) নামক মৌলিক পদার্থের আবিষ্কর্ত্তা এম্ বালার্ড (M. Balard)এর সহকারী নিযুক্ত হন। স্ফটিক-তত্ত্ব (crystallography) সম্বন্ধে বিশেষ অনুরাগ থাকায় তিনি ঐ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং সর্ব্বপ্রথম সফলতা লাভ করেন। তিন্তিড়িকাম্ল (Tartaric acid) হইতে উদ্ভূত একটি যৌগিক পদার্থের স্ফটিক (Sodium ammonium tartrate) লইয়া গবেষণা করিবার সময় তিনি আবিষ্কার করেন যে, এই যৌগিক পদার্থের মধ্যে দুই প্রকারের স্ফটিক বর্ত্তমান আছে।* উক্ত দুই প্রকারের স্ফটিক আলোকরশ্মির দিক পরিবর্ত্তন করে (optical rotation)। আলোকতত্ত্ব ও স্ফটিকতত্ত্ব সম্বন্ধে তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ ব্যক্তি এম্ বিয়ো (M. Biot)এর নিকট এই আবিষ্কারের বিষয় জ্ঞাপন করা হইলে তিনি পাস্তুয়রকে পুনরায় ঐ পরীক্ষার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতে বলিলেন। পাস্তুয়র পুনরায় ঐ পরীক্ষা করিলে বিয়ো দেখিলেন যে, পাস্তুয়রের সিদ্ধান্ত সত্য সত্যই নির্ভুল। বিয়োর জীবন-ব্যাপী সাধনা আজ পাস্তুয়রের পরীক্ষা দ্বারা জয়যুক্ত হইল। তিনি আনন্দের আবেগে পাস্তুয়রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "প্রিয় পাস্তুয়র, আমি সারাজীবন বিজ্ঞানকে এত অধিক ভালবাসিয়াছি যে, তোমার এই আবিষ্কার আমার হৃদয়কে বিচলিত করিয়াছে।" তখন পাস্তুয়রের বয়স মাত্র পঁচিশ কি ছাব্বিশ বৎসর।

এই সময়ে পাস্তুয়রের যশঃ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দিজঁ লিসেতে (Dijon lycee) পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। এই পদে অবস্থান কালে তাঁহার গবেষণাকার্য্যে বিশেষ বিঘ্ন ঘটে। এই জন্য বিয়ো ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষগণ ধারণা করিতে পারে না যে, গবেষণাকার্য্য সকল কার্য্যের উপরে।"

বাস্তবিক দেখা গিয়াছে যে, অনেক সময়ে যাঁহারা আজীবন মৌলিকতত্ত্বে নিমগ্ন থাকিয়া বহু গূঢ় রহস্যের আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহাদিগকে কোনও বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিলে নানাপ্রকার কার্য্য পরিচালনায় ব্যাপৃত থাকিতে হয় এবং অনেক চিঠিপত্র লেখালেখি করিতে হয়। এইরূপ ধরাবাঁধা কাজে অনেক মহামূল্য সময় অপচয় হয়। এই কারণে পাস্তুয়রের মহামূল্য গবেষণাকার্য্যে বিঘ্ন জন্মে।

কিছুকাল পরেই বন্ধুবান্ধবের চেষ্টায় পাস্তুয়র ষ্ট্রাস্‌বুর্গ (Strasbourg)এ রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং এই স্থলে তাঁহার গবেষণাকার্য্যে সুবিধা ঘটে।

এই সময়ে ষ্ট্রাস্‌বুর্গ একাডেমীর অধ্যক্ষ ছিলেন এম্ লোরাঁ (M. Laurent)। তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত পাস্তুয়রের

গবেষণাগারে পাস্তুয়র

ঘনিষ্ঠতা হয় এবং কিছুদিন পরে তিনি অধ্যক্ষের কন্যা মারি লোরাঁর গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন।

* তিন্তিড়িকাম্ল তেঁতুলের মধ্যে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

পাস্তুয়রের দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে তাঁহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু লিয়াছেন যে, মারি লোরা কেবল গৃহিণী ছিলেন না, গবেষণা-কার্য্যেও তিনি পাস্তুয়রের প্রধান সাহায্যকারিণী ছিলেন। ন্ধ্যাকালে পাস্তুয়র তাঁহার দৈনিক কার্য্যাবলী বলিয়া যাইতেন এবং তাঁহার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী সেই সমস্ত একত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া পাস্তুয়রকে উহা ব্যাখ্যা করিতে বলিতেন। ইহাতে পাস্তুয়রের এই সুবিধা হইত যে, ঐগুলি ব্যাখ্যা করিবার সময়ে তাঁহার মনে নূতন নূতন চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইত এবং গবেষণাকার্য্য সত্যপথে পরিচালিত করিবার শক্তি সঞ্চার হইত। তাঁহার দাম্পত্যজীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের না হইলে পাস্তুয়র এক জীবনে এত লোকহিতকর কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন কি-না সন্দেহ।

এই সময়ে তিন্তিড়িকাম্ল সম্বন্ধে গবেষণা সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টি অন্য দিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি 'সন্ধান' বা 'গাঁজন প্রক্রিয়া' (fermentation) সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়েন এবং সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সুযোগও জুটিয়া যায়। তিনি এই সময়ে লিল্ (Lille) নগরে বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লিলের বিজ্ঞান সমিতিতে দুগ্ধাম্ল (lactic acid)* 'সন্ধান' বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান। এই প্রবন্ধের বক্তব্য আমাদের কাছে বিশেষ বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তৎকালে এই নূতন মতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। ক্রমাগত বিশ বৎসর পরীক্ষার পর পাস্তুয়র হার মত প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং দীর্ঘ বিরোধ অবসানের দ সকলেই স্বীকার করিলেন যে, জীবাণু ব্যতীত 'সন্ধান' না।

তাঁহার প্রিয় শিক্ষা-মন্দির একোল নর্ম্যালের দুরবস্থা খিয়া তিনি স্বহস্তে ইহার বিজ্ঞান শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। সময়ে কতকগুলি পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য তাঁহার বেষণাকার্য্যের সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। মাত্র ছেচল্লিশ বৎসর স তিনি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার বন্ধুবান্ধব লেই ভাবিলেন যে, এইবার তাঁহার কর্ম্মজীবনের অবসান ঘটিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় পাস্তুয়র আরোগ্য লাভ করেন এবং কিছুকাল পরেই গুটীপোকার সংক্রামক রোগের দুইটি জীবাণু আবিষ্কার করিয়া তাঁহার প্রিয় মাতৃভূমির নষ্টশিল্পের পুনরুদ্ধার করেন।

এইখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, পাস্তুয়রের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ফরাসী দেশে লিয়ঁ (Lyons) নামক স্থানে কোটি কোটি টাকার রেশমের ব্যবসা হইতেছে। জাপানও এই উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রেশমের ব্যবসায়ে প্রভূত লাভবান হইতেছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে রেশমশিল্প প্রায় লুপ্ত হইবার উপক্রম হইতে চলিল, কিন্তু তথাপি আমাদের দেশের লোকের চোখ ফুটিল না। আমাদের দেশের রেশমশিল্প উন্নত করিতে হইলে বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক।

তৎকালে কোন যুদ্ধের সময়ে শত শত পীড়িত এবং আহত ব্যক্তি উপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাবে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতালগুলির উন্নতির কথা

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

* দধি তৈয়ার করিবার সময় দুধে যে দম্বল দিতে হয় তাহাতে এক র জীবাণু থাকে। এই দম্বল দেওয়ায় জীবাণুর প্রসার বৃদ্ধি হয় এই কারণে দুগ্ধ অম্লাক্ত দধিতে পরিণত হয়।

বলিতে গেলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা মনে পড়ে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত 'ক্রিমিয়ান্' যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এবং স্কুটারীতে (Scutari) যে সামরিক হাসপাতাল ছিল তাহার অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়।

মানুষের দুঃখ এবং যন্ত্রণা দেখিলে কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের হৃদয়ে অত্যন্ত করুণার সঞ্চার হইত এবং তিনি দেশের এই দুর্দ্দিনে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সাইত্রিশ জন শুশ্রূষাকারিণীর সহিত তিনি স্কুটারীতে উপস্থিত হন। এই সময় তিনি যেরূপ পরিশ্রম এবং সুচারুরূপে তাঁহার কর্ত্তব্য সমাধান করিয়াছিলেন, ইংরেজ জাতির ইতিহাসে তাহা চিরকাল স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি অস্ত্রোপচারের গৃহে উপস্থিত থাকিয়া নিয়ত আহত ব্যক্তিদিগকে সান্ত্বনা ও সাহসের কথা শুনাইতেন। রাত্রিকালে একটি প্রদীপহস্তে তিনি হাসপাতালের প্রতি গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং অনেক সময় হতভাগ্য আহত ব্যক্তিগণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি যে-সমস্ত পরিচর্য্যার নিয়মাবলী অবলম্বন করাইলেন তাহাতে হাসপাতালে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমিয়া গেল। তিনি আসিবার পূর্ব্বে মৃত্যুসংখ্যা শতকরা বিয়াল্লিশ জন ছিল, কিন্তু তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মৃত্যুসংখ্যা অবশেষে মাত্র শতকরা দুই জনে দাঁড়াইল। তাঁহার পরিশ্রমের প্রতিদানে কৃতজ্ঞ ইংরেজ জাতি চাঁদা তুলিয়া তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাত লক্ষ টাকা উপহার দেন, এবং তিনি সেই অর্থ দ্বারা সেণ্ট টমাস্ ও কিংস্ কলেজ হাসপাতালে শুশ্রূষাকারিণীদিগের শিক্ষার জন্য 'নাইটিঙ্গেল হোম' (Nightingale Home) প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান্ (Franco-Prussian) যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাতৃভূমির পরাজয়ে এবং লোকক্ষয়ে পাস্তয়রের মনে অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা প্রাণ দিয়াছে তাহারা বীরোচিত সম্মান লাভ করিয়াছে। কিন্তু যে সমস্ত সৈনিক সামান্য আহত হইয়া হাসপাতালে ক্ষতস্থান-বিষাক্ত (septic) হওয়ায় অসহায় ভাবে মৃত্যুর কবলে পতিত হয় তাহাদের জন্য পাস্তয়রের দয়ার্দ্র প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। পচন নিবারণের জন্য পাস্তয়র দেখাইলেন যে, মাংসের ঝোলকে উত্তপ্ত করিয়া জীবাণু-বিহীন বাতাসে (filtered air) রাখিয়া দিলে পুনরায় পচন হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যশরীরে পচন নিবারণ সম্বন্ধে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য নহে। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্য-বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক লিষ্টার পচননিবারক

জোসেফ লিষ্টার

চিকিৎসা প্রণালীর (antiseptic treatment) প্রবর্ত্তন করিয়া মনুষ্য জাতির অশেষ উপকার করিয়াছেন এবং এই সূত্রে জোসেফ লিষ্টার সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই বিখ্যাত ইংরেজ অস্ত্র-চিকিৎসক এসেক্সের অন্তর্গত আপটন্ (Upton) নামক স্থানে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জোসেফ জ্যাক্সন্ লিষ্টার যশস্বী বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জোসেফ লিষ্টার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এম, বি ও এফ, আর, সি, এস উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎকালে হাসপাতালে অনেক রোগী তাহাদের ক্ষতস্থানে পচনের জন্য মারা যাইত। লিষ্টার অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা এই পচনের কারণ নিরূপণ করিতে চেষ্টা আরম্ভ করেন। তিনি পায়েমিয়া (Pyaemia) নামক দুষ্ট

ব্যাধির কারণও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

লিষ্টারের কাজের প্রকৃত উপকারিতা বুঝিতে হইলে, আমাদের সেই সময়কার অস্ত্র-চিকিৎসার প্রণালী মোটামুটি জানা আবশ্যক। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অস্ত্র-চিকিৎসায় জ্ঞানলোপকারী বা বেহুঁস করিবার (anaesthetic) পদার্থের ব্যবহার আরম্ভ হইলে পর তৎকালীন অস্ত্র-চিকিৎসকগণ ক্লোরোফর্ম প্রয়োগের দ্বারা অধিকতর সাহস এবং দক্ষতার সহিত রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচার সমাধান করিতেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ রোগীরই ক্ষত স্থলে পচন আরম্ভ হইয়া প্রাণসংশয় হইত। সুতরাং তৎকালে হাসপাতালে অস্ত্র-চিকিৎসা করা ভয়ের ব্যাপার ছিল এবং লোকের শরীরের কোন স্থানে অস্ত্র-চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কেহ তৎকালীন অতি বিচক্ষণ অস্ত্র-চিকিৎসক দ্বারাও অস্ত্রোপচার করিতে সাহস করিত না।

লিষ্টার গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র চিকিৎসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া তাঁহার অধীনস্থ হাসপাতালগুলিতে এইরূপ পচনজনিত মৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক দেখিয়া ইহার মূল কারণ নির্ণয়ের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি রোগীর ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন এবং প্রত্যেক রোগীর নিকট তাহার ব্যবহারের জন্য পরিষ্কৃত তোয়ালে রাখিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এই সকল সতর্কতা সত্ত্বেও পচনের জন্য মৃত্যুসংখ্যা কিছুই কমিল না। এই সময়ে রোগের জীবাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধে পাস্তুরের অভিনব আবিষ্কার লিষ্টারের নিকট এক নূতন আলোক আনিয়া দিল। লিষ্টার প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, পচনের সহায়ক জীবাণুগুলি বাতাসে ভাসিয়া ভাসিয়া আসে। তখনকার দিনে কারবলিক এসিড জীবাণু ধ্বংসের একটি প্রধান ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইত। লিষ্টার ক্ষতস্থানে কারবলিক এসিডের প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে ফল এই হইল যে, ক্ষতস্থানের উপরে একটি পর্দ্দা পড়িয়া যাইত এবং ক্ষতস্থানও তাড়াতাড়ি শুকাইয়া আসিত। কিন্তু রোগীর শরীরে কারবলিক এসিড পোড়ার ভীষণ দাগ থাকিয়া যাইত এবং সেজন্য অস্ত্রোপচারের পক্ষে ইহা রোগীদের মনঃপূত ছিল না। ইহার পরে আরও গবেষণার পর লিষ্টার বুঝিতে পারিলেন যে বাতাসের জীবাণুগুলি ক্ষত স্থানের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর নয়। পচনকার্য্যের প্রধান সহায়ক হইতেছে চিকিৎসকের হাতের, এবং ছুরি, কাঁচি, ব্যাণ্ডেজ ও রোগীর পোষাক পরিচ্ছদের ময়লা। তিনি উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা এই সকল জিনিষকে জীবাণুবিহীন করিতে লাগিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তখন হইতেই উচ্চাঙ্গ অস্ত্র-চিকিৎসা-বিদ্যার উৎপত্তি। আজও পর্য্যন্ত সকল অস্ত্রোপচারে লিষ্টার প্রবর্ত্তিত পচননিবারক প্রণালী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অস্ত্র-চিকিৎসায় লিষ্টারের অমূল্য দান লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতেছে।

পুরোহিত

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মা বলিলেন—দিন যখন খারাপ তখন আজ যাওয়া হ'তেই পারে না। কিন্তু দিন খারাপ বলিয়া পৃথিবী ত তাহার কক্ষপথে নিয়মিত একটি আবর্ত্তন না দিয়া বসিয়া থাকিবে না এবং সে আবর্ত্তনে একটি দিবারাত্রি অতিক্রান্ত হইলেই বিমলের টেণ্ডার দিবার নির্দ্দিষ্ট দিনটি যে পার হইয়া যাইবে! সে উত্তপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—কে বললে যে দিন খারাপ? কোন্ মূর্খ বলেছে?

মা চোখ রাঙাইয়া বলিয়া উঠিলেন—দেখ বিমল লঘু গুরু মান্য ক'রে কথা ক'স্। দিন দেখেছেন ভটচায মশায়।

পুরোহিত যদু ভট্টাচার্য্য বিমলের বাপের বয়সী লোক। এ-বাড়িতে তাঁহার প্রতাপ অপ্রতিহত। বিমলের পিতা জমিদার পঞ্চানন রায় তাঁহার কথায় না-কি উঠিতেন বসিতেন। লোকে বলিত যদু ভটচায পঞ্চানন রায়কে 'বাঁদর নাচ' নাচাইত। এক সোনার তুলসীপত্র আর বিল্বপত্র একত্র করিয়া যদু ভটচাযের স্ত্রীর দশখানা ভারী ভারী গহনা হইয়াছে। একবার তাগা, একবার হার, একবার চুড়ি বার-বারের হিসাব মনে থাকে না, তবে মনে করিলেই মনে পড়িবে ইহা নিশ্চয়। বিমল মনে মনে ভটচাযের মাথা খাইয়া বলিল—আচ্ছা, যাই আমি ভটচাযের কাছে।

রাধাগোবিন্দজীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিয়া ভটচায চশমা-চোখে ঘাস ছিঁড়িতেছিলেন। বাঁধান আঙিনায় একটা ফাটল দেখা দিয়াছে, সেই ফাটল আশ্রয় করিয়া উঠিয়াছে ঘাস।

বিমল ডাকিল—এই যে ভটচায মশাই।

ভটচাজের চশমাটা ঝুলিতেছিল নাকের ডগায়। নাকের ডগাটা বিমলের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া ভটচায বলিলেন—বিমল! ভালই হয়েছে। তোমাকেই খুঁজছিলাম আমি। দেখ দেখি—উঠোনের ফাটটা—এটা মেরামত—

বাধা দিয়া বিমল বলিল—কি বলেছেন মাকে আপনি?

বিস্মিত হইয়া ভটচায বলিলেন—কি বলেছি?

—আমার জরুরি কাজ রয়েছে আর আপনি মাকে বলেছেন আজ দিন খারাপ—যাত্রা নাই।

ভটচায একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—তা কাজ যখন রয়েছে তখন যাত্রা না থাকলে চলবে কেন? চলে যাও তুমি আজ।

বিমল একটু নরম হইল, বলিল—কিন্তু মা যে—

—দাঁড়াও পাঁজিটা একবার দেখি। ভটচায উঠিয়া হাত-পা ঝাড়িয়া পাঁজি লইয়া বসিলেন। দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন—দুটো আটচল্লিশ মিনিটের পর তিনটের মধ্যে চলে যাও তুমি গোবিন্দ স্মরণ ক'রে। গমনে বামনশ্চৈব—বামনমূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা ক'রে বেরিয়ে পড়বে।

—বেশ লোক ত তুমি ভটচায ঠাকুরপো! বিমলকে যেতে বলছ তুমি? তবে যে আমাকে বললে আজকে দিন খারাপ যাত্রা হতেই পারে না।

মা কখন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন কেহ লক্ষ্য করে নাই। ভটচায নাকের ডগা আকাশে তুলিয়া তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—সে কথা ত মিথ্যে বলি নাই আমি। দেখ না পাঁজি—যাত্রা নাই আজ।

বিমলের মা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—তবে? তবে যে বিমলকে যেতে বলছ তুমি?

বিমল বলিল—এই যে বললেন আমাকে দুটো আটচল্লিশ মিনিটের পর তিনটের মধ্যে যাবে।

—হাঁ তা যাওয়া চলতে পারে। ভাল সময় ওটা। ঐ সময়টাতেই বেরিয়ে যেয়ো তুমি।

বিমলের মা রূঢ়ভাবে বলিয়া উঠিলেন—যাত্রা নাই ত বেরিয়ে যাবে কি রকম? তুমি কি পাগল হ'লে না কি?

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—ওর যে কাজের ক্ষতি হবে বলছে বৌঠাকরুণ।

গিন্নী বলিলেন—তা ব'লে অ-দিনে অ-ক্ষণে যাওয়া-আসা করে না-কি? তুমি বলছ কি?

ভটচায বলিলেন—ঠিকই বলছি বউ। বুঝিয়ে দিই তোমাকে। বিমল ব্যবসায়কর্ম্ম ত আজ থেকেই আরম্ভ করছে না। এ কর্ম্মে যাত্রা করেছে ও অনেক দিন আগেই—শুভদিন শুভক্ষণেই সে ও আরম্ভ করেছে। এটা হচ্ছে মধ্যপথে সেই যাত্রাতেই একটা ছোট যাত্রা আর কি। ধর না, যেমন তুমি শুভ দিন ক্ষণ দেখে যাত্রা করলে তীর্থে। পথে গাড়ী বদলের সময় পড়ল বারবেলা কি একটা খারাপ লগ্ন। সে ক্ষেত্রে গোবিন্দ স্মরণ ক'রে বামনমূর্ত্তি চিন্তা ক'রে যাত্রা করলেই দোষ খণ্ডন হয়ে যায়।

বিমলের হাসি পাইয়াছিল। অতি কষ্টে সে আত্ম-সংবরণ করিয়া রহিল। গিন্নী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—তা হ'লে তুমি অনুমতি দিচ্ছ ত?

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—হ্যাঁ আমি দিচ্ছি—তুমিও দ্বিধা না ক'রে আশীর্ব্বাদ ক'রে অনুমতি দাও।...হাঁ—আর গোবিন্দের চরণে পাঁচ পাতা তুলসী—সেটাও বরং ব্যবস্থা করা ভাল, বুঝলে। গিন্নীর যেন ব্যবস্থাটা এতক্ষণে মনঃপূত হইল। হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—সেই ভাল। তা হ'লে আর আমার মনে কোন খুঁত থাকবে না। তুমি ত সহজে সে ব্যবস্থা করবে না। বিমল, নায়েবকে তুই তা হ'লে ডেকে দে আমার কাছে। বাগল সেকরার কাছে গড়ান মজুতই আছে সোনার তুলসীপাতা—ওজনটোজন দেখে নিয়ে আসুক।

বিমলের মনটা কিন্তু খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। এমনি করিয়া যাত্রার লগ্ন শুদ্ধ করিতে হইলে যে অবশেষে দিন দেখিবার জন্য পাজি কেনার পয়সা জুটিবে না! টিকি ও ফোঁটার উপর বিরূপ সে চিরদিন। কিন্তু আজ আর সে-বিরূপতা ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় পরিণত না হইয়া পারিল না।

ভটচায বলিতেছিলেন তাহার মাকে—তোমার ত সব জানাই আছে—কি-কি লাগবে। পঞ্চগব্য—পঞ্চামৃত—নৈবিদ্যি, আর কাপড় একখানা। কাপড়খানা দশ গজা শাড়ীই যেন আনে। কাপড় কাপড় ক'রে আমাকে জ্বালিয়ে খেলে বাপু।

বিমল ঘৃণাভরে সে স্থান পরিত্যাগ করিল। স্থির করিল এবার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থা একটা করিতে হইবে। মনে মনে বলিল—দাঁড়াও—তোমারও যাত্রার দিন আমি দেখছি। অগস্ত্য যাত্রা—কিংবা ত্র্যহস্পর্শ কি মঘাই হবে প্রশস্ত দিন।

*　　*　　*

মাসখানেক পর বিমল দেশে ফিরিল। মনটা খুশীই ছিল। টেণ্ডার তাহার মঞ্জুর হইয়াছে। পাঁচ পাতা সোনার তুলসীপত্রের জন্য ক্ষোভটা কমিয়া গিয়াছে। আর কথাটা তাহার মনেও ছিল না। কাজের ভিড় অত্যন্ত বেশী। বিষয়পত্র কোথায় কি সে-সব জানিবার জন্য বিপুল পরিশ্রম তাহাকে করিতে হইতেছে। বাল্যকাল হইতে লেখাপড়ার জন্য কলিকাতায় মাসির বাড়িতে মানুষ হইয়াছে। তাহার পর মাসতুত ভাইদের দেখাদেখি কয়লার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া কর্ম্মজীবনও কলিকাতায় কাটিতেছিল। এমন সময় পঞ্চানন রায় হঠাৎ মারা গেলেন। অকস্মাৎ বিষয় জমিদারী ঘাড়ে পড়ায় সে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কাঁটার মুখে সান দিতে হয় না। বিষয়ী ঘরের ছেলে সে—নিজেও ব্যবসায়বুদ্ধিতে খানিকটা সাফল্য লাভ করিয়াছিল—তীক্ষ্ণ চতুরতার সহিত সব দিক গুছাইয়া লইতে তাহাকে বেগ পাইতে হইবে বলিয়া তাহার মনে হয় না। তবে কলিকাতায় ব্যবসা আর এখানে জমিদারী—দুই দিক লইয়াই হইয়াছে মুস্কিল। মা বলেন—কাজ কি বাপু তোর ব্যবসায়? জমিদারের ছেলে জমিদারী কর্। যার যা কাজ বুঝলি? বিমল হাসে। জমিদার! হাজার-পাঁচেক টাকা আয়ের জমিদার। চামচিকাই বা তবে পাখী নয় কেন? স্ত্রীও তাই বলেন। কাজ কি বাপু ব্যবসায়?

বিমল মনে মনে বলে—দাঁড়াও না বছর দুই তোমাকে কলকাতার জল খাইয়ে আনি। তারপর আবার শুনব তোমার মত।

যাক্।

সে-দিন ভোরেই তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল খুকীর কান্নার শব্দে। খুকী তাহার আট বছরের মেয়ে সুষমা। কান পাতিয়া শুনিয়া মনে হইল দক্ষিণের জানালার নীচেই বাগান হইতে কান্নাটা ভাসিয়া আসিতেছে। সময়টা কার্ত্তিক মাস। ঠাণ্ডা পড়ার জন্য জানালাটা বন্ধ ছিল। জানালাটা খুলিতেই নজরে পড়িল খুকী বৃদ্ধ ভটচাযের পিছনে পিছনে কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটাছুটি করিতেছে। বৃদ্ধ ভটচাযও [illegible]

ফেলিয়া একরূপ ছুটিতেছেনই। আর পট্ পট্ করিয়া ফুল ছিঁড়িয়া সাজিতে পূরিতেছেন।

খুকী চীৎকার করিতেছিল—ওগো বাবা গো,—সব নিলে গো—আমি কি করব গো? আমার সেজুতি কেমন ক'রে হবে?

ফুল তুলিতে তুলিতে ভট্‌চায বলিল—এ্যাঃ, ভারি তোর সাজপূজুনী। তার জন্যে আবার ফুল চাই! গোলাপ ফুলটা তুলে নিয়েছিস তুই—ওইটি দে। তা হ'লে তোকে চারটি ফুল আমি দেব। নইলে একটি ফুলও আজ পাবে না তুমি। রাধাগোবিন্দের চেয়ে ওর সাজপূজুনী বড়!

খুকী তীব্র ঝঙ্কার দিয়া মুখ ভেঙাইয়া উঠিল—এ্যা-এ্যা-এ্যা, ভারি ত ওর রাধাগোবিন্দ! ছাই ছাই ছাই তোমার রাধা-গোবিন্দ! কালো—ড্যাবড্যাবে চোক—এ-দিক ব্যাঁকা ও-দিক ব্যাঁকা—

বিপুল রোষে ভট্‌চায চীৎকার করিয়া উঠিল--এ্যাই-খুকী! এক চড়ে তোর গাল ভেঙে দেব বলছি। খবরদার।

খুকী ঘাড় উঁচু করিয়া বলিল—বটেই ত, বটেই ত তোর ঠাকুর ছাই কালো। বলছিই ত—ছাই—ছাই—ছাই! আমার 'সন্ধ্যেমণি অরুন্ধতী'কে কেন এ্যাঃ বলবে তুমি!

—নাঃ বলবে না! যেমন ব্রত তেমনি তার মন্তর! তিনি ভেঙাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—সন্ধ্যেমণি অরুন্ধতী অজ্জবতী বেলফুল—

খুকী কৃষ্ণমূর্ত্তির ভঙ্গিমা বিকৃতভাবে অনুকরণ করিয়া ভটচাযকে মুখ ভেঙাইয়া দাঁড়াইল। সহসা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জ্ঞান-গম্য যেন লোপ পাইয়া গেল। পাগলের মত খুকীকে ধরিয়া তাহার গালে সজোরে এক চড় বসাইয়া দিলেন। খুকী আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভটচায তাহাতেও তাহাকে নিষ্কৃতি দিলেন না। খুকীর আঁচল হইতে গোলাপ ফুলটি কাড়িয়া লইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন মন্দিরের দিকে। জানালায় দাঁড়াইয়া বিমল যেন বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গিয়াছিল। ষাট বৎসর বয়সের বৃদ্ধ আট বৎসরের শিশুর সহিত এমন আচরণ করিতে পারে এ ধারণা তাহার ছিল না।

সে রূঢ়স্বরে ডাকিল ভটচায মশাই!

লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ভটচায তখন দৃষ্টিপথের বাহিরে

খুকীর চীৎকার তখনও থামে নাই। তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া সে দেখিল তাহার কচি গালে পাঁচটি আঙুলের দাগ রাঙা দড়ির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। আপন মনেই সে বলিয়া উঠিল—বর্ব্বর—জানোয়ার!

খুকী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ভটচায-দাদা মেলে আমায়। বিমল মনে মনে ভাবিতেছিল প্রতিবিধানের কথা। সে গম্ভীর ভাবে বলিল—চুপ কর। আজই তাড়াব ওকে আমি। খুকী চুপ করিল না, তাহার অভিযোগ তখনও শেষ হয় নাই। সে বলিল—রোজ আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে, রোজ আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে। একটি ফুল আমাকে দেয় না।

তাহাকে বুকে করিয়াই বিমল কাছারীর দিকে চলিল। জানোয়ারের সঙ্গে জানোয়ারের মত ব্যবহার করিয়া ফল নাই, তাহাকে আজই বিদায় করিয়া দিবে। কাছারীতে তখনও নায়েব আসে নাই। এক জন পাইককে সে হুকুম করিল—নায়েববাবুকে এক্ষুনি ডেকে নিয়ে আয়। বলবি বাবু ব'সে আছেন।

নায়েব আসিতেই বিমল বলিল—আজই একজন পুরোহিত ঠিক করতে হবে দুপুরের আগেই।

কথাটা সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া নায়েব বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিমল বলিল—যদু ভটচাযকে জবাব দিয়ে দেন। আজই—এক্ষুনি।

নায়েব চুপ করিয়া রহিল। এমন পরমাশ্চর্য্যের কথা সে যেন কখনও শোনে নাই। বিমলের রুদ্ধ রোষ যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। সে আবার বলিল—লোকটা লোভী, অতিবড় লোভী, তা ছাড়া বর্ব্বর, জানোয়ার, কাণ্ডজ্ঞানহীন।

নায়েব বলিল—আজ্ঞে—তা যে হবার উপায় নাই।

—উপায় নাই! কেন?

রোষে বিমল গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

—আজ্ঞে দেবোত্তরের দলিল বোধ হয় আপনি দেখেন নি?

অসহিষ্ণু হইয়া বিমল বলিয়া উঠিল—কি বলছেন আপনি স্পষ্ট ক'রে বলুন। হাঁ, দেবোত্তরের দলিল দেখিনি আমি, কিন্তু কি হয়েছে তাতে?

ভটচায মশায় মন্দিরের হর্তাকর্তা থাকবেন। যাবতীয় পূজা-পার্ব্বণ তাঁর নির্দ্দেশমত হ'তে হবে। তাঁর জীবনভোর ত তিনি পুরোহিত থাকবেনই, এমন কি তাঁর পরে কে পুরোহিত হবেন তাও নির্দ্দেশ ক'রে যাবেন তিনি। তবে গিন্নীমায়ের একটা সম্মতি চাই।

বিমল অবাক হইয়া নায়েবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল লোকটা প্রলাপ বকিতেছে। নায়েব তখন বলিতেছিল—এমন কি যদু ভটচায ইচ্ছে করলে দেবোত্তর সম্পত্তির হিসেব-নিকেশ পর্য্যন্ত ট্রাষ্টীর কাছে চাইতে পারেন। যদি তাঁর মতে ট্রাষ্টী স্বেচ্ছাচারী হয়, কি হিন্দুধর্ম্মবিগর্হিত কোন কাজ করেন, তবে তিনি আদালতে ট্রাষ্টীকে পদচ্যুত করতে পারবেন। তাঁর আর গিন্নীমায়ের ক্ষমতা এক।

বিমল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর বলিল—নিয়ে আসুন দলিল।

নায়েব দলিল আনিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল—দলিলের আবার তিনখানা কপি,—একখানা আছে এষ্টেটের সেরেস্তায়, একখানা আছে গিন্নীমায়ের কাছে, আর একখানা আছে ভটচাযের হাতে।

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তিন-চার বার দলিলখানা পড়িয়া বিমল টেবিলে মাথা গুঁজিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। তাঁহার ইচ্ছা করিতেছিল চাবুক মারিয়া সে পাষণ্ডকে বিদায় করে। আপনার ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হওয়ার একটা প্রচণ্ড আক্ষেপ আছে, সে আক্ষেপে সে যেন পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। ইচ্ছা করিতেছিল সর্ব্বাগ্রে ঐ দলিলখানা কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে।

আবার সে দলিলখানা পড়িল। দেখিল ইহার প্রতি-বিধানে কিছু করিতে পারেন মা। সে উঠিয়া চলিল তাঁহার কাছে। মা সমস্ত শুনিয়া বিমলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন—একবার যা বললে তুমি বিমল, বারান্তরে আর ব'লো না। বললে—দেবোত্তরের ট্রাষ্টী ঘুচোবার জন্যে আমাকে দরখাস্ত করতে হবে।

বিমল আর কিছু বলিল না। সে সটান উপরে উঠিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। নারীচরিত্র তাহার অজানা নয়—বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের মেয়েদের সে বেশ চেনে। খুব বেশী দৃঢ় সংস্কারকে টলাইতে হইলে বড়-জোর প্রয়োজন এক দিন উপবাস।

চাকর চা লইয়া আসিতেই সে বলিল—নিয়ে যা, আমি খাব না।

জলখাবার-হাতে স্ত্রী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াই বলিলেন—তোমার এ মতিগতি দিন দিন কি হচ্ছে বল দেখি?

বিমল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া সে বলিল—ইচ্ছে করছে আজ কালাপাহাড় হ'তে। শুধু ওই বামুন কেন—দেবতা-টেবতা টান মেরে জলে ফেলে—

শিহরিয়া উঠিয়া স্ত্রী কানে আঙুল দিয়া বলিলেন—চুপ—চুপ—চুপ!

তাহার মুখের শঙ্কাতুর বিবর্ণতা দেখিয়া বিমল আপনা হইতেই চুপ করিয়াছিল। তাহার স্ত্রী তখনও থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিলেন।

একটু সামলাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন—যাই মাকে বলিগে—গোবিন্দের চরণে তুলসী দেওয়ার ব্যবস্থা করুন মা। কি হবে মা আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে। আবার বিমল চীৎকার করিয়া উঠিল—খবরদার। এই জানোয়ার বামুন—

স্ত্রী ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—তুমি কি পাগল হয়েছ না-কি? কা'কে কি বলছ? জান, গোবিনজীর সঙ্গে ওঁর কথা হয়!

এবার বিমল হতবাক্ হইয়া গেল। এত বড় সংবাদটা ত তাহার জানা ছিল না! স্ত্রী বলিলেন—আজ আর এখন কিছু খেয়ো না তুমি। তোমার নামে তুলসী দেওয়া হবে। চরণামৃত—আশীর্ব্বাদ নিয়ে তবে...। হাঁ—হাঁ—করছ কি—ছি—ছি—ছি, তুমি যে মেলেচ্ছ হয়ে উঠলে দিন দিন।

চায়ের ট্রেতে চায়ের কাপটা তখন ঠাণ্ডা জল হইয়া গিয়াছিল। বিমল ঢক্ ঢক্ করিয়া সেই ঠাণ্ডা চা গিলিয়া কাপটা ঠক্ করিয়া নামাইয়া দিল।

স্ত্রী বলিলেন—যাক্, আমি উপোস ক'রে থাকলেই হবে। আর কিছু খেয়ো না যেন।

তিনি জলখাবারের ডিসটা লইয়া আক্ষেপ করিতে করিতেই চলিয়া গেলেন।

—কি হবে মাগো, ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে।

মাকেই বা বলব কি ক'রে আমি। লজ্জায় ঘেন্নায় মাথাটা আমার কাটা যাচ্ছে যে! ছি! ছি!

বিমলের ইচ্ছা করিল র‍্যাক হইতে বন্দুকটা লইয়া নিজের বুকেই দাগিয়া দেয়!

দুই হাতে মাথা ধরিয়া সে বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর সে শুনিল—ভটচাযের কণ্ঠস্বর।

—কই—সে শালী কই গো বউঠাকরুণ?

গিন্নী গদগদ ভাবে বলিলেন—কি হ'ল আজ আবার সখীর সঙ্গে!

—ভারি দুষ্টু হয়েছে সে বউ। গোবিনজীকে বলেছে ছাই কালো। বাল্যভোগের প্রসাদ আনলাম—চরণামৃত এনেছি।

সঙ্গে সঙ্গে খুকীর ক্রন্দনধ্বনি শোনা গেল। তারপরই ভটচাযের তীব্র তিরস্কার প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—খবরদার বউ-মা, খবরদার! কেন মারবে ওকে তুমি! মার বউ-ঠাকরুণ, বউটাকে এক চড় তুমি কসে দাও।

তারপর সস্নেহকণ্ঠে তিনি বলেন—কেঁদ না ভাই সখি, কেঁদ না তুমি। এস আমার সঙ্গে এস। বাল্যভোগের প্রসাদ খেতে খেতে গল্প শুনবে এস। এস ভীম কি ক'রে বক রাক্ষসকে মেরেছিল বলব এস। খুকী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে—বলে—সেই পায়েস খেতে খেতে—

কথা তাহার সম্পূর্ণ হয় না। কলস্বরা হাসি চকমিলান বাড়ির খিলানে খিলানে জলতরঙ্গের মত বাজিয়া বাজিয়া উঠে।

ভটচায বলেন—বউমা তোমার আজকাল দেবসেবায় এমন অবহেলা হ'ল কেন বল ত? আগের মতন ত কই—

গিন্নী বাধা দিয়া বলেন—তুমি এক এক সময় এমন কথা ব'ল ঠাকুরপো! বিমল বাড়ি রয়েছে এখন—

হা হা করিয়া হাসিয়া ভটচায বলেন—বুড়ো হয়েছি কি-না বউ। তা স্বামী-সেবা করা ভাল—পরম ধর্ম্ম।

বিছানার উপর বিমল লাফ দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলে ব্রুট!

ভটচায বলেন—তুলসী ক-পাতা গড়ান আছে ত?

* * *

নিরুপায়ে মনের ঘা মনে রাখিয়াই বিমলের দিন কাটিতেছিল। যেখানে সমস্ত সংসার বিরোধী সেখানে সে ছাড়া উপায় কি? তাহা ছাড়া আর একটা দিকও ছিল। আর একদিক দিয়া বিপুল পরিতুষ্টিতে মন তাহার ভরিয়াছিল জমিদারী ও ব্যবসায়ে আশাতীত সাফল্য তাহাকে এ-দিকটা যেন ভুলাইয়া দিয়াছিল। সম্পত্তির পর সম্পত্তি সে কিনিয়া চলিয়াছে।

সে-দিন নায়েব বলিল—সরকারদের লাট খড়বোনা বিক্রী হচ্ছে বাবু।

লাটখড়বোনা! বিমল লাফাইয়া উঠিল। লাটখড়বোনা যে সোনার সম্পত্তি! এ চাকলায় এমন সম্পত্তি আর নাই তাহা ছাড়া যে-গ্রামে বিমলের বাস সে-গ্রামখানিও লাট খড়বোনার অন্তর্গত। নিজে জমিদার হইয়া অপরের জমিদারীর মধ্যে প্রজা হইয়া বাস করার আক্ষেপ ও লজ্জা আজ তিনপুরুষের মধ্যে মিটিল না।

নায়েব বলিল—রত্নপুরের চাটুজ্জেরা না-কি কিনছে।

বিমল বলিল—এক্ষুনি যান আপনি সরকারদের ওখানে।

নায়েব হাসিয়া বলিল—কাল রাত্রে শুনে রাত্রেই আমি সেখানে গিয়েছিলাম।

—তারপর?

—কথাবার্ত্তা একরকম কয়ে এসেছি। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দাম চায়। চাটুজ্জেরা তেত্রিশ হাজার কথা কয়ে গেছে। বড় সরকার বললেন পরশু পর্য্যন্ত দলিল রেজেষ্ট্রী ক'রে কাজ শেষ করতে হবে। কাল সন্ধ্যে পর্য্যন্ত টাকা দিয়ে রাত্রেই দলিল লেখাপড়া শেষ করতে হবে, নইলে আর হবে না। চাটুজ্জেরা পরশু টাকা নিয়ে আসবে।

বিমল বলিল—আসুন আমার সঙ্গে। বাগল সেকরাকে ডাকতে পাঠান।

সিন্দুক খুলিয়া বিমল দেখিল মজুত মাত্র দশ হাজার। ব্যাঙ্কের খাতায় মজুত বার হাজার দু-শ পঁচিশ। কথাটা শুনিয়া মা—স্ত্রী আপনাদের গহনা বাহির করিয়া দিলেন। বাগল স্বর্ণকার ওজন করিয়া মূল্য অনুমান করিল—হাজার আটেক। এখনও চাই পাঁচ হাজার! ঋণ সংগ্রহের সময় নাই। মধ্যে মাত্র ঘণ্টা-ত্রিশেক সময়। বিমল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

সহসা তাহার মাথায় বিদ্যুতের মত একটা কথা খেলিয়া গেল। দেবোত্তরের খাতায় সে দেখিয়াছে বিগ্রহের

অলঙ্কারে বহু টাকা আবদ্ধ হইয়া আছে। সে মায়ের পা দুইটা জড়াইয়া উপুড় হইয়া পড়িল।

ব্যস্ত হইয়া চিবুকে হাত দিয়া চুমা খাইয়া মা বলিলেন—ওঠ—ওঠ—কি হ'ল কি?

বিমল উঠিল না। বলিল—আগে বল—আমার কথা রাখবে?

—রাখব রাখব—ওঠ্ তুই।

—আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি কর।

—তাই করছি—সাধ্যি থাকলে করব। তুই ওঠ বাবা।

বিমল উঠিয়া বলিল—ঠাকুরদের গয়নাগুলি দাও।

মা সভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন।—সে কি রে?

বিমল বলিল—আমি আবার গড়িয়ে দেব। যত টাকার নেব তার চেয়ে বেশী দেব।

মা কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। বিমল বলিল—গোবিনজীর নামেই ও-সম্পত্তি কিনব মা। তা হ'লে ত হবে।

মা দ্বিধাভরে বলিলেন—তাই ত বিমল।

আবার তাঁহার পা দুইটা ধরিয়া বিমল বলিল—তিন পুরুষের লজ্জা মা—এ সুযোগ গেলে সে লজ্জা আর ঘুচবে না।

মা বলিলেন—দাঁড়া বাবা, ভটচায ঠাকুরপোকে ডাকি।

বিমল বলিয়া উঠিল—না—না—না। তা হ'লে আর হবে না। সে একধারার মানুষ—সে প্রাণ ধরে কখনও দিতে বল্‌তে পারবে না।

মা বলিলেন—কিন্তু গয়না যে তাঁর কাছেই বাবা।

বিমল আঁতকাইয়া উঠিল।—বল কি মা! সে কি? সে যদি হঠাৎ মরে যায়—কি—

মা বাধা দিয়া বলিলেন—ছিঃ বিমল—কা'কে কি বলছ?

দৃঢ়স্বরে বিমল বলিল—ঠিক বলছি মা। তোমরা যাই ভাব এমন লোভী আমি কখনও দেখিনি।

মা বলিলেন—গয়না কখনও তিনি বাড়ি নিয়ে যান না বিমল। ঠাকুরঘরেই দেবোত্তরের আয়রণ চেষ্টে সে-সব মজুত থাকে।

—চাবি?

—চাবি তাঁরই কাছে থাকে।

—হুঁ।

নায়েববাবু ভটচাজ মশায়কে ডাকুন ত।

উত্তেজনায় বিমল অস্থিরভাবে পায়চারি করিতেছিল। হাসিমুখে বাড়ি ঢুকিয়া ভটচায বলিলেন—কি হুকুম গো বউ-ঠাকরুণ।

বিমল এবার তাঁহার পায়ে উপুড় হইয়া পড়িল। ব্যস্তভাবে ঠাকুর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—কি—কি—হ'ল কি—বাবা বিমল?

বিমলের মা সমস্ত কথা বলিয়া বলিলেন—সম্পত্তি গোবিনজীর নামেই কেনা হবে ঠাকুরপো। আর যে-টাকার গহনা নেওয়া হবে এক বছরের মধ্যে বিমল তার দেড়গুণ বেশী দেবে।

মাথা নাড়িয়া ভটচায বলিলেন—তা হয় না বউ। সে আমি দিতে পারব না। না—সে কিছুতেই হবে না।

বিমল বলিল—বুঝুন আপনি ভটচায কাকা—গোবিনজীর সম্পত্তি বাড়বে।

—উঁহু। সম্পত্তি নিয়ে কি করবে ঠাকুর? উঁহু, সে আমি দিতে পারব না।

নায়েব বলিল—নিজ গ্রাম ঠাকুরের দখলে আসবে। পরের জমিদারীতে ঠাকুরকে বাস করতে হয় ভটচায মশাই—

ভটচাযের সেই এক জবাব—উঁহু—গয়না আমি দিতে পারব না বাপু। উ—হু!

এবার বিমল উঠিল। দৃঢ়স্বরে বলিল—চাবি দেন সিন্দুকের।

বিস্মিতভাবে ভটচায তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কেন?

কঠোর স্বরে বিমল আদেশ করিল—দেন! দেন বলছি!

ভটচায বলিলেন—চাবি ত আমার কাছে নাই।

অকস্মাৎ তাহার হাত ধরিয়া রূঢ় ভাবে ঝাঁকি দিয়া বিমল চীৎকার করিয়া উঠিল—চাব দে বলছি ভণ্ড বামুন! নইলে গুলী ক'রে তোকে মেরে ফেলব!

গিন্নী চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—বিমল!

ভটচায বিমলের মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলেন—ভীতস্বরে বলিলেন—চাবি ত তোমার মায়ের কাছে থাকে বাপু!

দৃঢ়স্বরে বিমল বলিল—চাবি দাও মা!

মা বলিলেন—ঠাকুরপো!

ভটচায ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—উহু—সে হয় না বউ। প্রাণ ধ'রে সে আমি বলতে পারব না। উ-হু!

বিমল দ্রুতপদে মায়ের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তাঁহার কাঠের হাতবাক্সটা থাকিত সম্মুখেই একটা জলচৌকীর উপর। সেটাকে আনিয়া সে উঠানের উপর আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিল। পাথরের টালি দিয়া বাঁধানো উঠানে আছাড় খাইয়া বাক্সটা চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল। ভিতরের জিনিষপত্র চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। রিঙে-গাঁথা গোছা দুই চাবি তাহার মধ্য হইতে কুড়াইয়া লইয়া বিমল উন্মত্তের মত মন্দিরের দিকে চলিয়া গেল।

একটা মানুষ যখন উন্মত্ত হইয়া উঠে তখন অপর সকলে হইয়া যায় যেন মূক—পঙ্গু। বাড়ির সমস্ত লোক বিমলের উন্মত্ততায় মূক-পঙ্গুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর বিমল আঁচলে করিয়া একরাশি অলঙ্কার আনিয়া বাগল স্বর্ণকারের সম্মুখে ঢালিয়া দিল। বলিল—ওজন কর।

মূক-পঙ্গু ভটচায অলঙ্কারগুলির দিকে তাকাইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তার পর ঝাঁপ দিয়া উপুড় হইয়া পড়িলেন অলঙ্কাররাশির উপর। বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—না—না—এ দেব না, দিতে পারব না। আমার—এ আমার।

বিমল রূঢ়ভাবে হাতে ধরিয়া সবলে ভটচাযকে টানিয়া সরাইয়া ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রলয় ঘটিয়া গেল যেন। সহসা ভটচায পাথরের উঠানে মাথা ঠুকিতে আরম্ভ করিলেন উন্মত্তের মত।

—এই নে—এই নে—তবে এই নে। এই নে—এই নে।

আঘাতের পরিমাণ বোধ নাই—জীবনের মমতা নাই—উন্মত্ত বিকারগ্রস্ত যেন! ফিন্‌কি দিয়া রক্ত পড়িতেছিল। সে রক্তে ভটচাযের দেহ ভাসিয়া গেল—খানিকটা মাটি রক্তাক্ত হইয়া উঠিল।

বিমলের মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ছুটিয়া আসিয়া ভটচাযকে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিলেন—ঠাকুরপো! ঠাকুরপো!—

ভটচায বলিয়া উঠিলেন—না—না—পারব না—পারব না আমি দিতে।

মা বিমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বাবা বিমল!

লজ্জাসরম ভুলিয়া গিয়া স্ত্রী আসিয়া বলিল—ওগো!

খুকী ওপাশে দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁদিতেছিল। নায়েব দাঁড়াইয়াছিল পাথরের মূর্ত্তির মত। বিমলেরও উন্মত্ততা ছুটিয়া গিয়াছিল। বিপুল ঘৃণাবিমিশ্রদৃষ্টিতে সে চাহিয়াছিল ঐ লোভজর্জ্জর বৃদ্ধের দিকে। সে বেশ বুঝিল, বৃদ্ধের সর্ব্বাঙ্গের ঐ লোল-কুঞ্চন—ও জরা নয়—লোভজর্জ্জরতা। সে স্থান ত্যাগ করিতে করিতে বলিল—নেঃ—নিয়ে যা। ইচ্ছে হয় ত বাড়িও নিয়ে যা ওগুলো।

কাছারীবাড়িতে গিয়া সে উঠিল। কিছুক্ষণ পর দেখিল বাগল স্বর্ণকার আবার চলিয়াছে অন্দরের দিকে। সে বুঝিয়াছিল—তবু জিজ্ঞাসা করিল—কি রে বাগল?

—আজ্ঞে তুলসী পাঁচপাতা।

* * *

বিমল ভাবিয়াছিল এই ঘটনার পর সে এখানে বাস করিবে কি করিয়া। তাহার দারুণ পরাজয়ের বার্ত্তা লেখা রহিল ওই লোভী ব্রাহ্মণটার ললাটে। নিত্য দুইটি বেলা ঐ লিপি-অঙ্কিত ললাট লইয়া তাহারই সম্মুখ দিয়া তাহারই বাড়িতে যাইবে আসিবে—সে তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিবে? কিন্তু নিরুপায়ে মানুষকে সব সহ্য করিতে হয়—ধীরে ধীরে সব সহ্য হইয়া যায়ও। বিমলেরও সহ্য হইল। যেমন পৃথিবী চলিতেছিল তেমনি চলিয়াছে। কিন্তু আক্রোশ বিমলের গেল না। মনে মনে সে সুযোগ সন্ধান করিয়া চলিল। বহুকষ্টে কৌশলে তুলসী-পাতার ওজন সে কিছু কমাইল। শুভদিন না দেখিয়া সে আর যায় না। মামলা-মকর্দ্দমার সংবাদ গোপনে থাকে। বাড়িতে মেয়েদের কানে আর তোলে না। কিন্তু তবুও বাগলের আসা-যাওয়ার বিরাম নাই। তাহার মুখে দ্বিতীয় কথাও নাই।

—বাগল—কিরে?

—আজ্ঞে—তুলসীপত্র।

বিমল মনে মনে গর্জ্জায়। খুকীটা পর্য্যন্ত যত বড় হইতেছে তত তাহার ঐ লোভী ব্রাহ্মণটার উপর ভক্তির প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। দিবারাত্রি সে এখন মন্দিরে আছে। ফুলতোলা মালাগাঁথার ভার নাকি কৃপা করিয়া বৃদ্ধ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। এক এক সময় মনে হয় যাক্ গে যাহা করিতেছে সে করুক, উহার আর কয় দিন? পরক্ষণেই সে অস্থির হইয়া

উঠে। অক্ষমের মত বিপক্ষের মৃত্যুকামনা ও আয়ুর দিন গণনার লজ্জা কাঁটার মত তাহাকে বিঁধিতে থাকে।

সে-দিন সকালে বসিয়া এই চিন্তাই সে করিতেছিল। এই মাত্র বৃদ্ধ সম্মুখ দিয়া ঘড়ির কাঁটাটির মত একগতিতে চলিয়া গেল।

খুকী আসিয়া ডাকিল—বাবা! ঠাকুমা তোমাকে ডাকছেন।

বিমল তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। নিশ্চয় কোন ব্রত-পার্বণ!

বৃদ্ধ গেল—অব্য-বহিত পরেই মা ডাকিলেন—ডাক লইয়া আসিল খুকী। সাজান বন্দোবস্ত। এ যেন নালিশ দায়ের হইল—হাকিম সমন সহি করিয়া দিলেন—পেয়াদা সমন জারি করিল। সে বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল—যা—এখন আমার সময় নাই যা!

খুকী বলিল—মায়ের যে জ্বর হয়েছে বাবা।

বিমলের মনে পড়িল সত্যই ত গত রাত্রে চারু সমস্ত রাত্রি কাতরাইয়াছে। শরীরে যেন উত্তাপও সে অনুভব করিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাড়ির ভিতর গেল।

মা বলিলেন—বউমার জ্বর হয়েছে রে, ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে দে।

—কতটা জ্বর হয়েছে?

—খুব বেশী নয়। কিন্তু বেলার সঙ্গে জ্বরটা বাড়ছে মনে হচ্ছে। ওঠেনি বেচারী আজ সকাল থেকে।

বিমল উপরে উঠিয়া গেল। বিছানায় শুইয়া চারু ছটফট করিতেছিল। দাহে সুন্দর রং রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। কপালে হাত দিয়া সে অনুভব করিল উত্তাপ অনেকখানি।

* * *

দেখিতে দেখিতে চারুর অসুখ ভীষণাকার ধারণ করিল। জেলার সদর হইতে বড় ডাক্তার আনান হইল। তিনি বলিলেন—টাইফয়েড। দিনের পর দিন কাটিতে আরম্ভ করিল—যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া। বিমল মাথার শিয়রে বাসা গাড়িয়াছে। একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া তাহার বিনিদ্র নয়নে দিনরাত্রি কাটিয়া যায়। মনের মধ্যে অনুশোচনার তাহার অন্ত নাই। ইদানীং ঐ বৃদ্ধের প্রতি আক্রোশ—বৃদ্ধের প্রতি ভক্তির জন্য চারুর উপরও কতকটা আসিয়া পড়িয়াছিল। শুধু চারু কেন ঐ বৃদ্ধ আজ তাহার সংসারের সকলকে আড়ালে রাখিয়া তাহার প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়াইয়া আছে। একদিকে সে একা; অন্য দিকে বৃদ্ধের আড়ালে দাঁড়াইয়া সকলে যেন সভয়ে তাহার দিকে চায়।

—বউঠাকরুণ!—

মা বলেন—এস ঠাকুরপো!

—গোবিন্‌জীর চরণামৃত এনেছি।

বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া তিনি ডাকেন—বউমা! বউমা! গোবিন্‌জীর চরণামৃত—হাঁ কর!

সামান্য জ্ঞান থাকিলেও চারু মুখ মেলিয়া চরণামৃত পান করিয়া বলে—আঃ।

জ্ঞান না থাকিলে সজলনয়নে বৃদ্ধ ললাটে স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া চলিয়া যান। মা বলেন—ঠাকুরপো, সেবার ভার তোমার ওপর।

কথা বলিতে বৃদ্ধের ঠোঁট দুইটা থর থর করিয়া কাঁপে। বলেন—নিশ্চিন্ত থাক বৌ!

প্রয়োজনে বা বিপুল আশঙ্কার দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে মনে হইলে বিমল পলাইয়া আসে কাছারীতে। পথে দেখে মন্দিরের মধ্যে বসিয়া বৃদ্ধ কিছু-না-কিছু করিতেছে। সন্ধ্যায় ডাক্তার আসেন—তাঁহাকে বিদায় করিতে গিয়া নিত্য বিমলের নজরে পড়ে একটি পুঁটুলী হাতে বৃদ্ধ চলিয়াছে। এই অবস্থাতেও বিমলের হাসি পায়—লুণ্ঠন চলিয়াছেই—লুণ্ঠন চলিয়াছেই।

যাই হউক, চারু বাঁচিল। আটাশ দিনের পর ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন—আজ ভরসা হচ্ছে বিমলবাবু। উঃ, যা ভয় আমাদের হয়েছিল। সকল কথা ত আপনাকে বলতে পারতাম না। বত্রিশ দিন পেরিয়ে গেলেই 'আউট অফ ডেঞ্জার')।

তিনি একটু হাসিলেন।

বিমল কৃতজ্ঞ ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল—কি ব'লে ধন্যবাদ দেব আপনাকে—

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—ওপরের তাঁকে ধন্যবাদ দেন বিমলবাবু। ধন্যবাদ আমাদের পাওনা নয়—আমরা নিই ফি। একটা কথা জানেন—Medicine can cure disease but cannot prevent death. ডাক্তার চলিয়া গেলেন। বিমল

দেখিল চারু প্রশান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে। পরম স্নেহভরে তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিল জ্বর নাই। পাণ্ডুর ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদবিন্দু দেখা দিয়াছে।

বাহির হইতে মা ডাকলেন—বিমল!

—মা।

—রয়েছিস? একটা কথা আছে বাবা।

মন ছিল প্রশান্তিতে ভরিয়া। পরম পরিতুষ্ট স্বরে একান্ত আজ্ঞাবহের মত সে বলিল—বল মা।

মা ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজার দিকে চাহিয়া বলিলেন—এস ঠাকুর পো, এস।

বৃদ্ধ ভটচায ভিতরে প্রবেশ করিয়া অকারণে বার-কতক কাসিয়া উঠিলেন। হাতে তাঁর নিত্যকার সেই একটি পুঁটুলী।

মা বলিলেন—বল ঠাকুরপো—তুমি বল।

—বলছিলাম কি—ডাক্তার বললেন—বউমার নাকি আর কোন ভয় নাই। তা হ'লে যদি তোমরা বল তবে আমি সঙ্কল্প ভঙ্গ করি।

মা বলিলেন—কি বলিস বিমল?

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিমল বলিল—কিসের সঙ্কল্প মা?

মা বলিলেন—তুই বুঝি জানিস নে। বউমার অসুখের পাঁচ দিনের দিন থেকে বরাবর সমস্ত দিন উপবাসী থেকে ঠাকুরপো গোবিন্দজীর পুজো ক'রে যাচ্ছেন। রাত্রে দুটি হবিষ্যি করেন। তাই বলছেন...

তাহার চারুর জন্ম ভটচায কৃচ্ছ্র-সাধন করিয়াছেন শুনিয়া বিমল একটু খুশী হইল। বলিল—তা বেশ।

ভটচায বলিলেন—তা হলে কালকেই ব্রত শেষ করব। তুলসীপত্র ইত্যাদি যা-যা লাগবে ফৰ্দ্দ ক'রে দিয়েছি। সে-গুলো জোগাড় ক'রে রেখো।

বিমলের মা বলিলেন—আমি বলছিলাম কি ঠাকুরপো—চল্লিশ দিন না গেলে বৌমা ঝোল পাবেন না। আর এ রোগটা নাকি ভারি কু-পেকো রোগ।

ভটচায বলিলেন—তাই হবে বউ। তুমি যখন বলছ তখন তাই হবে। যা হুকুম করবে তোমরা।

বিমল ভটচাযের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। সে ভাবিতেছিল এই জীবটির উপর আক্রোশ সে পোষণ করিয়াছিল কেমন করিয়া!

সে প্রচ্ছন্নব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া প্রশ্ন করিল—কত দিন আপনি উপোস ক'রে থাকতে পারেন ভটচায-মশায়?

ভটচাযও হাসিলেন একটু শুষ্ক হাসি; বলিলেন—এই যে আমাদের জীবিকা বাবা। এতে অশক্ত হলেও যে উপবাস ক'রে মরতে হবে। না পারলেও প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে বইকি।

উপবাসক্লিষ্ট কণ্ঠস্বর—কথা বলার করুণ দীন ভঙ্গী বিমলের প্রশান্ত মনকে স্পর্শ করিল। অকস্মাৎ তাহার লজ্জার আর অবধি রহিল না। দৃষ্টিতে পড়িল দারিদ্র্যশীর্ণ কঙ্কালসার মানব—আর তাহার ক্ষুধার্ত্তরিক্ত অন্তরের অন্তরাল হইতে উঁকি মারিতেছে এক স্নেহপরায়ণ কাঙাল!

সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—না—মা—থাক। কালই কাকা ব্রত শেষ করুন। কেন ওঁকে কষ্ট দেওয়া—ডাক্তার ত বলে গেলেন—

ভটচায বলিলেন—না—না—বাবা। কোন কষ্ট হবে না আমার। আমার বৌমার জন্য গোবিন্দের মুখচেয়ে আনন্দেই কেটে যাবে ক'টা দিন।

বিমল আর আপত্তি করিল না। ভটচায তাঁহার পুঁটুলিটি তুলিয়া লইয়া ঠুকঠুক করিয়া নিত্য যেমন যান তেমনি চলিয়া গেলেন। মাও নামিয়া গেলেন নীচের তলায়। বিমল তখন ভাবিতেছিল—শুধু কি উদরের দায়ে—শুধু কি লোভ? আর কিছু? দেবতার প্রতি একবিন্দু ভক্তি? তাহাদের প্রতি একবিন্দু ভালবাসা?

কথোপকথনের মধ্যে চারু কখন জাগিয়া উঠিয়াছিল। নিরালায় স্বামীকে পাইয়া সে বলিয়া উঠিল—ভটচাযকাকা আমায় বড় ভালবাসেন।

জৈনধর্ম্মের প্রাণশক্তি

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

আমার কাজ প্রধানতঃ ভারতীয় মধ্যযুগের ধর্ম্মের আন্দোলন লইয়া। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম-আন্দোলনের সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে তাহার যোগ থাকিলেও আমার আলোচনার ক্ষেত্র ততটা দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিতে চাহি না। তবু আমার একটি স্নেহাস্পদ জৈন ছাত্র আমাকে ধরিয়াছেন এই মহাবীর-জন্মদিনের উপলক্ষ্যে যেন আমি আমার তরফ হইতে কিছু বলি।

মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনার প্রধান গৌরবের কথা হইল মানব-মনের ধর্ম্মচিন্তার স্বাধীনতা। জৈন ও বৌদ্ধ মতেরও উৎপত্তি তো এই স্বাধীনতা হইতেই। প্রচলিত বেদবাদের বিরুদ্ধে সত্য ও মহৎ আদর্শ লইয়া কি ভীষণ যুদ্ধই তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন! তাই মধ্যযুগের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে তাঁহারা জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই স্বাধীন সাধনাকে কখনও শ্রদ্ধা না করিয়া পারেন না।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৯৯ অব্দে বিহার প্রদেশে পাটনা হইতে ২৭ মাইল দূরে, 'বসার'তীর্থে শ্রীমহাবীরের জন্ম। সে দিন ছিল চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী। কিন্তু এখন তাঁহার জন্মোৎসব প্রধানতঃ পালিত হয় ১লা ভাদ্রে, পর্য্যুষণের চতুর্থ দিনে। ৫২৭ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে বিহারের পাবাপুরীতে মহাবীরের তিরোধান ঘটে, তাই পাবাপুরী জৈনদের একটি বিশেষ তীর্থ, ইহা দক্ষিণ-বিহারে রাজগৃহের নিকটে অবস্থিত।

বুদ্ধের সময় খুব সম্ভবতঃ ৫৮৮ হইতে ৫০৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ, কাজেই মহাবীর ও বুদ্ধ অনেক পরিমাণে সমসাময়িক। উভয়েই অনেকটা একই প্রদেশে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। কাজেই অনেকে যে মনে করেন বিহার ও পশ্চিম-বঙ্গে পরি-ব্রজন কালে উভয়ের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক নয়।

মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েই বেদের উপদিষ্ট যাগযজ্ঞাদির বিরোধী, সাংখ্য ও যোগ মতও তাই। ইঁহাদের সবারই মতে, "সত্তামাত্রই দুঃখময়, কর্ম্মবশেই নিরন্তর সংসারপ্রবাহ; তাই দুঃখময় জন্মজন্মান্তরপ্রবাহ হইতে মুক্তিই সাধনার পরম ও চরম কথা।" জৈন বৌদ্ধ ও সাংখ্য মতে ঈশ্বরের স্থান নাই। যোগমতের ঈশ্বরও প্রায় না-থাকারই সামিল। মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েই সর্ব্বজাতিনির্ব্বিশেষে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রাকৃত ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করেন। উভয়েই সন্ন্যাসের উপর খুব ঝোঁক দেন, যদিও গৃহস্থ-আশ্রম লুপ্ত হয় নাই; হইলে ধর্ম্মের ধারা এতকাল কেমন করিয়া টিকিত? এই সব নানা কারণে কেহ কেহ জৈন ও বৌদ্ধ মতকে গোলেমালে এক করিয়া ফেলিয়াছেন।

বুদ্ধের সময়েও দেখা যায় নির্গ্রন্থ মত চলিয়াছে। নাত-পুত্ত তাহার উপদেষ্টা। তখন নির্গ্রন্থদের যে খবর মেলে তাহাতে বুঝা যায় তাহা এই জৈনদেরই কথা।

জৈনধর্ম্মে সংসারী ও সন্ন্যাসী এই দুই ভাগ তো আছেই, কিন্তু তাহাদের আসল বিভাগ হইল শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই দুই বিভেদ লইয়া। এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইবে।

বুদ্ধের ধর্ম্মের সঙ্গে মহাবীরের ধর্ম্মের এক বিষয়ে পার্থক্য বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে। বুদ্ধ তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের আদি উপদেষ্টা আর মহাবীর তাঁহার ধর্ম্মের চতুর্ব্বিংশ বা শেষ তীর্থঙ্কর। বুদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের উপদেশে বীতশ্রদ্ধ হইয়া স্বাধীন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন আর মহাবীর হইলেন তাঁহার মতবাদের পূর্ব্বতন সব মহাপুরুষদের সমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা।

চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের শেষ হইলেন মহাবীর আর তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্কর হইলেন পার্শ্বনাথ। ওসবালরা পার্শ্বনাথকেই বিশেষ করিয়া মানেন। অনেকে বলেন পার্শ্বনাথ মহাবীর হইতে ২৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার। উত্তরাধ্যয়ন সূত্রমতে (২৩ অধ্যায়) পার্শ্বনাথের শিষ্য কেশীর সঙ্গে মহাবীরের শিষ্য গৌতমের দেখা ঘটিয়াছিল বলিয়া যে কেহ কেহ মনে করেন পার্শ্বনাথ ও মহাবীর প্রায় সমকালীন তাহা ঠিক নহে,

কারণ পার্শ্বনাথের শিষ্য কেশী ছিলেন সেই পরম্পরাতে বহু পরে উৎপন্ন।

মহাবীরের পরবর্ত্তী আচার্য্য ও স্থবিরাবলীর সন্ধান পাওয়া যায় জৈন কল্পসূত্রে। মহাবীরের শিষ্য সুধর্ম্ম হইতে শাণ্ডিল্য পর্য্যন্ত তেত্রিশ জন স্থবির। দিগম্বর-মতেও বহু স্থবির আছেন। তাঁহাদের প্রথম ও ষষ্ঠ স্থবিরের নাম শ্বেতাম্বর-মতের সঙ্গে মেলে, আর সব নাম ভিন্ন।

ষষ্ঠ স্থবির ভদ্রবাহু হইতে চতুর্দ্দশ স্থবির বজ্রসেন পর্য্যন্ত স্থবিরগণের শিষ্য, নাম, গণ, কুল ও শাখা জৈনশাস্ত্রে লিখিত আছে।

বুলর তাঁহার এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকায় (১৮৯২) যে মথুরায় প্রাপ্ত এক খোদিত লিপি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে লিখিত সব নামের সঙ্গে জৈনশাস্ত্রোক্ত নামের মিল আছে।'

এই সব গণ-কুল-শাখা প্রভৃতি অনুসরণ করিয়া জৈন সাধনার ধারা অনেকটা দূর পর্য্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। তাহার পর আবার বহু সন্ধান মেলে হেমচন্দ্রের গুর্ব্বাবলী ও পট্টাবলীতে। তাহাতে বহু "গচ্ছ" বা পরম্পরার কথা আছে।

গুজরাতে শ্বেতাম্বর জৈনদের মধ্যে স্থানকবাসীরা মূর্ত্তি-পূজা স্বীকার করেন না; ডেরাবাসীরা করেন। ডেরাবাসীদের প্রধানতঃ চারিটি গচ্ছ—

১। তপাগচ্ছ। ইঁহাদের ভিক্ষাপাত্র লাল।

২। খরতর গচ্ছ। ইঁহাদের ভিক্ষাপাত্র কাল।

৩। অচঞ্চল গচ্ছ।

৪। পয় চন্দন গচ্ছ।

গুজরাতে ইহা ছাড়া আরও চারিটি গচ্ছ দেখা যায়।

শ্বেতাম্বরদের মতে মহাবীর ছিলেন বিবাহিত। পিতার মৃত্যুর পরে বড় ভাইয়ের অনুমতি লইয়া কন্যা প্রিয়দর্শনাকে ঘরে রাখিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাসী হন। সংসার ত্যাগ করিয়া গেলে মহাবীরের দৌহিত্রী যশোবতী জন্মগ্রহণ করেন। দিগম্বর-মতে মহাবীর ছিলেন বাল-সন্ন্যাসী। অষ্টম বৎসরে তিনি সংসার ত্যাগ করেন।

শ্বেতাম্বরদের মতে মহাবীরের জামাতা জমালি হইতেই 'নিহ্নব' বা ভেদের সুরু। অষ্টম 'নিহ্নব'ই হইল দিগম্বর মত; এই ভেদ ঘটে ৮৩ খৃষ্টাব্দে।

দিগম্বররা আবার কেহ কেহ বলেন ষষ্ঠ স্থবির ভদ্রবাহুর সময়ে অর্দ্ধফালক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি,তাহা হইতেই (৮০ খৃষ্টাব্দে) হয় শ্বেতাম্বরদের উদ্ভব। ইহার পূর্ব্বে আর কোনো নিহ্নব বা বিভাগ ঘটে নাই। মূল সঙ্ঘ আবার পরে (১) নন্দী, (২) সেন, (৩) সিংহ, (৪) দেব—এই চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়।

শ্বেতাম্বর সাধুরা কৌপীন ও উত্তরীয় এই দুইখানি বস্ত্র ব্যবহার করেন। কৌপীনকে তাঁহারা বলেন "চোল পট্ট" আর উত্তরীয়কে বলেন "পছেড়ী"। তাহা ছাড়া তাঁহারা কম্বল বা কাঁথাও ব্যবহার করিতে পারেন।

স্থানকবাসী সাধুরা মুখের উপর একটি বস্ত্রাচ্ছাদন বাঁধেন, তাহাকে বলে "মুখ-পত্তী," সাধারণ লোকে বলে "মোমতী"। ধূলা কীটাদি সরাইবার জন্য সাধুরা যে ঝাঁটা রাখেন তাহার নাম "পিছী"। তাহা ছাড়া কাষ্ঠ পাত্র প্রভৃতি লইয়া চৌদ্দটি জিনিষ পর্য্যন্ত তাঁহারা রাখিতে পারেন।

দিগম্বর সাধুরা বস্ত্র ব্যবহার করেন না কাজেই তাঁহারা বনবাসী। তাঁহারা ময়ূরপুচ্ছের "পিছী" রাখেন কীটাদি জীব সরাইতে। শ্বেতাম্বর সাধুদের মত তাঁদের "উপাশ্রয়" বা থাকিবার নির্দ্দিষ্ট বাড়ি নাই। শ্বেতাম্বর ধনী গৃহস্থেরা নিজেদের জন্য আপন বাড়িতে গৃহ-মন্দির রাখিতে পারেন; দিগম্বররা পারেন না। উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিমার মধ্যেও পার্থক্য আছে। শ্বেতাম্বরদের প্রতিমাতে বস্ত্র অলঙ্কার মণিমাণিক্যাদি বহু আড়ম্বর থাকে, দিগম্বরদের সেরূপ থাকে না। শ্বেতাম্বর প্রতিমার চক্ষু স্ফটিকনির্ম্মিত, দিগম্বর প্রতিমার চক্ষুতে এমন কোনো বিলাসবৈভব নাই এবং তাহার দৃষ্টি ভূতলবিন্যস্ত। ইহা ছাড়া পূজার উপচার বা উপকরণাদিতেও পার্থক্য আছে।

শ্বেতাম্বর দিগম্বর উভয় মতই আপন আপন মতকেই বলেন প্রাচীন। মহাবীরের সময়েও মনে হয় এইরূপ কোনো একটা ভাগ ছিল। তিনি স্থবিরকল্প ও জিনকল্প এই দুই দলকে একত্র করেন। প্রথমোক্ত দল বস্ত্র ব্যবহার করিতেন, দ্বিতীয় দল করিতেন না। তাই কেশী ছিলেন সবস্ত্র আর গৌতম ছিলেন বিবস্ত্র। তৈর্থিকদের অনেক গুরু তো নগ্নই থাকিতেন। কাজেই অতি প্রাচীনকাল হইতেই নগ্ন হইয়া সাধনা করার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

শ্বেতাম্বর দিগম্বর বিভাগ বিষয়ে স্থানকবাসীদের দুইটি মত প্রচলিত আছে। প্রথম মতে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময়ে একটি মহাদুর্ভিক্ষ হয়। তখন জৈন সাধুর সংখ্যা ছিল চব্বিশ হাজার। সকলের আর ভিক্ষা মেলে না। তাই বার হাজার নিষ্ঠাবান দৃঢ়ব্রত সাধু, গুরু ভদ্রবাহুর সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতে চলিয়া যান ও বার হাজার সাধু গুরু স্থূলভদ্রের সঙ্গে এই দেশেই থাকেন। এই স্থূলভদ্রের অধীনস্থ সাধুর দল কৃচ্ছ্রাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। দুর্ভিক্ষ চলিয়া গেলে যখন ভদ্রবাহু এদেশে ফিরিলেন তখন এই দল আর বস্ত্র ব্যবহার ছাড়িতে পারিলেন না।

দ্বিতীয় মতে দুর্ভিক্ষ বশতঃ যখন ভদ্রবাহু দক্ষিণ-ভারতে যান তখন তাঁহার অনুপস্থিতির অবসরে স্থূলভদ্র পাটলিপুত্রে একটি মহাসম্মেলন আহ্বান করেন। তাহাতে প্রাচীন উপদেশের বারটি অঙ্গ সংগ্রহের চেষ্টা হয়। এগারটি অঙ্গ তো যথাযথভাবে মিলিল, বাকী অঙ্গটি পূরণ করিয়া দিলেন স্থূলভদ্র। ভদ্রবাহু যখন আসিয়া দেখিলেন তাঁহাকে বাদ দিয়াই মহাসম্মেলন হইয়া গিয়াছে তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন ও ঘোষণা করিলেন ঐ দ্বাদশ অঙ্গ অপ্রামাণ্য।

এই বিভেদ সত্ত্বেও কিছুকাল এই উভয় দল একত্র চলিল, তারপর আর একত্র থাকা অসম্ভব হইল। শ্বেতাম্বর তপাগচ্ছ মতে এই বিচ্ছেদটি পূর্ণ হয় ১৪২ খৃষ্টাব্দে, চল্লিশবর্ষব্যাপী এক দুর্ভিক্ষের অবসানে। স্থানকবাসীরা বলেন এই বিচ্ছেদটি ঘটে ৮৩ খৃষ্টাব্দে। কেহ কেহ বলেন বজ্রসেনের দুর্বলতা বশতঃই এই বিচ্ছেদটি সম্ভব হয়।

শ্বেতাম্বরদের মধ্যে একটি গল্প চলিত আছে যে সাধু শিবভূতি গৃহস্থ অবস্থায় এক রাজার অধীনে কাজ করিতেন। শিবভূতি যখন সন্ন্যাসী হন তখন সেই রাজা তাঁহাকে একটি দামী কম্বল উপহার দেন। শিবভূতির গুরু বলিলেন, এইরূপ বহুমূল্য বিলাসদ্রব্য সন্ন্যাসীর পক্ষে রাখা উচিত নয়। তবু শিবভূতি তাহা ত্যাগ না করাতে গুরু একদিন তাহা গোপনে কাটিয়া কুটিয়া রাখিলেন। শিবভূতি যখন তাহা দেখিলেন তখন দুঃখিত হইয়া মহাবীরের মত একেবারে সর্ব্বপ্রকার বস্ত্রই ত্যাগ করিলেন। ইহা হইতেই হইল দিগম্বর দলের উদ্ভব। কাজেই দেখা যায় নগ্নতার উদাহরণ জৈনধর্ম্মের আদি ভাগেও আছে।

সন্ন্যাসীকে দিগম্বর হইতে হইলে নারীদের সন্ন্যাস চলে না। তাই শিবভূতির ভগ্নী যখন সন্ন্যাস লইতে চাহিলেন তখন কহিলেন, "আমি কেমন করিয়া বস্ত্রত্যাগ করি?" শিবভূতি তাঁহাকে বুঝাইলেন, "এই জন্মের সুকৃতিবশে পরজন্মে পুরুষ হইয়া জন্মাইও, তার পর সন্ন্যাসী হইও।" তাই দিগম্বরদের মধ্যে নারীর সন্ন্যাস নাই, নির্বাণও নাই। ঊনবিংশ তীর্থঙ্কর "মল্লি"কে শ্বেতাম্বররা নারী বলিয়া মানিলেও দিগম্বররা বলেন, তিনি ছিলেন পুরুষ, কারণ নারী হইয়া কেহ তীর্থঙ্কর হইবেন ইহা একান্ত অসম্ভব কথা।

এ-পর্য্যন্ত জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ কথাই আলোচনা করা গেল মাত্র। এখন দেখা যাউক ভারতের বৈদিক ধর্ম্ম হইতে জৈনধর্ম্মের বিশেষত্ব কোথায়? বৈদিক মতে মুখ্য ধর্ম্মই হইল যজ্ঞ, তাহাতে পশুবধ আবশ্যক। জৈনধর্ম্মে প্রধান কথাই অহিংসা। বৈদিক ধর্ম্মে যজ্ঞে গো আলম্ভনীয়, জৈনধর্ম্মে প্রধান ব্রতই গো-রক্ষা। এখনও ভারতে জৈনদের প্রধান কাজ গো-রক্ষার্থ পিঞ্জরাপোল প্রভৃতি করা।

বৈদিকদের আগমনের পূর্ব্বে ভারতে সম্ভবতঃ এমন কোনো অতি প্রাচীন সভ্যতা ছিল যাহাতে গো ছিল অতি পবিত্র। তাহার প্রমাণও এখন কিছু কিছু মিলিতেছে, যদিও এখন এখানে সে-সব কথা আলোচনার অবসর নাই। জৈনরা হয়ত সেখান হইতেই তাঁহাদের এই বস্তুটি পাইয়াছেন। পরে বৈদিক মতেও ক্রমে গো হইয়া দাঁড়াইল অঘ্ন্যা। এক সময় বিবাহকালে যে গবালম্ভন হইত তাহা বুঝা যায় এখনও বিবাহকালে উচ্চারিত বিখ্যাত "গৌ র্গৌঃ" মন্ত্রে। ভৃত্য যখন উচ্চারণ করে "গৌঃ গৌঃ" অর্থাৎ "এই যে গো ইহাকে এখন কি করা যায়?" তখন বর বলেন, "ওঁ মুঞ্চগাম্" ইত্যাদি, অর্থাৎ "গো-টি ছাড়িয়া দাও।" তারপর এই মন্ত্র দিয়া শেষ করেন—"মা গাম্ অনাগাম্ অদিতিম্ বধিষ্ঠ।" অর্থাৎ "এই বেচারা নিরপরাধ গো-কে বধ করিয়া কাজ নাই" (সামবেদ মন্ত্র-ব্রাহ্মণ ২, ৮, ১৩-১৫; গোভিল গৃহ্যসূত্র ৪, ১০, ১৯-২০; ইত্যাদি ইত্যাদি)

ক্রমে ভারতে গোমেধ লুপ্তই হইয়া গেল। আজ ভারতে গবালম্ভনের কথা কেহ চিন্তাও করিতে পারেন না। যে বেদপূর্ব্ব অতি প্রাচীন ধর্ম্মধারা ধরিয়া ভারতে এত বড়

অঘটনও ঘটিতে পারিল হয়ত সেই ধর্ম্মধারার সঙ্গে জৈন বৌদ্ধাদি অহিংসাবাদীদের মূলতঃ বিলক্ষণ যোগ ছিল।

বেদের কাম্য ছিল স্বর্গ; মুক্তিবাদ বেদের বাহিরের কথা। অবশ্য পরে এই মুক্তিবাদ বেদেও প্রবেশ করিয়াছে। এই মুক্তিবাদ হয়ত বেদের পূর্ব্ব হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে, সাংখ্যাদি মতেও সেই স্থান হইতেই হয়ত মুক্তিবাদটা আসিয়াছে। জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে এই একই কথা। এক সময়ে দক্ষিণ-ভারতে জৈন-মত অতিশয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। জৈন-মত যে শুধু সেখানে গিয়াছেই তাহা নহে; হয়ত সেখান হইতে বহু প্রাচীন বেদ-পূর্ব্ব ভারতীয় ভাব ও জৈন মতের আদিতে আসিয়াছে।

বেদের প্রাচীন আদর্শ ছিল গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। সন্ন্যাসাচার বেদের পূর্ব্ব হইতেই ভারতে ছিল এবং পরবর্ত্তী বৈদিক কালে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। চতুরাশ্রম ব্যবস্থার মধ্যে কি এই উভয়ের মধ্যে একটা আপোষ-রফার চেষ্টা দেখা যায় না? জৈন বৌদ্ধাদি ধর্ম্মের সন্ন্যাস-প্রাধান্যের মূলও হয়ত ঐখানেই।

বেদে সাহিত্য সঙ্গীত নাট্য অভিনয়াদি কলার প্রসারের পীঠস্থান ছিল যজ্ঞভূমি। অবৈদিক কালচারের সেই ভূমি ছিল তীর্থে। বেদবিরুদ্ধ প্রখ্যাত অষ্টাদশ তৈর্থিক ছাড়া আরও বহু তৈর্থিকের কথা আমরা পাই। জৈনদের আচার্য্যরাও তীর্থঙ্কর।

রথযাত্রা স্নানযাত্রা প্রভৃতি উৎসবও আর্য্যপূর্ব্ব এমন কোনো ধারা হইতে আসিল কি-না তাহা সন্ধান করিয়া দেখিবার বিষয়। দামো গেজেটিয়রে আছে কুন্তলপুরে রথ-উৎসবের প্রধান কথা হইল জলযাত্রা। তাহাতে মহাবীরকে স্নান করান হয়। সেই স্নাতাবশেষ জল ভক্তরা ক্রয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত হাতে মুখে মাখেন।

জৈন বৌদ্ধাদি ধর্ম্মে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকরা সবাই ক্ষত্রিয়। সকলেই দেখাইতে চায় তাহার ধর্ম্ম খুব উচ্চবংশীয় মহাপুরুষের কাছে প্রাপ্ত। তাই ভারতে মধ্যযুগে জোলা ধুনকার প্রভৃতি জাতীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদেরও ব্রাহ্মণ বানাইবার চেষ্টা হইয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে গিয়াও জৈনরা কখনও একথা বলেন নাই যে তাঁহাদের আদি গুরুরা ব্রাহ্মণ। দেখা যায় ভারতে বেদের বাহিরের সত্যগুলি উদারভাবে সর্ব্ব-প্রথমে প্রায় ক্ষত্রিয়রাই স্বীকার করিয়াছেন।

মগধ ও বঙ্গের পশ্চিম সীমাতেই জৈনধর্ম্মের আদি ও পবিত্র স্থান। খুব সম্ভব এক সময় বাংলা দেশে বৌদ্ধ মত অপেক্ষা জৈনধর্ম্মেরই বেশী পসার ছিল। ক্রমে জৈনধর্ম্ম সরিয়া গেলে বৌদ্ধধর্ম্ম সেই স্থান অধিকার করে। এখনও বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে সরাক জাতি শ্রাবকদের পূর্ব্বস্মৃতি বহন করিতেছে। এখনও বহু জৈন-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, বহু জৈনমূর্ত্তি, শিলালেখ প্রভৃতি জৈন-চিহ্ন বাংলার নানা স্থানে দৃষ্ট হয়।

বাংলার অনেক স্থানে দিগম্বর বিশাল সব জৈনমূর্ত্তি ভৈরব নামে পূজিত হয়। বিশেষতঃ বাঁকুড়া মানভূম প্রভৃতি স্থানে বহু গ্রামে এখনও অনেক জৈনমন্দিরের অবশেষ দেখা যায়। পঞ্চকোটের রাজাদের অধীনে অনেক গ্রামে বড় বড় জৈনমূর্ত্তির পূজা এখন হিন্দু পুরোহিতরা করেন দেবতার নাম ভৈরব। সাধারণে সেখানে পশু বলি দেয় সেই সব মূর্ত্তির গায়ে এখনও জৈন-লেখ পাওয়া যায়। স্বর্গী রাখালদাস ব্যানার্জিও এইরূপ মূর্ত্তি ওখান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। বাংলার ধর্ম্মে ব্রতে ও আচারে এখনও জৈন ধর্ম্মের প্রভাব খুঁজিলে বাহির হইয়া পড়ে। জৈন বহু শব্দ এখনও বাংলাতে প্রচলিত। পার্শ্বনাথ হেমচন্দ্র প্রভৃতি বহু জৈন নামে এখনও বাংলার নামকরণ হয়।

জৈন সাধুদের উত্তরীয়কে বলে 'পাছেড়ী' তাহাই আমাদের 'পাছুড়ি'। জৈন সাধুদের কীট-অপসারণের জন্য যে ঝাঁটা তাহাকে বলে 'পিছী', পূর্ব্ব-বাংলাতে ঝাঁটাকে বলে 'পিছা'। দিগম্বর সাধুরা ময়ূরপুচ্ছ দিয়া এই 'পিছী' করেন। এইরূপ খোঁজ করিলে আরও বহু শব্দ বাহির হয়। বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্মদেশক প্রাকৃত ভাষাকে এক সময় বাংলা দেশ জৈন ভাষা বলিয়াই জানিত। বুদ্ধও জিন কি-না। পালি বলিয়া আলাদা কোনো ভাষার উল্লেখ তাঁহারা করেন নাই।

প্রাচীন বাংলা-লিপির অনেক অক্ষর—বিশেষতঃ যুক্তাক্ষর-গুলি দেবনাগরী অক্ষরের সঙ্গে মেলে না অথচ প্রাচীন জৈন-লিপির সঙ্গে মেলে। এইরূপ লিপি গুজরাত রাজপুতানা পঞ্জাব প্রভৃতি দেশের পুঁথীতেও দেখা যায়। জৈন সাধুরা এখনও ঐ লিপিতেই লেখেন।

বাংলা দেশে জৈন ধর্ম্ম কেন তবে টিকিল না তাহ অনুসন্ধান করা উচিত। এখানকার আহার বিহার আচারাদি

সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য হইল না; না তাহার আরও কোনো হেতু আছে, তাহা দেখা দরকার। বৌদ্ধধর্ম্ম হয়ত সেই সব বিষয়ে অনেকটা মিটমাট করিয়া বাংলা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল।

অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি প্রমুখ কেহ কেহ অভিযোগ করেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন অকুণ্ঠিত ভাবে ভারতের ভিতরে বাহিরে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, জৈনধর্ম্ম সেইরূপ করিতে পারে নাই। উভয় ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান এক হইলেও ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইল যে বৌদ্ধধর্ম্ম বেশী প্রতিষ্ঠিত হইল পূর্ব্ব-ভারতে ও জৈনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল পশ্চিম-ভারতে। পূর্ব্ব দিকে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত ছাড়িয়া ব্রহ্ম শ্যাম চীন প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হওয়ায় ঐসব দিক হইতে ভারতবর্ষের কোনো রাজনৈতিক বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা গেল দূর হইয়া। জৈনধর্ম্ম যদি তেমন করিয়া ভারতের বাহিরে পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়িত তবে হয়ত ভারতের পরবর্ত্তী বহু দুঃখ ও দুর্গতি ঘটিতেই পারিত না। কথাটা ভাবিয়া দেখিবার মত। আবার অনেকে এই অভিযোগও করেন যে জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের মত পরকে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই, সকলকেই দূরেই ঠেকাইয়া রাখিয়াছে।

জৈনদের গ্রন্থভাণ্ডারগুলি ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের জন্য অমূল্য সব উপকরণে ভরা। যদি এগুলি সবার কাছে উন্মুক্ত হইতে পারিত তবে ভারতের ইতিহাসগত অনেক সংশয় দূর হইয়া যাইত আর জৈনধর্ম্মের মাহাত্ম্যও প্রত্যক্ষ হইত। কিন্তু যখন দেখি মুনি জিন বিজয়জী, পণ্ডিত সুখলালজী, পণ্ডিত বেচরদাসজী প্রভৃতির মত লোকের কাছেও তাহা উন্মুক্ত হইতে চাহে না তখন আর ভরসা কোথায়?

যাঁহারা অভিযোগ করেন তাঁহারা ইহাও বলেন জৈনধর্ম্মে ক্রমে বণিকরাই হইলেন প্রধান, তাই সংগ্রহ ও রক্ষার কাজ যত সহজে হইয়াছে প্রসার ও প্রচারটা তত সহজে হয় নাই।

অহিংসার আদর্শ যে-জৈনধর্ম্মে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা ছিল সেই মৈত্রী-প্রধান জৈনধর্ম্মের বণিকদের বাণিজ্যনীতি আজ পাশ্চাত্য সব নিষ্ঠুর বাণিজ্য-ব্যবস্থার সঙ্গে মিশিয়া কলুষিত হইয়াছে। আজ গৌণভাবে নানাবিধ ব্যাপক মানব-হিংসার জন্য এই ব্যবসায়পদ্ধতি দায়ী। সভ্যতার জটিলতায় এই দিনে দেখা যাইতেছে 'হাতে মারা' হইতেও বহুব্যাপক ও অতি নিষ্ঠুর ভাবে ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে বধ করা যায় 'ভাতে মারিয়া'। যাহাতে এইরূপ বহুব্যাপক সুগভীর নরহিংসার অপ্রত্যক্ষ রক্তে এই প্রাচীন পবিত্র ধর্ম্ম কলুষিত না হইতে পারে তাহা প্রত্যেক মৈত্রীর সাধক জৈনধর্ম্ম-হিতৈষীর দেখা উচিত।

যে-জৈনধর্ম্ম ছিল সন্ন্যাস ও তপশ্চর্য্যার আদর্শে অনুপ্রাণিত আজ তাহাই কত ব্যর্থ ঐশ্বর্য্যবিলাসে ও আড়ম্বরে হইয়াছে পর্য্যবসিত! জৈন দেবালয় প্রতিমা উৎসব প্রভৃতি সবই নিষ্ঠুর বৈভববিলাসে ভারাক্রান্ত। একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে আর্থিক যে ভিত্তির উপর এই সব ধর্ম্ম-উৎসবগুলি প্রতিষ্ঠিত তাহা নানা প্রকারের লোকসম্মত বহুব্যাপক হিংসার অপ্রত্যক্ষ রক্তে কলুষিত, কাজেই এই সব ধর্ম্মাচরণকে পবিত্র করার জন্যও সর্ব্ববিধ বিলাস ও আড়ম্বর ত্যাগ করা প্রয়োজন।

ধর্ম্মের পক্ষে দারিদ্র্য মোটেই অশোভন নহে। এবং আদর্শের বিশুদ্ধির জন্য আদি ধর্ম্মগুরুরা সেই দারিদ্র্যকে গৌরবের সঙ্গেই বহন করিয়া গিয়াছেন। বরং যে ঐশ্বর্য্যের মূলে কোথাও কিছুমাত্র বিশুদ্ধির অভাব আছে, সেই ঐশ্বর্য্যই ধর্ম্মের পক্ষে একান্ত অশোভন ও সাধনার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বাধা। জৈনদের এক একটা শোভাযাত্রায় যে ব্যয় হয় তাহা ভাবিলেও অবাক হইয়া যাইতে হয়। এমন অবস্থায় ইহাঁদের মহাতপস্বীদের কঠোর তপস্যা দেখিয়াও যদি কেহ মনে করেন তাহার মূলেও এক প্রকার অপ্রত্যক্ষ রাজসিকতা আছে, তবে তাহাকে নিতান্ত দোষ দেওয়া যায় না। তপস্যার মূলেও যদি দেখাইবার ইচ্ছা বা রাজসিকতা থাকে, তবে তাহা বাহ্য বৈভব হইতেও ধর্ম্মের পক্ষে সাঙ্ঘাতিক, কারণ তাহাকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়াই সবাই জানে।

সকলের উপর শোচনীয় ইহাঁদের একান্ত তীব্র আত্ম-কলহ। অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহাঁদের মধ্যে দলাদলির আর অন্ত নাই। ইহাঁদের 'নিহ্নব' 'গচ্ছ' প্রভৃতি ভেদের কথা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাহা ছাড়াও দেখা যায় ইহাঁদের ডেরাবাসী মূর্ত্তিপূজক শাখাতে চৌরাশিটি সম্প্রদায়, স্থানকবাসী শাখাতে বত্রিশটি ভেদ। ভেদ ও ভাগের আর অন্ত নাই।

এক একটি তীর্থ লইয়া মোকদ্দমায় ইহাঁদের যে অসম্ভব ব্যয় হইয়াছে তাহা ভারত ছাড়া আর কোনো দেশে কেহ বিশ্বাসই করিতে পারিবে না। এক পরেশনাথ পর্ব্বতের অর্থাৎ সমেত তীর্থের মোকদ্দমা লইয়া শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই উভয় দলে যে বিপুল ব্যয় হইয়াছে তাহাতে আর একটি পরেশনাথ পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়া আর একটি তীর্থ প্রতিষ্ঠিত করা যাইত। শুধু টাকার স্তূপ দিয়াই পর্ব্বতই করা যাইত।

এই সব তীর্থ লইয়া যে লাঠালাঠি মারামারি হত্যা প্রভৃতিই কত ঘটে তাহা কি লিখিয়া শেষ করা যায়? ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে যে মাসে উদয়পুরে কেসরিয়া তীর্থে একটি জীর্ণ ধ্বজার সংস্কার লইয়া শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই দুই দলে যে দাঙ্গা হয় তাহাতে শ্বেতাম্বররা দিগম্বরদের পাঁচ জনকে তখনই খুন করে, পনর জনের আর জীবনের আশাই দেখা যায় নাই, আর ১৫০ জন আহত হয়। এই খবরটি বাহির হয় শ্বেতাম্বরদেরই মুখ্য পত্র "জৈন যুগে" (১৯২৭ বৈশাখ)। পরবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ কাগজেই বোম্বাইয়ের একজন শ্বেতাম্বর জৈন সলিসিটর এক প্রতিবাদ বাহির করেন। তিনি লেখেন—এই দাঙ্গায় শ্বেতাম্বরদের কোনোই দোষ নাই, যদিও তিনি এ-কথা স্বীকার করেন যে, চারি জন দিগম্বরী মারা গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মতে সে দোষ তাঁহাদের নিজেরই। তিনি এই কথাও লেখেন যে, যাহা হউক, জৈনতীর্থে মানুষ মারা গেলেও এক বিন্দু রক্তপাত ঘটে নাই। কাজেই দেখা যাইতেছে যাঁহারা মারা গিয়াছেন তাঁহারা লোক ভাল, কারণ তাঁহারা ধাক্কায় ও মর্দ্দনেই মরিতে রাজি হইয়াছেন। অস্ত্রাঘাতপ্রাপ্তির দুরাকাঙ্ক্ষা করিয়া তাঁহারা প্রতিপক্ষকে বৃথা হয়রাণ করেন নাই। যাহা হউক, প্রাণ গেলেও এমন পবিত্র জৈন-তীর্থে রক্তপাত যে ঘটে নাই ইহাই পরম সান্ত্বনা। সলিসিটর মহাশয় জৈনতীর্থের পবিত্রতার সাক্ষ্যস্বরূপে এই পরম সান্ত্বনার কথা বহুবার উৎসাহ-ভরে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই জাতীয় নানা রকমের অভিযোগ জৈনদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে শোনা যায়। মুখে বা লেখায় নিপুণ রচনায় তাহার কোনো উত্তর দিয়া কিছু লাভ আছে কি? জৈনধর্ম্মের উন্নত সাধনা পবিত্রতা ও প্রেমে মৈত্রীতে পরিপূর্ণ জীবনের দ্বারা যদি এই সব অভিযোগকে নিঃশব্দে নিরুত্তর না করা যায়, তবে তর্কের বিরুদ্ধে তুমুলতর তর্ক দিয়া বৃথা যুদ্ধ করিয়া লাভ কি? তাহাতে নৈপুণ্য প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের মহত্ত্ব তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

এতক্ষণ শুধু নানা অভিযোগ ও বিরুদ্ধতার কথাই বলা গেল। এখন বলিতে চাই ইহাতেও হতাশ হইবার কোন হেতু নাই, যদি দেখা যায় যে এই ধর্ম্মের মধ্যে এখনও প্রাণশক্তি আছে। যে ধর্ম্মে হেমচন্দ্র যশোবিজয়জীর মত বহু বহু মহাপণ্ডিত জন্মিয়াছেন আর যাঁহারা জগতে অতুলনীয় সব গ্রন্থভাণ্ডার রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের হতাশ হইবার কোনো কারণ নাই। এই-সব লক্ষণ ছাড়াও জৈনধর্ম্মের মধ্যে নানাভাবে যে অতিগভীর প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে আজ সে-সম্পর্কে দুই একটি কথা বলিলে যথার্থই অন্তরে আশার সঞ্চার হয়।

জৈনরা যদিও সঙ্ঘগতভাবে ভারতের বাহিরে প্রচার করেন নাই, তবু ব্যক্তিগত ভাবে মাঝে মাঝে এক এক জন জৈন সাধু ভারতের বাহিরে গিয়া অহিংসা মৈত্রী প্রভৃতির মহা আদর্শ জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিয়াছেন। খোঁজ করিয়া দেখিলে এইরূপ খবর মাঝে মাঝে পাওয়া যাইবে।

প্রাচীন কালেও ভারতে যোগী নাথপন্থী প্রভৃতি মতের সাধুরা পারস্য আরব সিরিয়া মিশর তুরস্ক প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিতে যাইতেন। আমার বাল্যকালেও কাশীতে আমি মাঝে মাঝে এমন যোগী দেখিয়াছি যাঁহারা নীলনদী ও কাস্পিয়ান সাগরে স্নান করিয়া আসিয়াছেন।

৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি এইরূপ বিশ জন যোগী সা[illegible] একত্র হইয়া এক দল বাঁধিয়া ভারতের বাহিরে পরিব্রজনে বাহি[র] হন, তাঁহাদের সঙ্গে চিকিৎসকরূপে এক জন জৈন সন্ন্যাসী[ও] গিয়াছিলেন। তাঁহারা মাঝে একবার দেশে ফিরিয়া আবা[র] ঐ সব দেশে পর্য্যটন করিতে যান। দুইবার এইরূপ না[না] দেশ পর্য্যটন করিয়া ছাব্বিশ বৎসর পরে ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দে শেষবার তাঁহারা দেশে ফেরেন। এই দলের সঙ্গে সিরিয়া দেশের প্রখ্যাত কবি অন্ধ জ্ঞানী সাধক আবুল আলার পরিচ[য়] ঘটে।

সিরিয়া দেশে "মা অর্‌ রাত অল নুমান" নামক এক[টি] গ্রামে ৯৭৩ বা ৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভ্রান্ত "তনুৎ" নামক আর

বংশে আবুল আলার জন্ম। তাঁহার পিতামহ সুলেমান অল মঅআরী দীর্ঘকাল কাজী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। চারি বৎসর বয়সে আবুলের যে দারুণ বসন্ত রোগ হয় তাহাতে তিনি দৃষ্টিহীন হইয়া যান। তথাপি তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল এমন অদম্য যে তিনি মোরক্কো হইতে বোগদাদ পর্য্যন্ত নানা স্থানে জ্ঞানার্থী হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহার মত ছিল অতিশয় উদার ও একেবারে অসাম্প্রদায়িক। তিনি এতদূর স্বাধীন-চেতা ছিলেন যে, কি ধনী, কি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মগুরু কাহারও কোনো অন্যায়কে তিনি রেহাই দিয়া কথা বলেন নাই। তাঁহার রচিত "সকৃত্-অল-জন্দ" সেই দেশে অতিশয় সম্মানিত কাব্যগ্রন্থ ছিল। উদার মত ও স্পষ্টবাদিতার জন্য তাঁহার সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে বহু তীব্র আন্দোলন চলিয়াছে, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্যই করেন নাই। পরিশেষে বোগদাদে গিয়া ভারতীয় এই সব জ্ঞানীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে, তার পরই তাঁহার মতামত একেবারে আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আবুল আলার কাব্যের শক্তিশালী প্রভাব ওমর খয়্যামের মত মহাকবিও এড়াইতে পারেন নাই।

এই দলের সঙ্গে পরিচয়ে ও আরও নানা সূত্রে আবুল আলা ভারতীয় অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রতি রীতিমত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। যোগ সম্বন্ধে তিনি ভারতীয় সাধকদের মতই মর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার ঈশ্বর তাঁহার চারিদিকের বা তাঁহার সমধর্ম্মাবলম্বী সকলের স্বীকৃত ঈশ্বরের মত নহেন; তিনি অনেকটা ভারতীয় যোগীদের ঈশ্বরের মতই সর্ব্বব্যাপী নির্লিপ্ত। ধর্ম্মজগতের কুসংস্কার ছিল আবুল আলার অসহ্য। এই-সব কুসংস্কারের বলে যে একদল লোক অন্য সকলের উপর প্রভুত্ব করিয়া বেড়ায় ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

স্বর্গাদিতে তাঁহার বিশ্বাস ও আস্থা আর রহিল না বরং জৈন-বৌদ্ধাদির মত তিনি মনে করিতে লাগিলেন মুক্তিতেই আমাদের দুঃখময় সত্তার অবসান ও সত্তাই আমাদের সকল দুঃখের আধার। তাই একমাত্র নির্ব্বাণ মুক্তিই প্রার্থনীয়। তিনি বোগদাদ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া ভারতীয় তপস্বীদের মত গুহাতে বাস করিয়া অতি কৃচ্ছ্র তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। ইহার পর তাঁহার কাব্য আর এক ভাবে ভরপূর হইয়া উঠিল। মদ্য মৎস্য মাংস ডিম্ব, এমন কি দুগ্ধ প্রভৃতিও তিনি ত্যাগ করিলেন। তাঁহার বাক্যের তীব্রতা ক্রমে তপস্যার কৃচ্ছ্রতায় পরিণত হইল। জীবন শান্তি ও মৈত্রীতে ভরিয়া উঠিল।

ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্বজীবের প্রতি তিনি ছিলেন অপরিসীম করুণাপরায়ণ। তাঁহার কবিতাতে দেখা যায়, "কেন বৃথা পশুহিংসায় জীবন কর কলঙ্কিত? বেচারা বনচারী শিশুদের কেন নিষ্ঠুর হইয়া কর শিকার? চিরদিন তুমিও কিছু ব্যাধ রহিবে না, সেও কিছু বধ্য থাকিবে না। এক দিন তোমাকে এই পাপের ক্ষালন করিতেই হইবে।"

সাম্প্রদায়িক ভাবে লোকে তাঁহার বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ও তপশ্চর্য্যার খাতিরে নানা স্থান হইতে তাঁহার কাছে বহু উপহার আসিত। তিনি তাহা দীনদুঃখীকে বিলাইয়া দিয়া নিজে মুনিজনোচিত সরল জীবন যাপন করিতেন।

আবুল আলার এই অহিংসবাদের মূলে যে ভারতীয় ধর্ম্মের প্রভূত প্রভাব আছে ইহা ত সকল দেশের বিদ্বজ্জনেরাই জানেন। কিন্তু তাঁহার মতামতে জীবনযাত্রায় তপশ্চর্য্যায় কি বিশেষভাবে জৈনধর্ম্মের কোনো প্রভাব দেখা যায় না? তাঁহার কবিতার রস যাঁহারা ইংরেজী ভাষায় আস্বাদ করিতে চান, তাঁহারা শ্রীযুত অমীর রিহানী কর্ত্তৃক অনুবাদিত আবুল আলার "লুজু মিয়াত" নামে কাব্যসংগ্রহ পড়িয়া দেখিতে পারেন। (James T. White, & Co., New York)।

আবুল আলার এই-সব মতবাদ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইয়া যায় নাই। পরবর্ত্তী সূফী-মতবাদের মধ্যে তাহা স্থান পাইয়াছে। তাই বিখ্যাত মরমী কবি জালাল অল দীন রূমীর (জন্ম ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে) কবিতার মধ্যেও জন্মান্তরবাদের চমৎকার উল্লেখ মেলে।

রূমী বলিতেছেন, "ছিলাম পাষাণ, মরিয়া হইলাম বৃক্ষলতা; ছিলাম উদ্ভিদ, মরিয়া হইলাম জন্তু; ছিলাম জন্তু, মরিয়া হইলাম মানব। এখন আমি বাঁচিয়া উঠিব অমরলোক-বাসী হইয়া; ক্রমে সে অবস্থাও অতিক্রম করিয়া আমি অপূর্ব্ব অনুপম গতি করিব লাভ; আমি হইব শূন্য, শূন্যে হইব লয়প্রাপ্ত"—ইত্যাদি। এই-সব কথার মধ্যে কি নির্ব্বাণের ভাব পাই না?

তাঁহার আবার এমন সব বাণীও আছে যাহাতে ভারতের

পূর্ণ প্রেমপন্থী মরমীদের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—"সূর্য্যের রশ্মির মধ্যে দীপ্ত রেণুরূপে আমিই ভাসমান, সূর্য্যের দীপ্ত গোলকরূপে আমিই দীপ্যমান, আমিই উষার প্রথম জ্যোতি-লেখা, আমিই সন্ধ্যার শান্তপ্রাণ সমীরণ"—ইত্যাদি।

জৈনধর্ম্মের অন্তরে যে গভীর প্রাণ আছে তাহার আর একটি মহালক্ষণের কথা এখন বলিব। অনেক সময় মনে হয় একটা বৃক্ষ পুরাতন হইয়া মরিয়া গিয়াছে। বুঝাই যায় না যে, তাহার মধ্যে কোথাও প্রাণ আছে। তাহার পর হঠাৎ একদিন যখন নব বসন্তাগমে কি আকাশের বারিবর্ষণে দেখা যায় তাহাতে পল্লবমুকুল ধরিয়াছে, তখন আর আশা না হইয়া যায় না।

ভারতে এইরূপ একটি নবযুগ আসিল গুরু রামানন্দের সঙ্গে সঙ্গে। তাহার পরই কবীর, রবিদাস, নানক প্রভৃতি নানা মহাপুরুষের সাধনায় উত্তর-ভারতবর্ষের ধর্ম্মের ঐশ্বর্য্য উঠিল ভরপুর হইয়া।

জৈনদের মধ্যেও এই সময়ে এক মহাপুরুষের জন্ম হয়, তাঁহার নাম লোঙ্কা শাহ। মূর্ত্তিপূজক জৈনধর্ম্মের মধ্যে জন্মিয়াও ইনি কবীর নানক প্রভৃতির মত মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে ঘোর যুদ্ধ করিয়াছেন। জৈন বৈশ্যকুলে তাঁহার জন্ম। আমেদাবাদেই তিনি বাস করিতেন, কিন্তু কেহ কেহ বলেন তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস ছিল কাঠিয়াওয়াড়ে।

জর্ম্মাণ পণ্ডিত স্থব্রীণের একটি হস্তলিখিত লেখায় দেখিয়াছি যে, তাঁহার মতে লোঙ্কার সময় ১৪৫২ খৃষ্টাব্দ। লোঙ্কার সম্বন্ধে আর কোনো খবর স্থব্রীণের সেই লেখায় পাইলাম না, তাঁহার নিরূপিত সময়ের উপরও নির্ভর করিতে পারিলাম না। ১৪৫২ খৃষ্টাব্দ কি স্থব্রীণের মতে লোঙ্কার জন্মসময়? তাহা কেন যে সম্ভব নহে তাহা পরে দেখান যাইতেছে।

কবীর প্রভৃতির মত লোঙ্কা শাহ পুরাতন শাস্ত্র প্রভৃতি সব একেবারে ছাড়িয়া দিয়া কেবল স্বাধীন আত্মানুভবের উপর ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। তিনি প্রচলিত মূর্ত্তিপূজা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যর্থ আচার-অনুষ্ঠান, কুসংস্কার প্রভৃতি দূর করিতে প্রধানতঃ প্রাচীন বিশুদ্ধ শাস্ত্রেরই আশ্রয় করিলেন। তাঁহার সঙ্গে এই বিষয়ে অনেকটা মার্টিন লুথারকে তুলনা দেওয়া চলে। লোঙ্কা শার এই অনুবর্ত্তীদের বলে স্থানকবাসী। লোঙ্কার মৃত্যুর প্রায় তিন শতাব্দী পরে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কাঠিয়াওয়াড়ের স্থানকবাসীদের মধ্যে পাঁচটি "সংঘাড়া" বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। স্থানানুসারে এই পাঁচ সম্প্রদায়ের নাম (১) গোণ্ডাল, (২) লিমড়ী, (৩) বড়ৱালা, (৪) চুড়া ও (৫) ধ্রাংগধ্রা। এই গোণ্ডাল শাখার সাধুদের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে লোঙ্কার কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মুসলমানদের রাজত্ব যখন গুজরাটে সুপ্রতিষ্ঠিত তখন একদিন লোঙ্কা শাহ দেখিলেন একটি মুসলমান "চিড়া" নামক যন্ত্রদ্বারা পক্ষীশিকার করিতেছে। এই নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিয়া লোঙ্কা মনের দুঃখে মুসলমান রাজার রাজ্যে চাকরি ছাড়িয়া দিলেন এবং সাধারণ শ্রাবক রূপে পুঁথিলেখার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন ও আমেদাবাদেই রহিলেন।

একদিন এক "লিঙ্গধারী" শ্বেতাম্বর জৈন ভদ্রলোক একখানি "দশ বৈকালিক সূত্র" গ্রন্থ লোঙ্কাকে নকল করিতে দেন। লোঙ্কা গ্রন্থখানি পড়িয়া মুগ্ধ হন ও নকল করিতে গৃহে লইয়া আসেন। তাঁহার একটি বিধবা কন্যা ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া তিনি গ্রন্থখানির দুইটি প্রতিলিপি করিয়া একখানি নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন ও আর একখানি সেই ভদ্রলোককে দিলেন। এরূপ ভাবে আরও কিছু গ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করিয়া খুব ভাল করিয়া তাহা অধ্যয়ন করিতে ও লোকমধ্যে বিশুদ্ধ জৈন-মত প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার মধুর ও সহজ শ্রদ্ধায় উচ্ছ্বসিত উপদেশে লোকের চিত্ত বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইল।

তিনি সাধু নহেন, তাই সাধুরা তাঁহার এই আচরণ পছন্দ করিলেন না। এমন সময় একদল জৈন তীর্থযাত্রী তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে আমেদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হন। এই দলের মধ্যে বোধ হয় প্রধান যাত্রী ছিলেন শম্ভুজী নামে এক ভদ্রলোক। তাঁহার পৌত্রী মোহ বাঈ অতি অল্পবয়সে বিধবা হওয়ায় সেই বালিকা ও তাহার মাতাকে লইয়া তিনি তীর্থযাত্রায় বাহির হন। সেই দলে নাগজী, মোতিচংদ, গুলাবচংদ প্রভৃতি ভদ্রলোকও ছিলেন। আমেদাবাদে লোঙ্কা শার নাম শুনিয়া তাঁহারা তাঁহার উপদেশ শুনিতে যান।

সেই যাত্রীদলের নেতা সাধুরা এই-সব কথা শুনিয়া গেলেন চটিয়া, কারণ লোঙ্কা একজন সামান্য বৈশ্য গৃহস্থ মাত্র, তিনি সন্ন্যাসীও নহেন। কিন্তু লোঙ্কার উপদেশ সকলের এত ভাল লাগিল যে, তাঁহারা সেই সাধুদের

নিষেধ মানিলেন না। তাই সেই সব সাধু যতিরা ঐ যাত্রীদের ত্যাগ করিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। তখন সেই দলের পঁয়তাল্লিশ জন লোক লোঙ্কার কাছে নূতন করিয়া দীক্ষা লইলেন। এই ঘটনা ঘটিল ১৫৩১ সংবতের জ্যৈষ্ঠ শুক্লাপঞ্চমীতে, অর্থাৎ ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে। কেহ বলেন এই ঘটনা ঘটে ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে।

এই ঘটনার কিছু পূর্ব্ব হইতেই লোঙ্কার প্রচার চলিয়াছিল এবং তাঁহার প্রচারের পূর্ব্বে তিনি পুঁথী তাঁহার বিধবা কন্যাকে দিয়া প্রতিলিপি করাইতেন। তাঁহার বিধবা কন্যার বয়স যদি তখন কুড়ি বৎসরও ধরা যায় তবে সেই পুঁথী নকলের সময়ে লোঙ্কার বয়স আনুমানিক পঁয়তাল্লিশ বৎসর হওয়া সম্ভব। তার পরও কয়েক বৎসর প্রচারকার্য্যে ব্যতীত হইলে এই দল তাঁহার কাছে দীক্ষা নেয়। যাহা হউক, খুব সাবধানে খুব কম করিয়া ধরিলেও লোঙ্কার তখন বয়স পঁয়তাল্লিশ হইতে কম হইতেই পারে না। তাহা হইলেই দেখা যায়, ১৪২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই লোঙ্কার জন্ম। মোটকথা, ইহা বলা চলে যে, ১৪২৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি লোঙ্কার জন্মকাল। কাজেই দেখা যায় কিছুকালের জন্য অন্ততঃ লোঙ্কা কবীরের সমসাময়িক।

প্রাচীনপন্থী সাধু ও গৃহস্থরা লোঙ্কার বিরুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে লাগিয়া গেলেন, তবু নানাবিধ বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়াও লোঙ্কার প্রভাব বাড়িয়াই চলিল। লোঙ্কা গৃহীই রহিলেন, সন্যাসী হইতে স্বীকার করিলেন না; অথচ তাঁহার শিষ্যরা অনেকেই মুনি হইলেন। তাহার মধ্যে মুনি সর্বাজী, মুনি ভাণাজী, মুনি মুন্নাজী, মুনি জগমলজী সমধিক প্রখ্যাত। লোঙ্কার ধর্মকে তখন সকলে দয়াধর্ম্ম বলিত এবং গৃহস্থ হইলেও লোঙ্কাকে সকলে দয়াধর্ম্ম মুনি বলিত। লোঙ্কার দল দয়াগচ্ছ নামে প্রসিদ্ধ হইলেও কেহ কেহ তাঁহাকে তপাগচ্ছও বলিত। এই হইল স্থানকবাসী সাধুদের সম্প্রদায়ের সূচনা।

তখন মুসলমান রাজত্ব। নানাস্থানে মূর্ত্তি ও জৈনপ্রতিমা ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলা হইতেছে; কোথাও কোথাও তাহা দিয়া মসজিদ, প্রাসাদ, সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা চলিয়াছে। শুধু এই-সব কারণে নয়, বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়াও লোঙ্কা এই প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে লাগিয়া গেলেন। জৈনধর্ম্ম তখন তাহার প্রাচীন বিশুদ্ধি হারাইয়া প্রতিমাপূজা, উৎসব, আড়ম্বর ও নানা ব্যর্থ অনুষ্ঠানে ও মিথ্যা রাজসিকতায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। লোঙ্কা সেই সব মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মহাবীরের জন্ম-উৎসব উপলক্ষে যে ব্যর্থ আড়ম্বর হইত স্থানকবাসীরা তাহাও তীব্রভাবে আক্রমণ করিলেন।

আমেদাবাদের পর পাটনে লোঙ্কার কাছে রূপচংদ শাহ প্রভৃতি ১৫২ জন দীক্ষা লইলেন। রূপচাঁদের নাম হইল রূপ ঋষি। লোঙ্কা অর্থাৎ দয়াধর্ম্ম মুনির পর রূপ ঋষিই বসিলেন গুরুর আসনে। তাঁহার পর বসিলেন সুরতের জীবা ঋষি।

যতদিন পর্য্যন্ত ইঁহারা নানা বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন ততদিন আপন বিশুদ্ধ আচার রক্ষা করিয়াই চলিয়াছিলেন। তার পর যখন লোকমধ্যে ইঁহাদের রীতিমত প্রতিষ্ঠা হইল, তখন এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এক এক জায়গায় জমাইয়া বসিয়া যাইতে লাগিলেন, সাম্প্রদায়িক বৈভব জমিয়া উঠিতে লাগিল। তখন ক্রমে 'স্থানক দোষ' তাঁহাদের স্পর্শ করিতে লাগিল বলিয়া লোকে তাঁহাদিগকে বলিতেন স্থানকবাসী। সাধুরা পাত্রাদির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করিলেন অর্থাৎ শাস্ত্রের অননুমোদিত নানা বস্তুর ব্যবহার ও সঞ্চয় চলিতে লাগিল। কেহ কেহ আবার জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের দ্বারা অর্থোপার্জ্জনেও প্রবৃত্ত হইলেন।

জীবঋষির পর তাঁহার স্থানে বসিলেন নানাঋষি, তাঁহার পরে সম্প্রদায়গুরু হইলেন জীবরক্ষা ঋষি। এই পন্থে ভীমাজী, রতনজী, উদাজী, বীজাজী, জীবরাজজী, শ্রীচংদজী, লালজী প্রভৃতি সকলে ঋষি নামেই প্রখ্যাত হইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু স্থানকবাসীরা চিরদিনের জন্য প্রতিমাদি পরিহার করিয়া রাখিতে পারিলেন না। পরে তাঁহাদের সম্প্রদায়ে আবার প্রতিমা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ডেরাবাসীদের প্রতিমা ক্রমে স্থানকবাসীদেরও পাইয়া বসিল। এই ভাবে স্থানকবাসীদের পুণ্য প্রভাব পরে ক্রমে ক্ষীণ ও ম্লান হইয়া আসিল।

গোণ্ডাল শাখার স্থানকবাসী সাধু প্রাণলালজীর লিপি অনুসারে আমরা আরও অনেক শাখার উৎপত্তির খবর পাই। যথা, ১৫৬৪ সংবতে কতুক সাধু কতুক-মত প্রবর্ত্তন করেন। ১৫৭০ সংবতে বীজসাধু বিজয়-মত চালান—

এই মত আগমসম্মত। ১৫৭২ সংবতে পাশ্বচন্দ্র নিরুক্তি, ভাষ্য, চূর্ণী, ছেদগ্রন্থ প্রভৃতির প্রামাণ্যতা অস্বীকার করেন। ১৭৬২ সংবতে কড়ুয়া বাণিয়া কড়ুয়া-মত চালান। ১৭২২ সংবতে যশোবিজয়জী আনন্দঘনজীর সময়। ১৮১৮ সংবতে ভীমজী তের জন সাধু লইয়া স্বতন্ত্র হইয়া তেরপন্থ নামে এক মত চালান। ইত্যাদি ইত্যাদি এই-সব খবরে সকলের কৌতূহল হইবে না মনে করিয়া আর উদ্ধৃত করিলাম না।

১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি মহাপণ্ডিত যশোবিজয়জী ও বিখ্যাত মরমী কবি আনন্দঘনজীর কাল। আনন্দ ঘনজীর কিছু পরিচয় আমি পূর্ব্বে আর একটি লেখায় দিয়াছি। চিদানন্দ প্রভৃতির কথা আর উল্লেখ করিলাম না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কাঠিয়াওয়াড়ে স্থানকবাসীরা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হইয়া যান। তার পর ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে লিমড়ী শাখা হইতে "সায়লা" শাখার উদ্ভব হয়। এই সায়লা শাখার গ্রন্থালয়ে বাংলা অক্ষরে লেখা বাঙালী সাধুর সংগৃহীত তন্ত্র ও চিকিৎসার পুঁথী দেখিয়াছি। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে গোণ্ডাল শাখা হইতে সংঘাণী শাখা এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ধ্রাংগধ্রা শাখা হইতে বোটাদ শাখার উৎপত্তি হয়। এই ত গেল শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহার একটু বিবরণ।

দিগম্বর সম্প্রদায়ের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে তারণপন্থের বিশেষ প্রভাব হয়। তারণ মুনি তাহার প্রবর্ত্তক। তিনিও মূর্ত্তিপূজা, রুদ্রাচার ও মিথ্যা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোর যুদ্ধ করেন।

কাজেই যে-ধর্ম্মে যুগে যুগে এই ভাবের নব নব প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহার সম্বন্ধে হতাশ হইবার কোনোই হেতু নাই। শুধু তর্ক করিয়া বিপক্ষকে নিরুত্তর করিবার চেষ্টা করিয়া কোনো লাভ নাই, সাধনার জীবনে বিশুদ্ধ তপস্যার অগ্নি জ্বালাইয়াই প্রাণশক্তির সাক্ষ্য দিতে হইবে।

সত্য ও জীবন্ত মহৎ আদর্শকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার সরল পথ গ্রহণ না করিয়া যদি শুধু নিপুণ বাক্য, তর্ক ও প্রমাণ-চাতুর্য্যের পথেই এই সম্প্রদায় চলিতে চাহেন তবে বিশ্বের শাশ্বত ধর্ম্মের মহাকালের বিধানে ইঁহাদের কোনোই ভরসা নাই।

এখন এই জিনভাষিত ধর্ম্ম যদি আপনার নানা মিথ্যা আড়ম্বর, অর্থহীন সব আচার, আত্মঘাতী ব্যর্থ সব আত্মকলহ পরিহার করিয়া দয়া, মৈত্রী ও উদারতায় আপনাকে বিশুদ্ধ করিতে পারে তবে সে নিজেও ধন্য হইবে এবং সমগ্র মানবসভ্যতাকেও ধন্য করিবে। অন্তরে-বাহিরে নব আলোকের নব প্রেমের উদার তপস্যার দ্বারা যদি এই জিন-প্রবর্ত্তিত মহাধর্ম্ম আজও আপনার অন্তর্নিহিত মৃত্যুহীন অধ্যাত্মজীবনের পরিচয় দিতে পারে, তবে বাহিরের নানা প্রকারের অভিযোগ আপনিই শান্ত হইয়া স্তব্ধ হইয়া যাইবে।

মহাবীর প্রভৃতি মহাসাধকগণের মৃত্যুহীন তপস্যার অনন্ত সাধনার বেদীর কাছে সেই মহতী আশা ও আকাঙ্ক্ষা আজও আমরা উপস্থিত করিতে চাই। আজ সমস্ত জগৎ হিংসায় দ্বন্দ্বে কুটিলতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কে আজ ইহার মধ্যে মৈত্রী ও প্রেমের নবপ্রাণ সঞ্চার করিবে? তাই হিংসায় কুটিলতায় মিথ্যাচারে ব্যথিত মুমূর্ষু মানবসভ্যতা এই সব মহাপুরুষের সাধনার দ্বারে অনেক ভরসা লইয়া আজ দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের মহাসাধনার যাঁহারা উত্তরাধিকারী তাঁহারা ক্ষুদ্র চালাকী ও সম্প্রদায়গত কোনো চাতুরীর দ্বারা আমাদের কখনও ফাঁকি দিবেন না, এই আশা অন্তরের অন্তরে না রাখিয়া পারি না। এই মহা বিশ্বাসে এই সাধনার ভবিষ্যৎ মহাসাধকদের উদ্দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় নম্র আমাদের প্রণতি রাখিয়া যাইতেছি।

বিপরীত

শ্রীসীতা দেবী

ভগবান রামহরি মুখুজ্জ্যের অদৃষ্টে সবই উল্টা লিখিয়াছিলেন। এক ত মা-বাপ তাঁহাকে সুখের পৃথিবীতে আনিয়া দিয়াই বিদায় হইলেন, রামহরিকে মানুষ হইতে হইল মামাবাড়ির হুড়কো ঠ্যাঙা এবং দই সন্দেশ উভয়ের সাহায্যে। দিদিমা বাঁচিয়া থাকিতে দই সন্দেশের ভাগটাই বেশী ছিল, তিনি মারা যাইবার পর হুড়কো ঠ্যাঙার অংশটাই প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু রামহরি তখন ডান্‌পিটে হইয়া উঠিয়াছেন, কাজেই ইহা সত্বেও টিকিয়া রহিলেন।

তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইবার বিশেষ কোনো চেষ্টা হইল না। কিন্তু তবু লেখাপড়া তিনি শিখিয়াই ফেলিলেন। বড়মামীর এক ভাই তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া আসিয়াছিলেন, ছেলেটার একটা গতি করিয়া দিবার জন্য। ইচ্ছা ছিল বামুন-ঠাকুরের স্থানে না হোক, বাজারসরকারের পদে তাঁহাকে অবৈতনিকভাবে বাহাল করিয়া রাখিবেন। কিন্তু রামহরি প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর প্রভৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া লেখাপড়া শিখিবার জন্য অসম্ভব উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন। বাজারসরকারের কাজে সময় খুব বেশী যাইত না, কাজেই পড়ার সময় ছিল। দেখিয়া শুনিয়া বাড়ির গৃহিণী তাঁহাকে বৈঠকখানাঘর ঝাড়পোঁছের কাজটাও দিয়া দিলেন। ইহাতেও রামহরিকে দমান গেল না, বরং কোথা দিয়া সুপারিশ করাইয়া তিনি অবৈতনিক ছাত্ররূপে স্কুলে ঢুকিয়া গেলেন। বড়মামীর বৌদিদি ইহাতে একান্তই চটিয়া বেয়াদব ছেলেটাকে বাড়ি হইতে বিদায় করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এমন সময় কর্ত্তা বলিলেন, "থাক না ছোঁড়া, টেবী আর ঝণ্টুর মাষ্টারটাকে তাড়িয়ে দিলেই হবে। দুবেলা ব'সে গিলছে আর এইটুকু পারবে না?

রামহরির আপত্তি ছিল না, তিনি পড়িতে লাগিলেন, এবং পড়াইতে লাগিলেন। নিজের পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কোনো চেতনা ছিল না, সুতরাং এম্‌-এ পাস না করা পর্য্যন্ত এইখানেই থাকিয়া গেলেন এবং বাড়ির ছেলেমেয়েদের যখন যাহাকে প্রয়োজন পড়াইতে লাগিলেন। আগের চেয়ে যে তিনি ভাল খান, শুইবার জন্য যে তক্তাপোষ এবং ভাল বিছানা পাইয়াছেন, বাড়ির সব কয়জন চাকরের সঙ্গে যে তাঁহাকে শুইতে হয় না, এ-সব তুচ্ছ ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি কোনোদিনই মনোযোগ দিলেন না।

সর্ব্বপ্রথম তাঁহারও মনে সাড়া জাগিল যখন তিনি শুনিলেন তাঁহার কৈশোরের প্রথম ছাত্রী শ্রীমতী টেবী ওরফে কুমারী নীহারিকার সঙ্গে তাঁহার বিবাহের আয়োজন হইতেছে। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বাড়ির গৃহিণীর কাছে গিয়া বলিলেন, "রাঙা মামীমা, এটা কি রকম যেন হ'ল। টেবীকে আমি ছোটবেলা থেকে—"

রাঙামামী সাতজন্মেও রামহরিকে কোনো ভাবে খাতির করা আবশ্যক বোধ করেন নাই; আজ কিন্তু ভবিষ্যৎ শাশুড়ী রূপে তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, সেই জন্যেই ত ভরসা ক'রে মেয়েকে তোমার হাতে দিচ্ছি। মেয়ে আমার দেখতে ভাল নয়, অন্য জায়গায় বড় হেনস্থা হবে। তোমার কাছে সে ভয় নেই, তুমি ওর ভিতরে কত গুণ তা জান।"

টেবীর রূপ বা গুণ কিছুই বেচারা রামহরির অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু এ বাড়িতে তাঁহার সম্বন্ধে যখন যা ব্যবস্থা হইয়াছে, কোনটাতেই তিনি যেমন আপত্তি করেন নাই, এটাতেও তেমনি করিলেন না। শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রীমতী নীহারিকা তাঁহার পত্নীত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া ঘর জুড়িয়া বসিলেন।

নীহারিকার রূপ গুণ যাহা থাক বা না থাক, পয় ছিল। রামহরির একটা চাকরিও ভালমত জুটিয়া গেল। শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করিয়া এইবার তিনি বাড়ি ভাড়া করিয়া আলাদা সংসার করিলেন। নীহারিকা গৃহিণীপণায় মাকে এবং পিসিমাকেও ছাড়াইয়া গেল। রামহরি কতকগুলি টাকা রোজগার করিয়া আনেন মাত্র, সংসার পরিচালনায় আর তাঁহার কোনোই হাত নাই। তাঁহাকে যাহা খাইতে দেওয়া

হয় তাহাই তিনি খান, যাহা পরিতে দেওয়া হয় তাহাই তিনি পরেন এবং যাহা শুনিতে বলা হয় নীরবে তাহা শুনিয়া যান। অবশ্য এ ব্যবস্থায় তাঁহার নিজের কোনো অমত ছিল না। জন্মাবধি কোনো-না-কোনো রমণীকে ভাগ্যবিধাত্রী হিসাবে সমীহ করিয়া চলিতে তিনি অভ্যস্ত, সেই হিসাবেই তিনি নীহারিকাকেও মানিয়া চলিতেন। বরং আগে আগে যাঁহারা তাঁহার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী ছিলেন, এটি তাহাদের চেয়ে অনেক অংশে দয়াবতী, ইহার অধীনে আদর যত্নটা ঢের বেশী পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে যত্নের আধিক্যটা অসহ্য লাগিলেও রামহরি সহ্য করিয়া যাইতেন, কারণ স্ত্রীজাতির কথার যে প্রতিবাদ করিতে নাই, এ শিক্ষা তাঁহার ভাল রকমই হইয়াছিল। সুতরাং স্বামী হইয়াও তিনি অতি সাধ্বী পত্নীর মত নীহারিকার একান্ত অনুগত হইয়া রহিলেন এবং নীহারিকা আসলে গৃহিণী হইলেও কার্য্যতঃ কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন।

ইহাদের সংসারে যে-দুইটি শিশুর আবির্ভাব হইল, তাহারাও যেন ঠিক যাহা হওয়া উচিত, তাহার উল্টাটাই হইল। ছেলেটি হইল অতি সুন্দর দেখিতে, মেয়েটি হইল শ্যামবর্ণ অতি সাধারণ চেহারার। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই বুঝা যাইতে লাগিল যে, শ্রীমান দেখিতেই শুধু সুন্দর, ভিতরে বিশেষ কোনো বস্তু নাই। বুদ্ধি সুদ্ধি নাই, লেখাপড়া শিখিবার প্রবৃত্তি নাই, তবে সুখের বিষয় এইটুকু যে, কুবুদ্ধিও বিশেষ নাই। চুপ করিয়া এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে পাইলে সে সবচেয়ে খুশী হয়, একমাত্র সুখাদ্যের প্রলোভনে তাহাকে একটু নড়িতে চড়িতে দেখা যায়। স্বাস্থ্যও ভাল নয়, অল্পতেই তাহার ঠাণ্ডা লাগে, পান হইতে চুণ খসিলেই তাহার হজমের গোলমাল উপস্থিত হয়। নীহারিকা দেখে শোনে কপাল চাপড়ায়, আর বলে ভগবান্ একে গরিবের ঘরেই বা কেন পাঠালেন? আর বেটাছেলে করেই বা কেন পাঠালেন? রাজবাড়ির রাজনন্দিনী হলেই এর শোভা পেত। কিন্তু সমস্ত হৃদয় তাহার এই অকর্ম্মণ্য সুন্দর ছেলেই জুড়িয়া থাকে। মেয়ের দিকে মন দিবার তাহার অবসরই হয়না, যদিও মেয়েই ছোট।

তা কপালগুণে মেয়ের তাহাকে খুব বেশী দরকারও হয় না। মেয়ে ত নয় যেন লোহার বাঁটুল। বেশ শ্যামবর্ণ, গোলগাল চেহারা, মাথায় এক মাথা ভ্রমরকৃষ্ণ কোঁকড়ান চুল। সে দশ মাসে হাঁটিতে শিখিল, এগারো মাস পুরিতে না পুরিতে কলরব তুলিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

দুধ কোথায় থাকে, ফল কোথায় থাকে, মিছরী চিনি কোথায় থাকে, তাহার কিছুই জানিতে বাকি নাই। ছেলের তদারক করিতে করিতে নীহারিকা হয়ত খুকীকে খাওয়াইতেই ভুলিয়া গেল, কিন্তু খুকী দমিবার মেয়ে নয়। সে বাটি হাতে করিয়া, সিকি কড়া দুধ উল্টাইয়া দিয়া, খানিক দুধ খাইয়া, খানিক বুকে পেটে মাখিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া বসিয়া আছে। রাত্রে নিজের কাঁথা টানিয়া নিজে পাতে, দাদার বালিশ ঠিক করিয়া দেয়, খোকা ভয়ে ভ্যা করিয়া উঠিলে খুকী তাহাকে বসিয়া সান্ত্বনা দেয়। নীহারিকা অবাক হইয়া বলে, "একে ভগবান করলেন কি-না মেয়ে, এ যে জেলার ম্যাজিষ্টর হবার যুগ্যি।"

যত দিন যাইতে লাগিল, ছেলেমেয়ের অসাধারণ তফাৎটা বড় বেশী উগ্র হইয়া উঠিতে লাগিল। ছেলের নাম হইল কান্তিচন্দ্র, তিনি শুধু কান্তিসর্ব্বস্বই হইয়া রহিলেন। স্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি করিতে না করিতে ছেলে অসুখে পড়িয়া শয্যাগ্রহণ করিল, মাস কয়েক শুধু শুধু মাহিনা গণিয়া নীহারিকা শেষে ত্যক্তবিরক্ত হইয়া ছেলের নাম কাটাইয়া দিলেন। ঘরেই অল্প মাহিনার এক ছোক্‌রা-মাষ্টার রাখিয়া দেওয়া হইল, সে রোজ নিয়মমত হাজিরা দিতে লাগিল, তবে কান্তিচন্দ্রের বিদ্যালাভ কতটা হইল, তাহার কেহ কোনো খোঁজ করিল না। চেহারাটা কিন্তু দিনের দিনই বেশী খুলিতে লাগিল, পাড়াপড়শীর নজরের ভয়ে কান্তির মা ক্রমেই বেশী করিয়া সশঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

মেয়ের নাম রাখিলেন বাপ শ্যামলতা, ডাকনামটা লতাই থাকিয়া গেল। সাধারণ হিন্দু গৃহস্থঘরের মেয়ে, তাহার শিক্ষার ভাবনা বড় একটা কেহ ভাবে না। আর ভাবিয়াই বা হইবে কি? বড় হইয়া ত দেবী সরস্বতীর সহিত কোনো সম্পর্কই তাহার থাকিবে না, দিন কাটিবে রান্নাঘরে আর সূতিকাগৃহে, তখন তাহাকে আবার অত ঘটা করিয়া লেখা পড়া শেখান কেন? তাহার উপর লতা দেখিতে সুন্দরী নয়, নীহারিকার ইচ্ছা খুব ছোট থাকিতে থাকিতে কোনগতিকে তাহার বিবাহ দিয়া পার করিয়া দেওয়া। কচিবেলায়

তবু গোলগাল আছে, হাসি খুশী আছে, এক রকম দেখায়, বড় হইয়া এ যে আবার কি রকম দেখিতে হইবে কে জানে? বলা বাহুল্য, দেশে তখনও শারদা আইন জারি হইতে অনেক বিলম্ব ছিল, সুতরাং নীহারিকার ইচ্ছাটাকে কেহই আপত্তিজনক বা অদ্ভুত মনে করিত না। লতাকে যে বাপের বাড়ি বছর দশের বেশী বাস করিতে হইবে না, এ-বিষয়ে ঘরে বাহিরে কাহারও কোনো সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু যে-মেয়ে এক বছর বয়স হইতে না হইতে নিজের খাওয়া পরা, শোয়া সব-কিছুর ব্যবস্থা নিজে করিয়া আসিতেছে, তাহার চিরজীবনের ব্যবস্থা অন্য লোকে অত চট করিয়া করিয়া দিতে পারে না। দাদাকে মাষ্টার পড়ায়, সে উল্টা দিকে বসিয়া দেখে। হঠাৎ এক দিন একখানা খবরের কাগজ উল্টা করিয়া ধরিয়া গড় গড় করিয়া পড়িয়া সে সকলকে তাক্ লাগাইয়া দিল। ছোকরা-মাষ্টারটির ব্যাপারটা বড়ই মনে লাগিল। এই একটা মাকাল ফলের মত ছেলে, ইহার পিছনে সে পূরা একটা বছর খাটিতেছে, ইহাকে কি সে বিন্দুমাত্র কিছু শিখাইতে পারিল? আর এইটুকু মেয়ে, ইহাকে কোনো দিন কেহ ক খ চিনাইবারও চেষ্টা করে নাই, ইহার বুদ্ধি দেখ? সে-দিন হইতে কান্তিচন্দ্রের মাষ্টার নামে তাহারই মাষ্টার থাকিলেও কার্য্যতঃ লতারই মাষ্টার হইয়া দাঁড়াইল। লতাকে যাহা শেখান যায়, তাহা ত সে শেখেই, যাহা না শেখান হয় তাহাও কোথা হইতে যে সে শিখিয়া আসে তাহার মাষ্টার ভাবিয়া পায় না।

শুধু পড়াশুনাতেই নয়, অন্য দিকেও লতা বাড়ির লোককে থাকিয়া থাকিয়া তাক্ লাগাইয়া দেয়। ঠিকা ঝি আসে নাই, নীহারিকার মাথা ধরিয়াছে। কলতলায় স্তূপীকৃত এঁটো বাসনের দিকে তিনি যতবার তাকাইতেছেন, তাঁহার ধরা মাথা আরও বেশী ধরিয়া যাইতেছে। হঠাৎ বাসন নাড়ার শব্দ হইল, চৌবাচ্চার মধ্যে কলের জল ঝিরঝির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। নীহারিকার মনে হইল যেন মরুতে পথভ্রান্ত পথিকের কর্ণে জলধারার শব্দ আসিতেছে। আকুল আগ্রহে শয়নকক্ষ হইতে গলা বাড়াইয়া বাহিরের উঠানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। ওমা, কোথায় বা পোড়ার-মুখী ক্যাঙালীর মা। ছোট লতা ডুরে শাড়ীর আঁচলটি কোমরে আচ্ছা করিয়া জড়াইয়া, হাতের সোনার বালা ঊর্দ্ধে বাহুতে টানিয়া তুলিয়া মহোৎসাহে বাসন মাজিতেছে।

নীহারিকা ধরামাথার যন্ত্রণা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, "এই, এই, সব্ বল্‌ছি, সব্ গিন্নীর। একরত্তি মেয়ে, রকম দেখ না, কাঁড়িখানেক এঁটো মাজতে বসেছে। তারপর সর্দ্দি কাশি ক'রে মর আর কি। একেই ত আমার ছেলেকে নিয়ে কত সুখ।"

লতা নড়িবার কোনো লক্ষণ না দেখাইয়া বলিল—"আমি তোমার আহ্লেদে ছেলের মত কি-না? কতবার আমি ক্যাঙালীর মায়ের সঙ্গে বাসন মেজেছি, কখ্‌খনো আমার কিছু হয় না, বলিয়া ঘষ ঘষ করিয়া মাজিয়া চলিল।

নীহারিকা হয়ত জ্বরে শয্যাশায়ী, বামুন ঠাকরুণ সময় বুঝিয়া নিজের বাড়িতেই থাকিয়া গেলেন। কান্তি সময়মত গোছাভরা লুচি না পাইয়া নাকে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। রামহরির চোক প্রায় কপালে উঠিবার জোগাড়, এমন সময় দেখা গেল লতা গোল গোল ছোট দুইটি হাত প্রাণপণে চালাইয়া আটা ঠাসিতেছে এবং দাদাকে সান্ত্বনা দিতেছে, "বাবা, আচ্ছা ছেঁচকাঁদুনে ছেলেবাপু তুমি। একটু সবুর কর না, লুচি এখনি হয়ে যাবে।"

আট বছরের মেয়ে যখন লতা, তখনই সে রান্নাবান্না সব শিখিয়া ফেলিল। বামুনঠাকরুণ না আসিলে নীহারিকাকে আর একেবারে পথে বসিতে হয় না, লতাই তাঁহার অর্দ্ধেক কাজ করিয়া দেয়। এইটুকু মেয়ের গায়ে ভগবান্ শক্তিও দিয়াছেন আশ্চর্য্য। সে-দিন পাড়ার শ্রেষ্ঠ ডানপিটে ভোম্‌লাকে এমন এক চেলা কাঠের বাড়ি লাগাইয়াছে যে, পাড়ায় লতার নাম রটিয়া গিয়াছে। কান্তিচন্দ্র সকালে নিজে খাইবার জন্য দুইটি রসগোল্লা কিনিয়া আনিতেছিল, হঠাৎ ভোম্‌লা কোথা হইতে চিলের মত ছোঁ মারিয়া রসগোল্লা দুটি ঠোঙা হইতে তুলিয়া নিজের মুখে ফেলিয়া দিল। কান্তি ভ্যা করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই লতা বাহির হইয়া আসিল। কাঠ কাটিয়া দিয়া সে মায়ের উনুন ধরানোর সাহায্য করিতেছিল। সদর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিল কান্তি খালি ঠোঙাটা হাতে করিয়া হাঁ করিয়া কাঁদিতেছে, আর ভোম্‌লা একটু দূরে দাঁড়াইয়া তাহাকে কলা দেখাইয়া বলিতেছে "ও বাঁদর, কলা খাবি, জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি?"

তীরের মত ছুটিয়া গিয়া লতা ভোম্বলার পিঠে চেলা কাঠের বেশ এক ঘা বসাইয়া দিয়া বলিল, "বাঁদর ত তুমি, এইবার দেখ জয় জগন্নাথ" বলিয়া ক্রন্দনপরায়ণ দাদার হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। এই-টুকু মেয়ের হাতে মার খাইয়া ভোম্বলচন্দ্র এতেই অবাক হইয়া গিয়াছিল যে, প্রতিবাদ করিবার চেষ্টাও সে করিল না। নীহারিকা অবশ্য ব্যাপার শুনিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, 'ওমা কোথায় যাব! বেটাছেলেকে ঠেঙিয়ে এলি অমন ক'রে? লোকে বলবে কি? মা, মা, মা, এ মেয়ে ত নয়, একেবারে মহিষমর্দ্দিনী।"

লতার মাষ্টার হঠাৎ এই সময় দেশে চলিয়া গেল। কান্তির আর আনন্দ ধরে না, সকালবেলাটা এখন বেশ খুশীমত খেলা এবং খাওয়ার চর্চা করিতে পারিবে। লতা কিন্তু ভাবিয়াই অস্থির, তাহাকে পড়াইবে কে? মায়ের এ-সব দিকে সহানুভূতি নাই, তাহা সে এখনও বুঝিতে পারে, অগত্যা নিরীহ বাবাটিকেই গিয়া আক্রমণ করিল, "আমি বুঝি পড়ব না? আমি বুঝি তোমার ন্যাকা ছেলের মত মুখ্যু হয়ে থাকব?"

রামহরি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না মা না, মুখ্যু কেন হবে? মাষ্টার ত খোঁজা হচ্ছে, পাওয়া গেলে সে তোমাকেও পড়াবে।"

লতা বলিল, "হ্যাঁ, মাষ্টারও এসেছে, আর আমিও পড়েছি। ঐ যে বালিকা বিদ্যালয়ের গাড়ী যায় রোজ এই গলি দিয়ে, সেই বালিকা বিদ্যালয়ে আমি পড়ব।"

রামহরি অনুগত অধস্তন কর্ম্মচারীর মত নীহারিকাকে খবর দিলেন। গৃহিণী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "হয়েছে, হয়েছে, মেয়ে সত্যিই ত আর ম্যাজিষ্টর হবে না, এখন ব'সে ব'সে তাঁর 'টাইমে'র ভাত রাঁধি আর ইস্কুলের মাইনে গুণি। অতয় কাজ নেই।"

কিন্তু কে বা তাঁহার কথা শোনে? তাঁহারই মেয়ে ত? লতা খাওয়া, নাওয়া, শোওয়া, কাজ করা, দাদাকে সামলান, সব হঠাৎ একসঙ্গে তাকে তুলিয়া রাখিয়া, এমন সগর্জ্জনে কান্না সুরু করিল যে, নীহারিকাসুদ্ধ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাগটা পড়িল রামহরির উপরেই। এমন বাপ না হইলে, এমন মেয়ে হয়? সাতজন্মে তিনি এমন কাণ্ড দেখেন নাই। তাঁহারাও ত মা-বাপের মেয়ে, এমন অন্যায় আবদার করিতে কে কবে তাঁহাদের দেখিয়াছে? আপদ মেয়েকে ইস্কুলেই দিয়া আসা হোক, মানুষের কান দুটা জুড়াক্। রামহরি লতাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিতে চলিলেন। মনে মনে বুঝিলেন, তাঁহার রাজ্যে আবার সম্রাজ্ঞী বদলের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

লতা স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের একেবারে অবাক করিয়া দিল। এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এমন মনোযোগ, তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে কোনো ছাত্রীর মধ্যে দেখেন নাই। স্মৃতিশক্তিও তাহার অসাধারণ, কোনো কথা তাহার কাছে পড়িতে পায় না। বৎসরের মাঝখানে ভর্ত্তি হইল বটে, কিন্তু বৎসরের শেষে পরীক্ষায় সব কটা বিষয়ে প্রথম হইয়া ক্লাসের সব কয়জন মেয়েকে সে একান্তভাবে চটাইয়া দিল। হরেক রকম প্রাইজে দুই হাত ভরিয়া যে-দিন সে বাড়ি আসিয়া হাজির হইল, সে-দিন এমন কি নীহারিকা পর্য্যন্ত খুশী না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। সত্যি মেয়েটার গুণ আছে। হায়, হায়, ইহার শতাংশের একাংশ বুদ্ধি যদি ছেলেটার থাকিত। পোড়া ভগবানের কি বিচার আছে গা? এই মাকাল ফলের মত ছেলে, বাপ-মা যখন থাকিবে না, তখন খাইবে কি? স্বাস্থ্যও তাহার এমন যে মুটেগিরি করিবার যোগত্যাও তাহার কোনো দিন হইবে না। আর এই মেয়ে, গুণের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে হীরার টুকরা, কিন্তু একটুখানি রূপের অভাবে কোনো আদরই ইহার হইবে না। বিবাহ দিতেই জিব বাহির হইয়া পড়িবে, কেমন যে বর জুটিবে কে জানে?

লতার পড়াশুনায় ক্রমেই উন্নতি হইতে লাগিল। বিশ পঁচিশ বৎসর আগের কথা, তখন কলিকাতা শহরেও হাজারে হাজারে মেয়ে স্কুলে পড়িত না। পরীক্ষা দিতে অগ্রসর যে-ক'টি মেয়ে হইত, তাহাদের দিকে লোকে সশ্রদ্ধবিস্ময়ে তাকাইয়া থাকিত। আই-এ, বি-এ পাস করা মেয়ের সংখ্যা তখন এক হাতের আঙুলে গোনা যাইত। মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যে পরীক্ষায় প্রথম দ্বিতীয় হইতে পারে এমন অসম্ভব সম্ভাবনাও কাহারও মাথায় আসিত না।

কিন্তু লতা সম্বন্ধে ক্রমে এই রকম একটা অস্পষ্ট সন্দেহ, তাহার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের মাথায় আসিতে আরম্ভ করিল। এমন ছাত্রী তাঁহারা কখনও পান নাই, ইহাকে শিখাইতে গিয়া নিজেদেরই যেন মধ্যে মধ্যে লজ্জিত হইয়া পড়িতে হয়। স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষার প্রথম প্রাইজগুলা ত তাহার হাতে ধরা

এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা অবধি দিতে পারিলে সে ছেলেদের মাথায় চাঁটি মারিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিবে। সুবিধা পাইলেই তাঁহারা লতার মাকে বলিয়া পাঠান, যেন অনর্থক বিবাহ দিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিয়া এমন মেয়ের ভবিষ্যৎ তিনি নষ্ট না করেন।

লতার বয়স এখন বছর তেরো। চেহারাটি আগেরই মত আছে, শুধু লম্বা হইয়াছে খানিকটা, আর ঘন চুলের গুচ্ছ কাঁধ ছাড়িয়া পিঠের মাঝামাঝি নামিয়া আসিয়াছে। চোখ দুটি বুদ্ধিতে সমুজ্জ্বল, হাত দুটি কর্ম্মে তৎপর। নীহারিকার মেয়ের বিবাহ দিবার ইচ্ছাটা মাঝে মাঝে মাথা ঝাড়া দিয়া ওঠে, আবার শিক্ষয়িত্রীদের কথা ভাবিয়া সে উৎসাহটাকে তিনি চাপিয়া যান। অপদার্থ ছেলের জন্য তাঁহার মনে একটা প্রচ্ছন্ন লজ্জা সর্ব্বদাই গুমরিতে থাকে। পাড়ার অন্য ছেলেরা টপাটপ ক্লাসে উঠিতেছে, স্পোর্টে প্রাইজ পায়। বড় হইয়া, কাহাকে কোন্ লাইনে দেওয়া হইবে, তাহা লইয়া বাপ-মায়েরা কত আশা উৎসাহে আলোচনা করে। আর তাঁহার ছেলে দেখ না? ইহাকে পুতুল সাজাইয়া এক দেয়ালের তাকে বসাইয়া রাখা চলে, আর কোনো কাজ ইহার দ্বারা হইবে না। মেয়ে হইতে হয়ত তাঁহার মূর্খের জননী হওয়ার অপবাদ ঘুচিবে। রামহরির আর যা দোষই থাক্, মূর্খ তিনি নন, সুতরাং নীহারিকার জন্যই ছেলে মূর্খ হইল, এ কথা কি আর লোকে বলিতে ছাড়িবে? কাজেই মেয়ের বিবাহের বিষয় তিনি চুপ করিয়াই আছেন। মেয়েটা কপালক্রমে দেখিতে ছোটখাট, এখনও তাহাকে দশ-এগার বছরের বলিলে লোকে জোর করিয়া মিথ্যাবাদী বলে না।

কান্তি এখনও বেশীর ভাগ সময় বাড়িতেই পড়ে। স্কুলে তাহার নাম আছে, কিন্তু ঐ নাম পর্য্যন্তই। স্কুলে পাঠাইলেই তাহার হজমের গোলমাল হইতে সুরু হয়, আর নীহারিকা ব্যস্ত হইয়া তাহাকে আবার ঘরে আটক করেন। দেখিতে সে কিশোর কন্দর্পের মত সুন্দর, বেশ সাজিয়াগুজিয়া থাকে। সবে গোঁফের রেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাক্সের ভিতর একখানি মোটা বাঁধান খাতা আছে, মাঝে মাঝে তাহাতে কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনাও করে। সম্প্রতি এ-বিষয়ে তাহার বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে। শ্যামলতার স্কুলের গাড়ীতে উমা বলিয়া একটি মেয়ে যায়, মেয়েটি দেখিতে ভারি সুন্দর। মেয়েটি আবার ঠিক দরজার সামনেই বসে, বড় বড় হরিণনয়ন মেলিয়া কাহার সন্ধানে যেন এদিক ওদিক তাকায়। কান্তিকেই সে দেখিতে চায় কি? তাহার মত সুদর্শন অন্ততঃ এ গলির ভিতর আর কেহ নাই। উমা লতারই বয়সী হইবে বোধ হয়, তবে লতার চেয়ে লম্বায় বড়, চোখ দুটিও একেবারে শিশুর সারল্যেই শুধু পূর্ণ নয়। স্কুলের গাড়ীর সহিস আসিয়া যখন ডাক দেয়, "গাড়ী আয়া বাবা," তখন লতার আগে কান্তিচন্দ্রই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসে। কিন্তু দুষ্টু মেয়েগুলি আবার ইহা লইয়াও হাসাহাসি করে। তাই মাঝে মাঝে সে সামনের ঘরের জানালার আড়াল হইতে দেখে। মধ্যে মধ্যে সে অবশ্য বাহিরও হয়, কারণ উমাকে দেখাই ত তাহার কাজ নয়, উমাকে দেখা দেওয়াও কাজ। কি সুন্দর মেয়েটি। আর সর্ব্বদাই হালকা এক একটা রঙের শাড়ী পরে, এমন চমৎকার তাহাকে মানায়। কান্তি যদি কবি না হইয়া চিত্রকর হইত, তাহা হইলে উমার একখানি ছবি আঁকিয়া নিজে ধন্য হইত, উমাকেও ধন্য করিয়া তুলিত, বোধ হয়।

শ্যামলতা দাদার কাণ্ড দেখে আর রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়। আর উমালক্ষ্মীছাড়ীর রকম দেখ। বিয়ের সঙ্গে খোঁজ নাই সব কুলোপানা চক্র। বিদ্যা দাদারও যত, উমারও তত। রাগের চোটে আর কিছু করিতে না পারিয়া লতা গাড়ীতে উঠিবার সময় বেশ করিয়া উমার পা মাড়াইয়া দেয়। উমা আপত্তি করিলে বলে, 'তা ভোঁদা শরীর নিয়ে সামনেটা জুড়ে বসিস্ কেন? তোকে কি ডিঙিয়ে উঠব?"

উমাদের বাড়ি কাছেই, কলিকাতা শহর তাই, না হইলে হাঁটিয়া যাওয়া-আসা চলিত। তাহার বাবার অবস্থা ভাল নয়, মেয়ে অনেকগুলি, ছেলে মাত্র তাঁহারও একটি। মেয়েদের ভিতর উমা দ্বিতীয়া, বড়মেয়েটির অর্থাভাবে অতি অপাত্রে বিবাহ হইয়াছে। ইহাকে তাই কষ্ট করিয়াও তিনি স্কুলে দিয়াছেন। মেয়ে দেখিতে খুব ভাল, পড়াশুনা করিলে ভাল বিবাহ হয়ত হইবে। চেহারায় গুণে লোকের সুনজরেও পড়িতে পারে। স্কুলের প্রাইজ ইত্যাদিতে লোকের চোখের সামনে তাহাকে ভাল করিয়াই তুলিয়া ধরা হয়। উমার ভাই সকলের বড়।

কান্তিচন্দ্র কয়েক দিন ঘোরাফেরা করিয়াই বিনয়ভূষণের সঙ্গে ভাব জমাইয়া লইল। সে অন্য স্কুলে পড়ে, না

হইলে তাহার সঙ্গে বেশী করিয়া খাতির জমাইবার লোভে কান্তি স্কুলে সুদ্ধ যাইতে রাজী ছিল। বিনয় ছেলেটি ভাল, পড়াশুনায় মন আছে, কিন্তু স্বাস্থ্য তাহারও ভাল নয়। তবে গরিবের ঘরে তাহাকে অত নন্দলালী ঢঙে মানুষ করা সম্ভব নয়, কাজেই অন্য দশ জনে যাহা খায় পরে, সেও তাহাই খায় পরে। অসুখ করিলেও স্কুলে যায়। সম্প্রতি সে ম্যাটিক পরীক্ষার জন্য প্রাণপণে খাটিয়া প্রস্তুত হইতেছে। তাই ইচ্ছা থাকিলেও কান্তি বেশী আড্ডা দিতে পারে না।

দিনগুলা যেন পাখায় ভর করিয়া হু হু করিয়া উড়িয়া চলিতেছে। শ্যামলতা সে-দিন শিশু ছিল, দেখিতে দেখিতে কিশোরী হইয়া উঠিল। পাড়ার ছেলেদের সম্বন্ধেও সে আজকাল সচেতন হইয়া উঠিতেছে, তবে তাহার ভিতর রোমান্সের ভাব বেশী কিছু নাই, প্রতিযোগিতার ভাবই প্রবল। এক দিন কান্তিচন্দ্র রাত্রে একখানা প্রশ্নপত্র হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "দেখেছিস এবারে ইংলিশের কোশ্চন্ কি রকম শক্ত? তোদের বারে এই রকম হলেই চক্ষু স্থির। বিনয়টাও ভাল করে লিখতে পারেনি।"

লতা কাগজখানা হাতে করিয়া বলিল, "ইঃ, ভারি ত, দাও আমাকে খাতা, আমি পটাপট সব লিখে দিচ্ছি, তোমার বিনয়কে দেখিও।"

সত্যই একখানা খাতা টানিয়া লইয়া সে প্রশ্নের উত্তর লিখিতে বসিয়া গেল। ঘণ্টা দুই খাটিয়া, সব ক'টা প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া কান্তির হাতে দিয়া বলিল, 'যাও তোমার বন্ধুকে দেখাও গিয়ে।"

রাত্রেই না দেখাইলে কিছু চণ্ডী অশুদ্ধ হইয়া যাইত না। কিন্তু কান্তি রাত্রেই চলিল, তাহার নয়নতারাটিকে আর এক বার দেখিতে পাইবার লোভে।

বিনয় খাতাখানা লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া অনেকগুলা পাতা পড়িয়া ফেলিল। তাহার পর সংক্ষেপে বলিল, "তোমার বোন ইউনিভার্সিটিতে নাম রাখবে।"

কান্তিচন্দ্রের কানে কথাটা গেল কি-না বুঝা গেল না, পাশের ঘর হইতে কে মিষ্টি গলায় মিহি সুরে গান করিতেছিল, সে তন্ময় হইয়া তাহাই শুনিতেছিল।

লতারও পরীক্ষার বৎসর দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। তাহার পরিচিত জগৎ-সংসারে এই কয় বৎসরের মধ্যে নানা পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে। নীহারিকা দারুণ পক্ষাঘাত পীড়ায় একেবারে জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন, কথা পর্য্যন্ত একরকম বন্ধ। অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে জড়াইয়া জড়াইয়া যাহা বলেন, তাহা স্বামী পুত্র কন্যা ভিন্ন কেহ বোঝে না। শ্যামলতা ঘরের কাজও দেখে, পরীক্ষার পড়াও পড়ে। কান্তিচন্দ্র এখনও তেমনি পাড়ার লোকের চোখে বিস্ময় জাগাইয়া গলিতে গলিতে ঘোরে। তাহার শরীর আরও খারাপ হইতেছে, সুতরাং নিশ্চয়ই সে পরীক্ষা দিবে না। মা অক্ষম হইয়া পড়ার পর তাহার আর নিয়মমত খাওয়া-দাওয়া হয় না। লতা পোড়ারমুখী নিজের পড়ার ঝোঁক করিতেই ব্যস্ত। বাবা ত মানুষের মধ্যেই গণ্য নহেন।

উমাদের বাড়িতেও বিপদ আপদের শেষ নাই। তাহার বাবা মারা গিয়াছেন, বিনয় আই-এ পাস করিয়া অর্থাভাবে পড়িতে পারে নাই, গোটা পাঁচ ছয় ট্যুশনি করিয়া কোনো মতে সংসার চালাইতেছে। উমা আর স্কুলে পড়ে না, তাহার মা তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত। কিন্তু গরিব ঘরের পিতৃ-হীনা মেয়ে, কে তাহাকে বিবাহ করিবে?

লতার পরীক্ষা হইয়া গেল। শেষের দিন বাড়ি ফিরিয়া সে নিজেই বলিল, "ফার্ষ্ট না হই, সেকেণ্ড ত নিশ্চয় হব।"

নীহারিকার রোগপাণ্ডুর মুখে হাসি দেখা দিল। রামহরি বলিলেন, "তা হবে বৈ কি মা? শুধু কান্তি মুখখানাকে অসম্ভব বাঁকা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বন্ধুবান্ধব সকলকে মনের দুঃখ জানাইয়া, দিন কয়েক বলিয়া বেড়াইল, বোনের ষোল বছর বয়স হইয়া গেল, মা-বাবা বিবাহ দিবার নাম করেন না, ইহাতে কান্তির মানসম্ভ্রমের বড় হানি হইতেছে।

তাই ত, এখন আর লতাকে দশ-এগার বৎসর বলিয়া চালাইয়া দেওয়া চলে না। তাহার সুস্থ সবল দেহটি হঠাৎ যেন বর্ষার নদীর মত ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে, লম্বায়ও বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। তা ছাড়া ম্যাট্রিক পরীক্ষা যে দিল, সে-ই ত বয়সের একটা স্থির নিদর্শন? ষোল বৎসর না পুরিলে কাহাকেও ত খাতির করিয়া পরীক্ষা দিতে দিবে না? পাড়ার লোকে রামহরিকে এমন কি পীড়িতা নীহারিকাকেও বাড়ি বহিয়া অযাচিত উপদেশ দিয়া যাইতে

লাগিল। মেয়ে যে হাজার পড়ায় ভাল হইলেও জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট হইবে না, ইহাও বিদ্রূপের সুরে অনেকে জানাইয়া দিল।

রামহরি এখনও বিচলিত হইলেই নীহারিকার কাছে ছুটিয়া আসেন, চিরদিনের অভ্যাস যাইবে কোথায়? জিজ্ঞাসা করেন, "কি করা যায়, খোকার মা?"

নীহারিকা জড়াইয়া বলেন—"কিছু করতে হবে না. মেয়ে পড়ুক।

রামহরি বলেন, 'পাড়ার লোকে বড় নিন্দে করছে।

নীহারিকা বলেন, "তাদের মুখে পোকা পড়ুক, আমরা নৈকিষ্যি কুলীনের ঘর, মেয়ে চিরকুমারী থাকলেও নিন্দে নেই।

লতা পরীক্ষায় প্রথমই হইল। সে নিজে কিছুই বিস্মিত হইল না, কিন্তু চেনা-অচেনা সকলকে বিস্মিত করিয়া দিল। নীহারিকা মেয়েকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। রামহরি আনন্দে অধীর হইয়া কি যে করিবেন ভাবিয়াই পাইলেন না। কান্তিচন্দ্র রাগের চোটে বাড়ি হইতে সেই যে বাহির হইয়া গেল, আর রাত বারটার আগে ঘরেই ফিরিল না। চেনা শুনা কাহারও বাড়িতে না গিয়া, ইডেন গার্ডেনে গিয়া বসিয়া রহিল। চেনা মানুষে দেখিলেই ত লতার সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করিতে বসিবে? আর তাহার সহ্য হয় না। একে ত উমার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে শুনিয়া অবধি সে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। এ-দুঃখের কথা কাহাকে সে জানাইবে? আঠার বৎসরের ছেলে, পড়াশুনা কিছু করে নাই, শুধু রূপ দেখিয়া কেহ কি তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিবে? মা বাবা তাহার দারুণ মনোবেদনার কথা একবারও কি ভাবেন? তাঁহারা বলিলে কহিলে উমাকে কি আর কান্তির সঙ্গে বিবাহ দেয় না? যাহা হউক, গরিবের মেয়ে ত? কত ভাল বিবাহই আর তাহার হইবে? কান্তি একগাদা ইংরেজী বইই না হয় মুখস্থ করে নাই, কিন্তু তাহার মত সাহিত্যিক প্রতিভা তাহার বয়সের কোন্ ছেলের আছে? আর ঘরটা কত বড় তাহাও ত দেখিতে হইবে? কিন্তু পিতামাতা নিজেদের ঐ কেলে হোঁৎকা মেয়ের বিদ্যাবত্তার গর্ব্বে একেবারে দিনে তারা দেখিতেছেন, কান্তি-বেচারার কথা ভাবিবারই তাঁহাদের সময় নাই।

লতা আই-এ পড়িতে ঢুকিল। এখন স্কলারশিপের জোর আছে, কাজেই কিছুতে আর আটকাইবে না। ঘরের বাহিরের কোনো কথাতেই আর সে কান দেয় না। প্রতিবেশিনীরা তাহার দেমাক দেখিয়া দিনের দিন রুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। অত্যদ্ভুত রকমের দুই-চারটি পাত্রও অনেক সময় তাঁহারা খুজিয়া আনে, কিন্তু তাহাদের পরিচয় শুনিবা মাত্র লতা এমন হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া দেয় যে, ঘটকী এবং পাত্র অপ্রস্তুত হইয়া পলাইবার পথ পায় না। কান্তির ইচ্ছা করে বোনের মাথাটা গুঁড়া করিয়া দেয়, কিন্তু সে জোর তাহার কোথায়?

ফার্ষ্ট ইয়ার, সেকেণ্ড ইয়ারের দুইটা বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এমন সময় নীহারিকা হঠাৎ ঘর-সংসারের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। শেষ কথা স্বামীকে বলিয়া গেলেন, "লতু আমার যত পড়তে চায় পড়িও।"

শোকের ঘোরে কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। লতাই ঝাড়িয়া উঠিল সবার আগে। মুখ ম্লান, চোখে জল, কিন্তু সমানে ঘরের কাজ করিতেছে, পড়া করিতেছে। প্রতিবেশিনীরা গালে হাত দিয়া বলিল, "ধন্যি মেয়ে বাবা, এমন যারপরনাই মা, সে চলে গেল, তাতেও দু-দিন সবুর নেই, কেতাবী বিবির মুখ থেকে কেতাব নামল না। সাধে শাস্ত্রে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে মানা আছে?"

কান্তিচন্দ্রের বয়স এখন কুড়ি বৎসর। দেখিতে রাজ-পুত্রের মত। দেরাজে কবিতার খাতাও জমা হইয়াছে অনেকগুলি। ভাগ্যবিধাতা নিতান্তই প্রসন্ন, তাই উমার এখনও বিবাহ হইয়া যায় নাই। তাহার বয়স আজকাল বৎসরে বৎসরে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। কান্তিচন্দ্রের অবস্থা অবর্ণনীয়। তলে তলে এক দিন বিনয়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাবও তুলিয়াছিল, সে একরকম অপমান করিয়াই কান্তিকে বিদায় করিয়া দিয়াছে। বিনয় বলিয়াছে, "তুমি না হয়ে লতা যদি পাত্ররূপে হাজির হ'ত, এখনি বোনকে ধরে দিতাম। তুমি বিয়ে ক'রে স্ত্রীকে খাওয়াবে কি? ঐ বুড়ো বাপ যে ক'দিন সেই ক'দিন ত?"

কান্তি ভারিক্কি চালে বাবার কাছে গিয়া বলিল, "বাবা, সংসারটা ত রসাতলে যেতে বসল, লতা কিছুই দেখে না।"

রামহরি বলিলেন, "এই যে পরীক্ষাটা হয়ে যাক, এখন কিছু ব্যস্ত আছে কি-না?"

কান্তি বলিল, "ওর ভরসা করা বৃথা, আই-এ হয়ে গেলেই বি-এ পড়তে সুরু করবে ত?"

রামহরি অতি অবুঝ মানুষ, বলিলেন, "তা আর কি করা যাবে বল, ক'টা বছর একটু কষ্ট করেই চলবে।" কান্তি মুখ হাঁড়ি করিয়া চলিয়া গেল। এতদিন পর্য্যন্ত তলে তলে নানাপ্রকার ভাঙ্‌চি দিয়া উমার বিবাহ সে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু চিরকালই কি পারিবে?

লতা আই-এতেও প্রথম হইল এবং সত্যই বি-এ পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বি-এ পরীক্ষা দিতে যখন আর মাস তিন মাত্র বাকি, সেই সময় হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটিয়া তাহার জীবনে মস্ত একটা উলটপালট হইয়া গেল। লতা দেখিল, যতই কেন-না নিজের জীবনের সব ব্যবস্থা সে করিয়া থাকুক, তাহারও উপরে এক জন অদৃশ্য দেবতা বসিয়া আছেন, তাঁহার বিধির উপর কথা নাই।

উমার দাদা বিনয় হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার বলেন অতিরিক্ত খাটুনি এবং পুষ্টির অভাবই এ রোগের মূল। এই সময় সাবধান না হইলে, ক্রমে ক্ষয়রোগে দাঁড়ানও অসম্ভব নয়। কান্তি রোজ দুপুরে খাইয়া বাহির হইয়া যায়, বাড়ি ফেরে রাত এগারটায়। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "বিনয়ের কাছে থাকি। ডাক্তার তাকে একটু চিয়্যারফুল্ রাখতে বলেছে।"

সে-দিনও সে নিয়মমত বাহির হইয়া গেছে। লতার টেষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন সে বাড়িতে থাকিয়া পড়ে। পড়িতে পড়িতে একবার জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল, রোদ পড়িয়া আসিতেছে, বাবার চা খাইবার সময় হইল বোধ হয়। চেয়ার হইতে না উঠিয়া বামুন-ঠাকরুণকে ডাক দিয়া বলিল, "বামুন-ঠাকরুণ, চায়ের জল চড়িয়ে দাও, আর চারটি চিঁড়ে ভাজ।"

লতার ঘরের পাশেই কান্তির ঘর। হঠাৎ বিবর্ণ পাংশুমুখ, আর দুই চোখভরা জল লইয়া কান্তি হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দড়াম্ করিয়া নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার কান্নার শব্দ এ ঘর হইতে স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল।

লতা একেবারে অবাক হইয়া গেল। এ আবার কি কাণ্ড? দিন দুপুরে দাদা কাঁদিতে বসিল কেন? লতার মনে হইতে লাগিল, হঠাৎ মাঝের দশ-বারটা বৎসর তাহার জীবন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, সে আবার বাল্যকালে ফিরিয়া গিয়া ছেঁচকাঁদুনে কান্তিকে সামলাইয়া বেড়াইতেছে।

অনেক ঠেলাঠেলির পর ত কান্তি দরজা খুলিল। তখনও রুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। লতা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে কি?"

কান্তি বলিল, "ওরা চুপি চুপি উমার বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছে। কাল তার বিয়ে।"

লতা বলিল, "তা তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে না, তা ত জানই, নূতন কথা ত নয়? এখন কেঁদে লাভ কি? তোমাকে মেয়ে দেবে কে?"

কান্তি বলিল, "উমার সঙ্গে যদি অন্য কারো বিয়ে হয়, আমি আত্মহত্যা করে মরব। তোরা কেউ আমায় রাখতে পারবি না।"

লতা অত্যন্ত চটিয়া বলিল, "তুমি একেবারে অপদার্থ। লজ্জা করে না তোমার এই রকম "সীন" করতে? পুরুষ হয়ে জন্মে শেষে কেঁদে জিত্‌তে চাও?"

কান্তি বলিল, "তা ত তুমি বল্‌বেই, উচ্চশিক্ষিতা মহিলা কি-না? আমার মা বেঁচে থাকলে এটা হতে দিতেন না, যতই মূর্খ হই, আমাকে তিনি বাঁচাতেনই, যেমন করে হোক। তুমি যাও আমাকে নিজের ব্যথা নিয়ে একলা থাকতে দাও।"

সে এক রকম ঠেলিয়াই লতাকে বাহির করিয়া দিল। রাগে, উত্তেজনায়, এবং খানিকটা ভয়েও লতার পা তখন কাঁপিতেছিল, কোন মতে নিজের ঘরে গিয়া সে শুইয়া পড়িল। বই পড়িবার মত মনের অবস্থা আর তাহার ছিল না।

কিন্তু শুইয়াও স্থির থাকিতে পারিল না। কান্তি বয়সে লতার বড় বটে, কিন্তু তাহাকে লতা বাল্যকাল হইতে একান্ত অসহায় শিশুর মতই দেখিয়াছে এবং যথাশক্তি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে। মা অসুস্থ হইয়া পড়ার পর কান্তির সকলরকম ধাক্কা সাম্‌লাইয়াছে ছোটবোন লতা, যদিও অকৃতজ্ঞ কান্তি একদিনের জন্যও তাহা স্বীকার করে নাই।

আজও তাই কান্তিকে কাঁদিতে দেখিয়া লতা অস্থির হইয়া উঠিল, কোনোমতে তাহাকে শান্ত করিবার জন্য তাহার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সত্যই যদি আত্মহত্যা করিয়া বসে? অতবড় মূর্খের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। উমার উপরেও তাহার রাগ হইতে লাগিল। জানিয়া শুনিয়া সে দাদাকে অত আস্কারা দিল কেন?

স্থির থাকিতে না পারিয়া লতা উঠিয়া বাবার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "বাবা, দাদার কাণ্ড শোন। তুমি ত কিছু দেখবে না এ-দিকে সে যে কি-না করছে!

রামহরি ভীত ত্রস্তভাবে বলিলেন, "কি করেছে সে মা?"

লতা সব কথা খুলিয়া বলিল। রামহরি চিন্তিতভাবে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "তাই ত কাল বিয়ে? এর মধ্যে কিই বা করা যায়?"

লতা বলিল, "সময় থাকলেই বা কি করতে? ওরা অমন ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে কেন?"

রামহরি বলিলেন, "তা বুঝিয়ে বল্‌লে কি হয় বলা যায় না। আমার লাইফইন্‌স্যুরেন্সের হাজার কয়েক টাকা পাওনা আছে, আর তোমার মা থাকতে দেশের সেই জমিটা কিনেছিলেন। এর ভিতর কিছু টাকা তোমার জন্যে—"

লতা বাধা দিয়া বলিল, "আমার জন্যে তোমার কিছু রাখতে হবে না বাবা, আমি ক'রে খেতে পারব। যা আছে সব দিয়েও তোমার হাবা ছেলেকে বাঁচাতে পার ত দেখ।"

রামহরি বলিলেন, "তা হ'লে আমি যাব না-কি একবার বিনয়ের কাছে?"

লতা একটু থামিয়া বলিল, "তিনি ত বড় অসুস্থ, উমার মায়ের কাছে বল্‌তে পারলে হয়। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

লতা প্রস্তুত হইবার জন্য উপরে ছুটিল। দাদার ঘরের দরজায় একটা ধাক্কা দিয়া বলিয়া গেল, "আমরা উমাদের ওখানে যাচ্ছি, একটু ঠাণ্ডা হও।"

উমার মা তাহাদের দেখিয়াই মুখ গম্ভীর করিলেন। রামহরি বিনয়ের কাছে গিয়া বসিলেন। লতা বলিল, "আপনি দোজবরে পাত্রে দিচ্ছেন ত, সেও খুব ভাল নয়; না হয় দাদার সঙ্গেই দিন। তার অন্ততঃ বয়স কম, আর কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। খাবার পরবার মত ব্যবস্থা হয়েই যাবে।

উমার মা বলিলেন, 'কি ব্যবস্থা? ছেলে কি কোনো দিনও কিছু রোজগার করবে?"

লতা বলিল, "তা হয়ত করবে না, কিন্তু বাবার জমিজমা টাকাকড়ি কিছু আছে, তাতে সাধারণভাবে একটা সংসার চল্‌তে পারবে।"

উমার মা খানিক চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"তবে বাছা আসল কথা বলি, মেয়েকে শুধু খাওয়ালে ত হবে না, আমাদের সকলেরই একরকম ভার নিতে হবে। আমার বিনয়ের যদি ভগবান স্বাস্থ্য ভাল রাখতেন তা হ'লে কি আর উমাকে আমি বুড়ো বরে দিই? অমন সুন্দর মেয়ে আমার। কান্তির সঙ্গে বেশ মানাত, কিন্তু যেমন অদৃষ্ট। এ পাত্রর কিছু টাকাকড়ি আছে, তাই ভরসা আমাদের ফেলবে না।"

লতা গম্ভীর হইয়া গেল। খানিক বাদে জিজ্ঞাসা করিল, "উমা কই?"

উমার মা বলিলেন, "ছাদে আছে বুঝি।"

লতা ধীরে ধীরে ছাদে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবা মাত্রই উমা মুখে আঁচল গুজিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

লতা একটুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, "তোমরা আছ ভাল। কাঁদলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আমার কোনো দিন কাঁদবারও সুবিধে হ'ল না।" বলিয়া আবার নীচে নামিয়া গেল।

উমার মা তাহাকে নামিতে দেখিয়া বলিলেন, "উমি নেই ছাদে? তবে গেল কোথা, এই সন্ধ্যে বেলা?"

লতা বলিল, "উপরেই আছে, ব'সে ব'সে কাঁদছে।"

উমার মা ম্লানমুখে বলিলেন, "কি আর করব মা, পোড়া অদেষ্ট।"

লতা বলিল, "দেখুন, এক কাজ করলে হয়, আপনি যদি রাজী হন। তা হ'লে সকলেরই সুবিধে হয়।"

উমার মা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"

"আপনি যদি উমাকে আমাদের বাড়িতে দেন, আর আমাকে ঘরে নেন। বি-এতেও আমি ফার্ষ্ট হব। টাকাকড়ির দুর্ভাবনা আপনাকে আর কিছু ভাবতে হবে না।"

উমার মা তাহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "সে ভাগ্যি কি আর

আমার হবে ? আমার রোগা ছেলে। তোমার বাবা রাজী হবেন কেন ?"

লতার মুখখানা একটু লাল হইয়া উঠিল, বলিল, "তা তিনি রাজী হবেন।"

এমন সময় উমা ছুটিয়া আসিয়া লতাকে টানিয়া লইয়া গেল।

এক দিনেই এক জোড়া বিবাহ হইয়া গেল। বাসর ঘরে লতার কানের কাছে মুখ লইয়া উমা ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল "আচ্ছা ধিঙ্গী তুই, নিজেই নিজের বিয়ের সম্বন্ধ করলি।"

লতাও তেমনিভাবে বলিল—"তা তোমার বরটি যে পৌরাণিক রাজনন্দিনীর মত "হা হতোস্মি" ব'লে গড়িয়ে গেলেন, কাজেই আমাকেই নায়করূপে অবতীর্ণ হতে হ'ল।"

স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীসত্যপ্রিয় বসু

আজকাল বেকার-সমস্যার দিনে যুবকেরা ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। আমি এক কৃতী পুরুষের জীবনার প্রতি যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিজ অধ্যবসায় ও কর্ম্মশক্তির বলে উন্নতি লাভ করিয়া বাঙালীর গৌরবস্থল হইয়াছেন।

রাজেন্দ্রনাথ ১৮৫৪ সনে ভাবলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, তাঁহার মাতাই তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। তিনি খুব স্নেহশীলা ও তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ পরে যে-সব গুণাবলীর জন্য যশ ও কৃতিত্ব লাভ করেন, তাহা বাল্যকালে মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যখন রাজেন্দ্রনাথ এগার-বার বৎসরের বালক তখন তাঁহার মাতা নিজের স্বল্প পুঁজি ভাঙিয়া পুত্রকে উচ্চ শিক্ষার্থ সুদূর আগ্রায় কোন আত্মীয়ের নিকট প্রেরণ করেন ; কিন্তু রাজেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলে পুত্রের অভাব এত অনুভব করেন যে, অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি পীড়িত থাকেন। তথাপি পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও উচ্চ শিক্ষার যাহাতে কোনও ব্যাঘাত না হয়, এজন্য নিজের সুখ-সুবিধার প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করেন নাই।

রাজেন্দ্রনাথও অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। একবার যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার আত্মীয়স্বজনরা মাতার অসুস্থতার খবর দিয়া একটি তার পাঠান। তিনি এই সংবাদ পাইয়া অতি দুঃখিত মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং আসিয়া দেখেন, মাতার অসুস্থতার কথা সত্য নহে ; তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। পাছে তিনি না আসেন, সেজন্য এই মিথ্যা সংবাদ পাঠান হইয়াছিল ; কেন-না, তাঁহারা জানিতেন মাতার অসুস্থতার সংবাদ শুনিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিবেন না। তখনকার প্রচলিত রীতি অনুসারে অতি অল্পবয়সে তাঁহার বিবাহ হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসে ভর্ত্তি হন। কিন্তু এ-সময় এমন ভীষণ রোগে আক্রান্ত হন যে, তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া পড়ে। পারিবারিক অবস্থাও এরকম যে আর্থিক সাহায্যের নিতান্ত প্রয়োজন হয়। সুতরাং কাজের চেষ্টায় তাঁহাকে বাহির হইতে হইল। শেষ পরীক্ষা দিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি চিরকাল দুঃখ অনুভব করিয়াছেন এবং পরে যখন তাঁহার অবস্থার উন্নতি হয় তখন বহু ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন। বহু অর্থব্যয়ে নিজগ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং যাহাতে তাঁহার অবর্ত্তমানে অর্থাভাবে বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি না হয় সেজন্য ট্রাষ্টিদের হাতে বহু টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। তিনি বহুকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্‌টির সভ্য আছেন এবং শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ অনারারি ডি-এস্‌সি উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন। আর একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। সেটি বঙ্গীয় অনুন্নত জাতিসমূহের উন্নতি-বিধায়ক সমিতি (Society for the Improvement of the Backward Classes)। আজকাল অনুন্নত জাতির প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে, কিন্তু যাঁহারা খবর রাখেন তাঁহারা জানেন যে, এই প্রতিষ্ঠানটি প্রায় পঁচিশ বৎসর কয়েকটি নীরব কর্ম্মীর সাহায্যে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। স্যর রাজেন্দ্রনাথ শুধু অর্থসাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইহার সভাপতিরূপে ইহাকে দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহার সাফল্যের মূলে ইঁহার বহু যত্ন নিহিত আছে। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে প্রায় ৪৫০টি বিদ্যালয়ে অন্যূন ১৭০০০ বালকবালিকা শিক্ষা পায়। রাজেন্দ্রনাথের সাফল্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে

দেখা যায় কয়েকটি গুণের অপূর্ব্ব সমাবেশ। এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অক্লান্তকর্ম্মী, কষ্টসহিষ্ণু ভাগ্যবান পুরুষ খুব কমই দেখা যায়। তাঁহার জীবনচরিত-লেখক শ্রীযুক্ত মহীন্দ্র তাহার পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন পলতা জলকলে কাজ আরম্ভ করেন, তখন দিনে তের-চৌদ্দ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করিতেন। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন ইহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র।

তিনি জীবনের প্রারম্ভে দুঃখকষ্ট ও অর্থকৃচ্ছ্রতার ভিতর কাহারও অধীনতা স্বীকার করিবেন না বলিয়া যে-প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আজও জীবন-সায়াহ্নে সে-প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

যখন তিনি মার্টিন কোম্পানীতে অংশীদাররূপে প্রবেশ করেন, তখন মার্টিন কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার স্যর একুইন মার্টিনের সহিত এই চুক্তি করেন যে, সমান অংশীদার রূপেই তিনি আসিতে রাজী, নতুবা নহে। সেই সময় তিনি ইউরোপীয় কর্ম্মক্ষেত্র ক্লাইভ স্ট্রীটে অপরিচিত ছিলেন।

যদিও তিনি জানিতেন যে, মার্টিন কোম্পানীতে প্রবেশ না করিলে তাঁহার বহু আর্থিক ক্ষতি হইবে এবং ব্যাপক-ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ হারাইবেন তথাপি তিনি নিজের আদর্শচ্যুত হইলেন না। স্যর একুইন মার্টিন রাজেন্দ্রনাথের গুণাবলীর পরিচয় পাইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে সমান অংশীদার রূপেই গ্রহণ করিলেন, তাঁহারই সাহায্যে তিনি এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, পাটনা ইত্যাদি শহরে জলকলের কণ্ট্রাক্ট পান ও তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। কোন কাজে হাত দিলে তাহা সুন্দররূপে সম্পন্ন করাই তাঁহার বিশেষত্ব। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে মার্টিন কোম্পানীর ইমারতসকল নির্ম্মাণ প্রণালীতে তাঁহার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তাঁহার নির্ম্মাণশক্তির অপূর্ব্ব নিদর্শন। যদিও ইহার পরিকল্পনা বিলাতের প্রসিদ্ধ স্থপতি স্যর উইলিয়ম এমারসন প্রস্তুত করেন, তথাপি রাজেন্দ্রনাথের পরামর্শ অনুসারে মূল নক্সা তিনি অনেক পরিবর্ত্তন করেন। যদি রাজেন্দ্রনাথের পরামর্শ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হইত, তাহা হইলে পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুসারে সবটাই শেষ করা যাইত। ভিত্তি অত্যধিক ভারাক্রান্ত হওয়ায় কয়েকটি মিনারেট বসান হয় নাই।

কলিকাতার উপকণ্ঠে ও অন্যান্য স্থানে তিনি লাইট রেলওয়ে স্থাপন করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদিগের অনেক অসুবিধা দূর করিয়াছেন। জলকল বা রেলওয়ে নির্ম্মাণ অথবা এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, জব্বলপুর, ইত্যাদি স্থানের বৈদ্যুতিক কারখানা স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার নৈপুণ্য নিয়োগ করিয়াছেন।

স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আগ্রা জলকল প্রস্তুত করিবার জন্য টেণ্ডার বাহির হইলে রাজেন্দ্রনাথ যে দর দেন তাহা অন্যান্য কোম্পানী হইতে অনেক কম হইলেও, তিনি দেশী লোক তদুপরি বাঙালী, এই

অজুহাতে সেই অর্ডার পান নাই। এই সম্পর্কে তিনি তখনকার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সহিত বিশেষ পরিচিত হন এবং এলাহাবাদ জলকল প্রস্তুত করিবার স্কীম ঠিক হইলে, তিনি রাজেন্দ্রনাথকে কোন ইউরোপীয় কোম্পানীর নামে কোটেশন পাঠাইতে পরামর্শ দেন। এই সূত্রেই তিনি স্যর একুইন মার্টিনের সহিত মিলিত হইয়া মার্টিন কোম্পানী স্থাপন করেন। টেণ্ডার খুলিবার দুই-তিন দিন আগে তিনি ও একুইন মার্টিন এলাহাবাদ গমন করেন এবং পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থার খোঁজ করিয়া টেণ্ডার দাখিল করেন। টেণ্ডার খুলিবার দিন সকালবেলা দেখা গেল, যে-বাক্সে টেণ্ডার ছিল, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। বহু অনুসন্ধানের ফলেও তাহার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। টেণ্ডার খুলিবার মাত্র দুই ঘণ্টা বাকী। দুই জনে সেই একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলায় যান এবং বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত সময় চাহিয়া লন। নূতন টেণ্ডার-পত্র লইয়া দু-জনে হোটেলে ফিরিয়া আসেন এবং বহুপরিশ্রমে দুই জনে মিলিয়া পাঁচ ঘণ্টার ভিতর আবার টেণ্ডার-পত্র সম্পূর্ণ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও চার-পাঁচ লক্ষ টাকার কাজের টেণ্ডার, তথাপি তাঁহাদের পূর্ব্ব টেণ্ডারে যে দর ধরিয়াছিলেন এটাতে তাহায় চেয়ে অতি সামান্য তফাৎ হয় এবং টেণ্ডার খুলিলে দেখা গেল যে, তাঁহাদের টেণ্ডারই সর্ব্বনিম্ন এবং তাঁহারাই সেই কাজ পাইলেন। কোন বোম্বাইওয়ালার উপর সন্দেহ হয়, কিন্তু কে যে সেই বাক্স চুরি করিয়াছিল তাহা আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন যে, বাঙালীর ব্যবসার অবনতির অন্যতম কারণ, পাকা ব্যবসায়ীরা মুনাফার টাকা হয় কোম্পানীর কাগজ, না-হয় জমিদারী ক্রয়ে খাটান, কিন্তু রাজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ-কথা বলা চলে না। তিনি আজীবন যে-প্রতিষ্ঠানটি স্বহস্তে গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেইটি যাহাতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং তাহার উন্নতিসাধন হইতে পারে সেই চেষ্টাতেই ব্যাপৃত আছেন।

কিছুদিন হইল তিনি বার্ন্ কোম্পানীর সুপ্রসিদ্ধ লৌহ কারখানা ক্রয় করিয়াছেন এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র বীরেন্দ্র-নাথকে তাহা চালাইবার ভার দিয়াছেন।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করেন না। তাহার কারণ, যাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হইতে পারে, তাহাতে তিনি যোগদান করিতে চান না; কেন-না, তিনি মনে করেন ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিতর দিয়াই দেশের ও দশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। তাই যখন বাংলার মন্ত্রীত্ব গ্রহণের ডাক আসিল, বা গোলটেবিলের বৈঠকে যোগদানের নিমন্ত্রণ আসিল, তিনি তাহা গ্রহণে অসম্মত হইয়াছেন।

লোক চিনিবার ক্ষমতা, ব্যবসায়ে সততা, তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি, অধিকন্তু কর্ম্মচারীদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মিষ্ট ব্যবহার তাঁহার উন্নতির অন্যতম কারণ। গত বৎসর তাঁহার অষ্টতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহার কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে একটি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন, উত্তরে তিনি তাঁহার কারবারের কর্ম্মচারীদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্বন্ধের উল্লেখ করেন। তাঁহার একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। একবার কোন একটি জরুরী কার্য্যোপলক্ষে তিনি আমাকে জলপাইগুড়ি পাঠান এবং ফিরিয়া আসিলে প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমার থাকিবার বা খাইবার কোন অসুবিধা হয় নাই ত। তারপর কাজের কথা জিজ্ঞাসা করেন। কেন তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীদের শ্রদ্ধাভক্তি ভালবাসা পান, তাহা এই সামান্য ঘটনা হইতে বুঝা যায়।

বাল্যকালে তিনি একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন এবং এখনও একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তারূপে বাস করিতেছেন। সব জিনিষেই ভালমন্দের সংমিশ্রণ বিদ্যমান। একান্নবর্ত্তী পরিবারেও সুখে বাস করা যায় যদি পরিবারের সকলে স্বার্থপর না হন। রাজেন্দ্রনাথের পত্নী লেডী যাদুমণি মুখার্জ্জী হিন্দু স্ত্রী ও মাতার কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছেন এবং তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে স্যর রাজেন্দ্রনাথ এই উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে পারিতেন কি-না সন্দেহ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিদ্যমান। এক সময় এই সমাজ দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হইলেও তিনি দীক্ষিত হন নাই এবং প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম অনুসারেই ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দিয়াছেন।

কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট আছেন। বাঙালীদের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি তাঁহার চেষ্টায় ও যত্নের কথা কাহারও অবিদিত নাই। বয়স্কাউট, অলিম্পিক এসোসিয়েশ্যন্, মোহনবাগান ক্লাব, আহিরীটোলা ক্লাব, স্পোর্ট ইউনিয়ন ক্লাব ইত্যাদি বহু ক্লাব তাঁহার সাহায্য লাভ করিয়াছে।

কলিকাতা শ্যামবাজারে একটি অতি পুরাতন অনাথ আশ্রম আছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ রাজেন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানটিকে বহু যত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অল্পদিন হইল ইহার অধিবাসীদের জন্য একটি হাসপাতাল খোলা হয়। ডাক্তাররা তাঁহার অসুস্থতার জন্য সিঁড়ি দিয়া উঠা-নামা বারণ করা সত্ত্বেও তিনি উপরে না উঠিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, পাছে অনাথ বালক বালিকাদিগের জন্য সুবন্দোবস্ত না হয়। এখানে যে-সব অনাথা বালিকাদিগকে পালন করা হয় তাহাদের কয়েক জনের উপযুক্ত পাত্রের সহিত গুজরাটে বিবাহ হয়। অন্য কোন একটি প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের প্রতি ভাল ব্যবহার হয় নাই এবং নানা রূপ গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে শুনিয়া

তিনি এই প্রতিষ্ঠানের একটি কর্ম্মচারীকে সুদূর গুজরাটে প্রেরণ করেন ও প্রত্যেকটি মেয়ের প্রতি ভাল ব্যবহার হইতেছে কি-না এবং তাহারা সুখে আছে কি-না ইহা জানিয়া আসিবার আদেশ দেন। তাহারা সাদরে পরিবারে গৃহীত হইয়াছে এবং আনন্দে ঘরসংসার করিতেছে এই সংবাদ পাইয়া তবে তিনি নিশ্চিন্ত হন।

রাজেন্দ্রনাথ বাঙালীর কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে একটি নূতন ধারা দিয়াছেন। নিজের জীবন দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, অতি সামান্য অবস্থা হইতেও চরিত্রবলে অদ্ভুত কর্ম্মশক্তি দ্বারা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করা যায়।

তিনি জীবনে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা হইতেও একটি বড় জিনিষ অর্জ্জন করিয়াছেন, দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। পরামুখাপেক্ষী হইয়া গবর্ণমেন্টের চাকুরির জন্য বসিয়া থাকিলে আর চলিবে না। স্বাধীন ব্যবসা ও কর্ম্মশক্তি দ্বারা বাঙালীকে আবার বড় হইতে হইবে।

মুক্তি

শ্রীআশালতা দেবী

পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ—নির্ম্মলার বাবা চন্দ্রনাথ বাবু আজকালকার অনেক উচ্চশিক্ষিত স্বাধীনচিন্তাশীলের মত আচারব্যবহার এবং চালচলনে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন যদিচ প্রকাশ্যে কোনদিন দীক্ষা লন নাই। তাহার স্ত্রী পল্লীগ্রামের মেয়ে, অল্পবয়সে বিবাহ হইয়াছিল। স্বামী এবং স্ত্রীর ভাবনা, বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার মাঝে ছিল আকাশপাতাল ব্যবধান। সেটা যে কেবল চন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরক্তির কারণ তাহাই নয়। তিনি ছিলেন স্বভাবতঃই জ্ঞানলোকের মানুষ। সংসারের প্রয়োজন এবং তাগিদের চাপে তাঁহার প্রকৃতিকে খর্ব্ব করিয়া চলা—এ তাঁহার ধাতে আদৌ সহিত না। বস্তুতঃ আইডিয়া এবং আইডিয়ালের জগতে পুরুষ যেমন চিরনিঃসঙ্গ, তিনিও ছিলেন তাহাই। তা এজন্য তাঁহার স্ত্রীর কোন রোষ ক্ষোভ ছিল না; যদিবা ছিল বাহিরে প্রকাশ পাইত না। তিনি পল্লীগ্রামের মেয়ে, জীবনের সমস্ত অভাব অপূর্ণতাকেই নিয়তির মত মানিয়া লইতে শিখিয়াছিলেন। এমনি করিয়া একধারে তাঁহার স্ত্রী সুশীলা ছেলেপুলে ঘরসংসার লইয়া নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন, অন্যধারে চন্দ্রকান্ত ভাবরাজ্যের নেশায় ভরপুর হইয়া থাকিতেন। এমন করিয়া অনেক দিন কাটিয়াছিল। কিন্তু চন্দ্রকান্তের সবচেয়ে ছোট মেয়ে নির্ম্মলা যখন হইতে হইয়াছে, তখন হইতে প্রকৃতিতে তাঁহার পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। উদাসীন পুরুষের যে দিকটা ছিল শুষ্ক, স্নেহাতুর, অনেকদিন পরে আজ তাহাই এই শুভ্র সুন্দর সুকুমার শিশু-কন্যাটিকে কেন্দ্র করিয়া বিমথিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রকান্ত নির্ম্মলাকে শিশুকাল হইতে শিক্ষায় দীক্ষায় সর্ব্বতোভাবে নিজেকে দিয়া বেষ্টন করিয়া রহিলেন। এমনি করিয়া নির্ম্মলা ক্রমে সতের বৎসরের হইয়াছে, এখন সে বেথুন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে, কিন্তু কেবলমাত্র পিতার সঙ্গ এবং সাহচর্য্যে আশৈশব অভ্যস্ত হওয়ার ফলে তাহার প্রকৃতিতে রহিয়া গেছে একটা অপূর্ণতা। নবযৌবনের প্রত্যন্তপ্রদেশে পা দিলে তরুণীর মনে যে-সকল কথা যেমন করিয়া উদয় হয়, মনে যেটুকু ভাবের মায়া, যেটুকু আবেশ বাষ্পসঞ্চিত হইতে থাকে নির্ম্মলার তাহা হয় নাই। বরঞ্চ অবিশ্রান্ত চন্দ্রকান্তের মত পিতার সংস্পর্শে থাকিয়া জ্ঞানের এবং মননশীলতার একটা আভাস তাহার চরিত্রে লাগিয়াছিল এবং তাই তাহার প্রকৃতিতে একটা অনাসক্তির ভাব ছিল, যাহা ঠিক স্ত্রী-সুলভ নয়।

এমনি করিয়া বাকী সংসারের প্রতি উদাসীন থাকিয়াও পিতা এবং কন্যার মাঝে একটি সুমধুর স্নেহসম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। একদিন কলেজ যাইবার আগে চন্দ্রকান্তের ঘরে যামিনীর সঙ্গে নির্ম্মলার একটুখানি আলাপের মত এবং সামান্য দুই চারিটা কথা হইল। হয়ত তাহার মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছুই ছিল না। যামিনীর মত এমন কত ছাত্র কত লোকই তাঁহার বাহিরের ঘরে তাঁহার সহিত বিশ্বব্যাপারের যাবতীয় বস্তু লইয়া তর্ক করিতে আসিত এবং সকলের সহিতই নির্ম্মলাকে তিনি পরিচিত করিয়া দিতেন।

৪

নির্ম্মলা বাবার কাছে রাজ্যের বই পড়িয়াছে। নব্য রাশিয়ার অসমসাহসিক উদ্যম হইতে সুরু করিয়া বার্গসোঁ এবং সোপেনহাওয়ারের দার্শনিক মতামত পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়েই সে কিছু কিছু জানে। কিন্তু আশৈশব বাবার কাছে মানুষ হইয়া তাহার এমন স্বভাব হইয়া গিয়াছিল, যে, বইয়ের আলমারীতে ঠাসা তাহাদের এই বাইরের ঘরের বাহিরে যে আর একটা জগৎ আছে, যে-জগতে সমস্তই ন্যায়শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে চলে না এবং যেখানে সুখদুঃখ কামনা-আকর্ষণের ঘাত-প্রতিঘাত অহরহ চলিতেছে, তাহা সে অনুভবই করিত না। সে জগৎ হইতে সে অনেকটাই বাহিরে রহিয়া গিয়াছিল। নির্ম্মলাদের সংসারের এই বাহিরের ঘরটিতে সংসারের ভাবনা-চিন্তা দুঃখ-

দৈন্য কিছুই প্রবেশ-পথ পায় নাই। এখানে চন্দ্রকান্তবাবু বন্ধুদের সঙ্গে বসিয়া সাহিত্যের সীমা এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় লইয়া তর্ক করিতেন, গোধূলী বেলার আলোতে নির্ম্মলা সেতার বাজাইত; এবং দীপালোকিত এই ঘরেই সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া বই পড়িত। এইখানেই জ্ঞানের অপরিসীম মুক্তির মধ্যে এবং সাংসারিক চিন্তাবিরহিত বিশুদ্ধ আর্টের আলোচনায় সে তাহার সমস্ত দিনরাত্রি কাটাইয়াছে। সুশীলা যেখানে সংসারের খরচ বাঁচাইবার জন্য গুঁড়া কয়লার সহিত মাটি মাখাইয়া গুল্ প্রস্তুত করিতেন, নিজের হাতে গরুর জন্য ছানি কাটিতেন, যেখানে তাঁহার সেজভাইটি আই-এ পরীক্ষায় বৃত্তি না পাইয়া কলেজ হইতে আসিয়াই এক পেয়ালা চা খাইয়া গৃহশিক্ষকতা করিতে ছুটিত—সংসারের সেই নীচের তলার সহিত তাহার বিশেষ জানাশোনা ছিল না। তাহার সপ্তদশ বর্ষের জীবনে সে কখনও বাংলা বা ইংরেজী নভেল পড়ে নাই, লুকাইয়া আড়ি পাতে নাই, পান চিবাইতে চিবাইতে কিংবা চকোলেট চুষিতে চুষিতে সমবয়স্কাদের সহিত সরস আলোচনা করে নাই। এখনও তাহার তরুণ জীবনের মধ্যে সে আত্মনিমগ্ন, একা। চন্দ্রনাথ এককালে কলিকাতার কোন বে-সরকারী কলেজে বছর দুই-তিন অধ্যাপনা করেন, তাহার পরে কি জানি কেন তাহা হঠাৎ ছাড়িয়া দেন। কিন্তু সেই হইতেই কলেজের ছেলেদের প্রতি, ধীমান্ চিন্তাশীল অল্পবয়সী ছেলেমাত্রের প্রতিই তাঁহার একটা আকর্ষণ থাকিয়া গিয়াছে। পথেঘাটে ট্রামে বইয়ের দোকানে সামান্য দু-চার ঘণ্টার আলাপীকেও তিনি সাগ্রহে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহার সহিত হাসিয়া অজস্র বকিয়া তর্ক করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার অন্তরঙ্গ হইয়া উঠেন।

যামিনী অল্প কয়েক দিন হইতে এখানে আসিতেছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে তাহার আর আসা-যাওয়ার কোন আইন-কানুন নাই। তাহা সময় হইতে অসময়ে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। রাত্রি দশটা অবধি সে চন্দ্রকান্তের সঙ্গে বসিয়া তর্ক করে, সকালের দিকে কখনও কখনও বেলা বারটাও হইয়া যায়। সে যে কেবল হোয়াইটহেডের নূতন বই এবং হিটলারের প্ল্যান আর বলশেভিজমের মূল ধারাটা লইয়াই তর্কালোচনা করিতে এত উৎসাহ দেখায়—তাহা ত মনে হয় না।

কিন্তু নির্ম্মলা তাহাকে লক্ষ্যও করে নাই। চন্দ্রকান্তের সহিত যামিনী নানা বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে মাঝে মাঝে যখন বিমনা হইয়া যাইত তখন নির্ম্মলা বাবার পাশে প্রায়ই উপস্থিত থাকিত বটে; কিন্তু চিরকালের অভ্যাসমত চুপ করিয়া শোনা ছাড়া আর কোন কথা তাহার মনেও আসিত না। বস্তুতঃ সাধারণ মেয়েদের চেয়ে অন্যরকম ভাবে মানুষ হওয়ার জন্য নির্ম্মলার কোন কোন হৃদয়বৃত্তি একেবারে অপরিণত ছিল। তাহার বাবা এই বয়স হইতে জ্ঞানের প্রতি, গভীর চিন্তার প্রতি তাহার মনে এমন একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন, যে, নিজের বয়সের সঙ্গিনীদের সঙ্গে থাকিলেও স্বভাবতঃই সে থাকিত একা। তাহারা যখন শাড়ী, গয়না, নূতন উপন্যাস এবং মুখরোচক পরচর্চ্চা লইয়া পরম উৎসাহে মাতিয়া উঠিত, তখন সে-সব হইতে মন তাহার বিতৃষ্ণায় সরিয়া আসিত।

যেদিন নির্ম্মলা জন্মিয়াছিল সেই দিন হইতেই চন্দ্রনাথ তাঁহার মেয়ের জীবনকে এমন আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন, যে, তাঁহাকে বাদ দিয়া অপর কোনখানে তাঁহার কন্যার জীবনের যে কোন অর্থ থাকিতে পারে এ কথাটাই যেন তাঁহার মনে আসিত না। নির্ম্মলাও তেমনি করিয়া ভাবিতে শিখিয়াছিল এবং সেইজন্যই শিশুকাল হইতেই বাবা ছাড়া আর কাহাকেও সাথী বলিয়া ভাবিতে পারে নাই। তাই সমবয়সী সখী এবং সঙ্গিনীদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া হাসিকৌতুক ঠাট্টা মান-অভিমান এই সকল জড়াইয়া তরুণ বয়সে মনের উপর রহস্যবিজড়িত যে একটি সুমধুর ভাবের ছায়াপাত হয়, নির্ম্মলার তাহা হইতে পায় নাই। তাহার কুমারী-জীবনের সু-উচ্চ গিরিশিখরে কেবল অপরিমেয় শুভ্র তুষারের কঠিনতা এবং বর্ণহীন শুভ্রতা। তাহার চোখের চাওয়ায় এখনও যেন কোন বেদনার ঘোর লাগে নাই, মুখের উপর তরুণকালের ভাবমুগ্ধতার বিশেষ কোন চিহ্ন নাই। সে সহজ সরল স্বচ্ছ।

কিন্তু সেই নীরব সৌন্দর্য্য দেখিয়াই আর একজন পলে পলে মুগ্ধ হইতেছিল। চন্দ্রকান্তের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিবার ইচ্ছা যামিনীর দিন দিন কেন যে এত প্রবল হইয়া উঠিতেছে, কেন যে এ বাড়িতে ঢুকিলে নিজেকে স্থির করিয়া

রাখা তাহার পক্ষে এত কঠিন হইয়া উঠে, একটা কথা বলিতে বলিতে সে এমন অন্যমনস্ক হইয়া যায়, হঠাৎ সমস্ত মন এত উতলা হইয়া উঠে যে, প্রাণপণ বলে আপনাকে সংবরণ করিতে হয়, এ-সকল কথার উত্তর দেওয়া কঠিন।

৫

সেদিন সকাল হইতে বাদলা করিয়াছিল। মেঘলা ঘোলাটে আকাশ, শীতের তীক্ষ্ণ বায়ু। মাঝে মাঝে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। বাহিরের আব্‌হাওয়ার জন্য ভিতরটাও ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। পাচটা বাজিতে না বাজিতেই ইলেকট্রিক আলো জ্বালাইয়া কাচের শাসি বন্ধ করিয়া চন্দ্রকান্ত বিকালবেলাকার দ্বিতীয় পেয়ালা চা খাইতে খাইতে কহিলেন, "নির্ম্মলা, একটা গান কর তো, মা।"

বাজনার ডালা খুলিয়া নির্ম্মলা গান করিতেছিল, এমন সময় বন্ধ দরজার শার্সিতে কে টোকা মারিল। এমন বাদলায় কলিকাতার কর্দ্দমাক্ত পথ বাহিয়া যে কেহ আসিতে পারে, চন্দ্রকান্ত কল্পনাও করেন নাই। তাই যামিনীকে দেখিয়া অতিমাত্রায় খুশী হইয়া বলিলেন, "আরে এই যে! এস যামিনী। ভাল কথা—কাল সকালে যে বইটা নিয়ে তর্ক করছিলে, সেইটে তুমি চলে যাবার পরেই থ্যাকারের দোকান থেকে কিনে আন্‌লুম। অনেক দিন আগে এক বন্ধুর কাছে চেয়ে নিয়ে পড়েছিলাম কি-না, ঠিক মনে ছিল না। আর একবার আগাগোড়া মন দিয়ে পড়লুম। অনেক জিনিষ নতুন ক'রে চোখে পড়লো। সে-সব আমি দাগ দিয়ে রেখেচি। দাড়াও, বার ক'রে নিয়ে আসি পাশের ঘরের আলমারী থেকে।"

চন্দ্রকান্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া লাইব্রেরী ঘাঁটিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু যামিনীর বইয়ের প্রতি আদৌ মনোযোগ ছিল না। বাজনার উপর নির্ম্মলার সুকুমার আঙুলের গতি-লীলার দিকে সে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। বৃষ্টি পড়িতেছে,আজ আর চন্দ্রকান্ত বাবুর বাড়িতে যাইবে না এমনই স্থির করিয়া যামিনী আইনের একখানা মোটা কেতাব খুলিয়া তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারে নাই, কিন্তু দৃষ্টি সংযোগ করিয়াছিল। অথচ যতই সময় বহিয়া যাইতে লাগিল, ততই চেয়ার টেবিল এবং আইনের বইসমেত এই শুষ্ক শূন্য ঘরটা একটা বিরাট ভারের মত তাহার মনের উপর চাপিয়া বসিতে লাগিল। অবশেষে নিজের সঙ্কল্প এবং নিজের কামনার সহিত বিবাদ করিতে করিতে সে আলনা হইতে বর্ষাতি কোট টানিয়া লইয়া গায়ে দিয়া চন্দ্রকান্তের বাড়ি অভিমুখেই দ্রুতপদে আসিতে সুরু করিল। বর্ষার দিনে পিচ্ছিল কর্দ্দমাক্ত পথে বর্ষাতি গায়ে দিয়াও একজন যে আর এক জনের বাড়িতে কেবল মাত্র তর্ক করিতেই যায়, একথাটা আর যাহারই কাছে অবিশ্বাস্য হউক, চন্দ্রকান্তের কাছে ছিল না; কারণ তাঁহার ও-সকল কথা খেয়ালেও আসিত না।

তিনি ত পাশের ঘরে বই খুঁজিতে গেলেন, বাহিরে চাপিয়া বৃষ্টি আসিল এবং গানের সুরের মধ্যে নির্ম্মলা তন্ময় হইয়া গেল। কেবল যামিনী নিজের মনের মধ্যে সাগরের মত আবেগ চাপিয়া ধরিয়া সেই সঙ্গীতাবিষ্ট তরুণীর পানে চাহিয়া থাকিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, বাজনার পর্দ্দার উপর সুন্দর রক্তাভ যে আঙুলগুলা সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে তাহাদের চাপিয়া ধরে। এমন সময়ে চন্দ্রকান্ত বাবু পাশের ঘর হইতে ডাকিলেন, 'নির্ম্মল, নতুন বইখানা কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্ছিনে যে মা।" তাঁহার আহ্বানে নির্ম্মলা বাজনা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুর কাটিয়া গেল। গান থামিয়া গেল এবং যামিনী স্বপ্নলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিল, তাহার মানসী শুভ্র সুন্দর হাত দুইখানি একত্র করিয়া তাহাকে নমস্কার করিতেছে।

* * *

সুশীলা তাঁহার বড় বৌমাকে কিছুদিনের জন্য এ-বাড়ি আনিয়াছেন। এ তাঁহার বহুদিনের সখ। সুধাংশুর স্ত্রী প্রতিমাসুন্দরীর রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গড়ন মোটাসোটা। বয়স বছর পনের ষোল। বয়সে নির্ম্মলার চেয়ে বছর-খানেকের ছোটই বোধ করি। কিন্তু ইহারই মধ্যে একটি ছেলে হইয়াছে। মেয়েমানুষের জীবনে স্বামীকে হাতের মুঠোয় রাখা ছাড়া আর যে কোন লক্ষ্য থাকিতে পারে, প্রতিমা তাহা ভাবিতেও পারে না। সকালবেলায় সামান্য দুই-একটা কাজের পর স্নান সারিয়া মাথার ভিজা এলো চুলে একটা গেরো দিয়া লইয়া জলযোগের পরে প্রতিমাসুন্দরী আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া তাহার টিপের কৌটা বাহির করিয়া

সযত্নে একটি কাঁচপোকার টিপ পরিল। টিপ পরিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে পানের রসে ঠোঁট দুইটি লাল করিয়া যখন যূথিকা-সাহিত্য-মন্দিরের একটি বই হাতে বিছানায় একটু গড়াইয়া লইবার উপক্রম করিতেছে, ঠিক তখনই জানালা হইতে দেখিল নির্ম্মলা হাতে খাতা বই লইয়া কলেজের জন্য প্রস্তুত হইয়া বাসের অপেক্ষায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। প্রতিমার অবাক লাগিল। বুঝিতে পারিল না, মেয়েমানুষ হইয়া এই বয়সে এতখানি কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনটা কোন্‌খানে? বড় হইয়া আর কিছু তাহাকে জজিয়তী করিতে হইবে না। পানের বোঁটায় করিয়া একটু চুণ লইয়া এই কথাটাই ভাবিতে ভাবিতে সে উপন্যাসের প্রথম পাতাখানা খুলিয়াই একবার শেষের পাতাটা দেখিয়া লইল।

বিকালবেলায় কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গা ধুইয়া নির্ম্মলা যেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রতিমা তাহাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ঠাকুরঝি ভাই, আমার মাথা খাস্, একটা টিপ পর্।"

নির্ম্মলা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই কয়েকদিন দূর হইতে কি যেন লক্ষ্য করিয়া প্রতিমার মন ভিতরে ভিতরে রহস্যসমাকুল ও পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া সে বলিল, "অবাক হয়ে অমন ক'রে মুখের পানে চাইছিস কেন ভাই? আমি বলচি একটা টিপ পর্ আর একটা পান খা। অমন রাঙা দুটি ঠোঁটে পান না খেলে কি মানায়?...তাছাড়া যামিনী বাবু দেখলে কত খুশী হবেন, বল্ ত?"

নির্ম্মলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল; তাহার পরে প্রতিমার দিকে চোখ তুলিয়া কহিল, "যামিনী বাবু কেন খুশী হবেন? তিনি কি আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখতে যাবেন যে, আমি টিপ পরেছি কি না-পরেছি।"

প্রতিমা অবাক হইয়া গেল। সে আশা করিয়াছিল যামিনীবাবুর নাম শুনিবামাত্র নির্ম্মলা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিবে, ভিতরে ভিতরে খুশী হইবে, কিন্তু উপরে কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিবে, 'যাও!' কিন্তু তাহার ধারণার সহিত কিছুই মিলিল না। প্রতিমা অবাক হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার একটু রাগও হইল। 'মেয়ে অনেক লেখাপড়া শিখিয়া মনে করিয়াছেন যেন পুরুষ হইয়া গিয়াছেন।' নির্ম্মলাকে উদ্দেশ করিয়া সে মনে মনে বলিল, 'ছাই অমন লেখাপড়ায়! যাহার একটু ঠাট্টা বুঝিবার ক্ষমতা নাই, হৃদয়ের রস জীবনের সহজ আনন্দ-কৌতুক সমস্তই বর্জ্জন করিয়া আগাগোড়া যে ঠিক ঐ ছাপার বইয়ের মতই ঝরঝরে হইয়া উঠিয়াছে, সে কেবল দশটা পাঁচটা কলেজই করিতে পারে, আর কিছু পারে না।'

এমন রসবোধহীন মানুষের কাছে প্রতিমা আর তাহার দুর্ল্লভ টিপের বাক্স খুলিতে কোন উৎসাহ বোধ করিল না। সেখান হইতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। নির্ম্মলা প্রতিদিনকার মত তেতলার ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে ভাবিতে লাগিল, নীট্‌শের যে বইখানা বাবা পড়িতে দিয়াছেন তাহার অনেক স্থল সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, সেই সব জায়গাগুলা বাবাকে দিয়া বুঝাইয়া লইতে হইবে। তখন একেবারে সর্ব্বনিম্নতলায় সংসারের খরচ বাঁচাইবার জন্য তাহার মা সুশীলা একরাশ কয়লার গুঁড়া একত্র করিয়া তাহাতে মাটি মিশাইয়া গুল প্রস্তুত করিতেছিলেন।

এমনি করিয়া নির্ম্মলা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হইয়া জন্মিয়াও মধ্যবিত্ত পরিবারের সমস্ত দুঃখ দৈন্য সঙ্কীর্ণতা অভাব অনটন হইতে একেবারে দূরে রহিল। তাহার রাজ্যে কেবল নীট্‌শের শক্ত অধ্যায়গুলা বুঝিতে না পারার ক্ষোভ, তাহার পৃথিবীতে কেবল রবীন্দ্রনাথের পূরবী আর মহুয়ার কবিতাগুলির সম্পূর্ণ রস হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারার অতৃপ্তি।

৬

সে বছর পূর্ব্ববঙ্গে বন্যা হইয়াছিল। বন্যা রিলীফ কমিটির সাহায্যের জন্য কলেজের মেয়েরা নিজেদের মধ্যে কিছু ছোটখাট অভিনয় ইত্যাদি করিবে স্থির করিয়াছিল। মাসাধিক কালব্যাপী উদ্যোগ আয়োজন এবং রিহার্সালের পর অবশেষে সেই বিশিষ্ট দিনটি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। স্থির হইয়াছে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী সভায় উপস্থিত থাকিবেন। অভিনয় অন্তে যাহাদের অভিনয় ভাল হইবে ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী তাহাদের নিজে হইতে কতকগুলি প্রাইজ এবং মেডেল দিবেন বলিয়াছেন।

নির্ম্মলা কলেজের মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল গান

রে। তাহার সেতারের হাতও মিষ্ট এবং নিপুণ। কয়েক াস পূর্ব্বে একজন মহিলা-অধ্যাপকের বিদায়-অভিনন্দন উপলক্ষে শেক্সপীয়রের 'মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস' হইতে সে যে আবৃত্তি করিয়াছিল, তাহার সেই আবৃত্তির নির্ভুল উচ্চারণ, লালিত্য এবং মধুরতা সকলকেই অবাক করিয়াছিল। তাই এবারেও অভিনয়ে সে অনেক ভূমিকাতেই দেখা দিবে। শেক্সপীয়রের 'ম্যাক্‌বেথ' হইতে কোন কোন অংশ এবং রবীন্দ্রনাথের দুই একটি কবিতাও সে আবৃত্তি করিবে, এইরূপ ঠিক ছিল।

চন্দ্রকান্ত মেয়ের বিষয়ে সর্ব্বদাই গল্প করেন এবং তাহার নানা বিষয়ের কৃতিত্বে কল্পনার আরও রং চড়াইয়া লোকের কাছে বলিয়া সুখ পান। তাই তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে নির্ম্মলাদের কলেজের এই সকল ব্যাপার এবং তাহাতে নির্ম্মলার প্রধান ভূমিকা লইবার কথা সমস্তই যামিনী জানিয়াছিল।

সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় অভিনয় আরম্ভ। চঞ্চলা সাজঘরে ছুটোছুটি করিতেছিল, টিকিটের ঘণ্টা পড়িয়াছে। হঠাৎ এক সময় চঞ্চলা সেখান হইতে ছুটিয়া আসিয়া নির্ম্মলার কানে কানে কহিল, 'তোর বাবার সঙ্গে আর একজন কে ফর্সা মত চসমাপরা এসেছেন রে? তোর বাবার সঙ্গে তিনিও দশ টাকার একটা টিকিট কিনলেন। কেবল তোদের বাড়ি থেকেই আমরা কুড়ি টাকা পেলুম।'

নির্ম্মলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, 'উনি যামিনীবাবু।' তাহার স্বভাব কলেজের মেয়েরা সকলেই জানিত। এই নির্দিষ্ট, সংক্ষিপ্ত উত্তরের চেয়ে আর একটুখানিও তাহার কাছে আশা করা চলে না। তথাপি চঞ্চলা একটু হাসিয়া, কানের ইয়ারিংটা একবার ঠিক করিয়া লইয়া, চোখের চসমাটা খুলিয়া আবার মুছিতে মুছিতে কহিল, 'যামিনীবাবু কে রে? মানে তোর কে হন? দাদা?'

'না।'

'তবে কে?'

এবারে চঞ্চলার চাপাহাসি অঞ্চলপ্রান্ত দিয়া হাস্যরোধ করিবার চেষ্টা মানিল না।

'কে? ঠিক জানিনে ত। বাবার বন্ধু।'

'সংসারে কোন্ জিনিষটা তুই ঠিকমত জানিস্?'

চঞ্চলা নির্ম্মলার বেণী ধরিয়া একটা টান দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। কারণ আর দাঁড়াইবার সময় নাই, অভিনয় আরম্ভ হইবার তৃতীয় ঘণ্টা পড়িয়াছে।

আলো জ্বলিল, পর্দ্দা উঠিল। নির্ম্মলা প্রথম উদ্বোধন-সঙ্গীত গাহিল। বারংবার লোকের 'এনকোরে' তাহাকে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দুই তিন বার গাহিতে হইল। দুই একটা অভিনয়ের ছোটখাট পালা শেষ হইয়া যাইবার পরে সে যখন শেক্সপীয়রের ম্যাক্‌বেথ হইতে আবৃত্তি করিতে লাগিল,

'To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death—out, out, brief candle!'

তখন তাহার সমস্ত সত্তা যেন সেই সর্ব্বকালান্তক মরণের প্রতি ম্যাক্‌বেথের এই ক্লান্ত উক্তির সহিত নিজেকে এক করিয়া মিলাইয়া লইল। শেক্সপীয়রের কাব্যের এই সকল ভীষণ মধুর অংশের অনেকখানি সৌন্দর্য্যই সাধারণের কাছে শুধু পড়ার ভিতর দিয়া ধরা দেয় না, তাহার আবৃত্তির মধ্য দিয়া সেই সকল অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য্যও যেন সকলের কাছে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা হইতে সে যখন বলিতে লাগিল,

"হে ভারতী, দেখেছি তোমাকে
সত্তার অন্তিম তটে
যেখানে কালের কোলাহল
প্রতিক্ষণে ডুবিছে অতলে
নিস্তরঙ্গ সেই সিন্ধুনীরে
তীর্থস্নান করি'
রাত্রির নিকষ কৃষ্ণ শিলাবেদী মূলে
এলোচুলে করিছ প্রণাম
পরিপূর্ণ সমাপ্তিরে।

তখন মনে হইতে লাগিল, এ শুধু তাহার আবৃত্তি করিয়া যাওয়া নয়। তাহার সমস্ত অস্তিত্বই যেন এই শুভ্র শান্ত শেষ প্রণামের সহিত নিজেকে আনত করিয়া ধরিয়াছে।

যামিনী বসিয়া মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল। সপ্তদশবর্ষীয়া তরুণীর অম্লান সুন্দর যৌবনাকাশে কুমারী-জীবনের নির্ম্মল নীলিমা এখনও দিগন্তবিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে—কোথাও এতটুকু ভাবের বাষ্প, বেদনার মেঘ আসিয়া ছায়া ফেলে নাই। চোখের দৃষ্টি সহজ। শুভ্র সুকুমার ললাটে এখনও অনাহত প্রশান্তি। তাহার সমস্ত মনখানি যেন স্বচ্ছ দর্পণের মত, জলেধোওয়া বৃষ্টিহীন শরতের আকাশের মত। সে-মনে

কোন বাসনা-বেদনা বিকার জন্মায় নাই। তাই সে যাহাই অভিনয় করিতেছে, তাহার স্পষ্ট সত্তা প্রতিরূপ নিজেকে দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেছে। অভিনয় শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী তাহাকে ডাকিয়া স্মিতহাস্যে একটুখানি আলাপ করিলেন। তঁাহারই দেওয়া একরাশি বই, সোনার মেডেল ও ফুলের ভারে নির্ম্মলা যখন বিব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার শিথিল হস্ত হইতে দুই-একটা জিনিষ স্খলিত হইয়া এদিকে-ওদিকে পড়িয়া যাইতেছিল, তখন যামিনী পিছন হইতে নিঃশব্দে আসিয়া তাহার হাত হইতে জিনিষগুলা লইয়া কহিল, "চলুন। আপনার বাবা ট্যাক্সি ঠিক ক'রে অনেক ক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছেন।"

দ্বারান্তরাল হইতে চঞ্চলা তাহার সঙ্গিনীর গা টিপিয়া কহিল, "দেখ্‌লি, আমি সেই কালেই বলেছিলুম, There is something... (এর ভিতর কিছু আছে...)।

তরলা কহিল, "কিন্তু তোরা যাই বলিস, নির্ম্মলা যতটা সর[illegible] সাজতে চায়, আসলে ও তা নয়। ওর অনেকখানি[illegible] পোজ (ঢং)।"

"নিশ্চয়।"

"তা কি আর আমরাও বুঝতে পারিনে!"

"আর তোরা যাই বলিস, নির্ম্মলার চেয়ে যূথিকা ঢে[illegible] ভাল আবৃত্তি করে।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

"যূথিকার উচ্চারণগুলো খাঁটি ইংরেজী।"

"হবে না কেন? ওদের বাড়ির পার্টিতে সাহেব-সুবো আসা প্রায়ই ত লেগে রয়েচে। তা ছাড়া যূথিকার দা[illegible] ফি ইংরেজী টকিতে (সবাক ছায়াচিত্র প্রদর্শনে) ওকে নি[illegible] যায়। একটাও বাদ দেয় না।"

ক্রমশঃ

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বাজা তোরা শাঁখ,
ধন্য হোক পঁচিশে বৈশাখ।
কোন্ সে আদিম উষা-চক্রবাল-তলে,
অনাদি শ্রীসুন্দরের আনন্দের রসপদ্মদলে,
প্রথম সে মূর্ত্তি নিল রূপে, গগনে অখণ্ড মহাকাল—
সৃষ্টির অনন্ত মহাসুরে খণ্ডে খণ্ডে বেঁধে দিল তাল।
সেই তালে বন্দী হ'ল তিথিরূপে আনন্দসুন্দর,
সে বন্ধন-গ্রন্থি হ'তে ঝরিল ঝর্ঝর,
ব্রহ্মের মানস-মধু-ধারা।
সারা সৃষ্টি চিত্তহারা
চাহিল উন্মনে,
কোন্ পুণ্যক্ষণে—

সেই মধু-ধারা
রবিরূপে হ'ল মূর্ত্তিহারা।
হেরেছিনু তারে বিষ্ণুনাভিপদ্মদলে,
জন্মজন্মান্তর বহি কোটি মূর্ত্তি ধরিল সে ছলে।
সৃজনের নব ছন্দে গানে বহি এল যুগযুগান্তর,
গ্রহ হ'তে ফিরি গ্রহান্তরে চন্দ্রে সূর্য্যে করিল সুন্দর
হেরিলাম স্বর্গলোকে তারপর তমসার তীরে,
তারোপরে অকস্মাৎ কালগর্ভচিরে,
বঙ্গে রবি হইল উদয়,
চিরন্তনী সৃষ্টির বিস্ময়।
বাজে তারি জয়শাঁখ,
পঁচিশে বৈশাখ।

নন্দলাল বসু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্পিনোজা ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁর তত্ত্ববিচারকে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে স্বতন্ত্র করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু যদি মিলিয়ে দেখা সুব হয় তবে তাঁর রচনা আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রথম য়সেই সমাজ তাঁকে নির্মমভাবে ত্যাগ করেছে কিন্তু কঠিন দুঃখেও তাকে তিনি ত্যাগ করেননি। সমস্ত জীবন সামান্য কয় পয়সায় ার দিন চলত; ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই তাঁকে মোটা অঙ্কের নশন দেবার প্রস্তাব করেছিলেন, সর্ত্ত ছিল এই যে তাঁর একটি বই াজার নামে উৎসর্গ করতে হবে। স্পিনোজা রাজি হলেন না। ার কোনো বন্ধু মৃত্যুকালে আপন সম্পত্তি তাঁকে উইল করে দেন, সম্পত্তি তিনি গ্রহণ না করে দাতার ভাইকে দিয়ে দেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, আর তিনি যে মানুষ ছিলেন এ দুটোকে এক ঠায় মিলিয়ে দেখলে তাঁর সত্য সাধনার যথার্থ স্বরূপটি পাওয়া য়, বোঝা যায় কেবলমাত্র তার্কিক বুদ্ধি থেকে তার উদ্ভব নয়. তাঁর পূর্ণ স্বভাব থেকে তার উপলব্ধি ও প্রকাশ।

শিল্পকলায় রসসাহিত্যে মানুষের স্বভাবের সঙ্গে মানুষের রচনার ম্বন্ধ বোধ করি আরো ঘনিষ্ঠ। সব সময়ে তাদের একত্র করে খবার সুযোগ পাইনে। যদি পাওয়া যায় তবে তাদের কর্ম্মের কৃত্রিম সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হোতে পারে। স্বভাব-বিকে স্বভাবশিল্পীকে কেবল যে আমরা দেখি তাদের লেখায়, তাদের তের কাজে তা নয়, দেখা যায় তাদের ব্যবহারে তাদের দিনযাত্রায়, দের জীবনের প্রাত্যহিক ভাষায় ও ভঙ্গীতে।

চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুর নাম আমাদের দেশের অনেকেরই জানা াছে। নিঃসন্দেহ আপন আপন রুচি মেজাজ শিক্ষা ও প্রথাগত ভ্যাস অনুসারে তাঁর ছবির বিচার অনেকে অনেক রকম করে কেন। এরকম ক্ষেত্রে মতের ঐক্য কথনো সত্য হোতে পারে না, ত প্রতিকূলতাই অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠতার প্রমাণরূপে দাঁড়ায়। কিন্তু কটে থেকে নানা অবস্থায় মানুষটিকে ভাল করে জানবার সুযোগ ামি পেয়েছি। এই সুযোগে যে-মানুষটি ছবি আঁকেন তাঁকে পূর্ণ শ্রদ্ধা করেছি বলেই তাঁর ছবিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে রেছি। এই শ্রদ্ধায় যে দৃষ্টিকে শক্তি দেয় সেই দৃষ্টি প্রত্যক্ষের ীরে প্রবেশ করে।

নন্দলালকে সঙ্গে করে নিয়ে একদিন চীনে জাপানে ভ্রমণ করতে য়েছিলুম। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার ইংরেজ বন্ধু এল্‌ম্‌হর্স্ট্‌। নি বলেছিলেন, নন্দলালের সঙ্গ একটা এডুকেশন। তাঁর সেই থাটি একেবারেই যথার্থ। নন্দলালের শিল্পদৃষ্টি অত্যন্ত খাঁটি, তাঁর চার-শক্তি অন্তর্দর্শী। একদল লোক আছে আর্ট্‌কে যারা কৃত্রিম ীতে সীমাবদ্ধ করে দেখতে না পারলে দিশেহারা হয়ে যায়। রকম করে দেখা খোঁড়া মানুষের লাঠি ধরে চলার মত, কটা বাঁধা বাহ্য আদর্শের উপর ভর দিয়ে নজির মিলিয়ে বিচার রা। এই রকমের যাচাই-প্রণালী মুাজিয়ম সাজানোর কাজে লাগে। যে জিনিষ মরে গেছে তার সীমা পাওয়া যায়, তার সমস্ত পরিচয়কে নিঃশেষে সংগ্রহ করা সহজ, তাই বিশেষ ছাপ মেরে তাকে কোঠায় বিভক্ত করা চলে। কিন্তু যে আর্ট্‌ অতীত ইতিহাসের স্মৃতিভাণ্ডারের নিশ্চল পদার্থ নয়, সজীব বর্ত্তমানের সঙ্গে যার নাড়ীর সম্বন্ধ, তার প্রবণতা ভবিষ্যতের দিকে; সে চলছে, সে এগোচ্চে, তার সম্ভূতির শেষ হয়নি, তার সত্তার পাকা দলিলে অন্তিম স্বাক্ষর পড়ে নি। আর্টের রাজ্যে যারা সনাতনীর দল তারা মৃতের লক্ষণ মিলিয়ে জীবিতের জন্যে শ্রেণীবিভাগের বাতায়ন-হীন কবর তৈরি করে। নন্দলাল সে জাতের লোক নন, আর্ট তাঁর পক্ষে সজীব পদার্থ। তাকে তিনি স্পর্শ দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে দরদ দিয়ে জানেন, সেই জন্যই তাঁর সঙ্গ এডুকেশন। যারা ছাত্ররূপে তাঁর কাছে আসবার সুযোগ পেয়েছে তাদের আমি ভাগ্যবান বলে মনে করি,—তাঁর এমন কোনো ছাত্র নেই এ কথা যে না অনুভব করেছে এবং স্বীকার না করে। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর নিজের গুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণা আপন স্বভাব থেকেই পেয়েছেন সহজে। ছাত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বাহিরের কোনো সনাতন ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা তিনি কথনোই করেন না; সেই শক্তিকে তার নিজের পথে তিনি মুক্তি দিতে চান এবং তাতে তিনি কৃতকার্য্য হন যে হেতু তাঁর নিজের মধ্যেই সেই মুক্তি আছে।

কিছুদিন হোলো, বোম্বায়ে নন্দলাল তাঁর বর্ত্তমান ছাত্রদের একটি প্রদর্শনী খুলেছিলেন। সকলেই জানেন, সেখানে একটি স্কুল অফ আর্টস্ আছে, এবং একথাও বোধ হয় অনেকের জানা আছে সেই স্কুলের অনুবর্ত্তীরা আমাদের এদিককার ছবির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ কোরে লেখালেখি কোরে আসছেন। তাঁদের নালিশ এই যে, আমাদের শিল্পসৃষ্টিতে আমরা একটা পুরাতন চালের ভঙ্গিমা সৃষ্টি করেছি, সে কেবল সস্তায় চোখ ভোলাবার ফন্দী, বাস্তব সংসারের প্রাণ-বৈচিত্র্য তার মধ্যে নেই। আমরা কাগজেপত্রে কোনো প্রতিবাদ করিনি,—ছবিগুলি দেখানো হোলো। এতদিন যা ব'লে তাঁরা বিদ্রূপ কোরে এসেছেন, প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রমাণ। দেখলেন বিচিত্র ছবি, তাতে বিচিত্র চিত্তের প্রকাশ, বিচিত্র হাতের ছাঁদে, তাতে না আছে সাবেক কালের নকল না আছে আধুনিকের; তা ছাড়া কোনো ছবিতেই চল্‌তি বাজারদরের প্রতি লক্ষ্য মাত্র নেই।

যে নদীতে স্রোত অল্প সে জড়ো ক'রে তোলে শৈবালদামের ব্যূহ, তার সামনের পথ যায় রুদ্ধ হয়ে। তেমন শিল্পী সাহিত্যিক অনেক আছে যারা আপন অভ্যাস এবং মুদ্রাভঙ্গীর দ্বারা আপন অচল সীমা রচনা ক'রে তোলে। তাদের কর্ম্মে প্রশংসাযোগ্য গুণ থাকতে পারে কিন্তু সে আর বাঁক ফেরে না, এগোতে চায় না, ক্রমাগত আপনারি নকল আপনি করতে থাকে, নিজেরই কৃতকর্ম্ম থেকে তার নিরন্তর নিজের চুরি চলে।

আপন প্রতিভার যাত্রাপথে অভ্যাসের জড়ত্ব দ্বারা এই সীমা বন্ধন নন্দলাল কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না আমি তা জানি। আপনার মধ্যে তাঁর এই বিদ্রোহ কতদিন দেখে আসছি। সর্ব্বত্রই এই বিদ্রোহ

সৃষ্টিশক্তির অন্তর্গত। যথার্থ সৃষ্টি বাঁধা রাস্তায় চলে না, প্রলয় শক্তি কেবলি তার পথ তৈরি করতে থাকে। সৃষ্টিকার্যে জীবনীশক্তির এই অস্থিরতা নন্দলালের প্রকৃতিসিদ্ধ। কোনো একটা আড্ডায় পৌঁছে আর চলবেন না, কেবল কেদারায় বসে পা দোলাবেন, তাঁর ভাগ্যলিপিতে তা লেখে না। যদি তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভবপর হোতো তাহোলে বাজারে তাঁর পসার জমে উঠত। যারা বাঁধা খরিদদার তাদের বিচারবুদ্ধি অচল শক্তিতে খুঁটিতে বাঁধা। তাদের দর-যাচাই প্রণালী অভ্যস্ত আদর্শ মিলিয়ে। সেই আদর্শের বাইরে নিজের রুচিকে ছাড়া দিতে তারা ভয় পায়, তাদের ভাল লাগার পরিমাণ জনশ্রুতির পরিমাণের অনুসারী। আর্টিস্টের কাজ সম্বন্ধে জনসাধারণের ভালো লাগার অভ্যাস জমে উঠতে সময় লাগে। একবার জমে উঠলে সেই ধারার অনুবর্ত্তন করলে আর্টিস্টের আপদ থাকে না। কিন্তু যে আত্মবিদ্রোহী শিল্পী আপন তুলির অভ্যাসকে ক্ষণে ক্ষণে ভাঙতে থাকে আর যাই হোক্, হাটে বাজারে তাকে বারে বারে ঠকতে হবে। তা হোক্ বাজারে ঠকা ভালো, নিজেকে ঠকানো তো ভালো নয়। আমি নিশ্চিত জানি নন্দলাল সেই নিজেকে ঠকাতে অবজ্ঞা করেন, তাতে তাঁর লোকসান যদি হয় তো হোক্। অমুক বই বা অমুক ছবি পর্য্যন্ত লেখক বা শিল্পীর উৎকর্ষের সীমা—বাজারে এমন জনরব মাঝে মাঝে ওঠে, অনেক সময়ে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, লোকের অভ্যস্ত বরাদ্দে বিঘ্ন ঘটেছে। সাধারণের অভ্যাসের বাঁধা জোগানদার হবার লোভ সামলাতে না পারলে সেই লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আর যাই হোক সেই পাপলোভের আশঙ্কা নন্দলালের একেবারেই নেই। তাঁর লেখনী নিজের অতীত কালকে ছাড়িয়ে চলবার যাত্রিণী। বিশ্বসৃষ্টির যাত্রাপথ তো সেই দিকেই, তার অভিসার অন্তহীনের আহ্বানে।

আর্টিস্টের স্বকীয় আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তার চরিত্রে তার জীবনে। আমরা বারম্বার তার প্রমাণ পেয়ে থাকি নন্দলালের স্বভাবে। প্রথম দেখতে পাই আর্টের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ নির্লোভ নিষ্ঠা। বিষয়বুদ্ধির দিকে যদি তাঁর আকাঙ্ক্ষার দৌড় থাকত, তা হোলে সেই পথে অবস্থার উন্নতি হবার সুযোগ তাঁর যথেষ্ট ছিল। প্রতিভার সাচ্চাদাম-যাচাইয়ের পরীক্ষক ইন্দ্রদেব শিল্প সাধকদের তপস্যার সম্মুখে রজত নূপুরনিক্কণের মোহজাল বিস্তার করে থাকেন, সরস্বতীর প্রসাদস্পর্শ সেই লোভ থেকে রক্ষা করে, দেবী অর্থের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে সার্থকতার মুক্তিবর দেন। সেই মুক্তিলোকে বিরাজ করেন নন্দলাল, তাঁর ভয় নেই।

তাঁর স্বাভাবিক আভিজাত্যের আর একটি লক্ষণ দেখা যায় সে তাঁর অবিচলিত ধৈর্য্য। বন্ধুর মুখের অন্যায় নিন্দাতেও তাঁর প্রসন্নতা ক্ষুণ্ণ হয় নি তার দৃষ্টান্ত দেখেছি। যারা তাঁকে জানে এমনতরো ঘটনায় তারাই দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু তিনি অতি সহজেই ক্ষমা করতে পেরেছেন। এতে তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য্য সপ্রমাণ করে। তাঁর মন গরীব নয়। তাঁর সমব্যবসায়ীর কারো প্রতি ঈর্ষার আভাস মাত্র তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পায় নি। যাকে যার দেয় সেটি চুকিয়ে দিতে গেলে নিজের যশে কম পড়বার আশঙ্কা কোনোদিন তাঁকে ছোটো হোতে দেয় নি। নিজের সম্বন্ধে ও পরের সম্বন্ধে তিনি সত্য; নিজেকে ঠকান না ও পরকে বঞ্চিত করেন না। এর থেকে দেখতে পেয়েছি নিজের রচনায় যেমন, নিজের স্বভাবেও তিনি তেমনি শিল্পী, ক্ষুদ্রতার ত্রুটি স্বভাবতই কোথাও রাখতে চান না।

শিল্পী ও মানুষকে একত্র জড়িত ক'রে আমি নন্দলালকে নিকটে দেখেছি। বুদ্ধি, হৃদয়, নৈপুণ্য অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির এ রকম সমাবেশ অল্পই দেখা যায়। তাঁর ছাত্র, যারা তাঁর কাছে শিক্ষা পাচ্ছে, তারা একথা অনুভব করে এবং তাঁর বন্ধু যারা তাঁকে প্রত্যহ সংসারের ছোটো বড়ো নানা ব্যাপারে দেখতে পায় তারা তাঁর ঔদার্যে ও চিত্তের গভীরতায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। নিজের ও তাঁদের হয়ে এই কথাটি জানাবার আকাঙ্ক্ষা আমার এই লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। এ রকম প্রশংসার তিনি কোনো অপেক্ষা করেন না, কিন্তু আমার নিজের মনে এর প্রেরণা অনুভব করি।

বিচিত্রা—চৈত্র ১৩৪০

কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল

"বাঙ্গালা রামায়ণের আদি কবি কৃত্তিবাস কবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন" তাহা লইয়া পণ্ডিত সমাজে যে "বাদানুবাদ" চলিতেছিল, বোধ হয় এই বার তাহা শেষ হইল। "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলিতেছেন যে, বাঁকুড়া ও হুগলী জিলার সীমানায় বদনগঞ্জে কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি পুঁথি পাওয়া যায়—ইহা ১৪২৩ শকাব্দের (১৫০১ খৃষ্টাব্দের) নকল এবং ইহাতে কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণ আছে।

"এই আত্ম-বিবরণ দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হইয়া সাধারণো পরিচিত হয়।

এই আত্ম-বিবরণেই আছে—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

ইহা অবলম্বন করিয়া রায় মহাশয় গণনা আরম্ভ করেন। ১৩২০ সনের পরিষৎ পত্রিকায় তিনি যে গণনার ফল প্রকাশিত করেন তাহাতে দেখা যায়, ১২৫৯ শকে ৩০শে মাঘ রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথি হইয়াছিল এবং ১৩৫৪ শকে ২৯ দিনে মাঘ মাস পূর্ণ হইয়াছিল এবং ঐদিনও রবিবার শ্রীপঞ্চমী ছিল। নানা প্রমাণে তখনকার মত ১৩৫৪ শকই (১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দ) কৃত্তিবাসের জন্ম শক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

কিন্তু এই নির্দ্ধারণে সমস্ত সন্দেহ মিটিল না। প্রধান আপত্তি আত্ম-বিবরণ পড়িয়া পরিষ্কার বুঝা যায়, যে গৌড়েশ্বরের সভায় বিদ্যা সমাপনান্তে কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই হিন্দু রাজসভা। উহাতে একটিও মুসলমান কর্ম্মচারীর বা মুসলমান আচার ব্যবহারের উল্লেখ নাই। বাঙ্গলায় একমাত্র হিন্দু গৌড়েশ্বর রাজা গণেশ ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকে সমগ্র বাঙ্গলায় প্রবল ছিলেন। কাজেই রাজা গণেশের সভায় ২০ হইতে ৩০ বছর বয়সে কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়া থাকিলে তাঁহার জন্ম শক ১৩০৯।১০ হইতে ১৩১৯।২০ শক হওয়া আবশ্যক।

আর এক আপত্তি 'পূর্ণ' শব্দটিতে। প্রাচীন পুঁথি যাঁহারা ঘাঁটিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন, কোন কোন মাসকে 'পুণ্য' বিশেষণে বিশেষিত করা প্রাচীন সাহিত্যের প্রথা ছিল এবং 'পুণ্য' প্রাচীন পুঁথিতে সর্ব্বদা 'পুন্ন' রূপে লিখিত হয়। কাজেই গণনায় সম্বল মাত্র আদিত্যবার এবং শ্রীপঞ্চমী।

আমার এই সকল আপত্তি রায় মহাশয়কে জানাইলে তিনি আবার গণিতে বসিলেন। এইবার তিনি গণিয়া বাহির করিয়াছেন

১৩২০ শকে রবিবার দিন শ্রীপঞ্চমী ও সরস্বতী পূজা হইয়াছিল। এই শকেই কৃত্তিবাসর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কাজেই, যখন কৃত্তিবাস ১৯।২০ বছরের নবযুবক, তখন তিনি বড় গঙ্গা অর্থাৎ মূল গঙ্গার (ভাগীরথীর নহে) তীরস্থ রাঢ় দেশীয় গুরুগৃহে বিদ্যা সমাপন করিয়া রাজপণ্ডিত হইবার আশায় গৌড়েশ্বরকে ভেটিতে চলিয়াছিলেন। রাজা গণেশ ১৩৩৯।৪০ শকে (১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে) এই প্রতিভাশালী ফুলিয়ার মুখটিকে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করিলেন।"

—

মান্দ্রাজীরা কি বই পড়ে?

"মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী নভেল, নাটকই বেশীর ভাগ পড়ে" এবং অনেকে মনে করেন যে "পাঠকগণ আপিসে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর কেবলমাত্র সময় কাটাইবার ও চিত্তবিনোদনের জন্য পড়েন, কোনও গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা তাঁহাদের পক্ষে বিরক্তিকর" অথবা "বাটীর স্ত্রীলোকদের পাঠের সুবিধার জন্য অনেকে বাধ্য হইয়া নাটক, নভেল লাইব্রেরী হইতে লইয়া যান"। "ক্লাইভ ষ্ট্রীট" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হরিধন গঙ্গোপাধ্যায় মান্দ্রাজের মান্নারগুড়ি চলন্ত লাইব্রেরীর বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

মান্নারগুড়ি হইতে ১২ মাইলের মধ্যে যে যে গ্রাম আছে, সেই গ্রামে যদি অন্ততঃপক্ষে ১৬ জন পাঠক একত্র হইয়া একটি "গ্রাম্য কেন্দ্র" স্থাপন করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে তিন জন পুস্তক বিলি, ফেরৎ লওয়া ও যত্ন লওয়ার ভার এবং হারাইয়া গেলে ক্ষতিপূরণের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই গ্রামে গরুর গাড়ীতে করিয়া চলন্ত লাইব্রেরী উপস্থিত হইবে। গ্রাম্য কেন্দ্রের সভ্যরা যে যে বই পড়িতে ইচ্ছা করেন সেই সেই বই লইতে পারেন। কাহাকেও কোন প্রকার চাঁদা দিতে হইবে না, প্রত্যেকেই গ্রাম্য কেন্দ্রে বিলি করা সকল পুস্তকই পাঠ করিতে পারেন। এক মাসের মধ্যে পাঠ সমাধা করিতে হইবে, এবং এক মাস বাদে চলন্ত লাইব্রেরী উপস্থিত হইলে সেই সেই বইগুলি ফেরত দিতে হইবে।

চলন্ত লাইব্রেরীতে পুস্তকসংখ্যা ৩,৭৮২। এক বৎসরে যে যে সংখ্যক পুস্তক বিলি হইয়াছিল তাহার শ্রেণী বিভাগ সহ নিম্নে দেওয়া হইল।

ধর্ম্ম	২৪৩	চিকিৎসা	৪০
জীবনী	২৩৫	রাজনীতি	৩৭
স্কুল পাঠ্য	১৪৮	স্বাস্থ্য	১৩১
ইতিহাস	৯২	সাময়িক পত্রিকা	১৭৩
কৃষি	৪৯	ভূগোল	৫৮
সাহিত্য	৫৩	শাসন-সংস্কার	২৪
রামায়ণ ও মহাভারত			৩২
নভেল			১২৪
গল্প			১১২
উপদেশাবলী			৯১
প্রকৃতি পাঠ			২১
ইসলাম			২৭

উপরি উদ্ধৃত অঙ্কগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মান্দ্রাজী গ্রাম্য পাঠকগণের মধ্যে নভেল বা গল্প পড়িবার আগ্রহ থাকিলেও বাঙ্গালা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পাঠকগণের নাটক নভেল পড়িবার আগ্রহের ন্যায় উৎকট নহে। তাঁহারা ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক, রামায়ণ, মহাভারত যথেষ্ট পাঠ করেন। আজকাল যে বাঙ্গালীরা ক্রমাগত পিছাইয়া যাইতেছেন মনে হয় অধীত পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহাদের এইরূপ রুচি তাহার অন্যতম কারণ। সেকালের বাঙ্গালীরা আমাদের ন্যায় এত অধিক বাজে বই পড়িতেন না।

আর্থিক দুর্গতি মোচন

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ভারত-সরকার ও বাংলা-সরকার এদেশে আর্থিক দুর্গতি মোচনের উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইহা আশার কথা, সন্দেহ নাই। বিলাত হইতে দুইজন বিশেষজ্ঞ আনাইয়া ভারত-সরকার যে অনুসন্ধান আরম্ভ করাইয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি, সে-সম্বন্ধে ভারত-সরকারের কথা সে-দিন ব্যবস্থা-পরিষদে ব্যক্ত হইয়াছে:—

(১) উৎপন্ন দ্রব্যাদির হিসাব সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহের জন্য সরকারের একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা;

(২) উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা সম্ভব কি-না, সে-বিষয়ে মত প্রকাশ;

(৩) জাতির আয় ও সম্পদ নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে যে-সব উপকরণ পাওয়া যায়, সে-সকলের আলোচনা;

(৪) দ্রব্যের মূল্য, উৎপন্নদ্রব্য, পারিশ্রমিক প্রভৃতির হিসাবের পত্তন।

সুখের বিষয় বাংলা-সরকার পুনর্গঠনের কার্য্যে যে কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার কাজ এইরূপ নহে।

তাঁহার কাজের প্রত্যক্ষ ফল পাইবার আশা করা যায়। এ-বিষয়ে সম্প্রতি বাংলা-সরকার যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে :—

বর্ত্তমান অর্থনীতিক অবস্থায় পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা যে দশায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে সরকার শঙ্কিত হইয়াছেন এবং সেই জন্য পল্লীগ্রামের অর্থনীতিক অবস্থার পুনর্গঠনভার একজন কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে "ডেভেলপমেণ্ট কমিশনার" নাম দিয়া একজন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি যে-সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা নানা অংশে বিভক্ত এবং সেইজন্য নানা বিভাগের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে যে-যে কাজ আছে, সে সকল কোনরূপে বিচলিত করা হইবে না। কমিশনার যে কাজ করিবেন, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সহিত একযোগে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্য যাহাতে সম্মিলিত ভাবে করা যায়, সেজন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিবেন।

এই ব্যবস্থার সুবিধা যে সুপ্রকাশ, তাহা বলাই বাহুল্য। সাধারণ হিসাবে পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, সেচ প্রভৃতি বিবিধ বিভাগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়; শিক্ষা ও স্বাস্থ্য যদি বর্ত্তমানে বাদ দেওয়া যায়, তবে যে অভিপ্রেত ফললাভে বিলম্ব ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, কৃষিশিল্পও বহু পরিমাণে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। আবার সেচের দ্বারা যেমন কৃষির উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তেমনই স্বাস্থ্যেরও উন্নতি সাধিত হয়। বাংলায় ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপের উল্লেখ করিয়া বাংলার গতপূর্ব্ব আদমসুমারের বিবরণে লিখিত হইয়াছিল :—

"বৎসরের পর বৎসর জ্বর লোকনাশ করিতেছে। প্লেগ যদি সহস্র লোককে সংহার করে, তবে জ্বর দশ সহস্র লোকের মৃত্যুর কারণ। জ্বর যে কেবল মৃত্যুর দ্বারাই লোকসংখ্যা হ্রাস করে, তাহা নহে; পরন্তু যাহারা জীবিত থাকে তাহাদিগের জীবনীশক্তি ক্ষুণ্ণ করে, উদ্যম ও প্রজননশক্তির ক্ষতি করে, লোকের সাধারণ জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে বাধা জন্মায় এবং ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির গতি প্রহত করে। বাংলার দারিদ্র্য ও অন্য বহুরূপ দুর্দ্দশার ইহাই অন্যতম প্রধান কারণ বাঙ্গালীর উদ্যমহীনতার জন্যও ম্যালেরিয়া প্রধানতঃ দায়ী।"

ডাক্তার বেণ্টলী সেচের ব্যবস্থা করিয়া ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় করিতে বলিয়াছেন। সেজন্য বাংলার নদীনালা প্রভৃতির সংস্কার করিতে হইবে।

আবার পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশার জন্য গ্রামে শিক্ষিত লোকের অভাবও অল্প দায়ী নহে। দেশের শিক্ষিত লোকরাই অন্য লোককে আদর্শ ও উপদেশের দ্বারা উন্নতির পথ দেখাইয়া দিবেন।

এইরূপে নানা কারণের সমন্বয়ে যে সমস্যার উদ্ভব তাহার সমাধান সহজসাধ্য নহে। সহজসাধ্য নহে বলিয়াই এই কার্যে সকলের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। এ কার্য্যের শেষ যাহাই কেন হউক না—ইহার আরম্ভ স্থির করাই দুষ্কর। যে দুর্দ্দশা বাংলার জলবায়ুতে দ্রুতবর্দ্ধনশীল বটবৃক্ষের মত সমাজসৌধে তাহার সহস্র মূল প্রসারিত করিয়া তাহাকে আয়ত্তাধীন করিয়াছে, তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করা যেমন দুষ্কর, সে কার্য্য অসাবধান ভাবে করিলে তাহাতে সমাজসৌধের সর্ব্বনাশ সাধনের সম্ভাবনাও তেমনই প্রবল। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। ইহাকে অবহেলা করা যায় না; অবজ্ঞা করা অসম্ভব। কাজেই আরম্ভ করিতেই হইবে। সেই আরম্ভ হইতেছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি।

বাধা আছে, কিন্তু উদ্যোগ ত্যাগ করিলে চলিবে না। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব। বাংলার অনেক জলপথ ও প্রায় সব জলাশয় কচুরীপানায় পূর্ণ হইয়াছে—ইহাতে বাংলার লোকের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে; কোন কোন জলপথে নৌকাচলাচল বন্ধ হইয়াছে—কোন কোন নদীতে বা নালায় বর্ষার জল পতিত হইলে জল যখন কূল ছাপাইয়া যায়, তখন জলের সঙ্গে সঙ্গে পানাও ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, ফলে ধান নষ্ট হয়। কয় বৎসর ধরিয়া পানা দূর করিবার কথা আলোচিত হইতেছে—ফল কিছুই হইতেছে না। পানা দূর করিবার উপায় উদ্ভাবন জন্য প্রথম যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—যাহারা পানার দৌরাত্ম্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহাদিগের দ্বারা পানা দূর করানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। গ্রামের লোককে পারিশ্রমিক দিয়া যদি নালা, খাল, পুষ্করিণী পরিষ্কার করান যায়, তবে

তাহারা পারিশ্রমিক লাভ করে—পানাও যায়; এরোপ্লেন হইতে ঔষধ দিয়া পানা দূর করিবার কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা যাইবে না। কেহ কেহ বলেন, পানা পরিষ্কার করিলে আবার হইবে; সুতরাং পরিষ্কার করিয়া লাভ কি? ইহা অলসের উক্তি। উড়িষ্যায় দেখা গিয়াছে, যে-সব পুষ্করিণী হইতে পানা তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, সেগুলি পরিষ্কারই আছে। কোন দেশই এরূপ বিপদে নিশ্চেষ্ট থাকে না। অষ্ট্রেলিয়ার গবেষণা-সমিতির গত বৎসরের যে কার্য্যবিবরণ তথায় পার্লামেণ্টে পেশ হইয়াছে, আমরা তাহার এক খণ্ড পাইয়াছি। তাহাতে দেখিতে পাই, ঐ দেশে যে-সব উদ্ভিদ্ অনিষ্টকর ও বাড়িয়া যাইতেছে, সে-সকল নষ্ট করিবার জন্য নানা উপায় পরীক্ষা করা হইতেছে—এমন কি যে-সব কীট-পতঙ্গ এই সব উদ্ভিদ নষ্ট করে বিদেশ হইতে তাহা আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। উহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"Consignments of seven species of insects attacking St. John's wort have been received from abroad, and a number of some of them have already been liberated in the districts where the weed is a pest...In 1933, liberations were made in Queensland of a seedfly which attacks Noogoora burr."

এদেশে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যে সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা করিলে সুফল ফলিতে পারে; কারণ, এদেশে শ্রমিকের পারিশ্রমিক অল্প। এইরূপ কার্য্য যে পল্লীগ্রামের পুনর্গঠনকার্য্যে সহায় হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

সরকার যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে:—

কমিশনারকে যে-সব সমস্যার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে, সে-সকলের সংখ্যা অল্প নহে। পল্লীগ্রামের অর্থনীতিক উন্নতি সাধন সম্বন্ধে নানা প্রস্তাবও বিচার করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগের ঋণের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যাহাতে কৃষকের ঋণভার লঘু হয় এবং কৃষিকার্য্যের জন্য সে আবশ্যক অর্থ পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে তাঁহাকে নানা প্রস্তাব বিচার করিতে হইবে। সে-সব প্রস্তাবের মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা গেল—

(১) স্বেচ্ছায় অর্থাৎ আইনের সাহায্য না লইয়া ঋণ মিটাইয়া লওয়া।

(২) বর্ত্তমানে যে-ঋণ পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহা মিটাইয়া লইতে বাধ্য করা অর্থাৎ সে-বিষয়ে আইন করা।

(৩) যাহাতে পল্লীগ্রামে লোক সহজে দেউলিয়া হইতে পারে, আইনে তাহার ব্যবস্থা করা।

(৪) কৃষক যাহাতে অমিতব্যয়ী হইয়া পুনরায় ঋণগ্রস্ত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা।

(৫) জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা।

(৬) কৃষকের যে টাকা প্রয়োজন হয় তাহার অধিকাংশ দিবার জন্য ঋণদান প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা।

বলা বাহুল্য, এই সব ব্যবস্থা বিচারকালে বাংলার সমবায় অনুষ্ঠানের অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে।

কৃষককে মহাজনের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া তাহার আবশ্যক অর্থ পাইবার সুবিধা করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেগুলির ফল যে আশানুরূপ হয় নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অল্পদিন পূর্ব্বে এদেশে সমবায় সমিতিসমূহের প্রতিনিধিদিগের যে সম্মিলন হইয়াছিল তাহাতে দেখা গিয়াছে, জার্ম্মান যুদ্ধের সময় হইতে সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের যে অবনতি আরম্ভ হইয়াছে তাহা নিবারণ করা যায় নাই। ইহার কারণ কি? কারণ যাহাই কেন হউক না, এই অবনতির নিদান নির্ণয় করিতে হইবে। বিশেষ নূতন যে-সব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সে-সকল সমবায় নীতিতে গঠিত করাই প্রয়োজন হইবে।

জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এ-বিষয়ে যে তৎপরতা দেখা গিয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। প্রথমে পাঁচটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে। ময়মনসিংহে প্রথমটির উদ্বোধনকার্য্য সম্পন্ন করিবার সময় মন্ত্রী তাহার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। এবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা-সরকারের যে বজেট পেশ হইয়াছে তাহাতে এই বাবদে ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। ইহা কেবল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী প্রভৃতির বেতনের জন্য। মন্ত্রীর উক্তিতে প্রকাশ—

"ডিবেঞ্চার" ঋণ করিয়া এই-সব ব্যাঙ্কের মূলধন সংগৃহীত হইবে এবং যত দিনের জন্য ঋণ গৃহীত হইবে, ততদিনের জ

সরকার ঐ টাকার সুদের জন্য জামিন থাকিবেন। বর্ত্তমানে ঋণদান সমবায় সমিতিগুলি যেভাবে সভ্যদিগকে ঋণ দিয়া থাকে, তাহাতে কৃষকের কৃষিকার্য্যের জন্য প্রয়োজন টাকা পাওয়া গেলেও তাহার অন্য ঋণ শোধের উপায় হয় না—এমন কি জমির উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয় না। সেজন্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালে পরিশোধ করা যায়, এমন ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই-সব ব্যাঙ্কে তাহাই হইবে। মন্ত্রী বলিয়াছেন—এইরূপে দীর্ঘকাল মেয়াদে যে-সব ঋণ প্রদান করা হইবে, কিছু দিন তাহা পূর্ব্ব ঋণ ও জমি বন্ধক দিয়া গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিতেই প্রযুক্ত হইবে। জমির ও চাষের উন্নতিসাধন, জমিক্রয় প্রভৃতি ব্যবস্থা-বিষয় পরে বিবেচিত হইবে। এইরূপ ব্যাঙ্ক পরিচালিত করিয়া অন্যান্য দেশে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে তাহার সম্যক সদ্ব্যবহার করা যে প্রয়োজন হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যদি আইনের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই মহাজনের সহিত খাতকের ব্যবস্থায় ঋণ মিটাইবার উপায় হয়, তবে তাহাই যে অভিপ্রেত তাহাতে দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু সেরূপ কাজের জন্য কোন কর্ম্মচারীর বা কোন সমিতির মধ্যস্থতা অবশ্যই প্রয়োজন হইবে।

এ-বিষয়ে যত শীঘ্র কাজ আরম্ভ হয়, ততই ভাল; কারণ বর্ত্তমান ব্যবসা-মন্দার সময় মহাজন স্বভাবতই প্রাপ্য টাকা কতকটা বাদ দিয়াও লইতে আগ্রহশীল। কিন্তু আইন করিবার প্রয়োজন যে অতিক্রম করা যাইবে, এমন মনে হয় না। বরং আইন থাকিলে মহাজনের মিটাইয়া লইবার আগ্রহ হইবে।

ঋণভার লঘু হইলে কৃষক যাহাতে আবার অমিতব্যয়ী হইয়া ঋণ না করে, সে ব্যবস্থার ভিত্তি—শিক্ষা। কিভাবে তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে—কিরূপে সেজন্য প্রচারকার্য্য পরিচালিত করিতে হইবে, তাহা বিবেচনার বিষয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিতে পারি। অল্পদিন পূর্ব্বে বাংলা-সরকার লোককে স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে একখানি মোটরযান সজ্জিত করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহাতে ছবি দেখাইবার ব্যবস্থাও আছে। পঞ্জাব প্রদেশে এখন বেতারের সাহায্যে লোককে শিক্ষা ও উপদেশ দিবার প্রস্তাব বিবেচিত হইতেছে। বাংলায় এখন সেরূপ ব্যবস্থা হয়ত সম্ভব হইবে না। কিন্তু গ্রামে গ্রামে যদি চলচ্চিত্র সহযোগে বা এইরূপ যানের সাহায্যে প্রচারকার্য্য পরিচালিত হয়, তবে তাহাতে সহজে সুফল ফলিতে পারে।

ইহাতে নানা বিভাগের কাজ হইতে পারে। বাংলার শিল্পবিভাগ ইতোমধ্যেই মফস্বলে শহরে শিক্ষকদল পাঠাইয়া কতকগুলি শিল্পের উন্নত পদ্ধতি শিখাইতেছেন। যাহাতে লোক সে-সকলের সংবাদ পায় ও সে-সকলের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহা এইরূপ যানের দ্বারা করা যায়। প্রধানতঃ বাংলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে এই-সব শিল্পশিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কার্য্য-ক্ষেত্র প্রসারিত করা সহজসাধ্য। প্রথমে যাঁহারা সন্দেহ করিয়াছিলেন, ভদ্র সম্প্রদায়ের যুবকরা কায়িক শ্রমবিমুখ বলিয়া শিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে চাহিবে না তাঁহাদিগের সে সন্দেহের আর অবকাশ নাই। এখন দেখা যাইতেছে, যুবকরা যেমন "হাতে হাতিয়ারে" কাজ করিতে আগ্রহশীল, তাহাদিগের অভিভাবকরাও তেমনি তাহাদিগকে এ-বিষয়ে উৎসাহ দিতে প্রস্তুত; দেখা যাইতেছে, যুবকরা শিক্ষালাভ করিলে অভিভাবকরা তাহাদিগকে কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আবশ্যক মূলধন প্রদান করিতেছেন। ইহার মধ্যেই শিক্ষালাভ করিয়া যুবকরা নানা স্থানে আপনারা কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ও করিতেছে এবং যে-সব কারখানা আছে অনেকে সেইগুলিতে চাকরি পাইতেছে।

যাহারা এইরূপে শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহারা যাহাতে সরকারের কাছে ঋণহিসাবে অর্থসাহায্য পাইতে পারে, সেজন্য আইন হইয়াছে। কিন্তু আইন বিধিবদ্ধ হইলেও অর্থাভাবে সাহায্যদান সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, এঞ্জিনিয়ার ও বাহিরের কয় জন ভদ্রলোক টাকা দিয়া একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহার পর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা স্থির করিয়া দিয়াছেন, এই কার্য্যের জন্য সরকার জামিন হইয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক হইতে দিতে পারিবেন। ঋণ হিসাবে আরও টাকা দিবার ব্যবস্থাও এবার হইতেছে। কাজেই আশা করা যায়, এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠার কার্য্য অগ্রসর হইবে। পল্লীগ্রামেও এই-সব শিল্প অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে

বং তাহাতে পল্লীগ্রামের পুনর্গঠনকার্য্য সহজে সম্পন্ন হবে—অন্ততঃ সে-কার্য্যে সাহায্য হইবে।

সরকারী বিবৃতির শেষাংশে লিখিত হইয়াছে :—

কমিশনারকে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা রিতে হইবে। বাংলার যে-সব অঞ্চল লোকশূন্য ও শ্রীহীন তেছে, সে-সব অঞ্চলে বন্যার জলে সেচ ব্যবস্থা করিলে র্থাৎ যাহাতে বন্যার জল জমিতে যায় তাহা করিলে উপকার-ম্ভাবনা আছে। সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তী সেচের লের আয়ের বিষয়ও বিবেচনা করিতে হইবে।

পলিপূর্ণ বন্যার জল জমিতে আসিলে যে জমির উর্ব্বরতা র্দ্ধিত হয় এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপও প্রশমিত হয়, তাহা ক দিকে যেমন ডাক্তার বেণ্টলী, অপর দিকে তেমনই সেচ-ষয়ে বিশেষজ্ঞ স্যর উইলিয়ম উইলকক্স দৃঢ়তা সহকারে লিয়া গিয়াছেন। স্যর উইলিয়ম মিশরে এইরূপ ব্যবস্থার রা অসাধ্য সাধন করিয়া অক্ষয় যশ অর্জ্জন করিয়া গয়াছেন। তিনি পরিণত বয়সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাংলার বস্থা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন—জমিতে বন্যার ল প্রবেশ বন্ধ হওয়াতেই পশ্চিম-বঙ্গের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। ধগুলি এই দুর্দ্দশা আরও দ্রুত করিতেছে। কি পায় অবলম্বন করিলে ইহার প্রতিকার হয়, তিনি াহাও বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তখন তাঁহার পদেশ গৃহীত হয় নাই। কিন্তু এখন সেচের প্রয়োজন ও পযোগিতা উপলব্ধ হইতেছে। কিরূপে বন্যার জল জমিতে বেশ করান যায়, তাহার বিষয় বিবেচিত হইবে জানিয়া ামরা প্রীত হইয়াছি।

আমাদিগের মনে হয়, আজ যখন নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত ইতেছে, যখন বাংলার শ্রীহীন পল্লীগ্রামকে শ্রীসম্পন্ন করিবার—াংলার দুর্দ্দশা দূর করিবার উপায় আলোচিত হইতেছে, খন যদি পুনর্গঠন-কর্ম্মচারী স্যর উইলিয়ম উইলকক্সের স্তাবটি পরীক্ষা করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার কথা লেন, তবে কৃষি, স্বাস্থ্য ও সেচ তিন বিভাগই তাঁহাকে াহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন। এতদিন এই পথে রাট বাধা ছিল—অর্থাভাব। এবার সে বাধা দূর হইবার ম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার বর্ত্তনাবধি বাংলা-সরকারের আর্থিক দুর্গতির অন্ত ছিল না। বাংলার জনমত ও বাংলা-সরকার উভয়েই সেই জন্য বলিয়া আসিয়াছেন—

(১) পাটের উপর যে রপ্তানি-শুল্ক আদায় হয়, তাহার সব টাকা বাংলার প্রাপ্য ; সে টাকা বাংলাকে প্রদান করা হউক ;

(২) বাংলায় যত টাকা আয়কর হিসাবে আদায় হয়, তত টাকা আর কোন প্রদেশে আদায় হয় না ; সে টাকার কতকাংশও বাংলার প্রাপ্য।

দীর্ঘকাল আন্দোলনের ফলে পার্লামেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন,—পাটের উপর রপ্তানি-শুল্কের আয়ের অর্দ্ধাংশ পাট-উৎপাদনকারী প্রদেশগুলিকে যথাযথভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে এবং সেই জন্যই পার্লামেণ্ট বাংলার আয়ে তাহার ব্যয় সঙ্কুলান হইবে, ধরিয়া লইয়াছেন। এবার ভারত-সরকার সেই হিসাবে বাংলাকে তাহার প্রাপ্য ঐ টাকার অর্দ্ধাংশ দিতে উদ্যত হইয়াছেন। ফলে বাংলা এবার আর পূর্ব্ববৎ আর্থিক দুর্গতি দুঃখ ভোগ করিবে না। অতঃপর বাংলা উৎপাদক কাজের জন্য ঋণগ্রহণ করিতেও পারিবে। বলা বাহুল্য, যাহাতে পাটের শুল্কের সব টাকাই বাংলা পায়, সেজন্য এখনও আন্দোলন পরিচালিত করিতে হইবে এবং আয়করের কতকাংশও পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। সে-বিষয় আজ আমাদিগের আলোচ্য নহে। আজ আমরা বাংলার আর্থিক দুর্গতি মোচনের স্থায়ী উপায়ের কথাই বলিতেছি।

বাংলার অর্থনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহার সদস্যদিগের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা সরকারের নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। সরকার তাঁহাদিগকে কোন্ কোন্ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে বলিবেন, তাহাও কমিশনার স্থির করিয়া দিবেন। কমিশনার কোন বিশেষ বিভাগের অধীন থাকিবেন না, পরন্তু লাটপরিষদের আর্থিক সমিতির সভাপতির অধীনে কাজ করিবেন। গভর্ণর, তাঁহার শাসন-পরিষদের সদস্যত্রয় ও মন্ত্রিত্রয়—এই কয়জনে বাংলার গভর্ণরের পরিষদ গঠিত। ইহার মধ্যে তিন জনকে লইয়া আর্থিক সমিতি। পরিষদের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সদস্য স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র, অর্থসচিব এবং কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই কয়জন এই সমিতির সদস্য ছিলেন। স্যর প্রভাসচন্দ্রের

মৃত্যুতে যিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন তিনিই, তাঁহার মত, এই সমিতির সভাপতি হইবেন কি-না, তাহা আমরা জানি না। প্রভাসচন্দ্র বিষয়টি বিশেষ যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার মৃত্যুতে এই কার্য্যে কিছু বিঘ্ন ঘটিয়াছে, বলিতে হইবে। আমরা আশা করি, এখন যিনি সমিতির সভাপতি হইবেন, তিনি এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে আবশ্যক মনোযোগ দিবেন। কারণ, বাংলার পল্লী-গ্রামের দুর্দ্দশা দূর না হইলে বাংলার উন্নতি অসম্ভব।

অর্থনীতিক অনুসন্ধান জন্য বাংলায় যে বোর্ড বা সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহার নিকট হইতে পরামর্শ হিসাবেও যে উল্লেখযোগ্য কিছু পাইবার আশা আছে, তাহা মনে হয় না। নানা সম্প্রদায়ের ও নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া যে সমিতি গঠিত হয়, তাহার সদস্যরা যে অনেক সময় কোন বিষয়ে একমত হইতে পারেন না, তাহার প্রমাণ সম্প্রতি পাট-কমিটির রিপোর্টে পাওয়া গিয়াছে। বোর্ডের সভ্যরা কেহ কেহ বাঙালী নহেন—বাংলার আর্থিক অবস্থার সহিত তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই; কেহ কেহ এই বিষয়ে কখন মন দেন নাই। তথাপি যদি বোর্ড তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন, আমরা তাহা ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিব।

কাজ কমিশনারকেই করিতে হইবে। আর তাঁহার কাজ করিবার উৎসাহ ও দক্ষতার উপর সরকারের এই প্রশংসনীয় চেষ্টার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। যে বক্তৃতায় বাংলার গভর্ণর এই চেষ্টার কথা প্রথম উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কার্য্যের বিরাটত্ব ও জটিলতা বিবেচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, এ-কাজ একা সরকারের নহে এবং ইহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে সমাজের সকল উৎকৃষ্ট অংশকে ইহাতে প্রবৃত্ত করিতে হইবে। আমরা আশা করি, দেশের লোক উপদেশ ও সহযোগ দিয়া এই কাজ সম্পূর্ণ করিতে সহায় হইবেন। বাংলার পল্লীগ্রামের ও পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধনের উপায় যিনি যাহা চিন্তা করিয়াছেন, তাহা কমিশনারকে জানাইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে—তাহা এইবার কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। আর গ্রামে কোন কাজ আরম্ভ হইলে তাহার সাফল্য সম্বন্ধে আবশ্যক সাহায্য প্রদান করা প্রয়োজন। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত বিহারে গণ্ডক নদীর বাঁধ মেরামত করিবার জন্য যেমন সরকারী কর্ম্মচারী ও বে-সরকারী লোক, ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলে একযোগে কাজ করিয়া কাজ সফল করিতে হইলে কি করিতে হয় তাহা দেখাইয়াছেন, তেমনই এ কাজে বাঙালী মাত্রেরই অগ্রসর হইয়া সোৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। লোকের আন্তরিক উৎসাহই সরকারের কার্য্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

আজ বহুদিন পরে শ্রীহীন বাংলাকে পুনরায় শ্রীসম্পন্ন করিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে, যেন সহসা বদ্ধস্রোত নদীতে বন্যার জল প্রবাহের সৃষ্টি করিতেছে। আজ যে সুযোগ আসিয়াছে, তাহার সম্যক সদ্ব্যবহার বাঙালীকেই করিতে হইবে; বুঝিতে হইবে—যে-টাকা ব্যয়িত হইবে তাহা যেমন বাঙালীর, যে উপকার হইবে তাহাও তেমনই বাঙালীর—এই পুরাতন পরিচিত বাংলায় শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন, ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইবে—কিন্তু ইহার অধিকারী হইয়া থাকিবে—বাঙালী; সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, রোগে-সম্ভোগে, প্রাচুর্য্যে-অভাবে—বাঙালীর সম্বল এই বাংলা।

বাংলার ও বাঙালীর উন্নতির চেষ্টা বাঙালীকেই করিতে হইবে—নহিলে সে চেষ্টা কখনও সফল হইবে না। তাই আমরা আশা করি, আজ যে-চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অদূর ভবিষ্যতে বাঙালীর সাহায্যে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইবে—বাংলা আবার তাহার পূর্ব্বরূপ ফিরিয়া পাইবে।

পোয়ে নৃত্য

পোয়ে নৃত্য

ব্রহ্মদেশের একরকম লোকনৃত্যকে 'পোয়ে নৃত্য' বলে।

পোয়ে নৃত্যে সাধারণতঃ দুইটি মেয়ে, দুইটি অভিনেতা ও কয়েকটি বাদ্যকর থাকে। প্রথমে একটি মেয়ে নৃত্য করে। পরে অভিনেতারা হাসি-তামাসার কথা বলিয়া আসর জমায়। অতঃপর দ্বিতীয় মেয়েটি আসরে অবতীর্ণ হয়। এই রূপে এক একটি মেয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা নৃত্য করে। অভিনেতাদের ভাষা বুঝা যায় না বটে কিন্তু তাহাদের ভাবভঙ্গী বেশ কৌতুকপ্রদ।

নর্ত্তকীদের মাথার চুল মুকুটের মত করিয়া বাঁধা। সেই চুলের গায়ে ঝোলে ফুলের মালা। ইহারা ফিন্‌ফিনে পাতলা আদ্দির কোট পরে, গলায় পরে নানা রঙের জরি, কাচ, সাজের মালা ও হার। রাত্রির আলোতে এই সব ঝক্‌মক্‌ করে। ইহাদের পরণে রঙীন রকমারি লুঙ্গী। পায়ে মোজা, তাহার উপর সোনার একগাছি করিয়া মল।

নৃত্যকালের বাদ্য বড়ই মনোরম—তাল লয় সংবদ্ধ! তিমিরবরণের বাদ্য যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এই বাদ্য কত উচ্চাঙ্গের তাহা বুঝা কঠিন নয়। তাল মান জ্ঞানে ইহারা সত্যই উন্নত। অথচ ইহারা মূর্খ, নিরক্ষর।

পোয়ে নৃত্য কতকটা আমাদের দেশের যাত্রার মত। ধনীরা এই নৃত্যের আয়োজন করিয়া থাকেন। ধনীদের বাড়ির চত্বরে বা বাহিরে রাস্তায় একটি স্থানে মঞ্চ তৈরি হয়। সেখানে নৃত্য ও অভিনয় হয়। ধনী-দরিদ্র, পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই মঞ্চের চারিদিকে সমবেত হইয়া ইহা দর্শন করে।

ব্রহ্ম-সরকার এই পোয়ে নৃত্যের পোষকতা করিয়া থাকেন। লাটের বাড়িতে, স্কুলে-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নৃত্য হয়। সাধারণের আমোদ-প্রমোদের জন্য রেঙ্গুন কর্পোরেশন প্রতি সপ্তাহে পোয়ে নৃত্যের আয়োজন করিয়া থাকেন।

প্রসিদ্ধ নর্ত্তকী পাভলোভা তাঁহার পুস্তকে পোয়ে নৃত্যের প্রশংসা করিয়াছেন। নৃত্যকলাবিশারদ উদয়শঙ্করের এই নৃত্য এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি ইহার অনুকরণে একবার নৃত্য করিয়াছিলেন।

পোয়ে নৃত্যে মিঞা তান জি ও মা তান জি ইদানীং বেশ নাম করিয়াছেন। ইঁহাদের দলের নাম "ভার্সিটি ট্রুপ" (Versity Troup)—মিঞা তান জি ইহার প্রধান নর্ত্তকী। মিঞা তান জির নৃত্যে ব্রহ্মদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা মুগ্ধ।

আমেরিকার চোখে ইউরোপ

দুর্ভাগ্যকর আন্তর্জাতিক বিবাহ !
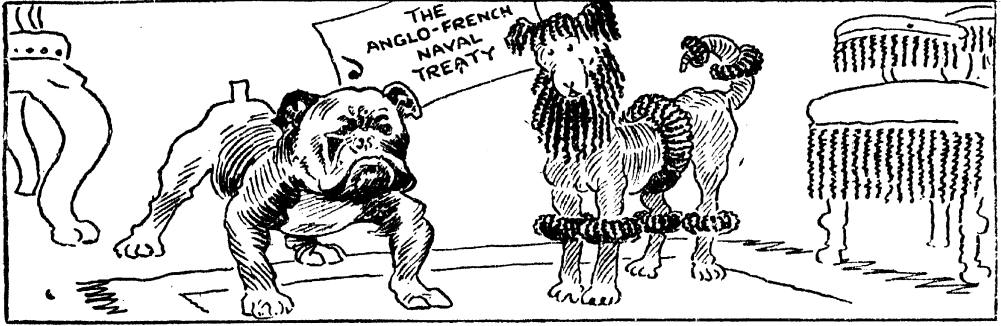
বিবাহিত।

১। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে জলযুদ্ধ ও রণতরী সম্বন্ধে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাকে আমেরিকান্ ব্যঙ্গচিত্রকর বিবাহ বলিয়াছেন।
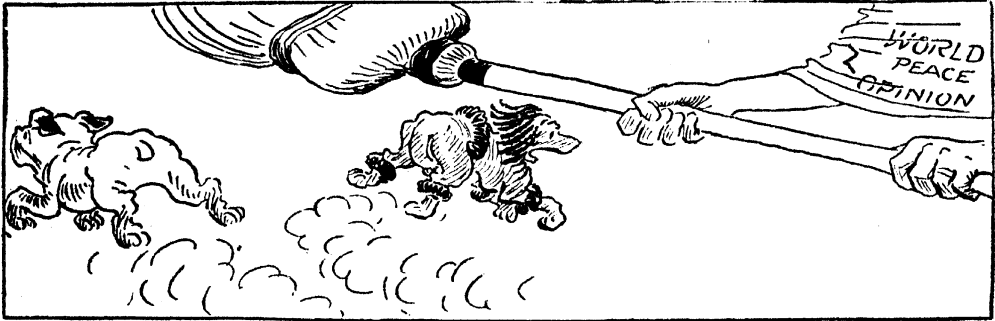
বিবাহ বিচ্ছিন্ন।

২। পৃথিবীব্যাপী শান্তিপ্রবণ মতের চোটে ইঙ্গ-ফরাসী বিবাহ টিকিল না।
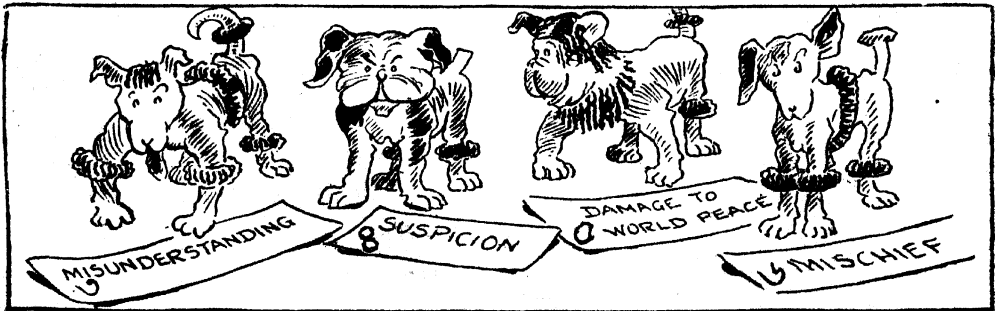
কুফল।

৩। পরস্পরকে ভুল বুঝা। ৪। সন্দেহ। ৫। জগতের শান্তির ক্ষতি। ৬। অনর্থ।

নেতৃত্বের জন্য ঝগড়া !

৭। বৃহৎ জাতিসমূহ।

৮। ক্ষুদ্র জাতিসমূহ।

৯। পৃথিবীর ভাগ্য।

১০। লীগ অব্ নেশুন্স বা জাতি-সংঘ।

১১। ইউটোপিয়ার বা কাল্পনিক আনন্দময় দেশের অভিমুখে।

মানবজাতিকে ইউটোপিয়ায় লইয়া যাইবে কে, তাহা লইয়া ঝগড়া !

আরও ফাঁপিতেছে !

১২। মুসোলিনীর ক্ষমতার বিস্তার।

১৩। ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল।

১৪। সিংহাসন।

১৫। রাজনৈতিক দলসমূহ দলন।

১৬। সংবাদপত্র দমন।

১৭। বক্তৃতার স্বাধীনতা লোপ।

১৮। সভা করিয়া সমবেত হইবার অধিকার লোপ।

১৯। ধর্ম্ম বিষয়ক স্বাধীনতায় ব্যাঘাত উৎপাদন।

আমেরিকা ইউরোপের আঁস্তাকুড় !
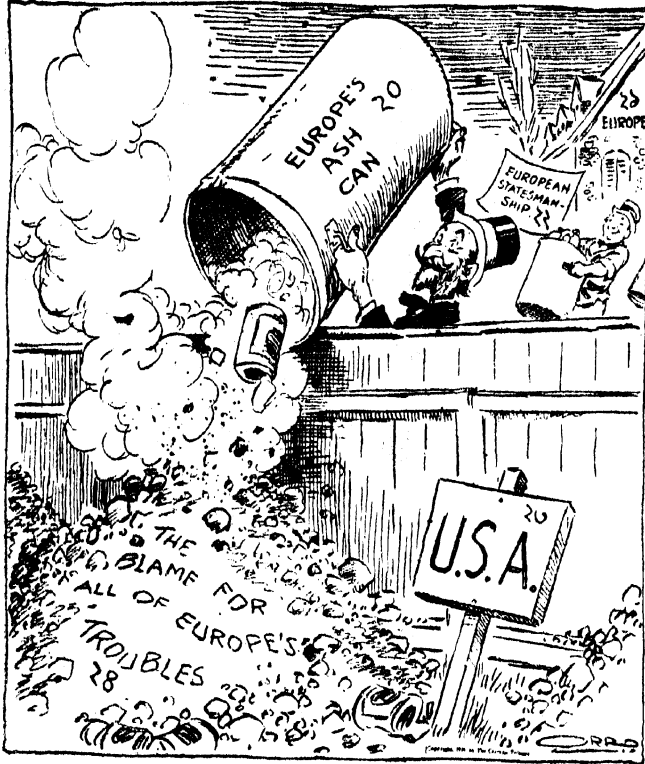
২০। ইউরোপের আবর্জ্জনার পাত্র উজাড়।

২১। ইউরোপ।

২২। ইউরোপীয় রাজনীতি-কৌশল।

২৩। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স।

২৪। ইউরোপের সব ঝঞ্ঝাটের যাহা মূলীভূত।

এই ছবিতে এই ব্যঙ্গ করা হইতেছে যে, ইউরোপের সব ওঁছা লোক ও অন্য আবর্জ্জনা আমেরিকায় ঢালিয়া দেওয়াই ইউরোপের রাজনীতিকৌশল! তাহারাই নাকি ইউরোপের সব অনর্থের মূল।

এই ছয়খানি ছবিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে, লীগ অব্ নেশুন্সের সভ্য বড় ও ছোট জাতিসমূহকে, মুসোলিনীকে, এবং সমগ্র ইউরোপকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। এগুলি আমেরিকার সংবাদপত্র হইতে গৃহীত।

কেবল মুসোলিনীই যে অন্য সকলের সব রকমের স্বাধীনতা লোপ করিতেছে, তাহা নহে। ইউরোপে ও এশিয়ায় অন্য অনেক স্বাধীনতাশত্রু স্বদেশে বা বিদেশে এইরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতেছে।

"মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গত ১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসের প্রবাসী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ মক্তব দ্রাসার বাংলা ভাষা বিষয়ে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন তাহারই লোচনা করিয়া জনৈক মুসলমান পত্রলেখক কবিকে একটি চিঠি ন। নিম্নলিখিত পত্রটি তাহারই উত্তর স্বরূপে লিখিত। পত্রলেখকের ব্য কি ছিল তাহা জানিলে কবির উত্তরটি বুঝিবার পক্ষে অধিকতর বধা হইবে এই জন্য তাঁহার চিঠি হইতেই কয়েকটি পংক্তি তুলিয়া তেছি।

"বাংলার মুসলমান যেদিন হ'তে বুঝতে পেরেছে বাংলা তার নিজের যা সে-দিন হ'তে সে তার ভাষায় নিজেদের হামেশা বোলচালের একটা শব্দ ক্রমশঃ এ্যাবজরব ক'রে নিচ্ছে।"

"মুসলমান ঘরে 'মা'কে 'আম্মা' বলে। লিখতে বসে ঠিক 'আম্মা' বললে তার মা ডাকার সাধ মেটে না। প্রাণের ভাষাকে কলম যদি ল না ক'রে তর্জ্জমা করতে সুরু করে তবে অচিরে সাহিত্য একটা ছাড়া ভাষার অভিনয় মাত্র হবে।"

ওঁ

বিনয় নিবেদন,

সর্ব্বপ্রথমে বলে রাখি আমার স্বভাবে এবং ব্যবহারে ন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব নেই। দুই পক্ষেরই অত্যাচারে আমি মান লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হই এবং সে রকম উপদ্রবকে সমস্ত শেরই অগৌরব বলে মনে করে থাকি।

ভাষা মাত্রেরই একটা ইতিহাসমূলক মজ্জাগত স্বভাব াছে, তাকে না মানলে চলে না। স্কটল্যাণ্ডের ও ওয়েলসের াকে সাধারণত আপন ঘরে ঘরে স্বজন পরিজনের মধ্যে র্বদাই যে সব শব্দ ব্যবহার করে তাকে তারা ইংরেজী াষার মধ্যে চালাবার চেষ্টা মাত্র করে না। কেননা, তারা ই সহজ কথাটি মেনে নিয়েছে যে, যদি তারা নিজেদের াভ্যস্ত প্রাদেশিকতা ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে চালাতে চায় া হ'লে ভাষাকে বিকৃত ও সাহিত্যকে উচ্ছৃঙ্খল করে লবে। কখনো কখনো বর্ন্স (Burns) প্রভৃতি বিখ্যাত স্কচ লখক যখন কবিতা লিখেছেন তখন সেটাকে স্পষ্টত স্কচ াষারই নমুনারূপে স্বীকার করেছেন। অথচ স্কচ ও ওয়েলস্ ংরেজের সঙ্গে এক নেশনের অন্তর্গত।

আয়রল্যাণ্ডে একদা আইরিশে ব্রিটিশে "ব্ল্যাক্ য্যাণ্ড ট্যান্" নামক বীভৎস খুনোখুনি ব্যাপার চলেছিল, কিন্তু সেই হিংস্রতার উত্তেজনা ইংরেজী ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে নি। ওয়েলসবাসী ও আইরিশরা অনেকে দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য এখন তাঁদের প্রাচীন কেল্‌টিক্ ভাষা অবলম্বন করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের কবি ও লেখকেরা তাঁদের রচনায় যে ইংরেজী ব্যবহার করেন সে অবিমিশ্র ইংরেজীই। তাঁদের লিখিত ইংরেজীর মধ্যে পারিবারিক বা প্রাদেশিক ভাষার শব্দ আরোপ করবার চেষ্টা মাত্র তাঁরা করেন নি। এ থেকে ঐ সকল জাতির সভ্য মনোভাবেরই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই।

আজকের বাংলা ভাষা যদি বাঙালী মুসলমানদের ভাব সুস্পষ্টরূপে ও সহজভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম হয়, তবে তাঁরা বাংলা পরিত্যাগ করে উর্দ্দু গ্রহণ করতে পারেন। সেটা বাঙালী জাতির পক্ষে যতই দুঃখকর হোক না, বাংলা ভাষার মূল স্বরূপকে দুর্ব্যবহারের দ্বারা নিপীড়িত করলে সেটা আরো বেশি শোচনীয় হবে।

ইংরেজীতে সহজেই বিস্তর ভারতীয় ভাষার শব্দ চলে গেছে। একটা দৃষ্টান্ত jungle—সেই অজুহাতে বলা চলে না, তাই যদি হ'ল তবে কেন "অরণ্য" শব্দ চালাব না। ভাষা খামখেয়ালি। তার শব্দনির্ব্বাচন নিয়ে কথা কাটাকাটি করা বৃথা।

বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার পার্সি আরবি শব্দ চলে গেছে। তার মধ্যে আড়াআড়ি বা কৃত্রিম জেদের কোন লক্ষণ নেই। কিন্তু যে-সব পার্সি আরবি শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত, অথবা হয়ত কোনো এক শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ, তাকে বাংলা ভাষার মধ্যে প্রক্ষেপ করাকে জবরদস্তি বলতেই হবে। হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে বেখাপ হয় না; বাংলার সর্ব্বজনের ভাষায় সেটা বেমালুম চলে গেছে। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলে নি, তা নিয়ে তর্ক করা নিষ্ফল।

উর্দ্দু ভাষায় পারসি আরবি শব্দের সঙ্গে হিন্দী ও সংস্কৃত

শব্দের মিশোল চলেছে—কিন্তু স্বভাবতই তার একটা সীমা আছে। কোনো পণ্ডিতও উর্দ্দু লেখার কালে উর্দ্দুই লেখেন। তার মধ্যে যদি তিনি "অপ্রতিহত প্রভাবে" শব্দ চালাতে চান তাহলে সেটা হাস্যকর বা শোকাবহ হবেই।

আমাদের গণশ্রেণীর মধ্যে য়ুরেশিয়েরাও গণ্য। তাঁদের মধ্যে বাংলা লেখায় যদি কেউ প্রবৃত্ত হন এবং বাবা মা শব্দের বদলে পাপা মামা ব্যবহার করতে চান এবং তর্ক করেন, ঘরে আমরা ঐ কথাই ব্যবহার করে থাকি, তবে সে তর্ককে কি যুক্তিসঙ্গত বলব? অথচ তাঁদেরকেও অর্থাৎ বাঙালী য়ুরেশিয়কেও আমরা দূরে রাখা অন্যায় বোধ করি। খুশী হ তাঁরা বাংলা ব্যবহার করলে; কিন্তু সেটা যদি য়ুরেশিয় বাংল হয়ে ওঠে তাহলে ধিক্কার দেব নিজের ভাগ্যকে। আমাদে ঝগড়া আজ যদি ভাষার মধ্যে প্রবেশ ক'রে সাহিতে উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ হয়ে ওঠে, তবে এর অভিসম্পা আমাদের সভ্যতার মূলে আঘাত করবে। ইতি ১১ই, চৈত্র ১১৪০।

ভবদীয়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহিলা-সংবাদ

কলিকাতার কয়েকটি চিত্র-প্রদর্শনীতে যে-সব মহিলার আঁকা ছবি প্রশংসিত হইয়াছে তাঁহাদের নামের তালিকা গত মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। মহিলাদের মধ্যে শ্রীমতী রমা বসু অন্যতমা। শ্রীমতী রমা চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শিনী। তাঁহার যে চিত্রগুলি প্রশংসিত হইয়াছে তাহার মধ্যে "শেষ আরতি" মাত্র পনর বৎসর বয়সে ও "নিরঞ্জনা" ষোল বৎসর

শ্রীমতী রমা বসু

বয়সে আঁকা। তিনি গৃহে বসিয়া মাতার নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মাতা শ্রীমতী প্রভাময়ী মিত্রের আঁকা ছবিও প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা আমেনা খাতুন গত ২৩এ মার্চ্চ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় হইতে অধিকসংখ্যক ভোট পাইয়া যশোহ মিউনিসিপালিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কলিকাত

শ্রীযুক্তা আমেনা খাতুন

করপোরেশন ছাড়া বঙ্গদেশের মিউনিসিপালিটিতে তিনিই প্রথ মহিলা-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

বাংলা
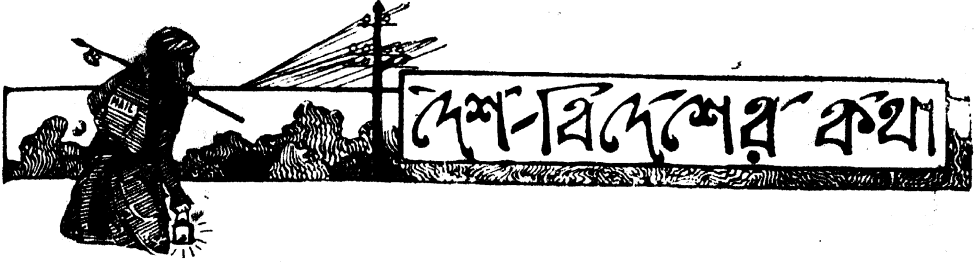
কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির—

চন্দননগরে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় প্রভৃত অর্থব্যয় করিয়া কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির নামক যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন ও চালাইতেছেন, তাহার পরিচয় আমরা আগে আগে দিয়াছি। এখানে বালিকাদিগকে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা দিবার আয়োজন আছে এবং চেষ্টা করা হয়। ইহার গত পুরস্কার-বিতরণ সভায় ছাত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া সভানেত্রী বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীমতী তটিনী দাস বলেন :—

"সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সমস্ত প্রতিকূল শিক্ষার মধ্যেও আমাদের নিজস্ব বিশেষত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। আমরা আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিতেছি, পশ্চিমের ভাষা কলা বিজ্ঞান বহু বিষয়েরই সহায়তা প্রতিনিয়ত আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইতেছে। বিদ্যার এই আদান-প্রদান নিন্দনীয় নহে, কারণ বিদ্যার জাতিভেদ নাই। যাহা-কিছু শিক্ষণীয় স্বদেশীয়-বিদেশীয় নির্ব্বিশেষে আমরা তাহা গ্রহণ করিব, কিন্তু এই শিক্ষার মধ্যে আমরা নিজেকে হারাইয়া ফেলিব না। বিদেশাগত বিদ্যা আয়ত্ত করিতে গিয়া, সকল রকমে বিদেশীয়ের অনুকরণ করিব না। বিদ্যার মধ্যে যাহা বাহিরের বস্তু, তাহা বাহির হইতে আসিয়া, বাহিরের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া বাহির হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে, অন্তরে প্রবেশ করিয়া, আমাদের একান্ত নিজস্ব চরিত্র-সম্পদ হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না, এই সঙ্কল্প দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারিণী বিদ্যার্থিনীকে শিক্ষাব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে।"

"তোমরা এই প্রতিষ্ঠানে যে সুযোগ লাভ করিয়াছ তাহার যথাসাধ্য ব্যবহার করিয়া লও, প্রভূত পরিমাণে বাহিরের বিদ্যা আয়ত্ত কর, কিন্তু তাহার মধ্যে আত্মসমাহিত থাকিও, বাহিরের মোহে মুগ্ধ হইয়া অন্তরের পরম বস্তুটিকে বিস্মৃত হইও না।

কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দিরে পুরস্কার-বিতরণ সভা

কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির—চন্দননগর

"যাঁহার স্মরণে এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার পূত চরিত্রের মাধুর্য্য তোমাদের অন্তরে প্রতিফলিত হউক।"

হুগলী জেলার ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও সাহিত্যিক সমিতি—

গত মাসে চুঁচুড়ায় একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও সাহিত্যিক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সমগ্র হুগলী জেলা আপাততঃ ইহার কার্য্যক্ষেত্র হইবে। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ ইহার সভাপতি ও শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ইহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন 'চুঁচুড়া বার্ত্তাবহে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ মুখুজ্যে, শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ আঢ্য, শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখুজ্যে, শ্রীযুক্ত কানাইলাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বাঁড়ুজ্যে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখুজ্যে ও শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। রাজশাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি অনেক ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়াছেন এবং একটি মিউজিয়মে প্রাচীন মূর্ত্তি, শিলালিপি প্রভৃতি রাখিয়াছেন। হুগলীর সমিতিটিরও ক্রমে ক্রমে এইরূপ কাজ করিতে পারা উচিত।

চুঁচুড়ায় প্রাচ্যকলা প্রদর্শনী—

চুঁচুড়ায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মণ্ডলের চণ্ডীমণ্ডপে একটি প্রাচ্যকলা-প্রদর্শনী গত মাসে খোলা হয়। তাহাতে অনেক ছবি, কাঠের কাজ, কাপড়ের উপর সেলাইয়ের কাজ এবং চামড়ার কাজ প্রদর্শিত হয়। চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় ইহা উদ্ঘাটন করেন। মফস্বলের সর্ব্বত্র এইরূপ প্রদর্শনী হওয়া উচিত।

চুঁচুড়া দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষক বিদ্যালয়—

চুঁচুড়ায় দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষক বিদ্যালয় একটি সুপরিচালিত বিদ্যালয়। ছাত্র ভিন্ন ইহা হইতে একটি বালিকাও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং আরও কয়েকটি ছাত্রী এখানে পড়িতেছে।

তালতলায় সাহিত্য-সম্মেলন—

তালতলা সাধারণ পুস্তকালয়ের উদ্যোগে এ-বৎসরও কুমার সিংহ হলে অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সাধারণ সভাপতিত্বে সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। ইহাতে অনেকগুলি ভাল অভিভাষণ ও প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর কুমার সিংহ হল ব্যবহার করিতে দিয়া শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি-বার্ষিকী—

চব্বিশ পরগণার বোড়াল গ্রামে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের শেষ ভাগ তিনি বৈদ্যনাথ-দেওঘরে যাপন করেন। বোড়ালে এখনও তাঁহার বাসগৃহের বৈঠকখানা অংশের দেওয়াল-গুলি দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিকের বাগান জঙ্গলময় হইয়াছে। বোড়ালের মিলনসঙ্ঘ তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য বার্ষিক সভা করিয়া থাকেন, গত মাসেও করিয়াছিলেন। সঙ্ঘ যদি বসু মহাশয়ের বাড়ির ভগ্নাবশেষ মেরামত করাইয়া তাহাতে কোন গ্রামহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। বসু মহাশয়ের বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থাবলী তাঁহারা তাঁহার দৌহিত্রী শ্রীমতী কুমুদিনী বসু ও দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্রের সহযোগিতায় পুনর্মুদ্রিত করাইলে একটি জাতীয় কর্ত্তব্য করা হইবে। পাঁচ শত খণ্ড বিক্রী হইলেই গ্রন্থাবলীর ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। উহার আনুমানিক ব্যয় স্থির করিয়া উদ্যোক্তারা যদি পাঁচ শত জন গ্রাহক সংগ্রহের চেষ্টা করেন, তাহা সফল হইবে মনে করি। আমরা গ্রাহক-সংগ্রহ কার্য্যের সাহায্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ দ্বারা করিতে পারি। সুবিখ্যাত শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বসু মহাশয়ের দৌহিত্র। তিনি মাতামহের গ্রন্থাবলী প্রকাশে তাঁহার প্রভাবের সাহায্য দি[লে] কাজ অগ্রসর হইতে পারে। বসু মহাশয় যে কিরূপ খাঁটি স্বাজা[তিক] ছিলেন, তাহা আজকালকার তরুণেরা জানেন না। তিনি ধর্ম্ম-সংস্কারক সমাজ-সংস্কারক ছিলেন বলিয়া তাঁহার অনাদর হওয়া উচিত নয়।

কোন্নগরের বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে লোকনৃত্য—

কোন্নগর ইংরেজী বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিত[রণ] উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রবর্ত্তিত কিছু লোকনৃত্য বালকে দেখাইয়াছিল। নৃত্যগুলি স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক, স্ফূর্ত্তিজনক ও নির্দ্দোষ আমোদপ্র[দ]। যে অল্পস্বল্প পরিবর্ত্তন আবশ্যক মনে হইল, তাহা দুঃসাধ্য নহে।

চট্টল দিয়াশলাই কারখানা—

চট্টগ্রামে "চট্টল দিয়াশলাই কারখানা" নাম দিয়া একটি কারখা[না] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনটি জাপানী কল ছাড়া ইহার আর সমস্ত ক[ল] কলিকাতার ভবানী এঞ্জিনিয়ারিং ট্রেডিং কোম্পানী নির্ম্মাণ করিয়াছে[ন]। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই কারখানার দিয়াশলাই শীঘ্রই বাজা[রে] বাহির হইবে।

কৃতী বাঙালী ছাত্র—

শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকিশোর দত্তরায় সম্প্রতি জার্ম্মেনী হইতে দেশে প্রত্যাব[র্ত্তন] করিয়াছেন। জার্ম্মেনীর হেনোফের টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (Tech[n]ical University, Hannover) হইতে তিনি কৃতিত্বের সহি[ত] জার্ম্মেনীর সর্ব্বোচ্চ ষ্টেট ডিগ্রী (State Degree) ডক্টর অব ইঞ্জিনিয়া[রিং]

শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকিশোর দত্তরায়

(Dr. Ing.) লাভ করিয়াছেন। তিনি তথাকার কেমিক্যাল টেক্নো-লজিকেল ইনষ্টিটিউশনের ডিরেক্টর প্রথিতযশা অধ্যাপক ডাঃ কেপলারের

বর

শ্রীমনোজ বসু

তক্ষণে সময় হইল বুঝি!

দোর খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সন্তর্পণে ছায়ামূর্ত্তি ঘরের মধ্যে আসিল। আসিয়া করিল কি—জানালার ধারে যেখানে উমা একেলা পড়িয়া আছে ঠিক সেই খানটিতে একেবারে শিয়রের উপর বসিয়া চোখের পল্লবের কাছে মুখটি নামাইয়া আনিল।

—উমারাণী, উমারাণী—

চুপ, চুপ,...কি লজ্জা!

মাঠের যেখানে যত জ্যোৎস্না ছিল স্তূপাকার মল্লিকার মতো সব কি ঘরের মধ্যে আসিয়া জমিয়াছে! তেঁতুল গাছে চোখগেলা একটানা ডাকিয়া চলিয়াছে, ক্লান্তি নাই।...ফাল্গুন রাত্রির মিঠা হাওয়া এক একবার আসিয়া ছোট মেয়ের দোলনার মতো বিছানা-মশারী দোলাইয়া দিয়া যায়।

—উমারাণী, রাণী গো—জাগো, চোখ দুটো মেল দিকি একবার—

কিন্তু চোখ না মেলিলে কি হয়, কীর্ত্তিকলাপ তোমার সব যে দেখা যাইতেছে! সুকুমার সুন্দর চোরের মুখখানি ভরিয়া মধুর চাপাহাসি। হাসিভরা সেই মুখ ধীরে ধীরে নীচু হইয়া আসিতেছে, আরো নীচু—আরো—আরো—আরো—

—ধ্যেৎ, দুষ্টু কোথাকার!

খিল-খিল করিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইতে উমার ঘুম ভাঙিল।... কে কোথায়! ঘরের দরজা বন্ধ। হঠাৎ এঞ্জিনের সুতীব্র বাঁশি। নৈশ নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া চুরিয়া প্রলয়ের শব্দে বাড়ির পাশের রেললাইন বহিয়া এগারোটার গাড়ী ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়া গেল।

পাড়ার গুটি পাঁচেক মেয়ে সোরগোল করিয়া রান্নাঘরে কাজে লাগিয়াছিল। বিভার স্ফূর্ত্তিটাই সব চেয়ে বেশী। গাড়ীর শব্দে তার টনক নড়িয়া উঠিল। ডাকাতের মতো ছুটিয়া আসিয়া সে এ ঘরের দরজা ঝাঁকাইতে লাগিল।

—ওঠ, ওঠ, এসেছে—

অলস তন্দ্রাচ্ছন্ন হাসি হাসিয়া উমারাণী বলিল—আর নেই, চলে গেছে।

—আবার তর্ক করে। খোল্ না দরজা; দেখ্ এসে কি চমৎকার বর—

জানে, পোড়ারমুখী আসিয়াছে যখন, না উঠাইয়া কিছুতেই ছাড়িবে না। তবু যতক্ষণ পারা যায়। বলিল—তোর বর—

—দিবি? এদিক ওদিক তাকাইয়া বিভা বলিল—দিতে পারিস প্রাণ ধরে?

উমারাণী সচ্ছন্দে এবং পরম নির্ভয়ে বলিয়া দিল—নি গে যা—

—ইস্, দাতাকর্ণ একেবারে। বুঝেছি, বুঝেছি। কেদার মিত্তির চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

দুই সখীর মধ্যে কেদার মিত্রকে লইয়া আজকাল প্রায়ই এমনি আলোচনা হয়। আসলে কিন্তু মিত্র মহাশয় মোটেই তুচ্ছ ব্যক্তি নহেন। বাড়ী তাঁর ক্রোশ দুই তিনের মধ্যে; প্রচুর মান সম্ভ্রম, কোন অংশে কাহারও অপেক্ষা খাট নহেন—না বিত্তে না বয়সে। সম্প্রতি ভদ্রলোকের পর পর দুইটি মহা সর্ব্বনাশ ঘটিয়া গিয়াছে। প্রথমে স্ত্রী গত হইলেন, তারপর সেই পিছু পিছু সেজ ছেলেটা। ছেলেটা আবার পথ কিছু সংক্ষেপ করিয়া লইল। রাত্রে বাপের সঙ্গে সামান্য একটু কথান্তর—প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখা গেল, তার প্রাণহীন দেহ গোয়ালের আড়ার সঙ্গে ঝুলিতেছে। তারপর থানা, সেখান হইতে সদর। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চুকিয়াছে এই মাস খানেকের বেশী নয়।

বিভা নিতান্ত ভাল মানুষের মতন বলিয়া চলিল—কেদার মিত্তিরই মাথা খেয়েছে। তা তোর দোষ দেব কি ভাই। একসঙ্গে অমন ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী—একেবারে একটা পুরো সংসার। কার না লোভ হয় বল্।

—দেখাচ্ছি তোমায়। বলিয়া বড় রাগে রাগে দরজা খুলিয়া উমারাণী বিভাকে টানিয়া ঘরে লইল। বলিল—

তুই বড্ড ইয়ে হয়েছিস। বিপদের সময় মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা ?

—ঠাট্টা ? কক্‌খনো না। দুঃখ করছি। বলিয়া বিভা চেষ্টা-চরিত্র করিয়া মুখখানা মলিন করিল। বলিল—বিপদই বটে। এমন সাধু সজ্জন লোকেরও এমনি দুর্গতি হয়। থানায় নিয়ে বটতলায় নাকি খাড়া দাঁড় করিয়ে দিল। তখন দারোগাকে ধরমবাপ বলে সমস্ত বেলা ধরে ভেউ ভেউ করে কান্না। বাবার কাছে গল্পটা শুনে অবধি—। কথা আর শেষ করিতে পারিল না; প্রবল দুঃখের যন্ত্রণাতেই বোধ করি বিছানার উপর একেবারে লুটোপুটি খাইতে লাগিল।

কিন্তু উমারাণী তাহাতে যোগ দিল না. ম্লান হাসিয়া বলিল—কিন্তু, বুড়ো হোক, যাই হোক—ঐ কেদার মিত্তির ছাড়া তোর সইকে আর কার মনে লাগল বল দিকি ? একটু চুপ থাকিয়া গভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিল—দাদুর অবস্থা দেখে কান্না আসে ভাই। বুড়ো মানুষ, এ দেশ সে দেশ করে এক একটা সম্বন্ধ নিয়ে আসেন; মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে দাদুর আহার-নিদ্রা ত্যাগ। আজ এই দুপুর থেকে ষ্টেশনে যাবার ঝোঁক। বলেন, কলকাতার ছেলে পাড়াগাঁয়ে আসছে, পথঘাট চেনে না—আগে গিয়ে বসা ভাল। যেন কলকাতার ছেলেকে খাতির করে গাড়ী আজ সকাল সকাল পৌঁছে যাবে। গাড়ী ত এল এতক্ষণে, আর সেই সন্ধ্যে থেকে ষ্টেশনে গিয়ে বসে আছেন।

বিভার চোখে জল আসিয়া পড়িল। দুই জনে বড় ভাব। উমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—বসে বসে ঐ সব ভাবছিস। আজকে বর আসবার দিন, আনন্দ করতে হয়। চল দিকি রান্নাঘরের দিকে—

হঠাৎ উমারাণী বলিল—বিভা, একটা জিনিষ ধার দিবি ?

—কি ?

—তোর ঐ গায়ের রঙটা। বড্ড ভয় করছে। ওরা দেখে শুনে চলে গেলে কাল আবার তোকে ফিরে দেব।

বিভা একেবারে আগুন হইয়া উঠিল—তুই হিংসুক, তুই কাণা। একবার আয়না ধরেও দেখিস নে ?

উমারাণী বলিল—সে ভাই, তোর চোখে। তুই যদি পুরুষ হতিস্—

—আলবৎ। গ্রীবা দোলাইয়া প্রবলকণ্ঠে বিভা বলিতে লাগিল—তা হলে নিশ্চয় তোকে বিয়ে করতাম। বিয়ে না করে সকালে ঘাড়ের উপর এক কিল, আর সন্ধ্যায় আর এক দফা। বলিতে বলিতে পরম স্নেহে উমাকে সে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—চুলোয় যাকগে কেদার মিত্তির। আমি ছাড়া আর কারো চোখে লাগে না—বটে ? আজকে তবে কি হচ্ছে মণি ? ছবি দেখে যে পাগল হয়ে রাজপুত্তুর ছুটেছে—

রাজপুত্র অর্থাৎ প্রশান্ত। কলিকাতায় কলেজে পড়ে। ফোটোগ্রাফ দেখিয়া বিচার বিবেচনা করিয়া অবশেষে আজ সে নিজেই আসিতেছে। সদয়গোপাল ষ্টেশনের বেঞ্চে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিলেন। চারিদিকে ফাঁকা মাঠ, বড় শীত করিতে লাগিল। চাদরটা গায়ে দিয়া কম্ফর্টার ভাল করিয়া গলায় জড়াইয়া সোজা হইয়া বসিলেন। অবশেষে গাড়ী আসিল।

কলিকাতার ছেলে, দেখিয়াই চেনা যায়। দুজন আসিয়াছে। একজন টুকটুকে সুন্দর, চশমা-পরা। অপর জন ফর্শা তেমন নয়, লম্বা চওড়া সুগঠিত দেহ। গাড়ী হইতে নামিয়া সেই সর্ব্বাগ্রে পরিচয় দিল—আমার নাম নিমাই গোস্বামী, নিবাস নীলগঞ্জ। পাত্র কিছুতে এল না।

সদয়গোপালের এমন ভাব হইল, বুঝি ঐখানেই বসিয়া পড়িবেন। নিমাই বলিতে লাগিল—এত করে বললাম, চলো যাই প্রশান্ত, আজকালকার দিনে এতে আর লজ্জা কি ? শিয়ালদহে এসেও টানাটানি। কিছুতে নয়। আমাদের দু'জনকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসছি বলে চম্পট।

কিন্তু বয়স কম হইলে কি হয়, নিমাই গোস্বামী অতিশয় বিবেচক ব্যক্তি। বাড়ি পৌঁছিয়া বলিল—এই রাত্তিরে আজ আর হাঙ্গাম হুজ্জুত করে কাজ নেই। আমরা কে ? দেখা-টেখা হবে একেবারে সেই আসল মানুষের সঙ্গে শুভদৃষ্টির সময়। আমরা দেখব শুধু তরিবৎটা। বরঞ্চ খাবার টাবার গুলো খুকীকে দিয়ে পরিবেশন করান। তাতে আন্দাজ পাওয়া যাবে—

বিভা ছুটিয়া গিয়া উমারাণীকে চিমটি কাটিল।—যা খুকী,

খাবার দিগে যা। রাগের আর তার অন্ত রহিল না। খুকী! পিতামহ ভীষ্মেরা সব আসিয়াছেন কিনা, তাই খুকী বলা হইতেছে!

বিভার বাপ ভুবনবিহারী রায় চৌধুরী—চৌধুরীদের বড় তরফের কর্ত্তা। তিনি আসিয়াছেন; রাত্রি একটু বেশী হইলেও গ্রামস্থ আরও দু'পাঁচজন আসিয়াছেন। খাইতে খাইতে নানাবিধ উচ্চাঙ্গের আলোচনা চলিয়াছে। ভুবন চৌধুরী ত নিমাইএর মুখের দিকে চাহিয়া হাঁ হইয়া গিয়াছেন। ঐ টুকু ছেলে, এই বয়সে এত শিখিয়া ফেলিয়াছে—অবলীলাক্রমে এমন করিয়া কহিয়া যায় যেন তার বিদ্যাবুদ্ধির তল নাই। পাশের ঘর হইতে বিভা উঁকি দিয়া দিয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল এবং সেই আনন্দে ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে রান্নাঘরে গিয়া খবর দিল, বর আসিয়াছে, উহারই মধ্যে আছে।

মেয়েরা নিরাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, আবার পাশের ঘরে জমায়েত হইতে লাগিল। সদয়গোপাল আনন্দে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—সত্যিরে বিভা, সত্যি?

বিভা চশমা-পরা ভদ্রলোককে দেখাইয়া দিল। – দেখছেন না, কি রকম ঘাড় ঝুঁকে পড়েছে ..তাকায় না, মুখ তোলে না। ঐ—ঐ—

সদয়গোপাল সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন উনি যে আর কি একটা নাম বললেন—

—বলেছে তবে আর কি! একেবারে বেদবাক্য বলেছে। দাদুর যেমন কথা!

বিভা একেবারে হাসিয়া খুন।

চশমাপরা ভদ্রলোকটির ইহার পরে আর বিপদের অবধি থাকিল না। জানালার ওদিক হইতে কাপড়ের খসখসানি, চুড়ির আওয়াজ। ভদ্রলোক বুঝিলেন, দৃষ্টির শতঘ্নীবাণ গুলা তাঁহারই পিঠে আসিয়া পড়িতেছে; মুখ ও চশমা থালার উপর ততই যেন ঠেকিয়া যাইবার উপক্রম করিল। ওদিকে উমারাণীও বিদ্রোহী। হাতের পাত্রটা ফেলিয়া ঝপ করিয়া সে বসিয়া পড়িল। বিভাকে বলিল—আমি পারব না, তুই যা—

বিভা জিভ কাটিয়া বলিল সর্ব্বনাশ। তা করিস নে। জীবে দয়া করতে হয়। তা হলে ওর চোখ ফেটে জল বেরুবে। দেখিস নি, তোর পিছনে কি রকম চেয়ে চেয়ে দেখে চোরের মতো। দেখিস নি তাই,—দেখলে মায়া হত।

উমার বিশ্বাস হইল কথাটা। মানুষটি এমনি দেখিতে গোবেচারার মতো, আসলে কিন্তু দুষ্টের শিরোমণি।

খাওয়ার পরে আবার পানের জন্য ডাকাডাকি।

উমা হাতজোড় করিয়া বলিল—বিভা, লক্ষ্মী ভাই, এবারে আর কাউকে—

কিন্তু বিভার দয়ামায়া নাই। হাত মুখ নাড়িয়া ঝগড়া আরম্ভ করিল—কি রকম মেয়ে তুই লো? আমাদের হ'লে আরও কত ছুতোনাতা খুঁজে বেড়াতাম। যা পোড়ারমুখী—যা শিগগির—

ভদ্রলোকেরা তখন সতরঞ্চির উপর সুখাসীন হইয়াছেন। উমারাণী গিয়া দাঁড়াইতে ভুবন রায় গুণ-ব্যাখ্যা সুরু করিলেন – মেয়ে নয়, আমার মা লক্ষ্মী। বুঝলেন মশাইরা, আমার বিভাও যা এ-ও তাই। ঐ রং যা একটুখানি চাপা, নইলে কাজ-কর্ম্ম স্বভাব-চরিত্র দেখলেন ত যাই হোক কিছু। আহা-হা, মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। বড্ড খেটেছিস—বোস দিকি মা, বুড়ো ছেলের পাশে একটুখানি বোস—

নিমাই গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। কলিকাতার ছেলে, কথায় ভুলিবার পাত্র নহে। বলিল না খুকী, দাঁড়াও আর একটু। চুলটা একবার খুলে দিন না কেউ। ঐ দরজাটার ঐখানে চলে যাও খুকী, - তাড়াতাড়ি যাও, একটু জোর জোর পায়ে এইবার চোখ তুলে তাকাও ত নজরটা দেখতে হবে—

অকস্মাৎ বিভা আসিয়া উমারাণীর হাত ধরিয়া লইয়া গেল। ভুবন রায় হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন—ওরে কি করিস? ভদ্রলোকেরা যে—

বিভার জবাব আসিল - ভদ্রলোকেরা বিশ্রাম করুন। হাঙ্গামা হুজ্জতের ত আজ কথা ছিল না বাবা। খুকী মানুষ—খেটে খুটে এখন বড্ড ঘুম ধরেছে, ও আর চোখ তুলতে পারবে না।

সকালে উঠিয়াই নিমাই গোস্বামী বলিল—নমস্কার!

সদয়গোপালের মুখ শুকাইল, দেবতা রুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু অপরাধ ত তাঁহার কিছুই নয়।

নিমাই হাসিমুখে বৃদ্ধকে নির্ভয় করিল। বলিল—আর কত দেখবো? ঐ ত হোলো। অনর্থক কলেজ কামাই করে দরকার কি?

সদয়গোপাল শুনিলেন না, ষ্টেশন অবধি সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। গাড়ী প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ নিমাই অবাক করিয়া দিল। বলিল—মাপ করবেন আমাকে; একটু মিথ্যাচার হয়েছে। পাত্র নিজেই এসেছে।

বিভার সন্দেহ ঠিক তাহা হইলে। বৃদ্ধ দুই স্তিমিত-চোখের সকল প্রত্যাশা লইয়া চশমাধারীর দিকে তাকাইলেন।

গোস্বামী পুনশ্চ বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে আমিই প্রশান্ত—

আরও আশ্চর্য্য হইয়া সদয়গোপাল বলিলেন—আপনার বাড়ি কি তবে—

কথা লুফিয়া লইয়া প্রশান্ত বলিল—নীলগঞ্জ নয়। জন্মে দেখিনি কখনো। তারপর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল—পরিচয় দিলে কি আর অমনি করে দেখা যেতো! তা ছাড়া অন্যায়টাই বা কি? আপনার সঙ্গে ত ঠাট্টা-তামাসারই সম্পর্ক।

সাহস পাইয়া এতক্ষণ পরে বৃদ্ধ মুখ তুলিলেন। ঢোক গিলিয়া বলিলেন—মেয়ে তবে পছন্দ হয়েছে দাদা?

—হয়েছে।—ফর্শাটি। আপনার ঐ যে কে হয় বলছিলেন না?

সদয়গোপালের কথা ফুটিল না। তারপর অনেকক্ষণ পরে কথা যখন বলিলেন, যেন হাহাকারের মতো শুনাইল। বলিলেন—ও ভুবন চৌধুরীর মেয়ে, ওর পাত্রের অভাব কি? আমার এই মা-বাপ মরা বাছার একটা গতি করে দাও তোমরা—

প্রশান্ত উদাসীনের মতো আর একদিকে চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল—গাড়ী এসে পড়েছে; আচ্ছা, নমস্কার। ভুবন চৌধুরী মশায়কে বলবেন ঐ কথা। আয় সুনীল দাঁড়িয়ে রইল যে—

গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু চশমাধারী ছেলেটি নড়িল না। এক মুহূর্ত্ত সে সেই সর্ব্বহারা বৃদ্ধের দিকে তাকাইল। কথা সে কাল হইতে বড় বেশী কহে নাই, গাড়ীর সামনে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমার নাম সুনীলকুমার রায়, বাড়ি প্রশান্তদের ওখানে। আমার সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর করে দেখবেন। আমি অযোগ্য, কিন্তু যদি আপনার পৌত্রীকে—

বৃদ্ধ যেন পাগল হইয়া উঠিলেন, শুষ্ক চোখ এতক্ষণে সজল হইয়া উঠিল। অধীর আকুলকণ্ঠে বারম্বার বলিতে লাগিলেন—আমার উমারাণীকে নেবে তুমি? দুঃখিনীকে পায়ে ঠাঁই দেবে তুমি দাদা?

অস্ফুট স্বরে সুনীল বলিল—যদি দেন দয়া করে। এবং তারপর সে-ই বা আর কি কি বলিল, বুড়াই বা কি বলিতে লাগিলেন গাড়ীর শব্দে লোকজনের কোলাহলে তাহার একবর্ণ শোনা গেল না।

বৃত্তান্ত শুনিয়া ভুবন চৌধুরী মহাখুসী। বলিলেন—বেশ হয়েছে, দিব্যি হয়েছে। এক ঢিলে দুই পাখী। হীরের টুকরো ছেলে ও দু'টি। দেখেই বুঝেছি—

এবং আরও ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য পরদিনই রওনা হইয়া গেলেন। ফিরিতে দিন আষ্টেক দেরী হইল। খিড়কীতে পা দিয়াই আনন্দোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—উলু দাও সব—শঙ্খ বাজাও—

উদ্যোগীপুরুষ। একেবারে বিয়ের তারিখ পর্য্যন্ত ঠিক। সামনের চৈত্রটা বাদ দিয়া বৈশাখ মাসের এগারোই।

হাত-পা ধুইয়া চৌধুরী মহাশয় বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলেন, সদয়গোপাল আসিয়া ফরাসের একপাশে চুপচাপ বসিয়া আছেন। হাঁ, সম্বন্ধ বটে। সেই কথাটাই সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া পড়িল। এমন ঘর-বর ভুবন স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। প্রায় বেকুব হইতে বসিয়াছিলেন; তারপর বুদ্ধি করিয়া নিজের হাতের হীরার আংটি বরের আঙুলে পরাইয়া মান বাঁচাইয়া আসিয়াছেন। সদয়গোপাল খুব ঘাড় নাড়িয়া ভুবনের বুদ্ধির তারিফ করিলেন, তারপর কাছে গিয়া কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ ভুবন, আর ঐ খবরটা নিয়েছিলে কিছু?

ভুবন বলিলেন—নেব না কি রকম? সে-ও ত এবাড়ি ওবাড়ি। ওটাও ভাল সম্বন্ধ। উনিশ আর বিশ। বরঞ্চ

এক হিসেবে উমার অদৃষ্ট আরও ভাল। শ্বশুর শাশুড়ী দুইই বর্ত্তমান। শ্বশুর নিশি রায়—ও অঞ্চলের ডাকসাইটে লোক। আমি গিয়ে পরিচয় দিলাম। ভদ্রলোক তখনি পুকুরে জাল নামিয়ে দিলেন।

সদয়গোপাল জিজ্ঞাসা করিলেন—আর সুনীল যে কথাটা বলে গিয়েছেন ?

ভুবন ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—তাও হোলো। নিশিবাবু বাইরে লোক মন্দ নন। বললেন—ছেলের পছন্দেই আমাদের পছন্দ। উপযুক্ত ছেলে, আমরা কি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাব ?

আনন্দে বিহ্বল হইয়া সদয়গোপাল বলিলেন—ভুবন, তবে তোমাকে আরও একদিন যেতে হচ্ছে। ঘাড় নাড়লে হবে না—আমিও যাব। গিয়ে বলব, আমার দুই নাতনীকেই একদিনে নিতে হবে—ঐ এগারোই বোশেখ। তা নইলে শুনব না।

ভুবন বলিলেন,—তাও বলেছিলাম। কিন্তু বিস্তর অজুহাত। ছেলেরই নাকি আপত্তি, পরীক্ষার আগে সুবিধে হয়ে উঠবে না। বাবাজী বাড়িতে নেই—আসল কথাটা তাই বোঝা গেল না। আমার মনে হয়, বুড়োরও কিছু দুষ্টুমি আছে।

তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া দুজনে অনেক পরামর্শ চলিতে লাগিল।

এদিকে খুব ঝাঁকাইয়া প্রাণপণ শক্তিতে উলু দিয়া উমারাণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে অবশেষে বিভাকে নির্জ্জনে ধরিয়া বসিল।

—ওরে রাক্ষুসী, সত্যি সত্যি আমার বর ছিনিয়ে নিলি ?

এই কথাটাই বাঁকা হাসির সঙ্গে ক'দিন ধরিয়া মেয়ে মহলে মুখে মুখে চলিতেছে। উমারাণীকে দেখিলেই সকলে চুপ করিয়া যায়। সেই কথা মনে করিয়া লজ্জায় সহসা বিভার উত্তর যোগাইল না। উমা বলিতে লাগিল—তুই ডাকাত। ডাকাতি করে বর কেড়ে নিয়ে শেষে এদ্দিন পরে আমাদের ছেড়ে ছুকে চললি—

—ছাড়ব কি সহজে ? বিভা সামলাইয়া তখন ঝগড়া সুরু করিল।—অত আহ্লাদ করিসনে রে। না হয়, দুটো একটা মাসের এদিক ওদিক। সেখানেও পাশাপাশি বাড়ি। তোর সঙ্গে চুলোচুলি না করলে একদিনেই যে মরে যাব ভাই—

তারপর আবার বলিতে লাগিল—বোশেখে না হয় কলেজের এগজামিন। জোষ্টিতে বাঁচবে কি করে ? পুরুষগুলো ভাই বড্ড বোকা। সেই সেই মাথা খুঁড়তে হবে, খামকা আমাদের চটিয়ে রেখে দেয়। তখন আচ্ছা করে কৈফিয়ৎ নিবি, ছাড়িস নে—বুঝলি ?

উমা বলিল—দয়ার উপর জুলুম ?

বিভা মুখ ঘুরাইয়া বলিল—কিসের দয়া লো ? মেয়েমানুষ গাঙের জলে ভেসে আসে নাকি ? পুরুষ জাতকে অমন আস্কারা দিস নে—দিস নে। তা'হলে কত হেনস্তা করবে দেখে নিস্—

যেন পুরুষের সঙ্গে ঘরকন্না করিয়া করিয়া বিভা মস্ত বড় গিন্নি ঠাকরুণ হইয়া গিয়াছে। উমারাণী হাসিয়া উঠিল।—সবাইকে তোর গোঁসাই ঠাকুর ভাবিস নাকি ? তারপর টিপি টিপি হাসিতে হাসিতে বলিল—ভাল হয়েছে যে ঐ দিন আমাকে বৌ সেজে বসতে হবে না, বাসরঘরে নিমাই গোঁসাইয়ের কাছে দিব্যি ভাগবত শোনা যাবে। রাগ করিস নে ভাই, আর একটা লোকও এসেছিল সেদিন—কিন্তু জ্বালিয়াতি বুদ্ধি তার ত মাথায় আসে নি—

বলিতে বলিতে অকস্মাৎ উমার মুখ অপূর্ব্ব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এক মুহূর্ত্ত সে চুপ করিয়া রহিল, তারপর মৃদু স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল—দাদু বলেন, দেবতা। আমার দাদুর মুখে যিনি হাসি ফুটিয়েছেন, সত্যি তিনি দেবতা। তোর কাছে বলব কি ভাই, সকালে উঠে রোজ মনে মনে তাঁকে প্রণাম করি। সেদিনের কাণ্ড নিয়ে লোকে হাসাহাসি করে, আমি তা বুঝি। তবু আমি ভাবি, ভাগ্যিস গোঁসাই ঠাকুর আমাকে পছন্দ করে বসেন নি।...কিছুতে বিশ্বাস হতে চায় না যে সত্যি সত্যি কোনদিন ঐ দেবতার পায়ে মাথা রাখতে পারব—

ছাতের প্রান্তে দুইজনে নিঃসীম মাঠের দিকে চাহিয়া চাহিয়া পরম মধুর আসন্ন সেই দিনগুলিকে লইয়া স্বপ্নের জাল বুনিয়া চলিল। শেষ ফাল্গুনের মাঠ। শিমুল বনে এখনও সব ফুল ফুটে নাই, তাদের মাথায় নূতন জটা পড়িতেছে, বৈঁচিগাছে

লাল লাল ফুলের কুঁড়ি দেখা দিয়াছে। গাঙের দিক হইতে আকাশে মেঘের কোলে কোলে এক ঝাঁক সাদা পাখী উড়িয়া যাইতেছে। যেন শ্বেতপদ্মের মালা; সে মালা কখনো দীর্ঘ হইতেছে—কখনো আঁকিয়া বাঁকিয়া তার কাটিয়া যাইতেছে। ···ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখনো দুজনে বসিয়া আছে।

সেদিন বাড়ি ফিরিয়া সকল কাজকর্ম্ম সারিয়া উমারাণী একেলা তার জানালাটিতে বসিল। বাহিরে ছোট্ট উলুক্ষেতের উপর ঝাপসা ঝাপসা অন্ধকার। তাহারই সীমানা দিয়া সারবন্দী টেলিগ্রাফ-পোষ্টগুলা। যেন রাত্রি জাগিয়া তাহারা সান্ত্রীর মতো রেললাইন পাহারা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উমার মনের উপর তন্দ্রা চাপিয়া বসিল, বিয়ে যেন তার আজই। আলো জালিয়া বাজনা বাজাইয়া বড় জাঁকজমক করিয়া ষ্টেশন হইতে বর তাদের বোধনতলায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; চীৎকার কোলাহলে কান পাতা যায় না। বিভা মল বাজাইয়া ছুটিল বর দেখিতে। সে-ও ছুটিল। গুড়ুম করিয়া তার পিঠে বিভা দিল এক কিল।

—যাচ্ছিস কোথা পোড়ারমুখী? বসে থাক্ পিঁড়ির উপর। একদিনে লোভ মেটে নি? শুভদৃষ্টি হয়ে যাক, তারপর দেখিস যত খুশী

বিয়ে আমি দেবোই। সুনীল কিছু জানে না; সে আমার ভোলানাথ।—সমস্ত ঐ বুড়োর কারসাজি।

ইতিমধ্যে বৃত্তান্ত শুনিয়া একদিন কেদার মিত্র মহাশয় স্বয়ং চলিয়া আসিলেন। উপর্য্যুপরি শোক ও বিপদের অবধি নাই, কিন্তু সে সব সত্ত্বেও তিনি এক কথার মানুষ; ভদ্রলোকের উপকারার্থ ঐ এগারোই তারিখেই তিনি রাজী। মাথা নাড়িয়া পরম গম্ভীরভাবে কেদার কহিলেন—নিশি রায়কে আমি জানি মশায়,—দু-এক হাজারের কর্ম্ম নয়। মিছে মিছি হয়রান হচ্ছেন। আমাকেও হয়রান করছেন।

—দেখা যাক।

সদয়গোপাল ও ভুবন চৌধুরী যাত্রা করিলেন। এবং মন্ত্রবলেই নিশি রায়ের গোছ-গাছের সমস্ত অসুবিধা দূর হইয়া গেল। আর কোন আপত্তি রহিল না। তারপর এক দিন গ্রামের মেয়েরা আনন্দ উৎসব সারিয়া যে যার বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, সদয়গোপাল ভুবনের বৈঠকখানায় নিবিষ্ট মনে ফর্দ্দ করিতে বসিয়াছেন, সেই সময়ে উমারাণী চুরি করিয়া দাদুর দেরাজ হইতে টাকার ছাপ-মারা চন্দন-মাখানো লগ্ন-পত্র টানিয়া বাহির করিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইল, ষ্টাম্প-আঁটা আর একখানি কাগজ।

অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক যুক্তি পরামর্শের পর ঠিক হইল, শুভকর্ম্ম কিছুতে ফেলিয়া রাখা যাইবে না; যেমন করিয়া হোক ঐ এগারোই এক দিনে দুইটি সারিতে হইবে। ভুবন চৌধুরী অনেক মুন্সিয়ানা করিয়া একখানা চিঠি লিখিলেন। পড়িয়া দেখিয়া সদয়গোপাল খুব খুসী হইলেন।

কিন্তু নিশি রায় অবিচল। জবাব আসিল, জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি ছাড়া কোন ক্রমে বিয়ে হইবার যো নাই। শ্রীমানের পরীক্ষার জন্য অসুবিধা তেমন নয়; দু-তিনটা দিনে এমন কি আর আসিয়া যাইবে। আসল কথা, ওদিককার গোছ-গাছ সমস্ত হইয়া উঠিবে না। বাড়ির মধ্যে প্রথম ছেলে, অতএব—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলে কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া ভুবন চৌধুরী কথাটা পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

সদয়গোপাল আরও রুখিয়া উঠিলেন—এগারোই খুকীর

এগারোই বৈশাখ পাশাপাশি দুই বাড়িতে পাল্লা দিয়া রসুনচৌকি বাজিতেছে। সদয়গোপালের স্ফূর্ত্তির আর অবধি নাই। সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্নার যেন প্লাবন বহিয়া যাইতে লাগিল। ঘটিয়াছেও বেশ—দুইটা লগ্ন। উমারাণী বয়সে একটু বড়, তার বিয়ে প্রথম লগ্নে হইবে। শেষের লগ্নে বিভার। ভুবনই বিবেচনা করিয়া এই রকম ব্যবস্থা করিয়াছেন। বরাসন এক জায়গাতেই; খাওয়া দাওয়া সমস্তই একত্র হইবে। সন্ধ্যার গাড়ীতে দুই বর আসিবে। আলো জালিয়া বাজনা বাজাইয়া সকলে ষ্টেশনে বর আনিতে গিয়াছে।

সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার ঝলমল করিয়া উমারাণী বসিয়া আছে। বিভা পলাইয়া আসিয়া পাশে বসিল। হাসিয়া হাসিয়া দু'জনে কি গল্প করিতেছে। এমনি সময়ে হঠাৎ

বাহির বাড়িতে আর্তনাদ। সদয়গোপাল ছুটিয়া আসিলেন। যেখানে তারা বসিয়াছিল সেইখানে আসিয়া উমার চুলের মুঠি ধরিয়া পিড়ি হইতে মাটিতে ফেলিলেন। নিজেও আছড়াইয়া পড়িলেন। চীৎকার করিয়া উঠিলেন—হতভাগী—

বিহ্বল উমারাণী; বিভা কাঁদিয়া উঠিল। সদয়গোপাল আকাশ ফাটাইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—হতভাগী, এত লোকে মরে তুই মরিস না কেন? ঘেন্না করে না? গলায় দড়ি দিগে যা, কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে পড়গে যা। যা—যা—বলিয়া সবলে তাহাকে ঠেলিয়া দিলেন।

বিভা আকুল হইয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল—কি হয়েছে দাদু, কি হয়েছে বলুন শিগগির—

আর কথা নাই। বৃদ্ধের সম্বিৎ নাই। সেইখানে এলাইয়া পড়িয়াছেন। ভুবন চৌধুরীও ছুটিয়া আসিয়াছেন, আরও কে কে আসিয়াছে। বিভা ঝাঁপাইয়া বাপের কোলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—কি হয়েছে? ও বাবা, কি হয়েছে বল আমায়—

ভুবন একবার উমারাণীর দিকে তাকাইলেন, পাষাণ প্রতিমার মতো স্থির নির্নিমেষভাবে সে বসিয়া আছে। বিভা বলিতে লাগিল—বলছ না কেন বাবা? বলো, বলো, পায়ে পড়ি তোমার—

ভুবন বলিলেন—সুনীল আসে নি। শুধু একলা প্রশান্ত—

একজনে প্রশ্ন করিল—গাড়ি ফেল করেছে?

—না গো। সর্বনাশ করেছে। বিয়ের সওদা করতে নিজেই কলকাতা যায়! তারপর আর পাত্তা নেই। আজকে বাপের কাছে হঠাৎ এই টেলিগ্রাম। ওরা এনে দিল।

টেলিগ্রামখানা সকলে পড়িল। ঘটনা সংক্ষিপ্ত। অবস্থাগতিকে সুনীলকুমার কলিকাতাতেই বিবাহ করিয়া বসিয়াছে। ঝোঁকের মাথায় একটা কথা দিয়া বসিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই হইতে ভাবিতে ভাবিতে সে পাগল হইয়া উঠিয়াছে। বাবা যেন তাকে ক্ষমা করেন। এবং উপসংহারে বাপকে আশ্বাস দিয়াছে, দু-এক দিনের মধ্যেই তাঁর পুত্রবধূর মুখদর্শন ঘটিবে।

সদয়গোপাল চেতনা পাইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন—আমার কি হবে? ও বাবা ভুবন, কি উপায় হবে আমার? জাত গেল, মান ইজ্জত গেল। ঐ হতভাগী কালামুখী বাপ খেয়েছে, মা খেয়েছে, আমার জাতকুল খেলে, আমাকে খেয়ে ফেল্লে—

যুবকের দল তখন ক্ষেপিয়া উঠিয়া চেঁচামেচি সুরু করিয়াছে—বেইমান। আমরা ত তাকে দেখেছি; ঠিক চিনব। গাড়ি পাহারা দেব—দেখি, বউ নিয়ে কবে যায়। হিড় হিড় করে নামিয়ে এনে আষ্টেপিষ্টে জুতো—

সদয়গোপাল উঠিয়া আলো ও লাঠি হাতে লইলেন।

—কোথায় যান?

—কেদারের কাছে। তার দয়ার শরীর, সে কথা ফেলবে না।

ভুবন চমকিয়া বলিলেন—কেদার মিত্তির?

—হাঁ বাবা। এক্ষুনি যাব। আজ রাত্রের মধ্যেই ঐ আপদ বিদায় করব। তোমরা কেউ যাবে সঙ্গে?

দু-একজন সঙ্গ লইল।

আশ্চর্য, উমারাণীর চোখে জল নাই। ধীরে ধীরে সে-ও উঠিয়া দাঁড়াইল। সেখানে তখন একেলা মাত্র বিভা। সভয়ে সে জিজ্ঞাসা করিল—কোথা যাচ্ছিস?

উমারাণী সহজ কণ্ঠে বলিল—যাই, একটু ঘুমিয়ে নি গে। কেদার মিত্তিরের খুব দয়া, নিশ্চয় আসবেন। এলে উঠব তারপর—

আর একটি কথাও বলিল না, বিছানায় গিয়া পাশ ফিরিয়া সে শুইয়া পড়িল। বিভা ডাকাডাকি করিতে বলিল—ঘুমুই ভাই। তোরও লগ্ন একটু পরে। তুই যা।

হয়ত চুপি চুপি কাঁদিয়া লজ্জা ও অপমানের ভার একটু লঘু করিবে। বিভা আর কিছু না বলিয়া উঠিল। তখন এ বাড়ী একেবারে নিস্তব্ধ, উৎসবের বাজনা কোলাহল সমস্ত থামিয়া গিয়াছে। এখানে ওখানে মুখোমুখি দু-চারি জন ফিসফিস করিয়া বোধ করি এইসব আলোচনাই করিতেছিল।

টং টং করিয়া ঘড়ি বাজিয়া যাইতেছে,—নয়, সাড়ে নয়, দশ...

মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা! কথাটা মনে করিয়া উমারাণীর

বুকের মধ্যে আনন্দ যেন নাচিয়া উঠিল। ওরা সব ঠাট্টা করিয়াছে, টেলিগ্রাম মিথ্যা,—তুমি নিশ্চয় আসিবে। কলিকাতা হইতে ঝলমলে বরের সজ্জা কিনিয়া রাজপুত্রের মত তুমি আসিতেছ।···এগারোটার গাড়ীর আর দেরী কত? দিগদিগন্ত ভেদ করিয়া বর লইয়া কলিকাতার গাড়ী ছুটিতেছে। কেদার মিত্তিরের আগেই পৌছিতে হইবে। এঞ্জিনের গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছে—একশো মাইল, হাজার মাইল, দশ হাজার মাইল, হাউই যত জোরে আকাশে ওঠে, আকাশের উল্কা যত জোরে ছুটিয়া আসে—

সহসা উমারাণীর মনে হইল, শিয়রের ধারে আসিয়া চুপিচুপি আদর করিয়া বর ডাকিয়া উঠিল উমারাণী, উমারাণী—

জবাব সে দিবে না। উপুড় হইয়া জোর করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িল। তোমার সঙ্গে কথা সে আজ কিছুতে কহিবে না। তুমি যাও—

—তোমার পরীক্ষার পড়া নিয়ে থাক তুমি। গোছগাছ হয় ত সমস্ত এখনো হয়ে ওঠেনি। কেন এই পাড়াগাঁয়ের বন জঙ্গলে কষ্ট করে এলে? কেন—কেন?···

দাদুর চোখের ঘুম গেছে কত দিন থেকে। আমার কিছু নয়, আমার বয়ে গেছে,—আমি খুব ঘুমুই।···দাদু কি করেছে জান?

বর জিজ্ঞাসা করিল—কি?

এই বাড়িঘর সমস্ত বিক্রি করেছে ভুবন চৌধুরীর কাছে। দলিল আর লগ্নপত্তোর একসঙ্গে দেরাজে রয়েছে। আমার দাদুকে ওরা পথে বের করে দেবে।

—রাণী, উমারাণী!

মৃদু হাসিয়া, হাসিতে গিয়া মুখখানি রাঙা করিয়া দেবতার মতো পরম সুন্দর বর কত কাছে আসিয়া বসিয়াছে। চোখ মুছাইয়া দিয়া কোমল স্নেহে ধীরে ধীরে মাথাটি কোলের উপর লইল। কোলের উপর লইয়া তারপর—

—না, না, না। খুব চিনেছি তোমায়। সময় হল এতদিন পরে। তুমি যাও—তুমি যাও—

চুপচাপ। আর কিছু নাই। চমকিয়া উমারাণী উঠিয়া বসিল। চৌধুরী বাড়ির কোলাহল অল্প অল্প কানে আসিতেছে। সে কান পাতিয়া রহিল। আবার যেন শুনিল, বৈঁচিবনের আবছায়া হইতে সেই ডাক অতিশয় মৃদু হইয়া আসিতেছে—

—রাণী, উমারাণী গো—

স্বপ্নাচ্ছন্ন কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইল। দিগন্তবিসারী জ্যোৎস্নার সমুদ্রে নৈশ বাতাস আজ তরঙ্গ তুলিয়াছে, তরঙ্গে তরঙ্গে সেই ডাক ক্ষীণ—ক্ষীণতর—অস্ফুটতম হইয়া দূর হইতে দূরে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। সুপারীবনের ফাঁকে ফাঁকে, শুকনা ঝিলের পাশ দিয়া, উলুক্ষেত পার হইয়া সেই ডাক শুনিতে শুনিতে উমারাণী রেললাইনের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। যতদূর অবধি দেখা যায় লোহার পাটি ঝিকমিক করিতেছে। অশ্রুর উৎস খুলিয়া আকুল হইয়া সেইখানে সে কাঁদিতে বসিল।

চৌধুরী বাড়িতে ভারী গণ্ডগোল। বাজনা বাজিতেছে, বাজি পুড়িতেছে, লোকজনের হাঁকডাক। লগ্নের আর দেরী নাই।···হঠাৎ এ বাড়িতেও রসুনচৌকি বাজিয়া উঠিল। কেদার মিত্র আসিলেন নিশ্চয়। দয়ার শরীর, পুত্র-শোকের মধ্যেও পরের বিপদ অবহেলা করিতে পারেন নাই।

দুই চক্ষের সমস্ত দৃষ্টিশক্তি পুঞ্জিত করিয়া উমারাণী তখন দেখিতেছে, কোথায় রেলগাড়ী? দূরে—অনেকদূরে যেন একটুখানি আলোর মতো। লগ্ন যে আসিয়া গিয়াছে। গাড়ীর এত দেরী!

বাড়ির মধ্যে খোঁজাখুঁজি পড়িয়া গিয়াছে। চাপা গলায় হাঁকডাক চলিয়াছে। সদয়গোপাল অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন—কোথায় গেল খুকী, ওরে তোমরা দেখাদকি একবার।·· লণ্ঠন লইয়া কারা যেন এদিকে আসিতেছে।...আর উমার কাণ্ডজ্ঞান রহিল না। ধরিয়া ফেলিল বুঝি। পাগল হইয়া লাইন বহিয়া সে ছুটিল। খোয়া তোলা পথ—দুইদিকে লোহার সীমানা। আঘাতে আঘাতে পা কাটিয়া রক্তের ধারা বহিল। তবু ছুটিয়াছে। যেদিক দিয়া কলিকাতার গাড়ী আসে উন্মাদিনীর মতো দুই ব্যাকুল বাহু সেদিকে প্রসারিত করিয়া সে কাঁদিতে লাগিল—তুমি এসো—এসো—আর কত দেরী করছ, এসো—তুমি—

না, দেরী নাই আর। সহসা ষ্টেশনে সিগন্যালের ডগমগে লাল আলো সুনীল স্নিগ্ধ হইয়া চিরদুঃখিনী মেয়েটিকে অভয় দিল। সুতীব্র সার্চলাইটে চারিদিক উদ্ভাসিত

রিয়া বিপুল সমারোহে বর আসিতেছে। তারপর কি য়া গেল; সকল দুঃখ ভুলিয়া পরম আরামে উমারাণী ইখানে শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া দেখিতে লাগিল, লোর বন্যায় সমস্ত একাকার করিয়া গাড়ী ছুটিতেছে, থিবী কাঁপাইয়া রাত্রির নিঃশব্দতা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া হাজার হাজার মাইল বেগে যেন বড় আদরের আহ্বান ছুটিয়া আসিতেছে—উমারাণী, উমারাণী!

সেই বন্ধুর রাস্তা, লোহার লাইন, অগ্নুদ্গারী প্রত্যাসন্ন এঞ্জিন একমুহূর্ত্তে তার কাছে পরম মনোহর হইয়া উঠিল। নিশ্চিন্ত আলস্যে উমারাণী চোখ বুজিল।

আদি মানব ও আসল মানব

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়, এম্ এ, বি এল

ত চৈত্র মাসের প্রবাসীতে "নর ও বানর" শীর্ষক প্রবন্ধে াদিম নর-কল্প জীবের বা "প্রাক্‌মানবের" (Pre-manএর) ং তৎপরবর্ত্তী "গোড়ার মানুষের" (Proto-manএর) মান্য পরিচয় দিয়েছি। এই প্রবন্ধে তাদের পরবর্ত্তী "আদি নব" (Homo Primigenius) এবং তারও পরের আধুনিক" বা "আসল মানব" (Homo recens বা Homo apiens) সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব।*

আমরা দেখেছি যে, ক্রমবিকাশবাদীরা "বানর হ'তে ানুষের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করেন," এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। ামরা দেখেছি যে, তাঁরা ভূস্তর-প্রোথিত কঙ্কালাবশেষ র্য্যালোচনা ক'রে কেবলমাত্র এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তীয়ক যুগের (Tertiary period-এর) ঊষাধুনিক Eocene) অন্তর্যুগে, যখন মানুষও ছিল না, বন-মানুষও ছল না, বানরও ছিল না, কেবলমাত্র তাদের সকলের পূর্ব্বজ -বিশিষ্ট-মনুষ্যকল্প গোষ্ঠী (undifferentiated generaized anthropoid stock) ছিল, সেই কালে বাহ্যপ্রকৃতির মধিক কঠোর প্রভাব ও পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঙ্গে মিলিয়ে চলবার উপযোগী দৈহিক ও বৈজিক (germinal) রিবর্ত্তন সাধন করতে না পেরে, ঐ মনুষ্য-কল্প গোষ্ঠীর এক দল ক্রমোন্নতির সোজা পথে অগ্রসর হ'তে অসমর্থ হ'ল এবং অবান্তর পথে গিয়ে আটকে থাক্‌লো ও ক্রমে পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভাবে অন্য প্রকারের দৈহিক ও বৈজিক পরিবর্ত্তন লাভ ক'রে 'বানর' হয়ে পড়ল। আবার আধুনিক বন-মানুষদের পূর্ব্বজেরাও অ-বিশিষ্ট-মনুষ্যকল্প গোষ্ঠীর সঙ্গে অভিন্ন ভাবে আরও কিছু দূর সোজা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে পরিবর্ত্তনশীল নৈসর্গিক অবস্থার সঙ্গে আর যুঝতে না পেরে ক্রমে পথভ্রষ্ট হ'য়ে অবান্তর পথে স'রে দাঁড়াল ও পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভাবে বিভিন্ন বনমানুষ (anthropoid apes) জাতিতে পরিণত হ'ল। কিন্তু অ-বিশিষ্ট মানবকল্প গোষ্ঠী অধিকতর উদ্যমশীল নাছোড়বন্দা জীবগুলি পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক অবস্থার অনুরূপ আপনাদিগকে প্রাকৃতিক ও ঐন্দ্রিয়িক নির্ব্বাচনের (natural and organic selection-এর) দ্বারা প্রয়োজনীয় দৈহিক ও বৈজিক পরিবর্ত্তন (germinal variations) হাসিল ক'রে মানবীয় শাখা (Humanoid stem) রূপে উন্নতির সোজা পথে ক্রমিক অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল।

গত মাসের প্রবন্ধে আমরা আরও দেখেছি যে, তৃতীয়ক যুগের অন্ত্যাধুনিক (Pliocene) অন্তর্যুগে এক দল জীব অ-বিশিষ্ট-মানবকল্প গোষ্ঠী হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে সোজা উন্নতির পথ হারিয়ে মানবীয় শাখার একটি ফ্যাকড়া বা প্রশাখা (offshoot) রূপে কিছু দূর চ'লে গিয়ে যব-দ্বীপের টিনিল মানব (Trinil man বা *Pithecanthropus Erectus*) জাতীয় প্রাক্-মানবে পরিণত হ'ল এবং কালক্রমে লয়প্রাপ্ত হ'ল। টিনিল মানবের মস্তিষ্ক-গহ্বরের পরিমাণ (cranial

* লাটিন 'হোমো সেপিয়েন্স' শব্দ দুটির অর্থ "বুদ্ধিশক্তিবিশিষ্ট মানুষ"।

capacity) ও অন্যান্য লক্ষণ দেখে উহাকে সম্পূর্ণ মনুষ্য-পদ-বাচ্য নির্দ্দেশ করা যায় না। যদিও ইহা সোজা হ'য়ে মানুষের মতন দুই পায়ে চলতে পারত, এবং সম্ভবতঃ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অপর আঙ্গুলগুলির উপর ফেলে দ্রব্যাদি ধরতে পারত, তবু এই জাতীয় নর-প্রায় জীবের মানুষের মতন বাক্-শক্তির এবং বুদ্ধি-শক্তির সম্পূর্ণ স্ফুরণ হয় নি। এজন্য ইহাদিগকে প্রাক্-মানব বলা যেতে পারে। ইংলণ্ডের সাসেক্স জেলার পিল্টডাউন (Piltdown) গ্রামে সম্ভবতঃ অন্ত্যাধুনিক (Pliocene) অন্তর্যুগের ভূস্তরে প্রাপ্ত পিল্টডাউন-মানব (*Eaonthropus Dawsonii* বা Piltdown man), যদিও যবদ্বীপে প্রাপ্ত ট্রিনিল মানব অপেক্ষা অধিকতর পরিণত অবয়ব-বিশিষ্ট ছিল, তবুও ইহাকেও সম্পূর্ণ মনুষ্যপদবাচ্য বলা যায় না। এরাও প্রাক্-মানবের মধ্যে পরিগণিত হ'তে পারে। জার্মানি দেশের হাইডেলবার্গ শহরের নিকটস্থ ময়ার (Mauer) গ্রামে অন্ত্যাধুনিক অন্তর্যুগের শেষভাগের ভূস্তরে কিংবা পরবর্ত্তী উৎস্তরে প্রাপ্ত চিবুক-হীন চোয়ালবিশিষ্ট কঙ্কালাবশেষ হ'তে যে হাইডেলবার্গ মানুষের (*Homo heidelbergensis* বা *Palaeanthropus*এর) সন্ধান পাওয়া যায়, তাকেও ঐ প্রাক্-মানব দলভুক্ত করা যেতে পারে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় টাঙ্গস্ (Taungs) রেলওয়ে ষ্টেশন হ'তে সাত মাইল দূরে বাক্সটন (Buxton) চূণের খনির (limestone quarryর) নিকট যে নর-প্রায় জীবের মাথার খুলি পাওয়া গেছে, তাহা স্যর আরথার কীথ (Sir Arthur Keith) প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে প্রাক্-মানবের নয়, একটি উন্নত বন-মানুষের মাথা ব'লে স্থির করা হয়েছে ও ইহার অষ্ট্রেলোপিথেকস্ (Australopithecus) নাম রাখা হয়েছে।

অ-বিশিষ্ট-নরকল্প গোষ্ঠী হ'তে কোন্ দেশে প্রথম মানবীয় গোষ্ঠীর উদ্ভব হ'ল, ইহা নিশ্চিত নির্দ্ধারণ করার উপযোগী উপকরণ এখনও পাওয়া যায় নি। সুতরাং এ-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন মত দেখা যায়। কেহ কেহ মধ্য-এশিয়া, কেহ বা উত্তর-ইউরোপ ও কেহ দক্ষিণ-আফ্রিকা মানবীয় গোষ্ঠীর উদ্ভবস্থান ব'লে নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু যতদূর দেখা যায়, মধ্য এশিয়া বা তার নিকটবর্ত্তী স্থানেই মানুষের উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা বেশী ব'লে মনে হয়। তৃতীয়ক যুগে মধ্য-এশিয়া খুব উর্ব্বর ও জঙ্গলময় দে[শ] ছিল। যেখানে এখন হিমালয় পর্ব্বত ও তিব্বত দেশ বর্ত্তমা[ন] সেখানে তখন টেথিস্ সমুদ্র (Tethys sea) ছিল। ক্র[মে] ঐ যুগে মধ্যভারতের ও টেথিস্ সমুদ্রের মাঝে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী মাথা ঠেলে উঠল। কাজেই ঐ সমুদ্র হ'তে যে বা[ষ্প] উঠে মেঘ হয়ে বৃষ্টিদ্বারা মধ্য-এশিয়ার ভূমিকে উর্ব্বর করতো, [তা] আটকে দিল ও সেই বৃষ্টির গতি হিমালয়ের দক্ষিণে চালি[ত হ'ল।] কাজেই মধ্য-এশিয়া ক্রমে নর-কল্প জীবের বাসে[র] অযোগ্য হ'য়ে উঠল। হরিৎ বর্ণ বনরাজির স্থলে প্রথ[মে] লম্বা লম্বা ঘাস জন্মাতে লাগলো; পরে তাও লুপ্ত হয়ে যাওয়া[য়] মধ্য-এশিয়া মরুভূমিতে পরিণত হ'ল। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্ত[নে] আত্মরক্ষায় অসমর্থ হ'য়ে অনেকজাতীয় পশুপক্ষী লোপ পেল আর কোনও কোনও জাতীয় পশুপক্ষী প্রয়োজনীয় দৈহি[ক] পরিবর্ত্তন হাসিল ক'রে রক্ষা পেল। জীবের খাদ্য বদ[লে] গেল। অ-বিশিষ্ট-নরকল্প গোষ্ঠী, যাহা এতদিন প্রধানত[ঃ] ফলমূল ভক্ষণ ক'রত ও গাছে গাছে বেড়াত, এখন তাদে[র] বাসভূমি গাছশূন্য হওয়ায়, মাটিতে দুই পায় হাঁটতে অভ্য[স্ত] হ'তে লাগল; ও ক্রমে হাতের অন্য আঙ্গুলগুলার সাহায্যে কা[জ] করবার উপযোগী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ (opposable thumb) হাসিল ক'[রে] পিথেকানথ্রোপাস বা পিল্টডাউন মনুষ্য প্রভৃতির রূপ প্রা[প্ত] হ'য়ে "প্রাক্-মানবে" পরিণত হ'ল ও নানা দেশে ছড়ি[য়ে] পড়লো। হিমালয়ের দক্ষিণে যে উপসাগর হয়েছিল, ত[া] ক্রমে পলিমাটিতে ভরে গেল ও ক্রমে সঙ্কুচিত হ'য়ে কেব[ল] একটি প্রকাণ্ড নদে পরিণত হ'ল। ঐ নদ তখন বর্ত্তমা[ন] সিন্ধুনদের মুখ হ'তে গঙ্গার মুখ পর্য্যন্ত,—অর্থাৎ আরব্যোপ সাগর হ'তে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। কালক্রমে তাও অনেকটা ভরাট হ'য়ে সিন্ধু উপত্যকা ও গঙ্গাতীরে[র] সমতল ভূমি গড়ে উঠল, ও আরও ভরাট হয়ে পঞ্জা[ব] বা পঞ্চ-নদের দেশ, উত্তর-পশ্চিমের দোয়াব, বিহারে[র] পলিমাটিপূর্ণ সমতল ভূমি ও বাঙ্গলার ব-দ্বীপ তৈয়ের হ'ল এব[ং] তাদের মধ্যে সিন্ধুনদ ও তার শাখাগুলি, এবং গঙ্গা ও যমু[না] প্রবাহিত হ'তে লাগল। এই সব কারণে মধ্য-এশিয়া হ'তে দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে যাতায়াতের পথ সুগম হ'ল।

মধ্য-এশিয়াতে মানবের উদ্ভব হওয়ার সপক্ষে অন্যান্য যুক্তি[র] মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য যুক্তি এই যে, প্রথমতঃ, সব চে[য়ে]

আদিম নর-প্রায় জীবে — অর্থাৎ, পিথেকানথ্রোপাস ইরেক্টাস বা টিনিল মানবের কঙ্কালাবশেষ এশিয়ারই যব-দ্বীপে (Javaতে) পাওয়া গেছে; দ্বিতীয়তঃ এশিয়াতে মানবের তিনটি প্রধান শাখাই (শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণ-ত্বক মানব) বর্ত্তমান; তৃতীয়তঃ, যে সব ভাষা একস্বর-শব্দ-বহুল (monosyllabic), যে-সব ভাষার শব্দরূপ ও ধাতুরূপ হয়, এবং যে-সব ভাষায় মূল শব্দসমূহ অর্থ বা রূপের পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে সমাস-বদ্ধ হয়, ভাষার এই তিন প্রধান শাখাই এশিয়ায় ব্যবহৃত হয়; চতুর্থতঃ, সকল প্রাচীনতম মানব সভ্যতার জন্মস্থান এশিয়াতে; পঞ্চমতঃ, আধুনিক মানব জাতির (Homo sapiens এর) সর্ব্বপ্রথমের প্রধান ইউরোপীয় প্রতিনিধি ক্রোমাগনন (Cromagnon) জাতিরও কোনও কোনও দৈহিক আকৃতিতে মধ্য-এশিয়াবাসী মানবের আকৃতির আভাষ পাওয়া যায়; এবং ষষ্ঠতঃ, অধিকাংশ গৃহপালিত জন্তুরও উৎপত্তিস্থান এশিয়াতেই অবস্থিত।

সে যা হোক, এ-পর্য্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রমাণ যত দূর পাওয়া গেছে, তার সাহায্যে মানবের অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের ইতিহাস যতটা অনুমান করা যায়, তা এইরূপ। অ-বিশিষ্ট মানবীয় গোষ্ঠী সোজা উন্নতির পথে উঠতে উঠতে অ-বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হ'ল। কিন্তু তাদেরও এক দলের পর আর এক দল খানিকদূর এগিয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে অবান্তর পথে এক একটি ফ্যাকড়া বা প্রশাখা রূপে মানবীয় শাখা হ'তে বিচ্যুত হ'তে লাগলো এবং কালক্রমে লয়প্রাপ্ত হ'ল। এইরূপেই পেকিং মনুষ্য (Sinanthropus Pekinensis) এবং রোডেসিয়ান মনুষ্য (Homo Rhodesiensis) প্রধান মানব শাখা হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে সোজা ক্রমোন্নতির পথ হারিয়ে ফেললো, এবং অবান্তর পথে প্রশাখারূপে কিছু বৃদ্ধি পেয়ে অবশেষে ক্রমে লোপ পেল। সম্ভবতঃ তৃতীয়ক যুগের (Tertiary periodএর) অন্তে কিংবা চতুর্থক যুগের (Quaternary periodএর) প্রারম্ভেই এই দুই জাতিরই লয় হয়। ইহাদিগকে সকলের "গোড়ার মানুষ" বলা যেতে পারে। এদের হিংস্রপশুভাবাপন্ন (brutal-looking) আকৃতি এবং এদের নির্ম্মিত উষা-শিলা (Eoliths) বা প্রাথমিক পাথরের অস্ত্রের কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি। এই উষা-শিলাগুলির গঠনভেদে রয়টিলিয়ান (Reutelian), ম্যাফলিয়ান (Mafflian) এবং মেসভিনিয়ান (Mesvinian) নামকরণ করা হয়েছে।

এই গোড়ার মানব-জাতি যদিও মানব-শাখার প্রথম প্রশাখা ব'লে পরিগণিত হয়, তবুও আধুনিক মানব (Homo recens) বা আসল মানব (Homo sapiens) হ'তে দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষে এদের স্থান অনেক নীচে। এদের কঙ্কালাবশেষ এবং হাতের তৈরি অস্ত্রাদি ইহার প্রমাণ।

বস্তুতঃ এই 'গোড়ায় মানবে'র আবির্ভাবের অনেক পরে অ-বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠীর আর একটি অধিকতর পরিপুষ্ট ও উন্নত প্রশাখা রূপে আর-এক-জাতীয় মানুষের হঠাৎ অভ্যুদয় দেখা যায়। অত্যাধুনিক যুগের (Pliocene age-এর) শেষভাগ হ'তে চতুর্থক যুগের (Quaternary period-এর) অন্ততঃ তৃতীয় তুষার অন্তর্যুগে (Third glacial age) ও তৃতীয় অন্তস্তুষার অন্তর্যুগ (Third Inter-glacial age) পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল পৃথিবীর নানা দেশে এই জাতীয় মানবের প্রাদুর্ভাব হয়। এই জাতীয় মানবের কঙ্কালাবশেষ প্রথমে প্রুসিয়া দেশের ডুসেলডরফ (Dusseldorf) শহরের নিকটবর্ত্তী নিয়াণ্ডারথাল (Neanderthal) নামক গিরিবর্ত্মে (ravineএ) তুষার-কালে (Pleistocene) ভূস্তরে ডাক্তার ফুলরট (Dr. Fuhlrott) ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। এই স্থান হ'তেই ইহার নামকরণ হয়। এই জাতির মাথা একটু চাপা এবং ধড়ের উপর ঘাড় ও মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়েছে; ভুরুর উপরের হাড় (eye-brow ridges) অনেকটা উঁচু (beetling), কপাল খোদল (retreating forehead), খুব মস্ত চোয়াল (massive cheek-bones) জঙ্ঘা দেশ একটু বাঁকা (curved), ঠ্যাং দুটি ধড়ের তুলনায় একটু লম্বা; আর লোকগুলি কিছু বেঁটে — ৫ ফুট ৪ ইঞ্চির বেশী লম্বা নয়। মোটের উপর সব চেয়ে গোড়ায় মানুষদের মতন ইহাদেরও খানিকটা পশুভাবাপন্ন (brutal-looking) চেহারা। যদিও আধুনিক মনুষ্যজাতির (*Homo sapiens*দের) মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার খর্ব্বকায় অসভ্য আদিমনিবাসীদের সঙ্গেই নিয়াণ্ডারথাল মানবের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, এবং যদিও কোনও কোনও নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মনে করেন যে, নিয়াণ্ডারথাল মানবের রক্ত অষ্ট্রেলিয়ানদের

ধমনীতে কিছু থাকিতে পারে, তবু এই দুই জাতি শারীরিক গঠনে কত দূর বিভিন্ন, তাহা এই প্রবন্ধের চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রায় সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে এই নিয়াণ্ডারথাল জাতিকে আধুনিক মানব-জাতি হইতে বিভিন্ন জাতি ব'লে স্থির করেছেন এবং নিয়াণ্ডারথাল মানুষকে "আদিম মানব" (*Homo Primigenius*) ও তৎপরবর্ত্তী মানব বা আধুনিক মানবকে "আসল মানব" (*Homo sapiens*) নাম দিয়েছেন।

আসল বা আধুনিক মানব-জাতির মধ্যে যেমন তিন রকমের মাথার গড়ন দেখা যায়,—গোল ধরণের মাথা (brachy-cephaly), লম্বাটে মাথা (dolichocephaly) এবং মাঝারি ধরণের মাথা (mesocephaly), নিয়াণ্ডারথাল মানবের মধ্যেও সেইরূপ তিন বিভিন্ন ধরণের মাথা-বিশিষ্ট লোক দেখা যায়; যেমন ক্রাপিনায় (Krapinaয়) প্রাপ্ত দশটি নিয়াণ্ডারথাল কঙ্কালের গোল মাথা, স্পাই (Spy) এবং ডুসেলডরফে (Dusseldorfএ) প্রাপ্ত কঙ্কালের লম্বাটে মাথা এবং জিব্রাল্টারে প্রাপ্ত কঙ্কালের মাঝারি ধরণের মাথা। ইহাতে অনুমান হয় যে, আধুনিক মানবের মধ্যে যেমন লম্বাটে মাথা-বিশিষ্ট (long-headed) নর্ডিক (Nordic) ও মেডিটারেনিয়ান (Mediterranean) প্রভৃতি জাতি, গোল ধরণের মাথা-বিশিষ্ট (round-headed) আলপাইন (Alpine), মঙ্গোলিয়ান (Mongolian) প্রভৃতি জাতি, এবং মাঝারি ধরণের মাথা-বিশিষ্ট (Medium-headed) আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান জাতি প্রভৃতি দেখা যায়, ঐ 'আদি-মানব' জাতিও তেমনি নানা জাতিতে বিভক্ত ছিল।

এই "আদিম মানব" জাতির কঙ্কালাবশেষগুলির সঙ্গে তাদের হস্তনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ও অন্য যে-কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা হ'তে জানা যায় যে, ইহারা পূর্ব্ববর্ত্তী "গোড়ার মানুষ" (Proto-man)দের চেয়ে কেবল যে দৈহিক গঠনে উন্নত হয়েছিল তা নয়, সভ্যতার সিঁড়িতে কয়েক ধাপ উপরে উঠেছিল। এরা আগুনের ব্যবহার জানতো; মাংসাদি বোধ হয় ঝল্‌সে খেতে জানতো; মৃত আত্মীয়দের যত্নের সঙ্গে কবর দিত এবং মৃতের কবরে তাদের অস্ত্রাদিও দিয়ে দিত। সুতরাং অনুমান করা যায়, তারা পরলোকে বিশ্বাস করতো। ইহাদের অস্ত্রগুলি পাথরের তৈরি

এই জাতির নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র যা-কিছু পাওয়া গেছে তার মধ্যে অবশ্য তেমন বৈচিত্র্য নেই। একটা পাথরের ঢেলা নিয়ে অন্য পাথর দিয়ে ভাঙতো আর পাশগুলি (sides) ভেঙে (chipping) আগাটা ধার করতো; পরবর্ত্তী নূতন প্রস্তর-যুগে (Neolithic ageএ) যেমন পাথর ভেঙে টুকরো ক'রে এক একটি টুকরোকে ইচ্ছা ও প্রয়োজন মতন বিভিন্ন আকার দিয়ে অন্য পাথরে ঘষে পালিশ করা হ'ত, এরা তেমন করতে শেখেনি। পুরাতন প্রস্তর-যুগ (Palaeolithic age)কে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—নিম্ন ও ঊর্দ্ধ। যদিও নিয়াণ্ডারথাল-মানবের অস্ত্র-শস্ত্রে বিশেষ বৈচিত্র্য ছিল না, তবু তাহাদের বহুসহস্রবর্ষব্যাপী স্থিতিকালের মধ্যে অস্ত্রের গঠনভঙ্গী যে ক্রমিক উন্নতি সাধিত হয়েছিল, তাহা তাহাদের নির্ম্মিত ষ্ট্রেপিয়ান (Strepyan), চেলিয়ান (Chellian), আসোইলিয়ান (Acheulian) এবং মুষ্টিরিয়ান (Mousterian) অস্ত্রগুলি একের সহিত অপরের তুলনা করলে বুঝতে পারা যায়। এগুলি সব নিম্নের পুরাতন প্রস্তর-যুগের (Lower palaeolithic)।

এই নিয়াণ্ডারথাল জাতি সম্ভবতঃ উত্তর-আফ্রিকা হ'তে ইউরোপে যায়; উত্তর-পশ্চিমে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত এই জাতির কঙ্কালাবশেষ ও হস্তনির্ম্মিত অস্ত্রাদি পাওয়া গেছে। পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইন দেশের গ্যালিলি প্রদেশেও ইহাদের কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষে যদিও নিয়াণ্ডারথাল মানবের কঙ্কালাবশেষ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি, তাদের নির্ম্মিত চেলিয়ান ও মুষ্টেরিয়ান অস্ত্রের অনুরূপ পুরাতন প্রস্তর-যুগের অস্ত্র (palaeoliths) ভারতের নানা স্থানে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে, পাওয়া যায়; বর্ত্তমান লেখক এবং আরও কেহ কেহ এরূপ অস্ত্রাদি পেয়েছেন; এবং ভারতের কোনও কোনও যাদুঘরে কিছু নমুনা রক্ষিত আছে।

কোনও কোনও নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মনে করেন যে, তুষার যুগের (Glacial ageএর) শেষ ভাগে যেমন ইউরোপে তুষার-নদী (glacier)গুলি উত্তরে স'রে যেতে লাগলো, পৃথিবীর জলবায়ু, উদ্ভিদ ও জীব-জগতের পরিবর্ত্তন হ'তে লাগলো, মানুষের চেহারাও তেমনি বদলে গিয়ে নিয়াণ্ডারথাল মানবেরই বংশধরেরা তুষার-যুগের পরবর্ত্তী কালে (Post glacial periodএ) অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায় ও সুশ্রী অওরিগনেশিয়ান (Aurignacian) ও ক্রোম্যাগনন

স্পেন দেশে প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানুষদের কাল্পনিক ছবি

(Cromagnon) প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হ'ল। কিন্তু অধিকসংখ্যক নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মতে এই নিয়াণ্ডারথাল জাতিও অবশেষে প্রকৃতির সঙ্গে জীবনসংগ্রামে পরাস্ত হয়ে ক্রমে লোপপ্রাপ্ত হয়। তবে হয়ত অষ্ট্রেলিয়া দেশের অসভ্যদের মধ্যে তাহাদের কিছু রক্তসংমিশ্রণের চিহ্ন বর্ত্তমান। তুষার-যুগের পরবর্ত্তীকালে ইউরোপে যে অওরিগনেসিয়ান ও ক্রোমাগনন প্রভৃতি জাতির আবির্ভাব হ'ল এবং অন্যান্য নামে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ল, তারা নূতন মানব-জাতি (Neanthropic Man)। নিয়াণ্ডারথাল মানুষ জীববৃক্ষের মানবশাখার প্রশাখামাত্র ছিল; প্রধান মানব শাখা আরও পরিপুষ্ট হয়ে ঊর্দ্ধে উঠে শেষে এই নূতন মানব-জাতিতে পরিণত হ'ল। এই ক্রোমাগনন প্রভৃতি নূতন মানুষের (*Neanthropic Man*এর) চেহারা আধুনিক মানুষের (*Homo recens* বা *Homo sapiens* এর) অনেকটা অনুরূপ, যদিও তত সুশ্রী ও সুন্দর নয়। বস্তুতঃ এদেরই বংশধরেরাই আধুনিক মানব (Homo sapiens) হয়ে দাঁড়াল। এদের মাথার খুলি উঁচু, নিয়াণ্ডারথাল-মানবের মতন চ্যাপ্টা নয়; ভুরুর হাড় নিয়াণ্ডারথালদের মতন উঁচু (prominent বা bulging) নয়, দাঁতের নীচের মাড়ি (lower jaw) ছোট, দাঁতও ছোট, এবং লম্বায় ক্রোমাগনন জাতি দীর্ঘকায়।

তুষার-যুগের পরবর্ত্তী নাতিশীত নাতিগ্রীষ্ম আবহাওয়ায় এই সব জাতিদের জীবনসংগ্রামের দায় অনেক হালকা হ'য়ে গেল; এবং সভ্যতার সিঁড়িতে এগিয়ে উঠবার অনেক বেশী সুবিধা ও সময় এরা পেল। নানা রকমের সুন্দর সুন্দর গঠনের পালিশ করা অস্ত্র এই পুরাতন প্রস্তর-যুগের শেষভাগে (Upper Palaeolithic ageএ) প্রস্তুত হ'তে লাগলো। ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে আজকাল আমরা তৎকালীন সভ্যতার স্তর বা শ্রেণী বিভাগ করেছি। প্রথম, অওরিগনেসিয়ান সভ্যতা (Auriguacian Culture); সেই আদিম সভ্যতার নিদর্শন-স্বরূপ প্রস্তরের বহুবিধ সুন্দর অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া পশ্চিম-ইউরোপের পর্ব্বতগুহার গাত্রে বা ছাদে আঁকা অনেক জীবন্ত (life-like and realistic) রঙীন চিত্র, বিশেষতঃ শিকারের, শিকারীর ও বন্য পশুপক্ষীর, পাওয়া গেছে। ভারতে মধ্যপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী ছত্তিশগড়ের অন্তর্গত রায়গড় রাজ্যে সিঙ্গানপুর গ্রামের পর্ব্বতগুহায় সেইরূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের সিঙ্গানপুর ষ্টেশন থেকে প্রায় এক মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। এই প্রবন্ধ-লেখক সিঙ্গানপুরের সেই পাহাড়ের নীচে অওরিগনেসিয়ান শিলা-অস্ত্রের অনুরূপ (Aurignacian flakes) কয়েকটি পেয়েছেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মিরজাপুর জেলার ছাতা গ্রামের অনতিদূরে কাইমুর পর্ব্বতশ্রেণীর কয়েকটি গুহার (cave sheltersএ) ও পাহাড়ের গায় যে-সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক চিত্র দেখা যায়, সেগুলি নূতন প্রস্তর-যুগের হওয়া সম্ভব। ভান্দরিয়া নদীর তীরে লিখুনিয়া গুহার নিকট নূতন প্রস্তর-যুগের শিলা-অস্ত্র পাওয়া গেছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, অনুসন্ধানের অভাবে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক কালের নরকঙ্কালাবশেষ এখনও বিশেষ পাওয়া যায় নি।

ইউরোপে অওরিগনেসিয়ান সভ্যতার প্রাদুর্ভাব কালে

যে গ্রিমালডি জাতির কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গেছে, তারা আফ্রিকার আধুনিক নিগ্রোজাতির পূর্ব্বপুরুষদের জাতি বলিয়া অনুমিত হয়। আর ফারফুজ (Furfooz) নামক গোলমস্তিষ্কবিশিষ্ট (brachycephalic) যে জাতির কঙ্কালাবশেষ ইউরোপে পাওয়া গেছে, তারা সম্ভবতঃ

রোডেশিয়ান মানব দেখিতে সম্ভবতঃ এইরূপ ছিল

এশিয়ার মোঙ্গোলিয়ানদেরই পূর্ব্বপুরুষদের জাতি ছিল ব'লে মনে করা হয়।

অওরিগনেসিয়ান সভ্যতার (Aurignacian cultureএর) পরে ইউরোপে ক্রোমাগনন জাতির পর্য্যায়ক্রমে সলুউট্রিয়ান (Solutrean) ও তার পর ম্যাগডেলেনিয়ান (Magdalenian) সভ্যতার (cultureএর) অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। সলুউট্রিয়ান সভ্যতাকালের সুন্দর লরেল পাতার নমুনায় নির্ম্মিত (laurel-leaf pattern) শিলা-অস্ত্র দেখিতে বড় সুন্দর। তার পরের ম্যাগডেলেনিয়ান সভ্যতা-প্রসূত আরও সুন্দর অস্ত্রশস্ত্র ও ইউরোপের পর্ব্বত-গুহায় অঙ্কিত চিত্রগুলি আরও মনোরম। এই সময় হাতীর দাঁতের ও হরিণের শিঙের দ্বারা সুন্দর বল্লম বা বর্শা ও তীর তৈরি হ'ত এবং তার উপর সুচিক্কণ কারুকার্য্য করা হ'ত। ইহাদের গোরস্থানে সুন্দর সুন্দর অস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি পাওয়া যায়, এবং কোনও কোনও শব এক প্রকার লাল মাটির (red ochreএর) ভিতর পোঁতা হ'ত।

এর পরে কিছু দিন মধ্য-প্রস্তর-যুগ (Mesolithic culture) আরম্ভ হ'ল এবং অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যেই তিরোহিত হ'ল। এটা পুরাতন প্রস্তর-যুগ হ'তে নূতন প্রস্তর-যুগের পরিবর্ত্তন হবার সন্ধিকাল (transitional period) তার পর চতুর্থক যুগের (Quaternary periodএর) প্রাথমিক (Pleistocene) অন্তর্যুগ শেষ হ'য়ে আধুনিক (recent) অন্তর্যুগ এল। এই অন্তর্যুগের প্রারম্ভে এ সময়ে ইউরোপে শিল্পকলা কিছু ম্লান হয়েছিল। এই কালের আজিলিয়ান ও টারডিনইসিয়ান সভ্যতায় (Azilian-Tardenoisian Cultureএর) সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নেই। কেবল অতি ক্ষুদ্র শিলা-অস্ত্র নির্ম্মাণে তখনকার লোক সিদ্ধহস্ত ছিল।

চতুর্থক যুগের (Quaternary Periodএর) প্রাথমিক (বা Pleistocene) অন্তর্যুগের অন্তে, "আধুনিক মানব" জাতি-সমূহের অ-বিশিষ্ট পূর্ব্ব-পুরুষেরা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। চতুর্থক যুগের (Quaternary Periodএর) প্রাথমিক (Pleistocene) অন্তর্যুগ শেষ হয়ে আধুনিক (Recent) অন্তর্যুগ এল। এই অন্তর্যুগের প্রারম্ভে নূতন প্রস্তর-কাল ছিল। ঐ সময় সুন্দর পালিশ করা নানা রকম পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কারাদি তৈয়ার হ'ত। চাষবাসের ও পশুপালনের আরম্ভ হ'ল। মাটির বাসন ও হাঁড়িকুড়ি হাতে গড়া হ'তে লাগল। মানুষের মৃতদেহ প্রোথিত করবার জন্য পাথরে মণ্ডিত গোল এবং লম্বা কবর (dolmens, stone-circles, etc.) প্রভৃতি প্রস্তুত হ'তে আরম্ভ হ'ল; এবং স্মরণীয় মৃত ব্যক্তিদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ প্রস্তরস্তম্ভ (menhirs) খাড়া করবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হ'ল। এই কালের পাথরের ও মাটির প্রস্তুত অনেক প্রকার তৈজসপত্র ও শকটের চাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

কিছুকাল পরে ইউরোপে দস্তা ও তামার সংমিশ্রণে প্রস্তুত একরূপ কাঁসার (bronzeএর) চলন হ'ল ও ভারতে তামার ব্যবহার আরম্ভ হ'ল। ছোটনাগপুরে এই প্রবন্ধলেখক একটি ব্রোঞ্জের কুঠার পেয়েছিলেন। এটি পাটনা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। ভারতে আর দ্বিতীয় ব্রোঞ্জের কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে ব'লে জানা নাই। নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার, ও বাসন হাঁড়িকলসী প্রভৃতি এই সব ধাতুতে প্রস্তুত হ'তে লাগল; সোনার এবং মূল্যবান পাথরের অলঙ্কারাদিও তৈয়ার হ'তে লাগলো। প্রথমে পাথর ও তামা দুই-ই এক সময় ব্যবহার হয়; তাই সে কালকে তাম্র-প্রস্তর-যুগ (chalcolithic period) বলা হয়। তাম্র-যুগ ও তাম্র-প্রস্তর-যুগের এত সুন্দর সুন্দর ধাঁচের (patternএর) অলঙ্কারাদি দেখা যায় যে, তা আধুনিক সেকরাদের তৈরি জিনিষের সঙ্গে সমকক্ষতা করতে পারে। সিন্ধুনদের উপত্যকায় মহেঞ্জোদাড়ো এবং

তারাপ্পায় এবং ভারতের আরও কোনও কোনও স্থানে ঐ যুগের ধ্বসাবশেষের মধ্যে এরূপ দ্রব্যসম্ভার পাওয়া গেছে। তাম্র-যুগের পরে পুরাতন লৌহ-যুগ এবং এখন আধুনিক লৌহ-যুগ।

তৃতীয় যুগের অন্ত্যাধুনিক (Pliocene) অন্তর্যুগে যে মানবীয় শাখা (Humanoid stem) মানব-শাখায় (Human stemএ) পরিণত হ'য়ে ক্রমে প্রাথমিক মানব (Homo Primigenius) বা নিয়াণ্ডারথাল-মানব নামক প্রশাখা উৎপন্ন করেছিল; এবং ক্রমে মূল অ-বিশিষ্ট মানব-গোষ্ঠীর উদ্যমশীল প্রধান শাখা আবার পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক অবস্থার সঙ্গে প্রাকৃতিক ও ঐন্দ্রিয়িক নির্ব্বাচনের সাহায্যে আপনাদিগকে মিলিয়ে বীজের ক্রমিক প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন হাসিল ক'রে অবশেষে চতুর্থক যুগের প্রাথমিক অন্তর্যুগের অন্তে 'আসল মানব' বা 'আধুনিক মানবে' পরিণত হ'ল,—সেই ক্রম-বিকাশ-পদ্ধতির সমগ্র ইতিহাস

নিয়াণ্ডারথাল মানবের কঙ্কাল.

আধুনিক অস্ট্রেলিয়ার আদিম-নিবাসীর কঙ্কাল

আমরা জানতে পারিনি। তৃতীয়ক যুগের অজ্ঞাত ইতিহাস অল্পাধুনিক (Oligocene) ও মধ্যাধুনিক (Miocene) যুগদ্বয়ের অন্ধকারে অ-বিশিষ্ট মানবকল্প গোষ্ঠীর কত কত প্রশাখা পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আপনাদিগকে মিলিয়ে নিতে না পেরে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে, তার সব নিদর্শন পাওয়া যায় না। চতুর্থক যুগের প্রাথমিক (Pleistocene) অন্তর্যুগেও মানব-শাখার যে-সব প্রশাখা আপন আপন অযোগ্যতার জন্য বিলুপ্ত হয়েছে, তাদের সমস্ত হিসাব আমরা পাই না। কেবল এই মাত্র অনুমান করতে পারি যে অন্ত্যাধুনিক (Pliocene) কালের প্রধান মানব-শাখা (main human stem) হ'তে যে আধুনিক মানব-জাতির (Homo sapiensএর) উৎপত্তি হয়েছে, তাহা প্রাকৃতিক ও ঐন্দ্রিয়িক নির্ব্বাচনের এবং বৃদ্ধির পরস্পরসাপেক্ষ নিয়মের (law of correlated growthএর) সাহায্যে যথোচিত

নূতন প্রস্তর-যুগের মানুষদের কাল্পনিক ছবি

ক্রমিক অনুকূল পরিবর্ত্তন (successive favourable variations) জমিয়ে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (survival of the fittest) নিয়ম অনুসারে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হাসিল করেই (by a process of extraordinary progressive differentiation) এইরূপ হ'তে পেরেছে।

যে-সমস্ত অনুকূল পরিবর্ত্তনের সমষ্টি অ-বিশিষ্ট মানব-গোষ্ঠীকে আসল মানব বা আধুনিক মানবে পরিণত করতে পেরেছে, সেগুলি সমস্তই ক্রমিক বা ধীরে ধীরে আয়ত্ত (gradual) নয়, কোন-কোনটিকে হঠাৎ করায়ত্ত পরিবর্ত্তন (saltatory changes বা sudden mutations) বলা যেতে পারে। এইরূপে যে-সমস্ত পাশবিক লক্ষণ অ-বিশিষ্ট মানব-গোষ্ঠীকে 'আসল মানবে' পরিণত হ'তে বাধা দিচ্ছিল, সেগুলি একে একে অপসারিত হওয়ায় আধুনিক উচ্চতর মানব-জাতির আবির্ভাব হ'ল।

পিথেকানথ্রোপাস (Pithecanthropus) প্রভৃতি প্রাক্-মানবের উদ্ভবকাল হ'তে আজ পর্য্যন্ত কত শত লক্ষ বৎসর গত হয়েছে। পশুপ্রায় অসভ্য বর্ব্বর 'গোড়ার মানুষের' অপেক্ষা 'আধুনিক মানুষ' সভ্যতার পথে অনেক দূর অগ্রসর

হয়েছে সত্য, কিন্তু এখনও মানবের চরম উন্নতির—যথার্থ মনুষ্যত্ব বা 'দেবত্ব' লাভের আশা সুদূরপরাহত। এখন পর্য্যন্ত উচ্চসভ্যতাভিমানী জাতিদের মধ্যেও পশু-গন্ধ (smell of the beast) বিলুপ্ত হয় নি; এখনও মানুষের রক্ত মানুষে শোষণ ক'রছে—কেবল অসভ্য মানব-মস্তক-শিকারী (head-hunters) আদিম জাতিরা নয়, সুসভ্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমৃদ্ধিশালী জাতিরাও এ-বিষয়ে তাদের চেয়ে পশ্চাৎপদ নন। কেবল হনন-কৌশলে যা-কিছু প্রভেদ।

এই সব দেখে মনে হয়, মানুষ এখনও উন্নতির পথের নূতন যাত্রী মাত্র; উন্নতির সুদীর্ঘ রাস্তা এখনও অন্তহীন ব'লে মনে হয়। ইংরেজ-কবি টেনিসন তাঁহার "উষা" ("The Dawn") নামক কবিতায় যথার্থই বলেছেন,—আমরা এখনও সভ্যতার রক্তাভ উষাকাল অতিক্রম করিনি:—

> "Red of the dawn!
>
> * * * *
>
> For Babylon was a child new-born, and Rome was a babe in arms,
> And London and Paris and all the rest are as yet but in leading strings."

কবির সঙ্গে বিবর্ত্তনবাদী নৃতত্ত্বসেবীরাও মনশ্চক্ষে দেখেন, একদিন—

> "Earth at last a warless world, a single race, a single tongue,
> —I have seen her far away—for is not earth as yet so young?—
> Every tiger madness muzzled, every serpent passion killed,
> Every grim ravine a garden, every blazing desert till'd."
>
> *(Locksley Hall Sixty Years After.)*

কারণ,—

> "Only that which made us, meant us to be mightier by and by;
> Set the sphere of all the boundless Heavens within the human eye,
> Sent the shadow of Himself, the boundless, through the human soul;
> Boundless inward, in the atom, boundless outward, in the Whole."
>
> *(Locksley Hall Sixty Years After.)*

মনোরাজ্যের কাহিনী

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নদীর বুকে যেমন ঢেউয়ের পর ঢেউ জাগে, মনের মধ্যেও তেমনই চিন্তার পর চিন্তা জাগে। ঢেউ জলের ভিতর হইতে উঠিয়া জলের ভিতরেই আবার মিলাইয়া যায়; চিন্তাও মনের অতল হইতে উঠিয়া আবার মনের অতলেই আত্মগোপন করে। নদীর বুকে ঢেউয়ের ওঠা-পড়ার যেমন বিরাম নাই, মনের মধ্যেও চিন্তার তরঙ্গ তেমনই কেবলই উঠিতেছে, কেবলই পড়িতেছে।

মনের উপরিভাগে যখন একটি চিন্তা জাগিয়া থাকে, তখন অন্যান্য চিন্তা মনের অতলে অপেক্ষা করে উপরে উঠিবার জন্য। যে-চিন্তাটি চেতনার ক্ষেত্র অধিকার করিয়া থাকে, সেটি কিছুক্ষণ পরে বিস্মৃতির রাজ্যে চলিয়া যায়। চেতনার রাজ্যে নূতন নূতন চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয় নেপথ্যের অন্ধকার হইতে। মন যেন থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ। রঙ্গমঞ্চে নটবালকেরা নাচিয়া গাহিয়া নেপথ্যে চলিয়া যায়। নূতন অভিনেতারা আসে নূতন ভূমিকা লইয়া নেপথ্য হইতে প্রকাশ্যে। মনের রঙ্গমঞ্চেও তাই। বিস্মৃতির অন্ধকার হইতে চেতনার আলোকে এবং চেতনার আলোক হইতে বিস্মৃতির অন্ধকারে চিন্তার ছুটাছুটির বিরাম নাই।

মনের যে-দিকটা চেতনার আলোকে আলোকিত তাহাকে মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, সজ্ঞান অবস্থা (conscious state) মনের যে-দিকটা চেতনার রাজ্যের বহির্ভূত, যে-দিকটা বিস্মৃতির অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, সেই দিকটার নাম আন্তর্জ্ঞানিক অবস্থা (sub-conscious state)। এই আন্তর্জ্ঞানিক প্রদেশের অলক্ষ্যে কত চিন্তাই যে লুকাইয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা জীবনে যত কিছু চিন্তা করি তাহার কোনটাই একেবারে নষ্ট হয় না। সেগুলি চেতনার রাজ্য হইতে বিস্মৃতির রাজ্যে চলিয়া যায়। সেই বিপুল অন্ধকারের রহস্যময় রাজ্যে কত দিনের কত আশা-আকাঙ্ক্ষাই না লুকাইয়া আছে। কবে শৈশবের সোনালী প্রভাতে মা আমার চিবুক ধরিয়া মাথা আঁচড়াইয়া দিয়াছে, ঠাকুরমা ভোরের বেলায় কৃষ্ণের শতনাম শুনাইয়াছে, আহার করাইবার সময় রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলিয়াছে, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, অভিমন্যুবধের কাহিনী শুনিতে শুনিতে দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়াছে, প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে একে একে কত কথাই না মনে পড়িতেছে। সে কতকালের কথা!

এতক্ষণ এই সব ছবি কোথায় আত্মগোপন করিয়া ছিল? কোথায় ছিল আমার ছোট্ট চিবুকটিতে মায়ের হাতের সেই স্পর্শের স্মৃতি?

দমদম জেলের কম্বলের শয্যায় বসিয়া লিখিতে লিখিতে মনের সাম্‌নে বায়স্কোপের ছবির মত শুধু ছবির পর ছবি জাগিতেছে। অনেক দিন তাহাদের কথা ভাবি নাই। কিন্তু একটি কথাও শূন্যের মধ্যে নিঃশেষ এবং নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। নিঃশেষে মুছিয়া গেলে আজ তাহারা মনের আকাশে তারার মত এমন করিয়া একটির পর একটি ফুটিয়া উঠিত না। আরও অনেক কথা, লজ্জার কথা, গৌরবের কথা, ভয়ের কথা, সাহসের কথা, দুঃখের কথা, সুখের কথা, সোহাগের কথা, শাসনের কথা—অনেক কথা মনের কোণে গুপ্ত হইয়া আছে, সুপ্ত হইয়া আছে। মনের যে-প্রদেশে অতীতের এবং বর্ত্তমানের শত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া আছে তাহাই হইতেছে অবচেতনার প্রদেশ। সেই বিস্মৃতির কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রদেশে এক দিন এই দমদম জেলের ছবিও মিলাইয়া যাইবে। সে-দিন নূতন দৃশ্য চোখের সাম্‌নে জাগিয়া উঠিবে; চোখ দেখিবে নূতন মানুষের মুখ, কান শুনিবে নূতন মানুষের কণ্ঠধ্বনি। বর্ত্তমান সে-দিন অতীতের গর্ভে চলিয়া পড়িবে, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের মধ্যে আসিবে। এমনি করিয়া যাহাকে বর্ত্তমানে জানিতেছি রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের মধ্য দিয়া, তাহা অতীতের মধ্যে নিমিষে নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে; যাহাকে পূর্ব্বে জানি নাই তাহাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জানিতেছি। কিন্তু সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে একটি সত্য আছে যাহা আমরা ভুলিব না। যাহা যায় তাহা নিঃশেষে মুছিয়া যায় না—তাহা মনের অতল প্রদেশে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

মনের এই অবচেতনার ক্ষেত্রকে আমরা চিত্তের চোরাকুঠ্‌রীও বলিতে পারি। অন্তরের অসংখ্য বৃত্তি বা চিন্তা চেতনার আলোকে দীপ্তিমান মনের প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়া চোরাকুঠ্‌রীতে চলিয়া যায়। তখন তাহাদের কথা আমরা ভুলিয়া যাই। কোন কারণের সূত্রকে অবলম্বন করিয়া তাহারা যখন-তখন চেতনার ক্ষেত্রে আসিতে পারে।

দুষ্মন্তের হৃদয় হইতে শকুন্তলার স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছিল। কণ্বের তপোবনে প্রিয়ার সহিত সেই প্রথম সাক্ষাৎ, কুঞ্জকুটীরে প্রেয়সীর সহিত সেই গোপনমিলন, কানে কানে সেই কত সোহাগবাণী—দুষ্মন্ত সব ভুলিয়া গিয়াছিল। শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিবার মূলে এই বিস্মৃতি। তাহার পর ধীবর আসিয়া যখন শকুন্তলার হারানো অঙ্গুরীয়টি আনিয়া রাজাকে দেখাইল তখন রাজার একে একে সব কথা মনে পড়িয়া গেল। বিস্মৃতির দুয়ার খুলিয়া রাজার চেতনার রাজ্যে আসিয়া দাঁড়াইল কণ্বের দুহিতা শকুন্তলা; নবযৌবনা সুন্দরী যুবতী সখীদের সঙ্গে আলবালে জলসেচন করিতেছে। আরও কত কথা একে একে রাজার স্মৃতিপথে উদিত হইল। অঙ্গুরীয়কে আশ্রয় করিয়া বিস্মৃতির আবরণ ঠেলিয়া শকুন্তলা স্মৃতিপথে আসিয়া দাঁড়াইল এবং রাজাকে অনুশোচনার তীক্ষ্ণ শরে একেবারে অভিভূত করিয়া দিল। এমনি করিয়াই যাহা বিস্মৃতির রাজ্যে এক দিন চলিয়া যায় তাহা সহসা স্মৃতিপথে আসিয়া উদিত হয়—যাহাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম সে আসিয়া কখন চোখের জলে বক্ষ ভাসাইয়া দেয়—যাহার মুখের ছবি বহু দিন মনে পড়ে নাই সে কখন রাতের অন্ধকারে নিদ্রাহীন আঁখির আগে আসিয়া দাঁড়ায় এবং অভিমানভরা ছলছল চোখে নীরবে আমাদিগকে তিরস্কার করে।

সকল সময়ে একটা কোন হেতুকে অবলম্বন করিয়াই যে বিস্মৃত চিন্তা মনের চোরাকুঠ্‌রী হইতে চেতনার প্রকাশ্যে আসিয়া উপস্থিত হয় এমন নহে। অনেক সময় অকারণে অনেক কথা মনে পড়িয়া যায়। উদাস সন্ধ্যায় ধূসর আকাশের পানে চাহিয়া হঠাৎ মনে পড়ে প্রিয়জনের কথা। বিরহী মন কাঁদিয়া উঠে। নিশীথ রাতে বাঁশীর করুণ সুর শুনিয়া সহসা মনে পড়িয়া যায় গত জীবনের বিষাদমাখা স্মৃতি; অতীতের অস্পষ্ট গর্ভ হইতে জাগিয়া উঠে বেদনার সকরুণ ছবিগুলি। কেন যে এমন হয় ইহার উত্তর দেওয়া সুকঠিন। হেমন্তের সন্ধ্যায় মাঠের পথে চলিতে চলিতে মনে পড়িয়া যায় বাল্যবন্ধুর কথা যাহার সঙ্গে জীবনের বহুস্মৃতি জড়াইয়া আছে। শ্রাবণরাত্রি; আকাশে জল ঝরিতেছে; বাতাস হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে; সহসা মন কাঁদে প্রিয়জনের জন্য। যাহাকে বহু দূরে ফেলিয়া আসিয়াছি তাহাকে বুকের কাছে পাইবার জন্য হৃদয় অস্থির হয়। দূরের বিস্মৃত মানুষ কেন যে বর্ষার মেঘ-কজ্জল দিবসে, আষাঢ়ের বর্ষণমুখর রাত্রে প্রাণের অন্তঃপুরে আসিয়া আমাদিগকে কাঁদায়, কে বলিবে? মেঘের নীলিমা দেখিয়া রাধা কাঁদিতেন। সেখানে নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চাহিয়া রাধার মনে পড়িত কৃষ্ণের চন্দনচর্চ্চিত নীল-কলেবরের কথা। মেঘের সেতু বাহিয়া কৃষ্ণ আসিতেন রাধার মনের মধ্যে। কিন্তু বর্ষণমুখর বাদলরাত্রে কেন শূন্য হৃদয়মন্দির বাঞ্ছিতের জন্য হাহাকার করিতে থাকে? ইহার উত্তর কে দিবে?

কিন্তু কতকগুলি স্মৃতি ও চিন্তাকে সহস্র চেষ্টাতেও আমরা চেতনার আলোকে আনিতে পারি না। তাহারা বিস্মৃতির অন্ধকারে চিরতরে অবলুপ্ত হইয়া যায়। সেই অতল অন্ধকার হইতে কোন ডুবুরীই তাহাদিগকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে তুলিতে পারে না। মনঃসমীক্ষণে (Psycho-analysis এ) ইহাদিগকে সঙ্গবিচ্যুত চিন্তা (dissociated thoughts) বলে। মনস্তত্ত্ববিদগণের মতে এই-সব চিন্তাকে চেতনার ক্ষেত্রে আনা যায় না। ম্যাক্‌ডুগাল সাহেব তাঁহার য়্যাবনর্ম্যাল সাইকলজী (Abnormal Psychology) নামক গ্রন্থের মধ্যে মানসিক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত কতকগুলি রোগীর ইতিহাস দিয়াছেন। ইহারা বিগত যুদ্ধের সৈনিক। একটি ক্যানাডাবাসী কৃষক

সৈনিক হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিল। একটি সাংঘাতিক যুদ্ধের দৃশ্য দেখিয়া তাহার মনের রাজ্যে একেবারে ওলটপালট ঘটিয়া গেল। ঐ যুদ্ধে তাহার প্রিয়তম বন্ধুর মৃত্যু ঘটে। মৃত বন্ধুটির ক্ষতবিক্ষত দেহের বীভৎস দৃশ্য তাহার মনকে এমন নাড়া দিল যে, সেই আঘাতে তাহার মন একেবারে বিকল হইয়া গেল। সে ভুলিয়া গেল চাষবাসের কথা, ক্যানাডার জীবন-যাত্রার কথা। গাধার ছবিকে বলিতে লাগিল ঘোড়ার ছবি, শেয়ালকে বলিল কুকুর, লাঙ্গলের বর্ণনা দিতে পারিল না। তাহার সত্তার এক অংশ যেন অতীতের গর্ভে চিরতরে বিলীন হইয়া গিয়াছে; তাহার মনের এক অংশ যেন ছিঁড়িয়া গিয়া কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়াছে; তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এমনি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, রোগীর অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। অতীতে সে যাহা করিয়াছে, দেখিয়াছে, শুনিয়াছে তাহার কোন কথাই তাহার মনে নাই। অতীতের মানুষ আর বর্ত্তমানের মানুষটি যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তাহাদের কোথাও যোগ নাই। রোগী কিছুতেই তাহার অতীত জীবনের কথা মনে করিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসার সাহায্যে পূর্ব্বের স্মৃতি আবার ফিরিয়া আসে, অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়া যায়। ক্যানাডার সৈনিকটি তাহার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে স্মৃতি আর চেতনার ক্ষেত্রে জাগে না। অপ্রীতিকর চিন্তাকে চেতনার ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসন করিবার প্রাণপণ চেষ্টা হইতে অনেক সময়ে এই স্মৃতিলোপ ঘটিয়া থাকে। রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎস দৃশ্য ও গৃহের চিন্তাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিতে গিয়াই বহু সৈনিক এই মানসিক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। গৃহে বহু বিপদের মধ্যে অসহায় স্ত্রীপুত্রকে ফেলিয়া আসা সহজ ব্যাপার নহে। চক্ষের সম্মুখে মানুষের মাথা উড়িয়া যাইতেছে, নাড়িভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িতেছে—সেও কি দুঃসহ দৃশ্য! এই-সব অপ্রীতিকর স্মৃতিকে জোর করিয়া দাবাইয়া রাখার চেষ্টা অনেক সৈনিকের মনকে বিকল করিয়া দিয়াছে। মনঃসমীক্ষণে (Psycho-analysis এ) ইহাকে বলে সঙ্গবিচ্যুতি (Dissociation)

"আমরা যাহাকে চেতনা বলিয়া থাকি তাহা আমাদের সত্তার অংশ-মাত্র—অতিক্ষুদ্র অংশমাত্র। যে-কোন একটি সময়ে আমাদের সত্তার প্রায় সবটুকু অংশ দৃষ্টির আড়ালে থাকে। চেতনা সত্তার উপরিভাগে খেলিয়া বেড়ায়—ইহা এবং সত্তা এক নহে। আমাদের পক্ষে যত কিছু চিন্তা করা, স্মরণ করা অথবা দর্শন করা সম্ভবপর তাহাদের অতি অল্প অংশ কোন একটি সময়ে আমাদের চেতনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে।"
—*Outline of Modern Knowledge.*

তাহা হইলে বুঝিতে পারা গেল, আমার মনের যে-অংশ চেতনার আলোকে আলোকিত হইয়া আছে তাহাই আমার সত্তার সবটুকু নয়। সেই অংশ আমার সমগ্র সত্তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশ। আমার অবশিষ্ট সত্তা সকল সময়েই দৃষ্টির বাহিরে লুকাইয়া থাকে। সমুদ্রের উপর দিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের পাহাড় অনেক সময়ে ভাসিয়া যায়। পাহাড়ের খানিকটা অংশ জলের উপরে জাগিয়া থাকে—বাকী অনেক-খানি থাকে সমুদ্রের ভিতরে দৃষ্টির বাহিরে। আমার মনের যে-অংশ চেতনার ক্ষেত্র অধিকার করিয়া থাকে তাহা সমুদ্রের উপরে ভাসমান বরফখণ্ডের মত—তাহা আমার সবটুকু নয়। আমার মনের প্রায় সবটুকুই গুপ্ত হইয়া আছে আমার চেতনার বহির্ভাগে। উহাকে আমি জানিতে পারিতেছি না, দেখিতে পারিতেছি না। উহা সমুদ্রের তলদেশে লুক্কায়িত বরফের পাহাড়ের মত।

আমাদের মনের গোপন কক্ষে, অন্তরের অতল প্রদেশে যে-সকল ইচ্ছা বিদ্যমান আছে তাহারা সর্ব্বদাই চেষ্টা করি-তেছে চেতনার রাজ্যে আসিবার জন্য। কিন্তু অন্তরের সকল ইচ্ছাকে চেতনার ক্ষেত্রে আমরা স্থান দিতে পারি না। কোন্ চিন্তা ভাল এবং কোন্ চিন্তা মন্দ তাহার সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা বোধ আছে। যে-ইচ্ছাকে আমি মন্দ ইচ্ছা বলিয়া মনে করি, যে-ইচ্ছাকে মনে স্থান দিলে আমি নিজের কাছে ছোট হইয়া যাই, সেই ইচ্ছাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি। সেই অশুভ চিন্তা যখন চেতনার ক্ষেত্রে আসিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে তখন তাহাকে তাড়াইবার জন্য আমিও প্রাণপণ চেষ্টা করি। মনের মধ্যে ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার, প্রবৃত্তির সহিত প্রবৃত্তির সংগ্রাম সর্ব্বদাই চলিতেছে। 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।' আমি সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি—স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসা আমার পক্ষে অধর্ম্ম। কিন্তু অন্তরে আমার মধ্যে যে আদিম পুরুষ রহিয়াছে সে নারীর অধরসুধা পান করিবার জন্য পিপাসু হইয়া আছে। তাহাকে কত বুঝাইতেছি, কত শাসাইতেছি—কিন্তু কোন ধর্ম্মকথাই সে শুনিতে চাহে না, কোন শাসনই সে মানিবে না! সে চায় রমণীর প্রেম, সে চায় নারীদেহের সৌন্দর্য্য। আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্মের বাঁধ ভাঙিয়া সেই আদিম পুরুষ আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। কিন্তু আমি তো তাহাকে স্বীকার করিতে পারি না! আমার মধ্যে যে বৈরাগী-মানুষ একতারা বাজাইতেছে সে বলিতেছে, নারীর সৌন্দর্য্য ক্ষণস্থায়ী; নারীর প্রেমে শান্তি নাই। দেহের জন্য দেহের যে বাসনা সেই উন্মত্ত বাসনা অগ্নিশিখার মত জ্বালাময়ী; তাহা আমাদিগকে দগ্ধ করে, স্নিগ্ধ করে না। লোকলজ্জা আমাকে বলিতেছে, ছিঃ ছিঃ, সামান্য ইন্দ্রিয়স্রোতে যদি ভাসিয়া যাও তবে সমাজে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া? লোকের নিকট চিরকাল কলঙ্কী হইয়া রহিবে। তোমাকে দেখিয়া রাস্তার লোকে হাসিবে, আত্মীয়-স্বজন বিদ্রূপ করিবে। এমনি করিয়া একদিকে আমার মধ্যে আদিম পুরুষের উদ্দাম কামনা এবং

আর একদিকে সন্ন্যাসীর ত্যাগের আদর্শ, অনাসক্তির আদর্শ —এই উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে। নরনারীর অন্তরে এই আদিম যৌনপ্রবৃত্তি সাগরের মত তরঙ্গিত হইতেছে। এই সাগরের আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্য মানুষ নীতির কত বাঁধই না বাঁধিয়াছে! কিন্তু সহসা সাগরে দোলা লাগে; বাঁধ ভাঙিয়া উচ্ছ্বসিত তরঙ্গরাশি সমস্ত একাকার করিয়া দেয়। কোন্ নিষ্ঠুর দেবতা আমাদিগকে পাগল করিয়া বিনাশের পথে ঠেলিয়া দেয় তাহা আমরা জানি না। শুধু জানি, অতি কঠোর সন্ন্যাসীরও আজন্মের সাধনা কখনও কখনও এই তরঙ্গবেগ সহ্য করিতে পারে না; উর্ব্বশীর চটুল নয়ন উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসীর মনকে প্রলুব্ধ করে; উমার সৌন্দর্য্যরাশি সর্ব্বত্যাগী শঙ্করের তপস্যা ভাঙিয়া দেয়।

যে-ইচ্ছাকে আমরা মনের মধ্যে স্থান দিতে চাহি না সেই ইচ্ছাকে আমরা দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে চাই। অনভিপ্রেত চিন্তাকে চেতনার ক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিবার এই প্রযত্নই 'Repression' অথবা 'অবদমন' বলিয়া অভিহিত হয়।

যে-পেয়াদা অনভিপ্রেত ইচ্ছাগুলিকে দূরে ঠেলিয়া দেয়, চেতনার ক্ষেত্রে অথবা চিত্তের খাসকামরায় তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেয় না, তাহার নাম Censor অথবা প্রহরী। আমরা ইহাকে বিবেকও বলিতে পারি। জমিদারের কাছারিবাটি ও খাসকামরার মত যে-দুইটি প্রকোষ্ঠ আমাদের মনের মধ্যে বিদ্যমান, যে প্রকোষ্ঠ দুইটির একটির নাম সংজ্ঞান (the conscious) এবং অপরটির নাম অন্তর্জ্ঞান (the sub-conscious) সেই প্রকোষ্ঠ দুটির মধ্যবর্ত্তী দ্বারদেশে প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে সেন্সর। প্রহরীর অনুমোদন ব্যতীত কোন ইচ্ছা চেতনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। মহাদেবের তপস্যাক্ষেত্রের প্রান্তে সে নন্দীর মত বেত্র উঁচাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। কোন চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে আসিবার উপক্রম করিতেছে দেখিলেই দ্বারী জিজ্ঞাসা করে, হু কাম্‌স্ দেআর (Who comes there)? যদি ইচ্ছাটি আমাদের নীতিধর্ম্মের অনুমোদিত হয় প্রহরী তাহাকে চেতনার ক্ষেত্রে আসিবার অনুমতি দান করে। যদি ইচ্ছাটি আমাদের নীতিধর্ম্মের অনুমোদিত না হয় তবে প্রহরীর কাছে উহা বন্ধু (friend) নহে, শত্রু (foe)। প্রহরী ধাক্কা দিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দেয়।

প্রহরী যে-সকল ইচ্ছাকে চেতনার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করে তাহাদের সবগুলিই যে সেই আজ্ঞা নতশিরে মানিয়া লইয়া প্রস্থান করে এমন নহে। অনেক ইচ্ছা আমাদিগকে জড়াইয়া থাকে যাহাদিগকে আমরা নীতিপথে বাধা বলিয়া জানি। তাহাদিগকে আমরা যে ছাড়াইয়া যাইতে চাহি না এমন নহে, কিন্তু ছাড়াইতে গেলেই কোথায় যেন ব্যথা পাই। তাহাদিগকে আমরা শত্রু বলিয়া জানি; তবুও তাহাদিগকে প্রাণপণে আদর করিতে ইচ্ছা করে। প্রহরী তাহাদিগকে চেতনার ক্ষেত্রে কখনই আসিতে দিবে না—কিন্তু তাহারা যে আমার মর্ম্মের মূলে বাসা লইয়াছে! তাহাদিগকে নির্ব্বাসন দিতে আমার মন যে কিছুতেই চাহে না! উপায় কি?

উপায় ছদ্মবেশ। যে-সকল প্রবৃত্তিকে নীতিধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া প্রহরী চেতনার ক্ষেত্রে আসিতে দেয় না অথচ যাহারা আমার একান্তই প্রিয় তাহাদিগকে ছদ্মবেশ পরাইয়া তবে চেতনার ক্ষেত্রে আনিতে হয়। নিজের সঙ্গে এমনি করিয়া আমরা কতই না লুকোচুরি খেলিয়া থাকি। আমরা ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাই, ভাবের ঘরে চুরি করি। রোমা রঁলার একখানি উপন্যাসের নাম মায়ামন্ত্রমুগ্ধ আত্মা (*Soul Enchanted*)। এই উপন্যাসের নায়িকা এনেট তরুণ চিত্রকর ফ্রাঙ্ককে ভালবাসিয়াছে। নায়িকা চিত্রকরটির মাতার বয়সী; নায়িকার নিজেরও একটি পুত্র আছে। এইস্থলে সোজাসুজি প্রেমিকার মত ভালবাসিতে নায়িকার সংস্কারে বাধে। যে ছেলের বয়সী, যাহার সঙ্গে বয়সের এত ব্যবধান তাহাকে সোজাসুজি প্রেমিকের আসন দান করিতে সংস্কারে যখন বাধে তখন উপায় কি? প্রহরী মনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, হুসিয়ার! চিত্রকরের চিন্তা মনে স্থান দিতে পারিবে না। তাহাকে ভালবাসা অন্যায়। নারীর মন কাঁদিয়া বলিতেছে—সে না থাকিলে জীবন শূন্য হইয়া যায়। সে যে প্রাণের প্রাণ! নিরুপায় হইয়া নায়িকা নিষ্করুণ প্রহরীকে ফাঁকি দিল। সে প্রহরীকে বলিল, আমি উহাকে ছেলের মত ভালবাসি। এই ভালবাসার মধ্যে কামগন্ধ নাই। প্রহরী চিত্রকরের চিন্তাকে নারীর চেতনা ক্ষেত্রে তখন আসিতে দিল। রমণী আপনাকে ফাঁকি দিল, প্রহরীকে ফাঁকি দিল—কিন্তু সত্যকে ফাঁকি দিতে পারিল না। সে অলক্ষ্যে হাসিল এবং সময় আসিলে নারীকে বুঝাইয়া দিল, মায়ের ভালবাসার মুখোসপরা প্রবৃত্তির মধ্যে লুকাইয়াছিল কামনা—পুরুষের জন্য নারীর চিরন্তন দুর্ব্বার কামনা।

এমনি করিয়া তুষারশুভ্র নিষ্কলঙ্ক ভালবাসার মুখোস পরিয়া কামনা আসিয়া আমাদের চিত্তকে অধিকার করে। আমরা অন্তরে অন্তরে জানি, যাহাকে ভগ্নী বলিয়া কাছে রাখিবার চেষ্টা করিতেছি তাহাকে ঠিক ভগ্নীর মত দেখি না, যাহাকে ভাই বলিয়া আদর করিতেছি তাহার প্রতি ভালবাসা আপনার সহোদরের প্রতি ভালবাসার ঠিক অনুরূপ নহে। তবুও এ-কথা বন্ধুর কাছে দূরে থাকুক, নিজের কাছেও সহজে স্বীকার করি না। স্বীকার করিতে আমরা লজ্জিত হই, আমাদের সংস্কারে বাধে। পাছে বিবেকের দংশনে উৎপীড়িত হইয়া তাহাদিগকে ছাড়িতে হয় তাই নিজেকে

এই বলিয়া ভুলাই—আমি উহাকে ভগ্নীর মত ভালবাসি, ভায়ের মত ভালবাসি, বন্ধুর মত ভালবাসি। আমি যদি এখন উহাকে ত্যাগ করি তবে সে মনে নিদারুণ ব্যথা পাইবে। অথচ সে-সব ক্ষেত্রে নিষ্করুণ হওয়ার মত করুণা আর নাই। যেখানে মিলনের কোন আশাই নাই, পরিণয় যেখানে অপরাধ, সেখানে প্রিয়জনের নিকট হইতে সরিয়া আসা নিষ্ঠুরতা সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাকে আমি বন্ধুর মত ভালবাসি—এই ভাবে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিয়া প্রিয়জনকে আঁকড়াইয়া থাকা আরও নিষ্ঠুরতা। কারণ বিচ্ছেদের দিন যখন একান্তই আসিবে তখন ভালবাসার জনকে মিলনের আনন্দ যত বেশী করিয়া দিয়াছি বিচ্ছেদের বেদনাও তত বেশী করিয়া দিব। তাহা ছাড়া নির্ম্মল ভালবাসার মুখোস পরিয়া যাহারা হৃদয়ে বাসা লইয়াছে তাহারা কখন যে গভীর রাত্রে অতর্কিত মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবে—কে বলিবে? মনের ক্ষেত্রে ভালবাসা চিরদিন যে সীমাবদ্ধ থাকিবে তাহার নিশ্চয়তা কি? মানুষের মধ্যে যে আদিম যৌনপ্রবৃত্তি রহিয়াছে দুর্নিবার তাহার আকর্ষণ। যে-কোন মুহূর্ত্তে ভালবাসা মনের ক্ষেত্র ছাড়াইয়া দেহের ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারে।

এই জন্যই আমাদের মনকে ভাল করিয়া জানিবার প্রয়োজন আছে। প্রহরীর উপর একান্ত ভাবে সবটুকু ছাড়িয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। কারণ, নিজেই যেখানে নিজের সঙ্গে শত্রুতা করি সেখানে প্রহরী কি করিবে? বিতাড়িত ইচ্ছাকে ছদ্মবেশ পরাইয়া প্রহরীকে ভুলাইয়া যখন চেতনার ক্ষেত্রে আসিতে দিই তখন সেই ফাঁকির পথ রুদ্ধ করিবে কে? এই ফাঁকির পথেই ত পাপ আসিয়া মনের মধ্যে বাসা গ্রহণ করে। সদর দরজায় প্রহরী পথ আগুলিয়া আছে—পাপ তাই আত্ম-প্রবঞ্চনার খিড়কির দরজা দিয়া চোরের মত অন্তরে আসিয়া আশ্রয় লয়; তাহার পর এক অতর্কিত মুহূর্ত্তে আমাদের দুর্ব্বলতার সুবিধা লইয়া সে অন্তরের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি হরণ করে। মানুষের পতনের ইতিহাস এই আপনাকে ভুলাইবার ইতিহাস। প্রহরী যে-সকল ইচ্ছাকে নীতিবিগর্হিত বলিয়া দূরে সরাইয়া দেয় তাহারা নিঃশেষে শূন্যতার অন্ধকারে মিলাইয়া যায় না—মনের চোরাকুঠরীতে গিয়া আশ্রয় লয়। রাতের বেলায় আমরা যখন ঘুমাইয়া পড়ি প্রহরীর চক্ষুও তখন ঘুমে মুদিয়া আসে সে ঝিমাইতে থাকে। চেতনার ক্ষেত্রে আসিবার এই ত উপযুক্ত সময়! প্রহরী ঝিমাইতেছে! দিনের বেলায় যাহার অতন্দ্র চক্ষু এড়াইয়া চেতনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার কাহারও উপায় ছিল না, রাতের বেলায় সে ঘুমাইতেছে! দিবসের বিতাড়িত ইচ্ছাগুলি চোরাকুঠরী হইতে বাহির হইয়া [illegible] এবং নিশ্চিন্ত মনে চেতনার ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিড়াল যখন ঘুমায় ইন্দুর তখন মহোল্লাসে নৃত্য করে; গৃহস্থ যখন নিদ্রামগ্ন তখনই ত তস্করের গৃহপ্রবেশের সময়!

দিবসে প্রহরীর তাড়নায় যে-সকল বাসনা অপূর্ণ থাকিয়া যায় রাত্রে স্বপ্নে সেই সকল সাধ আমরা মিটাইয়া থাকি। তখন বাধা দিবার কেহ থাকে না। এই সব স্বপ্ন এমন সব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের চেতনার আলোকে ভাসিয়া উঠে যে ঘুম ভাঙিয়া গেলে লজ্জায় আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি। অত্যন্ত সাধুপুরুষ বলিয়া যাঁহাদের খ্যাতি আছে তাঁহারাও স্বপ্নে অনেক ঘৃণ্য কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনোবিজ্ঞান যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহারা ইহার মধ্যে বিস্ময়ের হেতু খুঁজিয়া পাইবেন না। আমরা কেহই নিষ্কলঙ্ক দেবতা নহি। আমাদের সকলের প্রকৃতির মধ্যেই আদিম যুগের বর্ব্বর মানুষটা এখনও লুকাইয়া আছে। সভ্যতার প্রলেপটুকু একটু সরাইয়া ফেলিলেই সকলের ভিতর হইতেই বুনো মানুষের কদর্য্য মূর্ত্তিটা বাহির হইয়া পড়ে। আদিম যুগের বন্য প্রবৃত্তিগুলিকে চাপিয়া রাখিবার জন্য আমাদের চেষ্টার বিরাম নাই। কিন্তু চাপা দিলেই তাহারা যে নিঃশেষ হইয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুতঃ, আমরা তাহাদিগকে চাপিয়া রাখিবার যত চেষ্টাই করি না, তাহারা সময়ে সময়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাহাদের এই আত্মপ্রকাশের সুযোগ মিলে স্বপ্নে। তখন প্রহরীর চোখে নিদ্রা ঘনাইয়া আসে। আমাদের ভিতরের বন্য শূকরটা তখন দন্ত উঁচাইয়া নির্ভয়ে খেলা করিতে থাকে, সর্প নিঃশঙ্ক চিত্তে বিষ উদ্গীরণ করে, শকুনিটা অখাদ্য বস্তু কুণ্ঠা বর্জ্জন করিয়া উদরে পূরিয়া দেয়, নির্লজ্জ ছাগটা অতল হইতে চেতনার ক্ষেত্রে জাগিয়া উঠে।

স্বপ্ন আমাদের সমগ্র রূপটিকে চেতনার আলোকে প্রকটিত করে। আমাদের চেতনার বাহিরে অন্তরের বিপুল অন্ধকারময় প্রদেশে যে-সকল ইচ্ছা তরঙ্গিত হইতেছে প্রহরীর সতর্কতার জন্য জাগ্রত মুহূর্ত্তগুলি তাহাদিগকে প্রকাশ করিতে পারে না। স্বপ্নের রহস্যময় লোকে মনের অতল হইতে তাহারা জাগিয়া উঠে অনাবৃত মূর্ত্তি লইয়া। আমরা স্বপ্নলোকের নিজের সেই অনাবৃত রূপ দেখিয়া লজ্জায় শিহরিয়া উঠি সত্য, কিন্তু সেই লজ্জার মধ্য দিয়া জানিতে পারি নিজের স্বরূপকে। স্বপ্নের এই দিক দিয়া একটা বিপুল সার্থকতা আছে। স্বপ্নের কষ্টিপাথরে আমাদের যথার্থ চেহারাটার যাচাই হইয়া যায়। স্বপ্নের দর্পণে আমাদের মনের সত্যিকারের রূপটি প্রতিফলিত হইয়া উঠে। এখানে একটি কথা। স্বপ্নে নিজের কদর্য্য ইচ্ছা সব সময়েই যে অনাবৃত রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে এমন নহে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদিম ইচ্ছা ছদ্মবেশে অথবা বিকৃত মূর্ত্তি লইয়া স্বপ্নলোকে দেখা দিয়া থাকে।

আমরা আমাদিগকে যত ভাল মনে করি আমরা ঠিক তত ভাল নই। আমাদের মনের কোণে অনেক কলুষ,

অনেক ফাঁকি লুকাইয়া থাকে যাহার কথা আমরা নিকটতম বন্ধুর কাছেও বলিতে সাহস করি না। সেই ফাঁকির কথা প্রকাশ পায় শুধু আমার কাছে এবং আমার অন্তর্যামীর কাছে।

"লোকে যখন ভালো বলে,
যখন সুখে থাকি,
জানি মনে তাহার মাঝে
অনেক আছে ফাঁকি।"

কিন্তু আমার মধ্যে যে উলঙ্গ বর্ব্বর রহিয়াছে—যাহাকে ঢাকিবার জন্য আমি ভদ্রতার ছদ্মবেশ পরি—সেই বর্ব্বরটাই আমার সবটুকু নয়। তাহাকে একান্ত বড় করিয়া দেখিলে নিজের প্রতি অবিচার করা হয়। আমার মধ্যে কাঁদিতেছে নিঃসঙ্গ দেবতা। তাহাকে ত আমি জীবনে উচ্চ আসন দান করি নাই। সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, পরিবার, সাহিত্য আমাকে যে সংস্কার এবং আচারের অচলায়তনের মধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাদিগকেই আমি পদে পদে কুর্ণিশ করি। তাহারাই আমার জীবনের অনেকখানি স্থান নির্লজ্জভাবে জুড়িয়া বসিয়া আছে। আমার সত্তার যে-অংশ এইভাবে সামাজিক নিয়মকানুন এবং আদবকায়দার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহাকে আমি আমার বাহিরের মানুষ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এই বাহিরের মানুষটা হাসে, নাচে, গল্প করে; নিমন্ত্রণ করিয়া লোক খাওয়ায়, ঘটা করিয়া ছেলেমেয়ের বিবাহ দেয়। ইহার মুখে হাসি, ললাটে সিন্দুরবিন্দু, চুলে রেশমী ফিতা, অনামিকায় অঙ্গুরীয়, অঙ্গে সুন্দর পরিচ্ছদ; রেলে, ষ্টীমারে, কংগ্রেসে, উৎসবপ্রাঙ্গণে, নিমন্ত্রণসভায় এই বাহিরের মানুষটা সকলের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু আমার অন্দরের দেবতা যবনিকার অন্তরালে নিঃশব্দে অশ্রুমোচন করিতেছে। আচার-অনুষ্ঠানের রাক্ষস-পুরীতে সে অশোককাননের সীতার মত একাকিনী; নিয়মকানুনের জটিলা-কুটিলা-পরিবৃতা হইয়া সে রাধার মত নিঃসঙ্গ। তাহার রক্তে কাঁদিতেছে কৃষ্ণের বাঁশী। সভ্যতার সহস্র আড়ম্বরের মধ্যে তাহার তৃপ্তি নাই। তাহার মধ্যে বাজিতেছে শ্যামল অরণ্যের গান, উন্মুক্ত আকাশের বাঁশরী, অবারিত প্রান্তরের আহ্বান, কূলহীন সাগরের কলধ্বনি। সে মিথ্যার আবরণ ঠেলিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে চায় সত্যের মধ্যে। সঙ্কীর্ণতা তাহাকে পীড়িত করে, বন্ধন তাহাকে বেদনা দেয়, কপটতা তাহাকে আঘাত হানে, কদর্য্যতায় সে অশান্তি পায়। অন্তরের এই গোপন দেবতা—এই দেবতাকে আমরা অনুভব করি ব্যথার মধ্যে, অশান্তির মধ্যে। এই ব্যথা, এই অশান্তি আমাদের প্রত্যেকের বুকে। কিন্তু পাছে কঠোর সত্যের আঘাতে আমাদের সমাজ ও পরিবার ভাঙিয়া-চুরিয়া যায়, পাছে আমাদের আত্মীয়-স্বজন কিছু আঘাত পায়, এইজন্য অন্তরের এই কান্নার কথা স্বামী স্ত্রীকে বলে না, স্ত্রী স্বামীকে বলে না, বন্ধু বন্ধুকে বলে না, পিতা পুত্রকে বলে না, পুত্র পিতাকে বলে না। দেবতা আড়ালে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সভ্যতার সমস্ত উপাদান, সংসারের সমস্ত আয়োজন, পরিবারের সমস্ত সুখের অভিনয়ের মধ্যে মানুষের অন্তরতম দেবতার এই যে গোপন বেদনা—এই বেদনার ছবি আঁকিয়াছেন আমেরিকার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সিনক্লেয়ার লুইস্ (Sinclair Lewis) তাঁহার ব্যাবিট মেনষ্ট্রীট (*Babbit Mainstreet*) প্রভৃতি উপন্যাসগুলির মধ্যে। সমস্ত বন্ধনের বিরুদ্ধে দেবতার এই বিদ্রোহের গানই উৎসারিত হইয়াছে হুইটম্যানের কণ্ঠ হইতে। টলষ্টয়, ইবসেন, বার্ণর্ড-শ সকলের মধ্যেই বিদ্রোহী দেবতার এই অসন্তোষের সুর। মাঝে মাঝে কোথা হইতে আসে এইরূপ এক একজন অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাহারা হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়া দেয়, মানুষের গোপনতম কথা প্রকাশ করে। নির্ম্মম সত্যের অনাবৃত মুখের দিকে চাহিবার ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই আছে। তাই সত্যের দুঃসহ মুখকে ভীরু সমাজ ঢাকিয়া রাখে মিথ্যার মনোহর আবরণে। সেই আবরণ রচনা করিয়া থাকে প্রবীণ পাকার দল আর স্বপ্নবিলাসী কবিদের বাক্যজালের অলীক ইন্দ্রধনুচ্ছটা। শেলী, ইব্‌সেন, হুইটম্যান, বার্ণার্ড-শয়ের মত মানুষেরা আসিয়া সেই আবরণ ছিঁড়িয়া ফেলে, যাহা কালো তাহাকে কালো বলে; সত্যের অনাবৃত কঠিন নির্ম্মল রূপকে প্রকাশ করে। যে-কথা সকলেই জানিত অথচ কেহ কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না, যে-ব্যথা সকলেরই ব্যথা অথচ যাহা একে অন্যের নিকট মুখ ফুটিয়া বলিত না তাহাকে যে হাটে জানাইয়া দেয় সমাজ তাহাকে কোন দিনই ক্ষমা করে নাই। তাহাকে প্রবীণ পাকার দল ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছে, আগুনে পোড়াইয়াছে, তাহার পুত্রকন্যাকে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে, সমাজ হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহার উপর নিন্দা ও অপমানের বোঝা চাপাইয়াছে।

আমাদের মধ্যে বৃহত্তর, মহত্তর জীবনের জন্য এই যে বেদনা রহিয়াছে, এই বেদনাই আমাদিগকে বলিয়া দেয়, আমি আমাকে যত ভাল বলিয়া মনে করিতাম তাহার অপেক্ষা আমি অনেক ভাল, অনেক বড়।

"I am larger, better than I thought,
I did not know I hold so much goodness."

আমার মধ্যে দেবতা অমৃতের জন্য কাঁদিতেছে, তাই ত আমি বর্ত্তমানের বন্ধনকে অতিক্রম করিতে চাই। তাই ত আমার মধ্যে এই চাঞ্চল্য, এই অতৃপ্তি, এই সুদূরের পিপাসা। আমি ভিতরে ভিতরে শুধু বর্ব্বর নহি, আমি ভিতরে ভিতরে দেবতা। যেখানে আমি বর্ব্বর সেখানে আমাকে সাবধানে হিসাব করিয়া পথ চলিতে হইবে; কিন্তু যেখানে আমি দেবতা সেখানে আমি আশা করিব, বিশ্বাস করিব, আপনাকে শ্রদ্ধা করিব; সেখানে কোন দুঃখে আমি

বিমর্ষ হইব না, কোন পরাজয়ে পিছাইয়া যাইব না, কোন আঘাতে হৃদয়কে বিচলিত হইতে দিব না। অন্তরেই এই দেবতা-মানুষটির প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া ফ্রয়েড (Freud) বলিয়াছেন,—

"The normal man is not only far more immoral than he believes (referring to the repressed tendencies) but also far more moral than he has any idea of (referring to the Super-Ego)."

"প্রকৃতিস্থ মানুষ নিজেকে যেরূপ মনে করে, তার চেয়ে কেবল যে অনেক বেশী দুর্নীতিপরায়ণ তাহা নহে, কিন্তু তার চেয়ে এত বেশী সুনীতিপরায়ণ, যে, তাহা তাহার ধারণার অতীত।

প্রহরী যে-সকল ইচ্ছাকে চেতনার আলোকে আসিতে দেয় না, জ্ঞানের বাহিরে ঠেলিয়া দেয় সেই অনভিপ্রেত বিতাড়িত ইচ্ছাই গূঢ়ৈষণা (complex) বলিয়া অভিহিত হয়। দলিত ইচ্ছা সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। বাঁকাচোরা পথে ভোল বদলাইয়া চেতনার ক্ষেত্রে উহা দেখা দেয়। প্রথমদৃষ্টিতে তাহাকে চিনিতে পারা মুস্কিল—কিন্তু সূক্ষ্ম অন্তর্ভেদী দৃষ্টি লইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, আমাদের অনেক বিদলিত বিতাড়িত ইচ্ছাই পোষাক বদলাইয়া আমাদের স্বভাবের এবং আচার-ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পায়। গূঢ়ৈষণার একটি দৃষ্টান্ত আমরা নিম্নে দিলাম। এই দৃষ্টান্তটি লওয়া হইয়াছে ম্যাগডুগাল সাহেবের য়্যাবনর্ম্যাল সাইকলজী (Abnormal Psychology) হইতে।

রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের একজন উৎসাহী ধর্ম্মশিক্ষক গোঁড়া নাস্তিক হইয়া গেলেন। ভগবান নাই—ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার অপরিসীম উদ্যম দেখা যাইতে লাগিল। আপনার মত সপ্রমাণ করিতে বহু গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করিলেন। ধর্ম্মশিক্ষকের হঠাৎ এই অদ্ভুত ভাবান্তরের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখা গেল, তিনি একটি মেয়েকে ভালবাসিতেন। ঐ মেয়েটি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার সহিত পলায়ন করেন তিনি ছিলেন তাঁহার এক বন্ধু এবং রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের উৎসাহী সহকর্ম্মী। এই আচরণে সহকর্ম্মীর প্রতি তাঁহার মন অত্যন্ত বিরূপ হইয়া গেল। বন্ধুর উপর এই তীব্র বিতৃষ্ণাই প্রকাশ পাইল পূর্ব্বের ধর্ম্মবিশ্বাসগুলির প্রতি বিতৃষ্ণারূপে। কারণ ঐ সকল বিশ্বাসই যোগসূত্ররূপে বন্ধুর সহিত তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

এইরূপ অনুসন্ধানের ফলে জানা যায়, আমাদের মনের তলদেশে অনেক বিতাড়িত ইচ্ছা আত্মগোপন করিয়া থাকে। সেই গুপ্ত ইচ্ছাই অনেক সময়ে বিকৃত মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।

আমাদের মনে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার দ্বন্দ্ব লাগিয়াই আছে। কতকগুলি ইচ্ছা আছে যাহাদের মূল আমাদের আদিম প্রকৃতির মধ্যে নিহিত। যৌন ইচ্ছাকে আমরা এইরূপ একটি আদিমপ্রবৃত্তির মধ্যে গণ্য করিতে পারি। নরের নারীদেহের জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং নারীর নরদেহের জন্য আকাঙ্ক্ষা—ইহা চিরন্তন। কোন্ আদিকাল হইতে নরনারী পরস্পরকে তনুমন দিয়া আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছে। এক দিন ছিল যখন মানুষ সহজভাবে তাহার যৌন-আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করিতে পারিত। বিধি-নিষেধ তখন যে ছিল না—এমন নহে। তবে এখনকার মত এত বেশী ছিল না। মানুষের সৃজন-শক্তির প্রকাশ তখন দেহের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে মানুষ সভ্যতার সোপানে যতই উঠিতে লাগিল ততই সে দেখিতে পাইল, কতকগুলি আদিম প্রবৃত্তি লইয়াই তাহার জীবন নহে। তাহার অন্তরের মধ্যে রহিয়াছে অসীমের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিবার দুর্নিবার পিপাসা; তাহার আত্মায় আত্মপ্রকাশের ক্রন্দন। মানুষ দেহের স্তর অতিক্রম করিয়া মনের স্তরে উঠিল এবং সমাজকে নূতন ভাবে গড়িল। এই নূতন সমাজ আদিম প্রবৃত্তিগুলির আহ্বানকে উপেক্ষা করিতে সাহস করিল না বটে, কিন্তু বিধি-নিষেধের পর বিধি-নিষেধের সৃষ্টি করিয়া সেই প্রবৃত্তিগুলিকে খর্ব্ব করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

একদিকে সমাজের বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলগুলি এবং আর একদিকে আদিম প্রকৃতির দুর্ব্বার দাবি—এই দুইয়ের সংঘর্ষের ফলে আমাদের অনেকের জীবন ফেনিল, বিষময় এবং দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। যখন সমস্যার কোনরকমেই নিরাকরণ করিতে পারি না তখন তাহার সমাধানের জন্য আমরা অবদমন অথবা নিগ্রহের পন্থা অবলম্বন করি। মনের মধ্যে যৌন ইচ্ছা বা অন্য কোন আদিম ইচ্ছা জাগিলেই সেই ইচ্ছাকে জোর করিয়া ঠেলিয়া ফেলি। ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার সংঘর্ষ হইতে মনের মধ্যে যে অশান্তি জাগে একটি ইচ্ছাকে দমন করিবার ফলে সেই অশান্তির হস্ত হইতে কিছুকালের জন্য আমরা রক্ষা পাই এবং তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলি, আঃ বাঁচিলাম।

কিন্তু ভবী ভুলিবার নয়। সমাজ ও প্রকৃতি—এই উভয়ের দাবির মধ্যে সমাজের দাবি মানিয়া লইয়া মনে করিলাম, খুব জিতিয়া গিয়াছি—দুই সতীনের টানাটানির মধ্যে পড়িয়া আর প্রাণান্ত হইতে হইবে না! প্রত্যাখ্যাতা প্রকৃতি এবার নিষ্কৃতি দিবে।

কিন্তু প্রকৃতি এত সহজে কাহাকেও নিষ্কৃতি দেয় না। সে অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া নিঃশব্দে প্রতিশোধের পথ খুঁজিয়া বেড়ায়। আমাদের এই আদিম প্রকৃতি বেগবতী পার্ব্বত্য নদীর মত। আমরা এই নদীর সম্মুখে নিগ্রহের পাথর ফেলিয়া মনে করি, জলধারাকে পাষাণশৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিলাম। কিন্তু নদী বাঁধা পড়ে না। সোজা সহজ পথ ছাড়িয়া উহা বাঁকিয়া অন্যপথে প্রবাহিত হইবার চেষ্টা করে।

আমাদের আদিম প্রবৃত্তিগুলি সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। সেই প্রবৃত্তিগুলির বেগ অতি প্রচণ্ড। মনের যৌন-ইচ্ছার দুর্ব্বার শক্তিকে ফ্রয়েড বলিয়াছেন লিবিডো। এই লিবিডোর সহজ প্রকাশকে যখনই আমরা চাপিয়া মারিবার চেষ্টা করি ধর্ম্মের নামে, নীতির নামে, সংযমের নামে তখনই দেখিতে পাই, অবরুদ্ধ ইচ্ছা মনের অতল গুহায় ফেনিল আবর্ত্তনের সৃষ্টি করে। আমাদের ভিতরে ভিতরে একটা দারুণ সংগ্রাম চলিতে থাকে। সেই সংগ্রাম নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রাম। একদিকে উদ্দাম আদিম যৌনপ্রবৃত্তির দাবি, আর একদিকে সংযমের দাবি, ত্যাগের দাবি, নীতিধর্ম্মের দাবি। যুদ্ধ করিতে করিতে মনের শক্তি চলিয়া যায়, সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা হ্রাস পায়, অশ্রুজল এবং দীর্ঘশ্বাসে জীবন ভরিয়া উঠে, আমরা দিন-দিন নিস্তেজ হইয়া পড়ি।

আমাদের অনেক মনের অসুখের কারণ এই অবদমন অথবা নিগ্রহ। নিগৃহীত ইচ্ছাগুলি মনের কোণে জঞ্জালের সৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত উৎকট আকারে ব্যবহারে আত্মপ্রকাশ করে। হিষ্টিরিয়া অসুখের কারণ অনেক সময়েই এই নিগ্রহ। বাল্যেই স্বামী হারাইয়াছে—এমন অনেক বর্ষীয়সী পল্লী-বিধবাকে পরছিদ্র অন্বেষণে অত্যন্ত উৎসাহী দেখা যায়। কে কাহার সহিত কু-অভিপ্রায়ে হাস্যালাপ করিয়াছে, কাহার সহিত কাহার অবৈধ প্রণয় জন্মিয়াছে,—পল্লীর সমস্ত ঘটনা তাহাদের নখদর্পণে এবং সেই সমস্ত প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার লইয়া পথেঘাটে তাহাদের আলোচনার অন্ত নাই। অন্যের প্রণয়-ঘটিত দুর্ব্বলতা লইয়া এই অত্যধিক মাথাঘামানোর মূলে নিজের নিগৃহীত যৌন-ইচ্ছার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নাই। অনেক সময়ে এইরূপ নারীর দিকে কেহ নির্ম্মল দৃষ্টিতে চাহিলেও সে মনে করে এবং বলিয়া বেড়ায়, অমুক লোকটা অত্যন্ত অসচ্চরিত্র। সে নারীর মর্য্যাদা জানে না। আসলে মেয়েটির নিজের মনেই যৌন-ইচ্ছা জাগিয়া রহিয়াছে। নিজের সেই অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই সে অন্যের উপর বৃথা আরোপ করে।

তবে কি নিগ্রহ অথবা অবদমন আমাদের কল্যাণের পথে অন্তরায়? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। উহার উত্তরে 'না' এবং 'হাঁ' দুই-ই বলা যাইতে পারে। নিগ্রহ আমাদের দেহের এবং মনের কি পরিমাণ ক্ষতি করে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অবদমনের মধ্যে রহিয়াছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ইহা অস্বাভাবিক। দেহ এবং দেহের ক্ষুধাকে অস্বীকার এবং ঘৃণা করিবার অধিকার আমাদিগকে কে দিয়াছে? আমার দেহ ভগবানের মন্দির—আমার প্রতি অঙ্গে বিধাতার চুম্বনের ছাপ!

ছেলেবেলা হইতে আমরা শুনিয়া আসি, মানুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা একটা অপরাধের ব্যাপার। দেহের ক্ষুধার মধ্যে আছে কেবল পশুর প্রবৃত্তি। ফলে প্রবৃত্তিগুলিকে আমরা গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করি। পারি না; প্রকৃতি পরিশোধ লয়। এই জন্যই মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন,

"আমাদের অন্তরের যৌনপ্রবৃত্তিকে সুপথে পরিচালিত করিতে হইলে একটি জিনিষের প্রয়োজন আছে। আমরা এ-পর্য্যন্ত প্রবৃত্তির দাবিগুলিকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখান করিয়া আসিয়াছি। এখন হইতে এই দাবিগুলির প্রতি আমাদিগকে আরও সদয় হইতে হইবে।" *(Outline of Modern Knowledge)*

কিন্তু সহজ আদিম প্রবৃত্তি যখন একান্ত বড় হইয়া উঠে তখনও সর্ব্বনাশের কারণ ঘটে। আমাদের মনের মধ্যে যে যৌন-ইচ্ছার দুর্ব্বার শক্তি পুঞ্জীভূত রহিয়াছে তাহাকে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির পথে যথেচ্ছ পরিচালিত করিলে উচ্চতর বৃত্তির বিকাশ হওয়া অসম্ভব। আমাদের জীবন শুধু দেহকে ঘিরিয়া নহে। দেহকে ছাড়াইয়া আমরা মনের ক্ষেত্রেও বিচরণ করিতে পারি। আমরা কেবল আহার এবং বংশবৃদ্ধি করি না। আমাদের মধ্যে রহিয়াছে সুদূরের পিপাসা, সুন্দরের স্বপ্ন, আলোকের ধ্যান। সেই পিপাসা এবং স্বপ্ন হইতে যুগে যুগে কবিতার জন্ম হইয়াছে, সঙ্গীতের প্রস্রবণ বহিয়াছে, তাজমহল ফুটিয়াছে, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ঘটিয়াছে। অন্তরের সমস্ত শক্তি যদি ইন্দ্রিয়ের পথে ধাবিত হইয়া আপনাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলে তবে মনের রাজ্যে আমরা দেউলিয়া হইয়া যাইব। এইজন্য শক্তির সঙ্গে সংযমের প্রয়োজন। যে বিরাট আদিশক্তির উৎস হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে সেই শক্তির খানিকটা অংশ আদিম যৌন প্রবৃত্তির পথে পরিচালিত করা সমীচীন। কিন্তু সেই প্রবৃত্তির খেলা কখনও উদ্দাম হইবে না। শক্তির ধারাকে ইন্দ্রিয়ের খাত হইতে উচ্চতর সৌন্দর্য্য এবং আনন্দসৃষ্টির নব-নব খাতে বহাইতে হইবে। মানুষের ইতিহাসকে যাঁহারা প্রতিভার দানে সম্পদশালী করিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলের মধ্যেই যৌন-শক্তি রূপান্তরিত হইয়া প্রেমের মধ্যে, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে সার্থক করিয়াছে। তাহা উদ্দাম ভোগের পথে অথবা অন্তরের দ্বন্দ্বের জটিলতার মধ্যে ব্যর্থ হয় নাই।

"All great mystics and the majority of great idealists, the giants among the creators of spirit have clearly and instinctively realized what formidable power of concentrated soul, of accumulated creative energy, is generated by the renunciation of organic and psychic expenditure of sexuality. Even such free-thinkers in matters of faith, and such sensualists as Beethoven, Balzac and Flaubert, have felt this."

(Romain Rolland—*Ram Krishna's Life.*)

"Chastity is the flowering of man; and what are called Genius, Heroism, Holiness and the like, are but various fruits which succeed it." (Thoreau—*Walden*).

আমাদের বক্তব্য বিষয়কে আরও পরিস্ফুট করিবার জন্য আমরা রোমা রঁলা এবং থোরোর লেখা উপরে উদ্ধৃত করিলাম। যৌনশক্তিকে এই উচ্চতর শক্তিতে রূপান্তরিত করাকেই ফ্রয়েড বলিয়াছেন Sublimation বা উদ্গতি।

যাঁহারা প্রতিভাবান এবং যাঁহারা মানসিক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত—এই উভয় শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভেদরেখা অত্যন্ত ক্ষীণ। পাগল এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি উভয়েই প্রবল প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। উদ্দাম ভাব না থাকিলে কোন মানুষ বড় হইতে পারে না। উহা কাজের মধ্যে বেগ আনিয়া দেয়। যেখানে উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলি সত্য, শিব ও সুন্দরের পথে ধাবিত হয়, যেখানে মনের আদিম সহজ ইচ্ছাগুলি একটি বিরাট মহান্ আদর্শের কাছে মাথা নত করে, সেখানে মানুষ হইয়া উঠে প্রতিভাবান অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন। যেখানে উদ্দাম আদিম প্রবৃত্তিগুলি ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রকে অতিক্রম করিতে পারে না, যেখানে ইচ্ছার সঙ্গে রহিয়াছে ইচ্ছার দ্বন্দ্ব, প্রবৃত্তির সঙ্গে রহিয়াছে প্রবৃত্তির বিরোধ, যেখানে একটি মাত্র অত্যুচ্চ আদর্শ বিভিন্নমুখী ইচ্ছাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে না, সেখানে হৃদয় মগের মুল্লুক হইয়া উঠে। সেই হৃদয় হয় পাগলামীর আড্ডা, ব্যর্থতার মরুভূমি, ব্যাধির আলয়। সেই জীবনই হইতেছে পরিপূর্ণ সার্থক জীবন, যেখানে ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে, যেখানে প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব মিটিয়াছে, যেখানে দেহ আত্মাকে স্বীকার করে, আত্মাও দেহকে স্বীকার করে, যেখানে ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভেদের কোলাহল নাই, যেখানে জীবনের সকল সুর একত্র মিলিত হইয়া এক অখণ্ড ঐকতানের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকেই ম্যাগডুগাল সাহেব বলিয়াছেন স্বরাট্ আত্মন্ (autonomous self); গীতা বলিয়াছে যতাত্মা।

ব্যাঙ্কিং-জগতে বাঙালীর স্থান

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

বাংলা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান আজ কত পশ্চাতে, তাহা আমরা প্রত্যেকেই অবগত আছি; তাহার আর্থিক দুর্গতি প্রতিনিয়ত আমাদের চক্ষুর সম্মুখে অতি করুণভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে; ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাহার ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের বেদনা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। এই দারুণ দুর্দ্দশার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, সর্ব্বসাধারণকে, বিশেষতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায়কে, বিগত পঞ্চাশ বৎসরের কর্ম্মপন্থার অনেকটা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এযাবৎ কৃষিকার্য্যের উন্নতি-অবনতির উপরই প্রায় সকল প্রকার ব্যবসায়ীর লাভক্ষতি নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এতদিন শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মনোযোগী না হইয়া, নিজেদের সামান্য ক্ষেতখামারের রক্ষণাবেক্ষণ, জমিদারী, চাকুরি, ডাক্তারী বা ওকালতী প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকিতেন। ফলে এই হইয়াছে যে, তাঁহাদের পরিত্যক্ত ক্ষেত্রে অবাঙালী কায়েমী হইয়া বসিয়া গিয়াছে এবং দুনিয়ার ধনদৌলত যত, তাহারাই এখন ভোগ করিতেছে। শুধু ওকালতী, ডাক্তারী, জমিদারী প্রভৃতির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া বাঙালীর আর চলিতেছে না; উপস্থিত সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এতদিনের পরিত্যক্ত শিল্প-ব্যবসায়ের প্রতি তাহাকে আজ অধিকতর মনোযোগী হইতে হইবে। এস্থলে কেহ যেন মনে না করেন, আমি চাকুরি, জমিদারী—এই সকলকে অবহেলা করিতে বলিতেছি। আমার বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমানে দেশের আশু উন্নতিবিধান করিতে হইলে প্রধানতঃ শিল্প-বাণিজ্যের পথই অবলম্বনীয়। কিন্তু এই পথে বাঙালীকে যথেষ্ট প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। বিদেশী এবং অবাঙালী ব্যবসায়িগণ এই ক্ষেত্রে যে ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া বসিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের প্রবল শক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠা স্থাপন করা বর্ত্তমানে একমাত্র বাংলার প্রতি বাঙালীর মমত্ববোধ এবং সঙ্ঘবদ্ধতা দ্বারাই সম্ভবে।

ব্যবসায় বা শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং তাহার পরিচালনার জন্য, ব্যবসায়-শিল্পের মেরুদণ্ড যে অর্থ-শক্তি, সেই অর্থ-শক্তি সঞ্চয় করিতে হইলে বাঙালীর এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন,—সঙ্ঘবদ্ধতা। বর্ত্তমান জগতে যে আর্থিক সঙ্ঘশক্তির উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসায়-শিল্পের মূলধন সংগৃহীত হইতেছে, ব্যাঙ্ক তাহারই একটি নিদর্শন। আজিকার দিনে এই চট্টগ্রাম শহরে যে শাখা-প্রতিষ্ঠানটি জন্মলাভ করিতেছে, তাহাকে আমি বাঙালীর জাগ্রত সঙ্ঘশক্তির নিদর্শন বলিয়া মনে করিতেছি। এই প্রকার প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সহিত সমগ্র বাঙালীজাতির শিল্পব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনা যে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে, একথা বলাই বাহুল্য। এই ভাবী মঙ্গলের সম্ভাবনায় আজিকার অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিতেছি। শুধু আনন্দিত কেন,—আপনাদের এই প্রচেষ্টা আমাকে বিশেষ আশান্বিতও করিয়াছে। চট্টগ্রাম বাংলার দ্বিতীয় প্রধান বন্দর, এই বন্দরের শিল্প

এবং ব্যবসায় এখনও সম্পূর্ণ বিস্তার লাভ করে নাই ; শীঘ্রই ইহা ব্যবসায়-বাণিজ্যের একটি বিরাট কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই বন্দরের উন্নতিশীল ব্যবসায়ে বাঙালী তাহার ন্যায্য স্থান অধিকার করিয়া লউক,—ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙালীজাতির যে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহা আজ সকলেই অনুভব করিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠালাভের অনুকূলে চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতকগুলি লক্ষণ বর্ত্তমান দেখিতেছি। বর্ত্তমানে কলিকাতায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্যবসায়িগণ যেরূপ বিস্তৃত ও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে সেখানে বাঙালীর পক্ষে এখন আপনার স্থান করিয়া লওয়া সহজসাধ্য নহে। কিন্তু চট্টগ্রামের অবস্থা এখনও তেমন সমস্যাসঙ্কুল হইয়া উঠে নাই ; এখানে বিদেশীয় এবং অবাঙালী-সম্প্রদায় এখনও তেমন প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই ;—বাঙালীর পক্ষে এখানে ব্যবসায়শিল্পে যথাযোগ্য স্থান করিয়া লইবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। যে-সকল প্রতিকূল কারণে কলিকাতার ব্যবসায়ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঙালীর পক্ষে আপাততঃ নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার বলিয়া মনে হয়, চট্টগ্রামে সে-সকল কারণ অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেও, কৃতকার্য্য হইবার পক্ষে অনুকূল কারণও যথেষ্ট আছে। বাঙালী ব্যবসায়িগণ এবিষয়ে অবহিত হইয়া যাহাতে তাঁহারা এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাহার জন্য এখন হইতেই চেষ্টা করা উচিত। এখানকার এই সমবেত ব্যবসায় প্রচেষ্টাকে সফল করিবার কার্য্যে এই নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কটি যথেষ্ট সহায়তা করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। শিল্পবাণিজ্যের সম্প্রসারণের দিক দিয়া যে ইহার বিশেষ সার্থকতা আছে, তাহা বিস্তৃতভাবে বলা অনাবশ্যক।

এই উৎসবের আরও একটি বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া আমার মনে হয়। আমাদের দেশে ব্যবসায় শিল্পে আত্মনিয়োগের প্রচেষ্টা এবং আকাঙ্ক্ষা এখনও তেমন বিস্তৃতিলাভ করে নাই। এই প্রচেষ্টাকে ব্যাপকভাবে জাগ্রত করিতে হইলে সাধারণের মনোযোগ ক্রমাগত এইদিকে আকর্ষণ করিতে হইবে। আজিকার এই উৎসব সেই বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিবে বলিয়াই আমার মনে হয়।

বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি ও প্রসারকল্পে এই প্রকার ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ও প্রভাব যে কত বেশী তাহা আজ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে ব্যাঙ্ককে দেশের ধনসম্পদের মাপকাঠি বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে; কারণ সেখানে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য—সকলেরই ভারকেন্দ্র ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের উপর। সেই সকল দেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সুহারতার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্কই সরবরাহ করিয়া থাকে এবং ঐ সকল কার্য্যক্ষেত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের কারবারও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্কের সঙ্গে কৃষি-শিল্পাদির এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ইহাকে অন্যতম জাতীয় প্রধান প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করা হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যাঙ্কের শুধু এই সকল প্রয়োজনীয়তার দিক লক্ষ্য করিয়াই যে আমি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের শাখা-প্রতিষ্ঠানকে চট্টগ্রামের কার্য্যক্ষেত্রে বরণ করিতেছি, তাহা নহে। আমাদের বাংলা দেশে বাঙালীর আর্থিক জীবনে এইপ্রকার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যে আরও গুরুতর ও ব্যাপক তাহা বাংলা দেশে ব্যাঙ্কিং কারবারের উদ্ভব ও প্রসারের তুলনায় তাহার বর্ত্তমান ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শিল্পের আর্থিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে।

আপনারা জানেন, বাংলা দেশে মহাজনীরীতিতে টাকা ধার দিবার প্রথা অনেককাল হইতেই প্রচলিত আছে ; এই প্রকার বিষয় অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, মহাজনগণ আপন আপন মূলধনে আপন আপন কারবারই চালাইয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত কর্জ্জের টাকা অধিকাংশ স্থলেই 'জমি-বন্ধকী' কারবারে নিয়োজিত হইয়াছে। বহু জনের টাকা সংগ্রহ করিয়া ব্যাপকভাবে লগ্নীকারবার করার প্রথা সাধারণতঃ এই মহাজনী-কারবারের অঙ্গীভূত ছিল না। ভূ-সম্পত্তির প্রতি অত্যধিক মোহবশতঃ প্রত্যেক মহাজনই নিজ নিজ সংস্থান অনুযায়ী কর্জ্জ দিতেন। আর বাংলার 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' এই প্রদেশের ভূ-সত্ত্বের উপর যে অসাধারণ মূল্য আরোপ করিয়াছে, তাহাতে জমির উপর টাকা ধার দেওয়া এতকাল খুব সহজ ও নিরাপদ বলিয়াও বিবেচিত হইয়াছে। বাংলার ব্যাঙ্কিং-কারবারের ক্রমবিকাশের ইহাই প্রথমাবস্থা ;—ইহার জের এখনও চলিতেছে।

তারপর বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে এই ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়—বাংলা দেশে বাঙালীর চেষ্টায় যৌথনীতি কারবারের সূত্রপাতের সহিত। ইহাতে দেশের জনসাধারণের সঞ্চিত টাকা বিভিন্ন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত হইতে থাকে এবং তাহার সাহায্যে দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনের পথ প্রস্তুতিরও সুযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই ব্যাঙ্কিং-প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রথমাবধিই কতকটা নিজের উদাসীনতায়, কতকটা বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে টাকা খাটাইবার উপযুক্ত উপায়ের অভাবে, তাহাদের সংগৃহীত অর্থ পূর্ব্বোক্ত মহাজনদিগের ন্যায়ই মুখ্যতঃ 'জমী-বন্ধকী' কারবারে নিয়োজিত করিতে থাকে। টাকা-লগ্নী ব্যাপারে খাঁটি কমার্শ্যাল বা বাণিজ্যসহায়ক ব্যাঙ্কের সহিত বাংলার এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষ একটা পার্থক্য লক্ষিত হওয়ায় এইগুলিকে 'লোন-অফিস' আখ্যা দিয়া বিভিন্ন পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়।

বাঙালীর শিল্পব্যবসায় এই লোন-অফিসগুলিদ্বারা পুষ্টিলাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যে

সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এযাবৎ মহাজনেরা নিজেই দিয়াছেন ;—কখনওবা নিজ জামিনে অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রয়োজন মিটাইয়াছেন। কিন্তু এই প্রকার ব্যক্তিগত সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান ব্যবসায়-জগতে দীর্ঘকালের জন্য টিকিয়া থাকা সম্ভবপর নহে ; কারণ, দেশের ব্যবসায়ের পোষকতা করিবার সমগ্র শক্তি কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে কখনও যথেষ্ট হইতে পারে না। যে-যুগে বাংলার লোন-অফিসগুলি ব্যবসায়-শিল্পের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া কেবলমাত্র জমি-বন্ধকী-কারবারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, দেশের শিল্প-জীবনে তাহাকে 'অন্ধযুগ' বলা যাইতে পারে। বাঙালীজাতি তখন চাকরি, জমিদারি প্রভৃতির মোহে আকণ্ঠ ডুবিয়াছিল। সেই সুযোগে ইংরেজ বণিকগণের সহিত একযোগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত অবাঙালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বাঙালীকে ব্যবসায়-শিল্প হইতে স্থানচ্যুত করিয়া আপনাদিগকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

এইরূপে একদিকে যেমন লোন-অফিসগুলি হইতে বাঙালী ব্যবসায়িগণ কোনও সাহায্য পান নাই, তেমনি আবার লোন-অফিসগুলিও ব্যবসায়-শিল্পের প্রতি বাঙালীর বিমুখতার জন্য খাঁটি কমার্শ্যাল বা বাণিজ্যসহায়ক ব্যাঙ্করূপে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ফলে, বাঙালীর লোন-অফিস এবং বাঙালীর ব্যবসায় দুই-ই আজ এই প্রকার বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

এই লোন-অফিসগুলি অনেক স্থলেই কমার্শ্যাল বা বাণিজ্য-সহায়ক ব্যাঙ্কের মূলনীতি অনুসারে সংগঠিত। ইহাদের মূলধনের অধিকাংশই অল্পকালের জন্য আমানতহিসাবে রক্ষিত টাকা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই টাকা আমানত-কারীদিগকে অল্পকাল মধ্যেই ফিরাইয়া দিবার সর্ত্ত থাকার দরুণ লোন-অফিসগুলির উচিত ছিল,—অল্পকালের জন্যই ঐ টাকা লগ্নী করা। কিন্তু এই দিকে লক্ষ্য না করিয়া অধিকাংশ লোন-অফিসই আমানতী টাকা জমিবন্ধকী কারবারে নিয়োগ করিয়াছে। আজ ব্যবসার বাজার মন্দা, জমির মূল্য কম ; কাজেই সেই টাকা আদায় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ফলে, লোন-অফিসগুলির অবস্থাও আজ শঙ্কাজনক।

এই লোন-অফিসগুলি বিভিন্ন লোকের সঞ্চিত টাকা সংগৃহীত করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে সন্দেহ নাই ; বর্ত্তমানে ব্যবসার বাজার মন্দা এবং জমির মূল্য হ্রাস না হইলে হয়ত এগুলির তেমন দুরবস্থা হইত না। কিন্তু ব্যবসায়সঙ্গত উপায়ে কার্য্য পরিচালনা না করার জন্য বাংলার লোন-অফিসগুলির পক্ষে যে সম্যক্ সাফল্য লাভ করা অসম্ভব ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক, কি ভাবে কার্য্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিলে লোন-অফিসগুলি বর্ত্তমান বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহা এখনও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

বাংলায় বাঙালীপরিচালিত ব্যাঙ্কিং-কারবারের প্রসার সম্বন্ধে এখন আমাদের ব্যাপকভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। 'এই কারবারে বাঙালীর যথেষ্ট উদ্যম নাই'—এ-কথা সত্য নহে। এই প্রদেশে বাঙালীর উদ্যোগেই সত্তর বৎসর পূর্ব্বে প্রথম লোন-অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই হইতে এপর্য্যন্ত বাঙালীর চেষ্টায়,—বাঙালীর মূলধনে যত লোন-অফিস স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা আট শতেরও অধিক হইবে ; ইহাদের সবগুলিই যৌথনীতিতে প্রতিষ্ঠিত। সংখ্যাহিসাবে ভারতের অন্য কোন প্রদেশে এত ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠান হয় নাই। কিন্তু আপনারা মনে করিবেন না,—এই সংখ্যাবাহুল্য বাংলার ব্যাঙ্ক-সমৃদ্ধির পরিচায়ক। এই সকল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার মধ্যে কোন ব্যাপক পরিকল্পনা নাই ; অবস্থার সংঘাতে পড়িয়া এগুলি ক্রমশঃ বাণিজ্যসহায়ক অথবা কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কের মূলনীতি হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে এবং ব্যাঙ্কের কারবারের কেবলমাত্র একটি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে ; কিন্তু এই সীমাবদ্ধ কার্য্যপদ্ধতি যে ব্যাঙ্ক-পরিচালন নীতির দিক দিয়া মোটেই নিরাপদ নহে, তাহা পূর্ব্বে কেহই বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই ; তাই আজ বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কিং কারবার সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও হীনশক্তি এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—এতদিন বাঙালীর প্রচেষ্টায় যে-সকল ব্যাঙ্কিং-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সংগৃহীত টাকা মুখ্যতঃ জমি-বন্ধকী কারবারেই নিয়োজিত হইয়াছে এবং সেই কারণে ব্যবসার জন্য যে-প্রকার ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা থাকার দরকার, সে প্রকার ব্যবস্থা করা হয় নাই। বাংলার লোন-অফিসগুলি একান্তভাবে জমি-বন্ধকী কারবারে আত্মনিয়োগ করিয়া ভুল করিয়াছে। আমার এ-কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, বাংলার ব্যাঙ্কসংস্থানে জমি-বন্ধকী কারবারের স্থান অপ্রধান। বাংলার ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে এই কারবারের যে নিতান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু ক্ষুদ্রশক্তি লোন অফিসগুলি এই প্রকার কারবারের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়সম্মত ব্যাঙ্ক-পরিচালনা-পদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই,—ইহাই আমার মন্তব্য। এই সঙ্গে আমি ইহাও বলিতে চাই যে, জমি-বন্ধকী কারবারের প্রতি অত্যধিক আসক্তি থাকার দরুণ আমাদের ব্যাঙ্কিং-কারবারের প্রসার বিভিন্নমুখী হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান জগতের অগ্রণী দেশগুলির দিকে যখনই দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমরা ব্যাঙ্কের মধ্যে বিবিধ শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাই। সর্ব্বত্রই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। এই সকল ব্যাঙ্কের মূলধন সংগ্রহের পদ্ধতি ও লগ্নীব্যবস্থার উপর ইহাদের শ্রেণী-বিভাগ নির্ভর করে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি-

বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণের স্থিতিকাল সমান নহে; এই বিভিন্ন প্রকার ঋণের স্থিতিকাল অনুসারে ব্যাঙ্কেরও অর্থসংগ্রহের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। দেশের আর্থিক সংস্থানে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য—এই তিন প্রকার কর্ম্মক্ষেত্রই প্রশস্ত,—এই তিনটিই অবলম্বনীয়; ইহাদের কোনটিকেই উপেক্ষা করা সমীচীন হইতে পারে না এবং প্রত্যেকটির জন্যই যথাযথ ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা থাকা দরকার।

জমি-বন্ধকী কারবারের জন্য এদেশে ব্যাঙ্কের গঠন এবং পরিচালনপদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে 'ভারতীয় ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটি' যে বিস্তারিত অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহা হয়ত আপনারা অবগত আছেন। এই তদন্ত কমিটির প্রস্তাব অনুসারে বাংলার গবর্ণমেণ্ট কিছুদিন পূর্ব্বে মৈমনসিংহে এবং কুমিল্লায় দুইটি 'জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক' স্থাপনের আয়োজন করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট সুদ দিবার জামীন স্বীকারে 'ডিবেঞ্চার' অর্থাৎ দীর্ঘকাল মেয়াদে পরিশোধনীয় প্রতিজ্ঞাপত্র বিলি করিয়া, এই সকল ব্যাঙ্কের মূলধন সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং এই টাকা দ্বারা বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি কৃষক ও জমিদারবর্গের পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধের সহায়তা করিবে। জমিবন্ধকী কারবারের জন্য যে-মূলধন প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিতে হইলে দীর্ঘকাল মেয়াদী আমানত অথবা হস্তান্তর-যোগ্য ডিবেঞ্চার বিক্রয়ই প্রকৃষ্ট পথ। বাংলা গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থায় শেষোক্ত উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আমাদের লোন-অফিসগুলি মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে সর্ব্বতো-ভাবে অনতিকালস্থায়ী আমানতের উপর নির্ভরশীল হইয়াও জমি-বন্ধকী কারবারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। তাহার অবশ্যম্ভাবী কুফল আপনারা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আজ এখানে যে ব্যাঙ্কের শাখা-কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহা প্রধানতঃ কমার্শ্যাল বা বাণিজ্যসহায়ক ব্যাঙ্কের আদর্শে পরিচালিত; কাজেই এখানে লোন-অফিসের সমস্যার আর বিস্তৃত পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

বাংলাদেশে কমার্শ্যাল বা বাণিজ্যসহায়ক ব্যাঙ্কিং-কারবার এখন মুখ্যতঃ বিদেশীয় এবং ভিন্ন প্রদেশবাসিগণের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়া রহিয়াছে। কলিকাতার ন্যায় বন্দর, যেখানে বাংলার প্রায় সমগ্র অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এবং যেখানে ব্যবসায়গত কর্জ্জ সরবরাহ করিবার সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রহিয়াছে, সেখানেও দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙালীর প্রচেষ্টায় কোন বৃহৎ কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

বাংলায় ব্যাঙ্কিং-কারবারের প্রসার আলোচনা করিতে গিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, বিদেশীয় বা ভিন্নপ্রদেশবাসী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইলেও শিল্প-ব্যবসায়ের সাহায্যকল্পে যে যে প্রকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, বাংলায় তাহার অভাব নাই। কেহ কেহ আবার বাংলায় স্বত্বাধিকারীনির্ব্বিশেষে বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলির মোট কারবারের পরিমাণ লক্ষ্য করিয়া, তাহাকেই বাংলার ধনসম্পদের বাস্তব মাপকাঠি বলিয়া ভ্রম করিয়া বসেন। সত্য বটে, বিদেশী একসচেঞ্জ ব্যাঙ্ক এবং কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কগুলির সহায়তায় বাঙালী ব্যবসায়িগণও কোন কোন ক্ষেত্রে অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য চালাইতে সক্ষম হইতেছেন; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা কোনমতেই স্বীকার করা যায় না যে, বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যাঙ্কের প্রয়োজন নাই, তাহার অভাব আমরা অনুভব করিতেছি না। দুর্ভাগ্যক্রমে আজ বাংলা এবং বাঙালী তুল্যার্থবোধক কথা নহে। আপনারা এখানে যাঁহারা ব্যবসায়ী রহিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, বিদেশীয় ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের স্বদেশবাসী ব্যবসায়িগণের ব্যবসায়ের পোষকতা করিবার জন্য অনেক বিষয়ে তাহাদিগকে অনেক সুবিধা দিয়া থাকে; পক্ষান্তরে বাঙালীরা সে-সকল সুবিধা পায় না। অগ্নিবীমা, নৌ-বীমা প্রভৃতির সুবিধা বিদেশী প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলি হইতে বাঙালী ব্যবসায়িগণ কখনও আশা করিতে পারেন না। ঐ সকল ব্যাঙ্কে বাঙালীদিগকে কেরাণী প্রভৃতি নিম্নস্তর কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করা হয় বটে, কিন্তু কোন দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ পদে প্রায়ই তাহাদিগকে স্থান দেওয়া হয় না। এই প্রকার আচরণ যে সকল ক্ষেত্রেই পক্ষপাতমূলক, তাহা বলিতে চাই না। ব্যাঙ্কিং-কারবারে অনেক সময় ইহা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ এই-সব কারণেই ব্যাঙ্ক জাতীয়প্রতিষ্ঠান রূপে গণ্য হইয়া থাকে।

আজ আমরা বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক শুধু ব্যাঙ্কিং-কারবারের জন্যই চাহিতেছি না;—এই প্রতিষ্ঠান বাঙালীর শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া বাঙালী জাতির প্রতি বাঙালীর

মমত্ববোধ জাগাইয়া তুলিবে, ব্যবসায়-শিল্পের প্রতি বাঙালীকে অনুপ্রেরণা দিবে এবং এই ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারে তাহাকে সহায়তা করিবে, এইগুলিও এই প্রকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য। বেকার-সমস্যা সমাধানের দিক দিয়া বিচার করিলেও বাংলা দেশে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের প্রয়োজন যে যথেষ্ট রহিয়াছে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

দেশের অর্থনৈতিক জীবনে কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কের প্রয়োজনের প্রতি বাঙালীর মনোযোগ যে আকৃষ্ট হয় নাই, এমন নহে। বস্তুতঃ, স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতেই এ-বিষয়ে বাঙালী জাতি অবহিত হইয়াছে। অল্পকালমধ্যেই অনেকের সমবেত চেষ্টায় কলিকাতায় দুইটি কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ইহার একটি 'বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,' অপরটি 'হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক'। দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুইটি ব্যাঙ্কই কারবার বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক দুইটির শোচনীয় পরিণতির জন্য বাঙালীর ব্যাঙ্ক-পরিচালনের অক্ষমতার উপর যে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে, তাহার গ্লানি এখনও আমরা ভোগ করিতেছি। কিন্তু ইহার জন্য আমাদের নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই। এই সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আমি কয়েকটি কথা বলিতে চাহি।

আমার মনে হয়, যাঁহারা এই দুই ব্যাঙ্কের দৃষ্টান্তে বাঙালীর ব্যাঙ্ক-পরিচালনার ক্ষমতার উপর কটাক্ষপাত করেন, বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কের ইতিহাসের সহিত তাঁহাদের সম্যক পরিচয় নাই। প্রথম কথা,—অসাধুতাই ব্যাঙ্কের সর্ব্বনাশ ঘটিবার একমাত্র মুখ্য কারণ নহে। তা ছাড়া অসাধুতা কোন ব্যাঙ্কের সর্ব্বনাশ সাধনে সমর্থ হইলেও এ-কথা মনে রাখা দরকার যে, এই দোষ সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে বিরাজ করিতেছে এবং সর্ব্বত্রই কোন-না-কোন ব্যাঙ্ক ইহার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; কিন্তু পৃথিবীর কোন অগ্রণী দেশেই এই কারণে ব্যাঙ্কের প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি প্রতিহত হয় নাই।

বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পতনের পর আমি তাহার যথাযথ কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। এই অনুসন্ধানের ফলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের এই প্রকার দুর্গতির মুখ্য কারণ হইল,—সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার অভাব। ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীবৃন্দের অসাধুতায়ও ব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ব্যাঙ্কের সমূহ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে পারে না। যথাযথভাবে কার্য্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকিলে এই প্রকার অসাধুতা প্রশ্রয় পায় না এবং বিধি-বিগর্হিত কার্য্য বন্ধ করাও সহজসাধ্য হয়।

ব্যাঙ্কের পতনের কালে তাহার যে-সমস্ত টাকা যে-যে স্থানে নিয়োজিত ছিল, তৎপ্রতি একটু মনোযোগী হইলেই কতকগুলি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কের মূলনীতি এই যে, এমন ভাবে টাকা খাটাইতে হইবে যে, নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে ঐ টাকাটা আপনা-আপনি ফিরিয়া আসিবার উপায় বা বন্দোবস্ত থাকে; কিন্তু ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এই নীতির দিকে আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ অথবা নিজের দলকে পরিপুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে অনেক লোককে বিনা জামীনে অথবা উপযুক্ত জামীন না থাকা সত্ত্বেও টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল। লগ্নীর টাকার অনুপাতে তাহার জামীন সম্বন্ধে বিশেষ প্রণিধান করা হয় নাই। আর স্বাদেশিকতার প্রেরণায় এমন অনেক শিল্পে টাকা নিয়োগ করা হইয়াছিল যে, যাহা আদায় হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ব্যাঙ্কের ব্যবসায়নীতিসম্মত মূলধন সংগ্রহের রীতি এবং তাহা লগ্নী করিবার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা হইতে বিচ্যুতি ঘটিতে থাকিলে তাহার সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী; চরম সাধুতাও তখন তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না। পরিচালকবর্গের অসাধুতায়ও ব্যাঙ্কের অনেক ক্ষতি হয় বটে; কিন্তু এস্থলে আমি আপনাদের নিকট নিবেদন করিতে চাই যে, সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার অভাব ঘটিলে অতি বড় সাধুও অসাধু হইয়া দাঁড়ায়,—বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ব্যাপারে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের পতনের মূলে বিশেষ কোন অসাধুতার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই বটে; কিন্তু ব্যাঙ্কিং কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ইহার ধ্বংসের প্রধান কারণ।

আপনারা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, বর্ত্তমান সময়ে সাধু বলিয়া পরিচিত লোক অসাধু লোক অপেক্ষাও সমাজের অনেক অধিক অনিষ্ট করিতেছেন।

এই দুইটি ব্যাঙ্কের পতনের প্রকৃত কারণগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সাবধানতার সহিত যদি আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই,

তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমাদের প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই সাফল্যমণ্ডিত হইবে। 'বাঙালীর ভিতর এমন কোন মজ্জাগত দোষ আছে, যাহাতে তাহারা ব্যাঙ্ক-পরিচালনায় অক্ষম'—একথা মোটেই স্বীকার্য্য নহে। ব্যাঙ্কগুলির অসাফল্যের মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া এই ধারণা আমার স্পষ্ট জন্মিয়াছে যে, সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাদ্বারা কাজ চালাইলে সাফল্য অনিবার্য্য। আমার মনে হয়, কলিকাতার মত সুবৃহৎ বাণিজ্য-কেন্দ্রে বাঙালীদের দ্বারা একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতে পারে। যাঁহারা অর্থশালী, যাঁহারা এই কাজে উপযুক্ত, যাঁহাদের উপর লোকের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা যদি এই কাজে হাত দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সাফল্যমণ্ডিত না হইবার কোনই কারণ নাই। কালকাতায় এইরূপ একটি ব্যাঙ্ক মফঃস্বলের ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে অতীব শক্তিদায়ক হইবে।

কেবল কলিকাতা বা চট্টগ্রাম বন্দরেই নয়,—মফঃস্বল বাংলায়ও এই প্রকার কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কের প্রয়োজন রহিয়াছে; নতুবা মফঃস্বলের শিল্পব্যবসায়ের পুষ্টিলাভ হইবে না এবং তাহার ফলে বাঙালীকে এই দিকে আকৃষ্ট করিবার পথ আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিবে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিকাতাতে বিদেশী এবং ভিন্ন প্রদেশবাসীরা এমনভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে যে, সেখানে বাঙালীর পক্ষে তাহার ন্যায্যস্থান অধিকার করিয়া লওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার হইবে। কিন্তু বাংলার মফঃস্বলে অবাঙালী ব্যবসায়িগণ তেমনভাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। এক হিসাবে মফঃস্বলই বাণিজ্যের প্রধান স্থান; অধিকাংশ জিনিষপত্র এবং কাঁচামাল সেখানে উৎপন্ন হয় এবং সেখানেই জিনিষপত্রের ব্যবহার হয় বেশী। আমরা যদি মফঃস্বলে একবার কায়েমী হইয়া বসিতে পারি, তাহা হইলে কলিকাতায়ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

মফঃস্বল-বাংলার ব্যবসায়েও বাঙালীর ক্রমশঃ স্থানচ্যুত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা হইতেছে। বিদেশীয় এবং অবাঙালী ব্যবসায়িগণ এখন নিজ নিজ শাখা-কার্য্যালয় বা 'এজেন্সী' প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলার মফঃস্বল ব্যবসায় অধিকার করিয়া লইবার আয়োজন করিতেছে। এই আসন্ন প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে, মফঃস্বলে কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কিঙের মূল পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যাঙ্কের সহায়তা নিতান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু এস্থলে আমি বলিতে চাই, এই প্রকার ব্যাঙ্কের প্রবর্ত্তন-কালে আমাদিগকে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, মফঃস্বলে কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কিং-কারবারের পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ আছে কি-না। এই প্রকার ব্যাঙ্কিং-কারবারের মূলনীতি যে 'লগ্নীটাকা অল্পকাল মধ্যেই আদায়-যোগ্য হওয়া চাই,'—তাহা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণতঃ ব্যবসায়ক্ষেত্রেই এই শ্রেণীর লগ্নীর পথ প্রশস্ত দেখা যায়। আমাদের দেশের অন্তর্বাণিজ্য বৎসরের দুই এক সময়ে প্রধানতঃ দুই একটি ফসলের উপরই নির্ভর করে বেশী। এই বাণিজ্যে একস্থান হইতে আর একস্থানে মাল পাঠাইবার ব্যাপার সাধরণতঃ অল্পকালই স্থায়ী হইয়া থাকে। এই প্রকার মাল চলাচল সম্পর্কে যে-সকল দলিলের উদ্ভব হয়, তাহা হস্তান্তরকরণোপযোগী হইলে, কমর্শ্যাল ব্যাঙ্কের কর্জ্জ দিবার পক্ষে ঐগুলি বিশেষ উপযোগী 'সিকিউরিটি' বা জামীন বলিয়া বিবেচিত হয়। আমাদের দেশে হুণ্ডী, রেলের রসিদ, গুদাম রসিদ প্রভৃতি ঐ শ্রেণীর দলিল। হুণ্ডীর উপর টাকা ধার দেওয়ার কারবার অনেককাল হইতেই এদেশে প্রচলিত আছে। আমার মনে হয়, কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা এবং সহায়তা দ্বারা গুদামী ও আড়ৎদারী কারবারাদি বৃদ্ধি পাইবে এবং এই সকলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমার্শ্যাল নীতিতে টাকা ধার দিবার পক্ষে উপযুক্ত 'সিকিউরিটি' বা জামীনের অভাব ঘটিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, বিস্তৃতভাবে কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কিং-কারবার চালাইতে হইলে কতকগুলি মূলনীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ কর্ম্মচারী নিয়োগ, শাখা কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা, গুদামী ও আড়ৎদারী কারবারের পরিপোষণ এবং অন্যান্য স্বল্পবহুল ব্যয়সাপেক্ষ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। কার্য্যক্ষম কর্ম্মচারী ও পরিচালক নিয়োগ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা করিবার পক্ষে ব্যাঙ্কের যথেষ্ট আর্থিক সংস্থান না থাকিলে, সেই ব্যাঙ্কের পতন অবশ্যম্ভাবী। আর এইরূপ ক্ষুদ্রশক্তি ব্যাঙ্কের উপর নির্ভরশীল শিল্প ব্যবসায়েরও উন্নতি নাই। এজন্য দৃঢ় এবং ব্যাপক ভিত্তির উপর কমার্শ্যাল বা বাণিজ্য-সহায়ক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কের এই নীতির অনুসরণ না করিবার ফলে, আমেরিকার মত দেশেও বিগত তিন-চার বৎসরের

মধ্যে অন্যূন বার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক অন্য বিবিধ প্রকার সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও কারবার বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। আমেরিকার এই দৃষ্টান্ত হইতে অক্ষম ক্ষুদ্রশক্তি কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদিগকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। বিপুল আর্থিক সংস্থানের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যাঁহারা কেবল প্রতিযোগিতা করিবার জন্যই এক নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে অসংখ্য ব্যাঙ্ক খুলিয়া বসেন, প্রতিযোগিতায় জয়লাভ সেখানে তাঁহাদের হয় না—হয় কেবল দুর্গতি।

বাংলায় বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কগুলির যে আজ দায়িত্ব এবং গুরুত্ব কত, তাহা দুই-এক কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। এইগুলির উন্নতি অবনতির উপর বাংলার জাতীয় উন্নতি-অবনতি নির্ভর করিতেছে। এইগুলির সাফল্য আজ ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের সাফল্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না, আজ সমস্ত বাঙালী জাতির সাফল্য এদের উপর একান্তভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে। এই এক একটি ব্যাঙ্ক আজ সহস্র সহস্র বাঙালীকে শিল্প-ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট করিবে; আবার এক একটি শিল্প-ব্যবসায় বিরাট রকমের এক একটি ব্যাঙ্ক গড়িয়া তুলিবার পক্ষে সাহায্য করিবে; সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর আর্থিক দুর্গতির ও বেকার সমস্যার অবসান ঘটিবে। সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার অভাবে অথবা পরিচালকবর্গের শৈথিল্যে যদি বাংলায় বাঙালী প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের পতন হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, জগতের অগ্রণী দেশগুলির সঙ্গে বাঙালীর আর পা ফেলিয়া চলিবার উপায় নাই।

বর্ত্তমানে কুমিল্লায় দুইটি ব্যাঙ্ক কমার্শ্যাল নীতিতে কাজকর্ম্ম পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন; আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহাদের পরিচালকবর্গ যে কেবল আমানতী টাকা লইয়াই সন্তুষ্ট আছেন বা কাজ চালাইতেছেন, তাহা নহে; ইঁহারা নিজেদের টাকাও যথেষ্ট পরিমাণে এইগুলির মধ্যে রাখিয়াছেন, ইহার ফলে ব্যাঙ্ক পরিচালনা বিষয়ে ইঁহাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে এবং ব্যাঙ্ক দুইটির পূর্ণ সাফল্যের দিকে ইঁহারা প্রত্যেকেই মনোযোগী হইয়াছেন। এই দুর্দ্দিনেও তাঁহারা যে কেবল বাঁচিয়া রহিয়াছেন, তাহা নহে,—প্রসার-লাভও করিতেছেন যথেষ্ট। ১৯২৩ সনে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন; ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত মহাশয় সর্ব্বজনবিদিত। ব্যাঙ্কিং-কারবার বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় দক্ষতা ও অনুরক্তি যে এই ব্যাঙ্কটিকে সকল রকমে সাফল্যমণ্ডিত করিবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না। তাঁহার বাচনিক জানিতে পারিলাম এবং জানিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম যে, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক আমানতী টাকার লগ্নী কারবারে কমার্শ্যাল নীতির অনুসরণ করিতেছে। এই ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক কলিকাতায় এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর প্রভৃতি মফঃস্বলের বিভিন্নকেন্দ্রে শাখা-কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সকলস্থানেই তাঁহারা বাঙালীর সহানুভূতি পাইতেছেন ও পাইবেন। চট্টগ্রামের এজেণ্ট শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রচন্দ্র সেন এবং কলিকাতার এজেণ্ট শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন,—এঁদের আমি বিশেষ জানি। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে মহৎ এবং বৃহৎ পরিকল্পনা এবং তাহার পরিচালনা সম্বন্ধে এদের যথেষ্ট ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা আছে। ইঁহারা উভয়েই বাংলার সম্ভ্রান্তঘরের লোক এবং বহু বিশিষ্ট লোকের সহিত ইঁহারা সংশ্লিষ্ট। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং চাঁদপুরের এজেণ্টদের সঙ্গেও আমার আলাপ-পরিচয় করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক পরিচালন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা থাকার দরকার, তাহা তাঁহাদের যথেষ্টই আছে বলিয়া মনে হইল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম, ব্যাঙ্কের উপর ইঁহারা কত মহতী আশা পোষণ করেন। ব্যাঙ্ককে জাতীয় বিরাট প্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া তুলিবার পক্ষে ইঁহাদের উৎসাহ উদ্যম আমাকে চমৎকৃত করিয়াছে। আমার দৃঢ় আশা এবং বিশ্বাস, এই কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় এবং পরিচালনায় ইঁহারা দেশের এবং জাতির যে দায়িত্বভার স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে অচির ভবিষ্যতে ইঁহারা অবশ্য জয়যুক্ত হইবেন। দেশের বর্ত্তমান প্রয়োজনের তুলনায় এখনও ইঁহাদের প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র হইলেও অদূর ভবিষ্যতে সকলের সাধু প্রচেষ্টায় ইহাই সুদৃঢ় ও বিরাট হইয়া উঠিবে,—বাংলায় বাঙালী আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ভগবানের আশীর্ব্বাদ আমাদের সহায় হউক।*

* কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের চট্টগ্রাম শাখার উদ্বোধন-উৎসব উপলক্ষ্যে অভিভাষণ।

ভোজনের ফ্যাশন—

উবুড় হইয়া শুইয়া কিংবা বাম কনুইয়ের উপর ভর দিয়া অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় ভোজনের রীতি হোমরের যুগে গ্রীসে প্রচলিত ছিল না। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক যুগে গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে ইহার চলন দেখা যায়। এই প্রকারে ভোজন করিবার ছবি গ্রীস ও রোমের প্রাচীন ভাণ্ড আদিপাত্রের গায়ে অঙ্কিত দেখা যায়। কথিত আছে, যে,এই রীতি প্রাচ্য দেশ হইতে ঐ দুই দেশ গ্রহণ করে। কিন্তু কোন্ প্রাচ্য দেশ হইতে উহা গৃহীত তাহা জানি না। যাহারা এই প্রকারে

অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় ভোজন

ভোজন করিত, তাহারা কৌচে শুইয়া বা অর্দ্ধশয়ান হইয়া খাদ্য আহার করিত। তাহাদের বুকের বা বাঁ কনুইয়ের নীচে গদি বা বালিশ থাকিত। যে-টেবিলে ভোজ্য দ্রব্য থাকিত, তাহা কৌচের চেয়ে কিছু নীচু করা হইত। এরকম রীতি অলস অকর্ম্মা বিলাসীদের উপযোগী।

আফ্রিকার উগাণ্ডা দেশের এক জায়গার রাজা নিজের হাতে খাওয়াটাকে অপমানকর মনে করেন। তাঁহার পাচক তাঁহাকে খাওয়াইয়া দেয়। কিন্তু খাওয়াইতে খাওয়াইতে বেচারা যদি নৃপপুঙ্গবের দাঁত ছুঁইয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হয়।

আফ্রিকার উগাণ্ডা দেশের এক রাজাকে পাচক খাওয়াইতেছে
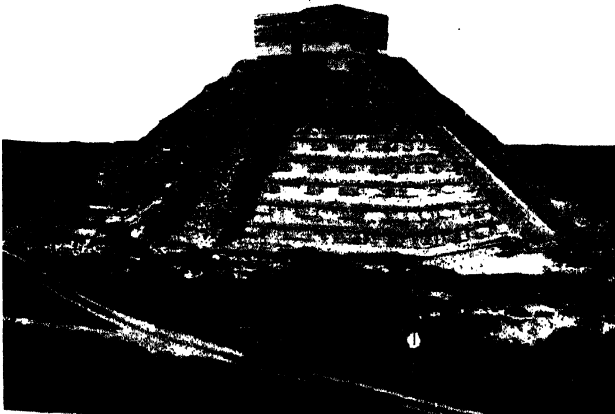
মিশরের অনুরূপ মেক্সিকোর একটি প্রাচীন পিরামিড

মেক্সিকোর সভ্যতা ও সংস্কৃতি—

কলম্বস ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিতে রওনা হইয়া আমেরিকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই হেতু আমেরিকার অন্য নাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ। ইহার আদিম অধিবাসিগণও রেড ইণ্ডিয়ান (লাল ভারতীয়) বলিয়া পরিচিত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আদিম অধিবাসীরা প্রায় নির্মূল হইলেও মেক্সিকোতে [illegible]নও বাঁচিয়া আছে। সেখানে আদিম [illegible]ীরা এখনও জনসংখ্যার শত করা উনচল্লিশ ভাগ। স্পেন-দেশীয় হারনেন্ডো কোর্টেজ ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে মেক্সিকো জয় করেন। তদবধি প্রায় তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা স্পেনের সংস্পর্শে থাকায়, ইহার অধিবাসীদের মধ্যে স্পেনীয় রক্ত প্রবেশ করিয়াছে। স্পেন ও ইণ্ডিয়ান জনিত 'মেষ্টিজো' নামক মিশ্র জাতি শতকরা তিপ্পান্ন জন। অবশিষ্ট সাড়ে সাত ভাগ মাত্র স্পেনীয়।

স্পেনীয়দের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মেক্সিকোর আদিম অধিবাসীরা নিজেদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াছিল। আদিম অধিবাসী বলিতে আমাদের মনে কোল, ভীল সাঁওতাল, নাগা, কুকী প্রভৃতির কথা স্বতঃই উদয় হয়। কিন্তু মেক্সিকোর আদিম অধিবাসীরা এরূপ ছিল না

একটি মেষ্টিজো রমণী (স্পেনীয়-ইণ্ডিয়ানের দৃষ্টান্ত)

সুবৃহৎ খড়ের টুপী মাথায় মেক্সিকো-বালক

তাহারা স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা 'কোয়েট্‌সকোট্‌ল'। ইনি মানুষের সকল রকম মহৎ গুণের প্রতীক। মেক্সিকোর এরূপ উন্নত অধিবাসীরা স্পেনীয়দের অধীনে আসিয়া ক্রমশঃ বৈশিষ্ট্য হারাইতে বসিয়াছিল। ইদানীং ইহারা আবার আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে।
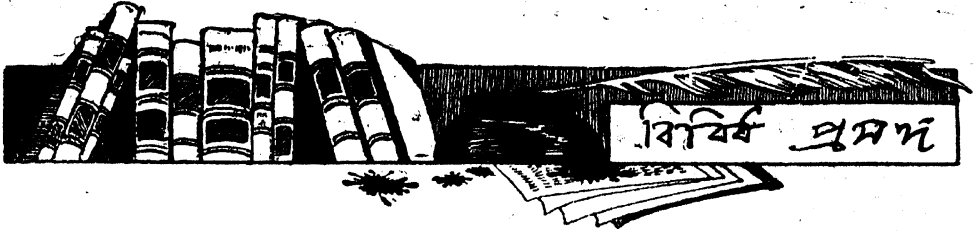
স্বরাজ্য-দলের পুনরুজ্জীবন

কংগ্রেস যখন রাজনৈতিক বিষয়সমূহে গবর্ন্মেণ্টের সহিত অসহযোগ নীতি অবলম্বন করেন, তখন সমগ্রভারতীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সভ্য হওয়াও কংগ্রেস-ওয়ালাদের পক্ষে নিষিদ্ধ হয়। পরে, ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে সদস্যরূপে প্রবেশ করিয়া সেখানেও গবর্ন্মেণ্টের কোন কোন প্রকার আইনপ্রণয়নাদি কার্য্যে বাধা দিবার জন্য অনেক কংগ্রেসওয়ালা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন। কংগ্রেসের এই দলের নেতা হন চিত্তরঞ্জন দাস। বস্তুতঃ তিনিই এই স্বরাজ্য-দল গঠন করেন এবং এই দলের মতের প্রবর্ত্তকও তিনি। তাঁহার মৃত্যুর পর পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু এই দলের নেতা হন।

অসহযোগ নীতির অনুসরণ দ্বারা যেমন, তেমনই এই স্বরাজ্য-দলেরও নীতির অনুসরণ দ্বারা কংগ্রেসের বাঞ্ছিত পূর্ণ স্বরাজ্য লব্ধ হয় নাই, ডোমিনিয়ত্বও লব্ধ হয় নাই। কিন্তু অসহযোগ নীতির অনুসরণ দ্বারা পরোক্ষ লাভ অনেক হইয়াছে এবং ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য-দলের সভ্যেরা যত দিন ছিলেন, তত দিন তাঁহারা জাতীয় স্বাধীনতা, প্রগতি ও উন্নতির প্রতিকূল আইনাদির বিরুদ্ধ আচরণ করিতে পারিয়াছিলেন।

ব্যবস্থাপক সভাসমূহে স্বরাজ্য-দলের উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় তাঁহারা কৌন্সিলপ্রবেশ নীতি পরিত্যাগ করেন। এখন, কিছু দিন হইতে কংগ্রেস বিশেষ কিছুই করিতেছেন না দেখিয়া অনেক কংগ্রেসওয়ালা আবার স্বরাজ্য-দলের পুনরুজ্জীবন দ্বারা ব্যবস্থাপক সভাসমূহে প্রবেশের সমর্থন করিতে ছিলেন। এ বিষয়ে দিল্লীতে তাঁহাদের কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। কন্‌ফারেন্সে কৌন্সিল প্রবেশের সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ-বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলোচনাও ডাক্তার আন্সারী, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই এবং ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় কন্‌ফারেন্সের পক্ষ হইতে পাটনায় করিয়াছেন। তাহার ফলে গান্ধীজী ডাক্তার আন্সারীকে এক খানি ইংরেজী চিঠিতে লিখিয়াছেন :—

I have no hesitation in welcoming the revival of the Swarajya party and the decision of the meeting to take part in the forthcoming election to the Assembly, which, you tell me, is about to be dissolved. My views on the utility of the legislatures in the present state are well known. They remain on the whole what they were in 1920, but I feel that it is not only right but it is the duty of every Congressman, who for some reason or other does not want to, or cannot take part in, civil resistance and who has faith in entry into the legislatures, to seek entry and form combinations in order to prosecute the programme which he or they believe to be in the interest of the country. Consistently with my view above mentioned, I shall be at the disposal of the party at all times and render such assistance as it is in my power to give.

তাৎপর্য্য। স্বরাজ্য-দলের পুনরুজ্জীবন এবং ব্যবস্থাপক সভার আগামী সভ্যনির্ব্বাচনে আপনাদের যোগ দিবার সিদ্ধান্তকে 'স্বাগত' বলিতে আমি দ্বিধা বোধ করিতেছি না। বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভাগুলির (দেশের পক্ষে) উপকারিতা সম্বন্ধে আমার মত সুবিদিত। তাহা ১৯২০ সালে যাহা ছিল এখনও মোটের উপর তাহাই আছে। কিন্তু আমি অনুভব করি, যে, যে-সব কংগ্রেসওয়ালা যে-কোন কারণে নিরুপদ্রব প্রতিরোধে যোগ দিতে চান না বা পারেন না, এবং ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, ব্যবস্থাপক সভায় দল বাঁধিবার জন্য এবং দেশের পক্ষে যাহা তাঁহারা হিতকর মনে করেন সেই কর্ম্মপন্থার অনুসরণ করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে চাহিবার শুধু যে অধিকার তাঁহাদের আছে, তাহা নহে, তাহা তাঁহাদের কর্ত্তব্যও বটে। আমার উপরি উল্লিখিত (ব্যবস্থাপক সভাসমূহের উপকারিতা সম্বন্ধীয়) মতের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আমি সর্ব্বদাই স্বরাজ্য দলের আজ্ঞাধীন থাকিব এবং আমার যেরূপ সাহায্য করিবার ক্ষমতা আছে তাহা করিব।

গান্ধীজীর চিঠিটির মানে যিনি যেরূপ বুঝিতে চান বুঝুন, আমরা এ-বিষয়ে কোন তর্ক করিব না। যত কংগ্রেসওয়ালার মত কাগজে বাহির হইয়াছে, তাঁহাদের প্রায় সকলেই স্বরাজ্য-দলের পুনরুজ্জীবনের পক্ষেই মনে হইতেছে। বড় নেতাদের মধ্যে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কিছু কিন্তু করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে এ-বিষয়ে কোন নির্দ্ধারণ না-হওয়া পর্য্যন্ত দিল্লী-কন্‌ফারেন্সের

প্রস্তাব কংগ্রেস-ওয়ালারা মানিতে পারেন, না-মানিতেও পারেন।

এ-বিষয়ে আমাদের মত অনেক বার প্রকাশ করিয়াছি। সকল কংগ্রেসওয়ালা ত কার্য্যতঃ অসহযোগ নীতির বা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতির অনুসরণ করেন না—এখন ত অতি অল্প লোকই তাহা করিতেছেন। যাঁহারা অসহযোগ নীতির অনুসরণ করেন না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের কৌন্সিলে গিয়া বক্তৃতা, তর্কবিতর্ক ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার যোগ্যতা আছে। ব্যবস্থাপক সভাগুলা কার্য্যতঃ জো-হুকুমদের একচেটিয়া লীলাক্ষেত্র যাহাতে না-হয়, তাহা তাঁহারা করিতে পারেন এবং তাহা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, তাহাতে কি লাভ ? আগেই বলিয়াছি, কৌন্সিল প্রবেশ দ্বারা স্বরাজ লব্ধ হয় নাই, হইবেও না। সে আশায় কোন দল কৌন্সিল প্রবেশ করিলে তাঁহারা নিরাশ হইবেন। কিন্তু স্বরাজ্য-দলের লোকেরা দলবলে বর্ত্তমানে কৌন্সিল দখল করিতে পারিলে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর কোন আইন ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা প্রণয়নের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে পারেন। অন্ততঃ তাঁহারা এরূপ বিরোধিতা করিতে পারেন, যে, এদেশে বা বিদেশে একথা রটান চলিবে না, যে, অমুক আইন দেশ-প্রতিনিধিরাই বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

অসহযোগ আন্দোলন যখন আরম্ভ হয়, তখন দেশহিতকর অনেক কাজ কোন আইন লঙ্ঘন না করিয়া করা চলিত, দেশহিতকর অনেক কথা লেখা ও বলা কোন আইন লঙ্ঘন না করিয়া লেখা ও বলা চলিত। তাহা সত্ত্বেও অনেক হাকিম ও পুলিসের লোক তাহাতে বেআইনী ভাবে বাধা দিত বটে ; কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে আদালতে প্রতিকার চাহিতে পারিত। কিন্তু তৎপরে অনেকবৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে সরকারী কর্ম্মচারীরা ঐসব কাজ ও কথা ক্রমশঃ ব্যবস্থাপক সভায় নূতন নূতন আইন করাইয়া এখন বেআইনী করিয়া ফেলিয়াছে। কংগ্রেসওয়ালারা দলবলে ব্যবস্থাপক সভায় থাকিলে হয়ত কোন কোন আইন ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা করান যাইত না, বা করাইতে খুব বেগ পাইতে হইত, কিংবা কিছু সংশোধিত আকারে প্রণীত হইত।

অত্যাচারের সংবাদ পর্য্যন্ত প্রকাশ করা ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে। এখন যে আইন হইয়াছে, তাহাতে খবরের কাগজে—বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের কোন খবরের কাগজে—অত্যাচারের অভিযোগ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইতেছে না। কিন্তু এই সব অভিযোগ অন্ততঃ এক শত দেড় শত জন লোকও যদি শুনে, তাও ভাল। শ্রোতাদের মধ্যে একজনেরও মনুষ্যত্ব যদি উদ্বোধিত হয়, ভাল। সে দিন দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভায় মেদিনীপুরের কোন কোন গ্রামের কোন কোন মহিলার ও পুরুষের উপর যে অত্যাচারের অভিযোগ সত্যেন্দ্রবাবু গবন্মেণ্টের গোচর করেন, তাহা নামধামসহ কোন খবরের কাগজেই বাহির হয় নাই। তিনি যখন দিল্লীতে অভিযোগসমূহ পাঠ করিতেছিলেন, তখন শ্রোতাদের চেহারা ও মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল জানি না। ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসওয়ালার সংখ্যা বেশী হইলে আশা করা যায় কোন গুরুতর অভিযোগই অকথিত থাকিয়া যাইবে না, এবং অভিযোগ শুধু কথিত হইবে না, তাহার প্রকাশ্য তদন্তের দাবী অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হইবে। সত্যেন্দ্রবাবুর দুই বৎসরের অভিযোগবিবৃতির ফলে এরূপ দাবীর প্রস্তাব উত্থাপিত পর্য্যন্ত হয় নাই। ইহা লজ্জার বিষয়। তদন্তের দাবীতেই কি প্রতিকার হইবে ? হইবে না জানি। এক বৎসর পূর্ব্বে ঠিক ঐরূপ অত্যাচারের অভিযোগ সত্যেন্দ্রবাবু ব্যবস্থাপক সভার ও গবন্মেণ্টের গোচর করিয়াছিলেন। তাহার কোন অনুসন্ধান পর্য্যন্ত হইয়াছিল বলিয়া অবগত নহি। তথাপি, অভিযোগ উচ্চারিত হওয়া ভাল। ব্যবস্থাপক সভায় যাইব না, এবং সেখানে গিয়া কিছু করিব না, ব্যবস্থাপক সভার বাহিরেও কিছু করিব না—অথচ দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিব, এরূপ মনের ভাব অন্ততঃ কংগ্রেসওয়ালাদের হওয়া উচিত নয়। অবস্থাটা কিন্তু এখনও ঐরূপই আছে। স্বরাজ্য-দল ব্যবস্থাপক সভায় গেলে কংগ্রেসের রাজনৈতিক পক্ষাঘাত-গ্রস্ততাটার কিঞ্চিৎ উপশমও যদি হয়, তাহা খুবই বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে সঙ্গে এই সুফলও যদি ফলে যে, ব্যবস্থাপক সভাগুলি জো-হুকুম ও ভাতা-উপার্জ্জকদের একচেটিয়া লীলাক্ষেত্র হইয়া না-থাকে, তাহাও কম লাভ হইবে না।

ব্যবস্থাপক সভায় একাধিক বার ভোটের আধিক্যে জাতীয় দাবী ('national demands') গৃহীত হয়। কিন্তু ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট সে দাবী শুনিয়া স্বরাজ্য মঞ্জুর করেন নাই। বস্তুতঃ শুধু দাবী দ্বারা স্বরাজ্য পাওয়া যাইবে না। যখন আমাদের

স্বরাজ্য লাভে সম্মতি না দিলে চলিবে না, তখন ব্রিটিশ জাতি সম্মতি দিবে, তাহার আগে নয়।

এই জন্য, কি ব্যবস্থাপক সভায়, কি ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে এরূপ কাজ করিতে হইবে যাহাতে ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ও ব্রিটিশ জাতির উপর অপ্রতিরোধনীয় চাপ পড়ে। দেশকালপাত্র বুঝিয়া প্রত্যেক জাতিকে এই প্রকার স্বরাজ্য-সংগ্রাম চালাইতে হয়।

ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক থাকিতে হইলে তাহা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা প্রদর্শন ও নির্দ্দেশ করিবার জন্য ভারতীয়দিগকে এখনও অনেক বক্তৃতা, আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করিতে হইবে, অনেক প্রবন্ধ, পুস্তিকা ও পুস্তক লিখিতে হইবে। যাহা কিছু বলা বা লেখা হইবে, তাহা যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, সত্যসঙ্গত, মানবিকতাসঙ্গত হওয়া আবশ্যক। এই প্রকার উক্তির ও লেখার একটা প্রভাব অন্যান্য জাতির আদর্শানুসারী মানুষদের মত আদর্শানুসারী ইংরেজরাও অনুভব করিবে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা কম। সমগ্র ইংরেজ জাতি—বা অন্য কোন জাতি—যদি কখন আদর্শানুসারী হয়, তাহা দূর ভবিষ্যতের কথা। আমরা তত দিন অপেক্ষা করিতে পারি না, অপেক্ষা করা উচিত নয়। এই জন্য অন্যবিধ চাপ প্রয়োগ আবশ্যক। এই চাপ ভারতীয় ঘটনা, ভারতের বাহিরের ঘটনা, বা উভয়বিধ ঘটনার দ্বারা প্রযুক্ত হইতে পারে।

সম্ভবপর যত রকম চাপ আছে, তাহার মধ্যে যাহা দৈহিক ও আস্ত্রিক বলপ্রয়োগসাপেক্ষ, তাহা ভারতীয়দিগকে কার্য্যের ও অভিপ্রায়ের বাহিরে রাখিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীর মত যাঁহারা অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম মনে করেন, তাঁহারা যে-যে কারণে দৈহিক ও আস্ত্রিক বল পরিহারের পক্ষে, অন্য অনেকে সেই সেই কারণে বিশ্বাসবান না হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও প্রধান নেতৃস্থানীয়েরা মনে করেন ও বলিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষের স্বরাজ্য-সংগ্রাম দৈহিক ও আস্ত্রিক বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকে অথচ সমষ্টিগত ভাবে চালাইতে হইবে। আমরা এই মত ঠিক মনে করি।

যে-সব কংগ্রেসওয়ালা কৌন্সিলে ঢুকিবেন, তাঁহারা কি করিবেন না-করিবেন, সে বিষয়ে আমরা বিস্তারিত কিছু বলিতে চাই না। কিন্তু একথা নিশ্চয়, যে, তাঁহারা যদি মন্ত্রিত্ব বা তদ্রূপ কোন চাকরী গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহা গর্হিত হইবে।

কৌন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধেও ভাবিবার কথা আছে। ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা, প্রশ্ন, প্রস্তাব-পেশ ইত্যাদি করিলেই দেশের প্রতি সব কর্ত্তব্য করা হইল, অনেকের পক্ষে এরূপ মনে করিয়া মনকে প্রবোধ দিবার খুব সম্ভাবনা আছে। সমস্ত বা অধিকাংশ কংগ্রেসওয়ালা যদি এই ভ্রমের বশবর্ত্তী হন, তাহা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে।

এখন ভারতবর্ষের কন্সটিটিউশ্যন যেরূপ আছে, তাহাতে ভারতীয় বা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দল প্রবল হইলে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর আইন প্রণয়নে বাধা দিতে পারেন এবং সেরূপ বাধা জন্মিলে লাটসাহেবদের ছয়মাসস্থায়ী অর্ডিন্যান্স জারী করা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু শ্বেত পত্রে ভারতের মূল শাসনবিধির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, ভবিষ্যৎ কন্সটিটিউশ্যন সেইরূপ হইলে ব্যবস্থাপক সভায় কোন আইন প্রণয়নে বাধা জন্মিলেও গবন্মেণ্টকে অল্পকালস্থায়ী অর্ডিন্যান্সের আশ্রয় লইতে হইবে না, বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটরা ইচ্ছা করিলেই গবর্ণর-জেনার্যালের আইন ও গবর্ণরের আইন নামক আইনসকল করিতে পারিবেন, সেগুলা ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে প্রণীত আইনের সমান বলবৎ ও স্থায়ী হইবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ কন্সটিটিউশ্যন এরূপ হইলেও একটা কাজ কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যেরা করিতে পারিবেন—তাঁহারা লাট-দিগকে নিজের নিজের আইন বানাইতে বাধ্য করিয়া ইহাই কার্য্যতঃ ঘোষণা করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন, যে, তাঁহারা লোকমতের বিরুদ্ধে দেশশাসন করিতেছেন।

কিন্তু কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যেরা ভবিষ্যৎ কন্সটিটিউশ্যন অনুসারে ইহাও করিতে পারিবেন কি না, সে-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। সমগ্রভারতীয় ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় রাজাদের মনোনীত সদস্যদিগকে এবং অনুগৃহীত মুসলমান, "অবনত" হিন্দু ও ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় প্রভৃতিকে যত আসন দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে স্বাধীনচেতা নির্ব্বাচিত সদস্যদের পক্ষে নিজেদের দলে ভোট দিবার জন্য অধিক সদস্য পাওয়া অসম্ভব, অন্ততঃ দুঃসাধ্য, হইবে। সুতরাং গবন্মেণ্ট ইচ্ছা করিলে নিজের আবশ্যক-

মত আইন ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা করাইয়া লইতে পারিবেন। তবে, কংগ্রেসওয়ালা সদস্য অনেক থাকিলে তাঁহারা খুব তর্কবিতর্ক করিতে এবং সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারিবেন বটে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গবন্মেণ্ট ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা কোন আইন করাইয়া লইতে অসমর্থ হইলে বড়লাট ও অন্য লাটেরা নিজেদের ইচ্ছামত স্থায়ী আইন জারী করিতে পারিবেন।

অতএব, পুনর্ব্বার বলিতেছি, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে কিছু কাজ করিয়া পূর্ণ বা রকম বার আনা বা তার চেয়েও কম আংশিক স্বরাজ্য লাভের আশা বৃথা। ঐ সকল সভা দ্বারা ছোটখাট দেশহিতকর কাজ—সামাজিক, কৃষিশিল্পসম্বন্ধীয়, শিক্ষাসম্বন্ধীয় কিছু কিছু ব্যবস্থা-করান সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে বা বিশেষ ভাবে জাতীয়শক্তিবর্দ্ধক ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠাপক কিছু কাজ কোন সদস্য করিতে গেলেই তাহাতে সরকার-পক্ষ হইতে তিনি বাধা পাইবেন।

ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ না করিয়া কংগ্রেসওয়ালারা অসহযোগ নীতি যত প্রকারে প্রয়োগ করিতে পারেন, তাহার দ্বারাও যে স্বরাজ্য লব্ধ না হইবার সম্ভাবনা কি কি কারণে আছে, আমরা তাহা ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে 'মডার্ণ রিভিউ' মাসিক পত্রের ৪৫৭-৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম। আমাদের ঐ মত যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা ঐ মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' দেখিতে পারেন। ঐ মত ঐতিহাসিক মেজর বামন দাস বসু তাঁহার "ইণ্ডিয়া আণ্ডার দি ব্রিটিশ ক্রাউন" পুস্তকের ৫১৫-৫১৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পুস্তকের ৫১৪-৫১৫ পৃষ্ঠায় লালা লাজপৎ রায়ের তদ্বিষয়ক কোন কোন মতও উদ্ধৃত হইয়াছে।

যে-সব কারণে আমরা ১৯২০ সালে বলিয়াছিলাম অসহযোগের পথে স্বরাজ লব্ধ না হইবার সম্ভাবনা, সেই সব কারণ এখনও বিদ্যমান আছে এবং সেগুলি এখন আগেকার চেয়ে প্রবলতর বাধা।

পুনরুজ্জীবিত স্বরাজ্য-দল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ "সাধারণ" আসনগুলি দখল করিতে পারিলে অন্ততঃ এই কাজটি হইবে, যে, কংগ্রেস যে দেশের বৃহত্তম প্রতিনিধি দল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ ইংরেজ জাতিও পাইবে। পাঠকেরা বলিতে পারেন, কিসে কি হইবে না আপনি তাহাই বলিতেছেন, স্বরাজ কি প্রকারে লব্ধ হইবে, তাহা ত বলিলেন না? তাহার উত্তর, আমরা উহা বলিতে অসমর্থ।

জাপানের ও ভারতবর্ষের বজেট

আগামী বৎসরে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের এবং এক একটি প্রদেশের সরকারী রাজস্ব ও ব্যয় কত হইবে, তাহার একটা আনুমানিক হিসাব প্রতিবৎসর বসন্ত কালে ভারতীয় ও প্রাদেশিক রাজস্বসচিবেরা ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে পেশ করেন। সদস্যেরা তাহা লইয়া তর্কবিতর্ক করেন, কাটছাঁটের প্রস্তাব করেন, কোন কোন বিভাগের বরাদ্দ কমাইয়া অন্য কোন কোন বিভাগের বরাদ্দ বাড়াইবার চেষ্টা করেন। এরূপ তর্কবিতর্কের প্রয়োজন ও উপকারিতা আছে। কিন্তু এই উপকারিতা সীমাবদ্ধ। প্রকৃত কথা এই যে, সমগ্র ভারতের ও প্রদেশগুলির রাজস্ব অনেক বেশী না-বাড়িলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভাগে যথেষ্ট ব্যয় করা যাইতে পারে না; কিন্তু অন্য দিকে ইহাও সত্য যে, এই সব বিভাগে যথেষ্ট ব্যয় না-করিলে, ব্যয় ক্রমশঃ বাড়াইয়া না-গেলে, দেশের লোকদের ধন বাড়িতে পারে না ও সরকারী রাজস্বও বাড়িতে পারে না। দেশ স্বশাসক না হইলে শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগের বরাদ্দ ক্রমশঃ আশানুরূপ অধিক হইবে না, দেশ স্বশাসক না-হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি ও সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি দ্বারা শিক্ষাদি বিষয়ে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধিও সম্ভাবপর হইবে না। অতএব, যে-দিক দিয়াই বিষয়টি বিবেচনা করা যাক্, দেশ স্বশাসক হওয়া সকলের চেয়ে অধিক আবশ্যক রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের চেয়ে ছোট এবং অল্প লোকের বাসভূমি প্রত্যেক সভ্য দেশের বজেট স্বশাসক দেশসমূহের ধনশালিতার সাক্ষ্য দেয়। ইউরোপ আমেরিকার কথা ছাড়িয়া দিয়া এশিয়ারই একটি দেশ জাপানের দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্।

খাস জাপানের আয়তন ১,৪৭,৫৯২ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৬,৪৪,৫০,০০৫; জাপান সাম্রাজ্যের আয়তন ২,৬০,৬৪৪ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৯,০৩,৯৬,০৪৩। ব্রিটিশ ভারতের আয়তন ১৩,১৮,৩৪৬ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২৭,১৫,২৬,৯৩৩।

জাপান ভারতবর্ষের একটা প্রদেশের সমান পার্ব্বত্য ভূমিকম্পবহুল দেশ। ইহার ষষ্ঠাংশ মাত্র চাষের যোগ্য। জাপান-সাম্রাজ্যও ভারতের চেয়ে ছোট।

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী জাপানী পার্লেমেণ্টে জাপানের আগামী বৎসরের বজেট মঞ্জুর হইয়াছে। উহার পরিমাণ দুই শত বার কোটি ইয়েন। অন্য দেশের মুদ্রার তুলনায় সব দেশেরই মুদ্রার মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। জাপানী ইয়েনেরও আপেক্ষিক মূল্য বাড়ে কমে। সাধারণতঃ উহা দেড় টাকার সমান ধরা হয়। তাহা হইলে আগামী বৎসর জাপানের রাজস্ব ও ব্যয় তিন শত আঠার কোটি টাকা হইবে ধরা হইয়াছে। জাপানী বজেট কেবল খাস জাপানের, না সমুদয় জাপান-সাম্রাজ্যের, তাহা ঠিক জানি না। দুই রকম অনুমানই করা যাক। উহা যদি জাপান-সাম্রাজ্যের হয়, তাহা হইলে, ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যা জাপান-সাম্রাজ্যের তিনগুণ বলিয়া, ভারতবর্ষ জাপানের মত ধনী হইলে ব্রিটিশ-ভারতের রাজস্ব জাপানের তিনগুণ অর্থাৎ নয় শত চুয়ান্ন কোটি টাকা হওয়া উচিত। কিন্তু যদি উহা খাস জাপানের হয়, তাহা হইলে, ব্রিটিশ-ভারতের লোকসংখ্যা খাস জাপানের চারিগুণেরও বেশী বলিয়া, ভারতীয়েরা জাপানীদের সমান ধনী হইলে ব্রিটিশ ভারতের বজেট হওয়া উচিত বার শত বাহাত্তর কোটি টাকার। এখন দেখা যাক, ভারতবর্ষের বজেটে ধৃত রাজস্ব কিরূপ হইয়া থাকে। ব্রিটিশ-ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বজেট আলাদা আলাদা ধরা হয়, অর্থাৎ ভারত-গবন্মেণ্টের বজেট এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক গবন্মেণ্টের বজেট আলাদা ধরা হয়। জাপানে তাহা ধরা হয় না, সমস্ত রাষ্ট্রটির একটি বজেট হয়। তাহা হইলে জাপানের সহিত তুলনার জন্য, ভারত-গবন্মেণ্টের ও সমুদয় প্রাদেশিক গবন্মেণ্টের বজেটের সমষ্টি লইতে হইবে। বর্ত্তমান বা আগামী বৎসরের এই সমষ্টি আমাদের সম্মুখে নাই, কোন প্রামাণিক বহিতে পাওয়া যায় না। ১৯৩৩ সালের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্স ইয়্যারবুকে ১৯৩১-৩২ সালের আছে। তাহা ২০৩,৭২,৫২,০০০ টাকার। জাপানকে মাপকাঠি ধরিলে ইহা নিতান্ত কম। জাপানী বজেটে যদি সে দেশের মিউনিসি-পালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির আয়ও ধরা হইয়া থাকে —খুব সম্ভব হয় নাই, তাহা হইলে ভারতবর্ষের বজেটেও তাহা ধরা উচিত। তাহা ধরিলে ভারতীয় বজেট হয় মোট ২৫৭,৮৭,০১,৪৫২ টাকার। ইহাও জাপানী মাপকাঠি অনুসারে অত্যন্ত কম। এরূপ তর্ক উঠিতে পারে, যে, ইয়েনের দর ১॥০ টাকা ধরা হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক এখন উহার দাম এত নয়। তাহা মানিয়া লইয়া যদি ইয়েনের দর বার আনা ধরা হয়, তাহা হইলেও, জাপানী বজেট খাস জাপানের হইলে সেই মাপকাঠি অনুসারে ব্রিটিশ-ভারতের বজেট হওয়া উচিত ছয় শত ছত্রিশ কোটি টাকার; আর উহা জাপান-সাম্রাজ্যের হইলে সেই মাপকাঠি অনুসারে ব্রিটিশ-ভারতের বজেট হওয়া উচিত চারি শত সাতাত্তর কোটি টাকার। কিন্তু ব্রিটিশ-ভারতের রাজস্ব এই উভয় অঙ্ক অপেক্ষাই অত্যন্ত কম।

ভারতবর্ষের তুলনায় জাপান ধনী এই জন্য, যে, জাপান "জাতিগঠনমূলক" শিক্ষাশিল্পবাণিজ্যাদি বিভাগে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক টাকা খরচ করে ও করিয়া আসিতেছে, এবং জাপান তাহা করিতে পারে, যেহেতু জাপান ধনী। এক দিক দিয়া দেখিলে যাহা কারণ, অন্য দিক দিয়া দেখিলে তাহা ফল। আরও একটা কারণ আছে। জাপানের সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে নবাবী চালে থাকিবার বা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিবার মত বেতন দেওয়া হয় না। প্রভূত শক্তিশালী জাপান-সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর বেতন এ-দেশের প্রথম শ্রেণীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বেতনের চেয়ে অনেক কম। এই জন্য দেশকে উন্নত ও শক্তিশালী করিবার নিমিত্ত জাপানী গবন্মেণ্ট যথেষ্ট খরচ করিতে পারে।

সকলের মূলে এই কথাটি রহিয়াছে, যে, জাপানের গবন্মেণ্ট নিজের দেশের জাতীয় গবন্মেণ্ট; উহাকে কেবল জাপানের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে হয়, অন্য কোন দেশের স্বার্থ ও প্রভুত্ব রক্ষাকে মুখ্য লক্ষ্য করিতে হয় না। তাই, ভারতবর্ষে বজেটের আলোচনার প্রয়োজন থাকিলেও, ভারতীয়দের প্রধান চেষ্টা হওয়া উচিত ভারতবর্ষে জাতীয় গবন্মেণ্ট স্থাপন করা। এই চেষ্টা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়ের এবং প্রত্যেক ভারতীয় লোকসমষ্টির বা দলের করা একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

—

স্বরাজলাভার্থ-আইনলঙ্ঘন-প্রচেষ্টা স্থগিত রাখিবার কারণ বিবৃতি

মহাত্মা গান্ধী স্বরাজলাভার্থ নিরুপদ্রবভাবে আইন লঙ্ঘনের বা তাহা প্রতিরোধের প্রচেষ্টাকে স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দিয়াছেন। বিশেষ কোন অভিযোগের প্রতিকারার্থ নিরুপদ্রব প্রতিরোধ করিতে তিনি নিষেধ করেন নাই। এইরূপ পরামর্শ দিবার কারণ তিনি যে মতবিবৃতি পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দৈনিক কাগজসকলে মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু দৈনিক কাগজ অল্প লোকেই বাঁধাইয়া রাখেন, মাসিক কাগজ তাহা অপেক্ষা অধিক লোক রক্ষা করেন। মহাত্মাজীর মতবিবৃতিটি পুনঃ পুনঃ পড়িয়া উহার মর্ম্ম গভীর ভাবে অনুভব করা আবশ্যক। এই জন্য আমরা উহা প্রবাসীতেও আদ্যোপান্ত ছাপিতেছি। উহার বাংলা অনুবাদে উহার অন্তর্নিহিত সত্তা সম্পূর্ণ পাওয়া যাইবে না বলিয়া মূল ইংরেজী বিবৃতিটি আগে ছাপিতেছি।

This statement owes its inspiration to a personal chat with the inmates and associates of the Satyagraha Ashram who had just come out of prison and whom at Rajendra Babu's instance I had sent to Bihar. More especially is it due to revealing information I got in the course of a conversation about a valued companion of long standing who was reluctant to perform the full prison task and preferred his private studies to the allotted task. This was undoubtedly contrary to the rules of Satyagraha. More than the imperfection of the friend, whom I love more than ever, it brought home to me my own imperfection. The friend said he had thought that I was aware of his weakness. I was blind. Blindness in a leader is unpardonable. I saw at once that I must for the time being remain the representative of civil resistance in action. During the informal conference week at Poona in July last, I had stated that while many individual civil resisters would be welcome, even one was sufficient to keep alive the message of Satyagraha. Now after much searching of the heart, I have arrived at the conclusion that in the present circumstances only one, and that myself and no other, should for the time being bear the responsibility of civil resistance if it is to succeed as a means of achieving Purna Swaraj.

ADULTERATION

I feel that the masses have not received the full message of Satyagraha owing to its adulteration in the process of transmission. It has become clear to me that spiritual instruments suffer in their potency when their use is taught through non-spiritual media. Spiritual messages are self-propagating. The reaction of the masses throughout the Harijan tour has been the latest forcible illustration of what I mean. The splendid response of the masses has been spontaneous. The workers themselves were amazed at the attendance and the fervour of vast masses whom they had never reached. Satyagraha is a purely spiritual weapon. It may be used for what may appear to be mundane ends and through men and women who do not understand its spiritual (nature ?), rovided the director knows that the weapon is spiritual.

EXPERT IN THE MAKING

Everyone cannot use surgical instruments. Many may use them if there is an expert behind them directing their use. I claim to be a Satyagraha expert in the making. I have need to be far more careful than the expert surgeon who is complete master of his science. I am still a humble searcher. The very nature of this science of Satyagraha precludes the student from seeing more than the step immediately in front of him.

SUSPEND CIVIL RESISTANCE

The introspection promoted by the conversation with the Ashram inmates has led me to the conclusion that I must advise all Congressmen to suspend civil resistance for Swaraj as distinguished from a specific grievance. They should leave it to me alone. It should be resumed by others in my lifetime only under my direction, unless one arises claiming to know the science better than I do and inspires confidence. I give this opinion as the author and instigator of Satyagraha. Henceforth, therefore, all who have been impelled to civil resistance for Swaraj under my advice, directly given or indirectly inferred, will please desist from civil resistance. I am quite convinced that this is the best course in the interest of India's fight for freedom.

I am in deadly earnest about this greatest of weapons at the disposal of mankind. It is claimed for Satyagraha that it is a complete substitute for violence or war. It is designed, therefore, to reach the hearts both of the so-called "terrorists" and the rulers who seek to root out the "terrorists" by emasculating the whole nation. But the indifferent civil resistance of many, grand as it has been in its results, has not touched the hearts either of the "terrorists" or the rulers. Unadulterated Satyagraha must touch the hearts of both. To test the truth of the proposition, Satyagraha needs to be confined to one qualified person at a time.

The trial has never been made. It must be made now. Let me caution the reader against mistaking Satyagraha for mere civil resistance. It covers much more than civil resistance. It means relentless search for truth and the power that such a search gives to the searcher. The search can only be pursued by strictly non-violent means. What are the civil resisters thus freed to do if they are to be ready for the call whenever it comes ? They must learn the art and the beauty of self-denial and voluntary poverty. They must engage themselves in nation-building activities, the spread of *khaddar* through personal hand-spinning and handweaving, the spread of communal unity of hearts by irreproachable personal conduct towards one another in every walk of life, the banishing of untouchability in every shape or form in one's own person, the spread of total abstinence from intoxicating drinks and drugs by personal contact with individual addicts and generally by cultivating personal purity. These are services which provide maintenance on the poor man's scale. Those for whom the poor man's scale is not feasible should find a place in small unorganized industries of national importance which give a better wage. Let it be understood that civil resistance is for those who know and perform the duty of voluntary obedience to law and authority.

It is hardly necessary to say that in issuing this statement I am in no way usurping the function of the Congress. Mine is mere advice to those who look to me for guidance in matters of Satyagraha.

বিবৃতিটির বাংলা তাৎপর্য্য নীচে দিতেছি।—

সত্যাগ্রহআশ্রমবাসী যে-সকল কর্ম্মী এবং আশ্রমের সহযোগী সম্প্রতি কারামুক্ত হইয়াছেন এবং বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনুরোধে আমি যাঁহাদিগকে বিহারে প্রেরণ করিয়াছি, তাঁহাদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে কথাবার্ত্তা হইতে আমি এই বিবৃতি প্রদানের প্রেরণা লাভ করি। বহুদিনের এক সমাদৃত সঙ্গী কারাগারের সমস্ত নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য করিতে অসম্মত হইয়া পড়াশুনা করাই পছন্দ করিয়াছিলেন। ইহা নিশ্চয়ই সত্যাগ্রহের নীতি-বিরুদ্ধ। তাঁহার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায় যাহা জানিতে পারি, তাহাই আরও বিশেষ ভাবে এই বিবৃতির কারণ। এই সংবাদ অবগত হইয়া আমি যে কেবল আমার বন্ধুর অসম্পূর্ণতা জানিতে পারিলাম, তাহা নহে—তাঁহার প্রতি আমার ভালবাসা পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইল, এই সংবাদে আমি আমার অপূর্ণতাও বুঝিতে পারিলাম। বন্ধু বলিয়াছেন, তিনি মনে করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার দুর্ব্বলতা অবগত ছিলাম। আমি অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম,—কিন্তু একজন নেতার পক্ষে অন্ধতা ক্ষমাতীত অপরাধ। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম, একাকী আমারই আচরণগত নিরুপদ্রব প্রতিরোধের প্রতিরূপপ্রদর্শক থাকা উচিত।

গত জুলাই মাসে আমি ঘরোআ পুণা বৈঠকে বলিয়াছিলাম, একা একা নিরুপদ্রবপ্রতিরোধব্রতীর সংখ্যা যত অধিক হয়, ততই বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু সত্যাগ্রহের বাণী বা মন্ত্র চির-সঞ্জীবিত রাখিবার পক্ষে একজন সত্যাগ্রহীই যথেষ্ট। আত্মহৃদয় পরীক্ষার পর এখন আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যে, পূর্ণ স্বরাজ লাভের উপায় স্বরূপ নিরুপদ্রব প্রতিরোধ যদি সার্থক করিতে হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় কেবল এক ব্যক্তির—একমাত্র আমারই, আপাততঃ নিরুপদ্রব প্রতিরোধের দায়িত্ব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

আমি বুঝিতে পারিলাম, দেশের জনগণ সত্যাগ্রহের পরিপূর্ণ বাণী শ্রবণ করিতে পায় নাই; কারণ এই বাণী প্রচার কালে ইহাতে ভেজাল মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, যদি আধ্যাত্মিকতাবিহীন মধ্যবর্ত্তীর মারফতে আধ্যাত্মিক উপায়সমূহের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহার কার্য্যকারিতার লাঘব হয়। আধ্যাত্মিক বাণী আত্মপ্রচারশীল। আমার হরিজন-ভ্রমণ কালে সর্ব্বত্র জনসাধারণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছি তাহাই আমার বক্তব্য বিশদ করিবার পক্ষে নূতনতম দৃষ্টান্ত। জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। তাহারা যে বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত হইয়া উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা দেখিয়া কর্ম্মীরাও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন—ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা এই সব লোকের কাছে পৌঁছেন নাই।

সত্যাগ্রহ নিছক আধ্যাত্মিক অস্ত্রবিশেষ। ঐহিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইহার আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অজ্ঞ নরনারীগণের সাহায্যেও এই অস্ত্রের প্রয়োগ সম্ভবপর হইতে পারে, যদি ঐ অস্ত্রের প্রয়োগ-পরিচালকের এই জ্ঞান থাকে যে, অস্ত্রটি আধ্যাত্মিক। সব লোকেই অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারে এমন নহে। তবে একজন বিশেষজ্ঞ যদি পিছনে থাকিয়া নির্দ্দেশ দিতে থাকেন, তবে হয়ত অনেকেই ঐগুলি ব্যবহার করিতে পারে। আমি সত্যাগ্রহ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হই নাই, হইয়া উঠিতেছি বলিয়াই দাবী করি; সুতরাং অস্ত্রচিকিৎসায় সম্পূর্ণ পারদর্শী সার্জ্জন অপেক্ষা আমার অধিকতর সতর্কতার সহিত চলা দরকার, কেন-না, আমি এখনও সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে একজন সামান্ত তত্ত্বানুসন্ধী। সত্যাগ্রহ-বিজ্ঞানের প্রকৃতিই হইল এই যে, ইহা বিদ্যার্থীকে ঠিক তাহার সম্মুখবর্ত্তী ধাপটি ছাড়া আর একটুও বেশী দেখিতে দেয় না।

আশ্রমবাসীদের সহিত কথাবার্ত্তা হইতে উদ্ভূত আত্মপরীক্ষণ আমাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করিয়াছে যে, বিশেষ কোন অভিযোগের প্রতিকারার্থ নহে, কিন্তু কেবল স্বরাজলাভার্থ এরূপ নিরুপদ্রব প্রতিরোধ প্রচেষ্টা স্থগিত রাখিবার জন্য সমস্ত কংগ্রেস কর্ম্মিগণকেই আমার পরামর্শ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। স্বরাজ লাভের জন্য নিরুপদ্রব প্রতিরোধ প্রচেষ্টা চালাইবার ভার কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ কেবলমাত্র আমার উপরই ন্যস্ত রাখুন। নিরুপদ্রব প্রতিরোধের নীতি সম্পর্কে আমা অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অপর কোন ব্যক্তির অভ্যুত্থান না-হওয়া পর্য্যন্ত আমার জীবদ্দশায় কেবলমাত্র আমার নির্দ্দেশে পরিচালিত হইয়াই অপর সকলে ঐ আন্দোলনে পুনরায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের স্রষ্টা এবং প্রবর্ত্তক হিসাবেই আমি এই অভিমত জ্ঞাপন করিতেছি। কাজেই যাঁহারা আমার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দ্দেশে চালিত হইয়া স্বরাজ লাভার্থ নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এখন হইতে উহা ত্যাগ করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সিদ্ধির দিক হইতে ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

মনুষ্যের আয়ত্ত যত অস্ত্র আছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুধ এই সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আগ্রহান্বিত। [অর্থাৎ ইহা আমার বা অন্য কাহারও খেলার জিনিষ নয়।] সত্যাগ্রহকে যুদ্ধ-বিগ্রহ বা বল-প্রয়োগের পরিবর্ত্তে ব্যবহারযোগ্য পূর্ণফলপ্রদ অস্ত্র বলিয়া দাবী করা যাইতে পারে। তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের এবং সমগ্র জাতিকে পৌরুষহীন করিয়া ফেলিয়া সন্ত্রাসবাদীদের উচ্ছেদকামী সরকারের হৃদয় জয় করা সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেকের আন্তরিকতাহীন নিরুপদ্রব প্রতিরোধ—উহার ফল জাঁকাল হইয়া থাকিলেও, সন্ত্রাসবাদী বা শাসকসম্প্রদায় কাহারও হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। খাঁটি সত্যাগ্রহ নিশ্চয়ই উভয়ের হৃদয়কেই স্পর্শ করিবে। এই উক্তির সত্যতা পরীক্ষা করিতে হইলে, এক সময়ে কেবল একজন করিয়া যোগ্য ব্যক্তির সত্যাগ্রহ করা উচিত। এতাবৎ সেরূপ পরীক্ষা করা হয় নাই—এক্ষণে তাহাই করিতে হইবে।

পাঠককে আমি সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, কেবলমাত্র নিরুপদ্রব প্রতিরোধকে তিনি যেন সত্যাগ্রহ বলিয়া ধরিয়া না লন। ইহা আরও ব্যাপক। সত্যাগ্রহের অর্থ নিষ্করুণ সত্যানুসন্ধান এবং এইরূপ সত্যানুসন্ধানজাত শক্তির সন্ধান। কেবলমাত্র নিরুপদ্রব উপায়েই এই সন্ধান সম্ভবপর।

যে-সকল নিরুপদ্রবপ্রতিরোধকারিগণকে বর্ত্তমানে স্বাধীনতা দেওয়া হইল, তাহাদিগকে যদি ভবিষ্যতের আহ্বানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কি করিতে হইবে? তাঁহারা আত্মসুখবর্জ্জন এবং স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যব্রতের বিদ্যা ও মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবেন। তাঁহারা জাতিগঠনমূলক কার্য্যে, যথা—স্বহস্তে কাটা সূতায় স্বহস্তে বোনা খদ্দরের প্রচার সম্প্রসারণে, ব্যক্তিগত আচরণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তরের মিলন সঙ্ঘটনে আত্মনিয়োগ করিবেন; তাঁহারা নিজ আচরণের মধ্য দিয়া সর্ব্বতোভাবে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিবেন, নিজ পবিত্রতা সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়া ও নেশাখোরদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে মেলামেশা করিয়া পানদোষাদির সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জনের আন্দোলন চালাইবেন। এই সকল জনসেবার কাজে গরীব লোকদের মত চালে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা হইতে পারে। গরীবদের মত জীবনযাত্রা-প্রণালী যাঁহাদের পছন্দ

না হইবে বা যাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত না হইবে, তাঁহারা জাতীয়তার দিক হইতে গুরুত্বসম্পন্ন এরূপ শ্রমশিল্পের প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন, যাহাতে মানুষ দলবদ্ধভাবে কারখানায় ব্যাপৃত হয় না, এবং যাহাতে গরীবিয়ানার জন্য আবশ্যক আয়ের চেয়ে বেশী মজুরী পোষায়। সকলেই মনে রাখিবেন যে, যাঁহারা আইন ও কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বাধ্যতা স্বীকারের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত এবং উহা পালনও করিয়া থাকেন, নিরুপদ্রব প্রতিরোধের অধিকারী কেবলমাত্র তাঁহারাই।

একথা বলার প্রয়োজন নাই বলিলেই হয়, যে, এই বিবৃতি প্রকাশ করিয়া আমি কোন মতেই কংগ্রেসের ক্ষমতা আত্মসাৎ করিতেছি না। যাঁহারা সত্যাগ্রহ সম্পর্কে আমার নির্দ্দেশ চাহেন, আমি কেবল মাত্র তাঁহাদিগকেই এতদ্দ্বারা পরামর্শ দান করিলাম।

মহাত্মা গান্ধী যাহাকে পরামর্শ বলিয়াছেন, অধিকাংশ কংগ্রেসওয়ালা তাহা আদেশ বলিয়াই পালন করিবেন।

আমরা কখনও সত্যাগ্রহ করি নাই, নিরুপদ্রব ভাবে আইনলঙ্ঘন বা প্রতিরোধ করি নাই; (অবশ্য সোপদ্রব আইন লঙ্ঘন ত করিই নাই!)। যাঁহারা নিরুপদ্রব অসহযোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া অসহযোগ প্রচেষ্টাটিকে ভিতরের দিক হইতে জানিবার বুঝিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। হয়ত সেই কারণে এবং আধ্যাত্মিকতার পথে আমরা অনগ্রসর বলিয়া মহাত্মাজীর সব কথা বুঝিতে পারিয়াছি কি-না সন্দেহ হইতেছে। বাহির হইতে দেখিয়া শুনিয়া আমাদের যে ধারণা হইয়াছে, তাহাতে মহাত্মাজী স্বরাজলাভার্থ-নিরুপদ্রব-আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা যে স্থগিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঠিকই মনে হইয়াছে। যাহার মধ্যে আর উৎসাহ আগ্রহ প্রাণ ছিল না, তাহার কেবল ঠাটটা বজায় রাখিলে তাহাকে কেবল লোকের চক্ষে অবজ্ঞেয় ও হাস্যাস্পদই করা হইত। তার চেয়ে, যিনি নিজের মন বুঝেন, যিনি নিজের হৃদয় পরীক্ষা করিয়াছেন, যিনি অসহযোগ সত্যাগ্রহ প্রভৃতির প্রবর্ত্তক, একা সেই মহাত্মাই ব্রতী থাকুন, ইহাই ভাল।

তবে, গান্ধীজী বিশেষ করিয়া তাঁহার যে সমাদৃত পুরাতন বন্ধুর কেলের আচরণ হইতে আলোচ্য সিদ্ধান্তটিতে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার সিদ্ধান্তের পক্ষে যথেষ্ট হেতু বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে না। আমরা সত্যাগ্রহের নিয়ম কি কি জানি না, কিন্তু গান্ধীজী যখন বলিতেছেন, যে, তাঁহার বন্ধুর আচরণে সত্যাগ্রহের নিয়মভঙ্গ হইয়াছে, তখন তাহা নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে ত প্রমাণ হয় না যে, অনেক অযুত সত্যাগ্রহীর মধ্যে অধিকাংশই সত্যাগ্রহের অন্তরে প্রবেশ করে নাই, তাহার আধ্যাত্মিক স্বরূপ বুঝে নাই, সকলেই বা অধিকাংশই সত্যাগ্রহের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। হইতে পারে, যে, মহাত্মাজী সব কথা খুলিয়া বলেন নাই, অনেকেই হয়ত বাহিরে সত্যাগ্রহী কিন্তু অন্তরে তাহার বিপরীত কিছু ছিলেন। কিন্তু আমরা মহাত্মাজী যাহা বলিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করিতেছি। তাঁহার মনের মধ্যে কি আছে, তাহা জানি না; সুতরাং তাহার আলোচনাও অনধিকারচর্চ্চা হইবে। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয়, তাঁহার উক্তিতে অনেক প্রকৃত সত্যাগ্রহীর উপর অবিচার ও তাঁহাদের অপমান করা হইয়াছে।

মহাত্মাজী যে-সব গঠনমূলক কার্য্যের কথা বলিয়াছেন, শিক্ষার বিস্তার, জ্ঞান-বিস্তার, নিরক্ষরতা-দূরীকরণ তাহার মধ্যে নাই, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ ঠিক এই জিনিষটিতে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ কোন কালেই দেখা যায় নাই। এই কারণে তিনি এক সময় বাঙালীদিগকে 'শিক্ষাপাগল' বলিয়াছিলেন। আমরাও লিখনপঠনক্ষম-ত্ব ও শিক্ষিত-ত্বকে অভিন্ন মনে করি না। কিন্তু লিখনপঠনক্ষমত্বকে ভিত্তি না করিলে আধুনিক কালে কোন জাতি যথেষ্ট উন্নত ও শক্তিমান হইতে পারে না, ইহাও আমাদের বিশ্বাস। যাহা হউক, শিক্ষা সাধারণ ভাবে গান্ধীজীর "জাতিগঠনমূলক" কাজের তালিকার মধ্যে না থাকিলেও 'হরিজনদের' উন্নতির জন্য উহার প্রয়োজন গান্ধীজী স্বীকার করিয়াছেন, এবং শিক্ষাদানকে 'হরিজন' সেবার একটি অঙ্গ করা হইয়াছে।

ইহাও হইতে পারে, যে মহাত্মাজী তাঁহার মতবিবৃতিটিতে 'জাতিগঠনমূলক' কার্য্যের পূরা তালিকা দিতে চান নাই; কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র দিয়াছেন।

অসহযোগ, সত্যাগ্রহ ও সন্ত্রাসবাদ

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, খাঁটি সত্যাগ্রহ এক দিকে সরকারী শাসকসম্প্রদায় ও অন্য দিকে বেসরকারী সন্ত্রাসবাদী উভয়েরই হৃদয় স্পর্শ করিবে। উক্ত দুই শ্রেণীর লোকদের কাহারও সঙ্গে অল্প বা অধিক সাহচর্য্য আমাদের ঘটে নাই বলিয়া আমরা বলিতে পারি না তাহাদের হৃদয় কিসে সাড়া দিবে। কিন্তু সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে সম্ভবতঃ সন্ত্রাসবাদের উদয় হইত না, কিংবা উহা উদ্ভবের পর লোপ পাইত, এরূপ কোন একটা অনুমান

বা তত্ত্ব হয়ত সরকারী মনের কোণে উঁকি মারিয়া থাকিতে পারে। কারণ, দেখিতেছি, বঙ্গের ১৯৩২-৩৩ সালের সদ্যঃপ্রকাশিত শাসনবৃত্তান্তের প্রথম ভাগের একাদশ অনুচ্ছেদ এই বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে :—

"11. While the star of civil disobedience and the prestige of Congress were thus waning, numerous incidents illustrated the strength and the widespread nature of the terrorist movement."

তাৎপর্য্য। যখন এই প্রকারে নিরুপদ্রব আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টার শুভ-গ্রহ ও কংগ্রেসের প্রতিপত্তি ক্ষয় পাইতেছিল, তখন বহুসংখ্যক ঘটনা সন্ত্রাসকদিগের প্রচেষ্টার শক্তি ও ব্যাপকতা সপ্রমাণ করিতেছিল।

একের হ্রাস ও অন্যটির বৃদ্ধির মধ্যে কারণকার্য্য সম্পর্ক আছে কি?

সরকারী মতে তাহা থাক্ বা না-থাক্, বেসরকারী বিস্তর লোকের মতে তাহা আছে।

—

রাজকুমারী কমলা রাজা শিন্দে

গোআলিয়রের মহারাজা শিন্দের ভগ্নী রাজকুমারী কমলা রাজা শিন্দের সহিত শিবাজীর বংশধর অাকালকোটের

রাজকুমারী কমালা রাজা শিন্দে

রাজার বিবাহ হইবার পর এক মাসের মধ্যে রাজকুমারী আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় সমস্ত গোআলিয়র শোকে নিমগ্ন হইয়াছে। এই রাজকুমারীকে তাঁহাদের পিতামাতা কেতাবী শিক্ষা ত দিয়াছিলেনই—তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, অধিকন্তু তিনি চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি ললিতকলাও শিখিয়াছিলেন। তিনি আধুনিক বঙ্গীয় চিত্রকলার অনুরাগিণী ছিলেন। ইহা ছাড়া মহারাষ্ট্রীয় রীতিতেও তিনি শিক্ষা পাইয়াছিলেন। অশ্বারোহণে তিনি পারদর্শিনী ছিলেন এবং সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়া পুরুষ সৈনিকদের মত যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন।

—

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্রঞ্জ মূর্ত্তি

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ও চৌরঙ্গীর মোড়ে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্রঞ্জ মূর্ত্তিটির প্রতিষ্ঠাকার্য্য সেদিন সম্পন্ন হইয়া

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্রঞ্জ মূর্ত্তি

গিয়াছে। ভালই হইয়াছে। অনুষ্ঠানটির বর্ণনা করিতে গিয়া স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজ লিখিয়াছে, মূর্ত্তিটি ইটালীতে প্রস্তুত। যাহারা মনে করে ভাল কোন জিনিষ ভারতবর্ষের লোকেরা করিতে পারে না, স্টেট্‌স্‌ম্যান্ চালায় সেই রকম লোকেরা। ঐ প্রকৃতির লোকেরাই রটাইয়াছিল, তাজমহল ইটালীর লোকদের

পরিকল্পিত। প্রকৃত কথা এই যে, মূর্ত্তিটির আসল শক্ত কাজ, শিল্প-প্রতিভার কাজ যাহা, তাহা করিয়াছেন বাঙালী চিত্রকর ও মূর্ত্তিনির্মাতা শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। তিনি এখন মান্দ্রাজের সরকারী আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। ইহার পরিকল্পনাটি তাঁহার, ছাঁচ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তিনি। এত বড় মূর্ত্তির ঢালাই ভারতবর্ষে হয় না বলিয়া কেবল ঢালাইটি ইটালীতে হইয়াছে। ইউরোপেরও অনেক বড় বড় মূর্ত্তিকার নিজেদের তৈরি ছাঁচের অনুযায়ী মূর্ত্তি ঢালাই করান ব্যবসায়ী কারিকরদের দ্বারা। কিন্তু তাহাতে কেহ বলে না, যে, ঐ ঢালাইকারীরাই মূর্ত্তিকার।

কুমুদনাথ চৌধুরী

কুমুদনাথ চৌধুরী কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিখ্যাত ব্যারিষ্টর ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল শিকারী বলিয়া। তাঁহার লেখা শিকারবিষয়ক পুস্তক ও অনেক প্রবন্ধ আছে। দুঃখের বিষয়, তিনি গত মাসে মধ্যপ্রদেশে বাঘ শিকার করিতে গিয়া বাঘের দ্বারাই নিহত হইয়াছেন।

জমির খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

আমরা ইহা বার-বার দেখাইয়াছি, যে, বাংলা দেশে সংগৃহীত রাজস্বের খুব বেশী অংশ ভারত-গবন্মেণ্ট লওয়ায়, অন্য যে-কোন দুই প্রদেশ হইতে গৃহীত রাজস্বের সমষ্টি অপেক্ষা বেশী লওয়ায়, বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য প্রধান প্রধান প্রত্যেক প্রাদেশিক গবন্মেণ্টের চেয়ে কম টাকা বাংলা-গবন্মেণ্টের হাতে থাকে; অথচ বঙ্গের লোকসংখ্যা অন্য যে-কোন প্রদেশের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশী। বঙ্গের প্রতি এই অবিচারে ও বঙ্গের এই দুরবস্থায় দুঃখিত হওয়া দূরে থাক, অন্যান্য প্রদেশের অনেক নেতা বলেন, ভূমির খাজনা প্রত্যেক প্রাদেশিক গবন্মেণ্টের প্রাপ্য, যে-যে প্রদেশে এই খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই তাহাদের গবন্মেণ্ট ভূমির খাজনা বাবদে অনেক টাকা পায়, কিন্তু বাংলা দেশে খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় উহার গবন্মেণ্ট এই বাবদে বেশী টাকা পায় না, এই কারণে বাংলা সরকারের ভাগে কম টাকা থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বঙ্গে যত জমি আছে তাহার তুলনায় জমির খাজনা কম। তাহা সত্য কি-না দেখা যাক্।

বাংলার লোকসংখ্যা সর্ব্বাধিক হইলেও বাংলার আয়তন বড় সব প্রদেশের চেয়ে কম। ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত সরকারী স্ট্যাটিষ্টিক্যাল য্যাবষ্ট্রাক্ট নামক বহিতে প্রদেশগুলির আয়তন ও সর্ব্বাধুনিক যে বৎসরের ভূমির খাজনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা নীচে লিখিত হইল।

প্রদেশ	বর্গমাইলে আয়তন	জমির খাজনার টাকা
মান্দ্রাজ	১৪২২৭৭	৪,৮৮,৬১,৯৬৪
বোম্বাই	১২৩৬৭৯	৪,৭৪,৪৫,১৩৯
বাংলা	৭৭৫২১	৩,০৮,৯৩,১০২
আগ্রা-অযোধ্যা	১০৬২৪৮	৬,৪৭,৯৮,৯৩৩
পঞ্জাব	৯৯২০০	২,৬৯,৪২,৬৩১
বিহার-উড়িষ্যা	৮৩০৫৪	১,৮০,০৩,৭০৮
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	৯৯৯২০	২,১৮,৫৯,২৯২

বঙ্গের আয়তন এই সব প্রদেশের মধ্যে কম, কিন্তু বাংলা প্রত্যেকের চেয়ে কম খাজনা দেয় না; যাদের চেয়ে কম দেয়, তাদের চেয়ে বঙ্গের বিস্তৃতিও খুব কম।

তবে একথা উঠিতে পারে বটে, যে, সব প্রদেশের সমস্ত ভূমি ত চাষের যোগ্য নয়, হয়ত বঙ্গে চাষের যোগ্য জমি বেশী। তাহা সত্য কিনা দেখা যাক্। অঙ্কগুলি নিযুত একরে দেওয়া হইয়াছে। এক একর্ তিন বিঘার কিছু বেশী।

প্রদেশ।	বাস্তবিক বাপিত জমি।	চলিত পতিত।	তদ্ভিন্ন চাষযোগ্য পতিত।
মান্দ্রাজ	৩৪	১০	১২
বোম্বাই	৩২	১০	৬
বাংলা	২৩	৫	৫
আগ্রা-অযোধ্যা	৩৫	২	১০
পঞ্জাব	২৬	৪	১৪
বিহার-উড়িষ্যা	২৪	৬	৬
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	২৫	৩	১৪

যত জমি বাস্তবিক কর্ষিত ও বাপিত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ বঙ্গে সব চেয়ে কম। যত জমি সাধারণতঃ চাষ করা হয়, কিন্তু কোন কোন বৎসর হয়ত পতিত রাখা হয় এবং যত জমি চাষযোগ্য অথচ এপর্য্যন্ত যাহাতে চাষ হয় নাই, এই উভয় প্রকার জমির সমষ্টিতেও বাংলা দেশ সকলের নীচে।

সুতরাং বঙ্গে জমির খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকিলেই এখান হইতে গবন্মেণ্ট বেশী খাজনা পাইতেন বা ন্যায়তঃ পাইবার অধিকারী হইতেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ রামমোহন রায় লিখিয়া গিয়াছেন, এবং এ-বিষয়ের বিশেষজ্ঞেরা জানেন, যে, ১৭৯৩ সালে

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় যে খাজনা ধার্য্য হয় তার চেয়ে বেশী কখনও ধার্য্য হয় নাই, বরং ইহা অনেক স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান ও ইংরেজ গবর্মেণ্টের সর্ব্বোচ্চ আদায়ের চেয়ে বেশী।

কথিত হইতে পারে, যে, বঙ্গের অনেক জমি খুব উর্ব্বরা, কিন্তু তাহা ত অন্য অনেক প্রদেশের পক্ষেও সত্য। অন্য দিকে বঙ্গের দুটা অসুবিধা আছে, যাহা অন্য প্রদেশগুলির নাই। যথা—বাংলা দেশকে অল্পতম জমীর দ্বারা অধিকতম কৃষিজীবী লোকদিগকে পালন করিতে হয়, এবং অন্য বহু প্রদেশ কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত সরকারী জলসেচনের খালের যে সুবিধা পাইয়া থাকে, বঙ্গের তাহা নাই।

—

স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়ের অবসর গ্রহণ

এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ স্যর লালগোপাল

স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়

মুখোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করিতেছেন। সেই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে গত মাসে এলাহাবাদে বিদায়-ভোজ দেওয়া হইয়াছে। ভোজ-সভায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্য অনেকে তাঁহার বিচারকার্য্যদক্ষতা ও অন্য গুণাবলীর প্রশংসা করেন। তিনি সৌজন্যের জন্য এবং সুবিচারক বলিয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিলে মনে হয় না, যে, তাঁহার বয়স ৬০ হইতে যাইতেছে। শুধু চেহারায় নয়, তিনি কর্ম্মিষ্ঠতাতেও অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক কর্ম্মিষ্ঠ লোকদের মত। সুতরাং তিনি জজিয়তী আরও কয়েক বৎসর বেশ করিতে পারিতেন। তাঁহার অবসর গ্রহণে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং তাঁহারও আয় কমিবে। কিন্তু তিনি অন্য প্রকারে দেশের হিত করিতে পারিবেন।

প্রবাসী বাঙালীরা তাঁহার নেতৃত্ব দ্বারা উপকৃত হইবার আশা রাখে। তিনি আগে হইতেই প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। এখন অবসর গ্রহণের পর ইহার কাজে আরও বেশী সময় দিতে পারিবেন। বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে সর্ব্বত্রই বাঙালীদের বিজ্ঞ সুবিবেচক পরামর্শদাতা ও নেতার খুব আবশ্যক।

—

সংবাদপত্র পরিচালনে বাঙালী

এলাহাবাদের দৈনিক ইংরেজী কাগজখানি আজকাল এলাহাবাদে যে-দিন বিলি হয়, কলিকাতাতেও সেই দিন বিকালে সন্ধ্যায় উহার বিতরক দ্বারা বিলি হয়। খাস কলিকাতায় চারি লক্ষের উপর হিন্দীভাষী উর্দ্দুভাষী লোক আছে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ নিরক্ষর হইলেও কয়েক শত —সম্ভবতঃ হাজারখানেক—লোক ইংরেজী জানে, এবং তাহারা সবাই সচ্ছল অবস্থার লোক। তাহারা যে-যে প্রদেশের লোক তথাকার খবর ও খবরের উপর মন্তব্য তাহারা কলিকাতার চেয়ে পশ্চিমের কাজে বেশী পাইবার আশা করে বলিয়া এলাহাবাদের কাগজখানার সুবিধা হইয়াছে। পাটনার দৈনিকেরও এই সুবিধা হইতে পারে।

বঙ্গের বাহিরে যে-সব জায়গায় বাঙালী বেশী আছে, তাহাদের দ্বারে দ্বারে বঙ্গের দৈনিকগুলি পৌছাইবার এইরূপ চেষ্টা মালিকরা করেন কিনা, জানি না।

কলিকাতায় ইংরেজদের দৈনিক তিন খানা ছিল। এখন কমিয়া এক খানায় ঠেকিয়াছে। 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস্' অনেক বৎসর আগে উঠিয়া যায়। 'ইংলিশম্যান' কয়েক বৎসর হইল সাপ্তাহিকের আকার ধারণ করে। সম্প্রতি সাপ্তাহিক ইংলিশম্যানও ভারতের ভাবী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে 'বিদ্বেষ-স্তোত্র' (hymn of hate) শেষবার গাহিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে। দেশী কাগজের প্রতিযোগিতার প্রবলতার ইহা একটি প্রমাণ। কিন্তু এক দিকে যদিও ইংরেজ সাংবাদিককে ও সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীকে হটিতে হইয়াছে, অন্য দিকে বঙ্গের বাহিরের সংবাদপত্র এবং সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী কলিকাতায় নিজেদের স্থান করিয়া লইতেছে। উদ্যোগিতার দ্বার সর্ব্বত্র অবারিত থাকা ভাল। এলাহাবাদের কাগজখানার যেমন কলিকাতায় কাটতি হইতেছে, তেমনই মান্দ্রাজী স্বত্বাধিকারীর দৈনিক ইংরেজী কাগজও কলিকাতা হইতে বাহির হইতেছে। বাঙালী স্বত্বাধিকারীর ইংরেজী দৈনিক বঙ্গের বাহিরে কোন জায়গায় নাই।

বাঙালী সাংবাদিকদের দৃষ্টি আর একটা বিষয়ে পড়িয়া থাকিবে। পাটনা হইতে 'ইণ্ডিয়ান নেশ্যন' নামক একখানি দৈনিক একবার বাহির হইয়া বন্ধ হয়। উহা আবার বাহির হইতেছে। উহার সম্পাদক লওয়া হইয়াছে বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যা ডিঙাইয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী হইতে। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশও নিকটতর ছিল। সেখান হইতেও লওয়া বা পাওয়া যায় নাই। এই সম্পাদকটির যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি না—সে-বিষয়ে কিছু জানি না। বাঙালী সাংবাদিকদিগকে কেবল লক্ষ্য করিতে বলিতেছি, যে, আজকাল তাঁহাদিগকে লোকে চায় না বা পুঁছে না। তাহার অনুমিত অন্যতম কারণ, তাঁহারা পরস্পরকে পুঁছেন না; যেখানে কোন প্রতিযোগিতা নাই—প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রই নাই, সে-স্থলেও বাঙালী সংবাদপত্রপরিচালকদের অ-সহযোগিতা ও ঈর্ষ্যার প্রমাণ পাওয়া যায়। কার্য্য উদ্ধারের জন্য অতিভদ্র, এমন কি খোসামোদকারী, কিন্তু অন্য সময়ে নিজমূর্ত্তিধারী, এরূপ লোকও আছেন।

ক্ষুদ্রতম কাগজও বৃহত্তম কাগজের বাস্তবিক সহযোগী। প্রত্যেক কাগজেই এমন কিছু থাকে, যাহা জ্ঞাতব্য এবং যাহা অন্য কাগজে পাওয়া যায় না।

কলিকাতার স্বাস্থ্য

বড় শহর মাত্রেরই স্বাস্থ্য ভাল রাখা অতিশয় কঠিন—বিশেষতঃ সেই রকম শহরের যেখানে স্থলপথে জলপথে আকাশ-পথে দেশবিদেশ হইতে নানা রকমের মানুষ ও অন্য জীব এবং বাণিজ্যদ্রব্য আসে, এবং তাহাদের সঙ্গে নানা রোগবীজ আসে। কিন্তু রোগের আগমন এইরূপে হইতে পারে বলিয়া কোন শহরেরই অন্য সব স্থানের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করা চলে না—সম্পর্ক ত্যাগ করা উচিতও নহে। যাহা করা যায় ও করা উচিত, তাহা নগরপালদিগের দ্বারা নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা এবং যাঁহারা স্বাস্থ্যতত্ত্ব বুঝেন তাঁহাদের দ্বারা স্বাস্থ্যতত্ত্বের প্রচার। ইংরেজী সাপ্তাহিক কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সাধারণসংখ্যাসমূহে শহরের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় তথ্য এবং রোগের প্রতিষেধক উপায় ও রোগের প্রতিকার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি থাকে। তা ছাড়া সম্পাদক মধ্যে মধ্যে যে একটি স্বাস্থ্যসংখ্যা বাহির করেন, তাহাতে এরূপ জিনিষ প্রচুর থাকে। এই সংখ্যাগুলি, এবং বার্ষিক সংখ্যাগুলিরও পঠিতব্য জিনিষ, চিত্র ও মুদ্রণের উৎকর্ষে এইজাতীয় পত্রিকাসমূহের মধ্যে যে স্থানটি অধিকার করিয়া আছে তাহা অনন্যসুলভ। সম্প্রতি যে ষষ্ঠ স্বাস্থ্যসংখ্যা বাহির হইয়াছে, তাহা কলিকাতায় বর্ত্তমান ঋতুতে প্রাদুর্ভূত রোগসমূহের ভয়ে ভীত লোকদের বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

"ক্যালকাটা ক্লীক্"

বিলাতে যেমন লণ্ডনে রয়্যাল সোসাইটি আছে, ভারতবর্ষে সেই-রকম একটি বৈজ্ঞানিক সভা (ইণ্ডিয়ান্ একাডেমি অব সায়েন্স) প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা অনেক দিন হইল উঠিয়াছে। বিষয়টির সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত ও আলোচনা গত মার্চ্চ মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে আছে। তাহা মাসিক কাগজের প্রবন্ধ এবং কলিকাতার মাসিকের প্রবন্ধ; সুতরাং কলিকাতার দৈনিক কাগজওয়ালারা তাহা না-পড়িতে বাধ্য, এবং তাহার শিরোনামটা দেখিয়া থাকিলেও তাহার উল্লেখ না-করিতে বাধ্য। (এই প্রবন্ধ হোনোলুলুর কোন কাগজে থাকিলে অবশ্য উদ্ধৃত হইতে পারিত।) সেই জন্য যখন দক্ষিণ-ভারত হইতে বৈজ্ঞানিক স্যর চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামনের

ই-বিষয়ক একটা বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তারযোগে কলিকাতার দৈনিকগুলির আফিসে পৌঁছিল, তখন তাঁহারা এই বিষয়ের সংবাদের জন্য ব্যাকুল হইলেন। অধ্যাপক আঘরকর কিছু সত্য খবর দিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন। পরে ডক্টর মেঘনাদ সাহার উক্তিও আসিয়া পৌঁছিল।

ব্যাপারটা এই, যে, যেহেতু অধ্যাপক রামন্ নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, অতএব তাঁহার মতে ভারতবর্ষে আর কোন বৈজ্ঞানিক নাই, এবং তিনি যেখানে বিরাজ করিবেন, তাহাই ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র স্বতই হইতে বাধ্য! পৃথিবীতে মোটে কয়েক গণ্ডা বৈজ্ঞানিক নোবেল প্রাইজ-ওয়ালা আছে। কিন্তু সেই জন্য কোন পাগলেও এরূপ ভাবে না, যে, অন্য বহু সহস্র বৈজ্ঞানিক নগণ্য। কলিকাতা তাঁহাকে বড় হইবার সুযোগ দিয়াছিল, কিন্তু এখন তিনি কলিকাতায় নাই। অতএব, যদিও কলিকাতায় ভারতবর্ষের যত সরকারী বৈজ্ঞানিক বিভাগের (ডিপার্টমেণ্টের) সদর কার্য্যালয় অবস্থিত ভারতীয় অন্য কোন শহরে তত নাই, এবং যদিও কলিকাতায় সরকারী ও বে-সরকারী অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণাগারে যত রকমের যত গবেষণা হয়, ভারতবর্ষের অন্য কোথাও তত হয় না, এবং সেই কারণে ইণ্ডিয়ান একাডেমী অব্ সায়েন্সের পীঠস্থান স্বভাবতঃই কলিকাতায় হইবার কথা, তথাপি অধ্যাপক রামন্ কল্পনা করিয়াছেন, কলিকাতার একটা ক্লীক্ (অর্থাৎ মন্দ অভিপ্রায়ে গঠিত একটা ক্ষুদ্র দল) ঐ একাডেমীকে কলিকাতায় বসাইবার চেষ্টা করিতেছে! কেহই সে চেষ্টা করিতেছে না, কারণ তাহা অনাবশ্যক। মহতের সহিত ক্ষুদ্রের উপমা দেওয়া মার্জ্জনীয় হইলে বলা যায়, সূর্য্যকে পূর্ব্বদিকে উদিত করিবার জন্য যেমন কোন ক্লীকের দরকার হয় না, তেমনি কলিকাতা যাহার কেন্দ্র উহাকে তাহার কেন্দ্র বানাইবার জন্যও ক্লীকের প্রয়োজন নাই।

কাহার গ্রাহক বেশী

এটা সবাই জানে, সরকারী বেসরকারী যে-সব প্রতিষ্ঠান, আফিস, ডিপার্টমেণ্ট প্রভৃতির কর্ত্তা ইংরেজ বা ফিরিঙ্গী, সেই সকলের বিজ্ঞাপন ইংরেজদের কাগজগুলা পায়—যদি বিজ্ঞাপনগুলা প্রধানতঃ ভারতীয়দের অবগতির জন্য অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেও সেগুলা এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজে বেশী দাম দিয়া দেওয়া হয়। স্টেট্স্ম্যানে এইরূপ কোন কোন বিজ্ঞাপনের প্রকাশে অমৃতবাজার পত্রিকা খুঁত ধরেন। তাহাতে চৌরঙ্গীর কাগজ বলিতেছেন, তাঁহার ভারতীয় পাঠকসংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত যে-কোন কাগজের চেয়ে বেশী। অমৃতবাজার তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং সন্দেহের যুক্তিসঙ্গত কারণও বলিয়াছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকাও এ-বিষয়ে কলম চালাইয়াছেন, লিখিয়াছেন, "ষ্টেট্স্ম্যান একটু অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিতেন যে, এই কলিকাতা শহর হইতে প্রকাশিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র আনন্দবাজার পত্রিকার প্রচার তাঁহাদের চেয়ে বহুগুণে অধিক। ষ্টেটস্ম্যান যদি প্রকাশ্যে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া এ-বিষয়ে মীমাংসা করিতে সম্মত থাকেন, আমরা প্রস্তুত আছি।" স্টেটস্ম্যান এই হিসাব-যুদ্ধে অগ্রসর হইবেন বলিয়া মনে হয় না। আমরা অবশ্য কোন কাগজেরই কাটতি কত জানি না। কিন্তু আজকালকার দিনেও যদি স্টেটস্ম্যানের বাঙালী পাঠক যে-কোন বাঙালী-পরিচালিত ইংরেজী বা বাংলা কাগজের চেয়ে বেশী থাকে, তাহা বাঙালীদের লজ্জার বিষয় হওয়া উচিত।

শুনিয়াছি, কোন কোন বিজ্ঞাপনসংগ্রাহক, যে-কাগজের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেন, শুধু তাহার কাটতি বাড়াইয়া বলিয়াই ক্ষান্ত হন না, অন্য সব কাগজের কাটতিও খুব কমাইয়া বলেন। মাসিক পত্রিকাগুলিও রেহাই পায় না।

বুদ্ধিমান বিজ্ঞাপনদাতারা শুধু কাটতির পরিমাণ বিবেচনা করেন না, দৈনিকের সঙ্গে মাসিকের কাটতির তুলনাও করেন না। কেন-না দৈনিক কাগজ কম লোকেই বাঁধাইয়া রাখে বা বাসি হইয়া গেলে পড়ে; কিন্তু মাসিক অনেকে মাসের ১লা তারিখের পরেও পড়ে, এবং বাঁধাইয়া রাখে। তাহার বাঁধান পুরাতন ভল্যুমের পর্য্যন্ত পাঠক অনেক। যিনি যে-রকম জিনিষের বিজ্ঞাপন দিতে চান, সেইরূপ জিনিষের ক্রেতা কোন্ কাগজের পাঠকদের মধ্যে কত, তাহার একটা অনুমানও তাঁহাকে করিতে হয়।

সৈন্যদল সম্বন্ধে সরকারী প্রবন্ধ

কাগজের কাটতি ও সরকারী বিজ্ঞাপনের বিষয়ে কিছু লিখিতে গিয়া একটা কথা মনে পড়িল। যখন কলিকাতার ও অন্য কোন কোন শহরের ইংরেজী দৈনিকে ভারতবর্ষের সৈন্যদলের সম্বন্ধে লম্বা লম্বা সরকারী প্রবন্ধ দেখি, তখনই মনে প্রশ্ন উঠে, "আচ্ছা, এগুলার জন্যে সরকার বাহাদুর কি কাগজওয়ালাদিগকে বিজ্ঞাপনের দরে টাকা দিতেছেন?"

আনন্দবাজার পত্রিকার নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি পড়িয়া সেই প্রশ্নটা আবার মনে উদিত হইল।

> কয়েক দিন পূর্ব্বে আমরা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রেস-অফিসারের মারফৎ "ফিজিক্যাল ডিরেক্টর, বেঙ্গল" মিঃ জেমস বুকাননের নিকট হইতে একটি "সংবাদ" প্রকাশার্থ পাই। আমরা সবিস্ময়ে দেখিলাম যে, গত ৭ই এপ্রিল তারিখে 'ষ্টেটসম্যান' এবং 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া'—এই উভয় পত্রেই ঐ সংবাদটি বিজ্ঞাপনরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যে-সংবাদ জনসাধারণের উপকারার্থে আমাদিগকে প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল, তাহাই বিজ্ঞাপনরূপে ছাপাইবার জন্য 'ষ্টেটসম্যান' ও 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া'কে অর্থ দেওয়া হইল! এই বৈষম্যের কারণ কি? কাহার আদেশে এইরূপ ব্যবস্থা হইল! ইহা কি অনুগ্রহভাজন সংবাদপত্রবিশেষকে "সব্‌সিডাইজ" করা নয়?

সরকারী সামরিক প্রবন্ধসমূহ দৈনিকগুলি বিনামূল্যে ছাপিতেছেন, না তাহার জন্য বিজ্ঞাপনের দরে টাকা পাইতেছেন, তাহা জানিবার কৌতূহলের কারণ বলিতেছি।

বেসরকারী লোকেরা অনেক মূলধন ফেলিয়া খবরের কাগজ বাহির করেন, এবং অনেক খরচ করিয়া ও দায়ঝুঁকি লইয়া সেগুলি চালান সর্ব্বসাধারণকে সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য, লোকমত প্রচার করিবার জন্য এবং আপনাদের মত ও মন্তব্য ও স্বাধীনচিত্ত জ্ঞানবান্ লোকদের লেখা প্রবন্ধ প্রকাশ দ্বারা লোকমত গঠন করিবার জন্য। যদি কোন কাগজে সরকারী বিষয়ে কোন ভুল খবর বাহির হয়, তাহার সরকারী সংশোধন মুদ্রিত করা কর্ত্তব্য বটে। কিন্তু বেসরকারী লোকেরা পয়সা খরচ করিয়া দায়ঝুঁকি লইয়া কাগজ চালাইবে আর সরকার বাহাদুর আত্মপক্ষ প্রচার ও সমর্থনের জন্য লম্বা লম্বা প্রবন্ধ তাহাতে বিনাব্যয়ে ছাপাইবেন, এই বন্দোবস্ত যুক্তিসঙ্গত বা বাণিজ্যরীতিসঙ্গত মনে হয় না। সরকার বাহাদুর যদি লোককে বুঝাইতে চান, যে, ভারতবর্ষের সৈন্যদল প্রয়োজনের অতিরিক্ত বড় নহে এবং ইহার ব্যয়ও যথাসম্ভব কম, তাহা হইলে নিজের পয়সায় কাগজ বাহির করিয়া বা বহি লিখাইয়া তাহার মারফতে ঐসব কথা প্রচার করুন।

যে-সব সংবাদপত্র ঐ সকল লম্বা প্রবন্ধ ছাপাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পাঠকেরা সেগুলি খুব আগ্রহের সহিত পড়িয়াছেন, না ভাবিয়াছেন এগুলার পরিবর্ত্তে পাঠযোগ্য যুক্তিসঙ্গত কিছু পাইলে তাঁহারা খুশী হইতেন, বলিতে পারি না। আমরা ঐ সরকারী প্রবন্ধসমূহের একটি বাক্যও পড়ি নাই, সুতরাং তৎসমুদয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না।

—

প্রাচীন স্থাপত্য-গ্রন্থ "মানসার"

গত চৈত্রের প্রবাসীর ৮৮৭ পৃষ্ঠায় আমরা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর প্রসন্নকুমার আচার্য্য মহাশয়ের সম্পাদিত প্রাচীন স্থাপত্য-গ্রন্থ মানসারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। তাহার বিস্তারিত পরিচয়ও দিবার ইচ্ছা আছে। এখন, চৈত্রে যাহা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তাহা লিখিতেছি। এই গ্রন্থের এই সংস্করণে কেবল যে মূল সংস্কৃত পাঠটি দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে, ইংরেজী অনুবাদও দেওয়া হইয়াছে এবং বিস্তর নক্সাও দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য ইহা ভারতবর্ষের যে-সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ আছে, তাহার অন্তর্ভূত এঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্কশূন্য এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিদ্যালয়সমূহে অগ্রসর ছাত্রদের অধীতব্য পুস্তক বলিয়া নির্দ্ধারিত হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের বিশ্বাস এই, যে, যদি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এখন জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এই পুস্তকখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এঞ্জিনিয়ারিং উপাধিপ্রার্থীদের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থসমূহের অন্যতম বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেন। এখন ইহা অন্ততঃ কাশীর হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধীত হওয়া উচিত। গ্রন্থখানিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীতব্য করিলে পরোক্ষ সুফল এই হইবে, যে, প্রাচীন ভারতীয়দের স্থাপত্য ও মূর্ত্তিশিল্পের জ্ঞানের পরিমাণ সম্বন্ধে সত্য ধারণা জন্মিবে। তা ছাড়া, এই উভয় শিল্পে প্রাচীনরা যদি কোন ভ্রম করিয়া থাকেন, নূতন জ্ঞান ও গবেষণার প্রভাবে তাহার সংশোধন হইবে। কারণ, প্রাচীন বা আধুনিক কোন লেখকদিগেরই কোন বিষয়ের জ্ঞান সম্পূর্ণ বা চূড়ান্ত নহে।

—

নেপালে মহারাজা হইবার অধিকার

নেপালের নৃপতিকে বলা হয় মহারাজাধিরাজ। কিন্তু তিনি প্রতীক মাত্র। সমুদয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রীর। তাঁহার উপাধি মহারাজা। নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে রাণা-পরিবারের লোকেরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইয়া থাকেন। ইঁহাদের সকলের আছে কিনা জানি না, কিন্তু অনেকের যেমন বৈধভাবে বিবাহিতা "উচ্চজাতীয়া" পত্নীর গর্ভে জাত সন্তান আছে, তেমনি "নীচজাতীয়া" রমণীর গর্ভে জাত সন্তানও আছে। এইরূপ কেহ কেহ খুব যোগ্য লোক। ভূতপূর্ব্ব মহারাজার "রুদ্র" নামক এইরূপ এক পুত্র সেদিন পর্য্যন্ত নেপালের প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং সৈনিকদের খুব প্রিয় ছিলেন। সম্প্রতি তিনি, তাঁহার মাতা সমমর্য্যাদার ছিলেন না এবং "নীচজাতীয়া" ছিলেন বলিয়া, প্রধান সেনাপতির পদ হইতে অপসৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের মাতা "নীচজাতীয়া" বলিয়া বা বৈধরূপে বিবাহিতা হন নাই বলিয়া এইরূপ আরও অনেকের কাজের অদলবদল হইয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজা এইরূপ করিবার এই কারণ দেখাইয়াছেন, যে, তাহা না করিলে রুদ্রই ইহার পর প্রধান মন্ত্রীর পদের ন্যায্য অধিকারী হইতেন, কিন্তু তাহাতে প্রজারা অসন্তুষ্ট হইত এবং শাসক রাণা-বংশের রক্তের বিশুদ্ধি নষ্ট হইত। প্রজারা অসন্তুষ্ট হইত কি না জানি না কিন্তু যোগ্যতা সত্ত্বেও অধিকারলোপরূপ ও পদচ্যুতিরূপ শাস্তি পাইবে এইরূপ মাতাদের পুত্রেরা, ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। দুর্নীতিপরায়ণ মহারাজাদের সামাজিক বা অন্যবিধ কোন শাসন বা শাস্তি হয় কি?

পৃথিবীতে জাতির বিশুদ্ধতা (racial purity) বলিয়া কোন জিনিষ নাই ; ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির লোকদের মধ্যে অল্পাধিক রক্তমিশ্রণ

ঘটিয়াছে। সুতরাং কেবলমাত্র বংশের রক্তশুদ্ধির কারণে এতটা করা ন্যায়সঙ্গত হয় কি? তবে যদি প্রজাদ্রোহের আশঙ্কা বা অন্য রাষ্ট্রনৈতিক কারণ ইহার সঙ্গে জড়িত থাকে সে অন্য ব্যাপার।

—

'তাঁহাকে বিষ দেন না কেন?'

খান্ ওবেইদুল্লাহ্ খান্ নামক একজন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজনৈতিক বন্দীর কারাগারে ক্ষয়রোগ হইয়াছে। তিনি মুলতান জেলে আবদ্ধ আছেন। (অদ্য ২৮শে চৈত্র কাগজে দেখিতেছি, তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছেন।) তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে কিনা, কিংবা তাঁহাকে অন্ততঃ মুলতান জেল হইতে তদপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থানের জেলে সরান হইবে কিনা, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ভারত-গবর্মেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব স্যর হ্যারি হেগ এই মর্ম্মের উত্তর দেন, যে, সেরূপ কিছু করা হইবে না। তখন মিঃ মাস্‌দ আহমেদ নামক এক জন সদস্য বলেন :—

"If the Government propose to g.t rid of the man, why not poison him?"

"যদি গবর্মেণ্ট একেবারে মানুষটিকে সরাইয়া ফেলিতে চান, তাহা হইলে তাহার প্রতি বিষপ্রয়োগ করেন না কেন?"

প্রশ্নকর্ত্তা মুসলমান, হিন্দু নহেন; ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে থাকেন, বঙ্গে নহে।

স্যর হ্যারি হেগ মৃদুভাবে উত্তর দিলেন :—

"That's not a reasonable way of looking at a hunger-striker who chooses to do so voluntarily, with the result that he has impaired his health."

"একজন প্রায়োপবেশক যে নিজে স্বেচ্ছায় উপবাস দিতেছে ও তাহার ফলে যাহার স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে, তাহার বিষয়ে এই প্রকার (মানসিক) দৃষ্টিনিক্ষেপ যুক্তিসঙ্গত নহে।"

মিঃ মাস্‌দ ব্যবস্থাপক সভায় অচিন্তিতপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি কি জানেন, সন্দেহ করেন বা কল্পনা করেন, যে, গবর্মেণ্ট কখনও কোন বন্দীকে মারিয়া ফেলিবার জন্য বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন বা করেন বা গবর্মেণ্টের পক্ষে তাহা করা সম্ভব; অন্ততঃ তিনি কি মনে করেন, যে, গবর্মেণ্ট কোন বন্দীর মৃত্যুকামনা করিয়াছিলেন বা করেন বা গবর্মেণ্টের তাহা করা সম্ভব, যে তিনি এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন? স্যর হ্যারি হেগও হয়ত মিঃ মাস্‌দ আহমেদের প্রশ্নের উত্তরে ঐরূপ প্রতিপ্রশ্ন করিতে পারিতেন। স্যর হ্যারি তাহা করিলে মিঃ আহমেদ কি উত্তর দিতেন জানিতে কৌতূহল হয়! কিন্তু যাহা হয় নাই তাহা হইলে আরও কি হইত, সে-বিষয়ে জল্পনা বৃথা।

—

"স্বদেশহিতৈষণার একচেটিয়া"

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র বিনাবিচারে বন্দীকৃত বাঙালীদের অসুস্থতাদি অভিযোগের কথা মধ্যে মধ্যে সভায় তুলিয়া থাকেন। সেই সম্বন্ধে ভারত-গবর্মেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব স্যর হ্যারি হেগ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

Referring to the problem of detenus, Sir Harry Haig was astonished at Mr. Mitra's charges. Mr. Mitra had declared that Government should not imagine that by merely keeping in restraint a few thousand young men they would kill the ideas of patriotism.

Sir Harry asked: Does Mr. Mitra think that we are keeping these young men in order to kill the ideas of patriotism? The problem of detenus is practically confined to Bengal. Are there no patriots in other provinces? Has Bengal the monopoly of patriotism? Or is it not that Bengal has the monopoly of something different (political murder)? What Government are seeking is not to suppress patriotism, but the desire for murder. That is the justification for the policy of keeping these young men under restraint. We fully believe that they are terrorists...

...I would invite Mr. Mitra to make it clear whether by expressing his feelings, as he did, he in any way desired to support the murder of Government officials or their friends.

Mr. Mitra immediately answered in the negative.

তাৎপর্য্য। স্যর হ্যারি মিঃ মিত্রের অভিযোগগুলিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। মিঃ মিত্র বলিয়াছিলেন, গবর্মেণ্টের কল্পনা করা উচিত নয়, যে, কয়েক হাজার যুবককে আটক রাখিয়া স্বদেশহিতৈষণার ভাব বিনষ্ট করিবেন।

স্যর হ্যারি জিজ্ঞাসা করেন: মিঃ মিত্র কি মনে করেন, যে, আমরা এই যুবকগুলিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি স্বদেশহিতৈষণার ভাব নষ্ট করিবার নিমিত্ত? বিনাবিচারে আটক রাখার সমস্যাটা কার্য্যতঃ বঙ্গেই সীমাবদ্ধ। অন্যান্য প্রদেশে কি স্বদেশহিতৈষী নাই? স্বদেশহিতৈষণা কি বঙ্গের একচেটিয়া? না, পৃথক একটা জিনিষ (রাষ্ট্রনৈতিক হত্যা) বঙ্গের একচেটিয়া? গবর্মেণ্ট যাহা চাহিতেছেন তাহা স্বদেশহিতৈষণার দমন নহে, কিন্তু নরহত্যার ইচ্ছার বিনাশ। তাহাই এই যুবকদিগকে আটক রাখিবার নীতির ন্যায্যতাপ্রতিপাদক। আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি, যে, তাহারা সন্ত্রাসবাদী।......

......মিঃ মিত্র যে প্রকারে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দ্বারা তিনি সরকারী কর্ম্মচারী বা তাহাদের বন্ধুদের হত্যা সমর্থন করিতে কোন রকমে ইচ্ছা করিয়াছেন কিনা, তাহা পরিষ্কার করিয়া জানাইতে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি।

মিঃ মিত্র তৎক্ষণাৎ বলিলেন, তিনি সেরূপ কোন ইচ্ছা করেন নাই।

পাঠকেরা লক্ষ্য করিবেন, স্যর হ্যারি হেগ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের কথাগুলিতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ভদ্রভাষায় তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মিঃ মাস্‌দ আহমেদের প্রশ্নে বিস্ময় প্রকাশ করেন নাই, এবং তাঁহাকে ভদ্রতম ভাষাতেও আহ্বান করেন নাই তাঁহার প্রশ্নের কারণ বলিতে। অথচ, মিঃ আহমেদের প্রশ্নের মধ্যে, গবর্মেণ্টের পক্ষে কাহাকেও বিষপ্রয়োগ সম্ভব হইতে

পারে, এইরূপ যে কল্পনা উহ্য থাকিতে পারে মনে করা যাইতে পারে, তাহা মিঃ মিত্রের উক্তির মধ্যে, গবন্মেণ্টের পক্ষে স্বদেশহিতৈষণা বিনাশের জন্য কতকগুলি লোককে আটক করিয়া রাখিবার যে সম্ভাবনা উহ্য থাকিতে পারে মনে করা যাইতে পারে, তাহা অপেক্ষা কম আশ্চর্য্যজনক নহে—বরং বেশী আশ্চর্য্যজনক।

বিনাবিচারে বন্দী সব বাঙালী যুবককে স্যর হ্যারি হেগ সন্ত্রাসবাদী মনে করেন, বলিয়াছেন। সুতরাং তিনি সত্যেন্দ্র বাবুকে যাহা কৈফিয়ৎ দিতে আহ্বান করেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু বিনাবিচারে বন্দীদিগকে বেসরকারী প্রত্যেক লোক সন্ত্রাসবাদী বলিয়া ধরিয়া লইতে বাধ্য নহে, কারণ তাহা প্রমাণ হয় নাই। সেই কারণে, বঙ্গে বিস্তর লোক বিশ্বাস করে, যে, তাহাদের মধ্যে সবাই না হউক, অনেক যুবক সন্ত্রাসবাদী নহে, এবং বঙ্গে কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদী থাকায় পুলিস বিস্তর অ-সন্ত্রাসবাদী স্বদেশভক্ত যুবককে সন্ত্রাসবাদ দমন উপলক্ষ্যে আটক করিয়াছে। সত্যেন্দ্র বাবুর উক্তি এইরূপ কোন বিশ্বাসের ফল বলিয়া অনুমান করি।

তিনি কিংবা সার্ব্বজনিক কার্য্যে ব্যাপৃত অন্য কোন বাঙালী এমন আহাম্মক নহেন, যে, স্বদেশহিতৈষণা বঙ্গের একচেটিয়া সম্পত্তি বলিবেন। স্যর হ্যারি বলিয়াছেন, রাজনৈতিক হত্যা বঙ্গের একচেটিয়া জিনিষ। স্যর হ্যারির উক্তি সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে প্রযোজ্য সত্য না হইলেও ভারতবর্ষে আপাততঃ তাহা বটে।

—

কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচন

এ-বৎসর কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচন যে সুশৃঙ্খলভাবে হইতে পারে নাই, ইহা দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। যে-রূপে ইহা হইয়াছে তাহা নিয়মানুগত্যের ও নিয়মানুগত প্রণালীতে কাজ করার পক্ষে বিপজ্জনক। অবিসংবাদিত নিয়ম অনুসারে নির্ব্বাচনের ফলে যে-কেহ নির্ব্বাচিত হউন, তাহাতে কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু স্বাজাতিক ও স্বায়ত্তশাসনপ্রার্থী কোন দলের পক্ষে এমন কিছু করা আত্মঘাতী, যাহা স্বায়ত্তশাসক প্রতিষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিবার ছিদ্র গবন্মেণ্টকে দেয়, কিংবা যাহা হাইকোর্টে মোকদ্দমার কারণীভূত হইতে পারে।

শেক্সপীয়রের জুলিয়স সীজর নাটকে জীবিত জুলিয়স সীজর বরাবর না থাকিলেও যেমন তাঁহার অশরীরী আত্মার প্রভাব অনুভূত হয়, তেমনি বঙ্গের দুই কংগ্রেস উপদলের একটির নেতা স্বর্গগত ও অন্যটির নেতা বিদেশ-প্রবাসী হইলেও দলাদলি মরিতেছে না, ইহা দুঃখের বিষয়।

—

শিক্ষায় আমেরিকার নিগ্রো ও ভারতবর্ষের "আর্য্য"।

আমেরিকার নিগ্রোদের আদি বাসস্থান আফ্রিকা। সেখানে তাহাদের বর্ণমালা বা সাহিত্য ছিল না। তাহারা ক্রীতদাস রূপে আমেরিকায় আনীত হয়। ১৮৬৫ সালে ডিসেম্বর মাসে তাহারা দাসত্বমুক্ত হয়, এবং তখন হইতে তাহাদের শিক্ষালাভ ও তাহাদিগকে শিক্ষাদান আইনসঙ্গত হয়—তাহার আগে উহা আইনবিরুদ্ধ ও দণ্ডনীয় কাজ ছিল।

১৮৬৫ সালের পর ৬৫ বৎসরে ১৯৩০ সালে দেখা গেল, অসভ্য, নিজেদের বর্ণমালাহীন, নিজেদের সাহিত্যহীন আমেরিকান নিগ্রোদের মধ্যে শতকরা ৮৩.৭ জন মোটামুটি ৮৪ জন, লিখনপঠনক্ষম হইয়াছে। অনেক হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের লোকদের বর্ণমালা আছে, সাহিত্য আছে, ব্রিটিশ শাসনের আগে লিখনপঠনক্ষমতা এখনকার চেয়ে বেশী লোকের ছিল। কিন্তু ১৯৩১ সালের সেন্সসে দেখা গিয়াছে, ভারতে শতকরা ৮ (আট) জন, বঙ্গে শতকরা ১১ (এগার) জন লিখনপঠনক্ষম। অর্থাৎ আমেরিকার নিগ্রোরা ভারতীয়দের চেয়ে শতকরা দশগুণেরও বেশী লিখনপঠনক্ষম।

—

বেকারদের সম্বন্ধে বড়লাটের মন্তব্য, এবং বঙ্গীয় ঔষধ

ভারতবর্ষের সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের এক কন্‌ফারেন্স গত মার্চ্চ মাসে দিল্লীতে হয়। তাহার কাজ আরম্ভ করিতে গিয়া বড়লাট যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে, বহু যুবক অনেক কষ্টস্বীকার ও পরিশ্রম করিয়া উচ্চ ডিগ্রী ও সম্মান লাভ সত্ত্বেও যে জীবিকানির্ব্বাহের বা স্বদেশবাসীদের সেবার সুযোগ পান না, এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেন, এবং বলেন :—

"Keen and unmerited disappointment, accentuated by irksome inactivity, are apt to lead high-spirited young men into dangerous and unexpected channels."

তাৎপর্য্য। যেরূপ আশাভঙ্গের তাহারা যোগ্য নহে সেইরূপ তীব্র নৈরাশ্য বিরক্তিকর নিষ্ক্রিয়তার ফলে বৃদ্ধি পাইয়া অতিতেজস্বী যুবকদিগকে বিপজ্জনক ও অপ্রত্যাশিত পথের পথিক করিতে পারে।

অতি সত্য কথা।

এরূপ সম্ভাবনার বঙ্গে প্রযোজ্য প্রাথমিক ঔষধ হিজলী, বক্সা, দেওলী ইত্যাদি স্থানে বিনামূল্যে বিতরিত হয়।

পুলিসের মতে এই সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হইলে, কিন্তু তখনও কোন নরহত্যা না-ঘটিয়া থাকিলেও, অব্যর্থ ঔষধের ব্যবস্থা বঙ্গীয় অতি-আধুনিক সংশোধিত ফৌজদারী আইনে আছে। উহা ফাঁসী।

—

টোরীদের দ্বারা ভারতীয় লোকমত নির্ণয়

বিলাতের রক্ষণশীল অর্থাৎ টোরী দলের দুইজন সভ্য, ভাইকৌণ্ট লাইমিংটন ও মেজর কোর্টল্ড্, ভারতীয়দের রাজনৈতিক মত সাক্ষাৎভাবে জানিবার জন্য ভারতভ্রমণ করিতেছেন। ইতিমধ্যেই নেতৃস্থানীয় কাহাকেও কাহাকেও প্রশ্নাবলী দিয়া তাহার জবাব চাহিয়াছেন এবং কিছু জবাব পাইয়াছেন। প্রশ্নগুলি নীচে দিতেছি।

1. Do you approve of or do you condemn the White Paper scheme?

2. Are the Hindus in British India really interested in the Federation between the Princes and British India, or are you indifferent to the Federal programme?

3. What are the dangers in the Federal scheme which the Hindus visualize?

4. If the Federal scheme is scrapped and only reforms in the British Indian Provinces are granted, will this meet with the approval of the Hindus?

5. Would the Hindu community prefer the Simon recommendations on the assumption that those recommendations will not be based on the Prime Minister's Communal Award?

এই প্রশ্নগুলি একটি একটি করিয়া বাংলায় দিয়া তাহার উপর কিছু টিপ্পনী যোগ করিয়া দিতেছি।

১। আপনি শ্বেত পত্রের প্রস্তাবাবলীর অনুমোদন করেন, না তাহা গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া তাহার নিন্দা করেন?

এরূপ প্রশ্ন যে করা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়, যে, ইংলণ্ডের লোকেরা ভারতের জনমত সম্বন্ধে কত অজ্ঞ, এবং যে অল্পসংখ্যক ইংরেজ হয়ত তাহা জানে, তাহাদের অনেকে কি পরিমাণ অজ্ঞতার ভাণ করে।

মনুষ্যনামধেয় যে-যে ভারতীয় জীব বা জীবসমষ্টি সরকার বাহাদুরের অনুগৃহীত ও ভবিষ্যতে অধিকতর অনুগ্রহপ্রার্থী, এবং ধামাধরা ও ধামা ধরিতে আগ্রহান্বিত, তাহারা ছাড়া কেহই যে শ্বেত পত্রের অনুমোদন করে না, ইহা ভারতবর্ষে সুবিদিত। কোনও স্বাজাতিক (nationalist) ইহার অনুমোদন করে না, করিতে পারে না—তাহার ধর্ম্ম ও জাতি যাহাই হউক। ইহার অনুমোদনকারী কোন ব্যক্তি স্বাজাতিক বলিয়া নিজের পরিচয় দিলে সে হয় ছদ্মবেশী, নয় কল্পনাবিলাসী আত্মপ্রতারক।

শ্বেত পত্রের ভিত্তি প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরা। ইহাতে হিন্দুদের উপর ঘোরতর অবিচার এবং ইউরোপীয় ও মুসলমানদের প্রতি অতি অন্যায় ও গর্হিত পক্ষপাতিত্ব দেখান হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরা ছাড়িয়া দিলেও, ইহাতে ভারতীয়দিগকে যতটুকু ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে—যদি কিছু দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা নিতান্ত অযথেষ্ট, এবং তাহার দ্বারা ভারতীয়দের অসন্তোষ দূরীভূত হইবে না।

২। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের হিন্দুরা কি দেশী রাজ্যের রাজাদের এবং ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির মধ্যে ফেডারেশ্যনে আগ্রহান্বিত? না, তৎসম্বন্ধে উদাসীন?

ভারতবর্ষের হিন্দুরা ও অন্য ভারতীয়েরা বস্তুতঃ দেশী রাজাদের সহিত ফেডারেশ্যনে আগ্রহান্বিত নহে। তাহারা চায় ব্রিটিশ ভারতের যত শীঘ্র সম্ভব দায়িত্বপূর্ণ স্বশাসন—তাহাকে ডোমীনিয়ন ষ্টাটস বা পূর্ণ স্বরাজ বা অন্য যে নামই দেওয়া হউক। যাঁহারা ফেডারেশ্যনে রাজী হইয়াছেন, তাঁহারাও এই কারণে রাজী হইয়াছেন, যে, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট বলিয়াছেন যে তা ছাড়া কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টকে ব্যবস্থাপক সভার কাছে দায়ী করা হইবে না। দেশী রাজারা কবে কি সর্ত্তে ফেডারেশ্যনে রাজী হইবেন, তাহার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতে পারি না। তাঁহারা যত মাস বৎসর ইচ্ছা নিজেদের মন স্থির করিবার জন্য সময় লউন। আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে স্বশাসন চাই। আর, বাস্তবিক, নৃপতি-পুঙ্গবদের ত নিজেদের মত অনুসারে কাজ করিবার স্বাধীনতা নাই। তাঁহাদিগকে ভারত-গবন্মেণ্টের রাজনৈতিক বিভাগের মত অনুসারে চলিতে হয়।

ফেডার্যাল ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের রাজ্যের প্রতিনিধি রাজারাই মনোনীত করিবেন, তাঁহাদের প্রজারা নহে। রাজারা এই কাজ করিবেন তাঁহাদের প্রধান মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে। ইহা ভুলিলে চলিবে না, যে, একটি এংলো-মুস্লিম সন্ধি বিদ্যমান আছে। যেমন উপরে আকাশ ও নীচে মাটির মধ্যে মিলনরেখা, অর্থাৎ চক্রবাল আছে, নিশ্চয়, অথচ তাহাকে কেহ ধরিতে ছুঁইতে পারে না, তেমনি এংলো-মুস্লিম সন্ধিও নিশ্চয় আছে—যদিও সে জিনিষটি ধরিতে ছুঁইতে পারা যায় না। এই সন্ধি অনুসারে যেমন বৃটিশ ভারতে মুসলমানরা তাহাদের সংখ্যা শিক্ষা ধনশালিতা প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতা ইংরাজদের নীচে পাইয়াছে ও পাইবে, তেমনি দেশীরাজ্যসকলের প্রধান মন্ত্রীর কাজও বড় বড় রাজ্যগুলিতে হয় ইংরেজ নয় মুসলমানকে দেওয়া হইতেছে। এই সব রাজ্যেরই প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী হইবে, এবং তাহাদিগকে রাজাদের নামে মনোনীত করিবে এই ইংরেজ ও মুসলমান প্রধান মন্ত্রীরা।

যদি সব দেশী রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ ভারতের মত সামান্য আইনানুযায়ী শাসনও থাকিত, যদি রাজ্যগুলির প্রতিনিধির সংখ্যা প্রজাদের সংখ্যার অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট হইত, যদি প্রতিনিধিরা প্রজাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইত, এবং যদি রাজারা ইংলণ্ডের রাজার অধীনতার জন্য ব্যাকুল না হইয়া সমগ্র-ভারতীয় ফেডার্যাল গবন্মেণ্টকে কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়া মানিতে রাজী হইতেন, তাহা হইলে ফেডারেশ্যনের বিরোধী না হইয়া আমরা সে-সম্বন্ধে হয়ত কিছু আগ্রহান্বিত হইতাম। শ্বেত পত্রে যেরূপ ফেডারেশ্যনের প্রস্তাব আছে, আমরা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী।

রাজাদিগকে ও তাহাদের প্রতিনিধিদিগকে ফেডারেশ্যনে আনা হইতেছে, ব্রিটিশ ভারতের স্বাজাতিকদিগকে সম্পূর্ণ হীনবল করিবার জন্ত। হীনবল করা হইবে নানা উপায়ে। একটা উপায়, ইউরোপীয়দিগকে অত্যন্ত বেশী প্রতিনিধি দান, আর একটা উপায় দেশী রাজাদিগকে বেশী করিয়া প্রতিনিধি দান, তৃতীয় উপায় মুসলমানদিগকে বেশী প্রতিনিধি দান, এবং চতুর্থ উপায় হিন্দুদিগকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া "সবর্ণ" হিন্দু ও "অবনত" হিন্দুদিগকে আলাদা আলাদা প্রতিনিধি দান। এ ছাড়া আরও অনেক উপায় আছে। তাহার আলোচনা গত দু-তিন বৎসরের প্রবাসীতে অনেক বার করিয়াছি।

৩। ফেডারেশ্যনের স্কীম বা পরিকল্পনায় হিন্দুরা কি কি বিপদ দেখিতেছেন ?

ইহা অনেক বার বলা হইয়াছে। ফেডার‍্যাল ব্যবস্থাপক সভার ব্রিটিশ-ভারতীয় অংশে থাকিবে ২৫০টি আসন। তাহার মাত্র ১০৫টি "অবনত" হিন্দুসমেত সকল হিন্দুরা পাইবে। বাকী ১৪৫টির অধিকাংশ মুসলমান, ইংরেজ, ফিরিঙ্গী, দেশী খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতিরা পাইবে, যাহারা অনুগৃহীত বলিয়া গবর্মেণ্টের অনুগত। অর্থাৎ হিন্দুরা যদিও সংখ্যায় অন্য সকলের সমষ্টির বহুগুণ, তথাপি তাহাদিগকে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত করা হইবে। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শ্বেতপত্ররচয়িতারা সমগ্র ফেডার‍্যাল ব্যবস্থাপক সভায় রাজাদের প্রতিনিধিদিগকে রাজ্যগুলির লোকসংখ্যানুপাতে প্রাপ্য অপেক্ষা অনেক বেশী আসন দিতেছেন। তাহাতে হিন্দুদিগকে একেবারে নগণ্যত্বে পরিণত করা হইবে। ইহার উপর হিন্দুদের আরও বিপদ্ ঘটাইবার প্রয়োজন আছে কি ?

৪। যদি ফেডার‍্যাল পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়, এবং যদি ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলিতেই শাসনসংস্কার মঞ্জুর করা হয়, তাহা কি হিন্দুদের অনুমোদন পাইবে ?

যাহাকে সরকারপক্ষীয় লোকেরা বলেন প্রভিন্শ্যাল অটনমি অর্থাৎ প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব, ইহা যদি সেই চীজ হয়, তাহা হইলে বলি, ইহাতে ভারতীয়েরা সন্তুষ্ট হইবে না। তাহারা কেন্দ্রীয় ভারত-গবর্মেণ্টেও "দায়িত্ব" চায়। অবশ্য নির্দ্দিষ্ট দু-চার বৎসরের জন্য যাহা ভারতবর্ষের হিতের জন্য আবশ্যক এরূপ কোন কোন বিষয় গবর্মেণ্টের হাতে রক্ষিত থাকিতে পারে।

৫। হিন্দুরা কি সাইমন কমিশনের সুপারিশগুলি পছন্দ করিবে, যদি এই সর্ত্ত করা যায় যে তাহা প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরা অনুযায়ী হইবে না ?

সাইমন কমিশনের সুপারিশগুলি প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার চেয়ে ভাল বটে। কিন্তু তাহাতেও হিন্দুদের প্রতি সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করা হয় নাই। তাহা ছাড়িয়া দিলেও, হিন্দুরা ও অন্য স্বাজাতিক ভারতীয়েরা এমন একটি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা চায়, যাহাতে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব থাকিবে, এবং যাহা কয়েক বৎসরের মধ্যে আপনা আপনিই, অর্থাৎ ব্রিটিশ জাতির বা পার্লেমেণ্টের পুনর্বিচার ব্যতিরেকে, ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বশাসনে, অন্ততঃ ডোমীনিয়নত্বে, উপনীত করিবে।

আমরা উপরে যে প্রশ্নাবলী দিলাম, দেখা যাইতেছে, যে, তাহা হিন্দুদের জন্য। অন্য লোকদিগকে কিরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছে জানি না। ভিন্ন ভিন্ন লোকসমষ্টিকে আলাদা আলাদা প্রশ্ন করা হইয়া থাকিলে, তাহার মধ্যেও ভেদনীতি বিদ্যমান মনে করা যাইতে পারে।

—

দেশী রাজাদিগকে ঋণদান

দেশী রাজারা বলেন, তাঁহাদের সম্পর্ক সাক্ষাৎভাবে ব্রিটিশ নৃপতির সহিত, তাঁহারা তাঁহারই ভক্ত। ভারত-গবর্মেণ্টের কাজে, অর্থাৎ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায়, তাঁহাদের স্বদেশী লোকদের সামান্য একটু ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহারা ঐ সভায় তাঁহাদের রাজ্যের বা তাঁহাদের কোন কিছুর আলোচনা বরদাস্ত করিবেন না। কিন্তু ধার চাহিবার বেলা তাঁহারা ব্রিটিশ নৃপতির বা ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের কাছে হাত পাতিতে পারেন না ; হাত পাতেন ভারত-গবর্মেণ্টের কাছে এবং ভারত-গবর্মেণ্টকে ঋণের আবেদন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিতে হয়। ইহাতে মহামহিম রাজা মহাশয়দের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে না।

এরূপ ঋণ দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। ঋণ আদায় হইবে কিনা তাহার কোন স্থিরতা নাই। বাহাওঅলপুরের নবাবের কাছে পাওনা কয়েক কোটি টাকা খুব সম্ভব পাওয়া যাইবে না। তার পর, এই যে ঋণ দেওয়া হয়, ইহা উদ্বৃত্ত টাকা হইতে নয়। ভারতীয় বজেটে ঘাটতি লাগিয়াই আছে। ঘাটতি পূরণের জন্য ব্রিটিশ ভারতের গরীব লোকদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া টাকা আদায় করা হয়। এইরূপে সংগৃহীত টাকা হইতে বহু লক্ষ, কখন কখন বহু কোটি টাকা অমিতব্যয়ী স্বেচ্ছাচারী সেই সব রাজাকে দেওয়া হয়, যাহাদের প্রজাদের উপর ব্যবহার সম্বন্ধে ব্রিটিশ ভারতের ট্যাক্সদাতাদের কিছুই বলিবার অধিকার নাই।

—

নারীদের উপর অত্যাচার

১৯৩২-৩৩ সালের বাংলা দেশের যে সরকারী শাসনবৃত্তান্ত সম্প্রতি বাহির হইয়াছে, তাহাতে নারীদের উপর অত্যাচার-মূলক অপরাধ সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ আছে। তাহাতে বলা হইতেছে, যে, এইরূপ অপরাধ বাড়িয়া চলিতেছে, এই বেসরকারী ধারণাটা ঠিক নয়। শাসনবৃত্তান্তে অপরাধের যে সংখ্যাগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহার নির্ভুলতা পরীক্ষা করিবার উপায় নাই। কিন্তু সেগুলি নির্ভুল বলিয়া

ধরিয়া লইলেও, সরকারী রিপোর্টের উক্তি প্রমাণিত হয় না। রিপোর্টে প্রথমতঃ ১৯২৯-৩২ এই চারি বৎসরের অঙ্ক দেওয়া হইয়াছে। পুলিসের কাছে এই চারি বৎসরে যথাক্রমে ৭৭৮, ৬৯৭, ৭২৯, ও ৭৭২টি অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেটদের কাছে উপস্থাপিত "সত্য" অভিযোগ ঐ চারি বৎসরে যথাক্রমে ১০২৯, ৬৮৪, ৬৯০ এবং ৮২১। ঐ চারি বৎসরে অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা হয় যথাক্রমে ২০০৬, ১৩৮৯, ১৫৫২ ও ১৬৫৭। যদি ১৯২৯ সালের সংখ্যাগুলি বিবেচনা না করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, তাহার পর পর তিন বৎসর ক্রমাগত সংখ্যাগুলি বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং সরকারী রিপোর্টের সংখ্যাগুলিতে ত সর্ব্বসাধারণের ধারণাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে! অথচ গবন্মেণ্ট বলিতেছেন, তাহা ঠিক্ নয়!

অতঃপর সরকারী রিপোর্টে বলা হইতেছে, ১৯২৬ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত ছয় বৎসরে অত্যাচরিতা হিন্দুনারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩২৪, ৩২৫, ৩০৪, ৩৬৭, ৩৬২, ও ৩৩৮; এবং অত্যাচরিত মুসলমান নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৪৯৪, ৫৯, ৬৫৭, ৫৩৮ এবং ৫৮২। অত্যাচরিতারা যে ধর্ম্মাবলম্বিনীই হউন, অত্যাচারটা পাশবিক বা পৈশাচিক এবং তাহার দমন হওয়া চাই। সরকারী সংখ্যাগুলি ঠিক্ হইলে, মুসলমান কাগজওয়ালা ও নেতারা যে বলিয়া থাকেন তাঁহাদের সমাজে চিরবৈধব্য আদি সামাজিক প্রথা না-থাকায় মুসলমান সমাজে নারীদের উপর এরূপ অত্যাচার হয় না, তাহা সত্য নহে। অথচ এ-পর্য্যন্ত নারীর উপর অত্যাচার দমনে মুসলমান সমাজের কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই।

সরকারী রিপোর্টে দেখান হইয়াছে, যে, ঐ ছয় বৎসরে মুসলমান দ্বারা অত্যাচরিতা হিন্দু নারীদের সংখ্যা যথাক্রমে ১১৪, ১২২, ১০৫, ১১৪, ১০৯ ও ১২৫, এবং হিন্দুদ্বারা অত্যাচরিতা হিন্দু নারীর সংখ্যা ২০৫, ২০১, ১৯৮, ২৩১, ২৩৪ ও ১৯৪। কিন্তু রিপোর্টে ইহাও দেখান উচিত ছিল, যে, মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচরিতা মুসলমান নারী ঐ ছয় বৎসরে কত, এবং হিন্দুদের দ্বারা অত্যাচরিতা মুসলমান নারীই বা কত। তাহা হইলে বুঝা হইত, মুসলমান বদমায়েসরা কত নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে, এবং হিন্দু বদমায়েসরাই বা কত নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে। আমরা সব বদমায়েসের শাস্তি ও সংশোধন চাই, এবং সর্ব্বধর্ম্মের নারীর রক্ষা চাই। কিন্তু গবন্মেণ্ট যদি দেখাইতে চান কোন্ সম্প্রদায়ে বদমায়েস বেশী আছে, তাহা হইলে সরকারী রিপোর্টে লেখা উচিত ছিল, মুসলমানরা মোট হিন্দু-মুসলমান কত নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং হিন্দুরা মোট কত হিন্দু-মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে। ছয় বৎসরে হিন্দুরা কত মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং মুসলমানরা কত মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে, এই দুই প্রস্ত সংখ্যা রিপোর্টলেখক গোপন রাখায় তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানাবিধ অনুমান হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য, রিপোর্টে বলা হইতেছে, যে, রিপোর্ট-প্রদত্ত সংখ্যাগুলি হইতে সিদ্ধান্ত করা যায়, যে, এই প্রকার অপরাধ দমনের জন্য বিশেষ কোন আইন প্রণয়ন বা বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন করা অনাবশ্যক। আশ্চর্য্য সিদ্ধান্ত! ঐরূপ পাশব ও পৈশাচিক অপরাধ বাড়ুক বা না-বাড়ুক, যাহা আছে, তাহারই ত বর্ত্তমান আইন দ্বারা ও বর্ত্তমান পুলিসকার্য্যপ্রণালী দ্বারা দমন হইতেছে না। সেই জন্যই আইনের ও কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন ও উন্নতি আবশ্যক।

—

সর্ব্বজাতীয় মানবিকতা

সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক ক্লাব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। যাহাকে ইংরেজীতে ইণ্টার-ন্যাশন্যালিজম ও ইণ্টারন্যাশন্যাল কাল্‌চার বলে, তিনি সেই বিশ্বমানবীয় সংস্কৃতি ও একপ্রাণতা বিষয়ে কিছু বলেন। তাঁহার বক্তৃতাটির ভাল বাংলা বা ইংরেজী রিপোর্ট বাহির হয় নাই। তবে, শ্রোতারা আশা করি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, তিনি, এই বাংলা দেশেই যে এক শত বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন রায়ের দ্বারা বিশ্বমানবিকতার আদর্শের প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা অস্বাভাবিক মনে করেন নাই, পরিহাস উপহাসের বিষয় মনে করেন নাই, বরং গৌরবের বিষয়ই মনে করিয়াছিলেন।

—

বেকারদের জন্য বিলাতী ব্যয়

আমাদের দেশে কর্ত্তৃপক্ষ বেকারসমস্যা বিষয়ে বক্তৃতা করেন, তাও খুব বেশী বার নয়. এবং বড়লাট পর্য্যন্ত, "মহাতেজা" ("high-spirited") যুবকেরা বেকার থাকায় বিপজ্জনক বিপথে যায়, তাহার জন্য দুঃখও করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য প্রধানতঃ শাস্তিরই ব্যবস্থা হইয়াছে। বিলাতী ব্যবস্থা অন্য প্রকার। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, ১৯২০ সাল হইতে এ-পর্য্যন্ত অলস বেকারদিগকে ভিক্ষা দিবার নিমিত্ত ব্রিটেন ১১০,০০,০০,০০০ এক শত দশ কোটি পাউণ্ড খরচ করিয়াছে। তাহা মোটামুটি ১৪৬৭ (চৌদ্দ শত সাতষট্টি) কোটি টাকার সমান। তিনি মনে করেন, এই টাকাটা ভিক্ষা দেওয়ায় বেকারদের কেবল নৈতিক অবনতি হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যয় না করিলে খুব অসন্তোষ হইত, হয়ত বিপ্লব ঘটিত। তিনি মনে করেন, কোন জনহিতকর সার্ব্বজনিক পূর্ত্ত বা অন্য কাজে ইহা ব্যয় করিয়া সেই কাজে বেকারদিগকে লাগাইয়া দিলে সুফল হইত। তাহা সত্য কথা।

ভারতবর্ষে কিন্তু এরূপ কোনপ্রকার ব্যবস্থাই হয় নাই, যদিও এদেশে বেকারের সংখ্যা ব্রিটেনের চেয়ে ঢের বেশী।

আমাদের ক্ষমতা থাকিলে আমরা কয়েক কোটি টাকা সরকারী ঋণ করিয়া তাহার সুদ হইতে বঙ্গের সর্ব্বত্র বিদ্যালয় চালাইতাম এবং তাহাতে সমুদয় বেকার যোগ্য শিক্ষিত যুবককে শিক্ষক নিযুক্ত করিতাম। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সামান্য এক-একটা অভিযানের জন্য ২০।২৫।৩০ কোটি ঋণ বাড়িয়া যায়। তাহা শোধও হয়। শিক্ষার জন্য ঋণ তাহার চেয়ে কম হইত এবং তাহা শোধও হইত। কিন্তু শিক্ষাকে সরকার অবশ্য-প্রয়োজনীয় মনে করেন না।

—

চাটার্জ্জি মুখার্জ্জি বানার্জ্জি

বাংলা দেশে কে যে প্রথমে ইংরেজীতে চাটার্জ্জি মুখার্জ্জি বানার্জ্জি ইত্যাদি পদবী লিখিতে আরম্ভ করেন, জানি না। তাঁহার প্রতি একটুও কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছি না। আমি নিজেও কুক্ষণে ছেলেবেলা ইংরেজীতে চ্যাটের্জি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা এখনও চালাইতে হইতেছে। কিন্তু তা বলিয়া বাংলায় চাটার্জি মুখার্জ্জি ইত্যাদি অসহ্য। চাটুজ্যে, মুখুজ্যে, প্রভৃতি কি দোষ করিল? এগুলি লিখিতে বেশী জায়গা লাগে না, বেশী অক্ষরও লাগে না।

বাংলা বক্তৃতায় ও খবরের কাগজে আর এক উপদ্রব দেখিতে পাই। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় 'মালব্য' নহেন। তিনি নিজেও লেখেন মালবীয়। অথচ বাঙালীরা তাঁহাকে 'মালব্য' না করিয়া ছাড়িবেন না। গোখলেকে গোখেল, নটরাজনকে নটরঞ্জন, নটেশনকে নেটসন্, রামনকে রমণ অনেকেই করেন। নামগুলির প্রতি তাঁহাদের একটু দয়া থাকা আবশ্যক।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

২য় সংখ্যা

প্রাণের ডাক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখনো কি ক্লান্তি ঘোচে নাই,
ওঠো তবু ওঠো,
বৃথা হোক তবুও বৃথাই
পথপানে ছোটো।
স্বপ্ন যত ঘিরেছিল রাতে
অবসন্ন তারাদের সাথে
মিলাল আলোকে অবগাহি।
আয়ুঃক্ষীণ নিঃস্ব দীপগুলি
নিশীথের স্মৃতি গেছে ভুলি,
অন্ধ আঁখি শূন্যে আছে চাহি।

সুদূর আকাশে ওড়ে চিল,
উড়ে ফেরে কাক,
বারে বারে ভোরের কোকিল
ঘন দেয় ডাক।
জলাশয় কোন্ গ্রামপারে,
বক উড়ে যায় তারি ধারে,
ডাকাডাকি করে শালিখেরা।
প্রয়োজন থাক্ নাই থাক্
যে যাহারে খুশি দেয় ডাক
যেথা সেথা করে চলাফেরা।

উছল প্রাণের চঞ্চলতা
আপনারে নিয়ে।
অস্তিত্বের আনন্দ ও ব্যথা
উঠিছে ফেনিয়ে
জোয়ার লেগেছে জাগরণে,
কলোল্লাস তাই অকারণে,
মুখরতা তাই দিকে দিকে।
ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায়
কী মদিরা গোপনে মাতায়,
অধীরা করেছে ধরণীকে।

নিভৃতে পৃথক কোরো নাকো
তুমি আপনারে,
ভাবনার বেড়া বেঁধে রাখো
কেন চারিধারে ?
প্রাণের উল্লাস অহেতুক
রক্তে তব হোক্ না উৎসুক,
খুলে রাখো অনিমেষ চোখ,
ফেলো জাল চারিদিক ঘিরে
যাহা পাও টেনে লও তীরে,
ঝিনুক শামুক যাই হোক্।

হয় তো বা কোনো কাজ নাই
ওঠো তবু ওঠো,
বৃথা হোক্ তবুও বৃথাই
পথপানে ছোটো।
মাটির হৃদয়খানি ব্যেপে
প্রাণের কাঁপন ওঠে কেঁপে,
কেবল পরশ তার লহ,
আজি এই চৈত্রের প্রভাতে
আছ তুমি সকলের সাথে
এ কথাটি মনে প্রাণে কহ ॥

জোড়াসাঁকো
৭ এপ্রেল, ১৯৩৪

চতুষ্কোটি

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্রধানত দুইটি মধ্যমপথের কথা দেখা যায়। নির্ব্বাণলাভের জন্য যে, অষ্ট-অঙ্গযুক্ত পথের ('আষ্টাঙ্গিক মার্গ') কথা বলা হইয়াছে, ইহা প্রথম মধ্যম পথ; কারণ এক দিকে বিষয়সম্ভোগে অত্যন্ত আসক্তি, এই এক অন্ত বা কোটি; আর অন্য দিকে শরীরকে নিতান্ত ক্লেশ দিয়া তপস্যা করা, এই অপর অন্ত বা কোটি; এই উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া ইহাদের মধ্য অবলম্বন করিয়া ঐ পথের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় মধ্যমপথে পরস্পরবিরুদ্ধ কতকগুলি মত পরিহার করিয়া তাহাদের মধ্য অবলম্বন করিয়া চলিবার কথা আছে। ঐ পরস্পরবিরুদ্ধ মতগুলি এইরূপ:—অস্তি, নাস্তি; নিত্য, অনিত্য; সুখ, দুঃখ; আত্মা, অনাত্মা; শূন্য, অশূন্য; ইত্যাদি।

এই দ্বিতীয় মধ্যমপথের সম্বন্ধে নাগার্জ্জুন নিজের মূলমধ্যমকারিকায় (১৫.৭) বলিয়াছেন:—

> "কাত্যায়নাববাদেচ অস্তি নাস্তীতি চোভয়ম্।
> প্রতিষিদ্ধং ভগবতা ভাবাভাববিভাবিনা॥"

"যিনি ভাব ও অভাব উভয়কেই ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন সেই ভগবান্ কাত্যায়নাববাদ (সূত্রে) 'আছে' ও 'নাই' এই উভয়কেই নিষেধ করিয়াছেন।"

নাগার্জ্জুনের এই কথার মূল কাশ্যপপরিবর্ত্তে (Staël Halstein-সংস্কৃত, §৬০. দ্রষ্টব্য §§৫২-৫৯) এইরূপ দেখা যায়:—

> "অস্তীতি কাশ্যপ অয়মেকোঽন্তঃ, নাস্তীত্যয়ং দ্বিতীয়োঽন্তঃ। যদনয়োর্দ্বয়োরন্তয়োর্মধ্যম্ ইয়মুচ্যতে কাশ্যপ মধ্যমা প্রতিপদ্ ভূতপ্রত্যবেক্ষা।"

"হে কাশ্যপ, 'আছে' এই এক অন্ত, আর 'নাই' এই দ্বিতীয় অন্ত। যাহা এই উভয় অন্তের মধ্য, তাহাকেই মধ্যমপথ বলা হয়, ইহা দ্বারা পরমার্থের প্রত্যবেক্ষণ হয়।"

এই কথাটি পালিতেও (সংযুত্তনিকায়, PTS, ২. ১৭) পাওয়া যায়:—

> "সব্বং অত্থীতি খো কচ্চায়ন একো অন্তো, সব্বং নত্থীতি অয়ং দুতিয়ো অন্তো। এতে তে কচ্চায়ন উভো অন্তে অনুপগম্ম মজ্ঝেন তথাগতো ধম্মং দেসেতি।"

"হে কাত্যায়ন, 'সমস্ত আছে' এই এক অন্ত, 'সমস্ত নাই' এই দ্বিতীয় অন্ত। হে কাত্যায়ন, এই উভয় অন্তেই গমন না করিয়া তথাগত মধ্য দ্বারা ধর্ম্ম দেশনা করেন।"

নাগার্জ্জুন যে মত প্রচার করিয়াছেন তাহা এই দ্বিতীয় মধ্যমপথে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহার নাম হইয়াছে মধ্যমক; এবং এই মত অনুসরণ করিয়া চলেন বলিয়া তাঁহার অনুগামিগণ মাধ্যমিক।

মাধবাচার্য্য নিজের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে লিখিয়াছেন যে, নাগার্জ্জুনের অনুগামিবর্গের প্রজ্ঞা মধ্যম রকমের ছিল বলিয়া তাঁহাদের নাম হইয়াছে মাধ্যমিক। বলাই বাহুল্য, এ ব্যাখ্যা নিতান্ত কল্পিত।

নাগার্জ্জুন পূর্ব্বোক্ত এই দুইটি অন্তের সম্বন্ধে বলিয়াছেন (মূলমধ্যমকারিকা, ৫.৮):—

> "অস্তিত্বং যে তু পশ্যন্তি নাস্তিত্বং চাল্পবুদ্ধয়ঃ।
> ভাবানাং তে ন পশ্যন্তি দ্রষ্টব্যোপশমং শিবম্॥"

'যাহারা বস্তুসমূহের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব দর্শন করে, তাহাদের বুদ্ধি অল্প, তাহারা বস্তুসমূহের দর্শনীয় যে উপশম (নিবৃত্তি), যাহা শিব, তাহা দর্শন করিতে পারে না।'

জ্ঞানসারসমুচ্চয় নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আছে। ইহার মূল সংস্কৃত এখনও পাওয়া যায় নাই। তিব্বতী ভাষায় ইহার একখানি অনুবাদ আছে (তঞ্জুর, মদো, চ.; Cordier, III. p. 267)। ইহাতে তাহার নাম যে. যে স্. স্ গ্রিঙ্. পো. কুন্. লস্. ব্তু স্. প। ইহা আর্য্যদেবের রচনা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার ২৮শ শ্লোকটি বহু বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকটি এই:—

> "ন সন্ নাসন্ ন সদসন্ ন চাপ্যনুভয়াত্মকম্।
> চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং তত্ত্বং মাধ্যমিকা বিদুঃ॥"

'মাধ্যমিকেরা জানেন যে, তত্ত্ব হইতেছে চতুষ্কোটি-বর্জ্জিত, সেই চারিটি কোটি এই—(১) সৎ নহে, (২) অসৎ নহে, (৩) সৎ ও অসৎ এই উভয় নহে, এবং (৪) সৎ নহে ও অসৎ নহে এই উভয়ও নহে।'[১]

১। এখানে মাণ্ডুক্যকারিকার (৪.৮৩) নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিটি তুলনীয়—

> "অস্তি নাস্ত্যস্তিনাস্তীতি নাস্তি নাস্তীতি বা পুনঃ।"

দুই দিকে দুই অন্ত বা কোটি থাকায় উহাদের মধ্যবর্ত্তীকে মধ্যম অথবা মধ্যমক বলা হইয়া থাকে, কিন্তু উল্লিখিত কারিকায় আমরা দুইটির স্থানে চারিটি কোটির কথা দেখিতে পাইতেছি। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথমত দুইটি কোটি ছিল, পরে তাহাতে আর দুইটি যোগ করা হইয়াছে।

অস্তি ও নাস্তি, অথবা সৎ ও অসৎ, এই শব্দযুগল পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবকে প্রকাশ করে। এই উভয়কেই অস্বীকার করার প্রথম উল্লেখ আমরা ঋগ্বেদের অন্তর্গত নাসদাসীয় সূক্তে (১০. ১২৯. ১) দেখিতে পাই:—

"নাসদাসীন্ ন সদাসীৎ তদানীম্।"

'তখন সৎ ছিল না, অসৎ ছিল না।'[২]

ক্রমশ এই ভাব উপনিষদে দেখা গেল। শ্বেতাশ্বতরে (৪. ১৮) উক্ত হইয়াছে:—

"ন সন্ ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।"

'সৎ নহে, অসৎও নহে, কেবল শিব।'[৩]

নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৩.১২) রহিয়াছে:—

"ন সৎ তন্ নাসদুচ্যতে।"

'তাহাকে সৎ বলা যায় না, অসৎ বলা যায় না।'

বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল শাস্ত্রসমূহে আমরা দুইটিমাত্র অন্তের কথা দেখিতে পাই। সমাধিরাজসূত্রে (কলিকাতা, পৃ. ৩০)[৪]

"অস্তীতি নাস্তীতি উভোঽপি অন্তা
শুদ্ধী অশুদ্ধীতি ইমে'পি অন্তা।
তস্মা উভে অন্ত বিবর্জয়িত্বা
মধ্যেঽপি স্থানং ন করোতি পণ্ডিতঃ॥"

'অস্তি ও নাস্তি এই উভয়ই অন্ত; শুদ্ধি ও অশুদ্ধি এই উভয়ও অন্ত। অতএব পণ্ডিত জন উভয় অন্ত বর্জ্জন করিয়া (তাহাদের) মধ্যেও অবস্থান করেন না।

"অস্তীতি নাস্তীতি বিবাদ এষ
শুদ্ধী অশুদ্ধীতি অয়ং বিবাদঃ।
বিবাদপ্রাপ্ত্যা ন দুখং প্রশাম্যতে
অবিবাদপ্রাপ্ত্যা চ দুখং নিরুধ্যতে॥"

'অস্তি ও নাস্তি ইহা বিবাদ; শুদ্ধি ও অশুদ্ধি ইহাও বিবাদ; বিবাদে গেলে দুঃখ প্রশান্ত হয় না, অবিবাদে না গেলেই দুঃখ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।'

এখানে একটা কথা লক্ষ্য করিবার আছে। এই উদ্ধৃত শ্লোক দুইটির প্রথমটিতে বলা হইয়াছে যে, পণ্ডিতেরা উভয় অন্তের যে মধ্য, তাহাতেও অবস্থান করেন না। ইহাতে বুঝা যায়, উভয়ের মধ্য একটি অন্ত নহে। কিন্তু, মনে হয়, যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্য মৈত্রেয়নাথ ঐ মধ্যকেও অন্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ তিনি নিজের একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থের নাম রাখিয়াছেন মধ্যান্তবিভঙ্গসূত্র।[৫] এখানে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মাধ্যমিকদের ন্যায় যোগাচার সম্প্রদায়ও মধ্যম পথ অবলম্বন করিয়া চলেন, যদিও ইঁহারা মাধ্যমিক নামে পরিচিত নহেন।[৬]

বস্তুর দুইটি অন্ত প্রসিদ্ধ, কিন্তু ক্রমশ আরও একটি অন্তের আলোচনা আরম্ভ হইল। আমরা মহোপনিষদে (পৃ. ৩৭২)[৭] দেখিতে পাই:—

"ন সন্ নাসন্ ন সদসন্।"

'সৎ নহে, অসৎ নহে, সৎ ও অসৎ এই উভয়ও নহে।'

পরব্রহ্মোপনিষদে (পৃ. ৪৫৭)[৭] আছে:—

"ন সন্ নাসন্ ন সদসদ্
ভিন্নাভিন্নং ন চোভয়ম্॥"

২। সেই স্থানেই (২) তুলনীয়:—
"ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি।"
'তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত (অমরণ) ছিল না।'

৩। অষ্টাশীত্যুত্তরশতোপনিষৎ (ত্রিপাদবিভূতি-মহানারায়ণোপনিষৎ), নির্ণয় সাগর, ১৯১৭, পৃ. ৩০৮:—
"ত্বমেব সদসদ্বিলক্ষণঃ।"
'তুমিই সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন।'

৪। মূলমধ্যমকবৃত্তির (চন্দ্রকীর্ত্তি-রচিত প্রসন্নপদার, Bibliotheca Buddhica) ১৩৫ তম পৃষ্ঠায় এই শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

৫। ইহার চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ আছে। কিন্তু মূল সংস্কৃত এখনও পাওয়া যায় নাই। বসুবন্ধু ইহার একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ইহারও মূল সংস্কৃত পাওয়া যায় নাই, তবে তিব্বতী অনুবাদ আছে। স্থিরমতি আবার এই ভাষ্যের একখানি টীকা লিখিয়াছেন। এই টীকারও তিব্বতী অনুবাদ আছে। ইহার মূল সংস্কৃতের একখানি মাত্র পুঁথি নেপালের রাজগুরু শ্রীহেমরাজজীর নিকটে আছে। ইহা নানাস্থানে খণ্ডিত। ইহারই প্রতিলিপি লইয়া মূল, ভাষ্য ও টীকার তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে রোমক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জি. তুচ্চি ও বর্ত্তমান লেখক টীকাখানির প্রথম অধ্যায় সংস্করণ করিয়াছেন (Calcutta Oriental Series)। ইহাতে মূল মধ্যান্তবিভাগেরও পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

৬। দ্রষ্টব্য মধ্যমকবৃত্তি, পৃ. ২৭৪।

৭। দ্রষ্টব্য টিপ্পনী ৩।

ৎ নহে, অসৎ নহে, সৎ ও অসৎ এই উভয়ও নহে; ভিন্ন হে, অভিন্ন নহে, ভিন্ন ও অভিন্ন এই উভয়ও নহে।'

বৌদ্ধশাস্ত্রেও এই তিন অন্ত বা কোটির আলোচনা দেখা য়। সদ্ধর্ম পুণ্ডরীকে (২.৬৫, পৃ. ৪৮) আছে:—

"বিলগ্ন দৃষ্টিগহনেষু নিত্যম্
অস্তীতি নাস্তীতি তথাস্তি নাস্তি।"

স্তি, নাস্তি, ও অস্তি-নাস্তি এইমত রূপ গহনে বিলগ্ন।'

লঙ্কাবতারে (ন্যাঞ্জিও, ১৯২৩, পৃ. ১৫৬) দেখা য়:—

"অসন্ ন জায়তে লোকো ন সন্ ন সদসন্ ক্বচিৎ।
প্রত্যয়ৈঃ কারণৈশ্চাপি যথা বালৈর্বিকল্প্যতে॥
ন সন্ নাসন্ ন সদসন্ যদা লোকং প্রপশ্যতি।
তদা ব্যাবর্ত্ততে চিত্তং নৈরাত্ম্যং চাধিগচ্ছতি।"

'বালকেরা যেমন কল্পনা করে, বস্তুত সেইরূপ মূল কারণ সহকারী কারণে সৎ-স্বরূপ, অসৎ-স্বরূপ, বা সদসৎ-স্বরূপ এই) লোক উৎপন্ন হয় না। কেহ যখন (এই) লোককে খে যে, ইহা সৎ নহে, অসৎ নহে, এবং সদসৎ নহে, তখন াহার চিত্ত নিবৃত্ত হয়, সে নৈরাত্ম্য অধিগত হয়।'

নিম্নলিখিত কারিকাটি নাগার্জ্জুনের, ইহা তাঁহার া কাতীতস্তবে (১৩) ও অচিন্ত্যস্তবে (৯) আছে:—

"ন সন্নুৎপদ্যতে ভাবো নাপ্যসন্ সদসন্ন চ।
ন স্বতো নাপি পরতো ন দ্বাভ্যাং জায়তে কথন্॥" ৮

'সৎ বস্তু উৎপন্ন হয় না, অসৎও উৎপন্ন হয় না, সদসৎও পন্ন হয় না। আবার বস্তু নিজ হইতে উৎপন্ন হয় না, অন্য তেও হয় না, এবং ইহাদের দুইটি হইতেও হয় না। অতএব রূপে ইহা উৎপন্ন হয়?

আর্য্যদেব এক স্থানে (চতুঃশতক, ১৬. ২৫) লয়াছেন:—

"সদসৎ সদসচ্চাপি যস্য পক্ষো ন বিদ্যতে।
উপালম্ভশ্চিরেণাপি তস্য কর্ত্তুং ন শক্যতে॥"

'যাঁহার নিকটে সৎ, অসৎ, ও সৎ-অসৎ বলিয়া কোনো পক্ষ নাই, দীর্ঘকালেও তাহার তিরস্কার করিতে পারা যায় না।'

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা দ্বারা ইহা মনে করিতে পারা যায় না যে, লঙ্কাবতার, নাগার্জ্জুন, বা আর্য্যদেবের সময়ে চতুষ্কোটি বা চারিটি অন্তের আলোচনা আরম্ভ হয় নাই, কারণ উল্লিখিত গ্রন্থ কয়খানির প্রত্যেকটিতেই তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। লঙ্কাবতারে (পৃ. ১২২, ১৫২) চাতুষ্কোটিকা শব্দটিরই বহুবার প্রয়োগ আছে, উহার অর্থ চতুষ্কোটি-বিষয়ক পদ্ধতি। মূলমধ্যমককারিকা, ২২. ১১, ও চতুঃশতক, ৮. ২০, ১৪. ২১ দ্রষ্টব্য।

এইরূপে বুঝা যাইবে যে, যদিও এই সময়ে ত্রিকোটি ও চতুষ্কোটির চিন্তা উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং প্রয়োজনানুসারে যে-কোনোটি প্রয়োগ করা হইত, তথাপি সাধারণত দ্বিকোটিরই প্রথম স্থান ছিল।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, প্রথমত দ্বিকোটির চিন্তা বেদে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। চতুষ্কোটির প্রথম প্রবর্ত্তক তিনি বা তাঁহার সাক্ষাৎ অনুগামিগণ নহেন। সামঞ্ঞফলসুত্ত (দীঘনিকায়, ২.৩২) অধ্যয়ন করিলে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধগণের মতে ছয় 'বিধর্ম্মী' আচার্য্যের মধ্যে অন্যতম বেলট্‌ঠিপুত্ত সঞ্জয় কেই প্রথমে এই মত প্রচার করিতে দেখা যায়। ইঁহার মতের দ্বারা জৈন ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই বিশেষরূপে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

জৈনগণের স্যাদ্বাদ অথবা সপ্তভঙ্গীনয় প্রথমত 'অস্তি' ও 'নাস্তি' এই দুইটি মাত্র ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী আর পাঁচটি ভঙ্গী পরে যোজিত হইয়াছে, ইহাই মনে হয়। এই দুই কোটির সম্বন্ধে এখানে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জৈন ধর্ম্মে বা দর্শনে উহা বিধিরূপে (affirmation), কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মে বা দর্শনে তাহা নিষেধরূপে (negation) গৃহীত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে ইহাই ভেদ।

৮। দ্রষ্টব্য মূলমধ্যমককারিকা, ১.৭।

দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জ্যাঠামশাইদের বাড়ির শালগ্রামশিলার ওপর আমার ভক্তি ছিল না। ওঁদের জাঁকজমক ও পূজার সময়কার আড়ম্বরের ঘটা দেখে মন আরও বিরূপ হয়ে উঠ্ল। আগেই বলেছি আমার মনে হ'ত ওঁদের এই পূজা-অর্চনার ঘটার মূলে রয়েছে বৈষয়িক উন্নতির জন্যে ঠাকুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখান ও ভবিষ্যতে যাতে আরও টাকাকড়ি বাড়ে সে-উদ্দেশ্যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানান। তাঁকে প্রসন্ন রাখলেই এদের আয় বাড়বে, দেশের খাতির বাড়বে—আমার জ্যাঠাইমাকে সবাই বল্‌বে ভাল, সংসারের লক্ষ্মী, ভাগ্যবতী—তাঁর পয়েতে এ-সব হচ্ছে, সবাই খোশামোদ করবে, মন জুগিয়ে চল্‌বে। পাশাপাশি অম্‌নি আমার মায়ের ছবি মনে আসে। মা কোন্ গুণে জ্যাঠাইমার চেয়ে কম? মাকে চা-বাগানে দেখেছি কল্যাণী মূর্ত্তিতে—লোকজনকে খাওয়ানো-মাখানো, কুলীদের ছেলে-মেয়েদের পুঁতির মালা কিনে দেওয়া, আদরযত্ন করা, আমাদের একটু অসুখে রাত জেগে বিছানায় বসে থাকা। কাছাকাছি কোনো চা-বাগানের বাঙালীবাবু সোনাদায় নেমে যখন বাগানে যেত, আমাদের বাসায় না-খেয়ে যাবার উপায় ছিল না। আর সেই মা এখানে এদের সংসারে দাসী, পরণে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, কাজ পারলে সুখ্যাতি নেই, না পারলে বকুনি আছে, গালাগাল আছে—সবাই হেনস্থা করে, কারও কাছে এতটুকু মান নেই, মাথা তুলে বেড়াবার মুখ নেই। কেন, ঠাকুরকে ঘুস্ দিতে পারেন না ব'লে? আমার মনে হ'ত জ্যাঠাইমাদের শালগ্রামশিলা এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন, তিনি ষোড়শোপচারে পূজো পেয়ে জ্যাঠাইমাকে বড় ক'রে দিয়েছেন, অন্য সকলের ওপর জ্যাঠাইমা যে অত্যাচার অবিচার করচেন, তা চেয়েও দেখচেন না ঠাকুর।

এক দিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর ঘরে আরতি সুরু হয়েছে; নরু, সীতা, সেজকাকার ছেলে পুলিন আর আমি দেখতে গেছি। পুরুতঠাকুর ওদের সবারই হাতে একটা ক'রে রূপোবাঁধানো চামর দিলে—আরতির সময় তারা চামর ঢুলুতে লাগল। আমার ও সীতার হাতে দিলে না। সীতা চাইতে গেল, তাও দিলে না। একটু পরে ধূপ ধুনোর ধোঁয়ায় ও সুগন্ধে দালান ভরে গিয়েছে, বুলু ও ফেণী কাঁসর বাজাচ্ছে, পুরুত-ঠাকুরের ছোট ভাই রাম ঘড়ি পিটচে পুরুতঠাকুর তন্ময় হয়ে পঞ্চপ্রদীপে ঘিয়ের বাতি জেলে আরতি করচে—আমি ও সীতা ছিটের দোলাইমোড়া ঠাকুরের আসনের দিকে চেয়ে আছি—এমন সময় আমার মনে হ'ল এ-দালানে শুধু আমরা এই ক'জন উপস্থিত নেই, আরও অনেক লোক উপস্থিত আছে, তাদের দেখা যাচ্চে না, তারা সবাই অদৃশ্য। আমার গা ঘুরতে লাগল, আর কানের পেছনে মাথার মধ্যে একটা জায়গায় যেন কতকগুলো পিঁপড়ে বাসা ভেঙে বেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। আমি জানি, এ আমার চেনা জানা, বহুপরিচিত লক্ষণ, অদৃশ্য কিছু দেখবার আগেকার অবস্থা—চা-বাগানে এ-রকম কতবার হয়েচে। শরীরের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি হয়—সে ঠিক ব'লে বোঝানো যায় না. জ্বর আস্‌বার আগে যেমন লোকে বুঝতে পারে এইবার জ্বর আস্‌বে, এও ঠিক তেমনি। আমি সীতাকে কি বল্‌তে গেলাম, পিছু হঠে গিয়ে দালানের থাম ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম, গা বমি-বমি ক'রে উঠলে লোকে যেমন সে ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করে, আমিও সেই রকম স্বাভাবিক অবস্থায় থাক্‌বার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম—কিছুতেই কিছু হ'ল না, ধীরে ধীরে পূজার দালানের তিন ধারের দেওয়াল আমার সাম্‌নে থেকে অনেক দূরে···অনেক দূরে সরে যেতে লাগল···কাঁসর ঘড়ির আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এল···কতকগুলো বেগুনী ও রাঙা রঙের আলোর চাকা যেন একটা আর একটার পিছনে তাড়া করেছে...সারি সারি বেগুনী ও রাঙা আলোর চাকা খুব লম্বা সারি আমার চোখের সামনে দিয়ে চ'লে যাচ্ছে...তারপর আমার বাঁ

অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা বড় নদী, ওপারেও সুন্দর গাছপালা, নীল আকাশ···এপারেও অনেক ঝোপ বন···কিন্তু যেন মনে হ'ল সব জিনিষটা আমি ঝাড়-লণ্ঠনের তেকোণা কাচ দিয়ে দেখছি···নানা রঙের গাছপালা, নদীর জলের ঢেউয়ে নানা রং···ওপারটা লোকজনে ভরা, মেয়েও আছে, পুরুষও আছে··গাছপালার মধ্যে দিয়ে একটা মন্দিরের সরু চূড়ো ঠেলে আকাশে উঠেছে··আর ফুল যে কত রঙের আর কত চমৎকার তা মুখে বল্‌তে পারিনে, গাছের সারা গুঁড়ি ভ'রে যেন রঙীন ও উজ্জ্বল থোবা থোবা ফুল···হঠাৎ সেই নদীর এক পাশে জলের ওপর ভাসমান অবস্থায় জ্যাঠামশাইদের ঠাকুর-ঘরটা একটু একটু ফুটে উঠল তার চারিদিকে নদী, কড়ি কাঠের কাছে কাছে সে নদীর ধারের ডাল তার থোকা থোকা ফুলসুদ্ধ হাওয়ায় দুলচে···ওদের সেই দেশটা যেন আমাদের ঠাকুর-ঘরের চারি পাশ ঘিরে ··মধ্যে, ওপরে, নীচে, ডাইনে, বাঁয়ে আমার মন আনন্দে ভরে গেল ··কান্না আসতে চাইল ··কি জানি কোন্ ঠাকুরের ওপর ভক্তিতে··আমার ঘোর কাটল একটা চেঁচা-মেচির শব্দে। আমায় সবাই মিলে ঠেলচে। সীতা আমার ডান হাত জোর ক'রে ধরে দাঁড়িয়ে আছে···পুরুতঠাকুর ও পুলিন রেগে আমায় কি বলচে···চেয়ে দেখি আমি ভোগের লুচির থালার অত্যন্ত কাছে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি ··আমার কোঁচা লুটুচ্ছে উঁচু ক'রে সাজানো ফুল্‌কো লুচির রাশির ওপরে। তারপর যা ঘটল! পুরুতঠাকুর গালে চার-পাঁচটা চড় কসিয়ে দিলেন ··মেজকাকা এসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বল্‌লেন। জ্যাঠাইমা এসে নরু-পুলিনদের ওপর আগুন হয়ে বল্‌তে লাগলেন সবাই জানে আমি পাগল, আমার মাথার রোগ আছে, আমায় তারা কেন ঠাকুরদালানে নিয়ে গিয়েছিল আরতির সময়।···

মেজকাকার মারের ভয়ে অন্ধকার রাত্রে জ্যাঠামশায়দের খিড়কীপুকুরের মাদার-তলায় একা এসে দাঁড়ালাম। সীতা গোলমালে টের পায়নি আমি কোথায় গিয়েছি। আমার পা কাঁপছিল ভয়ে···এ আমার কি হ'ল? আমার এমন হয় কেন? এ কি খুব শক্ত ব্যারাম? ঠাকুরের ভোগ আমি ত ইচ্ছে ক'রে ছুঁইনি? তবে ওরা বুঝলে না কেন? এখন আমি কি করি?

আমি হিন্দু দেবদেবী জান্‌তাম না, সে-শিক্ষা আজন্ম আমাদের কেউ দেয়নি। কিন্তু মিশনরী মেয়েদের কাছে জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত যা শিখে এসেছি, সেই শিক্ষা অনুসারে অন্ধকারে মাদারগাছের গুঁড়ির কাছে মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে হাতজোড় ক'রে মনে মনে বল্‌লাম—হে প্রভু যিশু, হে সদাপ্রভু, তুমি জান আমি নির্দ্দোষ—আমি ইচ্ছে ক'রে করিনি কিছু, তুমি আমার এই রোগ সারিয়ে দাও, আমার যেন এ-রকম আর কখনও না হয়। তোমার জয় হোক্, তোমার রাজত্ব আসুক্, আমেন্।

২

সকালে স্নান ক'রে এসে দেখি সীতা আমাদের ঘরের বারান্দাতে এক কোণে খুঁটি হেলান দিয়ে বসে পড়ছে। আমি কাছে গিয়ে বললাম—দেখি কি পড়ছিস্ সীতা?·· সীতা এমন একমনে বই পড়ছে যে বই থেকে চোখ না তুলেই বললে—ও-পাড়ার বৌদিদির কাছ থেকে এনেছি—প্রফুল্লবালা—গোড়াটা একটু পড়ে দ্যাখো কেমন চমৎকার বই দাদা—

আমি বইখানা হাতে নিয়ে দেখলাম, নামটা 'প্রফুল্লবালা' বটে। আমি বই পড়তে ভালবাসিনে, বইখানা ওর হাতে ফেরৎ দিয়ে বললাম—তুই এত বাজে বইও পড়তে পারিস!

সীতা বললে—বাজে বই নয় দাদা, পড়ে দেখো এখন। জমিদারের ছেলে সতীশের সঙ্গে এক গরিব ভট্টচায্যি বামুনের মেয়ে প্রফুল্লবালার দেখা হয়েছে। ওদের বোধ হয় বিয়ে হবে।

সীতা দেখতে ভাল বটে, কিন্তু যেমন সাধারণতঃ ভাইয়েরা বোনেদের চেয়ে দেখতে ভাল হয়, আমাদের বেলাতেও তাই হয়েছে। আমাদের মধ্যে দাদা সকলের চেয়ে সুন্দর—যেমন রং, তেমনই চোখমুখ, তেমনই চুল—তারপর সীতা, তারপর আমি। দাদা যে সুন্দর, এ-কথা শত্রুতেও স্বীকার করে—সে আগে থেকে ভাল চোখ, ভাল মুখ, ভাল রং দখল ক'রে বসেছে—আমার ও সীতার জন্যে বিশেষ কিছু রাখেনি। তা হলেও সীতা দেখতে ভাল। তা ছাড়া সীতা আবার সৌখীন—সর্ব্বদা ঘষে মেজে, খোঁপাটি বেঁধে, টিপটি প'রে বেড়ান তার স্বভাব। কথা বলতে বলতে দশ বার খোঁপায় হাত দিয়ে দেখচে খোঁপা ঠিক আছে কি-না। এ নিয়ে এ-বাড়িতে তাকে কম কথা সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু সীতা বিশেষ কিছু গায়ে

মাখে না, কারুর কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না—চিরকালের একগুঁয়ে স্বভাব তার।

আমার মনে মাঝে মাঝে কষ্ট হয়, আমাদের তো পয়সা নেই, সীতাকে তেমন ভাল ঘরে বিয়ে দিতে পারব না—এই সব পাড়াগাঁয়ে আমার জ্যাঠামশায়দের মত বাড়িতে, আমার জ্যাঠাইমার মত শাশুড়ীর হাতে পড়বে—কি দুর্দ্দশাটাই যে ওর হবে! ওর এত বইপড়ার ঝোঁক যে, এ-পাড়ার ও-পাড়ার বৌঝিদের বাক্সে যত বই আছে চেয়ে-চিন্তে এনে এ-সংসারের কঠিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব পড়ে ফেলে দিয়েচে। জ্যাঠাইমা তো এমনিই বলেন, "ও-সব অলুক্ষুণে কাণ্ড বাপু—মেয়েমানুষের আবার অত বই পড়ার সখ, অত সাজগোজের ঘটা কেন? পড়বে তেমন শাশুড়ীর হাতে, ঝাঁটার আগায় বই পড়া ঘুচিয়ে দেবে তিন দিনে।"

সীতার বুদ্ধি খুব। 'শতগল্প' ব'লে একখানা বই ও কোথা থেকে এনেছিল, তাতে 'সোনামুখী ও ছাইমুখী' ব'লে একটা গল্প আছে, সৎমার সংসারে গুণবতী লক্ষ্মীমেয়ে সোনামুখী ঝাঁটা লাথি খেয়ে মানুষ হ'ত—তারপর কোন্ দেশের রাজকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল ভগবানের দয়ায়—সীতা দেখি গল্পটার পাতা মুড়ে রেখেছে। ও-গল্পটার সঙ্গে ওর জীবনের মিল আছে, এই হয়ত ভেবেচে। কিন্তু সীতা একটি কথাও মুখ ফুটে বলে না কোনো দিন। ভারি চাপা।

সীতা বই থেকে চোখ তুলে পথের দিকে চেয়ে বললে—ঐ হীরুঠাকুর আসচে দাদা আমি পালাই—

আমি বললাম—"বোস, হীরুঠাকুর কিছু বল্‌বে না। ও ঠিক আজ এখানে খাবার কথা বল্‌বে দ্যাখ্।"

হীরুঠাকুরকে এ-গাঁয়ে আসা পর্য্যন্ত দেখছি। রোগা কালো চেহারা, খোঁচা খোঁচা একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি, পরণে থাকে আধময়লা থান, খালি পা, কাঁধে ময়লা চাদর, তার ওপরে একখানা ময়লা গামছা ফেলা। নিজের ঘরদোর নেই, লোকের বাড়ি বাড়ি খেয়ে বেড়ানো তার ব্যবসা। আমরা যখন এখানে নতুন এলাম, তখন কত দিন হীরুঠাকুর এসে আমাকে বলেছে, "তোমার মাকে বল খোকা, আমি এখানে আজ দুটো খাবো।" মাকে বলতেই তখুনি তিনি রাজী হতেন—মা চিরকাল এমন ছিলেন না, লোককে খাওয়াতে-মাখাতে চিরদিনই তিনি ভালবাসতেন।

সীতার কথাই ঠিক হ'ল। হীরুঠাকুর এসে বললে—"শো খোকা, তোমার মাকে বলো আমি এখানে আজ দুপুরে চাট্টি ভাত খাবো।" সীতা বই মুখে দিয়ে খিল্ খিল্ ক'রে হেসেই খুন। আমি বললাম, "হীরু-জ্যাঠা, আজকাল তো আমরা আলাদা খাইনে? জ্যাঠামশায়দের বাড়িতে খাই বাবা মারা গিয়ে পর্য্যন্ত। আপনি সেজকাকাকে বলুন গিয়ে। সেজকাকা কাঁটালতলায় নাপিতের কাছে দাড়ি কামাচ্ছেন।"

সেজকাকা লোক ভাল। হীরুঠাকুর আশ্বাস পেয়ে আমাদেরই ঘরের বারান্দায় বসল। সীতা উঠে একটা কম্বল পেতে দিলে। হীরুঠাকুর বললে, "তোমার দাদা কোথায়?" দাদার সঙ্গে ওর বড় ভাব। হীরুঠাকুরের গল্প দাদা শুনতে ভালবাসে, হীরুঠাকুরের কষ্ট দেখে দাদার দুঃখ খুব, হীরুঠাকুর না খেতে পেলে দাদা বাড়ি থেকে চাল চুরি ক'রে দিয়ে আসে। এখানে যখন খেতে আসত, তখুনি প্রথম দাদার সঙ্গে ওর আলাপ হয়, এই বারান্দায় বসেই। হীরুঠাকুরের কেউ নেই—একটা ছেলে ছিল, সে না-কি আজ অনেকদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। হীরুঠাকুরের এখনও বিশ্বাস, ছেলে এক দিন ফিরে আসবেই এবং অনেক টাকাকড়ি আন্‌বে, তখন তার দুঃখ ঘুচবে। দাদা হীরুর ওই সব গল্প মন দিয়ে বসে বসে শোনে। অমন শ্রোতা এ-গাঁয়ে বোধ হয় হীরুঠাকুর আর কখনও পায়নি।

খেতে বসে হীরুঠাকুর এক মহা গোলমাল বাধিয়ে বসল। জ্যাঠামশায়ের ছোট মেয়ে সরিকে ডেকে বললে, (হীরু কারুর নাম মনে রাখতে পারে না) "খুকী শোনো, বাড়ির মধ্যে জিগ্যেস কর তো ডালের বাটীতে তাঁরা কি কিছু মিশিয়ে দিয়েছেন? আমার গা যেন ঘুরচে।" সবাই জানে হীরুঠাকুরের মাথা খারাপ, সে ও-রকম একবার আমাদের বাড়ি খেতে বসেও বলেছিল, কিন্তু বাড়িসুদ্ধ মেয়েরা বেজায় চটল এতে। চটবারই কথা। জ্যাঠাইমা বললেন—"সেজঠাকুরপোর খেয়ে-দেয়ে তো আর কাজ নেই, ও আপদ মাসের মধ্যে দশ দিন আসে এখানে খেতে। তার ওপর আবার বলে কি-না ডালে বিষ মাখিয়ে দিইচি আমরা। আ মরণ মড়ুইপোড়া বামুন, তোকে বিষ খাইয়ে মেরে কি তোর লাখো টাকার তালুক হাত করব? আজ থেকে বলে দাও সেজঠাকুরপো, এ-বাড়ির দোর বন্ধ হয়ে গেল, কোনো দিন সদরের চৌকাঠ মাড়ালে ঝাঁটা মেরে তাড়াবো।"

হীরু তখন খাওয়া শেষ করেছিল। জ্যাঠাইমার গালাগালি শুনে মুখখানা কাঁচুমাচু ক'রে উঠে গেল। দাদা এ-সময় বাড়ি ছিল না—আমাদের মুখে এরপর শুনে বললে—আহা, ও পাগল, ছেলের শোকে পাগল হয়েছে। ও কি বলে না-বলে তা কি ধরতে আছে? ছিঃ, খাবার সময় জ্যাঠাইমার গালমন্দ করা ভাল হয়নি। আহা!

সীতা বললে, "গালাগাল দেওয়া ভাল হয়নি কেন, খুব ভাল হয়েচে। খামোকা বলবে যে বিষ মিশিয়ে দিয়েচে? লোকে কি মনে করবে?"

দাদা আর কিছু বললে না, চুপ ক'রে রইল। সে কারুর সঙ্গে তর্ক করতে পারে না, সীতার সঙ্গে তো নয়ই। একবার কেবল আমায় জিগ্যেস করলে, "হীরুজ্যাঠা কোন্ দিকে গেল রে নিতু?" আমি বললাম আমি জানিনে।

এর মাস দুই তিন পরে, মাঘ মাসের শেষ, বিকেল বেলা। আমাদের ঘরের সামনে একটুখানি পড়ন্ত রোদে পিঠ দিয়ে স্কুলের অঙ্ক কষচি—এমন সময় দেখি হীরুঠাকুরকে সন্তর্পণে আস্তে আস্তে ধরে নিয়ে আসছে দাদা। হীরুঠাকুরের চেহারা শীর্ণ, মাথার চুল আরও উস্কোখুস্কো, মুখ প্যাঁস্—জ্বরে যেমনি কাঁপচে, তেমনি কাস্চে। শুনলাম আজ না-কি চার-পাঁচ দিন অসুখ অবস্থায় আমাদেরই পাড়ায় ভটচায্যিদের পূজোর দালানে শুয়েছিল। অসুখে কাশ-থুথু ফেলে ঘর অপরিষ্কার করে দেখে তারা এই অবস্থায় বলেচে সেখানে জায়গা হবে না। হীরুঠাকুর চলতে পারে না, যেমন দুর্ব্বল, তেমনি জ্বর আর সে কি ভয়ানক কাশি! কোথায় যায়, তাই দাদা তাকে নিয়ে এসেচে জ্যাঠামশায়দের বাড়ি। ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। দাদার কি এতটুকু বুদ্ধি দেননি ভগবান! এটা কি নিজেদের বাড়ি যে এখানে যা খুশী করা চল্বে? কোন্ ভরসায় দাদা ওকে এখানে নিয়ে এল দ্যাখো তো?

যা ভয় করেছি, তাই হ'ল। হীরুকে অসুখ গায়ে হাত ধ'রে বাড়িতে এনেচে দাদা, এ-কথা বিদ্যুদ্বেগে বাড়ির মধ্যে প্রচার হয়ে যেতেই আমার খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোনেরা সব মজা দেখতে বাইরের উঠোনে ছুটে এল, সেজ-কাকা এসে বললেন—"না না—এখানে কে নিয়ে এল ওকে? এখানে জায়গা কোথায় যে রাখা হবে?" কিন্তু ততক্ষণ জ্যাঠামশায়দের চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় হীরু শুয়ে ধুঁকচে, দাদা চণ্ডীমণ্ডপের পুরোনো সপটা তাকে পেতে দিয়েচে। তখনি একটা ও-অবস্থার রোগীকে কোথায় বা সরানো যায়? বাধ্য হয়ে তখনকার মত জায়গা দিতেই হ'ল।

কিন্তু এর জন্যে কি অপমানটাই সহ্য করতে হ'ল দাদাকে। এই জন্যেই বল্‌চি দিনটা কখনো ভুলবো না। দাদাকে আমরা সবাই ভালবাসি, আমি সীতা দু-জনেই। আমরা জানি সে বোকা, তার বুদ্ধি নেই, সে এখনও আমাদের চেয়েও ছেলেমানুষ, সংসারের ভালমন্দ সে কিছু বোঝে না, তাকে বাঁচিয়ে আড়াল ক'রে বেড়িয়ে আমরা চলি। দাদাকে কেউ একটু বকলে আমরা সহ্য করতে পারিনে, আর সেই দাদাকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রথমে সেজকাকা আথালিপাথালি চড়চাপড় মারলেন। বললেন, "বুড়ো ধাড়ী কোথাকার, ওই হাঁপকাশের রুগী বাড়ি নিয়ে এলে তুমি কার হুকুমে? তোমার বাবার বাড়ি এটা? এতটুকু জ্ঞান হয়নি তোমার? সাহসও তো বলিহারি, জিগ্যেস্ না বাদ না কাউকে, একটা কঠিন রুগী বাড়ি নিয়ে এসে তুললে কোন্ সাহসে? নবাব হয়েচ না ধিঙ্গী হয়েচ? না এটা তোমার চা-বাগান পেয়েচ?"

এর চেয়েও বেশী কষ্ট হ'ল যখন জ্যাঠাইমা অনেক গালি-গালাজের পর রোয়াকে দাঁড়িয়ে হুকুম জারি করলেন, "যাও, রুগী ছুঁয়ে ঘরে দোরে উঠতে পাবে না, পুকুর থেকে গায়ের ও-কোটসুদ্ধ ডুব দিয়ে এস গিয়ে।"

মাঘ মাসের শীতের সন্ধ্যা আর সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা পুকুরের জল—তার ওপর চা-বাগানের আমলের ওই ছেঁড়া গরম কোটটা ছাড়া দাদার গায়ে দেবার আর কিছু নেই, দাদা গায়ে দেবে কি নেয়ে উঠে? সীতা ছুটে গিয়ে শুকনো কাপড় নিয়ে এসে পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। মাও এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি ভালমানুষ, দাদাকে একটা কথাও বললেন না, কেবল ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে জল থেকে সে যখন উঠে এল, তখন নিজের হাতে গামছা দিয়ে তার মাথা মুছিয়ে দিলেন, সীতা শুকনো কাপড় এগিয়ে দিলে, আমি গায়ের কোটটা খুলে পরতে দিলাম। রাত্রে মা সাবু ক'রে দিলেন আমাদের ঘরের উনুনে—দাদা গিয়ে হীরু-ঠাকুরকে খাইয়ে এল।

সকালবেলা সেজকাকা ও জ্যাঠামশাই দত্তদের কাঁটাল-বাগানের ধারে পোড়ো জমিতে বাড়ির কৃষাণকে দিয়ে খেজুর-পাতার একটা কুঁড়ে বাঁধলেন এবং লোকজন ডাকিয়ে হীরুকে ধরাধরি ক'রে সেখানে নিয়ে গেলেন। দাদা চুপি চুপি একবাটি সাবু মা'র কাছ থেকে ক'রে নিয়ে দিয়ে এল। দিন দুই এই অবস্থায় কাটলো। মুখুজ্জে-বাড়ির বড়মেয়ে নলিনীদি রাত্রে এক বাটি বার্লি দিয়ে আস্তো আর সকালবেলা যাবার সময় বাটিটা ফিরিয়ে নিয়ে যেত। একদিন রাতে দাদা বললে—"চল্ নিতু, আজ হীরুজ্যাঠার ওখানে রাতে থাকবি ? রামগতি-কাকা দেখে বলেচে অবস্থা খারাপ। চল্ আগুন জ্বালাবো এখন, বড্ড শীত নইলে।"

রাত দশটার পর আমি ও দাদা দু-জনে গেলাম। আমরা যাওয়ার পর নলিনীদি সাবু নিয়ে এল। বললে, "কি রকম আছে রে হীরু-কাকা ?" তারপর সে চলে গেল। নারকোলের মালা দু-তিনটে শিয়রের কাছে পাতা, তাতে কাশথুথু ফেলেচে রুগী। আমার গা কেমন বমি-বমি করতে লাগল। আর কি কন্‌কনে ঠাণ্ডা ! খেজুরের পাতার ঝাঁপে কি মাঘ মাসের শীত আটকায় ? দত্তদের কাঁটালবাগান থেকে শুক্‌নো কাঁটালপাতা নিয়ে এসে দাদা আগুন জ্বাল্‌লে। একটু পরে দু-জনই ঘুমিয়ে পড়লাম। কত রাত্রে জানি না, আমার মনে হ'ল হীরুজ্যাঠা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হীরু-জ্যাঠা আর কাশচে না, তার রোগ যেন সেরে গিয়েচে ! আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে, "নিতু বললে, আমি বাঁশবেড়ে যাচ্ছি গঙ্গা নাইতে। আমায় বড় কষ্ট দিয়েছে হরিবল্লভ (আমার জ্যাঠামশাই), আমি বলে যাচ্ছি, নির্ব্বংশ হবে, নির্ব্বংশ হবে। তোমরা বাড়ি গিয়ে শোওগে যাও।"

আমার গা শিউরে উঠলো—এত স্পষ্ট কথাগুলো কানে গেল, এত স্পষ্ট হীরুজ্যাঠাকে দেখলাম যে বুঝে উঠতে পারলাম না প্রত্যক্ষ দেখেছি, না স্বপ্ন দেখছি। ঘুম কিন্তু ভেঙে গিয়েছিল, দাদা দেখি তখনও কুঁকড়ি হয়ে শীতে ঘুমুচ্চে, কাঁটালপাতার আগুন নিবে জল হয়ে গিয়েচে, হীরুজ্যাঠাও ঘুমুচ্চে মনে হ'ল। বাইরে দেখি ভোর হয়ে গিয়েচে।

দাদাকে উঠিয়ে নলিনীদিদির বাবা রামগতি মুখুজ্জেকে ডাকিয়ে আন্‌লাম। তিনি এসে দেখেই বললেন, "ও তো শেষ হয়ে গিয়েচে। কতক্ষণ হ'ল ? তোরা কি রাত্রে ছিলি না-কি এখানে ?"

হীরুঠাকুরের মৃত্যুতে চোখের জল এক দাদা ছাড়া বোধ হয় আর কেউ ফেলেনি।

অনেক দিন পরে শুনেছিলাম, হীরুঠাকুর পৈতৃক কি জমিজমা ও দুখানা আমকাঁটালের বাগান বন্ধক রেখে জ্যাঠামশায়ের কাছে কিছু টাকা ধার করে এবং শেষ পর্য্যন্ত হীরুঠাকুর সে টাকা শোধ না করার দরুণ জ্যাঠামশায় নালিশ ক'রে নীলামে সব বন্ধকী বিষয় নিজেই কিনে রাখেন। এর পর হীরুঠাকুর আপোষে কিছু টাকা দিয়ে সম্পত্তিটা ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল—জ্যাঠামশায় রাজী হননি। কেবল বলেছিলেন, ব্রাহ্মণের ভিটে আমি চাইনে—ওটা তোমায় ফিরিয়ে দিলাম। হীরু তা নেয়নি, বলেছিল, সব যে-পথে গিয়েছে, ও ভিটেও সে-পথে যাক্। এর কিছুকাল পরেই তার মাথা খারাপ হয়ে যায়।

৩

বিষয় বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামশায়দের দানধ্যান ধর্ম্মানুষ্ঠানও বেড়ে চলেছিল। প্রতি পূর্ণিমায় তাঁদের ঘরে সত্যনারায়ণ পূজা হয় যে তা নয় শুধু—একটি গরিব ছাত্রকে জ্যাঠাইমা বছরে একটি টাকা দিতেন বই কেন্‌বার জন্যে ; শ্রাবণ মাসে তাঁদের আবাদ থেকে নৌকো আসে নানা জিনিষপত্রে বোঝাই হয়ে—বছরের ধান, জালাভরা কইমাছ, বাক্সভরা হাঁসের ডিম, তিল, আকের গুড় আরও অনেক জিনিষ। প্রতি বছরই সেই নৌকায় দুটি একটি হরিণ আসে। ধনধান্যপূর্ণ ডিঙা নিরাপদে দেশে পৌঁছেচে এবং তার জিনিষপত্র নির্ব্বিঘ্নে ভাঁড়ার-ঘরে উঠল এই আনন্দে তাঁরা প্রতিবার শ্রাবণ মাসে পাঁঠা বলি দিয়ে মনসাপূজো করতেন ও গ্রামের ব্রাহ্মণ খাওয়াতেন। বৈশাখ মাসে গৃহ-দেবতা মদনমোহনের পূজার পালা পড়ল ওঁদের। জ্যাঠামশায় গরদের জোড় প'রে লোকজন ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে কাঁসরঘণ্টা, ঢাকঢোল বাজিয়ে ঠাকুর নিয়ে এলেন ও-পাড়ার জ্ঞাতিদের বাড়ি থেকে—জ্যাঠাইমা খুড়ীমায়া বাড়ির দোরে দাঁড়িয়েছিলেন—প্রকাণ্ড পেতলের সিংহাসনে বসানো

শালগ্রাম বয়ে আনছিলেন জ্যাঠামশায় নিজে—তিনি বাড়ি ঢুকবার সময়ে জ্যাঠাইমা জলের ঝারা দিতে দিতে ঠাকুর অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেলেন—মেয়েরা শাঁখ বাজাতে লাগলেন, উলু দিলেন। আমি, সীতা ও দাদা আমাদের ঘরের বারান্দা থেকে দেখছিলাম—অত্যন্ত কৌতূহল হলেও কাছে যেতে সাহস হ'ল না। মাকে মেমে পড়াতো সে-কথা ওঁদের কানে যাওয়া থেকে মানুষের ধারা থেকে আমরা নেমে গিয়েচি ওঁদের চোখে—আমরা খ্রীষ্টান, আমরা নাস্তিক, পাহাড়ী জানোয়ার—ঘরেদোরে ঢুকবার যোগ্য নই। বৈশাখ মাসের প্রতিদিন কত কি খাবার তৈরি হ'তে লাগল ঠাকুরের ভোগের জন্যে—ওঁরা পাড়ার ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ ক'রে প্রায়ই খাওয়াতেন, রাত্রে শীতলের লুচি ও ফলমিষ্টান্ন পাড়ার ছেলেমেয়েদের ডেকে দিতে দেখেচি তবুও সীতার হাতে একখানা চন্দ্রপুলি ভেঙে আধখানিও কোনো দিন দেননি।

জ্যাঠাইমা এ সংসারের কর্ত্রী, কারণ জ্যাঠামশাই রোজগার করেন বেশী। ফরসা মোটাসোটা, একগা গহনা, অহঙ্কারে পরিপূর্ণ—এই হলেন জ্যাঠাইমা। এ-বাড়িতে নববধূরূপে তিনি আসবার পর থেকেই সংসারের অবস্থা ফিরে যায়, তার আগে এদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না—তাই তিনি নিজেকে ভাবেন ভাগ্যবতী। এ-বাড়িতে তাঁর ওপর কথা বল্‌বার ক্ষমতা নেই কারও। তাঁর বিনা হুকুমে কোনো কাজ হয় না। এই জ্যৈষ্ঠ মাসে এত আম বাড়িতে, বৌদের নিয়ে খাবার ক্ষমতা নেই, যখন বলবেন খাওগে, তখন খেতে পাবে। জ্যাঠামশায়ের বড় ও মেজ ছেলে, শীতলদা ও সলিলদার বিয়ে হয়েচে, যদিও তাদের বয়েস খুব বেশী নয় এবং তাদের বৌয়েদের বয়েস আরও কম—দুই ছেলের এই দুই বৌ ও বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে আছে এক ভাগ্নেবৌ তার ছেলেমেয়ে নিয়ে, আর আমার মা আমাদের নিয়ে—এ ছাড়া ভুবনের মা আছে, কাকীমারা আছেন—এর মধ্যে এক ছোটকাকীমা বাদে আর সব জ্যোঠাইমার সেবাদাসী। ছোটকাকীমা বাদে এইজন্যে যে তিনি বড়মানুষের মেয়ে—তাঁর ওপর জ্যাঠাইমার প্রভুত্ব বেশী খাটে না।

প্রতিদিন খাওয়ার সময় কি নির্লজ্জ কাণ্ডটাই হয়! রোজ রোজ দেখে সয়ে গিয়েচে যদিও, তবুও এখনও চোখে কেমন ঠেকে। রান্নাঘরে একসঙ্গে ভাগ্নে, জামাই, ছেলেরা খেতে বসে। ছেলেদের পাতে জামাইয়ের পাতে বড় বড় জামবাটিতে ঘন দুধ, ভাগ্নেদের পাতে হাতা ক'রে দুধ। মেয়েদের খাবার সময় সীতা ভাগ্নেবৌ এরা সবাই কলায়ের ডাল মেখে ভাত খেয়ে উঠে গেল—নিজেদের দল, দুই বৌ, মেয়ে নলিনীদি, নিজের জন্যে বাটীতে বাটীতে দুধ আম বাতাসা। নলিনীদি আবার মধু দিয়ে আমদুধ খেতে ভালবাসে—মধুর অভাব নেই, জ্যাঠামশাই প্রতি বৎসর আবাদ থেকে ছোট জালার একজালা মধু নিয়ে আসেন—নলিনীদি দুধ দিয়ে ভাত মেখেই বলবে মা আমায় একটু মধু দিতে বলো না সদুর মাকে? কালেভদ্রে হয়ত জ্যাঠাইমার দয়া হ'ল—তিনি সীতার পাতে দুটো আম দিতে বললেন কি এক হাতা দুধ দিতে বললেন—নয় তো ওরা ওই কলায়ের ডাল মেখে খেয়েই উঠে গেল। সীতা সে-রকম মেয়ে নয় যে মুখফুটে কোন দিন কিছু বল্‌বে, কিন্তু সেও তো ছেলেমানুষ, তারও তো খাবার ইচ্ছে হয়? আমি এই কথা বলি, যদি খাবার জিনিষের বেলা কাউকে দেবে, কাউকে বঞ্চিত করবে, তবে একসঙ্গে সকলকে খেতে না বসালেই তো সবচেয়ে ভাল?

এক দিন কেবল সীতা বলেছিল আমার কাছে,—দাদা, জ্যাঠাইমারা কি রকম লোক বল দিকি? মা তাল তাল বাট্‌না বাট্‌বে, বাসন মাজবে, রাজ্যির বাসি কাপড় কাচবে, কিন্তু এত ডাবের ছড়াছড়ি এ-বাড়িতে, গাছেরই তো ডাব, একাদশীর পরদিন মাকে কোনো দিন বলেও না যে একটা ডাব নিয়ে যাও।

৪

আমি মুখে মুখে বানিয়ে কথা বলতে ভালবাসি। আপন মনে কখনও বাড়ির কর্ত্তার মত কথা বলি, কখনও চাকরের মত কথা বলি। সীতাকে কত শুনিয়েছি, এক দিন মাকেও শুনিয়েছিলাম। এক দিন ও-পাড়ার মুখুজ্জে-বাড়িতে বীরুর মা, কাকীমা, দিদি—এরা সব ধ'রে পড়ল আমাকে বানিয়ে বানিয়ে কিছু বল্‌তে হবে।

ওদের রান্না-বাড়ির উঠোনে, মেয়েরা সব রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকটা ভাবলাম কি বল্‌ব? সেখানে একটা বাঁশের ঘেরা পাঁচিলের গায়ে ঠেসান ছিল। সেইটের দিকে চেয়ে আমার মাথায় বুদ্ধি

এসে গেল। এই বাঁশের ঘেরাটা হবে যেন আমার স্ত্রী, আমি যেন চাকরি ক'রে বাড়ি আস্‌চি, হাতে অনেক জিনিষপত্র। ঘরে যেন সবে ঢুকেছি, এমন ভাব ক'রে বললাম—"ওগো কই, কোথায় গেলে, ফুলকপিগুলো নামিয়ে নাও না? ছেলেটার জর আজ কেমন আছে?" মেয়েরা সব হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ল।

আমার উৎসাহ গেল আরও বেড়ে। আমি বিরক্তির সুরে বললাম—"আঃ, ঐ তো তোমার দোষ! কুইনিন্ দেওয়া আজ খুব উচিত ছিল। তোমার দোষেই ওর অসুখ যাচ্ছে না। খেতে দিয়েছ কি?"

আমার স্ত্রী অপ্রতিভ হয়ে খুব নরম সুরে কি একটা জবাব দিতেই রাগ পড়ে গেল আমার। বললাম—"ওই পুঁটুলিটা খোলো, তোমার এক জোড়া কাপড় আছে আর একটা তরল আল্‌তা—" মেয়েরা আবার খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। বীরুর ছোটবৌদিদি মুখে কাপড় গুঁজে হাসতে লাগল। আমি বল্‌লাম—"ইয়ে করো, আগে হাত-পা ধোয়ার জল দিয়ে একটু চায়ের জল চড়াও দিকি? সেই কখন ট্রেনে উঠেচি—ঝাঁকুনির চোটে আর এই দু-কোশ হেঁটে খিদে পেয়ে গিয়েচে—আর এই সঙ্গে একটু হালুয়া—কাগজের ঠোঙা খুলে দেখ কিসমিস এনেচি কিনে, বেশ ভাল কাবুলী—"

বীরুর কাকীমা তো ডাক ছেড়ে হেসে উঠলেন। বীরুর মা বললেন—"ছোঁড়া পাগল! কেমন সব বল্‌চে দেখ, মাগো মা উঃ—আর হেসে পারিনে।..."

বীরুর ছোটবৌদিদির দম বন্ধ হয়ে যাবে বোধ হয় হাস্‌তে হাস্‌তে। বললে—"উঃ মা, আমি যাবো কোথায়! ওর মনে মনে ওই সব সখ আছে, ওর ইচ্ছে ওর বিয়ে হয়, বৌ নিয়ে অম্‌নি সংসার করে—উঃ, মা রে!"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আমি রান্নাঘরে ব'সে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করচি। রান্না এখনও শেষ হয়নি। আমি বললাম—"চিংড়ি মাছটা কেমন দেখলে, খুব পচেনি তো? কালিয়াটায় ঝাল একটু বেশী ক'রে দিও।"

বীরুর কাকীমা বললেন, "হ্যাঁ রে, তুই কি কেবলই খাওয়া-দাওয়ার কথা বলবি বৌয়ের সঙ্গে?" কিন্তু আমি আর কি ধরণের কথা বলব খুঁজে পাইনে। ভাবলাম খানিকক্ষণ, আর কি কথা বলা উচিত? আমি এই ধরণের কথাই সকলকে বলতে শুনেচি স্ত্রীর কাছে। ভেবে ভেবে বললাম, "খুকীর জন্যে জামাটা আনবো, কাল ওর গায়ের মাপ দিও তো? আর জিগ্যেস কোরো কি রং ওর পছন্দ—না, না—এখন আর ঘুম ভাঙিয়ে জিগ্যেস করবার দরকার নেই, ছেলেমানুষ ঘুমুচ্ছে, থাক্। কাল সকলেই—খুব গম্ভীর মুখে এ-কথা বলতেই মেয়েরা আবার হেসে উঠল দেখে আমি ভারি খুশী হয়ে উঠলাম। আরও বাহাদুরী নেবার ইচ্ছায় উৎসাহের সুরে বললাম—"আমি নেপালী নাচ জানি—চা-বাগানে নাচতো আমি দেখে দেখে শিখেচি।" মেয়েরা সবাই বলে উঠলো, "তাও জানিস না কি? বারে, তা তো তুই বলিস্‌নি কোনো দিন? দেখি—দেখি—"

"কিন্তু আর একজন লোক দরকার যে? আমার সঙ্গে আর কে আসবে? সীতা থাক্‌লে ভাল হ'ত। সেও জানে। আপনাদের বীণা কোথায় গেল? সে হ'লেও হয়।"

এ-কথায় মেয়েরা কেন যে এত হেসে উঠল হঠাৎ, তা আমি বুঝতে পারলাম না। বীণা বীরুর মেজবোন, আমার চেয়ে কিছু ছোট, দেখতে বেশ ভাল। সে ওখানে ছিল না তখন—একা একা নেপালী নাচ হয় না ব'লে বেশী বাহাদুরীটা আমার আর নেওয়া হয়নি সে-দিন।

সীতার বইপড়ার ব্যাপার নিয়ে জ্যাঠাইমা সকল সময় সীতাকে মুখ নাড়া দেন। সীতা যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকতে ভালবাসে, এটাও জ্যাঠাইমা বা কাকীমারা দেখতে পারেন না। সীতা চিরকাল ওই রকম থেকে এসেচে চা-বাগানে—একটি মাত্র মেয়ে, মা তাকে সব সময় সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখতে ভালবাসতেন, কতকটা আবার গ'ড়ে উঠেছিল মিস্ নর্টনের দরুণ। মিস্ নর্টন মাকে পড়াতে এসে নিজের হাতে সীতার চুল আঁচড়ে দিত, চুলে লাল ফিতে বেঁধে দিত, হাত ও মুখ পরিষ্কার রাখতে শেখাত। এখানে এসে সীতার দুখানার বেশী তিনখানা কাপড় জোটেনি কোনো সময়—জামা তো নেই-ই—(জ্যাঠাইমা বলেন, মেয়েমানুষের আবার জামা গায়ে কিসের?) কিন্তু ওরই মধ্যে সীতা ফরসা কাপড়খানি প'রে থাকে, চুলটি টান টান করে বেঁধে পেছনে গোল খোঁপা বেঁধে বেড়ায়, কপালে টিপ প'রে—এ-গাঁয়ের এক পাল অসভ্য অপরিষ্কার ছেলেমেয়ের মধ্যে

ওকে সম্পূর্ণ অন্য রকমের দেখায়, যে-কেউ দেখলেই বলতে পারে ও এ-গাঁয়ের নয়, এ অঞ্চলের না—ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

দুটো জিনিষ সীতা খুব ভালবাসে ছেলেবেলা থেকে—সাবান আর বই। আর এখানে এসে পর্য্যন্ত ঠিক ওই দুটো জিনিষই মেলে না—এ-বাড়িতে সাবান কেউ ব্যবহার করে না, কাকীমাদের বাক্সে সাবান হয়ত আছে, কিন্তু সে বাক্স-সাজানো হিসেবে আছে, যেমন তাঁদের বাক্সে কাচের পুতুল আছে, চীনেমাটির হরিণ, খোকা পুতুল, উট আছে—তেমনি। তবুও সাবান বরং খুঁজলে মেলে বাড়িতে—কেউ ব্যবহার করুক আর নাই করুক—বই কিন্তু খুঁজলেও মেলে না—দুখানা বই ছাড়া—নতুন পাঁজি আর সত্যনারায়ণের পুঁথি। আমরা তো চা-বাগানে থাকতাম, সে তো বাংলা দেশেই নয়—তবুও আমাদের বাক্সে অনেক বাংলা বই ছিল। নানা রকমের ছবিওয়ালা বাংলা বই—যীশুর গল্প, পরিত্রাণের কথা, জবের গল্প, স্বুবর্ণবণিক পুত্রের কাহিনী—আরও কত কি। এর মধ্যে মিশনরী মেমেরা অনেক দিয়েছিল, আবার বাবাও কল্‌কাতা থেকে ডাকে আনাতেন—সীতার জন্যে এনে দিয়েছিলেন কঙ্কাবতী, হাতেমতাই, হিতোপদেশের গল্প, আমার জন্যে একখানা 'ভূগোল-পরিচয়' ব'লে বই, আর একখানা 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'। আমি গল্পের বই পড়তে তত ভালবাসিনে, দু-তিনটে গল্প পড়ে আমার বইখানা আমি সীতাকে দিয়ে দিয়েছিলাম।

আমার ভাল লাগে যিশুখৃষ্টের কথা পড়তে। পর্ব্বতে যিশুর উপদেশ, যিশুর পুনরুত্থান, অপব্যয়ী পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তন—এ-সব আমার বেশ লাগে। এখানে ও-সব বই পাওয়া যায় না ব'লে পড়িনে। যিশুর কথা এখানে কেউ বলেও না। একখানা খৃষ্টের রঙীন ছবি আমার কাছে আছে—মিস্ নর্টন দিয়েছিল—সেখানা আমার বড় প্রিয়। মাঝে মাঝে বার ক'রে দেখি।

হিন্দু দেবতার কোনো মূর্ত্তি আমি দেখিনি, জ্যাঠামশায়েরা বাড়িতে যা পুজো করেন, তা গোলমত পাথরের নুড়ি। এ-গ্রামে দুর্গাপূজা হয় না, ছবিতে দুর্গামূর্ত্তি দেখেছি, ভাল বুঝতে পারিনে, কিন্তু একটা ব্যাপার হয়েচে মধ্যে। চৌধুরী-পাড়ায় বড় পুকুর ধারের পাকুড়গাছের তলায় কালো পাথরের একটা দেবমূর্ত্তি গাছের গুঁড়িতে ঠেসানো আছে—আমি এক দিন দুপুরে একলা পাকুড়তলা দিয়ে যাচ্চি, বাবা তখন বেঁচে আছেন, কিন্তু তাঁর খুব অসুখ—ওই সময় মূর্ত্তিটা আমি প্রথম দেখি—জায়গাটা নির্জ্জন, পাকুড়গাছের ডালপালার পিছনে অনেকখানি নীল আকাশ, মেঘের একটা পাহাড় দেখাচ্ছে ঠিক যেন বরফে মোড়া কাঞ্চন-জঙ্ঘা—একটা হাতভাঙা যদিও কিন্তু কি সুন্দর যে মুখ মূর্ত্তিটার, কি অপূর্ব্ব গড়ন—আমার হঠাৎ মনে হ'ল ওই পাথরের মূর্ত্তির পবিত্র মুখের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের মুখের মিল আছে—কেউ ছিল না তাই দেখেনি—আমার চোখে জল এল, আমি একদৃষ্টিতে মূর্ত্তিটার মুখের দিকে চেয়েই আছি—ভাবলাম জ্যাঠামশায়রা পাথরের নুড়ি পুজো করে কেন, এমন সুন্দর মূর্ত্তির দেবতাকে কেন নিয়ে গিয়ে পুজো করে না? তার পরে শুনেছি ওই দীঘি খুঁড়বার সময়ে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগে মূর্ত্তিটা হাত-ভাঙা অবস্থাতেই মাটির তলায় পাওয়া যায়—সীতাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলাম একবার—একবার সীতা জবা, আকন্দ, ঝুমকো ফুলের একছড়া মালা গেঁথে মূর্ত্তির গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। অমন সুন্দর দেবতাকে আজ পঁচিশ বছর অনাদরে গ্রামের বাইরের পুকুরপাড়ে অমন ক'রে কেন যে ফেলে রেখে দিয়েছে এরা!

একবার একখানা বই পড়লাম—বইখানার নাম চৈতন্য-চরিতামৃত। এক জায়গায় একটি কথা প'ড়ে আমার ভারি আনন্দ হ'ল। চৈতন্যদেব ছেলেবেলায় একবার আঁস্তাকুড়ে এঁটো হাঁড়িকুড়ি যেখানে ফেলে, সেখানে গিয়েছিলেন ব'লে তাঁর মা শচীদেবী খুব বকেন। চৈতন্যদেব বললেন—মা, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঈশ্বর আছেন, এই আঁস্তাকুড়েও আছেন। ঈশ্বর যেখানে আছেন, সে-জায়গা অপবিত্র হবে কি ক'রে?

ভাবলাম জ্যাঠাইম'দের বিরুদ্ধে চমৎকার যুক্তি পেয়েছি ওঁদের ধর্ম্মের বইয়ে, চৈতন্যদেব অবতার, তাঁরই মুখে। জ্যাঠাইমাকে একদিন বললাম কথাটা। বললাম—"জ্যাঠাইমা, আপনি যে বাড়ির পিছনে বাঁশবনে গেলে কি শেওড়া গাছে কাপড় ঠেকলে হাত-পা না ধুয়ে, কাপড় না ছেড়ে ঘরে ঢুকতে দেন না, চৈতন্যচরিতামৃতে কি লিখেছে জানেন?" চৈতন্যদেবের সে-কথাটা বলবার সময়ে আনন্দে মন আমার ভরে উঠল—এমন নতুন কথা, এত সুন্দর কথা আমি কখনও শুনিনি। ভাবলাম জ্যাঠাইমা বই পড়েন না ব'লে এত সুন্দর কথা যে

ওঁদের ধর্মের বইয়ে আছে তা জানেন না—আমার মুখে শুনে জেনে নিশ্চয়ই নিজের ভুল বুঝে খুব অপ্রতিভ হয়ে যাবেন।

জ্যাঠাইমা বললেন—তোমাকে আর আমায় শেখাতে হবে না। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, উনি এসেচেন আজ আমায় শাস্তর শেখাতে। হিঁদুর আচার-ব্যাভার তোরা জান্‌বি কোত্থেকে রে ডেঁপো ছোঁড়া। তুই তো তুই, তোর মা বড় জানে, তোর বাবা বড় জান্‌তো—

আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। জ্যাঠাইমা এমন সুন্দর কথা শুনে চট্‌লেন কেন? তা ছাড়া আমি নিজে বানিয়ে কিছু বল্‌ছি কি?

আগ্রহের সুরে বললাম—আমার কথা নয় জ্যাঠাইমা, চৈতন্যদেব বলেছিলেন তাঁর মা শচীদেবীকে—চৈতন্যচরিতামৃতে লেখা আছে—দেখাবো বইখানা?

—খুব তক্কোবাজ হয়েচ, থাক্। আর বই দেখাতে হবে না। তোমার কাছে আমি গুরুমন্তর নিতে যাচ্ছিনে—এখন যাও আমার সামনে থেকে, আমার কাজ আছে—তোমার তক্কো শুনবার সময় নেই।

বা রে, তর্কবাজির কি হ'ল এতে? মনে কষ্ট হ'ল আমার। সেই থেকে জ্যাঠাইমাকে আর কোনো কথা বলিনে।

সীতা ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ক'রে বস্‌ল। জ্যাঠামশাইদের বাড়ির পাশে যদু অধিকারীর বাড়ি। তারা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাদের বাড়িতে যদু অধিকারীর বড় মেয়েকে বিয়ের জন্য দেখতে এল চার-পাঁচ জন ভদ্রলোক কলকাতা থেকে। সীতা সে-সময় সেখানে উপস্থিত ছিল।

যদু অধিকারীর বাড়ির মেয়েরা তাকে নাকি জিগ্যেস করেছে—শোন্ সীতা, আচ্ছা উমার যদি বিয়ে না হয় ওখানে, তোর বিয়ে দিয়ে যদি দি, তোর পছন্দ হয় কা'কে বল্‌ত?

সীতা বুঝতে পারেনি যে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করচে—বলেচে না-কি চোখে চশমা কে একজন এসেছিল তাকে।

ওরা সে-কথা নিয়ে হাসাহাসি করেচে। জ্যাঠাইমার কানেও গিয়েছে কথাটা। জ্যাঠাইমা ও সেজকাকীমা মিলে সীতাকে বেহায়া বোকা বদ্‌মাইস্ জ্যাঠা মেয়ে যা তা ব'লে গালাগালি আরম্ভ করলেন। আরও এমন কথা সব বললেন যা ওঁদের মুখ দিয়ে বেরুলো কি ক'রে আমি বুঝতে পারিনে। আমি সীতাকে বক্‌লাম, মাও বক্‌লেন—তুই যাস্ কেন যেখানে সেখানে, আর না বুঝে যা-তা কথা বলিস্‌ই বা কেন? এ-সব জায়গার ধরণ তুই কি বুঝিস্?

সীতার চোখ ছল্‌ছল্ ক'রে উঠ্‌ল। সে অতশত বোঝেনি, কে জানে ওরা আবার এখানে বলে দেবে! সে মনে যা এসেচে, মুখে সত্যি কথাই বলেচে। এ নিয়ে এত কথা উঠবে তা বুঝতে পারেনি।

ক্রমশঃ

বৌদ্ধধর্ম্মে কর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদ

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, এম-এ, পিএইচ-ডি

কোন্ সময়ে কি ও প্রকারে জন্মান্তরবাদ ভারতবর্ষীয় লোকের মনে আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্রমে ক্রমে ভারতীয় ধর্ম্মেতিহাসের গতি ঘুরাইয়া দিয়া মানুষের ধর্ম্মভাবনায় সরসতা বা আশ্বাস আনয়ন করিয়াছিল, সর্ব্বাগ্রে ইহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। মনীষিগণ, বিশেষতঃ প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ, মনে করিয়া থাকেন যে, সুপ্রাচীন সময়ে আর্য্যগণ স্বনিবাসস্থান হইতে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবার পূর্ব্বে, খুব সম্ভবতঃ, তাঁহাদের ধর্ম্মচিন্তার ধারাতে জন্মান্তরবাদ (Theory of Transmigration or Transmutation of Souls) ধর্ম্মবিশ্বাসরূপে হৃদয়ে পোষণ করিতেন না। মানুষের আত্মা মৃত্যুর পরে যে পুনর্ব্বার মানুষী তনু অথবা পশ্বাদিশরীর পরিগ্রহ করিতে পারে, এইরূপ মত যে গ্রীকজাতীয় দার্শনিক পাইথাগোরাস্ (Pythagoras) ও প্লেটো (Plato) পোষণ করিতেন, হয়ত ইহাও কেবল এই দুই দার্শনিকের স্বচিন্তাপ্রসূত ভাবমাত্র ছিল, ইহা যে গ্রীক জনসাধারণেরও বিশ্বাস্য বস্তু ছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ এমনও মনে করেন যে, মিশর দেশীয় দার্শনিকগণের সংস্পর্শে আসিয়া গ্রীক দার্শনিকগণের মনে এইরূপ কল্পনা উদিত হইয়া থাকিতে পারে। ভারতীয় আর্য্যগণের অতিপ্রাচীন ধর্ম্মসাহিত্য ঋগ্‌বেদাদিতেও জন্মান্তরবাদ পরিষ্কাররূপে বিশেষ কোন স্থান লাভ করিয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হয় না। ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে সিন্ধু ও পঞ্জাবের মহেঞ্জদারো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে অচিরাবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনসমূহের নিপুণভাবে পরীক্ষার ফলে স্যর জন্ মার্শাল্-প্রমুখ মনীষিগণ প্রাগার্য্য ভারতীয়গণের সভ্যতা সম্বন্ধে যে-সমস্ত মতবাদ প্রচার করিতে সমর্থ হইতেছেন, তৎপাঠেও জানা যায় যে, ভারতীয় আর্য্যগণ পঞ্চনদ ও সিন্ধু দেশবাসী প্রাগার্য্য জাতিগণের সহিত মিশ্রণের ফলে সেই সেই প্রাচীনতর আদিম জাতিসমূহ হইতে অনেক প্রকার ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মমত ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করিয়া সেগুলিকে পরবর্ত্তী সময়ে রচিত বেদাংশ, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ ও আরও পরবর্ত্তীকালে রচিত স্মৃতি-পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। শিব-শক্তির উপাসনা, নাগ-নাগীর ও যক্ষ-যক্ষিণীর পূজা, লিঙ্গ-যোনির অর্চ্চনা, বৃক্ষ-পশ্বাদির পূজা, ভক্তিবাদ, এমন কি সংসৃতি (Doctrine of metempsychosis) বা জন্মান্তরপরিগ্রহবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে মতামত কেন যে ভারতীয় আর্য্যগণ তাঁহাদের অতিপ্রাচীন নিজস্ব গ্রন্থে (অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থে) স্পষ্টতঃ উল্লেখ বা আলোচনা করেন নাই, এইরূপ প্রশ্ন বহুকাল যাবৎ প্রশ্নরূপেই থাকিয়া যাইতেছিল। সম্প্রতি পরিজ্ঞাত প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী এই সুসভ্য পঞ্চনদ ও সিন্ধু দেশবাসী প্রাগার্য্য ভারতীয়গণের সংসর্গে আসিয়া আর্য্যগণ যে জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি ধর্ম্মবিশ্বাস ক্রমশঃ ক্রমশঃ ধার করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকিবেন, এমন কথা আর সহসা নিষেধ করা যায় না। তৎপর কালে কালে দেশে দেশে প্রচারের ফলে এই মতবাদ সাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাসরূপে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছিল। এ সম্বন্ধে কোন কোন পণ্ডিত এমনও মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষে আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্বে, যদি অন্য কোন বৈদেশিক জাতি ভারতে প্রবেশলাভ করিয়া থাকেন এবং যদি বাস্তবিক আর্য্যগণ সেই জাতিকে পরাভূত করিয়া নিজ গোষ্ঠীতে মিশাইয়া লইয়া থাকেন তাহা হইলে এমনও অসম্ভব নহে যে, আর্য্যগণ সেই সেই পরাজিত জাতি হইতে একত্রবাসের ফলে জন্মান্তরবাদের কল্পনার ধারা ধার করিয়া শিখিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, এখন দেখা যাউক কোন্ প্রাচীন আর্য্যগ্রন্থে এই বাদটি প্রথমতঃ সুস্পষ্টভাবে সূচিত ও ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের বিশ্বাসবস্তু বলিয়া উল্লিখিত পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে (পঞ্চম অধ্যায়ের দশম খণ্ডে) ইহজন্মে আচরিত সুকৃত দুষ্কৃতের ফলানুসারে শরীরীর বা আত্মার পরজন্মে শরীরান্তর পরিগ্রহের বিষয় অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতি* বলিতেছেন যে,

---

* "তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাহথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরঞ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা॥"—ছা° উ° ৫।১০।৭

বর্ত্তমান জন্মে রমণীয় কর্ম্মের আচরণ দ্বারা শুভানুশয় হওয়ায় জীব পরজন্মে ব্রাহ্মণাদি রমণীয় যোনিতে জন্মলাভ করিবে এবং জুগুপ্সিত কর্ম্মের আচরণদ্বারা অশুভানুশয় হইয়া শ্বাদি জুগুপ্সিত যোনিতে জন্মলাভ করিবে। উপনিষদের রচনাকাল মোটামুটি ভাবে বুদ্ধদেবের জন্মের অন্যূন তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ধরিয়া লইলে শাস্ত্রের মর্য্যাদা নষ্ট হইবে এরূপ বিবেচিত হয় না। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচারের পরবর্ত্তী সময়ে রচিত কোন কোন উপনিষদে এবং ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতি-সংহিতা ও পুরাণাদিতে দেখা যায় যে, তৎ-তৎ সময়ে পুনর্জ্জন্মবাদ ও জন্মান্তরে দেহান্তর-প্রাপ্তিবাদ সমগ্রভাবে ভারতবাসিগণের স্বীকৃত বিশ্বাস হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিষয়ে কাহারও কোনরূপ সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু জীবের এই সংসৃতি বা সংসার কি কেবল দুই একবার মাত্রই ঘটে, অথবা ইহা অনন্তকালস্থায়ী—এইরূপ প্রশ্নও উত্থিত হইতে পারে। দেখা যায় যে, বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে জীবের পুনঃ পুনঃ সংসৃতির কল্পনাটি ধর্ম্মযুক্তিধারাতে ততটা প্রকৃষ্ট স্থান লাভ করিতে পারে নাই। এমনও মনে করা অসঙ্গত হয় না যে, বুদ্ধদেবের ধর্ম্মবিশ্বাসে ও তৎকর্ত্তৃক ধর্ম্ম-প্রচারেই পুনর্জ্জন্মের অনন্ত প্রবাহের কল্পনা প্রথমতঃ ভারতবর্ষে এতটা পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পুনর্জ্জন্মের অনন্ত চক্রের ধারণা বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ঋষি বা ধর্ম্মাচার্য্য প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন—তদ্বিষয়েও পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া কঠিন। বৌদ্ধগণের দৃঢ় বিশ্বাস এই ছিল যে, মোক্ষ বা নির্ব্বাণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীব বা পুদ্‌গলের জন্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। এক একটা জন্ম পাপপুণ্য কর্ম্মে ভোগের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। জন্মের অবধি হইল জীবের কর্ম্মক্ষয়। ভোগের ক্ষয়ে জীবের তৎ-তৎ-জন্ম শেষ হইলে পূর্ব্বকৃত অন্যান্য কর্ম্মের সঞ্চিত ফলে পুনর্জ্জন্ম হইতে থাকে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি এই স্থলে গীতার প্রসিদ্ধ বাক্য স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে বলিবেন—"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন" (হে অর্জ্জুন, আমার ও তোমার, উভয়েরই, বহু বহু জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে), কিন্তু, "তান্যহং বেদ সর্ব্বানি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ" (আমি ইহার সবগুলির বিষয় অবগত আছি, আর হে পরন্তপ, সেগুলিকে তুমি বুঝিতে পার না)।

কি হিন্দুশাস্ত্রে, কি বৌদ্ধশাস্ত্রে কর্ম্মকে মানসিক, বাচিক ও কায়িক ভেদে তিন প্রকারে কল্পনা করা হইয়াছে। এই তিন প্রকার কর্ম্মের শুভাশুভ ফলেই মানুষের মনুষ্য-তির্য্যগাদিভাবে উত্তম, মধ্যম বা অধম জন্মান্তর ঘটিয়া থাকে। হিন্দু মনে করেন যে, অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় পরমাত্মার রূপ হইতে অসংখ্য মূর্ত্তি লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্ন হইয়া নির্গত হইয়াই যেন জীবরূপে সর্ব্বভূতকে কর্ম্মে প্রেরিত করিতেছেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মের আচরণজনিত স্বর্গনরকাদি-ভোগের কল্পনাও মানুষের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য একটি উপাদেয় উপায়। অন্যভাবে শাস্ত্রকারগণ কর্ম্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—স্বর্গাদিসুখপ্রাপ্তিকর সংসরণের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয় বলিয়া কোন কোন কর্ম্ম (যথা—যজ্ঞ, উপাসনা প্রভৃতি) 'প্রবৃত্তাখ্য' কর্ম্ম (বা 'সুখাভ্যুদায়িক') এবং কোন কোন কর্ম্ম (যথা, তপোবিদ্যা প্রভৃতি) জীবের সংসরণ নিবৃত্ত করিতে পারে বলিয়া 'নিবৃত্তাখ্য' কর্ম্ম (বা 'নৈঃশ্রেয়সিক') বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু 'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা' না হইতে পারিলে জীবের পক্ষে পরমপুরুষার্থ বা মোক্ষলাভের অধিকারী হওয়ার জন্য উপায় হিন্দুশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হয় নাই। ব্রহ্মজ্ঞানী কর্ম্মজ দোষকে দহন করিয়া এই লোকেই ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। অগ্নি সংবর্দ্ধিত হইলে আর্দ্র কাষ্ঠও দহন করিতে সমর্থ হয় না কি? যিনি পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন, তিনিই ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মের অতীত হইতে পারেন। কর্ম্ম-সম্বন্ধে আরও এক প্রশ্ন এইরূপ উত্থিত হয়, জীব বা পুদ্‌গলের কর্ম্মে প্রেরণা উৎপাদন করিয়া দেন কে? হিন্দু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিবেন—

"এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি যমূর্দ্ধং নিনীষতি এষ হ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি যমধো নিনীষতি"—

আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞাদিতে কর্ম্মসাধনের প্রেরণা উৎপাদন করিয়া দেন। তাই ইহা সকলেরই অনুভূত হইতেছে যে, কর্ম্মহেতুক পুনর্জ্জন্ম ও জন্মান্তরপ্রবাহ স্বীকার না করিলে পরমাত্মার উপর বিষমসৃষ্টির দোষ ও নিষ্ঠুরত্ব আরোপ করিতে হয়। কিন্তু, পরমাত্মা সাধারণভাবে জীবের কর্ম্মানুরূপ সৃষ্টির বিধান করেন মাত্র; বৈসম্য কেবল জীবের কর্ম্মজনিত ঘটনা। বিষমসৃষ্টির এই ব্যাখ্যা কর্ম্মবাদ স্বীকার দ্বারাই সুসাধিত হয়। পর্জ্জন্যদেবব্রীহিযবাদিসৃষ্টিতে সাধারণ

কারণ, কিন্তু ব্রীহিযবাদির বৈষম্য তত্তদ্-বীজগত-কারণ জন্য ঘটিয়া থাকে। জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়াই পরমাত্মা অনাদিকাল হইতে বিভিন্ন প্রকার সংসারের বিধান করিতেছেন।

কর্ম্মের পারতন্ত্র্য জীবের পক্ষে ত্যাগ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। কর্ম্মই বন্ধনদুঃখের ও বার-বার জন্মান্তরপরিগ্রহের হেতু। তবে কি পুনর্জ্জন্ম নিরোধ করিতে হইলে কর্ম্মের নিরোধ বা সন্ন্যাস করিতে হইবে? মানুষের চেষ্টা থাকিবে কেমন করিয়া তাহার আত্মা—'ত্যক্তা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি"—দেহত্যাগের পর আবার দেহান্তরগ্রহণদ্বারা সংসারে ফিরিয়া না আসেন এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ বা ত্রিতাপের হস্ত হইতে, অর্থাৎ জন্ম, জরা, রোগ,মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্মের কঠোর ও কর্কশ শৃঙ্খলবন্ধন হইতে নিজকে মুক্ত করিবার উপায় খুঁজিয়া লইতে পারে। কিন্তু, কোন জীবের পক্ষেই সর্ব্বতোভাবে 'অকর্ম্মকৃৎ' থাকা সম্ভাবিত নহে। কৃষ্ণ, জনক, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি অবতার ও মহাপুরুষগণের জীবনচরিত লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা জীবের উদ্ধারকল্পে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষায় কর্ম্মযোগের, অর্থাৎ কৌশলপূর্ব্বক কর্ম্মের আচরণের, পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে, সুতরাং কর্ম্মের জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি সম্ভাবিত হয়। পরলোকে অধিকতর সুখের ও আনন্দের আশা না থাকিলে, মানুষ ইহলোকে দুঃখ এড়াইবার জন্য আত্মঘাত দ্বারা নিজের ও হত্যাদিদ্বারা শিশুসন্তানের প্রাণনাশ অবিধেয় মনে করিত না। স্বর্গাদিতে সুখভোগের আশা, অথবা ঐকান্তিকভাবে অপবর্গ লাভ, করিতে হইলে, কৌশলে কর্ম্মসাধন করিতে হইবে। হঠাৎ কর্ম্মত্যাগ করিয়া বসিতে চাহিলেও তাহা কাহারও সম্ভবপর হইয়া উঠে না। যে কৌশলদ্বারা—"কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে, কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে"—কর্ম্ম করিয়াও মানুষ নিবদ্ধ বা লিপ্ত হইবে না এবং সংসৃতির কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রে সেই কৌশলের শিক্ষা উপদিষ্ট রহিয়াছে। জলে ও বায়ুতে অদৃশ্যভাবে অনেক রোগবীজাণু বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তজ্জন্য যেমন সেই ভয়ে আমরা জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় এই প্রধান দ্রব্যদ্বয়ের ব্যবহার ত্যাগ করিয়া আত্মঘাতী হই না, কেবল বুদ্ধির কৌশলে দ্রব্যদ্বয়কে নির্দ্দোষ করিয়া পান ও সেবন করি, তেমনই জ্ঞানদ্বারা কর্ম্মকেও নির্দ্দোষ করিয়া লইতে পারিলে জীবকে আর কর্ম্মবশতঃ পুনর্জ্জন্ম-বন্ধনে পড়িয়া অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদের সেই মহাবাক্য এস্থলে স্মরণীয় যাহাতে শ্রুতি বলিতেছেন—"যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে"—যেমন পদ্মপত্রে জল শ্লিষ্ট হয় না, তেমন তত্ত্ববিৎ জ্ঞানীতে পাপকর্ম্মও শ্লিষ্ট হয় না। কর্ম্ম করিব, অথচ তৎফলদ্বারা বদ্ধ হইয়া পুনর্জ্জন্মের জন্য সংসৃতি লাভ করিব না—এমন কোন উপায়ের কথা শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে কি? গীতার কর্ম্মযোগ-অধ্যায়ে উক্ত আছে যে, যে-কর্ম্ম করণীয়, তাহা অনাসক্ত ও নিরভিমান হইয়া তৎফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া ভগবদর্পণপূর্ব্বক সম্পাদন করিতে পারিলে তদ্দ্বারা জীব ভববন্ধন প্রাপ্ত হয় না, বরং তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম প্রশংসার্হ নহে; স্বার্থপরতায় প্রণোদিত হইয়া কর্ম্মাচরণ বিধেয় নহে, কিন্তু কর্ম্মের মূলে পরার্থপরতা নিহিত রাখিয়া কর্ম্ম করিলে তবেই জগতের কল্যাণার্থ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় হইল—এরূপ বলা যাইতে পারে। কর্ম্মের ফলে আকাঙ্ক্ষা রাখার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, জগতের প্রাণীর জন্য হিতকর কর্ম্ম করিব, তাহাতে আমার নিজের লাভ, ক্ষতি, সিদ্ধি, অসিদ্ধি কিছুতেই উৎফুল্ল বা বিষণ্ণ হইব না। হিন্দুদর্শনের মতে কর্ম্মফলভোগের প্রধান কারণ এই যে, জীব মায়াপ্রভাবে নিজের উপর কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বাভিমান করিয়া থাকেন, তিনি যে 'অকর্ত্তা' তাহা তিনি যেন বিস্মৃত হন। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির অত্যাচারে বা মায়া-প্রভাবে যে সর্ব্বকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, জীব তাহা যেন সর্ব্বদাই ভুলিয়া যান। তাই নিষ্কাম-কর্ম্ম-কর্ত্তা ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কাম্য কর্ম্মের সন্ন্যাস বা পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বভূতের হিতার্থে কর্ম্ম করিয়া তৎফলত্যাগী হন। ইহারই অপর ব্যাখ্যা পরমাত্মা বা ভগবানের প্রীতির জন্য তদর্পণপূর্ব্বক কর্ম্ম-সম্পাদন। এই ত গেল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উপদেশমত কর্ম্মফলের আলোচনা।

বৌদ্ধগণের ধর্ম্মশাস্ত্রেও পুণ্যকর্ম্মের সঞ্চয় ইহ-পরলোকে সুখের নিদান ও পাপকর্ম্মের সঞ্চয় দুঃখের আকর বলিয়া উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। তবে আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই যেন এই

পৃথিবীতে পাপী নানারূপ সুখ অনুভব করিতেছে ও পুণ্যকারী দুঃখ ভোগ করিতেছে—কিন্তু, ইহা দৃশ্যতঃ সত্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও বাস্তবিকপক্ষে সম্পূর্ণরূপে সত্য নয়, কারণ পাপপুণ্যের বিপাক বা পরিপাক প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুরুষের প্রত্যয়ে এইরূপ বিসদৃশ ভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে মাত্র। 'ধম্মপদ' গ্রন্থে (পাপবগ্‌গে) এইরূপ উপদেশ আছে,—

"তোমার নিকট পাপকর্ম্ম আসিবে না, এই মনে করিয়া তুমি পাপকে অবজ্ঞা করিও না ; তোমার নিকট পুণ্যকর্ম্ম উপস্থিত হইবে না ইহা মনে করিয়া পুণ্যকেও অবজ্ঞা করিও না। কারণ, বিন্দু বিন্দু করিয়া জলপাতে যেমন জলকলস পরিপূর্ণ হইতে পারে, তেমনি মূর্খ বা অজ্ঞানী ব্যক্তি অল্প অল্প পাপ সঞ্চয় পূর্ব্বক, এবং ধীর বা জ্ঞানী ব্যক্তি তেমনি অল্প অল্প পুণ্য সঞ্চয় পূর্ব্বক যথাক্রমে পাপ ও পুণ্যে পরিপূর্ণ হইতে পারে। প্রভূত-ধন-বিশিষ্ট বণিকের যেমন স্বল্পসংখ্যক সঙ্গী সঙ্গে থাকিলে, ভয়সঙ্কুল পথ পরিত্যাগ বিধেয় এবং যেমন জীবনাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে বিষ-বর্জ্জন বিধেয়, তেমন পুদ্‌গলের বা জীবের পক্ষেও পাপ-বর্জ্জন সর্ব্বদা কার্য্য।"

কারণ, কি অন্তরীক্ষে, কি সমুদ্রতলে কি পর্ব্বতগুহায়—জগতে এমন কি কোন নিভৃত স্থান আছে, যেখানে পাপ অনাচরিত থাকিতে পারে ? তাই, সেই শাস্ত্রে আরও উপদেশ আছে—

গব্‌ভমেকে উপপজ্জন্তি নিরয়ং পাপকম্মিনো।
সগ্‌গং সুগতিনো যন্তি পরিনিব্বন্তি অনাসবা ॥ (পাপবগ্‌গো-১১।)

এই শ্লোকে কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে বৌদ্ধগণের বিশ্বাসটি সুন্দর ভাবে উল্লিখিত পাওয়া যাইতেছে। তাঁহাদের ধারণা এই যে, "পাপ আচরণ করিয়া কেহ কেহ পুনর্জ্জন্ম জন্য গর্ভ পরিগ্রহ করিয়া থাকে, কেহ কেহ নরকে গমন করে, কিন্তু, পুণ্য-কর্ম্মকারীরা স্বর্গে গমন করেন এবং 'আসব' বা আস্রব-রহিত (অর্থাৎ বিষয়বাসনাবিহীন) ব্যক্তিগণ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।" এক কথায় বলিতে গেলে, পুদ্‌গল সর্ব্বদাই 'কম্মসসকো' অর্থাৎ কর্ম্ম-পরতন্ত্র। বৌদ্ধগণের নিত্য প্রত্যবেক্ষণের মধ্যে এই ভাবনাটিও নিয়ত ভাবিতে হইবে বলিয়া উল্লিখিত আছে, যথা,—

"যং কম্মং করিস্‌সামি কল্যাণং বা পাপকং বা তস্স দায়াদো ভবিস্‌সামি"
"আমরা কল্যাণ কর্ম্ম বা পাপ কর্ম্ম যেটারই আচরণ করিব, তদনুরূপ ফল-ভাগী বা 'দায়াদ' অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে তৎফলভাগী হইব।"

সুতরাং তাহাদের মতে কর্ম্মই (ফলরূপে) জীবের বা পুদ্‌গলের অনুধাবন করিয়া নব-সৃষ্টির হেতু হইয়া দাঁড়ায়। পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ অশোক তদীয় অনুশাসনে পাপ পুণ্য কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রজাবর্গের ধর্ম্মোন্নতিকামনায় নিজ মত দ্বারা পরিপোষিত যে উপদেশবাণী প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তরস্তম্ভলিপি রূপে উৎকীর্ণ করাইয়া রাখিয়াছেন তাহা হইতে কয়েকটি বাক্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইতে পারে। নীতিমূলক কর্ম্ম আচরণ করার উপদেশ যে বৌদ্ধধর্ম্মের একটি বিশেষত্ব, তদ্বিষয়ে মহারাজ অশোকের এই কথাগুলি জ্বলন্ত নিদর্শনরূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্য। ধর্ম্ম কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে সম্রাট (দ্বিতীয় স্তম্ভলিপিতে) লিখাইতেছেন—

"কিয়ং চু ধংমে তি ? অপাসিনবে বহুকয়াণে দয়া দানে সচে সোচয়ে চ খু।"

'ধর্ম্ম কাহাকে বলা যায় ? (উত্তর) অপাদীনব (বা মতান্তরে অপাস্রব) অর্থাৎ দোষরাহিত্য, বহুকল্যাণ, দয়া দান সত্য ও শৌচ।' তৎপরে সম্রাট (তৃতীয় স্তম্ভলিপিতে) আরও লিখাইয়াছেন যে, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে পাপপুণ্যের প্রত্যবেক্ষণ নিত্যকরণীয় হইলেও, ইহা বড়ই কঠিন কার্য্য। কোন্ কোন্ পাপ চিত্তবৃত্তি আদিনব-গামিনী বা দোষোৎপাদনকারিণী বা পরলোক-নাশ-বিধায়িনী, প্রজাবর্গকে তদ্বিষয়ে সাবধান রাখিবার জন্য তিনি সেই সেই বৃত্তিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন। তিনি লিখাইতেছেন প্রত্যেক ব্যক্তিই—

"কেবল স্বকৃত কল্যাণ বা পুণ্যকর্ম্মই দেখিয়া থাকে (এবং বলিয়া থাকে) 'আমি এমন কল্যাণ কার্য্য করিয়াছি'। কিন্তু, সে কিছুতেই তাহার স্বকৃত পাপ কার্য্য দেখিতে চায় না (এবং বলিয়া থাকে না) 'আমি এমন পাপ কার্য্য করিয়াছি এবং ইহা আমার পরিক্লেশের বা ভবিষ্যৎ অনিষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে'। বাস্তবিক এইরূপ অনুভূতি দুষ্প্রত্যবেক্ষ্যা অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের এমন পরিমাপের প্রত্যবেক্ষণ কঠিন কার্য্য। (অতএব) সকলেরই এইটি লক্ষ্য করিয়া রাখা উচিত যে, চণ্ডতা নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, মান, ঈর্ষ্যা—এইরূপ মনোবৃত্তিগুলির আচরণ মানুষের পরিক্লেশের কারণ হইয়া থাকে এবং সকলকেই সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে হইবে যেন, এই পাপবৃত্তিগুলি তাহাদিগকে পরিভ্রষ্ট না করিয়া ফেলে। আরও লক্ষ্য রাখা উচিত—কোন্ কর্ম্মটি ঐহিক সুখদুঃখের ও কোন্‌টি পারত্রিক সুখদুঃখের নিদান।"

তবেই দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধগণের মতেও তাহাই সুকর্ম্ম, যাহা পারত্রিক মঙ্গলকর এবং যাহাদ্বারা সর্ব্বসত্ত্বের প্রতি কল্যাণ আচরিত হইতে পারে। বৌদ্ধশাস্ত্রেও অভিহিত হইয়াছে যে সুকর্ম্মকারী ব্যক্তিগণ অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে তাহার ফলে পুনর্জ্জন্মরহিত হইয়া নির্ব্বাণ বা বন্ধনমুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ কর্ম্মাচরণ দ্বারাই কর্ম্মজনিত বন্ধন ছিন্ন করিতে পারা যায়। 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো'

গ্রন্থে লিখিত আছে যে, স্থবির নাগসেন রাজা মিলিন্দকে (Menandar) বুঝাইতেছেন যে তিনি নিজে যদি—

"স-উপাদানো ভবিস্সামি—পটিসন্দহিস্সামি, সচে অনুপাদানো ভবিস্সামি ন পটিসন্দহিস্সামীতি"—

"আসক্তিযুক্ত হন, তবেই তাহার পুনর্জ্জন্ম হইবে, অনাসক্তিযুক্ত হইলে তাহা হইবে না।" উভয় শাস্ত্রই (হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্র) স্পষ্ট শিক্ষা দিতেছেন যে, অনাসক্ত হইয়া জগতের হিতের জন্য অদীনবগামী নিষ্ঠুরাচরণ প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক দয়া, মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি সদ্বৃত্তিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া কল্যাণ কর্ম্ম করিতে পারিলে, তাহার ফল উত্তম এবং তজ্জন্য তদাচরণ-কারীর পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে হইলেও, সেই কারণে তাহার উত্তম যোনিতে জন্মান্তর পরিগ্রহ হইতে পারে।

প্রব্রজিতের পক্ষেও বন্ধনের হেতুভূত কর্ম্মসমূহের মধ্যে দুইটি কোটি বা অন্ত (extremes) পরিত্যাগ করিবার জন্য বুদ্ধদেব স্বয়ং ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনসময়ে তদীয় পূর্ব্ব ধর্ম্মবৈরী কৌণ্ডিণ্য প্রভৃতি ভিক্ষুপঞ্চকের নিকট যে ধর্ম্মদেশনা (sermon) ঋষিপত্তনে বা মৃগদাবে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই প্রথম অন্তটি 'কামসুখল্লিকানুযোগো' অর্থাৎ গ্রাম্য ও পামরজনোচিত কামসুখে ও বিষয়ভোগে আসক্তি এবং দ্বিতীয়টি "অত্তকিলমথানুযোগো" অর্থাৎ কঠিন ও কঠোর তপস্যাদিদ্বারা শরীরের ক্লেশোৎপাদন। এই দুইটি অন্তপদ্ধতির কোনটিই ব্রহ্মচর্য্য, বিরাগ, সংবর (ধর্ম্মক্রিয়াসম্পাদন), নির্ব্বেদ, নিরোধ, বিমুক্তি, অভিজ্ঞা, বোধি বা নির্ব্বাণ সম্পাদন করিতে সমর্থ নয়। বরং এই দুই পদ্ধতিই কেবল দুঃখকর, অনার্য্য ও অনর্থযুক্ত পদ্ধতি। তিনি তাঁহাদিগকে আরও বলিয়াছিলেন—'অয়ং খো সা ভিক্খবে মজ্ঝিমা পটিপদা তথাগতেন অভিসম্বুদ্ধা। চক্খুকরণী ঞানকরণী উপসমায় অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি।" "তথাগত যে মধ্যম পথের আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা চক্ষুঃকর ও জ্ঞানকর মার্গ—ইহা দ্বারা অগ্রসর হইলে উপশম, অভিজ্ঞা, সংবোধি ও নির্ব্বাণলাভ হকর।" ইহাই 'অট্ঠঙ্গিকোমগ্গো'—আষ্টাঙ্গিক মার্গ। যথা সম্মাদিট্ঠি' (সম্যক দৃষ্টি—বিষয়ের ঠিক দর্শন), 'সম্মা-সংকপ্পো' সম্যক্ সংকল্প—সংকল্প স্থির রাখা), 'সম্মা বাচা' (সম্যক্ বাক্য—প্রিয় সত্য কথন), 'সম্মা কম্মন্তো' (সম্যক্ কর্ম্মান্ত—সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার), 'সম্মা আজীবো' (সম্যক্ আজীব—সাধু উপায়ে জীবিকোপার্জ্জন), 'সম্মা বায়ামো' (সম্যক ব্যায়াম—সাধু উদ্যোগ বা চেষ্টা), 'সম্মা সতি' (সম্যক্ স্মৃতি—স্মরণ ও ধারণশক্তি) ও 'সম্মা সমাধি' (পরমতত্ত্বাবগতির জন্য শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন প্রভৃতির সম্পাদন)। ভগবান বুদ্ধের মতে ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা ও উপাসক উপাসিকারা যদি এই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম করিতে থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহারা দ্বাদশ-নিদানাত্মক কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ ও পুনর্জ্জন্মের দুঃখ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়া তথাগতের ন্যায় সম্বোধি-জ্ঞানার্জ্জনপূর্ব্বক নির্ব্বাণরূপ পুরুষার্থ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন। বৌদ্ধধর্ম্মের মূল উপদেশ এই ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনসূত্রেই নিহিত আছে। ভগবান বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম যে অনেকাংশেই নৈতিক কর্ম্মের ধর্ম্ম তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়। সাধু ও শুদ্ধ জীবন যাপন করিয়া সর্ব্বসত্ত্বের দুঃখ হানির সহায়তা করিতে পারিলেই নির্ব্বাণ-পথ পরিষ্কার হইয়া উঠে। মুক্তির জন্য বুদ্ধের নিকট বৈদান্তিকের তত্তৎভাসক-নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাব প্রত্যক্চৈতন্য পরমাত্মার জ্ঞান, সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান, অথবা পাতঞ্জলের প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। 'চতুরার্য্যসত্য' ঠিক নয় কি ? 'যাহা কিছু জন্মশীল তাহাই নশ্বর'—ইহা সত্য নয় কি ? এইরূপ ধ্যানই বৌদ্ধের প্রধান ধর্ম্মাচরণকর্ম্ম।

আষ্টাঙ্গিক মার্গে চলিলে চতুরার্য্যসত্য উপলব্ধি করা যায় এবং সর্ব্বশেষে গন্তব্য স্থান নির্ব্বাণে উপস্থিত হওয়া যায়—ইহাই বুদ্ধের বিশ্বাস ও জ্ঞান এবং তিনি সংবোধিলাভের পর ইহাই জীবনের শেষ পঁয়তাল্লিশ বৎসর প্রচার করিয়া জগতের উদ্ধারকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

উপরি উল্লিখিত 'কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা' কথার অর্থ কি ? এবং চতুরার্য্যসত্যই বা কি, তাহার একটু উল্লেখ প্রয়োজনীয়। যে রজনীতে গৌতম বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুমের নীচে (অশ্বত্থমূলে) সম্যক্ জ্ঞানলাভসহকারে "সম্বুদ্ধ" হইয়াছিলেন, তাহার প্রথম যামে তিনি প্রাক্তন জন্মসমূহের সর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারিয়াছিলেন, দ্বিতীয় যামে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া বর্ত্তমান কালের সর্ব্বভূতের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তৃতীয় যামে সর্ব্ববিষয়ের কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার জ্ঞান লাভ

করিয়াছিলেন এবং রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অতি-প্রত্যূষে তিনি সর্ব্বজ্ঞতালাভে কৃতকৃতার্থ হইয়া সিদ্ধার্থ হইয়াছিলেন। তিনি যে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা বা দ্বাদশ নিদান উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ—জগতের লোকের জরা-মরণ-দুঃখ (শোক পরিদেবনাদি সহকারে) জাতি (জন্ম) হইতে সমূদ্ভূত হয়, জাতি ভব (হওয়ার ভাব) হইতে, ভব উপাদান (হওয়ার আসক্তি) হইতে, উপাদান তৃষ্ণা (আকাঙ্ক্ষা) হইতে, তৃষ্ণা বেদনা (অনুভূতি) হইতে, বেদনা স্পর্শ (বিষয়ের সহিত সংসর্গ বা সম্পর্ক) হইতে, স্পর্শ ষড়ায়তন (ইন্দ্রিয়গ্রাম) হইতে, ষড়ায়তন নামরূপ (মানসিক ও বাহ্যিক ব্যাপার বা বৃত্তি ইহার অপর নাম 'পপঞ্চ'=প্রপঞ্চ বা মায়া অর্থাৎ 'human body as an aggregate of physical and mental phenomena,' রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান-এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিও 'নামরূপ' সংজ্ঞায় আখ্যাত) হইতে, নামরূপ বিজ্ঞান (অহংভাব, consciousness) হইতে, বিজ্ঞান সংস্কার (বাসনা, impressions) হইতে, এবং সংস্কার অবিদ্যা হইতে সমুৎপন্ন হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই নিদান-পরম্পরার নাম প্রতীত্য-সমুৎপাদ (পটিচ্চসমুপ্পাদ)। সুতরাং দুঃখবাদী ভারতীয় অন্যান্য দর্শনে যেমন অবিদ্যাকেই সর্ব্বদুঃখের কারণ বলিয়া অভিহিত করা হয়, বৌদ্ধশাস্ত্রের মতে তদ্রূপ মানুষের অবিদ্যামূলক দুঃখস্কন্ধ সমুদিত হয়। মানুষ এই দুঃখ হইতে "নিঃসরণং ন জানাতি"—কেমন করিয়া মুক্ত হইবে তাহা জানে না। এই শৃঙ্খলাতে উক্ত অবিদ্যা প্রভৃতি দ্বাদশ নিদানগুলির মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্বটির নিরোধে পর-পরটির নিরোধ হইলেই সর্ব্বদুঃখহানি নিশ্চিত, বুদ্ধদেব ইহাও সকলকে জানাইয়াছিলেন। সম্বোধির ফলে তিনি আরও একটি মহাসত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যথা—

> 'ইদং দুঃখময়ং দুঃখ-সমুদয়ো জগৎত্রাপ।
> অয়ং দুঃখ-নিরোধোঽপি চেয়ং নিরোধগামিনী ॥
> প্রতিপদিতি বিজ্ঞায় যথাভূতমবুধ্যত ॥"

প্রথম সত্য—সংসারে দুঃখ আছে, দ্বিতীয়—দুঃখের কারণও আছে, তৃতীয়—দুঃখের অতিক্রম বা নিরোধও আছে এবং চতুর্থ—দুঃখের উপশমের আষ্টাঙ্গিক মার্গরূপ উপায়ও আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত মধ্যম পথ বা 'মজ্ঝিম পটিপদাই' দুঃখবিনাশের প্রকৃষ্ট সাধন। মোট কথা, বৌদ্ধ প্রতীত্য-সমুৎপাদ হইতেও ইহাই অনুমিত হয় যে, অবিদ্যাই জরা, মরণ, পুনর্জ্জন্মাদিরূপ রোগের বীজাণুসদৃশ। এই রোগের চিকিৎসার জন্য প্রধান বৈদ্য বুদ্ধদেবও প্রতীকার বা ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমাদের শেষ প্রশ্ন এই—বৌদ্ধমতে কর্ম্মজনিত পুনর্জ্জন্মটা কাহার ও কেমন করিয়া ঘটিয়া থাকে ?

হিন্দুশাস্ত্রে আত্মার অস্তিত্ব ও সেই আত্মারই পুনর্জ্জন্ম ও জন্মান্তর পরিগ্রহ বা সংসৃতি স্বীকার করিয়া কর্ম্মবাদের অভ্যুপগম লক্ষিত হয়। সেই জন্য কর্ম্মকারীর সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করা বিধেয়। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে আত্মা বা ঈশ্বর বিশেষ কোন স্থান লাভ করেন নাই। এই শাস্ত্র এক প্রকার অনাত্মবাদী শাস্ত্র। বৌদ্ধ নরপতি কণিষ্কের সমসাময়িক মহাকবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষের রচিত 'বুদ্ধচরিত' নামক মহাকাব্যে প্রতীত্য-সমুৎপাদ ও তৎক্রমনিরোধের উপদেশ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব যে-ভাবে সংসারের কারণ ও মুক্তি বিষয়ে সমসাময়িক দার্শনিকগণের প্রচলিত মতভেদের খণ্ডন করিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধে একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কবি বর্ণনা করিতেছেন যে, বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন—চতুরার্য্যসত্য ও আষ্টাঙ্গিক মার্গই যে মুক্তিবিধায়ক তাহা না জানিয়া "দৃষ্টি-বিপন্ন"বাদিগণ অভিমান-বশতঃ স্ব-স্ব মত পোষণ ও প্রচার করিয়া সংসৃতি হইতে মুক্তিলাভ দূরে থাকুক, বরং সংসারবন্ধনের পথ অধিকতর পরিষ্কার করিতেছেন। এই বিপ্রবাদ সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন,—কোন কোন বাদীরা কেবল আত্মাকে একমাত্র অস্তি-বস্তু মনে করিয়া মননাদিদ্বারা তাহারই জ্ঞান ও তৎপুণ্যজনিত মুক্তির উপদেশ করিয়াছেন, অপর শ্রেণীর বাদীরা বলেন সবই 'স্বাভাবিক' অর্থাৎ অকারণ-সম্ভূত, আবার অন্য দলের বাদীরা বলেন সবই 'ঈশ্বরাধীন,' কিন্তু তথাগতের মতে এই মতগুলির প্রত্যেকটিই সংসার-সাধন-ধর্ম্ম। তিনি মনে করেন যে, এই বাদিগণ সকলেই সংবৃত্তি-ধর্ম্মবাদী, কেহই নিবৃত্তি-বিধান-বিৎ নহেন। তাই তিনি প্রতীত্য-সমুৎপাদকে সংবৃত্তি-ধর্ম্ম-সাধন মনে করিয়া তাহার নিরোধকেই নিবৃত্তি-পদ-সাধন বলিয়া প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে—

> "পঞ্চস্কন্ধময়ং দেহং পঞ্চভূতসমুদ্ভবম্।
> শূন্যমনাত্মকং সর্ব্বং প্রতীত্যোৎপাদ(ন)সম্ভবম্ ॥"

পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন দেহ রূপাদি পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি (এবং) প্রতীত্য-সমুৎপাদ-সম্ভূত সব বস্তুই অনাত্মক। বৌদ্ধগণও পরলোক মানেন, দেব-দেবীর কল্পনা করেন, স্বর্গ-নরকভোগের কথাও বলেন—কিন্তু তাঁহাদের মতে দেবদেবীর স্থান বড় নীচে। অত্যুচ্চ স্থান কেবল কর্ম্মের। কর্ম্মকেই তাঁহারা পুনর্জ্জন্মের কারণ বলিয়া মানেন। ভববন্ধ-বিমুক্তির জন্য দুঃখমূলক অবিদ্যার সংছেদ করিতে হইবে; তাহা করিলেই সংসারের নিবৃত্তি ও পুদ্‌গলের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। এই নির্ব্বাণের লক্ষণ এই যে, ইহা নিষ্প্রপঞ্চ, অনুৎপাদ, অসংভব ও অনালয়,—ইহা বিবিক্ত, প্রকৃতিশূন্য ও অলক্ষণ;—ইহা "আকাশেন সদাতুল্যং নির্ব্বিকল্পং প্রভাস্বরং"—ইহা 'অস্তি-নাস্তি-বিনির্মুক্ত' 'আত্ম-নৈরাত্ম্য-বর্জ্জিত'। হিন্দুদিগের ন্যায় বৌদ্ধগণ সালোক্য, সারূপ্য বা সাযুজ্য প্রভৃতি নামে অভিহিত মুক্তির আকাঙ্ক্ষী নহেন। তাঁহারা নির্ব্বাণান্তে শূন্যে শূন্য হইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের মতে এই শূন্য ব্যতিরেকে আর যাহা কিছু আছে, তাহা সবই—

"মায়া-মরীচি-স্বপ্নাভং জলেন্দু-প্রতিনাদবং"

"মায়া বা মরীচিকার ন্যায়, তাহা স্বপ্নের ন্যায়, জলচন্দ্রের ন্যায়, অথবা প্রতিধ্বনির ন্যায় প্রতীয়মান হয়।" পূর্ব্বেও সূচিত হইয়াছে যে, বৌদ্ধধর্ম্মে প্রকৃতিপুরুষের সংযোগে সৃষ্টি বা সংসারের কোন কথা লক্ষিত হয় না। স্নেহ বা তৈলের অভাবে প্রদীপ নিবিয়া গেলে, তাহা যেমন অন্তরীক্ষ বা অবনী বা অন্য কোন দিগ্‌বিদিকে গমন করে না, সেইরূপ কর্ম্মজনিত ক্লেশক্ষয়ে পঞ্চস্কন্ধাত্মক (নাম-রূপী) পুদ্‌গলও কেবল শান্তিই লাভ করে এবং তাহার অস্তিত্ব পূর্ণভাবে লোপ পাইয়া যায় মাত্র। পরবর্ত্তীকালে আচার্য্য নাগার্জ্জুন রচিত চতুঃস্তব পাঠেও জানা যায় যে, এই শূন্যতার উপলব্ধিরই নামান্তর পরমার্থ। এই অবস্থায় বোদ্ধা ও বোদ্ধব্যের কোন ভেদ থাকে না, এমন কি সংসারের অপকর্ষদ্বারা নির্ব্বাণলাভের কোন কথাই খাটে না, সংসার ও নির্ব্বাণ এই দ্বন্দ্বটি পর্য্যন্ত অভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। বেদান্তের ব্রহ্মের ন্যায়, কেবল লোকানুবৃত্তি ও লোকানুকম্পার জন্যই শূন্যতার লৌকিকী ক্রিয়া ও "কর্ম্মপ্রবৃত্তি" প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

কোন বস্তুর নাশ না হইলে, তাহা হইতে নূতন জন্ম হয় না। বৌদ্ধদের মতে "বয়ধম্মা সংখারা"—"অনিচ্চা সংখারা"—যাহা-কিছু সংস্কার বা আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক বস্তু (all mental and physical constituents of being) আছে, তাহাই নাশশীল, তাহাই অনিত্য। নাশ ও অনিত্যতা আছে বলিয়া সেগুলিরই পুনরাগমন বা পুনর্জ্জন্ম সম্ভাবিত। এগুলি সবই মৃত্যুর অধীন, কেবল ব্যতিক্রম কর্ম্মের বেলায়। বৌদ্ধ-মতে কর্ম্মের উপর মৃত্যুর হাত নাই। মরণের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চস্কন্ধের পরস্পর বিয়োগ ঘটিলেও কর্ম্মফলে সেগুলির পুনঃ-সংযোগের সম্ভাবনা থাকে। নূতন পুদ্‌গলে যেন পূর্ব্বের কর্ম্মেরই সংযোগ বা আবর্ত্তন (transfer) ঘটিয়া থাকে। নূতন সৃষ্ট ব্যক্তির পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান আবৃত থাকে মাত্র, কিন্তু তিনি পূর্ব্বজন্মের ব্যক্তিরই প্রবাহস্বরূপ। বৌদ্ধগণ এই স্থলে এরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, যেমন—এক প্রদীপ হইতে জ্বালিত অন্য প্রদীপ, এবং শেষোক্ত প্রদীপ হইতে জ্বালিত অপর এক প্রদীপ এবং তাহা হইতে জ্বালিত আর একটি ইত্যাদি; এবং এক আম্রবীজ হইতে নূতন বৃক্ষ এবং তৎফলের বীজ হইতে অপর বৃক্ষ ইত্যাদি।

'মিলিন্দ-পঞ্‌হে' পাঠ করা যায় যে, রাজা মিলিন্দ স্থবির নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ভন্তে নাগসেন, যো উপ্পজ্জতি সো এব সো, উদাহু অঞ্‌ঞোতি"?—ভদন্ত নাগসেন, যিনি উৎপন্ন হন, তিনি কি তিনি (অর্থাৎ পূর্ব্বেকার তিনি) অথবা অন্য কেহ? স্থবিরের উত্তর হইল—"ন চ সো, ন চ অঞ্‌ঞোতি"—তিনিও নহেন, অন্যও নহেন। রাজা মিলিন্দ নাগসেনকে কথাটি উপমাদ্বারা বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করায়, নাগসেন 'রাজন্, শিশু অবস্থার তুমি এবং যুবক অবস্থার তুমিই যে বৃদ্ধ অবস্থার তুমিই রহ, না—ও তুমি রহ; প্রথম প্রহরের প্রদীপ যেমন মধ্যম ও পশ্চিম বা শেষ প্রহরের প্রদীপও রহে, না-ও তাহা রহে; দুগ্ধ যেমন দধি, নবনীত ও ঘৃতও রহে, না-ও তৎসমুদয় রহে' ইত্যাদি রূপ দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, যিনি উৎপন্ন হন, তিনি তিনিও নহেন, অন্যও নহেন। দেখা যাইতেছে যে, যাহা ধর্ম্মসন্ততি বা বস্তুর ধর্ম্মপ্রবাহ তাহাই বস্তুতে সম্মিলিত হয়। যাহার নিরোধ ঘটে তাহারই ঠিক উৎপত্তি হয় না, কিন্তু নিরুধ্যমানের ধর্ম্মপ্রবাহ উৎপদ্যমান বস্তুতে সংক্রান্ত হয় মাত্র।

নিজের পুনর্জ্জন্ম আর হইবে কি-না, মানুষ তাহা কিরূপে জানিতে পারে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে নাগসেন রাজা

মিলিন্দকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, "যো হেতু যো পচ্চয়ো পটিসন্দহনায়, তস্স হেতুস্স তস্স পচ্চয়স্স উপরমো জানাতি সো—ন পটিসন্দহিস্সামীতি।"—পুনর্জ্জন্মের যাহা হেতু, যাহা কারণ তাহার উপরমের দ্বারাই সে জানিতে পারিবে যে, আর তাহার পুনর্জ্জন্ম হইবে না। জন্মান্তরপরিগ্রাহী পুদ্‌গলে কি প্রকারে পূর্ব্বজন্মের পাপকর্ম্ম সংক্রান্ত হয়, তৎপ্রসঙ্গে সেই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, "কোন ব্যক্তি মরণ পর্য্যন্ত যেমন একপ্রকার নামরূপ, আবার তাহার পুনর্জ্জন্ম হইলে তিনি অন্য প্রকার নামরূপ। তথাপি পরবর্ত্তী নামরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী নামরূপ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য সে পাপকর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবে না।" আরও উক্ত হইয়াছে—"প্রথম নামরূপ যে পাপ পুণ্য কর্ম্ম আচরণ করে, তৎফলে পুনর্জ্জন্মে পরবর্ত্তী নামরূপও সেই কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয় না।"

বৌদ্ধদর্শনে কর্ম্মই যেন একমাত্র সত্য পদার্থ, ইহাই ছায়ার মত সর্ব্বদা জীবের অনুসরণ করিয়া থাকে। কর্ম্মবন্ধনই পুদ্‌গলের স্কন্ধপঞ্চককে আটকাইয়া রাখিয়াছে—এই কর্ম্মফল-বশতঃ স্কন্ধসমষ্টিরূপী পুদ্‌গলের সংসৃতি বা পুনঃ পুনঃ জন্ম। এই জীবনপরম্পরায় জীব একও নয়, ভিন্ন নয়। হিন্দুদর্শনে জীব শরীরী ও ক্ষেত্রজ্ঞ নামেও পরিচিত—এবং সেই দর্শনের উপদেশ এই যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবের পঞ্চভূতাত্মক (ষাট্‌কৌশিক) শরীর বা ক্ষেত্র পরিত্যক্ত হইলে, জীব বা পুরুষ আমোক্ষস্থায়ী লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর লইয়া সংসৃতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। বৌদ্ধমতে যখন জীব বা পুদ্‌গল পঞ্চস্কন্ধাত্মক সমষ্টিবিশেষ, তখন ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। তাই ইহা বড় কঠিন কথা, কেমন করিয়া পুদ্‌গলের যোনিভ্রমণ সম্ভাবিত হয়। দৃশ্যতঃ অনাত্মবাদী বুদ্ধদেব পাপ ও পুণ্যের ফলে সুখদুঃখভোগী জীবের জীবনসমস্যার মীমাংসা করিতে উদ্যত হইয়া কর্ম্মফলের বলবত্তা সম্বন্ধে এক অভিনব বিচারের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কর্ম্মের আদি নাই—কিন্তু ইহার অন্ত হইতে পারে। আষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুসরণ করিয়া কর্ম্মফল নষ্ট করিতে পারিলে পুদ্‌গলের নিরুপাধি নির্ব্বাণ লাভ হয়। এই দর্শনে আমার আমিত্ব, তোমার তুমিত্ব ও তাহার তত্ত্ব কিছুই স্বীকৃত নাই। অথচ কোন্ অজ্ঞাত বা বা অজ্ঞেয় নিয়মানুসারে কর্ম্মফল আমাকে তোমাকে ও তাহাকে পঞ্চস্কন্ধাত্মক শরীরধারী করিয়া পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিতে পারে, এবং এইভাবে জীবনপ্রবাহও আমোক্ষ চলিতে থাকে? বৌদ্ধগণের উত্তর এই হইবে যে, পুদ্‌গলের সমস্ত উপাদান নষ্ট হইয়া গেলেও তাহার কর্ম্মফল (হিন্দুর আত্মার মত?) অবিনাশী এবং বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় সেই কর্ম্মশক্তি পুদ্‌গলের বিশ্লেষিত স্কন্ধগুলিকে পুনঃ সংযোজিত করিয়া নব নব সৃষ্টিসাধনে সমর্থ হয়। ইহাই সংসৃতির অখণ্ড্য নিয়ম। প্রকৃতির বশে পড়িয়া কর্ম্মকারী কোন পুরুষের বা 'নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ' আত্মার স্বাধীন বা স্বতন্ত্র অস্তিত্বস্বীকারের কোন প্রয়োজন বুদ্ধদেব অনুভব করেন নাই।

তবে মোটামুটি এই মনে হয় যে, বৌদ্ধের 'শূন্য', বৈদান্তিকের 'ব্রহ্ম', সাংখ্য ও পাতঞ্জলের 'পুরুষ' ও 'ঈশ্বর' এবং প্রথমের প্রতীত্য-সমুৎপাদ জন্য 'স্কন্ধপ্রপঞ্চ', দ্বিতীয়ের 'মায়া' ও তৃতীয়ের 'প্রধান' বা 'প্রকৃতি' প্রায় পরস্পর সমস্থানীয়।

ললিতবিস্তরের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি—

> "চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশ-ব্যাধি-প্রপীড়িতে।
> বৈদ্যরাট্ ত্বং সমুৎপন্নঃ সর্ব্বব্যাধিপ্রমোচকঃ॥"

"হে বুদ্ধদেব, ক্লেশরূপ ব্যাধিদ্বারা প্রপীড়িত হইয়া বহুকাল জীবলোক আতুর অবস্থায় পতিত রহিয়াছিল, তুমিই সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির প্রমোচনকারিরূপে বৈদ্যরাজ হইয়া সমুৎপন্ন হইয়াছিলে।"

আচার্য্য নন্দলাল বসু ও তাঁহার চিত্রকলা

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

মনে পড়িতেছে অনেক বছর আগে কোন একটা বাংলা দৈনিক কাগজে এক ব্যঙ্গচিত্র ও ব্যঙ্গকবিতা দেখিয়াছিলাম; বিষয় ছিল "রাজ্ঞী পক্ষী নিরীক্ষণ করিতেছেন"। মনে পড়িতেছে কবিতাটা যেন এরূপ—

"রংবেরঙের অগ্নিকণা
হাত দুটো ঠিক সাপের ফণা
মৎস্যকন্যা কিম্বা নারী
সেইটি বোঝা শক্ত ভারি।"

সে দিন বোধ হয় আজ চলিয়া গিয়াছে। রাস্তায় যখন বাহির হই, চারিদিকে দেখি দেওয়ালে পোষ্টার; সাবান, এসেন্স, তেলের বিজ্ঞাপন। মাসিকপত্রে নানা চিত্র—সবটাতেই "তথাকথিত" ভারতীয় শিল্প ঢুকিয়া বসিয়াছে। "তথাকথিত" বলিলাম, কেন-না ভারতীয় শিল্পের রূপ সম্বন্ধে নানা আলোচনা চলিতে পারে। সরিষাপড়া দিয়া ভূত তাড়ান হয়, কিন্তু সরিষার ভিতর যদি ভূত ঢুকিয়া বসে, তবে ভূত তাড়াইবার উপায় কি? আমার এই উক্তি একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিই।

বোম্বে স্কুল অব আর্ট নিজের স্বাতন্ত্র্যে চলে; বাংলার নয়া পদ্ধতির অনুসরণ করে না। কিন্তু সেখানকার শিল্পীরাও বলিয়া থাকেন যে তাঁহারাও ভারতীয় শিল্পের "রেনেসাঁ" বা পুনরভ্যুদয় সংঘটন করিতেছেন। ১৯২৯ সনে বোম্বে স্কুল অব্ আর্ট পরিদর্শন করি। তথায় ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের কয়েকটি সিম্বলিক্যাল চিত্র দেখি—তাহার একটি গুপ্ত-যুগের চিত্র। একটি মেয়ে সোজা দাঁড়াইয়া, গ্রীক মূর্ত্তির ন্যায় নিখুঁত গড়ন, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদ অজন্টার মত, পিছনে আবার পরীর মত ডানা আছে। অজন্টার পোষাক থাকা সত্ত্বেও ছবিখানি গুপ্ত-যুগ অপেক্ষা বিলাতের ভিক্টোরিয়া যুগের "প্রির‍্যাফেলাইট" আর্টিষ্ট—রসেটি, ওয়াটস, বা বার্ণ জোন্স্ প্রমুখ শিল্পীদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। ছবিখানির সবই বুঝিলাম, য্যানাটমি ঠিক হইয়াছে, কোনো চিত্রপরিচয়ের দরকার নাই; কিন্তু অজন্টার পোষাকটা যেন বিসদৃশ লাগে—এ যেন সরিষায় ভিতর ভূতের প্রবেশ।

গুপ্ত-যুগের আবহাওয়া যদি সত্যই আনিতে হয়, তবে কিরূপ মূর্ত্তি হইবে?

"মুখে তার লোধ রেণু লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবিবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।"

অথবা

"কার্য্যা সৈকতলীন হংসমিথুনা স্রোতবহামালিনী
পাদাস্তমণ্ডিতো নিষণ্ণহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ
শাখালম্বিত বল্কলস্য চ তয়ো নির্ম্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডুয়মানাং মৃগীম্।"

এবং

কৃতং ন কর্ণাপিত বন্ধনং সখে শিরীষমাগণ্ড বিলম্বী কেশরম্
নবা শরচ্চন্দ্র মরীচি কোমলং মৃণালসূত্রং রচিতং স্তনান্তরে
(শকুন্তলা)

গুপ্ত-যুগের আদর্শ চিত্র করিতে গিয়া বোম্বাইয়ের শিল্পী অজন্টার আভরণখানি লইয়াছেন, তার স্পিরিট বা প্রাণ ধরিতে পারেন নাই। শিল্পের সেই প্রাণ কোথায়? বিশেষ ধরণে কাপড়-পরানোতে এবং অলঙ্কারে? শিল্পের এই প্রাণটুকু ধরিতে পারিলে শিল্পের ভাষা বোঝা হইল।

বাংলায় যে ভারতীয় শিল্পের পুনরভ্যুদয়, তার উৎপত্তি ক্লাসিক্স্ হইতে। ক্লাসিকাল ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্য হইতে তাহার প্রেরণা। কিন্তু যদি কেহ শুধু ক্লাসিক্স্ লইয়া থাকে, তার মন পঙ্গু হইয়া যাইতে পারে। নন্দলালের কাজে ক্লাসিকাল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্লাসিকাল ভারতকে তিনি তাঁর শিল্পে যেমন ব্যক্ত করিয়াছেন, অন্য কেহই তেমনটি করেন নাই। তাহা সত্ত্বেও নন্দলাল ক্লাসিকস-এ বদ্ধ হইয়া থাকেন নাই, প্রকৃতি বা বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করেন নাই।

তাম্রাভ বালুকার উপরে গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরের রৌদ্র, তার মধ্যে তালপাতার ক্ষুদ্র এক সবুজ শীষ মাথা তুলিয়াছে, যেন মরকত মনি জ্বলিতেছে। আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁর এক ছাত্রকে বলিতেছেন, "দেখ, তালপাতার সবুজ পাতাটুকু যেন আগুনের ফুলকি, এ যদি আঁকা যায় এরই দাম হবে লাখ টাকা; এ ছবি কম কি? বুদ্ধ কি শিবের ছবি থেকে এ কম হবে কেন?"

এ যেন ক্লাসিকাল নন্দলাল হইতে পৃথক্ আর এক শিল্পীর উক্তি।

আমাদের জাতীয় কৃষ্টির পরিপূরণের পক্ষে নন্দলালের কাজ কম নয়। বর্ত্তমানে শিল্পজগতে ভারতের প্রতিনিধি যদি কেহ থাকে, তবে নন্দলালই হইতে পারেন। কি চিত্রশিল্পে কি মণ্ডনশিল্পে, তাঁর স্বাতন্ত্র্য সবটার ভিতরেই আছে। বাংলার থিয়েটারে নূতন রূপসজ্জায় তাঁর কাজই কি কম? রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী', 'তপতী', 'নটীর পূজা', 'শাপমোচন', 'তাসের দেশ' প্রভৃতি নূতন ধরণের নাটিকা বাংলার নাট্যজগতে নূতন রূপলোকের সন্ধান দিয়াছে। তার সাজসজ্জা পরিকল্পনা জোগাইয়াছে কে? নন্দলালের মত শিল্পীর হাত না পড়িলে রবীন্দ্রনাথের নাটিকার অর্দ্ধেকই মারা যাইত।

শুধু বড় চিত্রে বা মাষ্টারপীসে নয়, পেন্সিল ড্রয়িং ও স্কেচেও তাঁর প্রতিভার ছাপ পড়ে। অটোগ্রাফের অর্থাৎ নানা জনের নামস্বাক্ষরের বহিতে তিনি যে-সব ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন, সৃজনী শক্তির পরিচয় তাহাতে কম পাওয়া যায় না। এ-সব কাজ কেবল তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। তাঁহার সম্মুখে অটোগ্রাফের খাতাখানা ধরিলে নিমেষে আঁকিয়া দেন—অনন্ত আকাশে উড্ডীয়মান বলাকাশ্রেণী, পদ্মানদীর বালুর চর, পাল-তোলা নৌকা, হাঁস, মুরগী, কুকুর ছানাকে স্তন্যদান করিতেছে, এক টুক্‌রা পাথরকে ঘিরিয়া বর্ষার জলধারা চলিতেছে, কেয়া ফুল ফুটিয়াছে, পলাশ গাছে রঙের উৎসব, বাছুর লাফাইয়া লাফাইয়া চলিয়াছে, হরিণের দল দৌড়াইতেছে, এমন কত কি!

তিনি যখন ভ্রমণে বাহির হন সঙ্গে থাকে একতাড়া সাদা কার্ড, তাতে কত রকমের স্কেচের সংগ্রহ। এগুলি অনেক সময় আঁকা হয় খেলাচ্ছলে। শিল্পামোদীর কাছে যে এতে কেবল রেখার দৃঢ়তা, পেন্সিল তুলি চালাইবার অপূর্ব্ব ক্ষমতা প্রকাশ পায় তাহা নহে - অনেক সময় ইহার ভিতর পাওয়া যায় শিল্পীর একটি প্রচ্ছন্ন হিউমার বা অনাবিল হাস্যরস।

তিনি অন্য আর্টিষ্টদের বা তাঁর ছাত্রদের কাছে যখন চিঠি লেখেন, তার ভিতর লেখা বিশেষ কিছু থাকে না, ছবি আঁকা থাকে। শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের মেলা উপলক্ষ্যে সাদা কার্ডে ছবি আঁকা হয়, মেলায় নামমাত্র দামে এগুলি বিক্রী হয়। নববর্ষ বা অন্য কোন সময়ে শুভ ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে এগুলির ব্যবহার হয়। নন্দলালের স্কেচ (নক্‌শা) ও পোষ্ট কার্ডের ছবি জাপানের বিখ্যাত আর্টিষ্ট হোকুসাইর কাজকে স্মরণ করাইয়া দিবে। দুই শিল্পীর যেন এ-বিষয়ে খুবই নিকট সম্বন্ধ। জাপানীরা নববর্ষে ছোট ছোট ছবি পাঠাইয়া বন্ধু ও আত্মীয়দের কাছে শুভ ইচ্ছা জানাইয়া থাকে। এ-সব ছবিকে জাপানীরা বলে সুরিমোনো (Surimono) হোকুসাইর ডিজাইন (এগুলি হইত রঙীন উডকাটের ছবি) করা। সুরিমোনো জাপানীদের কাছে খুব আদৃত ছিল, এগুলির সহিত শান্তিনিকেতনের ৭ই পৌষের কার্ডের যেন সাদৃশ্য আছে। এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে-আটটি চিত্র দেওয়া গেল, এগুলি ৭ই পৌষের কার্ড। লরেন্স বিনিয়ন যেমন হোকুসাইর ছবি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, সেইরূপ নন্দলালের কার্ডের ছবি সম্বন্ধে বলিতে পারি—"কল্পনা ও মাধুর্য্যে অফুরন্ত; শিল্পীর পরিপক্ক ক্ষমতা ব্যক্ত করে...তাঁর অনুসন্ধিৎসু চক্ষু এবং লিপিকুশল হাতের কাছে প্রকৃতির কিছুই এড়ায় না, প্রকৃতির সকল বস্তু তাঁর গতিমান রেখাপাতে মূর্ত্ত হইয়া উঠে।"

নন্দলালের অটোগ্রাফ এবং অন্যান্য স্কেচ সংগ্রহ করিতে পারিলে ভারতীয় শিল্পের একটি অপূর্ব্ব সামগ্রী হইতে পারে।

বৈষ্ণব গান আছে "কানু ছাড়া গীত নাই।" তিনি তাঁর সৃজনী শক্তিকে "কানুর গীতে" বা কোনো বিশেষ বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তাঁর প্রতিভা "নবনবোন্মেষ-শালিনী বুদ্ধি" শিল্পের বিভিন্ন দিকে প্রকাশিত হইয়াছে। নানা কারুকর্ম্মে তাঁর যত্ন পাওয়া যায়। কারুশিল্পকে তিনি তাঁর চিত্র অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করেন না। একবার এক আমেরিকান আর্টিষ্টের কাছে নন্দলালকে আর্টিষ্ট বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে তিনি উত্তর দেন—"আমি আর্টিষ্ট নই—কারিগর মাত্র।" তখন সেই আমেরিকান বলেন—"তাহলে আমি জানি না যে আমি কি!"

কারুশিল্পের বিভিন্ন বিষয়ে ও ক্ষেত্রে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। বিভিন্ন শিল্পীজনোচিত উপকরণে ব্যঞ্জনা দেওয়ার চেষ্টা—কাগজ, সিল্ক, মাটি, কাঠ, পাথর, রবার প্রভৃতিতে রূপ দেওয়ার চেষ্টা—বিভিন্ন উপকরণে ব্যক্তিত্বের ছাপ ফোটান তাঁর বৈশিষ্ট্য। উডকাট, লিনোকাট, লিথো, বাটিক ওয়ার্ক, ষ্টুকো, টেরাকোটা, মূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রভৃতি সকল কাজই তিনি করিয়াছেন। সকল কাজেই দেখা যায় তাঁর মণ্ডনশিল্পের দক্ষতা। তাঁর চিত্রের ভিতরে আছে আকারগত সৌন্দর্য্য।

তিনি যে কয়টি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া মনে হয় তিনি যদি চিত্রকর না হইয়া ভাস্কর হইতেন তবে একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর বলিয়া পরিচিত হইতেন। গণেশ, নটীর পূজা প্রভৃতি মূর্ত্তিতে তাঁর মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর তুলির টানে যে লিপিকুশলতা বা ক্যালিগ্রাফির পরিচয়, মূর্ত্তি নির্ম্মাণেও সে-রকম, আঙুলের টানে গঠনের (moulding) পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন কালের চিত্রকররা, আমাদের দেশেই হউক বা ইউরোপেই হউক, শুধু চিত্রকর ছিলেন না। তাঁহারা কারিগরও, ছিলেন; তাঁহারা ছিলেন—এনগ্রেভার, স্বর্ণকার, ভাস্কর, স্থপতি ইত্যাদি। বর্ত্তমানে জগতের শিল্পীদেরও ঝোঁক বোধ হয় এদিকে; শিল্পীর পরিকল্পনাকে নানা কারুকর্ম্মে প্রকাশ করা। বাংলার নব্য শিল্পীদের যে আজকাল নানা কারুশিল্পে মনোনিবেশ করিতে দেখা যায়, তার আরম্ভ নন্দলাল হইতে।

বাংলার এই নব্য শিল্পীদের গোড়াপত্তন করিয়াছেন অবনীন্দ্রনাথ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে। অবনীন্দ্রনাথ গোড়ার দিকে লিখিয়াছিলেন "ভারতীয় শিল্প"। তার ভিতর একটা রক্ষণশীলতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। তখন হয়ত এরূপ গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল—নব্য পদ্ধতিকে প্রকাশের জন্য। এখন "ইণ্ডিয়ান আর্ট" এই নামের আওতায় অনেক আগাছা জন্মিতেছে। যে-সব চিত্র বাহির হইতেছে, তাহার ভিতর না-আছে মৌলিকতা, না-আছে রেখা বা বর্ণের সৌন্দর্য্য। তাহার ভিতর কোনো অনুশীলন নাই; অনুসন্ধিৎসা নাই, পর্য্যবেক্ষণ নাই—আছে কেবল ম্যান্যারিজ্‌ম্ বা মুদ্রাদোষ। যে-সব বিষয় লইয়া চিত্র রচনা করা হয়, আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ও চারি দিকের আবেষ্টনের সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই। কল্পনার অসংযত দৌড় তাহাতে খুব বেশী। বর্ত্তমানের অনেক চিত্র বেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। শক্তি কোথায় মিলিবে? প্রকৃতির ভিতরে শক্তি মিলিবে। শিল্পী প্রকৃতির ক্রোড়ে ফিরিয়া গেলেই নবজীবন ও নবচেতনা লাভ করিবে। এই যে প্রকৃতির ভিতর ফিরিয়া যাওয়া—Back to Nature-এর নীতি - এর থেকে উৎপত্তি "রোমান্টিসিজম্।" ইউরোপে উদ্ভূত রেনেসাঁর শিল্প ক্রমশঃ বহু বিদ্যায় ভারাক্রান্ত প্রাণহীন ইন্টেলেক্‌চুয়ালিজম্ দ্বারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রকৃতির ভিতরে শিল্পীরা পাইল সহজ সরল মুক্তির আস্বাদ।

কুকুরছানা

অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পে যদি রেনেসাঁ আনিয়া থাকেন, তবে নন্দলাল আনিয়াছেন রোমান্টিসিজম্। নৈসর্গিক যে-সব চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন বা স্কেচ করিয়াছেন, তাহাতে তাহার উদাহরণ মিলিবে। এ-বিষয়ে একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ "প্রত্যাবর্ত্তন" নামে একটি বড় পেন্সিল ড্রয়িঙের চিত্র। সাঁওতাল পুরুষ বহুদিন পরে প্রবাস হইতে ফিরিয়াছে, দরজায় দাঁড়াইয়া স্ত্রী, বিস্ময়বিমুগ্ধ, আনন্দের আতিশয্যে বাক্য আর সরে না। রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে এর নীচে নিজের গান লিখিয়া দিয়াছেন —"ফিরে চল মাটির টানে।" সমস্ত ছবির সুর যেন এই গানের ভিতর পাওয়া যায়, আর রোমান্টিসিজমের উদ্দেশ্যই এই—"ফিরে চল মাটির টানে" Back to Nature—শিল্পের বন্ধনমুক্তি হইবে মুক্ত আকাশে, প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে।

"ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি" সৃষ্টি করিয়াছেন অবনীন্দ্রনাথ, তাকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন নন্দলাল। এ-সময়ে নন্দলালের সম্বন্ধে যে আলোচনা হওয়া উচিত তা বলাই বাহুল্য।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে খড়্গপুরে নন্দলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন সেখানে দ্বারভাঙ্গা ষ্টেটের ম্যানেজার। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা হয় খড়গপুরের মিডল ভার্নাকুলার স্কুলে। পনের বছর অবধি এখানে কাটে; হিন্দী ভাষাতেই

বানরওয়ালা

শিক্ষা পাইয়া থাকেন। এই স্কুল হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় ক্ষুদিরাম বোসের স্কুলে (সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল) ভর্ত্তি হন—এখানে কুড়ি বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একুশ বছরে তাঁর বিবাহ হয়।

ইহার পর তিনি আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হইবেন স্থির করিলেন, কিন্তু অভিভাবকদের অনুমতি মিলিল না, তাঁহাকে বি-এ পাস করিতে হইবে। তিনি জেনেরাল এ্যাসেম্‌ব্লীতে এফ-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইলেন। এফ-এ ফেল করিয়া মেট্রোপলিটন কলেজে (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্ত্তি হইলেন, এখানেও এফ-এ ফেল করিলেন। দাদাশ্বশুর মশায় ছিলেন অভিভাবক, তিনি বেলগাছিয়ার আর. জি. করের মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইতে বলিলেন। নন্দলালের মেডিক্যাল কলেজ ভাল লাগিল না। প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন কমার্শ্যাল (বাণিজ্য-বিষয়ক) ক্লাস ছিল, মিঃ চ্যাপম্যান ছিলেন তার প্রিন্সিপাল; তিনি সেখানে ভর্ত্তি হইলেন। ছয় মাস ছিলেন সেখানে—কিন্তু পড়াশুনা কিছুই করেন নাই, বইও কেনা হয় নাই, ছয় মাসের মাহিনাও দেওয়া হয় নাই। তখন ভর্ত্তির ফি দিলেই কলেজে প্রবেশ করা যাইত। তিনি মাহিনার টাকা দিয়া হ্যারিসন রোডের মোড়ে পুরাতন বইয়ের দোকান হইতে ছবির ম্যাগাজিন কিনিতেন।

সাঁওতাল-জননী

কমার্শ্যাল ক্লাসে যখন কিছু হইল না, দাদাশ্বশুর মশায়কে বার দফা দিয়া এক চিঠি লিখিলেন—(১) কমার্শ্যাল ক্লাস ভাল লাগে না; (২) ক্লার্ক হইলে বড়-জোর ষাট টাকা রোজগার করিবেন, কিন্তু আর্টের লাইনে গেলে এক শত টাকা মাসে
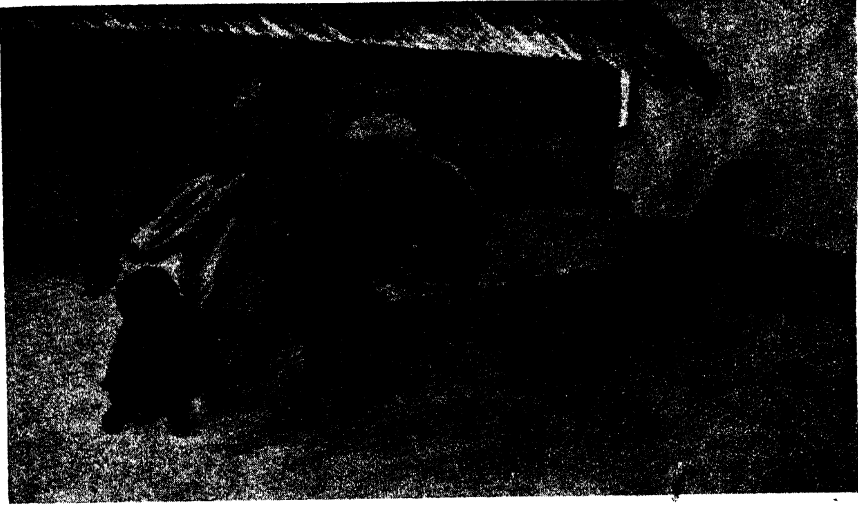
চিত্রকর

নিশ্চয়ই রোজগার হইবে ইত্যাদি। আর্টস্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার অনুমতি আসিল। কিন্তু এর আগেই তিনি আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথের চিত্র 'বুদ্ধ ও সুজাতা' এবং 'বজ্র মুকুট' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। এই চিত্র দেখিয়া এণ্ট্রান্স পাস করার পরই তিনি স্থির করিয়াছিলেন অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য হইবেন। একদিন তিনি অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন; সঙ্গে ছিল নিজের আঁকা কয়েকখানা চিত্র—রাফায়েলের মেডোনার নকল, সস্ পেণ্টিং, গ্রীক মূর্ত্তির নকল, still life painting ও কাদম্বরীর চিত্র। অবনীন্দ্রনাথ চিত্র দেখিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"ইস্কুল পালিয়ে আসা হয়েচে?" উত্তর, "না, এণ্ট্রান্স পাস ক'রে এসেচি।" "বিশ্বাস হয় না, সার্টিফিকেট দেখতে চাই।" নন্দলাল সার্টিফিকেট দেখাইয়া ভর্ত্তি হন।

আর্ট-স্কুলে অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন; হ্যাভেল নন্দলালের চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হন। ঈশ্বরীবাবুর নিকট ডিজাইনের ক্লাসে নন্দলাল ভর্ত্তি হইলেন। তিনিই ডিজাইনের ক্লাসে প্রথম ছাত্র। তখন এই বিভাগের ছাত্রেরা stained glass stencilling ও jesso work করিত। নন্দলাল কতক সময় করিতেন ডিজাইন, কতক সময় কারিগরের কাজ—কাঁচ কাটা ইত্যাদি।

ভর্ত্তির সময় ঈশ্বরীবাবু পরীক্ষা করিলেন, গণেশ আঁকিতে দিলেন; নন্দলালের কাজ দেখিয়া অবনীন্দ্রনাথ বলিলেন, "হাত পোক্ত হ্যায়।" হরিনারায়ণবাবুর কাছে মডেল ড্রয়িঙের পরীক্ষা হইল। টেবিলের উপর কুঁজা, বাটি সাজান। হরিনারায়ণ বাবু ঘড়ি ধরিয়া বলিলেন, "সব পনের মিনিটের মধ্যে আঁকতে হবে।" নন্দলাল দুই ইঞ্চি জায়গার ভিতর সব আঁকিয়া দিলেন পাঁচ মিনিটের ভিতর। হরিনারায়ণবাবু বলিলেন, "ওঃ, তুমি ফাঁকি দিয়েছ, ও-সব হবে না।" অবনীন্দ্রনাথ বলিলেন, "ঠিক হয়েছে—সবই তো আছে।"

ভবিষ্যতের "ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির" বীজ উপ্ত হইল, একা নন্দলালকে লইয়া কাজ আরম্ভ হইল।

বাল্যে নন্দলালের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল মূর্ত্তি-নির্ম্মাতা রূপে। খড়্গপুরে থাকিতে তিনি কুম্ভকারের কাজ দেখিয়া মৃণ্ময়-শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন। চিত্রাঙ্কনের পূর্ব্বে তাঁহার মূর্ত্তিনির্ম্মাণ শিক্ষা আরম্ভ হয়। কলিকাতায় আসিয়া

স্কুলে পড়িবার সময় তিনি ড্রয়িং ক্লাসেই সর্ব্বপ্রথম ছবি আঁকিবার উৎসাহ পান। কলেজে ভর্ত্তি হইলে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের যে কবিতার বই পড়ানো হইত তাহার পাতার দুই পাশে বর্ণনীয় বিষয়ের ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন।

নন্দলাল আর্ট-স্কুলে পাঁচ বছর ছিলেন, সেখানে মাহিনা

হরিণ

দিতে হইত না। বছর দুই পরে বার-তের টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতে থাকেন।

ক্লাসে সর্ব্বপ্রথম তিনি যে চিত্র অঙ্কিত করেন তাহার বিষয়—বুদ্ধ হাঁস কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি হাঁসের পা আঁকিয়াছিলেন গোল, অবনীন্দ্রনাথ শুদ্ধ করিয়া দেন। হ্যাভেল সাহেব এই ছবি দেখিয়া খুব খুশী হন, আর বলেন, "বেশ হয়েছে, বেশ অর্ণামেণ্টাল ছবি।" নন্দলালের আর্টস্কুলে আসার আট-দশ মাস পরে হ্যাভেল সাহেবের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়। তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে অবনীন্দ্রনাথ চার বছর অস্থায়ীভাবে প্রিন্সিপ্যালের কাজ করেন। বাঙালীকে এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করা তখন সরকারের নীতিবিরুদ্ধ ছিল।

অবনীন্দ্রনাথ স্কুলে বসিয়া নিজে ছবি আঁকিতেন, তাহাতে ছেলেদের ভাল শিক্ষা হইত। তাঁহার প্রথম ছবি "বঙ্গমাতা" বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে আঁকা স্বদেশী ভাবের ছবি।

আর্ট-স্কুলে আঁকা নন্দলালের ছবি সতী, শিবসতী, কর্ণ, তাণ্ডবনৃত্য, বেতালপঞ্চবিংশতি, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয় ইত্যাদি।

মোগল চিত্র সকল এখন যাদুঘরে থাকে, আগে এগুলি ডিজাইনের ক্লাসে টাঙান থাকিত। এই ছবির চার পাঁচখানা নন্দলাল নকল করেন। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের প্রদর্শনীতে শিবসতী চিত্রের জন্য তিনি পাঁচ শত টাকা পুরস্কার পান। এই টাকায় তিনি মথুরা অবধি ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

যখন আর্ট-স্কুল ত্যাগ করেন, তখন পার্সি ব্রাউন সাহেব স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। তিনি বলিলেন, "এখানেই কাজ কর, এখানে জায়গা পাবে।" অবনীন্দ্রনাথও ডাকিলেন তাঁর বাড়িতে থাকিয়া কাজ করার জন্য। নন্দলাল ব্রাউন সাহেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অবনীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণই গ্রহণ করিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁহাকে ষাট টাকা করিয়া একটা বৃত্তি প্রায় তিন বছর দিয়াছিলেন। এ সময়ে নন্দলাল নিবেদিতার *Indian Myths of Hindoos and Buddhists* পুস্তকের চিত্র আঁকেন। ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামী আসিয়া অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের সংগ্রহে যে প্রাচীন চিত্র আছে তাহার তালিকা করিতে নন্দলাল সাহায্য করেন।

ছাগলছানা

বিলাত হইতে লেডী হেরিংহ্যাম্ আসেন অজন্টার প্রতিলিপি লওয়ার জন্য। নন্দলাল এবং অসিতকুমার হালদারকে অবনীন্দ্রনাথ অজন্টায় পাঠান, পরে আসিয়া জুটিলেন ভেঙ্কট আপ্পা এবং সমর গুপ্ত।

অজন্টার এই অভিযান নূতন পদ্ধতিকে একটা সুনির্দ্দিষ্ট পথ দিয়াছে।

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যমণ্ডলী শিল্পীদের একটা উপনিবেশ স্থাপন করার জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন। বাড়িও একটা দেখা হইয়াছিল। এমন সময় রবীন্দ্রনাথের ডাক পড়িল। ১৯১৬ সনে কবি জোড়াসাঁকোর নিজ বাড়িতে "বিচিত্রা" স্থাপন করেন। শিল্প কারুকর্ম্ম প্রভৃতির সৌকর্য্যার্থ এই

গরু

"বিচিত্রা" মণ্ডলীর উদ্বোধন। নন্দলাল, অসিতকুমার হালদার, মুকুল দে ও সুরেন্দ্রনাথ কর বিচিত্রার শিল্পী নিযুক্ত হইলেন। সকলের ষাট টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মুকুল দে তখন আমেরিকা জাপান ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

জাপানের খ্যাতনামা শিল্পী আরাই সান এ-সময়ে কলিকাতায় আসেন। তিনি বিচিত্রার অতিথি ছিলেন।

বিচিত্রা উঠিয়া যাইবার পর নন্দলাল শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী প্রতিমা দেবীর শিক্ষকতার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এর পরে তিনি নিজের দেশে হাওড়া জেলায় রাজগঞ্জ গ্রামে অবস্থান করেন। এ-সময়ে আঁকেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বাড়ির জন্য মহাভারতের চিত্র ও তাঁর ল্যাবরেটরীর চিত্র। দেশেঅবস্থানকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। বিশ্বভারতী স্থাপিত হইলে নন্দলাল কলাভবনের অধ্যক্ষ হইয়া আসেন—

শান্তিনিকেতনের গল্পকথক

পূর্ব্বে কিছুদিন কলিকাতায় ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির অধ্যক্ষ ছিলেন।

শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে নন্দলালের জীবনের এবং কর্ম্মধারার এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। শিল্পী-জীবনের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে তাঁহার মানবতা ও আদর্শবাদ। তাঁর ত্যাগ ও জীবনের সাধনাকে অবলম্বন করিয়া শিল্পের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

অর্থলিপ্সা তাঁহাকে সাধনা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে

নাই; বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শিল্পসৃষ্টি করিয়া তিনি শিল্পকে সস্তা ও খেলো করেন নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ যেমন শিল্পের নূতন ধারার, নূতন অভিব্যক্তির প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার শিল্পেও তেমনি নূতনের অভিব্যক্তি আছে। তাঁহার শিল্পে ভারতের শিল্পযুগের নূতন অধ্যায় সূচিত হইবে। তিনি "সিদ্ধ শিল্পী"।

নন্দলালের অসামান্য প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া বাংলার নানা জেলা হইতে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে, অন্ধ্র, তামিল, মালাবারী, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, রাজপুত ছাত্র আসিয়াছে। এমন কি সুদূর সীমান্ত-প্রদেশ, সিংহল ও জাভা হইতেও ছাত্র আসিয়াছে।

নন্দলালের বহুমুখী প্রতিভা শুধু শিল্পসৃষ্টিতে নিঃশেষিত হয় নাই, তিনি শিল্পীও সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা স্বীকার করিবে।

একটি মেয়ে

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

"হচ্চে কি?"

প্রশ্ন থেকেই বুঝতে পারছেন, যিনি প্রশ্নকর্ত্রী তিনি হচ্চেন শাস্ত্রমতে আমার হৃদয়-মনের অধীশ্বরী আর লোকমতে আমি তাঁর খুঁটিতে বাঁধা, একান্ত তাঁরই বলে ছাপমারা একটি বুদ্ধিহীন জীববিশেষ।

স্থানটি হচ্চে ছাদের ঘর। একটা টেবিল—তার ওপর কাগজ ছড়ানো, এক দিকে একটা দোয়াত আর এক দিকে একটা কলম। আমার সামনেই খোলা জানলা এবং জানলার ঠিক পাশেই একটা আয়না। আয়নার ওপর একটু চোখ ঘুরিয়ে নিলেই দেখা যাবে, আমার পিছনে দাঁড়িয়ে শাড়ীবেষ্টিত একটি নারীমূর্ত্তি এবং তাঁর চোখের কোণে অর্থাৎ অপাঙ্গে একটু বক্ররেখা।

"দেখতেই পাচ্চ।"

বেশ সহজ ও মোলায়েম কণ্ঠস্বরে প্রত্যেক বর্ণটি স্পষ্ট ক'রে উচ্চারিত উত্তর।

আয়নায় দেখা গেল, রেখার বঙ্কিমতা বেড়েচে, আশেপাশে সঙ্গী দেখা দিয়েচে।

"ব'সে ব'সে কুঁড়েমি ক'রে সময় কাটাতে লজ্জা করে না?"

"উপায় কি?"

"বলতে লজ্জা করল না? রোজ খানিকক্ষণ ক'রে ছেলেমেয়েদের ধরলেও ত সংসারের একটু আয় দেখে—"

তারপরেই যে আওয়াজটা সহসা খর হতেই ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল তার নাম দেওয়া যেতে পারে স-রাগে স-শব্দে দ্রুত প্রস্থান।

প্রিয়া দিয়ে গেলেন একটা আর্থিক তত্ত্ব। টাকা আনা পাইয়ের হিসাব ক'ষে এর ওপর একটা বড় প্রবন্ধ লেখা চলে। আমার মত নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তির তাই কর্ত্তব্য এবং তারপর তার জন্যে অনুশোচনা করা। কিন্তু সামনের এই জানলা দিয়ে দেখা যাচ্চে গাঢ় নীল রঙের একটুখানি আকাশ আর তারই এক কোণায় একটি ছোট্ট নক্ষত্র, সন্ধ্যার আভাসে অস্পষ্টভাবে ঝিক্‌মিক্ করা সুরু করেচে। অর্থশাস্ত্রের কেতাবে নক্ষত্রদের কোনো কথাই লেখা নেই।

তাই ভাবচি—কাগজ, কলম, দোয়াতও সামনে হাজির—

হঠাৎ দেখা গেল, মনটা হয়ে উঠেচে রূপকথার সেই অতি বৃহৎ পাখীটির মত, আকাশের বুকে বিশাল পক্ষপুট বিস্তার ক'রে উড়ে চলেচে ওই নক্ষত্রলোকটি লক্ষ্য ক'রে। পৃথিবীর লতা পাতা গাছ, ঘর বাড়ি ছাদ, মানুষ পশু পাখী, তাদের অসংখ্য বিচিত্র কলকাকলি—সবই একে একে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাচ্চে। তারপর নক্ষত্রলোক পৌঁছে ডানা গুটিয়ে স্থির হয়ে বসল ওর ছাদে। বসে বসে সস্নেহে নিরীক্ষণ করতে লাগল তার পরিত্যক্ত নিশ্চিহ্ন-জীবন পৃথিবীটাকে।

দেখতে লাগল একটা অত্যতিবৃহৎ অগ্নিমণ্ডলকে পরিবেষ্টন ক'রে ঐ মাটির তাল জড়পিণ্ড পৃথিবীটা বিপুল বেগে

ঘুরচে। একটা নিরুদ্দেশ অন্ধ গতি। ছুটচে আর তার সঙ্গে বোধ করি একটু তুলচেও।

আরও পরে দেখা গেল, ঐ চলন্ত পৃথিবীর বুকে অকস্মাৎ জেগে উঠেচে একটি মুখ। একটি মেয়ের মুখ। কবি-প্রসিদ্ধ উপমায় বলা যায়, পদ্মপত্রে ঢাকা সরোবরের মাঝখানে ফুটে উঠল কমলদল, যেন অরুণোদয়ে একটি মাত্র সদ্যফোটা সূর্য্যমুখীর নিঃশব্দ নিরাড়ম্বর প্রণতি।

একটি মেয়ের মুখ। ডাগর ডাগর দুটি চোখ। চোখের তারা স্থির থাকলেও মনে হয় যেন ওর চাঞ্চল্য ঐ স্থৈর্য্য উপচে বেয়ে পড়চে। পাতলা দুটি ঠোঁট, লাল টুক্‌টুকে। গাল দুটি ঈষৎ ভারি, ওর হাসিভরা মুখে সর্ব্বদাই টোল খেয়ে আছে। একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুল, কান ঢেকে ঝুমকোর মত ঝুলচে।

কেউ কেউ মনে করচেন, শুধু প্রেম করার জন্যেই বুঝি ওকে সৃষ্টি করা হয়েচে। সে-কথা এখনও ঠিক ক'রে বলতে পারচিনে; তবে প্রেম করার বয়সে ওর প্রেমে হয়ত অনেকেই পড়বে,—সে-বয়সে পৌঁছুতে ওর ঢের দেরি। ওর গলায় ঐ যে ছোট্ট ভাঁজের রেখাটি দেখা যাচ্চে, বয়স-কালে ওটি হয়ে উঠবে আশ্চর্য্য বস্তু; তখন মনে হবে এই পেলব রেখাটির আদেশ সব চেয়ে কঠিন আর অনতিক্রম্য।

ওর গায়ের রং চাঁপার মত হওয়াই উচিত। সত্যিই তাই; চাঁপার মত নরম, মসৃণ, আলো-করা। ও যখন বড় হয়ে ব্রীড়ায় মুখ নেবে ঘুরিয়ে, তখন ওর গণ্ডে দেখা দেবে রক্তোচ্ছ্বাসের প্রাণব্যঞ্জনা। সেই জন্যেই ত ওর রং হয়েচে অত গৌর আর ও হয়েচে গৌরী।

বিরল বিজন প্রান্তে ফুলের মত ছোট্ট একটি মেয়ে অকারণ খেলায় সর্ব্বক্ষণ মত্ত, খলখলিয়ে হাসে, আপন মনে মাথা নাড়ে, চুলগুলো এসে পড়ে কানের ওপর, চোখের ওপর, আর সেই সঙ্গে দুলে ওঠে সমগ্র পৃথিবীটা। নির্ঝরিণীর মত ওর দুরন্ত চাঞ্চল্য, কূলের সীমানা পেরিয়ে দূর দিক্‌চক্রবালে তার আভাস যায় হারিয়ে।

ওকে দেখে আমার মনটা খুশীতে ভ'রে উঠেচে। আমার ইচ্ছে করচে ওকে ডেকে ওর সঙ্গে দু-দণ্ড আলাপ করি।

"ও খুকী, ও খুকী, শোনো।"

ও চোখ তুলে চাইলে।

"তোমার নাম কি খুকী?"

ভ্রূকুটি ক'রে তাকিয়ে ও বললে "ধ্যেত, বলব না।" তার বলার ভঙ্গীটা এই যে, নাম জিজ্ঞাসা করলেই যে বলতে হবে তার কোনো মানে নেই।

"ও খুকী, শোনই না। তুমি কি খেলা খেলচো?"

"বেশ করচি"—ব'লেই সে দিল ছুট্।

ও আমার সঙ্গে ভাব করতে চায় না।

এতক্ষণ ওই ছিল আলো ক'রে, আর চারপাশে অন্ধকার,—কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এখন দেখা গেল ওর বিধবা মাসী বলচেন, "কোথায় ছুটে চল্‌লি ওরে হতভাগী মেয়ে? তোমরা কি কেউ গৌরীকে একটুকুও শাসন করবে না?..."

তোমরা অর্থাৎ গৌরীর মা ও পিসি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "মেয়েটা গেল কোথায়? আন্ তো ধরে—"

গৌরী ততক্ষণে বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার আশ্রয় নিয়েচে। প্রশ্ন করচে, "দাদু, তোমার মাথায় নোংরা কেন? কালো-কালো চুল তুলে দেবো?"

গৌরী বড়ই চঞ্চল, বড়ই অস্থির। ওর মা-পিসি-মাসীরা সর্ব্বক্ষণ ওকে নিয়েই ব্যস্ত। বাপও চিন্তিত,—'তাই তো মেয়েটা বড় হ'লে ·"

বাড়িতে ছেলেমেয়ের অভাব নেই, কিন্তু তাদের সঙ্গে গৌরীর বনে না, বড়র শাসন মানতে চায় না, বরঞ্চ উল্টে ও-ই করতে যায় শাসন। যেমন দুরন্ত তেমনি অবাধ্য মেয়ে। দয়ামায়া যেন ওর মধ্যে স্থান পায় নি, সুযোগ পেলেই ভাইবোনদের ধ'রে অকারণেই মারে।

তবু সর্ব্বক্ষণই ও কৌতুকে ভরা। কেউ আছাড় খেয়ে পড়লে ও ওঠে খল্‌খলিয়ে হেসে, যেন লোকের আছাড় খাওয়া ওর হাসির খোরাক যোগান দেওয়ার জন্যেই।

নোংরায় ওর বড় ঘেন্না। কারুর নাকে সর্দ্দি ঝরতে দেখলে ওর গা বমি-বমি করে, তাই মলমূত্রের ত্রিসীমানা দিয়ে যায় না। মাসী পিসি রেগে আগুন হয়ে বলেন, "ওরে হতভাগি, মেয়ে হয়ে জন্মালি কেন?"

গৌরী উত্তর দেয়, "বেশ করেচি, খুব করেচি।" ওঁরা করেন জোর, মেয়ে দাঁড়ায় বেঁকে। মা মঙ্গলচণ্ডীর পায়ে গৌরীর মা প্রণতি জানান, "হে মা মঙ্গলচণ্ডী, মুখ তুলে চেয়ো, বয়সকালে মেয়ের বুদ্ধিশুদ্ধি শুধরে দিও।"

গৌরীর দোষ অনেক, তবুও ওকে আমার খুব ভাল লাগে। পিসি-মাসীর কাছে ওর যা দোষ, সুদূর নক্ষত্রলোকে বসে আমি দেখি, তাই যেন মুক্তির হাসির টুকরো। ওর যত কিছু মাধুর্য্য ওর অস্থিরতায়। ওর চঞ্চলতা দিকদিগন্তে প্রাণের ঢেউ তোলে। ও যেন একটা জাগরণ, একটা অবিচ্ছিন্ন মিষ্টি হাসি, ভোরের ঝরণার কলকলানির সুর। তাই পুতুলখেলায় ওর মন বসতে চায় না, ও চায় প্রাণের আনন্দে অকারণে ছুটে বেড়াতে বন-হরিণীর মত। ওকে কি বাঁধা যায়?

তবুও গৌরী হ'ল বড়, শিখল কিছু লেখাপড়া, অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামলো ঘরকন্নার, রান্নাবান্নার কাজে। কিন্তু ঘেন্না তাকে ছাড়ল না, নোংরা পরিষ্কার করতে হলেই ও এখনও বমি করে। সুযোগ পেলেই দুষ্টুমিও করে। পেয়ারাগাছে যে ছেলেটা ওঠে তাকে ও ক্ষেপায়, আবার তার সঙ্গে ভাব ক'রে পেয়ারা পাড়া শিখিয়ে দিয়ে ভাগ বুঝে নেয়। ছোট ভাইবোনদের ওপর তেমনি কঠিন শাসন চলে, তারপর মুখ বুজে বকুনি খায়।

ওর দেহে পড়চে আঁট-সাঁট-বাঁধন, চলন হ'তে সুরু করেচে ভারী, ঘরে হ'তে চলেচে বন্দিনী। তবুও ওর মনটা আছে ছাড়া; জানলার ধারে, চিকের ফাঁকে, ছাদের উন্মুক্ততায় ও পায় মুক্তি; ওর মন আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় প্রান্তরে প্রান্তরে খুশী বিলিয়ে।

তারপর একদিন বাজল সানাই করুণ সুরে। আলো ও কোলাহলের মধ্যে দিয়ে একরাতে গৌরীর আঁচলটি বাঁধা পড়ল এক তরুণের উত্তরীয়ে। মেয়ে চলেচে অচেনা অজানা ঘরে। মা ঘুরেফিরে চোখের জলে ভিজে বারংবার উপদেশ দেন, "দেখিস মা, জোরে হাসিস না, শাশুড়ী ননদের কথা শুনে চলবি, মুখটি বুজে সব কাজ করবি"—ইত্যাদি।

গৌরী এল শ্বশুরবাড়ি। ওর একদিকে শাশুড়ী, জা, ননদ; আর একদিকে শ্বশুর, ভাসুর, দেওর; তার সঙ্গে উৎসুক দাসদাসীর দৃষ্টি আর প্রতিবেশীদের নানা মন্তব্য। তাই ওকে এখানে পা ফেলতে হয় গুণে গুণে। অবগুণ্ঠনে আবৃত রাখতে হয় ওর আকাশে-ওড়া চঞ্চল দৃষ্টি।

গৌরীর বর দেখতে মন্দ নয়, সুশ্রীই বলা চলে। এরই মধ্যে গৌরী বরের চলনের ছন্দ, পায়ের শব্দ চিনে ফেলেচে। তার আভাস কানে গেলেই ও হয় খুব জড়ো-সড়ো, হাতের চুড়ী অকারণে বেজে উঠে ওর অবস্থিতি জানিয়ে দেয়। ননদেরা হেসে পরস্পরের গায়ে গড়িয়ে পড়ে। উদ্যত হাসি চাপতে গৌরী ওষ্ঠাধর দাঁতে চেপে ধরে।

আমার চোখ জলে ভরে উঠতে চাইচে। চাঞ্চল্যের ধারা বন্দিনী হয়ে হয়েচে বুঝি ফল্গু!

মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবচি, প্রাণ ত পড়ল বাঁধা, ওর আকাশ কি আর থাকবে তেমন বড়, তেমন দিগন্ত-প্রসারিত? সেখানে কি আর মেঘের গায়ে অহেতুক রঙের লীলা দেখতে পাব?

রাত্রে গৌরীর বর আসে ওর গা-ঘেঁষে, কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, "তোমায় আমি খুব ভালবাসি, গৌরী—খুব ভালবাসি।..."

এই সুযোগে অতি সংগোপনে ও বরকে চিম্‌টি কাটে। "ওঃ," ব'লে ওর বর সরে যায়। ও খুব ব্যস্ত হয়ে বলে, "কিছু কামড়ালো নাকি? ওমা, বিছে এল কোত্থেকে?"

ওর বর লাফিয়ে খাট থেকে নেমে পড়ে। আর সেই সঙ্গে ওর চাপা হাসির ফিন্‌কি ছোটে, ঘরের বদ্ধ বায়ু আলোড়িত হয়ে ওঠে, বরটির প্রাণে পুলকের কাঁপন ধরে।

কখনও দেখা গেল বরটি এসে ওর আঁচলটি চেপে ধরেচে, আর ও জোর ক'রে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টায় বলচে, "আঃ, কি যে করো! ছাড় বলচি এখ্‌খুনি, এখ্‌খুনি—"

"আচ্ছা চললুম, আর কখ্‌খনো আসব না—" বর যাচ্চে দরজার দিকে। আর ও তার হাত ধ'রে টেনে আনতে আনতে বলচে, "ঈস, ভারী যে তেজ। কই যাও দিকি—দেখি কেমন পার—"

এমনিতর কত ব্যাপার। কপট ক্রোধ, ভ্রুকুটির শাসন আর মান-অভিমানের মায়াখেলা। বদ্ধ ঘরের অল্প পরিসরে আজ গৌরী পায় তার মুক্তি। বাইরের আকাশ গাছপালার ইসারায় আর সাড়া দেয় না, ঐ এক টুকরো ঘরের জন্যেই ওর মন থাকে উন্মুখ। ও ঘরে ও ফেটে পড়ে হাসিতে, ঘরের দেয়াল ভেদ ক'রে তা আর দিকচক্রে রঙ ধরায় না। ওর যতকিছু কৌতুক, রঙ্গ, খেলা—সবই এখন

ঐ একটি লোককেই কেন্দ্র ক'রে। ঐ লোকটি আজ হয়েচে ওর আকাশ, সুদূরের সুর অকারণ খেলার ডাক। আমার মনে পড়েচে, কালো চুলের রাশি নিয়ে এই চঞ্চলাই একদিন মাথা দুলোতো আর তালে তালে দুলে উঠত পৃথিবী, সমগ্র বিশ্বলোক। অগোছালো চুলের রাশি বাঁধা পড়েচে কৃষ্ণসর্পিণীর বেণীতে, যার দোলনে ঢেউ ওঠে ঐ একটি লোকেরই বুকে। বিশ্বলোকের কথা কি আজ ও ভুলল ?

একটা কিছু ঘটেচে। গৌরী অত্যন্ত প্রবল হয়ে আপত্তি জানায় যদি ওর জা বলে, "তোর কিছু হয়েচে বাপু গৌরী।" আপত্তির ভঙ্গীটা সম্পূর্ণ নতুন, ওর ছেলেবেলাকার মোটেই নয়। এ পর্য্যন্ত ওর তনুদেহটি ঘিরে রয়েছিল পুষ্পসৌরভের অপূর্ব্ব রহস্য; বাঁধনের সে আঁট যাচ্চে খুলে, ফল সম্ভাবনায় হয়ে আসচে নত, যেন মধ্যাহ্নের ধানের ক্ষেতে কালো মেঘের লঘু ছায়া।

দিন এল। গৌরীর সেই ডাগর ডাগর চোখ দুটি ভ'রে উঠল জলে।...আমি এখানে বসেই শুনতে পাচ্চি নক্ষত্র-লোকের চেয়ে বহুদূরে ঐ নীহারিকাপুঞ্জে ঢাকা কোনো এক অচেনা অজানা দেবতার কাছে ও প্রার্থনা জানাচ্চে, "আর যে আমি সইতে পারচি না ঠাকুর।...আমায় মুক্তি দাও, মুক্তি দাও..."

কি করুণ আর্ত্তনাদ !

গৌরী নিশ্চয় মরতে বসেচে। দেখছিলাম ও মরছিল তিলে তিলে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে; এবার মরবে সত্যি করেই।

একটি ঘরে গৌরী আছে শুয়ে। ওর পাশেই বিছানায় ছোট্ট একটি ছেলে,—অতি ক্ষুদ্র মানবক। আমি ঘরের অস্পষ্ট আলোর সুযোগ নিয়ে ওর কানে কানে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলুম, "গৌরী, তোমার হ'ল কি ?"

ও হাসল। আমার চোখে ওর এই স্নিগ্ধ হাসিটি ঠেকলো ম্লান। বলল, "আমার ছেলে হয়েচে–" ব'লে ঐ ছোট্ট শিশুটিকে কাছে টেনে নেবার চেষ্টায় হাত বাড়াল। হাতের রেখায় দেখলুম সর্ব্বাঙ্গের সুকঠিন ব্যথা রূপ নিয়েচে একটা নিবিড় স্নেহে।

"দেখেচ, কেমন পিট পিট ক'রে চাইচে। ওর নাকটি হয়েচে ঠিক ওর বাপেরই মত।"—গৌরীর গণ্ডে রক্তোচ্ছ্বাস খেলল।

কত আশাই ছিল, ওই চম্পকবর্ণে দেখা দেবে শোণিত-রাগের লালায় প্রাণের ব্যঞ্জনা। আজ দেখলুম, শুধু উচ্ছ্বাসই আছে, ব্যঞ্জনা নেই, রূপ উপচে ওঠে না, শীতের নদীর শীর্ণতায় মত শান্ত, ধীর, শীতল। ওর চঞ্চল চোখ আজ হয়েচে স্থির, সেখানে নেমেচে কালো গভীরত', একটা কাজল মায়া।

মরণ আর কা'কে বলব ? আমি স্পষ্ট দেখচি গৌরীর চিতার অগ্নিশিখা ঊর্দ্ধমুখী হয়েচে।

ছেলে কোলে ক'রে গৌরী বাপের বাড়ি ফিরেচে। পিসি-মাসী-মায়ের মুখে আর হাসি ধরে না। ভাইবোনের আবদার আজ ও হাসিমুখে সহ্য করে, বাপকে জল দেবার সময় ভাল ক'রে দেখে জলে কিছু পড়েচে কি-না।

গৌরীর পিসি শোনাচ্চেন গৌরীর মাসীকে, "তখুনি আমি বলেছিলুম, ছেলেপিলের মা হ'লে এতটা ঘেন্নাপিত্তি আর থাকবে না। দেখলে ত..."

আর ওর মা মনে মনে নীরব প্রণতি জানাচ্চেন, "মা মঙ্গলচণ্ডী, মুখ রেখেচ।"

নক্ষত্রলোক থেকে আমি যে-গৌরীকে দেখেছিলুম সে-গৌরী আজ মরে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। এ গৌরী আর একটি মেয়ে। কি আশ্চর্য্য, পিসি মাসী মায়ের দল বুঝতে পারচে না, ও তাদের সেই ছোট গৌরীটি নয়, সেই দেহে অন্য কেউ,—সম্পূর্ণ আলাদা আর একটি মেয়ে !

মানুষের জীবনের কি অদ্ভুত ট্রাজেডি,—এই মরণের অপরূপ রূপ ! শোকাশ্রু দিয়ে মানুষ এ মরণের তর্পণ করে না।

গৌরীকে বারম্বার আমার মনে পড়চে, বারম্বারই তুলনা করচি, প্রাণের সঙ্গে প্রাণীর, চঞ্চলের সঙ্গে শান্তর, অধৈর্য্যের সঙ্গে ধৈর্য্যের। মনে হচ্চে, ভোরের শিশিরের মরণোৎসব চলচে এমনি অগোচরে, অন্তরালে, সহজ অনাড়ম্বরে। আর আমার চোখ বেয়ে পড়চে জল, বুকভরা দীর্ঘশ্বাস মুক্তি খুঁজচে মহাকাশে। সমগ্র সৌরলোককে আহ্বান ক'রে বলতে চাইচে,—সব নবসৃষ্টিকে তোমরা বরণ করো শঙ্খধ্বনি ক'রে, উলু দিয়ে, লাজ ছড়িয়ে।

কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে এই যে মহতী বিনষ্টি, এই যে অপরূপ

মরণ, তাকে কি এক ফোঁটা চোখের জলে বিদায় দেবে না? সে কি মায়ের প্রসব-বেদনার অশ্রুর মধ্যে চিরকালই লুকিয়ে থাকবে?

ব্যথামগ্ন মনটা হঠাৎ জেগে উঠে দেখলো, কাঁধের উপর কার কোমল হাতের স্পর্শ এলিয়ে পড়েচে। পরিচয় দেওয়া বাহুল্য। আমার মন্-মোহিনী বললেন, "উচ্ছ্বাসের মাত্রাটা যে খুব বেড়ে উঠচে দেখচি।"

"তাই নাকি? দেখে ফেলেচো?"

"তোমরা মিথ্যে নিয়ে এত হা হুতাশও করতে পার। তোমার গৌরীরা মরেও না নতুন ক'রে হয়ও না। ওরা যা তাই-ই থাকে। সবটাই ঢঙ্ আর ন্যাকামি—"

আমার অন্তর্যামিনীর দৃষ্টিটা খুব তীক্ষ্ণ। সম্ভবতা এঁরাই স্পষ্ট চেনেন।

বললুম, "সত্যি নাকি? খুব বাঁচিয়ে দিয়েচ আর একটু হলেই চোখের জল খরচ ক'রে ফেলেছিলুম আর কি।"

বুলবুলের প্রতি

শ্রীকামিনী রায়

তুমি চলে গেছ, বারটি বছর গিয়াছে তাহার পরে,
তোমারে কি আমি পেরেছি ভুলিতে একটি দিনেরও তরে?
দ্বাদশ বরষ, সে তো দীর্ঘকাল। আজ তাই মনে হয়
আমাদের মাঝে বর্ষ মাস দিন এ-সব কিছুই নয়।
দেশ কাল নাহি আনে ব্যবধান, মায়ের ব্যাকুল মন
পাশাপাশি রেখে গত অনাগত, খোঁজে তোরে অনুক্ষণ।

আমি হেথা; তুমি যেথাই থাক না, তুমি যে আমারি মেয়ে,
মাতৃপদ সহ অমৃতের স্বাদ লভেছিনু তোরে পেয়ে;
বুকে যেই দিন তুলিনু প্রথম, সে-দিন হিয়ার পুরে
তোমার লাগিয়া বাঁধিনু যে বাসা আজও তা' রয়েছে জুড়ে।
শিশু ও কিশোরী হাসিতে রোদনে, চাহনি চলনে আর
খেলায় সেবায়, আলাপে সঙ্গীতে ঢেলেছ যে সুধাধার,
এতটুকু তার না ফেলি হেলায়, আগ্রহে করেছি পান,
অন্তরেতে মোর অক্ষয় হয়ে করে তা' আনন্দ দান।

শূন্য করি যবে দেহের পিঞ্জর জীবন-বিহঙ্গ তোর
অলক্ষ্যে উড়িল অমরের দেশে, রহিল স্মৃতির ডোর,
সেই ডোর টানি নিত্য তোরে আনি,
পার কি ছিঁড়িতে তায়?
পার কি ভুলিতে, স্বর্গবিহারিণি,
ধূলিতে লুণ্ঠিতা মায়?
এস তবে আজ এস ভাল ক'রে, মায়ের নীরব প্রাণ
নব গীতিরসে ভরে তোল পুনঃ
তোমারে শুনাতে গান।

২১শে ও ২২শে জুলাই,
১৯৩২

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস

ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

আয়ুর্ব্বেদ অনাদি। যতদিন ধরিয়া মনুষ্যজীবন আরম্ভ হইয়াছে, ততদিন ধরিয়াই জীবনকে জানিবার চেষ্টা চলিয়াছে। এমন কি পশুপক্ষীর মধ্যেও আহারবিহারের একটা নিয়ম আছে; রুগ্ন হইলে তাহারাও রোগ-প্রশমনের কোন-না-কোনও উপায় অনেক সময়েই অবলম্বন করিয়া থাকে। অত্যন্ত অসভ্য জাতিদের মধ্যেও রোগ-নিবারণের নানাবিধ যাদুমন্ত্র, নানাবিধ প্রক্রিয়া ও ভেষজ-সেবনের ব্যবস্থা দেখা যায়। প্রাচীন সভ্য জাতিদের বিষয়ে আলোচনা করিলে প্রত্যেক জাতির মধ্যে নানারূপ ব্যাধি, তাহার লক্ষণ ও সেই রোগ নিবারণের বিবিধ উপায় দেখা যায়। প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যে নানারূপ তৈল ঘৃত ব্যবহারের কথা শুনা যায়, নানারূপ ধাতব বস্তু ও বৃক্ষভৈষজ্যের প্রয়োগের কথাও শুনা যায়। প্রায় সাড়ে চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বের চীনাগ্রন্থে দশ হাজার রকম জ্বর ও চৌদ্দ রকম আমাশয়ের উল্লেখ আছে, নাড়ীবিজ্ঞানের প্রতি তাঁহাদের প্রধান দৃষ্টি ছিল। পিয়ানো বাজাইবার মত আঙ্গুল বাজাইয়া তাঁহারা নাড়ী পরীক্ষা করিতেন। চীনা ভৈষজ্যগ্রন্থে আদা, বেদানার মূল, বৎসনাভ (একোনাইট), আফিং, সেঁকোবিষ (আর্সেনিক), গন্ধক, পারদ, বহুবিধ প্রাণীর মলমূত্রাদি ও অসংখ্য বৃক্ষের পত্রমূলাদি ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। চীনাদেশে লক্ষ লক্ষ টাকার গাছগাছড়ার ঔষধ প্রতি বৎসর বিক্রয় হয়। প্রাচীন চীনারা বসন্তের টীকা দিতে জানিতেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাস প্রণেতা গ্যারিসন বলেন যে এই তথ্যটি তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে শিখিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব এগার-শ অব্দ হইতে চীনদেশে প্রতিবর্ষে কি কি জাতীয় রোগ কি কি পরিমাণে হয় তাহার তালিকা প্রস্তুত হইত। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেও খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর হিপোক্রেটিসের পূর্ব্ব হইতেই চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্ভব দেখা যায়। কিন্তু হিপোক্রেটিসের সময়েই তাহার সমধিক উন্নতি হয়। হিপোক্রেটিস নিজে রোগী দেখিবার সময়ে নাড়ী দেখিতেন, তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস শুনিতেন, মলমূত্রাদি পরীক্ষা করিতেন ও তাহার মুখচোখের বিকারাদি লক্ষ্য করিতেন। নানাবিধ শস্ত্রোপচারেও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। হিপোক্রেটিসের পূর্ব্ব হইতেই অনেক ক্ষতস্থান আগুন দিয়া পোড়াইয়া সারাইবার ব্যবস্থা ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা মনে করেন যে এই পদ্ধতি গ্রীকেরা হিন্দুদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল।

ঋগ্বেদে ১ম মণ্ডলের ৩৪শ সূক্তে ত্রিধাতুর উল্লেখ আছে। সায়নাচার্য্য এই ত্রিধাতুতে বায়ু পিত্ত ও কফ বুঝিয়াছেন। সুশ্রুত বলেন, আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ এবং সহস্র অধ্যায়ে লক্ষ শ্লোকে ইহা ব্রহ্মার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ডহ্লণ তাঁহার নিবন্ধসংগ্রহ নামক টীকায় বলেন যে, অল্লাঙ্গ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদকে উপাঙ্গ বলা হইয়াছে, কিন্তু অথর্ব্ববেদে মোট ছয় হাজার মন্ত্র আছে, লক্ষশ্লোকাত্মক আয়ুর্ব্বেদ তাহার উপাঙ্গ হইতে পারে না। চরক বলেন যতদিন হইতে প্রাণ ততদিন হইতে আয়ুর্ব্বেদ, যতদিন হইতে দেহ ততদিন হইতেই দেহবিদ্যা। আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি বলিতে এইটুকু বোঝা যায় যে কোন সময়ে কোনও মনীষী কোনও একটি বিশেষ নিয়মশৃঙ্খলার দ্বারা রোগ রোগহেতু ও আরোগ্যোপায়কে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। চরক আয়ুর্ব্বেদকে স্বতন্ত্র বেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ইহাদ্বারা জীবন পাওয়া যায় বলিয়া এবং জীবনের উপরেই ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গল নির্ভর করে বলিয়া ইহাকে সকল বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বেদ বলিয়াছেন। ন্যায়সূত্রে ও তাহার টীকাভাষ্যাদিতে আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্যদ্বারাই অন্য সকল বেদের প্রামাণ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। জয়ন্ত তাঁহার ন্যায়মঞ্জরীতে বলিতেছেন প্রত্যক্ষীকৃতদেশকালপুরুষদশা-ভেদানুসারিসমস্তবাস্তপদার্থসার্থশক্তিনিশ্চয়াশ্চরকাদয়ঃ। এই আপ্তোক্তত্ব নিবন্ধন আয়ুর্ব্বেদের যেমন প্রামাণ্য বেদাদি গ্রন্থেরও সেইরূপ আপ্তোক্তত্বনিবন্ধন প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। বৃদ্ধ বাগ্ভট আয়ুর্ব্বেদকে অথর্ব্ববেদের উপবেদ বলিয়াছেন। অথর্ব্ববেদের সহিত আয়ুর্ব্বেদের বোধ হয় অতি প্রাচীনকাল হইতেই কোনও বিশেষ যোগ ছিল। কৌশিক সূত্রের টীকায়

দারিলভট্ট বলেন যে, ব্যাধি দুই প্রকার—অনিষ্টআহার জন্য আর অধর্ম্মজন্য। আয়ুর্ব্বেদের দ্বারা প্রথম জাতীয় ব্যাধির নিবৃত্তি হয় এবং আথর্ব্বণ প্রয়োগের দ্বারা দ্বিতীয় জাতীয় ব্যাধির নিবৃত্তি হয়। চরক নিজেও প্রায়শ্চিত্তকে ভেষজ বলিয়া ধরিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ অষ্টাঙ্গে বিভক্ত। শল্য (শস্ত্রচিকিৎসা), শালাক্য (শিরোরোগ-চিকিৎসা), কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমার ভৃত্য (শিশুচিকিৎসা), অগদতন্ত্র (বিষচিকিৎসা), রসায়ন (শরীরে তারুণ্য আনয়নের বিধি) এবং বাজীকরণ (ইন্দ্রিয় সামর্থ্য বৃদ্ধি)। সুশ্রুত বলেন যে পূর্ব্বকালে আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে এই আট প্রকার বিভাগ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল না। ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যের মধ্যে সুভিষজ নামক প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, মহাভারতের মধ্যেও আয়ুর্ব্বেদ অষ্টাঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মারও উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদের মধ্যেও তিন জাতীয় রোগের কথা উল্লিখিত আছে। সঞ্চারী রোগ, সিক্তা রোগ ও শুষ্ক রোগ—এই তিন প্রকার রোগই বোধ হয় পরে বায়ুপিত্ত-কফাত্মক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদ পড়িলে দেখা যায় যে, সে সময়েও শত শত চিকিৎসক ছিলেন এবং সহস্র সহস্র ঔষধ পৃথিবীতে প্রচার ছিল। শতং হ্যস্য ভিষজঃ সহস্রম্ উত বীরুধঃ—অথ, ২।৯।৩। সেকালে দুই উপায়ে রোগের চিকিৎসা চলিত। মন্ত্র ও কবচধারণাদি এবং ঔষধ প্রয়োগ। এই দুই প্রকারের চিকিৎসাই আমাদের দেশে এখনও পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

চরক ও সুশ্রুত উভয়েই আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের সহিত সংশ্লিষ্ট এইরূপ লিখিয়াছেন। চরক লিখিতেছেন, তত্র ভিষজা পৃষ্টেন এবং চতুর্ণাম্ ঋক্‌সামযজুরথর্ব্ববেদানাম আত্মনোঽথর্ব্ববেদে ভক্তিরাদেশ্যা। বেদোহ্যাথর্ব্বণঃ স্বস্ত্যয়নবলিমঙ্গল হোমনিয়মপ্রায়শ্চিত্তোপবাসমন্ত্রাদিপরিগ্রহাৎ চিকিৎসাং প্রাহ। উভয়েই বলেন যাহাদ্বারা আয়ু পাওয়া যায় বা যাহাতে আয়ুর বিচার আছে তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে এবং আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন ব্যাধিপরিমোক্ষ ও স্বাস্থ্যের পরিরক্ষণ। কিন্তু এই উভয় পদ্ধতির সম্প্রদায় বিভিন্নরূপ ছিল বলিয়াই মনে হয়। আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি বর্ণনা করিতে গিয়া সুশ্রুত যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, চরকে সেইরূপ দেখিতে পাই না। আবার সুশ্রুতে অষ্টাঙ্গ চিকিৎসার মধ্যে শল্যকেই প্রধান অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (এতদ্ধি অঙ্গপ্রথমং প্রাগভিঘাতব্রণসংরোহাৎ যজ্ঞশিরঃসন্ধানাচ্চ)। সুশ্রুত পড়িলে দেখা যায় যে, ইহাতে শস্ত্রচিকিৎসা ও বিষচিকিৎসাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, অথচ চরকে কায়চিকিৎসাই প্রধান। সুশ্রুতে অস্থিসংখ্যা-গণনার সহিত চরকের অস্থিসংখ্যা-গণনার সামঞ্জস্য নাই। সুশ্রুতের মতে অস্থিসংখ্যা ৩০০, চরকের মতে ৩৬০। চরক ও সুশ্রুতের সহিত অথর্ব্ববেদ ও শতপথব্রাহ্মণের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, অস্থিসংখ্যা-গণনায় চরকের সহিত ইহাদের সঙ্গতি আছে, সুশ্রুতের সহিত নাই। সুশ্রুত নিজেও বলিয়াছেন যে বেদবাদীদের মতে অস্থিসংখ্যা ৩৬০। ইহা ছাড়া যেরূপ সাঙ্খ্যাদি সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া চরক তাঁহার গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সুশ্রুত সেরূপ করেন নাই। সুশ্রুতের সাঙ্খ্য, ঈশ্বরকৃষ্ণের সাঙ্খ্যকারিকার সাঙ্খ্য এবং চরকোক্ত সাঙ্খ্য হইতে অনেক পরিমাণে বিভিন্ন। ইহা ছাড়া, চরকে যে সমবায় সামান্য বিশেষ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সুশ্রুতে সেরূপ নাই। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয় যে, সুশ্রুতের সম্প্রদায় চরকের সম্প্রদায় হইতে বিভিন্ন। চরককে যদি আত্রেয় সম্প্রদায় বলা যায়, তবে সুশ্রুতকে ধন্বন্তরিসম্প্রদায় বলা যাইতে পারে। এই দুইটি সম্প্রদায় ছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্রের আরও বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। চরক বিমানস্থানে বলিয়াছেন—"বিবিধানি ভিষজানি প্রচরন্তি লোকে।"

যদিও অথর্ব্ববেদে শুষ্ক, সিক্ত ও সঞ্চারী এই তিন প্রকার ব্যাধির উল্লেখ দেখা যায়, তথাপি অনেক স্থলেই অথর্ব্ববেদের রোগনিদান, ভূতবিদ্যার সহিত প্রায় এক পর্য্যায়ভুক্ত বলা যাইতে পারে। অথর্ব্ববেদের বহুসূক্তেই অরাতি, পিশাচ, রক্ষঃ, অত্রিন, কণ্ব, প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় ভূতবর্গের আক্রমণে নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিভিন্ন রোগের উৎপাদক বলিয়া যে-সমস্ত প্রাণীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের কতকগুলির নাম দিতেছি;—যাতুধান, কিমীদিন, পিশাচ, পিশাচী, অমীবা, দয়াবিন্, রক্ষঃ, মগুণ্ডী, অলিংশ, বৎসক, পলাল, অনুপলাল, শর্ক, কোক, মলিম্লুচ, পলীজক, বত্রীবাসস, অশ্রেষ, বিষ্কগ্রীব, প্রমালিন ইত্যাদি। এই সমস্ত পিশাচ-জাতীয় প্রাণীরা দেহের

নানাস্থানে বিচরণ করিয়া নানাবিধ রোগের উৎপত্তি করিত, এইরূপ কথার অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক সময়ে এই সমস্ত প্রাণীর সহিত ব্যাধিকে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অপচিৎ নামক ক্ষতের কথা উল্লেখ করিয়া এরূপ কথিত আছে যে. তাহারা বাতাসে উড়িয়া বেড়াইত এবং মানুষের দেহে আশ্রয় লইয়া মানুষকে আক্রমণ করিত। কোন-কোন স্থানে এই অপচিৎকে একরকম কীট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। একজাতীয় ক্রিমির আক্রমণে নানাবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয়, ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত দেখিলে মনে হয় যে, নানাবিধ ক্রিমিদ্বারা যে ব্যাধি উৎপন্ন হইত তাহা অথর্ব্ববেদ স্বীকার করিয়াছেন। বুদ্ধের সমসাময়িক আত্রেয়শিষ্য জীবকের সম্বন্ধে যে-সমস্ত উপাখ্যান লিখিত আছে তাহাতে দেখা যায় যে, তিনিও মনে করিতেন যে, নানা প্রকার জীবাণু বা ক্রিমি হইতে নানা প্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীবকের সম্বন্ধে ইহাও লিখিত আছে যে, তাহার এক প্রকার মণি ছিল, সেই মণি শরীরের রুগ্নস্থানে রাখিলে শরীরের অভ্যন্তর দেখা যাইত। জীবক অনেক সময়ে সেই মণি দিয়া রুগ্নস্থানের অভ্যন্তরবর্ত্তী জীবাণুগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া শস্ত্রোপচারের দ্বারা সেই স্থান ছেদন করিয়া এই জীবাণুগুলি নিষ্কাসিত করিয়া দিয়া পুনরায় সেই স্থান সীবন করিয়া দিয়া লোককে রোগমুক্ত করিতেন।

অথর্ব্ববেদে 'তক্মন' বলিয়া যে রোগের উল্লেখ আছে তাহার লক্ষণ পড়িয়া মনে হয় যে, তাহা আধুনিক কালের ম্যালেরিয়া জ্বর। এই তক্মনের প্রায়ই শরৎকালে প্রাদুর্ভাব হইত ও ইহা হইতে কামলা উৎপন্ন হইত। ইহা ছাড়া কাসিকা (কাস), যক্ষ্ম (যক্ষ্মা), পামন (পাঁচড়া), অক্ষত (ব্রণ বা টিউমার), বিদ্রধ, কিলাস (কুষ্ঠ), গণ্ডমালা, জলোদর, আস্রাব (অতিসার), বলাস (ক্ষয়), শীর্ষক্তি (শিরঃপীড়া), বিশল্যক (স্নায়ুবেদনা বা নাড়ীবেদনা), পৃষ্ঠাময়, বিলকন্দ (বাতব্যাধি), আশরীক, বিশারীক অঙ্গভেদ (বাতব্যাধিরই রূপান্তর), অলজী (চক্ষুরোগ), বিলোহিত (রক্তস্রাব), অপস্মার, গ্রাহি (ভূতেধরা) প্রভৃতি বহুবিধ রোগের উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া, বংশানুক্রমে যে-সমস্ত রোগ হইয়া থাকে তাহাদিগকে ক্ষেত্রীয় বলিয়া ধরা হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অথর্ব্ববেদের সময়ে একদিকে যেমন শান্তি-স্বস্ত্যয়ন মন্ত্রপাঠ কবচধারণাদির ব্যবস্থা ছিল, অপর দিকে তেমন বহুবিধ ঔষধ ব্যবহারের কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু অথর্ব্ববেদে মন্ত্র-চিকিৎসারই প্রাধান্য দেখা যায় এবং অথর্ব্ববেদের অনেক স্থান পড়িলে মনে হয় যে, মন্ত্রবাদী ও ভেষজবাদীদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু গোপথব্রাহ্মণ ও কৌশিকসূত্রের সময়ে এই উভয় বাদীদের মধ্যে একটা সন্ধিস্থাপন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কৌশিক সূত্রে বহুবিধ ঔষধের উল্লেখ আছে, যথা— পলাশ, কাম্পিল, বরণ, জঙ্গিড়, অর্জুন, বেতস্, শমী, শমকা, দর্ভ, দূর্ব্বা, যব, তিল, ইঙ্গিড় তৈল, বীরিণ, উষীর, খদির, ত্রপুস, মুঞ্জ, ক্রিমুক, নিতত্নী, জীবী, অলাকা, লাক্ষা, বিস, হরিদ্রা, পিপ্পলী, সদাপুষ্পা, কুষ্ঠ অলাবু. খলতুল, করীর, শিগ্রু, বিভীতক, নিকটা, শামীবিম্ব, শীর্ণপর্ণা, প্রিয়ঙ্গু, হরীতকী, পূতিকা, ইত্যাদি।

কৌশিকসূত্রে ক্ষতস্থানে জলৌকা লাগাইবার বিধি দেখা যায় এবং সর্প-দষ্ট স্থান অগ্নিকর্ম্মদ্বারা পুড়াইয়া দিবারও বিধি দেখা যায়। ঋগ্বেদ প্রভৃতিতে অশ্বিনীকুমারের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে তিনি বিস্পলার একটি পদ যুদ্ধে ছিন্ন হওয়াতে তাহার বদলে একটি লোহার পা জুড়িয়া দেন। ঋজাশ্ব ও পরাবৃজের আন্ধ্য দূর করেন। ঘোষাকে কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্ত করেন। কণ্ব ও কক্ষিবৎকে নবদৃষ্টি প্রদান করেন, বামদেবকে মাতৃকুক্ষি হইতে প্রসব করান, বন্ধ্যা নারীদিগকে সুপ্রজা করিতে পারিতেন। যজ্ঞীয় পশুর ছিন্নশিরকে প্রতিসন্ধান করিতে পারিতেন এবং এই কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি পূর্ব্বে শস্ত্রচিকিৎসকদিগকে লোকসমাজে সমাদৃত করেন। তাহাদের নামে অশ্বিনীকুমারের সংহিতা নামক গ্রন্থের কথা শুনা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, তিনি চিকিৎসা-সার নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ডাক্তার কর্ডিয়ার লিখিয়াছেন যে, তিনি এই গ্রন্থের খণ্ডাবশেষ পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া তাঁহার নামে বহু ঔষধ প্রচলিত আছে। কাশ্যপের নামেও কাশ্যপতন্ত্র কাশ্যপসংহিতা নামে প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণ পড়িলে জানা যায় যে, সে সময়েও সুশ্রুতের শাস্ত্র সমাজে প্রচলিত ছিল। শতপথ-ব্রাহ্মণের রচনাকাল ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ৬০০ বলিয়া মনে করেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে,

সুশ্রুতের শস্ত্রচিকিৎসা অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ৮০০, ৯০০ কি ১০০০ হইতে চলিয়াছে এবং সে সময়েও বেদবাদীদের একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসা ছিল। সুশ্রুত প্রায় ১২০টি শস্ত্রযন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হারিতেও ১২টি যন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। বাগ্‌ভটে ৬০টি যন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। ইহা ছাড়া পশুশাস্ত্রেও অন্যান্য শস্ত্রোপচার যন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। পালকাপ্য নামক হস্ত্যায়ুর্ব্বেদে প্রায় পঁচিশটি স্বতন্ত্র যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুশ্রুত পড়িলে দেখা যায় যে, সে সময়ে যে কেবল শবব্যবচ্ছেদ হইত তাহা নহে, শরীরের হস্তপদাদি বিভিন্ন স্থানে যে শস্ত্রোপচার হইত তাহা নহে, এমন কি উদরের মধ্যেও শস্ত্রোপচার চলিত এবং কঠিন শস্ত্রোপচারের দ্বারা উদরস্থ সন্তানকে প্রসব করান হইত। তাহা ছাড়া মাথার মধ্যেও শস্ত্রোপচার করিয়া অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি দূর করা হইত।

নানা গ্রন্থে জীবক সম্বন্ধে যে-সমস্ত কাহিনী বিবৃত আছে তাহাতে দেখা যায় যে তিনি অনেক স্থলেই মাথার করোটিকা কর্ত্তন করিয়া মাথার মধ্যের ক্ষতস্থান হইতে ক্রিমি নিঃসারণ করাইয়া অনেক শিরঃপীড়া আরোগ্য করাইয়াছিলেন। রাজগৃহে তিনি যে একটি শস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায় যে, একটি ধনীর স্ত্রীকে হস্তপদাদি বদ্ধ করিয়া তাহার উদরে শস্ত্রোপচার করিয়া উদরের অন্ত্রতন্ত্রগুলি বাহির করিয়া তাহার মধ্যে যে কতগুলি গ্রন্থি পাকাইয়া গিয়াছিল সেগুলি উন্মোচন করাইয়া পুনরায় সমস্ত অন্ত্রতন্ত্রকে যথাস্থানে নিবেশ করাইয়া সীবন করিয়া দেন। জীবক ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন এবং অনেক সময়ে তাঁহাকে নানা দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে নীরোগ করিয়াছিলেন। জীবক আত্রেয়ের শিষ্য ছিলেন। চরকও আত্রেয়-সম্প্রদায়ের লোক। চরক প্রধানতঃ কায়চিকিৎসক ছিলেন, সেইজন্য অনেক স্থানে (যথা—উদরি) শস্ত্রসাধ্য ব্যাধির কথা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত ব্যাধি শস্ত্রবিদেরা আরোগ্য করিতে পারেন। অতএব মনে হয় যে, ধন্বন্তরি সম্প্রদায় ছাড়া আত্রেয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও শস্ত্রোপচারের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সুশ্রুতের মধ্যে চক্ষুর ছানি কাটিবার যে পদ্ধতি ছিল আজও তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর ছানি কাটিবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ। সাধারণ আতুরালয় স্থাপনের পদ্ধতি বোধ হয় ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথম। অশোকের শিলালিপিতে দেখা যায় যে, সে সময়ে পশুদিগের ও মনুষ্যদিগের জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল এবং ভৈষজ্য উদ্যান স্থাপনা করিয়া নানা দেশের দুষ্প্রাপ্য ওষধি সকল একত্র রোপিত হইত। সিংহলীয় লেখমালা হইতে জানা যায় যে খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতেও এদেশে আতুরালয় বা হাসপাতাল ছিল। এই সমস্ত হাসপাতাল এবং গৃহীদের আতুরালয় ও প্রসবগৃহ প্রভৃতির ব্যবহারের জন্য নানাবিধ উপকরণের ব্যবস্থা দেখা যায়। সুশ্রুত চরক প্রভৃতির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধানের অঙ্গ বলিয়া দন্তকাষ্ঠ, জিহ্বানির্লেখন, ক্ষুর, কেশপ্রসাধনী বা চিরুণী, আদর্শ, পট্টবস্ত্র পরিধান, উষ্ণীষ, ছত্র, উপানহ বা ব্যজন ইত্যাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অপরিষ্কৃত জল পরিষ্কার করিবার জন্য নানাপ্রকার ফিল্টারের ব্যবস্থা দেখা যায়। আতুরালয়ের জন্য চামচ, নিষ্ঠীবনপাত্র, মলপাত্র (বেডপ্যান্) মূত্রপাত্র ও পূঁজপাত্র প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। ঔষধাদি পানের জন্য রজত, সুবর্ণ, তাম্র, মৃৎ বা শুক্তি পাত্র ব্যবহৃত হইত।

আলেকজাণ্ডারের পূর্ব্বে গ্রীকদের সহিত ভারতীয়দের কিরূপ আদানপ্রদান চলিত তাহা বলা কঠিন, কিন্তু নিয়ার্কাস (Nearchus) বলেন যে, গ্রীকবৈদ্যেরা হিন্দুদের চিকিৎসা-শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। গ্রীকদের ভৈষজ্যগ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, পদ্মবীজ, তিল, জটামাংসী শৃঙ্গবের, মরীচি, এলাচি প্রভৃতি বহুবিধ ভারতীয় ঔষধ তাঁহারা ব্যবহার করিতেন। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে আরবেরা চরক সুশ্রুত ও মাধবনিদান অনুবাদ করেন, ইহা ছাড়া ভারতীয় সর্পবিদ্যা, বিষবিদ্যা ও পশুচিকিৎসাও আরব ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, এবং অনেক সময়ে হিন্দু চিকিৎসকেরা আরব দেশে চিকিৎসার জন্য নীত হইতেন। আরব দেশের চিকিৎসা-গ্রন্থে বহু ভারতীয় ঔষধের ব্যবহার দেখা যায়, যথা—দেবদারু, সুগন্ধ মরীচ, সোণামুখী, সুবর্ণথ, কুলীঞ্জন, গুগগুল, তিন্তিড়ী, ত্রিফলা, হরীতকী, বিল্ব, চন্দন, নিম্ব, তাম্বুল, খদির, বিষমুষ্টি, কদলী, নাগরঙ্গ, মাতুলুঙ্গ, ইত্যাদি বর্ত্তমানে ইউরোপে প্রচলিত ভৈষজ্যমধ্যেও বহু ভারতীয় ঔষধের ব্যবহার দেখা যায়, যথা—অতিবিষ, পলাণ্ডু, খদির, যবস, সপ্তপর্ণ, এলা, উশীর দারুহরিদ্রা, পলাশ, সোণামুখী

ইন্দ্রবরণ, ধুস্তূর, অতসী, করঞ্জ, আজমোদ, এড়ণ্ড, শতপুষ্পা, উন্দুরকর্ণিকা, চন্দন, অজকর্ণ, গুরুচি, টগর, ইন্দ্রযব ইত্যাদি। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সহস্র সহস্র আয়ুর্ব্বেদীয় ভৈষজ্যের মধ্যে ইউরোপীয় ভৈষজ্য প্রায় একটিও দেখা যায় না। উপদংশ কুষ্ঠাদি ব্যাধিতে নাসিকা প্রভৃতি খসিয়া গেলে শস্ত্রোপচার করিয়া নূতন হাড় বসাইয়া আরোগ্য করিবার যে বিধি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল তাহা ভারতবর্ষ হইতেই ইউরোপে গৃহীত হইয়াছে। বার্লিনের ডাক্তার রিদবার্গ বলেন যে, এই জাতীয় শস্ত্রবিদ্যায় ইউরোপ যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছে তাহার প্রথম নিদর্শন ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতেই পাওয়া গিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, চামড়া কাটিয়া চামড়া জোড়া লাগাইবার যে পদ্ধতি তাহাও ভারতবর্ষ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। কোষে শস্ত্রোপচারের অনেক ব্যবস্থাও ভারতবর্ষ হইতেই ইউরোপে গৃহীত হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কীট ও জীবাণু দ্বারা যে নানাবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয় তাহা অতি প্রাচীন কালেই এদেশে জানা ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মার্কোপলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে মশক-দংশনে যে জ্বরের উৎপত্তি হয় তাহাও এদেশে জানা ছিল এবং মশক-নিবারণের জন্য দক্ষিণ-ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানে মশারি ব্যবহৃত হইত।

মনুষ্যচিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে পশুচিকিৎসাও অতি প্রাচীন কালেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। অশ্বচিকিৎসার প্রধান প্রবর্ত্তক ছিলেন শালিহোত্র ঋষি। ইহা ছাড়া অগ্নিপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও গরুড় পুরাণে অশ্বচিকিৎসার কথা দেখা যায়। শুক্রাচার্য্যের নীতিশাস্ত্রেও অশ্ববৈদ্য সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা আছে। সহদেব ও নকুল উভয়েই অশ্বচিকিৎসা সম্বন্ধে প্রবীণ ছিলেন। জয়দত্তসূরীর অশ্ববৈদ্যকও এ-বিষয়ের একখানা প্রধান গ্রন্থ। তাহা ছাড়া সিংহদত্ত অশ্বশাস্ত্রসমুদ্র নামে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। মল্লিনাথ হয়লীলাবতী হইতে স্থানে স্থানে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভোজও বাজীচিকিৎসা নামে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। দীপঙ্করও অশ্ববৈদ্যশাস্ত্র নামে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া শার্ঙ্গধর লিখিয়াছিলেন তুরঙ্গ পরীক্ষা, এবং ইন্দুসেন শালিহোত্রের সার সংগ্রহ করিয়া সারসংগ্রহ নামে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। পালকাপ্য প্রণীত গজায়ুর্ব্বেদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা ছাড়া গজনিরূপণ, মাতঙ্গলীলা, গজচিকিৎসা প্রভৃতি গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। অগ্নিপুরাণে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্রেও গজচিকিৎসার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্যৈনিক শাস্ত্রে পক্ষিচিকিৎসা ও পক্ষীদের আহার-প্রণালীর ব্যবস্থা দেখা যায়। গো-চিকিৎসার কথা অথর্ব্ববেদে উল্লিখিত হইয়াছে এবং পরাশরসংহিতা ও আপস্তম্ব সম্বর্ত্ত ও বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে গো-চিকিৎসার কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। শালিহোত্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় না। যে পুস্তকখানি পাওয়া যায় তাহা স্থানে স্থানে খণ্ডিত। এই গ্রন্থখানি শল্য শালাক্যাদি ক্রমে ৮টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। কথিত আছে যে, শালিহোত্র ছিলেন হয়ঘোষের পুত্র এবং সুশ্রুতের পিতা, এবং সুশ্রুতের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়াই শালিহোত্র তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন স্থানে সুশ্রুতকে বিশ্বামিত্রের পুত্র বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। গণ তাঁহার অশ্বায়ুর্ব্বেদে সুশ্রুতকেও স্বতন্ত্রভাবে অশ্বশাস্ত্রের কর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অগ্নিপুরাণে দেখা যায় যে, সুশ্রুত অশ্ববিদ্যা, গজবিদ্যা ও গোচিকিৎসা-বিদ্যা ধন্বন্তরির নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। শালিহোত্র গান্ধার দেশের লোক ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। শালিহোত্রের গ্রন্থখানি ১৩৮১ খৃঃ অব্দে পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়। গ্রন্থখানির উন্নয় স্থান, উত্তর স্থান, শারীরক, চিকিৎসা স্থান, কিশোর চিকিৎসা, উত্তরোত্তর ও রহস্য স্থান—এই কয় অধ্যায়ে বিভক্ত। পালকাপ্য ঋষি সামগায়নাক্ষ মুনির পুত্র ছিলেন। ইনি চম্পা (ভাগলপুর) দেশের রোমপাদ রাজা কর্ত্তৃক হস্তিচিকিৎসার জন্য আহূত হন। এই কাণ্ড-শেষে লিখিত আছে যে, পালকাপ্য ও ধন্বন্তরি একই ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার গ্রন্থখানি অতি বিস্তৃত এবং ইহাতে প্রায় ১৬৪টি অধ্যায় আছে। মহাবগ্‌গে লিখিত আছে যে আকাশগোত্ত যখন একটি বৌদ্ধ ভিক্ষুর ভগন্দর স্থানে শস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহার একটি বিরাট মুখ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া বুদ্ধদেব অত্যন্ত বীভৎসভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং মনুষ্যদেহে এইরূপ শস্ত্রপ্রয়োগ করিতে নিষেধ করিলেন। বোধ হয় তাহার পর হইতে এই দেশে শস্ত্রোপচারের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। কালক্রমে এই শস্ত্রচিকিৎসার

এমন অবনতি হইয়াছিল যে, যখন শঙ্করাচার্য্য ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন তখন এই রোগ অচিকিৎস্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু চরকাদির সময়েও শস্ত্রবিদ্‌দিগের বিশেষ সমাদর ছিল এবং বাগ্‌ভটাদির সময়েও শস্ত্রবিদ্যা যে একেবারে চলিত ছিল না, এ-কথা বলা যায় না।

চরক পড়িলে দেখা যায় যে, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিরা ভরদ্বাজকে ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন এবং তিনি তাঁহার নিকটে হেতু লিঙ্গ ও ঔষধজ্ঞানাত্মক ত্রিসূত্র শিক্ষা করেন। অন্যান্য ঋষিরা ভরদ্বাজের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করেন। ভরদ্বাজের নিকট হইতে আত্রেয় পুনর্ব্বসু এই শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি—এই ছয় শিষ্যকে ইহা শিক্ষা দেন। ইহাদের মধ্যে অগ্নিবেশই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ছিলেন। সেইজন্য তিনিই প্রথম অগ্নিবেশসংহিতা প্রণয়ন করেন। তদনন্তর ভেল, পরাশর, জতুকর্ণ প্রভৃতিরাও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিয়াছিলেন। এই পুনর্ব্বসু আত্রেয় ছাড়া কৃষ্ণাত্রেয় ও ভিক্ষু আত্রেয় নামে আরও দু-জন আত্রেয়ের কথা পাওয়া যায়। জীবক কোন্ আত্রেয়ের শিষ্য ছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। ইহা ছাড়া নাড়ীতত্ত্ববিধির প্রণেতা দত্তাত্রেয় নামে আর একজন আত্রেয় ছিলেন। চরক পড়িলে পুনর্ব্বসু আত্রেয়ের সমসাময়িক আরও অনেক ভিষকের নাম পাওয়া যায়, যথা—হিরণ্যকেশী বড়িশ, সাংকৃত্যায়ণ, শরলোম কাপ্য, কাংকায়ন কুমারশিরা, ভরদ্বাজ, রাজর্ষি, বামক, বার্য্যোবিদ্ শৌনক, মৈত্রেয়, পৈল, শাকুন্তেয় ইত্যাদি। চরকের অনেক অধ্যায়ের লিখন-প্রণালীতে ইহা বোঝা যায় যে, এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসক একত্র সম্মিলিত হইয়া নানা রোগের বিষয় ও আয়ুর্ব্বেদের নানা সমস্যা পরস্পর আলোচনা করিয়া প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিতেন এবং পরিশেষে আত্রেয় যেন সভাপতিরূপে সেই সব মতের সামঞ্জস্য করিয়া সমাধান করিতেন। এই সমস্ত স্থানগুলি দেখিলে অনেক সময়েই মনে হয় যে, চরকসংহিতাখানি যেন কোনও ভিষকসমিতির বক্তৃতাগুলির সারসংকলন। যে-সকল স্থলে মতদ্বৈধ ছিল না সে-সমস্ত স্থলে আত্রেয় যেন নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। অগ্নিবেশ-লিখিত তন্ত্র চরক পুনরায় প্রতিসংস্কার করিয়া তাহার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই অগ্নিবেশসংহিতা একাদশ শতাব্দীতে চক্রপাণির সময় পর্য্যন্তও পাওয়া যাইত। যে কারণেই হউক চরকসূত্র, নিদান, বিমান, শারীর ও চিকিৎসাস্থানে ১৬শ অধ্যায় পর্য্যন্ত লিখিয়া যান। চিকিৎসাস্থানের শেষ ১৭টি অধ্যায় এবং সিদ্ধিস্থান ও কল্পস্থান কাশ্মীরী ভিষক কপিলবলের পুত্র দৃঢ়বল খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আপূরণ করেন। দৃঢ়বল যে কেবলমাত্র আপূরণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, অনেক সময়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রোগাধ্যায়ের মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। চক্রপাণি ও বিজয় রক্ষিত যখন কাশ্মীরপাঠ বলিয়া সময়ে সময়ে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তখন এই দৃঢ়বলেরই প্রতিসংস্কারকে লক্ষ্য করিয়া তাহা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মাধব সম্ভবতঃ দৃঢ়বলের পূর্ব্বের লোক ছিলেন, কাজেই মাধব নবম শতাব্দীরও পূর্ব্বের লোক। বৃদ্ধ বাগ্‌ভট বোধ হয় ৭ম শতাব্দীর লোক ছিলেন, কারণ সপ্তম শতাব্দীতে ইৎসিন সমসাময়িক বলিয়া তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। চক্রপাণিও একাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন এবং অরুণদত্ত ও বিজয় রক্ষিত উভয়েই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন কালে কাশী ও তক্ষশিলা বিদ্যার প্রধান কেন্দ্র ছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শালিহোত্র গান্ধার-দেশীয় লোক ছিলেন। জীবকও তক্ষশিলার লোক ছিলেন। চীন-দেশীয় বিবরণ হইতে জানা যায় যে, চরক কণিষ্ক মহারাজের রাজবৈদ্য ছিলেন। কণিষ্ক খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর লোক এবং তাঁহার রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার। চরক পড়িলে দেখা যায় বাহ্লীক-দেশীয় ভিষকরা আত্রেয় পুনর্ব্বসুর ভিষক্-পরিষদে সমবেত হইতেন। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, আত্রেয় পুনর্ব্বসু যেখানে বাস করিতেন, বা তাঁহার সমধর্ম্মী চিকিৎসকেরা যেখানে বাস করিতেন তাহা বাহ্লীক দেশের নিকটবর্ত্তী স্থান; কাজেই এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, তক্ষশিলার নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে তাঁহাদের এই চিকিৎসা-পরিষদ বসিত। দৃঢ়বল যে কাশ্মীরের লোক ছিলেন তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইৎসিন নলান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন এবং তিনি যে-ভাবে বাগ্‌ভটের কথার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে বাগ্‌ভট যেন তৎসমীপবর্ত্তী কোন স্থানের লোক ছিলেন। তাহাতে এরূপ

মনে করা যাইতে পারে যে, বৃদ্ধ বাগ্‌ভট সম্ভবতঃ মগধেরই লোক ছিলেন। মাধব কোন্ দেশের লোক ছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অনেকে বলেন যে, মাধব এবং বিজয় রক্ষিত উভয়েই বাংলা দেশের লোক। ইহার সপক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। দৃঢ়বল যদি নবম শতাব্দীর লোক হন তাহা হইলে মাধব হয়ত ৭ম শতাব্দীর লোক হইবেন এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়কার বাগ্‌ভট হয়ত ৯ম শতাব্দীর লোক হইবেন। চরক ও মাধবের মধ্যে এই যে প্রায় ৬০০ বৎসরের ব্যবধান ইহার মধ্যে কোনও প্রসিদ্ধ ভিষকের নাম পাওয়া যায় না। কিছু দিন হইল তুর্কীস্থানের বালুস্তূপের মধ্যে নাবনীতক নামে এক সংগ্রহগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই সংগ্রহগ্রন্থ খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর লেখা এইরূপই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। ইহা চরক, সুশ্রুত ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এবং প্রধানতঃ একখানি ভেষজসারসংগ্রহের গ্রন্থ। এই নাবনীতকে সাম্বব্য, গর্গ, বশিষ্ঠ, করাল, সুপ্রভ, বাড়্‌বলি প্রভৃতি ভিষকের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে হবুষাবস্তি নামে একরূপ অন্ত্রবস্তি (Enema) ব্যবহারের বিধান আছে। চরক সুশ্রুতেও মলদ্বার দিয়া প্রয়োগের জন্য নানাজাতীয় বস্তির বিধান ছিল। এই সকল বস্তিদ্বারা নানাবিধ ঔষধ সঙ্কীর্ণ নলের মধ্য দিয়া অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত। ইহা ছাড়া স্ত্রীলোক ও পুরুষের মূত্রদ্বারের নানা প্রকার ব্যাধির জন্য বিভিন্ন প্রকারের বস্তি প্রয়োগের (cathetar) বিধি ছিল।

চক্রপাণিদত্ত গৌড় দেশেরই লোক ছিলেন ইহা প্রমাণ করা কঠিন নহে। সম্ভবতঃ অষ্টম কি নবম শতাব্দী হইতেই বঙ্গদেশে আয়ুর্ব্বেদ-চর্চ্চার প্রসার বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। বিজয় রক্ষিতের পূর্ব্বেও যে বহু আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহারা অনেকেই যে চরকের উপরে টীকা ও অন্যান্য প্রকার গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহার পরিচয় আমরা বিজয় রক্ষিতের টীকার মধ্য হইতে পাই। ডহ্লণ (১১শ কি ১২শ শতাব্দী) তাঁহার নিবন্ধসংগ্রহে বলিয়াছেন যে, প্রাচীন বৃদ্ধসুশ্রুতকৃত সুশ্রুতসংহিতা নাগার্জ্জুনের দ্বারা প্রতিসংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান সুশ্রুতসংহিতা নামে চলিয়াছে। বর্ত্তমান সুশ্রুত গ্রন্থে যে একটা উত্তর তন্ত্র আছে তাহাও ইহার পরিচায়ক। চক্রপাণি তাঁহার ভানুমতী নামক টীকাতে এই প্রতিসংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। সুশ্রুতচন্দ্রিকা বা ন্যায়চন্দ্রিকা নামে প্রচলিত গয়দাসের পঞ্জিকাতে নাগার্জ্জুনের পাঠ বলিয়া যে পাঠটি চলিয়াছে তাহা বর্ত্তমান সুশ্রুতেরই পাঠ, অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতার ভট্টনারায়ণকৃত বাগভট্খণ্ডনমণ্ডনটীকায় সুশ্রুতের নাগার্জ্জুনের পাঠ বলিয়া স্বতন্ত্র পাঠোল্লেখ আছে। আমরা তিনটি নাগার্জ্জুনের কথা জানি। প্রথম, শূন্যবাদী নাগার্জ্জুন (খ্রীঃ প্রথম শতাব্দী); দ্বিতীয়, বৃন্দসিদ্ধযোগে যে নাগার্জ্জুনের কথার উল্লেখ করিয়াছে, ইনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ কি পঞ্চম শতকের লোক ছিলেন; তৃতীয়, নবম শতাব্দীর গুর্জ্জরের রাসায়নিক নাগার্জ্জুন। এই তৃতীয় নাগার্জ্জুনই বোধ হয় কক্ষপুটতন্ত্রের লেখক ছিলেন। আর দ্বিতীয় নাগার্জ্জুন বোধ হয় সুশ্রুতসংহিতার প্রতিসংস্করণ করিয়াছিলেন। জৈয়্যট, গয়দাস, ভাস্কর, শ্রীমাধব, ব্রহ্মদেব প্রভৃতিরা বৃহল্লঘুপঞ্জিকা আর ন্যায়চন্দ্রিকা, পঞ্জিকা ও শ্লোক-বার্ত্তিক নামে সুশ্রুতের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া চক্রপাণিদত্তও ভানুমতী নামে এক টীকা লিখিয়াছিলেন। গোমিন্ আষাঢ় বর্ম্মা, জিনদাস, নরদত্ত, গদাধর, বাষ্পচন্দ্র, সোম, গোবর্দ্ধন, প্রশ্ননিধান প্রভৃতিরাও সুশ্রুতের টীকা লিখিয়াছিলেন। চরকের উপর চক্রপাণিদত্তের টীকাখানি এখন মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া স্বামিকুমার, হরিশ্চন্দ্র, শিবদাস সেন, বাষ্পচন্দ্র ঈশান দেব, ঈশ্বর সেন, বকুল কর, জিনদাস, মুনিদাস, গোবর্দ্ধন, সন্ধ্যাকর, জয়নন্দী ও গয়দাস প্রভৃতিরাও চরকের টীকা লিখিয়াছিলেন।

চক্রপাণির সময় পর্য্যন্ত জতূকর্ণসংহিতাখানি পাওয়া যাইত। পরাশরসংহিতা ও ক্ষারপাণিসংহিতা ও শ্রীকণ্ঠদত্ত ও শিবদাসের সময় পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত। চক্রপাণির টীকায় খরনাদসংহিতা ও বিশ্বামিত্রসংহিতারও উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন হারীতসংহিতাখানি চক্রপাণি ও বিজয় রক্ষিতের সময় পর্য্যন্ত ছিল। ভেলসংহিতাখানি কিছুদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। ধন্বন্তরির চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান, কাশীরাজের চিকিৎসাকৌমুদী, দিবোদাসের চিকিৎসাদর্শন, অশ্বিনীর চিকিৎসাসারতন্ত্র ও ভ্রমঘ্ন, নকুলের বৈদ্যকসর্ব্বস্ব, সহদেবের ব্যাধিসিন্ধুবিমর্দ্দন, যমের জ্ঞানার্ণব, চ্যবনের জীবদান, জনকের ব্যাধিসন্দেহভঞ্জন, চন্দ্রসুতের সর্ব্বসার,

জাবালের তন্ত্রসার, জাতুকর্ণের বেদাঙ্গসার, পৈলের নিদান, করঠের সর্ব্বধর, অগস্ত্যের দ্বৈধনির্ণয়তন্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন চিকিৎসা-গ্রন্থের কথা কেবল নামমাত্রই শুনিয়াছি। বৃদ্ধ বাগ্ভট তাঁহার ইন্দুকৃত টীকাসহ মুদ্রিত হইয়াছে। বাগ্ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতার অরুণদত্ত, আশাধর, চন্দ্রচন্দন, রামনাথ ও হেমাদ্রিকৃত পাঁচ খানি টীকা ছিল। তন্মধ্যে কেবলমাত্র অরুণদত্তের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর টীকাটি ছাপা হইয়াছে। মাধব-নিদানেরও অন্ততঃ সাতটি টীকা ছিল। বিজয় রক্ষিতকৃত মধুকোষ, বৈদ্যবাচস্পতিকৃত আতঙ্কদর্পণ, রামনাথ বৈদ্যকৃত টীকা, ভবানীসহায়কৃত টীকা, নাগনাথকৃত নিদানপ্রদীপ, গণেশভিষক্‌কৃত টীকা, নীলকণ্ঠ-ভট্টপুত্র নরসিংহ কবিরাজকৃত বিবরণসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা। এই শেষোক্ত গ্রন্থের মুদ্রাপনের আয়োজন চলিতেছে। এই গ্রন্থখানি আমার পারিবারিক গ্রন্থাগারে পাওয়া গিয়াছে। বিজয় রক্ষিতকৃত নিদানের টীকা নিদানের ত্রয়স্ত্রিংশদধ্যায় পর্য্যন্ত আসিয়া ক্ষান্ত হয়। বাকী অংশটি তাঁহার ছাত্র শ্রীকণ্ঠদত্ত সমাপন করিয়াছেন। বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগখানিও একখানি অতি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ। অনেকে বলেন যে বৃন্দ এবং মাধব একই ব্যক্তি ছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শার্ঙ্গধরের গ্রন্থখানি ও পঞ্চদশ শতাব্দীর শিবদাসকৃত চক্রদত্তের টীকা ও বঙ্গসেনের গ্রন্থখানি কবিরাজ-সমাজে অত্যন্ত সমাদৃত। ভাস্করের শারীরপদ্মিনী গ্রন্থের এখন আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। ঔপধেনবতন্ত্র পৌষ্কলাবততন্ত্র, বৈতরণতন্ত্র এবং ভোজতন্ত্র ডহলণের সময় পর্য্যন্ত ছিল। ভালুকাতন্ত্র ও কপিলতন্ত্র চক্রপাণির সময় পর্য্যন্ত ছিল। বিদেহতন্ত্র, নিমিতন্ত্র, কাঙ্কায়নতন্ত্র, সাত্যকী-তন্ত্র, করালতন্ত্র, কৃষ্ণাত্রেয়তন্ত্র গ্রন্থগুলি চক্ষুরোগের উপর লিখিত হইয়াছিল। শ্রীকণ্ঠদত্তের টীকার মধ্যে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। চক্ষুরোগের উপর লিখিত শৌনকতন্ত্র চক্রপাণি ও ডহলণের টীকায় উল্লিখিত দেখা যায়। ধাত্রী-বিদ্যা সম্বন্ধে লিখিত জীবকতন্ত্র, পর্ব্বতক-তন্ত্র ও বন্ধকতন্ত্রের কথা ডহলণের টীকায় দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সম্বন্ধে হিরণ্যাক্ষ-তন্ত্রের কথা শ্রীকণ্ঠও তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন। বিষশাস্ত্র সম্বন্ধে কাশ্যপ ও আলম্বায়ন সংহিতা শ্রীকণ্ঠ তাঁহার টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন। বিষশাস্ত্র সম্বন্ধে উশনস্ সংহিতা-সনক-সংহিতা ও লাট্যায়ন-সংহিতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাগার্জ্জুনের যোগশতক জীবসূত্র ভেষজকল্প ও অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ের চারখানি টীকা (অষ্টাঙ্গহৃদয়বৈদূর্য্যকভাষ্য, পদার্থ-চন্দ্রিকাপ্রভাস, অষ্টাঙ্গহৃদয়বৃত্তি, অষ্টাঙ্গহৃদয়ভেষজসূচি) তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় ইহাদের পুনরনুবাদ একান্ত আবশ্যক। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে ভাবমিশ্র তাঁহার ভাবপ্রকাশ লিখিয়া যান। ইহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কালে লিখিত বলরামের আতঙ্কতিমির-ভাস্কর, মাধবের আয়ুর্বেদপ্রকাশ, ত্রিমল্লের যোগতরঙ্গিণী, রঘুনাথের বৈদ্যবিলাস, বিদ্যাপতির বৈদ্যরহস্য, কবি-চন্দ্রের চিকিৎসারত্নাবলী, মণিরাম মিশ্রের বৃন্দরত্নাবলী, জগন্নাথের যোগসংগ্রহ, হর্ষকীর্ত্তিস্তরীর যোগচিন্তামণি বৈদ্যকসারসংগ্রহ ও লোলিম্বরাজের বৈদ্যজীবন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে যোগরত্নাকর নামেও এক গ্রন্থ লিখিত হয়, তাহাতে চিকিৎসাপ্রণালীর সহিত শস্ত্রক্রিয়ারও নানা পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কালে নারায়ণের রাজবল্লভীয়দ্রব্যগুণ, বৈদ্যচিন্তামণির প্রয়োগামৃত, নারায়ণের বৈদ্যামৃত, বৈদ্যরাজের সুখবোধ, গোবিন্দদাসের ভৈষজ্যরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে অনুধাবন-যোগ্য। আধুনিক কালেও কবিরাজচূড়ামণি গঙ্গাধর তাঁহার জল্পকল্পতরু টীকাতে আয়ুর্ব্বেদের প্রসার বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া গৈলার মদনকৃষ্ণ কবীন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যবর্গ, কবিরাজ দ্বারিকা-নাথ সেন, গঙ্গাপ্রসাদ সেন, কৈলাসচন্দ্র সেন, পীতাম্বর সেন ও শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন প্রমুখ কবিরাজগণ বঙ্গদেশকে আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসার পীঠস্থান করিয়া গিয়াছেন। জার্ম্মান ভাষায় পণ্ডিত জলী আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে একখানি নাতিবিস্তর গ্রন্থ ১৯০১ সালে বাহির করেন। ১৯০৭ খৃঃ অব্দে হর্ণলে ইংরেজী ভাষায় আয়ুর্ব্বেদীয় অস্থিতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাহির করেন ও কর্ণেল বাওয়ার কর্ত্তৃক প্রাপ্ত গুপ্তাক্ষরে লিখিত ৪র্থ শতকের নাবনীতক গ্রন্থখানি অশেষ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক অক্সফোর্ড হইতে মুদ্রিত করিয়াছেন। ডাঃ গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আয়ুর্ব্বেদীয় শল্যযন্ত্র সম্বন্ধে ও আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস সম্বন্ধে দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। মৎকৃত হিন্দুদর্শনের ইতিহাসের ২য় খণ্ডে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে এক অতিবিস্তৃত নিবন্ধ লিখিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ

গণনাথ সেন মহাশয় তাঁহার প্রত্যক্ষশারীর, সিদ্ধান্তনিদান প্রণয়ন করিয়া কবিরাজমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রথম গ্রন্থে তিনি ইউরোপীয় অস্থিবিজ্ঞানের কতকগুলি তথ্য আয়ুর্বেদ-পাঠীদের জন্য সংস্কৃত ভাষায় আহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে অধুনাতন কালে প্রচলিত অনেকগুলি রোগকে আয়ুর্বেদীয় প্রণালীতে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমান কবিরাজমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই কিছু কিছু আয়ুর্ব্বেদীয় গবেষণায় লিপ্ত আছেন ও নানা আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকার প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া নানা প্রবন্ধাদি প্রণয়ন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। ৺যামিনীভূষণ-কৃত কুমারতন্ত্র, বিষতন্ত্র ও শ্রীযুক্ত বিরজাচরণ গুপ্তের 'বনৌষধি-দর্পণ'ও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুশ্রুতের টীকা এবং যোগীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের চরকের টীকা সুধীসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত উ. সি. দত্ত মহাশয়কৃত *Materia Medica of the Hindus*, স্যর ভগবৎ সিংহজীর "A Short History of Aryan Medical Science, উমেশচন্দ্র গুপ্তের বৈদ্যকশব্দসিন্ধু, বিনোদলাল সেনগুপ্তের আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যাভিধান, গোড্‌বোলের নিঘণ্টুরত্নাকর, দত্তরাম চৌবের বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকর, রঞ্জিৎ সিংহের চোবচীনী-প্রকাশ ও বিনোদলাল সেনের আয়ুর্বেদবিজ্ঞান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আয়ুর্বেদের আর একটা বড় দিক্ তাহার রসশাস্ত্রের দিক্, তাহা আগামী প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

আলোচনা

" 'অগ্রসর' হিন্দু বাঙালী শিক্ষায় ভরপূর !"

এই বিষয়ে গত চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে সকলের চেয়ে শিক্ষায় অগ্রসর জাত বৈদ্যেরা। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও শতকরা ৩৬.৫ জন নিরক্ষর।... বৈদ্যদের চেয়ে কম অগ্রসর ব্রাহ্মণেরা, তাহাদের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা ৫৪.৮—এই নিরক্ষরদের মধ্যে শিক্ষাধীন হইবার বয়সের বিস্তর লোক আছে।" ইত্যাদি

মধ্যে মধ্যে পত্রিকায় দেখিয়া থাকি বৈদ্যদের চেয়ে কম অগ্রসর ব্রাহ্মণেরা; কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিতে যে আমরা কি বুঝি তাহা অনেকেই জানেন না। ব্রাহ্মণ অর্থে—রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক ব্যতীত লগ্নাচার্য্য, অগ্রদানী, ভাটব্রাহ্মণ, বর্ণব্রাহ্মণ, উড়িয়া, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, গুজরাটী, মারাঠী, মান্দ্রাজী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বোধ হয় বুঝায়।

সংখ্যালঘিষ্ঠ বাঙালী বৈদ্য জাতির সহিত যদি তুলনা করিতে হয় তাহা হইলে শুধু বাঙালী রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সহিত তুলনা করিলেই বোধ হয় উহা সমীচীন হইবে, কারণ সর্ব্বশ্রেণীর সমন্বয়ে বিরাট ব্রাহ্মণ জাতি গঠিত, কাজেই উহার সহিত বৈদ্য জাতির তুলনা কোনরূপেই সম্ভব নয়। আমার মনে হয় ঐরূপ তুলনামূলক আলোচনা করিলে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নিরক্ষর শতকরা ৫৪.৮ হইবে না, উহার অনেক কম হইবে সন্দেহ নাই।

এখানে লিখিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ পরিচয়জ্ঞাপক ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। এই জাতীয় উন্নতির যুগে বাধা দিবার কেহ নাই। হিন্দুস্থানী বা উড়িয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং বাংলার তাহাদের সংখ্যা নেহাৎ কম হইবে না, মনে হয়। আমার বিশেষ পরিচিত বর্ণব্রাহ্মণ অর্থাৎ জেলে, ভুঁইমালী ও মাহিষ্যদিগের ব্রাহ্মণগণের অনেকেই মোটেই লেখাপড়া জানেন না। ভাটব্রাহ্মণ, কামরূপী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণও শিক্ষায় বহু নীচে। কাজেই এক পর্য্যায়ে সকল ব্রাহ্মণকে ফেলিলে ভুল হইবে।

গত সেন্সসে অনেক ত্রুটিও হইয়াছে। নেত্রকোণায় হিন্দুদিগের চেয়ে মুসলমানগণ শিক্ষায় উন্নত, গণনায় এইরূপ প্রমাণিত হইয়াছে। 'প্রবাসী'তে জনৈক ভদ্রলোক উহা লিখিয়াছেন।

গণনার সময় অনুন্নত ব্রাহ্মণগণের অনেকেই ভয়ে স্ত্রীলোকগণ লিখিতে পড়িতে জানিলেও, অশিক্ষিতা বলিয়া লেখাইয়াছেন।

গণনাকারীদের মধ্যে অনেকেই তথাকথিত শিক্ষিত। কাজেই তাঁহারা নিজেদের ইচ্ছামত ঘর পূরণ করিয়াছেন এবং মফস্বলের অধিকাংশ বাড়ির স্ত্রীলোকগণকে অশিক্ষিত পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। এরূপ প্রায়ই ঘটিয়াছে।

বৈদ্য জাতির সংখ্যা কম, কাজেই শিক্ষায় তাঁহারা উন্নত সন্দেহ নাই, আর তাঁহাদিগের মধ্যে জাতীয় সহানুভূতি বাংলার যে-কোন জাতির চেয়ে যে বেশী তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব। সারা বাংলার ব্রাহ্মণগণের কোন সভা থাকিলেও শিক্ষার জন্য তাঁহারা কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি-না জানি না। এ-বিষয়ে সকল ব্রাহ্মণের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, শুধু রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের লোকসংখ্যা কত বা তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা কত, সঠিক জানিতে পারিলে 'প্রবাসী'র 'বিবিধ প্রসঙ্গে' লিখিয়া আমার ঔৎসুক্য নিবারণ করিবেন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার

সম্পাদকীয় মন্তব্য—

পত্রলেখক যে-যে তথ্য জানিতে চাহিয়াছেন সেন্সস রিপোর্টে তাহা নাই। হিন্দুদের মধ্যে কোন্ কোন্ জাত শিক্ষায় অগ্রসর এবং কত অগ্রসর, সেন্সস রিপোর্টে ও শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে এইরূপ তথ্য ও আলোচনা থাকাতেই আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম। আমরা সকল জাতকেই অগ্রসর দেখিতে চাই। "অগ্রসর"দিগকে অহঙ্কৃত ও "অনগ্রসর"দিগকে কুণ্ঠিত করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই।—প্রবাসীর সম্পাদক।

ভূষণা

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

রেণেলের মানচিত্রের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে, বর্ত্তমান ফরিদপুর ও যশোহর জেলার অনেকটা স্থান জুড়িয়া সেকালে ছিল ভূষণা। ভূষণা অতি প্রাচীন স্থান, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উহা নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখানে হিন্দুরাজার রাজত্ব ছিল, মুসলমান ফৌজদারের শহর ছিল; হিন্দু ও মুসলমান, পাঠান ও মোগলের বহু বার সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছিল। মুকুন্দরামের ভূষণা, সীতারাম রায়ের ভূষণা এখন খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। ইহাই কালের নিয়ম।

ফরিদপুর নগর হইতে পশ্চিম দিকে প্রায় আঠার মাইল দূরে মধুখালি গ্রাম। এখানে অল্পদিন পূর্ব্বেও পুলিসের একটা আড্ডা ছিল। সাবেক কালের ভূষণা এখান হইতে প্রায় তিন-চার মাইল। গ্রাম্য রাস্তা ও মাঠের মধ্য দিয়া কোনমতে সেখানে পৌঁছিতে হয়। যেখানে জনাকীর্ণ নগর ছিল সেখানে এখন ক্ষুদ্র পল্লী। নিকটেই প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ। প্রাচীর ও পরিখার চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বনজঙ্গলের মধ্যে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে এখনও দেখাইয়া দেয়, অমুক স্থানে অপরাধীকে শূলে দেওয়া হইত। সেকালে একদিকে চন্দনা নদী, অন্য দিকে কালীগঙ্গা ভূষণার নৈসর্গিক রক্ষিরূপে বিদ্যমান ছিল। কালীগঙ্গা এখন মৃত, চন্দনা মুমূর্ষু। দুর্গের পাদদেশে একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা কোনরূপে কালের সর্ব্বগ্রাসী কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আছে। পুলিস ষ্টেশনের নাম এখনও ভূষণা থাকিলেও বহুকাল পূর্ব্বে উহা ভূষণা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কিছু কাল ইহার অবস্থিতি ছিল সৈয়দপুর নামক স্থানে, তাহার পর গিয়াছে বোয়ালমারিতে। ভূষণার সমৃদ্ধি এক সময়ে সৈয়দপুরকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল। এখানে পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটি ছিল, বাণিজ্যের শ্রী বিরাজ করিত। তাহাও এখন অতীতের কথা।

ভূষণা-মামুদপুর কথাটা খুব প্রচলিত, কিন্তু ভূষণা মধুমতী নদীর পূর্ব্বদিকে, মামুদপুর পশ্চিমে। বোধ হয় মধ্যবর্ত্তী নদী পূর্ব্বে ক্ষুদ্রকায় ছিল এবং উভয় স্থানের সামাজিক যোগ থাকায় নামটার উদ্ভব হইয়াছে। এখন ভূষণা ফরিদপুর জেলায়, মামুদপুর যশোহরের মধ্যে।

'দিগ্বিজয়প্রকাশ' নামক হিন্দু ভৌগোলিক গ্রন্থে পাওয়া যায়, ধেনূকর্ণ নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি যশোরেশ্বরীর মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পুত্র কণ্ঠহারের "বঙ্গভূষণ" উপাধি ছিল এবং তিনিই যশোহরের উত্তর ভাগ অধিকার করিয়া তাহার নাম ভূষণা রাখেন। কোন্ সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা ঠিক জানা যায় না, তবে অবস্থা দৃষ্টে বলিতে হয় বারভূঞার অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে।*

মুসলমান আমলে ভূষণা নগর ছিল সাতৈর পরগণার অন্তর্গত। মোগল শাসনকালে যখন সুবে বাংলা (উড়িষ্যা সমেত) চাব্বশটি সরকারে বিভক্ত হয় তখন এই সাতৈরকে সরকার মামুদাবাদের অন্তর্গত দেখা যায়। সরকার মামুদাবাদ ও সরকার ফথেয়াবাদ দুইটি পাশাপাশি সরকার, একের ইতিহাস অন্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আইন-ই-আকবরীতে আমরা ফথেয়াবাদকে একটি বিস্তীর্ণ জনপদরূপে দেখিতে পাই। বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অনেকটা অংশ, যশোহর জেলার খানিকটা এবং বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ, ঢাকা ও নোয়াখালি জেলার খানিকটা ইহার অন্তর্গত ছিল। মামুদাবাদ সরকারের মধ্যে বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার পশ্চিমাংশ, যশোহর জেলার অনেকটা এবং নদীয়া জেলার কতকটা ছিল। ইহাতে মহাল ছিল ৮৮টি এবং ইহার রাজস্ব ছিল ১১৬১০২৫৬ দাম। ফথেয়াবাদ অপেক্ষা এই সরকার অধিক রাজস্ব যোগাইত, কিন্তু সৈন্য যোগাইতে হইত ফথেয়াবাদকে অনেক বেশী।

---

* 'দিগ্বিজয়প্রকাশ' খুব প্রাচীন বা প্রামাণিক গ্রন্থ না হইলেও প্রাচীন ঘটনাবলীর স্মৃতির উপর লিখিত এবং হিন্দুদিগের এই শ্রেণীর গ্রন্থের অভাব ইহাকে মূল্যবান্ করিয়া রাখিয়াছে।

এই দুইটি পাশাপাশি জনপদ নামে মুসলমান-প্রতাপ ঘোষণা করিলেও বহুকাল পর্য্যন্ত হিন্দুরাজার প্রভাবান্বিত ছিল। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বিজয়গুপ্ত-প্রণীত মনসামঙ্গলের কোন পাঠে এক 'অর্জ্জুন রাজা'র উল্লেখ পাইয়াছেন যাঁহার ছিল "মুল্লুক ফতেয়াবাদ বঙ্গরোড়া তক সাম"। এই অর্জ্জুন রাজা সম্ভবতঃ পাঠানরাজের আনুগত্য স্বীকার করিতেন, কিন্তু মামুদাবাদের হিন্দুরাজা গৌড়ের প্রতাপ ক্ষুণ্ণ দেখিলেই মস্তক উন্নত করিতে ত্রুটি করিতেন না। আইন-ই-আকবরীতে আমরা পাই, এখানে কেল্লা ছিল, আশেপাশে নদী ছিল, পূর্ব্বে জয় সত্ত্বেও শের শাহকে আবার এই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া জয় করিতে হইয়াছিল। সেই জয়ের সময়ে এখানকার রাজার কতকগুলি হস্তী জঙ্গলে পলায়ন করে এবং তাহার পর জঙ্গলের মধ্যে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হয়। এই রাজার রাজধানী ভূষণায় ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ঠিক কোন্ সময়ে মামুদাবাদ নামের উৎপত্তি তাহা বলা যায় না, তবে মনে হয় বাংলার পাঠান নৃপতি ফথ শার (১৪৮১-৮৭ খৃঃ অব্দ) নামানুসারে ফথেয়াবাদের নাম হইয়াছে আর মামুদাবাদের নামও তাহার নিকটবর্ত্তী কোন সময়ের। শের শাহের আক্রমণের পরবর্ত্তী সময়ের কোন ধারাবাহিক বিবরণ না পাইলেও আমরা বুঝিতে পারি যে হিন্দুরাজাদের প্রভাব প্রবল ছিল—নতুবা মোগল আমলে মামুদাবাদ ও ফথেয়াবাদকে শাসনে আনিতে দিল্লীর বাদশাহকে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হইত না। আকবরের রাজত্ব-কালে বাংলা দেশে বরাবর গোলমাল চলিয়াছিল। আকবর-নামায় পাওয়া যায়, সর্ব্বদা বিবাদ থাকায় বাংলা দেশের নাম হইয়াছিল 'বুলঘাক'। আকমহলের যুদ্ধের পর মুরাদ খাঁ নামক জনৈক সেনাপতি ফথেয়াবাদ ও বাকলা সরকার জয় করেন বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়। বাকলা চন্দ্রদ্বীপে বহুকাল পর্য্যন্ত স্বাধীন বা অর্দ্ধস্বাধীন হিন্দু রাজার রাজত্ব ছিল—সুতরাং এই জয়ের অর্থ সম্পূর্ণ খাসদখল নহে, আনুগত্য-স্বীকার। ইহার পরও পাঠান ও মোগলের সঙ্ঘর্ষ বাংলা ও বিহারে ভালভাবেই চলিতে লাগিল। বাদশাহের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যেও বিশ্বাসঘাতকের অভাব ছিল না। মুরাদ খাঁ ফথেয়াবাদে বিদ্রোহ দমন করিয়া সেখানে অবস্থিত ছিলেন। তিনি মুখে রাজভক্ত ছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ বাদশাহের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থের চিন্তাই বেশী করিতেন। আকবরনামায় পাওয়া যায়, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সে-অঞ্চলের ভূম্যধিকারী মুকুন্দরাম রায় তাঁহার পুত্রগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের হত্যাসাধন করেন ও সম্পত্তি অধিকার করিয়া লন। "বারভুঞা" গ্রন্থ প্রণেতা আনন্দনাথ রায় কিন্তু লিখিয়া গিয়াছেন, "মোরাদের সহিত তাঁহার বিশেষরূপ সখ্যতা থাকায়, মুকুন্দ তাঁহার পুত্রগণের যথোচিত সহায়তা সাধনে বদ্ধপরিকর হন।" ইহা তিনি কোথায় পাইলেন জানি না। আনন্দনাথ রায় আরও বলেন, "টোডরমল্ল জানিতে পারিলেন যে, মুকুন্দ মোগল পক্ষাবলম্বী হইয়া পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এজন্য নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া ফথেয়াবাদে অন্য কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিয়োগ না করিয়া মুকুন্দ রায়কে রাজোপাধি প্রদান ও ঐ সরকারের কতক শাসনভার অর্পণ করিলেন।" "মানসিংহ মধ্য সময়ে যখন একবার বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন তৎসময়ে শাসনকর্ত্তা সায়দ খাঁ, মুকুন্দ রায়কে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে এক জন মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। মুকুন্দ রায় এই আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু কোনও মতে নব শাসনকর্ত্তার হস্তে ফথেয়াবাদ সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। উভয় পক্ষের মধ্যে একটি যুদ্ধঘটনার অবতারণা হইল। তেজস্বী বীরবর মুকুন্দ রায় অনায়াসে সেই যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে তাড়াইয়া দিলেন। পরে সায়দ খাঁ দলবল সহ উপস্থিত হইয়া মুকুন্দ রায়কে পরাস্ত ও হত করেন।" এই সকল কথাও রায়-মহাশয় প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করেন নাই। মুকুন্দরাম রায় প্রদত্ত ব্রহ্মত্র জমীর দলীলের সন্ধান কালেক্টরীতে পাওয়া গিয়াছে।

আকবরনামায় পাই, খাঁ আজিম কোকা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ-দমনে প্রেরিত হইলে (১৫৮২ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার বিরুদ্ধে যে-সকল বিদ্রোহী নেতা সমবেত হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে ফথেয়াবাদের কাজীজাদা ছিলেন একজন। ইনি অনেক রণতরী লইয়া আসিয়াছিলেন। কামানের গোলায় ইহার মৃত্যু হইলে কালাপাহাড় ইহার স্থলে নৌবিভাগের ভার গ্রহণ করেন।

ইহার কিছুকাল পরে রাজা মানসিংহের উড়িষ্যা জয়ের

পর আমরা ভূষণায় বিষম গোলযোগের সংবাদ পাই। এই সময়ে, যেরূপেই হউক, ভূষণা চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের হস্তগত হইয়া পড়িয়াছিল। মুকুন্দরাম সম্ভবতঃ তখন মৃত, তাঁহার পুত্র সত্রাজিৎ কি করিতেছিলেন বা কোথায় ছিলেন জানা যায় না। বিদ্রোহী আফগানেরা লুটপাট করিতে করিতে ভূষণার দিকে অগ্রসর হয়। আবুলফজল এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বোধ হয় চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের সম্বন্ধবিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন। তাঁহার মতে কেদার রায় ছিলেন চাঁদ রায়ের পিতা। চাঁদ রায় কেদার রায়ের পরামর্শে বিদ্রোহী আফগানদিগকে বন্দী করার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু ফলে তাঁহার নিজেরই প্রাণ গেল। চাঁদ রায় না-কি আতিথেয়তার ভাণ করিয়া পাঠানসর্দ্দার দেলওয়ার, সুলেমান ও উস্‌মান্‌কে ভূষণা-দুর্গে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেখানে ছলক্রমে দেলওয়ারকে বন্দী করা হইলে সুলেমান তরবারি উন্মুক্ত করিয়া নিকটবর্ত্তী বহু লোককে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি দুর্গদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে চাঁদ রায় তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, কিন্তু উস্‌মান আসিয়া সুলেমানের সহায়তা করিতে লাগিলেন এবং ঘটনার বিবরণ শুনিয়া পাঠানেরা প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। চাঁদ রায়ের নিজের পাঠান-সৈন্যও তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। ফলে চাঁদ রায় নিহত হইলেন। আফগান-সৈন্য লুটপাট করিতে করিতে অগ্রসর হইলে দুর্গস্থ লোকেরা মনে করিল চাঁদ রায় বুঝি ফিরিতেছেন। তাহারা দুর্গদ্বার খুলিয়া দিল, আফগানেরাও সহজেই জয়লাভ করিল। তাহার পর ইশা খাঁর ষড়যন্ত্রে আফগানেরা তাঁহার সহিত মিলিত হইলে ভূষণা-দুর্গ ও রাজ্য কেদার রায়ের হস্তে সমর্পিত হইল।

কেদার রায় এইরূপে আফগানদিগের যোগে ভূষণার মালিক হইয়া বসিলেন, কিন্তু প্রবল মোগল কর্ত্তৃপক্ষ বেশী দিন এ অবস্থা স্থির থাকিতে দিলেন না। মানসিংহ শীঘ্রই দুর্জ্জন সিংহের অধীনে একদল বাছা সৈন্য ভূষণায় প্রেরণ করিলেন (১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ)। সুলেমান ও কেদার রায় দুর্গ দৃঢ় করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। মোগল-সৈন্য দুর্গ অবরোধ করিল, প্রতিদিন যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দুর্গমধ্যে এক কামান ফাটিয়া যাওয়ায় সুলেমান ও আরও অনেকে নিহত হইলেন। কেদার রায় আহত হইয়া পলায়ন করতঃ ইশা খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। (আকবরনামা)

সম্ভবতঃ ১৫৯৮-৯৯ অব্দে মানসিংহের স্থানান্তরে অবস্থানকালে সত্রাজিৎ আবার ভূষণায় প্রবল হইয়া পড়েন।

কথিত আছে, টোডরমল মুকুন্দরামকে ভূষণার জমিদার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন (১৫৮২ খৃঃ)। ৺সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেকের সময় মুকুন্দরাম ও তৎপুত্র সত্রাজিৎ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন (১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু, তৎপরে অভিষেক)। সতীশচন্দ্র আরও বলেন, মুকুন্দরাম কায়স্থ রাজা কেশব সিংহের বংশধর। কেশব সিংহ উত্তর-রাঢ় হইতে আসিয়া দক্ষিণ-রাঢ়ে আন্দুল-সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। কি সূত্রে মুকুন্দরাম ভূষণায় প্রাধান্য লাভ করেন তাহা স্থির করা কঠিন। তবে তিনি যে সম্রাট আকবরের সময়ে ভূষণা ও নিকটবর্ত্তী ফথেয়াবাদ অঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা সমসাময়িক বিবরণ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। কায়স্থদিগের দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ সমাজ উভয়ই তাঁহাকে দাবি করে। ফথেয়াবাদের বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের ইনিই প্রতিষ্ঠাতা। এই কার্য্যের জন্য ইঁহাকে চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চল হইতে অনেক কুলীন কায়স্থ আনাইতে হইয়াছিল।

মুকুন্দরামের পুত্র সত্রাজিৎ কখনও মোগল-পক্ষের সহায়তা, কখনও বিরোধিতা করিয়া বহুকাল ভূষণার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় যে আব্‌দুল লতিফের ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন ও বাহারিস্তান্ নামক পুস্তকের সন্ধান দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, সত্রাজিৎ কিছুদিন মোগল বাদশাহের বিদ্রোহিতাচরণ করিয়াছিলেন। সুবেদার ইস্‌লাম খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে ইফ্‌তখর্ নামক এক সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। ইহাতে সত্রাজিৎ দমেন নাই। তিনি বাদশাহের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু মোগলেরা নদী পার হইয়া অতর্কিত ভাবে তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিল। সত্রাজিৎ তখন বশ্যতা স্বীকার করিয়া ইস্‌লাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। * ইস্‌লাম খাঁ যখন আঠারবাঁকা ও

---

* এই প্রসঙ্গে মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত *Journal of Indian History*, Dec. 1932 তে বাহারিস্তানের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

ভৈরব নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত আলাইপুর হইতে কুচ করিয়া নসরপুর বা নাজিরপুরের দিকে যাইতেছিলেন তখন পথিমধ্যে ফতেপুর নামক স্থানে সত্রাজিৎ আসিয়া দেখা করিলেন (১৬০৯ খৃঃ অব্দ) এবং সুবেদারকে আঠারটি হস্তী উপহার দিলেন। দুই পক্ষে সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইলে সত্রাজিৎ মোগলপক্ষে বিদ্রোহদমনে মন দিলেন। এই সময়ে যিনি ফথেয়াবাদের অধিকারী হইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহার নাম মজলিস্ কুতব। কবি সৈয়দ আলাওলের আত্মপরিচয়ে এই মজলিস্ কুতবের উল্লেখ আছে। হবিবুল্লা নামক এক সেনাপতি বিদ্রোহী মজলিস্ কুতবের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন আর রাজা সত্রাজিৎ হইলেন এই সেনাপতির সহায়। মজলিস্ কুতব ফথেয়াবাদ-দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিয়া মুশা খাঁর সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। সাহায্য আসিল কিন্তু মজলিস্ মোগল সৈন্যকে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। মোগল ঐতিহাসিকের বিবরণ হইতে জানা যায়, এই যুদ্ধে সত্রাজিতের সৈনাপত্য ও সাহস মোগলদিগের বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল। পাঠানপক্ষীয় লোক পুনঃ পুনঃ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মোগলপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল, কিন্তু সত্রাজিৎ তাহাদিগের সকল উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিলেন। অনেক মারামারির পর মজলিস্ মুশা খাঁর সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। অবশেষে তিনি দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

ইহার পর আমরা ভূষণারাজ সত্রাজিৎকে মোগলপক্ষে কুচবিহারের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত দেখিতে পাই। মোগল-সুবেদার সেখ আলাউদ্দিন ইস্‌লাম খাঁর আহ্বানে তিনি মোগল-সৈন্যের যোগে কোচ হাজো আক্রমণ করেন। কোচ-হাজো বিজিত হইলে তাঁহার শৌর্য্যে প্রীত সুবেদার তাঁহাকেই পাণ্ডু ও গৌহাটির থানাদার বা সীমান্তরক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার বহু অনুচর এবং ভূষণার অধিপতিস্বরূপ একটা বিশিষ্ট খাতির ছিল। ইহার ফলে তিনি আসামবাসী-দিগের বন্ধুত্ব লাভ করেন এবং কোচ-রাজবংশের সহিতও ঘনিষ্ঠতা সম্পাদনে সমর্থ হন। সেখ আলাউদ্দিনের পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তারা তাঁহাকে অনেক বার ডাকিয়া পাঠাইলেও তিনি সে ডাক গ্রাহ্য করেন না, পূর্ব্বপ্রথামত পেশকশ্ ও পাঠান না। এদিকে তিনি কোচরাজের ভ্রাতা বলিনারায়ণের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং মোগল-সেনাপতি আবদার সালামের কর্ত্তৃত্বাধীনে সৈন্য প্রেরিত হইলে সত্রাজিতের বিশ্বাসঘাতকতায় অহোম নৌবাহিনী কর্ত্তৃক মোগল-সৈন্যের পরাজয় ঘটে। ইহার ফলে সত্রাজিৎ ধুবড়ীতে ধৃত হইয়া ঢাকায় প্রেরিত হন এবং এখানে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হয় (খৃঃ ১৬৩৬ অব্দে বা তাহার নিকটবর্ত্তী সময়ে)।

ইহার পর ভূষণা কিছুকাল মোগল-সেনাপতি সংগ্রাম শাহের 'নাওরা' মহলভুক্ত থাকে। সংগ্রাম পশ্চিমদেশীয় লোক। কেহ বলেন, তাঁহার আদি বাসস্থান ছিল রাজপুতানায় (৺আনন্দনাথ রায়), কেহ বলেন জম্মুতে (৺সতীশচন্দ্র মিত্র)। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে নানা স্থানে বিদ্রোহদমন ও দস্যুদলন কার্য্যে যশ অর্জ্জন করিয়া শেষে ভূষণা অঞ্চলে ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তখনও তাঁহাকে সম্রাটের কার্য্যে আবশ্যকমত নৌ-সৈন্য যোগাইতে হইত। ঠিক কোন্ সময়ে তিনি ভূষণায় আধিপত্য প্রাপ্ত হন ঠিক করা কঠিন। তবে তিনি বেশ প্রতাপের সহিতই শাসনকার্য্য চালাইতেন। বোধ হয় এখানে তাঁহার স্থায়ী ভাবে বাস করিবার ইচ্ছা ছিল, তাই বৈদ্য-সমাজে পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়া "হাম বৈদ্য" বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৈদ্যেরা সহজে অজ্ঞাতকুলশীল রাজন্যের সহিত বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হন নাই। কুলজী গ্রন্থের প্রমাণে বুঝিতে পারা যায়, নবাগত সামন্তকে সময়ে সময়ে বল-প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। মথুরাপুর গ্রামের সুবিখ্যাত "দেউল" ইহারই কীর্ত্তি। এই দেউল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের কৃপায় এখন আমরা অনেক কথাই শুনিতেছি।*

সংগ্রাম বা তাঁহার পুত্রের প্রতাপ ভূষণা অঞ্চল হইতে কিরূপে গেল ঠিক জানা যায় না। মনে হয়, প্রায় তাঁহাদের তিরোধানের সময়েই ফথেয়াবাদ হইতে ফৌজদারের আসন স্থানান্তরিত হইয়া ভূষণায় আসে। ফথেয়াবাদের উপর পদ্মাদেবীর অনুগ্রহ এবং সংগ্রাম শাহ বা তাঁহার পুত্রের ভূসম্পত্তি শাসন ইহার কারণ হইতে পারে।†

* ১৩৪০ চৈত্র সংখ্যার 'প্রবাসী' দ্রষ্টব্য।

† আনন্দনাথ রায় তাঁহার ফরিদপুরের ইতিহাসে সম্রাট্ আওরংজেবের সময়ে বঙ্গদেশে সংগ্রাম শাহের নানা কীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, আবার যশোহর কালেক্টরীর তায়দাদে ১৬২৬ ও ১৭৪১ (১৬৪১?) খৃষ্টাব্দে সংগ্রাম শাহ কর্ত্তৃক ভূমিদানের কথাও লিখিয়াছেন। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর সম্রাট্ এবং সত্রাজিৎ ভূষণার রাজা। সে সময়ে সংগ্রাম শাহের ভূমিদান কিরূপে সম্ভব হয়? ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে শাজাহান বাদশাহ

ইহার পর আমরা সীতারাম রায়ের পিতা উদয়নারায়ণকে ভূষণার ফৌজদারের অধীনে সাজোয়ালরূপে দেখিতে পাই। উদয়নারায়ণ ভূষণা নগরের অদূরে গোপালপুর গ্রামে বাসস্থান স্থির করেন; পরে হরিহরনগর নামক গ্রামে বাস করিতে থাকেন। তিনি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলসম্ভূত ছিলেন। কাটোয়ার নিকট কোন গ্রামে তিনি দয়াময়ী নাম্নী এক ঘোষ-দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। সীতারাম এই বিবাহের ফল।

সীতারাম সম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। তবু, বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিছু না-বলিলে ভূষণার কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি প্রথম বয়সে কিছু সংস্কৃত, ফার্সি ও উর্দ্দু শিখিয়াছিলেন কিন্তু অস্ত্রশিক্ষায়ই তাঁহার মনোযোগ ছিল অধিক। তাঁহার পিতা ঢাকায় রাজদরবারে নিযুক্ত থাকার সময়ে তিনিও সেখানে যাতায়াত করিতেন। পরে উদয়নারায়ণ ভূষণার সাজোয়াল হইয়া আসিলে, তিনিও দস্যুদমনের কার্য্যে ভূষণা অঞ্চলে আসিলেন। এই কার্য্যে সাফল্যলাভ করিয়া সীতারাম নবাবসরকার হইতে জায়গীরও লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পিতার ন্যায় নবাব সরকারে চাকরি করিয়াই জীবনক্ষেপ করিবার লোক ছিলেন না। তাঁহার অস্ত্রবিদ্যা নিজের কার্য্যে ভালমত লাগাইতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। নবাবপক্ষে নিযুক্ত হইয়া করিম খাঁ পাঠানের বিদ্রোহদমনই তাঁহার উন্নতির সূত্রপাত। সে সময়ে দস্যুবৃত্তি দেশে বিশেষভাবে প্রচলিত। সীতারাম জায়গীর ও সেই সঙ্গে আরও দস্যুদলনের ভার পাইলেন। তাঁহার বীর সঙ্গীও অনেক জুটিয়া গেল: জুনিরাম রায় ও রামরূপ বা মেনাহাতী ইহাদের মধ্যে প্রধান। দস্যুদলনে তিনি ক্রমেই অধিকতর কৃতকার্য্যতা দেখাইতে লাগিলেন; অন্যত্র বাসস্থান স্থাপন করিলেও সমৃদ্ধ ভূষণা নগরীতে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। তাঁহার খ্যাতি বাড়িতে লাগিল ও 'রাজা' উপাধি লাভ হইল। তিনি দক্ষিণ-বাংলা আবাদে আনিবার সনন্দ পাইলেন এবং বর্ত্তমান মাগুরা মহকুমায় অবস্থিত মহম্মদপুর নগর স্থাপন করিলেন। হিন্দুর এই নূতন রাজধানীর মুসলমানী নাম হইল কেন? এ-সম্বন্ধে নানা প্রবাদ আছে। খুব সম্ভব, তখনও তিনি মোগলের বশ্যতা অস্বীকার করেন নাই, মোগল শাসনকর্ত্তাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্যই নিজ নগরের মুসলমানী নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীদিগের মধ্যেও যোগ্য মুসলমানের অভাব ছিল না। মৃণ্ময় দুর্গ, সুবৃহৎ মনোরম জলাশয়, সুন্দর দেবমন্দির ইত্যাদি দ্বারা মহম্মদপুর ভূষিত হইয়াছিল। সীতারামের কীর্ত্তি অতীতের অনেক ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া এখন পর্য্যন্ত দর্শকের চিত্ত বিনোদন করে। নানাস্থান হইতে রাজসরকারে কর্ম্ম ও বাণিজ্যাদি উপলক্ষে লোক আসিয়া মহম্মদপুরকে ক্রমে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। এই সময়ে নানাস্থানে রাজা-প্রজায় অসদ্ভাব—রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা—সীতারামকে রাজ্যবিস্তারে সহায়তা করে। জমিদারীতে বিশৃঙ্খলা?—সীতারাম অমনি শৃঙ্খলার নামে গ্রাস করিতে প্রস্তুত। অন্য জমিদারের প্রজা বিদ্রোহী?—সীতারাম সেখানে সেই প্রজাকে নিজের প্রজায় পরিণত করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। সীতারামের জমিদারী ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এক সময়ে মুকুন্দরাম ও সত্রাজিতের প্রতাপে ভূষণা অঞ্চল কম্পিত হইত। সীতারাম সত্রাজিতের বৃদ্ধ প্রপৌত্রগণকে নিজের এলাকাভুক্ত করিলেন। নলডাঙ্গার রাজা তাঁহার জমিদারীর পূর্ব্বভাগ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

সীতারামের সকল কথা বিস্তৃতরূপে লিখিবার স্থান এ নয়। উত্তরে পদ্মা পর্য্যন্ত অনেক পরগণা—নসিবসাহী, নসরৎসাহী, মহিমসাহী, বেলগাছী প্রভৃতি এবং সম্ভবতঃ পদ্মার উত্তরেও কিছু কিছু তিনি ক্রমে হস্তগত করেন। দক্ষিণেও তাঁহার রাজ্য অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে—কতক গায়ের জোরে, কতক আবাদী সনন্দের বলে। উজানীর রাজাদের অনেক স্থান তিনি অধিকার করিয়া লন।

সীতারাম কেবল রাজ্যবিস্তারই করিতেন না, তিনি নিজের রাজ্যে শৃঙ্খলাস্থাপনের চেষ্টা করিতেন, পাণ্ডিত্যের সমাদর ও সাহায্য করিতেন, বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতেন, সমাজসংস্কারেও অমনোযোগী ছিলেন না।

মোগল সুবেদারগণের দুর্ব্বলতাই সীতারামের প্রতাপ বহুদিন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। ক্রমে ভূষণার ফৌজদারের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিল। বারাসিয়া নদীর কূলে এক ক্ষুদ্র যুদ্ধে ফৌজদার আবুতোরাপ নিহত হইলে সীতারাম ভূষণা অধিকার করিলেন। ভূষণার তখন অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি; নানারূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, কাগজ, গালা, বাসনপত্র, তুলা

ইত্যাদির জন্য ভূষণা বিখ্যাত ছিল। কাগজ ও গালার কাজ এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। সাতৈরের পাটীর ন্যায় সূক্ষ্ম পাটী বোধ হয় এখনও অন্য কোথাও প্রস্তুত হয় না। সৈয়দপুরের প্রকাণ্ড পান্সী নৌকা দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাংলায় একটা দর্শনীয় বিষয় ছিল।

আবুতোরাপ নিহত হইলে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বক্স আলি খাঁ নামক এক ব্যক্তি ভূষণায় ফৌজদার হইয়া আসিলেন। নিকটবর্ত্তী জমিদারদিগের উপর সীতারামকে দমন করিবার জন্য আদেশ প্রেরিত হইল। নবাবের হুকুম—জমিদারেরা সীতারামের উপর বেঁকিয়া দাঁড়াইলেন। সংগ্রাম সিংহ, দয়ারাম প্রভৃতি হিন্দু সৈন্যাধ্যক্ষেরা বক্স আলির সঙ্গে আসিয়া সীতারাম-দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে সীতারাম জয়লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার ভূষণা-দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। দয়ারাম মহম্মদপুরের দিকে ছুটিলেন। সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতীর গুপ্তহত্যার কথা এ অঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ। ভূষণায় অবস্থান নিরাপদ নহে দেখিয়া সীতারাম মহম্মদপুরে পলায়নকরতঃ তাঁহার কতক পরিজন স্থানান্তরিত করিলেন। শেষে যুদ্ধে আহত হইয়া বন্দী হইলেন। মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হওয়ার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। কিরূপে মৃত্যু হয় সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

এই উপলক্ষে নাটোরের রামজীবন ও রঘুনন্দন বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হন; দয়ারামেরও জমিদারী লাভ ঘটে।

রঘুনন্দন নবাব-সরকারে কার্য্য করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি-শালী হইয়াছিলেন, তাঁহারই প্রভাবে ভূষণা জমিদারী তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত হয়। জমিদারীটি তখন প্রকাণ্ড ছিল। অনেক পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ নবাবের সময় যখন পূর্ব্বতন সরকারগুলির পরিবর্ত্তে তেরটি চাকলার সৃষ্টি হয় তখন একটি চাকলা হইয়াছিল ভূষণা। প্রত্যেক চাকলায় একজন করিয়া ফৌজদার ও তাঁহার অধীন নানা কর্ম্মচারী ছিলেন। সীতারামের পতনের পরও ভূষণায় ফৌজদার রহিলেন কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ অনেক স্থান নাটোরের জমিদারীভুক্ত হইয়া গেল। রামজীবন যখন ভূষণা জমিদারীর সনন্দ প্রাপ্ত হন, তখন দিল্লীতে সম্রাট্ ফাররোক্‌শের। সনন্দ তাঁহারই মোহরাঙ্কিত ছিল।

রঘুনন্দন হইতেই নাটোর জমিদারীর অভ্যুদয়। সামান্য অবস্থা হইতে নিজের প্রতিভাবলে রঘুনন্দন বড় হইয়া উঠেন এবং ভ্রাতা রামজীবনের নামে বিস্তীর্ণ জমিদারী অর্জ্জন করেন। দীঘাপাতিয়া রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ প্রতিভাশালী দয়ারাম রায় ছিলেন রঘুনন্দনের দক্ষিণহস্তস্বরূপ, আর জমিদারী পরিচালনে সুদক্ষ ছিলেন রামজীবন।

রামজীবন নাটোর জমিদারী বৃদ্ধিই করিয়াছিলেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর কিছুকাল দয়ারাম জমিদারীর কাজকর্ম্ম চালান, পরে রামজীবনের পৌত্র রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার উপরই জমিদারীর ভার পড়ে। তখনকার জমিদারী পরিচালনা এখনকার মত ছিল না। জমিদারেরা পুলিসের তত্ত্বাবধান করিতেন, ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিতেন। রামকান্ত বিষয়কার্য্য অপেক্ষা ধর্ম্মকার্য্যেই অধিক অনুরাগী ছিলেন। অল্পবয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলে জমিদারী তাঁহার পত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর হস্তে আসে। রাণী যেমন বিষয়কর্ম্মে, তেমনি দেবার্চ্চনা, দান-ধ্যানাদি কার্য্যে মনোযোগ দিতেন। কিন্তু ভূষণার জমিদারীকে যে খাজনা যোগাইতে হইত, তাহাতে তাঁহার ন্যায় দানশীলা রমণীর পক্ষে ইহার রক্ষা অনেক সময়েই দুষ্কর হইয়া পড়িত। ইংরেজ শাসনের প্রথম আমলের কাগজপত্রে দেখা যায় ভূষণা জমিদারী রাজস্ব আদায়ের জন্য সময়ে সময়ে ইজারা দেওয়া হইত। তখন ভূষণায় আদালত ছিল এবং ইহা রাজসাহীর সুপারভাইসরের তত্ত্বাবধানে চলিত। রাজসাহীর সুপারভাইসর থাকিতেন নাটোরে। তাঁহার উপরে ছিল মুর্শিদাবাদে রাজস্ব-কৌন্সিল। ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভের অল্পদিন পরই (১৭৭০-১৭৭১ খৃষ্টাব্দ) ভূষণা হইতে আদালত উঠিয়া যায়, কিন্তু তখনও রাজসাহীর সুপারভাইসরের এক সহকারী সাহেব ভূষণায় থাকিতেন। রাণী ভবানীর সময় রাজস্ব আদায়ের জন্য ভূষণার জমিদারী যে-সকল ইজারাদারের হস্তে দেওয়া হইত তাঁহাদের মধ্যে নড়াইলের জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীশঙ্কর রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সরকারী কাগজপত্র হইতে মনে হয় ভূষণায় যে অত্যধিক পরিমাণে কর ধার্য্য হইয়াছিল তাহা পুনঃ পুনঃ ইজারা বন্দোবস্ত সত্ত্বেও আদায় করা যাইত না। কালেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা হওয়ার পর ভূষণার জন্য একজন অ্যাসিষ্টাণ্ট কালেক্টর থাকিতেন। ক্রমে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ভূষণা যশোহর

জেলাভুক্ত হইল এবং রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র সাধক রামকৃষ্ণের সময়ে রাজস্বের দায়ে ইহার পরগণাগুলি খণ্ডে খণ্ডে বিক্রীত হইয়া অন্য জমীদারের হস্তে চলিয়া গেল। নাটোর রাজবংশের হাতে থাকিল কেবল রাণী ভবানীকৃত দেবত্র গ্রামগুলি। কালের প্রভাবে সেই প্রাচীন স্থানীয় রাজধানী ইহার দুর্গসমেত জঙ্গলে পরিণত হইয়া গেল।

অন্যপূর্ব্বা

শ্রীসীতা দেবী

শীতশেষের প্রভাত, তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। গাঢ় কুয়াসার যবনিকার ভিতর দিয়া পল্লীগ্রামের পথঘাট কিছুই ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না। তবু মানুষকে উঠিয়া ঘরের বাহির হইতে হইয়াছে, কারণ এ শহর নয় যে যত-খুশী বেলা অবধি শুইয়া থাকিলেও চাকর-বাকর ঘরের কাজ সারিয়া, সামনে খাবার অগ্রসর করিয়া দিবে। তাহা ছাড়া, কথা হইতেছে ঠিক একালের নয়, পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বের। তখন শহরেও ঝি-চাকরের প্রাচুর্য্য এত ছিল না।

শীত শেষ হইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু যাইবার আগে যেন মরণ-কামড় বসাইয়া যাইতেছে। তীব্র তীক্ষ্ণ বায়ু যেন হাড়ের ভিতর ফুটা করিয়া দিতেছে, মানুষের হাত-পাও আর তাহার অধীন নাই, চালাইতে গেলে চলে না—কাঁপুনি থামাইতে চাহিলেও থামে না।

অত ভোরেও দত্তবাঁধে একটি মেয়ে স্নান করিতে আসিয়াছে। ঘাট তখন জনশূন্য, কিন্তু মেয়েটির তাহাতে কিছু ভয় নাই। ভীষণ শীতের আঘাতে তাহার তনুলতা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, কিন্তু মন তাহার সেদিকে নাই। যদি কেহ আসিয়া পড়ে এই ভাবনাতেই সে উৎকণ্ঠিত। থাকিয়া থাকিয়া ঘাটের পথটির দিকে শঙ্কাকুল চোখে তাকাইতেছে, আর তাহার হাত আরও দ্রুততর হইয়া উঠিতেছে। মস্তবড় একটি ঘড়া সে লইয়া আসিয়াছে, বাড়িতে জল লইয়া যাইবার জন্য। সেইটিই সে মাজিয়া পরিষ্কার করিতেছে।

ঘড়া মাজা হইয়া গেল। মেয়েটি জলে নামিয়া টপ্ টপ্ করিয়া গোটা দুই ডুব দিয়া উঠিয়া পড়িল। বেশী সময় লইয়া স্নান করিবার মত দিন নয়, হাতের ভিতরটাসুদ্ধ শীতে অবশ হইয়া উঠিতেছে, লোকজন কেহ আসিয়া পড়ে সে ভয়ও আছে। ঘড়াটি টানিয়া লইয়া সে জল ভরিয়া লইল। কিন্তু সিক্ত বস্ত্রে বাড়ি ফেরা অসম্ভব, সে তাহা হইলে পথেই মারা পড়িবে। কুয়াসার ভিতর দিয়া চক্ষু যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া সে দেখিবার চেষ্টা করিল, কোনো মানুষের আগমনের কোনো লক্ষণ দেখিতে পাইল না। তাড়াতাড়ি সঙ্গে আনীত একখানি লাল চওড়া পাড়ের শাড়ী পরিয়া ভিজা শাড়ীখানি সে ছাড়িয়া ফেলিল। কিন্তু শীত কি তাহাতেও বাগ মানিতে চায়? আঁচলটাকে দুই ফের দিয়া সে নিজের গায়ে শক্ত করিয়া জড়াইয়া পিতলের ঘড়াটি কোমরে তুলিয়া লইয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

কুয়াসায় মেয়েটির মুখ ভাল করিয়া দেখা যায় না। তবে বেশী দীর্ঘাঙ্গী ও অঙ্গসৌষ্ঠববতী, তাহা বুঝা যায়। তাহার পরিপূর্ণ দেহখানিতে লাবণ্যের জোয়ার উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। মুখখানি নিশ্চয়ই সুন্দর। বিধাতা যাহার দেহখানিকে এত সুষমা ঢালিয়া নিপুণ ভাবে গড়িয়াছেন, মুখখানিতে তিনি কার্পণ্য করিবেন কেন?

পূর্ব্বাকাশে একটুখানি রঙের ছোপ লাগিল। কুয়াসার যবনিকা এইবার তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে, হয়ত তাহার অপসৃত হইবার সময় হইয়া আসিল। মেয়েটির চলা আরও দ্রুততর হইয়া উঠিল। লোকচক্ষুর আড়ালেই কোনোমতে বাড়ি পৌঁছিয়া গেলে সে যেন বাঁচে।

কিন্তু ভাগ্য বিমুখ। প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, ঐ যে তাহাদের আটচালাটা দেখা যায়, পাশ দিয়া রান্নাঘরের ধূমের কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিয়া কুয়াসার রাশিতে মিশিয়া যাইতেছে, আর মিনিট পাঁচ ছয়ের পথ মাত্র।

এমন সময় কে যেন সম্মুখ হইতে বলিয়া উঠিল, "এরই মধ্যে নাওয়া-ধোওয়া সেরে এলি গা? ধন্যি তোদের গতরকে, শীতও লাগে না!"

মেয়েটি চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। মাথা হেঁট করিয়া চলিতেছিল বলিয়া একজন ক্ষীণাঙ্গী প্রৌঢ়া, তসরের থাটো শাড়ী পরিয়া ডিঙ্গি মারিতে মারিতে যে প্রায় তাহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই।

উত্তর না দিয়া উপায় নাই, অগত্যা সে বলিল, "হ্যাঁ গঙ্গাজলমাসী, সকাল সকালই এসেছি।" প্রৌঢ়া নারী মেয়েটির মায়ের 'গঙ্গাজল', সাতিশয় শুচিবাইগ্রস্তা. কখন কি অশুচি জিনিষ মাড়াইয়া ফেলেন, সেই ভয়ে লাফ দিয়া দিয়া চলেন।

গঙ্গাজল ঠাকুরাণী বলিলেন, "তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি। তা এত তাড়া কিসের লা? জন-মনিষ্যি নেই, একলা সোমত্ত মেয়ে ঘাটে এসেছিস্ কেন? তোর মা কি সঙ্গেও আসতে পারে না?"

মেয়েটি শুষ্কমুখে বলিল, "মায়ের বড় অসুখ, ক'দিন বিছানা থেকে উঠতেই পারেনি।"

"ভালা মা-বাপ বাছা তোমার। ইনি ওঠেন ত উনি প'ড়েন, উনি ওঠেন ত ইনি—এই মরেছে, রাম, রাম, রাম—ভোরবেলাই এ কি নরকে পা দিলাম মা! পোড়ারমুখি শতেক খোয়ারিদের ভাত খাওয়া চিরদিনের মত ঘুচে যাক্, পাত যেন আর ঘরে পাততে না হয়!" বলিয়া অজ-শিশুর ন্যায় লম্ফ দিতে দিতে প্রৌঢ়া নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

মেয়েটি একটু বিস্মিত হইয়া মাটির দিকে তাকাইয়া দেখিল। আর কিছু নয়, একখানা ছেঁড়া শালপাতা উড়িয়া আসিয়া পথের উপরে পড়িয়াছে, তাহাতেই গঙ্গাজলমাসী এতখানি সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। মনে মনে বলিল, "বাঁচাই গেল, নইলে কত যে-বক্‌বক্ করত বুড়ী, তার ঠিকানা নাই।"

কলসীটিকে দৃঢ়ভাবে কক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তরুণী দ্রুতপদে বাকী পথটুকু অতিক্রম করিয়া বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

গঙ্গাজলের জেরা এড়াইবার জন্ত সে বলিয়াছে, মা অত্যন্ত অসুস্থ, কিন্তু মায়ের অসুখটা সত্যই তত বেশী কিছু নয়। পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়ার কাজজ্বরে না ভোগে কে? তিনিও তাই দিন দুই তিন জ্বরের প্রকোপে শুইয়াছিলেন। আজ সকালে জ্বর নাই, উঠিয়া তাই মেয়েকে একটু সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ কয়দিন হতভাগী একলা হাতে খাটিয়া খাটিয়া সারা হইয়া গিয়াছে। ঘরকরণার সমস্ত কাজ ত আছেই, গোয়ালঘরে দুইটি গরু আছে, তাহাদের সেবাও করিতে হয়, তাহার উপর দুইটি রোগীর সেবা। উমাপতি ঘোষাল ত হাঁপানিতে ভুগিয়া ভুগিয়া কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি যে আবার কোনো দিন সারিয়া উঠিয়া সাধারণ মানুষের মত চলাফেরা করিতে পারিবেন, সে ভরসা আর মা বা মেয়ে কেহই করে না।

মেয়ের সাড়া পাইয়া মা রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "অম্বা, এলি মা?"

ভিজা কাপড়খানি উঠানের বাঁশের উপর মেলিয়া দিতে দিতে মেয়ে বলিল, "এই এলাম মা।"

তাহার পর জলের ঘড়াটি তুলিয়া লইয়া রান্নাঘরের ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল, সেটি এক কোণে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "তুমি সাত-তাড়াতাড়ি উনন ধরাতে বসলে কেন মা? আমি এসেই ধরাতাম।"

মা বলিলেন, "তা হোক গে, আমি এখন ত ভালই আছি। দুটো দিন ত দাঁতে কুটো কাটলাম না, আজ সকাল সকাল রেঁধে মুখে একটু কিছু দিই। তা যা অরুচি, মুখে সব যেন তেতো হালিম লাগে।

মেয়ে বলিল, "ম্যালেরিয়া জ্বরের ধারাই ঐ। ও-বছর দেখলে না আমার কি দশা হ'ল?" গুড় অম্বলসুদ্ধ তেতো লাগত। হ্যাঁ মা, বাবা উঠেছেন?"

মা বলিলেন, "না বাছা, এই ভোরের দিকে তবে ত একটু ঘুমলেন। যা যন্ত্রণা গিয়াছে সারারাত, সে আর বলবার নয়। এ আর চোখে সয় না, কিন্তু ঠাকুর কতদিন যে পাপচোখে এই যাতনা দেখাবেন তা তিনিই জানেন।"

অম্বা বলিল, "সেই শাদা ওষুধটা ফুরিয়ে গিয়েই ত এই বিপদ বাধল। আমি বল্‌লাম যেমন ক'রে হোক্ আমি নিয়ে আসি। তা তুমি নিজেও যেতে পারবে না, আমাকেও যেতে দেবে না, এরকম করলে কি চলে?"

মা বলিলেন, "কোন্ প্রাণে তোমায় যেতে দেব মা? এ গাঁয়ে কি মানুষ আছে? সব পিশাচের বাস। দুর্ব্বলের

উপর অত্যাচার করা ছাড়া এদের আর কিছুর যোগ্যতা নেই। দেখি আজ যদি আমি দুপুরে বেরতে পারি, ত নিয়ে আসব। সে কি এ রাজ্যি? সাতপাড়া ডিঙিয়ে তবে ভূষণ সেনের বাড়ি।"

এতক্ষণ কুয়াসার পরদা খানিকটা ছিঁড়িয়া গেল। তাহার ভিতর দিয়া এক ঝলক আলো উঠানে, রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া পড়িল। অম্বা তাড়াতাড়ি উঠানে বাহির হইয়া রোদে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল, সুমধুর উত্তাপটুকু সমস্ত দেহ দিয়া উপভোগ করিতে লাগিল।

এইবার তাহার মুখখানি বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। টিকল নাক, দুর্গাপ্রতিমার মত টানা বড় বড় চোখ, প্রবালের মত রাঙা ঠোঁট। দোহারা গড়ন, দেহখানি কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। দেহের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণই হইবে, তবে শীতের প্রকোপে খানিকটা ম্লান হইয়া গিয়াছে।

রোদে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অম্বা মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "হাজার ভোরেই উঠি মা, তোমার গঙ্গাজলের সঙ্গে পারবার জো নেই। এই শীতেও বেরিয়েছে।"

মা অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন, "তোকে দেখে বললে নাকি কিছু মাগী?"

মেয়ে বলিল, "বলবে আবার না? তা হ'লে ত তার নামই বৃথা। তবে একখান ছেঁড়া শালপাত উড়ে এসে পায়ের উপর পড়াতে, গাল দিতে দিতে হন্‌হনিয়ে পুকুর-ঘাটে চলে গেল।"

মা আর কিছু বলিলেন না, উনানে হাঁড়ি চাপাইতে ব্যস্ত ছিলেন বোধ হয়। অম্বা রোদে দেহখানি একটু উত্তপ্ত করিয়া লইয়া পিতার খোঁজে ধীরে ধীরে তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

উমাগতি তখন জাগিয়াছেন, কিন্তু খাট ছাড়িয়া ওঠেন নাই। মেয়েকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেলা হয়ে গেছে মা?"

অম্বা তাঁহার মশারিটা গুছাইয়া তুলিতে তুলিতে বলিল, "তা খানিক হয়েছে বইকি বাবা? বেশ রোদ উঠে পড়েছে। তোমার মুখ ধোবার গরম জল এনে দেব?"

উমাগতি বলিলেন, "আজ একবার চান করব মনে করছি। দেহটা তত খারাপ নেই, এরকম স্লেচ্ছ হয়ে আর থাকা যায় না।"

অম্বা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না বাবা, আর একটু সুস্থ হও, তারপর। কাল রাতে তোমার যা কষ্ট গিয়েছে। মা বলছিল আজ ভূষণ সেনের কাছ থেকে ওষুধ এনে দেবে। ঐ ওষুধটা খেলেই তুমি ভাল থাক।"

উমাগতি বলিলেন, "আচ্ছা, জল দে, মুখটা ত ধুই। কাপড়চোপড়গুলোও ছেড়ে ফেলতে হবে।"

অম্বা জল আনিতে চলিয়া গেল। তাহার পর ঘটি করিয়া জল, দাঁতের মাজন, জিবছোলা সব গুছাইয়া পিতার কাছে রাখিয়া গোয়াল-ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। গোয়ালাদের ঘোষানী বুড়ী রোজ সকালে আসিয়া গাই দুটি দুহিয়া দিয়া যায়, বেতন-স্বরূপ আঁচল ভরিয়া মুড়ি, মুড়কি বা চিড়া লইয়া যায়। পয়সার লেনাদেনা পাড়াগাঁয়ে বিশেষ ছিল না তখনকার দিনে। মেয়েদের মধ্যে ত একেবারেই নয়। চিঁড়া, মুড়ি, ধান বা চালের মূল্যেই তাহারা নিজেদের কেনাকাটা বা জনখাটানোর ব্যাপার চুকাইয়া ফেলিতেন।

গরু দুটিতে দুধ মন্দ দেয় না। মা ও মেয়ে ইহাদের সেবা ও আহারে কোন ত্রুটি ঘটিতে দেন না, ইহারাও যথাযোগ্য প্রতিদান দেয়। আজও মাপিয়া দেখা গেল সের-চার দুধ হইয়াছে। অম্বা ডাকিয়া বলিল, "মা আজ চার সের দুধ হয়েছে।"

মা রান্নাঘর হইতে জবাব দিলেন, "সের দুই রাখ ঘরে, বাকিটা ঘোষানীকে দে, বেচে আসুক।"

ঘোষানীর দ্বারাই যা তাঁহাদের একটু-আধটু সাহায্য হয়। সে রোজই প্রায় দুধ বেচিয়া পয়সা আনিয়া দেয়, হাটের দিন হাট করিয়া দেয়, অন্য কোনো কাজের দরকার হইলে তাহাও করে। আর কাহাকেও ডাকিতে অম্বার মা সাহস করে না, নিজে যাচিয়াও কেহ আসেন না। ঘরে অরক্ষণীয়া কন্যা, শত চেষ্টাতেও তাঁহারা তাহার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না। তাই নিজেদের ক্ষোভ ও লজ্জা লইয়া যথাসাধ্য লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিতেই তাঁহারা চেষ্টা করেন। ঘোষানী বুড়ী অম্বাকে অত্যন্ত ভালবাসে। উহার বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনিলে রাক্ষসীর মত গিলিয়া খাইতে যায়। তাহার নিজের একটি মেয়ে ছিল, নাম তাহার রাধা, সে নাকি অম্বারই মতনী, আর তার মতই দেখিতে ছিল। সে মেয়ে কোন্ কালে জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে, কিন্তু আজও ঘোষানী অম্বার মুখের মধ্যে

তাহার মুখখানি দেখিতে পায় ; তাই বাঘিনীর মত ভীষণ স্নেহে অম্বাকে আগলাইয়া বেড়ায়। তাহার দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহে পুরুষের বল, তাহাকে সহজে ঘাঁটাইতে গ্রামের অতি বকাটে ছেলেও সহসা সাহস করে না।

ঘোষানী দুধের কেঁড়েটি উঠাইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। অম্বা বাকী দুধটা রান্নাঘরে আনিয়া পিতলের কড়ায় ঢালিয়া দিয়া বলিল, "এইটা আগে জ্বাল দিয়ে দাও মা, বাবার এতক্ষণে মুখ ধোওয়া হয়ে গেল।" মা তাড়াতাড়ি কড়াটা উনানের উপর বসাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে দুধ ফোঁস ফোঁস করিয়া উৎলাইয়া উঠিল, অম্বা শাড়ীর আঁচল দিয়া কড়া চাপিয়া ধরিয়া সেটাকে নামাইয়া ফেলিল। তাহার মা ধমক দিয়া বলিলেন, "অত সাততাড়াতাড়ি তুই ছুটলি কেন কড়া নামাতে? এতবার বারণ করি, আঁচল দিয়ে হাঁড়ি-কড়া ধরিস্ নে, ধরিস্ নে, তা কিছুতেই যদি মেয়ে শোনে। একদিন কাপড়ে আগুন লাগিয়ে একটা কাণ্ড কর আর কি?"

অম্বা বলিল, "সে হ'লে ত বেশ হয়, তোমরাও বাঁচ, আমিও বাঁচি।" শ্লেষের সুরেই কথাটা বলিল বটে, কিন্তু সবটাই যেন শ্লেষ নয়। মা অত্যন্ত আহত হইয়া বলিলেন, "তুইও শেষে অমন কথা বল্‌লি? কেন রে? আমরা কোনো দিন তোর অনাদর করেছি?"

অম্বা তাড়াতাড়ি মাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিয়া গেল, "না, না তাই কি আমি বল্‌ছি? তুমি বাপু ঠাট্টা বোঝ না।" বলিয়া তাড়াতাড়ি আধ সের খানিক দুধ বাটিতে ঢালিয়া তাহা একটি কানা-উঁচু থালায় জলের ভিতর বসাইয়া ঠাণ্ডা করিতে লাগিল। তাহার পর ঝক্‌ঝকে একখানি ছোট কাঁশিতে বেলফুলের কুঁড়ির মত একরাশ খই ঢালিয়া লইয়া, দুধের বাটিটিও বামহাতে উঠাইয়া লইয়া উমাগতিকে খাইতে দিতে চলিল।

অম্বার বয়স বছর পনেরো যোলো হইবে, দেখিলে তাহার চেয়ে ছোট ত মনে হয়ই না, বরং বড়ই মনে হয়। পিতামাতার এক সন্তান সে, দেখিতে সুন্দরী। উমাগতি ধনী নহেন, কিন্তু দরিদ্রও নহেন। রোগে জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবার আগে তাঁহার ঘরদুয়ার, গোলাভরা ধান, গোয়ালভর্ত্তি গরু, এবং মাছভরা পুকুর দেখিয়া সকলে তাঁহাকে সম্পন্ন গৃহস্থই বলিত। কিন্তু হঠাৎ কোন্ সূত্রে যেন বছর চার-পাঁচ আগে হইতে তাঁহার সোনার সংসারে অলক্ষ্মী প্রবেশ করিয়াছে। ঘরগুলি জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, সময়ে মেরামত হয় না। গোলাগুলির কয়েকটি খালিই পড়িয়া থাকে, কারণ তাগাদা নাই বলিয়া ধান আগের মত আদায় হয় না। গরুগুলিও কমিতে কমিতে দুইটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পুকুরের মাছ চুরি যায় বেশীর ভাগ, চোরকে শাসন করিবার কেহ নাই। উমাগতি বৎসরের ভিতর এগারটা মাস ম্যালেরিয়া এবং হাঁপানিতে শয্যাগত হইয়া থাকেন, একটা মাস কোনো মতে চলিয়া ফিরিয়া বেড়ান। মা-মেয়েতে কোনোমতে সংসারের বোঝা বহিয়া চলিতেছে, রোগীর সেবাও করিতেছে। অর্থকষ্ট বা অভাব তাহাদের নাই, কারণ তাহাদের প্রয়োজন অতি সামান্যই। অনেক গিয়াও যাহা আছে তাহাতে তাহাদের স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। কিন্তু মনোদুঃখে সকলেই কাতর, অজানা ভয়ে সদাই সশঙ্কিত। দুইটিরই কারণ অম্বা। এতবড় অরক্ষণীয়া মেয়ে যাদের গলায় ঝুলিয়া আছে, তাহাদের স্বস্তি কোথায়?

অম্বার বিবাহ হয় না কেন? সুন্দরী মেয়ে, সুস্থ মেয়ে, কোন খুঁৎ নাই। বাপেরও পয়সার অপ্রাচুর্য্য নাই। পল্লীগ্রামে মেয়ের বিবাহ যতখানি খরচপত্র করিয়া লোকে দেয়, তাহা দিবার সঙ্গতি উমাগতির যথেষ্টই আছে। তবে অম্বার বিবাহ হয় না কেন? একটার পর একটা সম্বন্ধ আসে, ঘটা করিয়া মেয়ে দেখান হয়, পাকা-দেখার দিন পড়ে, তাহার পর কেমন করিয়া জানি না সব ব্যাপারটা ফাঁসিয়া যায়। একবার নয়, দুইবার নয়, এমন কাণ্ড দশ-বার বার ঘটিয়া গেল বোধ হয়। অম্বার জীবনে ঘৃণা ধরিয়া গিয়াছে, উমাগতি এবং শারদার বুকের রক্ত ক্রমে শুকাইয়া উঠিতেছে। মেয়ের বিবাহ কি তাঁহারা শেষ অবধি দিতে পারিবেনই না নাকি? যতদিন কুচক্রী মধু-ভটচায বাঁচিয়া আছে, আর গ্রামের সমাজপতি আছে, ততদিন ত নয়? কিন্তু তাহার আগেই না উমাগতির পরমায়ু শেষ হইয়া যায়।

তবু দিন কাহারও জন্য বসিয়া নাই, একটা একটা করিয়া কাটিয়া যাইতেছে। কয়েক দিন উমাগতি একটানা ভুগিয়াছেন, আজ একটু ভাল বোধ করিবা মাত্র কত চিন্তাই যে তাঁহার মনে আসিয়া ভীড় করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। আজ যদি ভাল থাকেন, রাত্রে ঘুমাইতে পারেন, তাহা হইলে কাল এক

জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করিবেন। একটি পাত্রের সন্ধান পাইয়াছেন, লুকাইয়া সেখানে গিয়া মেয়ের সম্বন্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন। তাহার পর অন্য কোথাও গিয়া বিবাহটা দিবার চেষ্টা করিবেন। এ-গ্রামে থাকিয়া বিবাহ দিবার সাধ্য তাঁহার নাই, তা এই কয় বৎসরেই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এখানে তাঁহার সহায় কেহ নাই, শত্রুই সকলে। অথচ জ্ঞানে তিনি কখনও কাহারও অপকার করেন নাই, উপকারই করিয়াছেন। যতদিন শরীর সুস্থ ছিল, আটচালাটিতে অবৈতনিক পাঠশালা খুলিয়া গ্রামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিয়াছেন, দরিদ্রকে সাহায্য করিয়াছেন, বিপন্নের জন্য যথাসাধ্য করিয়াছেন। কিন্তু এ সমস্তই গ্রামবাসীর মন হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। তাহারা সুদখোর, মূর্খ, চরিত্রদোষ-দুষ্ট মধু ভট্টাচার্য্যকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করে, তাহার কথায় ওঠে বসে; কিন্তু উমাগতি মরিয়া গেলেও কেহ তাহার দিকে ফিরিয়া তাকায় না। বাংলা দেশের পল্লীবাসীর মন এক বিচিত্র জিনিষ।

উমাগতি নানা ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে খাইতে দেরি করিতেছিলেন, অম্বা তাড়া দিয়া বলিল, "শীগ্‌গির ক'রে খেয়ে নাও বাবা, দুধ যে জুড়িয়ে হিম হয়ে যাচ্ছে। গরম গরম খেলে একটু ভাল বোধ করতে।"

উমাগতি বলিলেন, "আজ ত একটু ভালই আছি মা,"— দুধটা চুমুক দিয়া নিঃশেষ করিয়া তিনি বাটিটা নামাইয়া রাখিলেন। বলিলেন, "এ ক'দিন তোর বড় খাটুনি গেছে না মা? তোর মায়েরও অসুখ হয়ে পড়েছিল, একলা সব করতে হয়েছে।"

অম্বা উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিল, "ভারি ত কাজ, খাবার লোক ত নগদ আমি। একবেলা রাঁধলেই চলত।"

উমাগতি ম্লান হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পড়াশুনা কিছুই করতে পারিস নি না?"

অম্বা বাটি ও কাঁশি উঠাইতে উঠাইতে বলিল, "না এ-ক'দিন আর হ'ল কই?"

পড়া আর পড়ানো ছিল উমাগতির কাছে নিঃশ্বাস-বায়ুরই মত প্রয়োজনীয়। পাঠশালাও খুলিয়াছিলেন এই তাগিদেই। উহা উঠিয়া যাইবার পর তাঁহার একমাত্র ছাত্রী হইয়াছিল অম্বা। তাহার শিক্ষাতেই তিনি মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সে বাংলা এবং সংস্কৃত উত্তমরূপেই শিখিয়াছে, অঙ্কও কিছু কিছু জানে। উমাগতি কাশীর টোলে পড়িয়া পণ্ডিত, ইংরেজী প্রথমে মোটেই জানিতেন না, পরে নিজের চেষ্টায় খানিকটা শিখিয়াছিলেন। অম্বাকেও তাহা শিখাইবার ইচ্ছা তাঁহার আছে, তবে গ্রামবাসীদের ভয়ে হইয়া ওঠে না।

পিছনের পুকুরের ঘাটে গিয়া অম্বা কাঁশি, বাটি ও ঘটি মাজিতে বসিল। বাবা, কি শীত! জলে যেন ছুরির মত ধার, হাত দিলে হাত কাটিয়া যায়। শহরে নাকি জলের কল আছে, ঘরের ভিতর বসিয়াই জল পাওয়া যায়, গাঁয়ে তেমনি থাকিলে বেশ হইত।

হঠাৎ ঠিক তাহার সামনেই জলের মধ্যে মস্ত একটা ঢিল আসিয়া পড়িল। হিমশীতল জল ছিটকাইয়া উঠিয়া অম্বার দেহ সিক্ত করিয়া দিল। অম্বা চকিত ভাবে চারি দিকে তাকাইয়া দেখিল। ঐ ত বাঁশঝাড়ের আড়াল দিয়া কে একজন চলিয়া যাইতেছে। লুকাইবার বিশেষ চেষ্টা তাহার নাই, কারণ সে জানে ধরা পড়িলেও তাহাকে শাস্তি দিবার কেহ নাই। অম্বা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। এ-সব উৎপাত নূতন নয়, কিন্তু এখনও ত তাহার সহিয়া যায় নাই! এখনও যে বুকের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া ওঠে, ঐ কাপুরুষ ভীরুর দলের কণ্ঠ নখরে ছিঁড়িয়া দিতে ইচ্ছা করে! কিন্তু উপায় নাই। বাংলার পল্লীর সহায়হীনা নারী সে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিবার ক্ষমতা তাহার কোথায়?

বাসন কয়খানি লইয়া দ্রুতপদে সে বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। তাহার পর সেগুলি নিঃশব্দে রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাইয়া রাখিয়া, মাতার অজ্ঞাতেই ঘরে ঢুকিয়া আবার কাপড় ছাড়িয়া ফেলিল। শারদার এমনিতেই দুঃখের অন্ত নাই, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়া আর লাভ কি?

বাড়ির কর্ত্তাই যেখানে অসুস্থ, সেখানে রান্নাবান্না সর্ব্বদাই সংক্ষেপে সারা হইয়া থাকে, সুতরাং শারদারও রান্না শেষ হইতে দেরি হইল না। খাওয়াদাওয়াও কিছুক্ষণের মধ্যেই চুকিয়া গেল। অম্বা বলিল, "ঐ ভাত ক'টায় জল দিয়ে রাখ মা। ওতেই আমার রাত্তিরে হয়ে যাবে। আবার একটা পেটের জন্যে কে ঘটা ক'রে রাঁধতে বসছে?"

শারদা বলিলেন, "নিত্যি পান্ত খেয়ে তুইও শেষে একটা রোগ বাধা। একেই ত অসুখের বড় কমতি!"

অম্বা বলিল, "হাঁ। তা আর না? শীতের দিন, দুটো পান্ত খেলেই অমনি আমার অসুখ করে যাবে।" অগত্যা ভাতে জল ঢালিয়া শারদা হাঁড়ি তুলিয়া দিলেন।

সকালবেলাটা যেমন কুয়াসাচ্ছন্ন ছিল, এখন হইয়াছে তেমনি প্রখর রৌদ্র। শারদা মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে আমি এই বেলা একটু ভূষণের কাছে হয়ে আসি। তুই ঘরে দোর দিয়ে বোস্, তোর বাবা ঘুম থেকে উঠলে দুধ-সাবুটা দিস্।'

অম্বা ঘরের ভিতর বসিয়া 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' পড়িতেছিল, বইখানি হাতে করিয়াই বাহির হইয়া আসিল। তাহার বিশাল চক্ষু দুটি তখন স্বপ্নাচ্ছন্ন, ক্ষুদ্র ও নিষ্ঠুর বর্ত্তমানকাল ছাড়িয়া সে অতীতের কোন্ অপূর্ব্ব মায়াময় রাজ্যে উধাও হইয়া গিয়াছে। বনবাসিনী আশ্রমবালাও সম্রাটের প্রেমের যোগ্যা যেখানে, সেই রাজ্যেই অম্বার মন তখনকার মত বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে।

মায়ের কথামত দরজাটা বন্ধ করিয়া বসিয়া সে আবার বইয়ে মন দিল। এমন নিবিষ্ট হইয়া সে পড়িতেছিল যে, বেলা কোথা দিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে সেদিকে তাহার লক্ষ্যমাত্র ছিল না। উমাগতি ডাকাডাকি করায় তাহার চমক ভাঙিল। বইখানা সাবধানে উপুড় করিয়া রাখিয়া সে বলিল, "দাঁড়াও বাবা, তোমার দুধ-সাবুটা গরম ক'রে এনে দিই।'

দুধ সাবু গরম করিয়া রান্নাঘরে আবার শিকল তুলিয়া দিয়া সে ফিরিয়া আসিল। দুধের বাটি পিতার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "তুমি খেয়ে নাও বাবা, তারপর আমাকে ডেকো, আমি বাটি তুলে নিয়ে যাব।"

বিকালের পড়ন্ত রোদ তখন আড়াআড়ি ভাবে দাওয়ায় আসিয়া পড়িতেছে। খানিক পরে আবার সেই হিমশীতল রাত্রি। যতক্ষণ আছে ইহার মধুর উত্তাপটুকু উপভোগ করিয়া লওয়া যাক্। অম্বা মাদুরটা রৌদ্রের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বইখানি আবার খুলিয়া বসিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার একেবারে অমরকাব্যের সুধাসাগরে ডুবিয়া গেল।

বাহিরের দরজায় শিকলটা ঝন্ঝন্ করিয়া উঠিল। অম্বা চকিত হইয়া উঠিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। ওমা রোদ একেবারে উঠানের কোণে গড়াইয়া গিয়াছে, সূর্য্যাস্তের আর বিলম্ব নাই। ছুটিয়া গিয়া দরজাটা খুলিয়া দিল, বইখানি তখনও তাহার হাতে। বাহিরে তাহার মায়ের সঙ্গে গ্রামের চিকিৎসক ভূষণ সেন দাঁড়াইয়া। অম্বা লজ্জায় লাল হইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া আসিল।

শারদা ভূষণের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ওই আমার মেয়ে বাবা। বড় লক্ষ্মী, কিন্তু গ্রামের লোকের অত্যাচারে মা আমার চোখের উপর শুকিয়ে উঠছে। আজ আমায় বললে আমি পুড়ে মরলে ত সকলেরই ভাল হয়।"

ভূষণ বলিল, "আপনারা আমার কথা শুনুন, ভিটার মায়া ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। সেখানে এত অত্যাচার আপনাদের সহ্য করতে হবে না। আপনাদের সমান অবস্থায় মানুষও সেখানে আছে, কাজেই একেবারে সহায়হীন বা বন্ধুহীন আপনারা হবেন না।"

শারদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হয়ত তাই-ই আছে অদৃষ্টে,"—তিনি যেন বিমনা হইয়াই কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভূষণ চারি দিকে তাকাইয়া দেখিল, কিন্তু যে আশায়, তাহা পূর্ণ হইল ন। সেই সুন্দর মুখখানির অধিকারিণী কোথায় লুকাইয়া আছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তখন শারদাকে ডাকিয়া সচেতন করিয়া বলিল, "চলুন মা, ঘোষাল মশাইকে দেখে আসি।"

শারদা বলিলেন, "চল বাবা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। এই গাঁয়ে স্বজাতি যারা আমাদের, তারা এখন রাক্ষসের মূর্ত্তি ধরেছে, মানুষের প্রাণ শুধু তোমার মধ্যেই আছে।" দুই জনে গিয়া উমাগতির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

অম্বা গিয়া রান্নাঘরে লুকাইয়া ছিল। ভূষণ সেনের সঙ্গে সে কথা বলে না, কিন্তু দু-জনে দু-জনকে দিব্য চেনে। ঘোষানী বুড়ীর মারফতে একের কথা আর একজন শুনিতে পায়। একবার বুঝি সে অম্বার সংস্কৃতজ্ঞানের কথা শুনিয়া বলিয়াছিল, 'তোমাদের দিদি ঠাক্রুণের নাম বদলে সরস্বতী নাম দাও।" সে-কথা আর সকলে ভুলিয়া গিয়াছে, অম্বা ভোলে নাই। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে, নিদ্রাহীন রাতে, অনেক বার এইভাবে শোনাকথাগুলি মনে করে, আর তাহার বুকের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া ওঠে। কিন্তু নিজের মনের ভাব কখনও বুঝিবার চেষ্টা সে করে না, যাহা স্বপ্নেও অভাবনীয়, সে চিন্তা সাধ করিয়া কি কেহ ডাকিয়া আনে?

খানিক বাদে আবার সদর দরজা বন্ধ করায় শব্দ হইল। তখন অম্বা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উনি বাবাকে ওষুধ দিয়ে গেলেন মা ?"

শারদা বলিলেন, "হ্যাঁ মা, ভাল ক'রে দেখে-শুনে ওষুধ দিয়ে গেল। তা, তুই কি সত্যিই এবেলা রাঁধবি না ?"

অম্বা বলিল, "ভারি ত একটা পেট, তার জন্যে আবার দু-বেলা হাঁড়ি চড়ান, তার চেয়ে আমি বইখানা সেরে ফেলি।"

শারদা স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "যেমন বাপ তার তেমন বেটি, দুটিই পড়া পাগ্‌লা। তুই কি বেটাছেলে যে খালি পড়লেই চলবে ? পড়ায় আমাদের দরকার কি, মা ? ঘর-গেরস্তালির কাজ যত ভাল ক'রে শিখবে ততই লাভ।"

অম্বা বলিল, 'তা কেন মা ? জ্ঞানলাভ করবার অধিকার ছেলে মেয়ে সকলেরই আছে। ঐ যে কলকাতায় শুনি আজকাল মেয়েরা ইস্কুল-কলেজেশুদ্ধ যায়, তারা কি অন্যায় করে ?"

শারদা বলিলেন, "কি জানি মা ন্যায় কি অন্যায়। ও-সব বিচারে আমার কাজ নেই। তা তুই পিদিমগুলো আগে ঠিক্ কর, তারপর আবার বই নিয়ে বসিস্। ঘোষানী এখনও আসেনি ?"

অম্বা বলিল, "না, তুমি তাকে কত কি কিনে আনতে ফরমাশ করলে, তাই খুঁজে পেতে আন্‌তে দেরি করছে বোধ হয়।"

শারদা বলিলেন, "এদিকে গরু দুইবার সময় যে উৎরে গেল। নিজেই দেখব না-কি ?" বলিতে বলিতে ঘোষানী আসিয়া আঙিনায় ঢুকিল। মাথার ঝুড়িটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "এই আমার লক্ষ্মীদিদি ঠাকরুণের শাড়ী মা, এই জোড়াই হাটের সবার সেরা কাপড়।"

অম্বা ব্যস্তভাবে বলিল, "কেন মা তুমি আবার খরচ ক'রে আমার জন্যে কাপড় কিন্‌তে গেলে ? আর এই রকম ডুরে কাপড় বুঝি আমার বয়সী মেয়েতে প'রে ?

শারদা বলিলেন, "থাম্ ত, মেয়ের যেন আর বয়সের গাছ-পাথর নেই। ঘোষানী, যা—গরু দুইতে দেরি হয়ে গেল, অম্বা পিদিমগুলো চট করে গুছিয়ে নে," বলিয়া ডুরে শাড়ীজোড়া তুলিয়া লইয়া তিনি ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলেন।

শীতকালের ক্ষুদ্র দিন দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া গেল। তুলসীতলায় প্রদীপ দেখাইয়া শঙ্খধ্বনি করিয়া মা ও মেয়ে আবার ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। রৌদ্র চলিয়া গিয়াছে, সেই হাড়ে কম্প লাগান বাতাস আবার শুরু হইয়াছে, বাহিরে বসিবার আর জো নাই।

এত শীতেও অম্বার রাত্রে ঘুম আসিতেছিল না। খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া পাড়াগাঁয়ের মানুষ সকাল সকালই শুইয়া পড়ে, জাগিয়া থাকিবার কোনো ছুতা তাহাদের নাই। তবু ঘুম ত ইচ্ছা করিলেই আসে না। মা এখনও শুইতে আসেন নাই, পাশের ঘরে বাবার সঙ্গে একটানা কি সব পরামর্শ চলিতেছে। অম্বা কথাগুলি কানে শুনিতেছে না, কিন্তু কি যে কথা তাহার আর বুঝিতে বাকী নাই। ভগবান, কতদিনে এই দশার অবসান হইবে ? কোন্ পাপে পরিবার-সুদ্ধ তাহারা এমন তুষানলে দগ্ধ হইতেছে ? কোনোমতে একটা বিবাহ হইয়া গেলে অম্বা বাঁচে, সে যাহার সঙ্গে হোক। মা-বাপের এ যন্ত্রণা আর সে চোখে দেখিতে পারে না। হঠাৎ যেন বুকের ভিতরটা তাহার ব্যথায় মোচড় দিয়া উঠিল, সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

উমাপতি বোধ করি ভালই ছিলেন, কারণ অত ভোরে উঠিয়াও অম্বা দেখিল, মা বাবা তাহার আগেই উঠিয়াছেন, এমন কি বাবার মুখ-হাত ধোওয়া হইয়া গিয়াছে। নারিকেল-নাড়ু ও মুড়ি সহযোগে তিনি জলযোগ করিতে বসিয়াছেন। অম্বা বিস্মিত হইয়া বলিল, "বাবা কোথাও বেরবে নাকি ?"

উমাপতি বলিলেন, "হ্যাঁ মা, একটু ভিন্ গাঁয়ে যাব"—বলিয়া তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভিন্ গাঁয়ে যাওয়ার অর্থও অম্বা জানিত, কাজেই চুপ করিয়া গেল।

খাওয়া শেষ করিয়া উমাপতি উঠিলেন। আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে এমন করিয়া আচ্ছাদিত করিলেন যে, তিনি মানুষ না ভল্লুক, তাহাই বুঝিবার আর কাহারও ক্ষমতা রহিল না। জুতা পরিয়া ছাতা হাতে করিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। শারদা ডাকিয়া বলিলেন, "সন্ধ্যে নাগাত ঠিক ফিরবে, কিছুতে দেরি না হয়।"

উমাপতি সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। শারদা তখন মেয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চল মা আমরা

ান সেরে আসি। এখনি ত পথঘাট লোকে ভরে উঠবে। াপড় গামছা ও জলের ঘড়া জোগাড় করিয়া দুই জনেই পথে াহির হইলেন, সদর দরজায় শারদা তালা বন্ধ করিয়া গেলেন।

তাহার পর দিনের কাজ একই চিরন্তন সূত্র ধরিয়া লিতে লাগিল, বিরাম নাই, বৈচিত্র্য নাই। সন্ধ্যা হইবার াগে শারদা ব্যস্ত হইয়া ক্রমাগত ঘর-বাহির করিতে াগিলেন, উমাগতি আসেন কি-না। রুগ্ন, দুর্ব্বল মানুষ নতান্তই দায়ে ঠেকিয়া তাহাকে বাহিরে পাঠাইতে হইয়াছে, কন্তু প্রাণ তাঁহার ছটফট করিতেছে।

যাহা হউক, প্রায় সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়া টমাগতি শারদার চিন্তার তখনকার মত অবসান ঘটাইয়া দিলেন। তাঁহার হাত হইতে ছাতা, লাঠি লইয়া অম্বা জিজ্ঞাসা করিল, "পা ধোয়ার জন্যে একটু গরম জল দেব, বাবা?"

উমাগতি বলিলেন, "দাও মা।" অম্বা জল আনিতে রান্নাঘরে ঢুকিবামাত্র শারদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু করতে পারলে?"

উমাগতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঠিক ত একরকম ক'রে এলাম। তাদের খাঁই বড় বেশী, বুঝেছে কি না যে আমাদের বড় দায়। তা আমি রাজী হয়ে এসেছি।"

শারদা বলিলেন, "বেশ করেছ, আমাদের ত আর ঐ একটি বই নেই? কোনোমতে দু-হাত এক হয়ে যাক, তারপর এ পাপপুরী ছেড়ে দু-জনে কাশীবাস করব।" এই সময় অম্বা জল লইয়া ফিরিয়া আসিল।

সেই দিন হইতেই বাড়ির শান্ত, ধীর, মন্থর গতিটা বদলাইয়া গেল। ভোরে সন্ধ্যায় চুপি চুপি লোক আসে, কি-সব পরামর্শ হয়, আবার চলিয়া যায়। জিনিষপত্র আসে কতরকম, বাসনকোসন, শাড়ী, গহনা। অম্বাকে কিছুই বুঝাইতে হয় না, সবই সে বোঝে। অনেক বার সহিয়াছে, আরও কতবার সহিতে হইবে কে জানে? ভগবান কি চিরদিনই তাহার বাপ মাকে দুঃখ দিবেন?

হঠাৎ শীতের রাত্রে, ঘোর অন্ধকারের ভিতর তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় চলিল। দুইখানি গরুর গাড়ীতে জিনিষপত্র বোঝাই, একখানিতে তাহারা তিন জন। গাড়ীতে উঠিবার পর অম্বা জিজ্ঞাসা করিল, "মা, কোথায় যাচ্ছ?"

শারদা সংক্ষেপে বলিলেন, "তোর মামার বাড়ি।"

ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আর একটি গ্রামে প্রবেশ করিল। মামার বাড়ির লোকেরা সবই জানে দেখা গেল। আজই সকালে গায়ে হলুদ, রাত্রে বিবাহ। অম্বার বুকের ভিতরটা একবার মাত্র বিপুল বেগে দুলিয়া উঠিল, তাহার পর অসাড় হইয়া গেল। এ ব্যথা ত নূতন নয়, সে ত জানে ইহা তাহার জন্য জীবনপথে অপেক্ষা করিয়াই আছে? যাক, বাবা মা ত মুক্তি পাইবেন।

গ্রামেরই জনকতক এয়ো আসিয়া জুটিলেন, বরের বাড়ি হইতে হলুদ আসিল, কন্যাকে তাহা দিয়া স্নান করান হইয়া গেল। তখনকার দিনে এত ঘটার তত্ত্ব ছিল না। তেল হলুদ ছাড়া অতি সামান্য কিছু জিনিষই আসিত। এক্ষেত্রেও তাহাই আসিয়াছিল।

অম্বা একলা একটা ঘরে মাদুর পাতিয়া শুইয়া দুপুরটা কাটাইয়া দিল। উপবাসক্লিষ্ট দেহ, ব্যথাক্লিষ্ট মন লইয়া কখন যে ঘুমের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, তাহা নিজেই জানিত না। বিকালের দিকে কয়েকটি যুবতী ও বালিকা আসিয়া হাসির কল্লোলেই তাহাকে জাগাইয়া দিল। মহা ঘটা করিয়া সকলে কন্যা সাজাইতে বসিয়া গেল। রক্তাম্বরা, চন্দনচর্চ্চিতা অম্বা যেন রূপের জ্যোতিতে প্রদীপের ক্ষীণ আলোক ম্লান করিয়া দিল। বর আসিল। শারদা আশা-আশঙ্কাপূর্ণ হৃদয়ে এয়োদের সঙ্গে করিয়া উঠানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, এইবার বর আসিবে, স্ত্রী-আচার আরম্ভ হইবে। ওদিকে নির্জ্জন ঘরে অম্বা অশ্রুহীন শুষ্ক চোখে নক্ষত্র-বিভূষিত আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ বাহির বাড়িতে একটা প্রচণ্ড কোলাহল শোনা গেল। বর ভিতরে আসিতেছিল, কে একজন লোক তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল, এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "চলেছেন ত বিয়ে করতে, কিন্তু কাকে বিয়ে করছেন তা ভাল ক'রে খোঁজ করেছেন? কন্যার নিজের পিসী বিধবা হবার পর কলকাতায় বিদ্যেসাগরী মতে আবার বিবাহ করেছিলেন, তা জানেন?"

সঙ্গে সঙ্গে সভাসুদ্ধ লোক হৈ হৈ করিয়া উঠিয়া পড়িল। "কি অন্যায়, কি পাপিষ্ঠ! ব্রাহ্মণের জাত মারবার চেষ্টা!" উমাগতি অভিভূতের মত চাহিয়া রহিলেন, ভিতর-বাড়িতে শারদা কাঁদিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন, বরণডালা তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল।

বাহির বাড়ির কোলাহল ক্রমে ক্রমে প্রশমিত হইয়া আসিল। মারামারি, বকাবকি সব শেষ হইল, বরযাত্রের দল গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

উমাগতির শ্যালক তাঁহাকে নাড়া দিয়া বলিলেন, 'অমন পাথরের মত বসে থাকলে ত চলবে না। মেয়ের গায়ে হলুদ হয়ে গেছে, বিয়ে আজ রাত্রের মধ্যে দিতেই হবে, এখনও দুটো লগ্ন আছে।"

উমাগতি শূন্যদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পাত্র কোথায় পাব?"

তাঁহার শ্যালক অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "তা আমি কি জানি? চল খুঁজে দেখা যাক। কানা, খোঁড়া বুড়ো যা হোক, একটা কিছু জোটাতে হবে।' মন্ত্রমুগ্ধের মত উমাগতি তাঁহার পিছন পিছন বাহির হইয়া গেলেন।

শারদাকে সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া ঘরে তুলিয়া লইয়া গেল। অম্বা একবার চাহিয়া দেখিল, কোন কথা বলিল না। তাহার বিশাল চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল, যাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সকলে ধীরে ধীরে তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইয়া চলিল। হিমশীতল বায়ু আর্ত্তনাদ করিয়া ফিরিতেছে, বিবাহসভার প্রদীপগুলি এক একটি করিয়া নিবিয়া আসিল। শেষ লগ্নও প্রায় কাটিয়া যায়। এমন সময় উমাগতি ফিরিয়া আসিয়া মেয়ের সামনে দাঁড়াইলেন। পাগলের মত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মরতে পারবি মা?"

অম্বা তাহার বিশাল চোখ দুটি তাঁহার মুখে স্থাপিত করিয়া বলিল, "পারব বাবা, চল, আমরা তিন জনেই একসঙ্গে যাই।" শারদা হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ছুটিয়া আসিয়া কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "না, না, চল এ পাপরাজ্য ছেড়ে যাই। জগতে কোথাও কি আশ্রয় পাব না?"

তাঁহার ভাইও আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন, বলিলেন, "তাই যাও। কাশী চলে যাও, আজ রাত্রেই রওনা হও। অন্যপূর্ব্বা মেয়ে নিয়ে গ্রামে যেয়ো না, প্রাণে মারা যাবে।"

যে গরুর গাড়ীতে তাঁহারা সকালে এ-গ্রামে আসিয়াছিলেন, তাহাতেই আবার উঠিয়া বসিলেন। বাড়ির মেয়েরা অম্বার বিবাহসজ্জা খুলিয়া শাদা কাপড় পরাইয়া দিল, অন্য জিনিষপত্রও গুছাইয়া সব গাড়ীতে তুলিয়া দিল। শারদার ভ্রাতা বলিলেন, "আমি ওখানের জমিজমা ঘরদোর সবের ব্যবস্থা করব, তোমাদের কোনো চিন্তা নেই।"

গাড়ী ছাড়ে প্রায়, এমন সময় একজন লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। উমাগতির সামনে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছেন? গ্রামে যাবেন না। ওরা দুই দলে মিলে আপনাদের ঘরে আগুন দেবার ষড়যন্ত্র করছে।" সে ভূষণ।

অম্বার মুখ তাহার দিকে চাহিয়া একবার ভোরের আকাশের মত অরুণ-রাগ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

শারদা কাঁদিয়া বলিলেন, "আমরা কাশী যাচ্ছি বাবা। ও-গ্রামে জাত যখন ছিল, তখন টিকতে পারিনি, আজ জাত গেছে, এখন কোন সাহসে যাব?"

ভূষণ সেন বলিল, "চলুন আমি যাচ্ছি ষ্টেশন অবধি আপনাদের সঙ্গে। পথে বিপদ ঘটা অসম্ভব নয়।" গাড়ীগুলি চলিতে আরম্ভ করিল।

গ্রামের সীমানা ছাড়াইবা মাত্র ভূষণ বলিল, "কাশী যাবেন না, কলকাতায় চলুন।"

উমাগতি বলিলেন, "কলকাতায় কে আমাদের আশ্রয় দেবে বাবা?"

ভূষণ বলিল, "সেখানে ত আপনার বোন ভগ্নীপতি, তাঁরা রয়েছেন। যে-সমাজ আপনাদের ত্যাগ করল, কেন আর তাকে আঁকড়ে থাকা? আপনি পণ্ডিত, আপনাকে আর আমি কি বোঝাব?"

উমাগতি বলিলেন, "সত্য। আগে এ-কথা ভাবিনি। তাই চল গিন্নি।"

শারদা কথা বলিলেন না। ভূষণ তাঁহার দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, "মা, আমি তোমার স্বজাতি নই, কিন্তু আমি মানুষ, পশু নই।"

শারদা তাহার মাথায় হাত দিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাঁহার কণ্ঠে ভাষা ফুটিল না।

অম্বা একবার ফিরিয়া ভূষণের দিকে তাকাইল, তাহার দুই চোখে অরুণোদয়ের আভাস।

কাপুর স্পেশালে কাশ্মীরের পথে

শ্রীহেমেন্দ্রমোহন রায়

রাওলপিণ্ডি—১৩ই মে। আজ ভোর ৫টায় সুদীর্ঘ পথের যাত্রারম্ভের কথা ছিল, কিন্তু চা-পান ইত্যাদি সারিয়া লটবহর সরিতে এবং পথের উপযোগী হালকা জিনিষপত্র নিজ নিজ মোটরগাড়ীতে গুছাইয়া তুলিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। কাপুর কোম্পানীর নির্দ্দেশমত পনেরখানা মোটরগাড়ী ও তিন-চার খানা লরি ষ্টেশনের প্ল্যাট-ফর্ম্মের শেষভাগে সারি দিয়া দাঁড়াইলে যাত্রীরা নিজ নিজ মালপত্র উগাতে উঠাইতে লাগিলেন। আমরা দলে চারি জন ছিলাম বলিয়া একখানি গাড়ী নিজস্বরূপে পাইলাম। সকলে প্রস্তুত হইয়া নিজ নিজ গাড়ীতে উপ-বেশন করিলে আমাদের মোটরবাহিনী মন্থর গতিতে প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই থামিয়া গেল। ইহার কারণ পরক্ষণেই বোধগম্য হইল বটে, কিন্তু অযথা বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আমরা কিছু অধীর হইয়া পড়িলাম, কারণ আকাশের মেঘাচ্ছন্নতা ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রাওলপিণ্ডি হইতে ১৩৩ মাইল দূরবর্ত্তী উরি নামক স্থানে পৌছিয়া তত্রত্য পান্থশালায় অর্থাৎ ডাকবাংলায় রাত্রিযাপনের কথা ছিল। যাহা হউক দেখা গেল এই মোটরবাহনীর ফোটো লইবার উদ্দেশ্যেই কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে গাড়ীগুলি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। আলোক-চিত্রের উদ্যোগ-আয়োজনে আরও অর্দ্ধঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইল। অতঃপর ফোটো-তোলা শেষ হইয়া গেলেই রাজপথে অবতীর্ণ হইয়া বেলা প্রায় ৯টায় সমস্ত গাড়ী একযোগে ছুটিল। সে এক অভিনব দৃশ্য, কিন্তু পরক্ষণেই মোটর-চালকদের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া গেলে আমরা সকলে পৃথক হইয়া পড়িলাম। এই সুদীর্ঘ পথে চালকেরা যাত্রীদের অভিরুচি অনুযায়ী গাড়ী না চালাইয়া, নক্ষত্রবেগে ছুটাইয়া দেয়; এই কারণে পরম রমণীয় দৃশ্যাবলী উপভোগ করিবার অবসর হয় না, আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকিয়া যায় এবং মনে হয় এই মোটর-যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে টোঙ্গা নামক দ্বিচক্র অশ্বযানই এ-পথের উপযোগী ছিল। তাহাতে তিন-চার দিনে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইলেও নয়ন-মনের পরিতৃপ্তিকর বলিয়া শ্রান্তি বা ক্লান্তি অনুভূত হইত না। বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে সুসজ্জিত ডাকবাংলা বিরাজিত বলিয়া বিশ্রামসুখেরও কোনও ব্যাঘাত ঘটিত না।

মারি শহরের বাজার

সতের মাইল দূরবর্ত্তী টোল গেটে যখন পৌছিলাম তখন আকাশ রীতিমত মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং আরও আট মাইল অগ্রবর্ত্তী ট্রেট নামক স্থানে পৌছিবার পূর্ব্বেই অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পরক্ষণেই ৩,৫০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত পাইন-বৃক্ষবহুল 'সামলি সেনিটরিয়াম' অতিক্রম করিয়া সাত মাইল অগ্রবর্ত্তী ঘোরাগলি নামক স্থানে পৌছিবার পূর্ব্বেই বেশ বৃষ্টি নামিল। পথ ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হইয়া পঁয়ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী মারি ব্রুয়ারি (Murree Brewery) অতিক্রম করিয়া আরও দুই মাইল অগ্রবর্ত্তী রাওলপিণ্ডি বিভাগের প্রখ্যাত স্বাস্থ্যাবাস 'মারি' শহরের পাদদেশে (সমুদ্রতট হইতে ৬৫০০ ফুট উচ্চ) 'সানি ব্যাঙ্ক'
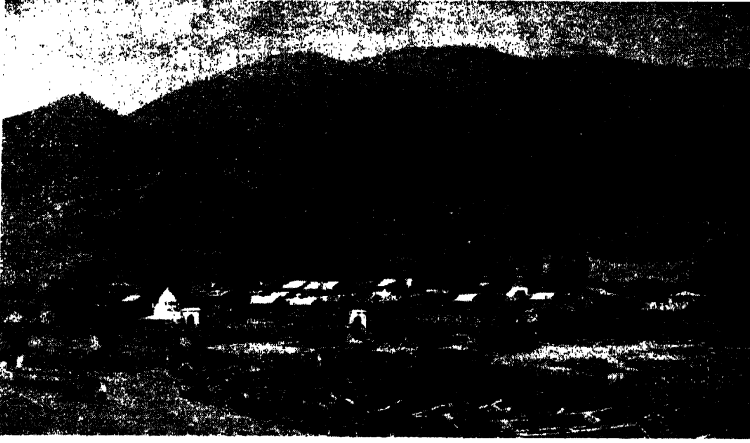
ঝিলম-তটস্থ বারামুলা শহর

(Sunny Bank) নামক স্থানে মোটর পৌঁছিলে আমরা চারি জন নামিয়া পড়িলাম এবং কাপুর কোম্পানির প্রদত্ত টিফিন ক্যারিয়ার ও ফ্লাস্কে রক্ষিত আহার্য্য ও পানীয়ের সদ্ব্যবহারার্থ মোটর-ষ্ট্যাণ্ডের সংলগ্ন ইম্পিরিয়াল হোটেলের কক্ষে প্রায় এক ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিয়া বৃষ্টির বেগ কিছু কমিলেই দুই মাইল উর্দ্ধস্থিত মারি শহর দেখিতে পদব্রজে রওনা হইলাম। কারণ এ চড়াই-পথে মোটরে গমনাগমন সম্ভবপর নয়। অবশ্য সঙ্গী মহিলাদ্বয়ের জন্য দুইটি ডাণ্ডির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অপর পর্য্যটক দল এ শহরটি না দেখিয়া ইতঃপূর্ব্বেই কাশ্মীরের পথে অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন। মারি অনেকটা দার্জ্জিলিং শহরের মত তবে অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু উচ্চতায় বেশী। ইহার সর্ব্বোচ্চ স্থানটি সমুদ্রবক্ষ হইতে ৭,৫০০ ফুট। শহরের নানা স্থান হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি চমৎকার। উত্তরে হাজারাগলির পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি ও দক্ষিণে রাওলপিণ্ডির সমতলক্ষেত্র পর্য্যন্ত পরিদৃশ্যমান। এ শহরে বহু হোটেল এবং সুসজ্জিত দোকানপাট। ১৮৭৬ সালের পূর্ব্বে এখানে পঞ্জাব সরকারের গ্রীষ্মাবাস ছিল এবং এখনও ইহা উত্তর-ভারতের সামরিক অধ্যক্ষের গ্রীষ্মাবাস রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পঞ্চনদ প্রদেশের স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তি-বর্গেরও সমাগম বেশ আছে। তবে ইদানীং পঞ্জাব হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পৃথক হওয়ায় নাথিয়াগলি (৮,০০০ ফুট) নামক সীমান্ত প্রদেশের গ্রীষ্মাবাসটি ক্রমশঃ লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং এ-শহরের প্রয়োজনীয়তা ও আদর অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। স্থানীয় ভাটিতে বিয়ার নামক যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহা সমগ্র ভারতে সরবরাহ হইয়া থাকে। প্রায় দুই-তিন ঘণ্টাকাল এখানে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় যখন রওনা হইলাম তখনও বৃষ্টির বিরাম নাই। এখন আমাদের পথটি ক্রমশঃ উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে নামিয়া চলিয়াছে। এই মারি শহরের পাদদেশ হইতে বিভক্ত হইয়া একটি মোটরবাহী পথ সোজা উত্তর দিকে ছাঙ্গলাগলি হইয়া দুঙ্গাগলি নামক অপর একটি স্বাস্থ্যাবাস পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার উচ্চতা ৮,০০০ ফুট এবং পূর্ব্বকথিত নাথিয়াগলি হইতে মাত্র দুই মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। বহুদূর অগ্রসর হইয়া যাইবার পরেও মারি পাহাড়ের চূড়াস্থিত ঘরবাড়ি চিত্রার্পিতের ন্যায় পশ্চাতে দেখা যাইতে লাগিল।

বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। গাড়ীর পর্দ্দা তুলিয়া দেওয়া সত্ত্বেও ভিতরে ছাট আসিয়া আমাদের ভিজাইয়া দিতে লাগিল। লগেজ ক্যারিয়ারে রক্ষিত মালপত্রের ত কথাই নাই। দেখিতে দেখিতে মারি হইতে সতের মাইল দূরবর্ত্তী গিরিসঙ্কটপ্রবাহিনী খরস্রোতা

ঝিলম বা পৌরাণিক বিতস্তা নদীর তটসংলগ্ন রাস্তায় উপনীত হইয়া আমাদের গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিল। তখন আর চারি পার্শ্বের দৃশ্য বড় একটা দৃষ্টিগোচর হইল না, কেবল এই স্রোতস্বিনীর আবর্ত্তিত ফেনিল তাণ্ডব ও গর্জ্জন গোচরীভূত হইতেছিল। বড় বড় কাঠের তক্তা ও রলা অসংখ্য ভাসিয়া চলিয়াছে। পার্ব্বত্য চীর, পাইন প্রভৃতি কাঠের ব্যবসায়ীরা এইরূপে কাঠ চিরিয়া নদীর ধারে ধারে আটকাইয়া রাখে এবং বন্যার সময়ে ভাসাইয়া পঞ্চনদের নানা স্থানে চালিত করে; তাহাতে কম খরচে নদীসংলগ্ন বিভিন্ন কাঠগোলায় নিজ নিজ চিহ্নিত মালগুলি পাঠাইয়া থাকে। মোটর ও বৃষ্টির বেগের বিরাম নাই। ক্রমে নিম্নগামী পথে রাওলপিণ্ডি হইতে চৌষট্টি মাইল দূরে কোহালা নামক ক্ষুদ্র শহরে উপনীত হইলাম। এখানে পান্থনিবাস অর্থাৎ ডাকবাংলা পোষ্ট ও তার আপিস এবং সামান্য দোকানপাট ইত্যাদি আছে। শুল্ক (Customs) আপিসের কার্য্যে ক্ষণকাল অতিবাহিত হওয়ার পরেই নদীর উপর সুদৃশ্য সেতুটি পার হইয়া কাশ্মীর রাজ্যান্তর্গত পথে আমাদের গতি আরম্ভ হইল। পরপারেই কাশ্মীর-মহারাজের এক প্রাসাদ বিরাজমান। এই উভয় রাজ্যের সংযোগস্থলটি পরম রমণীয়। ইহার আপেক্ষিক উচ্চতা ১৮০০ ফুট মাত্র, কিন্তু পথের দুই ধারে গগনচুম্বী শৈলরাজি বিরাজিত। উভয় রাজ্যের সীমান্তস্থিত এই রাস্তাটি ঝিলম নদীর সহচররূপে চলিয়াছে, কোথায়ও বিচ্ছেদ নাই। ক্রমে আমরা পচাশি মাইল দূরবর্ত্তী ঝিলম ও কিষণ-গঙ্গার সংযোগস্থলে অবস্থিত অপূর্ব্ব দৃশ্য দোমেল নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এখানেও পান্থশালা, ডাক ও তার আপিস এবং হাসপাতাল আছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলার সদর এবটাবাদ নামক ছাউনী-শহর হইতে একটি মোটরগমনোপযোগী রাস্তা এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। দোমেলের উচ্চতা ২,২০০ ফুট। এখানেও শুল্ক আপিসে আমাদের ও সঙ্গের অপর পর্য্যটক দলের গাড়ী এবং মালবাহী লরি প্রভৃতির ভিড় লাগিয়াছে দেখা গেল। বৃষ্টির বেগ কথঞ্চিৎ কম থাকায় এবং প্রায় এক ঘণ্টাকাল বিলম্ব হওয়ায় আমরা চা পান করিয়া লইলাম। দোমেল-সংলগ্ন ঝিলম নদীর উপর ঝুলা-সেতুর
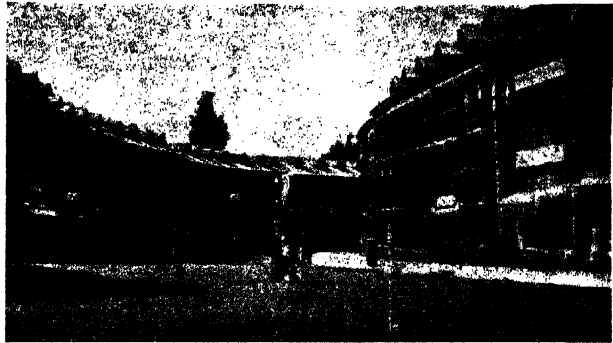
রাজপথ, শ্রীনগর

দোমেল নামক স্থানে একটি ঝুলা-সেতুর দৃশ্য

আমিরাকদল সেতু—শ্রীনগর

পরপারেই কাশ্মীর-রাজ্যের অন্যতম শহর মুজাঃফারাবাদ অবস্থিত। বর্ষণজনিত জলবৃদ্ধির সঙ্গে পার্ব্বতীয় নদীদ্বয়ের গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে আমরা পুনরায় যাত্রা করিলাম। ক্রমে পাহাড়ের উচ্চতর স্তরে আমাদের গাড়ী উঠিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে আরও চৌদ্দ মাইল অগ্রবর্ত্তী পান্থশালা সমন্বিত গঢ়ী নামক স্থানটিও ছাড়াইয়া গেলাম। বৃষ্টির বেগ এখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মনে ভাবিলাম কুক্ষণেই রাওলপিণ্ডি হইতে যাত্রারম্ভ করা হইয়াছিল। মারি হইতে রাস্তা ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে চলিয়া দোমেলে হঠাৎ বক্রগামী হইয়া গেল; অতঃপর দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে নদীর গতি ধরিয়া উরি পর্য্যন্ত চলিল। ক্রমে চিনারী, চাকোঠী নামক স্থানদ্বয় অতিক্রম করিলাম। আমাদের গাড়ী অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়াছে, কারণ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই উরি বাংলায় পৌছিতে হইবে নচেৎ সকল পর্য্যটকের উপযোগী পান্থশালা নিকটে আর নাই। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক শত তেত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী উরি বাংলায় আমাদের গাড়ীর গতিরোধ হইল। দেখিতে দেখিতে অন্যান্য গাড়ীগুলিও প্রায় আসিয়া জুটিল।

সমুদ্রতট হইতে উরির উচ্চতা চার হাজার পাঁচ শত ফুট, সুতরাং বিলক্ষণ শৈত্য অনুভব করিলাম। তখন সকলেই বিশ্রামসুখের জন্য লালায়িত, কিন্তু পান্থশালাটি বৃহৎ হইলেও একযোগে এতগুলি যাত্রীর স্থান সঙ্কুলান হওয়া দুর্ঘট। এই কারণে বিলম্বে আগত কতিপয় সহপর্য্যটক এখানে না নামিয়া তের মাইল অগ্রবর্ত্তী রামপুর বাংলায় রাত্রিযাপনোদ্দেশে রওনা হইয়া গেলেন। আমরা কিন্তু সিক্ত বসনে আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক ছিলাম না, কাজেই মালপত্র গাড়ী হইতে নামাইয়া এই পান্থশালার একটি কক্ষ দখল করিলাম এবং টিফিন-ক্যারিয়ার হইতে যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্য দ্রব্য উদরস্থ করিয়া শয়নের ইচ্ছায় বিছানাপত্র খুলিতেই দেখা গেল যে, প্রায় সমস্তই সিক্ত। তথাপি অপেক্ষাকৃত শুষ্ক আচ্ছাদনাদির সদ্ব্যবহার করিবার ইচ্ছায় শয্যা রচনা করিতেই এক বাধা উপস্থিত হইল। কতিপয় মহিলা-যাত্রী বিলম্বে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাদের অন্য কোনও ঘরে স্থানলাভের সুবিধা হইল না, সুতরাং আমাদের অধিকৃত কক্ষেই আগমন করিলেন। অগত্যা সঙ্গী মহিলাদ্বয়ের সহিত তাঁহাদেরও রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমরা উভয় ভ্রাতা অপর কোন কক্ষে স্থানসঙ্কুলানের চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বারান্দায় শয্যা রচনা করিয়া লইলেন এবং আমি বহির্বাটীর এক প্রকোষ্ঠে অপর তিন জন যাত্রীসহ রাত্রিবাসের জন্য প্রস্তুত হইলাম। তখনও বৃষ্টির

বিরাম নাই, এমন কি শিলাবর্ষণও হইতেছিল। সমস্ত রাত্রি একরূপ অনিদ্রায় কাটিল। পরস্পরের এইরূপ সহানুভূতি ছিল বলিয়াই এই সুদীর্ঘ পর্য্যটন এত আনন্দের হইয়াছিল। সকলেই পরস্পরের সাহায্যার্থ বদ্ধপরিকর, যেন সমগ্র স্পেশাল ট্রেনের যাত্রীবর্গ এক বৃহৎ পরিবারভুক্ত, নিজ নিজ স্বার্থ-বিস্মৃত। জীবনে এরূপ অভিজ্ঞতা বোধ হয় দুর্লভ। সহযাত্রীদের একখানি গাড়ী অনেক রাত পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছায় নাই বলিয়া আমরা সকলেই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলাম; অবশেষে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর ঐ গাড়ীর যাত্রীরা পৌছিলে জানা গেল আমাদের মালবাহী একটি লরি পথে বিপন্ন হওয়ায় উহার সাহায্যার্থ তাঁহাদের এত বিলম্ব হইয়াছে। এইরূপ দুর্য্যোগে পর্ব্বতগাত্র হইতে সবেগে পতিত জলপ্রবাহে রাস্তা স্থানে স্থানে যেরূপ কাটিয়া যাইতেছিল তাহাতে যে নির্ব্বিঘ্নে সকলে গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌছিব তাহা মনে হয় নাই।

রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই পুনরায় যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইল। কারণ এখনও তেষট্টি মাইল পথ বাকী আছে, বিশেষতঃ বর্ষণের যখন বিরাম নাই তখন দৈবদুর্য্যোগ আরও ঘনাইয়া আসিলে পথের কোনও স্থান যদি ধসিয়া যায় তবে শ্রীনগর পৌছান অসম্ভব হইবে, আমাদের পরিচালকেরা এইরূপ আশঙ্কা ব্যক্ত করিলেন। সুতরাং মালপত্র বাঁধিয়া ১৪ই বেলা সাড়ে সাতটায় পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া পুনরায় যাত্রারম্ভ করা হইল। উরি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে

পুরাতন রাজপ্রাসাদ, শ্রীনগর

একটি মনোলোভা স্থান বটে, কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ চতুষ্পার্শ্ব ঘুরিয়া দেখিবার অবসর পাওয়া গেল না। এই স্থান হইতে একটি রাস্তা দক্ষিণ দিকে কাশ্মীরের অন্যতম উপ-করদ-রাজ্যের রাজধানী পুঞ্চ্ নামক ক্ষুদ্র শহরাভিমুখে গিয়াছে। রওনা হইবার পর কয়েক মাইল পর্য্যন্ত আমাদের রাস্তার অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়াছে দেখা গেল এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই বিপদাশঙ্কা মনে জাগিতে লাগিল, কারণ বৃষ্টি ও মোটরের বেগ সমভাবেই চলিয়াছে। উরি হইতে তের মাইল অগ্রবর্ত্তী রামপুর বাংলা ছাড়াইলাম। তখনও পূর্ব্বরাত্রে উরি বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন অগ্রগামী পর্য্যটকদের চার-পাঁচটি গাড়ী পান্থশালার দ্বারে দণ্ডায়মান। তাঁহারা বোধ হয় তখনও গতরাত্রের অবসাদ কাটাইয়া পথের জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। পথিমধ্যে মহুরা নামক স্থানে কাশ্মীর রাজ্যের বিজলী-কারখানা দৃষ্ট হইল। আরও পনর মাইল ছুটিয়া ঝিলম্-তটস্থ বারামুলা শহরে উপনীত হইলাম। এই স্থান হইতে কাশ্মীরের

লেখকের ভাসমান নৌগৃহ
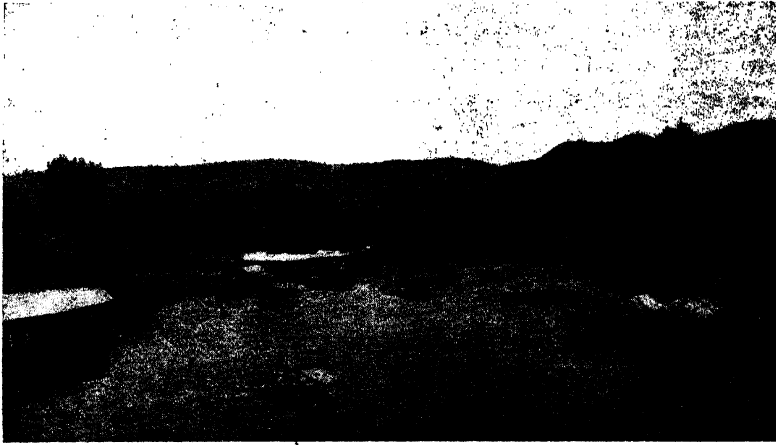
ডাল-হ্রদের একাংশ

উপত্যকাভূমি আরম্ভ হইল। এ রাজ্যের জলযানচালিত ব্যবসা-বাণিজ্যের ইহাই কেন্দ্রস্থল। বারামুলার নীচে আর জলযানের গতি সম্ভবপর নয়, কারণ নদীর ঢাল ক্রমশঃ খরতর ও বিপজ্জনক। বারামুলা হইতে ইসলামাবাদ বা অনন্তনাগ পর্য্যন্ত সত্তর মাইলের অধিক এই নদীর গতিপথটির সমতা (level) প্রায় সমান বলিয়া তরণীর গতিবিধি অব্যাহত। ঐ উভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী শ্রীনগর শহরে গমনেচ্ছুক পর্য্যটকেরা অনেকে বারামুলা হইতেই বজ্‌রা অর্থাৎ হাউস্‌-বোট ভাড়া করিয়া জলপথেই যাত্রা করিয়া থাকেন। অবশ্য যাঁহাদের প্রচুর সময় হাতে নাই তাঁহারা এরূপ নৌবিহারের আনন্দলাভে বঞ্চিত হন, তাহা বলা বাহুল্য। নানা শ্রেণীর বহু তরণী এখানকার ঘাটে লাগিয়া আছে দেখিলাম। এ শহরের আপেক্ষিক উচ্চতা প্রায় ৫,২০০ ফুট। এখান হইতেই শকটচারীদের ঝিলম নদীর সঙ্গ ত্যাগ করিতে হয় এবং শ্রীনগরে পৌঁছিয়া পুনরায় মিলন ঘটে। বারামুলা হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ জলাকীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে চাষ-আবাদের পর্য্যাপ্ত পরিচয় পাইয়া এবং যথাতথা চিরবিশ্রুত কাশ্মীর কুসুমের সুষমা দেখিয়া হঠাৎ স্বপ্নাবেশে বাংলা দেশে বুঝি স্থানান্তরিত হইলাম বলিয়া ভ্রম জন্মিতে লাগিল, তবে পরক্ষণেই দিগন্তের ক্রোড়ে হিমাচলের তুষার-মণ্ডিত উত্তুঙ্গ চূড়াগুলি দৃষ্টিপথে পড়িতেই সে ভ্রম বিদূরিত হইল। আর এক অদ্ভুত পাদপরাজির সহিত প্রথম পরিচয় ঘটিল—তাহার নাম পপ্‌লার। ইহার বল্কলশূন্য শুভ্র কাণ্ডগুলি সরলভাবে গগনমার্গে উঠিয়াছে। এই পাদপের সারি কাশ্মীরের উপত্যকা-বীথিগুলি শোভিত করিয়া রাখিয়াছে। এ-জাতীয় বৃক্ষ ইউরোপ হইতে প্রথমে আমদানী করা হয়, এ প্রদেশের আদিমজাত নহে।

দ্রুতগতিতে কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগর শহরের উপকণ্ঠে আসিয়া পড়িলাম। পাহাড়-পর্ব্বতের পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দিকেই খাল বিল ও হরিৎ শোভার প্রাচুর্য্য দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শহরের মধ্যে আমিরা-কদল নামে ঝিলমের উপর সাতটি সেতুর প্রথমটির উপর আসিয়া পড়িলাম। এই সেতুর দুই দিকেই প্রশস্ত রাজপথ-সংলগ্ন হর্ম্ম্য ও বিপণিশ্রেণী বিরাজমান। ইহার সন্নিকটেই নদীতটে সুরম্য রাজপ্রাসাদটি প্রথমেই নয়নগোচর হয়। অসংখ্য বজরা ও শিকাড়া নামক এক প্রকার ডিঙ্গী নদীবক্ষে ভাসমান। তন্মধ্যে মহারাজের খাস বজরাগুলি ও খালসা হোটেলের নামাঙ্কিত ভাসমান দ্বিতল বজরাটি প্রধানতঃ আগন্তুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাঁহারা উক্ত হোটেলের পাকা বাড়িতে না থাকিয়া জলবক্ষে অবস্থানের প্রয়াসী, তাঁহাদের জন্যই হোটেলওয়ালারা ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীনগর শহরটি যে এত বৃহৎ ও জমকাল এবং

উহার রাস্তাঘাট এত সুন্দর তাহা আমাদের ধারণাই ছিল না। অবশ্য আলো ও আঁধার প্রায় সর্ব্বত্রই পাশাপাশি বিরাজ করিতে দেখা যায় এবং এখানেও যে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই তাহার দৃষ্টান্ত অতঃপর যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। যাহা হউক, রেলপথ হইতে এতদূরে অবস্থিত এরূপ বর্দ্ধিষ্ণু শহরের প্রথম দর্শন যে একেবারে চমকপ্রদ তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যেন হঠাৎ এক স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। আমিরাকদলের নিকট আমাদের মোটর কোম্পানীর আপিসে অপর সহযাত্রীদের গাড়ীগুলি আসিয়া না মিলিত হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের তথায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিতে হইল। তৎপরে আরও দুই মাইল দূরবর্ত্তী শহরের প্রান্ত-সীমাস্থিত ডাল হ্রদ সংযুক্ত প্রণালীর গাগ্রিবল নামক অংশের দিকে আমাদের গাড়ীগুলি চলিতে লাগিল। কারণ সেখানেই জলবক্ষে আমাদের বার দিন আবাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। নিমেষে নেডু হোটেল, পোলো ময়দান, ডাল গেট প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া মোটরের গতিরোধ হইল এবং স্থলযান হইতে জলযানে অধিষ্ঠিত হইবার আয়োজনে সকলে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলাম। তখনও বর্ষণের বিরাম নাই, তবে প্রকোপ কমিয়াছে। উপরোক্ত প্রণালীর গাগ্রিবল নামক অংশটি ডাল-হ্রদের প্রায় মোহনায় অবস্থিত। এখানে নানা শ্রেণীর বহু বজরা তীরে সংলগ্ন আছে, তন্মধ্যে আমাদের চার জনের উপযুক্ত একটি বজরা পছন্দ করিয়া মালপত্র তাহাতে স্থানান্তরিত করিলাম। সিক্ত বসনে তখন আমরা প্রায় কম্পমান; যে পর্য্যটকেরা দলে চার-পাঁচ জনের কম ছিলেন তাঁহারা সম্পূর্ণ একটি বজরার অধিকারী হইতে পারিলেন না, অপর যাত্রীর সহিত কোন বজরার আংশিক অধিকারী হিসাবে বাসস্থান পাইলেন মাত্র। বজরাগুলি নানা শ্রেণীর আছে। তন্মধ্যে আমাদের বজরাটি অত্যুচ্চ শ্রেণীর না হইলেও মূল্যবান আসবাবপত্রে সুসজ্জিত পাঁচটি কামরা ও দুটি স্নানকক্ষ-বিশিষ্ট ছিল। প্রত্যেক বজরা-সংশ্লিষ্ট আরও দুটি করিয়া তরণী পাওয়া যায়, উহার একটি পাকশালা (kitchen boat) ও অপরটি শিকাড়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শিকাড়া বলিতে মধ্যস্থলে ছত্রীবিশিষ্ট জলীবোট বা ডিঙ্গী বুঝায়। উহাতে যাত্রীরা স্বেচ্ছামত জলবিহার ও মাঝিরা ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া থাকে। কারণ মূল বজরাটি তীরে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবেই থাকে, সচরাচর গতিশীল নহে। আর পাকশালাটি রন্ধনাদি ও হাঁজি বা মাঝিদের বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহাদের অন্য বাসস্থান নাই। ইতঃপূর্ব্বে কাঙড়ি নামক জিনিষটির সহিত পরিচিত ছিলাম না। অদ্য বজরায় অধিষ্ঠানকালে প্রথমেই উহা পরিলক্ষিত হইল, গলদেশবিলম্বিত প্রজ্বলিত অঙ্গারবিশিষ্ট বেত্রমণ্ডিত মৃৎপাত্র বিশেষ। যখন হিমঋতুতে এ-প্রদেশ তুষারাচ্ছন্ন থাকে তখন ইহাই সর্ব্বদা দরিদ্র কাশ্মীরীদের বক্ষস্থলে বিরাজ করে। শ্রীনগর শহরে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার মুসলমান-জাতীয় হাঁজির বাস। ইহাদের ব্যবসায় নৌচালনা এবং সম্পত্তির মধ্যে নিজ নিজ বজরা কিংবা ডোঙা। উহারই ভাড়ায় তাহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা ধূর্ত্ত এবং ভুলিয়াও সত্য কথা বলিতে চায় না। অনেকে বাবুর্চির কাজও শিখিয়াছে। ইহাদের রমণীরা পুরুষ অপেক্ষা কর্ম্মপরায়ণা ও সুশ্রী, কিন্তু তদ্রূপ সুশীলা নহে।

আমাদের প্রায় তিন দিকই গিরিমালা পরিবেষ্টিত। উহাদের উচ্চ চূড়াগুলি ডাল-হ্রদের স্বচ্ছ নীরে প্রতিফলিত হইয়া এক অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ডাল গেট হইতে এই প্রণালীর মোহনা পর্য্যন্ত প্রায় দেড় মাইলব্যাপী প্রশস্ত পাষাণ-ময় বাঁধ-সংযুক্ত রাস্তাটি (Strand) আধুনা দুই বৎসর যাবৎ প্রস্তুত হইয়া ক্যারান্ বুলভার নামে অভিহিত হইয়াছে এবং রাস্তার অপর পার্শ্বেই প্রাচীন হিন্দুমন্দির-শোভিত শঙ্করাচার্য্য বা তখ্‌ত-ই সুলেমান নামক পাহাড়টি বিরাজমান। ইদানীং এই রাস্তার ধারে সুন্দর সুন্দর দ্বিতল বাড়ি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ভাড়া পাওয়া যায়। আহারাদি কোনও প্রকারে সমাধা করিয়া বিশ্রামসুখের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিছানাপত্র, এমন কি বাক্সপেটরার অভ্যন্তরস্থ পরিধেয় বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছে। বেলা প্রায় দুইটা পর্য্যন্ত বর্ষণের পর আকাশ মেঘমুক্ত হইলে শীতবস্ত্রাদি বজরার ছাদে প্রসারিত করিয়া শিকাড়া সাহায্যে হ্রদবক্ষে বিচরণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। এই হ্রদে তরঙ্গ না থাকায় এইরূপ জলবিহারে কোনরূপ বিপদাশঙ্কা নাই। অবশ্য বৃহত্তর উলার-হ্রদের কথা স্বতন্ত্র, কারণ উহাতে বাত্যাবিতাড়িত তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

শান্তিদেবকৃত বোধিচর্য্যাবতার—প্রজ্ঞাপারমিতা নামক নবম পরিচ্ছেদ। প্রথম ভাগ। (গোবিন্দকুমার সংস্কৃত গ্রন্থাবলী—১) শ্রীগোপালদাস চৌধুরী, এম-এ, বি-এল্ সম্পাদিত। ৩২নং বিডন রো, কলিকাতা হইতে শ্রীগোপেন্দ্রকুমার চৌধুরী, এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আট আনা।

শান্তিদেবকৃত প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ বোধিচর্য্যাবতারের নবম পরিচ্ছেদের মূল ও বাংলা অনুবাদ এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ-দর্শনের মতবাদ ও হিন্দুদর্শনের সহিত তাহার সম্পর্ক বিস্তৃত ভাবে ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে। এই অনুবাদ ও ভূমিকা শ্রীযুক্ত হরিহরানন্দ আরণ্য মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। অনুবাদকে সর্ব্বত্র আক্ষরিক করিবার জন্য ব্যর্থ শ্রম করা হয় নাই। পক্ষান্তরে অনুবাদ সুবোধ্য করিবার জন্য স্থানে স্থানে বন্ধনীর মধ্যে অথবা স্বতন্ত্রভাবে টিপ্পনী প্রভৃতির দ্বারা গ্রন্থের তাৎপর্য্য বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, ইহা সত্ত্বেও ভাষা অনেক স্থলে জটিল ও দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। ভাষা আর একটু সরল হইলে সাধারণ পাঠকের বিশেষ সুবিধা হইত। যাহা হউক, অনুবাদ-দরিদ্র বাংলা সাহিত্যে এই নূতন অনুবাদগ্রন্থ আমরা সাদরে বরণ করিতেছি। প্রজ্ঞাপারমিতা বৌদ্ধদর্শনে অতি সুপরিচিত বস্তু। নানা গ্রন্থে ইহার সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শান্তিদেবের গ্রন্থে প্রাথমিক ভাবে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে এই বিষয়টি আলোচিত হইলেও পাঠক ইহা পড়িয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন। ইহার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধমাত্রও নাই। সুতরাং যাঁহাদের বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ বা অনুসন্ধিৎসা নাই এরূপ সাধারণ পাঠকও গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিবেন, সন্দেহ নাই। সম্পাদক-মহাশয় গ্রন্থের প্রারম্ভে জানাইয়াছেন যে, কতকগুলি পালিগ্রন্থের অনুবাদ তিনি অদূর ভবিষ্যতে প্রচার করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা প্রার্থনা করি তাঁহার এই সাধু আশা সত্বর সফল হউক এবং চৌধুরী-মহাশয়ের মত সুপ্রসিদ্ধ বদান্য ব্যক্তির প্রচেষ্টায় বাংলার অনুবাদ-সাহিত্য পুষ্ট হইয়া সাধারণ বাংলার জ্ঞানভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতে সহায়তা করুক। আমাদের বিশেষ আনন্দের কথা এই যে, চৌধুরী-মহাশয়ের প্রস্তাবিত অনুবাদ গ্রন্থমালা একজন প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ বাঙালীর গ্রন্থের অনুবাদের দ্বারা আরম্ভ করা হইল। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, মূল গ্রন্থের রচয়িতা শান্তিদেব অনেক পণ্ডিতের মতে বাংলা দেশেরই লোক ছিলেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

হালিদা হানুম—গোলাম মকসুদ হিলালী, এম্-এ, বি-এল্। এম্পায়ার বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। আশ্বিন, ১৩৪০। বারো আনা।

তুরস্কের নবজাগরণে পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া যে-সকল নারী জাতিকে বলিষ্ঠ ও উন্নত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হালিদা হানুমের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়। তিনি একাধারে শিক্ষক, সৈনিক, কেরাণী, সাহিত্যিক—অকাতরে তাঁহার শক্তি তুরস্কের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র হইতে স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে আমাদের দেশের লোকে অনেক কিছু শিখিতে পারিবে। তিনি যে স্বামী বিবেকানন্দ ও ফরাসী দার্শনিক ওগুস্ত কোৎ, এই উভয়ের অনুরাগিণী, বৌদ্ধধর্ম্মের করুণা ও মৈত্রীর প্রশংসা করেন, পাশ্চাত্য সাহিত্য ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, লেখক সে-সকল তথ্য সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। হালিদা হানুম ও রহিমার মত নারী যে-কোনও দেশের, যে-কোনও জাতির গৌরবস্থল। এরূপ পুস্তকের প্রচার বাঞ্ছনীয়। পুস্তকের তথ্যসংগ্রহ ও সন্নিবেশ মন্দ নহে, তবে মুদ্রাকর-প্রমাদ কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে এবং তুরস্কের একটি মানচিত্র দিলে ভূগোল-অনভিজ্ঞ পাঠকের উপকার হইত। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

রঙীন স্বপ্ন—মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, বি-দি গ্রেট্ ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী। ১৫ কলেজ স্কোয়ার। দাম বার আনা।

বারোটি ছোট গল্প। একটি তালিকা হইতে বোঝা গেল, প্রায় সবগুলিই মুসলমান-পরিচালিত বড় বড় মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গল্পগুলি অধিকাংশই খুব সাধারণগোছের। মনে কোন একটা দাগ বসায় না। দু-পাতা পড়িয়াই অনেকগুলি গল্পের পরিণতি সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে, তাহাতে আগ্রহ শিথিল হইয়া পড়ে। কোন কোন গল্পের মাঝে, শেষে মরালের অবতারণা করায় সাহিত্যরস আরও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহার উপর এক আধ জায়গায় ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতার ঝাঁঝ আছে। লেখক এ সস্তার উত্তেজনাসৃষ্টি ছাড়ুন—ইহাই অনুরোধ। ইহাতে মুসলমানেরও শক্তিবৃদ্ধি হয় না, হিন্দুরও গায়ে ফোস্কা পড়ে না। মাঝে পড়িয়া বইয়ের সার্ব্বজনীনতাটুকু নষ্ট হয় মাত্র।

শেষের কয়েকটি গল্পে লেখকের হাত সবদিক দিয়াই পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। "অই-যে অই-গাছের তলে" "তুফান", "খালিফার স্থির বুদ্ধি" আমাদের ভাল লাগিল।

ছাপা, বাঁধাই ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

হিন্দুধর্ম্ম ও স্পৃশ্যতা—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সরকার কবিরত্ন প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহরেকৃষ্ণ বিশ্বাস, ৮নং কৃপানাথ লেন কলিকাতা। মূল্য ॥০ আনা। ঠ+১২৭ পৃঃ।

বর্ত্তমান বর্ণ-হিন্দুদের ধর্ম্মের অসারতা দেখাইয়া লেখক বলিয়াছেন যে, একমাত্র প্রেম ও ভগবদ্ভক্তির বিস্তারের দ্বারাই সর্ব্বজাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে। প্রাচীনপন্থী হইয়াও তিনি যে উদারতা দেখাইয়াছেন তাহা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

শ্রী নির্ম্মলকুমার বসু

ঝিলে জঙ্গলে শিকার—কুমুদনাথ চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক এম. ব্যানার্জ্জি। মূল্য এক টাকা।

স্বর্গীয় কে. এন. চৌধুরীর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি তাঁহার *Sports in Jheels & Jungles* পুস্তকের সুন্দর অনুবাদ।

ইহার ঘটনাবলী যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি শিক্ষাপ্রদ এবং ছবিগুলিও চমৎকার। গৃহকোণবাসী নিরীহ পাঠক বা অরণ্যপর্ব্বতচারী তরুণ শিকারী, উভয়েরই ভাল লাগিবে।

জরীন্ কলম—প্রকাশক, মৌলবী মঈনুদ্দীন হুসায়েন, বি-এ, ১২।১, সারেং লেন, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

একখানি ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য উপন্যাস। ইহাতে মুন্সীয়ানার পরিচয় না থাকিলেও কয়েক স্থানে সাম্প্রদায়িক রোষ কিঞ্চিৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু মহাজনের কঠোর নির্যাতন কেবল "শত শত মুসলমান পরিবারকেই" ভোগ করিতে হয় না, শত শত অভাবগ্রস্ত হিন্দুপরিবারও তাহার কবলে পতিত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। "বাংলায় মুসলমানকে ধ্বংসের দিকে" লইয়া যাইবার প্রধান ও একমাত্র কারণ তাহারা নয়। আর, মহাজনগণকে সাধারণতঃ নীচতা, ক্রূরতা প্রভৃতি দোষ-দুষ্ট দেখা গেলেও তাহাদের প্রতীক গ্রন্থের "রায় মহাশয়ের" অন্তঃপুরের যে চিত্রখানি অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহা অতি জঘন্য। ইহাতে কবির "দরদী" অন্তরের পরিচয় পাওয়া গেল না।

লেখকের ভাষার উপর দখল আছে। ছাপা ও কাগজ ভাল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বাংলার সব্জী—শ্রীঅমরনাথ রায় প্রণীত। মূল্য ১।৷০ টাকা, ৩২০ পৃঃ।

আমরা এই ৩২০ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তক পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। পুস্তকের ভূমিকায় রায়সাহেব দেবেন্দ্রনাথ মিত্র যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ আমরা সংবরণ করিতে পারিলাম না। এই উদ্ধৃত অংশ হইতেই পুস্তকের উপকারিতা সম্যক পরিস্ফুট হইবে। দেবেন্দ্র বাবু লিখিতেছেন:—"বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের দিনে প্রত্যেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যদি নিজ নিজ বাড়িতে নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে তরিতরকারীর চাষ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে কেবল ভাইটামিনপূর্ণ টাটকা তরিতরকারী পাইবেন তাহা নহে, তাঁহাদের দৈনিক বাজার খরচেরও অনেকটা হ্রাস হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনীষী রায়-বাহাদুর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাইয়াছেন যে, গ্রামের সকলে যদি আশপাশের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এবং ডোবা, খানা প্রভৃতি ভরাট করিয়া তরিতরকারীর আবাদ করেন, তাহা হইলে গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া অদৃশ্য হইয়া যায় এবং গ্রামখানি শ্রী, সম্পদ ও স্বাস্থ্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। বিনা অভিজ্ঞতায় কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ তরিতরকারীর উৎপাদনের জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এই বিষয়ে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাই প্রধান।"

গ্রন্থকার নিজে "প্রত্যেক দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত...খালি পায়ে, খালি গায়ে, হাঁটু পর্য্যন্ত খদ্দর পরিয়া মাটি খোঁড়েন, গাছ লাগান ও বাগানের অন্যান্য যাবতীয় কাজ করেন।" গ্রন্থে তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এ কারণ আশা করা যায় যে, প্রত্যেক ভদ্রচাষী এই পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবেন। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

প্রেমের ফাঁদ—শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত প্রণীত। "দৈব ও পুরুষকারের খেলা, নাট্যাকারে উপন্যাস।" দাম পাঁচ সিকা।

কুসুমিকা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কবিতার বই। দু-একটি কবিতা মন্দ নয়। দাম দশ আনা।

বোবার বাঁশী—লেখকের নাম নাই। কবিতার বই। দাম বারো আনা।

অর্পণ—শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত কবিতা পুস্তক।

স্নেহের দাবী—শ্রীনিধিরাজ হালদার প্রণীত একটি উপন্যাস।

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভ্রান্তপথ—স্বাধীনচেতা সাহিত্যিক শ্রীগুরুদাস হালদার প্রণীত। স্বাধীন আর্ট বিউরো, কানপুর। পৃ. ২০৯। মূল্য দুই টাকা।

আগাগোড়া ভাষা ও বানানের ভুল। কিন্তু তোড়জোড়ের ত্রুটি নাই। নীল কাপড়ের ঝকঝকে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা, লেখকের পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি এবং প্রকাণ্ড সমাসবদ্ধ বিশেষণ;—আবার প্রকাশক মহাশয় শাসাইয়াছেন "স্বাধীনচেতার সমস্ত গ্রন্থ ছাপিবার জন্য এই 'স্বাধীন আর্ট বিউরো' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" কিন্তু গ্রন্থের নাম-নির্ব্বাচনে কিঞ্চিৎ ভরসা হইতেছে—ভ্রান্তপথ। 'স্বাধীনচেতা'র এই সত্যভাষণের জন্য সুখী হইলাম। প্রগতিশীল সমাজের যে পরিচয় দিতে লেখক চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার মাথামুণ্ড কিছু নাই এবং এই সম্পর্কে রুচির যে জঘন্যতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে করুণা হয়, তাহা আলোচনা করিবার বস্তু নহে। 'বক্তব্যে'র মধ্যে লেখক বলিতেছেন, "আমি ভুল করেছি বলে আমার গালে একটা চড় মারলেই বন্ধুর কাজ করা হয় না।" বন্ধুরা তবে কি করিবে?

দক্ষিণ-আফ্রিকা দৌত্য-কাহিনী—শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ২০ সুরি লেন, কলিকাতা। পৃ. ১৭৫। দাম বারো আনা।

অনেককাল হইতে ভারতীয়েরা দক্ষিণ-আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আপ্রাণ পরিশ্রমের ফলে সে দেশকে বসতিযোগ্য করিয়াছে। এখন ইহাদের ঝাড়িয়া ফেলিবার দরকার। বোয়ার ও শ্বেতচর্ম্মের কবলে হতভাগ্যেরা যে নিদারুণ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকে, ব্যবস্থা-পরিষদ ও খবরের কাগজের কল্যাণে তাহার কতক কতক আমরা মাঝে মাঝে শুনিতে পাই। কিন্তু অনেক চেষ্টা ও আন্দোলন সত্ত্বেও ফল বিশেষ কিছু হইতেছে না, গায়ের রক্ত জল-করা জমা-জমি অন্যের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় অনেককেই দেশে ফিরিতে হইবে।

এই সম্পর্কের একটা ডেপুটেশনে লেখক এক জন সভ্য ছিলেন। সমালোচ্য বইটিতে তিনি তাঁহার আফ্রিকা-ভ্রমণ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনতিবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। ঐ নিগৃহীত ঔপনিবেশিকদের সহিত সাধারণের পরিচয় অত্যন্ত ভাসাভাসা রকমের। লেখকের এই সহজবোধ্য বইখানি এই বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা আনিয়া দিবে। প্রবর্দ্ধমান জাতীয়তার দিনে এই বই অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে; প্রত্যেক দেশবাসীর ইহা পড়িয়া দেখা উচিত। ছবি, ছাপা প্রভৃতির তুলনায় দাম অল্পই হইয়াছে।

ছিন্ন পাঁপড়ী—শ্রীনবগোপাল দাস। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১৩০। দাম দেড় টাকা।

গল্পের বই। মোট পাঁচটির মধ্যে তিনটির বিষয়বস্তু, বাঙালীর ছেলে ইউরোপে পড়িতে গিয়া বিদেশিনীর সঙ্গে রকমারী প্রেম করিতেছে। নূতনত্ব আছে, সন্দেহ নাই এবং প্রথম গল্প 'ব্যথার মালা'র কোন কোন

জায়গায় লেখক সত্য সত্যই উচ্চ শিল্প প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তবু সমগ্রভাবে কোন গল্পই রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। বইটা পড়িলে এই কথাটাই সকলের আগে মনে আসে, লেখক তাঁহার ইউরোপীয় ঠসক, বুকনী ও বিদ্যার বোঝা লইয়া পাঁয়তারা কসিয়া বেড়াইতেছেন, রসাবেশে কোথাও এক মুহূর্ত্তের জন্য এতটুকু আত্মবিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ঠিক এই কারণেই পাঠকের মনে একবিন্দু ছাপ পড়ে না। যেখানে-সেখানে অনাবশ্যক ইংরেজী শব্দের ব্যবহারে ভাষার সহজ রূপটি ফুটিতে পারে নাই, যদৃচ্ছা দৃষ্টান্ত দিতেছি—"দু'জনে সীট বদল করলে—কিন্তু সম্মুখে স্পেশ খুবই অল্প, তাই চেঞ্জের সময় দু'জনের গায়ে গায়ে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল—।" লক্ষ্য করিতে হইবে, একই বাক্যের মধ্যে আগে "বদল" ব্যবহার হইয়াছে,—সম্ভবতঃ তাহাতে জাতিপাত হয় নাই,—তবু পুনশ্চ চেঞ্জ আসিয়াছে। আবার মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তার মধ্যে একেবারে ইংরেজী গোটা বাক্যই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে বিলাতী নায়িকার সঙ্গে কথাবার্ত্তা সমস্তই ইংরেজীতে হইয়াছে নিশ্চয়, অতএব পাত্র-পাত্রীর মুখের কথাগুলা তর্জ্জমা। সেই তর্জ্জমার মধ্যে এক একটা ইংরেজী বাক্য রাখিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য আর কি থাকিতে পারে, একমাত্র গোবেচারা বাঙালী পাঠকদের চমক লাগাইয়া দেওয়া ছাড়া? উপমাগুলিও কোথাও কোথাও হাস্যকর, যথা—"আমি এখন মাটির ঢেলা, তুমি কর্ম্মকার, তুমি আমায় যে ভাবে গড়াবে সেইভাবেই গড়ে উঠব।" কিন্তু বাংলা দেশে কর্ম্মকারেরা যে লোহা পিটায়, এখনও ভাঁড় গড়িতে সুরু করে নাই।

কিন্তু এইরূপ অফুরন্ত ত্রুটি সত্ত্বেও মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-চমকের মত লেখকের অসাধারণ ক্ষমতার প্রকাশ পাইয়াছে। সেই জন্যই এত কথা বলিবার আবশ্যক হইল। আশা করি, পরবর্ত্তী লেখায় পাঠককে তাক লাগাইয়া সস্তায় কিস্তিমাৎ করিবার এই লোভ কাটাইয়া লেখক পূর্ণশক্তিতে ফুটিয়া উঠিতে পারিবেন।

জাগৃহী—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস; ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা। পৃ. ২৪২।

লেখিকার স্নিগ্ধ সুরুচিবোধ ও বলিবার একটি মনোরম ভঙ্গীর গুণে বইখানি উৎরাইয়া গিয়াছে, পড়িয়া তৃপ্তি পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে পাত্র-পাত্রীর মুখের অযথা দীর্ঘ বক্তৃতাগুলি ছাঁটিতে পারিলে বইটার আয়তন কমিত এবং গল্পটি আরও জমিয়া উঠিত। আখ্যানভাগের কতকাংশে অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তির' সাদৃশ্য ফুটিয়া উঠায় সেদিক দিয়া উৎকট অশোভনতা প্রকাশ পাইয়াছে। ছাপা বাঁধাই ভাল।

শনির দশা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৩৬।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নায়ক রাখালের শোচনীয় পরিণাম দেখান হইয়াছে। কিন্তু এই ট্রাজেডি যেন পাঠকদের অশ্রু নিষ্কাশন করিবার উদ্দেশ্যে জোর করিয়া আমদানী ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতা নাই। কাজেই অশ্রু ত আসেই না, চরিত্রগুলিও কোন নির্দ্দিষ্ট আকারে মনের মধ্যে ফুটিতে পারে না। তবু ইহার মধ্যে আমরা সুরুচি নীলিমা, ও নেপাল-চরিত্রের আংশিক সাফল্যের জন্য লেখককে অভিনন্দন জানাইতেছি। সম্ভবতঃ ইহা তাঁহার প্রথম রচনা; তাহা হইলে ইহার সম্বন্ধে ভবিষ্যতের আশা পোষণ করা যাইতে পারে।

হিন্দুত্বের পুনরুত্থান—শ্রীমতিলাল রায়। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা। পৃ. ১২২।

হিন্দুজাতি সকল ক্ষেত্রেই দিন দিন পিছু হটিয়া যাইতেছে, শক্তি ও বিশ্বাসের দৈন্য এবং শতবিধ অনাচারের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, সংহতি-জীবন লাভ করিয়া বাঁচিবার তীব্র প্রচেষ্টা নাই। বস্তুতঃ তলাইয়া দেখিতে গেলে এ জাতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভয় হইবার কথা। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় এই বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছেন এবং কার্য্যকরী পন্থা নির্দ্দেশ করিবার তিনি যে একজন অধিকারী ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। আলোচ্য বইখানায় তিনি আশার বাণী শোনাইয়াছেন যে, বাঙালীর দ্বারাই হিন্দুত্বের নবজাগরণ ঘটিতেছে। অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া রোগের কারণ নির্ণয় করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রদীপ্ত ভাষায় প্রতিবিধানের পথও অনেকগুলি বলিয়া দিয়াছেন। সকল বিষয়ে মত না মিলিতে পারে, কিন্তু বইখানি এ বিষয়ে চিন্তার খোরাক আনিয়া দিবে এবং আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া দিবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীমনোজ বসু
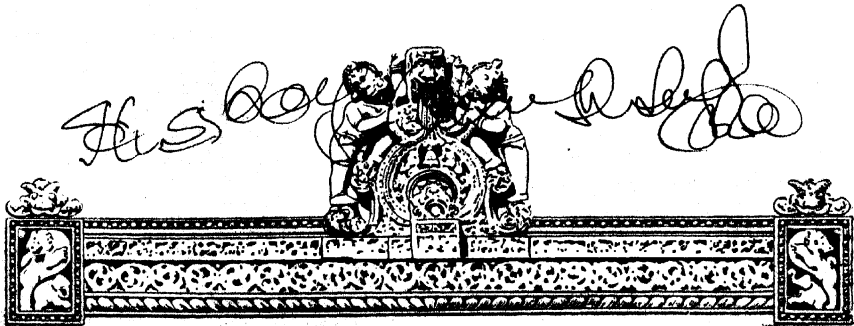
দুই বন্ধু

ডক্টর শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী

১

এক ছিল পরমাসুন্দরী মেয়ে, দেখতে ঠিক লক্ষ্মীর মত। তেমনি সুরূপা, তেমনি স্থিরযৌবনা, আর তেমনি বিষণ্ন-বদনা। এ তারই জীবনের করুণ অথচ স্বাভাবিক কাহিনী।

স্থান হচ্ছে ব্রাইস্ গাও-এর ফ্রাইবুর্গ শহর। সেটা যেন দক্ষিণ-জার্ম্মানীর "কালো বনের* পরী।" তার একধারে সবুজ গাছপাতা আর ছবির মত ছোট ছোট বাড়িতে ভরা অনুচ্চ পাহাড় এবং অন্যধারে এক ছোট্ট নদী সূর্য্যের আলোয় ঝিক্-মিক্ করে। এই মনোহর পাহাড় আর এই ছোট্ট নদীর মাঝে যে উপত্যকা সেই স্থানে জার্ম্মানীর নিজস্ব স্থপতিকলার নিরূপম রেখাটানা অনেকগুলি অনতিবৃহৎ বাড়ি, মনোরম বাগান, পরিষ্কার ঋজু ঋজু রাস্তা, মেরীর গীর্জ্জা, সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়, বাজার, দোকান, হোটেল, নাচঘর, রেস্তোর্াঁ, কাফে ইত্যাদি নিয়ে এই ছোট্ট শহর তৈরি হয়েছে। জার্ম্মান শহরের বিশেষত্ব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিমনীওয়ালা কারখানা বা অতিকায় অট্টালিকা এর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। পাহাড়ের ওপরে উঠলে সমস্ত "কালো বনের" নৈসর্গিক দৃশ্যের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য প্রাণ মন ভরে দেয়। মনে হয় প্রকৃতি যেন এক আঁচলা জামকে পট ক'রে তার উপরে তুলির ডগা দিয়ে যত রঙের সমাবেশ, যত শিল্পের নিপুণতা, যত রূপের অনুভূতি সব ব'সে ব'সে ফুটিয়ে তুলেছে।

এমন কি এই অতুল সৌন্দর্য্যের ছাপ ঐ শহরের মেয়েদের ওপরও পড়েছে। মনে হয়, ওর গাছে গাছে যে-সব পাখী গান করে তার সুরের সঙ্গে এর স্বচ্ছন্দ-বিচরণ-শীলা তরুণীদের হাস্যমুখরিত আলাপের সুর একই তানে বাঁধা, ওর তরু-লতা-ফল-ফুলে যে-সব রঙ ফোটে এর তরুণীদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও চক্ষু গণ্ডের রঙের সঙ্গে যেন তার কত মিল! এই সব হাস্যময়ী সুন্দরীদের মধ্যে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ছিল ঐ সতের-আঠার বছরের লক্ষ্মীর মত দেখতে একটি মেয়ে—নাম তার লুইসে।

লুইসের মা ছিল ফুলওয়ালী। তিনি বিধবা। লুইসের বাপ ছিল ন্যুর্ণবের্গের এক প্রকাণ্ড কারখানায় মজুর। লুইসে জন্মাবার অল্প কাল পরেই তার হয়েছিল মৃত্যু। শহর থেকে পাহাড়ে ওঠার যে রাস্তা, তারই গোড়ায় ছিল তার মার ফুলের দোকান। দোকানের সামনেটায় আগা-গোড়া কাঁচের দেওয়াল। এর এক অংশে ফুলের প্রদর্শনী। সেখানে সকল সময়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ক্রিসানথেমাম্, কার্ণেশন্, মেরিগোল্ড, ভায়লেট ইত্যাদি বিবিধ ফুলের তোড়া বা বাসকেট মূল্যবান আধারে সাজানো থাকে। দেওয়ালের মধ্যখানে দোকানে ঢোকার দরজা, তারও সমস্ত পাল্লা কাঁচের। তার ভেতর দিয়ে এবং দরজার অপর পার্শ্বের দেওয়ালের ভেতর দিয়ে দোকানের সব-কিছু দেখা যায়। দোকানের ভেতরেও বড় বড় ফুলদানী বা চুবড়িতে ভরা চারিদিকে নানা বর্ণের, নানা গন্ধের, নানা সজ্জার ফুল আর পাতা। এরই মাঝে ফুলরাণী হয়ে প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকত ও ফুল বেচত ঐ সৌন্দর্য্যের রাণী লুইসে।

এ শহরে ফুলের আদর বড় বেশী, কারণ এখানে বাইরের লোক যে আসে তারই প্রাণে জাগে বসন্ত। আর এই ছোট্ট শহরে সবচেয়ে প্রিয় ফুলের দোকান ছিল ঐটি। বহু ব্যক্তি ওখানে ফুল কিনতে আসত—তার মধ্যে নিত্য বৈকালে আসত দুটি তরুণ, তারা ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। একটির নাম কার্ল, অপরটির নাম হান্স। দু-জনে পরম বন্ধু এবং একই "বুর্শেন্ কোরের"* সভ্য। তারা তার

---

* কালো বন:—দক্ষিণ-পশ্চিম জার্ম্মানীর সুবিখ্যাত অরণ্য, নাম Schwarzwald বা Black-forest। ইহা Badonএর অন্তর্গত। এর সৌন্দর্য্য ও এর জলহাওয়ার খ্যাতির জন্যে পৃথিবীর সকল স্থানের ধনীরা এখানে বায়ুপরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে আসেন।

* বুর্শেন্ কোর জার্ম্মান-ছাত্র-সঙ্ঘ বিশেষ। এগুলি নেপোলিয়নের সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে গঠিত। জার্ম্মান জাতীয় জীবনে ইহাদের দান অতি মূল্যবান।

এতই গোঁড়া সভ্য যে কোরের সনাতন নিয়ম অনুসারে নানা রঙের ষ্ট্রাইপওয়ালা টুপি আর ব্যাজ না প'রে কখনও রাস্তায় বার হ'ত না। দু-জনেই জার্মান ছাত্রের নিয়ম যথাবিহিত পালন করেছে অর্থাৎ ডুএল লড়ে কয়েকটি তরোয়ালের খোঁচার দাগ গালে চিরস্থায়ী ক'রে নিয়েছে। দু-জনে একই অধ্যাপকের সেমিনারে 'নাতসনাল্ ওকোনোমি অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব অধ্যয়ন করে। দু জনেই গোঁড়া হিটলার-ভক্ত। দু-জনেই কার্ল মার্কস্ ও লাসালের নিছক নিন্দক। দু-জনেই রডবের্টুসের স্তাবক—আর দু-জনেই ছিল একান্তরূপ মুগ্ধ ঐ রূপসী লুইসের।

এ ছাড়া আর সব ব্যাপারেই ছিল তাদের চরম বৈষম্য। কার্ল ছিল প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশীয়। তার পিতার ব্যারণ পদবী গণ-তন্ত্রের যুগে অর্থহীন হ'লেও তাঁর জমিদারীর ক্ষীণ আয়টুকু এখনও তাঁকে আভিজাত্যের গৌরবে মণ্ডিত ক'রে রেখেছে অর্থাৎ তাঁকে খেটে খেতে হয় না। আর হান্সের পিতা হঠাৎ-ধনী—প্রকাণ্ড কারখানাওয়ালা! ন্যুর্ণবের্গ ফ্রাঙ্কফুর্ট ইত্যাদি বহু শহরে তাঁর সসেজের কারখানা আছে—এ ছাড়া পেন্সিল, খেলনা, নকল রেশম ইত্যাদি বহু দ্রব্যের কারখানার তিনি মালিক। ন্যুর্ণবের্গের এক গলিতে তিনি বাল্যকালে সসেজ বিক্রী করতেন এবং সেই অবস্থা থেকে নিজ বুদ্ধি, পরিশ্রম ও ভাগ্যগুণে এখন কোটিপতি হয়েছেন।

কার্লের দেহ ছিপছিপে পাতলা; দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট আড়াই ইঞ্চি! প্রকাণ্ড লম্বা মুখ, প্রকাণ্ড উঁচু নাক, কেউ তাকে সুপুরুষ বলবে না। কিন্তু তার শান্ত চক্ষুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি পরম তৃপ্তিদায়ক, দেখলেই মনে হবে এ সেই ধীর, সমাহিত-চিত্ত ব্যক্তি যে মনে করে "মননেন সহ যঃ জীবতি সঃ এব জীবতি।" আর হান্স-কে প্রাচীন গ্রীসের নিখুঁত প্রস্তরমূর্ত্তি বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। জার্ম্মানীর মতন দেশেও তার মত অত বলিষ্ঠ যুবক আর অত নিখুঁত পুরুষের রূপ অল্পই দেখা যায়। তার মুখের দীপ্ত আভা দেখলেই মনে হয় ওর মধ্যে কি প্রচণ্ড প্রাণশক্তি!

সামাজিক ব্যাপারে কার্ল মনে করে শ্রমজীবী আর আভিজাত্যের মধ্যে একটা সত্যিকারের মিলন আনা প্রয়োজন। কার্লের মুখে এই রকম মন্তব্য শুনলে হান্স ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর করে, "রেখে দাও তোমার প্যানপেনানি! ঐ কুত্তাগুলোকে নাই দিলেই ওরা চড়ে মাথায়—ওদের সব সময়ে শাসনে না রাখলে রক্ষে আছে?" কার্ল বলে, "তার পরিণামে যে জাতীয় সঙ্কট উপস্থিত হবে।" হান্স বলে "হ্যাঁ; জাতীয় সঙ্কট আনবে ঐ কুত্তার দল! কি করবে ওরা? ধর্ম্মঘট? কাজ বন্ধ করলেই শূয়োরগুলোকে সঙ্গীনের খোঁচা মেরে কাজ আদায় করবো না!"

প্রবৃত্তির ব্যাপারে হান্স ভালবাসে তীব্রতা ও উজ্জ্বলতা, আর কার্ল ভালবাসে স্নিগ্ধতা ও গভীরতা। নাচের আসরে গিয়ে হান্স খোঁজে যত চটকদার সুন্দরী আর অ্যামেরিক্ জ্যাজ ব্যাণ্ডের উন্মত্ত সুর। তার সঙ্গে সে মত্ত হয়ে নাচতে ভালবাসে চার্লস্টন, ব্ল্যাক্‌বটম্ আর রাম্বা। কার্ল ভালবাসে ইউরোপের নিজস্ব নাচ—'ভাল্‌তস্' আর তার সঙ্গে 'ষ্ট্রাউসে'র সুর! যদি 'মোজার্ট' বাজলো বা তার সঙ্গে 'মিনুয়েত' বা 'পোলকা' নাচ হ'ল তাহ'লে তো সে মুগ্ধ! তার মূর্চ্ছনার আনন্দে সে বিভোর হয়ে যায়। হান্স ভালবাসে 'শ্যাম্পেন' বা কড়া 'লিকার'! কার্ল ভালবাসে বহু পুরাতন 'রাইন ওয়াইন'। কিন্তু তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি এত বিপরীত হলেও তাদের কোথায় কোন্ মিলনসূত্র ছিল কে জানে, তারা ছিল পরম বন্ধু, আর তারা ছিল এক বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে ঐ শহরের অদ্বিতীয়া সুন্দরী আর কেউ নয়, শুধু ঐ লুইসে!

প্রতি অপরাহ্ণের নির্দ্দিষ্ট সময়ে দুই বন্ধুতে ঐ ফুলের দোকানের দোরগোড়ায় আসত—আর হান্স খুলত দরজা—শব্দ হ'ত টুং-ং-ং! লুইসেও ঠিক সেই সময়ে অন্য সব কাজ ফেলে দোকানে থাকত—কোন দিন তার ভুল হ'ত না। শত শত ক্রেতার দরজা খোলার 'টুং' শব্দ থেকে ঐ শব্দটির পার্থক্য সে অনুভব করত, তাই ঐ টুং-ং-ং কানে বাজলেই তার অত লালিত্যের উপরেও দুই গণ্ডে নতুন নতুন রঙের ঢেউ খেলে তাকে আরও সুন্দর ক'রে তুলত। ওরা প্রায়ই কিছু কিনত না, শুধু লুইসের সঙ্গে আলাপ করতেই আসত। লুইসেও তা ভাল রকম বুঝত, কিন্তু তবু প্রতিদিন তাদের কাছে দোকানের প্রতি ফুলটি, প্রতি পাতাটির পরিচয় দিত। যতক্ষণ তারা সেখানে থাকত হান্সই লুইসের সঙ্গে কথা বলত। আর কার্ল থাকতো চুপ করে, শুধু লুইসে যখন তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করত তখন তার মুখ ফুটত। না হ'লে সে শুধু দেখত ঐ অনিন্দ্যসুন্দরী লুইসে।

২

সেদিন ছিল রবিবার, মে মাসের প্রারম্ভ। বুর্শেন কোরের বসন্তোৎসব অর্থাৎ নাচের দিন। শহরের উপকণ্ঠে "গ্র্যুন থাল" গ্রামের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সৌখীন রেস্তোরাঁর বৃহত্তম হলটিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নাচের আসর করা হয়েছে। বুর্শেন কোরের তরুণ সভ্যরা সকলে তো এসেছেই, ঐ শহরের প্রবীণ নিবাসী, কোরের পুরাতন সভ্যরাও এসেছেন, আর এসেছে ঐ শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তরুণী কন্যারা—ঐ উৎসবের উপযুক্ত সাজে সজ্জিত হয়ে। এ ছাড়া যে-সব সভ্যের ভদ্রবংশীয়া বান্ধবী আছে তাদের নিয়ে তো তারা এসেছেই।

হান্‌স সেদিন লুইসেকে নিমন্ত্রণ ক'রে সেখানে নিয়ে গেল। কার্ল অবশ্য সঙ্গে গেল। লুইসের আবির্ভাব সেখানে দস্তুরমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলে। প্রথমতঃ সে অত রূপসী ব'লে, দ্বিতীয়তঃ সে ভদ্রঘরের মেয়ে নয় ব'লে, তৃতীয়তঃ সে হান্‌সের সঙ্গে এসেছে ব'লে। হান্‌সের প্রচণ্ড খ্যাতি, সে নাকি নারী-হৃদয় জয় করতে অদ্বিতীয় এবং তার জন্যে বহু তরুণীর হৃদয় ভেঙেছে। কোরের নিয়ম, তরুণ-তরুণীরা পরস্পরের সঙ্গে অবাধে নাচে। কোন তরুণ কোন তরুণীকে নাচতে অনুরোধ করলে সে যদি অন্যের কাছে প্রতিশ্রুত না থাকে তো সে-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে সে বাধ্য। কিন্তু পূর্ব্বে দু-একবার হান্‌সের বান্ধবীকে নাচে আহ্বান ক'রে বিষম বিপত্তি ঘটেছিল, এমন কি সে ব্যাপার ডুএলে পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল। হান্‌সের সঙ্গে ডুএল লড়ার অর্থ অবধারিত পরাজয় নিমন্ত্রণ করা। সুতরাং লুইসের মত সুন্দরীর সঙ্গে একবার নাচা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করলেও বহু তরুণ সে ইচ্ছা দমন করাই শ্রেয়ঃ মনে করলে।

নাচ সুরু হ'ল। প্রথমেই বাজল উদ্দাম 'জ্যাজ্'। বহু যুগলমূর্ত্তি তার তালে তালে নাচছে। ক্ষিপ্র পদবিক্ষেপে তারা নাচছে 'চার্লস্টন্'। হান্‌স ও লুইসেও নাচছে। সুর ও নাচের উন্মাদনায় তারা উৎফুল্ল! তাদের চোখে মুখে হয়েছে কি আনন্দের উচ্ছ্বাস! তাদের সৌন্দর্য্যের হয়েছে কি অপূর্ব্ব বিকাশ। এই যুগল-সুন্দরের আত্মহারা নাচ সকলের নজরে পড়ল। অনেকে নাচ থামিয়ে তাদের দেখলে, অনেকে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাচলে। শেষে সকলেই গেল থেমে! বাজনা আরও উদ্দাম সুরে চলল। তারা আরও উৎফুল্ল হ'য়ে নাচল। অনেকে বিমুগ্ধ হয়ে তাদের 'সোলো' নাচ দেখলে। বাজনা যখন থেমে গেল, সকলের প্রচণ্ড করতালি-ধ্বনি সেই বৃহৎ নাচ-ঘর প্রতিধ্বনিত করলে। পুলকিত চিত্তে তারা এসে কার্লের পাশে বসল। সুনৃত্যের মিষ্ট-শ্রম-জাত মধুর ক্লান্তি লুইসের সুন্দর মুখকে সুন্দরতর ক'রে দিল।

কয়েকটা নাচের পর একটা নাচের মধ্যে হান্‌স জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন লাগছে?" লুইসে প্রফুল্ল মনে বললে, "চমৎকার!"

হান্‌স—ভারি খুশী হ'লুম।

লুইসে—সত্যি আপনি বড় ভাল নাচেন।

হান্‌স—ভাল নাচি ব'লে আমার খ্যাতি আছে বটে।

লুইসে—আগে বুঝি খুবই নাচতেন?

হান্‌স—নিশ্চয়! বার্লিন, ম্যুন্‌শেন্, লাইপ্‌ৎসিগ্ ইত্যাদি শহরের শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরীদের সঙ্গে বহুৎ নেচেছি!

লুইসে—বটে!

হান্‌স—নিশ্চয়! সে সুযোগও আমার অনায়াসে জোটে। জানেনই তো আমার পিতা হচ্ছেন বিখ্যাত ধনী, তাঁর অনুগ্রহের জন্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লালায়িত।

লুইসে—ও!

হান্‌স—কিন্তু জানেন আপনার মত সুন্দরী কোথাও দেখিনি! আপনার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি শুনেই তো এই গেঁও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছি।

লুইসে—এ সব বাজে কথা। বড় বড় শহরের সোসাইটি-মহিলাদের সঙ্গে কি আর আমার তুলনা হয়?

হান্‌স—সত্যি আপনার মত এত সুন্দর শরীরের গঠন, এত সুন্দর চোখ, মুখ, নাক—এত সুন্দর রঙ—এত সুন্দর হাত-পায়ের গড়ন—আর এত সুন্দর চুলের বাহার কোথাও দেখিনি।

লুইসে—ইস্! মিথ্যা চাটুবাদ করবেন না।

হান্‌স—সত্যি বলছি! আপনার প্রয়োজন শুধু একটু আভিজাত্যের কুলটুরের স্পর্শ, তা হ'লেই আপনি জার্ম্মানীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরী হবেন।

লুইসে—থামুন, থামুন।

বাজনা গেল থেমে। কিছুক্ষণ পরে আবার নাচ আরম্ভ

হ'ল—এবার হ'ল আধুনিক 'ব্ল্যাকবটম্'। এবারও নাচের মধ্যে হান্‌স কথা আরম্ভ করলে, বললে, "এ নাচটা খুবই নতুন, অনেকে জানে না। দেখুন না সকলে কি বিশ্রী নাচছে!"

লুইসে—কিন্তু আপনি তো এও বেশ নাচেন দেখছি।

হান্‌স—তা আর হবে না? এর পেছনে কত অর্থব্যয়, কত পরিশ্রম করেছি।

লুইসে—এটাও বুঝি বার্লিনে শিখেছেন?

হান্‌স—নিশ্চয়, বার্লিন থেকে মাত্র গত মাসে শিখে এসেছি।

লুইসে—ও!

হান্‌স—জানেন, এখানেও অনেক মহিলা এই নাচটি আমার সঙ্গে নাচবার জন্যে লালায়িত?—সকলেই তো জানে—এ শহরে এ নাচের ওস্তাদ একমাত্র আমি।

লুইসে—সত্যি? তা'হলে তো ঐ সব মহিলাদের ইচ্ছা অপূর্ণ রাখা ঠিক হচ্চে না।

হান্‌স—আমি ঠিক করেছি আজ শুধু আপনার সঙ্গেই নাচব।

লুইসে—বহু ধন্যবাদ! কিন্তু আমি এমন স্বার্থপর নই এবং এত লোকের অভিশাপ কুড়োতেও চাই না।

হান্‌স—ওরা আমার পেছনে ছোটে ব'লে ওদের সঙ্গে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নাচতে হবে এমন কিছু খতেপত্রে লেখা আছে?

হঠাৎ তাদের নাচ কেমন বেখাপ্পা হয়ে গেল—লুইসের পায়ের ওপর হান্‌স দিল পা মাড়িয়ে, লুইসে 'উঃ' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠলো—তাদের নাচ গেল থেমে। দু-জনে গিয়ে বসলে।

পরের নাচে হান্‌স জিজ্ঞাসা করলে, "পূর্ব্বে কখনও সুপুরুষের সঙ্গে নেচেছেন?" লুইসে বললে, "না, এই প্রথম!" হান্‌স পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করলে। অন্তরে অন্তরে অতি সন্তুষ্ট হ'ল। লুইসের মুখভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরে শ্লেষের ক্ষীণ আভাসটুকু তার বোধগম্য হ'ল না। সে মুখে বললে, "তা কি হয়? আচ্ছা, আমার বন্ধুটিকে কি মনে করেন—সুপুরুষ?"

লুইসে—মন্দ কি?

হান্‌স—হাঃ, হাঃ, আপনার শ্লেষটুকু আমি বুঝেছি। কিন্তু ভেবে দেখুন ওর স্বভাবটি কেমন?

লুইসে—ভাল।

হান্‌স—বেচারি! অতি ভাল, অতি ভাল! অনেক সময়ে ভাবি, ভগবান ওকে মেয়ে করবেনই ঠিক করেছিলেন, কিন্তু হাত পা মুখ অত লম্বা হয়ে গেল দেখে পুরুষ ক'রে দিলেন! হাঃ, হাঃ, হাঃ!

আবার নাচ বেখাপ্পা হয়ে গেল। লুইসে অকস্মাৎ নাচ থামিয়ে আপন আসনে গিয়ে বসলে। হান্‌স হ'ল বিস্মিত—এরকম তো কখনও হয় না!

পরের নাচ হ'ল 'ভালতস্', বেজে উঠল, "রোস অফ ইস্তাম্বুলের" সেই সুমধুর সুর। এবার লুইসেকে নিয়ে কার্ল গেল আসরে নাচতে। যেতে যেতে লুইসে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি তো আধুনিক নাচ একটাও নাচলেন না?" কার্ল বললে, "আমি ও-সব জানি না।"

লুইসে, "ও! আপনি বুঝি ও-সব ভালবাসেন না?"

কার্ল—"ঠিক কথা! আমেরিকা হ'তে আমদানী ঐ আফ্রিকানদের নকল নাচে আমি কোন রস পাই না। [তাদের নাচ আরম্ভ হ'ল] কিন্তু এ নাচ কি মনোহর! [দুই তিন পাক ঘোরার পর] এ যে ইউরোপের আপন জিনিষ! [আরও দু-তিন পাক ঘুরে] কি মধুর!!

কার্ল নাচতে নাচতে ভাবে বিভোর হ'ল—তার চোখ দুটি জড়িয়ে এল! লুইসে হ'ল বিমোহিতা—আবেগভরে বললে, "সত্যিকারের নৃত্যরসিক আপনিই!"

কার্ল বলে—"আপনার সঙ্গে নেচে তা না-হয়ে উপায় আছে?" লুইসে তার উত্তর না দিয়ে বাজনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে কিন্নর-কণ্ঠে গেয়ে উঠল—

বিস্‌ত দু আইনে ফাল্‌শে সোয়াল্‌বে
সোয়াল্‌বিন্ গেএত দান্ ফোর্ত।*

কার্ল বিমুগ্ধ হয়ে বলে, "কি সুন্দর! জার্ম্মানীর সব সৌন্দর্য্য আপনার মধ্যে রূপ নিয়েছে!" লুইসে চুপ! সুরের কেমন একটা আমেজ, ছন্দের কেমন একটা দোলা, নাচের কেমন একটা হিল্লোল তাকেও বিভোর ক'রে দিয়েছে। আর দুই গাজেল-আঁখি বুজে এসেছে। কার্ল ভাববিজড়িত কণ্ঠে

* "Bist Du eine Falsche Schwalbe Schwalbin geht dann fort!"
তুমি যদি অবিশ্বাসী পাখী হও, পক্ষিণী যাবে উড়ে।

আবার বলে, "আমার জীবন ধন্য, যে ভেতরে বাইরে এত সুন্দর তাকে নিয়ে এই সুর আর এই নাচের মধুরতা উপভোগ করতে পেলুম।" ঐ সুর, অত ভাবভরে নাচ, আর অত কোমল প্রাণের অত মোলায়েম স্তুতি! লুইসের অন্তরের গভীরতম প্রদেশের কোন্ তন্ত্রীতে এক অভূতপূর্ব্ব ঝঙ্কার হ'ল—লুইসের সারা অঙ্গে এল শিহরণ। তার কোকিল কণ্ঠে আবার বেজে উঠল গান -

"ডু বিস্‌ত মাইন, উন্‌ত ইশ্ বিন্ দাইন
উন্‌ত ভির সিন্‌ত সোয়াই গেসেলেন্।"*

কার্ল হ'ল আরও মুগ্ধ! তার মনে হ'ল এ তো শুধু আসরের গান নয়—এ যেন লুইসের জীবনসঙ্গীত! তারও এল সারা অঙ্গে শিহরণ!! উভয়ের চোখ উভয়েতে নিবদ্ধ হ'ল—উভয়ে উভয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখলে,—উভয়ে উভয়কে চিনলে!

এ ব্যাপারটা হান্‌সের নজর একেবারে এড়ায় নি। সে মনে মনে অধীর হয়ে প্রতিজ্ঞা করলে, অবিলম্বে লুইসের সঙ্গে কায়েমী ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে হবে। বাজনা শেষ হ'লে কার্ল ও লুইসে আচ্ছন্নের মত এসে বসলে। উভয়ের চক্ষু যেন কোন্ রঙীন স্বপ্নের আবেশে অর্দ্ধনিমীলিত! সে স্বপ্নের জাল বিচ্ছিন্ন ক'রে হান্‌সের কর্কশ কণ্ঠ তাদের কর্ণপটে আঘাত করল, "আশ্চর্য্য! বিংশ শতাব্দীতেও লোকে এই সব নাচে!" দু-জনের কেউ কোন উত্তর দিলে না। এমন কি কার্লও এর প্রতিবাদ করলে না! হান্‌স আরও চঞ্চল হয়ে বললে, "কার্ল! তোমাকে নিয়ে বাপু কোন ভদ্রসমাজে যাওয়া চলে না"—সেই মুহূর্ত্তে আবার সেই 'জ্যাজের' উন্মত্ত সুর সকলকে বিচলিত ক'রে তুললে, হান্‌স লাফিয়ে উঠল। আশা করলে প্রতিবারের মত লুইসে আনন্দে উতলা হয়ে নাচতে উঠবে। কিন্তু লুইসে চুপ ক'রে রইল—যেন এ উদ্দাম সুর তার কানেই ঢোকে নি, যেন হান্‌সের লাফিয়ে ওঠা তার নজরেই পড়ে নি। অগত্যা হান্‌স বসল, কিন্তু তার চিত্ত আরও অস্থির হয়ে উঠল। লুইসেকে সে বললে, "আপনার কি হয়েছে?" লুইসে তবু নিরুত্তর! হান্‌স আরও অধীর হয়ে ওয়েটারকে ডেকে এক তীব্র পানীয়ের হুকুম দিল—দু-গ্লাস! দু-গ্লাস কড়া লিকার এল হান্‌স তার একটা লুইসেকে দিলে। লুইসে অস্বীকৃত হ'ল তা পান করতে। হান্‌স সম্পূর্ণ ধৈর্য্য হারিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে, আপন প্রচণ্ড অহঙ্কার চূর্ণ ক'রে এই প্রথম নিজে লুইসেকে অনুরোধ করলে তার সঙ্গে নাচতে।

সুতরাং লুইসেকে যেতে হ'ল নাচের আসরে। নাচ আরম্ভ ক'রে হান্‌স জিজ্ঞাসা করলে, "আপনারও ঐ সেকেলে নাচ ভাল লাগে?"

লুইসে—খুব ভাল লাগে!

হান্‌স—আশ্চর্য্য, আমি এতো সুন্দরীর সঙ্গে মিশেছি—কত ক্রোরপতি, জেনারেল, মন্ত্রী প্রভৃতির মেয়ে আমার বান্ধবী—কিন্তু কাউকে বলতে শুনিনি ভাল্‌তস্ ভাল লাগে।

লুইসে কোন উত্তর দিলে না! তাদের নাচ আবার বেখাপ্পা হ'তে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ হান্‌স কেমন অদ্ভুত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "তিতির সেতে কখনও গেছেন?—সেখানে গিয়ে কখনও হোটেলে থেকেছেন? জানেন, সেখানকার হোটেলে ইউরোপের শুধু কোটিপতি এবং রাজরাজড়াদের থাকবার ক্ষমতা হয়—"

লুইসে শুধু বললে, "না!"

হান্‌স—তা জানি! সেখানে থাকতে গেলে দৈনিক অন্ততঃ দুশো মার্ক হোটেল খরচই লাগে!

লুইসে—তাতে আমার কি?

হান্‌স—তোমার কি?—আমি তোমাকে কালই সেখানে নিয়ে গিয়ে একমাস থাকব—" লুইসে তৎক্ষণাৎ নাচ থামিয়ে নিমেষে হান্‌সের বাহুবেষ্টনী হ'তে নিজকে মুক্ত ক'রে বললে, "আপনি অতি বর্ব্বর!" তারপরই দ্রুতপদে আপন আসনে গিয়ে বসলে। হান্‌স প্রথমে একটু বিস্মিত হ'ল। এও সম্ভব? সামান্য মজুরের মেয়ে তার মত ধনবান রূপবান যুবকের ঐ রকম স্পষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে? কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই মনে মনে বললে, "ন্যাকামি!" অবজ্ঞার সহিত একটু মুচকে হেসে আপন আসনে গিয়ে বসলে। সে রাত্রে আর তাদের নাচ হ'ল না।

লুইসে বললে, "আমার বড় মাথা ধরেছে! এখুনি বাড়ি যাব।" অগত্যা তাদের নাচের আসর থেকে বিদায় নিতে হ'ল।

---

* "Du bist mein und ich bin Dein
Und wir sind zwei Gesellen!"

"তুমি আমার এবং আমি তোমার—আর আমরা দু-জন যুগল বঁধু!"

৩

নাচের আসর থেকে বার হ'য়ে রাস্তায় এসে কিছুক্ষণ হাঁটার পরই তারা ট্রামে উঠল। ট্রাম প্রায় এক মাইল গিয়ে শহরে প্রবেশ করে। ট্রাম তখন একেবারে খালি, কারণ তখনও নাচ ভাঙেনি, ট্রামে আসা পর্য্যন্ত তাদের মধ্যে একটা কথাও হ'ল না। ট্রামে উঠে লুইসে জানালার ধারে এক আসনে বসলে, হান্‌স তার পাশে বসলে। লুইসে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে সামনের বেঞ্চে বসলে। হান্‌স একটু মুচকে হাসলে, ভাবলে, "ইস্! এ ঢঙের অর্থ যেন বুঝি না!" কার্ল হ'ল পরম বিস্মিত—এ আবার কি? যাই হোক সে হান্‌সের পাশে বসলে। ট্রাম দিল ছেড়ে। ট্রাম চলতে লাগলো। অনেকক্ষণ সকলে চুপ ক'রে রইল। অকস্মাৎ হান্‌স জিজ্ঞাসা করলে, "এতক্ষণ ঐ বাজনার পর, ট্রামের কন্‌সার্টটা কেমন লাগছে মিস লুইসের?" লুইসে কোন উত্তর দিলে না—বাইরের দিকে মুখ ফেরালে। কার্ল বললে, "তোমাদের জ্যাজের হট্টগোল আর এই ট্রামের ঘড়ঘড়ানিতে পার্থক্যটা কোথায়?" হান্‌স হেসে উঠল।

কার্ল—যতই হাস, আমেরিকা থেকে আমদানী এই অসভ্য নাচ ইউরোপের যত ক্ষতি করেছে এমন আর কিছু করে নি।

হান্‌স—হাঃ, হাঃ, হাঃ—সত্যি নাকি?

লুইসেরও প্রথমটা মনে হয়েছিল, কার্ল হয়ত একটু বাড়িয়ে বলছে, কিন্তু হান্‌সের এই বিকট হাঃ, হাঃ, হাঃ তাকে এত বিরক্ত করলে যে মুহূর্ত্তে তার কাছে যেন একটা সত্য প্রকাশিত হ'ল, সত্যিই ত এই-সব অ্যামেরিক্ নাচ কি বিশ্রী!

কার্ল—হেসে উড়াবার চেষ্টা করলে আর কি হবে? আমার কথা সত্যি!

হান্‌স—যেহেতু তুমি এ-সব নাচ জান না—এর মর্ম্ম বোঝ না—এর রস গ্রহণ করতে পারো না! কিন্তু লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, এমন কি তোমার মোজার্ট ষ্ট্রাউসের দেশ ভিয়েনাও যে এর স্রোতে ভেসে গেল! আসল কথা আর কিছুই নয়—আধুনিকতার সব-কিছু তোমার খারাপ লাগে, কারণ তোমার মন হয়েছে অতি বৃদ্ধ—তুমি থাক মধ্য-যুগে!

কার্ল—আমি ইউরোপের বৈশিষ্ট্য ভালবাসি—

হান্‌স—তা জানি এ ব্যাপারে তুমি রক্ষণশীল, কিন্তু আসল ব্যাপারেই তুমি উদার—অর্থাৎ অকেজো।

লুইসে—তার মানে?

কার্ল—থাক্—থাক্!

হান্‌স—তার মানে উনি মজুর বেটাদের মাথায় তুলে জার্ম্মানীর এত শিল্পের উন্নতি সমস্ত নষ্ট করতে—

কার্ল—কিন্তু হান্‌স—

হান্‌স—ইস্—অমনি রাগ! কোদালকে কোদাল বললেই যে রাগে সে অকেজো নয় তো—

কার্ল—কিন্তু হান্‌স—মানুষকে অত ঘৃণা করা, বিশেষতঃ যে-সব মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ—

হান্‌স—কৃতজ্ঞ! কিসের জন্যে কৃতজ্ঞ? ঐ কুত্তাদের আমরা খেতে দিই ব'লে আমাদেরই ওদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে?—না—

কার্ল—কিন্তু হান্‌স—

হান্‌স—ওদের আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত—কিন্তু ওদের কৃতজ্ঞতা ব'লে কোন জিনিষ আছে? ওদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর—দেখবে তোমার ভাল-মানুষির সুবিধা নিয়ে তোমারই সর্ব্বনাশ করবে। চাবুক লাগাও দেখবে কুকুরটির মত তোমার সব কাজ করছে! কি বলেন মিস লুইসে? [লুইসের মুখ বিবর্ণ, কার্লের মুখ লাল হয়ে উঠেছে] হাঃ, হাঃ, হাঃ—সতীত্ব, সাধুত্ব, কৃতজ্ঞতা—ওদের মধ্যে যেন এসবের অস্তিত্ব আছে! ওদের কোন মেয়ে যদি সতীগিরি ফলায় তো জানবে, সে শুধু দর বাড়াবার ফন্দি—

কার্ল [চীৎকার ক'রে উঠলো]—হান্‌স থাম!

হান্‌স—হাঃ, হাঃ, হাঃ! তোমার নারীসুলভ নরম মনে এই সত্যি কথার খোঁচা বুঝি বেজায় আঘাত দিল? কিন্তু আমি তোমাকে এখুনি প্রমাণ ক'রে দেব—চাক্ষুষ প্রমাণ ক'রে দেব এ কথা কত সত্যি! [লুইসের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে) কি মিস্ লুইসে আপনারও এ-কথায় সন্দেহ হয়?

এমন সময়ে ট্রাম কণ্ডাক্টার গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "আবষ্টাইগেন্" [নেমে যাও]! ট্রাম তাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছেচে। ট্রাম থেকে নামতে নামতে কার্লের মনে হ'ল—আজ ঐ কন্‌ডাক্টারের গুরুগম্ভীর নাদ "আবষ্টাইগেন" তাদের যেন একটা আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করলে।

তিন জন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চুপ ক'রে হাঁটতে লাগল। তিন জনের প্রাণেই আলোড়ন—কি প্রবল আলোড়ন! অল্প দূরেই লুইসের বাসা। তার বাসার দোর-গোড়ায় এসে লুইসে চাবি বার ক'রে দরজায় লাগিয়েছে—এমন সময়ে হান্‌স তার অতি নিকটে এসে হুকুম দিলে, "লুইসে, দাঁড়াও! তোমাকে একটা কথা শুনতে হবে!" লুইসের প্রাণে কেমন একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক জাগল! দরজা খুলতে গিয়ে তার হাত কেঁপে উঠল—তার সমস্ত শরীরে একটা ক্ষীণ কম্পন এল—শুষ্ককণ্ঠে সে না ব'লে থাকতে পারলে না, "কি কথা?" হান্‌স তার মুখের কাছে মুখ এনে বললে, "দেখ, তোমার এ ন্যাকামির অর্থ আমি বুঝি—"

যেন এক বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের আঘাত লুইসেকে নিমেষে সচেতন ক'রে দিলে—তৎক্ষণাৎ তার ক্ষণিকের ভীতি দূর হ'ল—সে দীপ্ত হ'য়ে বললে, "আমাকে বুঝি অপমান করতে চান?" পর মুহূর্তেই চাবিতে এক মোচড় দিয়ে দরজা খুললে এবং দরজাকে মাত্র একটু ফাঁক করেছে, হান্‌স তার হাত চেপে ধ'রে বললে, "থামো! স্পষ্ট বল কি চাও?" লুইসে বললে, "হাত ছেড়ে দিন!" হান্‌স বললে, "সোজা বল, কি চাও? ভাল বাড়ি? মোটর গাড়ী? মাসহারা? কত মাসহারা—কত?—এক হাজার?—পাঁচ হাজার? দশ হাজার?—কত? কত?"—বলতে বলতে লুইসের কুসুমকোমল বাহুযুগল দুই হাত দিয়ে চেপে ধ'রে লুইসেকে বুকের কাছে টেনে আনলে। লুইসে চীৎকার ক'রে উঠল, "ছেড়ে দাও" এবং শরীরের সকল শক্তি দিয়ে তার কবল থেকে নিজকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলো—কিন্তু বৃথা! হান্‌সের অধর তার গণ্ড স্পর্শ করলে—এমন সময়ে হান্‌স অনুভব করলে তার দুই স্কন্ধে লম্বা লম্বা আঙ্গুলের এক অদ্ভুত চাপ—তার অসহ্য যন্ত্রণা হ'ল—তার দুই চক্ষু যেন অন্ধ হ'য়ে এল—তার দুই হাত অবশ হ'য়ে এল। লুইসে তার শিথিল মুষ্টি হ'তে নিজকে নিমেষে মুক্ত ক'রে দরজা খুলে ফেললে এবং বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে আরম্ভ করলে! ঠিক সেই মুহূর্তে কাঁধের সে চাপ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হান্‌স বেগে গিয়ে দরজার ওপর পড়ল এবং চীৎকার ক'রে উঠল, "থামো!" কিন্তু লুইসে তখন এত প্রচণ্ড বেগে দরজায় ধাক্কা দিয়ে সেটা বন্ধ ক'রে দিলে যে, ঐ অতি গুরু দরজার আঘাত সোজা হান্‌সের মাথায় লাগল—মাথাফাটার সেই ভীতিপ্রদ শব্দ হ'ল "থাড্‌" এবং পরমুহূর্তে হান্‌সের মত বলিষ্ঠ পুরুষ দূরে ছিটকে পড়ে কাতর আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো, 'ও'!

৪

পরের দিন শহরের ছাত্রসমাজে এই সংবাদ অতিরঞ্জিত ভাবে প্রচারিত হ'ল। বেচারী হান্‌সকে হাসপাতালে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তার সমস্ত মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হয়েছে। হান্‌সের প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য শত্রুর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না—তারা এই ব্যাপার নিয়ে একটা তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করলে। বেচারি হান্‌সের নারী-হৃদয়-জয়শক্তির প্রচণ্ড খ্যাতি বিনষ্ট হ'ল।

সঙ্গে সঙ্গে এ-সংবাদও শুধু ছাত্রমহলে নয় সমস্ত শহরে প্রচারিত হ'ল যে এক ব্যারণের ছেলে সামান্য এক মজুরের মেয়েকে বিয়ে করছে। সমস্ত শহরে এ-সংবাদ দস্তুরমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলে। অনেকেরই দুর্ভাবনা হ'ল লর্ড-ব্যারণের ছেলেরাও যদি এই কাজ করে, সমাজের কি পরিণাম হবে? ছোট ছোট কাফেতে বাড়ির গিন্নীরা বৈকাল চারটায় শকোলাডে* ও কুখেন† খেতে সমবেত হয়ে এই আলোচনা করেন; সন্ধ্যায় 'ডিন্নার' টেবিলে সমবেত হয়ে সকল পরিবারে এরই বিচার চলে; বাজার করতে বার হয়ে প্রতি মাংসের দোকানে, প্রতি সসেজের দোকানে, প্রতি তরিতরকারির দোকানে গিন্নীরা এই ব্যাপার নিয়ে তর্কবিতর্ক করেন;—এমন কি রাত্রে বিয়ার-হলে সমবেত হয়ে বৃদ্ধেরা লিটারের পর লিটার বিয়ার ওড়ান, তাঁদের বেঁকানো পাইপ টানেন আর রাত্র বারটা-একটা পর্য্যন্ত উত্তেজিত হয়ে এই প্রসঙ্গ চালান। তরুণদের মধ্যে একদল এই সংবাদ পেয়ে মহা উত্তেজিত হ'ল, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের A. St. A, র‡ যে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল তারা কার্লকে সম্বর্দ্ধনা করবার আয়োজন করলে। কিন্তু কার্লের আপন 'কোরে' মহা গণ্ডগোল বাধলো, একদল স্থির করলে কার্লকে 'কোর' থেকে তাড়াতে, অন্য দলের মত হ'ল কার্ল ঠিক করেছে।

* শকোলাডে—কোকোজাতীয় পানীয়।

† কুখেন—কেক।

‡A. St. A.—Allgemeiner Studenten Ausschuss—সাধারণ ছাত্রসঙ্ঘ।

কিন্তু যাদের জন্যে এই আন্দোলন, এই কোলাহল, তারা এর কোন সংবাদই রাখে না। পাহাড়ের কোন সুন্দর কন্দরে, ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর কূলে কোন নিভৃত কুঞ্জে, বনান্তের কোন শ্যামল ক্ষেত্রে উভয়ে উভয়েতে নিমগ্ন থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায় আর মনে করে মাত্র এক নিমেষ অতীত হ'ল। এমন কি সৌন্দর্য্যের ললাম, ঐ কালো বনের যত কোকিলের গান, যত পাখীর কলরব, যত ভেসে-আসা নৈসর্গিক গুঞ্জর, যত পুষ্পের সুবাস তাদের প্রেম-সম্মোহিত চিত্তে কোন বিক্ষেপ আনতে পারে না, হয়ত তাদের অন্তরের অজ্ঞাত ক্ষেত্রে শিহরণ সৃষ্টি ক'রে তাদের প্রেমকে আরও মধুর ক'রে দেয়!

কিন্তু যথাসময়ে এ সংবাদ পৌছল কার্লের পিতার কাছে। তিনি ছুটে এলেন ফ্রাইবুর্গে জানতে এ-খবর সত্য কি না। কার্ল তাঁর একমাত্র সন্তান। তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তুচ্ছ রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে তাদের শত শত বৎসরের আভিজাত্য যেন সে নষ্ট না করে। তা করলে তার উর্দ্ধতন সকল পুরুষের অভিশাপ তার মস্তকে পড়বে—সে কখনও সুখী হবে না এই রকম অনেক কিছুই তাকে বোঝান হ'ল, কিন্তু সবই হ'ল বৃথা। এমন কি তিনি লুইসেকে দশ সহস্র মুদ্রার লোভ দেখিয়ে এ থেকে নিবৃত্ত হ'তে অনুরোধ করলেন—তার ফলে হ'লেন অপমানিত, কিন্তু কার্ল রইল অটল! শেষে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করার ভয় দেখান হ'ল—কার্ল রইল তবু অটল! কার্লের একমাত্র যুক্তি আভিজাত্য ও শ্রমজীবীর মধ্যে যদি মিলন না হয়, ত'হ'লে জাতি যাবে উৎসন্ন—তাকে এ-বিবাহ করতেই হবে!

কার্লের পিতা শেষে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন—তাঁর সমস্ত প্রতিপত্তির প্রভাবে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাদের বিবাহের অনুমতি দান বন্ধ করলেন। গভর্ণমেণ্টের অজুহাত, যেহেতু কার্ল পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত, সে নিজে উপার্জ্জনক্ষম না হ'লে, বিবাহ করার অনুমতি পেতে পারে না। অগত্যা তাদের বিবাহ গেল অনিশ্চিত কালের জন্যে পেছিয়ে। এমন কি ষ্টেট থেকে কার্লের পড়ার খরচও গেল বন্ধ হয়ে।

পুস্তকের কীট ব'লে যে কার্লের খ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল সে হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কশূন্য—অতএব পুস্তকহীন। সে এখন প্রবল উদ্দামে চাকরির সন্ধান করে—উদ্দেশ্য লুইসেকে বিবাহ করার উপযোগিতা অর্জ্জন করা! শেষে জার্ম্মানীর উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তের শহর ক্যোনিগবের্গে তার একটা কাজ জুটল। ঠিক হ'ল উভয়ে সেখানে যাবে—লুইসে যাবে পালিয়ে। পালানরই প্রয়োজন, কারণ যেদিন সংবাদ এল কার্ল পিতার ত্যাজ্যপুত্র হয়েছে, সেই দিন থেকে লুইসের মা তাকে বিশেষ ক'রে বারণ করেছেন কার্লের সঙ্গে মিশতে। এমন কি লুইসের ওপর কড়া পাহারা বসেছে, এমন কি লুইসের অন্যস্থানে যাতে তাড়াতাড়ি বিবাহ হয়ে যায় সে-চেষ্টা তিনি উঠে-পড়ে করছেন। এ-সব বিষয়ে তিনি অত্যন্ত 'প্র্যাকৃটিকাল'! আর অত 'প্র্যাকৃটিকাল' বলেই কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় শিশু-কন্যাকে নিয়ে বিধবা হবার পর তিনি আপন চেষ্টায় অত ভাল ফুলের দোকান গড়ে তুলেছেন এবং মেয়েকে ভদ্রোচিত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন!

কিন্তু তরুণ-তরুণীর প্রথম প্রেমের বন্যা এ বাধা বলীলা-ক্রমে অতিক্রম করে। প্রতিদিন অন্ততঃ কয়েক মিনিটের জন্য তাদের লুকিয়ে দেখা হয়ই—তবে তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে একত্রে কাটানো আর ঘ'টে ওঠে না। কাজ পাওয়ার সংবাদ এলে তারা ঠিক করল—আগামী রবিবার সকালে যখন লুইসের নিষ্ঠাবতী মাতা মেরী-গীর্জ্জায় উপাসনা করতে যাবেন—লুইসে আসবে পালিয়ে! এবং উভয়ে তৎক্ষণাৎ ট্রেনে উঠে জার্ম্মানীর অপর প্রান্তে রওনা হবে। তারপর দুনিয়ার যা হয় হোক—তাদের বয়ে গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিন প্রত্যূষে কার্ল জিনিষপত্র গোছাচ্ছে। গৃহ-কর্ত্রীকে পাঠিয়ে দিল বাজারে তার জন্যে রাস্তার রসদ কিনতে। এমন সময়ে বাহিরের দরজায় আওয়াজ বেজে উঠল—'ক্রিং-ড়িং'! কার্ল গিয়ে দরজা খুলতেই দেখে সামনে হান্‌স। কোন অভিবাদন না ক'রে, কোন কথা না ব'লে, সোজা তার ঘরের মধ্যে ঢুকে টুপিটা খুলে সোফার ওপর ছুঁড়ে ফেলে চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে প্রস্থানের তোড়জোড় দেখে বিস্মিত হয়ে হান্‌স জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাওয়া হবে?"

কার্ল—সে সংবাদে তোমার প্রয়োজন?

হান্‌স—কোন প্রয়োজন নেই! তোমার মত কুলাঙ্গার

রসাতলে গেলে সমাজের মঙ্গল বই অমঙ্গল হবে না! শুধু জান্‌তে চাই এ কি লুইসেকে সঙ্গে নিয়ে পালাবার ষড়যন্ত্র?

কার্ল—সে সংবাদেই বা তোমার প্রয়োজন?

হান্‌স—তোমার মত লোকের কাছে আমার প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের কৈফিয়ৎ দিতে চাই নে—আমাকে ঠিক ক'রে বল লুইসেও সঙ্গে যাবে কি-না?

কার্ল—কোন্ অধিকারে এ সংবাদ চাও?

হান্‌স—শ্রেষ্ঠতম অধিকারে। কাল বৈকালে লুইসেদের সম্মতি পেয়ে আমি হয়েছি লুইসের ভাবী স্বামী!!

কার্ল [চমকিত] ললে?

হান্‌স—এতে অত চমকাবার কি আছে? সকলেই কি আশা করে নি লুইসের সঙ্গে আমার সম্পর্কের এই হবে স্বাভাবিক পরিণতি? তুমিও কি তা জানতে না? জেনে-শুনে হীন বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তুমি কি একটা বিশ্রী গণ্ডগোল বাধাও নি?—কিন্তু শোন! এখানে এসেছি শুধু তোমাকে সাবধান ক'রে দিতে, আবার যেন আমাদের জীবনে উৎপাত সৃষ্টি ক'রো না।

কার্ল যেন বজ্রাহত হ'ল! কিছুক্ষণ তার আর বাক্য-স্ফুরণ হ'ল না। হান্‌সের মুখে দেখা দিল ক্ষুদ্রচেতা বিজয়ীর সেই অবজ্ঞাপূর্ণ হাসি, যা পরাজিতকে পরাজয়ের চেয়েও অধিক ব্যথা দেয়। সে-হাসি দেখা মাত্র কার্লের চমক ভাঙল, সে জিজ্ঞাসা করলে, "লুইসে নিজে রাজী?"

হান্‌স—হাঃ, হাঃ, হাঃ! নিশ্চয়! আর—

কার্ল [চীৎকার পূর্ব্বক] অসম্ভব!

হান্‌স—অসম্ভব?—অসম্ভব কেন শুনি?

কার্ল—তুমি বললে কাল বৈকালে তাদের সম্মতি পেয়েছ—অথচ কাল রাত্রে লুইসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, সে ত এর বিন্দুবিসর্গ জানেই না, বরং—

হান্‌স [বাধা দিয়ে]—হোঃ, এই কথা? লুইসের মা আমাকে বলেছেন, লুইসের মত আছে, তাই যথেষ্ট! লুইসে যে নিজে সম্মত হবে তা নিঃসন্দেহ—

কার্ল—অসম্ভব—অসম্ভব!

হান্‌স—হেঁ হেঁ—অসম্ভব! তোমার মত গর্দ্দভই ভাবে ছোটলোকের মেয়েদের পক্ষে কোন কাজ অসম্ভব—

কার্ল—সাবধান হয়ে কথা বল!

হান্‌স—আমি তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্চি, চলে যাচ্চ—ভালই হচ্চে—আপদ দূর হ'চ্চ—কিন্তু আমার আর লুইসের জীবনে আর কখনও উঁকি দিও না।

কার্ল—সে বারণ আমি করছি! লুইসে কখনও তোমাকে চায় না—

হান্‌স—তোমার মত কীটের সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। কিন্তু আবার সতর্ক ক'রে দিচ্ছি, আমার অবর্ত্তমানে আমার প্রণয়মুগ্ধার কাছে বিবাহের প্রস্তাব ক'রে যথেষ্ট অনর্থ বাধিয়েছ ভাল চাও তো আর এর মধ্যে এস না!

কার্ল—কোনো দিন সে তোমার প্রণয়মুগ্ধা হয় নি। কাল রাত্রেও আমার প্রতি তার গভীর প্রণয়ের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখিনি! সে আমাকে ভালবাসে—প্রাণ দিয়ে ভালবাসে—

হান্‌স—বটে, বটে! হাসির কথা বটে! সে আমার প্রণয়মুগ্ধা হয়নি, হ'য়েছে তোমার? আমি একবার যে-নারীকে পছন্দ করেছি, সে ভালবাসবে অন্য পুরুষকে—তাও আবার তোমার মত লম্বা লম্বা ঠ্যাঙসর্ব্বস্ব, কদাকার, কপর্দ্দকশূন্য অপদার্থকে?—হাঃ,হাঃ,হাঃ!—শোন, ইডিয়ট শোন! তোমাকে সে শুধু বাঁদর না চয়েছে! ভালবাসার ভাণ ক'রে তোমার মত বুদ্ধিহীন ব্যারণ-পুত্রের কাছ থেকে বিবাহের প্রস্তাব আদায় ক'রে সে শুধু আমার কাছে নিজের দর বাড়িয়েছে। তুমি না বাধা দিলে, সেই বল্-ডানসের রাত্রেই সে আমার অঙ্কশায়িনী হ'ত—

কার্ল—থামো!—তাকে বিবাহ করতে চাও এই শ্রদ্ধা নিয়ে?—

হান্‌স শ্রদ্ধা? হাঃ, হাঃ, হাঃ!—কুলির মেয়েকে আবার শ্রদ্ধা! তোমার বোকামির জন্যে তার মার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করতে হয়েছে—অকারণ কতকগুলো অর্থব্যয় করতে হচ্চে—এই যেন যথেষ্ট নয়! তাকে আবার শ্রদ্ধাও করতে হবে?

কার্ল—তাহ'লে তোমার অভিপ্রায় তাকে বিবাহ করা নয়—তার সর্ব্বনাশ করা—

হান্‌স তাই যদি হয়, তাতেই বা কার ক্ষতি? কৌশল ক'রে একটা ছোটলোকের মেয়ের ন্যাকামি যদি ভাঙতে পারি, তাতে লাভ বই লোকসানটা কার? শোন, বোকা,

শোন! আমাদের জন্মগত অধিকার আছে এই-সব ছোট-লোকের মেয়েদের যে উপায়ে হোক উপভোগ করা—

কার্ল হান্‌সের গণ্ডদেশে সজোরে চপেটাঘাত করলে। হান্‌স প্রথমটা স্তম্ভিত হ'ল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তার বজ্র-মুষ্টি কার্লের মুখে পড়লো! কার্ল দূরে ছিটকে পড়ল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠে, ছুটে এসে হান্‌সকে উপর্যুপরি ঘুষি মারতে আরম্ভ করলে। হান্‌স তাকে জাপটে ধরলে, তারপরই আরম্ভ হ'ল ধ্বস্তাধ্বস্তি। ঘরের যত আসবাব, যত কাঁচের জিনিষ, ড্রেসিংটেবিলের আয়না, চেয়ারের পায়া, আলমারির কবাট, জানলার সার্‌সি, খাটের ব্যাটন, সোফার কাঁধা, বইয়ের আলমারি ইত্যাদি সব ভাঙতে আরম্ভ হ'ল! দু-জনে উন্মত্তের মত কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করবার পর কার্লকে হান্‌স মেঝের উপর চিৎ ক'রে ফেলে দুই হাত দিয়ে তার গলা চেপে ধরলে এবং শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে টিপতে আরম্ভ করলে! এক চাপ—দুই চাপ—তিন চাপ—কার্লের প্রাণ-বায়ু নির্গত হ'ল!!

জাগ্রত রাখিও মোরে

শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়

জানিতে চাহি না আমি—কত যুগ ধরি
কত ক্লেশে, কি অপার তিমির সন্তরি
এসেছি এ ধরণীর স্নেহ-স্নিগ্ধ ক্রোড়ে।
জানিতে চাহি না আজ—কোথা পুন মোরে
যেতে হবে আয়ুশেষে।

আমি শুধু যাচি
হে ঈশ্বর, জাগ্রত রাখিও মোরে। বাঁচি
যেন বাঁচিবার মত চির-অনুক্ষণ।
বিমুখ না হয় কভু উদাসীন মন
আকণ্ঠ করিতে পান উদ্বেলিত কূলে
কূলে জীবন-জাহ্নবী-বারি। কোনো ভুলে
কভু যেন, হে ঈশ্বর, ভুলিয়া না যাই
রয়েছি বাঁচিয়া।—

রয়েছি বাঁচিয়া তাই—
বক্ষে আজি জাগে মোর উদধি-উচ্ছ্বাস;
রয়েছি বাঁচিয়া তাই ধরণী, আকাশ,
আবরেছি মোর প্রাণ-বর্ণ-গরিমায়।
তরু-তৃণে, শস্য-শীর্ষে ধূলি-মৃত্তিকায়,
ব্রততী-বিতানে, পুষ্পে—সর্ব্বঠাঁই 'পরে
বৃষ্টি-সম লক্ষধারে নিয়ত যে ঝরে
মোর স্নেহ-ভালবাসা। নিখিল গগনে
আমারই মমতা বুঝি পবনে পবনে
সুমেদুর মেঘ-রূপে হেরি সঞ্চারিতে
দিকে দিকে নব নব দেশেরে বেষ্টিতে!

বাঁচিয়া রয়েছি তাই—জল-ধারা প্রায়
অনায়াসে অধোলোকে চিত্ত মোর ধায়
স্তরে স্তরে ভেদিয়া পৃথিবী। স্বর্গবাসী
দেবতার মত চিত্ত সর্ব্ববাধা নাশি
ভ্রমিয়া বেড়ায় সুখে জ্যোতিষ্ক-সভায়।
তাই যাচি, হে ঈশ্বর, দিবস নিশায়
এমনি জাগ্রত যেন রহি অনুক্ষণ
এমনি বাঁচিয়া যেন থাকি আমরণ
পূর্ণ প্রাণ লয়ে। দিও দুঃখ, দিও ব্যথা
অযুত আঘাত হেনো—কহিব না কথা,
করিব না অভিযোগ—শুধু, দেখো হায়
হাসি-অশ্রু-উৎস মোর কভু না শুকায়!
শুধু দেখো, হে ঈশ্বর, এমনি জাগ্রত
যেন রহি চিরকাল। এমনি নিয়ত
পরম উল্লাসে চলে জীবন-ভুঞ্জন।
তারপর, অকস্মাৎ যে-দিন মরণ
চাপিয়া ধরিয়া কর অতিদৃঢ় করে
আকর্ষিবে রন্ধ্র হীন তিমির-জঠরে—
সে-দিনও তোমার পানে আর্দ্র আঁখি মেলি
শুধাব না, হে বিধাতা, দীর্ঘশ্বাস ফেলি
এ আকাশ, এ পৃথিবী—চন্দ্র, গ্রহ, তারা,
সাগর, ভূধর, বন—কেহ গো ইহারা
ধাইয়া চলিবে কি-না মোরে অনুসরি
সে-আঁধার পথে। শুধু এ-মিনতি করি
এমনি জাগ্রত মোরে রেখো অনুক্ষণ
এমনি বাঁচিয়া যেন রহি আমরণ।

অ-সহযোগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি পুরাতন চিঠি

[রবীন্দ্রনাথ আমাকে গত ৬ই বৈশাখ এই চিঠিখানি লেখেন।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

১৯১৬ থেকে ১৯১৭ খৃষ্টশক পর্য্যন্ত আমেরিকা ও য়ুরোপে বক্তৃতায় নিযুক্ত ছিলুম। সেই সময়ে সংবাদপত্রযোগে খবর পাওয়া যেত,—মহাত্মাজী অসহযোগ প্রচার করচেন, একথা স্বীকার করব, আমার সেটা ভালো লাগে নি। তার কারণ, যেমন খিলাফতের লক্ষ্য ভারতবর্ষের বাইরে, অসহযোগের লক্ষ্য প্রায় তাই। ইংরেজরাজের সঙ্গে কোমর বেঁধে সহযোগই চালাই বা অসহযোগই জাগাই, তাতে আমাদের সাধনা কেন্দ্রভ্রষ্ট হয়। ওটা কলহ মাত্র, সেই কলহের পরিণামে সার্থকতা নেই। মহাত্মাজী দেশের লোকের মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, অত বড়ো প্রভাব অপর পক্ষকে তারস্বরে অস্বীকার করবার নঙর্থক উদ্দেশে খরচ হয়ে যাচ্ছে, এই কথা কল্পনা করে আমার মন পীড়িত হয়েছিল। সেদিন আমার মনে এই একান্ত কামনা জাগছিল যে মহাত্মাজী নিজের চারদিকে দেশের বিচিত্র শক্তিকে আহ্বান করবেন দেশের বিচিত্র সেবার কাজে। কারণ, দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য পূর্ত্তকার্য্য বাণিজ্য—এই কর্ত্তব্যগুলিকে প্রবল বলে অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে চালনা করাই যথার্থ দেশকে লাভ করা, জয় করা। সকলে মিলে কেবল চরকায় সুতো কাটায় দেশচিত্তের সম্পূর্ণ উদ্বোধন হ'তে পারেই না। জানি এই সঙ্কল্পে বাধার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল—তখন সেই বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করা সার্থক হ'ত। এতদিন ধরে সংগ্রাম ত যথেষ্টই হ'ল, দুঃখের তো অন্ত নেই। তার পরিবর্ত্তে আজ রক্তহীন সাদা কাগজ পাওয়া গেল। সেই কাগজে শূন্যতা যথেষ্ট কিন্তু রচনা কতটুকু?

সেই সময়ে আমি জগদানন্দকে যে চিঠি লিখেছিলুম আমাদের কোনো প্রাক্তন ছাত্র সেটি কপি করে রেখেছিল। আজ দৈবাৎ সেই কপি আমার হাতে পড়েছে। লেখাটি আপনার কাছে পাঠালুম। প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে যদি মনে করেন তবে ছাপাবেন। সংক্ষেপে আমার বলবার ছিল এই যে পরের সঙ্গে অসহযোগ নিয়ে আন্দোলন না করে নিজেদের মধ্যে পরিপূর্ণ সহযোগের জন্যে দেশের বহুধা শক্তিকে একত্র করতে পারলে তাতে স্বরাজের যে রূপ অভিব্যক্ত হ'ত, সেই রূপটি হ'ত সত্য। ইতি ৬ বৈশাখ ১৩৪১

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অধ্যাপক জগদানন্দ রায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি

De Duinev
Huizen N. H.

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

হল্যাণ্ডে একটি সুন্দর জায়গায় সুন্দর বাড়ীতে এসেচি। অদূরে সমুদ্র; চারিদিকে বাগান ফলে ফুলে সুরমা, পাখীর গানে মুখরিত। শরতের সূর্য্যালোক এই মনোহর জায়গাটির উপর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে। যিনি গৃহকর্ত্রী তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের যত্ন করচেন সুতরাং দেবে মানবে মিলে যখন আমাদের আতিথ্যে নিযুক্ত হয়েচেন তখন ক্রটি কোথাও থাকতে পারে না। প্যারিসে আমরা যাঁর আতিথ্যে ছিলুম তিনিও আমাকে একান্ত যত্নে সমাদর করেচেন। তিনি খুব ধনী অথচ আহারে বিহারে সন্ন্যাসীর মত। মানুষের কল্যাণের জন্যে তাঁর মনে যে সব সঙ্কল্প আছে তাতেই অহরহ তাঁর সমস্ত শক্তি ব্যয় করচেন। এখানকার যাঁরা বড়লোক মানুষের ইতিহাসকে সমস্ত ভাবী-কালের মধ্যে প্রসারিত করে তাঁরা দেখেন। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, দেশকালের ক্ষেত্র আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ছোট হয়ে গেছে, এই জন্যে আমাদের শক্তিকে আমরা বড়ো করে ফলাতে পারিনে। শক্তি যেখানে রস পায় না, খাদ্য পায় না, সেখানে মরুভূমির গাছপালার মত কেবল প্রচুর কণ্টক বিকাশ করে।

দেশে আজকাল কী সব গণ্ডগোল চলছে দূর থেকে তার অল্প আভাস পাই। আমাদের গুমটের দেশে এ সব গোলমাল ভালো—মনকে তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু গোলমালেরই আবার নিজের একটা গণ্ডি আছে। অন্ধকার আমাদের পথ ভোলাবার ওস্তাদ বটে কিন্তু আলেয়ার আলোও পথ ভোলায়। দেশব্যাপী গোলমালের মধ্যে যদি সত্যের অভাব ঘটে তা হোলে সে আমাদের ঘূর্ণির মধ্যে ঘুরিয়ে বেড়ায়, কোথাও এগোতে দেয় না। ঘোরো গণ্ডি আমাদের ধরে রাখে, উত্তেজনার গণ্ডি আমাদের ঘুরপাক খাওয়ায়। দুইয়েরই পরিধি সঙ্কীর্ণ। একটা স্থির গণ্ডি, আর একটা চলতি গণ্ডি; একটাতে ঘুম পাড়ায়, আর একটাতে মাথা ঘোরায়। সত্য হচ্চে পরমা গতি, অর্থাৎ এমন গতি যার প্রত্যেক পদক্ষেপেই সার্থকতা। আর মোহ হচ্চে সেই গতি যার চলায় সার্থকতা আনে না, কেবল নেশা আনে। একটা হচ্চে ধনাত্মক গতি, আর একটা হচ্চে ঋণাত্মক গতি। দেশ জুড়ে যখন তোলাপাড়া ঘটছে তখন ভালো করেই ভাবতে হবে, এই গতির প্রকৃতি কি। যে জলে স্রোত প্রবল কিন্তু তট অবর্ত্তমান সে-ই হচ্চে বন্যা। বন্যায় ভাঙে, ভাসিয়ে দেয়, ফসল নষ্ট করে। আমাদের দেশে যে আবেগ এসেছে সে যদি একমাত্র ভাঙনেরই বার্ত্তা নিয়ে আসে তা হোলে অনাবৃষ্টিতে শুকনো ডাঙার ক্ষেতে অতিবৃষ্টির অগাধ ক্ষতির মধ্যে ডুবে মরতে হবে। আমার অনুরোধ এই যে, মন যখন কোনোমতে জেগেছে, তখন সেই শুভ অবকাশে মনটাকে কষে কাজে লাগিয়ে দাও, অকাজে লাগিয়ে শক্তির অপব্যয় কোরো না। Non-Co-operation (নন্-কো-অপারেশ্যন) অকাজ—তার আবির্ভাব অন্তিমে। শাস্ত্রে বলে কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্ম থেকে মুক্তি, নৈষ্কর্ম্মের দ্বারা নয়; পাস করার দ্বারাই স্কুল থেকে মুক্তি, আমার মত ইস্কুল ত্যাগ করার দ্বারা নয়। আজ সময় এসেছে নিজেদের সব কাজ নিজেরা মিলে করতে হবে। সে কাজ কতখানি বাহ্যফল দেবে তা ভাববার দরকার নেই, কিন্তু কাজের উপলক্ষ্যে আমাদের যে মিল সেই মিলই সত্য মিল, সেই সত্য মিলই হচ্চে চরম লাভ! অ-কাজ করবার উপলক্ষ্যে যে মিল সে কখনই সত্য এবং স্থায়ী হোতে পারে না। আহারে শরীরে যে শক্তি আনে সেইটাই শ্রেয়, মদের নেশায় যে শক্তি তার বেগ আপাতত বেশি হোলেও পরিণামে প্রতিক্রিয়ার দিনে তার হিসাব নিকাশ হোতে থাকে। গীতা বলেছেন—স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ—সত্যের মিলও অল্প যেটুকু দেয় সেও মস্ত বড়, আর ক্রোধের মিল, খিলাফতের মিল, এমন বর দিতে পারে যাকে নিয়ে কোথায় ফেলব ভেবে অস্থির হোতে হবে। মিথ্যা জোড় যখন ভাঙে তখন ভালোয় ভালোয় সরে যায় না, নিজের মধ্যে দমাদ্দম মাথা ঠোকাঠুকি করতে থাকে। এই জন্যে আবার একবার দেশকে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে সমিধ যদি সংগ্রহ হয়ে থাকে তবে সে যজ্ঞ করবার জন্যই, দাবানল জ্বালাবার জন্যে নয়। একদিন আমি স্বদেশী সমাজে যা বলেছিলাম আবার সেই কথাই বলতে চাই। আমরা যে রাগারাগি করছি তার গতি বাইরের দিকে অর্থাৎ অন্য পক্ষের দিকে অর্থাৎ পরে তার কর্ত্তব্য করেছে, কি, না-করেছে, সেইটেই তার মুখ্য লক্ষ্য। ভিক্ষা করবার বেলাতেও সেই লক্ষ্যই প্রবল। আমি বলি আপাতত বাইরের পক্ষকে ভোলো। পরের সঙ্গে অসহকারিতার দিকেই সমস্ত ঝোঁক দিয়ো না। নিজের লোকের সঙ্গে সহকারিতার দিকেই সমস্ত ঝোঁক দাও। আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত্তকার্য্য, বিচার প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যভার সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে নেব এই পণ করো। সেজন্যে সমস্ত দেশ জুড়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দরকার। গান্ধিজী সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে আমাদের প্রত্যেককে কাজে আহ্বান করুন, অকাজে না। আমাদের কাছ থেকে টাকার এবং কাজের খাজনা তলব করুন। আমাদের অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, পথকষ্ট, রোগকষ্ট, সমস্ত নিজেরা দূর করব বলে আমাদের সত্যাগ্রহ করান। তার বাহ্যফল আপাতত কী হবে তার হিসাব করবার কোনো দরকার নেই, কিন্তু এই সত্য গ্রহণ ও পালনের ফল গভীর ও স্থায়ী। স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। আমাদের সংযোজনের দরকার আছে, কিন্তু সেই যোগ শুভবুদ্ধির যোগ, যে বুদ্ধি আমাদের পুণ্যকর্ম্মে নিযুক্ত করে। সেই কল্যাণ কর্ম্ম আমাদের শুভবন্ধনে বাঁধে বলেই অশুভ বন্ধন থেকে স্বতই মুক্তি দেয়। আমাদের দেশের অতি লক্ষ্মীছাড়া পলিটিক্‌স্ এই সহজ কথা আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছে।

বাংলার জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলার পুনর্গঠন সম্বন্ধে গভর্ণর স্যর জন এণ্ডার্সন যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, পুনর্গঠনের যে সকল উপায় সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায়—জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সে সকলের অন্যতম।

তাঁহার এই বক্তৃতার পর জানা গিয়াছে, বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যেই পরীক্ষা হিসাবে বাংলায় পাঁচটি জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেই সব ব্যাঙ্কের পরিচালন-ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সরকার চল্লিশ হাজার টাকা দিবেন। সম্প্রতি সরকারের এক বিবৃতিতে জানা গিয়াছে, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও পাবনা—এই তিনটি জিলায় তিনটি ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আর দুইটি জিলায় অবশিষ্ট দুইটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই জাতীয় ব্যাঙ্ক নানা শ্রেণীর এবং দেশের অবস্থার উপযোগী করিতে হয়। জার্ম্মানীতেই এইরূপ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সুফল ফলিয়াছিল এবং সেই জন্য বিলাতের সরকার (কৃষি ও মৎস্য বিভাগ) মিষ্টার কাহিলকে জার্ম্মানীর ব্যবস্থা অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার অধ্যয়নফল প্রদান করিবার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি যে বিবরণ প্রদান করেন, তাহাতে দেখা যায়, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সে-দেশে জমির উন্নতি-সাধন জন্য এক কেন্দ্রী "ফণ্ড" প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই তহবিলে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা সঞ্চিত হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই টাকার অধিকাংশ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সরকারকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় এবং সে-সব সরকারেরই জমির উন্নতি-সাধন জন্য প্রতিষ্ঠিত "ফণ্ড" আছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক প্রদেশকে সেইরূপ "ফণ্ড" প্রতিষ্ঠায় অধিকার প্রদান করিবার জন্য আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে স্যাক্সনীতে, ১৮৮০ ও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হেসে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বাভেরিয়ায় ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ওলডেন্‌বার্গে এইরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

মিষ্টার কাহিল বলেন, সেচের ব্যবস্থা করা, জলনিকাশের বন্দোবস্ত করা এবং বাঁধ ও নদীর কূলরক্ষা করাই এইরূপ ঋণ গ্রহণের প্রধান কারণ। অধিকাংশ স্থলেই জমির অধিকারীরা জমির যেরূপ উন্নতিসাধন জন্য ঋণ গ্রহণ করেন, সেরূপ উন্নতিতে আয় বর্দ্ধিত হয়। জমির উন্নতিসাধন জন্য যে ঋণ লওয়া হয় তাহাকে ব্যক্তিগত ও বন্ধকী ঋণের মধ্যবর্ত্তী বলা যাইতে পারে। খাতকের নির্ভরযোগ্যতা ও উন্নতি-জনিত জমির মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ বিবেচনা করিয়া ঋণ প্রদান করা হয়। কৃষিজ দ্রব্যের বিষয় বিবেচনা করিলে খাতকের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়:-

১। ঋণের পরিমাণ উপযুক্ত হইবে;

২। সুদের হার অধিক হইবে না;

৩। পরিশোধ জন্য সঞ্চয় ভাণ্ডারে কিস্তিমত টাকা দিতে হইবে বটে, কিন্তু ঋণের টাকা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে পরিশোধ করিতে হইবে না। সাধারণতঃ মহাজনরা বা ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলি এইরূপ সর্ত্তে ঋণ দান করিতে পারেন না; কারণ, উন্নতির ফলে জমির মূল্য কিরূপ বর্দ্ধিত হইবে তাহা স্থির করিবার ও জমি-পরিদর্শনের ব্যবস্থা তাঁহাদিগের থাকে না। মহাজন বা ঋণদান প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকালব্যাপী কিস্তিতে টাকা লইতে পারেন না। সেই জন্যই এরূপ ঋণদানের জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

জার্ম্মানীর প্রথার আলোচনা করিলে প্রথমেই দেখা যায়—বাংলার অবস্থার সহিত সে দেশের অবস্থার বিশেষ প্রভেদ আছে। বাংলায় জমির উন্নতিসাধনের প্রথম প্রয়োজন—পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ করা। সেই জন্য বাংলায় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যত্রয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ঋণপরিশোধ-ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যত্রয়—

১। জমি বন্ধক রাখিয়া গৃহীত ও পূর্ব্বকৃত অন্যরূপ ঋণ পরিশোধ;

২। জমির ও কৃষিপ্রথার উন্নতিসাধন;

৩। যে স্থানে আর কিছু জমি কিনিলে কৃষকের পক্ষে

ক্ষেত্রের ও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে চাষের সুবিধা হয়, সে স্থানে নূতন জমি ক্রয়।

বাংলার কৃষকের ঋণভার বহুদিনের এবং দুর্ব্বহ। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত অর্থনীতিক এডাম স্মিথের 'ওয়েল্‌থ অব নেশন্স' গ্রন্থ প্রচারিত হয়। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, বাংলায় ফসল পূর্ব্বেই বন্ধক রাখিয়া কৃষক শতকরা ৪০, ৫০, ও ৬০ টাকা সুদে টাকা ঋণ লয়।

ইহার অল্পদিন পূর্ব্বে, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কমিটী অব সার্কিট বাংলায় ঋণ ও সুদ পরিশোধ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম করেন—

"পুরাতন ঋণ পরিশোধ অর্থাৎ মহাজনের প্রাপ্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে এই নিয়ম হইবে যে, একবার মোট টাকা স্থির করিবার পর তাহার আর সুদ চলিবে না এবং খাতকের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঋণ কিস্তিবন্দী হিসাবে পরিশোধ করা হইবে। তদ্ভিন্ন এতদিন সুদের যে হার চলিয়া আসিয়াছে, তাহা অত্যধিক বলিয়া পূর্ব্বকৃত ঋণের ও ভবিষ্যতে গৃহীত ঋণের সুদের হার নিম্নলিখিতরূপ হইবে—

(ক) আসল একশত টাকার অনধিক হইলে, শতকরা মাসিক ৩ টাকা ২ আনা বা টাকায় ২ পয়সা।

(খ) আসল এক শত টাকার অধিক হইলে, শতকরা মাসিক ২ টাকা। [আসল ও সুদের টাকা দলিলের সর্ত্ত অনুসারে শোধ করা হইবে এবং মধ্যবর্ত্তী সময়ে কোন ব্যবস্থায় চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ চলিবে না—তাহা আইন-বিরুদ্ধ ও অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে। নালিশে যদি দেখা যায়, নির্দ্দিষ্ট হার অপেক্ষা উচ্চ হারে সুদ দেওয়া হইয়াছে, তবে সুদের সব টাকা বাজেয়াপ্ত ও খাতকের প্রাপ্ত বলিয়া সেরূপ স্থলে কেবল আসল টাকাই আদায় হইবে। যদি কেহ আইনের ব্যতিক্রম চেষ্টা করিয়াছে, প্রতিপন্ন হয়, তবে আসলের অর্দ্ধেক টাকা সরকার ও অর্দ্ধেক খাতকের প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।"

ব্যবস্থার কঠোরতাতেই বুঝা যায়, মহাজনরা অত্যন্ত অধিক সুদ লইত এবং খাতককে মহাজনের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা সরকার কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

সুদের হার যে হ্রাস হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না। কোন কোন স্থানে "আধা বাড়ী" হিসাবে যে ধান্য দাদন করা হয়, তাহার নামেই শতকরা ৫০ টাকা সুদ প্রকাশ। আবার উহাও চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িয়া যায়। সরকার সুদের হার কমাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু আইনের সঙ্গে সঙ্গে আইনের বিধান অতিক্রমের নানা উপায়ও অবলম্বিত হইয়াছে। যে স্থানে খাতক বিপন্ন ও বর্ণজ্ঞানশূন্য, সে স্থানে চতুর মহাজনের পক্ষে নানারূপে প্রাপ্যের অতিরিক্ত টাকার জন্য তাহাকে দায়ী করা দুঃসাধ্য হয় না।

কয় বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যাঙ্কিং-অনুসন্ধান-সমিতি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার নির্দ্ধারণ—বাংলার কৃষিঋণের পরিমাণ—একশত কোটি টাকা। যখন এই হিসাব হয়, তাহার পর যে কয় বৎসর গত হইয়াছে, সেই কয় বৎসরে ব্যবসামন্দাহেতু কৃষিজ পণ্যের মূল্য হ্রাস প্রভৃতি কারণে খাতক যে অনেক স্থলে সুদও দিতে পারে নাই তাহা সকলেই জানেন। সেই জন্য এই কয় বৎসরে এই ঋণের পরিমাণ আরও বাড়িয়াছে।

ইহার জন্য জমিই অনেক স্থানে দায়ী; সুতরাং জমি বন্ধক হইতে খালাস করিতে না পারিলে, তাহার উন্নতিসাধনে কৃষকের কোন উপকার হইবে কি-না সন্দেহ এবং তাহাতে তাহার উৎসাহও থাকিতে পারে না।

এই ঋণের ভার হইতে বুঝা যায়, কিছুকাল পূর্ব্বে কৃষককে সাহায্য করিবার জন্য যে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে আশানুরূপ ফল ফলে নাই। না ফলিবার যে অনেক কারণ ছিল ও আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আজ সে সকল আমাদিগের আলোচ্য নহে। তবে সেই সব কারণের মধ্যে আমরা প্রধান দুইটির উল্লেখ করিব—প্রচারকার্য্যে অমনোযোগ, সমিতিগুলিকে স্বাবলম্বী করিতে আবশ্যক চেষ্টার অভাব। সমবায়-প্রথার মূল নীতি এদেশের কৃষকের নিকট নূতন নহে। কিন্তু তাহা যে বিদেশী বেশে দেখা দিয়াছিল, তাহাতে কৃষকের পক্ষে তাহাকে আপনার মনে করা অসম্ভব হইয়াছিল। এই নীতি যে তাহাদিগের পরিচিত এবং তাহাতে যে সুফল ফলে, তাহা কৃষককে বুঝান হয় নাই। সরকারী কর্ম্মচারীরা ডাক-বাংলায় বা থানায় গিয়া দুই দিনে কাজ করিলে তাহা কখনও ফলপ্রদ হয় না—হইতে পারে না। বর্ত্তমানে পল্লীগ্রামে উপযুক্ত লোকের অভাব যে সমিতি গঠনের ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা উপযুক্তরূপ অনুভব করেন নাই, তাহা সপ্রকাশ। তাহার প্রতীকারোপায় করা হয় নাই। তাহার পর কাজের ভার সমবায় সমিতির সভ্যদিগের প্রতিনিধিদিগকে না দিলে কি হইবে? এই সব সমিতি সরকারের বিভাগের মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সরকারের কর্ম্মচারীরা দরিদ্র কৃষকের সামান্য কথা ভুলিয়া পাট বিক্রয় সমিতির মত বিরাট প্রতিষ্ঠানগঠনের চেষ্টায় সমবায় সমিতিগুলির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ সমবায়

নীতি অবলম্বন ব্যতীত পথ নাই। সুতরাং লব্ধ অভিজ্ঞতার সংশোধন করিতে হইবে।

আমরা জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বিবৃত করিবার বলিয়াছি, জমি বন্ধক রাখিয়া বা অন্যরূপে গৃহীত ঋণ শোধ জন্য ব্যাঙ্ক হইতে টাকা দেওয়া হইবে। কিন্তু এখন বিবেচ্য—কিরূপ টাকা দেওয়া হইবে? কাহারাই বা টাকা লইতে পারিবে? ঋণগ্রহণ সম্বন্ধে অবশ্য নিয়ম হইয়াছে। সে-নিয়ম যে বিশেষ সতর্কতার পরিচায়ক তাহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি। বিবৃতিতে দেখা যায়—

(১) কোন সদস্য ব্যাঙ্কে যে টাকার অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ১০ গুণ পর্য্যন্ত টাকা পাইতে পারিবেন। তবে সাধারণতঃ টাকার পরিমাণ ২ হাজার ৫ শত টাকার অধিক হইবে না এবং সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রারের অনুমোদনে তিনি ৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত পাইতে পারিবেন।

(২) যত দিনের জন্য ঋণ গৃহীত হইবে, ততদিনে জমি হইতে উৎপন্ন শস্যের মূল্যের শতকরা ৭৫ ভাগ বা জমির মূল্যের অর্দ্ধাংশের অধিক টাকা কাহাকেও দেওয়া হইবে না।

(৩) যিনি কৃষিজ আয় হইতে নিজ প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া সুদ ও কিস্তিমত টাকা দিতে পারিবেন না, তিনি ঋণ পাইবেন না।

(৪) ঋণ কখন ২০ বৎসরের অধিক কালে পরিশোধ্য হইবে না।

(৫) খাতককে দুই জন সদস্য জামিনদার দিতে হইবে।

(৬) জমির উপর ব্যাঙ্কের প্রথম অধিকার থাকিবে।

কিন্তু পূর্ব্বকৃত ঋণ কি ভাবে পরিশোধ করা হইবে, তাহা জানা যাইতেছে না। স্যর জন এণ্ডার্সন বলিয়াছেন—ঋণ মিটাইবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। এ-বিষয়েও বিশেষ বিবেচ্য—ঋণের পরিমাণ কিরূপ? ঋণ যদি পরিশোধযোগ্য হয়, তবে ব্যবস্থা একরূপ হইবে, তাহা পরিশোধাতীত হইলে ব্যবস্থা অন্যরূপ না করিলে চলিবে না। বাংলার মোট কৃষি-ঋণ যদি এক শত কুড়ি কোটি টাকা হয়, তবে তাহা জমি হইতে পরিশোধ করা সম্ভব কি-না? অথচ ঋণ উপেক্ষা করাও সঙ্গত নহে; মহাজনের স্বার্থ অবজ্ঞা করা যায় না। যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে কেবল দুই শ্রেণীর কৃষক বা খাজনালাভকারী বা স্বল্প আয়ের লোকই ব্যাঙ্কের টাকায় উপকৃত হইতে পারিবে ঃ—

(১) যাহারা অঋণী;

(২) যাহাদিগের ঋণের পরিমাণ অল্প বলিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়া পরিশোধ করা যাইবে।

কিন্তু বাংলার অধিকাংশ কৃষক ঋণভারপীড়িত—যতক্ষণ তাহাদিগের ঋণ মিটাইয়া দিয়া তাহা পরিশোধ করা না হইবে, ততক্ষণ তাহারা অসহায় ও নিরুপায়। বিশেষ জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের মত বাংলায় অনেক জমি লইয়া চাষের ব্যবস্থা নাই—কৃষকরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে চাষ করিয়া কোনরূপে দিনপাত করে। যিনি পঞ্জাবের কৃষকের অবস্থা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন, সেই মিষ্টার ডার্লিং বলিয়াছেন,—তাহার মনও তাহার ক্ষেত্রের মত সঙ্কীর্ণ ("as narrow as the plots he cultivates.")

এই অবস্থায় ঋণ মিটাইবার ব্যবস্থা না করিয়াই ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠায় বাংলার অধিকাংশ কৃষকের—প্রায় সব কৃষকের উপকার হইবে না। তবে ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া শিক্ষিত যুবকরা যদি কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন তবে তাহাতেও মঙ্গল হইবে। যাঁহারা বলেন, বাংলায় একসঙ্গে অধিক জমি পাওয়া যায় না, তাঁহারা বাংলার সকল ভাগের বিষয় অবগত নহেন। কারণ দেখা গিয়াছে নদীয়া, যশোহর ও মুর্শিদাবাদ জিলাত্রয়ে অনেক জমি পতিত আছে এবং সেচের ব্যবস্থা করিতে পারিলে বীরভূম ও বাঁকুড়া জিলাদ্বয়েও উপযুক্ত পরিমাণ জমির অভাব হয় না।

এই জন্য ঋণ মিটাইবার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন বিষয়ে আমরা বাংলা সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। সে ব্যবস্থা না হইলে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

শত কোটির অধিক টাকার ঋণভারে যে পিষ্ট সে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? কেবল তাহাই নহে - মহাজনের নিকট ও জমিদারের নিকট তাহার ঋণের প্রকৃত পরিমাণ কি, তাহাও অনেক কৃষক জানে না। এত দিন যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে তাহার "সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত"। প্রজার জন্য শাসকদিগের সহানুভূতি যে ছিল না, তাহা বলা যায় না; কিন্তু সে সহানুভূতি সুপ্রযুক্ত হয় নাই বলিয়াই প্রজা তাহাতে উপকৃত হয় নাই। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন শাসকদিগের সহানুভূতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে প্রজা যে আশানুরূপ উপকৃত হইয়াছে, এমন বলা যায় না। ইংরেজ এদেশে রাজস্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার চেষ্টায় যে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে" ভূমিরাজস্ব জমিদারের সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে যে মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহারা শিক্ষিত এবং সঙ্গতিপন্ন—সুতরাং

অজ্ঞ ও দরিদ্র প্রজা তাঁহাদিগের আইন-অতিক্রম নিবারণ করিতে পারে না। কি ভাবে অনেক জমিদারের সেরেস্তায় কাজ হয়, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আমরা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। ১৯ ৪ খৃষ্টাব্দে সারণ জিলায় জরিপ ও বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সরকার যে বিবৃতি প্রকাশ করেন, তাহাতে লিখিত ছিল—

"Illegal enhancement of rent, oppression by the landlords and consequent discontent among the tenantry were found to be prevalent to a greater or less degree in nearly all parts of the district."

অর্থাৎ জিলার সকল অংশেই অল্প বা অধিক পরিমাণে বেআইনী খাজনাবৃদ্ধি, জমিদারের অত্যাচার ও সেই কারণে প্রজার মনে অসন্তোষ লক্ষিত হইয়াছে।

কোন প্রসিদ্ধ ও দানশীল জমিদারের জমিদারী সম্বন্ধে ঐ বিবৃতিতে লিখিত হয় :—

"The rayats complained not so much that the rates arbitrarily fixed by the Raj officials were more than they could afford to pay, but the constant changes in the rent rolls had destroyed all sense of security."

অর্থাৎ জমিদারের কর্মচারীরা যথেচ্ছা খাজনা ধার্য্য ত করিয়াই ছিলেন ; তাহার উপর আবার শেহা করচা প্রভৃতি বার-বার পরিবর্ত্তন করায় প্রজার ও জিজ্ঞা ও খাজনা সম্বন্ধে কোন স্থিরতাই ছিল না!

সরকার এই সব ব্যাপারের প্রতিকারকল্পে থাকবস্ত জরিপ ও বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কখন প্রজার ঋণ পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা হয় নাই। বহু দিন পূর্ব্বেই যে প্রজার ঋণভারের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রমাণে আমরা কমিটী অব সার্কিটের নির্দ্ধারণ উদ্ধৃত করিয়াছি বটে, কিন্তু সে নির্দ্ধারণও কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

প্রজাস্বত্ব আইনে প্রজাকে যে অধিকার প্রদান করা হইয়াছে, তাহা যে মহাজনের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচিত হয় নাই। বলা বাহুল্য, কেহ কেহ বলিবেন—প্রজা যদি তাহার অধিকার রক্ষা না করে, তবে কে তাহার জন্য তাহা রক্ষা করিতে পারে? কিন্তু তাহার উত্তরে বলিতে হয়, যে-দেশে শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক নহে, সে-দেশে সরকারকে অন্য দেশ অপেক্ষা প্রজার স্বার্থরক্ষায় অধিক অবহিত হইতে হয়।

সরকার তাহা বুঝিয়াই সমবায় ঋণ দান সমিতি প্রতি... ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আর সেই জন্য আজ জমি-বন্ধকী ব... প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। যাহাতে এই অনুষ্ঠান সাফ... লাভ করে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা দেশের লোকের কর্ত্তব্য ও... তাহা হইলেই ইহা এক দিকে যেমন স্বাবলম্বী হইতে পারিবে অপর দিকে তেমনই প্রকৃত কৃষকের ঋণ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা হইলে তাহার পক্ষে এই সব ব্যাঙ্ক হইতে আবশ্যক অর্থ লইয়া জমির ও চাষের প্রকৃত উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইবে।

ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, তাহার আভাস আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। কিরূপে ইহার মূলধন সংগৃহীত হইবে, তাহাও জানিবার বিষয়, সন্দেহ নাই। ব্যাঙ্কের সদস্যদিগকে অংশ বিক্রয় করিয়া প্রথমতঃ মূলধন সংগৃহীত হইবে। যিনি যত টাকার অংশ ক্রয় করিবেন, তাঁহার দায়িত্ব কখন তাহার অতিরিক্ত হইবে না। লাভ হইলে লাভের টাকার শতকরা ৭৫ টাকা সঞ্চয়-ভাণ্ডারে জমা হইবে এবং অবশিষ্ট ২৫ টাকা মাত্র লভ্যাংশ বোনাস বা বৃত্তি প্রভৃতি বাবদে ব্যয়িত হইবে। ব্যাঙ্কে মূলধন হিসাবে যত টাকা সংগৃহীত হইবে তাহার সহিত সঞ্চয়-ভাণ্ডারের তহবিল যোগ করিয়া মোট টাকার বিশ গুণ টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ-হিসাবে লইতে পারিবেন। বঙ্গীয় কেন্দ্রী সমবায় ব্যাঙ্ক এই টাকা ঋণ দিবেন এবং কেন্দ্রী জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত সব জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক এই সমবায় ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। ব্যাঙ্ক "ডিবেঞ্চার" করিয়া টাকা সংগ্রহ করিবেন এবং যত দিনের জন্য "ডিবেঞ্চার" থাকিবে, সরকার তত দিনের জন্য সুদের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। মোট "ডিবেঞ্চার" ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার অধিক হইতে পারিবে না। কেন্দ্রী সমবায় ব্যাঙ্কের এই কাজের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে। যাহাতে গৃহীত ঋণের টাকা যথাযথ ভাবে থাকে, তাহা দেখিবার জন্য সমবায়-সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রারই প্রথম ট্রাষ্টি থাকিবেন এবং জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি যে বন্ধকী দলিলে টাকা ধার দিবে, তাহা তাহারা কেন্দ্রী সমবায় ব্যাঙ্কের ও ঐ ব্যাঙ্ক ট্রাষ্টির বরাবর লিখিয়া দিবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহাতে টাকা নষ্ট না হয়, সেই

শিশুসাহিত্য

শ্রীঅনাথনাথ বসু

আমাদের বাংলা ভাষা শিশুসাহিত্যে সমৃদ্ধ নয়, এ-কথা বলিলে বোধ করি বিশেষ অত্যুক্তি করা হয় না। হয়ত পঁচিশ পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে শিশুদের পাঠোপযোগী গ্রন্থের সংখ্যা এখন অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু দেশের অভাবের ও অন্য দেশের অবস্থার তুলনায় ইহা মোটেই যথেষ্ট নয়। জেনেভায় জঁ্যা জ্যাক্ রুসো আঁস্‌টিটুট (Jean Jacques Rousseau Institute) নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। তাহারই এক অংশে বুরো দ্য'ঢুক্যাসিঁও আঁটারন্যাশিওনাল (আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষাদপ্তর) নামক দপ্তরের একটি গৃহে পৃথিবীর অনেক দেশের শিশুসাহিত্য সংগৃহীত হইতেছে। প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে এই শিশুসাহিত্য-গ্রন্থাগার দেখাইতে দেখাইতে যেখানে ভারতীয় গ্রন্থগুলি রাখা হইয়াছে তাহা দেখাইয়া বলিলেন, "আপনাদের দেশের বেশী বই আমরা পাই নাই, আপনাদের শিশুসাহিত্যের অবস্থা কেমন ?" পাশেই ক্ষুদ্র দেশ চেকোশ্লোভাকিয়ার গ্রন্থগুলি রাখা দেখিলাম, সেলফের দুই-তিন থাক ভরিয়া রহিয়াছে; ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত কয়েকটি মাত্র গ্রন্থ সেখানে দেখিতে পাইলাম। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ শিশু-সাহিত্যের একটি তালিকা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইল যে, আমাদের দেশে শিশুসাহিত্য বিশেষ পরিপুষ্ট নহে, তবে দেশে যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলিও এখানে আসে নাই। বাহিরের লোকের কাছে যাহাই বলি না কেন, নিজের মনে বুঝি যে আমাদের দেশের সাহিত্যিকগণ এ-দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই; দেশের অভিভাবকগণও শিশুসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এ-কথা উঠিতে পারে যে, আমরা দরিদ্র সুতরাং শিশুসাহিত্যের ক্রেতা মেলা দুর্লভ; কথাটার মধ্যে আংশিক সত্য নিহিত থাকিলেও কথাটা পুরাপুরি সত্য নহে। যে-দেশে উপন্যাস গল্পের বইয়ে পুস্তকের বাজারে বন্যা চলিয়াছে, সে-দেশে মনোজ্ঞ শিশুসাহিত্যের ক্রেতার অভাব ঘটিবে এ-কথা সত্য নহে। তবে হয়ত দেশের লোককে এ-বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, শিশুসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তার দিকে দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। এই শিক্ষার যে একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। আমাদের দেশের সাধারণ অভিভাবক ও শিক্ষকগণ শিশুদের হাতে বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, কথামালা তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন, ভাবেন তাঁহাদের কর্ত্তব্যের শেষ হইল ; বাকিটুকুর বরাত তাঁহারা টেক্‌স্‌ট-বুক কমিটির হাতে দেন। টেক্‌স্‌ট-বুক কমিটির দ্বারা অনুমোদিত শিশুদের উপযোগী বলিয়া বর্ণিত সাধারণ গ্রন্থের স্বরূপ কি, তাহা সেই বইগুলি খুলিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় ; তাহাদের মধ্যে ভাল গ্রন্থ যে নাই তাহা বলিতেছি না। তবে তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। কোন কোন দায়িত্ববোধপূর্ণ অভিভাবক হয়ত ইহার উপরে বড়জোর একখানা রামায়ণ বা মহাভারত কিনিয়া দেন। যে-যুগে শিশুবোধকই ছিল শিশুদের একমাত্র সাহিত্য, তাহার চেয়ে এ-অবস্থা অনেক উন্নত এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই উন্নতিতে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার কিছু নাই। এক হিসাবে শিশুবোধকের যুগেও আমাদের দেশের শিশুরা যাহা পাইত, আজ তাহা হইতে বর্ত্তমান কালের শিশুরা বঞ্চিত হইয়াছে। তখনকার দিনের ছড়া ও রূপকথাগুলি ছিল সে-যুগের শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ছড়াগুলি লোপ পাইতেছে, রূপকথা-গুলি আমরা ভুলিতে বসিয়াছি; রূপকথা ও ছড়া বলিতে পারেন এমন দিদিমা ঠাকুরমার সংখ্যা আজ অতি অল্প। অথচ এগুলি শিশুসাহিত্যের অপূর্ব্ব রসবস্তু। অনেক দিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম কেহ কেহ ছড়াগুলি সংগ্রহ করিতেছেন, সে-সংগ্রহের কি হইল জানি না।* সেগুলি যদি লোপ পাইবার পূর্ব্বে সংগৃহীত হয় তাহা হইলে যে দেশের শিশুরা কৃতজ্ঞ হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

---

* মুদ্রিত বাংলা ছড়ার বহি আছে। কিন্তু তাহা যথাযথ সংগ্রহ নহে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

তাহা ছাড়া সে-যুগে রামায়ণ মহাভারত সকলেই পাঠ করিত, শিশুরাও মাতৃমুখে রামায়ণকাহিনী ও মহাভারতের উপাখ্যানগুলি শুনিয়া পাঠশালার বর্ণপরিচয় শেষ করিয়াই আমাদের দেশের এই দুইটি অপূর্ব্ব সাহিত্যগ্রন্থে প্রবেশ-অধিকার লাভ করিত। এক হিসাবে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের রচনা পাঠ করিতে প্রভূত পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না; সুতরাং শিশুরাও ইহা উপভোগ করিতে পারে। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের ইহাই বিশেষত্ব যে, আবালবৃদ্ধ-বনিতা তাহাদের মধ্যে আপন আপন চিত্তবিকাশ অনুযায়ী রস লাভ করে। এই সার্ব্বজনীনত্ব বর্ত্তমান কালের কোন গ্রন্থের আছে কি-না সন্দেহ। যাহা হউক, পঞ্চাশ এক-শ বৎসর পূর্ব্বে সমাজের গঠন ছিল অন্য ধরণের এবং তাহারই সহিত মিলাইয়া শিশুসাহিত্যের প্রচলনও ছিল। তখন শিশুর নিজস্ব অধিকারের কথা কেহ বলিত না, শিশুজীবনকে তখন পরিণত জীবনের ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপে গ্রহণ করিয়া সেই দৃষ্টি হইতে শিশুসাহিত্য সৃষ্ট হইত। এই যুগের আর একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার বিষয়। তখন অতি অল্প লোকেই লেখাপড়া শিখিত, সুতরাং তখনকার শিশুসাহিত্যের অধিকাংশ লিখিত না হইয়া কথিত আকারেই প্রচার লাভ করিয়াছিল।

তাহার পর অনেক কাল গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন "বর্ণপরিচয়" লিখিলেন তখন শিশুবোধকের উপর কতটা উন্নতি হইল তাহা আমাদের পক্ষে আজ ধারণা করা কঠিন। বিদ্যাসাগর প্রথম শিশুসাহিত্য রচনায় মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির সহায়তা লইলেন, কিন্তু তখন ছিল মনোবিজ্ঞানের শৈশবকাল; তাহার পর মনোবিজ্ঞানেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু শিশুসাহিত্য-রচনায় তাহার ব্যবহার উন্নতির অনুরূপ হয় নাই। এখনও আমরা পরিণত বয়স্কের দৃষ্টি লইয়া শিশুসাহিত্য রচনা করিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই মনোভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না। তবে ভুবনের মাসীর কর্ণকর্ত্তনের ব্যাপারে শিশুরা কোন শিক্ষা লাভ করুক বা না-করুক, যথেষ্ট আনন্দ যে লাভ করিত এটা নিজেরই অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি।

শিশুসাহিত্য-রচনার মাপকাটি কি? বর্ত্তমান কালের শিশুপাঠ্য গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে এই মাপকাটির ঠিক সন্ধান মেলে না; তাহাদের মধ্যে কতকগুলা দেখি পরিণত বয়স্কের মাপকাটি দিয়া লেখা। এগুলির সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি, পরেও বলিব। মনে পড়িয়া গেল কে এক জন এই শ্রেণীর কোন কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, জনহীন মরুভূমিতে সঙ্গীর একান্ত অভাব ঘটিলেও তিনি সেগুলা পড়িবেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর বইগুলি দেখিলে মনে হয় শিশুদের আনন্দ দিবার একটা চেষ্টা সেগুলির মধ্যে আছে। কিন্তু সে-চেষ্টার মধ্যে কোন চিন্তা ও সংযম নাই। সেইটাই দুঃখের কথা। অন্য ক্ষেত্রেও সাহিত্য-সৃষ্টিচেষ্টায় সুচিন্তিত ও সংযত চিন্তার প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক। কারণ যাহাদের হাতে এই গ্রন্থগুলি দিব তাহাদের বিচারশক্তি পরিণত নহে, ভাল-মন্দ বাছিয়া লইবার ক্ষমতা তাহাদের হয় নাই; সুতরাং খারাপ গ্রন্থ তাহাদের যত ক্ষতি করিতে পারে অন্যের বেলায় ততটা পারে না। এইজন্যই শিশু-সাহিত্য-রচনার দায়িত্ব অনেক বেশী। দুর্ভাগ্যক্রমে সকল লেখকের মধ্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না।

অনেকে বলেন, শিশুসাহিত্যের মাপকাটি হওয়া উচিত চরিত্রগঠন, জ্ঞানদান বা এমনই একটা কিছু। সাহিত্যের যে প্রাথমিক উদ্দেশ্য আনন্দদান সেটাকে স্বীকার করিয়াও তাহাকে তাঁহারা গৌণ মনে করেন। সুতরাং তাঁহাদের রচিত শিশুসাহিত্য নীতি-শিক্ষারই একটি আলাদা সংস্করণে পরিণত হয়। এ যেন চিনি-মাখান কুইনিনের বড়ি। শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহার উদাহরণ আমরা পদে পদে পাই।

এখানে শিশুসাহিত্যের উদ্দেশ্য বিচার করিবার স্থান নাই। আমাদের মতে শিশুসাহিত্যের মুখ্য আদর্শ আনন্দ-দান, শিক্ষা বা চরিত্রগঠন বা জ্ঞানদান গৌণ; সেটাকে আনন্দের by-product বা 'ফাউ'-স্বরূপ লওয়াই উচিত এবং শিশুসাহিত্য-রচনায় এই আদর্শ আমাদের মনে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকা উচিত। এক জন বলিয়াছিলেন আমরা বাহিরের তথাকথিত বাজে বই পড়িয়া যাহা শিখি তাহার অতি সামান্য অংশই তথাকথিত কাজের বই পড়িয়া পাই। কথাটা অত্যন্ত সত্য। যে-বই আনন্দ দেয় তাহা জীবনে ছাপ রাখিয়া যায়, আর যে-বই পড়িতে পদে পদে কষ্ট ও চেষ্টা করিতে হয়, মনের সমস্ত শক্তি তাহারই মধ্যে নিঃশেষিতপ্রায় হইয়া যায়,

শেখার শক্তি আর থাকে না। মনোবিজ্ঞানও এ-কথার সমর্থন করে।

এ-কথা যেন কেহ মনে না করেন যে, আমি তপস্যার কথা অস্বীকার করিতেছি। ভাল সাহিত্য চর্চ্চা করিতে তপস্যার প্রয়োজন; শিশুদেরও ভাল সাহিত্যে প্রবেশ-অধিকার দিতে হইবে। কিন্তু যাহা প্রাণ মন দিয়া চাই, যাহা ভালবাসি, যাহার রস কিছু অনুভব করিতে পারিয়াছি আমরা তাহারই জন্য তপস্যা করি। সাহিত্যের রসবোধ জাগ্রত হইবার পূর্ব্বেই যদি নীতিশিক্ষার মুখব্যাদান শিশুচিত্তে ভীতির সঞ্চার করে তবে সে শিশুসাহিত্যকে দূর হইতেই নমস্কার জানায়। আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেই যে পর-জীবনে লেখাপড়ার চর্চ্চা রাখে, ভাল ভাল বইয়ের সহিত পরিচয় রক্ষা করে, তাহার কারণ শৈশবের এমনই একটা ট্র্যাজেডি। বর্ণপরিচয়ে বিপত্তির প্রভাব জীবনের ক্ষেত্রে অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়ায়। অথচ কথাটা আমরা তেমন করিয়া ভাবি না।

ব্যাপারটা মূলে এই যে, যাহাকে লইয়া আমাদের কারবার, তাহার মনের খবর আমরা বিশেষ রাখি না। শিশুসাহিত্য-রচনার একমাত্র মাপকাটি শিশুমনের ক্রমবিকাশ ও সেই ক্রমবিকাশের প্রত্যেক পর্য্যায়ের অনুযায়ী প্রয়োজন। যেমন দেহের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তেমনই মনোবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্যের প্রয়োজন হয়। দেহ একবার পুষ্ট হইলে তখন খাদ্যের ভেদাভেদের বিশেষ আবশ্যকতা থাকে না, কিন্তু সে-অবস্থায় পৌছাইবার পূর্ব্বে এ-বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার হয়। মনের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটে। সেইজন্যই এই শ্রেণীর সাহিত্য-রচনার এত সতর্কতা চাই।

এতক্ষণ শিশুসাহিত্য কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছি; উপরে যাহা বলিলাম তাহাতে বোঝা যাইবে ইহার মধ্যে শ্রেণী-ভাগ ও স্তর-ভাগ আছে, মনোবিকাশের ক্রম-অনুযায়ী এই শ্রেণী-ভাগ ও স্তর-ভাগ হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ যৌবন-বিকাশ হয় ষোল-সতের বৎসর বয়সে; তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালকে মোটামুটি তিনটি ভাগে আমরা ভাগ করিতে পারি; পাঁচ-ছয় বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থা শৈশব, পাঁচ-ছয় হইতে এগার-বার বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থা বাল্য ও তাহার পরে যৌবনারম্ভ পর্য্যন্ত কালকে কৈশোর বলা যাইতে পারে। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এই হিসাবে এক-আধ বৎসর কম-বেশী হইতে পারে, তবে মোটামুটি ভাবে এই হিসাব ঠিক বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এ-ক্ষেত্রে এ-কথা বলা প্রয়োজন যে, এই ভাগ-গুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন নহে, অর্থাৎ এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থার বিকাশ ক্রমশগতিতে হয় বলিয়া তাহাদের কোন একটির সঠিক সীমা ও সুপরিস্ফুট সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। তবে এ-কথাও ঠিক যে প্রত্যেক অবস্থারই এক একটা বিশেষত্ব আছে। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে উভয় অবস্থারই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

শৈশবে শিশুর জগৎ একান্তই তাহার আপনাকে লইয়া; তাহার খেলাধূলা সকল কিছুরই কেন্দ্র সে নিজে। সে যখন খেলার সঙ্গী চায় সে তাহার নিজের আনন্দের জন্য, আত্মতুষ্টি, আত্মঅভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য। ইহাকে স্বার্থপরতা বলিতে পারি, কিন্তু সে স্বার্থপরতা জীবনরক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। পরবর্ত্তীকালে স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করিলে শিশুচিত্ত এই স্বকৃত স্বার্থপরতা হইতে ধীরে ধীরে মুক্তিলাভ করে, স্বার্থপরতার গণ্ডি ধীরে ধীরে বিস্তৃততর হইয়া পরার্থপরতা দেখা যায়; শিশু সামাজিক জীব হইতে শেখে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিকাশের পথে বহু বাধাবিঘ্ন আসে; একদিকে হয় স্বার্থপরতা রক্ষা করিবার চেষ্টা চলে, না-হয় অসময়ে শিশুকে সামাজিক করিবার, ভদ্র করিবার প্রয়াস দেখা দেয়। তাহাকে নানারূপ নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়; অবিকশিত চিত্ত শিশুর নিকট এই শ্রেণীর শিক্ষার কোন মূল্য নাই; ঠিক এই বয়সটায় সে নীতিবিধানের ঊর্দ্ধে।

এই বয়সে মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগ অত্যন্ত বিকশিত অর্থাৎ পরবর্ত্তী বয়সে ইন্দ্রিয়বিকার ঘটিলে যে মানসিক নানাবিধ উপাধিদ্বারা আমরা অর্থ নির্ণয় ও বিচার করি, সেগুলির তখনও সৃষ্টি না হওয়াতে তখন প্রত্যক্ষ অনুভূতির মূল্য অনেক বেশী হয়। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে মনোজগতের এই ব্যাপারটার মূল্য অনেকখানি। এই জন্যই শিশুসাহিত্যে প্রত্যক্ষ অনুভূতির খোরাক যথেষ্ট পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে শিশুসাহিত্যে ভাল ছবি থাকে না; যাহা থাকে তাহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। অথচ চোখের সাহায্যে শিশু যে-পরিমাণে শিক্ষালাভ করে, অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বোধ করি

ততটা পারে না। ভাল ভাল ছবি-দেওয়া বইয়ের অভাব হওয়াতে অনেক সময়ে সুলিখিত বইয়ের মূল্য কমিয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে এইভাবে শিক্ষা দিবার যে আয়োজন হইয়াছে তাহা আমাদের দেশে প্রবর্ত্তন করা একান্ত প্রয়োজন।

পড়িতে গেলে নানা ইন্দ্রিয়ের যে সমবায়ের (co-ordination) প্রয়োজন শৈশবে তাহার একান্ত অভাব; তাই তখন ইন্দ্রিয়গুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে লইয়া তাহাদের বিকাশ চেষ্টা করা প্রয়োজন হয়। চোখের ব্যবহারের কথা কিছু বলিয়াছি। এইবার কানের কথা বলি। এককালে আমাদের দেশে নানারকমের ছড়া প্রচলিত ছিল, শিশুরা সেগুলি শুনিত, তাহাদের মনের অলক্ষ্যে তাহার রস আস্বাদ করিত; ধীরে ধীরে তাহার ভিতর দিয়া কাব্যবোধ ছন্দবোধ জন্মাইত। আমার এই কথাটির মধ্যে কিছু পরিমাণ অত্যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা যে আংশিকভাবে সত্য এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজকাল ছড়াগুলি আমরা হারাইয়াছি, কিন্তু তাহাদের স্থান অধিকার করিতে পারে এমন কিছুর সৃষ্টি করি নাই। শিশু-কবিতার নামে প্রচলিত কবিতাগুলি নীতিশিক্ষার জন্য রচিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশের মধ্যে ছন্দ নাই, শব্দসঙ্গীত নাই, আছে শুধু নীরস নীতিকথা; সেগুলি শিশুচিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না।

এক 'ঘুমপাড়ানি গান' বাদ দিলে শিশুদের উপযোগী গান আমাদের দেশে কোনদিনই বেশী ছিল না। অথচ সকল পিতা-মাতাই জানেন শিশুরা ছন্দ ও গান কত ভালবাসে। ইহার কোন আয়োজনই কি আমাদের গান-রচয়িতা ও সাহিত্যিকগণ করিতে পারেন না?

শৈশবে ছেলেমেয়েরা গল্প বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা ভালবাসে কি-না সন্দেহ; তাহারা যে-শ্রেণীর গল্প ভালবাসে তাহা অত্যন্ত সরল; তাহার মধ্যে প্লট আছে কি-না চরিত্র-চিত্রণ আছে কি-না সে-বিষয়ে তাহারা দৃষ্টি দেয় না। বোধ করি এই বয়সে কথার একটা মোহ আছে, সেই মোহের জন্যই শিশু ছড়া গান কবিতা গল্প শুনিতে চায়। তাই দেখি একই গল্পের পুনরাবৃত্তিতে শিশুচিত্ত ক্লান্তিবোধ করে না। শিশু যে রূপকথা ভালবাসে সে-ভালবাসাও তখন পরিণতি লাভ করে না; বাল্যে সে-ভালবাসা সত্যই ভালবাসা হইয়া দাঁড়ায়। তবুও শৈশবে রূপকল্পার মূল্য অনেকখানি; কল্পলোকে বিচরণ করার শক্তি শিশুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে। তাহারই উপাদান হয় এই রূপকথাগুলি।

যে ভাষা শিশু বলে ও শোনে তাহা ছাড়া যে একটি মনগড়া সাধুভাষা আছে শিশুর পক্ষে তাহা একান্তই অবাস্তব; সুতরাং শিশুর কণ্ঠে তাহা দিবার চেষ্টা অন্যায়। ইহার জন্য যে মানসিক পরিশ্রম প্রয়োজন শিশুর পক্ষে তাহা কঠিন; তাহাতে যে সময় যায় তাহার মূল্যও কিছু নাই। আর সেই চেষ্টা করিতে গিয়া শিশুর সামান্য শক্তির যে অপব্যয় হয় তাহার ফলে অন্যত্র যেখানে তাহার শক্তিপ্রয়োগ স্বাভাবিক-ভাবে প্রয়োজন সেখানে তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। সুতরাং শিশুসাহিত্য লিখিতে হইবে তাহাদেরই ভাষায়। পাশ্চাত্য দেশে দেখিয়াছি শিশুদের শব্দসংগ্রহের তালিকা করা হইয়াছে; অর্থাৎ কোন্ বয়সে শিশু কি কি শব্দ ব্যবহার করে বা কোন্ কোন্ শব্দের তাহার প্রয়োজন হয় তাহা স্থির করা হইয়াছে; তাহার পর সেই শব্দগুলি দিয়া শিশুদের উপযোগী গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ফলে সে-সকল গ্রন্থ শিশুরা সহজে পড়িতে পারে, পড়িয়া আনন্দ লাভ করিতে পারে। অযথা অপ্রয়োজনীয় শব্দের ভারে শিশুচিত্ত ভারাক্রান্ত হয় না। আমাদের দেশে শিশুরা পড়া আরম্ভ করিয়াই "মানের বই" খোঁজে। দোষ দিব কাহাকে? এ-বিষয়ে আমাদের দেশের শিক্ষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বলা উচিত। বর্ণপরিচয়ে বর্ণবোধের যে প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে, তাহা বিকলনমূলক (analytical) ও কতকটা ধ্বনি-অনুসারী (phonetic)। ধ্বনির ও কথার এইরূপ বিচার শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক নহে। বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞানের মতে এইরূপ বিকলন (analysis) শিক্ষার দ্বিতীয় ধাপ; প্রথম ধাপে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি সমগ্রভাবে দেখা দেয়, পরে শিক্ষিত জন ত'হাকে ভাঙিয়া-চুড়িয়া বিশ্লেষণ করিতে শেখে। বর্ণপরিচয়ের প্রথম ধাপ বর্ণবোধ নহে, কথাবোধ। সুতরাং "বর্ণপরিচয়"ও নূতন করিয়া লেখার সময় হইয়াছে।*

* চল্লিশ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে আমি কথাবোধকে প্রথম ধাপ করিয়া সচিত্র বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ লিখি, এবং তাহা কিরূপে পড়াইতে হইবে, তাহাও লিখিয়া দিই। ঐ বই এখনও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শিশুদিগকে উহা পড়ান হয় পুরাতন রীতিতে, অর্থাৎ বর্ণবোধকে প্রথম ধাপ করিয়া।—প্রবাসীর সম্পাদক।

মুক্তি

শ্রীআশালতা দেবী

১

যামিনীর স্বভাবের গতি ছিল অত্যন্ত বেগবান এবং চঞ্চল। নিজেকে লইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা, নিজের মনকে টানাহেঁচড়া করিয়া তাহা হইতে চুনিয়া চুনিয়া চিরিয়া চিরিয়া তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা এ-সকল তাহার ধাতে সয় না। তাহার সমস্তই দ্বিধাহীন, সোজাসুজি। যাহা তাহার ভাল লাগে না, তাহা হইতে প্রবল বিতৃষ্ণায় সে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং লইবার সময়ে কোন ছলে কোন মিহি এবং মিষ্ট বাক্য দিয়া তাহা ঢাকিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না। আবার ইহার উল্টা দিকেও সে ঠিক এমনি জোরের সঙ্গে চলে। যেখানে তাহার মন আকৃষ্ট হয় সেখানেও এতটুকু রাখিয়া-ঢাকিয়া চলা তাহার অসাধ্য।

সেই সে মবারের প্রায় সপ্তাহখানেক পরে যামিনী বিকালবেলায় চন্দ্রকান্তের লাইব্রেরী-ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, নির্ম্মলা দরজার দিকে পিছন ফিরাইয়া আলমারী খুলিয়া কি বই বাহির করিতেছে। ঘন কালো চুলের রাশি হাতে, পিঠের উপর, কপোলে সমস্ত জায়গায় অবিন্যস্ত হইয়া ছড়ান। পিছনে পায়ের আওয়াজ পাইয়া সে মুখ ফিরাইয়া কহিল, 'ও, আপনি এসেছেন! বাবা সেই কখন বেরিয়েছেন, তাঁর কোন এক বন্ধু তাঁকে দুপুরের খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এবারে তো তাঁর আসার সময় হ'ল। হয়ত এখনি এসে পড়বেন।'

'আচ্ছা আমি ততক্ষণ বসছি।'

'হ্যাঁ, একটু বসুন। এই আলমারীটা গোছান শেষ হ'লেই আমি চায়ের জল চড়াব। বাবার জন্যে আর পনের মিনিট অপেক্ষা করব। তার পর তিনি না এলেও চা করব, এত অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক! এই যে আলমারীটা দেখছেন এইটে আমি দু দিন অন্তর গোছাই, আবার যেমনকার তেমনি নোঙ্‌রা হয়ে যায়।'

যামিনীর কাছ হইতে কোন উত্তর আসিল না। নির্ম্মলা আপনার হাতের কাজে মন দিল। হঠাৎ যামিনী কহিল, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"কি কথা?"

"আচ্ছা, আপনার সঙ্গে ব্যবহারে আমি কি কোন দিন কোন অসঙ্গত আচরণ করেছি বা অন্যায় কিছু?"

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া নির্ম্মলা বলিল, "আপনি কি বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে।

যামিনী নির্ম্মলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "অন্য কেউ হ'লে এইটুকুতেই বুঝত। আপনি ব'লেই পারছেন না। কিন্তু আমিও আর সঙ্কোচ করব না, আরও স্পষ্ট ক'রে বলছি। ধরুন, আপনার বাবার সামনে আপনার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করি সকল সময়েই আমার তা-ই করা উচিত। কিন্তু আমি তা পারিনে। আপনি যখন একলা থাকেন তখন আমার ইচ্ছে করে শুধু আপনার দিকেই একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। আর তাই থাকিও। আরও অনেক কিছুই ইচ্ছে করে, অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ ক'রে নিই। কিন্তু আপনার বাবার সুমুখে আপনাকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখিনে। তাই, যদি মনে করেন কোথাও কোনখানে আমার অন্যায় হচ্ছে তাহলে আমাকে সাবধান ক'রে দিন। আপনার উপর কোন দিক থেকে এতটুকু অন্যায় করব তা আমি ভাবতেও পারিনে।"

নির্ম্মলা বিমনা হইয়া যামিনীর দিকে চাহিল। আলমারীর পাল্লাটা তখনও খোলা, কালো চুলে তাহার মুখখানি অর্দ্ধ আবৃত। কি একটা অজানা ভয়ে তাহার গলাটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। তারপরই আর একটু স্পষ্ট করিয়া সে বলিল, "আপনার কথা আমি এখনও খুব স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারছি নে। কি হয়েছে বলুন ত! আপনি যে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন তা অপরেও লক্ষ্য করেছে।"

যামিনীর মনে হইল নির্ম্মলা এমন সহজ গতিতে কুণ্ঠাহীন ভাবে কথা বলিতেছে, যেন এ আর কাহারও কথা। অন্য

কেহ অপর কাহাকেও বলিতেছে। কিন্তু যামিনী ভিতরে ভিতরে লজ্জায় অভিভূত হইয়া যাইতেছিল। তথাপি একটা কৌতূহলমিশ্রিত উদ্বেগও তাহার মনকে নাড়া দিতেছিল। মৃদুকণ্ঠে কহিল, "কে দেখেছে? বলুন।"

নিজের সম্বন্ধে আলোচনায় লজ্জাবোধ করিয়াও নির্ম্মলা বলিল, "সে-দিন আমার বৌদি এই ধরণের কি বলছিলেন। আমাকে টিপ্ পরতে অনুরোধ করছিলেন আপনি দেখে খুশী হবেন ব'লে। আমি তাঁকে বললুম, আপনি কি সর্ব্বদাই আমার মুখের পানে চেয়ে অত লক্ষ্য ক'রে দেখেন আমি কি পরেছি বা না-পরেছি? আমাকে এত ক'রে দেখবার কি যে মানে বুঝতে পারছি না।"

নির্ম্মলার মনটা ভিতরে ভিতরে একটু খুশী হইয়াছিল, কিন্তু তবু কারণটা ঠিক সে ধরিতে পারিতেছিল না।

"এর মানে যে কি হ'তে পারে তা কি সত্যি তুমি বুঝতে পার না? তুমি কি বুঝবে না......।" যামিনী হঠাৎ অত্যন্ত আবেগভরে কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত ঘরে ঢুকিতেছেন। আলমারীর পাল্লাটা খুলিয়া রাখিয়াই নির্ম্মলা বিমনাচিত্তে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সে হাজার দর্শনযোগ্য হইলেও যামিনীর এতখানি বিচলিত হইবার কারণ কি জন্য হইল ভাবিয়া নির্ম্মলা বিস্মিত হইতেছিল। সুন্দর জিনিষ দেখিয়া সে নিজে ত কখনও এমন করে না। আনন্দ ও ভয়মিশ্রিত অচেনা একটা কি অনুভূতি নির্ম্মলার হৃদয়-দ্বারে আসিয়া উঁকি দিতে লাগিল। যামিনী চেয়ার হইতে উঠিয়া ঘরময় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। চন্দ্রকান্তবাবু তাহার কোন ভাবান্তর লক্ষ্যের মধ্যেই না আনিয়া কহিলেন, "যামিনী, আমাদের নির্ম্মলের সেই মীনাকরা রিষ্টওয়াচটা দেখেছ? সেই যে ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী বাড়িতে গিয়ে তার নাম ক'রে তাদের কলেজে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, নির্ম্মলের সেক্সপীয়রের আবৃত্তি শুনে তিনি এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাকে তার উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হয়নি ব'লে মনটা তাঁর খুঁৎ খুঁৎ করছিল। তাই তাড়াতাড়ি নিজের হাতের ঘড়িটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। দেখবে?...এই আলমারী-তেই সেইটে আছে।"

যামিনী ঘড়ি দেখিবার জন্য বিন্দুমাত্র কৌতূহল না দেখাইয়া কহিল, 'আচ্ছা, চন্দ্রকান্ত বাবু, একটা কথা আপনাকে বলব?"

"কি কথা? রোসো আগে ঘড়িটা বার করি। কোথায় রাখলুম ঠিক মনে পড়ছে না। নির্ম্মল,...নির্ম্মলা—"

"থাক, তাঁকে আর ডাকবেন না। তাঁর সম্বন্ধেই কথা, তাঁর অনুপস্থিতিতেই বলতে চাই। আচ্ছা চন্দ্রকান্ত বাবু, সত্যি ক'রে স্বীকার করুন, পাত্র-হিসাবে আমাকে আপনি কেমন মনে করেন?"

"পাত্র!" চন্দ্রকান্ত তখনও ঘড়ির খাপটা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন, একটু আশ্চর্য্য হইয়া যামিনীর দিকে চাহিলেন। পাত্র সম্বন্ধে কোন কথা যে ভাবা তাঁহার প্রয়োজন আছে, আজ পর্য্যন্ত তাহা তাঁহার মনে পড়ে নাই।

"ধরুন আমি যদি নির্ম্মলাকে বিয়ে করতে চাই, আপনি কি তাতে রাগ করবেন?...আপনার কি কোন রকম আপত্তি আছে?"

চন্দ্রকান্ত কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, "নির্ম্মলের বিয়ে! সে-কথা তো এখনও আমি কিছু ভাবিনি।"

যামিনী গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "এইবারে ভাবা উচিত।"

চন্দ্রকান্ত তাঁহার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে অপ্রস্তুতের মত কহিলেন, "ভাবব বইকি। নিশ্চয় ভাবব। ওর বয়স কত হ'ল, এই তুমিই হিসেব ক'রে দেখ না, উনিশ-শো তের সালে জন্ম, এখন আঠারো হ'ল। তাই তো এ সব কথা এতদিন খেয়াল করিনি।"

আরও অনেকক্ষণ তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সহসা সুপ্তোত্থিতের মত যামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যামিনী, নির্ম্মলার বিয়ের পর আমি তাকে দেখতে পাব ত?"

তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া যামিনীর মনটা আর্দ্র হইল। কিন্তু তাহার পরেই তাহার রাগ হইল, নির্ম্মলার বিবাহের কথা উঠিতেই প্রথম প্রশ্ন তাঁহার মনে জাগিল তাহার সুখ বা কল্যাণ কামনা নয়, কেবল এখনকার মত তখনও তিনি সর্ব্বদা তাহাকে চোখে দেখিতে পাইবেন কি-না। সে বলিল, 'আমার বাবা পশ্চিমের উকীল, আর আমাদের বাড়ও সেখানে। কিন্তু আপনার যখনই দেখবার ইচ্ছে হবে তাঁকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আপনি সাধারণের চেয়ে এত অন্য রকম চন্দ্রকান্তবাবু! যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন তার অবস্থা জাতি কুল—এ সকল

বিচার না ক'রে প্রথম ভাবনা আপনার বিয়ের পরেও তাঁকে দেখতে পাবেন কি-না ?"

চন্দ্রকান্ত নিস্তব্ধ হইয়া অন্যমনে বসিয়াছিলেন ; এখন ধীরে ধীরে কহিলেন, "কিন্তু যামিনী, তোমার বিয়ে তোমার বাবা স্থির করবেন। তাঁর যাকে পছন্দ হবে— ।"

যামিনী উত্তেজিত হইয়া কহিল, "কখ্খনো না। আমার বাবা বিয়ে করবেন না। করব আমি।"

চন্দ্রকান্ত তথাপি মৌন হইয়া রহিলেন।

যামিনী পুনশ্চ কহিল, "তাঁদের মত করাবার ভার আমার। কিন্তু তাঁরা যদি সম্মতি দেন তাহলে বলুন আপনার আপত্তি করবার কিছু নেই।"

চন্দ্রকান্তের মুখ হইতে অস্ফুট স্বরে বাহির হইল, "আমার আর কিসের আপত্তি। নির্ম্মলার বিয়ে হবে সে তো ভাল কথা, সুখের কথা।"

৮

যামিনীর স্বভাবের গতিশীলতা এমন দ্রুত তাহাকে চালনা করে যে, সে যখন যাহা কামনা করে সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে যতক্ষণ না আপনার করায়ত্ত করিয়া তোলে ততক্ষণ এক নিমেষের জন্যও থামিতে পারে না। অনেক সময় এমনও হয় তাহার একাগ্র বাসনাটাই তাহার কাছে সর্ব্বব্যাপী হইয়া উঠে। যাহাকে পাইবার জন্য এত দুর্ম্মদ আকাঙ্ক্ষা সেই আসল বস্তুটিই তখন চেষ্টার উগ্রতায় কর্ম্মের জালে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিবার যো হয়।

নির্ম্মলার ঈষৎ-উদ্ভিন্ন যৌবনের উপর স্নিগ্ধতার, অপরিসীম শুভ্রতার সে কী অনির্ব্বচনীয় জ্যোতি আসিয়া পড়িয়াছিল। সে রূপ পুরুষের মনকে আচ্ছন্ন করে না, নেশায় মাতাল করে না, কিন্তু সমস্ত মন অধীর হইয়া উঠে ঐ শুভ্র অচঞ্চল মনের অন্তরালে কী আছে দেখিবার জন্য। হৃদয় লোভাতুর হইয়া উঠে ঐ অনাহত মনে প্রথম বীণার তারটি ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিতে, ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে প্রথম প্রেমের ভারাতুর ছায়া ঘনাইয়া তুলিতে।

যামিনী ক্ষিপ্রগতিতে সমস্ত ঠিক করিয়া আনিল। তাহার বড়দাদা নির্ম্মলাকে পূজার ছুটির পরে দেখিতে আসিলেন এবং পছন্দও করিয়া গেলেন। টাকার কথা তুলিতেই চন্দ্রকান্ত ছল ছল চক্ষে কহিলেন, "আমার মেয়েটি যদি সুখী হয়, তবে আমার যাহা কিছু আছে তাহাকে দিব।"

বিবাহের ব্যবসাদারী পণ কষাকষির অবশ্য ইহা রীতি নয়। কিন্তু চন্দ্রকান্ত যেমন স্বরে এবং যেমন বাষ্পার্দ্র চোখে কথা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার কথার আন্তরিকতা সম্বন্ধে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না। তাহার উপর তাঁহার পৈতৃক বাড়িটি তেতলা, বেশ বড়। আর নির্ম্মলা যখন যামিনীর দাদার সম্মুখে বসিয়া সেতার বাজাইল তখন অদূরে তাহার ভূতপূর্ব্ব ওস্তাদ বসিয়াছিলেন। তিনি মাথা নাড়িয়া দু-একটা বিজ্ঞতাসূচক কথা বলিলেন এবং ছাত্রীর বিস্তর সুখ্যাতি করিলেন। যামিনীর দাদা বুঝিলেন যিনি মেয়েকে বেথুন কলেজে পড়াইতেছেন এবং পয়সা খরচ করিয়া গান-বাজনা শিখাইয়াছেন তাঁর অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল। তা ছাড়া আজকালকার এ রীতিটাও তিনি জানিতেন, যেখানে কন্যাপক্ষের অবস্থা বেশ ভাল সেখানে সুস্পষ্ট ভাষায় দাবির পরিমাণ জানাইয়া দেওয়ার চেয়ে যদি বলা যায়, 'আপনার সাধ্যমত আপনি দিবেন। আপনাদেরই মেয়ে, তাহাকে যাহা দিতে চান সে আপনারই বিবেচনার উপর নির্ভর করে', তাহা হইলে ঢের ভাল ফল হয়।' অতএব তিনিও তাহাই করিলেন।

যামিনীর দাদা বিনোদবাবু পূজার ছুটিতে কলিকাতায় বাড়ি ভাড়া করিয়া সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন। মেয়ে দেখিয়া ফিরিয়া যাইবার পরের দিন যামিনী দ্বিতলের একটি শয়ন-কক্ষে ঢুকিয়া কহিল, "বৌদি, তারপরে দাদা কী বললেন ?"

বৌদি হাসি চাপিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া কহিলেন, "মন্দ নয়।"

যামিনীর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। বৌদি আড়চোখে একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "আর রাগ করতে হবে না। না গো তোমার দাদা তা বলেনি। বরঞ্চ বলছিল, 'মেয়েটি বেশ ভাল। ভায়া যখন আমার কাছে এসে বললে, ওই মেয়েকে ছাড়া সারা পৃথিবীতে সে আর কাউকে বিয়ে করবে না, তখন আমি মনে করেছিলুম ঘোরালো ক'রে কোথাও প্রেমে পড়ে গেছে বুঝি। কিন্তু মেয়েটিকে চোখে দেখার পরে বুঝতে পারলুম—না, এ মুখে এমন একটি শান্ত আভা আর লক্ষ্মীশ্রী আছে, গায়ে পড়ে প্রেম

করবার মেয়ে এ নয়।' কেমন ঠাকুরপো এইবারে খুশী তো?"

যামিনী কথা না বলিয়া নতমুখে ডিবেটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

"কিন্তু ভাই একটা কথা আছে।"

যামিনী উৎসুক ভাবে চাহিল।

"মা ব'লে দিয়েছেন আর সব দিকে যতই ভাল হোক ছ-সাত হাজার টাকার গয়না চাই। তার কমে কিছুতেই রাজী হ'তে পারবেন না। ঠিক এই কথাটাই ওঁদের সামনাসামনি বলতে তোমার দাদার কেমন সঙ্কোচ লাগল। আভাস দিয়েচেন। তুমি বরঞ্চ স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিয়ো।"

"এত গয়না পরবে কে?"

"তোমার বৌ।"

"তোমাদের যত গহনা আছে তার অর্দ্ধেকও কি প'র?"

"ওমা! তাহলে যে গয়নার ভারে নড়তে চড়তে পারব না। সে-সব সিন্দুকে তোলা আছে।"

"তাহলেই দেখ মেয়েদের যুক্তিশক্তি এত কম। যে-সব জিনিষ বারো মাস সিন্দুকে তোলা থাকে তাই নিয়ে এত জেদাজেদি। তারই উপর নির্ভর করছে জীবনমরণের ব্যাপার।"

"কেন?"

'ধর চন্দ্রকান্ত বাবু যদি অত টাকার গয়না না দিতে পারেন—"

"তাহলে তার মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে মা কিছুতেই রাজী হবেন না। কিন্তু কেন? শুনেছি ত যে তাঁর অবস্থা খুব ভাল।"

যামিনী তাড়াতাড়ি কহিল, "না না, সে কথা আমি বলছি নে। তিনি হয়ত দিতে পারবেন। কোন বিশেষ মেয়ের কথা আমি বলছি নে, কিন্তু মেয়েদের হাতে পড়ে মেয়েদেরই বিয়ের ব্যাপারটা কেমন নিষ্ঠুর অদ্ভুতগোছের হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণ ভাবে আমি সেই কথারই আলোচনা করছি।"

"মেয়েদের হাত কি?"

"কেন নিরানব্বইটা ক্ষেত্রে আমি তো দেখেছি বরের মায়ের দাবির পরিমাণই আর মিটতে চায় না। এত ভরি চাই, তত ভরি চাই, তার বিরাট ফর্দ্দটা মুখে মুখে দাখিল হয় অন্তঃপুর থেকেই।"

"কে জানে ভাই অত কথা। মূর্খ মেয়েমানুষ, তোমাদের মত কথায় কথায় তো আর তর্কের বান ডাকাতে পারি নে, কিন্তু সোজা কথাটা বেশ বুঝতে পারি। সেটা হচ্ছে এই যে, বিয়ে করতে তুমি পাগল হয়ে উঠেছ।"

"প্রায়।" যামিনী হাসিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

৯

সমস্ত ঠিকঠাক হইয়া যাইবার পরে যামিনীর মনটা যেন বসন্তবাতাসে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। আর কোনখানে কোন বাধা নাই। যতদূর দৃষ্টি যায় স্বচ্ছ বাধাহীন নীলাকাশ ব্যাপিয়া আনন্দের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। মনের আনন্দে সে বৌদিকে লইয়া থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখাইল। শিবপুরের বোটানিক্যাল্ গার্ডেন, বালির ব্রীজ, দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার দৃশ্য, এমন কি যাদুঘর চিড়িয়াখানাও বাদ দিল না।

আজ দুপুরবেলায় তাঁহাকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখাইয়া আনিবে স্থির করিয়া সে ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিল।

মোটরে চড়িয়া বৌদি স্মিতহাস্যে কহিলেন, "ঠাকুরপো যে দেখছি এবারে আমার উপর বড্ড সদয়। কলকাতায় যা কিছু দেখবার সমস্তই দেখালে। কিছুই প্রায় আর বাকী নেই।"

"যা দেখবার তাই এখন দেখনি।"

'কি, ওই ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল? তা ভাই যতই বল ভিকটোরিয়া মেমোরিয়েলের লোকে সুখ্যাতি করে বটে, কিন্তু—"

"কে বললে তোমাকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল? যা দেখনি তা এখনই দেখবে। অত ব্যস্ত কেন? তখন কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে আসল দেখাটাই ছিল বাকী।"

মোটর ততক্ষণে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটের কাছে দাঁড়াইয়াছে। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে তিনি নির্ম্মলাকে দেখিলেন। চন্দ্রকান্তের সঙ্গে সে আসিয়াছে। এইটুকু আয়োজন যামিনীর আগে হইতে করিয়া রাখা। বাড়ি ফিরিবার সময় বৌদি হাসিয়া কহিলেন, 'যা দেখবার তা তো দেখলুম। কিন্তু ভাই ঠাকুরপো, তোমার ভাবখানা

যেন একেবারে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। মাটিতে আর পা পড়ছে না।

যামিনী হাসিয়া চুপ করিল।

ইহারই দিন দুই পরে দাদা ও বৌদিকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে গিয়া ফিরিবার পথে ট্রামে আশুবাবুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। তিনি চন্দ্রকান্তবাবুর একজন বন্ধু, সান্ধ্য আড্ডাতে প্রায়ই হাজির থাকেন। তিনি যামিনীর সঙ্গে নির্ম্মলার বিবাহের কথা শুনিয়াছিলেন। পাত্রী-পক্ষকে যে কোন চেষ্টাই করিতে হয় নাই, যামিনী নিজে উদ্যোগী হইয়া সমস্ত করিয়াছে, বিবাহে পণ লাগিবে না, এসমস্ত কথাই তিনি জানিতেন। ইহাতে মনে তাঁহার একটু ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইয়াছিল। মেয়ে তো তাঁহারও আছে, তাহারাও বিবাহযোগ্যা, কিন্তু কই তাঁহার বেলায় তো ঠিক এতখানি সুবিধা যাচিয়া ধরা দেয় না। যামিনীকে দেখিয়া এধার-ওধার দু-পাঁচটা গল্পের পরে তিনি বলিলেন, "আর শুনেচ চন্দ্রের ব্যাপারটা ?"

"কী ?"

"সে তো বলতে গেলে অনেক কথা। এই যে হ্যারিসন রোডের মোড়েই আমার বাড়ি। চল না এক পেয়ালা চা খেয়ে আসবে। (হাতে রিষ্ট-ওয়াচের দিকে চাহিয়া) চারটে কুড়ি। তোমার চা খাওয়ার সময়ও বোধ হয় হ'ল। কোথায় গিয়েছিলে ? ..ও, দাদা বৌদি বুঝি পুজোর ছুটিতে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিলেন। আজ দেশে ফিরে গেলেন, তাই ষ্টেশনে রাখতে গেছিলে। তা বেশ ভাল। নাববে ?"

তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া যামিনী নামিয়া আশুবাবুর বৈঠকখানায় বসিল। ভৃত্য চা দিয়া গেল। তখন চা-রসের সহিত মিশাইয়া মিশাইয়া সুদীর্ঘ ভূমিকার জালে গাঁথিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "এই যে সেদিন চন্দ্র ফট ক'রে আমার কাছে হাজার তিনেক টাকা ধার চেয়ে বসলো। মেয়ের বিয়ে। আমি তো বলি লোকটার মাথায় ছিট আছে। ভিতরের কথা জানতে আমার কিছু বাকী নেই।"

যামিনী বাধা দিয়া পাংশুমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তাঁর অবস্থা কি ভাল নয় ?"

"কোথায় ভাল। সে ওই বাইরে থেকেই দেখতে। বললুম তো লোকটা ওই রকম অ্যাপার্টে-গোছের। যা সঙ্গতি ছিল কুলিয়ে-গুছিয়ে রেখে-ঢেকে চলতে পারলে তাতেই কি চলত না ? কিন্তু চাল বেশী। দেদার খরচ করবে। গেরস্তর ঘরে মেয়েকে টাকা খরচ ক'রে গান-বাজনা শেখান, কলেজে পড়ান, এ-সব চাল দেবারই বা দরকার কি ?"

যামিনী তাঁহার রসাইয়া-তোলা আলোচনার মাঝে আবার বাধা দিয়া কহিল, "আপনি টাকাটা তাঁকে ধার দিলেন ?"

"ক্ষেপেচ ! আমি কোথা পাব টাকা ? লোকে বাড়িয়ে বলে বটে বড়লোক, হেন তেন কত কি। কিন্তু লোকে কী না বলে, লোকের কথায় কান দিতে গেলে চলে না। আমার নিজের মেয়েও তো রয়েছে। তাদের বিয়ে দেবার কথাও ভাবতে হবে।"

"তাঁর কি টাকাকড়ি একেবারেই নেই ?"

"তবে তোমাকে খুলেই বলি ভিতরের কথাটা। কোম্পানীর কাগজগুলো তো সবই গেছে। হাজার দুই টাকার অবশিষ্ট ছিল। সে-টাকাটাও গত বছর সিমলা গিয়ে অর্দ্ধেক উড়িয়ে এসেছে। সংসার কি ক'রে চালায় জানিনে। শুনতে পাই ছেলেগুলো ট্যুশানি ক'রে পড়ার খরচ চালায়। পৈতৃক বাড়ি রয়েছে, কলকাতায় বাড়িভাড়া লাগে না এই যা রক্ষে। এই অবস্থা নিয়েও চালবাজী করতে ছাড়েন না। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বের করেও মেয়েকে কলেজে পড়ান চাই। আমি টাকা ধার দেব, বল কি বাবাজী! আমি বরঞ্চ পরামর্শ দিয়েছি, যেমন অবস্থা তেমনি চল। টাকা ধার ক'রে মেয়েকে গয়না দিতে হবে না। কেন তোমরা তো কোন পণ নিচ্ছ না। তোমার দাদা তো বলেই গেছেন, যেমন অবস্থা সাধ্যমত দেবেন। আমরাই ফাঁকে পড়ে গেলাম ভায়া। তোমাদের মত একটা পাত্রটাত্র দেখে দাও কষ্ট করে।"

যামিনী কিছু অভদ্রতা করিয়া আশুবাবুর কথার মাঝখানেই ঝড়ের বেগে সেখান হইতে চলিয়া গিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

তাহার চক্ষুপ্রান্ত সজল হইয়া আসিতেছিল। নির্ম্মলার মান-অপমানের জন্য এখন হইতেই সে যেন নিজেকে দায়ী মনে-করিতেছিল। ক্ষুব্ধ চিত্তে ভাবিতেছিল, লক্ষ্মীর পায়ের আলিম্পনরাগের জন্যও আবার চিন্তা করিতে হয়, ছুটিতে হয় ঝানু ব্যবসাদারের কাছে টাকা ধার করিতে! সেই রাত্রিতেই সে মনে মনে একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া লইল। সে

ছোট ছেলে বলিয়া মায়ের অতিশয় আদরের ছিল। মা যখন যাহা কিছু টাকা নিজে হইতে জমাইতেন, যামিনীর নামেই তাহা জমাইতেন। বছর আড়াই আগে এমনি তাহার নামে একটা পোষ্টাল সার্টিফিকেট কিনিয়াছিলেন। সেটা সুদে আসলে এখন প্রায় হাজার-দশেক দাঁড়াইয়াছে। টাকাটার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন বাহির করিয়া লইতে হইবে কিংবা আবার নূতন করিয়া জমা দিতে হইবে। কালই সে জননীর নিকট হইতে পত্র পাইয়াছে টাকাটা আবার আড়াই বছরের সর্ত্তে জমা দিতে। যামিনীর পিতা পশ্চিমের বিখ্যাত একজন উকীল। অত্যন্ত ধনবান। তাঁহার নিজের নামে জমান টাকা ছাড়াও তাঁহার স্ত্রীর হাতে দশ-পাঁচ হাজার টাকা এমন প্রায়ই থাকিত।

পরদিন সকালে উঠিয়াই যামিনী ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কে গেল এবং টাকাটা নূতন করিয়া জমা দিবার পরিবর্ত্তে উঠাইয়া লইয়া আসিল। উঠাইয়া লইয়া সারা সকাল ধরিয়া জহরলাল পান্নালালের দোকান, বেঙ্গল ষ্টোর্স এবং বড় বড় জুয়েলারির দোকানগুলায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। জিনিষ যা কিনিল তাহাতে একটা ট্যাক্সি বোঝাই হইয়া যায়।

ক্রমশঃ

মান্দ্রাজ শিল্প-প্রদর্শনী

গত মার্চ্চ মাসে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আর্ট-স্কুলের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। রঞ্জিত চিত্র, রেখাচিত্র, এবং মৃত্তিকা ও মৃত্তিকাবৎ পদার্থে গঠিত মূর্ত্তি, এই তিন প্রকারের সর্ব্বসমেত ২২৪টি চিত্র ও মূর্ত্তি প্রদর্শিত হয়। প্রদত্ত চিত্রগুলি হইতে বিদ্যালয়ে কিরূপ উচ্চাঙ্গের শিল্পানুশীলন-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার কিঞ্চিৎ ধারণা করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী এই বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল।

বর্ণ-বৈচিত্র্য ও অঙ্কন-পারিপাট্যে শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটরথন্ অঙ্কিত 'পৃথ্বীরাজ' চিত্রখানি সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটনারায়ণ মৃত্তিকা-ভাস্কর্য্যে যে 'রাসলীলা'র চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে এক নিপুণ রূপদক্ষ শিল্পীর তুলিকাপাতে লীলায়িত মাধুর্য্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণা রাওয়ের 'অভিসারিকা'য় ভাব-সম্পদ ও বর্ণ-মাধুর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার 'মানুষের মাথা' শীর্ষক চিত্রখানিও প্রশংসার যোগ্য। সৈয়দ হামেদের 'ভবিষ্যদ্বক্তা' চিত্রখানিতে মুসলমান ভাবধারা পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীযুক্ত এস. ভি. এস রামা রাওয়ের সম্পূর্ণ নূতন ধরণের দৃশ্য-চিত্র 'গোধূলির আলো'র কবিত্বসম্পদ অতুলনীয়।

পরবর্ষে মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের শিল্পপ্রদর্শনী যে অনুরূপ সাফল্য লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভবিষ্যদ্বক্তা

সৈয়দ হামিদ

অভিসারিকা

পি, ভি, কুপ্পারাও

মানুষের মাথা (উড্‌-কাট)

পি, ভি, কুপ্পারাও

গোধূলির আলো
এম, ভি, এস, রামারাও

পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তা
এম, ভেঙ্কটরথন্‌
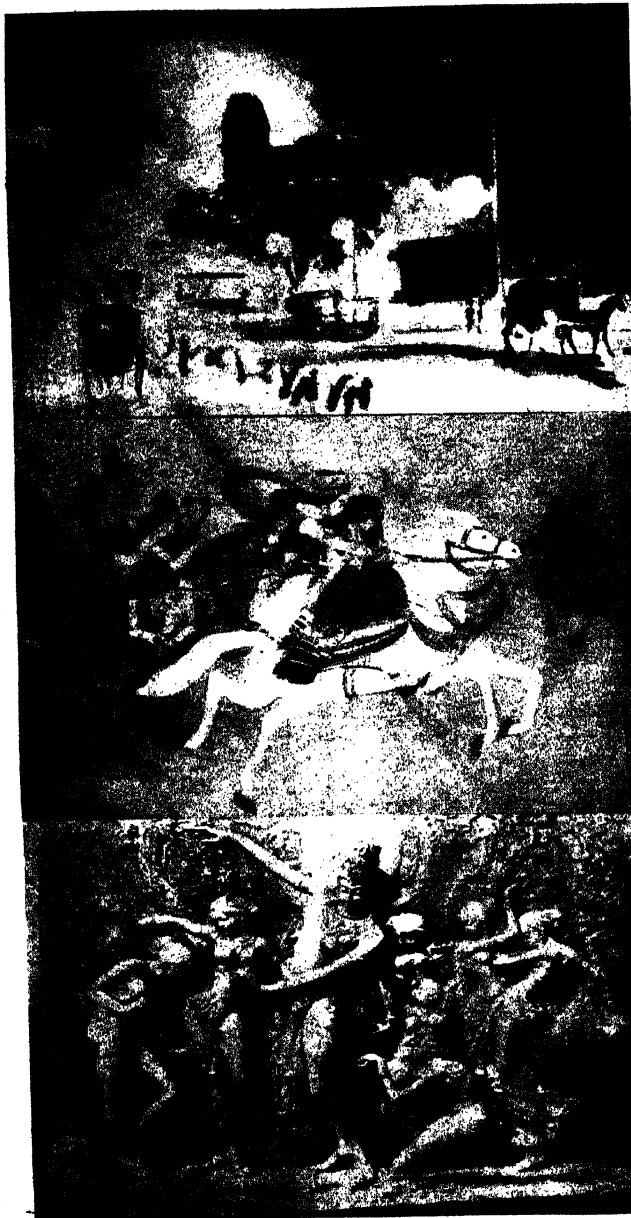
রাসলীলা
ভেঙ্কটনারায়ণ রাও

মার্টিন লুথার।
১৫৪০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি

চিত্রে মার্টিন লুথার—

খৃষ্টধর্ম্মের দুইটি প্রধান শাখা—রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট। প্রোটেস্টাণ্ট শাখার প্রবর্ত্তক মার্টিন লুথার (১৪৮৩—১৫৪৬)। লুথার জার্ম্মাণীর অধিবাসী। তিনি তথাকার হ্বিটেনবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ হইয়া এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন। খৃষ্টান-জগতের অধিনায়ক পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করার জন্য তাঁহার প্রচলিত মতবাদের নাম হইল প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম্ম। সে-সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশসমূহের রাজারাও ছিলেন প্রধানতঃ পোপের অনুবর্ত্তী। এই হেতু রাজপুরুষগণের হস্তে লুথারকে কম নির্যাতিত হইতে হয় নাই। তাঁহার জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাসম্বলিত কয়েকটি চিত্র এখানে দেওয়া হইল।

স্যাক্সনিতে মার্টিন লুথার ও পুলিস

পাঠশালায় মার্টিন লুথার

দীর্ঘলেজবিশিষ্ট মোরগ—

চিত্রে সুদীর্ঘ লেজ বিশিষ্ট একটি মোরগ দেখা যাইবে। জাপানের ওশিনো-মুরা নামক স্থানে এই মোরগ পাওয়া যায়। ইহার লেজ ছাব্বিশ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। মুরগীর কিন্তু এরকম লেজ থাকে না। যে মোরগের লেজ যত দীর্ঘ তাহার মূল্যও তত বেশী। দীর্ঘতম লেজবিশিষ্ট মোরগের মূল্য চার-পাঁচ হাজার টাকা!

দীর্ঘলেজবিশিষ্ট মোরগ

জাপানের আদর্শে উদ্যান-রচনা—

জাপানীরা সৌন্দর্য্যের পূজারী। তাহারা যে-সব জিনিষ তৈয়ার করে, তাহাদের নিপুণহস্তে তাহা সুন্দর হইয়া উঠে। ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, চারু ও কারু শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের নৈপুণ্য সকলেরই জানা। জাপানীরা ফুল ভালবাসে, তাই ইহার জন্মভূমি উদ্যান রচনাতেও তাহাদের অদ্ভুত কৃতিত্ব। উদ্যানে তরু-লতা কুঞ্জবন ত থাকিবেই, উপরন্তু স্থাপত্য ভাস্কর্য্য ও কারু শিল্পের নানা নিদর্শনও ইহাতে স্থান পাইয়া থাকে। এই সকল জিনিষের বর্ণ তরু-লতারই মত। এই-সব কারণে জাপানের উদ্যান বিদেশীর নিকট বড়ই সুন্দর লাগে। আবার বড় বড় উদ্যানের মত সেখানে ছোট ছোট উদ্যানও রচিত হইয়া থাকে। এই সকল উদ্যান যে আয়তনে ছোট তাহা নহে, বড় উদ্যানের গাছপালা যেরূপ বড়, ছোট উদ্যানের গাছপালাও সেই অনুপাতে ছোট হয়। শিল্পকলার [illegible] সেইরূপ ছোট করিয়া তৈরি। জাপানের উদ্যান-রচনা [illegible] বাস্তবিকই চমৎকার।
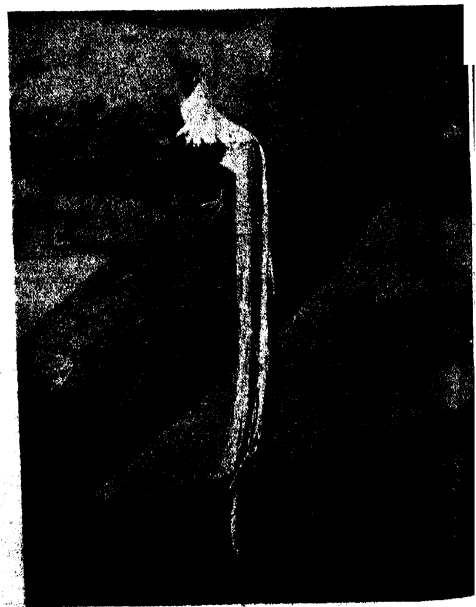
জার্ম্মানীর রাইনল্যাণ্ডে জাপানের আদর্শে রচিত উদ্যান

প্রতীচ্য প্রাচ্যের অনুকরণ করে ইহা শুনিতে অভিনব। কিন্তু জাপানের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা প্রতীচ্যকে হার মানাইয়াছে। ইদানীং প্রতীচ্যে জাপানের আদর্শে উদ্যান রচিত হইতেছে। জার্ম্মানীর রাইনল্যাণ্ডে ডক্টর ডুইস্‌বার্গ এইরূপ উদ্যান রচনা করিয়াছেন। তিনি সেখানকার একটি বৃহৎ কারখানার পরিচালক। তিনি জাপানে গমন করিয়া সেখানকার উদ্যান-রচনা-কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন। উদ্যানের তরু-লতা, যন্ত্র-বাড়ি, তথাগতের মূর্ত্তি ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের সংস্থান ঠিক যেন জাপান উদ্যানের মত।

আফ্রিকার হাউসা জাতি—

হাউসারা আফ্রিকার আদিম অধিবাসী। সুদানের পশ্চিমে নাইগেরিয়া প্রভৃতি প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গমাইল পরিমিত স্থান তাহাদের আবাসভূমি। হাউসারা মধ্যযুগে খুবই উন্নত ছিল। তাহারা দেশ-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহারা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিল। পরে ১৮১০ সনে মুসলমানদের অধীন হয়।

হাউসারা সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ। তাহারা কৃষ্ণকায়, একারণ অনেকে তাহাদিগকে কাফ্রী বলিয়া ভ্রম করে। বস্তুতঃ তাহারা কাফ্রী

হাউসা-আমীরদের রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ তোরণ

দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ হাউসা। হাউসারা দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় ফুট

নহে। প্রাচীন 'ফুলা' ও আরব জাতির সংমিশ্রণে ইহাদের উৎপত্তি। হাউসারা শক্তিতে ও বুদ্ধিমত্তায় কাফ্রীদের অপেক্ষা উন্নত। দেড় কি দুই মণ জিনিষ লইয়া তাহারা হামেশা চলাফেরা করে ও একদিনের পথ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। তাহারা পরিশ্রমী। মধ্য-আফ্রিকার উষ্ণতার মধ্যেও তাহাদের কার্য্যে বিরতি নাই। কৃষি ও শিল্পই তাহাদের জীবিকা। বস্ত্র-বয়নে ও বস্ত্র-রঞ্জনে এবং মাদুর, চাম্‌ড়ার দ্রব্য ও কাচ প্রস্তুতে তাহারা সুনিপুণ। লাগোস, টিউনিস, ট্রিপলি, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি স্থানে তাহাদিগকে এখনও ব্যবসা করিতে দেখা যায়।

হাউসাদের ভাষাও বেশ সমৃদ্ধ। আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যত ভাষা চলিত আছে তাহাদের মধ্যে হাউসা ভাষাতেই সর্ব্ব-প্রথম পুস্তক লিখিত হয়। এই ভাষার শব্দ-সংখ্যা দশ হাজার। দিনের বিভিন্ন অংশের আটটি নাম। এই শব্দের এক-তৃতীয়াংশ আরবী শব্দ হইতে উৎপন্ন। কবিতা ও রাষ্ট্রীয় বিষয়মূলক কয়েকখানি পুস্তকের খণ্ডাংশ পাওয়া গিয়াছে। আদিম অধিবাসীদের মধ্যে হাউসারা শিক্ষায়ও বেশ অগ্রসর। প্রতি গ্রামে একটি করিয়া পাঠশালা আছে। হাউসাদের এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী, এক-তৃতীয়াংশ মূর্ত্তিপূজক ও অবশিষ্ট লোকেরা একরূপ কোন ধর্ম্মই মানে না।

হাউসা ও কৃষ্ণসার মৃগ

হাউসারা দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান এবং নিয়ম মানিয়া চলে। তাহারা এখন ইংরেজের প্রভাবে আসিয়াছে। পুলিস ও সামরিক কার্য্যে তাহারা অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

শ্রীমতী পোলা নেগ্রী ও শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর—

ভারতীয় নৃত্যে উদয়শঙ্কর বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ভারতবর্ষে ও ইউরোপের নানা দেশে নৃত্য করিয়া তিনি জনসমাজের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। উদয়শঙ্কর এখন আমেরিকায় নানা প্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চে নৃত্যকলা দেখাইতেছেন। শ্রীমতী পোলা নেগ্রী চলচ্চিত্রে এক জন বিখ্যাত অভিনেত্রী। নিউইয়র্কে উদয়শঙ্করের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তথাকার সেণ্ট জেম্‌স্ রঙ্গমঞ্চে উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। উদয়শঙ্করের নৃত্য শেষ হইলে শ্রীমতী পোলা নেগ্রীর সহিত নৃত্য সম্বন্ধে তাঁহার আলাপ হয়। শ্রীমতী নেগ্রী ভারতবর্ষে আগমন করিবেন—উদয়শঙ্করের নিকট এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। উদয়শঙ্করের নৃত্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "ইহা বাস্তবিকই স্বর্গীয়।"

শ্রীমতী পোলা নেগ্রী ও শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর

মহিলা-সংবাদ

হরিদ্বারের গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যব্রতের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী চন্দ্রাবতী লখনপাল 'স্ত্রীয়োঁ কি স্থিতি' নামক পুস্তক লিখিয়া এলাহাবাদের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন হইতে পাঁচ শত টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। গত বৎসরে মহিলারা যে-সকল হিন্দী পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে এখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

শ্রীমতী চন্দ্রাবতী লখনপাল

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্তা বিমলা সান্যাল কাশী-আয়ুর্ব্বেদ-সম্মিলনীর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রী" উপাধি লাভ করেন। তিনি সেখানকার সরকারী হাসপাতাল ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্ব্বেদ-বিভাগে প্রায় তিন বৎসর কাল ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষা করেন। উদয়-পুরের মহারাণার পারিবারিক চিকিৎসক হিসাবে ও কাশীর আয়ুর্ব্বেদ হাসপাতালে মহিলা কবিরাজ রূপে কিছুকাল কার্য্য করিয়া শান্তিপুর অটলবিহারী মৈত্র দাতব্য আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয়ের ভার প্রাপ্ত হন। সম্প্রতি তিনি স্বাধীনভাবে কলিকাতায় চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি মহিলা ছাত্রীদের আয়ুর্ব্বেদ পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আমরা শ্রীযুক্তা বিমলা সান্যালের উন্নতি কামনা করি।

কাঠ-খোদাই শিল্প

বাংলা দেশে ললিতকলার নবজাগরণের সময় চিত্রাঙ্কন বিষয়ে অনেক নূতন এবং কিছু পুরাতন পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং সংস্কার আরম্ভ হয়। উড্-কাট (কাঠ-খোদাই) রীতিতে চিত্রাঙ্কন এক সময়ে জগদ্বিখ্যাত ছিল। জাপানী উড-কাটের সূক্ষ্ম রেখাপাত এবং বর্ণসংযোগ এখনও ললিতকলাক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও তাঁহার কৃতী ছাত্র শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই রীতির নূতন সংস্কার ও অভ্যাস বিষয়ে পথপ্রদর্শক। এই

রাজপুত-নারী
শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রকেশরী রায়

গুরুশিষ্যদ্বয়ের পরিচয় প্রবাসীর পাঠকদিগের নিকট দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

রমেন্দ্রবাবু কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট-স্কুলে এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিতেছেন। এই সংখ্যায় তাঁহার এক ছাত্র শ্রীমান নরেন্দ্রকেশরী রায়ের শিল্প-কৌশলের পরিচয় আমরা দিতেছি। শ্রীমান নরেন্দ্রের হস্তলেখে আলো-ছায়ার বিন্যাস এবং রেখাপাতের সৌন্দর্য্য বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। ভবিষ্যতে ইঁহার কার্য্য সমাদর পাইবে আশা করা যায়।

ক. চ.

"মত্তময়ূর" শৈব সন্ন্যাসী

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মালব ও মহারাষ্ট্র দেশে এক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় ছিল, যাহার নাম আজ লোকস্মৃতির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ঐ সম্প্রদায়ের নাম ছিল 'মত্তময়ূর"। নয় শত বৎসর পূর্ব্বে জব্বলপুর অঞ্চলের হৈহয়-বংশীয় রাজগণ ঐ সম্প্রদায়ের তিন-চার জন সন্ন্যাসীকে নিজ রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং উঁহাদের জন্য কয়েকটি বিশাল মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ মঠগুলির মধ্যে রেওয়া রাজ্যে দুইটি এবং জব্বলপুর জেলায় দুইটি এখনও বর্ত্তমান। বহু গ্রাম ও বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড ঐ সম্প্রদায়কে দেবোত্তররূপে দান করা হয় এবং ত্রিপুরী রাজ্যের হৈহয়-বংশের রাজত্ব কালের শেষ পর্য্যন্ত এই সন্ন্যাসীদিগের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল।

ঐ মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের নামের উল্লেখ সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণা-পথের শিলাহার-বংশীয় রাজা রট্টরাজের তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি জেলার খারেপটন গ্রামে প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে চারটি তাম্রপত্র পাওয়া যায়। ঐ পত্রগুলির পাঠোদ্ধারে জানা যায় যে, ৯৩০ শকাব্দার জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমার দিন শিলাহার রাজপুত বংশের মাণ্ডলিক রট্টরাজ, মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের কর্করোগী শাখার ব্যয়-সংস্থানের জন্য তিনটি গ্রাম দান করেন। ঐ দিন খ্রীষ্টীয় ১০০৮ সালের ২২শে মে। মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের পৌরাণিক উৎপত্তি কাহিনীতে কথিত আছে, যে. ভগবান শিব কৈলাসপর্ব্বতে আপন গণ-পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। সেই সময় কার্ত্তিকেয়ের বাহন ময়ূর যদি কখনও প্রসন্ন হইয়া কেকা রব করিত তখন ঐ গণসমষ্টিমধ্যে কয়েক জন মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন। কেকা রবে দুইটি মাত্র স্বর আছে—ষড়জ ও কোমল ঋষভ। ঐ গণদল কেবল মাত্র ঐ দুইটি আশ্রয় করিয়া নৃত্য করিতেন, যদিও নৃত্যকলা অনুসারে উহা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কথিত আছে যে, ভগবান শিব তাঁহার অনুচরদিগের ঐ নৃত্যে প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে বর দান করেন—"তোমরা পৃথিবীতে যাও এবং সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া মত্তময়ূর নামে প্রসিদ্ধ হও। অষ্টবিংশতি শিবতত্ত্ব মধ্যে তোমাদের গণনা হইবে।" কথিত আছে যে, ঐ শিব-গণই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

কোন সময়ে মত্তময়ূর সন্ন্যাসী সম্প্রদায় দক্ষিণ হইতে মালব দেশে আগমন করেন। তাহার অন্তর্গত গোয়ালিয়রে উপেন্দ্রপুর ও রাণোড় নামক দুইটি স্থানে ইহাদের বড় বড় মঠ বিদ্যমান আছে। রাণোড় মঠের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইহাদের গুরুপরম্পরা ইতিহাস পরে পরে লিখিত হইত। মালবের মত্তময়ূর সম্প্রদায়ে কদম্ব-গুহাধিবাসী নামক মোহন্তই সর্ব্বপ্রথমে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হন। উঁহার পর শঙ্খমঠাধিপতি এবং তাঁহার পর তিরম্বি-পাল রাণোড় মঠের মোহন্ত পদ পাইয়াছিলেন। জব্বলপুরের চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরের শিলালেখ অনুসারে "তিরম্বি" দ্বাদশভুজা দুর্গা বা মহিষমর্দ্দিনীর নাম। তিরম্বিপালের শিষ্য আমর্দ্দক তীর্থনাথ এবং তাঁহার শিষ্য পুরন্দর ছিলেন। মালবরাজ অবন্তিবর্ম্মা শৈবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের জন্য পুরন্দরকে মালব দেশে আনয়ন করেন। পুরন্দরের নিকট দীক্ষার পর অবন্তিবর্ম্মা উপেন্দ্রপুরে মঠ স্থাপনা করেন। পুরন্দরের শিষ্য কবচশিব এবং তাঁহার শিষ্য সদাশিব ছিলেন। সদাশিবের শিষ্য হৃদয়েশের শিষ্য ব্যোমশিবের সময়ে রাণোড় বা রণপত্র-পুরের শিলালিপি খোদিত হয়।

পুরন্দরের অন্য শিষ্য চূড়াশিব (বা শিখাশিব) হৈহয়রাজ চেদিচন্দ্রের (বা দ্বিতীয় যুবরাজদেব) নিমন্ত্রণে চেদিরাজ্যে আসেন। শিখাশিব নিজে গোলকী (বা গুর্গকি) মঠে আসীন হইয়া স্বীয় শিষ্য হৃদয়শিবকে রাজা লক্ষ্মণরাজপ্রদত্ত বিলহরীর মঠে প্রতিষ্ঠিত করেন।

নর্ম্মদা-জলপ্রপাততটস্থ বৈদ্যনাথ মহাদেবের মন্দির ও মঠ এই সন্ন্যাসীদিগের অধিকারে ছিল। শিখাশিবের অন্য শিষ্য প্রভাবশিবের গুরুপরম্পরায় গোলকী ও বৈদ্যনাথ

যুবরাজদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত শিবমন্দিরের তোরণদ্বার। এখন ইহা গুর্গী হইতে আনিয়া রেওয়ার রাজপ্রাসাদের সম্মুখে রক্ষিত হইয়াছে।

এই দুই মঠ লাভ হয়। ইহার শিষ্যের শিষ্য প্রবোধশিব প্রাচীন হৈহয়-রাজ্যে তিনটি বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত মঠ স্থাপন করেন। ইহার মধ্যে রেওয়া-রাজ্যের চন্দ্রেহীর মঠ সর্ব্ব-পুরাতন। রেওয়া নগরের উনিশ মাইল দক্ষিণে শোন-নদের তটে ভ্রমরশৈল পর্ব্বতের নিম্নে অতি মনোরম স্থানে এই মঠ ও শিবমন্দির বিদ্যমান। রাণোড়ের মঠের ন্যায় চন্দ্রেহীর

মঠও দ্বিতল। ইহার সম্মুখে বারোটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত একটি বারাণ্ডা আছে। বারাণ্ডার সম্মুখে প্রস্তর-নির্ম্মিত লম্বা চত্বর আছে যাহা সন্ন্যাসীদিগের বসিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। বারাণ্ডার পিছনের দেওয়ালে মোহন্ত প্রবোধ-শিবের শিলালিপিতে জানা যায় যে, তিনি কলচুরি চেদি ৭২৪ সংবতে গুরু প্রশান্তশিব নির্ম্মিত শিবমন্দিরের নিকট এই প্রস্তরের মঠ নির্ম্মাণ করেন। বারাণ্ডা হইতে এক প্রবেশপথ ভিতরে যায় এবং উহার শেষে এক অঙ্গন আছে। এই অঙ্গনের চারিধারে বারাণ্ডা এবং ঐ বারাণ্ডায় স্থিত ১২-১৪টি দ্বার মন্দিরের বিভিন্ন কক্ষে যাইবার পথ। ঐ কক্ষগুলি দুই প্রকার, প্রথম দেবগৃহ বা গুরুগৃহ, দ্বিতীয় বাসগৃহ। প্রথম শ্রেণীর কক্ষের দ্বারের উপরের চৌকাঠে এক-একটি বা তিন-তিনটি করিয়া দেবমূর্ত্তি আছে, সন্ন্যাসী-বাসকক্ষের চৌকাঠে ঐরূপ কোনও মূর্ত্তি নাই। গুরুগৃহের চৌকাঠে জটাজুট কৌপীনধারী গুরুদেবের মূর্ত্তি আছে। দেবগৃহের চৌকাঠের মূর্ত্তির মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণপতি, সূর্য্য, রুদ্র, বিরূপাক্ষ, নটেশ ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি দেখা যায়, তবে সকল মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায় না।

যুবরাজদেবের রাজত্বকালের হরগৌরীর-মূর্ত্তি। উচ্চতা ১২ ফুট

অঙ্গনের দক্ষিণ পার্শ্বে এক বিরাট কক্ষে চারটি ছোট ছোট সমাধিগৃহ আছে। ঐগুলিতে একটি করিয়া দ্বার আছে, কিন্তু জানালা বা অন্য পথ নাই।

মঠের বর্ত্তমান অবস্থায় বুঝা যায় না যে, দ্বিতলে যাইবার পথ কি ছিল। দ্বিতলে দুইটি প্রশস্ত কক্ষের চিহ্ন আছে এবং মনে হয় ঐ দুইটি শিক্ষালয় ছিল। কারণ দেবগৃহ বা গুরুগৃহের উপরের তলে সন্ন্যাসীদের শয়ন-ভোজন নিষিদ্ধ এবং আয়তন পরিমাপেও ঐ দুইটি কক্ষ বিশাল। সুতরাং চন্দ্রেহী মঠের দ্বিতলের ঐ কক্ষগুলি ছাত্রদের শিক্ষাগৃহ রূপেই নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

মিসহরি গ্রামে লক্ষ্মণসাগরের তীরে প্রশান্তশিব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত শিবমন্দির (খৃঃ সন ৯৭১)
এখন ইহা 'কামকন্দলা বটীর মন্দির' নামে খ্যাত

সোম-নদীর তটবর্ত্তী চন্দ্রেহী গ্রামে শৈবাচার্য্য প্রশান্তশিব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মত্তময়ূর-সম্প্রদায়ের মঠ। (কলচুরি চেদি সং ৭২৪)

মঠের সম্মুখে এক শিবালয় আছে। ঐরূপ শিবালয় খুব অল্পই দেখা যায়, যেহেতু ইহা গোলাকার এবং ইহার শিখরও গোলাকৃতি। কিছুদিন পূর্ব্বে (প্রায় পঁচিশ বৎসর) কানপুর ও ফতেপুর জেলায় ঐ প্রকার দুইটি মন্দির আবিষ্কৃত হয়, সেগুলি ইটের তৈয়ারি এবং তাহাদের নির্ম্মাণের সময় এখনও অনির্দ্দিষ্ট। এগুলির আবিষ্কারের প্রায় দশ-বার বৎসর পরে আমি রেওয়া-রাজ্যের গুর্গী মঠের নিকট ঐরূপ এক মন্দির আবিষ্কার করি। গুর্গী মঠের শিলালিপিতে ঐ মন্দিরের বিস্তৃত বিবরণ আছে। গুর্গী ও চন্দ্রেহীর শিলালেখের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ঐ প্রকার মন্দিরনির্ম্মাণ মত্তময়ূর সম্প্রদায়ই সর্ব্বপ্রথম করেন। নিজের মঠের সম্পর্কে চন্দ্রেহীর শিলালিপিতে প্রবোধশিব বলিয়াছেন, "আমি আমার গুরুকৃত সুরাগারের (মন্দির) সম্মুখে এক মঠ নির্ম্মাণ, সিন্ধু নামক পুষ্করিণী খনন এবং প্রশান্তশিব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক কূপের সংস্কার করাইয়াছি।

রেওয়া নগরের ছয়ক্রোশ পূর্ব্বদিকে, গুর্গীতে ত্রিপুরী রাজ্যের মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের এক বিশাল 'আখড়া' ছিল। গুর্গীর সহস্র পুষ্করিণী ও জলাশয় উহার প্রাচীন কালের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক। শতবর্ষ পূর্ব্বে এইখানে ছোট একটি পাহাড়ের উপর অতি আশ্চর্য্যজনক এক তোরণ ছিল। রেওয়া-রাজ্যের বঘেল-বংশীয় রাজগণ সেই তোরণ স্বীয় নগরে লইয়া গিয়া প্রাসাদদ্বাররূপে স্থাপিত করেন। তোরণ লইবার সময় গুর্গীর ঐ পাহাড়ে একটি শিলালেখও পাওয়া যায় এবং ঐ তোরণের সঙ্গে উহাও রেওয়া নগরে আনীত হয়। এখন উহা রাজপ্রাসাদের দরবারগৃহের নীচের দেওয়ালে সংলগ্ন আছে। উহাতে জানা যায় যে, পুরন্দরের প্রশিষ্য প্রভাবশিব হৈহয়-বংশের মহারাজাধিরাজ মুগ্ধতুঙ্গের পুত্র দ্বিতীয় যুবরাজদেবের নিমন্ত্রণে হৈহয়-রাজ্যে গমন করেন ও মোহন্ত-পদ গ্রহণ করেন। উঁহার শিষ্য প্রশান্তশিব যুবরাজদেব নির্ম্মিত কৈলাসশৃঙ্গোপম আকাশস্পর্শী মন্দিরের উত্তরভাগে অন্য এক সুমেরুশৃঙ্গোপম মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উমা, শিব, দুর্গা, ষড়ানন (কার্ত্তিকেয়) ও গণপতির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গুর্গীর পাহাড়ে দুর্গার দুটি অতি বৃহৎ মূর্ত্তি এখনও রহিয়াছে, কিন্তু কার্ত্তিকেয় বা গণপতির মূর্ত্তিগুলির কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। গুর্গীর শিলালেখে ইহা লিখিত আছে যে, প্রভাবশিব প্রায়ই তীর্থবাস করিতেন এবং বহুবার কাশীতে যাইয়া শিবপূজা করিতেন।

শিলালেখের মধ্যের অংশ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় পাঠোদ্ধার অসম্ভব। শেষের অংশে প্রথম যুবরাজদেবের যুদ্ধযাত্রা এবং মত্তময়ূর সন্ন্যাসীদিগকে গ্রামদানের বিবরণ খোদিত আছে।

গুর্গীর ঐ পাহাড়ের আধুনিক নাম গুর্গজ। ইহার চারিধারে পুরাতন মন্দির ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। রেওয়া-রাজ্যের বঘেল-বংশীয় রাজগণ যখন বাঁধোড়গড়ের পুরাতন কেল্লা ছাড়িয়া রেওয়া নগর প্রতিষ্ঠা করেন তখন ঐ সকল প্রাচীন মঠ ও মন্দিরের মালমশলা দ্বারাই নগরের অর্দ্ধেক নির্ম্মিত হয়। ঐ নগরের পুরাতন গৃহমাত্রেই গুর্গীর কারুকার্য্যখচিত প্রস্তর আজও দেখা যায়। গুর্গীর মত্তময়ূর মঠের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর ছিল; সেই প্রাচীরে প্রায় দুই তিন মাইল ব্যাপী অংশ আজও বর্ত্তমান। প্রাচীরের পাশে চড়াই উৎরাই দেখিলে মনে হয় যে, প্রাচীরের পরে প্রশস্ত পরিখা ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের মঠ দুর্গের ধরণে নির্ম্মিত হইত। ষাট বৎসর পূর্ব্বে স্যর আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ঐ প্রাচীরের ভিতরের ভূমিখণ্ডে দুই-তিনটি মন্দিরের ভিত্তি দেখিয়াছিলেন, কিন্তু পরে রেওয়া-রাজ্যের লোক তাহাও উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। গুর্গজ টিলার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে এক প্রাচীন বিশাল জলাশয়ের তটে চন্দ্রেহীর মন্দিরের ন্যায় একটি মন্দির আছে, কিন্তু তাহার শিখর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই মন্দিরটির গর্ভগৃহও গোলাকার এবং ইহার সম্মুখে আটটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত মণ্ডপ আছে।

মত্তময়ূর সম্প্রদায় মন্দিরনির্ম্মাণের যে রীতি প্রচলন করেন তাহার সহিত চন্দেল (বুন্দেলখণ্ডি) এবং পরমার বা মালবীয় মন্দিরনির্ম্মাণ-পদ্ধতিতে অনেক প্রভেদ আছে। চন্দেল-মন্দিরের গর্ভাগারের সম্মুখে একটি বৃহৎ মণ্ডপ এবং গর্ভাগারের অন্য তিন পার্শ্বে ছোট ছোট "অর্দ্ধমণ্ডপ" নির্ম্মিত হইত। চন্দেল-মন্দিরমণ্ডপের একটি দ্বার থাকে এবং উহার সম্মুখে একটি অর্দ্ধমণ্ডপ থাকে। গর্ভগৃহের উপর উচ্চতম শিখর (চূড়া) নির্ম্মিত হইত, প্রধান মণ্ডপের চূড়া উহা অপেক্ষা নীচু এবং চারটি অর্দ্ধমণ্ডপের ছাদ সর্ব্বাপেক্ষা নীচু হইত।

চন্দেল এবং মালবীয় রীতির প্রভেদ এই যে, মালবীয় মন্দিরের গর্ভগৃহের তিন পার্শ্বে অর্দ্ধমণ্ডপ স্থাপিত হয় না এবং

লক্ষ্মণসাগর (খৃঃ সন ৯৫০)
কাটনীর নিকটবর্ত্তী বিলহরি গ্রামে রাজা কর্ণদেব দাহরিয়ার প্রপিতামহ
রাজা লক্ষ্মণ রাও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

মণ্ডপ হইতে গর্ভগৃহ প্রদক্ষিণা-পথও থাকে না। মালবীয় মণ্ডপের তিনদিকে দ্বারপথ থাকে এবং প্রধান মণ্ডপের সম্মুখে আট, বারো অথবা ষোলটি স্তম্ভযুক্ত, চতুর্দ্দিক উন্মুক্ত,ছোট মণ্ডপ থাকে। মালবরাজ পরমার-বংশীয় অবনীজনাশ্রয় কবি-বল্লভ ভোজদেব মন্দিরনির্ম্মাণের এই রীতি প্রবর্ত্তন করেন এবং এই পদ্ধতিতে নির্ম্মিত মন্দির নর্ম্মদা-নদীতটে হোলকর-রাজ্যের অন্তর্গত নেমাওর নগরে এবং রামপুরা-ভানপুরা জেলার অর্থূনা মৌজায় আছে। নাসিক নগরের চার ক্রোশ পশ্চিমে সিন্নার গ্রামের মন্দির, অহমদনগর জেলার রতনবাড়ি গ্রামের মন্দির এবং খান্দেশ অঞ্চলের বহু মন্দির এই মালবীয় প্রথায় নির্ম্মিত।

মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের পদ্ধতিতে নির্ম্মিত মন্দিরে প্রধান
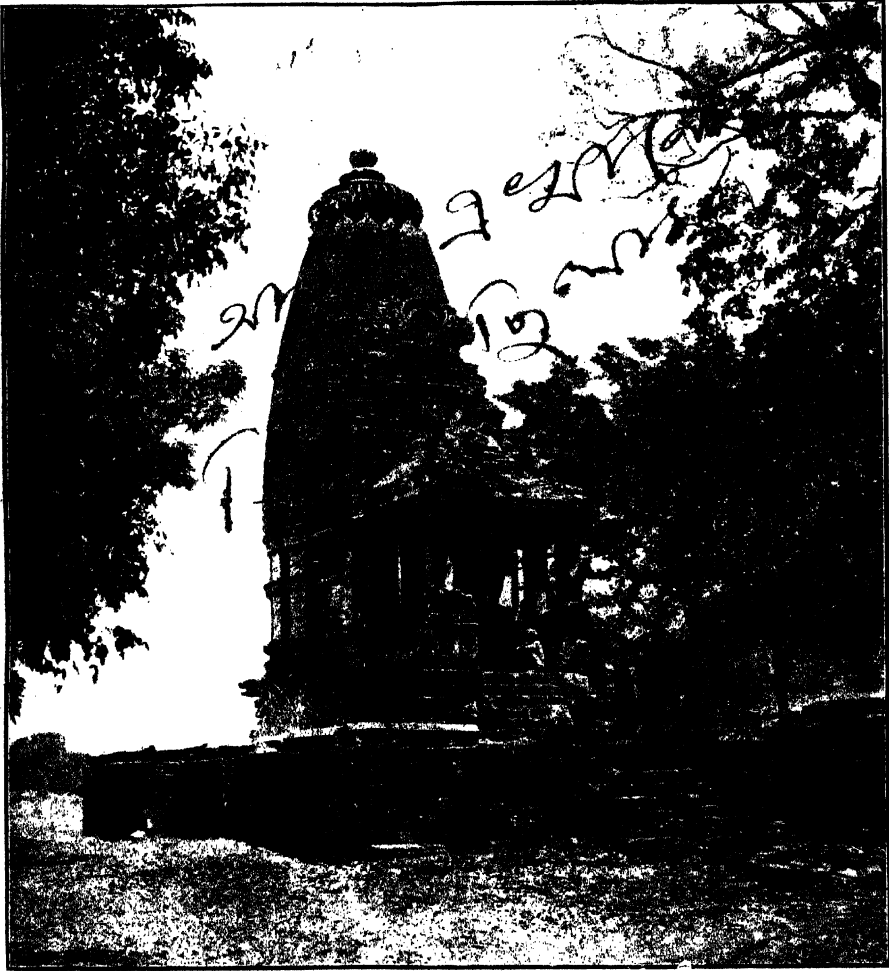
চন্দ্রেহী গ্রামে শোন নদীর তটবর্ত্তী চেদি-পদ্ধতিতে নির্ম্মিত প্রবোধশিবের মন্দির (কলচুরি চেদি সংবৎ ৬৯৫)

মণ্ডপ বা অর্দ্ধমণ্ডপ জাতীয় কিছুই থাকে না। চন্দ্রেহী এবং গুর্গীর মন্দিরের সম্মুখে এক একটি করিয়া উন্মুক্ত বারাণ্ডা আছে। চন্দ্রেহীর বারাণ্ডা অটুট অবস্থায় আছে, ইহাতে কলচুরি চেদি ৭০০ (সন ৯৪২) সংবতের এক লেখ আছে। ঐ দিন মকরধ্বজ নামে এক যোগী মন্দির দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ঐ বারাণ্ডায় উপবেশনের জন্য উচ্চপ্রস্তরাসন (বেঞ্চ) বর্ত্তমান আছে। কানপুর এবং ফতেপুর জেলায় পারৌলী তিন্দুলী এবং বহুয়ায় এই প্রকার গোল মন্দির আছে। পারৌলী গ্রামের মন্দির ইটের তৈরি, কিন্তু ইহার এক অংশে শিখর হইতে ভিত্তি পর্য্যন্ত ধ্বংস হইয়া যাওয়ায়

ইহার [illegible] পার্শ্বে দ্বার ছিল, বারাণ্ডা ছিল কি-না নির্দ্ধারণ ক[illegible] অসম্ভব। ফতেপুর জেলার তিন্দুলী গ্রামের ঐরূপ মন্দিরে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ইহার সম্মুখের বারাণ্ডা এক শত বর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়। ঐ জেলার বহুয়া ও কুকারী গ্রামে ঐ প্রকার চারটি মন্দির আছে। তন্মধ্যে একটিতে এখনও পূজা হয়। যুক্তপ্রদেশের এই সব মন্দিরে প্রাচীন পদ্ধতির বারাণ্ডা দেখিতে পাওয়া যায় না। পারৌলী, তিন্দুলী, বহুয়া ও কুকারীর মন্দির কোন্ সময়কার, আজ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু চন্দ্রেহী ও গুর্গীর মন্দিরের সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় যে, এই সকল মন্দিরও খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত। ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে, মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের শৈব সন্ন্যাসিগণ এরূপ মন্দির-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি যুক্তপ্রদেশেও প্রচলিত করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী হৈহয়-বংশীয় মহারাজাধিরাজ কর্ণদেব (খৃঃ সন ১০৪১-৭) কান্যকুব্জ জয় করিয়া অন্তরাজ-পত্তল বা অন্তর্ব্বেদ অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অধিকার করিয়াছিলেন, ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কর্ণদেবের পুত্র যশঃকর্ণদেব অন্তর্ব্বেদের অন্তর্গত করণ্ড গ্রাম নিজ গুরু শৈব মহাযোগী রুদ্রশিবকে দান করিয়াছিলেন, কিন্তু গাহড়বাল-বংশীয় কনৌজরাজ গোবিন্দচন্দ্র মত্তময়ূর-যোগীদিগের নিকট হইতে এই গ্রাম কাড়িয়া লইয়া ঠক্কুর বশিষ্ঠ শর্ম্মাকে (বিঃ সংবৎ ১১৭৭) দান করেন।

জব্বলপুর শহর হইতে তের মাইল দক্ষিণে নর্ম্মদার তটবর্ত্তী ভেড়াঘাট গ্রামে একটি প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া যায়, কিন্তু সেই শিলালিপি এখন যুক্ত-রাজ-আমেরিকার 'নিউ হাভেনে' সুরক্ষিত। এই শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, কর্ণদেবের পৌত্র জয়কর্ণদেব মেবারের গুহিল-বংশীয় বিজয়সিংহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। জয়কর্ণদেবের মৃত্যুর পর অহ্লনদেবী কলচুরি চেদি ৯০৭ সংবৎসরে বৈদ্যনাথ নামক মহাদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের খরচ চালাইবার জন্য রাণী অহ্লনদেবী জাউলীপত্তলাতে নামউণ্ডী গ্রাম এবং নর্ম্মদার দক্ষিণ তটে মকরপাটক গ্রাম দান করেন। গুর্জ্জর-দেশীয় পাশুপতাচার্য্য শৈব সন্ন্যাসী রুদ্রশিবকে এই দুইটি গ্রামের কর সংগ্রহ করিবার ভার অর্পণ করা হয়। ইহা হইতে মনে হয় যে, যশঃকর্ণদেবের গুরু রুদ্রশিব খৃঃ ১১২০ সন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কারণ, খৃঃ ১১২০ সনে কনৌজরাজ গোবিন্দচন্দ্র রুদ্রশিবের উক্ত দেবোত্তর ভূমি করণ্ড গ্রাম ছিনাইয়া লইয়া অন্য কাহাকেও

গুর্গীমসানের গোল শিবমন্দির

দিয়াছিলেন। অহ্লনদেবীর পৌত্র হৈহয়-বংশীয় মহারাজাধিরাজ বিজয়সিংহের রাজত্বকালে শৈবাচার্য্য বিদ্যাদেব রাজগুরু ছিলেন। বিজয়সিংহের দেহাবসান হইলে মত্তময়ূর সন্ন্যাসিগণ দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করেন। তেলিঙ্গানাতে কাকতীয়-বংশীয় রাজন্যবর্গের রাজধানী বরঙ্গল এবং একশিলা নগরীতে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে মত্তময়ূর সন্ন্যাসী বিশ্বেশ্বরশম্ভু কাকতীয়-রাজ গণপতি এবং চেদি মালব ও চোল-রাজ্যের রাজগুরু ছিলেন। খৃঃ ১২৬১ সনে কাকতীয়-বংশীয়া মহারাণী রুদ্রাম্মা উক্ত বিশ্বেশ্বর শম্ভুকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে কতকগুলি গ্রাম প্রদান করেন। উক্ত শিলালিপি অনুসারে বিশ্বেশ্বর শম্ভু গৌড়দেশীয় রাঢ়া মণ্ডলের পূর্ব্বগ্রামে বাস করিতেন। জব্বলপুর জেলার ভেড়াঘাট ও বিলহরি এলাকায় মত্তময়ূর সন্ন্যাসীদের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের শৈব সন্ন্যাসী গূঢ় শিবতত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। চন্দ্রেহী ও গুর্গীর শিলালিপি অনুসারে শৈবাচার্য্য প্রশান্তশিব কাশীতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। ইহা

কেবল কবির অতিশয়োক্তি নহে, ইহার কিছু-কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়। খৃঃ ১৯২০ সনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় ত্রিবাঙ্কুর হইতে ঈশানশিব-গুরুদেবপদ্ধতি নামক গ্রন্থ (যাহার দ্বিতীয় নাম তন্ত্রপদ্ধতি) প্রকাশ করেন। 'তন্ত্রপদ্ধতি' চারি ভাগে বিভক্ত—'সামান্যপাদ' 'মন্ত্রপাদ', 'ক্রিয়াপাদ' ও 'যোগপাদ'। এই গ্রন্থে ঈশানশিব 'বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্র' 'গৌতমসূত্র' ভোজরাজকৃত তন্ত্রসার টীকা এবং মত্তময়ুর সন্ন্যাসী ব্রহ্মশম্ভু রচিত শিবাগমদীপিকার উল্লেখ করা হইয়াছে। ভোজরাজের উল্লেখ থাকাতে মনে হয় যে, তিনি মালবরাজ ১ম ভোজরাজের পরবর্ত্তী [illegible] খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পর তাঁহার জন্ম হয় [illegible] শিব প্রণীত তন্ত্রপদ্ধতি আগমশাস্ত্রে স্বনামবিখ্যাত গ্রন্থ। বর্ত্তমানে তান্ত্রিক কর্ম্মকাণ্ডের কোন ক্রিয়াই তন্ত্রপদ্ধতির সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না।

ভারতবর্ষে এখনও শৈব বৈষ্ণবাদি অনেক প্রকার সন্ন্যাসী আছেন, কিন্তু অতি বিদ্বান্ ও প্রভুত শক্তিশালী মত্তময়ুর সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের চিহ্ন—মাত্র দুই-একটি প্রস্তরখণ্ড ও প্রাচীন গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোথাও নাই।
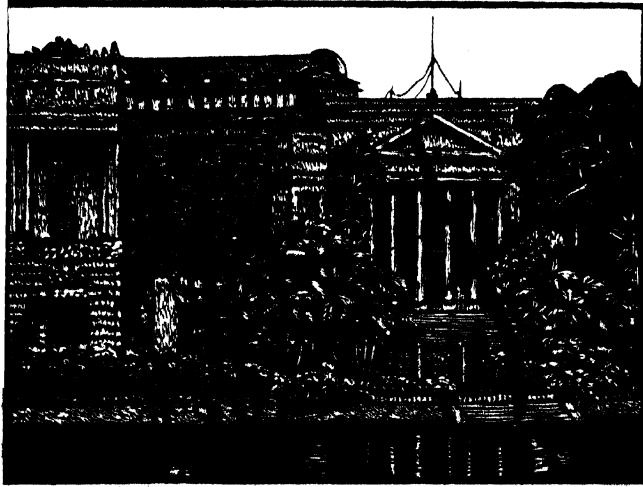
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রকেশরী রায়

মেঘদূত

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

এ কাহিনীটি বোধ হয় নিতান্তই কবি-কল্পনা,—এর সংজ্ঞা দেখিয়া গোড়াতেই এইরূপ একটা ভুল ধারণা আসিয়া পড়িতে পারে; তাই বলিয়া রাখি—এর যক্ষরাজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র শ্রীমান্ অভয়পদ, যক্ষবধূ, শ্রীমতী অণিমা রায় এবং এর মেঘদূত—থাক্, আপাতত একটু অন্তরালেই থাকুন।

অভয়পদর বৈমাত্র ভাই শ্যামাপদর বয়স চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি হইবে, অর্থাৎ তিনি তাহার চেয়ে ন্যূনকল্পে পঁচিশ বৎসরের বড়। বড্ড রাশভারী পুরুষ। পিতা অবশ্য আরও ঢের বড় ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন বড় ঢিলাঢালা, অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণ মানুষটি। তাঁহার বর্ত্তমানে দাদার কড়া শাসনটাকে একটু পাশ কাটাইয়া আসিতে হইত বলিয়া অনেকটা বাঁচোয়া ছিল,—মানে, তবু কিছু স্বাধীনতা পাওয়া যাইত; এখন তাঁহার মৃত্যুতে সেটুকুও লোপ পাইতে বসিয়াছে।

শ্যামাপদ বলেন—সংসারটা পরীক্ষাগার, হাসিঠাট্টার জায়গা নয়। তাই, সবার হাসিঠাট্টার পথে কড়া চোখের পাহারা বসাইয়া তিনি নিজের অধীনের জীবগুলিকে পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত করিয়া তুলিতে গম্ভীর ভাবে মোতায়েন হইয়া গেছেন। মন লইয়াই আসল কথা, কিন্তু বিপদ এই, সে-মনের গূঢ়তত্ত্বগুলি খোদ মানুষের নিকট হইতে সব সময় ভাল করিয়া আদায় করা যায় না। তাহার কারণ, হয় মানুষকে সব সময় ইচ্ছানুরূপ অবস্থায় ফেলা যায় না, না হয়, ফেলিতে পারিলেও, আত্মগোপনশীল মানুষের চতুরালি ছিন্ন করিয়া তত্ত্বগুলি উদ্ধার করাও সময় সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই গুরু সমস্যা সমাধানের জন্য শ্যামাপদ বাড়ির একধারে নিরিবিলি দেখিয়া একটি ল্যাবরেটারী অর্থাৎ বীক্ষণাগার তৈয়ারী করিয়াছেন। সেখানে ব্যাং, টিকটিকি, গিনিপিগ, খরগোস, বিলাতী ইঁদুর প্রভৃতি যে-সব প্রাণীর সঙ্গে মানুষের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাদের খাঁচাবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের প্রয়োজনীয় অবস্থায় ফেলিয়া, এবং প্রয়োজন গুরুতর হইলে চিড়িয়াফাড়িয়াও শ্যামাপদ মানবমনের তত্ত্বরাশি সংগ্রহ করিয়া থাকেন। সেগুলি যথাবিধি নোটবুকে জমা হইয়া ওঠে, তাহার পর মানুষের উপর প্রয়োগ করিয়া তাহাদের যাচাই হয়। শ্যামাপদর বেশীর ভাগ সময়ই এই বীক্ষণাগারে কাটে।

পিতার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শ্যামাপদ নিরতিশয় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।—কেমন যেন একটা মনমরা ভাব, কিছুতে স্পৃহা নাই, পরীক্ষায় ফেল করিল, অত্যন্ত বাধ্য ও সত্যবাদী হইয়া পড়িয়াছে। অনেক পুস্তক উলটাইয়া এ অবস্থার একটা নামও বাহির হইল—Loss of individuality অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের বিলোপ।—জ্যেষ্ঠ একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

গবেষণাগারে পরীক্ষা চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন হদিস্ পাওয়া গেল না। একটা গিনিপিগের খাঁচা হইতে ধাড়ী দুটাকে সরাইয়া দেখা গেল ছানাগুলার তাহাতে মোটেই কোন দুঃখ নাই, বরং খাদ্যের দুইটা বড় বড় অংশীদার স্থানান্তরিত হওয়ায় এবং খাঁচার মধ্যেও চলাফেরা করার খানিকটা সুবিধা হওয়ায় তাহাদের ব্যক্তিত্ব বেশ বাড়িয়া গেল বলিয়াই বোধ হইল।—মাথা ঘামাইয়া আরও যে-সব গবেষণা করা গেল তাহাতেও এই ধরণের উল্টা ফলই হইতে লাগিল। তখন খাঁচাবন্দীদের নিকট হতাশ হইয়া শ্যামাপদ গৃহবন্দিনীর দ্বারস্থ হইলেন।—স্ত্রী হৈমবতী বিনা চিন্তা এবং গবেষণাতেই বলিলেন—"ঠাকুরের কালাশৌচটা গেলে ওর বিয়ে দিয়ে দাও।"

শ্যামাপদ হাঁ করিয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

স্ত্রী বলিলেন—"ওরকম ক'রে চেয়ে রইলে যে? তুমি তো এই চাও যে ঠাকুরপো একটু অন্যমনস্ক হোক, মনে একটু ফুর্ত্তি আসুক?"

শ্যামাপদ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ঘরের মধ্যে খানিকটা পায়চারি করিলেন। একটা সোফার হাতলের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—"কিন্তু বিয়ে হ'লে ভাবনা বাড়ায়ই কথা তো?...কি হয় ঠিক যে মনে পড়চে না।"

স্ত্রী বলিলেন—"আচ্ছা তো! ঠিক না মনে পড়লে আমার ভাবনার কথা যে! তা অত বেশী তোমায় এগুতে হবে না, আমিই কিছু কিছু মনে করিয়ে দিচ্চি—বারো সের ওজনে বেড়ে গিয়েছিলে;—আমায় নিয়ে আসবার সময় ইষ্টিশানে তৌল হয়ে এলে আমায় জানালে—মনে পড়চে?"

শ্যামাপদ বলিলেন—"হ্যাঁ, আর তুমি বললে—'থাক্, ইষ্টিশানের লোকেদের ওজন বেড়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে কাজ নেই...আমায় পাটের গাঁটরি, কি চালের বোরা ভেবেছিলে, কে জানে।"

হৈমবতী হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, ভুল হয়েছিল,—চালের বোরায় মধ্যে তবুও একটা বস্তু থাকে। তারপরে

নৈহাটি ইষ্টিশানে সেই বুড়ো ভিকিরীটাকে গলার মাফলারটা খুলে দিয়ে দিলে। জিজ্ঞাসা করতে বললে..."

শ্যামাপদ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়চে..."

—"ফুর্ত্তির চোটে চলন্ত গাড়ী থেকে নামতে গিয়ে পা মুচকে .."

শ্যামপদ লজ্জিত হইয়া আর অগ্রসর হইতে দিলেন না। অভয়পদর বিবাহ দেওয়াই সিদ্ধান্ত হইল।

২

অভয়পদ যে-দিন বধূ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল, সেই দিন বিকালে শ্যামাপদ টেরিটিবাজার হইতে এক জোড়া হাড়গিলা কিনিয়া আনিয়া নিজের ল্যাবরেটারিসাৎ করিলেন। হৈমবতী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন—"এ আবার কি সখ? কি হবে এ-দুটো; চেরাফাঁড়া করবে তারও তো মাসে দেখচি না এদের মধ্যে।"

শ্যামাপদ একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন—"চকাচকীই কেনবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তা পাওয়া গেল না, তাই, প্রায় একই জাত ব'লে এই দুটো..."

হৈমবতী আরও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন চখাচখীই বা কি হ'ত?"

—"কি যে বলে—ওদের দাম্পত্যজীবনটা আদর্শ কি-না··· এ-কথা আমি একাই বলচি না গো, তোমাদের কালিদাসও স্বীকার ক'রে গেছেন—চক্রবাক, চক্রবাকী"···

—"বেশ, তারপর?"

—"তাই মনে করলাম—অভয়টার বিয়ে হ'ল—এখন কি-ভাবে চললে ওদের দাম্পত্যজীবনটা আদর্শ হয়ে ওঠে—একে অন্যের জীবনটাকে ভালভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে, সে সম্বন্ধে একটু গবেষণা করা দরকার, তাই..."

হৈমবতী গালে তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, বলিলেন—"তাই বাজার থেকে এক জোড়া হাড়গিলে কিনে নিয়ে এলে! অবাক করলে তুমি; অমন সোনার চাঁদ ভাই—ভাদ্দরবৌ ঐ ল্যাংপ্যাং-এ হাড়গিলের সামিল হ'ল! ষাট্, ষাট্, ম্যাগো, একটা আস্ত ব্যাং গিলে ফেললে! দূর···হ"—

শ্যামাপদ বিপর্য্যস্ত হইয়া বলিলেন—"কি অবুঝ দেখ ত! আরে সামিল হবে কেন? কথা হচ্ছে—মনটা উভয় ক্ষেত্রে একই ভাবে কাজ করে, পালক, রোঁয়া—এ-সবের মধ্যেই হোক, আর সেমিজকামিজের মধ্যেই হোক;—যেমন ধর, খুকী গরুটাকে দুইবার সময় সে তার বাছুরটার জন্যে খানিকটা দুধ চুরি ক'রে রাখে; সেটা যে-কারণে হয় ঠিক সেই কারণেই তুমিও খাবার পর খুকীর জন্যে তোমার ভাগ থেকে খানিকটা..."

হৈমবতী ধমক দিয়া উঠিলেন—"আচ্ছা, থামো বাপু; সখ থাকে তোমার ভাইকে হাড়গিলে কর গিয়ে, আমায় খুকীর সঙ্গে তুলনা দিতে হবে না .."

বিবাহের পর প্রত্যাশিত ভাবান্তরটুকু বেশ পাওয়া গেল। অভয়পদর মনের প্রফুল্লতা সুদে আসলে ফিরিয়া আসিয়াছে, ওজনও বাড়িয়াছে ভালরকমই; কিন্তু পাঠ্য-জীবনের উপর প্রতিক্রিয়াটা কেমন যেন সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হইতেছে এবং সত্যবাদী ভাই যে সেটা গোপন করিবার জন্য ধীরে ধীরে উৎকট মিথ্যাবাদী হইয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। হাড়গিলাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে হয় না বলিয়া তাহার নিকট হইতে এ-বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া উঠিতে লাগিল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে হাতুড়ি-পেটার কল্যাণে অভয়পদর এত দিন মাথা-ব্যথা কিংবা পেট-কামড়ানির কোন বালাই ছিল না, এখন ক্রমে ক্রমে এই রোগ দুটির আবির্ভাব হইতে লাগিল। শ্যামাপদ রোগের জন্য মোটেই চিন্তিত হইলেন না,—দুশ্চিন্তার কারণ এই যে, অসুখ ঠিক দশটা হইতে চারটা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় এবং তাহার চেয়েও অধিক দুশ্চিন্তার বিষয় এই যে, কোন রকম ঔষধপত্র সেবন না করিয়া শুধু নব-বধূর সেবার অর্থাৎ উপস্থিতির গুণেই আরোগ্য লাভ হইয়া যায়। ওদিকে তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষার সময় হইয়া আসিতেছে; ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এ একটা সঙ্কট। শ্যামাপদ মহাফাঁফরে পড়িলেন এবং অবশেষে এক দিন নেহাৎ অনন্যোপায় হইয়া কনিষ্ঠকে নিজের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও কথাটা কি ভাবে পাড়িবেন সে-বিষয়ে মনে মনে একটা খসড়া তৈয়ার করিতে লাগিলেন।

অভয়পদ প্রবেশ করিলে শ্যামাপদ বলিলেন—"তেমন কিছু কথা নয়,—ওদিকে কয়েকটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম ব'লে তোমার পড়াশুনার কথাটা অনেক দিন একেবারেই ভাবতে পারিনি। হ্যাঁ, কেমন প্রিপ্যারেশন হচ্ছে?"

অভয়পদ হাতের আংটিটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ধীরে ধীরে বলিল—"ভালই।"

—"থার্ড ইয়ারের পরীক্ষাটা আবার এসে পড়েচে কি-না, তাই জিজ্ঞাসা করচি।"

অভয়পদ চুপ করিয়া রহিল।

—"এই পরীক্ষাটা বড় শক্ত কি-না, এটা পেরিয়ে গেলেই আবার দু-বচ্ছর নিশ্চিন্দি।"

অভয়পদ চুপ করিয়া রহিল; দাদাও একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"ইয়ে, কথা হচ্ছে, কোন রকম ডিস্টারবেন্স হচ্ছে না তো?"

অভয়পদ বলিল—"আজ্ঞে না, ঘরটা বেশ নিরিবিলি থাকে।" শ্যামাপদ মনে মনে বলিলেন—"সেই তো সর্ব্বনাশের

মূল।" একটু মৌন থাকিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ, ঐটিই এখন দরকার।—মানে হচ্চে—যদি এ সত্ত্বেও মনে কর যে এক-আধ জনকে বাইরে সরিয়ে দিয়ে বাড়িটা আরও হালকা, আরও নিরিবিলি করা দরকার, তো সে ব্যবস্থাও না হয় করা যায়।"

কথাটা জলের মত সহজ; কিন্তু অভিলষিত ফল পাওয়া গেল না। অভয়পদ স্রেফ বুঝিতেই পারিল না, কিন্তু পারিয়াও বুঝিল না বলা শক্ত। যেন খুব গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া উত্তর করিল—"আজ্ঞে না, পিসীমা পড়ার ঘরে এসে একটু গজর গজর করতেন, তা তিনি তো চলেই গেচেন কাশী।..."

শ্যামাপদ উত্যক্ত হইয়া মনে মনে বলিলেন "বাঁচিয়েচেন তোমাদের দু-জনকে।" প্রকাশতঃ এ-প্রসঙ্গটা আর চালাইতে পারিলেন না। ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন—"তা যেন হ'ল; কিন্তু তোমার শরীরটার দিকে একটু লক্ষ্য রেখ। তোমার বৌদি বলছিলেন—আজকাল নাকি প্রায় মাথা-ব্যথা করচে? ওটা ঠিক নয় তো!"

অভয়পদ এ আক্রমণে একটু থতমত খাইয়া গেল, কিন্তু সরলঅন্তঃকরণ দাদা নিশ্চয় দাম্পত্যশাস্ত্রের প্যাঁচোয়া কথা অতশত বোঝে না এই সিদ্ধান্ত করিয়া সহজভাবেই বলিল—"হ্যাঁ, ওদিকে পড়াশোনার একটু চাপ পড়েছিল, তাই দু-এক দিন রাত জেগে···"

শ্যামাপদ অসন্তোষের ভাব দেখাইয়া কহিলেন—"ঐটি তোমাদের বড় অন্যায়। রাত জেগে পড়াশোনা করাটা··" দৃষ্টি নত করিয়া কহিলেন—"তোমার গিয়ে, যে-কোন কারণেই রাত জাগাটা স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই ক্ষতিকর। আচ্ছা, যাও তা হলে; এই সব জিজ্ঞাসা করবার জন্যেই ডেকেছিলাম। না, রাত-টাত জাগার আর ধার দিয়েও যেও না—"

৩

ভাইকে সোজা ভাবে বাগমানান গেল না। দাদা কোন বক্ররীতি অবলম্বন করিলেন কি-না বলা যায় না, তবে হঠাৎ এক দিন দেখা গেল, হাড়গিলা দুইটা পৃথক পৃথক পিঁজরায় বন্দী হইয়া অত্যন্ত চেঁচামেচি লাগাইয়াছে—এবং আশ্চর্য্য যোগাযোগ—ইহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অভয়পদর খুড়শ্বশুর আসিয়া বলিলেন তাঁহার দাদার শরীর খারাপ, দিনকতকের জন্য কন্যাকে দেখিতে চান।

হৈমবতীর আপত্তি সত্ত্বেও শ্যামাপদ ভ্রাতৃজায়াকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

দিনপনের সতর্ক পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা জানা গেল—এই বিচ্ছেদের ফলে শুধু গভর্ণমেন্টের ডাকবিভাগ দুই হাতে পয়সা লুটিতেছে মাত্র। রোজ একখানি করিয়া ব্যাটরা পোষ্ট-আপিসের ছাপমারা স্ফীতোদর লেফাফা শ্রীমান্ অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়ের নামে হাজির হয়—প্রায়ই একখানি টিকিটে তাহার ভাড়া কুলায় না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সে-সব পত্রের আধাআধি ওজনেরও জবাব প্রত্যহ ব্যাটরা অভিমুখে যাত্রা করে, তাহা হইলে পাটীগণিতের সোজা হিসাবে অতি সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে ভায়ের কলেজ, পরীক্ষা, এ-সব দিকে মন দিবার আর একটুও অবসর বাকিই থাকে না। আর একটি উপসর্গ জুটিয়াছে,—এতদিন অভয়পদর মাথা-ব্যথা পেট-কামড়ানি ছিল, এখন - কি বিধানে বলা যায় না—সে-সব উপদ্রব বধূর শরীরে গিয়া জুটিয়াছে। তিন দিন তো এমন অবস্থা গিয়াছে,—কলেজে গাড়ী পাঠাইয়া অভয়পদকে বধূর শয্যাপার্শ্বে হাজির করিতে হইয়াছে। সুখের বিষয় উগ্রতাটা বেশীক্ষণ থাকে না, তবে দাদার তরফ থেকে চিন্তার বিষয় এই যে, স্বয়ং ভাইকে এ-অবস্থায় সমস্ত দিনরাত ব্যাটরায় থাকিয়া যাইতে হয়।

এর উপর সে-দিন সকালে দেখা গেল সে হাড়গিলা-দম্পতি পিঁজরার বাহিরে গলা বাড়াইয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থায় নীরবে পড়িয়া আছে, সে-দিন শ্যামাপদ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বৈকালেই গিয়া ভ্রাতৃবধূকে গৃহে লইয়া আসিলেন এবং পুকুরঘাটে নির্জ্জনে বসিয়া ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে গভীর-ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দারুণ সমস্যা—কাছে থাকিলেও বিপদ, দূরে থাকিলে বিপদের উপর বিপদ। ওদিকে পরীক্ষার মাত্র আর তিন সপ্তাহ বাকী। অন্ততঃ বধূটি যদি একটু বুঝিত তো একটা সুরাহা হইতে পারিত। বুদ্ধি আছে, তবে সঙ্গদোষে সেটা এখন ষোলআনাই অকাজে লাগিতেছে। মুস্কিল এই যে, কিছু বলিতে যাওয়াও সম্বন্ধবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তবুও কনিষ্ঠের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এবং সে ভবিষ্যতের সহিত ভ্রাতৃবধূর ভবিষ্যৎ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলিয়া, শ্যামাপদ আর অত অগ্রপশ্চাৎ ভাবিলেন না, দু-দিন পরে একবার ভ্রাতৃবধূকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হইল—

"আজকাল কেমন আছ মা?"

"ভাল আছি।"

শ্যামাপদ মনে মনে বলিলেন—"তা জানি।"

"হ্যাঁ, ব্যাটরাতে বড় সংসারে ছেলেপিলের গোলমাল বেশী, তাই আমি ভাবলাম শরীরটা যখন এত উপর্য্যুপরি খারাপ হচ্চে একটু নিরিবিলিতে থাকাই ভাল। এখানে কোন রকম গোলমাল হচ্চে না তো?"

"না।"

"হলেও তুমি এড়িয়ে চলবে, অভয়টার মতন তো আর নও। দেখ না; সামনে এগজামিন, একটু চাড় নেই; খেলা, হুজুগ, এ-ও-তা—এই সব নিয়েই ব্যস্ত।"

বধূ একটু মাথা নীচু করিল; বোধ হয় অনিশ্চিত এ-ও-তার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কাহাকেও স্পষ্ট দেখিতে পাইল।

শ্যামাপদ বলিলেন—"এগ্‌জামিনের আর মোটে তিন সপ্তাহ কি-না।" একটু থামিয়া বলিলেন "আর তিন সপ্তাহই বা কোথায়?—এদিকে এই এগারটা দিন, ওদিকে সাতটা দিন, এই আঠারটি দিন জুড়ে আছে। তার মধ্যে আগেশেষে দুটো দিন তো বাদই দিতে হয়, নয় কি?"

"হুঁ।"

"আর কিছু নয়, এটা ওর গার্ডিয়ার কি-না, তাই একটু সাবধান হওয়া; তা তুমি আমি সাবধান হলে কি হবে মা?—ওটার কি আর নিজের চাঁক আছে!—দেখতে পাও কি!"

বধূ মুখ নীচু করিয়া ডাইনে বাঁমে মাথা নাড়িল—না, কোন চাঁক দেখিতে পায় না।

বিষয়টির গুরুত্ব ভাল করিয়া মাথায় অনুবিষ্ট করাইয়া দিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া শ্যামাপদ বলিলেন—"তা হলে যাও মা তুমি, শরীরটা কেমন আছে তাই জিগ্যেস করতে ডেকেছিলাম। অনুকূলডাক্তার বললে—এখন স্রেফ্‌ বিশ্রাম আর ঘুম,—ঘুমটা একটা মস্তবড় দরকারী জিনিষ কি-না ...যাও মা।"

তিন-চার দিনের পর শ্যামাপদ খবর লইয়া দেখিলেন—ঘুমটা যে অত দরকারী জিনিষ তাহা তাঁহারও জানা ছিল না।—ভ্রাতৃবধূ সমস্ত দিনটাই ঢুলিয়া ঢুলিয়া, অথচ সুযোগ পাইলে গভীর নিদ্রায়ই কাটাইতেছে। এদিকে বধূ আসার পর থেকেই অভয়পদ মারাত্মক রকম নিরিবিলির ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সকালে সন্ধ্যায় সমস্ত দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া অমন একমনে পাঠাভ্যাস যে তাহার কোষ্ঠিতে লেখা ছিল এ-কথা পূর্ব্বে কেহ জানিত না। এরকম নিষ্ঠা, শান্তি, নীরবতা দেখা যায় এক শুধু যোগাভ্যাসে অথবা নিদ্রায়।

শ্যামাপদ স্ত্রী হৈমবতীকে ডাকিয়া বলিলেন –"হ্যাঁগা, এতো বড় ফ্যাসাদেই পড়া গেল এদের নিয়ে,—সমস্ত রাত দুটোতে জেগে কাটাবে আর সমস্ত দিন ঘুমোবে"

হৈমবতী মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"চুপ কর! তোমার কি ওরকম ক'রে বলা মানায়?"

শ্যামাপদ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কি গেরো! মানায় না ব'লে চুপ করে থাকতে হবে? বেশ আমার না মানায় তো তুমিই না হয় বল না কেন?"

—"ইস্, আমি হন্তারক হ'তে গেলাম ব'লে। তা ভিন্ন আমার লাগে ভাল।"—বলিয়া, বোধ হয় একটু হাসিয়া ঘুরিয়া চলিয়া গেলেন।

"ও!"—বলিয়া শ্যামাপদ খানিকটা একভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবটা—বুঝেছি, তুমিও এই চক্রান্তের মধ্যে!

এক নূতনতর বন্দোবস্ত করিয়া দেখা স্থির হইল। বাগানের মধ্যে, বীক্ষণাগার হইতে খানিকট দূরে, বাড়ি হইতে বিচ্ছিন্ন একটা ছোট ঘর ছিল, প্রয়োজনের অভাবে তাহাতে কাঠকুটা ভাঙা আসবাবপত্র রাখা থাকিত। সেই ঘরটি পরিষ্কার করাইয়া, চূণ ফিরাইয়া অভয়পদর পড়িবার এবং শয়ন করিবার ঘর নির্দ্দিষ্ট হইল।

শ্যামাপদ বলিলেন—"আমি বুঝতে পারছিলাম তোমার বাড়ির ভেতর সব বিষয়ে অসুবিধে হচ্ছে, অথচ তুমি মুখ ফুটে বলতেও পারছ না। এ বাগানের মধ্যে একটেরেয় দিব্যি হ'ল না?"

অভয়পদ মুখটা গোঁজ করিয়া বলিল—"হুঁ।"

"এখানে তোমাকে দোর-জানালা কিছু বন্ধ করতে হবে না; বরং পড়তে পড়তে ক্লান্তি বোধ করলে, খানিকটা বাগানে এদিক-ওদিক বেড়িয়ে এলে। ফুল তুমি ভালওবাস, আর ওর চেয়ে মন প্রফুল্ল রাখবার মত কি-ই বা আছে?"

অভয়পদ মুখটা আরও গোঁজ করিয়া, আরও অনুনাসিক সুরে বলিল—"হুঁ।"

ভাই যেমন সর্ব্বদা বইয়ে-মুখে এক হইয়া বসিয়া থাকে তাহাতে মনে হয় ব্যবস্থাটা খুব লাগসই হইয়াছে। হইবার কথাই কি-না,—নীরব নিথর জায়গাটি যেন কণ্ব মুনির আশ্রম। দাদা নিশ্চিন্ত হইয়া অনেকদিন পরে বীক্ষণাগারে একটু ভাল করিয়া মন দিতে পারিয়াছেন। হাড়গিলা দুটারও অনুরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পরীক্ষায় পরীক্ষায় পরিশ্রান্ত হওয়ার দরুণই হোক কিংবা, অদর্শনের হেতু বিস্মৃতির জন্যই হোক তাহার আর তত টা গোলযোগ করে না। দিব্য খায় দায়, যদি নেহাৎই তেমন তেমন হইল তো হন্দ তারের জালের উপর চঞ্চু দ্বারা গোটাকতক ছোবল মারে। এ-সব যথারীতি নোটবইয়ে লিপিবদ্ধ হইতেছে। শ্যামাপদ *Love that defied science* নাম দিয়া মনস্তত্ত্বমূলক একটি নিবন্ধ লিখিতেছেন, কোন বিলাতী কাগজে দিবেন। নূতন প্রেম বৈজ্ঞানিকের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিতে করিতে শেষ পর্য্যন্ত কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইল তাহারই গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস। বিজ্ঞানজগৎকে চমৎকৃত করিয়া দিবে বলিয়া আশা করেন।

৪

পড়িবার ঘর থেকে বাড়িটা দেখা যায়, কিন্তু বাড়ির কাহাকেও দেখা যায় না। সেই জন্য কেবলই মনে হয় দুইটি টানা টানা ব্যাকুল চোখ এই দিকে অনিমেষ চাহিয়া আছে, বই থেকে মুখ তুলিলেই যেন ক্ষণিকের জন্য চোখোচোখি হইবে।

ওদিকে টানা চোখ দুটিও সর্ব্বদা যেন একটু সজল, তারা যেন দেখিতে পায় পাষাণের মত কঠিন বইয়ের গাদার ওপর কোথাও একজন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকে; তাহাকে ওঠায়, একটু 'আহা' বলে, ত্রিসংসারে এমন কেহই নাই।

—কল্পনাদেবী এইটুকু মধ্যস্থতা করেন।

আর একটু মধ্যস্থতা করে ঝিয়ে।—তেতলার ঘরে বসিয়া

অণিমা নীচের বিচিত্রতায় শূন্যতা দেখিতেছে, কিংবা আকাশের মহাশূন্যতায় কত বিচিত্রতার ছবি আঁকিতেছে—সিঁড়ি ভাঙিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিমি আসিয়া উপস্থিত হইল। অণিমা তাড়াতাড়ি সোফা কিংবা চেয়ার হইতে নামিয়া তাহার ঝিকুঝিকে কোঁকড়া লোমেভরা গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া আকুলভাবে প্রশ্ন করে—"কোথায় ছিলি এতক্ষণ, পোড়ারমুখী ?"

জিমি উত্তর দিতে পারে না বলিয়াই তাহার বক্তব্য সম্বন্ধে অণিমার কোন দ্বিধা সন্দেহ থাকে না; বলে—"বুঝেচি তুই কার কাছে ছিলি—তোর চাইবার ভঙ্গিতেই বুঝেচি। কি করচে রে ?—খুব পড়চে, না ?...তুমি বলবে এগজামিন, তুমি বলবে ঘুমটা দরকার...ছাই এগজামিন, ছাই ঘুম, ওসব কিছু দরকার নেই; তুই যা, বেরো।"

একটু ধাক্কা দিয়া আবার কোমরটা সঙ্গে সঙ্গে জড়াইয়া ধরে, বলে—"কি দেখলি লা ? খুব বুঝি পড়চে ?"

জিমি প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে এই সোহাগটুকু পাইয়া প্রবলবেগে ল্যাজ আর মাথাটা নাড়িতে থাকে। অণিমা উল্লসিত হইয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরে, বলে—"পড়চে না, না ? -সে আমি জানি; আমায় ছেড়ে থাকলে ওর নাকি আবার পড়া হয়। যখন ফেল ক'রে বসবে তখন বড়ঠাকুরের চাক হবে।"

জিমির সামনের হাত দুটা তুলিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করে—"কি বলিস্ ?"

জিমি জিভ বাহির করিয়া প্রবলবেগে মাথা দুলায়। অণিমা তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলে—"না, তখনও হবে না ?—আচ্ছা যা, তোকে আর দৈবজ্ঞগিরি ফলাতে হবে না, কালামুখী কোথাকার।"

অভয়পদর ঘরে গাদা-করা বই খাতার সোঁদা গন্ধ হঠাৎ চাপা পড়িয়া নববধূর জামা কাপড়ের পরিচিত এসেন্সের বাসী গন্ধম ঘরটা ভরিয়া ওঠে; মুখ ফিরাইয়া চাপা উল্লাসের সহিত বলে—"জিমি বুঝি ?" কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

কোথায় এতক্ষণ যে ছিল তাহা জানে বলিয়াই আর উত্তরের প্রয়োজন হয় না; 'আয়'—বলিয়া তাহার গলাটা জড়াইয়া কাছে টানিয়া লয়। বধূর মত অত আবলতাবল বকে না, মুখের পানে আবেগময় দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে কপালটিতে হাত বুলায়। ওর সমস্ত শরীরটাতে অণিমার স্পর্শ মাখান আছে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন সেটা মুছিয়া লইতে থাকে।

আবলতাবল অত বেশী বকে না বটে, তবু এক-আধটা কথা বাহির হইয়াই পড়ে, প্রকৃতিস্থ লোকের মুখ দিয়া যাহা বাহির হইতেই পারে না। বলে—"কথা কইতে তুই শিখবি নি জিমি ?—দু'টা কথাও বুঝি আমার অণিমার কাছে পৌছে দিতে পারিস্..."

একটু থামিয়া বলে—"দেখ না, তোদের দেশে কুকুরেরা কত বড় বড় কাজ করচে; কত খুনী আসামী ধরিয়ে দিচ্ছে, কত খবর পৌছে দিচ্ছে, কত..."

এই ধরণের প্রাত্যহিক কথাবার্ত্তার মধ্যে অভয়পদ এক দিন একটু বেশীক্ষণ থামিয়া কি একটা ভাবিল, তাহার পর বইয়ের গাদা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, টেবিলের উপর একটা শক্ত নীল সুতার বাণ্ডিল ছিল, তাহার খানিকটা ছিঁড়িয়া লইয়া, তাহার মাঝখানে একটা কাগজের টুকরা বাঁধিল, তাহার পর সুতাটি জিমির বুকের চারিদিকে বেড় দিয়া বাঁধিয়া, সুতাটি ও তৎসংলগ্ন কাগজটি তাহার সুদীর্ঘ কেশরাশির মধ্যে সন্তর্পণে ঢাকিয়া দিল।

দাদার ভাই প্রভৃতি-গবেষণা লাগাইয়াছে।

কিন্তু হায়, সাফল্য-লক্ষ্মী নিতান্তই বিমুখ।—পাঁজরার চারিদিকে হঠাৎ এ-এক নূতন উপদ্রবে জিমি ঘোর আপত্তি লাগাইয়া দিল। উঠিয়া, পড়িয়া, গড়াইয়া এক মহামারি কাণ্ড বাধাইয়া দিল, এবং শেষে ছিঁড়িবার চেষ্টায় সুতাটার মধ্যে সামনের একটা পা আটকাইয়া যাওয়ায়, তিন পায়ে সমস্ত ঘরটা ছুটাছুটি করিতে করিতে পরিত্রাহি চীৎকার সুরু করিয়া দিল।

দাদা বুঝি আসিয়া পড়ে! সমস্ত ঘরটায় একটা ছুরি কি কাঁচি নাই। অবশেষে নিরুপায় হইয়া অভয়পদ জিমিকে এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়া, সুতাটা সাধ্যমত একটু টানিয়া ধরিয়া, দাঁত দিয়াই ছেদন করিয়া দিল। মুক্তির আনন্দে এবং কতকটা বোধ হয় প্রভুর এই হঠাৎ ভাবপরিবর্ত্তনে অনেকটা সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াও, জিমি আর কালবিলম্ব না করিয়া তীরবেগে বাহির হইয়া গেল।

নিরাশ হইয়া অভয়পদ একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল;—অস্ফুট স্বরে নিজেকেই বলিল—"একটু ট্রেনিং দিতে পারলে ঠিক চিঠিটা পৌছে দিতে পারত, কেউ টেরও পেত না; কিন্তু যা হল্লা সুরু ক'রে দিলে!" একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

কিন্তু হাজার হোক প্রেমিকের মন, তায় আবার বিরহ-শাণিত একটি বিফলতাতেই তাহার উদ্ভাবনীশক্তি লোপ পায় না।

এদিকে একটু সুরাহাও হইল।—

সমস্ত দিন তর্কে তর্কে থাকিয়া খবর পাওয়া গেল খরগোসের জোড়া ভাঙিয়া একটি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, দাদা কাল সকালে টেরিটিবাজারে যাইবেন। অভয়পদ আন্দাজ করিল অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক লাগিবে। আহা, বেচারী খরগোস! তা ভাল হইয়াছে; দাদার হাত থেকে তো পরিত্রাণ পাইয়াছে।

অভয়পদর মোটরের আওয়াজ যখন দূরে মিলাইয়া গেল, অভয়পদ ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে পা বাড়াইল। দুয়ারের কাছেই ছোট ভাইপোর সঙ্গে দেখা হওয়ায় প্রশ্ন করিল—"দাদা কোথায় রে খলু? তাঁকে আজ সকাল থেকে দেখচি না যে ?"

ধলু প্রত্যাশিত উত্তরই দিল—"জানি না তো!"

—"তবে তোর মা জানে নিশ্চয়, তাঁকেই জিগ্যেস ক'রে আসি। কোথায় আছে বল দিকিন তোর মা?"

"বড় ঘরে।"

ভ্রাতৃজায়ার সন্ধানে অভয়পদ ভিতরে প্রবেশ করিল, এবং যাহাতে তিনি সন্ধান না পান সেই উদ্দেশ্যে বড় ঘরের দিকের রাস্তাটা বাদ দিয়া একেবারে অণিমার ঘরে প্রবেশ করিল। অণিমা ছিল।

কোয়ার্টার তিনেক পরে বিদায় লইয়া অলক্ষিতে বাহিরে আসিবে, হৈমবতীর একেবারে সামনাসামনি হইয়া গেল। বলিল—"এই যে। দাদা কোথায় জিগ্যেস করব ব'লে, তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই থেকে"

হাসির ভাব দেখিয়া থামিয়া গেল। এমন সময় মোটরের পরিচিত হর্ণের আওয়াজ হইল। ভ্রাতৃজায়া হাসিটাকে গাম্ভীর্য্যে প্রচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া প্রশ্ন করিল—'ওঁকে খুঁজছিলে বললে; যদি জিগ্যেস করেন—কেন—কি বলব?"

অভয়পদ ক্ষিপ্রগতিতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতেই ঘুরিয়া শাসন ও মিনতির ভঙ্গিতে বলিল—'না, খবরদার।... তোমার পায়ে পড়ি বৌদি যাও..."

দাদা আসিয়া দেখিলেন ভাই পড়িবার ঘরে; একবার ডাকিলেন কিন্তু উত্তর না পাওয়ায় একাগ্রতায় আর বাধা না দিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া ল্যাবরেটরীর পানে চলিয়া গেলেন।

তিন কোয়ার্টার ব্যাপী কনফারেন্সে কিছু একটা সাব্যস্ত হইয়াছিল নিশ্চয়। সে-দিন কলেজ হইতে ফিরিবার সময় অভয়পদ বেশ একটি ডাগর দেখিয়া পিতলের ঘুঙুর কিনিয়া আনিয়া জিমির গলার ব্যাণ্ডে ঝুলাইয়া দিল; তরল ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজে জিমি সমস্ত বাড়িটা মুখরিত করিয়া তুলিল। শ্যামাপদ অভিনবত্বটুকু অনুমোদন করিলেন, বলিলেন—"মন্দ করনি অভয়, ওদের মিউজিক্যাল সেন্স্‌টা যদি ফুটিয়ে তোলা হয় তো মানসিক কোন পরিবর্ত্তন হয় কি-না পরখ ক'রে দেখবার বিষয়। এ্যানিম্যাল্‌ সাইকোলজিতে আমরা একটু নতুন তথ্য দান করতে পারি।

নোটবুকে তারিখটি টুকিয়া রাখিলেন এবং খুব সূক্ষ্মভাবে জিমির গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। নোটবুকটি মন্তব্যে মন্তব্যে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

৫

বেলা আন্দাজ নয়টা হইবে। ল্যাবরেটরিতে বিশেষ কোন কাজ নাই, তাহা ভিন্ন ভাই এত দুর্বোধ হইয়া উঠিতেছে যে তাহাকে চোখে চোখে রাখিবার জন্যও আর গবেষণার অছিলায় মিছামিছি বাগানে বসিয়া থাকিতে হয় না। শ্যামাপদ সাফল্যের জন্য বেশ একটি নিবিড় আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছেন এবং আপাততঃ উপরের বড় ঘরটিতে নিরালায় তাঁহার *Love that defied science* প্রবন্ধটির উপসংহার লেখায় ব্যাপৃত আছেন।

সামনের বারান্দা দিয়া জিমি নিতান্ত ব্যস্তসমস্তভাবে নীচের দিক হইতে আসিয়া ওদিকে অণিমার ঘরের পানে চলিয়া গেল। তাহার যাওয়ার ভাবেই মনে হইল সে বিশেষ একটা কাজে লাগিয়া রহিয়াছে—এদিক-ওদিক চাহিবার ফুরসৎ নাই।

শ্যামাপদ কলমটা তুলিয়া লইয়া একটু অন্যমনস্ক ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন—সঙ্গীতে এই একাগ্রতাটুক আনিয়া দিয়াছে...তাহা হইলে দেখা যাইতেছে সঙ্গীত মানুষের মনে যে ঐকান্তিকতা জন্মায় পশুর মনেও ঠিক সেই রকমই

হঠাৎ তাঁহার মনে হইল ঘুঙুরের শব্দটা যেন ছিল না! তিনি কি রচনায় এতই লিপ্ত ছিলেন যে শব্দটা তাঁহার কানে গেল না,—না; শ্যামাপদ ঘুঙুরটা খুলিয়া রাখিয়াছে? কেন, খুলিতে গেল কেন? বোধ হয় তাহার পড়াশুনায় ব্যাঘাত জন্মায়—ব্যাঘাত আর উহাতে কতটুকু হইবে? তবু, যখন খুলিয়া দিয়াছেই তখন না হয় আপাততঃ থাক, পরীক্ষাটা হইয়া গেলে আবার পরাইয়া দিলেই চলিবে।...দেখ ব্যাপার!—বৈজ্ঞানিক মেথড জিনিষটাই এই রকম—ঐ অভয়পদর মন বই কেতাব থেকে কি রকম উঠিয়া গিয়াছিল, আর আজ বই আর নিজের মাঝখানে একটা ঘুঙুরের মিহি আওয়াজও আসিতে দিতে সে রাজী নয়!

এই সময় কুকুরটাকে সেই রকম হন্তদন্ত হইয়া ওদিক হইতে নীচের দিকে চলিয়া যাইতে দেখা গেল। গলায় নজর পড়িতেই দেখিলেন—না, ঘুঙুর তো ঠিকই রহিয়াছে!

শিষ্‌ দিয়া ডাকিতে জিমি বারান্দাতেই দুয়ারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ব্যস্ততার মধ্যে প্রভুর মন রাখিবার জন্য, সমস্ত শরীরটাকে দশ বারো সেকেণ্ড খুব একচোট নাড়া দিয়া শঁ করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

শ্যামাপদ বলিলেন—"যা রে! আর এত ব্যস্তই বা কেন?"

ধলু ওপরে আসিয়াছিল, একটু চাকিয়া বলিলেন—"দেখ তো; কুকুরটার গলার ঘুঙুরের মটরটা বুঝি কি ক'রে আটকে গেছে, বাজছে না; ধ'রে ঠিক ক'রে দাও তো।"

আবার লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। ধলু খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"কৈ, তাকে তো বাড়িতে দেখতেই পেলাম না।"

—"ঘুঙুর থাকলে এও একটা সুবিধে—সহজে স্পষ্ট করতে পারা যায়...তোমার কাকার পড়বার ঘরে দেখেচ? বোধ হয়"

এমন সময় জিমি সিঁড়ি ভাঙিয়া ওপরে আসিল—সেই ব্যস্তবাগীশ ভাব। শ্যামাপদ বলিলেন—"হয়তো, আবার ডাকলে আসে না, আ মর! দেখ তো কি হ'য়েচে ঘুঙুরটাতে।"

জিমি ধরা দিতে কিছু আপত্তি করিল, ঘুঙুর স্পর্শ

করিতে দিতে আরও আপত্তি করিল।...মটর আটকানো নয়; ঘুঙুরের মধ্যে কি একটা সেঁদিয়া গিয়াছে। এমনি বাহির করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। ধলু শেষে ঘুঙুরটাই ব্যাগু হইতে বাহির করিয়া লইল।

ভেতরে আধময়লাপানা একটা কি,—ন্যাকড়া বলিয়া যেন বোধ হয়। বাহির করা মুস্কিল; নিব দিয়া টানিয়া বাহির করা গেল না। ধলু বলিল—"দাঁড়াও, কাকীমার কাছ থেকে মাথার কাঁটা নিয়ে আসি।"—বলিয়া চলিয়া গেল।

শ্যামাপদ চেষ্টা করিতে করিতে একটা কোণ ধরিলেন, তাহার পর অতি সন্তর্পণে সমস্তটা টানিয়া বাহির করিলেন;—মিহি পার্চমেণ্ট কাগজের ভাঁজ করা ছোট্ট একটি বাণ্ডিল। ভাবিলেন—ব্যাপারখানা কি!

আস্তে আস্তে ভাঁজ খুলিয়া দেখা গেল একটা চিঠি। বেশ দীর্ঘ চিঠি। কাগজটা দীর্ঘ নয় বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা মালমসলায় আগাপাস্তলা ঠাসা। শ্যামাপদ চসমাটা ভাল করিয়া নাকে বসাইয়া প্রথমেই "প্রাণেশ..." পর্য্যন্ত পড়িয়াই অর্দ্ধপথে থামিয়া গিয়া 'ছি-ছি' করিয়া সামলাইয়া লইলেন। তাহার পর ওটুকু বাদ দিয়া চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিলেন

"মধুমাখা চিঠি পেলাম। আর যে পারি না—পারি না—পারি না। পড়ার বন্দীশালায়, পুস্তকপ্রহরীর মধ্যে আমি বন্দী—ইন্‌স্ট্রুমেণ্টগুলা যেন তাদের নির্ম্মম অস্ত্র। প্রিয়ে, কি অপরাধে দাদা আমায় এ রুকম ক'রে 'স্বাধিকার প্রমত্তঃ,' করলেন? আমি তো বেশ ছিলাম,—কই আমি তো তাঁর কাছে তোমা-নিধি চাই-নি; দাদা-বিধি যদি দিলেনই ত এমন ক'রে বঞ্চিত ক'রলেন কেন?—কি সে আমার দোষ? বোধ হয় আমার ভাল করাই তাঁর উদ্দেশ্য; কিন্তু ওগো আমার অন্তরের অন্তর, প্রাণের প্রাণ, তোমার এই শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রেই কি তিনি ভাল করার..."

ধলু আসিয়া নালিশের সুরে বলিল—"বাবা, কাকীমা কোনমতেই মাথার কাঁটা কি একটা সেফ্‌টিপিন্ দিলেন না; কি সে জিদে লোক!..."

শ্যামাপদ কাগজটা মুঠার মধ্যে মুড়িয়া লইয়া অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করিলেন—"কেন দিলেন না?"—সঙ্গে সঙ্গে যেন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া—বলিলেন—"তা হোক্, তোমার মাকে শীগ্‌গির একবার ডেকে দাও দিকিন।"

তাহার পর হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন—"আর দেখ,—ঐ কুকুরটাকে ভাল ক'রে ডবল চেন দিয়ে বেঁধে সে—ই ওদিককার রেলিঙে আটকে রেখে এস; যেন এ দি—ক না মাড়াতে পারে। তাই তো বলি—এদিক যায় না, ওদিক যায় না,·দুদিন থেকে খালি ওপর আর নীচে,—করে কি? ...পাজি, মেঘদূত হয়েচেন—মেঘদূত!—বার করচি তোমার মেঘদূত হওয়া এবার আমি..."!

বাংলার পল্লী
শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রকেশরী রায়
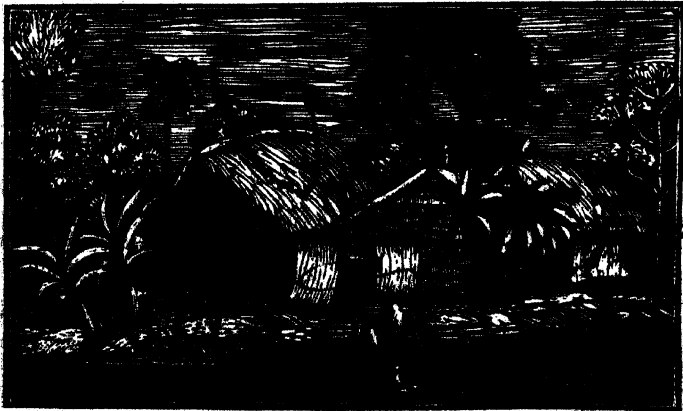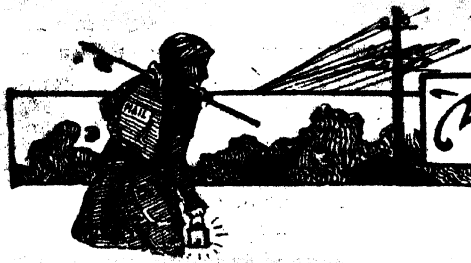
রবার নিয়ন্ত্রণ-চুক্তি—

রবারের উৎপাদন ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎপাদক ও ব্যবসায়িগণ দীর্ঘ আলোচনার পর একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই চুক্তি আগামী ১লা জুন হইতে ১৯৩৮ সনের ৩১এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। চুক্তির প্রধান সর্ত্তগুলি সংক্ষেপতঃ এইরূপ—

(ক) ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদক দেশের রপ্তানি নিম্নলিখিত ভাবে সীমাবদ্ধ থাকিবে। সংখ্যাগুলি হাজার টন হিসাবে।

দেশ	১৯৩৪	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৮
মালয়	৪০৪	৫৩৮	৫৬৯	৫৮৯	৬০৯
ডাচ-ঈষ্ট ইণ্ডিজ	৩৫২	৪০০	৪৪৩	৪৬৭	৪৮৫
সিংহল	৭৭	৭৯	৮০	৮১	৮২·৫
উত্তর বর্ণিও	১২	১৩	১৪	১৫·৫	১৬·৫
সারাবাক	২৪	২৮	৩০	৩১·৫	৩২
শ্যাম	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
ভারতবর্ষ	৬·৮৫	৮·২৫	৯	৯	৯·২৫
ব্রহ্ম	৫·১৫	৬·৭৫	৮	৯	৯·২৫

(খ) নূতন আবাদ হইতে পারিবে না—শুধু পরীক্ষার জন্য নূতন আবাদ চলিতে পারিবে কিন্তু তাহাও বর্ত্তমান আবাদের শতকরা ¼ ভাগ অতিক্রম করিবে না; পুনঃ-আবাদ বর্ত্তমান আবাদের শতকরা ২০ ভাগে সীমাবদ্ধ থাকিবে; নূতন আবাদ যাহাতে না হইতে পারে সেই জন্য ঐ সকল স্থান হইতে আবাদকার্য্যে ব্যবহারযোগ্য কোন বস্ত্রপাতি [illegible] করা হইবে না।

(গ) একটি "আন্তর্জাতিক রবার নিয়ন্ত্রণ পরিষৎ" গঠিত হইবে, চুক্তিতে আবদ্ধ প্রত্যেক দেশের সরকার দুই জন প্রতিনিধি এই পরিষদের জন্য নিযুক্ত করিবেন, [illegible] পারিষদের প্রতি ১০০০ টনে এক "ভোট" হইবে। [illegible] শতকরা কত অংশ রপ্তানি করা হইবে সময় সময় তাহা নির্দ্দিষ্ট করাই এই পরিষদের কার্য্য হইবে।

(ঘ) এই চুক্তির স্থিতিকালে শ্যাম তাহার আবাদ বাড়াইয়া ৩১,০০০ একর পর্য্যন্ত করিতে পারিবে এবং তাহার রপ্তানি প্রতি বৎসরই একটি নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ থাকিবে।

(ঙ) ইন্দো-চীন হইতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে যে পরিমাণে রবার রপ্তানি হইয়াছিল ফ্রান্সই তাহার [illegible] আমদানি করিয়াছিল, ইন্দো-চীন কি পরিমাণ রপ্তানি করিবে তাহার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(চ) সারাবাক ও শ্যাম—এই দুই দেশ ব্যতীত চুক্তিবদ্ধ অপরাপর দেশের সরকারকে রপ্তানির উপর সেস্ বসাইয়া গবেষণার বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

(ছ) এই চুক্তি ১৯৩৮ সনের ৩১এ ডিসেম্বর শেষ হইবে, তবে নবগঠিত পরিষৎ অনুরূপ ব্যবস্থা, প্রয়োজন হইলে, সুপারিশ করিতে পারিবেন।

এই চুক্তির সর্ত্ত যাহাতে সকলেই মানিয়া চলিতে বাধ্য হন, এইজন্য সর্ত্তানুযায়ী আইন করিতে এই দেশসমূহের সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে রবার অতি অল্পই উৎপন্ন হয়; রপ্তানির যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ একত্র হইয়াও সর্ব্বনিম্ন স্থানেই অবস্থান করিতেছে। যুদ্ধের পর বাণিজ্যের দুরবস্থায় যত পণ্যের মূল্য কমিয়াছে, বোধ হয় রবারই তন্মধ্যে প্রধান। যুদ্ধের পূর্ব্বে এক পাউণ্ড রবারের দাম ছিল ১২½ শিলিং, ১৯৩২ সনে 1⅛ পেনীতে দর নামিয়া যায়। বিশেষজ্ঞগণ আশা করেন যে, এই চুক্তির ফলে রবার উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়িগণ লাভবান হইবেন।

বাংলার পাটের জন্য চুক্তি অসম্ভব হইল!—

বাংলাদেশে রবার উৎপন্ন হয় না, সুতরাং এই রবার নিয়ন্ত্রণে সাক্ষাৎভাবে তাহার কোনই সম্পর্ক নাই, যদিও ভারত-সাম্রাজ্যের অংশরূপে পরোক্ষ সম্পর্ক যথেষ্ট আছে। এই রবার নিয়ন্ত্রণ বাঙালার পক্ষে বিশেষ আলোচনার যোগ্য এই জন্য যে, রবার ব্যবসায়িগণ সকলে একরাষ্ট্র ভুক্ত নহেন, এক জাতিরও (nationality) নহেন, তবু তাঁহারা একমত হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু বাংলার পাটের সম্পর্কে এরূপ একমত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। বাংলার কৃষকগণ দরিদ্র, তাহারা রবার উৎপাদকগণের ন্যায় সঙ্ঘবদ্ধ নহে, সুতরাং তাহারা স্বয়ং প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কংগ্রেস এক সময়ে বিজ্ঞাপন প্রচার ও বক্তৃতাদি দ্বারা পাটের চাষ কমাইবার জন্য কৃষকগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। বাংলা-সরকারও এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন—অবশ্য রাজসিকভাবে; উড়োজাহাজ হইতে পল্লীতে পল্লীতে বিজ্ঞাপন বিতরণ করা হইয়াছিল! বর্ণপরিচয়ও যে কৃষকগণের নাই, তাহাদের নিকট মুদ্রিত উপদেশবাণী-বিতরণ নিদারুণ উপহাস!—এই বিজ্ঞাপনপ্রচারের ফল কি হইল তাহা সকলেই জানেন।

পাট রপ্তানির বর্ত্তমান অবস্থা কি?—

পাট অন্য কোন দেশে উৎপন্ন হয় না, অথচ এই পাটের ব্যবহার পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই অল্পবিস্তর আছে। বাংলা হইতে কোন দেশ কত পাট সংগ্রহ করে নিম্নের তালিকায় তাহা বুঝা যাইবে—

(ক) ছালা (Gunny-bag)

	১৯৩২	১৯৩৩
	এপ্রিল—নভেম্বর	এপ্রিল—নভেম্বর
গ্রেট ব্রিটেন	৩৩,০১৫,৪৩৭	২৭,৯৭৩,২১৩
রাসিয়া	৫,৮৪৭,৪০০	৬৮৩,৫০০
নরওয়ে	৫৪৯,০০০	৫১৩ ০০০
জার্ম্মাণী	১,৬৩৯,৩০০	১ ৪৭৮,২০০
হলাণ্ড	১,২০৩ ৮০০	১,০০২,৫০০
বেলজিয়াম	৪,০২৪,২০০	৫,৭৯৩,০০০
ফ্রান্স	৫১০,১০২	৪৩৭ ১৭৫
গ্রীস	১,৩৭৭,০০০	১,২৭৭,৮০০
তুরস্ক (ইউরোপ)	১,৭১২,৫৪৩	২ ৮৫৮ ৭৬২
" (এসিয়া)	৩,৩১২,৭০৭	৩,৪১২,৮০৬
ইরাক	৫৭৯,৬১৪	৮৬৬,৬০০
সিংহল	৩২৯,০৪৬	৫৩৭,২১৬
ষ্ট্রেটস্ সেটেলমেণ্ট	৮,৫১৯,৯০০	৯,৩৯১,০১০
যাভা	৬,০৯৭,৯০০	৮ ০০৬,৪৫০
শ্যাম	৬,৩৪৬,৭০০	৮,১৭৫,৫০০
ইন্দো-চীন	৫,৮০৯,৭০০	৪,৪৯০,৬০০
ফিলিপিন	৩,৫৭০,২০০	৪ ২৪৭,৬০০
সেলিবিস	৮৯০,৩০০	১,৮১৯,০০০
ফরমোসা	৯২১,২০০	৪২০,০০০
হংকং	১৪,৪৯০,৫০০	১২ ৯১৯,৬০০
চীন	২৭০,০০০	৩৪৬,৫০০
জাপান	৪,৫৭৯,৪০০	৪,৫৬২,৪০০
মিশর	৭,২১৩,১৫০	৯,৮৬৭,৮৫০
উত্তর আফ্রিকা	৪৮৩,০০০	৫১৮,৩০০
ইউনিয়ন অফ দক্ষিণ আফ্রিকা	১৩,৮৮০,৭৫৪	১১.৬৮৯,১৫০
পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকা	৮,৩৫০,৮২৬	৭,১০৪,৭৫১
মরিসাস	২,৫১৪,০০০	৩,২০৫,৯০০
কেনিয়া, জাঞ্জিবার ও পেম্বা	৩,৫৮৩,১২৩	৩,০৯৫,৮০০
ব্রিটিশ সুদান	১,২১৫,৬০০	১,০৬৭,১৫০
পূর্ব্ব-আফ্রিকা (অন্য)	১,৫১৩,১৪৯	২,৮১৫,০২১
কানাডা	১,০৮৬,৬০০	৫ ৭৫,৮৫৯
মার্কিণ	১০,৬৩৬,৬০০	৬,৫৬৭,০৩৪
কিউবা	৬,২০২,৮০০	৭,৫৫৩,৮১৮
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	৬ ১১৬,৮৬৭	৬,৯৬১,৮৮৮
আর্জ্জেণ্টাইন	৬৮৪,৫৫০	৭,০৭৪,২০০
চিলি	৪,১৩৫ ৪০০	৯,০৬৮,৭৪৯
পেরু	৪,১০২,০০২	৫,০১১,২০৩
অষ্ট্রেলিয়া	৮৫,৭৩৮,৯৭৩	৬৪,৩৭৫,৩২৪
নিউজিল্যাণ্ড	১,৯২০,৯৫৯	৩,১১৩,৪৫০
হাওয়াই	১০,১৯৫,৫৫৩	৯,৬৮২,০০০
অন্যান্য	১৩,১৯৫ ৫৫৩	১৬,১৫৫,০০৮
মোট সংখ্যা—	২৮৮,৫২২,৭৫৫	২৮০,৭৫৬,৮৮৭
ওজন—টন	২৮২,৩৩৭	২৭৩,৭৫১

(খ) কাঁচামাল

	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪
	জুলাই—নভেম্বর	জুলাই—নবেম্বর
গ্রেট ব্রিটেন(বেল)	২৮৭,৯৯২	৪৫৭,৮৪৮
জার্ম্মানী	৩৮৯,৯২০	৪৩২,০৪৫
ফ্রান্স	১২৩,৫৫৭	২১৮,৫১৫
বেলজিয়াম	৭৭,৪২৫	৯৭,৩৮৫
ইটালি	৪৮,৭১৭	১৪৫,৮৭০
মার্কিন	৫৭,২০২	১১৫,৭৮৪
স্পেন	৮৬,৯১২	৭৩,৩৪৯
পোর্ট সৈয়দ	২৪,৭৪১	১৬,০৬৭
দক্ষিণ আমেরিকা	২৪,৪০৮	৫০,৪৭৩
হল্যাণ্ড	৪৬,৩০০	৫০,৫১৫
চীন	২১,৬০০	২৭,১৯২
জাপান	৩০,৭৭০	২৯,০২৯
গ্রীস	৩ ২১৬	১,২৮৩
অষ্ট্রেলিয়া	৩,৫১২	১,৫০৯
ওপ্লো	১,৯৮৪	২,৫৪৪
সুইডেন	৪,৭১৬	১২,৮৩৪
অন্য যুরুপীয় বন্দর	১০,০৭৪	২৯,৫২৯
মোট	১,৩০৩,২৫৯	১,৭৯৪,৩৯৬

(গ) চট—

	১৯৩২	১৯৩৩
	এপ্রিল—নভেম্বর	এপ্রিল—নভেম্বর
গ্রেট ব্রিটেন	৩৫,২৬০,২১৮	২৬,৬১০,৫৮৫
সিংহল	১,৪৩৪,১৭১	১,৩৯০,১৯৮
হংকং	২৬৪,০০০	১,২৫৫,০০০
চীন	২,৪৯৩,০০০	১,০৬৭ ০০০
ফিলিপাইন	৯,৮৬৪,০০০	৮,৭৪৭,০০০
মিশর	৪,৪৯৮,৫০০	৭,৭৮১,০০০
দক্ষিণ-আফ্রিকা	৩,৩৬০,৩৫০	৪,৯৮১,০০০
কানাডা	৪৭,৭৮০,০২৯	৫৫,৯৫২,৪৫২
মার্কিণ	৩৬২,০৩৯,৬২১	৪৩৮,৮২৪,৪৬৩
উরুগোয়ে	৮,২৫৩ ৬৬১	৮,৯৬৫,৫০০
আর্জ্জেণ্টাইন	১৮৫,৫১১,০০০	১৩৭,০৮৯,৭৩৩
পেরু	৭৬৩,০০০	১,৮০৮,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	১৫,৮৭৩,৫১৯	১২,১৪১,১৩৪
নিউজিল্যাণ্ড	১,৫৯৩,৪০২	২,৭৪৫ ৭১৫
অন্যান্য দেশসমূহ	১৪,০৫৭,২২৪	১৭,৬৩৬,০১৯
মোট গজ	৬৯১,০২৭,৬৯৫	৭২৭,৭১৪,৮৯৯

ভবিষ্যতের আশা ও আশঙ্কা কি ?—

উদ্যমশীল জাতি কখন পরমুখাপেক্ষী থাকিতে চাহে না। বাংলার চাষী কিংবা চটকলওয়ালা কখনও এরূপ আশা করিতে পারেন না যে, কাঁচা পাট কিংবা চটের জন্য সকল দেশই চিরকাল তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে। আজ নানা দেশে এই সম্পর্কে দুই ভাবে চেষ্টা হইতেছে, প্রথম—পাটের পরিবর্ত্তে অন্য কোন

জিনিষ আবিষ্কার, ও দ্বিতীয়—বাংলা হইতে কাঁচা পাট সংগ্রহ করিয়া চট ইত্যাদি প্রস্তুত।

(ক) ডচ ঈষ্টইণ্ডিজ—পাটের ছালার সবচেয়ে বড় খরিদদার ডাচ ঈষ্টইণ্ডিজ। এই দেশ হইতে যত চিনি রপ্তানি হয় তাহা ভারতে প্রস্তুত ছালায়ই প্যাক করা হইত। কিন্তু কতিপয় বৎসর যাবৎ পাটের পরিবর্ত্তে অন্য কোন জিনিষে তৈয়ারী ছালা ব্যবহার করা সম্ভবপর কি না সে পরীক্ষা চলিতেছে। প্রথম চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হইয়াছে; সুতা ভাল হয় না বলিয়া সিসল পরিত্যক্ত হইয়াছে। রোজেলা দ্বারা কাজ চলিবে এইরূপ স্থির হইয়াছে, তবে তাহাতে খরচ বেশী পড়ে—কি করিয়া কম খরচে সুতা বা চট প্রস্তুত করা যায়, তাহারই গবেষণা চলিতেছে। অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে পাটের একজন বড় গ্রাহক হাতছাড়া হইবে।

(খ) নিউজিল্যাণ্ড—বহুদিনের গবেষণার পর, নিউজিল্যাণ্ডে একটি সুবৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে—নিউজিল্যাণ্ডের তিসি বা মসিনা গাছের আঁশে ছালা প্রস্তুত হইবে। এই ছালা বাজারে বাহির হইলে শুধু নিউজিল্যাণ্ড নহে, অষ্ট্রেলিয়াও ভারতবর্ষ হইতে পাট বা চট লইবে না। বিপদের আরও আশঙ্কা এই যে, নিউজিল্যাণ্ডে এত অধিক তিসি বা মসিনা উৎপন্ন হয় যে, দুনিয়ার বাজারে পাটের এক বড় প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হইল!

(গ) ব্রাজিল—ডাণ্ডী জুট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি বলিয়াছেন যে, ব্রাজিলের সহিত তাহাদের খুব বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল; এখন সে দেশ হইতে মাল সরবরাহ করিবার জন্য আদেশের বড়ই অভাব। বর্ত্তমানে বাণিজ্যের জগৎ-জোড়া দুরবস্থাই ইহার কারণ নহে, কোন কোন জিনিষের জন্য কাগজের আবরণই ব্যবহৃত হইতেছে অর্থাৎ কাগজ পাটকে ব্রাজিলের বাজার হইতে তাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে।

(ঘ) পোলাণ্ড—পাটের পরিবর্ত্তে শনের দ্বারা কাজ চলে কি-না সে বিষয়ে পরীক্ষা হইতেছে।

(ঙ) ইটালী—এক সময়ে পাটের বাজার বড়ই মন্দা ছিল, কিন্তু পুনরায় কাজ ভালই হইতেছে—

		নবেম্বর	ডিসেম্বর
মাকু	১৯৩২	৫৫·৭	৫৮·৮
	১৯৩৩	৭৩·৪	৮০·৩
উৎপাদন	১৯৩২	৫০·৩	৫১·৪
	১৯৩৩	৬২·০	৭০·৪
কাঁচা মাল আমদানি (কুয়িণ্ট্যাল বা হন্দর)			
	১৯৩২	১৬,৩১৪	১৯,১৯১
	১৯৩৩	২৭,৫৭৮	৩০,৯৭৩

(চ) জার্ম্মানী—ভারতবর্ষে তৈরি চটের ছালার আমদানি জার্ম্মানীতে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩২ সালে ছিল ৩৭৪ টন, ১৯৩৩ সনে নামিয়া হইল ২৮৪ টন। কিন্তু ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জার্ম্মানীতে চটের রপ্তানিই কমিয়াছে, পাটের নহে। বরং কাঁচা পাটের রপ্তানি বাড়িয়াছে। ১৯৩২ সালে ৫০,০০০ হইতে ১৯৩৩ সনে ৮৫,০০০ দাঁড়াইয়াছে। ভারত হইতে চট ও ছালা না লইলেও হলাণ্ড, বেলজিয়াম ও চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রস্তুত চটের আমদানি অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। জার্ম্মানীতে একজন ভারতীয় ট্রেড কমিশনার আছেন। তিনি বাঙালী—মিঃ এন গুপ্ত, [illegible], সি. এস। তাঁহার এবং অপরাপর বিশেষজ্ঞদের মত এই যে—

১। জার্ম্মানীতে সকল ছালাই "Veredlungsvorkehr" বা অপরিণত মাল বলিয়া গণ্য সুতরাং তাহার উপর কোন শুল্ক বসানো হয় না। হলাণ্ড, বেলজিয়াম ও চেকোস্লোভাকিয়াতে বহু কৃষিজাত দ্রব্য জার্ম্মানী হইতে রপ্তানি করা হয়। ইহা প্রমাণ করা কঠিন নহে যে, এই সকল দেশ হইতে আমদানী ছালাতেই এই সব দেশের জন্য রপ্তানির মাল প্যাক করা হইয়া থাকে।

২। বিনা শুল্কে ছালা যাইতে পারে বলিয়াই, জার্ম্মানী হইতে দেশ চিনি, ময়দা ও সার (fertilizer) রপ্তানির জন্য প্রায় সকল বৈদেশিক ক্রেতাই নিজ নিজ দেশ হইতে ছালা প্রেরণ করেন। জার্ম্মানী হইতে ভারতবর্ষে বীট (Beat sugar) আমদানি হইত এবং তাহার জন্য ভারতীয় ছালাই ব্যবহার করা হইত, এখন জার্ম্মানী হইতে বীটের রপ্তানি একপ্রকার বন্ধ, সুতরাং ভারতের ছালার ব্যবহারও নাই।

৩। জার্ম্মানী হইতে অধিক মাত্রায় কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা হয় বলিয়া, হলাণ্ড, বেলজিয়াম ও চেকোস্লোভাকিয়ার সহিত ব্যাঙ্কের মারফৎ লেনদেনের খুব সুবিধা; হলাণ্ড ও জার্ম্মানীর মধ্যে "ক্লীয়ারিং সিস্টেম" (clearing system) প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হলাণ্ড হইতে ছালা আমদানী বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(ছ) জাপান—চট নির্ম্মাণে জাপান নূতন ব্রতী। সস্তায় মাল বিক্রয় করিতে জাপানীরা ওস্তাদ, ভারতবর্ষ হইতে তুলা কিনিয়াই ইহারা ভারতে অতি সস্তা দরের কাপড় উপস্থিত করিয়া ভারতীয় কলওয়ালা-দিগকে সন্ত্রস্ত করিয়াছিল।

সস্তায় কাঁচা মাল পাইবার জন্য বাংলার চটকলওয়ালারা পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করেন নাই; অথচ চটের ছালার দাম বাড়াইবার জন্য নিজেরা যুক্তি করিয়া চট নির্ম্মাণ সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা দেখিতেছেন যে বাংলার পাট জাপান ও অন্যান্য দেশের কলওয়ালারা সস্তায় কিনিয়া লইতেছেন ও বাংলা দেশে প্রস্তুত চটের চেয়েও সস্তায় চট বিক্রয় করিতে উদ্যত এই বাংলা দেশেই—অন্য স্থানের ত কথাই নাই।

সুতরাং পাটের চাষ ও রপ্তানির নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রশ্ন নূতন করিয়া আবার উঠিয়াছে।

কাহার স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন ?—

যাঁহারা কাঁচা মাল উৎপাদন করেন ও যাঁহারা ঐ কাঁচামাল হইতে নানাবিধ পণ্য তৈরি করেন তাঁহাদের স্বার্থ এক নহে। ডচ-পূর্ব্বভারত, নিউজিলাণ্ড, ব্রাজিল বা পোলাণ্ড হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে বাংলার কৃষককুলের সমূহ বিপদের আশঙ্কা, কিন্তু জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপানের সংবাদে বাংলার কৃষকের পক্ষে অত্যন্ত আশার কথা। জার্ম্মানীতে ছালার রপ্তানিই কমিয়াছে, কাঁচা পাটের রপ্তানি বাড়িয়াছে। ইটালীতেও সেই অবস্থা, জাপানও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলার পাটের বড় খরিদদার হইয়া উঠিবে অর্থাৎ কাঁচা পাট বিক্রয়ের জন্য কেবল মাত্র ডাণ্ডীর দিকে চাহিয়া থাকিবার অবস্থা বাঙ্গালী কৃষকের বেশীদিন থাকিবে না। ক্রেতাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইলেই উৎপাদকের ধনলাভের সুযোগ উপস্থিত হয়—বাংলার কৃষক কি সে সুযোগের শুভফল লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে ?

কিন্তু বাংলার চটকলওয়ালাদের স্বার্থে আঘাত পড়িবে; মধ্য ও দক্ষিণ য়ুরূপ কিংবা জাপানে যতই মিল স্থাপিত হইবে ততই বাংলার

চটের চাহিদা কমিবে। তাহাদের স্বার্থ রক্ষার একমাত্র উপায় পাট রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ।

এই চটকলওয়াগণ অধিকাংশই ইংরাজ, ইহাদের ইণ্ডিয়ান (!) [ভারতীয় (?)] জুটমিল এসোসিয়েসন নামক এক সঙ্ঘ আছে। ভারতীয় চটকল সামান্য কয়েকটি, যথা—ইলিয়াস, বিড়লা, হুকুমচাঁদ, আদমজী, রাজা জানকীনাথ। স্যার ডেবিড ইউল ইহাদিগকে উপহাস করিয়া বলিতেন—বৈদেশিক (!) কল (foreign mills)! কিন্তু আজ সত্য সত্যই বৈদেশিক কল দেখা দিয়াছে।

রপ্তানির নিয়ন্ত্রণে কি লাভ হইবে?—

যদি পাটের রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে পাটের দর কিছু হয় ত সাময়িক ভাবে বাড়িবে। কিন্তু ইহার পরিণাম কি ভাল হইবে? পাটের পরিবর্ত্তে অন্য জিনিষ আবিষ্কারের যে চেষ্টা নানা দেশে চলিতেছে, তাহার মূলে কি ইহা নাই যে পাট তথা চট ও ছালার জন্য খুব চড়া দাম দিতে এবং সঙ্ঘবিশেষের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল? দুনিয়ার বাজারে সস্তাদরে পাট ছাড়িয়া দিয়া ঐ আবিষ্কার চেষ্টাকে পরোক্ষভাবে বাধা দেওয়া কি বাংলার কৃষকের পক্ষে স্থায়ী মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন নহে? পাটের দাম কমিয়া গিয়াছে, ইহাই বাংলার কৃষকের দুঃখ নহে; এত কম মূল্যেও সমুদায় পাট বিক্রয় হয় না—ইহাই তাহাদের চরম দুঃখ। যদি বাংলার সমুদায় পাট রপ্তানি হইবার সুযোগ পায় তবে ক্ষতিতেও লাভ দাঁড়াইবে। কমলাভে অধিক বিক্রয় প্রকৃত ব্যবসায়ীর আদর্শ। বাংলা একটি ক্ষুদ্র দেশ, তাহারও সব জেলায় পাট হয় না, কয়েকটি জেলায় মাত্র হয়। এই বিশাল বিশ্বের বিরাট যোগান দিয়াও বাংলার পাট উদ্বৃত্ত থাকিবে—এরূপ আশঙ্কা নাই।

শুনিয়াছি একটি স্বর্ণালঙ্কার সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মধ্যে এক বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল; মহাত্মা অলঙ্কার জলে ছুঁড়িলেন—বিতর্ক থামিয়া গেল। আজ পাটের রপ্তানি শুল্ক লইয়া এমনি বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, বঙ্গের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি এই শুল্ক সম্পূর্ণরূপে রদ হয়, তবে শুধু যে এই বিতর্কের অবসান এবং দ্বেষ দূর হইবে তাহা নহে, অবাধ গতির সুযোগে দুনিয়ার বাজারে পাটের চাহিদা বাড়িবে, বাংলার কৃষকগণের স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইবে।

বড় বিপদ ও তাহার প্রতিকার কি?—

বাংলার কৃষকের পক্ষে আশঙ্কার কথা এই যে, পাটের পরিবর্ত্তে অন্য জিনিষ আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে, ইহাকে উপেক্ষা করা চলে না। পাটের চাষ অথবা রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ইহার প্রতিকারের উপায় নহে। পাটের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কি কি কাজ হইতে পারে তাহা আবিষ্কার করিয়া চাহিদা বাড়ানোই একমাত্র প্রতিকার। পাটের রপ্তানি-শুল্ক ত ভাগাভাগি হইয়া গেল, কিন্তু চাহিদার বৃদ্ধির চেষ্টা কাহার ভাগে? ঘরে জিনিষ থাকিলেই বাজারে চাহিদা হয় না। এই জন্য চাই প্রচার, চাই গবেষণা ও পরীক্ষা।

পূর্ব্বে যে ডাণ্ডী সভার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে সভাপতি অংশীদারগণকে আশার বাণী শুনাইয়াছেন যে, রাস্তা নির্ম্মাণে চটের ব্যবহার চলিবে, আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে ইহার পরীক্ষা সফল হইয়াছে, ইংলণ্ডেও পরীক্ষা চলিতেছে।—কিন্তু এই পরীক্ষা চলা উচিত ছিল রপ্তানি-শুল্কভোগী ভারত সরকারের রাজধানী নয়া দিল্লীতে, পাটের দেশ বাংলার রাজধানী কলিকাতায়।

সম্প্রতি *Teer and Bitumen* পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, চট রেলপথ নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইতে পারে। ভারতবর্ষের রেলওয়ে বোর্ড হইতে এইরূপ সুসংবাদ পাইলেই শোভন হইত।

পাট আরও কত প্রয়োজনে লাগিবে পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে। দেশের একটি সম্পদকে গলা টিপিয়া মারা জাতির ধনবৃদ্ধির সহায়ক নহে।

বিদেশে কৃতী বাঙালী ছাত্র—

মিঃ বি, পি, ঘোষ বিলাতের লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে
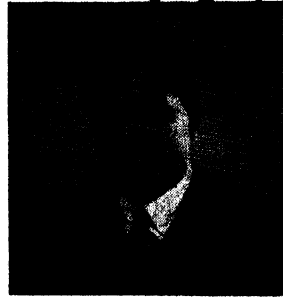
মিঃ বি, পি, ঘোষ

ইন্ধন-বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করিয়া পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই উপাধি লাভ করিয়াছেন।

ওরিয়েণ্টাল জীবন-বীমা কোম্পানীর 'ডায়মণ্ড জুবিলী' উৎসব—

গত ৫ই মে বোম্বাইয়ের ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি জীবন-বীমা কোম্পানীর ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়ায় 'ডায়মণ্ড জুবিলী' উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে জীবন-বীমা কোম্পানীর ইতিহাসে ওরিয়েণ্টালের স্থান অতি উচ্চে। ভারতীয় স্বত্বাধিকারমূলক জীবন-বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে ইহা সর্ব্বপুরাতন। ১৮৭৪ সনে বোম্বাইয়ে ওরিয়েণ্টাল কোম্পানী স্থাপিত হয় ও কার্য্য আরম্ভ করে। এখন ইহার কার্য্য দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি সহজে ভারতবাসীদের জীবন বীমা করিতে চাহিত না। তাহাদের ধারণা—ভারতবাসীদের জীবন বিদেশীয়দের ন্যায় নিরাপদ নহে। ওরিয়েণ্টাল বীমা কোম্পানী এই ষাট বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিয়া ইহার অসারতা প্রমাণিত করিয়াছে। ভারতবর্ষে ভারতবাসীদের দ্বারা পরিচালিত বীমা কোম্পানীর মধ্যে ওরিয়েণ্টাল শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার কার্য্যসম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৯৩৩ সনে ইহার ৩৮,১৯১টি জীবন-বীমা বলবৎ ছিল, তাহার পরিমাণ ছিল ৭,০৫,২৬,২০৩ টাকা। ওরিয়েণ্টাল জীবন-বীমা কোম্পানীর দ্বারা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের বিশেষ সাহায্য হইবে। আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি।

প্রবাসী বাঙালীর নববর্ষোৎসব—

বাঙালীরা প্রবাসে থাকিয়াও সামাজিক আমোদ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন—ইহা আশা ও আনন্দের কথা। ব্রহ্মদেশের বেসিন শহরে 'বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে'র সহায়তায় প্রবাসী বাঙালী বালক-বালিকারা গত ১লা বৈশাখ নববর্ষোৎসব পালন করিয়াছে। উৎসবে

বাম দিক হইতে—শ্রীমতী খুকুন বসু, শ্রীমতী সুধা দাস, শ্রীমতী করুণাকণা দেব, শ্রীমতী [illegible] দাস, শ্রীমতী ইন্দু দাস, শ্রীমতী অণিমা ঘোষ, শ্রীমতী রুবি রায়। সম্মুখে—শ্রীমতী নীলিমা ঘোষ।

আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে বালিকারা 'একলব্য' অভিনয় করে। অভিনয় দেখিয়া উপস্থিত জনগণ মুগ্ধ হন।

মহাভারত-সংস্করণে বাঙালী—

গত যুগের সংস্কৃত সাহিত্যসেবিগণের অগ্রগণ্য স্বর্গীয় স্যর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের নামে প্রতিষ্ঠিত পুনার গবেষণা-প্রতিষ্ঠান (Bhandarkar Oriental Institute) বহুবর্ষ যাবৎ সংস্কৃত মহাভারতের একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সম্পাদিত করিবার ভার লইয়াছেন। সম্প্রতি এই সংস্করণের আদিপর্ব্ব পুনার ডক্টর বিষ্ণু সুখথঙ্কর কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রায় হাজার পৃষ্ঠায় বিরাট আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একটি পর্ব্ব নিখুঁত করিয়া সম্পাদন করিতে ছয় বৎসরের উপর সময় লাগিয়াছে, এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিভিন্ন পাঠের জন্য পঞ্চাশখানি পুথি সংগ্রহ করিয়া মিলাইতে হইয়াছে। এই বিরাট অনুষ্ঠান দু-এক জন ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন করা দুরূহ ও বহু সময়সাধ্য বলিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠান মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব্বের সম্পাদনের ভার দেশী ও বিদেশী লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ সুধীগণের উপর দিয়াছেন। পঞ্জাবের ডক্টর রঘুবীর বিরাটপর্ব্ব ও প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিন্টারনিট্‌জ সভাপর্ব্ব সম্পাদন করিতেছেন। এরূপ উদ্যম আমাদের দেশে এই প্রথম, এবং ইহাকে জাতীয় অনুষ্ঠান বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, এই অনুষ্ঠানে বাংলা দেশ হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়কে সম্প্রতি উদ্যোগপর্ব্ব সম্পাদন করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। ডক্টর দে শীঘ্রই এই কার্য্যে যোগদান করিবেন।

রবীন্দ্র-পদক—

"রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাংলার পল্লীচিত্র" নামক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায়, পাটনা ল'কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত রাধামোহন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনিই এ বৎসর "রবীন্দ্র-স্বর্ণপদক" পুরস্কার পাইলেন।

"রবীন্দ্র-জয়ন্তী" উৎসবকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য দিল্লীর বেঙ্গলী ক্লাব 'রবীন্দ্র-পদক' নাম দিয়া প্রতি বৎসর একটি করিয়া স্বর্ণ-পদক পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রবাসের বাঙালী ছাত্র ও ছাত্রীগণের মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুশীলন এই আয়োজনের মুখ্য উদ্দেশ্য।
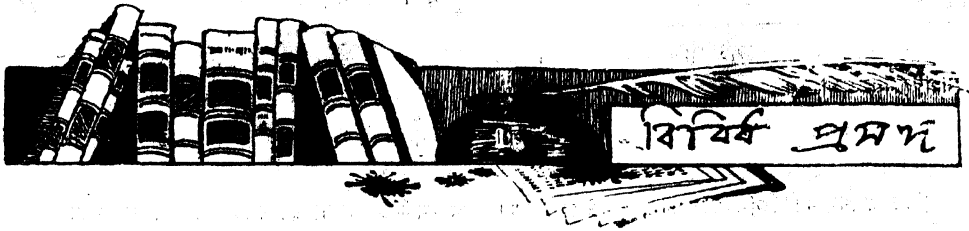
"ভারতী" ঝরণা-কলমের কারখানা

কয়েক দিন পূর্ব্বে আমরা কুমার গোকুলচন্দ্র লাহা এবং কোম্পানীর 'ভারতী' ঝরণা-কলমের কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহাতে নানা দামের ও নানা রকমের ঝরণা-কলম ছাড়া পেন্সিল এবং পেনহোল্ডার ও নিব প্রস্তুত হয়। সোনার যে নিবের ডগায় ইরিডিয়ম ধাতুকণা লাগান থাকে, তা ছাড়া ঝরণা-কলমের অন্য সব অংশই কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া সুখী ও উৎসাহিত হইলাম। ঐরূপ নিবও প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু

ভারতী ঝরণা-কলম কারখানায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখনও ঝরণা-কলমের কাটতি ভারতবর্ষে এত বেশী হয় নাই, যে, তাহাতে বহুমূল্য যন্ত্রপাতি আনাইলেও ঐরূপ নিব বিদেশী নিবের সঙ্গে দামে টক্কর দিতে পারে। পরে উহাও প্রস্তুত হইবে—মূলধনের, যন্ত্রের, কারিগরের অভাব হইবে না; কেবল কাটতি বাড়িলেই সব হইবে। কারিগরের অভাব হইবে না যে বলিতেছি, তাহা বাঙালী কারিগরদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছি। কারণ, এই কারখানায় সামান্য ২।১ জন ছাড়া সব কারিগর ও শ্রমিক বাঙালী। তাহাদের মধ্যে ইংরেজী-জানা প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়া যুবকও আছে। তাহাদের রোজগার সাধারণ কেরানীদের চেয়ে কম নয়।

এই কারখানায় ঝরণা-কলম ছাড়া পেন্সিল এবং পেনহোল্ডার ও নিব প্রস্তুত হয় বলিয়াছি। তাহার সমুদয় অংশই কারখানায় প্রস্তুত হইতে দেখিলাম। ঝরণা-কলমের কালি এবং ক্লিপও এখানে প্রস্তুত হয়।

এই কারখানার অনেকগুলি যন্ত্রও কারখানাতেই বাঙালী কারিগর দ্বারা নির্ম্মিত। ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা ইহার তত্ত্বাবধায়ক, এবং শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ দত্ত বি-এ ও অন্নদা-প্রসাদ শীল বি-এ ইহার কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কারখানা দেখিতে আসিয়া ফাউণ্টেন পেনের ঝরণা-কলম নাম দিয়াছেন।

সূক্ষ্ম এবং শক্ত রকমের কারিগরীর কাজও বাঙালী কারিগরদের দ্বারা হইতে পারে, এই ধারণা আমাদের আগে হইতেই ছিল। তাহার একটি প্রমাণ এই কারখানায় পাইলাম।

—

পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির

কলিকাতার বেলগাছিয়া পল্লীস্থিত এই বিদ্যামন্দিরটি কয়েক দিন পূর্ব্বে আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা নিজের জমীতে নিজের বাড়িতে অবস্থিত। শিক্ষাবিষয়ে ইহার বিশেষত্ব এই, যে, এখানে সাধারণ কেতাবী শিক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাটি কুলেশ্যন পরীক্ষা পর্য্যন্ত দেওয়া হয়, অধিকন্তু অনেক রকমের পণ্যশিল্প এবং কিছু ললিত-কলা শিখান হয়। যে-সব ছাত্র কেবল কারিগরী শিখিতে চায়, তাহাদিগকে সাধারণ শিক্ষার শ্রেণীতে যাইতে হয় না; কিন্তু যাহারা সাধারণ শিক্ষা পায়, তাহাদিগকে কোন দুটি পণ্যশিল্প শিখিতে হয়। যাহারা কেবল কারিগরী শিখিবে, তাহারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর হইলে তাহাদিগকেও লিখনপঠনক্ষম করিয়া দেওয়া ভাল।

এই বিদ্যামন্দিরে কোন ছাত্রকেই বেতন দিতে হয়

না, ইহার ছাত্রবাসেও বারটি ছাত্র বিনাব্যয়ে থাকিতে ও আহার করিতে পারে।

কারিগরী-বিভাগে শিক্ষণীয় বিষয় অনেকগুলি। কর্ম্মকার-বিভাগে ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, নরুন, দা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে দেখিলাম। জিনিষগুলি ভাল, দামও বেশী নয়। সূত্রধরের কাজ, তন্তুবায়ের কাজ, চর্ম্মকারের কাজ, দর্জ্জির

পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরের শিক্ষকগণ ও প্রবাসীর সম্পাদক

কাজ, দপ্তরীর কেতাব বাঁধাইয়ের কাজ, প্রভৃতিও শিখান হয়। সকল বিভাগেই আবশ্যক যন্ত্রপাতি আছে। বেতের সুন্দর সুট-কেস্, সাজি, বারকোশ, প্রভৃতিও প্রস্তুত হইতেছে। এখানে রেখাঙ্কন, চিত্ররঞ্জন ও চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি এবং ফটোগ্রাফীও শিখান হয়। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, যে, এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক ছাত্র নিজের উপার্জ্জন দ্বারা স্বাবলম্বী হইতে পারিয়াছে। তাহা সন্তোষের বিষয়। স্বাবলম্বী হইতে পারা চাই। যাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি আছে, তাহাদেরও নিজে কিছু উপার্জ্জন করিতে পারা আবশ্যক। তাহাতে মানুষের নিজের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বাড়ে।

কারিগরী দ্বারা রোজগার করিয়া যাহাদিগকে খাইতে হইবে, কারিগরী-শিক্ষা কেবল তাহাদেরই আবশ্যক, ইহা একটা ভ্রান্ত ধারণা। হাত-পায়ের দ্বারা নানা রকম কাজ করিতে পারিলে তাহাতে বুদ্ধিবিকাশেরও সাহায্য হয়। এই জন্য কোন-না-কোন রকম কারিগরী শিক্ষা করা সকল বালক-বালিকারই উচিত। শিক্ষার প্রণালী ভাল হইলে সাধারণ কেতাবী সমুদয় বিষয় শিখিয়াও কিছু কারিগরী শিখিবার সময় তাহাদের যথেষ্ট হইতে পারে।

পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরে ম্যাট্রিকুলেশ্যন পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ইহাকে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বিদ্যালয়সকলের তালিকাভুক্ত করা হয় নাই। ইহার ছাত্রেরা প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে ম্যাট্রিক দিতে পারে। ইহাতে কিছু অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু সুবিধাও আছে। সকল মানুষের, সকল বালক-বালিকার, প্রকৃতি, শক্তি, প্রবৃত্তি এক রকম নয়। সুতরাং একই রকমের শিক্ষা সকলের উপযোগী হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন, শিক্ষাপ্রণালীও নানা প্রকার আছে; তাহার মধ্যে কোন্‌টি সব দিক দিয়া ভাল এবং কোন্‌টি সব দিক দিয়া মন্দ, এরূপ বলা যায় না। শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতি সাধনের জন্য নানাবিধ পরীক্ষণ (experiment) আবশ্যক। যদি সব বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লইতে হয়, তাহা হইলে সবগুলাই এক ধাঁচের, সবগুলার শিক্ষিতব্য বিষয় ও পাঠ্যপুস্তক এক রকম, এবং সবগুলার শিক্ষাপ্রণালী একই প্রকার হয়। তাহা হইলে বালক-বালিকাদের প্রকৃতি, শক্তি ও প্রবৃত্তিভেদে শিক্ষার প্রকারভেদ করা যায় না। শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধনের জন্য পরীক্ষণও হয় না। এই জন্য আমাদের বিবেচনায় এমন কতকগুলি বিদ্যালয় থাকা আবশ্যক যেগুলির পরিচালকগণ শিক্ষাদান বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা করেন, কিংবা স্বাধীন চিন্তায় সমর্থ শিক্ষকদের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ। এরূপ বিদ্যালয় ছাত্রদত্ত বেতনে না চলিবার সম্ভাবনা। এই জন্য তাহার স্বতন্ত্র আয় থাকা আবশ্যক। পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরের তাহা আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বিদ্যালয় হইতে কোন ভাল ছাত্র বিশেষ পারদর্শিতার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সরকারী বৃত্তি পায়। অননুমোদিত বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইলে তাহা পায় না। এই জন্য বেশ বুদ্ধিমান ছেলেরা অননুমোদিত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি না হইতে পারে। কিন্তু এরূপ বিদ্যালয় হইতে বিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য কয়েকটা বৃত্তি রাখিলেই ভাল ছাত্র পাওয়া যাইতে পারে। আমরা এই কথা বলায় পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে এত কথা বলিবার কারণ এই যে, এইরূপ বিদ্যালয় আরও হওয়া আবশ্যক। সম্ভবতঃ বাংলা দেশে ইহাই এই শ্রেণীর একমাত্র বিদ্যালয় নহে।

—

মহাত্মা গান্ধীর কলিকাতা আগমন

হিন্দু সমাজের অবনত জাতিসমূহের উন্নতিবিধানার্থ এবং তাহাদিগকে মনুষ্যোচিত সামাজিক মর্য্যাদা দিয় সমাজদেহের সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম অঙ্গে পরিণত করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। কলিকাতায় তাঁহার আগমন তাঁহার ভ্রমণের একটি অংশ। প্রবাসী মাসিক কাগজ। দৈনিক কাগজের মত ঠিক্ তাঁহার আগমনের আগের দিন বা আগমনের দিন তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার সুযোগ আমাদের হইবে না। সেইজন্য আমরা আগে হইতেই সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি।

হিন্দু সমাজে কয়েক শতাব্দী আগে হইতে যে ভাঙন ধরিয়াছে এবং যাহা এখনও চলিতেছে তাহার একটি প্রধান কারণ অবনতশ্রেণী-সমূহের অবস্থা, তাহাদের নানা মনুষ্যোচিত অধিকার না থাকা, তাহাদের সমুচিত মর্য্যাদার অভাব, তাহাদের নানা অপমান এবং তাহাদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন। ভারতীয় যত মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ বা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের অধিকাংশ বিদেশ হইতে আসেন নাই। হিন্দু সমাজের লোকেরা মোহম্মদীয় ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করায় এই দুই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে। এই বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ হিন্দু সমাজে অবনত শ্রেণীর লোকদের অবস্থা। আমাদের মত যাঁহারা কোন কোন বিষয়ে সামাজিক বিদ্রোহ করিয়াছেন, তাঁহারাই যে একথা বুঝিয়াছেন ও বলিতেছেন তাহা নহে, যাঁহারা বিদ্রোহ করেন নাই, তাঁহারাও তাহা বুঝিয়াছেন ও বলিতেছেন, এবং অবনত শ্রেণীসকলের উন্নতির জন্য নানা দিকে চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা মহাত্মা গান্ধীর ভারতীয় কার্য্যক্ষেত্রে—বিশেষতঃ সমাজসংস্কারক্ষেত্রে—অবতীর্ণ হইবার অনেক পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে

মহাত্মা গান্ধী

এই কার্য্যক্ষেত্রে তিনিই প্রধান পুরুষ, তিনিই প্রধান কর্ম্মী।

তিনি যাহা করিতেছেন, হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য তাহা একান্ত অবশ্যক। হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার প্রয়োজনও আছে। মুসলমানদের ও খ্রীষ্টিয়ানদের সমাজের কতকগুলি উৎকর্ষ আছে বটে, কিন্তু হিন্দু সমাজের হিন্দু সংস্কৃতির এবং হিন্দু প্রকৃতিরও কতকগুলি উৎকর্ষ আছে। হিন্দু সমাজ রক্ষিত না হইলে [illegible] সব উৎকর্ষগুলির তিরোভাব হইতে পারে এবং তাহাতে মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই সব কুফল নিবারণের জন্য হিন্দু সমাজকে সুস্থ ও জনবহুল এবং শক্তিমান রাখা আবশ্যক।

কিন্তু যদি হিন্দু সমাজকে এইরূপ অবস্থায় উন্নীত করিয়া রক্ষার প্রয়োজন না থাকিত, তাহা হইলেও হিন্দু অবনত জাতি-সমূহের উন্নতি বিধান আবশ্যক হইত। মানবজাতির কোন অংশকেই হীন করিয়া রাখা বা হীন থাকিতে দেওয়া গর্হিত, অনুচিত, অধর্ম্ম।

এই সব বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, যে, মহাত্মা গান্ধী অতি মহৎ কাজ করিতেছেন। তাঁহার সহিত কোন কোন বিষয়ে আমাদের মতভেদ আছে। তাহা আমরা আমাদের বাংলা ও ইংরেজী মাসিক-পত্র দুটিতে প্রয়োজন-মত জানাইয়াছি, পরেও আবশ্যক হইলে জানাইব। তাঁহার সহিত কচিৎ কখন যে পত্রব্যবহার হয়, তাহাতেও আমরা এই মতভেদ গোপন করি না। কিন্তু কাহারও সহিত কোন কোন বিষয়ে মতভেদ থাকিলে অন্য যে-সব বিষয়ে ঐক্য আছে, তাহার নিমিত্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না, এরূপ মনে করা ভুল।

[এই প্রসঙ্গটি ছাপিতে যাইবার পূর্ব্বে কাগজে দেখিলাম, গান্ধীজী এখন বাংলা দেশে আসিবেন না। ইহা দুঃখের বিষয়। কিন্তু আমাদের স্বাগতসম্ভাষণ স্থগিত রহিল না, বাতিলও হইল না! এ-বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী কিংবা বঙ্গদেশের "গান্ধী অভ্যর্থনাসমিতি" আমাদের উপর হুকুমজারী করিতে অসমর্থ!]

—

প্রমথনাথ বসু

প্রায় আশী বৎসর বয়সে রাঁচীতে সুপণ্ডিত ও সুলেখক, ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর অনুরাগী এবং সমর্থক প্রমথনাথ বসু মহাশয় পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু ছোটনাগপুর নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ভারতবর্ষের বাহিরে যাঁহারা ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব অনুভব করেন, তাঁহারাও এই ক্ষতি অনুভব করিবেন।

তিনি কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছিলেন নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে, কিন্তু পরে নিজের চেষ্টায় সাহিত্য

পরলোকগত প্রমথনাথ বসু

ও দর্শনেও জ্ঞানবান ও পারদর্শী হয়েন। তিনি তাঁহার গ্রন্থাবলী ও নানা প্রবন্ধ দ্বারা স্বদেশবাসীদিগকে সেই জ্ঞানের অংশী করিয়া গিয়াছেন।

তিনি গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লইয়া বিলাত যান এবং সেখানে প্রধানতঃ ভূতত্ত্ব এবং তাহার সঙ্গে অন্য কোন কোন বিজ্ঞান শিখিয়া ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ভূতত্ত্ব-বিভাগে চাকরী গ্রহণ করেন। চাকরী তিনি দক্ষতা ও স্বাধীনচিত্ততার সহিত করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় লোক বলিয়াই তাঁহার অধস্তন একজন ইংরেজ কর্ম্মচারীকে তাঁহাকে ডিঙাইয়া উচ্চপদ দেওয়ায় তিনি ১৯০৩

সালে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গোরুমহিষানী, বাদামপুর, পাঁচপীর ও কালীমাটিতে তিনি লৌহ আবিষ্কার করেন। তিনিই মিঃ জামশেদজী টাটাকে জামশেদপুরে লোহা ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করিতে পরামর্শ দেন, এবং তদনুসারে সেইখানে কারখানা স্থাপিত হয়। ইহা এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রধান এবং পৃথিবীর অন্যতম প্রধান লোহা-ইস্পাতের কারখানা।

সরকারী চাকরী ছাড়িয়া দিবার পর তিনি ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ভূতত্ত্ববিৎ নিযুক্ত হন এবং তখন গোরুমহিষানীতে লৌহের খনি আবিষ্কার করেন। তাঁহাকে ময়ূরভঞ্জের স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। মহারাজা অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন। যোগেশ বাবু একদা তাঁহাকে বলেন, "তোমার রাজ্যে কোথায় কি বহুমূল্য সম্পদ আছে, তাহা তুমি জান না; তুমি কিরূপ মহারাজা?" অতঃপর বসু মহাশয় ভূতত্ত্ববিদের কার্য্যে নিযুক্ত হন। গবর্ন্মেণ্টের চাকরীতে থাকিবার সময় তিনি জব্বলপুর ও দার্জ্জিলিঙে কয়লা এবং রায়পুর জেলায় গ্র্যানাইট ও অন্যান্য খনিজ আবিষ্কার করেন।

প্রমথনাথ বসু মহাশয় চরিত্রবান্, বিনয়ী পুরুষ ছিলেন। লোহার খনি আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

"Well, to compare small things with great, I discovered them in the sense that Amerigo Vespucci is said to have discovered the continent which is called after him. But, as I have shown in my *Epochs of Civilization*, for many centuries before him it was well known to the Asiatics, and the Chinese and the Japanese had probably small settlements there. All that Amerigo and Columbus a few years before him did was to bring it to the notice of the Europeans. The iron ores of Mayurbhanj had long been worked by the smelters of the State before I came upon them. All that I did was to make them known to the industrial public."—*Tisco Review*, April 1933, p. 18.

সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য। বড় জিনিবের সঙ্গে ছোট জিনিবের তুলনা করিলে বলা যায়, যে, আমেরিগো ও কোলম্বস্ যে-অর্থে আমেরিকার আবিষ্কারক, আমিও সেই অর্থে গোরুমহিষানী প্রভৃতি স্থানের লোহার খনির আবিষ্কারক। আমার "সভ্যতার যুগাবলী" গ্রন্থে দেখাইয়াছি, যে, তাঁহাদের অনেক শতাব্দী আগে এশিয়াবাসীরা আমেরিকার অস্তিত্ব অবগত ছিল এবং চৈনিক ও জাপানীদের বোধ হয় সেখানে ছোট ছোট উপনিবেশ ছিল। আমি ময়ূরভঞ্জের লোহার খনিগুলির সন্ধান পাইবার অনেক আগে হইতে সেই রাজ্যের লৌহদ্রাবক ও সংশোধকেরা তথাকার অসংস্কৃত খনিজ হইতে লৌহ প্রস্তুত করিত। আমি কেবল আকরগুলিকে কারখানাশিল্পব্যবসায়ীদের গোচর করিয়াছিলাম।"

টাটা কোম্পানী জামশেদপুর কারখানার যে প্রস্পেক্টস বা অনুষ্ঠানপত্র বাহির করেন, তাহাতে বসু মহাশয়কে আকরগুলির আবিষ্কারক না বলিয়া এইরূপ ধারণা জন্মান হয়, যে, সেগুলি স্বর্গীয় জামশেদজী টাটা মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত খনিজ-অনুসন্ধান চেষ্টাবলীর ফল। যথা—

"...the first prospectus of The Tata Iron and Steel Company .... created the impression that the discovery .... was made in the course of the prospecting operations instituted by the late Mr. J. N. Tata."

ইহা সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ায় তিনি টাটা কোম্পানীর অন্যতম কর্ম্মী মিঃ বি জে পাদশাহকে চিঠি লেখেন। সেই চিঠির নিম্নমুদ্রিত উত্তরে বসু মহাশয়ের কথাই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। যথা :—

Navsari Buildings, Bombay,
3rd July, 1907.

Dear Mr. Bose,

Your statement of facts is perfectly correct, and I shall bear it in mind when we come to the publishing of a final prospectus. In a commercial document one is not always able to reserve place for giving due credit to every one, but it is perfectly fair that the document should not be so worded as to imply that credit elsewhere than where it is due.

তাৎপর্য্য। প্রিয় মিঃ বসু, আপনার তথ্যসমূহের বর্ণনা সম্পূর্ণ নির্ভুল। আমাদের শেষ প্রস্পেক্টস্ বাহির করিবার সময় আমি ইহা মনে রাখিব। ব্যবসাঘটিত দলিলে প্রত্যেককে তাঁহার ন্যায্যপ্রাপ্য প্রশংসা দিবার নিমিত্ত জায়গা সব সময়ে রাখা যায় না; কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, যে, দলিলটির বয়ান এরূপ হওয়া উচিত নয় যাহাতে একজনের প্রাপ্য প্রশংসা অন্যের প্রাপ্য বলিয়া বুঝায়।"

টাটা-কোম্পানী শেষ প্রস্পেক্টস্ বাহির করিয়াছিলেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে তাহাতে বসু মহাশয়ের কৃতিত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল কিনা, জানি না। কিন্তু ইহা সন্তোষের বিষয় যে সম্প্রতি জামশেদপুরে কারখানার সাধারণ ম্যানেজার কীনান সাহেবের সভাপতিত্বে যে সর্ব্বসাধারণের সভা হয়, তাহাতে প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের কীর্ত্তি প্রশংসিত এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কীনান সাহেব আমেরিকান। ইহাও বক্তব্য, যে, জামশেদপুরের কারখানায় বসু মহাশয়ের পুত্রেরা যথাযোগ্য কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন।

আজকাল কেহ বিদ্যালাভ, বাণিজ্য বা দেশভ্রমণের জন্য সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে গেলে, দেশে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। বসু মহাশয় পঞ্চাশ

বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে যখন শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন, তখন কুশদহ সমাজ তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন। তিনি রাজী হন নাই, প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই।

দেশে ফিরিয়া আসিবার পর এবং রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় তাঁহার পোষাক, চালচলন, ও জীবনযাত্রা-প্রণালী ছিল ইংরেজদের মত। কিন্তু পরে তিনি সাহেবিয়ানা বর্জ্জন করিয়া সাবেক বাঙালী ভদ্রলোকদের মত থাকিতেন। স্বাদেশিকতার জন্য, দেশের লোকদের সহিত সংহতি ও সহানুভূতি রক্ষার জন্য, জাতীয় আত্মসম্মান রক্ষার নিমিত্ত, তাহা আবশ্যক। কিন্তু তাহাতে এদেশে আরামও বেশী পাওয়া যায়, এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘজীবন-লাভেরও তাহা উপযোগী।

মহাত্মা গান্ধীর ভ্রমণ-রীতির পরিবর্ত্তন

মহাত্মা গান্ধী রেলে, ষ্টীমারে, মোটরকারে—যখন যেখানে আবশ্যক ও সুবিধা হয়, সেই খানে ভ্রমণ করেন। ইহাতে অল্প সময়ের মধ্যে বহু স্থানে গিয়া তথাকার লোকদের মধ্যে নিজের মত প্রচার করিবার সুবিধা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক জায়গার কর্ম্মীদিগকে পরামর্শ দেওয়া ও উৎসাহিত করাও এই প্রকারে সম্ভব হয়।

তিনি এখন এই রীতি কতকটা পরিবর্ত্তন করিবেন। তিনি বলিয়াছেন, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে হাঁটিয়া যাইবেন। ইহাতে সময় বেশী লাগিবে এবং পরিশ্রমও অধিক হইবে। কিন্তু ইহার একটি ভাল দিক, সুবিধার দিকও আছে। ইহাতে সাধারণ লোকদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও ঐক্য, তাঁহার একাত্মতা বাড়িবে। তাঁহার সত্য প্রভাব তাহারা বেশী করিয়া অনুভব করিতে পারিবে। ইহা কালসাপেক্ষ বটে। কিন্তু প্রাচীন কালে বুদ্ধদেবের মত উপদেষ্টাকেও প্রধানতঃ পদব্রজেই প্রচারকার্য্য চালাইতে হইয়াছিল; রেল, ষ্টীমার, মোটরগাড়ী তখন ছিল না। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বাণীর ও জীবনের প্রভাব কম অনুভূত হয় নাই।

পদব্রজে ভ্রমণের যে কারণ মহাত্মা গান্ধী নিজে বলিয়াছেন, তাহা দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে।

"সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোআরার প্রত্যাশিত ফল"

বঙ্গের ১৯৩২-৩৩ সালের সরকারী শাসনবিবরণীতে বঙ্গের দেশী খবরের কাগজগুলির সাধারণ সুর সম্বন্ধীয় অনুচ্ছেদ এই বলিয়া শেষ করা হইয়াছে :—

"The most noticeable feature of the year was the growing cleavage between the Hindu and Moslem press, and the gradual disappearance of the nationalist section in the latter. The anticipated effects of the Communal Award on the division between the two communities of powers to be transferred by the new constitution mainly contributed to this development." P. 175.

তাৎপর্য্য। হিন্দু সংবাদপত্রসমূহ ও মুসলমান সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান মতপার্থক্য বা ছাড়াছাড়ি এবং মুসলমান সংবাদপত্রসমূহের মধ্য হইতে ন্যাশন্যালিষ্ট কাগজগুলির ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধান এই বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষিতব্য বিশেষত্ব। নূতন শাসনবিধিদ্বারা যে-সব ক্ষমতা দেশের লোককে দেওয়া হইবে, তাহা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিরূপ ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে, প্রধানতঃ তদ্বিষয়ক "সাম্প্রদায়িক মীমাংসা"র প্রত্যাশিত ফলেই এইরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে।

উদ্ধৃত ইংরেজী শেষ বাক্যটিতে আছে "য়্যান্টিসিপেটেড্ এফেক্টস্"। ইংরেজী য়্যান্টিসিপেট শব্দটির মানে পূর্ব্বাববোধ করা, পূর্ব্বসিদ্ধান্ত করা, প্রত্যাশা করা। তাহা হইলে বঙ্গের শাসন-বিবরণীতে বলা হইতেছে, যে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যে সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোআরা করিয়াছেন, তাহার ফল কি হইবে, তাহা আগে হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল, প্রত্যাশা করা হইয়াছিল। সেই ফল হিন্দু ও মুসলমান সাংবাদিকদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান মতানৈক্য এবং মুসলমান সংবাদপত্র-জগৎ হইতে স্বাজাতিক বা জাতীয়তাবাদী বা ন্যাশন্যালিষ্ট কাগজগুলির ক্রমিক তিরোভাব। এই তিরোভাবের মানে এই হইতে পারে, যে, ন্যাশন্যালিষ্ট মুসলমান কাগজগুলি একটি একটি করিয়া উঠিয়া গিয়াছে, কিংবা যাহারা আগে ন্যাশন্যালিষ্ট ছিল তাহারা ক্রমে ক্রমে সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত হইয়াছে। মানে যাহাই হউক, শাসনবিবরণী বলিতেছেন, হিন্দু ও মুসলমান সাংবাদিকদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান অনৈক্য হইয়াছে, এবং সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরার ফল যে এইরূপ হইবে, তাহা প্রত্যাশা করা গিয়াছিল।

সাধারণতঃ সাংবাদিকরা যে-দলের লোক সেই দলের ভাব, চিন্তা, মত প্রকাশ করেন। সুতরাং সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোআরার ফলে হিন্দু ও মুসলমান খবরের কাগজওয়ালাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, ইহা বলার মানে, ঐ ভাগবাঁটোআরার

ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরার ফল যে এইরূপ হইবে, সরকারী রিপোর্টে বলা হইয়াছে, যে, তাহা আগে হইতেই বুঝা গিয়াছিল, প্রত্যাশা করা হইয়াছিল।

"কে বা কাহারা এই প্রত্যাশা করিয়াছিল," এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠিতেছে। কে ইহার উত্তর দিবে? যখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এই ভাগবাঁটোআরা করেন, তখন তিনি কি এই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন? তিনি ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন সরকারী কাজ করেন না। সুতরাং সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরা ঘোষিত হইবার পূর্ব্বে তিনি তাহাতে ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের সম্মতি পাইয়াছিলেন ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, "ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডল কি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, যে, সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোআরার ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে?" ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ব্যাপারসমূহে ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা সাধারণতঃ ভারতীয় গবন্মেণ্টের মত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে তাহা করা হইয়া থাকিলে প্রশ্ন উঠে, "ভারতীয় গবন্মেণ্ট কি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, যে, সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোআরার ফলে হিন্দু-মুসলমানে বিচ্ছেদ ক্রমবর্দ্ধমান হইবে?"

বঙ্গের আলোচ্য শাসনবিবরণীটি হইতে এই সকল প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় না। বরং কোন অসুবিধাজনক সমালোচনা হইতে আত্মরক্ষার জন্য বঙ্গীয় গবন্মেণ্ট রিপোর্টটির উপক্রমণিকায় বলিয়া রাখিয়াছেন :—

"The Report is published under the authority and with the approval of the Government of Bengal but this approval does not necessarily extend to every particular expression of opinion."

তাৎপর্য্য। "এই রিপোর্টটি বাংলা-গবন্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে ও তদীয় অনুমোদন অনুসারে প্রকাশিত হইল, কিন্তু এই অনুমোদন রিপোর্টে প্রকাশিত প্রত্যেক মত সম্বন্ধে নিশ্চয়ই প্রযোজ্য, এরূপ বুঝা চলিবে না।"

ভারতবর্ষীয় গবন্মেণ্টের এবং ভারতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের সমালোচকেরা কখন কখন বলিয়া থাকেন, যে, উক্ত দুই গবন্মেণ্ট কখন কখন ভেদনীতি অবলম্বন করেন। কিন্তু তাঁহারা বরাবরই উত্তর দিয়া আসিয়াছেন, যে, তাঁহারা তাহা করেন না—তাঁহারা সকল সম্প্রদায়ের ঐক্যই চান। এই জন্য, এখন ব্রিটিশ ও ভারতীয় প্রধান রাজপুরুষদের বলা উচিত, যে, সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরার এইরূপ ফল হইবে, আগে হইতেই তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা।

—

বঙ্গের গবর্ণরকে বধ করিবার চেষ্টা

সে দিন দার্জিলিঙে ঘোড়দৌড়ের মাঠে বঙ্গের বর্ত্তমান গবর্ণর স্যর জন এণ্ডার্সনের উপর গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু তিনি সৌভাগ্যক্রমে নিহত ত হনই নাই, আহতও হন নাই। আততায়ী বলিয়া কয়েক জন বালক ও যুবক ধৃত হইয়াছে।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বঙ্গদেশ হইতে সন্ত্রাসন এখনও তিরোহিত হয় নাই।

উচ্চ বা নিম্নপদস্থ সরকারী লোকদিগকে হত্যা ও হত্যার চেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা যাহা বলিতে পারি, তাহা বহু বৎসর ধরিয়া বার-বার বলিয়াছি। সেই কারণে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। কিন্তু অনাবশ্যক পুনরুক্তিও করিতাম, যদি তাহাতে কোন ফল হইত। কিন্তু অন্য অনেক সম্পাদকের মত আমরা বার-বার নানা কথা বলা সত্ত্বেও দেখা যাইতেছে, যে, বিপ্লবেচ্ছু ও সন্ত্রাসনবাদীদের কোন মতিপরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহার কারণ হয়ত এই, যে, আমরা যাহা লিখি তাহা তাহারা পড়ে না, কিংবা পড়িলেও তাহা তাহারা উপেক্ষারই যোগ্য মনে করে।

এরূপ হইবার একটা কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, বিপ্লবেচ্ছু ও সন্ত্রাসনবাদীরা যে যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া নিজেদের কাজে প্রবৃত্ত হয়, আমরা সেই যুক্তমার্গ অবগত না থাকায় তাহা খণ্ডন করিতে পারি না, খণ্ডন করিবার চেষ্টাও করিতে পারি না।

শুধু তর্ক-যুক্তির দ্বারাই যে সন্ত্রাসনবাদীদের মতি পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায় নাই, তাহা নহে, শাস্তি ও ভয়ের দ্বারাও পারা যায় নাই। আমাদের তর্কযুক্তি তাহাদের নিকট না-পৌছিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু অনেক সন্ত্রাসকের ফাঁসী বা দ্বীপান্তর বা অন্য গুরুতর শাস্তির সংবাদ তাহাদের নিকট নিশ্চয়ই পৌছে; সন্ত্রাসন দমনের জন্য যে কঠোরতম আইন প্রণীত হইয়াছে তাহা তাহারা নিশ্চয়ই জানে; সন্ত্রাসক এবং সন্ত্রাসক বলিয়া সন্দেহভাজন লোকদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত লোক, এবং অপরিচিত প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত যে সন্ত্রাসকদের কাজের জন্য নানা দুঃখ ও

ক্ষতি সহ্য করিতে বাধ্য হয়, ইহাও সন্ত্রাসকেরা নিশ্চয়ই জানে। কিন্তু ভয়ে বা সন্ত্রাসনকার্য্যের সহিত সম্পর্কবিহীন ঐ সব লোকদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া দয়াবশতঃ সন্ত্রাসকদের মতি পরিবর্ত্তন হয় নাই, দেখা যাইতেছে।

আমরা যে বার-বার মতিপরিবর্ত্তনের কথা বলিতেছি, তাহার কারণ আছে। গবন্মেণ্ট খুব বেশী টাকা খরচ করিয়া, খুব বেশী গোয়েন্দা পুলিস এবং সাধারণ রক্ষী পুলিশ নিযুক্ত করিয়া সন্ত্রাসনকার্য্য (acts of terrorism) খুব কমাইয়া ফেলিতে পারেন, এমন কি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য একটিও ওরূপ ঘটনা না ঘটিতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ত্রাসকদের মতিপরিবর্ত্তন ও হৃদয়ের পরিবর্ত্তন না হইতেছে ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হওয়া চলিবে না; সর্ব্ববিধ সতর্কতার মধ্যেও তাহারা কোন্ ফাঁক দিয়া কি করিয়া বসিবে, এ উদ্বেগ সর্ব্বদাই থাকিয়া যাইবে।

এই জন্য, এক দিকে যেমন মানুষের চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে যাহা আসে এমন সর্ব্ববিধ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, তেমনি মতিপরিবর্ত্তনের উপায় চিন্তাও করিতে হইবে।

কি উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসকেরা সন্ত্রাসনকার্য্যে ব্যাপৃত হয়, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তন করা যদি তাহাদের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাহাদের অনুষ্ঠিত সরকারী লোকদের প্রাণবধ বা বধের চেষ্টার দ্বারা তাহা হইতে পারে না।

—

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের "আপীল"

কিছুদিন হইল অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত বঙ্গের পুত্রকন্যাদের উদ্দেশে সন্ত্রাসন চেষ্টা হইতে সকলকে নিবৃত্ত করিবার জন্য ইংরেজীতে একটি "আপীল" প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি উহা আমাদিগকে গত মার্চ্চ মাসে দেখান। আমরা তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, যে, আমাদের যদি ওরূপ কিছু লিখিবার ও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে অনেকটা অন্য রকমে লিখিতাম; কিন্তু ও-বিষয়ে কিছু লিখিয়া দেখিয়াছি কোন ফল হয় না, হইবেও না, সুতরাং ওরূপ কিছু লিখিতে চাই না, কেহ লিখিলে তাহাতে দস্তখতও করিতে চাই না। এইরূপ আরও অনেক কথা হইয়াছিল। তাহা লেখা অনাবশ্যক। শেষ ফল দাঁড়ায় এই, যে, তিনি সন্ত্রাসনবাদ নিরসনচেষ্টায় আমার সহানুভূতিজ্ঞাপক কিছু লেখা পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় এবং সেরূপ সহানুভূতি আমার থাকায়, আমি তাঁহাকে গত ২৩শে মার্চ্চ লিখিয়া পাঠাই :—

"Though I think the terrorist mentality as well as terrorist policy and actions can disappear mainly, if not only, as the result of political, politico-economic and economic changes of a radical character, yet on principle as a journalist I have argued against terrorism of all descriptions on various occasions, particularly in my Bengali magazine *Prabasi*. But there is nothing to show that terrorists of any kind have either found my arguments convincing to any appreciable extent or have even considered them. I shall, however, be glad indeed, if Mr. J. N. Gupta's appeal succeeds where my arguments have failed.

March 23, 1934. Ramananda Chatterjee."

সন্ত্রাসনবাদ নিরসনের চেষ্টার সহিত আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন, কোন কোন কাগজওয়ালা মনে করিয়াছেন আমি তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছি, কেহ বা লিখিয়াছেন আমি তাহার অন্যতম সমর্থক বা অনুমোদক। কিন্তু আসল কথা তাহা নহে। সন্ত্রাসনবাদ নির্ম্মূল হয় ইহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে চাই। কিন্তু মিঃ গুপ্ত যাহা কিছু লিখিয়াছেন, যে-যে যুক্তিমার্গের অনুসরণ করিয়াছেন, সবগুলিরই আমি সমর্থন করি, এরূপ মনে করা ভুল; যাহা কিছু বলা দরকার তিনি সবই বলিয়াছেন, তাহাও আমি মনে করি না। কিন্তু তাঁহার অনেক কথা সত্য।

উপরে বলিয়াছি, সন্ত্রাসনবাদ নিরসনের চেষ্টার সহিত আমার সহানুভূতি আছে। গবন্মেণ্টের উহার নিরসনের ইচ্ছারও আমি সমর্থক। কিন্তু তদর্থে গবন্মেণ্টের প্রত্যেকটি চেষ্টা ও উপায়ের সমর্থন করিতে পারি না, কোন কোনটির সমর্থন করি।

—

সন্ত্রাসক কার্য্যের তালিকা

রাষ্ট্রীয় পরিষদের গত মাসের এক অধিবেশনে শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ হ্যালেট বলেন, যে, গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বাংলায় সন্ত্রাসক ঘটনা মোট ২১০টি হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৩১টি খুন, অত্যাচারের চেষ্টা ৩৭টি, ডাকাইতি ৭৬টি, ডাকাইতির উদ্যম ৭টি, লুণ্ঠন ৪৬টি, লুণ্ঠনের চেষ্টা ১৪টি, বোমানিক্ষেপ ১০টি, বোমা-ফাটান ৫টি, সশস্ত্র লুণ্ঠন কার্য্য ১টি ও উপরিউক্ত শ্রেণীভুক্ত নহে এরূপ অত্যাচার ১টি হইয়াছে।

বাংলায় রাজপুরুষ ও অন্যান্য যাঁহারা নিহত হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা ১১৪।

ঐ সময়ের মধ্যে অন্যান্য প্রদেশে যে-সব সন্ত্রাসক অত্যাচার হইয়াছে, তাহার মধ্যে মাদ্রাজে ৬, বোম্বাইএ ১৭, বিহার ও উড়িষ্যায় ১৪, আসামে ১৩, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৬, মধ্যপ্রদেশে ৬, ব্রহ্মে শূন্য, যুক্ত-প্রদেশে ৩৬, পঞ্জাবে ২০ এবং দিল্লীতে ৪—মোট ১২২টি হইয়াছে।

বাংলা ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশে যত লোক নিহত হইয়াছে. তাহার মধ্যে ৫ জন রাজপুরুষ এবং অন্যান্য লোকের মধ্যে ২১ জন। আহতের সংখ্যা রাজপুরুষদের মধ্যে ২২ জন এবং অন্যান্য ৩১ জন।

বাংলা দেশে যে এত বেশী নরহত্যা আদি হইতেছে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু এই দুষ্কর্ম্মগুলা যে সমস্তই সন্ত্রাসনবাদীরা করিতেছে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই কাজগুলার সমস্তই করা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ নাই। অবশ্য, উদ্দেশ্য যাহাই হউক, এরূপ কাজ যাহারা করে, তাহাদের শাস্তি হওয়া উচিত, এবং যাহাতে এরূপ দুষ্কার্য্য নিবারিত হইতে পারে, তাহারও চেষ্টা হওয়া উচিত।

কিন্তু কি কারণে ও কি উদ্দেশ্যে এই সব অপরাধে মানুষ প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান অনাবশ্যক নহে। কারণ ও উদ্দেশ্য না জানিলে প্রতিকার হয় না। উদ্দেশ্য ও কারণ প্রধানতঃ রাজনৈতিক হইলে, প্রতিকারও প্রধানতঃ রাজনৈতিক উপায়ে করা দরকার হইতে পারে। আর যদি কারণ ও উদ্দেশ্য প্রধানতঃ আর্থিক হয়, তাহা হইলে প্রতিকারও প্রধানতঃ অর্থনীতির পথে আবিষ্কার করিতে হইবে।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে যে সংখ্যাগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বাংলা দেশেই অধিকাংশ উপদ্রব হইতেছে প্রমাণ হয় বটে, কিন্তু মার্চ্চ মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্যর হ্যারি হেগ যে বলিয়াছিলেন, রাজনৈতিক হত্যা বাংলা দেশের একচেটিয়া, তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হইতেছে।

এই সব উপদ্রব ভারতবর্ষের অন্য সব অংশের চেয়ে বাংলা দেশে বেশী হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, আধুনিক সময়ে বঙ্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস অন্য সব প্রদেশ হইতে কতকটা ভিন্ন রকমের এবং বাঙালীর স্বভাবও অন্য প্রদেশের ভারতীয়দের স্বভাব হইতে কিছু পৃথক রকমের।

কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ও ভারতীয় নেতারা যদি মনে করিয়া থাকেন, যে, সন্ত্রাসকজাতীয় মনুষ্য কেবল বাংলা দেশেই আছে বা ভারতবর্ষেই আছে, তাহা হইলে ইহা তাঁহাদের একটা মস্ত ভুল। পৃথিবীর অন্য অনেক দেশেও সন্ত্রাসককার্য্য চলিতেছে। আমাদের ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এ নয়, যে, যেহেতু অন্যান্য দেশেও ইহা হইতেছে অতএব ইহা নির্দ্দোষ বা মামুলী, সুতরাং ইহার কোন প্রতিকার অনাবশ্যক। আমরা যাহা বলিতে চাই তাহা এই যে, সমস্যাটির সম্মুখীন অন্য অনেক দেশের লোককেও হইতে হইয়েছে। অতএব সেই সব দেশের নেতৃস্থানীয় লোকেরা এবং মানবজাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা এই সমস্যার সমাধানকল্পে কি পরামর্শ দেন তাহা জানা দরকার। দুষ্কর্ম্ম বন্ধ করিবার ও বন্ধ রাখিবার জন্য শাস্তি ও বলপ্রয়োগ কখন কখন আবশ্যক হইতে পারে,—তাহার আলোচনা এখানে করিতেছি না। কিন্তু দুষ্কর্ম্মের প্রবৃত্তি বিনষ্ট করিতে হইলে হৃদয়মনের যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা কেবল শাস্তি ও বলপ্রয়োগ দ্বারা হইতে পারে না। তাহার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এবং সামাজিক ব্যবস্থাকে ন্যায় ও মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করা আবশক।

চরিত্রহীনতার জন্য পদচ্যুতি

সিংহলের ব্যবস্থাপক সভার-সভাপতি কোন কুলবধূর সর্ব্বনাশ করায় তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয়। বিচারে তাহাকে পঁচিশ হাজার টাকা খেসারত দিতে হয়। এই ব্যক্তিকে সিংহলবাসীরা সভাপতির পদ হইতে তাড়াইয়াছেন, অধিকন্তু তাঁহাকে রাজনৈতিক সব কাজ হইতে দূর করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

পার্নেলের মত শক্তিমান আইরিশ নেতাকে চরিত্রহীনতার জন্য রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইতে হইয়াছিল। স্যর চার্লস্ ডিল্ক ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দলের একজন বড় নেতা ছিলেন। চরিত্রহীনতার জন্য তাঁহাকেও নেতৃত্ব হারাইতে হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে বাংলা দেশ এ-বিষয়ে কোন সৎ দৃষ্টান্ত দেখাইবার সাহস ও ক্ষমতা রাখে কি?

বঙ্গের নারীদের উপর অত্যাচার

আমরা বৈশাখের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, যে, বঙ্গের ১৯৩২-৩৩ সালের সরকারী শাসনবিবরণীতে ইহা দেখান উচিত ছিল, যে, ১৯২৬ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত ছয় বৎসরে হিন্দু বদমায়েসদের দ্বারা হিন্দু-মুসলমান উভয়বিধ কত নারীর উপর অত্যাচার হইয়াছে এবং মুসলমানদের দ্বারাই বা উভয়বিধ কত নারীর উপর অত্যাচার হইয়াছে।

কিন্তু রিপোর্টে কেবল লেখা আছে মুসলমানরা কত হিন্দু নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং হিন্দুরা কত হিন্দু-নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে। যাহা হউক, রিপোর্টে যাহা নাই, তাহা মাননীয় রীড্ সাহেব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একটি প্রশ্নের উত্তরে একবার বলিয়াছিলেন। সেই উত্তর হইতে গত ১২ই এপ্রিলের 'সঞ্জীবনী'তে সংখ্যাগুলি সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নীচে তাহা উদ্ধৃত হইল।

মুসলমান বদমায়েসদের দ্বারা অত্যাচরিতা নারীদের সংখ্যা।

বৎসর।	হিন্দু নারী।	মুসলমান নারী।	মোট—
১৯২৬	১১৩	৪৮১	৫৯৪
১৯২৭	১২২	৫৭৬	৬৯৮
১৯২৮	১০৪	৪৬০	৫৬৪
১৯২৯	১১৪	৬৭৬	৭৯০
১৯৩০	১০৪	৫৩১	৬৩৫
১৯৩১	১২৫	৫৭৩	৬৯৮

হিন্দু বদমায়েসদের দ্বারা অত্যাচরিতা নারীদের সংখ্যা

বৎসর।	হিন্দু নারী।	মুসলমান নারী।	মোট—
১৯২৬	১৯৪	৯	২০৩
১৯২৭	২০১	৩	২০৪
১৯২৮	১৯৮	১০	২০৮
১৯২৯	২৩৬	৮	২৪৪
১৯৩০	২৩৪	৬	২৪০
১৯৩১	১৯৭	৩	২০০

মুসলমানদের কাগজ ও মুসলমান নেতাদের দ্বারা এইরূপ কথা প্রকাশিত হইয়া থাকে, যে, হিন্দুনারীহরণাদির এত যে অভিযোগ হয়, তাহার জন্য হিন্দু সমাজের চিরবৈধব্যাদি প্রথাই দায়ী। হিন্দু সমাজের যাহা দোষ ছিল ও আছে, তাহা সংশোধনের জন্য রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময় হইতে এ-পর্য্যন্ত চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু মুসলমান সমাজে যে বদমায়েসের সংখ্যা বেশী এবং তাহারা যে অধিকতরসংখ্যক নারীর উপর অত্যাচার করে, এদিকে মুসলমান সম্পাদক ও নেতাদের দৃষ্টি পড়িলে এবং তাঁহারা সামাজিক ও ব্যক্তিগত চারিত্রিক দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিলে শুধু মুসলমান সমাজ নহে, অন্য সব সমাজও উপকৃত হইবে। কেবল হিন্দুর উপর সব দোষ চাপাইয়া চলিলে সাম্প্রদায়িক উন্নতি হইবে না, অবনতিই হইবে।

—

নারীর উপর অত্যাচার কি বাড়িতেছে না?

১৯৩২-৩ সালের বঙ্গীয় শাসনবিবরণীতে লেখা হইয়াছে, যে, বঙ্গে নারীর উপর অত্যাচার বাড়িতেছে না। কিন্তু আমরা ঐ রিপোর্টেই মুদ্রিত সংখ্যাগুলি হইতে বৈশাখের 'প্রবাসী'তে দেখাইয়াছি, যে, ঐরূপ অত্যাচার বাড়িতেছে। তা ছাড়া, ঐরূপ অত্যাচার যে বাড়িতেছে, তাহা অন্য একটি সরকারী রিপোর্টে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকৃত হইয়াছে, এবং সেই রিপোর্টটিও আধুনিক—তাহার পর ঐ বিভাগের কোন রিপোর্ট এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। তাহা বঙ্গীয় পুলিস বিভাগের আধুনিকতম রিপোর্ট। তাহাতে ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—

"The increase of 94 cases under this head is most noticeable, Burdwan, Nadia and Hooghly being the worst contributors with increases of 21, 20 and 17 cases, respectively."

পুলিস-বিভাগের এই রিপোর্টের উপর বাংলা-গবন্মেণ্টের মন্তব্যে ("Resolution" এ) লিখিত হইয়াছে :—

"His Excellency in Council notes that cases of offence committed against women under sections 366 and 354, Indian Penal Code, showed an increase of 94 over the figures of the previous year—Burdwan, Nadia and Hooghly being the main contributors." P. 2.

—

ম্যাডেম মেরিয়া মণ্টেসরীকে আহ্বান

খবরের কাগজে দেখিলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা মিউনিসিপালিটী শিশুদের শিক্ষার অভিনব প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য ম্যাডেম মেরিয়া মণ্টেসরীকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে কোন কোন মহিলা যদি সাক্ষাৎভাবে এই প্রণালী শিখিয়া লয়েন, তাহা হইলে ভালই হইবে।

তবে, ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে, যে, কোন দেশের শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষার সরঞ্জাম অন্য কোন দেশে হুবহু নকল করিলে তাহা সুফলদায়ক হয় না। দেশকালপাত্রভেদে সব প্রণালী ও সরঞ্জামেরই আবশ্যক-মত পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়।

ইহাও মনে রাখা দরকার, যে, যেমন বিজ্ঞানে আধুনিক কালে আমরা প্রথম প্রথম কেবল পাশ্চাত্য জাতিদের ছাত্রই ছিলাম, পরে আমরাও নূতন কিছু আবিষ্কার করিয়া জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে পারিয়াছি, শিক্ষাবিজ্ঞানে এবং শিক্ষাদান-বিদ্যাতেও তেমনি আমাদের শুধু ছাত্রত্বে সন্তুষ্ট না থাকিয়া গবেষণা দ্বারা নূতন কিছু আবিষ্ক্রিয়া ও উদ্ভাবনও করিতে হইবে।

প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, যে, ইংরেজ-রাজত্বকালেও ইংরেজরা ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষাপ্রণালীর একটি জিনিষ শিখিয়া নিজেদের দেশে চালাইয়াছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে ১৮১৪ সালের ৩রা জুন লণ্ডনের কোর্ট অব ডিরেক্টর্‌স্‌ বঙ্গের সকৌন্সিল গবর্ণর জেনার‍্যালকে যে চিঠি লেখেন, তাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষকেরা যে প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দিতেন তাহার উল্লেখ আছে। তাহার পর ঐ চিঠিতে লিখিত হয় :—

"The mode of instruction that from time immemorial has been practised under these masters has received the highest tribute of praise by its adoption in this country under the direction of the Reverend Dr. Bell, formerly chaplain at Madras ; and it is now become the mode by which education is conducted in our national establishments, from a conviction of the facility it affords in the acquisition of language by simplifying the process of instruction."

তাৎপর্য্য। "স্মরণাতীত কাল হইতে এই শিক্ষকেরা যে শিক্ষা-প্রণালীর অনুসরণ করিতেন, তাহা রেভারেণ্ড ডক্টর বেলের উপদেশ অনুসারে এই দেশে (অর্থাৎ বিলাতে) প্রবর্ত্তিত হওয়ায় কার্য্যতঃ ঐ প্রণালীর উচ্চতম প্রশংসা করা হইয়াছে ; ঐ প্রণালী অনুসারে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে এখন শিক্ষা দেওয়া হয়—এই বিশ্বাসে যে তদ্দ্বারা ভাষাশিক্ষা সহজ হয়।"

সমস্ত চিঠিটি মেজর বামনদাস বসু প্রণীত "কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষে শিক্ষার ইতিহাস" (*History of Education in India under the Rule of the East India Company*) নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভারতের জ্ঞানগৌরবের দিন যখন অতীত হইয়া গিয়াছিল, তখনও ভারতবর্ষ শিক্ষাপ্রণালীতে পাশ্চাত্য একটি দেশকে নূতন কিছু দিয়াছিল। এখন আমরা অনেক বিষয়ে উন্নতি করিতেছি। এখন আমরা চেষ্টা করিলে কেবল প্রতীচ্যের ছাত্র না থাকিয়া হয়ত শিক্ষকও হইতে পারি। আদান ও প্রদান দুই-ই চলিলে তবে অন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমানবিকতা দুই-ই সম্ভব হইতে পারে।

—

অনুন্নত জাতিদের শিক্ষা ও স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টা

"বঙ্গ ও আসামের অনুন্নত জাতিদের উন্নতিবিধায়িনী সমিতি" প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া অনেক জেলায় কাজ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ ইহার কাজের প্রশংসা করিয়াছেন। অনেক জেলায় ইহার বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৪৪টি—২টি হাই স্কুল, ৭টি মধ্যইংরেজী, ২৯৮টি বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১২৩টি বালিকাদের প্রাথমিক স্কুল এবং ১৪টি নৈশ বিদ্যালয়। তা ছাড়া, ইহার পুস্তকাগার, ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা, বয়স্কাউট, সেবা-সমিতি প্রভৃতি আছে। বর্ত্তমানে স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার সভাপতি। সমিতির আয় এখন কমিয়া যাওয়ায় গত মাসে তিনি একটি কন্‌ফারেন্স ডাকেন এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট চাঁদা ও দান ছাড়া হাজার টাকা দিয়া তাহার কাজ আরম্ভ করেন। সমিতির আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য মহারাজা স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের সভাপতিত্বে ঐ কন্‌ফারেন্সে একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। কন্‌ফারেন্সের সময় অমৃত সমাজের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার দুই শত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন।

স্যর রাজেন্দ্রনাথ এই সমিতির জন্য যাহা করেন এবং সেই সংশ্রবে তাঁহার হৃদয় ও মতামতের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ সেন উহার কার্য্যালয় ৪০ নং কারবালা ট্যাঙ্ক লেন (কলিকাতা) হইতে আমাদিগকে লিখিয়াছেন :—

ছয় বৎসর পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং শহরে উক্ত সমিতির পক্ষ হইতে স্যর রাজেন্দ্রনাথের সহিত আমি প্রথম সাক্ষাৎ করি। সমিতির কার্য্যবিবরণ তিনি প্রথমে হয়ত পরলোকগত লর্ড সিংহের নিকট কিছু শুনিয়াছিলেন। সচরাচর তাঁহার নিকট নানা প্রকার সমিতি অর্থসাহায্যের জন্যই উপস্থিত হয়। আমিও তাঁহার নিকট অর্থসাহায্যের প্রার্থী হইয়াই উপস্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার অন্তরে এই ইচ্ছাই ছিল, কি করিয়া স্যর রাজেন্দ্রনাথের মত দেশবিখ্যাত স্বনামধন্য ব্যক্তিকে সমিতির কার্য্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করিব। প্রথম সাক্ষাতের পরেই আমার সেই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমেই, তিনি আমাকে কোন অর্থসাহায্য করিতে পারিবেন না এই কথাই জানাইলেন। এই কথার উত্তরে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, ঐ মুহূর্ত্তেই আমি তাঁহার নিকট অর্থসাহায্যের প্রত্যাশী হইয়া আসি নাই, সমিতির রিপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র যাহা আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম তাহা তাঁহাকে পাঠ করিতে অনুরোধ করিলাম। কার্য্যবিবরণী ভাল করিয়া পাঠ করিলে পর তিনি যদি সন্তুষ্ট হন তবে সাহায্যাদি সম্বন্ধে আমি তাঁহার সঙ্গে পরে কথা বলিব, ইহাই জানাইয়াছিলাম।

ইহার পর তিনি আমাকে কলিকাতায় দেখা করিতে বলিলেন। কলিকাতা ফিরিয়া দুই সপ্তাহ পর তাঁহার সঙ্গে পুনরায় দেখা করিতে যাই। দেখা করিয়াই বুঝিতে পারিলাম সমিতির কার্য্যবিবরণী ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত কাগজ-পত্র আদ্যোপান্ত তিনি পাঠ করিয়াছেন। দেখা হওয়া মাত্র তিনি খুব আদর করিয়া তাঁহার নিকট বসাইলেন এবং সমিতি অতি অল্প ব্যয়ে কি করিয়া এত বেশী কাজ করেন তাহা জানিতে চাহিলেন। যখন শুনিলেন যে এই সমিতি যে-সমস্ত গ্রামে স্কুল স্থাপন করিয়াছেন সেই সকল গ্রাম হইতেই

ধান পাট মুষ্টিভিক্ষা প্রভৃতি দ্বারা সহস্র সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তখনই তিনি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "এই তো কাজ, এই রকম কাজের দ্বারাই তো অশিক্ষিত সমাজ শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।" পরে ধীরে ধীরে তিনি সমিতির সমস্ত ইতিহাস অর্থাৎ কি করিয়া কাজ আরম্ভ হইল, কার্য্যক্ষেত্র কি ভাবে ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইল, কত জন কর্ম্মী কাজ করিতেছেন, যাহাদের মধ্যে সমিতি কাজ করেন তাঁহাদের সঙ্গে সমিতির কিরূপ সম্বন্ধ—এই সমস্ত সংবাদ জানিয়া সমিতিকে নানাভাবে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমি সে দিন কোন অর্থ তাঁহার নিকট চাই নাই। কিন্তু তিনি সেদিনই সমিতির আফিসে বার্ষিক চাঁদা স্বরূপ ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার এক খানা চেক্ পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পনর দিন পরেই তিনি পুনরায় ৫,০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য করেন এবং প্রতিবৎসর তিনি নিয়মিত ভাবে কখনও ৫০০৲ টাকা, কখনও হাজার টাকা করিয়া দান করিয়া আসিতেছেন। তিনি কেবল ব্যক্তিগত ভাবে অর্থ-সাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু এই ছয় বৎসর যাবৎ কি করিয়া সমিতির কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে পারে এবং অর্থের জন্য যাহাতে সমিতির কাজের কোন ক্ষতি না হয় সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিঠিপত্রাদি দ্বারা এবং সময় সময় সভা-সমিতি আহ্বান করিয়া অর্থসংগ্রহেও বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তিনি নিয়মিত ভাবে সমিতির কার্য্যকরী সভায় উপস্থিত হন।

আজকাল অসুস্থতার জন্য তিনি বাহিরে যাইতে পারেন না বলিয়া সময় সময় তাঁহার আফিসেই কার্য্যকরী সভা আহ্বান করা হয়। বলিতে কি, তিনি এই সমিতির সভাপতি রূপে ইহাকে নূতন জীবনীশক্তি প্রদান করিতেছেন এবং কর্ম্মীদিগকে নানাভাবে উৎসাহিত করিতেছেন। তাঁহার এই সকল সাহায্যের মধ্য দিয়া আমি তাঁহার অন্তরের যে পরিচয় লাভ করিয়াছি তাহাতে অতিশয় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। সমিতির কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার নিকট আমাকে প্রায়ই যাইতে হয়। হঠাৎ তিনি এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন, সমিতি হইতে আমাকে বৃত্তিস্বরূপ যাহা মাসিক সাহায্য করা হয় তাহাতে পারিবারিক খরচপত্র নির্ব্বাহ হয় কি-না—অতি সন্তর্পণে অথচ সহানুভূতির সঙ্গে এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন, "It is your first duty to look after your children." তাঁহার এই উক্তিটির মধ্যে আমি তাঁহার ভিতরের পরিচয় পাইয়াছিলাম। এই সময়েই তাঁহার নিকট জানিতে পারিলাম যে তিনি মহামতি গোখলেকে কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত মাসিক সাহায্য করিয়াছেন। তিন-চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত হই। প্রায় ছয় মাস পরে সেদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই, সেদিনের কথা আমি ভুলিতে পারি না। অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত তিনি আমার রোগ সম্বন্ধে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কত উপদেশ দিলেন তাহা এখনও অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া আসিতেছি। এই প্রকারে তাঁহার জীবনের মহানুভবতার পরিচয় কত ভাবে যে পাইয়াছি তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। নানা কার্য্যে তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত; অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমার মতন সামান্য একজন লোক সমিতির কার্য্যাদির জন্য যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি তখনই সময় দিয়া অতি মনোযোগের সহিত সব কথা শুনিয়া যথোচিত উপদেশ দিয়াছেন ও দিতেছেন। দীর্ঘ ছয় বৎসরের মধ্যে একদিনও কোন বিরক্তি বা উষ্মার ভাব প্রকাশ করেন নাই, কেবল সহানুভূতি ও সদাশয়তার পরিচয়ই পাইয়াছি। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না করিলে জনসাধারণ শক্তিশালী হইবে না এবং দেশের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না, বহুবার তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষার যাহাতে বহুল প্রচার হয় তাহার চেষ্টা করিতে তিনি বারংবার বলিয়াছেন।

এখন তিনি বার্দ্ধক্যে ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু ইহার মধ্যেও সমিতির সভাপতিরূপে তাঁহার যে কর্ত্তব্য তাহা করিতে কখনও অবহেলা করেন না। দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য সমিতির আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ায় গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে তিনি কলিকাতা শহরের গণ্যমান্য লোকদিগকে আহ্বান করিয়া একটি কনফারেন্স ডাকিয়াছিলেন। কিন্তু তিন দিন পূর্ব্বেই হঠাৎ স্নানাগারে পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইয়া আফিসে আসিতেও পারিতেছিলেন না। কিন্তু কনফারেন্সের দিন এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই তিনি আফিসে আসিয়া কনফারেন্সের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং এই দিনও সমিতিকে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

—

প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্র

কয়েক বৎসর হইতে ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্বিসের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ভারতবর্ষে হয়, বিলাতেও হয়। তাছাড়া, রাজস্ব-বিভাগের (Finance Departmentএর) জন্যও সমগ্রভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ভারতবর্ষে হয়। কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে, যে, বাঙালী ছেলেরা এই সব পরীক্ষায় বেশী উত্তীর্ণ হয় না, দু-এক জন হইলেও উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে না। এ বৎসর ভারতবর্ষে যে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা হয়, তাহার ফল কতক কতক জানা গিয়াছে বলিয়া খবরের কাগজে দেখিলাম। প্রথম ও চতুর্থ স্থান এলাহাবাদের দু-জন গ্র্যাজুয়েট এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান মান্দ্রাজের দু-জন গ্র্যাজুয়েট অধিকার করিয়াছেন। অন্যদের খবর এখনও কিছু জানা যায় নাই।

বাঙালী ছেলেরা যে এই সব পরীক্ষায় বেশী কৃতিত্ব দেখাইতে পারে না, তাহার কারণ অনুসন্ধান একটি কমিটি করিতেছেন শুনিতে পাই। তাঁহাদের বিস্তারিত রিপোর্ট বাহির হইলে তাঁহাদের মত জানা যাইবে।

বাঙালীদের বিরুদ্ধে প্রতিকূল মনোভাব বশতঃ বাঙালী পরীক্ষার্থীদের প্রতি অবিচার হইতেই পারে না, মনে করি না। কিন্তু এই কারণে অবিচার হইয়াই থাকে, তাহাও ধরিয়া লইতে পারি না। যাহা প্রমাণ করিতে পারা যায় না, এরূপ কিছু কল্পনা বা অনুমান করিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া অনুচিত ও অনিষ্টকর। অনুসন্ধানের পথ ও-প্রণালী অন্য রকম হওয়া আবশ্যক।

এই সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যাহারা দেয়, তাহারা ইংরেজীতে শিক্ষিত। তাহাদের শিক্ষার আরম্ভ ও ভিত্তিস্থাপন সাধারণতঃ বঙ্গের ইংরেজী ইস্কুলগুলিতে হয়। এই

সকল ইস্কুলের অধিকাংশের আয় কম, শিক্ষকেরা যথেষ্ট বেতন পান না, অনেক শিক্ষককে গৃহশিক্ষকতা ও অন্য উপায়ে আয় বাড়াইতে হয়। সুতরাং তাঁহারা পূর্ণ শক্তি ও মনোযোগ ইস্কুলের কাজে দিতে পারেন না। তা ছাড়া, সাধারণতঃ এই কথাও সত্য, যে, উপযুক্ত বেতন দিতে না পারিলে খুব যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যায় না। বঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ভারতবর্ষে ঐ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে দরিদ্রতম বলিলেও চলে। তাঁহারা ইস্কুলে ছেলেদের বেশী বেতন দিতে অসমর্থ, এবং বাংলা-গবন্মেণ্টও অন্য বড় বড় প্রদেশের গবন্মেণ্টের চেয়ে শিক্ষার জন্য ঢের কম টাকা খরচ করেন। বঙ্গে স্কুলসকলের ভাল শিক্ষক না পাওয়ার ও ভাল শিক্ষা না-হওয়ার এইগুলি এক-একটি কারণ।

আর একটি কারণ, বঙ্গের ইস্কুলসমূহে শিক্ষাদান-বিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত অর্থাৎ ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের একান্ত অপ্রাচুর্য্য। ওকালতী, ডাক্তারী, এঞ্জিনীয়ারী প্রভৃতি অন্য নানা কাজের মত শিক্ষকতাও সাধারণশিক্ষাপ্রাপ্ত সকল লোকের দ্বারা সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হয় না। শিক্ষাদানকার্য্যে ট্রেনিং পান নাই এমন সুশিক্ষকের অভাব অবশ্য নাই। কিন্তু ওকালতী, ডাক্তারী ও এঞ্জিনীয়ারিং পাস না করিয়াও আইনঘটিত, চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় এবং ঘরবাড়িনির্ম্মাণসম্বন্ধীয় কাজ অনেকে ভাল করিয়াছে; তাহাতে যেমন প্রমাণ হয় না, যে, ওকালতী, ডাক্তারী ও এঞ্জিনীয়ারী শিখিবার দরকার নাই, তেমনি ট্রেনিং কলেজে না-পড়া ভাল শিক্ষক অনেক থাকার দ্বারা প্রমাণ হয় না, যে, শিক্ষাদানকার্য্য শিখিবার আবশ্যক নাই। শিক্ষণ-বিজ্ঞানে আবিষ্ক্রিয়া ও শিক্ষাদান-বিদ্যায় উপায় উদ্ভাবন আধুনিক সময়ে অনেক হইয়াছে, যাহা জানা শিক্ষকদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বঙ্গের সহিত মান্দ্রাজের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে, বঙ্গে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক কত কম। বাংলা দেশের নূতন পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা-রিপোর্টের ৩৭ পৃষ্ঠায় এই তালিকাটি দেওয়া আছে। ইহা ১৯২৬-২৭ সালের। তাহার পর বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই।

	বাংলা	মান্দ্রাজ
প্রতি স্কুলে গড়ে শিক্ষক-সংখ্যা	১২.৮	২০.১
" " " ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক-সংখ্যা	১.৮	১৫.৬
শতকরা কত শিক্ষক ট্রেনিংপ্রাপ্ত	১৪.২	৭৭.৮

এই তালিকাটি হইতে বুঝা যাইবে, বঙ্গে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক নিতান্তই কম। সুতরাং মান্দ্রাজের তুলনায় এখানে ইস্কুলের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বাংলা দেশে ইস্কুলের শিক্ষা খারাপ হইবার আর একটি কারণ, গবন্মেণ্টের ও সরকারী শিক্ষা-বিভাগের সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব। সবাই জানেন, বঙ্গে মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে শিক্ষায় খুবই পশ্চাৎপদ। অথচ গবন্মেণ্ট ও শিক্ষা-বিভাগ চান, যে, মুসলমানরা মোট লোক-সংখ্যার যত অংশ, শিক্ষা-বিভাগের চাকরীও তাহাদের তত অংশ পাওয়া চাই! যেন নিরক্ষর মুসলমান চাষীরাও সকল রকম স্কুলপরিদর্শক ও শিক্ষক হইবার যোগ্য! ইংরেজী ইস্কুলের সকল শ্রেণীর শিক্ষক এবং সকল রকমের স্কুলপরিদর্শক সবাই গ্র্যাজুয়েট না হউন, অন্ততঃ কলেজে কিছু পড়িয়াছেন এরূপ শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। বাংলা দেশে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে পড়ে, তাহাদের মধ্যে ১৯২১-২২ সালে শতকরা ১২.৮ জন ছিল মুসলমান, ১৯২৬-২৭ সালে ছিল শতকরা ১৪.২ মুসলমান, এবং ১৯৩১-৩২ সালে ছিল শতকরা ১৩.৩ জন মুসলমান। আমাদের প্রথম বক্তব্য এই, যে, অন্যান্য সরকারী বিভাগের মত শিক্ষা-বিভাগেও কেবল যোগ্যতমদিগকেই কাজ দেওয়া উচিত জাতিধর্ম্মবর্ণনির্বিশেষে। দ্বিতীয় বক্তব্য এই, যে, যদি একান্তই কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে অনুগ্রহ দেখাইতে হয়, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তাহাদের ছাত্রেরা শতকরা যত জন, কেবল শতকরা ততটি চাকরীই তাহাদিগকে দেওয়া উচিত। এই হিসাবে মুসলমানরা শিক্ষা-বিভাগে মোটামুটি শতকরা ১৪টি চাকরী পাইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টে দেখিতেছি বঙ্গের শতকরা ৪৬.৮ জন শিক্ষক মুসলমান এবং শতকরা ৫৪.২ জন পরিদর্শক কর্ম্মচারী (inspecting officer) মুসলমান! ইহার সোজা মানে এই, যে, বিস্তর অপেক্ষাকৃত অযোগ্যতর ও অযোগ্যতম মুসলমানকে মুসলমান বলিয়াই শিক্ষক ও পরিদর্শক করা হইয়াছে এবং বিস্তর অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর ও যোগ্যতম হিন্দুকে হিন্দু বলিয়াই কাজ দেওয়া হয় নাই। সুতরাং বঙ্গে যে শিক্ষাদান ভাল করিয়া হয় না, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা এক জন প্রাচীন অধ্যাপকের নিকট শুনিয়াছি এবং আগেও জানিতাম, মুসলমান পরিদর্শক কর্ম্মচারীরা স্কুল দেখিতে গিয়া তথায় মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষক কয় জন ইত্যাদি

সাম্প্রদায়িক বিষয়েই খুব জোর দেন। শিক্ষার উৎকর্ষ বিধান করিবার মত শিক্ষাই তাঁহাদের অধিকাংশের নাই, সুতরাং তাঁহারা সে দিকে কী দৃষ্টি দিবেন?

সাম্প্রদায়িকতা শুধু সরকারী ইস্কুলে আবদ্ধ নহে।

বঙ্গের অধিকাংশ বেসরকারী বিদ্যালয় হিন্দুদের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত, কারণ শিক্ষায় আগ্রহ তাহাদেরই বেশী। অথচ সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত হিন্দুদের ইস্কুলগুলিতেও মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ ও ম্যানেজিং কমিটিতে মুসলমান সভ্য নিয়োগ করাইবার নিমিত্ত শিক্ষা-বিভাগ জেদ করিতেছেন। যাহারা শিক্ষায় বেশী আগ্রহান্বিত, শিক্ষার জন্ত ত্যাগস্বীকার বেশী করে, শিক্ষায় বেশী অগ্রসর, তাহাদিগকে জোর করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাদের ন্যায্য স্থান হইতে—শিক্ষকতা হইতে, পরিদর্শকতা হইতে এবং স্কুলপরিচালক সমিতির সভ্যত্ব হইতে—কতকটা বঞ্চিত রাখা হইতেছে। সুতরাং বঙ্গে শিক্ষার অবস্থা খারাপ হওয়া বিচিত্র নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি সহজ করাতেও (প্রমাণ, প্রথম বিভাগেই সবচেয়ে বেশী পাস হয়, যদিও পৃথিবীতে কোন কর্ম্মক্ষেত্রেই প্রথম শ্রেণীর লোক সংখ্যায় বেশী নয়) স্কুল ও কলেজে ভাল শিক্ষা হয় না। আর একটি কারণ প্রধান প্রধান কলেজে ছাত্রবাহুল্য। তাহার দরুন প্রত্যেক ছাত্রের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মন দেওয়া হয় না।

বাংলা দেশের শত শত ছাত্র ও যুবক বিনা বিচারে বন্দী আছে। তাহাদের মধ্যে বেশ বুদ্ধিমান যুবক অনেক আছে; তাহারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিলে হয়ত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিত। কিন্তু তাহারা তাহা দিতে পারে না, হয় ত দিতে চায়ও না।

বোধ হয় বাংলা দেশের ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং নেতাদের দ্বারা রাজনৈতিক কাজে ছাত্র ও অন্য যুবকদিগকে নিয়োগ (অবশ্য বিনা বেতনে!) অন্য প্রদেশের চেয়ে বেশী। ইহাও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্রদের প্রায়ই পরাজয়ের একটা কারণ হইতে পারে।

আমি জানি না, এই পরীক্ষাগুলি খাঁটি প্রতিযোগিতামূলক, না, ইহার আগে মনোনয়ন বা নমিনেশ্যন হয়। যদি নমিনেশ্যন হয়, তাহা হইলে সার্ব্বজনিক কাজে উৎসাহী অর্থাৎ পব্লিক-স্পিরিটেড অনেক ভাল ছেলে বোধ হয় পরীক্ষা দিতে পায় না।

আজকাল বাঙালী অনেক ছেলে চাকুরী করিতেই চায় না। সেই কারণেও কতক বুদ্ধিমান্ ছেলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেয় না।

আধুনিক নানাবিধ শিক্ষালাভ ও জ্ঞানলাভ অর্থসাপেক্ষ। বাঙালীদের মধ্যে—বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে—অর্থকষ্ট বেশী হইয়াছে। এই জন্য তাহাদের ছেলেরা ভাল ভাল পুস্তক ও মাসিকপত্রাদি কিনিয়া পড়িবার সুযোগ ততটা পায় না, যতটা অন্যান্য প্রদেশের ঐ শ্রেণীর ছেলেরা পায়। এটাও বাঙালী ছেলেদের অকৃতিত্বের একটি কারণ হইতে পারে।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাসমূহে ভারতবর্ষের ও সমগ্র জগতের 'চলতি' ঘটনা ও সমস্যা এবং আধুনিক ব্যাপারসকল সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা হয়। মৌখিক পরীক্ষায় এই সব বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। এই সকল বিষয়ে ইংরেজী নানা বহি ও সাময়িক-পত্র পড়া দরকার। বাঙালী ছেলেরা অন্যান্য প্রদেশের—যেমন মান্দ্রাজের—ছেলেদের চেয়ে ইংরেজী বহি কম পড়ে—বিশেষতঃ গল্প ও উপন্যাস ছাড়া অন্য বহি যাহা জ্ঞানগর্ভ। গল্পের মাসিক ছাড়া অন্য ইংরেজী মাসিকও, জ্ঞানগর্ভ মাসিকও, বাঙালী ছেলেরা কম পড়ে। মডার্ণ রিভিউ বাংলা দেশ হইতেই বাহির হয়। ইহার উৎকর্ষ, পৃথিবীর অন্যান্য সমুদয় মাসিকের তুলনায় উৎকর্ষ, স্যর মাইকেল স্যাডলারের মত জ্ঞানী বিদেশী (যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতি ছিলেন) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "It is one of the live periodicals of the world" "ইহা পৃথিবীর জীবন্ত সাময়িক-পত্রগুলির মধ্যে একখানি।" তাঁহার বহুপূর্ব্বে বিখ্যাত সাংবাদিক ও গ্রন্থকার নেভিন্সন সাহেব কলিকাতা-দর্শনকালে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু আমাকে একবার বলিয়াছিলেন, "তোমার মডার্ণ রিভিউ মান্দ্রাজীরা গস্পেলের মত করিয়া পড়ে।" কিন্তু ইহার পাঠক বাংলা দেশ অপেক্ষা বঙ্গের বাহিরে বেশী, বিশেষতঃ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ও ছাত্রমহলে। সেদিন

কলিকাতার একজন উকীল কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন, একবার একটি সমগ্রভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মৌখিক তের-চোদ্দটি প্রশ্নের মধ্যে সাত-আটটিই এরূপ ছিল যাহার সম্বন্ধে মডার্ণ রিভিউতে প্রবন্ধাদি বাহির হইয়াছিল।

[এ-বিষয়ে আমরা তাঁহার কথা ভুল শুনিয়াছি বা বুঝিয়াছি কিনা তাহা জানিবার জন্য তাঁহাকে চিঠি লিখি। তিনি গত ১১ই মে উত্তর দিয়াছেন:—"—* ইংরেজী ১৯২৯ ও ১৯৩০ সালে ভারতবর্ষে গৃহীত আই সি এস পরীক্ষা দেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, যে, *viva voce* examinationএ অর্দ্ধেকের উপর প্রশ্ন গত মাসের *M. R.* হইতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; দুইবারই ঐরূপ প্রশ্ন *Moden Review* হইতে করা হইয়াছিল; তবে একবার প্রায় সব প্রশ্ন *M. R.* হইতে answer করা যাইত।" *M. R.* অর্থাৎ মডার্ণ রিভিউ।]

অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বাংলা দেশে সিনেমা ও থিয়েটারের আধিক্য লক্ষিত হয়। ছাত্রদের মধ্যেও অভিনয়ের ধুম কিছু বেশী। ইহাতে যে কিছু অধিক মাত্রায় চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না, এরূপ বলা যায় না।

ছাত্রেরা রাজনীতির বা অন্যান্য সমসাময়িক ব্যাপারের কোনই খবর রাখিবেন না, ইহা আমরা চাই না, আশাও করি না। কিন্তু ইহা অবশ্যই চাই ও আশা করি, যে, যেহেতু তাঁহারা ছাত্র, তাঁহারা বিদ্যার্থী, সেই জন্য ছাত্রের প্রধান কর্ত্তব্য যে বিদ্যা অর্জ্জন, জ্ঞানলাভ, তাহাতেই তাঁহারা বেশী মন দিবেন, সময় দিবেন, শক্তি ব্যয় করিবেন। আমরা কংগ্রেসের বা অন্য কোন রাজনৈতিক কিংবা অন্যবিধ দলের নেতা নহি বলিয়া ছাত্রেরা যদি আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রাগৈতিহাসিক মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহারা আধুনিক ও অতি-আধুনিক নেতাদের দৃষ্টান্ত বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি নেতারা আগে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পরে কার্য্যতঃ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন। আমরা তাঁহাদের দৃষ্টান্তের প্রতিই অধিক মন দিতে বলিয়াছি, বাক্যের প্রতি তত মন দিতে বলি নাই এই জন্য, যে, দৃষ্টান্ত বাক্যের চেয়ে বেশী মূল্যবান্ ("Example is more valuable than precept")।

* নামটি বাদ দিলাম।—প্রবাসীর সম্পাদক।

প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় বাঙালী ছেলেদের অপেক্ষাকৃত কম কৃতকার্য্যতা উপলক্ষ্য করিয়া আমরা অনেক কথা লিখিলাম। বাঙালী ছেলেদিগকে চাকরীর উমেদার করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য নহে, বঙ্গে শিক্ষার উন্নতি যাহাতে হয় সেই দিকে সকলে মন দেন ইহাই আমরা চাই। তবে ইহাও বলিতে চাই, যে, যখন দেখিতেছি শত শত হাজার হাজার বাঙালী ছেলে সামান্য বেতনের চাকরীর জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন বড় চাকরীগুলিতেই বা বাঙালী ছেলেরা ঢুকিবে না কেন? বেসরকারী সার্ব্বজনিক কর্ম্মীদের সেবার উপর ভারতবর্ষের উন্নতি অবনতি, হিতাহিত নির্ভর করে বটে; কিন্তু বুদ্ধিমান্ চাকর্যেরা যদি স্বদেশহিতৈষী হন, তাহা হইলে তাঁহারাও দেশের হিত অনেকটা করিতে পারেন। বাঙালী ছেলেদের মধ্যে যাঁহারা চাকর্যে হইবেন, তাঁহারা যেন ভারতহিতৈষী চাকর্যে হন।

—

ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ

বৈশাখের 'প্রবাসী'তে আমরা ইহা লিখিয়াছি, যে, স্বাধীন-চিত্ত লোকেরা ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রবেশ করেন, ইহা বাঞ্ছনীয়। যে-সকল কংগ্রেসপন্থীর কৌন্সিল প্রবেশে আপত্তি বা বাধা নাই, এবং যাঁহাদের কৌন্সিলের কাজ করিবার মত যোগ্যতা আছে, তাঁহারা কৌন্সিলে প্রবেশ করিলে ভাল হয়। বৈশাখের কাগজেই বলিয়াছি, তাঁহারা কৌন্সিলে গেলেই যে স্বরাজ লাভ হইবে, এরূপ আশা কম। কিন্তু অন্য দেশহিত যাহা হইতে পারে, তাহা বৈশাখের 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছি। কিন্তু কোন কংগ্রেসওয়ালা যদি মন্ত্রী বা তদ্রূপ অন্য কিছু চাকর্যে হইবার মতলবে কৌন্সিল প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তাহা গর্হিত হইবে। কারণ তিনি যদি খুব দৃঢ়চেতা কংগ্রেসওয়ালা হন, তাহা হইলে তিনি গবর্মেণ্ট ও আমলাতন্ত্রের সহিত মতানৈক্যবশতঃ ইস্তফা দিতে বাধ্য হইবেন; আর যদি দৃঢ়চেতা না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে গবর্মেণ্টের নীতিরই সর্ব্বাংশে অনুসরণ করিতে হইবে—তাঁহার কংগ্রেসওয়ালাত্ব

টিকিবে না। সুতরাং কংগ্রেসের বদনামের তিনি কারণ হইবেন এবং কংগ্রেসের মতানুযায়ী দেশহিত তাঁহার দ্বারা হইবে না।

ভারতবর্ষের কন্সটিটিউশ্যন কংগ্রেসের বা উদারনৈতিক দলের দাবি অনুযায়ী যত দিন না হইতেছে, ততদিন ঐ ঐ দলের স্বাধীনচেতা কাহারও মন্ত্রী বা তদ্রূপ কিছু হওয়া উচিত নয়। কংগ্রেসওয়ালারা স্বরাজী হউন, কিংবা গোঁড়া অসহযোগী হউন, তাঁহারা কৌন্সিল প্রবেশ করিবেন কি-না, তাহা তাঁহারাই স্থির করিবেন। সে-বিষয়ে আমাদের কিছু বলা উচিত নয়। আমরা কেবল চাই, যে খুব বেশী-সংখ্যক স্বাধীনচিত্ত ও যোগ্য লোক কৌন্সিলগুলিতে যান।

কংগ্রেসওয়ালাদের মধ্যে কতক লোক যেমন কৌন্সিল-প্রবেশের পক্ষপাতী হইয়াছেন ও স্বরাজ্য দলকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহিতেছেন, তেমনি আর এক দল কৌন্সিল প্রবেশের বিরোধীও হইয়াছেন। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে শেষোক্ত দল খুব প্রবল। কংগ্রেসে আর এক দলেরও প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। তাঁহারা সোশ্যালিষ্ট বা সমাজতান্ত্রিক দল। এই ভারতীয় সোশ্যালিষ্টদের সহিত ভারতীয় কম্যুনিষ্ট বা সাম্যবাদী দলের কোন পার্থক্য আছে কি-না জানি না।

একোধিক দলের উৎপত্তি ভাল কি মন্দ, এক কথায় বলা যায় না। কিন্তু যদি আদর্শভেদ, লক্ষ্যভেদ, মতভেদ জন্মে, তাহা হইলে তাহা চাপা দিয়া জোড়াতাড়া দিয়া বাহ্য একতা রক্ষা করা ভাল নয়; তাহাতে সুফল হয় না, বরং অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র দল বা উপদল গঠিত হইলেও, যে-যে বিষয়ে আদর্শে ও মতে মিল আছে, সেই সব বিষয়ে একযোগে কাজ করা বাঞ্ছনীয়। তাহাতে কাজ বেশী ও ভাল হয় এবং বিবাদে শক্তিক্ষয় হয় না।

পাটনায় নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটিতে যদি কৌন্সিল-প্রবেশ অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে কৌন্সিল-প্রবেশার্থীদের তালিকা কংগ্রেসের স্থানীয় বা প্রাদেশিক বোর্ড প্রস্তুত করিবেন, না, স্বরাজ্য-দলের ঐ ঐ বোর্ড করিবেন, তাহা স্থির করিতে হইবে। নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে জয়ী হইয়া যাঁহারা কৌন্সিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন, কৌন্সিলে তাঁহাদের আদর্শের ও কাজের উপর নজর রাখিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহার বিচার করিবেন কংগ্রেস কমিটি বা স্বরাজ্য-দলের কমিটি, তাহাও বিচার্য্য। রাঁচীতে স্বরাজ্য-দলের কনফারেন্সে যে প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে, তদনুযায়ী কার্য্যতালিকাতে কংগ্রেসের প্রায় সব কাজই আছে। স্বরাজ্য-দল যদি সব কাজই করেন, তাহা হইলে নো-চেঞ্জার বা গোঁড়া অসহযোগীরা কি করিবেন?

অনেক কংগ্রেসওয়ালা কংগ্রেসের একটা পুরা অধিবেশন চাহিতেছেন। তাঁহারা বলেন পুণার ঘরোয়া কন্ফারেন্সের পর কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আনে ও পরে গান্ধীজী যে সমষ্টিগত নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত করেন, এবং পাটনায় থাকিতে গান্ধীজী যে স্বয়ং একমাত্র সত্যাগ্রহী হইয়া উহা "একচেটিয়া" করেন, ইহা সমস্তই অবৈধ, কংগ্রেসের বিধিবহির্ভূত। তাঁহাদের মতে কৌন্সিল-প্রবেশও লাহোর কংগ্রেসের স্বাধীনতা ঘোষণার বিরোধী, এবং নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্যেরা এত পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নির্ব্বাচনের পর এত নূতন প্রশ্ন ও সমস্যার আবির্ভাব হইয়াছে, যে, এখন তাঁহাদের মত কংগ্রেসওয়ালাদের বর্ত্তমান মত বলিয়া ও তাঁহাদিগকে এখনকার প্রশ্নাবলী সম্বন্ধে কংগ্রেসওয়ালাদের মুখপাত্র বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাঁহাদের মতে এই এই কারণে পুরা কংগ্রেসের এক অধিবেশন এবং নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির নূতন সভ্য নির্ব্বাচন আবশ্যক।

পাটনায় নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে উপরিলিখিত সব বিষয়ের আলোচনা হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইয়া গেলে আবার সম্পাদকেরা, অন্য সাংবাদিকেরা এবং হরেক রকমের খবুরে ও সার্ব্বজনিক মনুষ্যেরা (public men) নিজের নিজের মত জাহির করিবেন।

আর একটা বিষয় লইয়া এখন খুব আলোচনা চলিতেছে। তাহা, "শ্বেতপত্র"কে সম্পূর্ণ অস্বীকার কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোআরা সম্বন্ধে তূষ্ণীম্ভাব।

—

শ্বেতপত্র দুশমন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা—?

নব-স্বরাজীরা বলিতেছেন, তাঁহারা শ্বেতপত্রের পুরাপুরি নিন্দাও প্রত্যাখ্যান করিবেন, উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবেন—উহা দুশমন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরা সম্বন্ধে তাহা বলিতেছেন না। জেরা করিলে বলিতেছেন, শ্বেতপত্র

ত উহাকে ভিত্তি করিয়াই রচিত, উহা শ্বেতপত্রের একটা অঙ্গ, সুতরাং শ্বেতপত্রকে অগ্রাহ্য করিলে উহাকেও অগ্রাহ্য করা হইল। তাই যদি হয়, তাহা হইলে পরিষ্কার ভাষায় বলুন না, যে, সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরাও দুশমন, উহাকেও প্রত্যাখ্যান করিলাম। তাহা তাঁহারা বলিতেছেন না। তাহার কারণও আছে। সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরাটা মুসলমানদের খুব পিয়ারা। তাহাকে দুশমন বলিলে প্রায় সব মুসলমান বাঁকিয়া বসিবে। তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইবে না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরাটাকে দুশমন না বলিলেই কি ঐ মিলন হইবে? হইবে না। কারণ, অধিকাংশ মুসলমানের দাবি শুধু এ নয়, যে, "ওটাকে দুশমন বলিও না," তাহারা চায়, বল, যে, "ওটা খুবই ন্যায্য জিনিষ।" অন্যদিকে ওটাকে দুশমন না বলিলে হিন্দুরা, এমন কি বিস্তর কংগ্রেস-ওয়ালা হিন্দুও, স্বরাজীদের সহিত একমত হইবে না। বস্তুতঃ, ঐ ভাগবাঁটোআরাটা যে কেবল বঙ্গের ও পঞ্জাবের হিন্দু-দিগকেই লাঞ্ছিত অপমানিত ও হীনবল করিয়াছে তাহা নহে, উহা সমগ্রভারতের হিন্দুদিগকে পদাঘাত করিয়াছে এবং অধিকন্তু উহা স্বাজাতিকতা (ন্যাশন্যালিজম্) এবং গণতান্ত্রিকতাকেও (ডিমোক্র্যাসীকেও) অপমানিত, অগ্রাহ্য ও হীনবল করিয়াছে। সুতরাং কংগ্রেস যদি স্বাজাতিক ও গণতান্ত্রিক বলিয়া নিজের পরিচয় বজায় রাখিতে চান, তাহা হইলে প্রত্যেক হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি কংগ্রেস-ওয়ালার ঐ বাঁটোআরাটা প্রত্যাখ্যান ও অগ্রাহ্য করা উচিত।

আর একটা কথা এই, যে, ঐ বাঁটোয়ারা অনুসারে শ্বেতপত্রের একটা মাত্র অংশ, অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভাগুলাতে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বীরা কত আসন পাইবে তাহার ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে, বটে। কিন্তু শ্বেতপত্রে তা ছাড়া আরও অনেক জিনিষ আছে; সেগুলাই উহার অধিক অংশ। সেগুলাতে ভারতবর্ষের লোকদিগকে ক্ষমতা দিবার নামে বন্ধন, এবং অধিকার দিবার নামে অনধিকার দেওয়া হইয়াছে। যদি স্বরাজীদের বা অন্য কাহারও চেষ্টায় ঐ বন্ধন কমে ও মুক্ততা বাড়ে, অনধিকার কমে ও অধিকার বাড়ে, কিন্তু যদি সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঁটোআরাটা নাকচ না হইয়া বজায় থাকে, তাহা হইলে ফলটা কিরূপ দাঁড়াইবে? ফল এই হইবে, যে, ইঙ্গ-কেরঙ্গ-মুসলমানেরা আরও ক্ষমতাশালী এবং হিন্দুরা আরও হীনবল হইবে। হইতে পারে হিন্দুরা দুর্ব্বল, কিন্তু কিসের মানে কি, কিসের ফল কি, তাহারা তাহা বুঝিতে সমর্থ। এই জন্য যখন আগা খান বলিয়াছিলেন, "এস, ভারতীয় বেরাদররা সব, সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরাটার এখন আলোচনা না করিয়া শ্বেতপত্রের অন্য দোষগুলা আমাদের সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারা শুধরান যাক্," তখন হিন্দুরা সবাই না হোক অনেকেই তাঁহার মতলবটা বুঝিয়াছিল এবং মুসলমান স্বরাজীদের চা'লও এখন তাহারা বুঝিতেছে।

ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও সকল জা'তের ও শ্রেণীর লোকদের মিলন আমরাও চাই। কিন্তু যত দিন কোন কোন সম্প্রদায়ের, জা'তের ও শ্রেণীর আনুগত্যের মূল্য নীলামের সর্ব্বোচ্চ ডাক অনুসারে দিবার ক্ষমতা ইংরেজদের থাকিবে এবং স্বদেশবাসী অন্যান্য সম্প্রদায়ের, জা'তের ও শ্রেণীর সহযোগিতা ও দেশের স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে, সেই মূল্য লইয়া ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করিতে কোন কোন সম্প্রদায় রাজী থাকিবে, তত দিন এই মিলন হইবে না। এবং, সব সম্প্রদায়ের মিলন ভিন্ন স্বরাজ পাওয়া যাইবে না, এই বিশ্বাসে বা এই বিশ্বাসের বাহ্য ভাণে যত দিন আমরা ক্রমাগত সম্প্রদায়বিশেষের দ্বারস্থ হইতে থাকিব, তত দিনও মিলন হইবে না। যখন হিন্দুরা নিজের চেষ্টায়, মুসলমানরা নিজের চেষ্টায়, স্বরাজলাভে প্রয়াসী হইবে, অথচ অন্যের সহিত মিলনেও অনিচ্ছুক হইবে না, তখন মিলন হইতে পারে।

—

মন্ত্রিত্ব ও শাসন-পরিষদের সভ্যত্ব

বঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব শাসন-পরিষদের সভ্য হইলেন। বোম্বাইয়েও এক জন মন্ত্রী তথাকার শাসন-পরিষদের সভ্য হইয়াছেন। মন্ত্রীদের এইরূপ পদ গ্রহণ বাঞ্ছনীয় নহে। তাঁহারা প্রজাপক্ষের লোক। গবন্মেণ্টকে খুশী রাখিলে তবে শাসন-পরিষদের সভ্য হওয়া যায়। সুতরাং মন্ত্রীদের শাসন-পরিষদের সভ্য হইবার নিয়ম বা রীতি থাকিলে মন্ত্রীরা প্রজাহিত অপেক্ষা যথাসাধ্য গবন্মেণ্টের মনস্তোষণে বেশী মন দিবে। এইরূপ, হাইকোর্টের কিম্বা ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির শাসন-

পরিষদের সভ্য হওয়ার রীতিটাও ভাল নয়। তাহাতে ভিতরে ভিতরে উভয় পদে অধিষ্ঠিত লোকদের মানসিক স্বাধীনতা নষ্ট হয়, তাহারা গবর্ন্মেণ্টকে খুশী রাখিতে চেষ্টা করে।

বঙ্গে আর মন্ত্রী অনাবশ্যক

বঙ্গের এক মন্ত্রী শাসন-পরিষদের সভ্য হইলেন, কিন্তু আরও দু-জন মন্ত্রী আছেন। মন্ত্রীদের কাজ এমন কিছু বেশী নহে, যে, দু-জনের দ্বারাই চলিতে পারে না। অনেক বৎসর পূর্ব্বে একজন ছোটলাট কয়েক জন সেক্রেটরীর সাহায্যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও আসামের কাজ চালাইতেন। এখন তার জায়গায় তিন লাট, বহুসংখ্যক মন্ত্রী ও শাসন-পরিষদের সভ্য, এক এক গাদা সেক্রেটরী, এবং অনেক দঙ্গল আরও কিছু হইয়াছে। তাহাতে প্রজাদের জ্ঞান, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, শক্তি, সুখস্বাচ্ছন্দ্য কতটুকু বাড়িয়াছে?

তাই বলি আর মন্ত্রী চাই না। ভাগও ত এখন বেশ আছে—এক-এক জন হিন্দু ও এক-এক জন মুসলমান মন্ত্রী ও শাসন-পরিষদের সভ্য।

শিক্ষা-বিভাগের ভার কে পাইবেন?

বাংলা দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা, ("অ আ ক খ"র পড়ুয়া ছাড়া) শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শিক্ষালয়-প্রতিষ্ঠাতার সংখ্যা, শিক্ষার জন্য দাতার সংখ্যা, এবং শিক্ষাবিস্তারের জন্য আগ্রহান্বিত ও উৎসাহী লোকের সংখ্যা মুসলমান সমাজের চেয়ে হিন্দু সমাজে ঢের বেশী। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসকলের ও শিক্ষা-বিভাগের ব্যয় প্রধানতঃ হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের বেতন হইতে চলে। বঙ্গের রাজস্ব হইতে গবর্ন্মেণ্ট যে টাকা শিক্ষা-বিভাগের জন্য দেন তাহারও অধিকাংশ যে হিন্দুদের দেওয়া, (কারণ, হিন্দুরাই রাজস্বের খুব বেশী অংশ দেয়) তাহা না হয় নাই বলিলাম।

অথচ দেখিতে পাই, শিক্ষামন্ত্রীর কাজটা যেন মুসলমানের একচেটিয়া হইয়া বসিতেছে। এই ব্যবস্থার মূলীভূত নীতি কি এই, যে, শিক্ষার জন্য যাহাদের দরদ কম, যাহারা শিক্ষার জন্য কম ত্যাগস্বীকার করিয়াছে ও করিবে, তাহাদের মধ্য হইতেই শিক্ষা মন্ত্রী লইতে হইবে? অধিকাংশ স্কুল-ইন্সপেক্টার ত মুসলমান আছেনই। [ইহা ছাপিতে যাইবার আগে দেখিলাম, তৃতীয় মন্ত্রীর নিয়োগ না হওয়া পর্য্যন্ত নবাব ফারোকী সাহেবকে শিক্ষা-বিভাগের ভার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়ও ত লিখনপঠনক্ষম? তিনি কি হিন্দু বলিয়াই শিক্ষা-বিভাগের ভার পাইলেন না? আমরা বঙ্গের গবর্ণর বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করিতেছি, যে, তিনি এক জন লিখনপঠনক্ষম বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টিয়ান, বা সাঁওতালকে শিক্ষা-মন্ত্রী নিযুক্ত করুন। বঙ্গে কেবল হিন্দু ও মুসলমান বাস করে ও ট্যাক্স দেয় এমন নহে; ইহারাও বাস করে ও ট্যাক্স দেয়।]

শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা কোন রকম সাম্প্রদায়িকতা চাই না। কিন্তু যদি হিন্দুদিগকে কেবল ক্ষতিগ্রস্তই হইতে হয়, তাহা হইলে বলি, হিন্দুদিগকে তাহাদের প্রদত্ত রাজস্বের অংশ হইতে, হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের বেতন হইতে, তাহাদের স্থাপিত ও পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে, তাহাদের নির্ব্বাচিত পুস্তকাদির সাহায্যে হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অনুমতি দেওয়া হউক। অবশ্য পরিদর্শনের অধিকার ও ক্ষমতা গবর্ন্মেণ্টের থাকিবে। এখন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৫১ জন ছাত্র মুসলমান হইলে তাহা মক্তব বলিয়া গণিত হইতে পারে, এবং তাহাতে হিন্দু ছাত্রদিগকেও কদর্য্য বাংলায় লেখা অপকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক পড়িতে হয়। ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর ও আপত্তিজনক নিয়ম।

বোম্বাইয়ের ধর্ম্মঘট

বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলির শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করায় প্রায় সব কল বন্ধ হইয়াছে। ৭০১৮০ হাজার শ্রমিক বেকার অবস্থায় আছে। ঐ সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হইতেছে। শ্রমিকদের বেতন বাড়া উচিত, বাসস্থান আদির বন্দোবস্ত ভাল হওয়া উচিত। কিন্তু এ-দেশের গবর্ন্মেণ্ট যে-শ্রেণীর লোকদের দ্বারা চালিত, তাহারা ধনিক বা ধনিকের গা-ঘেঁসা, শ্রমিক বা শ্রমিকের গা-ঘেঁসা নহে। এই জন্য ধর্ম্মঘট করিয়া শ্রমিকরা প্রায়ই লাভবান হয় না। অথচ ধর্ম্মঘট না করিয়াই বা করে কি?

মিলওয়ালারাও ত দেখিতেছেন, যে, তাঁহারা শ্রমিকদিগকে কম বেতন দিয়াও, তাহাদের শিক্ষাভাব ও অসন্তোষ এবং তজ্জনিত অকার্য্যতৎপরতা হেতু, জাপানের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিতেছেন না। নিজেদের লাভ খুব কম রাখিয়া শ্রমিকদিগকে সন্তুষ্ট, কারিগরীতে শিক্ষিত ও সুস্থ করিয়া দেখুন না তাহাতে বস্ত্রশিল্পের শ্রী ফিরে কিনা? ফিরিবার খুবই সম্ভাবনা।

—

দেশব্যাপী ঝড়

আসাম, বাংলা ও বিহারের অনেক স্থানে প্রবল ঝড়ে ও বৃষ্টিতে অনেক গৃহ নষ্ট এবং মনুষ্য ও পশু হত ও আহত হইয়াছে। বিপন্ন ও আর্ত্ত সকলের জন্য দুঃখ অনুভব করিতেছি।

—

স্যর চেত্তুর শঙ্করন্ নায়ার

স্যর চেত্তুর শঙ্করন্ নায়ার মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ও ভারতবর্ষের এক জন কৃতী পুরুষ ছিলেন। সম্প্রতি ৭৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বাল্যে ও যৌবনে মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং পরে বড় উকিল হইয়া হাইকোর্টের জজ, মান্দ্রাজের ও ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, বড়লাটের শাসন-পরিষদের সভ্য, প্রভৃতি উচ্চপদে তিনি অধিষ্ঠিত হন। তিনি একবার সাবেক কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন।

—

স্বাধীনতার দ্বারদেশে

ত্রিশ বৎসরের কিছু অধিক কাল আমেরিকার অধীন থাকিয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীনতা পাইতে যাইতেছে। তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিবার আইন আমেরিকার কংগ্রেসে পাস হইয়া গিয়াছে। এখন ফিলিপিনোরা ঐ আইনের কয়েকটা সর্ত্তে রাজী হইলেই হয়। তাহারা স্বাধীন হইলে বিনাযুদ্ধে স্বাধীন হওয়ার ইহা একটি দৃষ্টান্ত হইবে।

ইংরেজেরই তৈরি আইন ও কন্সটিটিউশ্যনের জোরে ডি ভ্যালেরা আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিতেছেন।

নিজেদের সাহসে এবং ইংলণ্ডের ওএষ্ট্‌মিন্‌ষ্টার স্টাট্যুট (Westminster Statute) নামক ঐ আইনের অনুসরণ করিয়া এবং তাহা হইতে ইঙ্গিত পাইয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতকায়েরা স্বাধীন হইতে বসিয়াছে। কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়াও এই পথের পথিক হইবে। ইহারা সব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ডোমীনিয়ন। এইজন্যই কি ইংরেজরা ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়ন হইতে দিতে চাহিতেছে না?

—

অধ্যাপক রামনের অবদানপরম্পরা

পাছে প্রস্তাবিত ইণ্ডিয়ান একাডেমী অব সায়েন্সের সদর আফিস কলিকাতায় হয় এইজন্য স্যর চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন্ ঐ নাম দিয়া ইতিমধ্যেই একটা বৈজ্ঞানিক সমিতি বাঙ্গালোরে রেজিষ্ট্রী করিয়া ফেলিয়াছেন!* উদ্যোগী পুরুষ বটে! নইলে বাঙালীকে বোকা বানাইয়া তাহাদেরই কয়েক লক্ষ টাকার যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিলেন, আর কোন অধ্যাপক বা বাঙালী ছাত্রকে সেগুলি ব্যবহার করিতে দিলেন না, এবং ছুটি লইয়া বাঙ্গালোর যাইবার সময় সেগুলি সঙ্গেও লইয়া গেলেন! এখন তিনি দয়া করিয়া বলিয়াছেন, আর কলিকাতায় ফিরিবেন না, যন্ত্রগুলিও ফেরত দিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসক বীরদল তাঁহাকে এই প্রকার আচরণ করিতে দিয়াছেন সম্ভবতঃ এইজন্য, যে, তিনি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁর "সাত খুন মাফ।" বাংলায় যে "কর্ত্তার ভূত" সম্বন্ধে প্রবাদ-বাক্য আছে, তাহা স্মর্ত্তব্য।

—

বিহারের আক ও বঙ্গের পাট

আক-চাষীদের সুবিধার জন্য ভারত-গবর্মেণ্ট ইক্ষুর দাম বাঁধিয়া দিবার আইন করিয়াছেন এবং তাহার সাহায্যে

* এই বিষয়ে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-কমিটির অর্গানাইজিং সেক্রেটারীদ্বয় ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও ডক্টর এস পি আঘরকর সংবাদপত্রে একটি ধীর সংযম ও সত্যবাদিতাব্যঞ্জক বৃত্তান্ত বাহির করিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠের প্রবাসী ছাপিবার উদ্যোগ করিবার সময় তাহা দেখিতে পাওয়ায় উহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে পারিলাম না।

প্রবাসীর সম্পাদক।

বিহার-গবন্মেণ্ট আক-চাষীদের সুবিধা করিয়া দিতেছেন। এখন চিনির কলওয়ালারা কৌশলে চাষীদিগকে খুব কম দরে আক বেচিতে বাধ্য করিতে পারিবে না। বঙ্গের পাটচাষীরা খুব কম দামে পাট বেচিতে বাধ্য হয়। গবন্মেণ্ট পাটের দর বাঁধিয়া দিবার আইন কিন্তু করেন নাই।

চিনির কল বেশীর ভাগ দেশীলোকদের, চটকল বেশীর ভাগ বিদেশী লোকদের।

—

সেনহাটীর মহিলাদের পুণ্য কীর্ত্তি

সেনহাটীর পানীয় জলের জন্য রক্ষিত জলাশয়টি আগাছায় পূর্ণ হওয়াও অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছিল। লোক্যাল বোর্ডের বাবুদিগকে পুনঃ পুনঃ বলাতেও তাঁহারা আগাছা তুলাইয়া দেন নাই। তখন সেনহাটী মহিলা-সমিতির ৪০ জন মহিলা সভ্য কোমর বাঁধিয়া ৪ দিনের পরিশ্রমে জলাশয়টি স্বয়ং সাফ করিয়াছেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানকে উহার জল বীজাণুমুক্ত করাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ধন্য এই মহিলারা। এখন ইঁহাদের কৃপায় আশা করি বাবুদের পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব উদ্বুদ্ধ হইবে।

এই মহিলাগুলির চিত্র সেনহাটীর কোন সার্ব্বজনিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'প্রবাসী'তে তাঁহাদের ছবি ছাপিতে পাইলে প্রবাসীর গৌরব বাড়িবে মনে করি।

—

মাসিক কাগজের সমালোচনা

কোন কোন বাংলা ও ইংরেজী দৈনিকে কোন কোন বাংলা ও ইংরেজী মাসিকপত্রের পরিচয় বা "সমালোচনা" দেখিতে পাই। অন্যান্য মাসিকের প্রতি নেকনজর ইঁহাদের কেন হয় না? খোসামোদ পান না বলিয়া? তাহা হইলে নাচার।

—

রবীন্দ্রনাথ ও সিংহল

চীন, জাপান, যবদ্বীপ, শ্যামদেশ প্রভৃতির সহিত প্রাচীন কালে ভারতীয় সংস্কৃতির যে যোগ ছিল, আধুনিক সময়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই সব দেশে গিয়া তাহা নূতন করিয়া স্থাপন করেন। তাঁহার সিংহলযাত্রা দ্বারাও ভারতবর্ষের সহিত সিংহলের প্রাচীন সংস্কৃতি-যোগ পুনরুজ্জীবিত হইবে।

চিত্র-পরিচয়

সমুদ্র-শাসন

রঘুপতি রামচন্দ্র সীতার উদ্ধারকল্পে সাগরতীরে উপনীত হইয়া বিশাল জলধি কিরূপে উত্তীর্ণ হইবেন, তাহা স্মরণ করিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বিভীষণের পরামর্শে উপবাস ক্লিষ্ট রাঘব দীর্ঘকাল কুশ-শয়নে সাগরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন—

"সাগর শুষিব আজি অগ্নিজাল-বাণে"

উৎসর্গ

জীবন-দেবতার দেউলে মহিলাগণের অর্ঘ্য দিবার প্রথা ভারতে এবং যবদ্বীপ ও বলীদ্বীপে অনেক প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি উপচার, দীপ-শিখা লইয়া, নানা নৃত্য সম্ভারে তাঁহারা দেবতার তুষ্টিবিধানে যত্নবান হইতেন। বর্ত্তমান চিত্রে বর্ণ বৈচিত্র্য ও অঙ্কন-পরিপাটো ভাবসম্পদ যথেষ্ট পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলিয়াছেন—

"সন্ধ্যা হলে, কুমারীদলে, বিজন তব দেউলে,
আলায়ে দিত প্রদীপ যতনে"—

ক্ষুধার্ত্ত

এই চিত্রে বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে যে অপরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় তাহা দেখান হইয়াছে। ইহাকে বলে 'কলার কন্‌ট্রাষ্ট স্কীম' (colour contrast scheme)। পরিকল্পনায় ক্ষুধিতের ব্যাকুলতাও বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

১২০-২, আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৪১

৪র্থ সংখ্যা

পাঠিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহিছে হাওয়া উতল বেগে
আকাশ ঢাকা সজল মেঘে
ধ্বনিয়া উঠে কেকা।
করি নি কাজ পরি নি বেশ—
গিয়েছে বেলা বাঁধি নি কেশ,
পড়ি তোমারি লেখা।

ওগো আমারি কবি,—
তোমারে আমি জানি নে কভু,—
তোমার বাণী আঁকিছে তবু
অলস মনে অজানা তব ছবি।
বাদলছায়া হায় গো মরি
বেদনা দিয়ে তুলেছ ভরি',
নয়ন মম করিছে ছলছল।
হিয়ার মাঝে কী কথা তুমি বলো!

কোথায় কবে আছিলে জাগি,
বিরহ তব কাহার লাগি
কোন্ সে তব প্রিয়া।
ইন্দ্র তুমি, তোমার শচী,
জানি তাহারে তুলেছ রচি'
আপন মায়া দিয়া।

ওগো আমার কবি,—
ছন্দ বুকে যতই বাজে

ততই সেই মূরতিমাঝে
জানি না কেন আমারে আমি লভি।
নারীহৃদয় যমুনাতীরে
চিরদিনের সোহাগিনীরে
চিরকালের শুনাও স্তবগান।
বিনা কারণে দুলিয়া ওঠে প্রাণ॥

নাই বা তার শুনিনু নাম
কভু তাহারে না দেখিলাম
কিসের ক্ষতি তায়।
প্রিয়ারে তব যে নাহি জানে
জানে সে তারে তোমার গানে
আপন চেতনায়।

ওগো আমার কবি,—
সুদূর তব ফাগুন রাতি
রক্তে মোর উঠিল মাতি'
চিত্তে মোর উঠিছে পল্লবি'।
জেনেছ যারে তাহারো মাঝে
অজানা যেই সেই বিরাজে
আমিও সেই অজানাদের দলে
তোমার মালা এলো আমার গলে।

বৃষ্টিভেজা যে ফুলহার
শ্রাবণ সাঁঝে তব প্রিয়ার
বেণীটি ছিল ঘেরি'—
গন্ধ তারি স্বপ্ন সম
লাগিছে মনে, যেন সে মম
বিগত জনমেরি।

ও গো আমার কবি,—
জানো না তুমি মৃদু কী তানে
আমারি এই লতাবিতানে
শুনায়েছিলে করুণ ভৈরবী।
ঘটেনি যাহা আজো কপালে
ঘটেছে যেন সে কোন্ কালে.
আপনভোলা যেন তোমার গীতি
বহিছে তারি গভীর বিস্মৃতি॥

শান্তিনিকেতন
বৈশাখ ১৩৪১

পুরাণে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা যে, পুরাণগুলি রূপকথার ন্যায় নানাপ্রকার অবাস্তব, অসম্ভব ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার বিবরণে পূর্ণ; পুরাণে বিশ্বাসযোগ্য কোন ব্যাপারের উল্লেখ প্রায় নাই বলিলেই হয়; যদি বা কিছু থাকে তবে তাহা এত অতিরঞ্জিত যে তাহা হইতে সার উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই যুক্তিবাদী আধুনিক পণ্ডিতগণ পুরাণে মনোনিবেশ করেন নাই।

অষ্টাদশ মূল পুরাণ ও বহু উপপুরাণ লিখিত হইয়াছে। সকল পুরাণ এক সময়ের নহে। কোনটি প্রাচীন, কোনটি নিতান্ত অর্ব্বাচীন। একই পুরাণে প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন অংশ আছে। অধুনা-প্রচলিত পুরাণগুলির মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণ সর্ব্বাধিক প্রামাণিক ও প্রাচীন বলিয়া সুধীগণ বিবেচনা করেন। পুরাণে কি কি বিষয়ের আলোচনা থাকে, তাহা বায়ুপুরাণের ৪।১০ শ্লোকে দেখা যাইবে; যথা,

> সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
> বংশ্যানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

অর্থাৎ, সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিবরণ, মন্বন্তরের বিবরণ, বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণ ও সেই সকল বংশজাত ব্যক্তিগণের বিবরণ পুরাণে থাকিবেই। এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিবরণ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও মোক্ষ-প্রতিপাদক আখ্যায়িকাও পুরাণে দেখা যায়। সূত নামক বিশেষ সম্প্রদায়গত ব্যক্তিগণ পুরাণ-বক্তা ছিলেন। বায়ুপুরাণে আছে, "প্রাচীন পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, অমিততেজা দেবতা, ঋষি, রাজা ও অন্যান্য মহাত্মাদিগের বংশবৃত্তান্ত জানিয়া রাখাই সূতের স্বধর্ম্ম।" ॥ বায়ু ১।৩১,৩২ ॥ সূতকে বহুস্থানে সত্যব্রতপরায়ণ বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে।

পুরাকালে ভারতবর্ষ বহু খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক রাজার সভায় এক জন করিয়া মাগধ থাকিতেন। মাগধগণ নিজ নিজ প্রভু রাজার বংশ-বিবরণ ও কীর্ত্তিকলাপ জানিয়া রাখিতেন। ষ্টেট হিষ্টরিয়ন (State Historian) বলিলে আমরা যাহা বুঝি, মাগধ তাহাই। পূর্ব্ববর্ণিত সূতগণ বিভিন্ন দেশের মাগধগণের নিকট হইতে সমসাময়িক 'হিষ্টরি' সংগ্রহ করিতেন। কোন মাগধ স্বীয় প্রভু সম্বন্ধে কোন অত্যুক্তি করিয়া থাকিলে বা প্রভুর কোনও দোষ গোপন করিয়া থাকিলে সূতগণ তাহা সংশোধন করিতেন। এইজন্যই সূতগণকে সত্যব্রতপরায়ণ বলা হইয়াছে। সূতগণ সকল রাজারই বংশবিবরণাদি জানিতেন। পুরাকালে রাজা ও ঋষিগণ প্রায়ই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেন। যজ্ঞে নানা দেশ হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও বিদ্বান ঋষিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন। যজ্ঞে সূতগণ আগমন করিয়া নিজ নিজ সংগৃহীত বিবরণ পাঠ করিতেন। এই সূতোক্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা এক শ্রেণীর ঋষির কার্য্য ছিল। পরম্পরাপ্রাপ্ত সূত-কাহিনী ঋষিগণ কর্ত্তৃক গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়া পুরাণ নামে পরিচিত হইয়াছিল। পুরাণ-সংগ্রহ বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। পুরাণকর্ত্তা ঋষিগণ বিভিন্ন কালে পুরাণকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন ও বিশেষ বিশেষ ঘটনার মন্বন্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মন্বন্তর নির্দ্দেশ ও কাল নির্দ্দেশ একই কথা। মন্বন্তরের সঙ্কেত অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। পুরাণকার ঋষিগণের মতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বার-বার আবর্ত্তিত হইতেছে। অতি অতি দীর্ঘকালে এইরূপ একটি আবর্ত্তন সম্পন্ন হয়। পুরাণকার ঋষি সৃষ্টির আদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন জাগতিক ঘটনার বিবরণ কাল-নির্দ্দেশ সহকারে লিপিবদ্ধ করিতে চাহেন। এইজন্যই তিনি পুরাণে সৃষ্টি ও প্রলয়কালের অবস্থা আলোচনা করিয়াছেন। পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ বিচার করিলে পুরাণকে হিষ্টরি বলিতে কোন বাধা থাকিবে না। পুরাণকার চাহেন যে, তাঁহার

গ্রন্থ ক্রমশঃ নূতন নূতন ঘটনার বিবরণ দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকুক। কালের কবল হইতে পুরাণকে রক্ষা করিবার জন্য পুরাণকার এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি হিষ্টরি রক্ষার জন্য শিলালিপি, তাম্রলিপি, লোহার সিন্দুক, ইম্পিরিয়ল রেকর্ডস ডিপার্টমেণ্ট প্রভৃতি কিছুরই আশ্রয় লন নাই। তিনি জানিতেন, রাষ্ট্রবিপর্য্যয় ও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে এ সমস্তই ধ্বংস হইয়া যায়। পুরাণকার পুরাণ-রক্ষার জন্য এক অবিনাশী আশ্রয় খুঁজিয়াছেন। পুরাণকার ঋষি দেখিলেন যে মানবের ধর্ম্মবুদ্ধি চিরন্তন। যতদিন পৃথিবীতে মানুষ থাকিবে ততদিন সে কোন-না-কোনও ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে। সাধারণের ধর্ম্মবুদ্ধি যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে। ধর্ম্মের মূল অলৌকিক। পুরাণকার ঋষি পৌরাণিক বিবরণকে সহজ ভাবে প্রকাশ না করিয়া তাঁহার কাহিনীর ধর্ম্মবুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ দিলেন। ফলে পুরাণে অতিরঞ্জিত ও অতিপ্রাকৃত প্রস্তাব আসিল এবং পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইল। পুরাণ শ্রবণ, পঠন, লিখন, মুদ্রণ ও ব্রাহ্মণকে পুরাণদান এখনও সাধারণে মহাপুণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সরলভাবে লিখিত হিষ্টরি রক্ষার জন্য কেবল বিশেষজ্ঞ হিষ্টরিয়নই যত্নবান হইতে পারেন। সমাজে এইরূপ হিষ্টরিয়নদের সংখ্যা নগণ্য। অপর পক্ষে, জনসাধারণের মধ্যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি পৌরাণিক ভঙ্গীতে লিখিত হিষ্টরি-রূপ ধর্ম্মশাস্ত্র রক্ষার জন্য সমুৎসুক। পুরাণ এখনও বহু প্রচলিত, কিন্তু অনেক জ্যোতিষ প্রভৃতি পুরাতন বিজ্ঞানগ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে। পুরাণকার ঋষির অত্যুক্তিগুলির প্রকৃত অর্থ সহজেই ধরা পড়ে। পুরাণার্থ-বিচক্ষণ হিষ্টরিয়নের কাছে পুরাণ প্রকৃত হিষ্টরি এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য পুরাবৃত্ত বলিয়াই বিবেচিত হইবে। পুরাণের প্রামাণিকতা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

আধুনিক হিষ্টরিতে কেবল রাজা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বংশ ও বংশানুচরিতই থাকে এমন নহে। সকল প্রকার প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক ঘটনার বিবরণও হিষ্টরিতে পাওয়া যায়। পুরাণকারও তদ্রূপ অনেক নৈসর্গিক ঘটনার বিবরণ পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুরাণে উল্লিখিত আছে, চাক্ষুষ মন্বন্তর শেষ হইলে ভীষণ জলপ্লাবন হইয়াছিল। মৎস্য।২।১৩॥ এই জলপ্লাবনের কথা বহু দেশের কিংবদন্তীতে প্রচলিত আছে। পুরাকালে কবে লোক-ক্ষয়কর ভূমিকম্প হইয়াছিল পুরাণে তাহাও লিখিত আছে।

প্রাকৃতিক ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য পুরাণের একটি নিজস্ব ভঙ্গী আছে। এই সূত্র জানা না-থাকিলে বর্ণনা অতিপ্রাকৃত মনে হইবে। পুরাণ সর্ব্বত্র হিন্দুশাস্ত্রানুগামী। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্ব হিন্দুদর্শনকার বিচার করিয়াছেন। পুরাণ সেই দার্শনিক তত্ত্ব ভিত্তি করিয়া নৈসর্গিক ঘটনাসমূহ বিবৃত করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র-মতে ব্রহ্মের শক্তিতে উদ্ভাসিত না হইলে জড়জগৎ প্রকাশিত হয় না। জড় ও চৈতন্য বিরুদ্ধধর্ম্মী। চৈতন্যই ব্রহ্ম। জড়ে চৈতন্যশক্তি না থাকিলে জড়জগৎ মানুষের চৈতন্যে প্রতিভাসিত হইতে পারে না। এজন্য প্রত্যেক জড়পদার্থে চৈতন্যশক্তি বিরাজ করিতেছে স্বীকার করিতে হয়। আধুনিক মনোবিদ্যার ভাষায় ইহা এক প্রকার 'প্যান-সাইকিজম্' (panpsychism)। বহু মনোবিৎ বলেন, জড়ে (material) ও চৈতন্যে (mental) প্রকৃতিগত পার্থক্য বর্ত্তমান। অগত্যা ইহাদের মধ্যে একে যে অন্যকে প্রভাবিত করিতে পারে এরূপ কল্পনা করিতে পারা যায় না। শরীর খারাপ হইলে মন খারাপ হয় ও মন খারাপ হইলে শরীর খারাপ হয়—এই যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি ইহা জড় ও চৈতন্যের পরস্পরাশ্রয় প্রমাণিত করে না। ইহাদের মতে জড়প্রকৃতিজাত শরীর নিজ নিয়মে স্বাধীনভাবে চলিতেছে ও তাহার সহিত চৈতন্যোদ্ভাসিত মনও নিজ পথে চলিয়াছে; ইহাদের পরস্পরের এক সাহচর্য্য ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ নাই। একটি লাল ও একটি কাল বলকে যদি একত্রে গড়াইয়া দেওয়া যায় তবে তাহারা উভয়ে পাশাপাশি চলিবে, কিন্তু একের গতি অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এমন কথা বলা চলিবে না। শরীর ও মনও সেইরূপ পাশাপাশি চলিতেছে, কিন্তু একের দ্বারা অন্যে বাস্তবিক প্রভাবিত হইতেছে না। শরীর ও মন পরস্পরে আশ্রিত এই অনুভূতি ভ্রমাত্মক; ইহা মায়ামাত্র (illusion)। এই মত মনো-বিদগণের মধ্যে মনোদৈহিক সহচারবাদ (psycho-physical parallelism) নামে পরিচিত। পূর্ব্বপক্ষ

বলিবো, মদ জড়পদার্থ, কিন্তু মদ খাইলে মনে স্ফূর্ত্তি হয় এবং না-খাইলে সে স্ফূর্ত্তি হয় না অতএব অন্বয়-ব্যতিরেক ন্যায়ানুযায়ী জড় ও চৈতন্য ব্যাপাশ্রিত মানিতেই হইবে। অগত্যা যদি জড় ও চৈতন্যের পরস্পরের প্রভাব কল্পনাতীত মনে করি, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে জড়পদার্থ মদেও চৈতন্যশক্তি আছে এবং এই জড়াশ্রিত চৈতন্যশক্তিই মনকে প্রভাবিত করিতেছে। প্রত্যেক জড়পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ায় সমস্ত জড়ে চৈতন্যশক্তি মানিতে হইতেছে। চৈতন্যশক্তি আছে বলিয়াই জড় চৈতন্য প্রতিভাসিত হয়। এতএব জড়াশ্রিত চৈতন্যই জড়কে দ্যোতনশীল করিয়াছে। যাহা দ্যোতন করে তাহাই দেবতা। অতএব প্রত্যেক জড়পদার্থে তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা আছে বলা অন্যায় নহে। ইন্দ্রিয়গণও দ্যোতন-শক্তিবিশিষ্ট বলিয়া শাস্ত্রে তাহাদিগকেও দেবতা বলা হইয়াছে। ঘটে, পটে দেবতা মানিলেও হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার নামকরণ করেন নাই, কিন্তু সমস্ত প্রধান প্রধান জড়পদার্থের ও প্রাকৃতিক শক্তির দেবতা কল্পিত হইয়াছে। বজ্র ও বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র, পবনের বায়ু, সূর্য্যের বিবস্বান, চন্দ্রের সোম ইত্যাদি। সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা, স্থিতির বিষ্ণু ও লয়ের রুদ্র। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মশক্তি; ইহাদের প্রত্যেকের প্রকারভেদ আছে।

শাস্ত্রমতে এই বিশ্ব প্রথমে অতি সূক্ষ্ম 'আকাশ'ময় ছিল; ক্রমে তাহা ঘনীভূত হইতে লাগিল। আকাশময় আবরণের মধ্যে স্থূলতর 'বায়ু' সৃষ্ট হইল, তন্মধ্যে 'তেজ'রূপী পদার্থ জন্মিল, তাহার অভ্যন্তরে 'জল' হইল ও জলে স্থূলতম 'ক্ষিতি' পদার্থ উৎপন্ন হইল। এইরূপে এক বিরাট অণ্ড জন্মিল। এই অণ্ডের উপাদান ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত আমাদের পরিচিত মৃত্তিক, জল ইত্যাদি নহে, তবে গুণতারতম্যানুসারে এই সকল পরিচিত প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের নামানুযায়ী পঞ্চ মহাভূতের নামকরণ হইয়াছে। পঞ্চমহাভূতজাত অণ্ড প্রথমে সূর্য্যের জ্যোতিঃসম্পন্ন ছিল। এই অণ্ডের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার নাম হিরণ্যগর্ভ। জ্যোতির্ম্ময় অণ্ড হইতে ক্রমে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পদার্থসমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল ও অণ্ডমধ্যে সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ, তারকা ও আমাদের পৃথিবী সৃষ্ট হইল। মহাভূতগুলি যেরূপ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেইরূপ তাহাদের পঞ্চীকৃত সংমিশ্রণে উৎপন্ন প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকাশ প্রভৃতি জড়দ্রব্য সূক্ষ্ম হইতে স্থূলতর রূপ ধারণ করিল। ক্রমশঃ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও সর্ব্বশেষে জলমধ্যে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। বিশাল জলরাশির মধ্যে পৃথিবী বহুকাল যাবৎ নিমজ্জিত ছিল। এই জলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার নাম নারায়ণ। মৎস্য জলের সুপরিচিত প্রাণী, এজন্য ভগবানের প্রথম অবতার মৎস্য-রূপী নারায়ণ। জলমগ্ন পৃথিবী বিপুল প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে জল হইতে উত্থিত হইল। বিষ্ণুপুরাণে এই বিপর্য্যয়ের বিবরণ আছে। ॥বিষ্ণু ১।৪।২৫॥ যে-শক্তি পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতার নাম বরাহ-রূপী বিষ্ণু। কর্দ্দমলিপ্ত জলোত্থিত মহাকায় বরাহের ন্যায় পৃথিবী দেখিতে হইয়াছিল বলিয়া বরাহ অবতার কল্পন। এই উত্থানের সময় জলরাশি চতুর্দ্দিকে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মহাবায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল, পৃথিবী ঘন ঘন কম্পিত হইয়াছিল এবং ঘোর শব্দে জলসমূহ ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। তখন ভূপৃষ্ঠে পর্ব্বতাদি বিভাগ দৃষ্টিগোচর হইল।

বরাহাবতার কর্ত্তৃক পৃথিবীর উদ্ধারের বিবরণ পড়িলে মনে হয় প্রাচীন পুরাণকারগণ এরূপ কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা ব্যাপক ভাবে আদি সৃষ্টিকালে আরোপ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ জল-প্লাবন, আগ্নেয় উৎপাত, ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধ্বংসকর প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় হইতে তাঁহারা প্রলয়কালীন অবস্থা অনুমান করিয়াছেন। প্রলয়কাল ব্রহ্মার শয়নকাল। ব্রহ্মাই সৃষ্টির দেবতা। পুরাণে বলা হইয়াছে যে সত্য প্রভৃতি মহর্ষি মহর্লোকে অবস্থিত হইয়া বর্ত্তমান কল্পের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রলয়াবস্থা দেখিয়াছিলেন। প্রলয়ে মহর্লোক নষ্ট হয় নাই। মহর্লোক আদিতে ভৌম ছিল।

> এবং ব্রাহ্মীষু রাত্রীষু অতীতাসু সহস্রশঃ।
> দৃষ্টবন্তস্তথা হ্যস্মে সুপ্তংকালং মহর্ষয়ঃ ॥ বা ।৭।৭৬ ॥

অর্থাৎ এইরূপ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মরাত্রি অতীত হইয়াছে। অন্য মহর্ষিগণ সেই সময় কালকে সুপ্তাবস্থায়

দেখিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণও বলিয়াছেন যে, প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে মহর্ষিগণ পলাইয়া জনলোক প্রভৃতিতে আশ্রয় লন। অনেকের মতে জনলোক চীনদেশের প্রাচীন নাম।

পুরাণে প্রলয়কালের বর্ণনা আছে। দৈবমানের চতুর্যুগ-সহস্র অতীত হইলে নৈমিত্তিক ব্রাহ্ম প্রলয় উপস্থিত হয়। প্রথমে অত্যন্ত উগ্র শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হয়। রুদ্র-রূপী ভগবান সূর্য্যরশ্মিতে অবস্থানপূর্ব্বক পৃথিবীস্থ যাবতীয় জল পান করিয়া নিঃশেষ করেন। সূর্য্যের সপ্তরশ্মি সপ্তসূর্য্যরূপ ধারণ করে ও ভূমণ্ডল অশেষরূপে দগ্ধ হইতে থাকে। যাবতীয় পদার্থ বিশুষ্ক হইয়া বসুধা কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ প্রতীয়মান হয়। তৎপরে পাতালবাসী সঙ্কর্ষণাত্মক রুদ্র পাতাল হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীতল ভস্মসাৎ করেন। স্বর্গ প্রভৃতি লোকও দগ্ধ হইয়া যায়। অখিল ভূমণ্ডল এক বৃহৎ ভর্জ্জন কটাহে পরিণত হয়। তৎপরে রুদ্রমুখনিশ্বাস হইতে বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনিবিশিষ্ট ভীষণাকার বিভিন্ন বর্ণের সংবর্ত্তক মেঘসমূহ উৎপন্ন হয় ও অবিশ্রান্ত জলধারা শতবর্ষেরও অধিক কাল বর্ষিত হইতে থাকে। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে ভূমণ্ডল জলপ্লাবিত হইয়া যায়। তখন শতবর্ষব্যাপী প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে ও ভগবান নারায়ণরূপে নাগশয্যায় শয়ন করেন। এই অবস্থা সহস্র চারি-যুগকাল বর্ত্তমান থাকে। ইহাই ব্রাহ্মরাত্রি। রাত্রি-শেষে ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ করেন। বরাহ অবতার তখন জল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। পৃথিবীর পর্ব্বতাদি বিভাগ পরিস্ফুট হয় ও ব্রহ্মার বৈকারিক সৃষ্টি বা বিসর্গ আরম্ভ হয়। প্রথমে উদ্ভিদ, তৎপরে কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু প্রভৃতি তির্য্যকযোনি, তৎপরে অসুর, তৎপরে দেবতা ও সর্ব্বশেষে মনু-বংশীয় মানব সৃষ্ট হয়। ইহাই পুরাণোক্ত সৃষ্টিক্রম। সৃষ্টিব্যাপার পূর্ব্বকল্পানুযায়ী প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রতিদিন অনুক্ষণ যে জীবাদি সৃষ্ট হইতেছে তাহার নাম নিত্যসর্গ। জীবের যে স্থিতি বৃদ্ধি তাহা নিত্যস্থিতি, তদ্রূপ জীবের মৃত্যুতে নিত্য লয় সংঘটিত হইতেছে॥ বিষ্ণু ১।২২।৩৬॥ শ্লোকগুলিতে কথিত আছে এক প্রাণী হইতে অপর প্রাণী সৃষ্ট হইলে জন্মদাতা প্রাণীকে সৃষ্টিবিষয়ে হরির অবতার বলিয়া জানিবে, সেইরূপ যদি এক প্রাণী অপর প্রাণীকে বধ করে, তবে বধকর্ত্তা প্রাণীকে রুদ্রের অবতার বলিয়া জানিও। মনুষ্যের যে যে নিত্য প্রবৃত্তির বশে জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সাধিত হয় সেই সকলে সৃষ্টি লয়াদির কর্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে। এজন্য ইহাদিগকে ব্রহ্মার নররূপী মানসসন্তান বলা হয়। দক্ষ, মনু প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস-পুত্র। কারণ, এই সকল নামধারী প্রকৃত মনুষ্য হইতে এককালে মানব-বংশ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। মনুষ্য দক্ষ হইতে বংশ বিস্তার হইয়াছিল বলিয়া দক্ষ প্রজনন শক্তির দেবতা কল্পিত হইয়াছেন। এজন্য দক্ষ ব্রহ্মার এক মানস-পুত্র। প্রজাসৃষ্টি করেন বলিয়া ইঁহারা প্রজাপতি। এখনও বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র প্রজাপতিকে প্রণাম জ্ঞাপন করা হয়। মানবী দক্ষকন্যা-গণের নামানুসারে নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছিল এজন্য নক্ষত্রেরাও দক্ষ-সন্তান।

পৌরাণিক অধিষ্ঠাতৃ বা অভিমানিদেবতা এবং অবতার-কল্পনার সূত্র মনে রাখিলে পুরাণ-বর্ণিত সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপারকে একেবারেই অতিরঞ্জিত বা কাল্পনিক মনে হইবে না বরং দেখা যাইবে যে সেগুলি অনেক স্থলেই বিজ্ঞান-অনুমোদিত। বার-বার সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সংঘটিত হইতেছে কি-না আধুনিক বিজ্ঞানী বলিতে পারেন না। কিন্তু পুরাণবর্ণিত সৃষ্টিব্যাপারকে বিজ্ঞান অনুমোদন করিবেন। অন্যত্র ইহার বিশদ আলোচনা করিয়াছি।

সঙ্কর্ষণাত্মক রুদ্র সম্বন্ধে পুরাণ যে-সকল কথা বলিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা করিলে তাহাদের প্রকৃত অর্থ ধরা পড়িবে। সঙ্কর্ষণ রুদ্র পাতালবাসী। পাতাল অর্থে ভূ-বিবর বা ভূগর্ভ ও দক্ষিণ দেশ উভয়ই বুঝায়। সাপ পাতালে থাকে, অর্থাৎ সাপ মাটির মধ্যে গর্ত্তে থাকে। মাটির নীচে হইতে যে-জল প্রস্রবণের ন্যায় নির্গত হয় তাহা পাতালগঙ্গা। অপর পক্ষে পুরাণ বলেন, পাতালে বহু সুন্দর নগর ও উপবন প্রভৃতি আছে; পুরাকালে পাতালে বলি রাজা ছিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি বলির রাজ্য। বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে পাতাল। পুরাণের বর্ণনার এক আশ্চর্য্য সূত্র এই যে, কোন শব্দের দুই প্রকার অর্থ থাকিলে উভয় অর্থই গ্রহণীয় এবং দেখা যাইবে যে

উভয়ই সত্য। পাতালে নাগগণ থাকে—ইহার এক অর্থ মাটির নীচে সাপ থাকে, অপর অর্থ দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নাগ-জাতির বাস। নাগজাতীয় রাজা সর্পের রাজা বলিয়া পরিচিত। বাসুকি এক জন নাগ-রাজা ছিলেন। ইতিহাসে বাসুকি সর্প বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সঙ্কর্ষণ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছে :—

পাতালসমূহের অধোভাগে বিষ্ণুর যে শেষনামা তামসী মূর্ত্তি আছে, যাঁহার গুণাবলী দৈত্য দানবেরাও বর্ণন করিতে পারগ নহে, যিনি অনন্ত নামে সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক স্তুত হন, যিনি দেব ও দেবর্ষিগণ পূজিত, তিনি সহস্রশির ও নির্ম্মল স্বস্তিক ভূষণে শোভিত। তিনি ফণামণিসহস্রদ্বারা দিকসমূহ উদ্ভাসিত করিয়া আছেন। জগৎ হিতের জন্য তিনি সমস্ত অসুরদের নির্বীর্য্য করেন। তিনি মদাঘূর্ণিত-লোচন ও সদা এক কুণ্ডল ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি কিরীট ও মালা ধারণ করিয়া অগ্নিযুক্ত শ্বেত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার পরিধানে নীলবাস, তিনি মদোন্মত্ত হইয়া শ্বেতহার ধারণ করায় অভ্র ও গঙ্গাপ্রবাহ দ্বারা অলঙ্কৃত উন্নত কৈলাসগিরির ন্যায় শোভমান হইয়াছেন। তাঁহার এক হস্তে লাঙ্গল ও অপর হস্তে উত্তম মুষল রহিয়াছে। কান্তি ও মদিরা দেবী বারুণী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। কল্পান্তে তাঁহার মুখসমূহ হইতে উজ্জ্বল বিষানল শিখাযুক্ত সঙ্কর্ষণনামা রুদ্র নির্গত হইয়া জগৎত্রয় ভক্ষণ করেন ও তিনি অশেষ ক্ষিতিমণ্ডল মস্তকে ধারণ করিয়া পাতাল-মূলে অশেষ সুরগণকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া শেষরূপে অবস্থান করিতেছেন। দেবতাগণও তাঁহার বীর্য্য, প্রভাব, স্বরূপ এবং রূপ বর্ণনা করিতে বা জানিতে পারেন না। সমস্ত পৃথিবী যাঁহার ফণামণিশিখায় অরুণ বর্ণ হইয়া কুসুমমালার ন্যায় (মস্তকে) ধৃত আছে, তাঁহার বীর্য্য কে বর্ণনা করিতে সমর্থ? অনন্ত যখন মদাঘূর্ণিতলোচনে জৃম্ভা পরিত্যাগ করেন তখন সমুদ্র সলিল ও কাননসমূহের সহিত এই ভূমি কম্পিত হয়। গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, সিদ্ধ, কিন্নর, উরগ ও চারণগণ ইঁহার গুণের অন্ত পান না, সেই হেতু ইঁহাকে অব্যয় ও অনন্ত বলা হয়। যাঁহার গাত্রস্থিত নাগবধূগণ কর্ত্তৃক লিপ্ত হরিচন্দন শ্বাসবায়ুর দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া দিকসকল সুবাসিত করে, যাঁহাকে আরাধনা করিয়া পুরাণর্ষি গর্গ জ্যোতিঃতত্ত্ব ও সকল নিমিত্ততত্ত্ব (শুভাশুভজ্ঞাপক লক্ষণসমূহ) অবগত হইয়াছিলেন, সেই নাগবরের দ্বারা মস্তকে বিধৃত হইয়া পৃথিবী দেবাসুর মানুষ সমন্বিত লোকসমূহের মালা ধারণ করিতেছে। ।।বিষ্ণু ২।৫।১৩—২৭ ।।

বিষ্ণুর তামসী তনু হইতে সঙ্কর্ষণ উৎপন্ন হন। প্রলয়কারী বলিয়া এই তনু তামসী। ইঁহাকে শেষ বলা হয়, কারণ প্রলয়কালে ইনি জগৎত্রয় শেষ করেন। ইনি নাগবর কারণ ইনি পাতালসমূহেরও নিম্নে থাকেন, ইনি অতিবীর্য্যশালী, ইঁহার গুণের অন্ত নাই এজন্য ইনি অনন্ত। ইঁহার অগ্নিময়ী সহস্র ফণা। সেই ফণামণির জ্যোতিতে ইনি পৃথিবীতল অরুণালোকে উদ্ভাসিত করিয়া আছেন। ইঁহার ভীষণ ও চঞ্চল সৌন্দর্য্য ; কান্তি ও মদিরা দেবী ইঁহার উপাসিকাদ্বয়। ইনি নীলবাসা ও মদাঘূর্ণিতলোচনা। ইনি স্বস্তিক বা বজ্র, লাঙ্গল ও মুষল ধারণ করেন। এই সকল বিশেষণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে সঙ্কর্ষণ ভূগর্ভস্থ অগ্নি। ভূগর্ভের দিকে দিকে ইহা ফণাবিস্তার করিয়া আছে। ঋষিগণ বহুস্থানে ভূগর্ভস্থ অগ্ন্যুৎপাত দেখিয়া এই কল্পনা করিয়াছিলেন মনে হয়। তাঁহাদের মতে এই অগ্নিজাত শক্তিই পৃথিবীর উপরিভাগস্থ কঠিনস্তর ধারণ করিয়া আছে। পৃথিবীর অভ্যন্তর অগ্নিময়। অভ্যন্তরস্থ অগ্নির জৃম্ভণে অর্থাৎ ফণার সঙ্কোচন প্রসারণে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উৎপাত উভয়ই হয়—ইহাই পৌরাণিক মত। বাসুকি নাগের দ্বারা পৃথিবী ধৃত হওয়ার ও তাঁহার ফণাকম্পনে ভূমিকম্প হওয়ার ইহাই প্রকৃত অর্থ। আগ্নেয়গিরির উৎপাতে যে ভস্মরাশি নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয় ঋষিগণ তাহা জানিতেন। ভস্মরাশিকে সুবাসিত হরিদ্রা বা কপিল বর্ণের হরিচন্দনের রেণুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পদ্মরেণুর নামও হরিচন্দন। ভূকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের আনুষঙ্গিক বজ্রধ্বনি সঙ্কর্ষণের স্বস্তিক-চিহ্নদ্বারা উপলক্ষিত হইয়াছে ; মৃত্তিকা-বিদারণ ও ধ্বংসশক্তি লাঙ্গল ও মুষল দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভারতের ঋষিগণ আগ্নেয়গিরির

উৎপাত কোথায় দেখিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরাণের কোন কথার একাধিক অর্থ থাকিলে তাহার সকলগুলিই গ্রহণীয়। পৌরাণিক বলিয়াছেন, পাতাল-সকলেরও নীচে সঙ্কর্ষণ আছেন। সপ্ত পাতালের নিম্নতম প্রদেশের নামও পাতাল। ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বদক্ষিণ অংশ। ইহারও দক্ষিণে ঋষিগণ আগ্নেয়গিরি দেখিয়াছিলেন। অনুমান হয়, বহু পুরাকাল হইতেই মলয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান জানা ছিল। এই সকল প্রদেশে আগ্নেয়গিরি আছে। বায়ুপুরাণের ৪৮ম অধ্যায়ে ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫২ম অধ্যায়ে বোর্ণিও, মলয় প্রভৃতি দ্বীপের অতি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আছে। বর্হিণ দ্বীপবর্ষের অন্তর্গত বহু দ্বীপ আছে বলা হইয়াছে। অঙ্গদ্বীপ, যমদ্বীপ, মলয়দ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ, বরাহদ্বীপ প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। এই সকল দ্বীপে ম্লেচ্ছ প্রভৃতি জাতি বাস করে। আরও বলা হইয়াছে, তত্রস্থ প্রজা

> দীর্ঘশ্মশ্রুধরাস্থানো নীলা মেঘসমপ্রভাঃ।
> জাতমাত্রাঃ প্রজাস্তত্র অশীতি পরমায়ুষঃ॥
> শাখামৃগ সধর্ম্মাণঃ ফলমূলাশিনস্তথা॥
> গোধর্ম্মাণো হ্যনির্দ্দিষ্টাঃ শৌচাচারবিবর্জ্জিতাঃ॥
> বায়ু। ৪৮। ৮,৯॥

অর্থাৎ তথায় প্রজা জন্মিবামাত্র দীর্ঘশ্মশ্রুধারী, নীলমেঘ-কান্তি ও অশীতিবর্ষ পরমায়ুশীল হয়। তাহারা বানরের ন্যায় ফলমূলভোজী, গোধর্ম্মী—অর্থাৎ গম্যাগম্য বিচারহীন ও তাহাদের শৌচাচার বা নির্দ্দিষ্ট আচার-ব্যবহার নাই। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেওঅনুরূপ শ্লোক আছে। কেবল 'জাতমাত্রাঃ' স্থানে 'জানুমাত্রাঃ' শব্দ আছে। জানুমাত্রাঃ অর্থে যাহাদের দেহ-পরিমাণ একজানু মাত্র। এই বিবরণ যে সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপের ওরাংউটাং সম্বন্ধে লিখিত সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্হিণ দ্বীপপুঞ্জকে রত্নের ও চন্দনাদির আকর বলা হইয়াছে।

এখন যেমন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন পুরাকালেও বিভিন্ন ঋষি সেইরূপ বিভিন্ন বিজ্ঞান আলোচনা ও পর্য্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান আহরণ করিতেন। গর্গ সঙ্কর্ষণের আরাধনা করিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্র ও নিমিত্তবিদ্যা অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের পূর্ব্বলক্ষণ সমূহের জ্ঞানলাভ করেন। আধুনিক ভাষায় বলা যায়, গর্গ ভূকম্পবিৎ (seismologist) ছিলেন। পুরাকালে ভারতে নানা বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচিত হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

সঙ্কর্ষণ ধ্বংস-শক্তি বলিয়া রুদ্র বা রুদ্রের অবতার। পুরাণে সঙ্কর্ষণেরও অবতার কল্পিত হইয়াছে। ধুন্ধু নামক অসুর সঙ্কর্ষণের প্রথম অবতার ও কৃষ্ণভ্রাতা বলদেব, বলরাম বা বলভদ্র সঙ্কর্ষণের দ্বিতীয় অবতার। ধুন্ধু শব্দ ধুম হইতে নিষ্পন্ন। ধু ধাতুর অর্থ কম্পন। সঙ্কর্ষণের অবতারের সহিত ধূম ও কম্পনের সম্বন্ধ বিচিত্র নহে। বলরাম ধ্বংসকারী প্রবল যোদ্ধা ছিলেন, হল বা লাঙ্গল তাঁহার অস্ত্র ছিল। কীর্ত্তি সাদৃশ্যে হলধর বলরাম, হলধর সঙ্কর্ষণের অবতার হইলেন। বলরামের পরবর্ত্তীকালে যে-সকল ভূমিকম্প হইয়াছে তাহাও বলরামের কীর্ত্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। বলরামের বহুকাল পূর্ব্বে এক ভূমিকম্প হয়। ইহার উল্লেখ পুরাণে আছে; এই ভূমিকম্প ধুন্ধুর কীর্ত্তি।

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশ দ্বিতীয় অধ্যায় ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিতেছেন, ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব মহর্ষি উতঙ্কের উপকারার্থে একবিংশতি সহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া বৈষ্ণব তেজপ্রভাবে ধুন্ধু নামক অসুরকে বধ করিয়া ধুন্ধুমার নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার সমস্ত পুত্রগণ ধুন্ধু-মুখনিঃশ্বাসজনিত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হন কেবল তিন পুত্র অবশিষ্ট থাকে। বিষ্ণুপুরাণের বিবরণ পড়িয়া সন্দেহ হয় যে কুবলয়াশ্বের ২১০০০ প্রজা বা সেনা ভূমিকম্পে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বায়ুপুরাণে এই ঘটনার বিশদ বিবরণ আছে। বায়ুর অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, বৃহদশ্ব বাণপ্রস্থ অবলম্বনে উদ্যত হইলে মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহাকে বলিলেন "হে ভূপতে, আমার আশ্রমের সমীপে এক বালুকাপূর্ণ সমুদ্র অর্থাৎ মরুভূমি আছে; সেখানে দেবতাদিগেরও অবধ্য মহাকায় মহাবল ক্রূর ধুন্ধু নামক মধুতনয় শত শত লোক বিনাশের জন্য অন্তর্ভূমিগত হইয়া অর্থাৎ মৃত্তিকানিম্নে বালুকায় অন্তর্হিত থাকিয়া সুদারুণ তপ করিতেছে। সম্বৎসর শেষে সে যখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তখন সকানানা মহী কম্পিত হয় ও মহান রজ উত্থিত হইয়া আদিত্য পথ অবরোধ করে, তখন

সপ্তাহকালব্যাপী ভূমিকম্প হইতে থাকে ও প্রদীপ্ত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গসহ দারুণ ধূম নির্গত হয়।" ধুন্ধুর অত্যাচার নিবারণের জন্য বৃহদশ্ব স্বীয় তনয় কুবলয়াশ্বকে আজ্ঞা দিলেন। কুবলয়াশ্ব ২১০০০ পুত্রসহ তথায় যাইয়া বালুকার্ণব খনন করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পশ্চিমদিকাশ্রিত ধুন্ধুর মুখ হইতে অনল নির্গত হইয়া সকলকে উল্টাইয়া ফেলিতে লাগিল এবং মহোদধি চন্দ্রোদয়ে যেরূপ চঞ্চল হয়, তদ্রূপ প্লবমান জলরাশি প্রবাহিত হইল। তিন জন ব্যতীত সমস্ত কুবলয়াশ্ব সন্তান ধুন্ধু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন কুবলয়াশ্ব যোগবলে সেই জলদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া সমস্ত জল পান করিয়া ফেলিলেন এবং ধুন্ধুকে নিরস্ত করিলেন। অনুমান হয়, কুবলয়াশ্ব ২১০০০ লোক লইয়া ভূকম্প-পীড়িত স্থানে উদ্ধারকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এইজন্যই তিনি বালুকার্ণব খনন করিতেছিলেন। সেই সময় পুনরায় ভূকম্প ও তজ্জনিত জলপ্লাবনে সমুদায় ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গত বিহারের ভূমিকম্পের মত এই ভূমিকম্পেও জলরাশি উত্থিত হইয়াছিল, অধিকন্তু মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে ধূম ও অগ্নি নির্গত হইয়াছিল। পুরাণ পাঠ করিলে অনুমান হয় যে উতঙ্কের আশ্রম সিন্ধুদেশে ছিল। সিন্ধুদেশে অনেক বার প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর কিছুকাল পরে নিকটবর্ত্তী দ্বারকা নগরী সমুদ্রগর্ভে চলিয়া যায়। ইহাও ভূমিকম্পের ফল বলিয়া মনে হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কচ্ছ প্রদেশের ২০০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থান সমুদ্রগর্ভে লুপ্ত হয় ও প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ ও দশ মাইল প্রস্থভূমি দশ ফুট উচ্ছ্রিত হয়। সিন্ধুপ্রদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ। উতঙ্ক বলিয়াছিলেন, সংবৎসরান্তে ধুন্ধু অত্যাচার করে। কুবলয়াশ্বের রাজত্বকাল* ৩৬০০ খ্রীঃ-পূঃ। অন্যত্র তারিখের প্রমাণ আলোচনা করিয়াছি। ইহার পূর্ব্বের কোন ভূমিকম্পের প্রামাণিক লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না।

পুরাণে কথিত হইয়াছে, একদা বলরাম বৃন্দাবনে মদিরাপানে বিহ্বল ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া স্নান করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি যমুনার উদ্দেশে বলিলেন, 'হে যমুনে, তুমি এই স্থলে আগমন কর', কিন্তু বলভদ্রের মত্ততাপ্রসূত বাক্যের অবমাননা করিয়া নদী যমুনা সেই স্থানে যাইলেন না। তখন লাঙ্গলী ক্রুদ্ধ হইয়া লাঙ্গল গ্রহণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন—"রে পাপে, তুমি আসিবে না, আসিবে না বটে? এখন নিজ ইচ্ছায় গমন কর দেখি।" বলভদ্র কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া নদী বলভদ্র যে-বনে ছিলেন তাহা প্লাবিত করিল। তখন যমুনা মূর্ত্তিমতী হইয়া বলিলেন, "হে মুষলায়ুধ, আমাকে পরিত্যাগ কর।" বলভদ্র তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। অনন্তর কান্তিদেবী বলভদ্রকে অবতংসোৎপল এক কুণ্ডল ও দুইটি নীল বস্ত্র দিলেন। তখন কৃতাবতংস চারুকুণ্ডলভূষিত, নীলাম্বর ও মাল্যধারী বলভদ্র কান্তিযুক্ত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ বিষ্ণু ৫। ২৫ ॥ বলভদ্র পূর্ব্ববর্ণিত সঙ্কর্ষণের ন্যায় নীলবাস, এক কুণ্ডল, মালা, মুষল ও হলধারী। তিনিও মদাঘূর্ণিত-লোচন। পাছে কেহ বলভদ্রের কাহিনীর প্রকৃত অর্থ না বুঝিতে পারে এই জন্য পুরাণকার এই-সকল ইঙ্গিত করিলেন। অন্যত্র পুরাণে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে বলভদ্র সঙ্কর্ষণের অবতার। বুঝা যাইতেছে ভূমিকম্পের ফলে যমুনার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই ভূমিকম্পের পূর্ব্বে বৃন্দাবন যমুনা হইতে বহুদূরে অবস্থিত ছিল। বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ অষ্টাদশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অক্রূর বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণ ও বলরামকে সঙ্গে লইয়া মথুরায় গিয়াছিলেন। বিমল প্রভাতে অক্রূর, কৃষ্ণ ও বলরাম অতি বেগবান অশ্বসমূহযুক্ত রথারোহণে যাত্রা করিলেন। মধ্যাহ্ন-সময়ে তাঁহারা যমুনাতটে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্নানাদি সারিয়া পুনরায় রথারোহণ করিলেন। অক্রূর বায়ুবেগবান অশ্বগণকে অতি দ্রুত চালাইতে লাগিলেন। অতিসায়াহ্নে অর্থাৎ সায়াহ্ন অতীত হইলে তাঁহারা মথুরা পৌছিলেন। বেগবান অশ্বযুক্ত রথ ঘণ্টায় সাত আট মাইল যাইতে পারে। এই হিসাবে বৃন্দাবন হইতে যমুনার দূরত্ব চল্লিশ মাইল আন্দাজ হয়। মথুরা আরও চল্লিশ

* এই প্রবন্ধে পুরাণোক্ত প্রাচীন ঘটনার যে সকল তারিখ দিয়াছি তাহার একটিও কাল্পনিক নহে। পুরাণে মন্বন্তর নির্দ্দেশ অর্থাৎ কাল-নির্দ্দেশ আছে। এই নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। অন্যত্র মন্বন্তর-রহস্য প্রমাণ সহকারে বিচার করিয়াছি।

মাইল দূরে। এখন টাঙ্গায় এক ঘণ্টার মধ্যেই মথুরা হইতে বৃন্দাবন যাওয়া যায়। অতএব আধুনিক বৃন্দাবন প্রাচীন বৃন্দাবন নহে। যমুনার গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় প্রাচীন বৃন্দাবন যমুনাগর্ভে গিয়াছিল অনুমান হয়। মথুরার নিকটে নূতন বৃন্দাবন স্থাপিত হয়। কবে বৃন্দাবন জলপ্লাবিত হইয়াছিল ঠিক বলা যায় না। বলরামের জন্মকাল আনুমানিক ১৪৬০ খ্রীঃ-পূঃ। এই ভূমিকম্প বলরামের জীবিতকালে হইয়াছিল কিনা তাহাও নিশ্চিত বলিবার উপায় নাই, কারণ পরবর্ত্তী কালের ভূমিকম্পও সঙ্কর্ষণাবতার বলরামের কীর্ত্তি বলিয়াই কথিত হইবে। বলরামের কীর্ত্তি-স্বরূপ আরও একটি ভূমিকম্পের কথা পুরাণে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়ে লিখিত আছে, "পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয় অনন্ত, অপ্রমেয় ধরণীধারী শেষের কীর্ত্তি বলিতেছি শ্রবণ কর।" কৃষ্ণতনয় জাম্ববতী-পুত্র বীর শাম্ব দুর্য্যোধন-কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করেন। তাহাতে কর্ণ দুর্য্যোধন ও অপর কুরুবীরগণ শাম্বকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। বলভদ্র দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে শাম্বকে ফিরাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলে তাঁহারা বলভদ্রকে কটুবাক্যে অপমানিত করেন। তখন হলায়ুধ কোপে মত্ত ও আঘূর্ণিত হইয়া পার্ষ্ণি ভাগ (গোড়ালি) দ্বারা বসুধা তাড়িত করিলেন। মহাত্মা বলভদ্রের পদতল-প্রহারে পৃথ্বী বিদারিত হইল। সকল দিক শব্দে পূরিত করিয়া বলভদ্র বাহ্বাস্ফোটন করিলেন। মদলোলাকুল কণ্ঠে বলরাম বলিলেন, "কুরুকুলাধীন হস্তিনা-নগরীকে কুরুগণের সহিত উৎপাটিত করিয়া ভাগীরথীমধ্যে নিক্ষেপ করিব।" মুষলায়ুধ বলরাম কর্ষণাধোমুখ লাঙ্গল হস্তিনাপুরীর প্রাকারে বিন্যস্ত করিয়া নগরীকে আকর্ষণ করিলেন। অনন্তর সেই নগরী সহসা আঘূর্ণিত হইতেছে দেখিয়া কৌরবগণ রাম রাম ক্ষমা কর ক্ষমা কর, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কৌরবগণ শাম্বকে স্বীয় পত্নীর সহিত প্রত্যর্পণ করিলে বলরাম ক্ষান্ত হইলেন। পরাশর বলিলেন, "হে দ্বিজ এই কারণে হস্তিনাপুর অদ্যাপি আঘূর্ণিতাকারে লক্ষিত হইয়া থাকে। বলরামের বল ও শৌর্য্যউপলক্ষণে এই প্রবাদ।"

গত ভূমিকম্পের ফলে বিহারের মতিহারি নামক নগর বিপর্য্যস্ত হয়। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, মতিহারি শহর 'twisted' হইয়া গিয়াছে। পৌরাণিক ভাষায় ইহাই আঘূর্ণিত হওয়া। বলভদ্র হস্তিনাপুরীকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন। বাস্তবিকই যুধিষ্ঠিরের সাত পুরুষ পরে নিচক্ষুর রাজাকালে হস্তিনাপুরী গঙ্গাগর্ভে চলিয়া যায় ॥ বিষ্ণু ৪। ২১।৩ ॥ নিচক্ষু রাজধানী কৌশাম্বীতে লইয়া যান। নিচক্ষুর কাল আনুমানিক ১২৫১ খ্রীঃ-পূঃ। পূর্ব্ববর্ত্তী ভূমিকম্পের ফলে পরবর্ত্তীকালে গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া হস্তিনাপুরী ধ্বংস হয় কিনা বলা যায় না। পরিক্ষিতের কালে হস্তিনাপুরী আঘূর্ণিত আকারে দৃষ্ট হইত। ভূমিকম্প খ্রীঃ-পূঃ ১৪১৬ অব্দের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ১৪১৬ খ্রীঃ-পূঃ পরিক্ষিৎ-জন্মকাল। কৃষ্ণজন্মের শত বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল পরে দ্বারকা-নগরী সমুদ্রদ্বারা প্লাবিত হয়। বিষ্ণু ৫। ৩৭। ১৭, ৫৪ ॥ শ্রীধরোদ্ধৃত শুকবচন মতে উল্লিখিত শ্লোকোক্ত কাল কৃষ্ণজন্মের ১২৫ বৎসর পরে অর্থাৎ আনুমানিক ১৩৩১ খ্রীঃ-পূঃ। গঙ্গা ও যমুনার গতি-পরিবর্ত্তন ও দ্বারকা-প্লাবন বিভিন্নকালের হইলেও হয়ত একই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে ঘটিয়াছিল। এ-বিষয়ে কিছুই নিশ্চিত বলা যায় না।

চাক্ষুষ মন্বন্তরের পর যে বিপুল জলপ্লাবন হয়, তাহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মৎস্য-পুরাণে কথিত হইয়াছে বহুবৎসর অনাবৃষ্টির পর অতিবৃষ্টি হইয়া এই প্লাবন ঘটে। নর্ম্মদাতীর প্লাবিত হয় নাই। মনু ও মার্কণ্ডেয় নৌকারোহণে রক্ষা পান। চাক্ষুষ মন্বন্তর ৩৮১৪ খ্রীঃ-পূর্ব্বাব্দে শেষ হয়। তাহার কিছুকাল পরে এই প্লাবন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিদ্যার (geology) অধ্যাপক ডাক্তার সোলাস-এর (Dr. W. J. Sollas) মতে নোয়ার সময়কার প্লাবন সত্য ঘটনা। অধ্যাপক ষ্টিফেন ল্যানডন (Prof. Stephen Landon) প্রত্নতাত্ত্বিক খনন দ্বারা ইহার প্রমাণ পাইয়াছেন। সোলাসের মতে মহাপ্লাবন (deluge) ৩২০০ খ্রীঃ-পূঃ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। (Quotation from "The Statesman," June 30, 1929 by Kumud Ranjan Ray—Evolution of Gita, p. 14.)

বায়ুপুরাণে আছে সত্য প্রভৃতি ঋষি কালকে সুপ্তাবস্থায় দেখিয়াছিলেন॥ বায়ু ৭। ৭৫॥ কালের সুপ্তাবস্থা ব্রাহ্মরাত্রি। এই সময় পৃথিবী জলপ্লাবিত থাকে। বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশের প্রথম অধ্যায়ে আছে, সত্য ঔত্তমি মন্বন্তরে ছিলেন। ঔত্তমি মনুকাল ৫২৪২ খ্রীঃ-পূঃ হইতে ৪৮৮৫ খ্রীঃ-পূঃ এই কালের মধ্যেও একবার মহাপ্লাবন ঘটিয়াছিল পুরাণ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

পুরাণে বহু প্রকৃত পুরাবৃত্ত ধৃত হইয়াছে। মনোযোগ-সহকারে পুরাণগুলি পাঠ করিলে ভারতের প্রাচীন হিষ্টরি উদ্ধার হইবে।

লেখকের বিচা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

অবনীর 'ললিত-লাবণ্য' কথা, সিতাংশুর 'বালীগঞ্জে ভুতুড়ে বাড়ি' ও সতীশের 'অনন্ত তৃষ্ণা' গল্পগুলির পর আমার গল্প তোমাদের তেমন ভাল লাগবে না। আমি যা বলব তা গল্প নয়, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এ-ঘটনা ঘটেছিল, অর্থাৎ ঘটা উচিত ছিল।

গত মাসে সতীশ চৌধুরীর বাড়িতে ডিনার-খাওয়া তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে। চৌধুরীর কোন ডিনার আমি ভুলতে পারি না, ও লোকটা খাওয়ার আর্ট ওস্তাদের মত আয়ত্ত করেছে। যেমন বর্ণ ও রেখা-ছন্দের সামঞ্জস্যে চিত্রের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়; যেমন বেহালার সঙ্গে পিয়ানোর বা শরদের সঙ্গে বাঁয়াতবলার যথাযথ সঙ্গতে সুরের সমন্বয়ে জলসা জমে ওঠে, তেমনি আহার্য্যের সঙ্গে পানীয়ের যথোচিত সম্মিলনেই আহারের আনন্দ সৃষ্টি হয়; ভোজ্য প্রচুর ও বিচিত্র হলেই হয় না; আহার্য্য নির্দ্ধারণে চাই সংযম, এবং ডিনারের প্রতি কোর্সের খাদ্যের সঙ্গে পানীয় নির্ব্বাচনে চাই পান-বিলাসীর সূক্ষ্ম আভিজাতিক রুচি; চৌধুরীর প্রতি ডিনারে আহার্য্য ও পানীয়ের শুধু বৈচিত্র্য নয়, আনন্দময় ঐক্য পাওয়া যায় বলেই তার ডিনারগুলি এমন উপভোগ্য।

ডিনার খেয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম রাত বারটা বেজে গেছে, কে আমায় মোটরে বাড়ি পৌছে দিয়ে গেল, অবনী তুমিই বোধ হয়, হাসছ কেন,—বুঝেছি, তুমি বলতে চাও, মোটরে বাড়ি পৌছে না দিয়ে গেলে, একা বাড়ি ফেরবার মত অবস্থা আমার ছিল না, তা হয়ত সত্যি!

আমার ড্রয়িং-রুম তোমরা দেখেছ, বাড়ির একতলার প্রায় সমস্ত অংশ জুড়ে, তার পাশে বারান্দা, তারপর দোতলাতে ওঠবার সিঁড়ি। সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে দেখি, ড্রয়িং-রুমে আলো জ্বলছে, এত রাত্রে ড্রয়িং-রুমে কে আলো জ্বালাল!

খোলা দরজার পর্দ্দা সরিয়ে দেখি, ঘর লোক-ভরা, সব অজানা অদ্ভুত মূর্ত্তি! এত রাতে এত লোক আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে আর গেট খোলবার সময় দরোয়ান একটা কথাও বললে না? ঘরের আলো বড় অপূর্ব্ব লাগল, এ-আলো কলিকাতা ইলেকৃট্রিক কোম্পানীর বৈদ্যুতিক আলো নয়, এ সূর্য্যের বা চন্দ্রের আলোও নয়, এ কোন অতীন্দ্রিয় লোকের আলো।

ঘরে প্রবেশ করতেই একটা সোরগোল পড়ে গেল।

—এই যে এতক্ষণে এসেছেন।

—খাওয়া বেশ ভালই হয়েছে দেখছি।

—পান ততোধিক, আমরা এদিকে এক ঘণ্টা ব'সে।

বিস্মিত ভাবে বললুম, ক্ষমা করবেন, আমি কাউকে ঠিক চিনতে পারছি না, কোন জরুরী কেস নাকি, পুলিস কেস?

সোফাতে একটি মোটা লোক বসেছিল, সার্কাসের ক্লাউনের মত হা, হা, ক'রে সে অদ্ভুত হেসে উঠল,—ওহে আমাদের চিনতে পারছে না।

সামনের 'সেটি'তে এক মধ্যবয়স্কা নারী ব'সে, শুষ্ক মুখ, শীর্ণ দেহ, চোখ দুটি অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করছে। কোণে গদিআঁটা চেয়ারে এক তরুণ যুবক, কালো কোঁকড়ান চুল, কবির মত স্বপ্নভরা চোখ। রজনীগন্ধা-ভরা ফুলদানির পাশে দোলানো-চেয়ারে এক তরুণী, বর্ষাস্নাত শ্বেতকরবীর মত করুণ সুন্দর। অপর দিকে এক কিশোরী মভ্ রঙের শাড়ী প'রে শ্রাবণ-জ্যোৎস্নায় অপরাজিতা লতার মত মধুর উদাস। আরও অনেক বিচিত্রবেণী বিভিন্ন বয়সের নরনারী। মনে হ'ল, তাদের যেন কোন স্বপ্নে দেখেছি, চেনা হয়েছিল, কিন্তু জানা হয় নি, সব ভুলে গেছি। মোটা লোকটি পরিহাসের সুরে হেসে উঠল,—ভয় নেই, চেয়ারটায় ব'স, 'ভারতী'তে 'ক্লাউন' ব'লে একটি গল্প লিখেছিলে মনে পড়ে?

—হাঁ, সে ত তিন বছর আগে হবে।

—আমি সেই ক্লাউন, আমার কথাই তুমি লিখে নাম করেছিলে। আমার আসার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এঁরা, বিশেষ ক'রে ইনি, কিছুতেই ছাড়লেন না।

রঙ্গভরা চোখ নাচিয়ে সে শীর্ণা নারীটির দিকে চাইল।

ক্লাউন বলতে লাগল, 'মা' গল্পটা মনে পড়ে, ইনি সেই মা; তোমার গল্পে এঁর সাত বছরের ছেলে টাইফয়েডে মারা যায়, চার বছর ধ'রে ইনি মৃত ছেলের জন্য শোক করছেন, প্রতীক্ষা করছেন, এখন এসেছেন তোমার কাছে, তাঁর প্রতি কেন এ অবিচার, কেন তাঁর ছেলে মারা যাবে, তুমি ত তাঁর ছেলেকে বাঁচিয়ে দিতে পারতে। আর এঁরা সব তোমার গল্প উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার।—ওই হচ্ছে বিশু পাগল কোণে গুম হয়ে ব'সে আছে, ওই তোমার তরুণ কবি রেবন্ত, ওই মাধবী কেশে শ্বেতকরবীর মালা জড়িয়েছে, ওই চিরবিরহিণী অপরাজিতা—এঁরা এসেছেন তোমার বিচার করতে, তুমি তোমার খুশীমত তাঁদের জীবন গড়েছ, ভেঙেছ, কেন তাঁরা এত দুঃখ পাবেন চিরদিন, তুমি কি ওঁদের সুখী করতে পারতে না? হা, হা, এবার বড় মুস্কিলে পড়েছ, লেখক।

ব্যঙ্গের সুরে সে উচ্চৈস্বরে হেসে উঠল, যেন জীবনটা একটা অট্টহাস্য।

ধীরে বললুম,—আমি লেখক মাত্র, মানব-সংসারে যদি দুঃখ, মৃত্যু, বিচ্ছেদ না থাকত আমিও সে-কথা লিখতুম না, আমার কি অপরাধ?

শীর্ণা নারী ব্যথিত স্বরে ব'লে উঠল, কার কি অপরাধ আমি জানি না, বুঝি না, আমি চাই আমার ছেলেকে, আমার মাণিককে ফিরিয়ে দাও।

—আমি চাই আমার স্বামীকে, কেন তিনি আমায় ত্যাগ ক'রে চলে যাবেন এক ঘৃণিতা নারীর সঙ্গে।

—আমি চাই আমার প্রেমিক, আমার অজিতকে, সে ত সত্যি আমায় ভালবাসত, আমায় বিবাহ করবে বলেছিল, তুমি কি আমার সুখ-মিলন কথা লিখে তোমার উপন্যাস শেষ করতে পারতে না? কেন তুমি আনলে ইন্দ্রাণীকে, অজিত তার রূপ দেখে ভুলে গেল, আমাকে ত্যাগ ক'রে চলে গেল—আমাদের প্রেম-মিলনপথে তুমি কেন আনলে ইন্দ্রাণীকে?

—আর আমি? হৈমন্তীকে আমার মত কে ভালবাসত, কে ভালবাসে, নিজ হাতে তাকে আমি খুন করলুম, হৈমন্তী শরৎ-শেফালির মত পবিত্র নিষ্পাপ, তাকে আমি সন্দেহ করলুম; কেন তুমি শরতকে আনলে আমাদের জীবনে, সে শুধু আমার মনে সন্দেহ জাগাত, নিজ স্ত্রীকে ভাবলুম, অবিশ্বাসিনী, তুমি লেখক শরতের চরিত্র এঁকে পেলে বাহবা, আমি হলুম স্ত্রী-হত্যাকারী!

বললুম,—দেখ তোমরা যদি একে একে তোমাদের কথা বল, তাহলে তোমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করতে পারি।

শীর্ণা নারী ব'লে উঠলেন, আগে আমার উত্তর দাও, কেন আমার ছেলে মরবে, টাইফয়েড রোগ থেকে ত কত ছেলে সেরে ওঠে, তুমি কি গল্পে লিখতে পারতে না আমার ছেলে সেরে উঠল?

বললুম, মা, তুমি কি ভাবো, তোমার ছেলের মৃত্যুতে আমার অন্তরের ব্যথা, তোমার ব্যথার চেয়ে কিছু কম; তুমি জানো, আমিও তোমারই মত তোমার রুগ্নশিশুর শিয়রে রাতের পর রাত ভয়ব্যাকুল চক্ষে জেগেছি; তুমি জানো, আমিও তোমারই মত তার রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছি। মনে পড়ে, যে-রাতে তোমার ছেলের মৃত্যু হয়—সন্ধ্যায় ডাক্তার ব'লে গেল, খোকা অনেকটা ভাল আছে, সেই

আশ্বাসবাণী শুনে তুমি ভাবলে রাতে একটু ঘুমোবে, শ্রান্তিতে তুমি তার শয্যাপার্শ্বে ঘুমিয়ে পড়লে, আমি কিন্তু বিনিদ্র নয়নে জেগে রইলুম। শ্রাবণের মধ্যরাতে আকাশের সব তারা নিবিয়ে বৃষ্টি এল, দ্বারে দেখলুম কার করাল কৃষ্ণ ছায়া, সে যম। দ্বার রোধ ক'রে দাঁড়ালুম, বললুম, নিদ্রিত মায়ের কোল থেকে রুগ্ন পুত্রকে তুমি নিতে পারবে না, আমি মাকে জাগিয়ে দেব। যম বললে,—তুমি বাধা দিও না, সৃষ্টির সত্যকে তুমি লঙ্ঘন করতে চাও; আমি যম, আমি অমোঘ শাশ্বত নিয়ম, আমি আজ্ঞা-বহনকারী ভৃত্য মাত্র, আমার কাছে প্রার্থনা করা বৃথা; যিনি জন্মমৃত্যুর অধিপতি তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, কিন্তু সে প্রার্থনাও বৃথা হবে, সৃষ্টিকর্ত্তা নিজ নিয়ম-জালে আপনি বাঁধা পড়েছেন। পারলুম না যমকে বাধা দিতে, নিশীথ রাত্রে তোমার ঘর থেকে সে তোমার ছেলেকে নিয়ে গেল, তুমি নিদ্রিতা ছিলে, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ শ্রাবণ নিশীথাকাশের মত আমার চোখে অশ্রুর বন্যা উথলে উঠেছিল। তা যদি না হ'ত তা হ'লে পারতুম কি তোমায় সৃষ্টি করতে, তোমার কথা লিখতে কি পারতুম? তোমার মনের বেদনা আমার রেখাঙ্কিত ললাটে, আমার শীর্ণ কপোলে; তোমার আশাহীন কালো চোখের দিকে চেয়ে বিশ্বস্রষ্টাকে আমিও রাতের পর রাত প্রশ্ন করেছি; উত্তর পেলুম না, কিন্তু শোকাতুরা মাতার দিব্য মুর্ত্তি দেখলুম; তুমি ছিলে চঞ্চলা বালিকা, নিজ স্বার্থকামিনী, সুখান্বেষিণী, তুমি বদলে গেলে, নিজ সুখ-সম্পদের দিকে চাইলে না, তুমি হ'লে সেবিকা, পৃথিবীর সব মা-হারা সন্তানদের তুমি বুকে টেনে নিলে; তোমার দুঃখ বেদনা যদি না-জানতুম, তোমার কথা কি লিখতে পারতুম এমন ক'রে।

পুত্র-মৃত্যুপীড়িতা মাতা কোন উত্তর দিল না, দীপ্ত নয়ন দুটি অশ্রুতে অন্ধ হয়ে গেছে।

বিরহিণী অপরাজিতা বললে, অজিতকে ত মৃত্যুতে নিয়ে যায়নি, নিয়ে গেল এক ডাইনী, সে মায়াবিনীকে তুমিই ত আমাদের জীবনে আনলে, তোমার গল্প হয়ত বেশ জমল, কিন্তু আমার জীবন হ'ল ব্যর্থ, শূন্য। তুমি তোমার উপন্যাসের একটা উপসংহার লেখ—অজিত বুঝতে পেরেছে ইন্দ্রাণী মেকী, তার ক্ষণিক রূপের মোহ ভেঙে গেছে, আজ বুঝেছে আমার প্রেম কত সত্য, আমি তার জন্য প্রতীক্ষা করছি, সে আমার কাছে ফিরে আসুক, তোমার উপন্যাসের কি সুন্দর শেষ হবে বল দেখি। বললুম,—আমার সমস্যা দেখছ না, অজিতকে তোমরা দু-জনেই ভালবাস, আমি কার সঙ্গে তার মিলন ঘটাই? অজিত যাকে ভাল-বাসবে, তার সঙ্গে মিলন হওয়া ভাল নয় কি? তোমার সঙ্গে যদি অজিতের বিবাহ দিতুম আজ ইন্দ্রাণী এসে আমায় প্রশ্ন করত, আমাদের মিলন কেন হবে না, আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি? হয়ত তোমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়ে যেত।

—মিথ্যা কথা, ইন্দ্রাণী কি অজিতকে আমার মত ভালবাসে! ও অজিতের টাকায় ভুলেছে।

—মানলুম, কিন্তু জীবনের বিপুল পথে মানব-দেহ-মনের লোভ মোহ ক্ষুধা বাসনা কামনা জ্বালাকে তুমি কোন নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করতে পার? আমি দিতে পারি অজিতকে তোমার হাতে, কিন্তু তুমি রাখতে পারবে কি? দীর্ঘ বিচিত্র জীবনপথে কত নবীনা ইন্দ্রাণী অজিতের হৃদয়-দ্বারে আঘাত করবে, অজিতের হৃদয় উদাস হবে, তার পায়ে শৃঙ্খল দিয়ে রাখতে পার, কিন্তু তার প্রেম পাবে কি? চাও তুমি তোমার ব্যর্থ প্রেমের কারাগারে তার অশান্ত বুভুক্ষু দেহ-মনকে বন্দী ক'রে রাখতে?

—কেন সে আমায় ভালবাসবে না? তুমি ত উপন্যাসে লিখতে পার, সে আমায় মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসল, তুমি ত তাকে তেমনি ক'রে সৃষ্টি করতে পার।

—অজিতকে আমি তোমার প্রেমিকরূপেই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলুম, আমি লিখতে চেয়েছিলুম, সত্যিকার প্রেমিক আজীবন অনুরক্ত স্বামীর কথা, আঁকতে চেয়ে-ছিলুম আদর্শ গার্হস্থ্য-জীবন। কিন্তু মানুষের মন ত আমার হাতের পুতুল নয়, সে সজীব, সক্রিয়, অগ্নিগর্ভ, পর্ব্বতগুহাবতীর্ণা নদীধারার মত সে যে কোন্ পথে যাবে পুরানো পাড় ভাঙবে, নূতন তীর গড়বে, তার পথের নির্দ্দেশ কে করতে পারে! সজীব মানুষ যখন আমার উপন্যাসে আসে তাকে ত শৃঙ্খলিত সামাজিক অনুশাসন-পীড়িত ক'রে আপন ইচ্ছা আদর্শ মত চালাতে পারি না,

, বাধা শৃঙ্খল ভেঙে সে তার নিজ যাত্রাপথ ক'রে চলে, আমি তার পথচলার কাহিনী লিখি।

দোলানো-চেয়ার থেকে দীর্ঘ কৃষ্ণ অক্ষিপক্ষ্ম কাঁপিয়ে মাধবী আমার দিকে চাইল। বললুম, মুর্ত্তিমতী বেদনার মত তুমি মূক বসে আছ, মাধবী, তুমি ত কিছু বলছ না, আমার আত্মার সুগভীর বেদনা দিয়ে তোমায় সৃষ্টি করেছি, তুমি আমার প্রেমের কাহিনী জান। শোন, তোমরা আমার গল্প শোন ঃ

আমি যখন কিশোর ছিলুম, এক কিশোরীকে ভালবেসেছিলুম, সে ছিল আমার জীবন-রূপকথার রাজকন্যা, তাকে ঘিরে রচতুম যৌবনস্বপ্ন, জীবন-মায়াজাল। কিন্তু সে সুন্দরীর মন ছিল অন্যমনা, সে ভালবাসত আর এক যুবককে, আনমনা হয়ে সে বসে থাকত আমার পাশে। জিদ হ'ল জয় করব ওই কিশোরী-চিত্তকে। আমার প্রেমের সাধনায় সে মুগ্ধা হ'ল, তাকে জয় করলুম ; যৌবনে তাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পেলুম। তারপর বাহির হলুম পৃথিবীর বিপণিতে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুটে আনতে হবে প্রিয়ার পদপ্রান্তে ; সেখানে স্বর্ণের জন্য হানাহানি, কাড়াকাড়ি, স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত, অর্থ-আহরণের প্রবল সংগ্রামে মেতে গেলুম। প্রথম যৌবনের প্রেম-বিহ্বল দিনগুলি স্বপ্ন হয়ে গেল, প্রিয়া যখন গান গায় আমার এস্রাজ বাজাবার সময় হয় না, প্রিয়া যখন ছবি আঁকে, আমার রং গুলে দেবার অবসর কোথায়।

বাণিজ্য ক'রে আনলুম স্বর্ণ, ব্যাঙ্কে তহবিল উঠল উপ্‌ছে। প্রিয়াকে সাজালুম, কর্ণে মুক্তার দুল, কণ্ঠে হীরার মালা, অঙ্গুলিতে নীলার অঙ্গুরীয়, কটিতে স্বর্ণময় কাঞ্চী, পদে মণির নূপুর।

গঙ্গাতীরে তৈরি করলুম বিচিত্র প্রাসাদ প্রিয়ার জন্য। জার্ম্মান দেশ হ'তে এল স্থপতি, ইতালী হ'তে এল বিচিত্র বর্ণের মর্ম্মরপ্রস্তর, চৈনিক কারিগর তৈরি করল গবাক্ষ, পারসিক রীতিতে নির্ম্মিত হ'ল স্নানাগার।

প্রাসাদের চারিদিকে রমণীয় উদ্যান, পূর্ব্বদ্বারে অশোক-বীথিকা, পশ্চিমে তালতমালশ্রেণী, উত্তরে পদ্মদীঘি, দক্ষিণে নীপবন, করবীকুঞ্জ।

কিন্তু প্রিয়ার মন রইল অন্যমনা, আনমনা হয়ে সে সুদূরে চেয়ে থাকে, প্রেমতৃষিতা।

সেদিন সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশের বর্ণোৎসবে পৃথিবী রঙীন, হেনা-হাস্নাহানাকুঞ্জের গন্ধোচ্ছ্বাসে বাতাস মাতাল, নদীর জল কূলে কূলে ভরা। বিপণি থেকে গৃহে ফিরলুম ; চন্দন-কাষ্ঠের দ্বার খুলে পারস্য কার্পেটমণ্ডিত অধিরোহনী অতিক্রম ক'রে প্রিয়ার কক্ষের দিকে গেলুম। সে সন্ধ্যায় প্রিয়া প'রেছিল মাধবী-রঙের শাড়ী, কণ্ঠে ছিল রজনীগন্ধার মালা ; আমাকে দেখে প্রিয়া স্মিতমুখে, চকিত পদে এগিয়ে এল, শ্বেতপ্রস্তরের গৃহতল দর্পণের মত দীপ্তিময়, পদযুগল ফুটে উঠল রক্তকমলের মত, কিন্তু প্রিয়ার মন ছিল আনমনা, কাচের মত মসৃণ মেজেতে পা গেল পিছ্‌লে, সে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ল, শুভ্র মর্ম্মরে রক্তপদ্মের পাঁপড়ি ছড়িয়ে লুটিয়ে পড়ল ; সে মূর্চ্ছা ভাঙল না, অন্যমনা হয়ে আমার গৃহে চলতে চলতে প্রিয়ার চরণ স্খলিত হ'ল, মৃত্যু এল।

পশ্চিমাকাশের বর্ণোৎসব শেষ হয়ে অন্ধকার এল, আমার অগণিত অশ্রুবিন্দু অনন্ত আকাশ ভ'রে জ্বলে উঠল। সে-রাতে বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তাকে যদি পেলুম, কেন তার ভালবাসা পেলুম না, তাকে এমন ক'রে কেন তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলে ? বোবা আকাশ কোন উত্তর দিল না।

উন্মাদ হয়ে প্রাসাদ ভেঙে দিলুম, প্রিয়ামৃত্যুবেদনা অহর্নিশি অন্তরে বহন ক'রে মহা উন্মাদনায় দেশ হ'তে দেশান্তরে ঘুরেছি। জীবনের সেই অপরিসীম বেদনা-সমুদ্র মন্থন ক'রে তুমি এলে মাধবী, তুমি এলে তরুণ কবি রেবন্ত ; তোমরা আন্‌লে নবদৃষ্টি, নববাণী মানবজীবনে, সংসারের সুখদুঃখ, পৃথিবীর সৌন্দর্য্য নূতন চোখে গভীর ভাবে দেখলুম। আগে যাদের হৃদয়ের ব্যথা বুঝিনি, যাদের তুচ্ছ অবহেলা করেছি, তাদের বীরত্ব, তাদের মহত্ত্ব দেখলুম, আত্মার নবজন্ম হ'ল। তুমি খুনী, তুমি ঘৃণিতা, তুমি পাগল, তুমি ক্লাউন, তোমাদের সঙ্গে অন্তরের পরিচয় হ'ল, তোমাদের সমব্যথী হলুম। তোমাদের দুঃখের কথা লিখেছি, তোমার আত্মার সংগ্রাম বেদনার কাহিনী। প্রিয়াবিরহকাতর আমার অন্তর দিয়ে যা অনুভব করেছি তাই লিখেছি, আমি কথাশিল্পী,

তোমাদের দুঃখে সমবেদনায় কাঁদতে পারি, আমি দার্শনিক নই, মানবজীবনে দুঃখের অর্থ কেমন ক'রে বলব? আমি শুধু বুঝেছি, অপরূপ এই পৃথিবী, মহান্ এই মানবজীবন।

আমি চুপ করলুম। ঘর-ভরা স্তব্ধতা কাঁপতে লাগল তেল-ফুরিয়ে-যাওয়া প্রদীপের শিখার মত। সহসা বিশে-পাগল হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল—আমি পারি, আমি পারি বলতে, এস আমার সঙ্গে।

বিশে-পাগল পূবদিকের সবুজ পর্দা সরিয়ে আমার লাইব্রেরীতে যাবার দরজা খুলে দিলে। সবাই চমকে দাঁড়ালুম। লাইব্রেরীতে নটরাজ শিবের একটি মূর্ত্তি আছে দেখেছ, বিশু মূর্ত্তিটির দিকে ছুটে গেল, হাতজোড় ক'রে নতজানু হয়ে মূর্ত্তির সামনে বসল।

চোখে চমক লাগল। মনে হ'ল, এ আমার লাইব্রেরী নয়, ভারতীয় কোন গুহামন্দিরের গর্ভগৃহের সম্মুখে আমি দাঁড়িয়ে, গর্ভগৃহের অন্ধকারে অগ্নিকান্তি নটরাজ বিগ্রহ। গৃহের দ্বার শঙ্খপদ্মক্ষোদিত কারুকার্যময় প্রস্তর-নির্ম্মিত; দ্বারের দক্ষিণে গঙ্গা ও বামে যমুনার লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি উৎকীর্ণ, অমৃতনিষ্যন্দিনী রূপ কঠিন প্রস্তর ভেদ ক'রে পদ্মের মত ফুটে উঠতে চায়—জ্যোৎস্নাশুভ্র গঙ্গা তরুচ্ছায়ায় মকরের ওপর বঙ্কিম ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, এক হস্তে পূর্ণ জল-কুম্ভ, অপর হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম; নীলোৎপলবর্ণা যমুনা কূর্ম্মের ওপর দাঁড়িয়ে, তার এক হস্তে চামর, অপর হস্তে নীলোৎপল।

গর্ভগৃহে দশদিকে ষোড়শ হস্ত প্রসারিত ক'রে অপরূপ নটরাজমূর্ত্তি—দক্ষিণ হস্তগুলিতে ডমরু বজ্র শূল পাশ টঙ্ক দণ্ড সর্প ও অভয়মুদ্রা; বাম হস্তগুলিতে অগ্নি খেটক ঘণ্টা কপাল খড়্গ পতাকা শুচিমুদ্রা ও গজহস্তভঙ্গী; পিঙ্গল জটাভারে অর্ক ধুতুরা পুষ্প, চন্দ্রা, গঙ্গামূর্ত্তি; কণ্ঠে মুক্তার হার, সর্প-হার, বকুলের মালা; বামস্কন্ধে ব্যাঘ্রচর্ম্ম; কর্ণে কুণ্ডল; হস্তে পদে মণিমাণিক্যবিজড়িত বলয়; অগ্নি-শিখাবেষ্টিত পদ্মের ওপর দক্ষিণ পদ; নৃত্যচঞ্চল বামপদ শূন্যে স্থাপিত।

বিশে-পাগল অট্টহাস্য করলে—হাঃ হাঃ! পদ্ম-পীঠ ঘিরে অগ্নিশিখা নেচে উঠল। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এল। নটরাজ নৃত্য সুরু করলেন। নৃত্যের তালে তালে হস্তের নানা অস্ত্র দিকে দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলেন। পরম বিস্ময়ে দেখলুম নানা অস্ত্রের বদলে আমার গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা তাঁর অগণিত হস্তে পুত্তলিকার মত শোভিত। নটরাজ তাঁর ডমরু ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আমার দিকে, যেন তিনি বললেন, আমার ডমরু তুমি বাজাও, আমি তোমার সৃষ্ট নরনারীদের নিয়ে নৃত্যে মাতি। দেখলুম পুত্রশোকাতুর মাতা, চিরবিরহিণী প্রেমিকা, জীবনের হলাহলপায়ী পাগল, সবাই মেতেছে তাঁর হস্তে জন্মমৃত্যু সুখদুঃখের নৃত্যের উন্মাদনায়।

আকাশের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত বিসর্পিল গতিতে বিদ্যুৎ চমকে গেল। অশনি-গর্জ্জনে চমকে জেগে দেখি সিঁড়ির পাশে বারান্দায় বেতের লম্বা চেয়ারে শুয়ে আছি, আমার চোখেমুখে বৃষ্টির জল অঝোরে ঝরে পড়ছে, বাতাসে অন্ধকার আকাশ হা হা ক'রে উঠল।

তোমরা কি আমায় সে-রাতে মোটর থেকে ওই বারান্দায় চেয়ারে শুইয়ে দিয়ে গিয়েছিলে?

নুলিয়া সমাজ

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

পুরী হইতে দক্ষিণে যেখানে গোদাবরী নদী সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেইখান পর্য্যন্ত নুলিয়াদের বাস। উড়িয়া ভাষায় ইহাদের নুলিয়া বলিলেও ইহাদের প্রকৃত নাম ভিন্ন। ইহাদের মধ্যে একটি জাতির নাম ওয়াড়া-বালিজি, অপরের নাম জালারি। আরও দক্ষিণে যে-সকল নুলিয়ার মত জাতি বাস করে তাহাদের নাম কালিঙ্গী। ওয়াড়া-বালিজি এবং জালারিগণের মধ্যে ওয়াড়া-বালিজিগণই অপেক্ষাকৃত ধনী। জালারিগণ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও কৃশকায়। ওয়াড়া-বালিজিগণ আগে সমুদ্রে জাহাজের কাজ করিত, এখন দেশী জাহাজের ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া তাহারা অপরের মত মাছ ধরে এবং তাহাদের মেয়েরা শহরে মজুরের কাজ করে। ওয়াড়া-বালিজিদের জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি হইলেন মান্দাসার রাজা মাইলিপিলি নারায়ণ স্বামী। তিনিও ওয়াড়া-বালিজি জাতির লোক, এবং তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে সমস্ত প্রধান ওয়াড়া-বালিজি গ্রামে গিয়া গ্রামের কয়েক বৎসরের জমা ঝগড়া-বিবাদ অথবা সামাজিক গণ্ডগোল মিটাইয়া আসিতে হয়। ওয়াড়া-বালিজিদের পক্ষে মান্দাসার রাজাই সুপ্রীম কোর্ট বলা যাইতে পারে, তাঁহার উপরে আর আপীল নাই।

ওয়াড়া-বালিজি অথবা নুলিয়াদের বসতির মধ্যে গঞ্জাম জেলায় গোপালপুরের মত পুরীও একটি প্রধান জায়গা। এখানে প্রায় ৫০০ ঘর নুলিয়ার বাস; তাহা ছাড়া জালারি নুলিয়াও কিছু আছে। নুলিয়াদের মধ্যে একটি বংশের বিশেষ আদর আছে। তাহাদের নাম অঙ্ক। এই বংশের লোকের নাম এইরূপ হয়—অঙ্ক করলাম্মা, অঙ্ক রামাইয়া ইত্যাদি। নুলিয়াদের গ্রামে অঙ্ক পলাম্মা প্রধান দেবী। সেই দেবী নাকি অঙ্ক-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য অঙ্ক-বংশের পুরীতে এত সম্মান আছে।

পুরীর নুলিয়া-বস্তির শাসনভার গ্রামের একজন অগ্রণীর হাতে আছে; তাঁহাকে "উর-পেডা" বলা হয়। তাঁহার একজন কার্য্যাধ্যক্ষ বা "কারিজি" আছে এবং তদুপরি একজন চাপরাসীও আছে, তাহার নাম "সাম্মিটোডু"। অঙ্ক-বংশের লোকেরা একটি বিশেষ পরিবার হইতে 'উর-পেডা'কে নির্ব্বাচন করেন। নির্ব্বাচন সিদ্ধ হইলে উর-পেডা মান্দাসার রাজার নিকট হইতে একটি সম্মতিপত্র পান। অঙ্ক-বংশের লোকেরা যদি কোন উর-পেডা নির্ব্বাচন করিতে না পারে, তাহা হইলে গ্রামের লোকসাধারণ নির্ব্বাচনের সে ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। উর-পেডা যদি নিজের কাজ ঠিকমত না করেন, তাহা হইলে গ্রামের লোক তাঁহাকে সরাইয়া সেই পদে নূতন লোক বাহাল করিতে পারে; তবে নূতন লোকটি উরপেডার বংশের লোক হওয়া চাই। একবার পুরীতে হইয়াছিলও তাই। শেষে মান্দাসার রাজা পুরীতে আসিলে তাঁহার কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া, সাধারণের কাছে ক্ষমা চাহিবার পর তবে পুরাতন উর-পেডাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল।

উর-পেডার কাজ আগে হয়ত অনেক বেশী ছিল। কিন্তু অনেকাংশে এখন দণ্ডের ভার ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতে চলিয়া যাওয়ায় তাহার কাজ অনেক কমিয়া গিয়াছে। বিবাহ, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম, যথা—গ্রামদেবতার পূজা প্রভৃতিতে যোগ দেওয়াই এখন তাহার প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উর-পেডা, কারিজি এবং সাম্মিটোডুর কাজ আজীবন থাকে। তাহারা মারা গেলে লোকে পুনরায় তাহাদের পদে লোক নির্ব্বাচন করিয়া দেয়।

নুলিয়াদের গ্রামে যে পাঁচ শত ঘরের কথা বলা হইয়াছে গ্রামের সাধারণ কাজে তাহাদের একত্র হইতে দেখা গেলেও বিবাহ সম্পর্কে এই ৫০০ ঘরের মধ্যে একটি বিচিত্র ভাগ দেখা যায়। নুলিয়াদের বাড়িগুলি ছোট।

সচরাচর তাহাতে দু-তিনটি ঘর থাকে। একটি ঘরে স্বামী-স্ত্রী এবং ছোট ছেলেমেয়েরা শোয়, অপরটিতে সংসারের কাজকর্ম্ম এবং রান্নাবান্না হয়। আর একটি অন্ধকার কুটুরীর মধ্যে দেবতা ও পূর্ব্বপুরুষদের বেদী থাকে এবং তাহা ছাড়া জাল ও অন্যান্য আবশ্যক জিনিষপত্রও রাখা হয়। বড় ছেলেরা বাড়ির বাহিরে বারান্দায় শুইয়া থাকে। একটু বড় হইলেই মেয়েদের বিবাহ হইয়া যায়, তাহারা স্বতন্ত্র ঘর করিয়া থাকে। বাপ মারা গেলে সকল ভাই বাড়িতে অধিকার পায় বটে, কিন্তু বাড়ি এত ছোট যে, তাহাকে ত ভাগ করা চলে না। তখন বড় ভাই সেই বাড়ি অধিকার করিয়া অন্য ভাইদের অন্যত্র বাড়ি তৈয়ারী করিয়া দেয় বা যথাসাধ্য তাহার জন্য খরচ জোগাইয়া থাকে।

অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া নৃত্য

যাহা হউক, গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন ভাগের কথা বলিতেছিলাম। পুরীর নুলিয়া-বস্তিটি সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম্মের জন্য তেরটি ভাগে বিভক্ত। এই সকল বিভাগকে বিরিসি বলে। বিরিসির নিয়ম হইল যে বিরিসির মধ্যে যে-কোন ঘরে যদি একটি বিবাহ হয় তাহা হইলে বিরিসির যেন সকলকে সেই বাড়িতে খাটিয়া দিতে হয়। বিরিসির অধিবাসিগণ একান্নবর্ত্তী পরিবার। বিবাহের কয়দিন বিবাহ-বাড়িতেই তাহারা খায়দায়, কাজ করে এবং আনন্দ করে।

নুলিয়াদের মধ্যে বিবাহ সচরাচর অল্প বয়সে হয়। বরের বয়স সতের-আঠার এবং কনের বার-তের; ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে কদাচিৎ পাঁচ-ছয় বৎসরের ছেলের সহিত তিন-চার বৎসরের মেয়ের বিবাহ হয়। উপর পক্ষে বরের আঠার-উনিশ এবং কনের পনের-ষোলর বেশী বয়স বাড়িতে দেওয়া হয় না।

বরের পিতাই প্রথমে কথা পাড়েন। যদি কন্যাপক্ষ রাজি হয় তখন বাগ্‌দানের অনুষ্ঠান হয়। সেই দিন কয়েক জন ভদ্রলোককে লইয়া বরের পিতা কনেকে গহনা পরাইতে যান। কনের বাড়িতে সকলে বসিলে কনের বাপ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে বিবাহে রাজি আছে কি-না। মেয়ে যতই ছোট হউক না কেন, তাহার অনুমতি না লইয়া বাগ্‌দান কিছুতেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। যদি সে রাজি না হয়, তাহা হইলে কনের পিতা বরপক্ষের কাছে মাপ চান, আর একদিন আসিতে বলেন এবং ইতিমধ্যে কনেকে যথাসাধ্য বুঝাইয়া রাজি করিতে চেষ্টা করেন। ইহা নুলিয়া সমাজের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। স্ত্রীলোকদের আসন আমাদের সমাজের চেয়ে সেখানে আরও উচ্চে, সেইজন্য স্ত্রীলোকের অনুমতি বিনা বিবাহ নিষ্পন্ন হয় না। যদি অনুমতি ব্যতিক্রম করিয়া কোন পিতা বিবাহ দেন তাহা হইলেও শেষে সে বিবাহ ভাঙিয়া দেওয়া যাইতে পারে, এমনও দেখা গিয়াছে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

যাহা হউক, কন্যা রাজি হইলে সমবেত ভদ্রলোকদের সম্মুখে বরের পিতা তাহাকে সম্পূর্ণ দানের গহনা পরাইয়া দেন, এবং তখন কনের মা সমবেত ভদ্রলোকদের হাত-পা জল দিয়া ধুইয়া দেন। ইহাই হইল বাগ্‌দানের পর্ব্ব বরকর্ত্তা তখন সমবেত ভদ্রলোকদের তিন টাকা করিয়া ও কন্যাকর্ত্তা দুই টাকা করিয়া প্রণামী দেন। তাহার পর

দুই জন দুলিয়া

বরকর্ত্তা মেয়ে লওয়ার খেসারৎ-স্বরূপ কন্যাকর্ত্তাকে নয় টাকা দিয়া থাকেন। বাড়ির একজন কাজের লোক চলিয়া যাইতেছে, ইহারই খেসারৎ নয় টাকা; সে টাকাকে কন্যাবিক্রয়ের মূল্য বলিয়া ধরিবার কোন কারণ নাই।

বাগ্‌দানের পর নায়েক অর্থাৎ জ্যোতিষীর সাহায্যে তিথি, লগ্ন ইত্যাদি ঠিক করিয়া বিবাহের দিন ধার্য্য হয়। বিবাহের তিন দিন বরের বাড়িতে বিরিসির সমস্ত লোক এবং উর-পেড়া, কারিজি ও সাম্মিটোড়ুর পাত পড়ে। বিবাহ বরের বাড়িতে হয়, কনের বাড়িতে হয় না। কনের বাড়িতে তাহার বিরিসির লোকের জন্য পাত মাত্র একদিন পড়ে, তাহার বেশী নয়।

যে-রাত্রে বিবাহের কাজ আরম্ভ হয় সেদিন উর-পেড়া বরের কব্জিতে একটি হলুদ ও একটি পান সুতা দিয়া বাঁধিয়া দেন। তাহার পরদিন তত্ত্ব সঙ্গে করিয়া বিরিসির একটি মেয়ে হলুদ বাটা, হলদে কাপড়, তিলের তেল, কুঙ্কুম, নারিকেল, দর্পণ প্রভৃতি লইয়া সাম্মিটোড়ু বা গ্রামের চাপরাসীকে সঙ্গে করিয়া কনেকে বাপের বাড়ি হইতে আনিতে যায়। কন্যা শ্বশুরবাড়ির কুঙ্কুম ও কাপড় পরিয়া, গায়ে হলুদ মাখিয়া বরের বাড়িতে পঁহুছায়। বাড়ি হইতে আসিবার সময়ে সে আঁচলে কিছু চাল এবং একটি আস্ত নারিকেল লইয়া আসে। এই অবস্থায় সে বরের বাড়িতে সম্মুখের দরজা দিয়া না ঢুকিয়া খিড়কি দরজা দিয়া প্রবেশ করে।

এইবার বরকন্যার কামান এবং স্নানের জন্য মেয়েরা দূরে কোনও পুষ্করিণী বা কূয়া হইতে জল আনিতে যায়। জল আসিলে বর ও কনেকে নারিকেলপাতায়-ছাওয়া শামিয়ানার তলায় পিঁড়িতে বসাইয়া নাপিত নখ কাটিয়া চান করাইয়া দেয়। বর ও কনের বিরিসির মেয়েরা উভয়ের গায়ে তেল, হলুদ এবং বিরি কলাই বাটা মাখাইয়া তাহাদের স্নান করাইয়া দেয়। বরকনের সম্মুখে ধান ও উদুখল রাখা হয় এবং ভবিষ্যতে কনেকে যে ধান ভানিয়া সংসার চালাইতে হইবে এখানে তাহারই ইঙ্গিত করা হয়।

ইহার পর ব্রাহ্মণ আসে। দুলিয়াদের কাজকর্ম্মে শুধু এইখানেই ব্রাহ্মণকে দেখা যায়। মৃত্যুর পর তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণব আসে, ব্রাহ্মণ আসে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ না হইলে বিবাহ নিষ্পন্ন হয় না। ব্রাহ্মণ বর কনেকে পাশাপাশি বসাইয়া একবার বরের হাত কনের হাতের উপর রাখিয়া মন্ত্র পড়ে, আবার কনের হাত বরের হাতের উপর রাখিয়া মন্ত্র পড়ে। তাহার পর উর-পেড়া অর্থাৎ গ্রামের অগ্রণী বরের মাথায় একটি পাগড়ী বাঁধিয়া দেয় এবং ব্রাহ্মণ বর এবং কনে দুজনের গলায় দুইটি পৈতা পরাইয়া দেয়। বোধ হয় এইভাবে কিছুক্ষণের জন্য বরকনেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে অভিষিক্ত করা হয়।

পৈতার পর ব্রাহ্মণ কুশ দিয়া উভয়ের হাত বাঁধিয়া দেয়। সঙ্কল্প ও পূজাদির পর বরের কাপড় ছাড়াইয়া ঘোড়ায় চড়াইয়া উভয়কে গ্রামের মধ্যে একবার ঘুরাইয়া আনা হয়। কনে সামনে বসে, বর পিছনে। কিন্তু কনে বড় হইলে সচরাচর বরের সঙ্গে হাঁটিয়া যায়। উভয়ে ঘুরিয়া আসিলে

নারিকেলমণ্ডপে উভয়কে বসাইয়া গাঁটছড়া বাঁধা হয়। গাঁটছড়ার মধ্যে দুইটি সুপারি ও দুইটি পয়সা থাকে। তাহার পর বর ও কন্যা উভয়ে আঁচলে চাল লইয়া পরস্পরের মাথার উপর তাহা ছড়াইয়া দেয়।

এইবার বরকনে দেখিবার পালা। উভয় পক্ষের বন্ধু-বান্ধব বরকনের মুখ দর্শন করিয়া কেহ এক টাকা, কেহ দুই টাকা, কেহ বা দশ টাকা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যায়। ইহাতে এত টাকা জমে যে, আগাগোড়া বিবাহের খরচ ইহা হইতেই উঠিয়া যায়। কিন্তু সমাজের নিয়ম অনুসারে কে কত দিল তাহার একটু হিসাব রাখিতে হয়। তাহার পর তাহার বাড়িতে আবার বিবাহের সময় ঠিক তত টাকা দিয়া সেখানে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিতে হয়। এইভাবে একজন লোক হয়ত দশ বাড়িতে দশ বৎসরের মধ্যে একশত টাকা দিয়াছে। তাহার সুবিধা হইল, সে আবার নিজের বাড়ির কাজের সময়ে সেই টাকা এবং হয়ত কিছু বেশী টাকা ফেরৎ পায়। লৌকিকতার এই প্রথাটি কতকটা বিবাহ ইনসিওরেন্সের মত ব্যাপার। ইহার ফলে বিবাহের খরচটা নুলিয়াদের কোন দিন গায়ে লাগে না। কেবল দানের গহনাপত্রের খরচটা বরপক্ষকে অন্য ভাবে যোগাইতে হয়।

যাহা হউক, বিবাহের পরদিন খুব ঘটা করিয়া বরকনেকে শহর ঘুরান হয়। ফিরিয়া আসিলে বরের ছোটভাই দাদার ও বৌদির পথ আগলাইয়া দাঁড়ায়। সে নানারকম আপত্তি করে, ঠাট্টা করে, শেষে দাদার কাছে বিবাহ দেওয়াইবার প্রতিজ্ঞা পাইলে দ্বার ছাড়িয়া দেয়। ঘরে ঢুকিয়া বরকনেকে একটি ঘড়ার মধ্য হইতে সোনার ও রূপার আংটি খুঁজিতে দেওয়া হয়। যে সোনারটি পাইবে তাহার বরাত ভাল, এবং যে রূপার পাইবে তাহার অপেক্ষাকৃত মন্দ বলিয়া নুলিয়াদের বিশ্বাস।

বিবাহের তিনদিন বাদ দিয়া একটি ভাল যোগলগ্ন দেখিয়া বর শ্বশুরবাড়িতে যায় এবং সেখানে তাহার স্ত্রীকে রাখিয়া চলিয়া আসে। কিছু কাল পরে তাহার স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহের সংস্কার হইলে তবে সে তাহাকে ঘরে আনিয়া সংসার করে।

ইহাই হইল নুলিয়াদের বিবাহের সাধারণ নিয়ম।

সমুদ্রে বড় জাল ফেলার আগে ভোজ

কিন্তু বিধবা অথবা ত্যক্তা স্ত্রীর সহিত যখন বিবাহ হয়, তখন এত ঘটা কোনদিনই করা হয় না। তখন শুধু কয়েকজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া কুঙ্কুম, বস্ত্রাদি লইয়া বরকর্ত্তা কন্যাকে তাহার পিত্রালয় হইতে লইয়া আসেন, তাহাতেই বিবাহ সিদ্ধ হয়।

নুলিয়াদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ আছে। বিচ্ছেদের জন্য ক্রীশ্চান আইনের মত কোনও দোষ দেখাইবার দরকার হয় না। পরস্পরের মনের মিল নাই, এমন কারণেও বিবাহবিচ্ছেদ হইয়া থাকে। কিন্তু কোন পক্ষ বিচ্ছেদ চাহিলে পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া পঞ্চায়েতের ফি পনর টাকা দিতে হয়, এবং যে পক্ষ বিচ্ছেদ চায় তাহাকে আরও পঞ্চাশ টাকা অপর পক্ষকে খেসারৎ-স্বরূপ দান করিতে হয়। কিন্তু যদি পঞ্চায়েতের বিবেচনায় বিচ্ছেদের যথেষ্ট কারণ থাকে, তাহা হইলে কোন ও টাক না-ও লওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, স্ত্রী স্বামীর মারধর সহিতে না পারিয়া বিচ্ছেদ চাহিতেছে। তখন হয়ত তাহার সমস্ত জরিমানা মাপ করা হয়। এমন কি তাহার পয়সা না থাকিলে পঞ্চায়তী পাওনা পনর টাকা পর্য্যন্ত মকুব করিয়া দেওয়া হয়।

শীতকালে ব্যবহৃত বড় নৌকা

যে সকল ক্ষেত্রে জরিমানা হয়, সেখানেও এককালীন টাকা দিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। অনেক ক্ষেত্রে কিস্তিবন্দীতে টাকা দিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই সকল সুবিধা থাকার জন্য পুরীর নুলিয়া-বস্তিতে প্রতি বৎসর চার-পাঁচটি করিয়া বিবাহবিচ্ছেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার ফলে তাহাদের বিবাহিত জীবন যে অসুখী তাহা বলা যায় না। বরং তাহারা মোটের উপর বর্ণহিন্দুদের চেয়ে সুখে সংসার করে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

নুলিয়াদের মধ্যে বিধবা-বিবাহও প্রচলিত আছে। বিধবা স্বাধীনভাবে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে স্বামীর পুত্রকন্যা ছাড়িয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হয় এবং যাইবার সময়ে সে পিতৃগৃহ হইতে যে গহনা আনিয়াছিল, শুধু তাহাই লইয়া যাইতে পায়। পুত্র স্বামীর, স্ত্রীর নহে। এই জন্য স্বামী বর্ত্তমানে যদি কোনও স্ত্রীলোক বিবাহবিচ্ছেদ ঘটায় তাহা হইলে তাহাকেও পুত্রকন্যা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। তবে শিশু থাকিলে সে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যায়, এবং যতদিন না শিশু বড় হয়, ততদিন নিজের কাছে রাখিতে পারে। বড় হইলে তাহাকে পূর্ব্বস্বামীর গৃহে পাঠাইয়া দিতে হয় এবং তখন সে পুত্রের পিতার নিকট এতদিনের ভরণ-পোষণের ন্যায্য মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকে।

বিবাহবিচ্ছেদ হইলে বা বিধবা অন্যত্র বিবাহ করিলে তাহার স্বামীর সম্পত্তির উপর সকল অধিকার চলিয়া যায়। বিধবা কিন্তু ইচ্ছা করিলে দেবরের সহিত স্ত্রীরূপে বাস করিতে পারে। এরূপ বিবাহ সমাজে সিদ্ধ হইলেও তাহার যে খুব প্রচলন আছে তাহা মনে হয় না। দেবরের বিধবা ভ্রাতৃবধূর উপর কোনও দাবি নাই। অপরে তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে দেবর যে কিছু খেসারৎ পাইবে তেমন কোনও নিয়ম নাই। যাহা হউক, এরূপ বিবাহ যে নুলিয়াসমাজে প্রচলিত আছে, ইহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য।

বিধবাবিবাহের মত বহুবিবাহের নিয়মও নুলিয়াসমাজে বর্ত্তমান আছে। প্রথম স্ত্রীর সন্তান না হইলে আইনতঃ নুলিয়ারা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে বটে, কিন্তু তৃতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। তখন একজনের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া তবে সে অপর স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। এক সঙ্গে দুই জনের বেশী স্ত্রী থাকিতে পারে না, কিন্তু তাহাও ঘটনাক্ষেত্রে খুব বিরল বলা যাইতে পারে। কেবল একটি ক্ষেত্রে পুরীতে এইরূপ বিবাহ হইয়াছিল, তাহারই কথা বলিতেছি। তাহা হইতে নুলিয়াসমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ঘটনাটি বেশী দিনের নয় এবং তাহার নায়কেরা সকলেই আমার সুপরিচিত। সেইজন্য প্রকৃত নাম গোপন রাখিয়া ঘটনাটি বিবৃত করিতেছি। পলাম্মা নাম্নী কোনও

একটি বালিকা রামাইয়া নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। রামাইয়ার বিবাহ পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল এবং সে স্ত্রী লইয়া সুখেই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল। উভয় পরিবারের কর্ত্তাদের মধ্যে কিন্তু সদ্ভাব ছিল না, এমন কি যথেষ্ট মনোমালিন্য ছিল বলা যাইতে পারে। পলাম্মা সুন্দরী এবং ধনীর সন্তান, সুতরাং তাহার পাত্রের অভাব হয় নাই। কিন্তু সেই যে সে রামাইয়াকে বিবাহ করিবে বলিয়া ধরিয়া বসিল, তাহাকে আর কিছুতেই টলান গেল না। তাহার পিতা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, অনেক তম্বিতম্বা করিলেন, শেষে মারধরও করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না।

অবশেষে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যার অসম্মতি সত্ত্বেও তাহার অন্যত্র বিবাহ দিলেন। কিন্তু পলাম্মা কিছুতেই স্বামীর বাড়ি যাইত না। অবশেষে পঞ্চায়েৎ সে-বিবাহ ভাঙিয়া দিতে বাধ্য হইল, পলাম্মার পিতা বরপক্ষকে যাবতীয় দানের সামগ্রী ফিরাইয়া দিলেন।

এদিকে পলাম্মা যাহাতে রামাইয়ার সঙ্গে দেখা করিতে না পারে, তাহার জন্য তিনি সতত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাকে অন্য গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু সে রহিল না। তখন তিনি রাত্রে, বিশেষ করিয়া আমোদ-উৎসবের রাত্রে, বাড়ির চারিদিকে লাঠি লইয়া পাহারা দিতেন। এমনি ভাবে কিছু দিন গেল। কিন্তু পলাম্মা রামাইয়ার বাড়িতে খবর পাঠাইল যে, যদি তাহার বিবাহ না দেওয়া হয় তবে সে জোর করিয়া সেখানে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিবে, তাহাতে লোকে যাই বলে বলুক না কেন। গ্রামের লোক অবশেষে রামাইয়ার পিতার দ্বারা বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইল। পলাম্মার পিতা ত প্রস্তাব শুনিলেনই না, উপরন্তু ভদ্রলোকদের অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

ইহাতেও কিন্তু কিছু হইল না। ইতিমধ্যে রামাইয়ার শ্বশুর স্বীয় কন্যার দুঃখের দিন আসিতেছে ভাবিয়া তাহাকে নিজের কাছে লইয়া গেলেন, আর পাঠাইলেন না। রামাইয়া বহু চেষ্টাতেও স্ত্রীকে আনিতে না পারিয়া শেষে একদিন সবান্ধবে শ্বশুরের বাড়ি পঁহুছিল। শ্বশুর তাহার নির্দ্দোষিতা শুনিয়াও কিছুতেই কন্যাকে পাঠাইতে স্বীকৃত হইলেন না। উপরন্তু পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া বিবাহবিচ্ছেদের প্রস্তাব করিলেন।

রামাইয়ারও ইচ্ছা নাই, তাহার স্ত্রীরও সম্পূর্ণ আপত্তি;

তেপাকাটি বা ভেলা

তবু কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পূরা টাকা দিয়া অনেক করিয়া রামাইয়ার মুখ দিয়া বাহির করা হইল যে সে বিবাহ ভাঙিয়া দিতে প্রস্তুত আছে। বিবাহ ভাঙিয়া গেল, রামাইয়া যথেষ্ট টাকা পাইল, কিন্তু সে সে-সকল কিছু না লইয়া তাহার স্ত্রীকে দান করিয়া চলিয়া গেল। পুরী যাইতেছে বলিয়া গেল, কিন্তু শেষে তাহার এক বন্ধুর পরামর্শে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে গিয়া সে কয়েকদিন বাস করিল। সেইখানে থাকিতে থাকিতে অবশেষে একদিন তাহার স্ত্রীর সহিত গোপনে চরের সাহায্যে ষড়যন্ত্র করিল। তাহার স্ত্রী পিতামাতার কাছে শান্তশিষ্ট ভাবে কয়েকদিন থাকিয়া একদিন ভিন্ন গ্রামে হাটে যাইবার অনুমতি চাহিল। হাটে অবশ্য গেল, কিন্তু হাট হইতে সে স্বামীর সহিত পলায়ন করিল এবং তাহার পর হইতে আর পিত্রালয়ের দিকে যায় নাই।

রামাইয়ার স্ত্রী পলাম্মার প্রেমের কথা সবই জানিত, কিন্তু তাহাতেও তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। এদিকে পলাম্মার জিদ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। শেষে বাস্তবিকই একদিন সে রামাইয়ার বাড়ি আসিয়া বাসা বাঁধিবে যখন এমন ভয় দেখাইল, এবং গ্রামের লোকজনও তাঁহাকে ধরাধরি করিতে লাগিল, তখন বাধ্য হইয়া তাহার পিতা বিবাহে স্বীকৃত হইলেন।

রামাইয়ার পিতা লোকজন পাঠাইয়া নূতন স্ত্রীকে গ্রহণ করিলেন এবং সেই অবধি উভয়ে একত্র বাস করিতেছে। যতদূর জানি উভয়ের মধ্যে কোন কলহ নাই এবং উভয়ে সুখে বাস করিতেছে।

এরূপ ঘটনা দুলিয়া সমাজে বিরল হইলেও উহা হইতে সে সমাজে নারীর স্থান অনেকাংশ বুঝা যায়। পিতামাতার যেমন জোর করিয়া বিবাহ দিবার অধিকার আছে, নারীরও তেমনই সে অধিকার ভাঙিবার ক্ষমতা আছে। সমাজের মর্য্যাদা রক্ষার দিকে পিতামাতার যেমন দৃষ্টি আছে, সামাজিক ঠাট বজায় রাখিবার জন্য তাহাদের যেমন চেষ্টা আছে, মানুষকে সুখী করিবার, তাহার স্বাধীনতাকে স্বীকার করিবারও তেমনি একটা ইচ্ছা সমাজের দিকেও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাতে নারীকে যেমন মর্য্যাদা দিয়াছে, তেমনই তাহার চরিত্রকে স্বাভাবিক ভাবে পুষ্ট হইবার আরও সুযোগ দিয়াছে।

ইহার সাক্ষাৎ কারণ আবিষ্কার করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়। দুলিয়ারা মাছ ধরিয়া যাহা রোজগার করে তাহা মদ খাইতে, সখের জিনিষপত্র কিনিতে ও মহাজনের পাওনা মিটাইতে খরচ হইয়া যায়। বাস্তবিক সংসার চালায় মেয়েরা। তাহারা মজুরি করে, ইট বহিয়া, বালি বহিয়া ঘরে পয়সা আনে এবং সেই পয়সায় সংসারের খরচপত্র চলে। অন্নের জন্য তাহারা স্বামীর উপর নির্ভর করে না। এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের স্বাধীনতা সমাজেও যে স্বীকৃত হইবে ইহাতে বিচিত্র কি?

এই কালো মেঘ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

এই কালো মেঘ ডেকেছিল মোরে
নগরের গৃহপথে;
ভাল করে চোখে চিনিবার আগে
ফিরে গেছে দ্বার হ'তে!
সঙ্গীসাথীরা ধুলায় ধোঁয়ায়
ঘিরে রেখেছিল তারে,—
সহজ কণ্ঠ শুনিতে দেয়নি
বিচিত্র চীৎকারে।

সেই মেঘ ফিরে এসেছে আমার এ
পল্লীর আঙিনায়,
ঊর্দ্ধ আকাশে সেই পরিচিত
ধ্বনিখানি শোনা যায়;
এপার-ওপার একশা করিয়া
নীলা নদীটির কূলে
শ্যামল রূপের ছায়াখানি কাঁপে
এলায়িত কালো চুলে!

বেণুবন-শিরে সজল সমীরে
ঝিমায় দিনের আলো,
কালো ফলে-ভরা জামের শাখায়
ঘনায় দ্বিগুণ কালো;
বেতসের গায়ে জাগে রোমাঞ্চ
ছল ছল নদীতীরে,
দর্দ্দুরদল করে কোলাহল
তৃণপল্লব ঘিরে।

সেই চেনা সুর শ্রবণে পশিয়া
মাতায়ে তুলিল মন,
সেই চেনা রূপ জানাল আবার
রসের নিমন্ত্রণ!
নিমেষের মাঝে পরবাসী হয়ে
ঘরবাসী এই মনে
নিয়ে যেতে চায় অভ্র-পাখায়
অমরার নন্দনে!

পরাণদোসর ওগো বারিধর,
মিনতি তোমায় প্রিয়,
নয়নের সাথে পরাণের পাতে
বিছাও উত্তরীয়।
ফুটাও হরষ-রস-কদম্ব
ছুটাও গো পরিমল,
ডম্বরু স্বরে চিত্তকুহরে
ভুলাও নাগিনী দল।

চলচঞ্চল বলাকার দল—
—শতদলে গাঁথা মালা—
ঐ কালো বুকে হারায়ে যেমন
ভুলে বন্ধন-জ্বালা,
তেমনি এ মন ও রস-সায়রে
ডুবিয়া মরিতে চায়,—
ডুবাও তাহারে—বাঁচাও তাহারে—
মিনতি তোমার পায়!

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম-তারিখ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন দত্তের যে-দুইখানি উৎকৃষ্ট জীবনী আছে, সে-দুইখানিই বহু তথ্যে পরিপূর্ণ। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে নূতন কোন কথা শুনাইবার ভরসা রাখা স্পর্দ্ধার মতই শোনায়। তবু আমার মনে হয় মাইকেলের জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে নূতন আলোকপাত করা এখনও অসম্ভব নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আজ একটি প্রশ্নের উত্থাপন করিব। সে প্রশ্ন—মাইকেলের জন্ম-তারিখ কি?

সকলেই বলেন, মাইকেলের জন্মের তারিখ—২৫এ জানুয়ারি ১৮২৪ (১২ই মাঘ ১২৩০, শনিবার)। শোনা যায়, এই তারিখ তাঁহার কোষ্ঠী হইতে পাওয়া। কিন্তু চরিতকারদের কেহ এই কোষ্ঠী স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন কি-না তাহা আমাদের জানা নাই। মাইকেলের এই জন্ম-তারিখ যে নির্ভুল নহে তাহার দুইটি প্রমাণ দিতেছি।—

(১) মাইকেলের প্রচলিত জন্ম-তারিখ—"২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ (১২ মাঘ ১২৩০, শনিবার)"। কিন্তু ২৫এ জানুয়ারি হইলে বাংলা তারিখ ১২ই মাঘ শনিবার হয় না,—হয় ১৩ই মাঘ রবিবার। ইংরেজী ও বাংলা তারিখের সামঞ্জস্য নাই, সুতরাং এই জন্ম-তারিখের কোথাও-না-কোথাও একটা ভুল আছে।

(২) মাইকেল ১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলে[illegible] স্কুলে প্রবেশ করেন—ইহাই সক[illegible] জানা আছে। ১৮২৪ সনের জানুয়ারি মা[illegible]াইকেলের জন্ম হইয়া থাকিলে, ১৮৩৭ সনে হিন্দু-[illegible]লজে প্রবেশকালে তাঁহার বয়ঃক্রম অন্ততঃ ১৩ ব[illegible] ছিল। কিন্তু ১৩ বৎসর বয়সে মধুসূদন হিন্দু-কলেজে জুনিয়ার স্কুলে প্রবেশ করিতে পারেন না; [illegible] এই বিভাগে ৮ বৎসরের কম এবং ১২ বৎসরের [illegible] বয়স্ক ছেলেকে প্রবেশ করিতে দিবার নিয়ম ছিল [illegible]

[illegible] is divided into a junior and senior school. In the former, boys not less than eight, and not more than twelve, are admitted..."(*Asiatic Journal* for Sept. Dec. 1832. Asiatic Intelligence—Calcutta, pp. 114-115.)

তাহা হইলে মাইকেল নিশ্চয়ই ১৮৩৭ সনের পূর্ব্বে হিন্দু-কলেজের জুনিয়ার স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন।
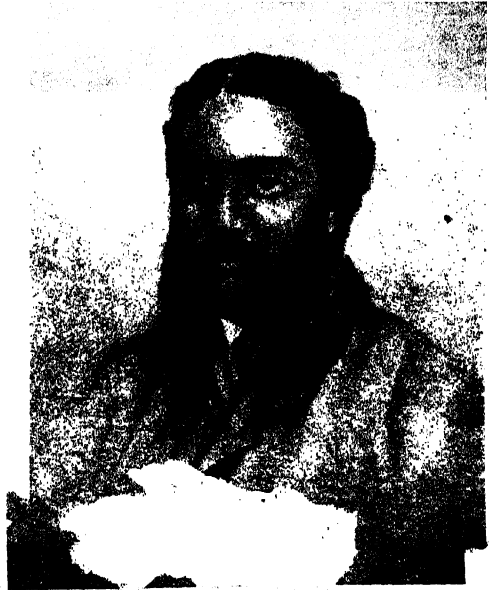
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

তবে মাইকেলের জন্ম-সন কি, এবং কোন্ সনেই বা তিনি সর্ব্বপ্রথম হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করেন? এই দুইটি বিষয়ে আমার বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।—

(১) মাইকেলের জন্ম-সন ১৮২৪ নহে,—আমার মনে হয় ১৮২৩ হইবে। তিনি ১৮৪৪ সনের নভেম্বর মাসে বিশপ্স্ কলেজে প্রবেশ করেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২১ বৎসর ছিল। পাদরি লং তাঁহার *Hand-Book*

of Bengal Missions etc (1848) পুস্তকের ৪৫৭ পৃষ্ঠায়—খুব সম্ভব বিশপ্‌স্‌ কলেজ রেজিষ্টার হইতে—নিম্নাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

List of tho Students connected with Bishop's Collogo in 1846.

Namo.	Date of Admission.	Ago. yrs. ms.	On what Endowment.
* * udhu Sudon Dut * *	Nov. 1844	21	Lay Studont.

স্পষ্ট জানা যাইতেছে, ১৮৪৪ সনের নভেম্বর মাসে বিশপ্‌স্‌ কলেজে প্রবেশকালে মাইকেলের বয়স ছিল ২১ বৎসর। ইহা দ্বারা তাঁহার জন্ম-সন ১৮২৩ পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার সমাধি-স্তম্ভেও এই জন্ম-বৎসর খোদিত আছে।

উদ্ধৃত অংশ হইতে আরও একটা সঠিক তারিখ পাওয়া গেল। আমরা এখন জানিতে পারিলাম যে মাইকেল বিশপ্‌স্‌ কলেজে প্রবেশ করেন ১৮৪৪ সনের নভেম্বর মাসে—১৮৪৩ সনে নহে।

(২) প্রচলিত জীবনচরিতগুলির মতে, মাইকেল ১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলেজের জুনিয়ার স্কুলে প্রবেশ করেন। কিন্তু মাইকেল যে ইহার অন্ততঃ চার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু-কলেজে শিক্ষার্থী ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। ১৮৩৪ সনের ৭ই মার্চ্চ কলিকাতার টাউন-হলে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ হয়। এই উপলক্ষে মাইকেল একটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন। এই পুরস্কার-বিতরণী সভার বিবরণ সেকালের সাপ্তাহিক পত্র 'সমাচার দর্পণে' পাওয়া যায়। ১৮৩৪ সনের ১২ই মার্চ্চ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' পাইতেছি :—

ষষ্ঠ হেনরি ও প্লাষ্টর

ষষ্ঠ হেনরি।	...	...	ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল।
প্লষ্টর।	...	...	মধুসূদন দত্ত।

জানা গেল, ১৮৩৪ সনের মার্চ্চ মাসে মাইকেল হিন্দু কলেজে শিক্ষার্থী রূপে ছিলেন। ইহার পূর্ব্বেই—সম্ভবতঃ ১৮৩৩ সনে, তিনি হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, মাইকেলের জন্ম-সন ১৮২৩ হওয়া উচিত। তাহা হইলে তিনি হিন্দু কলেজের জুনিয়ার স্কুলে আনুমানিক ১০ বৎসর বয়সে প্রবেশ করিয়াছিলেন, প্রচলিত জীবনীগুলিতে যে ১৩ বৎসর বয়সের কথা আছে তখন নয়।*

* ১৩৪১।১৪ই আষাঢ় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিসভায় পঠিত।

শ্যামল-রাণী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মিত্তিরদের মেয়ে সুধা আজ বছর দুই পরে বাপের বাড়ি আসিল। গিয়াছিল যখন—একা। আজ পাল্‌কি হইতে নামিল—কোলে ননীর পুতুলের মত একটি শিশু। সাত বছরের ছোট বোন শৈল আহ্লাদের চোটে হাততালি দিয়া উঠিল, বলিল,—"দিদিকে ঠিক ওপর-ঘরের পটের গণেশ-জননীর মত দেখতে হয় নি মা?—ঘেটা নতুন টাঙান হয়েচে?...না-গো বৌদি?"

সুধা মাকে আর ভাজকে প্রণাম করিয়া হাসিয়া বলিল—"গণেশ-জননীর মা তবুও বছরের শেষে একবার ক'রে তাঁর মেয়েকে......"

গলা ভারী হইয়া গেল, চোখ ডবডব করিয়া উঠিল, ঠোঁটে হাসি কিন্তু লাগিয়াই রহিল। বাপের বাড়ি আসার মিশ্র অনুভূতি,—একটুতেই হাসি ধৌত করিয়া অশ্রু উছলিয়া ওঠে।

খোকাকে বুকে লইয়া, চুমা খাইয়া, মা আঁচলে চোখ দুইটা মুছিয়া বলিলেন—"মা'র অসাধ বাছা?...যা সাত-সমুদ্র-তের-নদীর-পারে দিয়েচি...তা'র—ভালছিলি সুধা? ওমা, এটা কি চমৎকার হয়েছে গো! ছেলেবেলাতে তুই ঠিক এই রকমটি ছিলি,—বেশ মনে আছে আমার..."

মেয়ের আব্দারের সঙ্গে নূতন আমার ভাষা সুর...

মিশাইয়া সুধা বলিল—"তুমি ত বলবেই। আমি কিন্তু অমন দস্যি ছিলাম না বাপু, কক্ষনই না। আমায় ত নাজেহাল ক'রে দিয়েচে। সামলান কি সোজা?"

ভাজ ততক্ষণ খোকাকে লইয়াছে। একটু একান্তে ঠোঁট টিপিয়া বলিল—"একটিতেই?"

ননদ-ভাজের মধ্যে এক ধরণের চোখোচোখি হইয়া গেল।

শৈল খোকার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল—"দাও আমার কোলে বৌদি, আমি ত মাসী হই?"

খোকাকে দিয়া বৌদিদি হাসিয়া বলিল—"হ্যা, ক্ষুদে-মাসী।"

সুধাও হাসিয়া উঠিল। ছোট ভাই-পো মস্তু মার পেছনে, আঁচল টানিয়া দিয়া অপ্রতিভ ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, আর পিসীর সহিত পটের গণেশ-জননীর সাদৃশ খুঁজিয়া হয়রাণ হইতেছিল; সুধা তাহাকে কোলে লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"হ্যারে খোকা, পিসীকে ভুলে গেলি? ···দেখচ মা ছেলের বেইমানি?—আর এই পিসি এক দণ্ড না হ'লে চলত না।"

মস্তু ছুটিয়া পলাইয়া শৈলর পাশে গিয়া দাঁড়াইল এবং যাইতে যাইতে শিশুর দিকে চাহিয়া, নিজের মনোগত সমস্যার একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া বলিল—"খোকা ঠিক পটের গণেশের মত মোটা হয়েচে, না মেজপিসী?"

খোকার মাসী চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, মার পানে চাহিয়া ভীতস্বরে বলিয়া উঠিল—"শুনলে মা?—খোকা নাকি গণেশের মত মোটা হয়েচে!···এই বেস্পতিবারের বারবেলা ছেলেটাকে খুঁড়লে!—ষাট, ষাট···"

তাহার রকমখানা দেখিয়া মা, সুধা, বৌদিদি, তিন জনেই হাসিয়া উঠিল।

সুধা বলিল—"রোববারের সকাল একেবারে বেস্পতি বারের বারবেলা হ'য়ে গেল! ঠিক সেইরকম গিন্নী আছে শৈলী, না মা?—বরং আরও বেড়েচে।"

বৌদিদি হাসিয়া বলিল—"তোমার জায়গা দখল করেচে; বাড়িতে একটি থাকা চাই ত, নইলে গরু, বেরাল, পায়রা—এদের সংসার কে দেখবে বল?"

দুই বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত সেই ব্যাপারই ছিল। আজ সে-কথার উল্লেখে একটু লজ্জা করিয়া আসিল বটে, কিন্তু সুধা আগ্রহটাও দমন করিতে পারিল না; জিজ্ঞাসা করিল—"পায়রাগুলো বিদেয় ক'রে দিয়েচ নাকি মা? পুসীটার এবারে ক'টা ছানা হ'ল? আর শ্যামলী?—তার বাছুরটা কেমন হ'ল?···যাক, একটা সাধ মিটবে এবার, শ্যামলীর দুধ খেয়ে যাব। ভাবতেও কি রকম হয়, না মা?—এই সেদিনকার শ্যামলী, এতটুকু বাছুর, বাড়ি এল—সিঁদুর, হলুদ দিয়ে গোয়ালে তোলা হ'ল, আর আজ তার নিজেরই বাছুর!···"

বৌদিদি যেন ওৎ পাতিয়া ননদের কথাগুলি শুনিতে-ছিল, এই পর্য্যন্ত আসিলে একটু অর্থপূর্ণ হাস্যের সহিত সংক্ষেপে বলিল—"ওই রকমই ত হয়।"

বাড়িতে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রবেশ করিতে করিতে সুধা আব্দারে-নালিশের সুরে বলিল—"দেখচো মা বৌদিকে?"

অল্পক্ষণ পরেই শ্বশুরবাড়ির বউমানুষের ভাব আর মাতৃত্বের গাম্ভীর্য্য যাহা একটু লাগিয়া ছিল, সুধার দেহ-মন থেকে একেবারে অপসৃত হইয়া গেল। জামা কাপড় ছাড়া, বাক্সপত্তর গোছান সব ভুলিয়া সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুসীটাকে প্রথমে তল্লাস করিয়া বাহির করিল, এক আঁজলা চাল উঠানের মাঝখানে ছড়াইয়া দিতেই পায়রাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে নামিয়া বকবকম আওয়াজ করিয়া ভোজের মধ্যে সংস্কৃত-উদ্গারী পণ্ডিতদের মত এক মহাসমারোহ লাগাইয়া দিল। সুধা তাহাদের সামনে রকে পা ছড়াইয়া বসিয়া পুসীকে কোলে চাপড়াইতে চাপড়াইতে সুর করিয়া ছড়া কাটিতেছিল—

'সারা ভারত বাড়ি বাড়ি ষষ্ঠীঠাকুর ব'য়ে
একেবারেই হ'ল পুসীর সাতটি ছেলেমেয়ে,
বর দাঁড়াল শাপে গিয়ে, অন্ন দেওয়া ভার···

এমন সময় বোন্‌পোকে পাড়ায় একটু টহল দেওয়াইয়া শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল, পেছনে পেছনে দুটি বেরালছানা। সুধার কাছে পরিচয় করাইয়া দিল—"পুসীর ছানা; একটি শেয়ালের পেটে গেছে; তবুও কি একবার ঘুরে দেখে? মুয়ে আগুন মায়ের, ওঁকে আর আদর ক'রো না, দু-চক্ষের বিষ। মা-ষষ্ঠী কি দেখে যে ওকে দেন অতগুলি ক'রে।···হ্যা দিদি, এই ছেলে হ'ল তোমার দুষ্টু?"

খোকার মাথাটা নিজের কাঁধে চাপিয়া চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল—"এমন ঠাণ্ডা ছেলে এ-তল্লাটে দেখাক-দিকিন কেউ! বাছা আমার মাসী ব'লতে অজ্ঞান।"

মা, বৌদিদি, সুধা তিন জনেই হাসিয়া উঠিল। সুধা বলিল—"আচ্ছা মা, পাঁচ মাসের একটা শিশু,—সে ওকে কখন মাসী ব'ললে বল দিকিন?—আবার বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল।"

মা বলিলেন—"মাসী হ'য়ে ও-ই জ্ঞানরহিত হয়েচে—কি যে করবে, কি বলবে…"

শৈল তাহার মাসীত্ব লইয়া এমন 'ব্যাখ্যানায়' অপ্রস্তুত হইয়া খোকাকে রকে বসাইয়া দুড়-দুড় করিয়া পলাইতেছিল। দুয়ারের নিকট হইতে হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া সন্ত্রস্তভাবে বলিল—"ও দিদি! শীগগির পুঁসীকে নামিয়ে খোকাকে কোলে নিয়ে ভবিসব্যি হ'য়ে ব'স;—তোমার সই, সই-মা, ও-পাড়ার সতী-পিসি—একপাল সব দেখতে আসচে তোমায়—দাও নামিয়ে—দিলে?…"

সুধা ধীরেসুস্থে বাটি থেকে একমুঠা চাল উঠানে পায়রার ঝাঁকের উপর ছড়াইয়া দিয়া বলিল—"বয়ে গেচে আমার; শ্বশুরবাড়ির ক'নে বউ নাকি?"

গাড়ীতে সমস্ত রাত্রি জাগার জের,—বিকাল হইয়া গেলেও সুধা অঘোরে নিদ্রা দিতেছিল। শৈল আসিয়া হন্তদন্ত হইয়া তাহাকে ঠেলিয়া উঠাইল—"ও দিদি, শামলী ফিরে এসেচে, তার বাছুর দেখ'সে; কি চমৎকার যে হয়েচে, এ-তল্লাটে অমন বাছুর কেউ যদি…"

মা ধমক দিয়া উঠিলেন—"না, এ-তল্লাটে যা-কিছু এক তোদেরই আছে।…দেখ্ দিকিন, সমস্ত রাত ঘুমোয় নি মেয়েটা, মিচিমিচি এসে তুললে!"

শৈলর মনে দিদির আর খোকার আসার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একটা তোড় নামিয়া গিয়াছে; কিন্তু সেটা যেন নিজের বেগেই সব জায়গায় ধাক্কা খাইয়া মরিতেছে। উৎসাহের মুখে মা'র নিকট ধমক খাইয়া বেচারি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, দিদির কথায় আবার সামলাইয়া উঠিল।—উঠিতে উঠিতে সুধা হাসিয়া বলিল—"ভাগ্যিস্ শৈলী তুললে মা!—স্বপ্ন দেখছিলাম—খোকাকে না দেখে শ্বশুরের যেন ভীমরতি দাঁড়িয়ে গেচে; এসে ব'লচেন—'এক বছর হ'য়ে গেল বৌমাকে পাঠিয়েচি, কতদিন আর রাখা চলে?'…যাবেনই নিয়ে…তোমরা হাতে ধ'রে কাকুতিমিনতি ক'রে ব'লচ—'এই ত মোটে আজ সকালে এসেচে বেইমশাই…কে শোনে?…সেজেগুজে কাঁদতে কাঁদতে বেরুচ্চি—এমন সময় শৈলী…"

শৈল চোখ দুটো বড় বড় করিয়া একেবারে তদ্‌গত হইয়া শুনিতেছিল; উল্লাসে হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিল—"দেখ, কেমন আমি দিদিকে বাঁচিয়ে দিয়েচি; যদি না…"

তাহার পর সবার হাসিতে নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া, একেবরে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দিদির কোলে মিশিয়া গেল।

সুধা বলিল—"চল্, ওঠ্, দেখিগে।"

নামিতেই খোকা জাগিয়া উঠিল। "দেখেচ? ওর টনক নড়ে, কোথাও যদি এক-পা যাবার জো আছে।"—বলিতে বলিতে খোকাকে তুলিয়া লইল, ভাজের দিকে চাহিয়া বলিল—"বৌদি তুমিও এস ভাই।"

"হাতের পাট-টা সেরে আসচি, তুমি এগোও।"—বলিয়া সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

শামলী গোয়াল ঘরে তৃপ্তির গাঢ় নিঃশ্বাসের সঙ্গে জাব্‌না খাইতেছিল, আর মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া সামনের খোলা জায়গায় চঞ্চল, উৎক্ষিপ্যমান বৎসটির পানে চাহিয়া এক-একটা হ্রস্ব অথচ গভীর আওয়াজ করিয়া নিজের বাৎসল্য-স্নেহ প্রকাশ করিতেছিল। সুধা সামনে আসিয়া বলিল—"কি লা শামলী, চিনতে পারিস?…ওমা, কত বড়টা হয়ে গেচে গরুটা!"

শামলী নাদা হইতে ঘাড়টা বাহির করিয়া জাব্‌না চিবাইতে চিবাইতে প্রশ্নকর্ত্রীর পানে একটু চাহিল, তাহার পর হঠাৎ মুখনাড়া বন্ধ করিয়া দু-পা আগাইয়া আসিয়া সুধার ডান হাতটা সুদীর্ঘ টানের সঙ্গে চাটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। বুকের নিকট হইতে একটা অব্যক্ত, ভরাট আওয়াজ বাহির হইয়া আসিতে লাগিল এক

প্রবল নিঃশ্বাসে মুখের ওপরের জাব্‌নার কুটাকাটিগুলা সুধার শাড়ীর উপর উড়িয়া সাঁটিয়া যাইতে লাগিল।

খানিকক্ষণ জিবের আঁচড় সহ্য করিয়া সুধা সুড়সুড়িতে ঘাড়টা কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"ওরে থাম্, বাছুর চেটে তোর যা জিব হয়েচে, আমার এক পরদা চামড়া উঠে গেল···দেখ কাণ্ড, আবার খোকাকে চাটতে যায়!"

হাসিয়া দু-পা পিছাইয়া গেল। শ্যামলী ব্যগ্রভাবে একবার দড়িতে টান দিয়া ঘাড়টা নাড়িয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে বাছুরটার উপর নজর পড়ায় "হ্বাং!" করিয়া ডাক দিয়া উঠিল এবং বাছুরটা ছুটিয়া আসিলে কিছুক্ষণ আগন্তুকদের ভুলিয়া, সপ্রেমে তাহার গা-টা ঘন ঘন এক চোট চাটিয়া দিয়া আবার সুস্থির হইয়া দাঁড়াইল।

সুধা চোখমুখ কৌতুকে বোঝাই করিয়া বাছুরের সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যান করিতে যাইতেছিল, দু-একটা কথা বলিয়া দিদির দিকে চাহিতেই থমকিয়া গেল। দিদি ডানহাতের তর্জ্জনীটা গালে চাপিয়া, নিতান্ত বিস্ময়ে ঘাড় কাৎ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; বলিল—"দেখ্‌লি শৈলী, কাণ্ডটা!"

শৈল এমন কিছু কাণ্ড দেখিতে পায় নাই যাহাতে দিদির এতটা ভাবান্তর হইতে পারে। প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, তাহার পূর্ব্বেই সুধা সুরু করিয়া দিল—"দেখলি না ঠেকারটা?—চাটতে দিলাম না তাই স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে—তোমার খোকা আচে, আমার নেই? এই দেখ···কেমন ডাকলে, কেমন কোলে টেনে নিয়ে চাটতে লাগল!···হ্যালা শামলী, গেরস্তকে এতদিনেও একটা নই-বাছুর দেওয়ার মুরোদ হ'ল না, উল্টে আমার সঙ্গে টেক্কা দিতে এলি! মুয়ে আগুন, ব্যাটা-বাছুরের আবার গুমোর কি লা?—কি কাজে লাগবে? কদ্দিনই বা কাছে ধ'রে রাখতে পারবি? আমার এই সোনার-চাঁদের সঙ্গে তুলনা হ'ল কিনা···"

বৌদিদি আর মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৌদিদি হাসিয়া বলিল—"কি কথা হচ্চে গো পুরনো সইয়ের সঙ্গে?"

দিদির কথাবার্ত্তা শুনিবার পর শৈল শ্যামলীর ব্যবহারে দিদির চেয়েও ক্ষুব্ধ ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া গিয়াছিল, বড় বড় চোখ করিয়া আরম্ভ করিল—"ব'ললে পেত্যয় যাবে না মা, দিদির কোলে খোকাকে দেখে শামলী ঠেকার ক'রে···"

কোন্ ফাঁকতালে হঠাৎ ছেলেবেলার সুধা আসিয়া তাহার মুক সখীর সঙ্গে মুখর আলাপ জমাইয়া তুলিয়াছিল, সরমের স্পর্শে আবার অন্তর্হিত হইয়া গেল। নদীর মধ্যে হঠাৎ যেন ঝরণার উচ্ছলতা আসিয়া পড়িয়াছিল।··· শৈলকে ধমক দিয়া সুধা বলিল—"হ্যাঃ, গরুর নাকি আবার ঠেকার হয়!—পাগলের মত যা তা ব'কিস্ নি শৈলী।"

শ্যামলীর কাণ্ডর চেয়ে দিদির কাণ্ড আরও দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বোধ হইল; শৈল অপ্রতিভ হইয়া হাঁ করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুধা মাকে কহিল—"বলছিলাম মা, শাম্‌লীর শেষে ব্যাটা-বাছুর হ'ল? 'নই' হ'লে নিয়ে যেতাম আমি। শ্বশুর কি ভাল একটা নাকি ওষুধ জানেন, খাওয়ালে নাকি নই-বাছুর হ'তেই হবে···হাসচ বৌদি, কিন্তু একেবারে নাকি পরীক্ষিত, নড়চড় হবার জো নেই।"

মাও না হাসিয়া পারিলেন না, বলিলেন—"তিন বার ত 'নাকি' বললি, অথচ নড়চড়ও হবার জো নেই! শ্বশুর তোর ভারি গুণী ত!"

সুধা লজ্জায় 'যাও'—বলিয়া মুখ ফিরাইল।

ভাজ বলিল—"তার চেয়ে তুমি শাম্‌লীকে নিয়ে যাও না ঠাকুরঝি, ঠাকুর-জামায়েরও পণ রক্ষা হয়······"

সুধা ঘাড় নীচু করিয়া বাড়ির দিকে পা বাড়াইয়া বলিল—"না বাবু, আমি চললাম, শাশুড়ী-বউয়ে এক-জোট হ'য়ে আমার পেছনে লাগলেন সব।"

সে একটা আলাদা কাহিনী, বিবাহের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়ান। যতই বড় হইতেছে তাহার লজ্জাটা সুধাকে ততই যেন অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে।

শর্দ্দার বিবাহ-সংক্রান্ত বিল লইয়া সারা দেশটায় সামাল সামাল রব পড়িয়া গেল; লোকে বলিল—কালাপাহাড় এবার কলম হাতে করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। সে আজ প্রায় চার-পাঁচ বৎসরের

কথা ; সুধা আট পারাইয়া ন'য়ে পড়িবে। দুপুরে সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে যখন গ্রামের মাতব্বরদের মধ্যে আসন্ন ধর্ম্মবিপ্লব লইয়া সুচ্যগ্র আলোচনা চলিতে থাকে, সে তখন তাহাদের নূতন গোয়াল-ঘরের পিছনে লিচুগাছের ছায়ায় খেলাঘর পাতিয়া জীবনের মাঝখানে বিচরণ করিতে থাকে। হালদারদের নিমাই হয় কর্ত্তা, সে হয় গিন্নী, দু-বছরের শিশু শৈল হয় মেয়ে। পুসী বেরালটা তখন বাচ্চা, চারখানা ইটের একটা ছোট্ট ঘরে কাপড়ের পাড়ে বাঁধা থাকিয়া অসহায় ভাবে বসিয়া থাকে। 'মিউ মিউ' করিয়া শব্দ করিলে সুধা বিব্রত হইয়া বলে—"ওদিকে গরুটা ডেকে ডেকে সারা হ'য়ে গেল, কোন্ দিকটা যে সামলাই···"

সই বউমা হয়। নিমাইয়ের ভাই ননী প্রায়ই অসুখে ভোগে, যেদিন আসিতে পারিল সেদিন সে হয় বাড়ির ছেলে, সই-বৌমার বর। দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকিলে সইকে নূতনত্বের খাতিরে বিধবা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

আসল সংসারে যে-সব কথা হয় নকলে তাহার প্রতিধ্বনি ওঠে।—সুধা রান্না করিতে করিতে কড়ায় খন্তির দুই তিনটা ঘা দেয়, উনানের মধ্যে কাঠটা একটু ঠেলিয়া দিয়া ঘুরিয়া বসে এবং হাঁটু দুইটা মুড়িয়া ডাকে—"বলি হাগা, শুনচ ?"

নিমাই আসিয়া উপস্থিত হয়, জিজ্ঞাসা করে—"কথাটা কি ?"

সুধা তাহার গাফিলতিতে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া যায় ; নিজের গৃহিণীত্ব ভুলিয়া বলিয়া ওঠে—"নাঃ, তোমায় শিখিয়ে শিখিয়ে পেরে উঠলাম না নিমুদা ;—বাবার মত হাতে হুঁকো কই ?"

ছেলেটা বড় ভুলো-মন, খুঁজিয়া-পাতিয়া হুঁকাটা লইয়া আসে। একটা পেঁপের ড াঁটার নীচের দিকটা একটু ছেঁদা-করা, মাথায় একটা কল্‌কে-ফুল বসান। একখানা ইট পাতিয়া তাহার উপর বসিয়া প্রশ্ন করে—"কি বলছিলে ?"

"বলছিলাম আমার মাথা আর মুণ্ডু ;—নাকে তেল দিয়ে সব ঘুমুচ্চ,' সরকার বাহাদুর যে এদিকে জাতকুল নিয়ে টানাটানি লাগিয়েচে—হিঁদুয়ানি যে যেতে বসল। শুনচি নাকি মেয়েদের আর বাইশ বছরের কমে বিয়ে দিতে দেবে না ?"

কর্ত্তা নিমু বলে—"বাইশ না আঠার ?"

"বড় তফাৎ! আজ আঠার, কাল পাল্‌টে বাইশ ক'রে দেবে। বলি সুধীটার কথা ভাবচ ?"

"আট বছরের শিশু, ওর কথা আর কি ভাববো ? শুনচি জেলায় এই নিয়ে একটা মিটিন্ হবে ; গ্রাম থেকে ডাল্‌ঘেঁটে পাঠাবার জন্যে তারণ খুড়োর কাছে লোক এসেছিল···"

সুধা আরও গম্ভীর হইয়া বাধা দিয়া বলে—"বাইরের লোক তোমার জাত বাঁচাবে সেই ভরসায় আছ ? তোমাদের ঘটে কি একটুও বুদ্ধি···"

তাহার কড়া চোখ দেখিয়া নিমাই একটু থতমত খাইয়া যায় ; তাহা ভিন্ন নিজে একটু হাঁদা বলিয়া কথাটা তাহাকে সাক্ষাৎভাবে আঘাতও করে। আমৃতা আমৃতা করিয়া একটু নীচু হইয়া বলে—"ছাঁঃ, বুদ্ধি নেই কে বললে ?—খালি ঐ কথা।"

রাগের চোটে সুধা পিঁড়া ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলে—"তোমার দ্বারা হবে না নিমুদা, তুমি বাড়ি যাও। 'যে মেয়েমানুষের দশ হাত কাপড়ে কাছা জোটে না, সে আবার বুদ্ধির খোঁটা দেয়'—রেগে এইখানে এই কথাটা বলতে হবে না ? শুনলে না সেদিন বাবা মাকে বললেন ?"

সুধার মূর্ত্তি দেখিয়া নিমাইয়ের নিজেরই কাছাকোঁচার ঠিক থাকে না। কোন রকমে কাপড়টা সামলাইয়া লইয়া বলে—"আচ্ছা আচ্ছা, বলচি, বোস ; তোর মা কিন্তু ও-রকম রেগে কাঁই হয়ে ওঠে না সুধী, তা ব'লে দিচ্ছি ; তোকে নিয়ে ঘর করা বড় শক্ত।"

এই সময় একদিন সুধার বাপ রামরতন বাথমারীর হাট থেকে শ্যামলীকে কিনিয়া আনিলেন। ইহাতে যে শুধু পুসী বেরালটা গাভীত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল তাহাই নয়, খেলাঘরের ঘরকরণার পদ্ধতিতেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিল।

রান্নাবান্না, ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল তোলা—এ-সবের

পাট উঠিয়া গিয়াছে ; এখন কর্ত্তা গিন্নী, ছেলে বউ সকলে শ্যামলীর পিছনে হয়রাণ ;—কোথায় নধর ঘাস জন্মাইয়াছে, কোঁচড় ভরিয়া তুলিয়া আনা ; কে কোথায় গাছ কি ডাল কাটিয়াছে, পাতা সংগ্রহ করা ; ওদিকে গ্রামে সবার বাগানে যে কি হইয়াছে,—নেউল তাড়ানো চুনদাগা হাঁড়িতে আর কাজ হয় না। নিমাই ত সুধাকে তুষ্ট করিবার এমন সুবর্ণ সুযোগ পাইয়া একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছে ; এতদিন স্কুলে যে সময়টা নষ্ট হইত তাহারও বহুলাংশ এখন শ্যামলী-পরিচর্য্যায় সার্থক হইয়া উঠিতেছে। এই সব করিয়া যে সময়টুকু উদ্বৃত্ত হয় তাহাতে সুধা সকলকে গো-তত্ত্ব শিক্ষা দেয়।

বলে—"তোমরা যে মনে কর মশাই, ওরা আসল গরু, বুদ্ধিসুদ্ধি নেই—তা নয়। সব বোঝে—দেখচ না কি রকম ক'রে আমাদের কথা শুনচে?···সত্য যুগে ওরা কথাও কইত···"

ননী বলে—"ওরা ত ভগবতী!"

বাৎসল্যের মৃদুহাস্যের সহিত সুধা বলে—"হ্যা ভগবতী, তা ব'লে কি লক্ষ্মী-সরস্বতীর মা ভগবতী?—তা নয় ; ও অন্যরকম ভগবতী। হ্যা, কি যে বলছিলাম—সত্য যুগে ওরা কথাও বলত, তার পর কোন্ মুনির শাপে বোবা হয়ে যায়। অনেক কান্নাকাটির পর মুনি বলেন—"আচ্ছা যা, তোদের কোন কষ্ট হবে না—তোদের বুদ্ধি একটু মানুষের মাথায় সাঁদ করিয়ে দিচ্চি—তোদের নিজের জাত যেমন তোদের ইসারা বুঝবে, মানুষেও সেইরকম বুঝতে পারবে। কাছে গেলে শামলী যখন তোমার হাত চাটে তখন তোমার ত বুঝতে বাকী থাকে না যে ঘাস-পাত তুলে আনতে ব'লচে—সে কেমন ক'রে বোঝ মশাই? যখন···"

ভক্তিমান ননী বলে—"আর গরু ত স্বর্গ, ওদের গায়ে তেত্রিশ কোটি দেবতা থাকেন।"

সুধা বলে—"থাকেনই ত ; মুখে ব্রহ্মা থাকেন, মাথায় জগন্নাথ থাকেন, ন্যাজে কার্ত্তিক থাকেন···"

সই করুণাপরবশ হইয়া বলে—"আহা, কার্ত্তিকের বড় কষ্ট ভাই ; সব্বদা ন্যাজ ধ'রে ঝুলতে হয়···"

সুধা বলে—"চুপ, ব'লতে নেই!" তাহার পর নিমাইয়ের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলে—"আর অত দেবতা থাকেন ব'লেই ত গরুর জন্যে চুরিটুরি ক'রলে কোন দোষ হয় না, বরং পুণ্যিই হয়। এই দেখ না, একটা পিঁপড়ে মারলেও কত পাপ হয় ত?—কিন্তু মা-কালীর সামনে পাঁঠা-বলি দিলে কোন দোষ হয় কি?"

যুক্তিটা অকাট্য ; ইঙ্গিতটাও অস্পষ্ট নয়,—ফলে নিমাইদের গোয়াল হইতে কোঁচড় ভরা খোল কুঁড়ো, কলাই হাজির হইয়া শ্যামলীর উদরে প্রবেশ করে। সইও সাধ্যমত পুণ্যসঞ্চয়ে মনোযোগী হইয়া ওঠে।

এদিককার খবর সংক্ষেপত এই—

জেলায় মিটিং হইয়াছিল ; হরবিলাস শর্দ্দাকে যথাযোগ্য গালাগালির পর ছেলেদের বিবাহযোগ্য বয়স ষোল এবং মেয়েদের বারো ধার্য্য করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে এর তুমুল আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে হরবিলাস শর্দ্দা এবং জেলার উকিল ও অন্যান্য উদ্যোক্তাদের যথাযোগ্য গালাগালির পর ছেলেদের ন্যূনতম বয়স চোদ্দ এবং মেয়েদের দশ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ও-পাড়ার তিনকড়ি-খুড়ীর বাড়িতে উৎকট রকমের এক মেয়ে মিটিং বসিয়াছিল, তাহাতে হরবিলাস শার্দ্দা, গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর, জেলার উকিল এবং সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে যাহারা তামাক পোড়ায় সকলকেই একঘাটে 'ভাগাড়ে' দেওয়া হইয়াছে। গ্রামের নানারূপ কেচ্ছাকাহিনী আলোচনার পর সকলের মনের বোঝা হাল্কা হইলে ধার্য্য হইয়াছে যে, ইহাদের পুরাপুরি মতিচ্ছন্ন হইবার পূর্ব্বেই বয়স-নির্ব্বিশেষে গ্রামের সমস্ত অনূঢ়া কন্যাকে পাত্রস্থা করিয়া জাতকুল বাঁচাইতেই হইবে ;—'তা বর কানা হোক, খোঁড়া হোক, নুলো হোক, কুঁজো হোক, মন্তরটা কোনরকমে আউড়ে দিতে পারলেই হ'ল···'

বিধিব্যবস্থার যথেষ্ট অভাব থাকিলেও দুপুরের এই মহিলা-মজলিসই সাধারণত জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে ; বিশেষ করিয়া মজলিসের কর্ণধার যদি তিনকড়ি-খুড়ীর মত কেহ থাকেন। পাড়ায় পাড়ায় কন্যা-মহামারী পড়িয়া গেল।

কয়েক দিন পরের কথা। বিকালে সুধা বাগানের এক

কোণে শ্যামলীর গলা জড়াইয়া আদর করিতেছিল—"শামলী শুমলী শ্যামলরাণী, তুমি আর কারুর নয় সোনামণি···"

শ্যামলী তাহার সমস্ত পিঠখানি চাটিয়া-চাটিয়া বোধ হয় জানাইতেছিল—না, আমি আর কাহারই নয়, একান্ত তোমারই···

এমন সময় মা আসিয়া বলিয়া উঠিলেন···"দেখ কাণ্ডখানা! সমস্ত পাড়া তোলপাড় ক'রে ম'রচি, আর মেয়ে কিনা গাদাড়ের মধ্যে গরুর সঙ্গে সোহাগে ব্যস্ত!··· তোকে না আজকে দেখতে আসবে, সুধী?···গা মাজতে হবে না, চুল বাঁধতে হবে না?···চ'লে আয় শীগিগর।"

দেখিতে আসিলেন মাঝের পাড়ার সাব-রেজিষ্ট্রারবাবু, নাম জগবন্ধু রায়। বিদেশী লোক, মেদিনীপুরে বাড়ি, কার্য্যোপলক্ষে বদলি হইয়া এখানে বছর দুই-তিন আছেন। ছেলেটি এখানে থার্ড ক্লাসে পড়ে; বছর তেরো বয়স হইবে। জগবন্ধুবাবু একটু বাহিরের খবরাখবর রাখেন এবং প্রত্যেক বিষয়ই যুক্তিতর্কের শেষ সীমানা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া তুলিয়া অনুধাবন করেন। ছেলে তাঁহার একটু ছেলেমানুষ, কিন্তু এর পরেই ত সেই আঠার। অনেক জায়গায় আবার মিটিং করিয়া হাঁকাহাঁকি করিতেছে—ছেলেদের বয়স করা হোক বাইশ চব্বিশ···এক মিস্‌ মেয়ো আসিয়াই এই ব্যাপার;···ইতিমধ্যে যদি আর একটি আসিয়া পড়ে ত চক্ষুস্থির! ছেলেদের বয়স যে কোথায় গিয়া ঠেকিবে কে জানে? বিবাহ জিনিষটাই থাকিলে হয়; বোধ হয় বৈদিক বিবাহপদ্ধতি উঠিয়া গিয়া সিভিল ম্যারেজের ধুম পড়িয়া যাইবে। শেষকালে চল্লিশ বছরের বুড়ো ছেলে লাভ্‌ করিয়া কোর্টে বিবাহ-রেজেষ্টারীক রিয়া কাহাকে ঘরে তুলিবে কে বলিতে পারে? এখন একটু ভুলের জন্য শেষকালে জাতকুল সব যাক্‌, আর কি···

মেয়ে খুব পছন্দ। আশীর্ব্বাদও হইয়া গেল এবং খুব কাছাকাছি একটা দিন স্থির করিয়া জোগাড়-যন্ত্র আরম্ভ হইয়া গেল।

সুধার মনটা ভাল নাই। যতদূর জানা আছে বিবাহ জিনিষটা মন্দ নয়, কিন্তু ভাবনার কথা এই যে, শ্যামলীকে ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। আশীর্ব্বাদের পরদিন সকালবেলা সই আসিয়াছিল; সুধার মেজাজের জন্য খেলা জমে নাই। যাওয়ার সময় মুখ ভার করিয়া বলিয়া গেছে—"আচ্ছা লো, আমারও একদিন বিয়ে হবে, তখন দেখে নেব।"

সুধা শ্যামলীর জন্য মনমরা হইয়া ঘাস হিঁড়িতেছিল, নিমাই আসিয়া বলিল—"ওগো শুনচ?"

ঘাড় বাঁকাইয়া শাসনের ভঙ্গীতে সুধা বলিল—"তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি ক'বে হবে নিমুদা!"

নিমাই ভড়কাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—"কেন র‍্যা!··· আমায় আর ওরকম করে ডাকা চলে তোমার?"

নিমাই সব কথা শুনিল; শেষের দিকে পাত্রের পরিচয় পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—"চমৎকার হবে··· সে ত হরিহর, আমাদের স্কুলে থার্ড ক্লাসে পড়ে, আমি খুব জানি তাকে। মাইরি বলচি বেশ হবে ভাই।"

সুধা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—"তোমাদের ত খুব ফুর্ত্তি; আমার মনে যে কি হচ্চে·····"

নিমাই কোন রোমান্সের গন্ধ পাইস কি-না সে-ই জানে, মাঝখানেই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন র‍্যা, সুধী?"

"বাছুরটার কথা ভাবছ? আমি শামলীকে ছেড়ে থাকতে পারব? আর আমায় ছেড়ে শামলীই বাঁচবে?"—কথাটা বলিয়া দুলালের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতেই ঠোঁট দুটি কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষুর কূল ছাপিয়া দু-ফোঁটা জল জমিয়া উঠিল। নিমাই হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল—"কঁদিস্‌ নি সুধী; খুড়ীমাকে ব'লব আমি।"

এর পর শান্তভাবে চিন্তা করিয়া দেখা গেল—খুড়ীমাকে বলাও চলে না, আর ওসব উপায়ে কাজও হইবে না। ক্রমাগতই দু-জনে পরামর্শ হইতে লাগিল।—বাগানের ঝোপঝাড়ের মধ্যে বসিয়া, গোয়াল ঘরের কোণে, সন্ধ্যার সময় পুকুরঘাটের ভাঙা রাণার নীচে।······ খেলা হয় না; ননী, সই আমল পায় না; সই যাইবার সময় নাক কুঁচকাইয়া বলে—"বিয়ের ক'নের অত বেটা-ছেলে-ঘেঁসা হওয়া ভাল নয় লো,—এই শাস্ত্রবাক্য ব'লে দিলাম······"

বিয়ের রাত। পাশাপাশি দুই গ্রামের বরক'নে, বরপক্ষ কন্যাপক্ষের লোকজনে বাড়িটা গমগম করিতেছে। উঠানে বিবাহের সরঞ্জাম, চারিদিকে গোল করিয়া বিবাহ-সভা রচনা করা হইয়াছে, ছেলেবুড়ো ঠাসাঠাসি হইয়া বিবাহ দেখিতেছে।

অনুষ্ঠানের মধ্যে পুরোহিত সুধার বাপকে বলিলেন—"এইবার তুমি মেয়ের ডান হাতটি তুলে ধর, সম্প্রদান ক'রতে হবে···তুমি হাত পাত ত বাবা, শ্বশুরের দান নেবে···কই গো, হাতে জড়াবার মালাগাছটা ?···"

সুধার বাপ সুধার হাতটা একটু তুলিয়া বাড়াইয়া ধরিলেন।

বর কিন্তু একটা কাণ্ড করিয়া বসিল।—তাহার হাতটা এতক্ষণ বাহিরেই ছিল, হঠাৎ কাপড়ের মধ্যে টানিয়া লইয়া গোঁজ হইয়া বসিল! সকলে যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। পুরোহিত পাকা লোক, হাসিয়া বলিলেন—"হাত বের করো বাবা, লজ্জা কি?—বড্ড ছেলেমানুষ কি না।···"

সভার মধ্যে থেকেও অনুরোধ, উপরোধ, হুকুম, ধমক কিছুই বাকী রহিল না। বর কিন্তু ক্রমাগতই হাতটা কড়া করিয়া নিজের কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। মুখটা রাঙা হইয়া গিয়াছে, ঘাড়টা গুঁজ্‌ড়াইয়া বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

"বর বেঁকে ব'সেচে, বর বেঁকে ব'সেচে"—বলিয়া একটা রব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বাড়ির ভীড় চাপ বাঁধিয়া উঠিল। জগবন্ধু আগন্তুকদের দেখাশুনায় বাহিরে ব্যস্ত ছিলেন। ভীড় ঠেলিয়া আসিয়া হাজির হইলেন, কড়া গলায় বলিলেন—"ব্যাপার কি রে হ'রে? হাত বের কর্‌। থার্ড ক্লাসে প'ড়ে স্বাধীনচেতা তরুণ হয়েচ?—বটে!···"

পুরোহিত উঠিয়া তাঁহার পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় দিয়া বলিলেন—"আপনি একটু ঠাণ্ডা হন—রাগবার সময় নয়। ব্যাপার আমি বুঝেচি, সব ঠিক ক'রে দিচ্চি।"

বরের নিকট আসিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি চাই তোমার বাবা, বল দিকিন আমায়?"

কোন উত্তর হইল না। আর একটু অপেক্ষা করিয়া বলিলেন—"বল, শ্বশুরের কাছে ত চাইবেই। আমরাও এই রকম পণ ক'রে বসেছিলাম, এতে লজ্জা কি?··· সাইকেল চাই?—নগদ টাকা?—হাওয়াই বন্দুক?···"

বর জড়িত কণ্ঠে কি একটা বলিল।—বেশ ভালরকম বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত ভাবে বলিলেন—"স্পষ্ট ক'রে বল, কিচ্ছু লজ্জা নেই।"

বাড়ির মধ্যে একটা খড়্‌কে পড়লে আওয়াজটা শোনা যায়। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে পুরোহিত-ঠাকুর এক রকম চীৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"আঁ, কি ব'ললে—শামলী বাছুর!!"

নিস্তব্ধতা সেই রকমই রহিল, কেহ যেন কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। একটা মুহূর্ত,—তাহার পর জগবন্ধু অগ্রসর হইয়া নাকমুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"হারামজাদা! মানুষের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দোব ব'লে নিয়ে এলাম, আর ভদ্দরলোক তোকে এখন নই-বাছুর সম্প্রদান করবেন?···বের কর্‌ হাত, নয়ত তুই আছিস কি আমি আছি—করলি বের্‌?"

হরিহর আস্তে আস্তে হাতটা বাহির করিল, মুষ্টিবদ্ধ অবস্থাতেই রহিয়াছে, একটু একটু কাঁপিতেছে। সুধার বাপ ব্যাপারটার আকস্মিকতায় এতক্ষণ বিমূঢ়ভাবে বসিয়াছিলেন, এইবার একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া, বাম হাতটা হরিহরের পিঠে রাখিয়া সস্নেহে কহিলেন—"ওতো ছোট্ট বাছুর বাবা, তোমায় আমি ভাল একজোড়া বিলিতী গাই-বাছুর কিনে দোব এই হাটেই। নাও হাত খোল, লক্ষ্মী আমার।···"

জগবন্ধু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "না, না, ওরকম আস্কারা দেবেন না বেইমশাই, ওতে আমার বদনাম, ছেলে পণ ক'রে দুধ খাবার জন্যে গাইবাছুর নিয়ে যাবে, লোকে ব'লবে···"

বরপক্ষের একজন রসিক বৃদ্ধ কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—"লোকে বলবে বাপ-বেটায় মিলে শ্বশুরকে দুইচে।"

যাহারা বুঝিল তাহাদের মধ্যে হাসি পড়িয়া গেল। সুধার বাপ একটু লজ্জিত হইলেন। জগবন্ধুর মাথায় তাঁহার নিজস্ব পদ্ধতিতে তর্ক জাগিয়া উঠিতেছিল; বলিলেন—

"একটু থামুন পুরুতমশাই, এর গোড়া এইখানেই মেরে দিতে হবে। দিব্যি এক মতলব বের ক'রেচে ত!—আজ বিয়ে করতে ব'সে পণ, এর পর শ্বশুরবাড়ি আহারে ব'সে পণ, তারপর বৌমাকে বাড়ি নিয়ে আসবার সময় পণ, প্রত্যেক বারেই শ্বশুর-শাশুড়ীর মাথায় হাত বুলিয়ে এটা-ওটা-সেটা হাতান! আমি কোথায় শর্দা-আইন বাঁচাতে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে গেলাম, ছেলে আমার ভাবছেন—বাঃ, এ ত খাসা এক রোজগারের পথ বের হ'ল!—কোন্ মুখ্যু আর লেখাপড়া করে, এই ব্যবসাই চালান যাক্।···বলি, তোকে কে এ হদিস বাৎলে দিলে র্যা? তুই শামলী বাছুরের নামই বা জানলি কেমন ক'রে? বল্, তোর ব্যবসার গোড়াপত্তনেই আমি গণেশ ওল্টাব···"

বাপের মুঠার মধ্যে সুধার হাতখানিও কাঁপিয়া উঠিল। এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কচি বরবধূর প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া সুধার বাপ বলিলেন,—থাক বেইমশাই; ছেলেমানুষ একটা কথা ব'লে ফেলেচে···"

জগবন্ধু কড়া-ধাতের লোক, নিরস্ত করা গেল না। অনেক বকাবকি জেদাজেদির পর হরিহর মাথা তুলিয়া একবার পুরোহিতের পানে আড়ে চাহিল। তিনি উদ্দেশ্যটা বুঝিতে পারিয়া তাহার মুখের কাছে কান লইয়া গেলেন, তাহার পর বিস্ময়ের ঝোঁকে প্রায় হাতখানেক সরিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিলেন—"সে কি!—ক'নে ব'লেচে!!···নিমাই কি করেছিল?—চিঠি দিয়ে এসেছিল?"

আরও ধমক-ধামক করার পর চিঠিটার সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি যে ছেলেকে টিপিয়া এই পণ করান নাই সর্ব্বসমক্ষে এটা নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ করাইবার জন্য জগবন্ধু তখনই বাড়িতে লোক ছুটাইলেন। হরিহরের নির্দ্দেশ-মত সে তাহার ভূগোলের পাতার মধ্য হইতে দলিলখানি সংগ্রহ করিয়া আনিল। লেখা আছে—

প্রণামা বহব নিবেদন মিদং কার্য্যঞ্চাগে। তোমার সহিত আমার বিয়ে ঠিক হইয়াছে। আমি খুব ভাগ্যবান, কিন্তু শামল রাণীকে ছাড়িয়া থাকতে পারব না। অতএব মহাশয় বিয়ের সময় শামলী চাই বলিয়া বেকে বস্‌বেন। না হইলে আমি আপিম খাইয়া মরিব। আপিম আমার সারির আঁচলেই বন্ধিত থাকিবে মোটা গেরো তুমি দেখিতে পাইবে। এতে দোস হয় না। নেত্যপিসিদের বরও সেদিন একটা ঝার লালঠেম চাই ব'লে বেকে বসেছিল। নিয়ে ছাড়িল। মা বলেন জিদই পুরুষের লক্ষন। এ নিমাই। নিমাই আমায় প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। এ চিঠি লিখে দিয়েচে। আমি অবলা নারি লেখাপড়া জানি না শামলী ছাড়া হইয়া থাকিতে হইত। নিমাই ভয়ঙ্কর বিদ্যান আর খুব ভাল ছেলে তোমাদের ইস্কুলে 6th Class পড়ে। প্রণাম জানিহ।

ইতি

অভাগিনি

Sudha

সুধাময়ি দাসী

'ভয়ঙ্কর বিদ্যান'টির, হাজার খোঁজাখুঁজি করিয়াও সে-রাত্রে বিয়ে-বাড়িতে কোন সন্ধানই মিলিল না। শাড়ীতে একটি বড়গোছের গেরো পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সুখের বিষয় তাহাতে একটি বড় মার্ব্বেল ভিন্ন অন্য কিছু 'বন্ধিত' ছিল না।

ভারি জল

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

শতবর্ষেরও কিছু আগেকার কথা।

রাসায়নিক পঞ্চাশ-ষাটটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, তামা, সোনা, সীসা পারদ প্রভৃতি। তিনি দেখিলেন বস্তুমাত্রই হয় এই মৌলিক পদার্থ—না-হয় দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের মিলনে উদ্ভূত; একটি মৌলিক পদার্থকে যদি ক্রমাগত ভাঙিতে থাকা যায় ত শেষ অবধি উহা এমন অবস্থায় পৌছায় যখন আর উহাকে ভাঙা চলে না; দৃষ্টির অগোচর অবিভাজ্য এই পদার্থ-কণিকার নাম দিলেন 'এটম'; মৌলিক পদার্থের এটম-রা প্রায়ই দুইটা করিয়া জোট বাঁধিয়া থাকে, তাহাদের নাম দওয়া হইল 'মলিকিউল'; একটি হাইড্রোজেন এটম সর্ব্বাপেক্ষা হাল্কা, তাহার তুলনায় অন্যান্য এটমের ওজন নিরূপিত হইতে লাগিল; হাইড্রোজেনকে এক ধরিলে একটি কার্ব্বন এটমের ওজন দাঁড়াইল ১২, অক্সিজেনের ১৬, এই রকম সব।

চিরদিনই মানবের মন বহুর মধ্যে একের সন্ধানে ছুটিয়াছে। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রাউট এই সময় বলিলেন যে পৃথিবীর মূলে আছে একটি এবং কেবল মাত্র একটি মৌলিক পদার্থ, সে হইল এই হাইড্রোজেন; ঐ যে কার্ব্বন এটম, হাইড্রোজেন এটমের তুলনায় যাহা ১২ গুণ ভারি, তাহা আর কিছু নয় ১২টি হাইড্রোজেন এটম জোট পাকিয়া ঐ একটি কার্ব্বন এটমে দাঁড়াইয়াছে; সেই রূপ অক্সিজেন এটম প্রভৃতি। কিন্তু গোল বাধিল ঐ প্রভৃতিদের লইয়া; কার্ব্বন, অক্সিজেন সম্বন্ধে এ-কথা না-হয় মানিয়া লওয়া গেল, কিন্তু দেখা গেল একটি ক্লোরিণ এটমের ওজন হাইড্রোজেন এটমের ঠিক পঁয়ত্রিশ গুণও নয়, ছত্রিশ গুণও নয়, তাহাদের মাঝামাঝি। প্রাউট তখন একটু ঢোক গিলিয়া বলিলেন যে এই ব্রহ্মাণ্ডের মূল হইল একটি পূরা নয়, আধখানা হাইড্রোজেন এটম। কিন্তু সমস্যার সমাধান হইল না। রাসায়নিকের পরীক্ষা সুক্ষতর হইতে লাগিল; দেখা গেল একটি ক্লোরিণ এটমের ওজন ঠিক সাড়ে পঁয়ত্রিশ নয়, পঁয়ত্রিশ আর একটি জটিল ভগ্নাংশ। আরও অনেক মৌলিক পদার্থের আণবিক ওজনে বড় বড় ভগ্নাংশ দেখা দিল; প্রাউট থামিয়া গেলেন।

এই সময়ই সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাল্টন এটম সম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করিলেন। একটি মৌলিক পদার্থ ভাঙিয়া যে কোটি কোটি এটম পাওয়া যায় তাহারা হুবহু এক—আকারে, ওজনে, গুণাবলীতে; কিন্তু এক মৌলিক পদার্থের এটম আর এক মৌলিক পদার্থের এটম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; রাসায়নিক সংযোগ যখন ঘটে তখন এই এটমদের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। প্রাউটের মত পরিত্যক্ত হইল, কিন্তু শতবর্ষ চলিয়া গেল, ডাল্টনের এই সিদ্ধান্ত অটল ও অটুট রহিল; দেখা গেল, এমন কোন রাসায়নিক মিলন ঘটে না যাহাতে ডালটনের এই সব সিদ্ধান্ত ভাঙিয়া পড়ে। ইতিমধ্যে এই এটম সম্বন্ধে আরও অনেক খবর জানা গেল; খানিকটা মৌলিক পদার্থে কতগুলি এটম আছে, উহাদের প্রত্যেকের ওজন কত এ-সব নির্ণীত হইল।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্ব অবধি এটম সম্বন্ধে এই ছিল শেষ কথা। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষের দিকে পদার্থের গঠন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের পূর্ব্ব ধারণা যে ভীষণ ধাকা খাইল তাহা এক ফরাসী বৈজ্ঞানিকের কথায় বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। অধ্যাপক জে, জে, টমসন রয়াল সোসাইটীর বক্তৃতাগৃহে পদার্থের গঠন সম্বন্ধে নূতন তথ্যের কথা বলিতেছিলেন। বক্তৃতাশেষে সভায় উপস্থিত ঐ ফরাসী বৈজ্ঞানিক তাঁহার কোন বন্ধুকে বলেন—ভায়া হে, বিজ্ঞান জান না ব'লে তোমার অবস্থা আমার চেয়ে ঢের ভাল, কারণ তুমি যদি বিজ্ঞান শিখতে চাও ত-গোড়া থেকে আরম্ভ করলেই চলবে; কিন্তু আমাকে একেবারে ঢেলে সাজতে হবে; এক দফায় যা জানি তা ভুলতে হবে, তার পর নতুন ক'রে আরম্ভ।

যে ঘটনাবলী দ্বারা বৈজ্ঞানিকের পূর্ব্ব ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন হইল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

একটি কাঁচের গোলক প্রায় বায়ুশূন্য করিয়া তাহার মধ্যে তড়িৎ চালাইয়া জে, জে, টমসন ঐ গোলকমধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র কণিকার সন্ধান পাইলেন যাহারা এটম অপেক্ষাও ছোট; এই ক্ষুদ্র কণিকার নাম দেওয়া হইল 'ইলেক্ট্রন'। বিভিন্ন পরীক্ষা হইতে এই ইলেক্ট্রনের ওজন মাপা হইল; দেখা গেল এই ইলেক্‌ট্রনের ওজন, সব-চেয়ে হাল্কা যে হাইড্রোজেন এটম, সেই হাইড্রোজেন এটমের ১৮৪০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। একটি সোনার এটম একটি সীসার এটম হইতে পৃথক, কিন্তু দেখা গেল যে এই ইলেক্ট্রন—তা সে সোনা, সীসা বা যে-কোন পদার্থ হইতে আসুক না কেন—ইহারা হুবহু এক। এই ইলেক্ট্রন সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা চলিতে লাগিল, জানা গেল যে প্রতি ইলেক্ট্রন তড়িৎযুক্ত এবং সেই তড়িৎ বিয়োগ-তড়িৎ। আরও দেখা গেল যে নানান্ প্রক্রিয়ায় পদার্থ হইতে ইলেক্ট্রন বাহির করা যায়; খুব বেশী কিছু নয়, খানিকটা গরম করিলেই পদার্থ হইতে ইলেক্ট্রন বাহির হইতে থাকে।

সুতরাং দাঁড়াইল এই, পদার্থকে ভাঙিতে ভাঙিতে এটমে পৌঁছান যায়, কিন্তু এটমকে ভাঙা যায় না—ডালটনের এ মত আর টিকিল না; এটম হইতে পাওয়া গেল ইলেক্ট্রন, এটমের তুলনায় খুব ছোট ও হাল্কা; তাহার পর যে-রকমের বাড়ি হউক না কেন ভাঙিলে যেমন পাওয়া যায় একই রকমের কতকগুলি ইট, তেমনি যে-এটমই হউক না কেন, তাকে ভাঙিলে পাওয়া যাইবে একই রকমের ইলেক্ট্রন। একটা বাড়ি আর একটা বাড়ি হইতে অবশ্য তফাৎ, কারণ ইটের সংখ্যা সমান নয় আর সাজানোর ধারাও পৃথক; সেই রকম একটা এটম আর একটা এটম হইতে পৃথক, কারণ উভয়ের ইলেক্ট্রনগুলির সংখ্যা ও সাজান সমান নয়। কিন্তু একটা গোলের কথা দাঁড়াইল। এটম-রা তড়িৎশূন্য অথচ এটমের উপাদান ইলেক্ট্রন হইল বিয়োগ-তড়িৎযুক্ত। অতএব এটমের মধ্যে আছে আরও কিছু যাহাতে আছে সমপরিমাণ সংযোগ-তড়িৎ। কোথায় কি ভাবে আছে এই সংযোগ-তড়িৎ? জে, জে, টমসন বলিলেন, একখানা কেকের মধ্যে যেমন কিসমিস্ ছড়াইয়া থাকে সেই রকম খানিকটা সংযোগ-তড়িতের মধ্যে বিয়োগ-তড়িৎযুক্ত ইলেক্ট্রনরা ছড়াইয়া আছে। জে, জে, টমসনের এ-মত কিন্তু টিকিল না; শেষ অবধি জয়যুক্ত হইল রদারফোর্ডের সিদ্ধান্ত। রদারফোর্ড বলিলেন যে এই এটম একটি ক্ষুদ্র সৌরজগৎসদৃশ; সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া যেমন পৃথিবী আদি গ্রহগণ ঘুরিতেছে, তেমনি কেন্দ্রস্থিত সংযোগ-তড়িৎকে বেষ্টন করিয়া ইলেক্ট্রনরা ঘুরিতেছে। সংযোগ-তড়িৎযুক্ত এই কেন্দ্রীয় অংশের নাম দেওয়া হইল প্রোটন। রদারফোর্ডের এই তথ্য নানান্ দিক দিয়া নানান্ রকমে যাচাই হইতে লাগিল এবং সব পরীক্ষা হইতে রদারফোর্ডের মতই প্রতিষ্ঠিত হইল। চোখে দেখা যায় না যে ক্ষুদ্র একটি এটম সেই এটমের ভিতরের অনেক খবর বিজ্ঞান টানিয়া বাহির করিতে লাগিল। সে-সব কথা যাক; এখন বিভিন্ন এটমের গঠন এইরূপ দাঁড়াইল। প্রত্যেক এটমে যতগুলি ইলেক্ট্রন আছে—নিশ্চয় ততগুলিই প্রোটন আছে, যেহেতু এটম-রা তড়িৎশূন্য। হাইড্রোজেনে আছে এক জোড় ইলেক্ট্রন-প্রোটন, হিলিয়মে চারি জোড়, অক্সিজেনে ষোল জোড়, এবং সব চেয়ে ভারি যে ইউরেনিয়ম এটম তাহাতে ২৩৮ জোড়। এইরূপ হিসাব যদি হয় ত ঘুরিয়া ফিরিয়া শতাধিক বর্ষের পূর্ব্বের প্রাউটের কথাই ত আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে হাইড্রোজেন এটমের ওজন এক ধরিলে অন্য কোন এটমের আণবিক ওজনে কোন ভগ্নাংশ থাকিতে পারে না। থাকিতে পারে না, কিন্তু আছে যে! আগেকার ক্লোরিণের কথাই ধরা যাউক। ক্লোরিণে আছে হয় ৩৫ জোড় ইলেক্ট্রন-প্রোটন, না-হয় ৩৬ জোড়, সাড়ে ৩৫ বা পৌনে ৩৬ বা কোন ভাঙাচোরা জোড় ত হইতে পারে না; এখন ৩৫ জোড় যদি থাকে ত উহার আণবিক ওজন হইবে ৩৫, আর ৩৬ জোড় থাকিলে ওজন হইবে ৩৬; কিন্তু রাসায়নিক দেখিয়াছেন উহা ৩৫ও নয়, ৩৬ও নয়, ৩৫ আর একটি জটিল ভগ্নাংশ। প্রাউট যাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই এখন সেই সমস্যাই ত অমীমাংসিত ভাবে উপস্থিত। কিন্তু এবার একটা মীমাংসা হইল, সুনিশ্চিত ভাবেই হইল। ব্যাপারটা দাঁড়াল এইরূপ।

মনে করা যাউক একটি কাঁচের গোলকে খুব অল্প পরিমাণ একটু গ্যাস আছে; সে গ্যাসটার নাম আমরা জানি না.

তবে তাহার প্রতি এটম ৩৫ জোড় ইলেকট্রন-প্রোটন লইয়া গঠিত ; এই গোলকের মাঝখান হইতে একদিকে খুব বেশী ভোল্টের তড়িৎ পাঠান হইতে লাগিল ; গোলকস্থিত ঐ গ্যাসের একটি এটমের কথা ভাবা যাউক ; উহা হইতে একটি ইলেকট্রন খসিল এবং খসিয়া গোলকের একদিকে ছুটিতে লাগিল। বিয়োগ-তড়িৎযুক্ত একটি ইলেকট্রন খসিয়া যাওয়ায় ঐ ভাঙা এটম এখন সংযোগ-তড়িৎযুক্ত হইল এবং ইহাও ছুটিতে লাগিল, বিয়োগ-তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রন যে-পথে যাইতেছিল তাহার ঠিক উল্টা পথে ; এই পথের ধারে রাখা হইল প্রভূত শক্তি-সম্পন্ন একটি চুম্বক এবং তড়িৎমণ্ডিত একটি শলাকা। সংযোগ-তড়িৎযুক্ত এটমটি বাঁকিয়া গিয়া একখানা আলোকচিত্র কাঁচের উপর পড়িয়া একটি রেখা অঙ্কিত করিল। এই এটমটি যাইতে যাইতে যে বাঁকিল সেই বাঁকার পরিমাণ নির্ভর করে ঐ চুম্বক এবং তড়িতের শক্তির উপর—তা ছাড়া ঐ এটমটির গুরুত্বের উপরও ; স্মরণ করিয়া রাখা যাউক এই এটমটি একটি ইলেকট্রনবিহীন ৩৫ জোড় ইলেকট্রন-প্রোটনের সমষ্টি। এইবার ঐ গোলকমধ্যে দেওয়া হইল আর একটি গ্যাস যাহার প্রতি এটমে আছে ৩৬ জোড় ইলেকট্রন-প্রোটন। এর প্রতি এটমও এক-একটি ইলেকট্রন হারাইয়া ইলেকট্রনের বিপরীত পথে ছুটিতে লাগিল, ছুটিয়া পূর্ব্বকার ঐ চুম্বক ও তড়িতের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে বাঁকিল এবং আলোকচিত্র কাঁচের উপর রেখা আঁকিল—কিন্তু ঠিক আগেকার জায়গায় নয়, একটু তফাতে ; কারণ আমাদের মনে রাখিতে হইবে এই বাঁকা নির্ভর করে গুরুত্বের উপরে, আর এই এটম গুরুত্বে আগেকার এটম অপেক্ষা ভারি এক জোড়ে। এইবার যদি ঐ গোলকের মধ্যে ৩৫ জোড়ওয়ালা ও ৩৬ জোড়ওয়ালা এই দুই রকমের এটম মিশাইয়া দিয়া পরীক্ষাটা করা যায় তাহা হইলে ঐ আলোকচিত্রে আমরা পাইব দুইটি রেখা, একটি ঐ ৩৫এর জন্য অপরটি ৩৬এর জন্য। রেখা দুইটির কালিমা যদি সমান হয় ত বুঝিতে হইবে ঐ দুই রকমের এটম গোলক-মধ্যে সমপরিমাণে ছিল। কালিমা যদি সমান না হয় ত উহার বিভিন্নতা হইতে উহাদের আপেক্ষিক পরিমাণ ঠিক করা যাইতে পারে।

এখন ঐ গোলকমধ্যে বিশুদ্ধ ক্লোরিণ গ্যাস দিয়া দেখা গেল আলোকচিত্রে দাগ পড়িয়াছে একটি নয়, দুইটি—একটি ৩৫এর জায়গায় এবং অপরটি ৩৬এর জায়গায়। তাহা হইলে ত বলিতে হইবে ঐ বিশুদ্ধ ক্লোরিণ গ্যাস, ডাল্টনের সময় হইতে যাহার এটমগুলিকে হুবহু এক বলিয়া আসিতে-ছিলাম, বাস্তবিক তাহারা ত হুবহু এক নয় ; রাসায়নিক গুণাবলী তাহাদের সমান হইতে পারে, কিন্তু আপেক্ষিক গুরুত্বে, গঠনে তাহারা ত একেবারে সমান নয়। একদল আছে তাহারা ৩৫ জোড় ইলেকট্রন-প্রোটনের সমষ্টি আর একদল ৩৬ জোড়ের। ক্লোরিণ একটি মৌলিক পদার্থ, কিন্তু দেখিতেছি মৌলিক পদার্থ হইলেই ত তাহার সব এটম সর্ব্ববিষয়ে সমান নয়। আলোকচিত্রে রেখাদ্বয়ের কালিমার তারতম্য অনুসারে কি অনুপাতে এই দুই জাতীয় এটম আছে তাহার হিসাব করা হইল এবং এই হিসাব হইতে সমস্ত গ্যাসটার যে গড় আণবিক ওজন নিরূপিত হইল, তাহা রাসায়নিকের সূক্ষ্ম নিরূপণের সহিত একেবারে মিলিয়া গেল। বহুকালের একটি সমস্যার সমাধান হইল। যে বিভিন্ন দলের এটমকে রাসায়নিক তাহার গুণাবলী দেখিয়া হুবহু এক বলিতেছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া ফেলা হইল এবং দেখা গেল রাসায়নিক ধর্ম্ম তাহাদের সমান হইলেও গুরুত্বে তাহারা এক নয়। অন্যান্য মৌলিক পদার্থের উপরও এই পরীক্ষা চলিতে লাগিল, জানা গেল বহু মৌলিক পদার্থ আছে যাহারা দুই বা ততোধিক বিভিন্ন প্রকারের এটম লইয়া গঠিত। পারদের আণবিক ওজন হইল ২০০.৬ ; দেখা গেল পারদে আছে ৬ রকমের বিভিন্ন এটম, তাহাদের ওজন যথাক্রমে ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০২ এবং ২০৪, যদিও রাসায়নিক গুণাবলীতে তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

বিভিন্ন ওজনের এটম বাছাই করা এই যে যন্ত্র, বৈজ্ঞানিক এস্টনের হাতে দিন-দিন এই যন্ত্রের উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল ; এখন উহা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে ১০০০০ হাজারের এক রকম ও আর এক রকমের এক—এই অনুপাতেও যদি দুই রকমের এটম থাকে ত তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব এই যন্ত্রে ধরা পড়ে। এই সূক্ষ্ম যন্ত্রে পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা গেল যে অক্সিজেনেরও দুই জুড়িদার আছে ; ১৬

অক্সিজেনের সঙ্গে আছে ১৭ ও ১৮ওয়ালা অক্সিজেন, ৮০০০ হাজারটি ১৬ অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া আছে ২টি ১৭ ও ১৮ অক্সিজেন এই অনুপাতে।

অক্সিজেনের আণবিক ওজন ১৬ ধরিলে হাইড্রোজেনের দাঁড়ায় ১.০০৭৭। অক্সিজেন ঠিক ১৬ গুণ না হইয়া এই যে সামান্য একটু তফাৎ হয় তাহার যথাযথ কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সে কথা যাক, এখন অক্সিজেনের ১৭, ১৮ জুড়িদার বাহির হওয়ায় হাইড্রোজেনের কোন সঙ্গী আছে কিনা খোঁজ পড়িল। খোঁজ মিলিল। দেখা গেল সাধারণ হাইড্রোজেনের সঙ্গে আছে আর এক রকমের হাইড্রোজেন যাহার আণবিক ওজন হইল ২.০১৩৬ এবং ইহারা আছে সাড়ে ছয় হাজারে এক, এই অনুপাতে। একটি হাইড্রোজেন মলিকিউল অপেক্ষা এই নূতন হাইড্রোজেন ওজনে অল্প কিছু কম। ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকেরা বলিলেন যে নবজাত শিশুর নামকরণ তাহার জনকই করিয়া থাকেন, সুতরাং ইহার আবিষ্কারক, আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরাই ইহার নাম দিন। তাঁহারা বলিলেন ইহা এখন সমস্ত বৈজ্ঞানিকের সম্পত্তি – তাঁহারা সকলে মিলিয়া ইহার নাম ঠিক করুন। বিভিন্ন নাম আসিতে লাগিল, দেখা যাইতেছে 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।' যত দিন চূড়ান্ত ভাবে কিছু নিষ্পত্তি না হয় তত দিন ইহা 'ভারি হাইড্রোজেন' নামে আখ্যাত হইতেছে।

সমস্ত জিনিষটার অন্য দিক দিয়া যাচাই হইল। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের বর্ণচ্ছত্র বিভিন্ন; এই বর্ণচ্ছত্র দিয়া অনেক সময় অনেক অজ্ঞাত পদার্থকে চেনা গিয়াছে। আচ্ছা, ৩৫ ক্লোরিণ আর ৩৬ ক্লোরিণ ইহারা ত সত্য সত্যই বিভিন্ন পদার্থ, সুতরাং ইহাদের বর্ণচ্ছত্র ত বিভিন্ন হওয়া উচিত; উচিত ত বটে, কিন্তু এই বিভিন্নতা এত অল্প যে বর্ণচ্ছত্র মাপিবার যন্ত্রে ধরা পড়িবার কথা নয়। কিন্তু এই কয়েক বৎসরে এই যন্ত্র এত উন্নতি লাভ করিয়াছে যে ইহাতে অতি অল্প তফাৎও ধরা পড়িতেছে। এই যন্ত্রসাহায্যে ঐ হাইড্রোজেনের জুড়িদারেরও সন্ধান হইল; সাক্ষাৎ মিলিল এবং এই উপায়ে তাহার যে আণবিক ওজন নিরূপিত হইল তাহা পূর্ব্বফলের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া গেল।

দেখা যখন মিলিল তখন বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ ভারি হাইড্রোজেনকে তফাৎ করিয়া ফেলিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল; তরল হাইড্রোজেন লইয়া পরীক্ষা হইতে লাগিল এবং শেষ অবধি সফলতা আসিল। এই ভারি হাইড্রোজেনকে অক্সিজেনের সহিত মিশাইয়া পাওয়া গেল যে জল, সাধারণ জলের সঙ্গে তাহা মিলিল না, আর মিলিবার কথাও নয়। দেখা গেল এই ভারি জল জমে সেন্টিগ্রেডের ০°তে নয় — ৩.৮এ, বাষ্পে পরিণত হয় ১০১.৪২এ এবং ইহার গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয় ৪এ নয় ১১.৬এ। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদিগের চেষ্টায় এই 'ভারি জল' এখন এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে যে ইহা লইয়া এখন সহজেই বিভিন্ন রাসায়নিক ও অন্যবিধ পরীক্ষা করিবার উপায় হইয়াছে; প্রচুর মানে অবশ্য ঘড়া ঘড়া নয়, একসঙ্গে ২০।২৫ সি, সি, সংগৃহীত হইতেছে। উদ্ভিদ্‌দেহে ও প্রাণী-দেহে এই ভারি জলের ক্রিয়া কিরূপ তাহা লইয়া নানাবিধ গবেষণা চলিতেছে এবং সাধারণ হাইড্রোজেনযুক্ত যৌগিক পদার্থে এই ভারি হাইড্রোজেন আসিলে তাহাদের গঠন গুণাবলী কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা লইয়া আলোচনা সুরু হইয়াছে। রসায়নশাস্ত্রে এই ভারি হাইড্রোজেন এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

পদার্থবিজ্ঞানেও ইহা এক অমূল্য সম্পদরূপে দেখা দিয়াছে। কিছু দিন হইতে এটমকে ভাঙিবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে রদারফোর্ড প্রথম নাইট্রোজেন এটমকে ভাঙিলেন; ভাঙিলেন রেডিয়ম হইতে নির্গত আল্‌ফা-রশ্মির সাহায্যে। কিন্তু পৃথিবীতে রেডিয়ম আছেই বা কতটুকু এবং তাহা হইতে আল্‌ফা-রশ্মি বাহির হইতেছেই বা কি পরিমাণে? সুতরাং পদার্থকে ভাঙিতে হইলে যদি শুধু আল্‌ফা রশ্মির উপর নির্ভর করিতে হয় ত এই ভাঙার পরিমাণ কতটুকুই বা হইবে! আল্‌ফা-রশ্মি ব্যতীত অন্য কোন প্রচণ্ড শক্তি দিয়া এই ভাঙনক্রিয়া সম্পাদন করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে ক্যাভেণ্ডিস ল্যাবরেটরিতে কক্‌ক্রফ্‌ট ও ওয়াল্টন প্রোটনকে খুব বেশী ভোল্টের তড়িৎ দ্বারা শক্তিশালী করিয়া লিথিয়মকে ভাঙিলেন। এর পর প্রোটন ছাড়িয়া লাগান হইল নিউট্রন; শেষ অবধি দেখা গেল যে এই ভারি হাইড্রোজেন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কার্য্যকরী, আর এই ভারি হাইড্রোজেন সুপ্রাপ্য না

হইলেও একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। সুতরাং পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারেও এই ভারি হাইড্রোজেনের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

সূর্য্যের অভ্যন্তরে হিলিয়ম নামক একটি নূতন গ্যাসের যখন সন্ধান পাওয়া যায় তখন কি কেহ ভাবিয়াছিল যে এই হিলিয়মই উড়োজাহাজকে নিরাপদ করিবে? পোলাণ্ডবাসী একটি মহিলা যখন রেডিয়মের অন্বেষণে বাহির হন তখন এই রেডিয়ম যে ক্যানসারের চিকিৎসায় লাগিতে পারে এ-কথা কি কাহারও মনে আসিয়াছিল? রয়াল ইন্‌স্টিটিউশনে রাসায়নিক বিশ্লেষণ লইয়া যখন ডেভি পরীক্ষা করিতেছিলেন তখন কেহ কল্পনায়ও আনেন নাই যে এই পরীক্ষাই প্রচুর পরিমাণে সস্তায় বিভিন্ন ধাতু পাইবার সূচনা করিয়া দিতেছে। ব্যাঙ লইয়া গ্যালভানির পরীক্ষা ত জগতে তড়িৎপ্রবাহ আনয়ন করিতেছে। আজ রেডিও যে জগৎ জুড়িয়া নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, ম্যাক্সওয়েলের কতকগুলি 'ইকোয়েশন' ত তাহার মূলে! হয়ত একদিন এই ভারি হাইড্রোজেন, ভারি জল ব্যবহারিক বিজ্ঞানের এক অজ্ঞাত দিকের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিয়া মানবের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবে।

কিন্তু এ-সব কিছুই যদি না-ও করে তাহাতেই বা কি? মিলিক্যান যখন বার-বার আলোকের বেগ মাপিতেছিলেন তখন তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন ইহাতে লাভটা কি? মিলিক্যান বলেন আমি ইহাতে বড়ই আনন্দ পাই। নব আবিষ্কারের এই আনন্দই বৈজ্ঞানিকের পরম ঈপ্সিত—এই তাহার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এই আবিষ্কার যদি জগৎবাসীর কাজে আসে ভালই, না আসিলে বৈজ্ঞানিক মুহ্যমান হইয়া পড়ে না। কিন্তু ইহাতে কি শুধু আবিষ্কারকেরই আনন্দ? এ-আনন্দে জগৎবাসীও যে যোগদান করে! আজ যদি বৈজ্ঞানিক জানিতে পারেন যে চন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে পেট্রোলিয়ম আছে তাহা হইলে পৃথিবীতে নিশ্চয় পেট্রোলিয়মের দাম কমিবে না, কিন্তু জনসাধারণের অবগতির জন্য, তাহার শিক্ষার জন্য, তাহার আনন্দের জন্য, সংবাদপত্র বড় বড় অক্ষরে এ-সংবাদ ছাপিবে। আইনষ্টাইন যখন বলিলেন যে এই আকাশ সমাকার নয়, বক্রাকার তখন পৃথিবীর অল্প লোকই ইহার মানে বুঝিল, ইহাতে বাজারে কোম্পানীর কাগজের দর এবং শেয়ারের ডিভিডেণ্ড যেমন ছিল তেমনি রহিল কিন্তু জগৎবাসীর মন আলোড়িত হইল। আলোকের প্রকৃতি তরঙ্গ না কণিকা এ-কথা অবৈজ্ঞানিকও জানিতে চাহে, অথচ কাহার কি আসিয়া যায় এই তথ্য লাভে?

কোন এক মনীষী শিক্ষা কথাটার এই সংজ্ঞা দিয়াছেন। শৈশবে যে কৌতূহল জাগরূক হয় তাহার ক্রমপরিণতি ও তাহার অনুশীলন হইল শিক্ষা। এই কৌতূহল যত দিন মানবজাতির চিত্তে জাগরূক রহিবে তত দিন বিজ্ঞানের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং সভ্যতার পথে মানব দিন-দিন অগ্রসর হইবে।

দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

জ্যাঠামশায়দের বাড়ি আরও বছর দুই কেটে গেল এই ভাবেই। যত বছর কেটে যায়, এদের এখানে থাকা আমার পক্ষে বেশী কঠিন হয়ে পড়তে লাগল। আমার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জিনিষ আমি বুঝতে পারি আজকাল, আগে আগে অত বুঝতাম না। এ-বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে উঠছিল এই জন্যে যে, আমি চেষ্টা করেও জ্যাঠাইমাদের ধর্ম্ম ও আচারের সঙ্গে নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পেরে উঠলাম না।

এঁরা খুব ঘটা ক'রে যেটা ধর্ম্ম ব'লে আচরণ করেন, আমার মনের সঙ্গে সেটা ত আদৌ মেলে না—আমি মনে যা বলে, বাইরে তাই করি—কিন্তু ওঁরা তাতে চটেন। ওঁদের ধর্ম্মের যেটা আমার ভাল লাগে—সেটাকে ওঁরা ধর্ম্ম বলেন না।

কিন্তু একটা ব্যাপার হয়েচে এই, আগে ভাবতাম শুধু জ্যাঠাইমাদের বাড়িতেই বুঝি এই রকম, এখন বয়স বাড়বার সঙ্গে বুঝতে পেরেচি—এ গ্রামের অধিকাংশই এই রকম—জ্যাঠাইমায়েরা একটু বেশী মাত্র।

এতেই আমার সন্দেহ হ'ল বোধহয় আমার মধ্যেই কোন দোষ আছে, যার ফলে আমি এঁদের শিক্ষা নিতে পারচি নে। ভাবলাম আমার যে ভাল লাগে না, সে বোধ হয় আমি বুঝতে পারিনে বলেই—হয়ত চা-বাগানে থাকার দরুণ ওঁদের ধর্ম্ম আমরা শেখবার সুযোগ পাই নি, যে আবহাওয়ার মধ্যে ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েচি, সেটাই এখন ভাল লাগে।

ম্যাট্রিক পাস ক'রে শ্রীরামপুর কলেজে ভর্ত্তি হলাম। জ্যাঠামশায়দের গ্রাম আটঘরার নবীন চৌধুরী—যার বড় ছেলে ননী ভাল ফুটবল খেলত এবং যে প্রায়শ্চিত্তের বাধাবিঘ্ন না মেনে বাবার সৎকারের সময়ে দলবল জুটিয়ে এনেছিল—তারই ভগ্নীপতির বাড়ি অর্থাৎ নবীন চৌধুরীর বড় মেয়ে শৈলবালার শ্বশুরবাড়ি শ্রীরামপুরে। ননীর জোগাড়যন্ত্রে তাদের শ্বশুরবাড়িতে আমার থাকবার ব্যবস্থা হ'ল।

এসে দেখি এদেরও বেশ বড় সংসার, অনেক লোক। শৈলদিদির স্বামীরা ছ' ভাই, তার মধ্যে চার ভাইয়ের বিয়ে হয়েচে, আর একটি আমার বয়সী, ফার্ষ্ট ইয়ারেই ভর্ত্তি হ'ল আমার সঙ্গে। সকলের ছোট ভাই স্কুলে পড়ে। শৈলদি বাড়ির বড়বৌ, আমি তাঁর দেশের লোক, সবাই আমাকে খুব আদরযত্ন করলে। এখানে কিছুদিন থাকবার পরে বুঝলাম যে, সংসারে সবাই জ্যাঠামশায়দের বাড়ির ছাঁচে গড়া নয়। চা-বাগান থেকে এসে বাংলা দেশ সম্বন্ধে যে একটা হীন ধারণা আমার হয়েছিল, সেটা এখানে দু-চার মাস থাকতে থাকতে চলে গেল। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম যে এ-বাড়ির মেয়েরা কেউ কারও বড় একটা অধীন নয়। কোন এক জনকে সকলের ভয় ক'রে চলতে হয় না বা কোন এক জনের কথায় সকলকে উঠ্‌তে বসতে হয় না।

আমি থাকি বাইরের একটা ঘরে, কিন্তু অল্পদিনেই আমি বাড়ির ছেলে হয়ে পড়লাম। শৈলদিদি খুব ভাল, আমাকে ভাইয়ের মত দেখে। কিন্তু এত বড় সংসারের কাজকর্ম্ম নিয়ে সে বড় ব্যস্ত থাকে—সব সময় দেখাশুনো করতে পারে না। শৈলদিদির বয়েস আমার মেজকাকীমার চেয়ে কিছু ছোট হবে—তিন-চারটি ছেলেমেয়ের মা। আটঘরায় থাকতে খুব বেশী আলাপ ছিল না, দু-একবার জ্যাঠামশায়দের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে আলাপ ক'রে এসেছিল, তারপর ননী কথাটা পাড়তেই তখুনি রাজী হয়ে যায় আমায় এখানে রাখবার সম্বন্ধে। শৈলদিদির স্বামী তার কোন কথা ফেলতে পারে না।

বাড়ির সকলের সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে সর্ব্বত্র যাই—জ্যাঠামশায়দের বাড়ির মত এটা ছুঁয়ো না,

ওটা ছুঁয়ো না কেউ করে না। সব ঘরে যাই, সব বিছানাতেই বসি—সবাই আদরযত্ন করে, পছন্দ করে। এখন বয়েস হয়েচে বুঝতে পেরেচি আটঘরায় যতটা বাঁধাবাঁধি, এসব শহর-বাজারে অত নেই এদের। কষ্ট হয় মার জন্যে, সীতার জন্যে—তারা এখনও জ্যাঠাইমার কঠিন শাসনের বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে ক্রীতদাসীর মত উদয়াস্ত খাটচে। দাদার জন্যেও কষ্ট হয়। সে লেখাপড়া শিখলে না—চাকুরী করবে সংসারের দুঃখ ঘুচোবে বলে—কিন্তু চাকুরী পায় না, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আজ বারো টাকা মাইনের চাকুরী করে, কাল জবাব হয়ে যায়, আবার আর এক জায়গায় ষোল টাকা মাইনের চাকরি জোটায়। এত সামান্য মাইনেতে বিদেশে খেতে পড়ে কোন মাসে পাঁচ টাকা, কোন মাসে তিন টাকার বেশী মাকে পাঠাতে পারে না, তাতে কি দুঃখ ঘুচবে? অথচ না শিখলে লেখাপড়া, না করতে পারলে কিছু।

কলেজের ছুটির পরে গঙ্গার ধারে একখানা বেঞ্চির ওপর বসে এইসব কথাই ভাবছিলাম। মাঝে মাঝে ভয়ানক ইচ্ছে হয় আবার একবার চা-বাগানের দিকে যাই, আর একবার হিমালয় দেখি। কতকাল রডোড্রেণ্ডন্ ফুল দেখি নি, পাইন-বন দেখি নি, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখি নি—সে রকম শীত আর পাইনি কোনদিন,—এদের সবাইকে দেখাতে ইচ্ছে হয় সে দেশ। স্কুলে যখন প্রবন্ধ লিখতে দিত, আমি হিমালয় নিয়ে লিখতাম—আমার লেখা সকলের চেয়ে ভাল হ'ত—কারণ বাল্যের স্বপ্ন-মাখানো সে ওক পাইনের বন, ঝর্ণা, তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা, কুয়াশা, মেঘ আমার কাছে পুরনো হবে না কোন দিন, তাদের কথা লিখতে গেলে নতুনতর ভাব ও ভাষা কোথা থেকে এসে জোটে, মনে হয় আরও লিখি, এখনও সব বলা হয় নি। লেখা অপরে ভাল বললেও আমার মন তৃপ্ত হ'ত না, মনে হ'ত যা দেখেচি তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও আঁকতে পারলাম না—অপরে ভাল বল্‌লে কি হবে, তারা ত আর দেখেনি?

ওপারে বারাকপুরের সাদা বাড়িগুলো যেন সবুজের সমুদ্রে ডুবে আছে। ঠিক যেন চা-ঝোপের আড়ালে ম্যানেজার সাহেবের কুঠী—লাল টালির ছাদ থাকলেই একেবারে চা-বাগান। ওই দিকে চেয়েই ত রোজ বিকেলে আমার মনে হয় বাল্যের চা-বাগানের সেই দিনগুলো।

বাড়ি ফিরে গেলাম সন্ধ্যার পরে। চাকরকে ডেকে বল্‌লাম, "লুলু আলো দিয়ে যা।" আলো দেওয়ার পরে হঠাৎ আমার নজরে পড়ল দেওয়ালের গায়ের আমার দুটো প্রিয় ছবি, পর্ব্বতে উপদেশদানরত খৃষ্ট, আর একটা সাধু জন্,—নোনা ধ'রে নষ্ট হয়ে যাচ্চে। ছবি দুটো সরিয়ে পুঁতচি এমন সময়ে ভবেশ এল। ভবেশ সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে, খুব বুদ্ধিমান ছেলে, স্কলারসিপ নিয়ে পাস করেচে—প্রথম দিনেই কলেজে এর সঙ্গে আলাপ হয়। ভবেশ এসেই বললে—ও কি হচ্ছে? নোনা ধ'রে যাচ্ছিল? ভালই হচ্ছিল—ও-সব ছবি রেখে লাভ ঘরে?

ভবেশের দৈনন্দিন কাজ রোজ এসে আমার কাছে খৃষ্টান ধর্ম্মের নিন্দা করা। আমাকে ও খৃষ্টান ধর্ম্মের কবল থেকে উদ্ধার ক'রে নাকি হিন্দু করবেই। আজও সে আরম্ভ করলে, বাইবেলটা নিতান্ত বাজে, আজগুবি গল্প। খৃষ্টান ইউরোপ এই সেদিনও রক্তে সারা দুনিয়া ভ'সিয়ে দিলে গ্রেট ওয়ারে। কিসে তুমি ভুলেচ? রোজ যাও পিকারিং সাহেবের কাছে ধর্ম্মের উপদেশ নিতে। ওরা ত তোমাকে খৃষ্টান করতে পারলে বাঁচে। তা ছাড়া আজ হিন্দুদের বলবৃদ্ধি করা আমাদের সবারই কর্ত্তব্য—এটা কি তোমার মনে হয় না?

আমি বললাম—তুমি ভুল বুঝেচ ভবেশ, তোমাকে এক দিনও বোঝাতে পারলাম না যে আমি খৃষ্টান নই; খৃষ্টান ধর্ম্ম কি জিনিষ আমি জানি নে—জানবার কৌতূহল হয় তাই পিকারিং সাহেবের কাছে জানতে যাই। আমি যীশুখৃষ্টের ভক্ত, তাঁকে আমি মহাপুরুষ ব'লে মনে করি। তাঁর কথা আমার শুনতে ভাল লাগে। তাঁর জীবন আমাকে মুগ্ধ করে। এতে দোষ কিসের আমি ত বুঝি নে।

—ও বটে! বুদ্ধ, চৈতন্য, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ এরা সব ভেসে গেলেন—যীশুখৃষ্ট হ'ল তোমার দেবতা! এরা কিসে ছোট তোমার যীশুর কাছে জিজ্ঞেস্ করি?

—কে বলেচে তাঁরা ছোট? ছোট কি বড় সে কথা উঠচে ত না এখানে? আমি তাঁদের কথা বেশী জানি নে। যতটুকু জানি তাতে তাঁদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এও ত হয় কেউ এক জনকে বেশী ভালবাসে, আর এক জনকে কম ভালবাসে?

—তুমি যতই বোঝাও জিতেন, আমার ও ভাল লাগে না।

দেশের মাটির সঙ্গে যোগ নেই ওর। তোমার মত চমৎকার ছেলে যে কেন বিপথে পা দিলে, ভেবে ঠিক করতে পারি নে। তোমার লজ্জা করে না একথা বলতে যে, তুমি রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যের কথা কিছু জান না, তাঁদের কথা জানতে আগ্রহও দেখাও না, অথচ রোজ যাও যীশুখৃষ্টের বিষয় শুনতে? একশো বার বলবো তুমি বিপথে পা দিয়ে দাঁড়িয়েচ। কই, একদিন গীতা পড়েচ? অথচ গস্‌পেল পড়তে যাও পিকারিঙের কাছে—তোমাকে বন্ধু বলি তাই কষ্ট হয়, নইলে তুমি উচ্ছন্ন যাও না, আমি বলতে যাব কেন?

ভবেশ চলে গেলে আমার মনে হ'ল ও যা ব'লে গেল তা জ্যাঠাইমা আমাকে যা বলতেন তার সঙ্গে মূলতঃ এক। ভবেশ আমাকে স্নেহ করে ব'লে হৃদয়হীন ভাবায় বলে নি জ্যাঠাইমার মত। কিন্তু আমি যা করচি তা যে খুব ভাল কাজ নয় একথা ভবেশ বলেচে।

অনেক রাত পর্য্যন্ত কথাটা ভাবলাম। হিন্দুর ছেলের পক্ষে যীশুখৃষ্টকে ভক্তি করাও পাপ। শ্রীরামপুরে এসে আমার একটা সুবিধে হয়েচে এখানে খৃষ্টধর্ম্মের অনেক বই আছে, থিওলজির কলেজ রয়েচে, পিকারিঙের কাছে যাই ও-সব সম্বন্ধে জানতে। পিকারিং আমাকে খৃষ্টান হ'তে বলেচে। কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের দিকটা এখানে এসে দেখেচি, তার দিকে আমার মন আকৃষ্ট হয় নি। কিন্তু খৃষ্টকে আমি ভক্তি করি, খৃষ্টের কথা বলতে ভাল লাগে, শুনতে ভাল লাগে। এতে দোষ আছে কিছু? মহাপুরুষের কি দেশ-বিদেশ আছে?

রাত্রে বাড়ির মধ্যে খেতে গিয়ে দেখি আর সকলের খাওয়া হয়ে গিয়েচে—ছোট বউ অর্থাৎ শৈলদিদির ছোট জায়ের রান্নার পালা ছিল এবেলা—তিনি হাঁড়িকুড়ি নিয়ে বসে আছেন। আমি খেতে বসলাম কিন্তু কেমন অশ্বস্তি বোধ হ'তে লাগল—শৈলদিদির এই ছোট-জাকে আমি কি জানি কেন পছন্দ করিনে। মেজ বউ, সেজ বউকে যেমন মেজদি, সেজদি ব'লে ডাকি—ছোটবউকে আমি এপর্য্যন্ত কোন কিছু ব'লে ডাকি নি। অথচ তিনি আমার সাম্‌নে বেরোন বা আমার সঙ্গে কথা বলেন। ছোটবউয়ের বয়েস আমার সমান হবে, এই সতেরো আঠারো—আমি যদিও 'আপনি' ব'লে কথা বলি। বাড়ির সব মেয়েরা ও বৌয়েরা জানে যে ছোটবৌয়ের সঙ্গে আমার তেমন সদ্ভাব নেই। কেন আমি তাঁকে ছোটদিদি ব'লে ডাকি নে, শৈলদি আমায় এ নিয়ে কতবার বলেচে। কিন্তু আমার যা ভাল লাগে না, তা আমি কখনও করিনে।

সেদিন এক ব্যাপার হয়েচে। খেয়ে উঠে অভ্যাসমত পান চেয়েচি—কাউকে বিশেষ ক'রে সম্বোধন ক'রে নয়, যেন দেয়ালকে বলচি এই ভাবে। ছোটবউ আধ-ঘোমটা দিয়ে এসে পান আমার হাতে দিতে গেলেন—আমার কেমন একটা অশ্বস্তি বোধ হ'ল, কেন জানি নে, অন্য কারুর বেলা আমার ত এমন অশ্বস্তি বোধ হয় না? পান দেবার সময় তাঁর আঙুলটা আমার হাতে সামান্য ঠেকে গেল—আমি তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিলাম। আমার সারা গা কেমন শিউরে উঠল, লজ্জা ও অশ্বস্তিতে মনে হ'ল পান আর কখনও এমন ভাবে চাইব না। মেজদি কি শৈলদির কাছে গিয়ে চেয়ে নেবো।

সেই দিন থেকে ছোট বউকে আমি এড়িয়ে চলি।

২

মাস-কয়েক কেটে গেল। শীত পড়ে গিয়েচে।

আমি দোতলার ছাদে একটা নিরিবিলি জায়গায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে জ্যামিতির আঁক কষ্‌চি।

সেজদি হাসতে হাসতে ছাদে এসে বল্‌লেন—জিতু এস তোমায় ওরা ডাকছে। আমি বললুম—কে ডাকচে সেজদি? সেজদির মুখ দেখে মনে হ'ল একটা কি মজা আছে। উৎসাহ ও কৌতূহলের সঙ্গে পেছনে পেছনে গেলাম। দোতলার ওদিকের বারান্দাতে সব মেয়েরা জড়ো হয়ে হাসাহাসি করচে। আমায় সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল, বললে—এস ঘরের মধ্যে। তাদের পেছনে ঘরে ঢুকতেই সেজদি বিছানার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—ওই লেপটা তোল ত দেখি কেমন বাহাদুরি? বিছানাটার উপর আগাগোড়া লেপ-ঢাকা কে এক জন শুয়ে আছে লেপ মুড়ি দিয়ে। সবাই বল্‌লে—তোল ত লেপটা!

আমিও হাসিমুখে বল্‌লাম—কি বলুন না সেজদি, কি হয়েচে কি?

ভাবলুম বোধ হয় শৈলদির ছোট দেওর অজয়কে এরা একটা কিছু সাজিয়েচে বা ঐ রকম কিছু। তাড়াতাড়ি লেপটা টেনে নিয়েই চমকে উঠলাম। লেপের তলায় ছোট বৌঠাকরুণ মুখে হাসি টিপে চোখ বুজে শুয়ে!

সবাই খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল। আমি লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের বার হয়ে গেলাম। বা রে, এ কি কাণ্ড ওদের? কেন আমায় নিয়ে এ রকম করা? তা ছাড়া—ছিঃ—না ওকি কাণ্ড? ছোট বৌঠাকৃরুণ স্বেচ্ছায় এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন নিশ্চয়। আমার আরও রাগ হ'ল তাঁর ওপরে।

এর দিন দুই পরে আমি আমার নিজের ঘরে একা বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ ছোট বৌঠাকৃরুণকে দোরের কাছে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তিনি আমার ঘরে কখনও আসেন নি এ-পর্য্যন্ত। কিন্তু তিনি যেমনি এলেন, তেমনি চলে গেলেন, একটুও দাঁড়ালেন না. যাবার আগে ঘরের মধ্যে কি একটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেলেন।

আমি বিস্মিত হয়ে তুলে দেখলাম একখানা ভাঁজকরা ছোট কাগজ—একখানা চিঠি! ছোট্ট চিঠি, দু-কথায়—

সেদিন যা ক'রে ফেলেচি সেজন্য আপনার কাছে মাপ চাই। আমি নিজের ইচ্ছেতে কিছু করি নি। দলে পড়ে করেচি। ক'দিন ধরে ভাবচি আপনার কাছে মাপ চাইব—কিন্তু লজ্জায় পারি নি। আমি জানি আপনার মন অনেক বড়, আপনি ক্ষমা করবেন।

পত্রে কোনো নাম নেই। আমি সেখানা বার-বার পড়লাম—তারপর টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেললাম—কিন্তু টুক্‌রোগুলো ফেলে দিতে গিয়ে কি ভেবে আমার একটা ছোট মণিব্যাগ ছিল, তার মধ্যে রেখে দিলাম।

সেদিন থেকে আমার কি হ'ল, আমি একা থাকলেই ছোট বৌঠাকৃরুণের কথা ভাবি। কিছুতেই মন থেকে আমি তার চিন্তা তাড়াতে পারি নে। দু-পাঁচ দিন ক'রে সপ্তাহখানেক কেটে গেল। আমি বাড়ির মধ্যে তেমন আর যাই নে—অত্যন্ত ভয়, পাছে একা আছি এমন অবস্থায় ছোট বৌঠাকৃরুণের সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে। ছোটবৌয়ের রান্নার পালার দিন আমি সকাল সকাল খেয়ে নি, যখন অনেক লোক রান্নাঘরে থাকে। যা যখন দরকার হয়, শৈলদি কি সেজদির কাছে চাই—ওদের গলা না শুনতে পেলে বাড়ির মধ্যে যেতে সাহস হয় না।

সেজদি একদিন বলচেন—জিতু, তুমি কলেজ থেকে এসে খাবার খাওয়া ছেড়ে দিলে নাকি? বিকেলে ত বাড়ির মধ্যে থাকই না, আসই না। কোথা থেকে খেয়ে আস বুঝি? আমি জানি বিকেলের চা খাবার প্রায়ই ছোটবৌ তৈরি করেন—আর সে সময় বড়-একটা কেউ সেখানে থাকে না। যে যার খেয়ে চলে যায়। ইচ্ছা ক'রেই বিকেলে চা খেতে যাই নে।

পয়সা যেদিন থাকে, ষ্টেশনের দোকান থেকে খেয়ে আসি।

শীত কেটে গেল, বসন্ত যায়-যায়। আমার ঘরে জানালার ধারে বসে পড়চি, হঠাৎ জানালার পাশের দরজা দিয়ে ছোট বৌঠাকৃরুণ কোথা থেকে বেড়িয়ে এসে বাড়ি ঢুকচেন, সঙ্গে শৈলদির ছেলে কালো। তিনি আমায় দেখতে পাননি। আমি অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তাঁকে যেন নূতনরূপে দেখলাম—আরও কত বার দেখেচি, কিন্তু আজ দেখে মনে হ'ল এ চোখে আর কখনও দেখিনি তাঁকে। তাঁর কপালের অমন সুন্দর গড়ন, পাশের দিক থেকে তাঁর মুখ যে সুশ্রী দেখায়, ভুরুর ও চোখের অমন ভঙ্গি—এ সব আগে ত লক্ষ্য করি নি? যখন কেউ দেখে না, তখন তাঁর মুখের কি অদ্ভুত ধরণের ভাব হয়! তিনি বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতেই আমার চমক ভাঙলো। বই খুলে রেখে দিলাম—পড়ায় আর মন বসল না, সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। কি একটা কষ্ট হ'তে লাগল বুকের মধ্যে—যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আটকে আসচে। মনে হ'ল আর চুপ ক'রে বসে থাকতে পারব না, এক্ষুনি ছুটে মুক্ত বাতাসে বেরুতে হবে। সেই রাত্রে আমি তাকে চিঠি লিখতে বসলাম—চিঠি লিখে ছিঁড়ে ফেল্‌লাম, আবার লিখে আবার ছিঁড়লাম। সেইদিন থেকে তাঁকে উদ্দেশ ক'রে চিঠি লেখা যেন আমার কলেজের টাস্কের সামিল হয়ে দাঁড়ালো—কিন্তু লিখি আর ছিঁড়ে ফেলি। দিন-পনের পরে ঠিক করলাম, আজ চিঠি দেবই। সেদিন বেলা দেড়টার মধ্যে কলেজ থেকে ফিরে এলাম—গ্রীষ্মের দুপুর, বাড়ির সবাই ঘুমুচ্চে। আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম, সিঁড়ির পাশেই দোতলায় তাঁর ঘর, তিনি ঘরে বসে সেলাই করছিলেন—আমি সাহস ক'রে ঘরে ঢুকে চিঠি দিতে পারলাম না, চলে আসছিলাম, এমন সময় তিনি মুখ তুলেই আমায় দেখতে পেলেন, আমি লজ্জায় ও ভয়ে অভিভূত হয়ে সেখান থেকে সরে গেলাম, ছুটে নীচে চলে এলাম—পত্র দেওয়া হ'ল না, সাহসই হ'ল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে পথে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ালাম লক্ষ্যহীন ভাবে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি যখন ফিরি, রাত

তখন বারোটা। বাড়িতে আবার সেদিন লক্ষ্মীপূজা ছিল। খেতে গিয়ে দেখি রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় আমার খাবার ঢাকা আছে, শৈলদি ঢুলচেন রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে। মনে মনে অনুতাপ হ'ল, সারা বিকেল খাটুনির পরে শৈলদি বেচারী কোথায় একটু ঘুমুবে, আর আমি কি-না এ-ভাবে বসিয়ে রেখেচি!

আমায় দেখে শৈলদি বললে—বেশ, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

কথার উত্তর দিতে গেলে মুস্কিল, চুপচাপ খেতে বসলাম। শৈলদি বল্‌লে—না খেয়ে ঢন্ ঢন্ ক'রে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গিয়েচে। চা খেতেও আসিস নে বাড়ির মধ্যে, কালোকে দিয়ে বাইরের ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিলেও পাওয়া যায় না—থাকিস্ কোথায়?

খানিকক্ষণ পরে পাতের দিকে চেয়ে বল্‌লে—ও কি ভাল ক'রে ভাত মাখ। ঐ ক'টি খেয়ে মানুষ বাঁচে ত? তোরা এখন ছেলেমানুষ, খাবার বয়েস। লুচি আছে ভোগের, দোবো? পায়েস তুই ভালবাসিস্, এক বাটি পায়েস আলাদা করা আছে। কই মাছের মুড়ো ফেল্‌লি কেন, চুষে চুষে খা। আহা, কি ছিরি হচ্চে চেহারার!

পরদিন কিসের ছুটি। আমি দোতলার ছাদে কালোকে ডাকতে গিয়েচি তার প্রাইভেট টিউটার নীচে পড়াতে এসেচে ব'লে। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়েছে। ও-ঘরে উঠেই আমি একেবারে ছোটবৌঠাকরুণের সাম্‌নে পড়ে গেলাম। তাঁর কোলে মেজদির দেড় বছরের খুকী মিণ্টু—সে খুব ফুটফুটে ফর্সা ব'লে বাড়ির সকলের প্রিয়, সবাই তাকে কোলে পাবার জন্যে ব্যগ্র। ছোটবৌঠাকরুণ হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন খুকীকে কোলে ক'রে। আমি বিস্মিত হ'লাম, কপালে ঘাম দেখা দিল। খুকী আমায় চেনে, সে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে আসতে চায়। ছোটবৌঠাকরুণ আমার আরও কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন—খুকীকে আমার কোলে দিলেন। তাঁর পায়ের আঙুল আমার পায়ের আঙুলে ঠেকল। আমি তখন লাল হয়ে উঠেচি, শরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করচে। কেউ কোন দিকে নেই।

ছোটবৌঠাকরুণ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সুর নীচু ক'রে বললেন—আপনি আর বাড়ির মধ্যে আসেন না কেন আজকাল? আমার ওপর রাগ এখনও যায় নি?

আমি অতি কষ্টে বললাম—রাগ করব কেন?

—তবে সেদিন ও-ঘরে এলেন, আমার সঙ্গে কথা বললেন না ত? চলে গেলেন কেন? মরীয়া হ'য়ে বললাম—আপনাকে সেদিন চিঠি দোবো ব'লে এসেছিলাম, কিন্তু পাছে কিছু মনে করেন, সেজন্যে দেওয়া হয় নি। পাছে কিছু মনে করেন ভেবেই বাড়ির মধ্যে আসি নে। তিনি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন—মাথা ঠাণ্ডা ক'রে লেখাপড়া করুন। কেন ও-রকম করেন? আর বাড়ির মধ্যে আসেন না কেন? ওতে আমার মনে ভারি কষ্ট হয়। যেমন আসতেন, তেম্‌নি আসবেন বলুন? আমায় ভাবনার মধ্যে ফেল্‌বেন না ওরকম।

আমার শরীরে যেন নতুন ধরণের অনুভূতির বিদ্যুৎ খেলে গেল। সেখানে আর দাঁড়াতে পারলাম না—মুখে যা এল, একটা জবাব দিয়ে নীচে নেমে এলাম। সারারাত ঘুমুতে আর পারিনে। আমার জন্যে এক জন ভাবে—এ চিন্তার বাস্তবতা আমার জীবনে একেবারে নতুন! নতুন! নতুন! নেশার মত এ অনুভূতি আমার সারা দেহ-মন অভিভূত ক'রে তুল্‌লে।

কি অপূর্ব্ব ধরণের আনন্দ-বেদনায় মাখানো দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস! দিন রাতে সব সময়ই আমার ওই এক চিন্তা। নির্জ্জনে কাটাই, কিছু ভাল লাগে না, অথচ যাঁর চিন্তা শয়নেস্বপনে সর্ব্বদাই করি, তাঁর সাম্‌নে পাছে পড়ি এই ভয়ে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করি। লেখাপড়া, খাওয়া, ঘুম সব গেল।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি ছোট বৌঠাকরুণের হ'ল অসুখ। অসুখ ক্রমে বাড়াবাড়ি ধরণের হ'ল। চাতরা থেকে যদু ডাক্তার দেখতে এল। তাঁর বাপের বাড়ি থেকে লোকজন এসে পড়ল—বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। আমি ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, এসব করি বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে, কিন্তু একদিনও রোগীর ঘরে যেতে পারলাম না—কিছুতেই না। একদিন ঘরের দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম—কিন্তু চৌকাঠের ওপারে যাই নি।

ক্রমে তিনি সেরে উঠলেন। একদিন আমার 'চয়নিকা' খানা তিনি চেয়ে পাঠালেন—দিন দুই পরে কালো বই ফিরিয়ে দিয়ে গেল। চার-পাঁচ দিন পরে 'চয়নিকা' খানা কি জন্যে খুলতে গিয়েচি, তার মধ্যে একখানা চিঠি, ছোটবৌঠাকুরুণের হাতের লেখা।

নাম নেই কারুর। লেখা আছে—

আমার অসুখের সময় সবাই এল, আপনি এলেন না কেন? আমি কত আশা করেছিলাম যে আপনি দেখতে আসবেন, জানেন তা? আমার মরে যাওয়াই ভাল ছিল। কেন যে আবার সেরে উঠলাম! অসুখ থেকে উঠে মন ও শরীর ভেঙে গেছে। কালোর মুখে শুনেচি, আপনি আপনার দেবতার ছবি ঘরে টাঙিয়ে রেখেচেন, শুনেচি যীশুখৃষ্টের ছবি, তিনি হিন্দুর দেবতা নন—কিন্তু আপনি যাঁকে ভক্তি করেন—আমি তাঁকে অবহেলা করতে পারি নে। আমার জন্যে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবেন! আর একটা কথা—একটিবার দেখতে কি আসবেন না।

যীশুখৃষ্টের ছবির দিকে চাইলাম। সম্প্রতি একখানা বুদ্ধের ছবি, আর একখানা চৈতন্যের ছবিও এনে টাঙিয়েছিলাম। রোগশীর্ণা পত্রলেখিকার করুণ আকুতি ওঁদের চরণে পৌঁছে দেবার ভার আমার ওপর পড়েচে। কিন্তু আমি কি পারব? অনুকম্পায় মমতায় আমার মন তখন ভরে উঠেচে। যে প্রার্থনা ওঁদের কাছে জানালাম, তা ভাষাহীন, বাক্যহীন। আমি এ-ছাড়া আর কিছু করতে পারি নে। সামনে হঠাৎ যেতে পারব না তাঁর। এ-বাড়িতেও আর বেশীদিন থাকা হবে না আমার। চলে যাব এখান থেকে।

টেষ্ট পরীক্ষা দিয়েই আটঘরায় পালাবো, ঠিক করলাম। সেখানে যাইনি অনেক দিন। মা চিঠি লিখেছেন, দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়েচেন। আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে হয় না শুধু জ্যাঠাইমাদের ব্যবহারের জন্যে। গেলেই মায়ের দুঃখ দেখতে হবে। দাদা এক বাতাসার কারখানায় চাকরি পেয়েচে, মাসে কিছু টাকা অতিকষ্টে পাঠায়। সীতা বড় হয়ে উঠল—তারই বা কি করা যায়?··· দাদা একাই বা কি করবে!

পিকারিং সাহেব আমার হাতে গীতা দেখে একদিন বললে—তুমি এ-সব পড় নাকি? বাইবেল কি তোমার সকল আধ্যাত্মিক অভাব পূর্ণ করে না?

আমি বললাম—পড়ে দেখতে দোষ আছে সাহেব? তা ছাড়া আমি ত খৃষ্টান নই, আমি এখনও হিন্দু।

—দু-নৌকোতে পা দেওয়া যায় না, মাই বয়। তুমি খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হও—নয়তো তুমি বাইবেল পড় কেন?

—সাহেব, যদি বলি ইংরিজী ভাষা ভাল ক'রে শেখবার জন্যে?

পিকারিং সাহেব হো হো ক'রে হেসে উঠল। বললে—তোমার আত্মার পরিত্রাণ তার চেয়েও বেশী দরকারী। যীশুতে বিশ্বাস না করলে আত্মার ত্রাণ নেই। তিনি আমাদের সকলের পাপের ভার নিজে নিয়ে ক্রুশের নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করেছিলেন। যীশুর ধর্মে দীক্ষিত হও, তোমার পাপ তাঁর রক্তে ধুয়ে যাবে। এস, আমার সঙ্গে গান কর।

তারপর সাহেব নিজেই গান ধরল—

Nothing but the Blood of Jesus
Oh, Precious is the flow,
That can make me white as snow,
No other Fount I know,
Nothing but the Blood of Jesus.

পিকারিং সাহেবকে আমার খুব ভাল লাগে। খুব সরল, ধর্মপ্রাণ লোক। স্ত্রী মারা গিয়েচে আজ দশ-বারো বছর, আর বিয়ে করেনি,—টেবিলের ওপর নিকেলের ফ্রেমে বাঁধানো স্ত্রীর ফটো সর্ব্বদা থাকে। মাঝে মাঝে আমায় জিগ্যেস করে—আমার স্ত্রী দেখতে কেমন ছিল, ভাল না? ফটো দেখে মিসেস্ পিকারিংকে সুন্দরী মনে হয়নি আমার, তবুও বলি খুব চমৎকার।

পিকারিং সাহেবের ধর্মমত আমার কাছে কিন্তু অনুদার ঠেকে—কিছুদিন এদের সঙ্গে থেকে আমার মনে হয়েচে জ্যাঠাইমারা যেমন গোঁড়া হিন্দু—খৃষ্টানদের মধ্যেও তেমনি গোঁড়া খৃষ্টান আছে। এরা নিজের ধর্মটি ছাড়া আর কারুর ধর্ম ভাল দেখে না। এদেরও সমাজে সংকীর্ণতা আছে—এদেরও আচার আছে—বিশেষতঃ একটি নির্দ্দিষ্ট ধরণে ঈশ্বরের উপাসনা না করলে উপাসনা ব্যর্থ হ'ল এদের মতে। একখানা কি বইয়ে একবার অনন্ত নরকের গল্প পড়লাম। শেষবিচারের দিন পর্য্যন্ত পাপীরা সেই অনন্ত নরকের অনন্ত আগুনের মধ্যে জ্বলবে পুড়বে, খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার আগেই যদি কোন শিশু মারা যায়—তাদের আত্মাও যাবে অনন্ত নরকে। এসব কথা প্রথমে যেদিন শুনেছিলাম, আমাকে ভয়ানক ভাবিয়ে তুলেছিল। তারপর মনে হ'ল কেন যীশু কি এতই নিষ্ঠুর? তিনি পরিত্রাণের দেবতা, তিনি সকল পাপীকেই কেন পরিত্রাণ করবেন না? যে তাঁকে জানে, যে তাঁকে না-জানে—সবাইকে

সমান চোখে তিনি কেন না দেখবেন? তাঁর কাছে খৃষ্টান ও অখৃষ্টানে প্রভেদ থাকবে কেন? বরং যে অজ্ঞানান্ধ তাঁর প্রতি তাঁর অনুকম্পা বেশী হবে—আমার মনের সঙ্গে এই খৃষ্টের ছবি খাপ খায়। তিনি প্রেমময় মুক্ত মহাপুরুষ, তাঁর কাছেও ধর্ম্মের দলাদলি থাকে কখনও? যে দেশের, যে ধর্ম্মের, যে জাতির হোক, তিনি সবারই—যে তাঁকে জানে, তিনি তার, যে না-জানে, তিনি তারও।

এক দিন গঙ্গার ধারে বেঞ্চির ওপর বসে জনকতক লোক গল্প করচে শুনলাম বরানগরে কুঠিঘাটের কাছে একটা বাগান-বাড়িতে এক জন বড় সাধু এসেচেন, সবাই দেখতে যাচ্চে। দু-এক দিনের মধ্যে একটা ছুটি পড়ল, বেলুড় নেমে গঙ্গাপার হয়ে কুঠিঘাটের বাগান-বাড়িতে খোঁজ ক'রে বার করলাম। বাগান-বাড়িতে লোকে লোকারণ্য, সকলেই সাধুজীর শিষ্য, মেয়েরাও আছে। ফটকের কাছে একজন দাড়িওয়ালা লোক দাঁড়িয়ে ছিল, আমি ফটকের কাছে গিয়ে আমার আসার উদ্দেশ্য বলতেই লোকটা দু-হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে—ভাই, এস এস, তোমাকে নেওয়ার জন্যই আমি এখানে যে দাঁড়িয়ে আছি! আমি পছন্দ করিনে যে কেউ আমার গলা জড়িয়ে ধরে—আমি ভদ্রভাবে গলা ছাড়িয়ে নিলাম। লোকটা আমায় বাগানের মধ্যে নিয়ে গেল। আমি কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। বাঁ-দিকের রোয়াকে একদল মেয়ে ব'সে একরাশ তরকারী কুটছে—একটা বড় গামলায় প্রায় দশ সের ময়দা মাখা হচ্চে,—যেদিকে চাই, খাওয়ার আয়োজন।

—সাধুর দেখা পাবো এখন?

—তিনি এখন ধ্যান করচেন। তাঁর প্রধান শিষ্য জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী ও-ঘরে আছেন, চল ভাই তোমায় নিয়ে যাই।

কথা বলচি এমন সময় এক জন ভদ্রলোক এলেন, সঙ্গে একটি মহিলা—ফটকের কাছে তাঁরা মোটর থেকে নামলেন। এক জন বালক-শিষ্যকে ভদ্রলোকটি কি জিগ্যেস্ করলেন—সে তাঁদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল আমার সঙ্গের দাড়িওয়ালা লোকটির কাছে। ভদ্রলোকটি তাকে বললেন—স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেচি, তিনি কোথায়?

—কোথা থেকে আসচেন আপনারা?

—ভবানীপুর, এল্‌গিন রোড থেকে। আমার নাম বিনয়ভূষণ মল্লিক—

দাড়িওয়ালা লোকটির শরীরের ইস্ক্রুপ কব্জা যেন সব ঢিলে হয়ে গেল হঠাৎ—সে তিন ভাগে ভেঙে হাত কচলে বললে—আজ্ঞে আসুন, আসুন, বুঝতে পেরেচি, আসুন। এই সিঁড়ি দিয়ে আসুন—আসুন মালক্ষ্মী—

আমি বিস্মিত হ'লাম। এই যে বললে সাধুজী ধ্যানে বসেচেন—তবে ওঁরা গেলেন যে! লোকটি ওঁদের ওপরে দিয়ে আবার নেমে এল। আমায় একটা হলঘরে নিয়ে গেল। সেখানে জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে। জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর পরনে গেরুয়া আলখেল্লা, রং ফর্সা—আমার সঙ্গে বেশ ব্যবহার করলেন। তিনি আপিসের কাজে দেড়শো টাকা মাইনে পেতেন—ছেড়ে স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেচেন। স্বামিজী বলেচেন তিনি তিনটে মহাদেশ উদ্ধার করবেন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেই বেরিয়ে পড়বেন সে উদ্দেশ্যে। স্বামিজীর দেওয়া মন্ত্রজপ ক'রে তিনি অদ্ভুত ফল পেয়েচেন নিজে—এই সব গল্প সমবেত দর্শকদের কাছে করছিলেন। আমি কৌতূহলের সঙ্গে জিগ্যেস করলাম—কি ফল পেয়েচেন মন্ত্রের? তিনি বললেন—মন্ত্র জপ করতে করতে মনে হয় যেন কোথায় পাহাড়ের উপরে বসে আছি। স্বামিজী বলেন এ-একটা উচ্চ অবস্থা। আমি আরও আগ্রহের সুরে বললাম—আর কিছু দেখেন? তিনি বললেন জ্যোতিঃদর্শন হয় মাঝে মাঝে।

—সে কি রকম?

—দুই ভুরুর মাঝখানে একটা আগুনের শিখার মত দীপ্তি দেখতে পাই।

আমি হতাশ হ'লাম। আমি নিজে ত কত কি দেখি! এরা ত সে-সব কিছু দেখে ব'লে মনে হয় না! এরা আর কতটুকু দেখেচে তা হ'লে? পাহাড়ের ওপর বসে আছি এই দেখলেই বা কি হ'ল? ভুরুর মধ্যে আগুনের শিখা দেখলেই বা কি?

শুনলাম বেলা ছ'টার পরে স্বামিজীর দেখা পাওয়া যাবে। পাশের একটা ঘরে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। আরও এক জন বৃদ্ধ সেখানে ছিলেন। কথায় কথায় তিনি বললেন—দেখ ত বাবা—এই তোমরাও ত ছেলে। আর আমার

হতচ্ছাড়া ছেলেটা পালিয়ে এসে বাড়ি থেকে এই সন্নিসির দলে যোগ দিয়েচে। এখানে ত এই খাওয়া, এই থাকা। যাত্রার দলের মত এক ঘরে একশো লোক শোয়। ছেলেটা হাঁড়ির হাল হয়েচে—আগে একবার ফিরিয়ে নিতে এসেছিলাম—তা যায় নি। এবার আমি আসচি শুনে কোথায় পালিয়েচে হতভাগা। আহা, কোথায় খাচ্চে, কি হচ্চে—ওদিকে বাড়িতে ওর মা অন্নজল ছেড়েছে। ওই সন্নিসির দলই তাকে সরিয়ে রেখেচে কোথায়। আজ তিন দিন এখানে বসে আছি—তা ছোঁড়া এল না। এরা তলায় তলায় তাকে খবর দিচ্চে। আবার আমার ওপর এদের রাগ কি? বলচে—ছেলে তোমার মুক্তির পথে গিয়েচে, বিষয়ের কীট হয়ে আছ তুমি, আবার ছেলেটাকে কেন তার মধ্যে ঢোকাবে? শোন কথা। ওদের এখানে বিনি পয়সায় চাকর হাতছাড়া হয়ে যায় তা হ'লে যে! আমায় এই মারে ত এই মারে। দু-বেলা অপমান করছে।

—কোথা থেকে আপনার ছেলে এদের দলে এল?

—এই সন্নিসির দল গেছল আমাদের মাদারিপুরে। খুব কীর্ত্তন ক'রে, ভিক্ষে ক'রে, শিষ্য-সেবক তৈরি ক'রে বেড়ালে ক'দিন! সেখান থেকে ছেলেটাকে ফুস্‌লে নিয়ে এসেচে। পয়সা হাতে থাকত আমার ত ব্যাটারা খাতির করত। এখানে খেতে দেয় না; ওই বাজারের হোটেল থেকে খেয়ে আসি। একটু এই দালানটাতে রাত্রে শুয়ে থাকি, তাও দু-বেলা বলচে—বেরো এখান থেকে। ছোঁড়াটা ফিরে আসবে, সেই আশায় আছি।

স্বামিজীর সঙ্গে দেখা হ'ল না।

সন্ধ্যার পরে ষ্টীমারে পার হয়ে বেলুড়ে এলাম; মনে কত আশা নিয়ে গিয়েছিলাম ওবেলা। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার যেখানে ভাল নয়, সেই জ্যাঠাইমাদের বাড়ির গোপীনাথ জিউএর পুজোর সময় যা দেখেচি, হীরু ঠাকুরের প্রতি তাদের ব্যবহার যা দেখেচি—সেই সব একই যেন।

দিন দুই পরে ছোট বউঠাকরুণের বাপের বাড়ি থেকে বড় ভাই তাঁকে নিতে এল। আমার সঙ্গে দশ-পনের দিন দেখা হয়নি, ভাবলুম যাবার সময় একবার দেখা করবই। দুপুরের পরে ঘোড়ার গাড়ীতে জিনিষপত্র ওঠানো হচ্চে, আমি নিজের ঘরে জানলা দিয়ে দেখচি আর ভাবচি ওঠবার সময় গাড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়াব, না ওপরে গিয়ে দেখা ক'রে আসব?

পায়ের শব্দে পেছনে চেয়ে দেখি ছোটবৌঠাকরুণ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে, রোগশীর্ণ মুখ, হাতায় লাল পাড়-বসানো ব্লাউজ গায়ে, পরণে লালপাড় শাড়ী। আমি থতমত খেয়ে বললাম—আপনি! আসুন, এই টুলটাতে—

তিনি মৃদু, সহজ সুরে বললেন—খুব ত এলেন দেখা করতে।

—আমি এখুনি যাচ্ছিলাম, আপনি এলেন, তাই নইলে—

ছোটবৌঠাকরুণ ম্লান হেসে বললেন—না, নিজেই এলাম। আর আপনার সঙ্গে কি দেখা হবে? আপনি ত পরীক্ষা দিয়ে চলে যাবেন। বি-এ পড়বেন না?

আমি একটু ইতস্তত: ক'রে বললাম—ঠিক নেই, এখানে হয়ত আর আস্‌ব না।

তিনি বললেন—কেন আর এখানে আসবেন না?

আমি কোন কথা বললাম না। দু-জনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে মৃদু অনুযোগের সুরে বললেন—আপনার মত ছেলে যদি কখনও দেখেচি! আগে যদি জানতাম তবে সেবার আপনাকে নিয়ে যে ওরা ঠাট্টা করেছিল, আমি তার মধ্যে যাই? এখন সে-কথা মনে হ'লে লজ্জায় ইচ্ছে হয় গলায় বঁটি দিয়ে মরি।

তারপর গভীর স্নেহের সুরে বললেন—না, ওসব পাগলামি করে না, আসবেন এখানে, কেন আসবেন না, ছিঃ—

দরজার কাছে গিয়ে বললেন—না এলে বুঝবো আমায় খুব ঘেন্না করেন, তাই এলেন না। (ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সমাজ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

সাহিত্য-বিষয়ক যে সমস্যাগুলি নিয়ে আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সুধীসমাজের মধ্যে তর্ক জমে উঠেচে, তার ভিতরকার সবচেয়ে বড় কয়েকটি প্রশ্ন এই—

(১) সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের কোনরূপে সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত কি না? উচিত হ'লে সে যোগ সাহিত্যকে সমাজের মুখাপেক্ষী করবে অথবা সমাজকে সাহিত্যের মুখাপেক্ষী ক'রে রাখবে? সাহিত্য সমাজের অগ্রগামী না অনুগামী?

(২) নিছক আনন্দ পাওয়া ও দেওয়ার কাজে নিযুক্ত আর্ট বা ললিতকলা হিসাবে সাহিত্যের পার্থিব প্রয়োজন-নিরপেক্ষ কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও নিজস্ব মানদণ্ড থাকা সম্ভব এবং উচিত কিনা? সম্ভব বা উচিত হ'লে সে অস্তিত্ব ও তার মানদণ্ডের স্বরূপ কি?

(৩) সাহিত্যের দ্বারা সমাজের কল্যাণ-বুদ্ধিকে জাগ্রত ক'রে অকল্যাণ-বুদ্ধিকে ঠেকাবার চেষ্টা করলে তাতে সাহিত্যের প্রতি অবিচার করা হয় কি না?

(৪) সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষে সৎসাহিত্য সৃষ্টির জন্য কোন্ পথে সাধনার প্রয়োজন?

এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা খুব সহজ নয় এবং অল্প কথায় সম্ভবও নয়। বড় বড় পণ্ডিত কবি এবং সাহিত্যিক এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন ক'রে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েচেন। আমার বুদ্ধিতে আমি এই প্রশ্নগুলির যেরূপ সমাধান করতে পেরেচি কেবল সেইটুকুই বলব।

প্রথম প্রশ্ন, সাহিত্য ও সমাজের কোনরূপ যোগ আছে বা থাকা উচিত কি না এবং থাকলে সে যোগের স্বরূপ কি? সাহিত্য এবং সমাজ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় সত্য এই যে, এরা সর্ব্বদেশকালেই পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী, আবার উভয়ের স্বাতন্ত্র্য চিরদিনই সুস্পষ্ট। সাহিত্য যেমন মানুষকে কেবল যেন-তেন-প্রকারেণ আনন্দ পরিবেশনের যন্ত্র নয়, তেমনই সে কেবল সমাজের কল্যাণ অকল্যাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য রচিত কঠোর নীতি-উপদেশের সমষ্টিও নয়। সাহিত্যের মধ্যে এই দুই দিকই আছে, আবার সাহিত্য এই দুইয়েরই উপরে। এক কথায় সাহিত্যের বহিরঙ্গ হচ্চে সুন্দর এবং তার অন্তরঙ্গ হচ্চে সত্য ও কল্যাণ। "সত্যং শিবং সুন্দরং" কথাটি যেমন ব্রহ্মের সম্বন্ধে খাটে তেমনই সাহিত্য সম্বন্ধেও খাটে। সাহিত্য সমাজকে আনন্দ দেবে, তার কল্যাণ করবে, তার নিজের কাছে নিজেকে সত্য হ'তে শেখাবে, যেন সে তার দেশের বিশিষ্ট ধারা রক্ষা করে, কালের উপযোগী সংস্কারকে গ্রহণ ক'রে সুন্দর ও সুখী হয়ে উঠতে পারে। ইহাই সাহিত্যের চিরন্তন ধর্ম্ম। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের এই যোগ থাকার প্রধান এবং প্রথম কারণ মানুষই সাহিত্য সৃষ্টি করে এবং মানুষ সামাজিক জীব। বিভিন্ন দেশের মানুষের সমাজে বিভিন্ন সংস্কার ও বিভিন্ন রীতিনীতি আছে, সুতরাং তার প্রভাব বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের বহির্মূর্ত্তিতে পরস্পর থেকে কিছু-না-কিছু পার্থক্য এনে দিয়েচে। এই জন্য সাহিত্যের বহিরঙ্গের কোন শাশ্বত রূপ বা শাশ্বত মানদণ্ডও থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এক অখণ্ড মানবজাতির হৃদয় থেকে বিভিন্ন দেশের সাহিত্য উদ্ভূত হওয়াতে পরস্পরের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য আছে। প্রত্যেক দেশের রসপিপাসু মানুষই অন্য দেশের মানুষের সৃষ্ট সাহিত্য উপভোগ করতে পারচে এবং পারবে, বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের অন্তরগত সাদৃশ্যই তার কারণ। সাহিত্য-স্রষ্টা যে কেমন ক'রে দেশকালের ব্যবধান ছাড়িয়ে জগতে আনন্দ পরিবেশন ক'রে বেড়ান, তার সাক্ষী ভারতের সুধীসমাজে সেক্সপীয়র, শেলি, গ্যেটে, রোম্যা র'লা প্রভৃতির সমাদর এবং ইউরোপ আমেরিকার সুধীসমাজে কালিদাস রবীন্দ্রনাথের পূজা। এর কারণ প্রতিভাশালী কবি সর্ব্বদেশের মানবাত্মাকে আনন্দ দিতে সমর্থ এবং সাহিত্যের এমন একটা শাশ্বত আন্তররূপ তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলেচেন যেটা দেশকাল এমন কি পাত্রেরও অতীত।

বিজ্ঞানের সাহায্যে বিভিন্ন দেশের মানুষ আজ যতই ক্রমশঃ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হচ্চে, যতই তাদের মেলামেশার ফলে সামাজিক রীতিনীতি অনেকটা এক ছাঁচে ঢালাই হ'য়ে আসচে, ততই সাহিত্যের আন্তর ও বহির্মূর্ত্তির একটা শাশ্বত রূপ স্থির করার চেষ্টা বিভিন্ন দেশে চলচে। বিভিন্ন দেশের বাহ্য রূপ কোন দিন একটা বাঁধাধরা নিয়মে বিচার্য্য হবে কি না বলা শক্ত, কিন্তু তার আন্তর রূপ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে একই ছিল, আছে এবং পৃথিবীর মানুষ যদি আত্মঘাতী হ'তে প্রস্তুত না হয় তাহলে থাকবে—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই আন্তর রূপ হচ্চে মানুষের বৃহত্তর সত্তার প্রতি প্রত্যেক মানুষের ক্ষুদ্রতর সত্তার কল্যাণবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সূক্ষ্ম রসানুভূতি। তাই বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের বহিঃপ্রকাশের ভাষা সাহিত্যিকের রুচি ও রচনাপ্রণালী ভেদে বাহ্যতঃ বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হলেও আন্তরিক তাদের অনৈক্য নেই। তাদের সমাজনিরপেক্ষ নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকলেও তাদের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারের একটা শাশ্বত মানদণ্ড আছে। সাহিত্য একদিক দিয়ে সমাজের প্রতিচ্ছবি হলেও সে তার হুবহু নকল বা ফটোগ্রাফ নয়। অন্যান্য ললিতকলার মত সে প্রকৃতির সঙ্গে স্রষ্টা মানুষের মনকে মিলিয়ে দক্ষ শিল্পীর হাতের আঁকা ছবি, যাহাতে বহির্জগৎ বা এক্ষেত্রে সমাজের প্রতিচ্ছবিটার উপরে সাহিত্যস্রষ্টার শিক্ষা দীক্ষা রুচি প্রবৃত্তি এমন কি তাঁর দেশকালের প্রভাবও খুব সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে।

একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দশ জনের চোখে ঠিক একরকম হয়ে প্রতিভাত হয় না। একই বিষয়বস্তু নিয়ে যেমন পাঁচ জন শিল্পী পাঁচ রকম বিভিন্ন ছবি আঁকতে পারেন, তেমনই একটি সামাজিক চিত্রই বিভিন্ন সাহিত্য-স্রষ্টার হাতে বিভিন্ন রূপ পেয়ে থাকে। এ-সম্বন্ধে বাঁধাধরা কোন নিয়ম করা যায় না এবং প্রয়োজনও নেই; কারণ কোন সুকুমার শিল্পই একঘেয়ে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কেবল একটি গোড়ার কথা মনে রাখা দরকার। সাহিত্যিক সমাজবদ্ধ মানুষের জন্য যে আনন্দ-লোক সৃজন করবেন, তাহা যেন যুগপৎ তাদের পক্ষে কল্যাণ-লোক এবং সত্যলোক হয়। কবিরা নিরঙ্কুশ হবার অধিকার যুগে যুগে দাবি করেছেন এবং পেয়েছেন, কিন্তু কেবল তাঁদেরই দাবি সমাজ মেনেছে, যাঁরা কাব্য সৃষ্টি করতে গিয়ে সমাজের কল্যাণকে বিসর্জন দেননি, যাঁরা সমাজকে মেনে নিয়ে সুপথে পরিচালনা করেছেন। সংযমের দ্বারাই স্বাধীনতার অধিকার লাভ করা যায়। সমস্ত তর্ক বিচারের উপরে আমাদেরও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ তার সৃষ্ট সাহিত্যের চেয়ে বড়। যে কল্পনার বিলাস মানুষকে তার প্রতিদিনের হীনতার দীনতার ক্লেদকর্দ্দম থেকে, তার স্বার্থসংঘাতের নির্ম্মম রণক্ষেত্র থেকে উর্দ্ধে তুলে নিয়ে বিমলতা দান করে, শান্তস্নিগ্ধ সরস করে, তার মূল্য খুব বেশী; কিন্তু তা ব'লে সে-আনন্দ যদি মাতালের মত্ততাপ্রসূত সুখমাত্র হয়, সাহিত্য যদি সমাজের মাথায় ব'সে তারই মূলচ্ছেদের জন্য কুঠারাঘাত করতে চেষ্টা করে—মানুষকে তার সুপরিচালনায় বড় না করে, তার স্বাভাবিক পশুত্বকে জাগিয়ে তুলে নৈতিক অধঃপাতের পথে তাকে ঠেলে দেয়, তবে তাকে বাধা দেওয়ার এবং নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার সমাজের থাকা উচিত। নিরঙ্কুশ কবি বনের পাখীর মত মনুষ্যসমাজের বহির্ভাগে বাস করলে বোধ হয় কিছু বলবার থাকে না; কিন্তু তাঁর রচনার প্রভাব যদি কুপ্রভাব হয় তবে নির্জ্জনবাস থেকে জনপদে এসে দেশকালের ব্যবধান ছাড়িয়ে সে যে সমাজের ক্ষতি করবে না এমন কথা জোর ক'রে বলা শক্ত।

এর পর প্রশ্ন আছে, সাহিত্যের দ্বারা সমাজের কল্যাণ অকল্যাণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সাহিত্যের প্রতি অবিচার কি না? সাহিত্যিক যদি তাঁর রচনার সৌন্দর্য্যের হানি না ক'রে সমাজের অকল্যাণ-বুদ্ধিকে রোধ করার এবং কল্যাণবুদ্ধিকে উজ্জীবিত করার প্রয়াস করেন এবং সেই কার্য্যে সফল হন, তবে তাঁর রচনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সার্থক হয়। সাহিত্য যে-রসলোক সৃজন করবে তাতে সকল রসেরই স্থান আছে; কিন্তু যথোপযুক্ত স্থানে প্রত্যেক রসকে স্থান দিতে হবে। রসসৃষ্টির উৎসবকে সাহিত্যিকের মন যেন বীভৎস রসকে শান্ত বা করুণ রসের উর্দ্ধে স্থান না দেয়, আদি রসের আদিম বর্ব্বরতা যেন তার মাধুর্য্যকে অতিক্রম ক'রে অশোভন না হয়ে ওঠে। আমরা যখন বাসগৃহের পরিকল্পনা করি তখন ময়লা-ফেলার জায়গাগুলিকে যতটা সম্ভব লোকলোচনের অন্তরালে রাখবার ও ফুলবাগানটিকে যতটা সম্ভব লোকচক্ষের সামনে ধরবার ব্যবস্থা করি। তার কারণ এই যে, জীবনের যে-সব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে

মানুষ অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে সমান, মানুষের সহজাত সুরুচির জ্ঞান ব্যবহারিক জগতেও সেই সব প্রয়োজনের ক্ষেত্রগুলিকে অন্য মানুষের চোখে পড়তে দিতে কুণ্ঠিত হয়। সুতরাং শিল্প বা সাহিত্যের উর্দ্ধতর লোকে সেগুলির অবিকল প্রতিরূপ খুব স্পষ্ট ক'রে তুলতে মানুষের কুণ্ঠিত হওয়াই স্বাভাবিক। পূর্ব্বেই বলেচি, সাহিত্য সমাজের একটা অবিকল প্রতিচ্ছবি নহে, তাহা বিভিন্ন শিল্পীর বিভিন্ন আদর্শ অনুযায়ী রচিত সমাজের সুসংযত এবং সুসমঞ্জস রূপমূর্ত্তি। তাই সাহিত্য সমাজকে হুবহু নকল করার চেষ্টায় বার-বার পথভ্রান্ত হয়েচে। এক শ্রেণীর সাহিত্যিক জোরগলায় বলচেন, সাহিত্য সমাজের অবিকল প্রতিরূপ, সমাজে ভালমন্দ যেখানে যা যেমন ঘটচে সাহিত্যেও ঠিক তেমনিই তার প্রতিচ্ছবি না থাকলে সাহিত্য একদেশদর্শী হয়ে ওঠে, তার সৌন্দর্য্যের ত্রুটি এবং বিস্তারে বাধা থেকে যায়। এক্ষেত্রে বলবার কথা এই যে, আদিযুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশের সাহিত্যিকই নিজ নিজ দেশের সাহিত্যে সমাজের ভালমন্দ দুটো দিকের ছবিই দেখিয়েচেন, তবে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই অবশ্য শেষপর্য্যন্ত ভালটাকে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত ক'রে গেছেন। ভারতীয় সাহিত্যের আদিকবি বাল্মীকি উচ্ছৃঙ্খলতার যে-চিত্র রাবণের ভিতর দিয়ে দেখিয়েচেন, তা কোন দেশের কোনও বাস্তব উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের চাইতে উচ্ছৃঙ্খলতায় বিশেষ কম যায় না। কিন্তু রামায়ণ পড়ে বাল্মীকির রাবণ-চরিত্র জীবনে অনুকরণ করতে বোধ হয় কেহই ইচ্ছুক হয় না, কারণ শিল্পীর রচনা-কৌশলে রামায়ণে কল্যাণের রূপ অকল্যাণের রূপকে পরাভূত ক'রে ফুটে উঠেছে।

আর একটা কথা, সমাজের হুবহু নকল সাহিত্যে অঙ্কন করবার শক্তিই বা ক-জন সাহিত্যিকের থাকতে পারে বা আছে। সমস্ত সমাজের সর্ব্বাঙ্গে একই সময়ে চোখ রেখে সাহিত্যসৃষ্টি করাই কি সহজ কথা! অল্পজ্ঞ অক্ষম শিল্পীরা অন্ধদের হস্তিদর্শনের মত সমাজের বিভিন্ন অঙ্গের রূপ দেখে অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে সমস্ত দেহটার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ না জেনে (অন্ধরা যেমন তর্ক তুলেছিল হস্তি দড়ির মত, না থামের মত, না কুলার মত, তেমনই) একই সমাজের বাস্তব চিত্র আঁকতে গিয়ে কেহ তাকে নীরস নীতিকথার সাহিত্য, আবার কেহ বা তাকে বস্তি-সাহিত্য ক'রে তোলেন। দক্ষ শিল্পী চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির মত এককালে সমাজের সর্ব্বাঙ্গ দেখতে পান এবং সেই জন্যই তাঁর হাত দিয়ে সমাজের যে-রূপ সাহিত্যে ফুটে ওঠে তার মধ্যে রাম রাবণ সীতা সূর্পনখা সকলেরই স্থান আছে। অধিকন্তু সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য কবির সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও কল্যাণবুদ্ধির স্পর্শ আছে। এইখানেই বড় সাহিত্যিকের ও ছোট সাহিত্যিকের রচনার প্রভেদ।

এর পর সাহিত্যসাধনার পথ সম্বন্ধে দু-এক কথা ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করব। রবীন্দ্রনাথ এই পথের নির্দ্দেশ দিতে গিয়ে শিল্প-সাধনার অন্তরের কথা বলেছেন, 'দেখ, দেখ, দেখ"—প্রকৃতি ও সমাজকে সত্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করা সাহিত্যিকের প্রথম প্রয়োজন, তার বর্ণশিক্ষা ও ব্যাকরণ-জ্ঞান না-থাকলে সে যেমন বাহিরের দিক দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করতে কোন দিনই সক্ষম হবে না, তেমনই অন্তরের দিক দিয়ে যে নিজে দেখেনি সে পরকে দেখাতে কোন দিনই সক্ষম হবে না। এক্ষেত্রে আরও একটা কথা জানবার আছে, আমরা যে কেবল বর্ত্তমানকে দেখব তা নয়, আমরা অতীত ও বর্ত্তমানকে এককালে দেখবার সাধনা করব। অতীতের সাহিত্যস্রষ্টারা যা রেখে গেছেন তা আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি, আমাদের যাত্রাপথের অবশ্যপ্রয়োজনীয় পাথেয়—তা যেন আমরা ভুলে না যাই। এ-কথা যেন মুহূর্ত্তের জন্যও না ভুলি যে মানুষের শিক্ষা ও সভ্যতা সম্ভব হয়েচে মানুষ জন্মমাত্র তার পূর্ব্বপুরুষদের যুগযুগ-সঞ্চিত জ্ঞান অতীতের উত্তরাধিকার-স্বরূপ পেয়েচে ব'লে। নূতনত্বের মোহে আমরা তুচ্ছ জিনিষটাকে নিয়ে মাতামাতি করতে গিয়ে বড় জিনিষটাকে ভুলে যাই, কবির ভাষায় মাথাটা সহজাত ব'লে তার মূল্য বুঝি না, পাগড়ীটা সংগৃহীত ব'লে এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব'লে তাকে সম্মান দিই। কিন্তু চিরদিন ঘরে বসে পৈত্রিক সম্পত্তি খরচ করলে যেমন দৈন্য আসে এবং বিনাশ আসে, তেমনই চিরদিন পূর্ব্বতন লেখকদের ভাব ও ভাষার চর্ব্বিতচর্ব্বণ করলেও সাহিত্যের দৈন্য ও অধঃপতন অনিবার্য্য। পৈত্রিক সম্পত্তিকে কারবারে খাটাতে হবে, বর্ত্তমানের সঙ্গে অতীতের যোগসাধন করতে হবে। এই নিজের উপার্জ্জন প্রকৃতিকে এবং সমাজকে ভালবেসে নিজের চোখে দেখে তার কাছ থেকে রূপ রসের

দৈনন্দিন সংগ্রহ। এই সংগ্রহের অভাবে রাজার ঐশ্বর্য্যও ফুরিয়ে যায়, অতীতের সাহিত্যিক মহিমা বর্ত্তমানের সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে কোনমতেই সক্ষম হয় না। সাহিত্যের বাইরের দিকটার কথা বলতে গিয়ে বর্ত্তমান যুগের কোন বিখ্যাত শিল্পাচার্য্যের শিল্প সম্বন্ধে ব্যবহৃত একটি উপমা দিব। অন্যতম সুকুমার শিল্পহিসাবে সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁহার কথাটি খাটে। "সাহিত্য একটি সাত ঘোড়ার রথ, রথী যদি দক্ষ সারথির হাতে রাশ দিতে পারেন, তবে ঘোড়াগুলি পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে নির্দ্দিষ্ট পথে রথকে নিয়ে যায়।" সুসমঞ্জস পরিকল্পনা, ভাবের ঐশ্বর্য্য, রচনার সৌষ্ঠব, শব্দ-নির্ব্বাচনে সুষমার জ্ঞান, ব্যাকরণবোধ, উপযুক্ত স্থানে চলবার এবং থামবার মাত্রাজ্ঞান এবং সমস্ত রচনাকে উজ্জীবিত করবার উপযোগী রসবোধ এই ধরণের সাতটি ঘোড়া যে-সাহিত্যিক সংযম-রশ্মির দ্বারা আয়ত্তের মধ্যে রেখে চালাতে পারেন, তিনিই উঁচুদরের সাহিত্যস্রষ্টা। না হ'লে অক্ষম সারথির হাতে পড়ে বিদ্রোহী ঘোড়াগুলি যেমন রথটাকে শেষে খানায় ফেলে বা বিপথে নিয়ে যায়, তেমনই অক্ষম সাহিত্যিকের হাতে ও রচনার মধ্যে পরিকল্পনায় অসামঞ্জস্যের সঙ্গে ভাষার ঐশ্বর্য্য, ব্যাকরণজ্ঞানের আধিক্যের সঙ্গে রসবোধের অভাব, ভাবের গভীরতার সঙ্গে ভাষার দৈন্য অনবরত বিরোধ করতে থাকে এবং শেষপর্য্যন্ত কুসাহিত্য সৃষ্টি হয়। সাহিত্যরথীর লক্ষ্য হবে এই সাত ঘোড়ার রথকে সমাজের প্রতি কল্যাণবুদ্ধি রূপ দক্ষ সারথির দ্বারা চালনা করানো। প্রত্যেক সৎসাহিত্যস্রষ্টার ভিতরের এবং বাহিরের দিক দিয়ে ইহাই সাধনার আদর্শ। এই আদর্শ ঠিক থাকলে সাহিত্যিকের ক্ষমতা অনুযায়ী সাহিত্যে ত্রুটি-বিচ্যুতির আধিক্য বা অল্পতা থাকলেও এবং সাহিত্য সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'তে না পারলেও তাহা সুসাহিত্য হবে এবং পথভ্রষ্ট না হওয়ায় তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা করবার কারণ থাকবে।

আফ্রিকার নিগ্রো শিল্প

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[১]

একটী ব্যক্তিগত কথা দিয়া প্রসঙ্গ আরম্ভ করিতেছি। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৯শে তারিখে বিলাতে পদার্পণ করি, জাহাজ হইতে নামিয়া ঐ দিন লণ্ডনে পঁহুছি। ২রা অক্টোবর প্রথম ব্রিটিশ-মিউজিয়ম দেখিতে যাই, সেদিন কিন্তু ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। তারপরে দুই একবার মিউজিয়মে গিয়াছিলাম—মিউজিয়মে রক্ষিত কতকগুলি বিশ্ব-বিশ্রুত শিল্প-দ্রব্য দেখিয়া আসি—যেমন, Elgin Marbles নামে সুপরিচিত আথেন্স-নগরীর পার্থেনন্ মন্দিরের খোদিত চিত্র ও মূর্ত্তির সংগ্রহ; আমাদের ভারতবর্ষের অমরাবতীর ভাস্কর্য্য; প্রাচীন মিসর ও আসিরিয়ার ভাস্কর্য্য; ইত্যাদি। তার পরে ১৪ই তারিখে আবার ব্রিটিশ-মিউজিয়মে যাই; ঐ দিনটী আমার কাছে একটী স্মরণীয় দিন বলিয়া মনে হয়। ইউরোপে অবস্থানকালে কতকগুলি বিভিন্ন দেশ ও কালের শিল্প সম্বন্ধে, কেবল বার-বার দেখার ফলেই, আমার মন সচেত হইয়া উঠে; আগে যে জিনিসের কথা জানিতাম না, আমার নিকট যাহার কোনও মূল্য ছিল না, কেবল ভূয়োভূয় দর্শনের ফলে সেই সব জিনিস আমার কাছে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—মানবের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির বিচিত্রতা ও দেশ-কাল-পাত্র বশে এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অবশ্যম্ভাবিতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই সব জিনিসের মধ্যে উল্লেখ করিতে পারা যায়—গ্রীসের সুপ্রাচীন হেল্লেনীয় যুগের ভাস্কর্য্য ও ঘট-চিত্র; বিজান্তীনীয় ভাস্কর্য্য ও mosaic অর্থাৎ রঙীন কাচের টুকরা সাজাইয়া তৈয়ারী ভিত্তি-চিত্র; "গথিক" ভাস্কর্য্য; ইতালীর প্রাগ-রাফাএল যুগের চিত্রকলা; প্রাচীন চীনা ভাস্কর্য্য; ইত্যাদি। ১৪ই অক্টোবর ব্রিটিশ-মিউজিয়মের Ethnological Gallery

অর্থাৎ আদিম-সংস্কৃতিতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় কক্ষগুলিতে ঘুরিতে ঘুরিতে, বড় বড় কাচের আলমারীর মধ্যে রক্ষিত নানা বর্ব্বর ও অর্দ্ধ-বর্ব্বর জাতির আদিম উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা ও তাহাদের অশিক্ষিত-পটু হস্ত হইতে উদ্ভূত অদ্ভুত ও কিম্ভূতকিমাকার বস্তু দেখিতে

১০। পক্ষী-শিকার
বেনিন্—ব্রঞ্জে ঢালা পাটা

দেখিতে, পশ্চিম-আফ্রিকা হইতে আনীত নিগ্রো-সংস্কৃতি জাত দ্রব্য-সম্ভারের মধ্যে, হঠাৎ একটী ধাতুতে-ঢালা নিগ্রো মেয়ের মুখ দেখিয়া থমকিয় দাঁড়াইলাম। (চিত্র [১] ও [২])।

মুখখানা প্রতিমার মুখের ধাঁজে, নৃমুণ্ডের মত চারিদিকে ঢালা, চিত্রাকার নহে। আদিয়ে স্বাভাবিক মানুষের মাথার মত হইবে। শিল্পী পুরাপুরি স্বাভাবিক অনুকৃতি করে নাই, বা করিতে পারে নাই,—কতকটা অপ্রাকৃতিক বা অতিপ্রাকৃতিক ভঙ্গি মুখটীতে আসিয়া গিয়াছে, কান দুইটা যে ভাবে গঠিত হইয়াছে তাহা হইতে উহা স্পষ্ট বুঝা যায়। মাথায় একটা চূড়াকৃতি শিরস্ত্রাণ পরিহিত—খুব সম্ভব সেটা বেতের তৈয়ারী অথবা প্রবাল-নির্ম্মিত টুপী; গলায়

২। বেনিন্ হইতে আনীত ব্রঞ্জে ঢালা কন্যার মুখ [বেলিন, আদিম-সংস্কৃতি-তত্ত্ব সম্পর্কীয় সংগ্রহ-শালা]

প্রবালের কণ্ঠী। কণ্ঠেই মুণ্ডটীর পরিসমাপ্তি। আজকালকার শিল্পীদের পাকা হাতের তুলনায়, এই রূপ-কর্ম্মটীতে একটু ভাবুকতার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এই অশিক্ষিত-পটুত্বকে, মূর্ত্তিটীর গঠনের ভঙ্গিতে, প্রকৃতিকে যোল আনা রকম অনুকরণের অভাবকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে—ইহাদের সম্পূর্ণতা দিয়া মূর্ত্তিটীকে শ্রেষ্ঠ শিল্পের আসনে উন্নীত করিয়াছে,—সার্থকভাবে ও সরলভাবে মূর্ত্তিটীতে

নিগ্রোর জাতিগত বৈশিষ্ট্যটুকুকে শিল্পি-কর্তৃক ফুটাইয়া তুলা। ইহাতে শিল্পীর সত্যদর্শন এবং সত্য বস্তুর প্রদর্শন উভয়ই প্রমাণিত হয়। তদতিরিক্ত, শিল্পী যে প্রকারে একটী ঈষদ্-বিষাদ-মণ্ডিত ভাব মুখমণ্ডলে আনিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভাবুকতা এবং ভাবপ্রকাশে ক্ষমতা দেখা যায়—তিনি মুখ-

১। বেনিন্ হইতে আনীত ব্রঞ্জে ঢালা
নিগ্রো কন্যার মুখ
(ব্রিটিশ-মিউজিয়ম)

খানিতে এমন একটা কিছু আনিয়া দিয়াছেন, যাহার দ্বারা আমাদের আদর্শ-মতে মুখটী সুন্দর না হইলেও ইহাতে একটা আকর্ষণী শক্তি আসিয়া গিয়াছে।

এই ধাতু-মুণ্ডটী দেখিয়াই চমকিত হইলাম—এ জিনিস পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে কি করিয়া আসিল? বিবরণী হইতে জানিলাম, ইহা "বেনিন্ হইতে আনীত ব্রঞ্জ-ধাতুতে প্রস্তুত তরুণীর
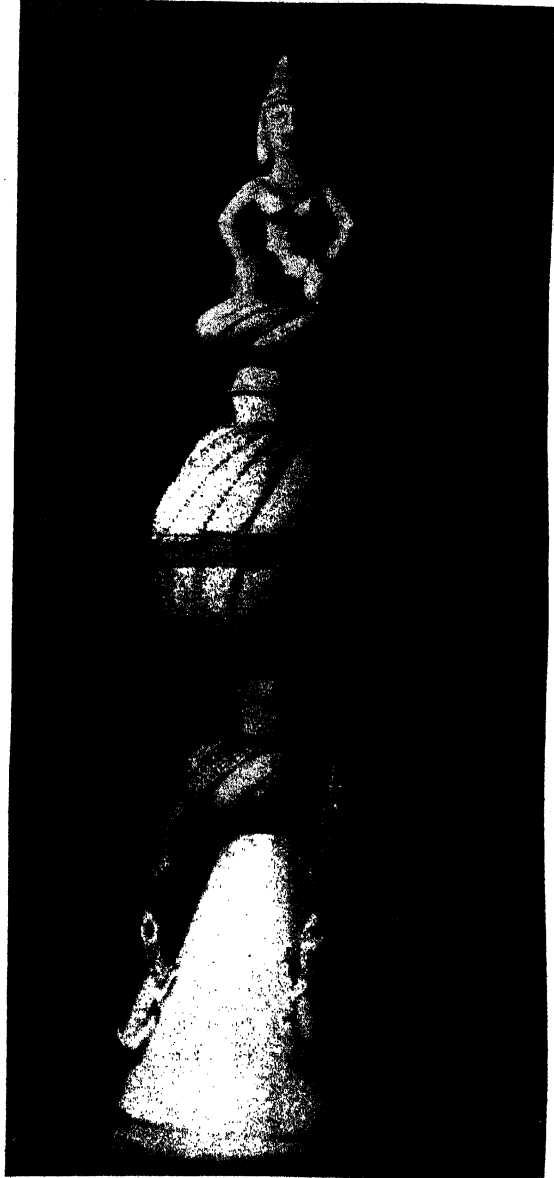
১৩। বেনিন্—হাতীর দাঁতের কৌটা।
উপরে কন্যা-মূর্ত্তি, নীচে সর্প ও শ্বাপদ

মুণ্ড।" আশে-পাশে আরও দুই তিনটী অনুরূপ মুণ্ড ও অন্য মূর্ত্তি আছে। বেনিন্ কোথায়, তাহা তখন জানিতাম না— পশ্চিম-আফ্রিকার কোথাও, এইটুকু মাত্র মিউজিয়মের লেবেল হইতেই বুঝিলাম। অন্য আলমারীতে দেখিলাম, এই বেনিন্ হইতে আনীত অন্য বহু শিল্প-দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। ঢালাই-করা ব্রঞ্জের পাটা বা ফলকের গায়ে নানা bas-relief বা নীচু করিয়া গড়া চিত্র—নিগ্রো যোদ্ধা, অনুচর-পরিবৃত নিগ্রো রাজা, ঘোড়সওয়ার, কন্যা, এবং কুমীর ও মাছ প্রভৃতি জন্তু; বড় বড় অখণ্ড হাতীর দাঁত, তাহার গায়ে নক্সায় কাটা নানা যোদ্ধার ছবি, শিকারীর ছবি খোদাই করা; ছোট ছোট হাতীর দাঁতের পুতুল; ব্রঞ্জের ঢালাই করা মুণ্ডের আকারে বড় বড় অলঙ্কারময় পায়া, সেগুলির উপরে খোদাই-করা অখণ্ড হাতীর দাঁত খাড়া করিয়া রাখা হইত; কাঠে খোদাই মূর্ত্তি; মোড়ার মত কাঠে তৈয়ারী খোদাই করা বসিবার আসন।

এই শিল্প-সম্ভার দেখিয়া, আফ্রিকার—বিশেষতঃ পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রোদের সম্বন্ধে আমার চোখ যেন খুলিয়া গেল আফ্রিকার অন্য অঞ্চলের শিল্পেরও নিদর্শন কিছু কিছু দেখিলাম—সব চেয়ে ভাল লাগিল কতকগুলি কাঠের মূর্ত্তি।

৭। অশ্বপৃষ্ঠে বেনিন্-রাজ

৮। বেনিন্ যোদ্ধা

বেনিন্ শিল্প—ব্রঞ্জে ঢালা পাটা

৪। নিগ্রো মেয়ে—আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্র

ব্রিটিশ-মিউজিয়মের দোতালায় Ethnological Gallery, একতালায় ব্রিটিশ-মিউজিয়ম গ্রন্থশালার পাঠাগার। নীচে পাঠাগারে আসিয়া, প্রথমেই মিউজিয়মের পুস্তক-প্রকাশ বিভাগ হইতে প্রকাশিত বেনিন্ হইতে আনীত সংগ্রহের বিবরণ গ্রন্থখানি আনাইয়া লইয়া পড়িতে লাগিলাম। পরে ক্রমে ক্রমে এ-বই ও-বই ঘাঁটিয়া আফ্রিকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে, বিশেষতঃ নিগ্রোদের একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া গেল।

এই ভাবে ভাস্কর্য্য-শিল্পের—রূপ-কর্ম্মের—মারফৎ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত হইল, আফ্রিকার কালো-মানুষদের সম্বন্ধে মনে মনে একটা আকর্ষণ, একটা অনুকম্পা, এমন কি একটা প্রীতির ভাবও অনুভব করিতে লাগিলাম। "বসুধৈব কুটুম্বকম্"—শিল্পের প্রসাদে এই ভাব জাগরিত হইয়া, আফ্রিকার কালো-মানুষদের সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসু করিয়া দিল; ইহা একটা খুব বড় লাভ বলিয়াই আমি মনে করি।

যে দুই বৎসর লণ্ডনে কাটাই, তাহার মধ্যে চার মাস বাদে বাকী সমস্ত সময় ৩২ নং বেডফোর্ড প্লেস্-এ, ব্রিটিশ-

মিউজিয়মের খুব কাছে, এক ওয়াই-এম-সী-এ ছাত্রাবাসে বাস করি। এই ছাত্রাবাসটীতে পঞ্চাশ জন ছেলে ছিল, তাহাদের মধ্যে আমি আর পরে একটী তামিল ছেলে, মাত্র আমরা দুই জন ভারতীয় ছিলাম ; বাকী আটচল্লিশ জনের মধ্যে তিরিশ জন ব্রিটিশ, অর্থাৎ ইংরেজ, স্কচ্, ওয়েল্‌শ্, আইরীশ্ ছিল, এবং আঠার জন ছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ছেলে। এই ছাত্রাবাসটী বেশ আন্তর্জাতিক স্থান হইয়া

১৫। ফরাসী শিল্পী এভারিস্ত-দ্য শেয়ার রচিত নিগ্রো যুবকের মুখ—ব্রঞ্জে ঢালা কাঠের বেদীর উপর

উঠিয়াছিল। কাছেই গিল্‌ড্‌ফোর্ড স্ট্রীট্-এ অনুরূপ আর একটী ওয়াই-এম-সী-এ ছাত্রাবাস ছিল—সেখানে দুই এক জন নিগ্রো ছাত্র বাস করিত। এইরূপ একটী নিগ্রো ছাত্রের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আমাদের বেডফোর্ড প্লেস্-এর ছাত্রাবাস, আর গিল্‌ড্‌ফোর্ড স্ট্রীট-এর ছাত্রাবাস, উভয় স্থান হইতে জন ছয় মিলিয়া ১৯২০ সালের গ্রীষ্মকালে আমরা একবার লণ্ডনের বাহিরে সারা দিনের জন্য পল্লীভ্রমণে গিয়াছিলাম। ছয় জনের মধ্যে তিন জন ইংরেজ, এক জন সুইস, এক জন নিগ্রো, এবং আমি ভারতবাসী। নিগ্রো শিল্পের বিষয়ে ও নিগ্রোদের সংস্কৃতি বিষয়ে জানিবার-শুনিবার ও পড়া-শুনা করিবার ঝোঁক হইয়াছে,—সুতরাং এই নিগ্রোটীর সঙ্গে পরিচিত হওয়াতে আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। কিন্তু দুই চারিটী বিষয় ছাড়া

১২। বেনিন—হাতীর দাঁতের কৌটা
(ঢাকনীর মাথায় ইউরোপীয় জাহাজ, পায়ায় ইউরোপীয় সিপাহী)

ইহার নিকট হইতে ইহাদের জাতির ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু খবর পাইলাম না।

ছেলেটীর বাড়ী পশ্চিম-আফ্রিকার Nigeria নাই-

গিরিয়া দেশের বন্দর ও অন্যতম প্রধান নগর Lagos লেগস্-এ। জাতি ও ভাষায় Yoruba য়োরুবা-জাতীয় নিগ্রো। লেগস্-এর পূর্ব্বে, সমুদ্রতীর হইতে একটু অভ্যন্তরে, বেনিন্-নগরী। বেনিন্-এর লোকেদের Bini বিনি বলে, ইহারা

৫। পূর্ব্ব-আফ্রিকার কিকুয়ু-জাতীয়া কন্যা
ইংরেজ শিল্পী শ্রীমতী ডোরা ক্লার্ক রচিত ব্রঞ্জ মুখ

য়োরুবা হইতে পৃথক্ ভাষা বলে, তবে ইহারা ও য়োরুবারা অনেকটা একই জাতির শাখা। এই কথা শুনিয়া ইহার নিকট হইতে ইহার স্বজাতীয় লোকেদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। আমার নিগ্রো বন্ধুটীর নামটী ছিল N. A. Fadipe—এন্, এ—এই দুইটী অক্ষর কোন্ কোন্ নামের আদ্য অক্ষর তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, তবে যতদূর মনে হইতেছে, এ দুইটী ইউরোপীয় বা খ্রীষ্টান নাম। Fadipe ফাডিপে ধর্ম্মে খ্রীষ্টান, তাই সে বড়-একটা নিজের জাতির পূর্ব্ব-কথা সম্বন্ধে খোঁজ রাখিত না। য়োরুবারা সংখ্যায় কত, বেনিন্-এর লোকেদের সঙ্গে তাহাদের পার্থক্যই বা কোথা, সে সব কথা কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার নাম "ফাডিপে" শব্দের অর্থ কি তাহা জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল যে এই নামটী একটী heathen বা তাহাদের আদিম ধর্ম্মের অনুমোদিত নাম—Ife ইফে বা Ifa ইফা নামে তাহাদের এক দেবতা আছে, সেই দেবতার প্রতি সম্মান-জ্ঞাপক এই নাম—ইহার অর্থ "ইফে বা ইফার দান।" সে আমাকে আরও জানাইল, যে য়োরুবা জাতির মধ্যে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এখন মুসলমান, তিন ভাগের এক ভাগ

১৪। য়োরুবা-দেশ—ইফে নগরীতে প্রাপ্ত মৃন্ময় মুখ

খ্রীষ্টান এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ heathen বা আদিম-ধর্ম্মাবলম্বী। এই ধর্ম্মের দেবতাদের জন্য বিভিন্ন গ্রামে রীতিমত ঠাকুর-ঘর আছে, পুরোহিত আছে, পূজা হয়। ইংরেজী-শিক্ষিত হইয়াও অনেকে পৈত্রিক ধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই।

ইহার অধিক ফাডিপের কাছে জানিতে পারি নাই। ইফে দেবতা কে, তাঁহার শক্তি কি, সে বিষয়ে ফাডিপে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিল না। পরে John Wyndham সঙ্কলিত Myths of Ife (প্রকাশক Erskine Macdonald Ltd., London, 1921) নামক বই হইতে য়োরুবাদের দেবতাবাদ সম্বন্ধে কিছু খবর পাই, এবং এই বিষয়ে অন্য বই দেখিবারও সুযোগ হয়। ফাডিপের বয়স কম, তাহার উপর মিশ-কালো চেহারার নিগ্রো বলিয়া, একটু কিন্তু-কিন্তু করিয়া তাহাকে চলিতে হইত—আমায় অতি করুণ ভাবে সে বলিয়াছিল,

"আপনারা সভ্য জাতি, গায়ের রঙও আপনাদের ফর্সা, আমাদের অসুবিধা ও অপমান আপনারা বুঝিবেন না।"

ইহার পরে আর একজন য়োরুবা ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়, তাঁহার নিকট হইতে য়োরুবা এবং পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রোদের সংস্কৃতি ও মনোভাব, সামাজিক রীতিনীতি ও রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক খবর পাই। তাহাতে এই জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আমার আরও অনেক গুণ বাড়িয়া যায়। সে প্রসঙ্গ পরে করা যাইতে পারে।

মোটের উপরে, ব্রিটিশ-মিউজিয়মে বেনিন্ এর শিল্প-দ্রব্য দেখার পরে, এবং এই দুই জন য়োরুবা ও পরে এক জন জুলু জাতীয় আফ্রিকানের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পরে, নিগ্রো জাতির সম্বন্ধে যে কৌতূহলের উদ্রেক হয়, তাহার ফলে পৃথিবীর এক বিশাল ভূভাগ যে জাতিদ্বারা অধ্যুষিত, নানা বিষয়ে যে জাতির স্বাতন্ত্র্য আছে, সেই নিগ্রো জাতিকে

৬। বেনিন্—নিগ্রো যুবকের মুখ
ব্রঞ্জে ঢালা

বুঝিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহাদের শিল্প ও অন্য কৃতিত্বের জন্য তাহাদের প্রাপ্য মর্য্যাদা দিয়া, মনে মনে আমি বিশেষ আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছি।

[২]

আফ্রিকার নিগ্রো শিল্প আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকার রূপ-রসিকগণের নিকটে একটা craze—যেন একটা পাগল-করা বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপ ও

৩। লোআঙ্গো হইতে আনীত—কাঠের মূর্ত্তির অংশ

আমেরিকার অনেক কৃতী শিল্পী ও শিল্প-রসিক, যাঁহারা প্রাচীন মিসরী, গ্রীক, রোমান, গথিক, রেনেসাঁস প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের এবং যুগের শ্রেষ্ঠ রূপ-রচনার গুণাগুণের সহিত নখ-দর্পণবৎ পরিচিত, হালের ইউরোপীয় শিল্পে যাহা তাঁহারা পাইতেছেন না এমন একটা উপভোগ্য রস তাঁহারা নিগ্রো শিল্পে পাইতেছেন। ইউরোপের আধুনিক শিল্প, মুখ্যতঃ গ্রীক ও রেনেসাঁস-যুগে পুনরুজ্জীবিত গ্রীক শিল্পের আধারের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সব বিষয়ে ইউরোপে উন্নতি হইতেছে, কিন্তু সেদিন পর্য্যন্ত ইউরোপ শিল্প-বিষয়ে গ্রীক

রোমান ও ইতালিয়ান, বড় জোর বিজান্তীনীয় ও গথিক যুগের কথাকে চরম কথা বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল; গ্রীক-রোমান-ইতালিয়ান চোখ ছাড়া অন্য চোখেও যে রূপময় জগৎকে দেখা যায়, অন্য হাতেও যে তুলি টানা যায় বা ছেনী দিয়া কাটা

১১। ষোড়শ শতকের পোষাকে ইউরোপীয় যোদ্ধা
ব্রঞ্জ পাটা—বেনিন

যায়, সে ধারণা ইউরোপের ছিল না। অথচ শিল্প-বিষয়ে ক্রমিক গ্রীক-রোমান-রেনেসাঁস যুগের পিষ্ট-পেষণ ও অন্ধ অনুকরণের ফলে, ভিতরে ভিতরে ইউরোপের আত্মা গুমরিয়া মরিতেছিল। উনবিংশ-শতকের মধ্য-ভাগ হইতেই গ্রীক-রেনেসাঁস শিল্প-ধারার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রতিক্রিয়া আসিতে আরম্ভ করিল—ফ্রান্স-দেশে। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াও গ্রীক রেনেসাঁস শিল্পের জাতি বাঁচাইয়াই হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ইউরোপের বাহিরের জগতের শিল্পের খবর ইউরোপের কাছে পঁহুছিল—উনবিংশ শতকের শেষ পাদের মাঝামাঝি জাপানী শিল্পের সৌন্দর্য্য ইউরোপের শিল্প-রসিকদের মোহিত করিয়া দিল, এবং পরে চীনা ও মুসলমান শিল্পের (ও কিছু পরে চীনা সাহিত্যের) বাণীও ইউরোপের চোখে (ও কানে) পঁহুছিল; এবং বিংশ-শতকের প্রথম দশক হইতেই ভারতের তথা বৃহত্তর-ভারতের শিল্পের সার্থকতা ও সৌন্দর্য্য, ইহার গভীরতা ও অন্তর্মুখিতা ইউরোপকে আকৃষ্ট করিল।

এই-সব শিল্প-জগৎ কিন্তু সুসভ্য মানবের শিল্প-জগৎ। এই সব জগতের শিল্পের পিছনে শত শত বর্ষের চিন্তা ও সাধনা এবং চর্য্যা ও পটুতা আছে। এগুলি আসিয়া ইউরোপের চিত্তকে মথিত করিল বটে, কিন্তু তাহাকে মূলোৎখাত করিল না—কারণ এইসকল শিল্প-জগতের সহিত ইউরোপের বিভিন্ন শিল্প-ধারার একটা স্বাজাত্য, একটা সাধর্ম্ম আছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের চীনা বুদ্ধমূর্ত্তি, গথিক যুগের ইউরোপীয় খ্রীষ্টান দেবমূর্ত্তিকে স্মরণ করাইয়া দেয়; মহাবলিপুরের ভাস্কর্য্যের সুদৃঢ় ও শক্তিব্যঞ্জক সৌন্দর্য্য দেখিয়া মিসর ও গ্রীসের শ্রেষ্ঠ শিল্পের কথা মনে আসে; অজন্টার ছবি ও প্রাচীন ইতালিয়ান ভিত্তি-চিত্র—উভয়কে মিলাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়।

ব্যর্থ অনুকরণ ও গতানুগতিকতায় যাঁহারা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন এমন বহু ইউরোপীয় শিল্পী, বাহিরের

৯। তিন কন্যা
ব্রঞ্জ পাটা—বেনিন

শিল্পের চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের অধুনাতন মৃতপ্রায় গ্রীক-রেনেসাঁস শিল্প-ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। প্রাচীন মনোভাব এবং প্রাচীন পদ্ধতিকে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া, গোড়া হইতে নূতন ভাবে শিল্প-গঠনের প্রয়াস করিলেন।

ইহারই ফলে আধুনিক শিল্পে Futurism, Cubism প্রভৃতি নূতন তন্ত্রের ও ধারার প্রবর্ত্তন। এই ভাঙ্গনের ও নূতন সৃজনের কার্য্যে তাঁহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহস ও অনুপ্রাণনা পাইলেন, আফ্রিকার নিগ্রোদের (তথা ওশেনিয়ার দ্বীপপুঞ্জের এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের) মৌলিক ও আদিম শিল্প হইতে;-বিশেষ করিয়া আফ্রিকার ভাস্কর্য্য শিল্প হইতে—মধ্য আফ্রিকার ও পশ্চিম-আফ্রিকার কাঠের মূর্ত্তি ও মুখস হইতে এবং পশ্চিম-আফ্রিকার ধাতুমূর্ত্তি ও অন্য শিল্প হইতে।

এই শিল্পে যে জগতের বাণী ইউরোপের কাছে আসিল, যে ভাব-ধারার সন্ধান ইউরোপ পাইল, তাহা একেবারে নূতন, এবং প্রচলিত সমস্ত শিল্প-সংস্কারের মূলোচ্ছেদকারী। কতক-গুলি মৌলিক বিষয়ে এই শিল্প-জগতের সহিত ইউরোপীয় শিল্প-জগতের এবং ইউরোপ কর্ত্তৃক নবাবিষ্কৃত এশিয়ার সুসভ্য জাতিগণের শিল্প-জগতের সাদৃশ্য নাই। তীব্র আঘাতে এই শিল্প ইউরোপের শ্রান্ত ও নিদ্রাতুর শিল্প-চেতনাকে যেন উজ্জীবিত করিতে চাহিতেছে। এই নবীন সঙ্ঘাতের ফলে, আধুনিক ইউরোপীয় তথা সার্ব্বভৌম শিল্প কোন্ পথে চলিবে, কি ভাবে প্রভাবান্বিত হইবে, তাহার বিচার করার সময় এখনও আসে নাই।

নিগ্রো শিল্প হইতে ইউরোপ একটা কিছু পাইয়াছে, নিশ্চয়ই; তাহা না হইলে, ইহার এতটা আলোচনা হইত না, নিগ্রো শিল্পের চিত্র ও ইহার পরিচয় লইয়া এত বই প্রকাশিত হইত না। এই সব বইয়ের উদ্দেশ্য মাত্র ethnological বা আদিম-সংস্কৃতি-তত্ত্ব লইয়া নহে—ইহাদের উদ্দেশ্য, সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব বিষয়ক। এখন, নিগ্রো শিল্পে ইউরোপ কি পাইয়াছে, বা ইহা হইতে কি পাইবার প্রয়াস করিতেছে—ইহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

এই শিল্পে ইউরোপ পাইয়াছে, সভ্যতার সহস্র কৃত্রিমতা হইতে মুক্ত আদিম মনের পরিচয়। আধুনিক ইউরোপ সংস্কারের দাস;—বিশেষ করিয়া আধুনিক ইউরোপীয় শিল্প। একটা বিশেষ ধর্ম্ম-বিশ্বাস লইয়া নিগ্রো প্রতিমা-নির্ম্মাতা অপটু হস্তে তাহার মনের মধ্যে নিহিত আদর্শ বা ভাবকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিল। শিক্ষা বা পরম্পরাগত রীতির স্থান এখানে নাই; মানসনেত্রে দেখা কল্পনা, এবং কতকটা নিয়ন্ত্রিত ও কতকটা অনিয়ন্ত্রিত হাতের গতি—এই দুইয়ে মিলিয়া রূপ-সৃষ্টি করিল। কোন কোন স্থলে এই দুইয়ে ঠিক তাল রাখিয়া চলিতে পারে নাই; যেখানে পারিয়াছে, সেখানেই যথার্থ শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। পারুক আর নাই পারুক, মোট কথা, এই শিল্প রচনার প্রথম বৈশিষ্ট্য হইতেছে, সারল্য ও নিষ্কপটতা। এখানে চটক দেখাইবার প্রয়াস মোটেই নাই, অথবা যাহার প্রতি সত্যকার দরদ নাই তাহাকে রূপ দিয়া তাহার প্রতি দরদ দেখাইবার ভাণ নাই। এই নিষ্কপটতা-গুণই বোধ হয় আধুনিক ইউরোপের শিল্পে বিশেষ ভাবে অপেক্ষিত; এবং সেই জন্যই এই আদিম ও শিশুচিত নিষ্কপটতা ইহার একটী প্রধান আকর্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই শিল্পে ইউরোপ যে plastic quality বা রূপ দ্যোতনার ভঙ্গি পাইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ-রূপে নূতন,—ইউরোপের শিল্প-চেতনায় তাহা অপূর্ব্ব। নিগ্রো শিল্প মুখ্যতঃ মূর্ত্তির শিল্প, ইহা চিত্রের শিল্প নহে। ছুতার ও কুমার, কামার ও কাঁসারী,—ইহারাই হইল ইহার শিল্পী, পটুয়ার স্থান ইহাতে নাই। নিগ্রো শিল্প-রীতিতে রচিত মূর্ত্তির পরিকল্পনার এবং গঠনের আধার বা প্রাণ হইতেছে—ইহার নিরেট বর্ত্তুলতা। ইউরোপীয় ভাস্কর্য্য-মতে রচিত মূর্ত্তির পরিকল্পনার আধার এই যে, ইহাকে সামনে হইতে চিত্রবৎ দেখিতে হইবে। এইরূপ একটা উদ্দেশ্য সুসভ্য জাতিগণের মধ্যে সৃষ্ট মূর্ত্তি-শিল্পে যেন অন্তর্নিহিত আছে-ভাস্কর্য্য সমতল ক্ষেত্রের পটভূমিকার সমক্ষে চিত্রবৎ দণ্ডায়মান। সুসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে ভাস্কর্য্য যে ভাবে সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়, তাহার জন্যই এই প্রকার চিত্রণ-রীতিই হইয়াছিল ভাস্কর্য্যের আদিম আধার বা প্রেরণা। দেবমূর্ত্তিকে মন্দিরের দেওয়ালের দিকে পিছন করিয়া রাখা হইত—দেওয়াল যেন back-ground বা পটভূমিকা, মূর্ত্তি চিত্রবৎ স্থাপিত। মিসরীয়, গ্রীক, ভারতীয়, গথিক প্রভৃতি ভাস্কর্য্যে in the round মূর্ত্তি পরে গঠিত হইলেও, এই বিভিন্ন সভ্য দেশের ও কালের ভাস্কর্য্য-রীতির একই মূল প্রেরণা—ভিত্তি-গাত্রে স্থাপিত করিয়া রাখিবার জন্যই মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ। নিগ্রো শিল্প এ বিষয়ে, মূর্ত্তি বা বস্তুর বাস্তব অবস্থান সম্বন্ধে, আরও অনেকটা বেশী সচেতন। সত্যকার মূর্ত্তি বা বস্তু যেমন in the round থাকে, অর্থাৎ ঘুরিয়া চারি দিক হইতে দেখিবার

জন্য যেমন ইহার অবস্থান, নিগ্রো শিল্প তদনুসারে স্পষ্ট দুই-চারিটী রেখা টানিয়া মানুষের ধড়ের বা মুণ্ডের ছবি আঁকা যায়, সেই ছবির মধ্যেই ভাস্কর্য্যের বা প্রতিমা-শিল্পের বীজ উপ্ত থাকে। আবার একটী বড় ফল বা গোলক, গাছের গুঁড়ি অথবা cylinder অর্থাৎ সমবর্তুল বস্তু দ্বারাও মানুষের মুণ্ডের বা দেহের দ্যোতনা হইতে পারে। দ্বিতীয় পদ্ধতি নিগ্রো ভাস্কর্য্যের অন্তর্নিহিত পদ্ধতি। এই solid, in the round অর্থাৎ যাহাকে প্রদক্ষিণ করিতে পারা যায় এমন plastic quality অর্থাৎ রূপ-দ্যোতনার গুণ থাকায়, নিগ্রো ভাস্কর্য্যের জাতি, সভ্য জাতির ভাস্কর্য্যের জাতি হইতে স্বতন্ত্র। ইউরোপীয় শিল্পবিদ্‌গণ এইখানে একটী নূতন জিনিস পাইয়াছেন, এবং ইহাকে আশ্রয় করিয়া, নূতন ভাবে রূপ-সৃষ্টিতে, প্রতিমা-গঠনে লাগিয়া গিয়াছেন।

নিগ্রো ভাস্কর্য্যের তৃতীয় লক্ষণীয় গুণ—ইহার ছন্দোময়ত্ব। মানব-দেহের আদর্শ কল্পনা করিয়া, মানবদেহানুকারী অতিমানব মূর্ত্তি অথবা দেবমূর্ত্তি সৃষ্টি করা যায়; সুসভ্য জাতিগুলির প্রতিমা-ভাস্কর্য্য এই লক্ষণাক্রান্ত। আবার অতিমানব বা দেবতার কল্পনা বর্জ্জন করিয়া, কেবল মানব-দেহের যথাযথ অনুকরণ করিয়াও প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করা যায়; সুসভ্য জাতির ভাস্কর্য্যে এইরূপ realistic বা বাস্তবানুকারী রীতিও সাধারণ। এতদ্ভিন্ন, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লোচন-গ্রাহ্য রূপের উচ্চাবচত্বকে আশ্রয় করিয়া একটা যে ছন্দ আছে, মাত্র সেই ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, সেই ছন্দকেই প্রাধান্য দিয়া, মূর্ত্তি সৃজন করা যায়। নিগ্রো শিল্পে প্রাকৃতিক বস্তুর যথাযথ অনুকরণের চেষ্টাও আছে। তবে মুখ্যতঃ ইহার প্রেরণা—বস্তুর বাহ্য বা রূপ-গত ছন্দকে আকারে ধরিবার চেষ্টা,—প্রতিকৃতিকে নহে; অথবা, প্রতিকৃতিকে আধার করিয়া কল্পিত আদর্শকে রূপের দ্বারা ধরিবার চেষ্টার মধ্যে ইহার রসসৃষ্টির উৎস নিহিত নহে; বরঞ্চ, বাহ্য সৌষম্য ও ছন্দোগতিকেই প্রাধান্য দিয়া, সেই সৌষম্যকেই দৃষ্টি-গোচর করাইয়া ইহার অন্তর্নিহিত ছন্দটীকে রূপে প্রকট করা এই শিল্পের উদ্দেশ্য। অতএব, বাস্তবের আধারেরই উপরে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর দর্শন স্পর্শনের উপরে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত প্রাচীন সুসভ্য জাতির শিল্পের মত, নিগ্রো শিল্প কল্পনাত্মক অথবা কল্পনাবাহী বস্তু-অনুকৃতি নহে।

নিগ্রো ভাস্কর্য্য নিগ্রো জাতির প্রাচীন ধর্ম্ম ও দেবতা-বাদের বাহন—অতএব ইহা উদ্দেশ্যমূলক শিল্প; এই জন্য অনেকের কাছে ইহার একটা বিশেষ সার্থকতা ও মূল্য আছে—যে সার্থকতা বা মূল্য আমাদের আজকালকার বহু উদ্দেশ্যহীন শিল্প-প্রচেষ্টার মধ্যে নাই। দেব-মূর্ত্তি বা দেব-প্রতীক, মৃতের মূর্ত্তি, মুখস, মাতৃ-মূর্ত্তি বা কুমারী-মূর্ত্তি—এ সমস্তই বাস্তব রূপের অন্তর্নিহিত ছন্দকে প্রকট করিয়া দেয়, এগুলিকে আধ্যাত্মিক জগতের প্রতীক-স্বরূপে ব্যবহার করিবার চেষ্টা মাত্র।

নিগ্রো শিল্প সম্বন্ধে আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। ইহা আদিম অরণ্যবাসী জাতির শিল্প। সুসভ্য নগরবাসী জাতির শিল্পে যে-সকল বিরাট জিনিস পাই, সেরূপ জিনিস ইহাতে নাই। উচ্চকোটির বাস্তু-শিল্প নিগ্রোদের মধ্যে উদ্ভূত হয় নাই—বিরাট বিশাল দেবায়তন ও অন্য ইমারত ইহাদের মধ্যে নাই। রাজারাও মাটির বা কাঠের দেওয়াল, খড়ে বা পাতায় ছাওয়া চালা ঘরে বাস করিত। একমাত্র দক্ষিণ-আফ্রিকায় Rhodesia-তে Zimbabwe জিম্বাবোএ ও অন্যত্র পাথরের বিশাল দেওয়াল ও অন্য ইমারত পাওয়া যায়, সেগুলি হয় তো অতি প্রাচীন কালে বান্টু-জাতীয় নিগ্রোরা তৈয়ারী করিয়াছিল; কিন্তু নিগ্রো বাস্তু-শিল্পে, Zimbabwe ও তদ্রূপ সন্নিকটবর্ত্তী অন্য দুই-একটা জায়গার বাস্তু-রীতি একক ও অদ্বিতীয় বস্তু। ছবি আঁকার রীতিও উহাদের মধ্যে জন্মলাভ করে নাই। বড় বড় মূর্ত্তিও অজ্ঞাত। যে প্রকারের শিল্প ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাকে Major Arts অর্থাৎ উচ্চকোটির শিল্প বলা চলে না, তাহা Minor Arts and Crafts অর্থাৎ লঘুশিল্প ও কারুশিল্পের পর্য্যায়েই পড়ে। ভাস্কর্য্যে আবার নিগ্রোদের মধ্যে পাথর ব্যবহার হইত না—অথবা খুব কম হইত, মাত্র দুই-চারিটী প্রাচীন পাথরের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে; কাঠ, ধাতু, মাটি, হাতীর দাঁত—এইগুলিই প্রধান উপাদান ছিল।

নিগ্রো শিল্পের বহু নিদর্শন ও চিত্র দেখিয়াছি। ইহার মধ্যে সবগুলিই আমার ভাল লাগে না; অনেকগুলি বুঝি না, খারাপই লাগে—দুই-চারিটী প্রবন্ধ বা বই পড়িয়াও এইরূপ কতকগুলি মূর্ত্তি বা মুখসের মধ্যে রসের কোনও হদিস পাই না। তবে মোটামুটি, ইহার একটা আকর্ষণ অনুভব করি। প্রাচীন মিসরীয় ভাস্কর্য্য, খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতকের গ্রীক ভাস্কর্য্য,

মহাবলিপুরের ভাস্কর্য, চীনা প্রাকৃতিক দৃশ্য, প্রাচীন চীনা ও জাপানী বৌদ্ধমূর্তি, রাজপুত চিত্রকলা, মিসরের ও সিরিয়ার মসজিদ, বিজান্তীনীয় ও গথিক গির্জ্জা—এ সব প্রাণের সঙ্গে ভালবাসি; সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রো ভাস্কর্যকেও ফেলিতে পারি না; এবং নিগ্রো শিল্পের কতকগুলি মূর্ত্তিকে অন্য জাতির শ্রেষ্ঠ শিল্পের পাশে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইব না। তবে সাধারণতঃ আমার নিজের কাছে নিগ্রো জাতি:—নিগ্রো সংস্কৃতির—নিগ্রোদের মধ্যে উদ্ভূত ভাব-জগতের—নিগ্রোদের জীবনের মধ্যে বিদ্যমান সুখ ও দুঃখের, প্রেম ও বিরোধের, ভয় ও আনন্দের প্রতীক হিসাবেই নিগ্রো শিল্প ভাল লাগে—ইহার আভ্যন্তরীণ শিল্প-প্রেরণা এবং গঠন-রীতি সব সময়ে আমার রস-গ্রহণের কারণ হয় না; ইহার মানবিকতাই আমার কাছে ইহার প্রধান গুণ বলিয়া লাগে।

[৩]

নিগ্রো শিল্প সম্বন্ধে উপদেশ দিবার যোগ্যতা আমার নাই—শিল্প-সমালোচক নহি, কেবল ভাল লাগে বলিয়াই একটু দিগ্‌দর্শন করাইবার দুঃসাহস করিতেছি। কতকগুলি আপাত-রমণীয় মূর্ত্তির চিত্র দেখাইব মাত্র; ইহাদের সৌন্দর্য্য বুঝাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে বেশী টীকা-টিপ্পনী অনাবশ্যক। যে সকল মূর্ত্তি দেখিলেই সাধারণ শিল্প-রসিক ব্যক্তিমাত্রকেই আকৃষ্ট করিবে, এই প্রকারের সহজবোধ্য ভাস্কর্য্য ও অন্য শিল্প-দ্রব্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয় আবশ্যক; প্রথম দর্শনেই যাহা কিম্ভূত-কিমাকার বা কুৎসিত মনে হইবে, যাহা অত্যন্ত প্রচণ্ডভাবে আমাদের শিল্প-চেতনা ও রুচিতে আঘাত দিবে (কিন্তু যাহার মধ্যে সত্যসত্যই গুণ আছে)—এইরূপ শিল্প-দ্রব্য, প্রথম সহানুভূতি উদ্রেকের পরে দেখাই শ্রেয়ঃ; আলোচ্য শিল্প-রীতিতে একটু প্রবেশলাভ হইলে, পরে এইরূপ নিদর্শন বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত।

যে যে দেশ-কাল-পাত্র ধরিয়া নিগ্রোদের মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং উঠিতেছিল, সেই সেই দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে কতকগুলি অবশ্য-জ্ঞাতব্য কথা বলিব।

সমগ্র আফ্রিকা-খণ্ডে মোটামুটি পাঁচটী মূল জাতির বাস ছিল, ইহাদেরই মিশ্রণে আজকালকার আফ্রিকার নানা জাতির উদ্ভব। এই পাঁচটী মূল জাতি হইতেছে—

১। হামীয় জাতি (Hamites)।

২। শেমীয় জাতি (Semites)।

৩। নিগ্রো—[ক] বিশুদ্ধ নিগ্রো বা সুদানী; [খ] বাণ্টু (Bantu) নিগ্রো।

৪। নিগ্রোবটু (Negrito) বা বামন জাতি (Pygmies)।

৫। বুশমান্ (Bushman) ও হটেন্‌টট্ (Hottentot) জাতি।

হামীয় জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে উত্তর-আফ্রিকায় ও পূর্ব্ব-আফ্রিকায় বসবাস করিয়া আসিতেছে। ইহারা শ্বেত জাতিরই শাখা—নিগ্রো হইতে ইহারা একেবারে পৃথক্—ইহারা দীর্ঘ নাসিকাযুক্ত, লম্বকেশ, নিগ্রোদের অপেক্ষা অধিকতর সভ্য ও সুব্যবস্থ। প্রাচীন মিসরের সুসভ্য অধিবাসিগণ এই হামীয় জাতিরই শাখা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে হামীয়গণ উত্তর ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় অবস্থিত আপনাদের আদিম বাসভূমি হইতে মধ্য- ও দক্ষিণ-আফ্রিকায় নামিয়া আসিয়াছে, এবং মধ্য- ও দক্ষিণ-আফ্রিকার নিগ্রোদের জয় করিয়া তাহাদের উপরে রাজা হইয়া বসিয়াছে, রক্তের সংমিশ্রণ করিয়া বহু স্থানে নূতন নূতন হামীয়-নিগ্রো মিশ্র জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা নিজেরা এখন শেমীয় জাতির (আরবদের) চাপে বিপন্ন। মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারের ফলে আরবেরা একতাবদ্ধ হইল, এবং দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইল। মুসলমান আরবেরা মিসরের প্রাচীন ও সুসভ্য জাতিকে জয় করিল—অতি শীঘ্র সমস্ত উত্তর-আফ্রিকা জয় করিয়া ফেলিল। শেমীয়দের ভাষা ও হামীয়দের ভাষার মধ্যে যথেষ্ট সাম্য আছে—পণ্ডিতদের মতে, উভয় শ্রেণীর ভাষার মূল এক। শেমীয় জাতি শ্বেত জাতির অন্তর্ভুক্ত, ইহারা প্রাচীন জাতি, বাবিলন আসিরিয়া সিরিয়া প্রভৃতি দেশে ইহারা বড় বড় সভ্যতার পত্তন করে। কিছু পরিমাণ শেমীয়, দেড় হাজার বৎসরের অধিক হইল, আরব দেশ হইতে আসিয়া আফ্রিকার আবিসিনিয়া অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়;—এইরূপে আফ্রিকায় শেমীয়দের প্রথম প্রতিষ্ঠা ঘটে। ইতিপূর্ব্বে সিরিয়া হইতে শেমীয়েরা আসিয়া মিসর আক্রমণ করিত, মিসরে উপনিবেশ স্থাপন করিত, কিন্তু ইহারা প্রাচীন কালে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই; আফ্রিকায় আসিয়া শেমীয়েরা নিজেদের ভাষা ভুলিয়া যাইত, হামীয়দের সঙ্গে মিশিয়া

যাইত। পরে উত্তর-আফ্রিকার হামীয় জাতি আরবদের অধীন হইল, মুসলমান হইল,—হামীয় ভাষাও ধীরে ধীরে আরব ভাষার চাপে পড়িয়া বিলুপ্ত হইতে লাগিল। এখন মিসরের লোকেরা প্রায় সব আরব-ভাষী হইয়া গিয়াছে। আরবেরা দাস-ব্যবসায়ে রত ছিল, ইহারা ক্রীতদাস ধরিয়া আনিবার জন্য মধ্য-আফ্রিকা পর্য্যন্ত ধাওয়া করিত। ইহাদের দ্বারা নিগ্রোদের মধ্যেও ইস্লাম ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে। মোটের উপর, শেমীয় আরবদের আফ্রিকায় আগমন হাজার বারশ' বছরের অধিক নহে, এবং এই শেমীয় জাতির আগমনে হামীয়দের ও নিগ্রোদের জাতীয় সংস্কৃতি প্রায় সর্ব্বত্রই বিশেষভাবে সঙ্কুচিত ও খর্ব্ব হইয়াছে।

নিগ্রো জাতিই আফ্রিকার বিশিষ্ট জাতি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হামীয়দের সঙ্গে নিগ্রোদের বহুস্থলে খুবই মিশ্রণ ঘটিয়াছিল; ফলে সেই সব স্থলে নূতন মিশ্র জাতির উদ্ভব হইয়াছে—এই সকল জাতিতে এখন নিগ্রো বৈশিষ্ট্য কম বিদ্যমান। ফরাসী অধিকৃত সুদানের Pul, Ful, Peul (পুল, ফুল বা প্যোল্) জাতি এই রূপ একটা মিশ্র জাতি। ইহাদিগকে পৃথক্ ধরা উচিত।

নিগ্রোরা দুইটী বর্গে বা শ্রেণীতে পড়ে [ক] বিশুদ্ধ নিগ্রো; ইহাদের বাস পশ্চিম-আফ্রিকায়—আটলাণ্টিক-সমুদ্রের অংশ গিনি-উপসাগরের উত্তরে ও সাহারা মরুর দক্ষিণে যে ভূভাগ, সেই ভূভাগে; মোটামুটি—Senegal সেনেগাল, Gambia গাম্বিয়া ও Niger নিগের বা নাইগার—এই তিনটী নদীর দ্বারা ধৌত দেশে, এবং উত্তর-মধ্য-আফ্রিকার কতক অংশে। বিশুদ্ধ নিগ্রোদের মধ্যে আদি নিগ্রো রূপটুকু অবিমিশ্র ভাবে বিদ্যমান। নানা ভাষা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত, কিন্তু এই-সব ভাষার মধ্যে একটা প্রকৃতি-গত মিল আছে। [খ] আফ্রিকার উপদ্বীপীয় অংশে, আটলাণ্টিক-সমুদ্রের পূর্ব্বে ও ভারত-সমুদ্রের পশ্চিমে লম্বমান যে অংশ, সেই অংশে বাণ্টু-নিগ্রোদের বাস। এই বাণ্টু-নিগ্রোদের ভাষা, সুদানী বা বিশুদ্ধ নিগ্রোদের ভাষা হইতে পৃথক্, ইহাদের সংস্কৃতিও পৃথক্; ইহারা বিশুদ্ধ নিগ্রোর সহিত অতি প্রাচীনকালে সংঘটিত অল্প-বিস্তর হামীয়দের মিশ্রণের ফল। বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া মধ্য-আফ্রিকায় হামীয়েরা ধীরে ধীরে নিগ্রোদের সঙ্গে রক্ত-মিশ্রণ করিতেছিল; তাহার ফলে দুই জাতির লক্ষণাক্রান্ত, রক্তে নিগ্রোর প্রাধান্যযুক্ত কিন্তু সংস্কৃতিতে বেশীর ভাগ হামীয় প্রভাব পুষ্ট, একটী বিশিষ্ট মিশ্র হামীয় নিগ্রো জাতির সৃষ্টি হয়। মধ্য-আফ্রিকায় এই হামীয় মিশ্রণের ফলে, নিগ্রোর প্রকৃতি ও বাহ্যরূপ আমূল পরিবর্ত্তিত হইল না. অনেকটা বজায় রহিল,—ইহারা একেবারে নূতন একটা মিশ্রজাতি হইল না, কিন্তু বিকৃত হইয়া একটু অন্য ধরণের নিগ্রো হইল; এইরূপ হামীয় প্রভাবে বিকৃত, ভাষায় পৃথক্কৃত নিগ্রোদের "বাণ্টু" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

নিগ্রোবটু (Negrito) জাতি বামন আকারের. ইহাদের উল্লেখযোগ্য কোনও সংস্কৃতি নাই। বুশমান্ ও হটেণ্টটগণ
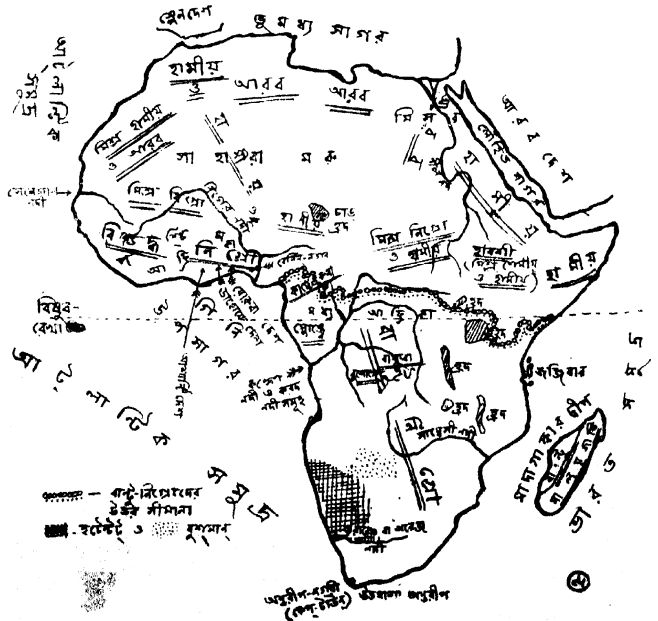
একই মূল জাতির দুই বিভিন্ন শাখা, ইহারা পীতকায়, নিগ্রোদিগের হইতে ইহারা সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। প্রাচীনকালে বুশমান্ ও হটেণ্টট জাতি পর্ব্বতগুহার গাত্রে মানুষ ও নানা পশুর বেশ প্রাণবন্ত চিত্র আঁকিত; উপস্থিতকালে ইহারা ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসোন্মুখ জাতি; এখন ইহাদের কোনও শিল্প নাই।

নিগ্রো শিল্প মুখ্যতঃ বিশুদ্ধ নিগ্রোদের মধ্যে এবং বাণ্টু-নিগ্রোদের কতকগুলি শাখার মধ্যে—যে সব শাখা বিশুদ্ধ নিগ্রোদের সান্নিধ্যে বাস করে,—বেলজিয়ান কঙ্গো, ফরাসী বিষুব-বৃত্তাধিকৃত আফ্রিকায় (French Equatorial Africa) ও কামেরুনে, সেই সব শাখার মধ্যে—উদ্ভূত হইয়াছিল। বাণ্টু-নিগ্রোরা তিনটী প্রধান বিভাগে পড়ে—(১) পশ্চিমী—ইহার মধ্যে কঙ্গো দেশের বাণ্টু উপজাতিরা পড়ে, ইহারাই প্রধান শিল্পস্রষ্টা; (২) পূর্ব্বী—ইহাদের মধ্যে "বাগাণ্ডা" ও "স্বআহিলি" জাতিদ্বয় প্রধান, শিল্প-বিষয়ে ইহাদের তেমন কৃতিত্ব নাই; এবং (৩) দক্ষিণী—জুলু, বেচুয়ানা, সোআজী প্রভৃতি জাতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত; শিল্প বিষয়ে ইহারাও বিশেষ কৃতী নহে। মোটামুটি, গিনি-উপসাগরের উত্তরে ও পূর্ব্বে আফ্রিকার যে অংশ পড়ে, সেই অংশেই নিগ্রো শিল্পের চরম বিকাশ হইয়াছিল; Ivory Coast (Cote d' Ivoire), Gold Coast, Togoland, Dahomey, Southern Nigeria, Kamerun, Spanish Rio Muni, French Equatorial Africa-র দক্ষিণ ভাগ ও Belgian Congo—মোটামুটি এই কয় দেশের নিগ্রোরাই (বিশুদ্ধ নিগ্রো ও বাণ্টু) সত্যকার শিল্প সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে; অন্য স্থানের নিগ্রোগণ—যথা, ইংরেজাধিকৃত সুদান, উগাণ্ডা, কেনিয়া (Kenia), মোসাম্বিক বা পোর্ত্তুগীস পূর্ব্ব-আফ্রিকা, তাঙাঞ্জিকা (Tanganyika), রোডেসিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকার সংযুক্ত রাষ্ট্র, ডামারাল্যাণ্ড ও নামাকোয়ালাণ্ড এবং আঙ্গোলা বা পোর্ত্তুগীস পশ্চিম-আফ্রিকার বাণ্টু-নিগ্রোগণ তথা বুশমান ও হটেণ্টটগণ—ইহারা কোনও উল্লেখযোগ্য শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। গিনি-উপসাগরের উত্তরে সমুদ্রতীরবর্ত্তী যে কয়েকটী দেশের নাম করা হইল—Ivory Coast, Gold Coast, Togoland, Dahomey ও Nigeriaর দক্ষিণ অঞ্চল—সে কয়টী দেশেই নিগ্রো সংস্কৃতি সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতে পারিয়াছে—সেখানে উত্তর হইতে মুসলমান প্রভাব ততটা আসিতে পারে নাই। গিনি-উপসাগরের তটবর্ত্তী ঐ কয়টী দেশের উত্তরে যে নিগ্রোরা থাকে—French Upper Soudan-এ, Senegal ও Niger Colony তে এবং British Northern Nigeria-তে—তাহারা বিশেষভাবে হামীয় ও আরব মুসলমানদের প্রভাবে পড়িয়াছে, কাজেই তাহাদের উল্লেখযোগ্য জাতীয় শিল্প আর কিছুই নাই।

যে যে স্থলে নিগ্রোদের মধ্যে শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে, সেই স্থলগুলি অরণ্য-সঙ্কুল। আদিম অরণ্যের মধ্যে খানিকটা করিয়া জমি সাফ করিয়া ছোট বড় বহু গ্রাম; অধিবাসীরা অল্প-স্বল্প চাষ করে—কলা, সীম জাতীয় কড়াই, নারিকেল, চীনাবাদাম, এবং তাল জাতীয় একপ্রকার গাছ, যাহার ফল হইতে খাদ্য-তৈল বাহির করে; এবং পোর্ত্তুগীসদের দ্বারা আমদানী করা ফসল—ভুট্টা, yam বা চুপড়ী আলু ও manioc বা সাগু-জাতীয় শ্বেতসার; এবং ইহারা জঙ্গলে শিকার করে। ইহারা যাযাবর বা গোপালক জাতি নহে, স্থিতিশীল কৃষক ও শিকারী জাতি। এই স্থিতিশীলতা—এক জায়গার মাটি ধরিয়া বসিয়া থাকা—শিল্প-বিষয়ে ইহাদের সাফল্যের অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

বিশুদ্ধ নিগ্রোদের ও তাহাদের প্রতিবেশী কতকগুলি বাণ্টুদের রূপ-শিল্পেরই জয়জয়কার; শিল্পমধ্যে, অন্যত্র নিগ্রোরা কেবল দেবতা-বাদে বা আমাদের হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রের মত পশুবিষয়ক উপাখ্যান-রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখা বিষয়ে, এবং সব রকমের শিল্প বিষয়ে, বিশুদ্ধ নিগ্রোরাই অগ্রণী। আফ্রিকা হইতে যে সব নিগ্রো ক্রীতদাস আমেরিকায় নীত হয়, তাহারা প্রায় সকলেই বিশুদ্ধ নিগ্রো বংশীয় ছিল; গিনি-উপসাগরের উত্তরের দেশ হইতেই তাহারা গৃহীত হয়। আমেরিকায় উহারা ইংরেজী (অথবা স্পেনী বা ফরাসী) ভাষী হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রের নিগ্রোদের মধ্যে এখন সাহিত্য (অবশ্য ইংরেজী ভাষায়) গড়িয়া উঠিতেছে; হেটি-দ্বীপের কতক অংশে নিগ্রোরা ফরাসী বলে, ফরাসীতেও তাহারা সাহিত্য রচনা করিতেছে। সঙ্গীতে এই নিগ্রোরা আধুনিক সভ্য জগৎকে দুই একটা নূতন জিনিস দান করিয়াছে—Jazz Music-কে

যতই নিন্দা করা যাউক, উহার একটা আকর্ষণী শক্তি সুসভ্য ইউরোপকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, এবং এই Jazz বাদ্য, আমেরিকায় নূতন অবস্থা-গতিকে পরিবর্ত্তিত নিগ্রোদেরই সৃষ্টি। আফ্রিকায় নিগ্রোদের বাদ্যের মধ্যে ছিল কেবলমাত্র কাঠের গুঁড়ি ফাঁপা করিয়া তৈয়ারী ঢোল; এই ঢোল খালি নাচের জন্য বাজান হইত;—দূরে সংবাদ পাঠাইবার জন্যও ঢোল বাজাইত, ঢোলের বিভিন্ন বুলি টেলিগ্রাফের টক্কা-টরের মত কাজ করিত। Jazz band-এর মুখ্য প্রয়োগও নাচের জন্য। নিগ্রোদের চরিত্রে একটা গভীর বিশ্বাসের ও আত্মসমর্পণের এবং সেই সঙ্গে বিষাদের ভাবও দেখা যায়। আমেরিকায় এই ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও বিষাদময় সেই ভাবটী, ক্রীতদাস অবস্থায় বহু অত্যাচার সহ্য করায় নিগ্রোদের মধ্যে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। আমেরিকার নিগ্রোরা খ্রীষ্টান হইয়াছে, ধর্ম্ম-সঙ্গীতে ও করুণরসাত্মক সঙ্গীতেও কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, আফ্রিকা হইতে যে সকল পশু-বিষয়ক আখ্যান উহারা লইয়া গিয়াছিল, সেগুলি আমেরিকায় সংগৃহীত হইয়া, "নিগ্রোদের হিতোপদেশ বা পঞ্চতন্ত্র" গ্রন্থ-স্বরূপ বিদ্যমান। এই সব বিষয়, বিশুদ্ধ নিগ্রোদের প্রকটিত বা সুপ্ত মানসিক উৎকর্ষের পরিচায়ক।*

* আগামী সংখ্যায় সমাপ্য। এই সংখ্যায় প্রকাশিত চিত্রাবলীর বর্ণনা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ্য অংশে থাকিবে।

ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা বলিতে হইলে নানা কথারই আলোচনা আসিয়া পড়ে, ব্যাপারও বিরাট্ হইয়া উঠে। প্রাসঙ্গিক বহু বিষয়ের অবতারণা না করিলে বিষয়টিও পরিস্ফুট হয় না। কাজেই সর্ব্বপ্রথমে দিগ্‌দর্শন হিসাবে বর্ত্তমান প্রবন্ধে কয়েকটা কথা বলিব। পরে মূল বিষয়ের সূচনা করিব।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই যে মানবজাতি বিভক্ত হইয়া গিয়াছে তাহা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। আর্য্য, নিগ্রো, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিভাগের পশ্চাতে নৃতত্ত্ব বিশেষ কোন সংবাদ দিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের সংস্কৃতি (culture) ও সভ্যতার (civilization) বৈশিষ্ট্যও অস্বীকার করা যায় না। ভৌগোলিক সংস্থানের ফলে দীর্ঘ যুগ যাপন করিয়া বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড মানব-সমাজে এক একটি সংস্কৃতি—তথা সভ্যতা বিশিষ্ট সত্তা বা ব্যক্তিত্ব লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই মানব-সমাজের আকৃতির বৈশিষ্ট্য যেমন অস্বীকার করা সম্ভব নয়, তেমনি তাহার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যও অবশ্য স্বীকার্য্য।

আবার সকল মনুষ্যের মধ্যে এমন একটি সাধারণ বস্তু আছে যাহা মানুষকে অন্য সকল জীব হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে; তাহা মানব-মনের সর্ব্বসাধারণত্ব। আর ইহাই বিশ্বমানবতার নিদানভূত।

একটা জাতিকে সাধারণ মনুষ্যজাতি হইতে পৃথক্ করিয়া বিশেষ নামে যে অভিহিত করি তাহার নীতি হইতেছে এই যে, সকল মনুষ্যসমাজ হইতে এক একটি বিশেষ অংশ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ খণ্ডে প্রাচীন কাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছে। ফলে, এক একটি বিশেষ অংশের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাই এক একটি জাতির ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য বা সংস্কৃতি। এই বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বহু ব্যাপারে ইহাদের মধ্যে পরস্পরের ঐক্য ও সাধারণত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। এক জাতি যাহা ভাবিয়াছে, অন্য জাতিও হয়তো সেই একই ভাবনা করিয়াছে; এক জাতির সমস্যা হয়তো অন্য জাতির সমস্যার সঙ্গে অনেকাংশে মেলে, তাহার সমাধানেও হয়তো অদ্বিতীয়ত্ব নাই; কিন্তু একটি জাতির চিন্তার ধারা এবং সমাধানের ধারায় অপূর্ব্বত্ব

থাকিবেই। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল দেশেই আছে, অথচ তজ্জন্য পরিচ্ছদ, আবাস, আহার ইত্যাদি পৃথিবী জুড়িয়া এক নয়। ইহাদের পার্থক্য অসামান্য। দেশ-কাল-পাত্রে এই সমস্যার রূপের বিশেষ হের-ফের হইয়াছে। চিন্তার ক্ষেত্রে ইহা আরও বেশী সত্য। বিভিন্ন দেশের প্রশ্ন হইয়াছে বিভিন্ন—সমাধানও বিভিন্ন। বাহ্য জীবনের বৈচিত্র্য অপেক্ষা অন্তর্জীবনের বৈষম্য এত অধিক তীব্র যে কল্পনাই করা যায় না, তাই অন্তর্জীবনের এই বৈষম্য বা ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই একটি বিশেষ জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি টিকিয়া থাকিতে পারে।

পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। অধুনা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা নূতন সভ্যতার মধ্যে প্রাচীন সভ্যতার কোন কোন রেশ আবিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের নিকট তাহার প্রাত্যহিক জীবনে ইজিপ্ট, বাবিলোনিয়া, আসিরিয়া বা মায়া-সভ্যতা মৃত। এমন কি গ্রীস-রোমও যেন প্রত্নাগারে স্থান পাইয়াছে। ইহাদের সভ্যতা মানুষের প্রতিদিনকার জীবনে মরিয়া গিয়াছে। আজ অতীতের বক্ষের কঙ্কাল—পঞ্জর দেখি, দেখিয়া বিস্মিত হই, উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করি—সে-প্রশংসা এমন কি কাব্যের আকারও পাইতে পারে, তাহা কোন শিল্পীর অনুপ্রেরণাও যোগাইতে পারে, কিন্তু মানুষের জীবনে তাহার স্থান ও সার্থকতা কোথায়?

সকল প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে মাত্র একটি বাঁচিয়া আছে। সেই অদ্বিতীয় গৌরবের স্থান ভারতীয় সভ্যতার। (চৈনিক সভ্যতা বলিতে যাহা বুঝি তাহা ভারতীয় সভ্যতার একটি বিশিষ্ট পরিণতি, অন্য দেশে, অন্য জাতির সংমিশ্রণে এক বিচিত্র রূপ।)

অন্য দেশে অন্য যে সভ্যতা উদ্ভূত হইয়াছিল তন্মধ্যে এমন প্রেরণা ছিল না, এমন গভীরতা ছিল না যাহার ব্যাপকতা এত বেশী। সে-সকল সভ্যতার সমস্যা ছিল সাময়িক, তাহাদের চিন্তা বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। সেখানে পরের সভ্যতা নূতন কথা লইয়া আসিয়াছে, পরের চিন্তা নূতন আলোক লইয়া আসিয়াছে, সেই নূতন বাণীকে বাধা দিবার মত শক্তি পুরাতনের ছিল না। সে সমস্ত পুরাতন সভ্যতা ছিল মাত্র পাথরের—ইটের সভ্যতা—সেনাবাহিনীর সভ্যতা। বাহ্য জীবনের বহু প্রয়োজনের, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের, আরামের বন্দোবস্ত তাঁহারা করিয়াছেন, কিন্তু অন্তর্জীবনের গূঢ় সমস্যার—সত্যকার জীবন-সমস্যার কোন বাণী সে সকল সভ্যতায় নাই। প্রাণহীন এ-রকম বস্তু-সভ্যতা বাঁচিতে পারে না। ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্পন্দন ছিল বলিয়াই সে বাঁচিয়াছে। ইহাকে 'আধ্যাত্মিক' বলিয়া কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত অধরপ্রান্তে একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছেন। ইহার বস্তু-সভ্যতার অংশ কতটা তাহা এখানে বিচার্য্য নয়। কিন্তু এ-টুকু বুঝিতে হইবে যে, ইহা বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক বলিয়াই বাঁচিয়াছে। মাত্র এই সভ্যতারই আত্মা আছে—তাই সে মরে নাই।

ভারতের চিন্তা পৃথিবীর বস্তুতেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। বস্তুর আশ্রয় যাহা, বস্তুর অতীত যাহা তাহারই সন্ধান সে পাইয়াছে। ভারত রূপের মধ্যে অরূপের সাধনা করিয়াছে। নশ্বর ভঙ্গুরকে অতিক্রম করিয়া ভারতের সাধনা হইতেছে শাশ্বত নিত্যের। এই জগতের প্রাণের সন্ধানে তাহার যাত্রা। অমৃতের পথ পাইয়া সে চলিয়াছে। ভারতে জীবন অতি দীর্ঘ সাধনা—অবিদ্যা হইতে মুক্তির সাধনা, বিদ্যার আবির্ভাবের সাধনা।

ভারতবর্ষে লেখা-পড়া ও সংস্কৃতি কোন দিন এক বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সংস্কৃতি ভারতের অন্তরের বস্তু, অক্ষর-পরিচয়ে সাহিত্য-জ্ঞান কোন দিন তাহার জ্ঞাপক ছিল না। এ-দেশে বিদ্যা কখনও academic ব্যাপার বলিয়া গৃহীত হয় নাই। বিদ্যা তাহার অন্তরের সামগ্রী। দর্শনও কোনদিন বুদ্ধির পরিচয়জ্ঞাপক মাত্র হয় নাই—ইহা ছিল ভারতবাসীর প্রাণস্বরূপ। দর্শন ও ধর্ম্ম কোন সময়ে এদেশে দুটি পৃথক্ বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ধর্ম্মের গোড়ার কথাটি হইয়াছে সর্ব্ববস্তুর মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ; সর্ব্ববস্তু একটি অখণ্ড পূর্ণত্বের প্রকাশ মাত্র। তাহার macrocosm ও microcosm সর্ব্ববিদ্যাই ধর্ম্মের মধ্যে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। চতুঃষষ্টি শিল্পকলাও ধর্ম্মের বাহন হইয়াছে। শিল্পকলা গ্রন্থেরও তাই নাম হইয়াছে—শাস্ত্র। ধর্ম্মের মত ব্যাপক শব্দ ভারতীয় ভাষায় আর নাই। ধর্ম্ম সকলের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে সকলকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে বলিয়া এ-দেশে কোন বিদ্যা watertight compartment-এর মত হয় নাই। সর্ব্ববিদ্যার শেষবাণী ধর্ম্ম; তাহাদের মধ্যে

কোন বিদ্বেষ ঘটে নাই। প্রাচীন যুগে ধর্ম্ম ভিন্ন তাই এদেশে কাব্য হয় নাই, স্থাপত্য হয় নাই, শিল্প-সৃষ্টি হয় নাই। আমাদের শিল্পে বিদেশীরা বস্তুতন্ত্রের অভাব বোধ করেন। সত্য বটে, বাস্তবের সঙ্গে আমাদের শিল্প মেলে না। কিন্তু সাধনার দিক্ দিয়া দেখিলে কোন গোলযোগ থাকে না। ভারতের সাধনা concrete-এর মধ্য দিয়া abstract-এর; রূপের মধ্য দিয়া অরূপের। লিঙ্গপূজার মধ্যে আমরা ইহারই সাক্ষাৎ পাই; মূর্ত্তিপূজায় অবিকল নিছক মনুষ্যমূর্ত্তি যে দেখি না তাহারও ব্যাখ্যা ইহাই। এখানে abstractকে মূর্ত্তি দিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাহা concrete-এর হুবহু নকল হইতে পারে না।

অতি প্রাচীন যুগেই আমরা পরিব্রাজকদের কথা শুনিতে পাই। চির-পথিক তাঁহারা; দেশদেশান্তরে বিরামহীন যাত্রার ব্রত তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহাদের সাধনার ফল তাঁহারা প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। দরিদ্রতম কৃষকের কুটীরেও তাঁহাদের গতি—রাজ-অতিথিও তাঁহারা। তাই প্রাচীন যুগে গ্রামে গ্রামে এই পরিব্রাজকদের জন্য কুটাহনশালার অস্তিত্ব। গ্রামবাসীরাও কুটাহনশালার গর্ব্বে গৌরব বোধ করিয়াছে। যেখানে ইঁহাদের বিচার সভা বসিত সেখানে ইঁহারা গ্রামবাসীদের উপদেশ দিতেন। রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিতে কি সাহায্য করিয়াছে তাহা আজও নিরূপিত হয় নাই। প্রতি-ভারতবাসীর মর্ম্মে ইহারা প্রাণসঞ্চার করিয়াছে। ভারতের অষ্টাদশ পুরাণ-কথা ভারতের মর্ম্ম-কথা হইয়াছে।

অতি প্রাচীন যুগে আমরা যাত্রা ও কথকতার পরিচয় পাই। এ-গুলি যে কত বড় শিক্ষার বাহন তাহা আজও ঠিক বোঝা হয় নাই। নিরক্ষর কৃষকের মুখে কত অজানা সাধক কবির যে-গান আজও শুনা যায় তাহা দর্শনের গভীরতম মূল তত্ত্বের ব্যাখ্যা। চর্য্যাচর্য্য, দেহতত্ত্ব, বাউল, ভাসান, মঙ্গল-গান প্রভৃতি সঙ্গীত এ-যুগেও কত শত বৎসর ধরিয়া নিরক্ষরদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। ভারতের বারব্রতও সেই প্রাচীন সংস্কৃতি বহন করিয়া আসিয়াছে। শিক্ষা ও লেখা-পড়া এক বস্তু নয়—এ-কথাটা যদি একবার উপলব্ধি করিতে পারি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব আমাদের নিরক্ষর গ্রাম-বাসীদের মত শিক্ষিত গ্রামবাসী পৃথিবীতে আর নাই।

ভারতবর্ষে আর্য্যদের কেমন করিয়া দেখা পাওয়া গেল সে-প্রশ্নের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মীমাংসা আজও হয় নাই। তবে আদিম যুগের কয়েকটি আর্য্য দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সুদূর বোঘাসকুই-শিলালিপিতে, তেল-এল-অমরনার পত্রাবলীতে এবং বাবিলনের কাসাইটদের দলীলপত্রে। কসাইটরা হিমালয়ের (সিমলিয়ার) উল্লেখ করিয়াছে। মিতানীদের সহিতও আর্য্যদের সম্পর্ক ভারতবর্ষে আর্য্যা-গমনের পূর্ব্বে হইয়াছিল, একথা এখন আর বলা চলে না। তেল-এল-অমরনার পত্রাবলীতে সংস্কৃত নাম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বোঘাসকুই-লিপিতে সংস্কৃত সংখ্যা আছে, বৈদিক শব্দের সহিত ইহার শব্দের মিল আছে। ভারতবর্ষের সহিত এশিয়া-মাই-নরের সাক্ষাৎ সম্পর্ক। এই দূরদেশে হিন্দু দেবতারা শান্তি-দেবতারূপে দেখা দিয়াছেন। শান্তির বাণী লইয়াই ভারতবর্ষের প্রথম আন্তর্জ্জাতিক পরিচয়। শান্তিই ভারতের সনাতন বাণী—শান্তিই ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ প্রতীক। সে-যুগের অপর সকল সভ্যতার আন্তর্জ্জাতিক পরিচয় গ্রহণ করিতে গিয়া দেখিতে পাই সে-পরিচয় তাহাদের লুণ্ঠনে। সে-লুণ্ঠন হয় ব্যবসাচ্ছলে, নয় প্রকাশ্য সৈন্যবলে। সে-দিনও ইজিপ্ট্ তৃতীয় থুট্‌মোসিসের বিশ্বজয়ের জয়গীতি দুন্দুভিদ্বারা ঘোষণা করিতেছিল, এথেনিয়নরা ক্রীট দখল করিতেছিল এবং ফিনীসিয়রা এই প্রাচীন যুগে বাণিজ্যচ্ছলে পৃথিবী লুণ্ঠন করিয়া প্রথম আসিবিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। আসিরিয়ার অসুরেরা জাগিতেছিল।

মোহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় যে সভ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত সুমেরীয় সভ্যতার একটা সহজ ঐক্য ও সামঞ্জস্য আছে। মার্শাল (A.S.I., A.R. 1923-24) বলিয়াছেন, সিন্ধু-উপত্যকায় যে-সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার উৎপত্তি, অতিবৃদ্ধি ও পরিণতি ঐ-স্থানেই হইয়াছে। নীলনদীর তীরে ফারওয়াদের সভ্যতার মত উহা ঐস্থানের একান্ত সম্পত্তি। আর মেসোপটেমিয়ায় সুমেরীয় সভ্যতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে বেশ ধারণা করিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষের অঙ্কপ্রদেশই ঐ সভ্যতার আদি ভূমি, এবং বাবিলন, আসিরিয়া ও পশ্চিম-এশিয়ার সাধারণ সংস্কৃতি পরে সেখানে ছড়াইয়া পড়িয়া বদ্ধমূল হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির দ্রাবিড়ীয় অংশের

ইতিহাস অজও লিখিত হয় নাই; কিন্তু ইহা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার তাহা অস্বীকার করা যায় না। দ্রাবিড়ী রক্তের মত সেই সংস্কৃতি আর্য্যসংস্কৃতির সহিত বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে। লিঙ্গপূজা, নাগপূজা, বৃক্ষপূজা, মাতৃকাপূজা প্রভৃতি দ্রাবিড়ীয় ভিন্ন অন্য ব্যাখ্যায় এই সংস্কৃতিতে স্থান পাইতে পারে না। যজ্ঞস্থলে প্রতিমাপূজার ব্যাখ্যা দ্রাবিড়ীয় বলিয়া সম্ভব হয়।

বেলুচিস্তানের দ্রাবিড়ী ব্রাহুই ভাষা অনেক ব্যাপারেরই সূচনা করে। আবার দ্রাবিড়ীরও পূর্ব্বে নেগ্রিটো-সম্পর্কও প্রমাণিত হইতেছে।

বৈদিক যুগ হইতেই ইরাণের সহিত ভারতের সম্বন্ধ। অশোকের সময় ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইরাণ-সম্পর্কের অকাট্য নিদর্শন পাওয়া যায়। মৈত্রী-বাণী-প্রচারক এই অশোক প্রথম প্রচার করিলেন—পৃথিবীবাসী সকলেই ভ্রাতা। ইহাপেক্ষা বৃহত্তর আন্তর্জাতিক বাণী আর নাই। তিনি পৃথিবী-বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র এই বাণী পৌছাইয়া দিবার জন্য। তাই সেই বিজয়ের তিনি নাম দিয়াছিলেন 'ধর্ম্মবিজয়'। তিনি চাহিয়াছিলেন বিশ্বের কল্যাণ। তিনি বলিয়াছিলেন—ধর্ম্মের দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ জয়ই একমাত্র জয়।

আর এই যুগেই রোম পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় রোমক সভ্যতার পরিচয় দিতেছিল।

খৃষ্টপূর্ব্ব শতকে প্রবলপ্রতাপ মেনেন্দরকে একাগ্র ও ঐকান্তিক বৌদ্ধরূপে দেখি, বৈষ্ণব ভাগবতরূপে হেলিওডোরসের পরিচয় পাই। চীনে বৌদ্ধ-প্রচারক মেলে, আর তথাকথিত গান্ধার শিল্পে গ্রীক সংস্কৃতির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এই যুগের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়—ভারতবর্ষ সকলকে গ্রহণ করিয়াছে; কত অজানাকে স্থান দিয়াছে। এমন সময় গিয়াছে যখন ভারতে পর-সংস্কৃতির একটা রাসায়নিক সংমিশ্রণ চলিয়াছিল। ইজিপ্ট, এশিয়া-মাইনর, পারস্য সকলের সহিতই ভারতের কোলাকুলি। তারপর পরের যুগে দলে দলে অসভ্য বর্ব্বর আসিয়া ভারতের দুয়ারে হানা দিয়াছে। তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হয় নাই। ভারতবর্ষ শক, হুন, মোঙ্গল, পহ্লব, চীন সকলকেই গ্রহণ করিল। ভারতের অপূর্ব্ব সবল সংস্কৃতিকে ইহারা নষ্ট করিতে পারে নাই, ভারতের আশ্চর্য্য প্রভাবে তাহারা গর্ব্বিত হিন্দু হইয়া গেল। ভারতবর্ষের গৌরবময় ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অংশ ইহাদেরই কীর্ত্তি—রাজপুতরূপে। দ্রাবিড়ী অন্ধ্র সম্রাট্ গোতমীপুত্র শাতকর্ণি নিজেকে এক-ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব করিলেন, চতুর্বর্ণের সংমিশ্রণ বন্ধ করিয়াছেন বলিয়া শিলালিপিতে অঙ্কিত করিলেন; শক উসভদাত, রুদ্রদামা হিন্দুধর্ম্মের প্রতিপালক হইলেন। সংস্কৃতির এমন বিরাট্ রাসায়নিক সংমিশ্রণ পৃথিবীর ইতিহাসে বড় ঘটে নাই। ভারতের উদারনীতিতে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্বন্ধ সকল দেশেরই হইয়াছে। আর ইহার পরেই ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ঐতিহাসিক উপকরণ জুটাতে আরম্ভ হইল। বৃহত্তর ভারতের সূচনা দেখা গেল। চীনে তো বহু পূর্ব্বেই বৌদ্ধ ভিক্ষু গিয়াছিল। এখন তাহাদের সংখ্যা বেজায় বাড়িয়া উঠিল। ভারতীয় নাবিকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ছাইয়া গেল। বৌদ্ধ ভিক্ষু পৌছিল, ব্রাহ্মণও পৌছিল। এ-সব ঘটিল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষে। অফগানস্তান পার হইয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু মধ্য-এশিয়া ছাইয়া ফেলিল। চীন পার হইয়া তাহারা জাপানে দেখা দিল। ভারতের প্রতিবেশী তিব্বত, সেও বৌদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইল।

সাধনা

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বি-এ

কলিকাতা হইতে তার আসিল, পাটের দর কিছু চড়িয়াছে এবং আরও কিছু চড়িবারই সম্ভাবনা। হাজার-তিরিশেক মণ 'গড়সড়ে' তাড়াতাড়ি কিনিয়া রাখা আবশ্যক।

তার পাইয়া রতিরাম পেরিওয়াল গোঁফে একবার আরাম-সূচক 'তা' দিয়া লইল। মনের আনন্দ চোখ ও মুখের কোণে ফুটিয়া উঠিল।

সত্যি কথা বলিতে কি, এবারের বাজার বড় মন্দা যাইতেছে। শুধু এবারই বা কেন, গত আড়াই-তিন বৎসর যাবৎ পাটে লোকসান ছাড়া আর লাভ নাই;—কাহারও নাই; না চাষার, না ব্যাপারীর। হালের খবরে দেখা যাইতেছে, আমেরিকা আবার কিছু মাল খরিদ করিতেছে; কলিকাতার মিলের অবস্থা ঠিক কিছু বুঝা যাইতেছে না বটে, তবে সে খবরও ভালর দিকেই। আর 'কাট্‌কা'র শেষ খবরও আশাপ্রদ।

রতিরাম ঘড়ির দিকে চাহিল। পাঁচটা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকি। কাল বদরগঞ্জের হাট। বদরগঞ্জ এখান হইতে ত্রিশ মাইল; ছোট লাইনের গাড়ীতে বুলাকিনগর ষ্টেশনে নামিয়া তিন মাইল গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়। বদরগঞ্জ এদিকের মধ্যে বিখ্যাত পাটের বাজার; আমদানী অনেক। আর যাওয়া-আসা সেখানে ত নিত্যই আছে।

পাঁচটা বিশ মিনিটে ছোট লাইনের একখানা গাড়ী ছাড়ে, আর বুলাকিনগর পৌঁছায় রাত্রি নয়টায়। সেখানে গরুর গাড়ী অনেক—প্রায় সবই রতিরামের জানাশুনা। আর বদরগঞ্জে থাকিবার জায়গারও অভাব নাই; চূড়ামণজীর ওখানে বন্দোবস্ত সবই ভাল; একই দেশের—নোহর রিয়াসতের লোক ত!

রতিরাম ঠিক করিল, সন্ধ্যার গাড়ীতে যাওয়াই শ্রেয়। কলিকাতার টাট্‌কা খবর সকাল সাতটার পূর্ব্বে বদরগঞ্জে না পৌঁছিবারই সম্ভাবনা। সকাল-সকাল সওদা করিয়া ফেলিতে পারিলেই ভাল। ছিয়ানব্বই ওজনের দরি টাকায় কিনিতে পারিলে লাভ অনিবার্য্য; তিরানব্বইতে আর দুই পয়সা নয় কমাইয়া দিবে। তবে সঙ্গে কিছু খুচরা টাকা থাকিবে আর সময় রাত্রিকাল। তা ওখানকার পথঘাট ত সবই জানাশুনা আর গাড়োয়ানও সব পরিচিত। অত ভয়-ভাবনা করিলে কি কাজ-কারবার চলে?

যাইবার সময় আর বড় নাই, তবে এ-লাইনের গাড়ী সর্ব্বদাই বিলম্ব করিয়া আসে ও ছাড়ে এই যা ভরসা। সকালের বাসি পুরি ছিল—তাড়াতাড়ি সে তাহারই দুইটা অর্দ্ধশতাব্দী-রক্ষিত আচারের সহযোগে গলাধঃকরণ করিয়া একলোটা জল ঢকঢক করিয়া গিলিয়া ফেলিল। তাহার পর ছোট একটুকু বিছানা ও দুইখানা কাপড় বগলদাবা করিয়া ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইল। তখনও গাড়ী ছাড়িতে পাঁচ মিনিট বাকি।

রতিরামের মনিব কলিকাতায় থাকে। পূর্ব্বে সে এই মনিবের চাকরি করিত; সম্প্রতি বছর-চারেক যাবৎ মনিব তাহাকে হিস্যায় লইয়াছে। মূলধন তাহার কিছুই নাই—সে খাটিয়া মূলধন জোগায়।

রতিরামের বয়স বিয়াল্লিশ। পরনের কাপড়খানা সম্ভবতঃ মাস-দুই যাবৎ সাফ করিবার ফুরসুৎ হয় নাই; সেখানার রং এখন ধূসর গৈরিক হইতে তামাটে কালো হইয়া গিয়াছে। পায়ে জাপান-নির্ম্মিত পাঁচ সিকা দামের রবারের জুতা—গায়ে লম্বা গরম কোট। মাথার পাগড়ীটি গাঢ় কমলা রঙের। দাড়ি আজ দিন-পাঁচেক যাবৎ কাটা হয় নাই, কিন্তু পাট কেনাবেচার বাজারে তাহাতে কিছু আসে যায় না।

গাড়ী যথারীতি দেরি করিয়া ছাড়িল। রতিরাম তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় বসিয়া বিড়ি ধরাইয়া ধূমপানের ফাঁকে ফাঁকে গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতে আরম্ভ করিল।

পাশে বসিয়া একজন বাঙালী ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। রতিরামের মনটা আজ অত্যন্ত প্রফুল্ল; সহযাত্রীর সহিত কথা বলিবার জন্য সে উৎসুক হইয়া উঠিল।

ভদ্রলোক একমনে পড়িয়া যাইতেছিলেন। দ্বিধাভরে রতিরাম খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—সমাচারমে কোই খবর আছে বাবুজী?

রতিরাম বাংলা বলে।

ভদ্রলোক মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন—কিসের খবর? রতিরাম বিশেষ কোন খবরের প্রত্যাশায় ছিল না, আর এক পাটের খবর ছাড়া বহির্জগতের কোনো কথাও তাহার জানা ছিল না; বলিল—পাটুয়াকা কেয়া হাল?

ভদ্রলোকটি আশ্চর্য্য হইলেন কি না বুঝা গেল না, তবে আশ্চর্য্য হইবার কোন লক্ষণ তাঁহার মুখেচোখে দেখা গেল না বটে। হয়ত এ-শ্রেণীর জীব হইতে এই প্রশ্ন ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা তিনি করেন নাই। বলিলেন—পাটের খবর ত কিছু জানি না, তবে পঞ্জাবের দিকে খুব বেশী ভূমিকম্প হইয়াছে।

রতিরাম বলিল—ভুঁইডোলা? কাঁহা হোয়েছে?

—পঞ্জাবের দিকে; সব খবর ত এখনও বাহির হয় নাই।

রতিরাম বলিল—হামারা তো খবর মিলে নাই।

ভদ্রলোকটি বলিলেন—আজই খবর বাহির হইয়াছে; আজিকার কাগজ পড়িয়াছেন?

রতিরাম মাথা নাড়িয়া বলিল—নেহি।

শুধু আজিকার কেন, কোনোও দিনের কাগজই সে পড়ে না; তাহার ঘরের পাশে বাঙালী পানওয়ালার নিকট হইতে সে শুধু পাটের বাজারের খবরটুকু পড়াইয়া নেয়। খবরের কাগজওয়ালার সহিত তাহার বন্দোবস্ত আছে; এজন্য তাহাকে সে মাসে চারি আনা পয়সা দেয়—অবশ্য কাগজখানা তাহাকে তখনই ফিরাইয়া দিতে হয়।

রতিরাম খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল—কেৎনা লোক্সান হোয়েছে? কয়ঠো আদমী মরা?

—সে খবর ত এখনও বাহির হয় নাই।

ভদ্রলোক আবার কাগজে মন দিলেন। মিনিট-দুই পরে আবার রতিরামের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন সে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাঁহারই দিকে চাহিয়া আছে। বলিলেন—আপনার ঘর কোথায়?

—মোহর বিকানীর রিয়াসৎ।

—বালবাচ্চা কোথায় আছে?

—ঘরমে—ওতো পাঞ্জাবকা নজ্দিগই আছে।

—তা চিঠিপত্র পান ত?

—হাঁ, মাহিনামে একঠো। রূপেয়া ভেজ দেই, আওর কুপনমে সমাচার লিখ্ দিই—আজ চার বচ্ছর ঘর নেহি গিয়া।

ভদ্রলোক কথা বলিলেন না। রতিরামও চুপ করিয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল।

লাইনের দুই ধারে বন; শিশু, শাল, আম ও বাঁশ—ঘনায়মান সন্ধ্যার আবছায়া গায়ে মাখিয়া একান্তে দাঁড়াইয়া আছে। মাঠ হইতে রাখালেরা গরু লইয়া গিয়াছে—দুই একটি এখনও দলছাড়া হইয়া এ-দিকে ও-দিকে ঝোপের পাশে খাদ্যসংগ্রহে ব্যস্ত। মাঠের মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুটীর; বাঁশ ও বাখারির আব্রু-দেওয়া অঙ্গন; সে বেড়ার উপরে লতার ঝাড়; কি লতা তা বুঝা যায় না।

গাড়ী ষ্টেশনে দাঁড়াইল। ছোট ষ্টেশন। ষ্টেশন-ঘরের পাশেই ছোট ছোট ঘর—বোধ হয় কুলীদের। রতিরাম চাহিয়া রহিল। একটা ঘরের কোণে বাহিরে দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে—বছর-কুড়ির; কোলে তাহার বছরখানেকের একটি শিশু—বোধ হয় তাহারই মেয়ে। ষ্টেশনের আলো আসিয়া তাহাদের মুখে পড়িয়াছে। রতিরামের মনে হইল, শিশুটি যেন দেখিতে অনেকটা তাহার নিজের মেয়েরই মত। তাহাকে বছরখানেকের দেখিয়া সে ঘর হইতে আসিয়াছে—তখন তাহাকে সে 'বুড্ডী' বলিয়া ডাকিত। আজ চারি বৎসর সে তাহাকে দেখে নাই।

রতিরামের মনে পড়িল, মেয়েটার চুল ছিল কোঁকড়ানো, রংটা বেশ ফর্সা; বেশ গোলগাল মাংসল চেহারা। নরম নরম দুটি গাল—চুমো খাইলেই ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিত আর কোলে আসিতে চাহিত।

ঘর হইতে কে ভারি গলায় ডাকিল,—মুন্নি। মা বা মেয়ে কেহই উত্তর দিল না। কালো রঙের কাপড় ও সেই রঙেরই কোর্ত্তা গায় দিয়া দীর্ঘাবয়ব এক মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিল। মা হাসিয়া মেয়ের মুখের দিকে চাহিল—মেয়ে নবাগতের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল।

গাড়ী আবার চলিল।

মাঘের শুক্লাচতুর্থী। চন্দ্র উঠিয়া পড়িয়াছে। খোঁয়া

ও কুয়াশায় মিলিয়া চারিদিকে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ রচনা করিয়াছে। দূরের বাঁশের ঝাড়কে চন্দ্রালোকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই। পাশেই একটা মেঠো রাস্তার উপরে একসারি গরুর গাড়ী—হয়ত ঘণ্টা বাজাইয়া চলিয়াছে। শব্দটা শোনা যায় না। একটু দূরের এক গৃহ-অঙ্গনে জীর্ণ-বস্ত্রাবৃতা কে একজন খড়ের জ্বালানি দিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছে। সে আলোকে তাহার দেহ ও খাদ্যসামগ্রী স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

রতিরামের মন এই গাঢ় কুয়াশা ও দূরত্ব উপেক্ষা করিয়া সুদূর বিকানীর রিয়াসতে চলিয়া গিয়াছে।

দারুণ এ অর্থনেশা। বছর-দশেক পূর্ব্বে তাহার অর্থ ছিল না সত্য, কিন্তু তৃপ্তি ছিল। মনিবের চাকরি করিত, সারাদিন কাজ করিয়া রাত্রি দশটায় ঘরে ফিরিয়া আসিত; স্ত্রীর আদরে সমস্ত দিবসের ক্লান্তি মুছিয়া যাইত। ছেলে-পিলে ছোট ছোট—কেহ পায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, কেহ কোলে উঠিতে চেষ্টা পাইত। দিবসের শত-শহস্র চিন্তা যেন তাহার একটি নিমেষেই অন্তর্হিত হইয়া যাইত।

আর আজ? কোথায় সে, আর কোথায় তাহার সেই স্নেহের ধনগুলি? অর্থের মোহ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে; এই চারি বৎসরের মধ্যে অন্য কোনও চিন্তা তাহার মাথায় আসে নাই। ভাবিতে গেলেই মাথায় গোল পাকাইয়া উঠে, 'ব্যাজ' 'ফাট্‌কা' 'স্যাকুর', 'রকম'। অর্থ কিছু হইয়াছে সত্য, কিন্তু শান্তি কি সে পাইয়াছে?

এই চারি বৎসরের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও সেই সুখের দিনগুলির কথা মনে হয় নাই। একবারও ভাল করিয়া ছেলে, মেয়ে বা তাহাদের মায়ের কথা সে মনে করে নাই। দিন গিয়াছে, রাত্রি আসিয়াছে—সে করিয়াছে পাটের হিসাব—সে স্বপ্ন দেখিয়াছে বাজারের খরিদ-বিক্রীর ইতিহাস। মাসের শেষে স্ত্রীর নামে টাকা পাঠাইয়াছে—কুপনে খরচের হিসাব লিখিয়া স্ত্রীকে বার-বার হিসাবী হইবার জন্য সাবধান করিয়াছে;—মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর। সেটা একটা একঘেয়ে ইতিহাস মাত্র।

একবার তাহার জ্বর হইয়াছিল। ম্যালেরিয়া—ভুগিয়াছিল সে আট দিন। রোগশয্যায় পড়িয়া বহুবার তাহার স্ত্রীর কথা মনে হইয়াছিল। মাথার ব্যথায় অস্থির হইয়া মনে হইত, কেহ যদি মাথাটা একটু টিপিয়া দিত। কিন্তু একটা জরুরি খবর ছিল; ভাল করিয়া সারিয়া উঠিতে না-উঠিতেই তাহাকে বাহিরে যাইতে হয়। হাঁ, লাভ হইয়াছিল বটে—তিনশো টাকা। এ-সব দুর্ব্বলতা থাকিলে কি কাজকারবার চলে?

রতিরাম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাসটি বোধ হয় একটু জোরেই পড়িয়াছিল। বাঙালী সহযাত্রীটি একটু চমকিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, ভূমিকম্পের খবর শুনিয়া হয়ত বেচারা একটু ঘাবড়াইয়া গিয়া থাকিবে—হাজার হউক মানুষের মন ত। বলিলেন—আপনার কোনো ভয় নাই, আপনাদের দেশে ত কিছু হয় নাই।

রতিরাম ভূমিকম্পের কথা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। বলিল, নেহি—ডর কোই নেই আছে।

ভূমিকম্প তাহাকে চঞ্চল করে নাই—করিয়াছিল দুইটি প্রসারিত ক্ষুদ্র হস্তের স্বপ্ন। কিন্তু রতিরাম স্বপ্ন দেখিলেও বেশীক্ষণ দেখে না—স্বপ্নের মূল্য তাহার কাছে নাই; থাকিলে কি আর কাজকারবার চলে?

ঘুরিয়া বসিয়া সে প্রশ্ন করিল—ও কেতাব মে কেয়া লেখা আছে বাবুজী?

ভদ্রলোক তখন একখানা মোটা বই পড়িতেছিলেন। বলিলেন—এটা কবিতার বই।

রতিরাম তাহার স্বভাবসুলভ উচ্চারণে বলিল—ক্যা?

—কবিতার বই, রামায়ণ পড়িয়াছেন? রামায়ণের মত।

—পড়নেছে ক্যা হোতা হ্যায়?

—কি আর হইবে? দিল্ আচ্ছা লাগে।

রতিরাম বলিল—হুঁ। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, ইসুকা কিম্মৎ কতো আছে?

—তিন টাকা।

—ঝুটমুট—ফজুল। আপনি তো বড়া লিখাপড়াওয়ালা আদ্‌মি আছেন। আপনি কেৎনা রূপেয়াকা আলেম নিয়াছেন?

ভদ্রলোক হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—লেখাপড়া কি আর টাকার দরে মাপা যায়?

—কেন হোবে না? বি-এ পাস হোনেছে—চৌদ্দ বরষ; পড়তা মাহিনা বিশো রুপেয়া করকে—সাড়ে তিন হজ্জার!

ভদ্রলোক আবার হাসিলেন।

রতিরাম দমিল না। বলিল—আপ কেৎনা কামাতা এক মাহিনামে?

ভদ্রলোক বলিলেন, তিনি এখন প্রায় বেকার। অর্থোপার্জ্জন এখন পর্য্যন্তও বিশেষ কিছু ঘটিয়া উঠে নাই।

রতিরাম আবার গোঁফে আরামসূচক তা দিয়া লইল। বলিল, আমার আলেম তো দেড় রুপেয়াকা—চার মাহিনা পাঠশালমে গয়া—ব্যস্ খতম। মাড়োয়ারীকা লেড়কা—মাহিনামে শো রুপেয়া তো কামাতেই হোবে।

এ-দৃশ্যের যবনিকা পড়িল। পরের ষ্টেশনে ভদ্রলোক কেতাব-হস্তে নামিয়া গেলেন। রতিরাম তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া একটা আত্মম্ভরিতার নিঃশ্বাস ফেলিল। ভারি ত বাবু, কেতাবে কি লেখা থাকিবে? দিল্ আচ্ছা লাগে? খাইতে জোটে না দিল্ আচ্ছা করিয়া কি হইবে? স্বপ্ন দেখিলে চলে না—স্বপ্ন দুর্ব্বলতা মাত্র। তাহার মোহে পড়িলে রতিরামকে এতদিন পথে বসিতে হইত। সে সাধনায় বসিয়াছে—বিঘ্ন ত আছেই। তাহাতে ভুলিলে আর সিদ্ধিলাভ ঘটিবে না। যাউক না দেশ উৎসন্ন,—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প—সকলে মিলিয়া চারিদিক হইতে জগতকে গ্রাস করুক না—কি আসে যায়? শুধু পাটের বাজারে হরুজা না পৌছিলেই হয়।

তথাপি মাঝে মাঝে মনটা যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। দূরান্তের স্বপ্নের মত চোখের সম্মুখে দুইটি ক্ষুদ্র নিটোল শিশুহস্ত আসিয়া দেখা দেয়, কি গভীর সে আহ্বান—কি শক্তিমান্ তাহার আকর্ষণ, রতিরামকেও কখনও কখনও অন্যমনস্ক করিয়া তোলে!

যথারীতি বিলম্ব করিয়া রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় গাড়ী বুলাকিনগর পৌছিল। শীতাচ্ছন্ন রাত্রি সহসা ষ্টেশনের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে যেন প্রাণবান হইয়া উঠিল। রতিরাম তাহার বিছানার পুঁটুলি-হস্তে নামিয়া আসিল।

বদরগঞ্জ যাইবার জন্ম গরুর গাড়ী এখানে সর্ব্বদাই মিলে সত্য, কিন্তু এত রাত্রি পর্য্যন্ত আর কোনো গাড়োয়ান বসিয়া নাই। রতিরাম জানিত, পাশেই সব গাড়োয়ানদের বাড়ি—সে হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিল।

গাড়ীর জোগাড় হইয়াছে। চেনা গাড়োয়ান ভেকারামের গাড়ী, কিন্তু ভেকারামের জ্বর আসিয়াছে—যাইবে তাহার ষোল বৎসরের পুত্র বিষণ। রতিরাম প্রস্তুত হইল।

নিশুতি রাত্রি! চারিদিকে নিস্তব্ধতা—সেই অখণ্ড নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটা অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে গাড়ী চলিয়াছে। দুই পাশে কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর। চন্দ্র ঢলিয়া পড়িয়াছে। বাঁশের ঝাড়ের ফাঁক দিয়া চন্দ্রের সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। কোথাও ঘরের পার্শ্বে দুই-একটি কুকুর এদিক হইতে ওদিকে যাতায়াত করিতেছে। পথের পার্শ্বে ঝোপ, তাহার ওধারে শস্যক্ষেত্র; কি শস্য বুঝা যায় না।

রতিরামের কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিল। সঙ্গে কিছু টাকা আছে; মাইলখানেক ত বস্তির মধ্য দিয়া চলিতে পারা যাইবে, তারপরই ত মাঠ—প্রায় দেড় মাইল ব্যাপী। তারপর মেচি নদী, তারও ওপারে বদরগঞ্জ। রতিরাম ভাবিল, জাগিয়া থাকিতে হইবে।

গাড়ী চলিয়াছে। বিষণ মাঝে মাঝে গরুর ল্যাজ নাড়িয়া দিয়া তাহার সহিত যে পশুটির অত্যন্ত নিকট-সম্বন্ধ আছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া জানাইতেছে। আর মাঝে মাঝে দুই-একটা গানের পদ অস্পষ্ট ভাষায় আবৃত্তি করিতেছে।

রতিরাম কথা কহিল। বলিল, কি রে বিষণা তোর সাদি হইয়াছে?

বিষণ বলিল—না, মহাজন। সকল মাড়োয়ারীকেই তাহারা মহাজন বলিয়া কথা বলে।

—তব্ রুপেয়াছে কেয়া কোরবি?

বিষণ বলিল—সে টাকা পাইলে বাপকে একটা কম্বল কিনিয়া দিবে; বেচারা শীতে বড় কাঁপে। আর বাকি কিছু থাকিলে তাহার ছোট ভাই 'মনিয়া'র জন্ম একটা ছোট আরশি কিনিয়া দিবে—যেমনটি সে-বার সে বদরগঞ্জের মেলায় দেখিয়া আসিয়াছে।

রতিরামের মনে পড়িল, তাহার ছোটছেলেটি একবার একখানা ছোট আরশি কিনিবার জন্ম জেদ ধরিয়াছিল। সে

কিনিতে দেয় নাই ; বলিয়াছিল, ফজুল। এ সবের দরকার নাই। আজ আবার তাহার কথা মনে পড়িল, সকল ছোট ছেলেরই কি আরশি কিনিবার সখ হয় ? ভাবিল, শীতের রাত্রে বিষণ চলিয়াছে ; গাড়ী আট আনায় ঠিক হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভালয় ভালয় পৌছিতে পারিলে সে তাহাকে আরও দু-পয়সা বকশিস্ দিবে—ভাবিতে ভাবিতে রতিরাম উদার হইয়া উঠিল।

মনটা আবার একফাঁকে বিকানীর রিয়াসতে চলিয়া গিয়াছে। এমনই করিয়াই কি চলিবে ? চলিবে বইকি ? তাহার চোখের সম্মুখেই ত ঘনশ্যামদাস দশ বৎসরের মধ্যে লাখো রূপেয়া উপার্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছে—একটা ধর্ম্মশালাও করিয়া দিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের খেতাব পাইয়াছে রায়-বাহাদুর। লক্ষ্মী মতলব করিলে কি না হয় ? তাহারও কি হইবে না ? আসিবে—তাহারও আসিবে—সবই ভাগ্যের খেলা। নসিবে থাকিলে লাগিয়া যাইবে ; শুধু ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে হয়।

আর কতদিন ? নসিব একবার খুলিয়া গেলেই রতিরাম একদম গদীয়ান হইয়া বসিবে। লোকে বলিবে, রতিরাম পেরিওয়াল লাখ পতি। না-হয়, কিছু দানধর্ম্মও করা যাইবে। তাহার কাছে কোথায় তুচ্ছ ছেলেপেলে লইয়া সংসার করা ; রুটির পয়সা জুটিলে, শাকচচ্চড়ির পয়সা জোটে না।

ভাবিতে ভাবিতে রতিরামের তন্দ্রা আসিয়া পড়িল। স্বপ্নে সে দেখিতে থাকিল, স্বয়ং লছমীজী তাহাকে দর্শন দিয়াছেন। তিনি তাহাকে বর মাগিতে বলিতেছেন। সে এই বর প্রার্থনা করিতেছে যেন বদরগঞ্জের বাজারে পাট খরিদ করিবার পরই কলিকাতার বাজার-দর মণ-প্রতি তিন টাকা বাড়িয়া যায়।

সহসা তন্দ্রা টুটিয়া আসে। জাগিয়া বসিয়া রতিরাম ভাবিল, সে কি বেকুব। এই সামান্য বর সে প্রার্থনা করে ? ভাবিতে ভাবিতে আবার তন্দ্রা আসিয়া পড়িল।

বস্তি ছাড়িয়া গাড়ী মাঠে পড়িয়াছে। প্রকৃতি যেন শীতার্ত্ত ; নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। উত্তরের বাতাস মাঝে মাঝে কম্পন আনিয়া দিতেছে—চারিদিকে উন্মুক্ত শস্যক্ষেত্র। রাস্তার পাশে পাশে কোথাও বাঁশের কোথাও আমের ঝাড় ; তাহার মধ্য হইতে কখনও দুই একটা বাদুড় কিচমিচ করিয়া উঠিতেছে—কখনও দুই-একটা শিয়াল পাশ কাটাইয়া ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতেছে। চন্দ্র ম্লান চোখে নিম্নের কুয়াশার পানে তাকাইয়া বিদায়-বেদনা জানাইতেছে। এই নিশুতি রাত্রে শুধু দুইটি শীতার্ত্ত ভাষাহীন প্রাণীর বোঝার পরিসমাপ্তি নাই। তাহারা চলিয়াছে—কতদূর যাইতে হইবে জানে না—নিরুদ্দেশে—অসহায়, ক্লান্ত।

ক্রমে গাড়ী নদীর ধারে আসিয়া পড়িল। নদীর নাম 'মেচি'—বৃটিশ-ভারত ও নেপালের সীমারেখা। এদিকে বিহার প্রদেশ, অন্যদিকে মোরং। 'মেচি' স্বাধীনতা ও পরাধীনতার যোগসূত্র রচনা করিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে।

শীতের পাহাড়ী নদী ; স্থানে স্থানে শুষ্ক স্রোতাবেগবিক্ষিপ্ত —জল তাহার হিমশীতল। গাড়ী কতদূর তাহার শুষ্ক বক্ষদেশের পাশ দিয়া চলিল। সিক্ত বালুকা ; জলের বক্ষ ঈষৎ আন্দোলিত হইলে যে-আকার ধারণ করে বালুর বক্ষও সেই আকার ধারণ করিয়া আছে। কোথাও অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে আধপ্রতিফলিত বালুকণা চিক্ চিক্ করিয়া উঠিতেছে। ওপারের বন দেখা যাইতেছে—কুয়াশার গাত্রাবাস পরিয়া স্তব্ধ, নিশ্চল। আকাশে তারা অগণ্য, তবে অমাবস্যার আকাশে যত দেখা যায় তত নয়।

বালুতটের পাশ কাটাইয়া গাড়ী নদীর বুকে পড়িল। জল বেশী নয়, কোথাও হাঁটু, কোথাও কোমর। ওপাড়ের কাছ ঘেঁষিয়া শুধু কোমরজল। বালুর বুকের উপর দিয়া তর্‌তর্ করিয়া জলের স্রোত চলিয়াছে ; হিমশীতল তাহার স্পর্শ ; স্পর্শমাত্র অবশ করিয়া আনে। স্রোত অসম্ভব রকমের। জল অগভীর কিন্তু অত্যন্ত স্বচ্ছ। বালুর বুক পরিষ্কার রূপে দেখা যায়।

চলিতে চলিতে সহসা গরু দুটি দাঁড়াইয়া গেল। বিষণ তাহার সনাতন পন্থা অনুসরণ করিয়া দেখিল তাহার পর যষ্টির দ্বারা আঘাতের পর আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি বলদযুগল একান্ত অনড় অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। অগ্রসর হইবার জন্য তাহারা আপ্রাণ চেষ্টা করিল সত্য, কিন্তু তাহাতে কোনো ফলোদয় হইল না।

বিষণ জলে নামিয়া পড়িল। হিমশীতল জলের স্পর্শ তাহাকে অবশ করিয়া ফেলিল তথাপি হাতড়াইয়া দেখিল,

সর্ব্বনাশ উপস্থিত। বলদদ্বয়ের পা ক্রমশঃ বালুতে ডুবিয়া যাইতেছে—গাড়ীর চাকা ক্রমশঃ বসিয়া যাইতেছে। জল সেখানে বেশী নয়, মাত্র হাঁটুর উপরে কিন্তু যেরূপ দ্রুত গতিতে গাড়ী ও বলদ বসিয়া যাইতেছে তাহাতে কিছুক্ষণ এরূপ ভাবে থাকিলে যে উভয়েরই একেবারে বালুকা-সমাধি হইয়া যাইবে তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। চাহিয়া দেখিল, সে 'লিক্' ভুলিয়া ভুলপথে জলের বুকে নামিয়াছে। বিষণ প্রমাদ গণিল।

সে চেঁচাইয়া উঠিল,—মহাজন, ও মহাজন। রতিরাম স্বপ্ন দেখিতেছিল। সহসা বিষণের চীৎকারে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়াই তাহার সমস্ত কথাটা মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িয়া গেল, সে রাত্রিকালে একক রওনা হইয়াছে আর সঙ্গে আছে দুই শত টাকা বিছানার বাণ্ডিলে বাঁধা। সঙ্গে সঙ্গে বাণ্ডিলে তাহার হাত পড়িল তাহার মনে কোনো সন্দেহই হইল না যে সত্য সত্যই সে এবার ডাকাতের হাতে পড়িয়াছে।

তড়াক্ করিয়া উঠিয়া বিছানার বাণ্ডিল বগলে লইয়া সে জলে নামিয়া দৌড়াইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু নামিবার পর আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। রতিরাম ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। একে শীতের নিদারুণ বাতাস, তাহার উপর এহেন অবস্থা; রতিরাম কাঁপিতেছিল। বিষণ প্রায় কাছে আসিয়া বলিল—এ কি মহাজন তুমিও কি ধ্বসনায় পড়িয়া গেলে নাকি?

রতিরাম আকুল হইয়াছিল বটে, কিন্তু বুদ্ধি একেবারে হারায় নাই। ধ্বসনায় পড়ার অর্থ সে জানিত, এখনও তাহার যথেষ্ট বোধগম্য হইল। এই সর্ব্বগ্রাসী পাহাড়ী নদীর বালুকা-সমাধির কথা তাহার অবিদিত ছিল না—ক্ষুধিত বালুকা, চিরন্তন জলস্রোতে তাহার তৃষ্ণা মিটে না—রক্তের তৃষা তাহার অপরিসীম, অনন্ত।

রতিরাম কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—বাবা বিষণ, সব কুছ দে দেয়গা—রক্ষা করো বাবা।

বিষণ অন্ধিসন্ধি জানিত। বলিল—দাঁড়াও মহাজন, দেখি কি করা যায়।

রতিরামের পায়ের চারিদিকে ক্রমশঃ বালু জমিয়া উঠিতেছে; অসহ্য শৈত্যে পায়ের চেতনা একেবারে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। রতিরাম ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া বলিল,—বিষণা, দো হজার রূপেয়া দেগা। অসহ্য শৈত্য তাহার আসন্ন বিপদকেও ছাপাইয়া উঠিতেছিল।

বিষণ সাহায্য করিল। ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়; দুই-চারি মিনিট ধস্তাধস্তির পর রতিরাম বালুকাগর্ভ হইতে মুক্তিলাভ করিল।

বিষণ বলিল—মহাজন, বলদ ধরিয়া টানিয়া তুলিতে হইবে, নহিলে উহাদের মরণ অনিবার্য্য।

রতিরাম বলিল—সে কি ক'রে হোবে, দু আদ্‌মীতে কি হোবে? অওর আদ্‌মী দেখি। বলিয়া সে আস্তে আস্তে এপারের দিকে অগ্রসর হইল।

বিষণ আবার চাকা ধরিয়া রথকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বলদযুগলের গাত্রে আঘাতের পর আঘাত পড়িতে লাগিল—সহস্র প্রকার ভাষায় সে পশুযুগলকে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সমস্তই বৃথা। আর্ত্ত পশুযুগল একবার করুণ নেত্রে বিষণের দিকে চাহিয়া পরক্ষণেই ওপারের দিকে চাহিতেছিল। শক্তিহীন, শীতার্ত্ত পশু, ভাষাহীন মুখে আপনার অনিশ্চিত ভবিষ্যত্‌কে দেখিয়া যেন ক্রমশঃ ভীত হইয়া পড়িতেছিল।

এই সংজ্ঞাহীন রজনীর অখণ্ড নিস্তব্ধতা, এই অনন্ত বিস্তৃত মাঠের অস্পষ্ট চন্দ্রালোকের অবিচ্ছিন্ন রূপ কুয়াশার আবরণ পড়িয়া ক্ষণে ক্ষণে বিষণকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছিল। বিষণ জোর করিয়া ভাবিতেছিল, রতিরাম এই আসিল বলিয়া। ভয় কি?

বিষণ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। পশুযুগলের ভীত, চকিত দৃষ্টি, নিম্নে বরফ-শীতল জলের স্পর্শ, পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ক্রমে তাহার পা অবশ হইয়া আসিতে লাগিল; বালুকাগর্ভ হইতে পা তুলিতে রীতিমত কষ্ট বোধ হইতে লাগিল—সে গাড়ীর উপর বসিল। বসিয়া বলদযুগলের গায়ে তাহার স্নেহহস্ত বুলাইয়া দিতে লাগিল। ভাষাহীন পশু তাহাদের আসন্ন বিপদের কথা বুঝিতে পারিয়াছে; আর্ত্তদৃষ্টিতে নিমন্ত মালিকের দিকে চাহিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে—বিষণ কাঁদিয়া ফেলিল। ক্রমশঃ গাড়ী আরও নীচে ধ্বসিয়া গেল; বলদদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া প্রায় জল ছুঁইল, শীতার্ত্ত পশুর কম্পন লাগিয়া

গেল। বিষণ ভাবিতে লাগিল, লোকজন লইয়া রতিরাম এখনও আসিয়া পড়িল না, নিশ্চয় শীঘ্র আসিবে।

রতিরাম তীরে উঠিয়া একটা বিড়ি ধরাইল। ভাবিল, ভারি ত বলদ—বিশ রূপেয়াতে তিন জোড়া মিলে—তাহার জন্য কি দুই শত টাকা ফেলিয়া দৌড়াইয়া যাওয়া যায়? দৌড়াইয়া গেলে লোকজন সংগ্রহ করিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসা যায় বটে, কিন্তু টাকাটা কোথায় রাখা যায়—খুচরা টাকা ও পয়সা; বাণ্ডিলটা আধ মণ ভারি হইয়াছে যে! আস্তে আস্তে যাওয়াই ভাল—আর এত রাত্রে লোকজনই বা কোথায়?

অর্দ্ধ মণ ভার বহিয়া রতিরাম যখন ধীরে ধীরে পল্লীর দিকে চলিতেছিল তখন মেচির গর্ভের বালুকারাশি ভেদ করিয়া দুইটি আর্ত্ত পশু ক্রমশঃ অনন্তের পথে অগ্রসর হইতেছিল। গাড়ীর উপর আর বসা যায় না—বিষণ গাড়ী ছাড়িয়া রতিরামের পথ চাহিয়া জলে দাঁড়াইয়া। বলদ দুটি মাত্র নাক জাগাইয়া রহিয়াছে—এখনও আসিতে পারিলে হয়।

বিষণ স্তব্ধ হইয়াই ছিল, এখন নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছে—কখনও বলদের দিকে, কখনও রতিরামের পথের দিকে চাহিতেছে। মেচির স্রোত বহিয়া চলিয়াছে—খরধার, শব্দ নাই, স্পর্শ তাহার হিমশীতল। স্বচ্ছ জলের মধ্য দিয়া সর্ব্বগ্রাসী বালুকা দেখা যাইতেছে। চন্দ্র ডুবিয়া যাইতেছে; এ-পারের ক্ষেত ও ও-পারের বন যেন সমস্ত একাকার হইয়া আসিতেছে।

ক্রমে আরও নীচে—আর্ত্ত পশু এবার উর্দ্ধনেত্রে আকাশমুখী হইয়া রহিয়াছে। বিষণ রতিরামের পথ চাহিয়া; হঠাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, চতুর্থীর চন্দ্র কখন লাল হইয়া একটা একচক্ষু বিরাট দৈত্যের মত দেখা দিয়াছে—এ-পারের একটা পত্রহীন বৃক্ষ যেন খলখল করিয়া হাসিতেছে, ও-পারের বন যেন ভ্রূকুটি করিয়া বিশ্বকে গিলিতে আসিতেছে।

বিষণ আবার চন্দ্রের দিকে চাহিল; একচক্ষু দানব তাহার সর্ব্বগ্রাসী চিরক্ষুধিত রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া যেন নিম্নের আর্ত্ত পশুযুগলকে গ্রাস করিতেছে—সমস্ত জলটা রাঙিয়া গিয়াছে। এমন কুৎসিত ও বীভৎস দৃশ্য সে জীবনে দেখে নাই!
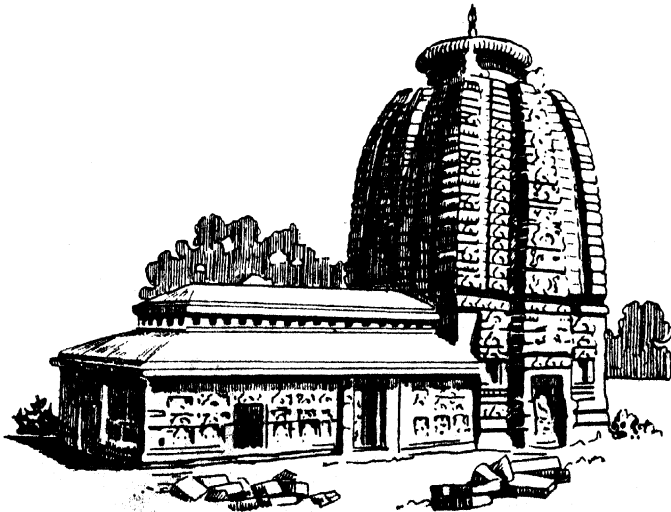
শব্দপ্রসঙ্গ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

আমাদের দেশের প্রাচীন শব্দশাস্ত্রের তুলনা নাই। তথাপি উহার রচনার পর বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত দেশ-বিদেশে যে-সব আলোচনা হইয়াছে তদনুসারে আমাদের প্রাচীন শব্দ নির্ব্বাচন-পদ্ধতির সংস্কার যে নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। পরবর্ত্তী কয় পঙ্‌ক্তিতে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

আমাদের বৈয়াকরণদের মধ্যে যদি কোনো অতি বিচক্ষণকেও জিজ্ঞাসা করা যায় যে, √দৃশ্‌ ধাতুর বর্ত্তমান কালে প্রথম পুরুষের এক বচনে রূপ কি, তবে তিনি সঙ্গে-সঙ্গেই উত্তর দিবেন পশ্যতি। কিন্তু ইহা কি সঙ্গত উত্তর? √দৃশ্‌ ধাতুর দকার-স্থানে পকার কিরূপে হইল? সহস্র নৈরুক্ত সমবেত হইলেও ইহার উত্তর দিতে পারিবেন না। এখানে পশ্যতি বস্তুত √দৃশ্‌ ধাতুর রূপ নহে, ইহা দর্শন অর্থেই প্রযুক্ত √স্পশ্‌ ধাতুর রূপ। ইহা হইতেই স্পষ্ট, স্পশ ('চর'), ও পস্পশা ('ব্যাকরণমহাভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের নাম') এই তিনটি শব্দ লৌকিক সংস্কৃতে দেখা যায়। পস্পশে, পস্পশান, ইত্যাদি বহু রূপ বৈদিক সংস্কৃতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত কতকগুলি রূপে স্পশ্‌ ধাতুর সকার লোপের কারণ বাহুল্য-ভয়ে এখানে আলোচনা করিলাম না। তুলনীয়—স্পৃধ্‌ ধাতু হইতে পস্পর্ধে।

√স্থা ধাতু হইতে তিষ্ঠতি, ঘ্রা ধাতু হইতে জিঘ্রতি, √পা ধাতু হইতে পিবতি। কিন্তু কিরূপে এই সব হইল? ব্যাকরণে বলা হইয়াছে √স্থা-প্রভৃতির স্থানে তিষ্ঠ্‌ প্রভৃতি আদেশ হয়। ইহা ঠিক উত্তর নহে। কিরূপে ইহা হইল তাহা ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ইহার উত্তর খুবই সোজা, তথাপি সমগ্র পাণিনি পড়িলেও ছাত্রেরা সাধারণত বলিতে পারিবে না যে, √স্থা প্রভৃতির অভ্যাস বা দ্বিত্ব হওয়ায় ঐরূপ পদ হইয়াছে। তুলনীয়—√স্থা হইতে সনন্তে তিষ্ঠাসতি, √ঘ্রা হইতে জিঘ্রাসতি, ইত্যাদি।

এই পদ্ধতিতেই √জক্ষ্‌, √জাগৃ, √দরিদ্রা, √চকাস্‌ এই কয়টি মূল ধাতু নহে, কিন্তু যথাক্রমে √ঘস্‌, √গৃ, √দ্রা, ও √কাস্‌ এই কয়টি ধাতুর অভ্যস্ত রূপ।

√বৃধ্‌, √ঋধ্‌, ও √এধ্‌ এই তিনটি ধাতু পরস্পর ভিন্ন বলিয়া ব্যাকরণে গৃহীত হইলেও বস্তুত একই √বৃধ্‌ ধাতু √ঋধ্‌ ও √এধ্‌ এই দুই আকার ধারণ করিয়াছে। বৃণোতি ও ঊর্ণোতি একই বৃ ধাতুর রূপ। বৃষভ শব্দেরই রূপান্তর ঋষভ।

শাব্দিকেরা আমাদিগকে পড়াইয়া থাকেন, অপর শব্দ স্থানে পশ্চ আদেশ হয়, তাহার পর আৎ (আতি) প্রত্যয় করিয়া পশ্চাৎ হয়। কিন্তু পশ্চার্দ্ধ হয় কিরূপে? তাঁহারা বলেন, পশ্চাৎ স্থানে পশ্চ আদেশ, পশ্চ + অর্দ্ধ = পশ্চার্দ্ধ। এত কষ্টকল্পনা নিরর্থক। বস্তুত পশ্চ ইহাই একটি মূল শব্দ, ইহারই পঞ্চমীর এক বচনে পশ্চাৎ। ইহাকে অব্যয় বলিয়া গণ্য করিবার উপযুক্ত কারণ নাই। বৈদিক ভাষায় এই পশ্চ হইতেই তৃতীয়ার এক বচনে পশ্চা হয়। পশ্চ হইতেই অতিশায়ন অর্থে প্রযুক্ত ম-প্রত্যয়ের যোগে পশ্চিম, পশ্চাৎ হইতে ইহা হয় নাই। অতএব "অগ্রপশ্চাড্‌ ডিমচ্‌" এইরূপ সূত্র নিষ্প্রয়োজন।

বৃহস্পতি শব্দ প্রসিদ্ধ। শাব্দিকেরা বলেন, বৃহৎ শব্দের ত কারের লোপে ও সকারের আগমে বৃহৎ-পতি হইতে ইহা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। ব্রহ্মণস্পতি, বাচস্পতি, দিবস্পতি, ইত্যাদি স্থানে যেমন যথাক্রমে ব্রহ্মণঃ (স্), বাচঃ (স্), দিবঃ (স্), ইত্যাদি ষষ্ঠ্যন্ত পদ, প্রকৃত স্থলেও সেইরূপ বৃহঃ (স্) হইতেছে বৃহ্‌ শব্দের ষষ্ঠ্যন্ত পদ, তাহার পর পতি শব্দ থাকায় বৃহস্পতি।

বৈদিক ভাষায় চনিশ্চদৎ ইত্যাদি ক্রিয়াপদ, এবং পুরুশ্চন্দ্র, সুশ্চন্দ্র, বিশ্বশ্চন্দ্র, ইত্যাদি শব্দ পাওয়া

যায়। এইরূপ হ রি শ্চ ন্দ্র শব্দ বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে আছে। এই সমস্ত পদই মূল √শ্চ ন্দ্ হইতে উৎপন্ন। ইহারই শকার-লোপে পরে √চ ন্দ্ হইয়াছে। কিন্তু বৈয়াকরণেরা হ রি চ ন্দ্র হইতে হ রি শ্চ ন্দ্র হইয়াছে বলিয়া উভয় শব্দের মধ্যে শকার-আগমের বিধান করিয়াছেন। ইহা করিবার আবশ্যকতা ছিল না। মূলত শ্চ ন্দ্র হইতেই আমাদের চ ন্দ্র হইয়াছে।

প্রসঙ্গত একটা কথা এখানে আলোচনা করা যাইতে পারে। চ ন্দ্র মা ঃ (চ ন্দ্র ম স্) ও চ ন্দ্র পর্য্যায় শব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু বস্তুত ইহাদের অর্থে কিছু ভেদ আছে। চ ন্দ্র শব্দের যৌগিক বা আক্ষরিক অর্থ 'উজ্জ্বল', 'দীপ্তিমান্'; কারণ শ্চ ন্দ্ অথবা চ ন্দ্ ধাতুর অর্থ 'দীপ্তি পাওয়া'। উহার 'আহ্লাদিত করা' অর্থ গৌণ। মাঃ (ম স্) শব্দের অর্থ 'চন্দ্র, চাঁদ'। পূর্ব্বে চন্দ্রের প্রত্যক্ষ উদয়াস্ত দেখিয়া কাল মাপা হইত বলিয়া উহার নাম হইয়াছিল মাঃ (ম স্, √ম স্ অথবা √মা ধাতু হইতে), অতএব চ ন্দ্র মাঃ শব্দের পূর্ব্বে মূল অর্থ ছিল 'উজ্জ্বল চ ন্দ্র'। পরে বিশেষণবাচক শব্দের অর্থটি লুপ্ত হওয়ায় কেবল 'চাঁদ' মাত্র বুঝাইতে ঐ শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে। মাঃ অর্থাৎ চন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ থাকায় চৈত্রাদি মাসকে মা স বলা হয়।

শাব্দিকেরা তদ্ধিত প্রত্যয়-প্রকরণে বলিয়াছেন যে, ই ষ্ঠ প্রভৃতি প্রত্যয়ের যোগে প্র শ স্য স্থানে শ্র, বৃ দ্ধ স্থানে জ্য, যু ব ন্ ও অ ল্প স্থানে ক ন, স্থূ ল স্থানে স্থ ব, দূ র স্থানে দ ব, ইত্যাদি আদেশ হইয়া থাকে, এবং এইরূপে যথাক্রমে এই সমস্ত পদ হয়ঃ—শ্রে ষ্ঠ, জ্যে ষ্ঠ, ক নি ষ্ঠ, স্থ বি ষ্ঠ, দ বি ষ্ঠ, ইত্যাদি। কিন্তু কিরূপে ইহা সম্ভব হয়? কি প্রকারে প্র শ স্য প্রভৃতির স্থানে শ্র-প্রভৃতি হইতে পারে? বস্তুত ই ষ্ঠ প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয় নহে, কৃৎ প্রত্যয়; আর শ্র-প্রভৃতিও প্র শ স্য-প্রভৃতি হইতে নহে, √শ্রি-প্রভৃতি ধাতু হইতেই ঐ সমস্ত পদ হইয়াছে। √শ্রি হইতে শ্রে ষ্ঠ, √জ্যা হইতে জ্যে ষ্ঠ, √ক ন্ (যাহা হইতে ক ন্যা) ক নি ষ্ঠ, √স্থূ (যাহা হইতে স্থূ ল, স্থ বি র) হইতে স্থ বি ষ্ঠ, √দূ ধাতু (যাহা হইতে দূ র, দূত) হইতে দ বি ষ্ঠ; ইত্যাদি।

উ চ্চ ও নী চ শব্দ সুপ্রসিদ্ধ। ইহাদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে "উচ্চম্ উচ্চিনোতেঃ, 'অন্যেভ্যোঽপীতি' (পাণিনি, ৩. ২. ১০১) অ প্রত্যয়ঃ", অর্থাৎ উ ৎ উপসর্গ পূর্ব্বক √চি ধাতুর উত্তর অ প্রত্যয়ের যোগে উ চ্চ শব্দ হইয়াছে। আর নী চ শব্দের নির্ব্বচন দেখান হইয়াছে—"নিকৃষ্টাম্ ঈং লক্ষ্মীং চিনোতি;" অর্থাৎ যে নিকৃষ্ট লক্ষ্মীকে সঞ্চয় করে সে নী চ। ইহার ব্যুৎপত্তি নি (= নিকৃষ্ট) + ঈ (= লক্ষ্মী) + চি + অ।[১] এই নির্ব্বচন অতিকষ্টকল্পিত। এইরূপ কত শত আছে বলিয়া শেষ করা যায় না। উণাদি প্রত্যয়ের মধ্যে প্রদর্শিত ব্যুৎপত্তিসমূহের অনেকগুলি এইরূপ অত্যন্ত কষ্টকল্পিত। পালিতেও এইরূপ নির্ব্বচন অত্যন্ত বেশী। যাহাই হউক, আলোচ্য শব্দ দুইটি কিরূপে হইয়াছে আমরা আলোচনা করিয়া দেখি। সংস্কৃতে অ ব চ শব্দ আছে, যেমন উ চ্চা ব চ শব্দের মধ্যে। অ ব চ ও নী চ অর্থত একই। অ ব অর্থাৎ অধোদিকে যাহা গমন করে (√অ চ্ অথবা √অ ঞ্চ্ ধাতু)[২] তাহা অ ব চ। অ চ্ ধাতুর আকারের লোপ হওয়ায় (কেন লোপ হইয়াছে পরে একটু বলিতে চেষ্টা করিব) অ বা চ না হইয়া অ ব চ। 'দক্ষিণ দিক' অর্থে অ বা চ্, ও অ বা চী শব্দও আছে। যেমন অ ব উপসর্গ-পূর্ব্বক অ চ্ ধাতু হইতে অ ব চ, ঠিক তেমনি উ ৎ উপসর্গ-পূর্ব্বক √অ চ্ ধাতু প্রথমে উ দ চ (স্মরণীয় উ দ চ্, উ দী চী 'উত্তর দিক্'), তাহার পর অ চ্ ধাতুর অকারের লোপ হওয়ায় উ চ্চ। ইহার আক্ষরিক অর্থ 'যাহা উপরের দিকে যায়।' সংস্কৃত উ চ্চা ব চ শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'উচ্চ-নীচ', গৌণভাবে 'বিবিধ' অর্থে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

যেমন অ ব-পূর্ব্বক √অ চ্ ধাতু হইতে অ ব চ, সেইরূপ নি-পূর্ব্বক √অ চ্ হইতে নী চ। স্মরণীয় ন্য ক্। নি + অ চ্ হইতে অকারের লোপে নি চ ইহাই হইবার কথা, মনে হইতে পারে, কিন্তু বস্তুত তাহা না হইয়া নী চ ইহাই হইবে। কারণ মূলত নি অ চ এখানে তিনটি অক্ষর (syllable) থাকে, তিনটি অক্ষরে তিনটি মাত্রা। এখন অকারের লোপ হইলে

১। "উচ্চৈস্ত্বমন্যত্র বা 'অর্শআদিভ্যোঽচ্'" (পা. ৫. ২. ১২৭)। ইহাও চমৎকার!

২। অবাক্ অধো বা অঞ্চতীতি অ ব চ ম্।

মধ্যের একটি মাত্রা কমিয়া যায়, কিন্তু ভাষার প্রকৃতি (genius) ঐ মাত্রাটিকে যে-কোনোরূপে হউক বজায় রাখিতে চাহে। তাই আলোচ্য স্থলে নি উপসর্গের ইকারকে দীর্ঘ করিয়া অর্থাৎ নি-কে নী করিয়া দিয়া তাহা রক্ষা করা হইয়াছে; নি অ এখানে দুই মাত্রা ছিল, নী এখানেও সেই দুই মাত্রা থাকিল। উ দ চ হইতে উ চ্চ হইয়াছে বলিয়াছি। উ দ চ শব্দেও মূলত তিন অক্ষরে তিন মাত্রা ছিল, পরে অকারটা লোপ হওয়ায় একটি মাত্রারও লোপ হইল, পদটি হইয়া গেল উ চ্চ। এখানে পরে সংযুক্ত বর্ণ থাকায়, পূর্ব্ববর্ত্তী উকারে প্রথমে মূলত এক মাত্রা থাকিলেও এখন গুরু বলিয়া তাহাতে দুই মাত্রা হইয়া গেল, এবং মোটের উপর মধ্যের দুই মাত্রা রক্ষিত হইল। মাত্রাকে ঠিক রাখিতে হইয়াছে বলিয়াই দ্বি+অ প হইতে দ্বী প, প্র তি+অ প হইতে প্র তী প, অ নু+অ প হইতে অ নূ প, ইত্যাদি অনেক; সর্ব্বত্রই হ্রস্ব হইয়াছে দীর্ঘ।

পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অকারের লোপ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলি। √অ স্ হইতে অ স্তি, স্তঃ, স ন্তি এই সব পদ হয়। এখানে দেখা যাইতেছে প্রথম পদটিতে ধাতুর অকার আছে, কিন্তু শেষের দুইটিতে ইহা নাই। কেন এরূপ হয়, ইহার কারণ কি? ইহাই কারণ যে, উদাত্ত ও অনুদাত্ত এই দুই স্বরের মধ্যে উদাত্ত অনুদাত্ত হইতে প্রবল। বহু স্থলেই প্রবল দুর্ব্বলকে পরাভব করিয়া থাকে, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। প্রবল স্বরও এইরূপ দুর্ব্বল স্বরকে পরাভব করে। পরাভূত স্বর টিকিতে না পারিয়া তিরোহিত হইয়া যায়। আলোচ্য স্থলে অ স্-তি এই পদে ধাতুর স্বর অর্থাৎ অ সে র অকার উদাত্ত, আর প্রত্যয়ের স্বর অর্থাৎ তি, ইহার ইকার অনুদাত্ত। ধাতুস্বর অকার উদাত্ত এবং এই জন্যই প্রবল হওয়ায় ইহা ঠিক রহিয়াছে, লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু স্তঃ ও স ন্তি এই দুই পদে প্রত্যয়ের অর্থাৎ ত স্ ইহার অকার, ও অ ন্তি ইহারও অকার উদাত্ত, এই জন্য ইহারাই প্রবল। ইহারাই প্রবল হওয়ায় অনুদাত্ত ধাতুস্বর অর্থাৎ অ সে র অকার দুর্ব্বল, এবং এই দৌর্ব্বল্য হেতু তাহা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট সকারটি উপায়ান্তর না থাকায় প্রত্যয়-স্বরকে আশ্রয় করিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, সাধারণত একটি পদে একটিমাত্র স্বর উদাত্ত হয়। এই √অ স্ ধাতুর উত্তর অ ৎ (শতৃ) প্রত্যয়ে স ৎ পদ হয়। এখানেও প্রত্যয়-স্বর অর্থাৎ অ তে র অকার উদাত্ত, তাই ইহাই প্রবল, এবং ধাতু-স্বর অ সে র অকার অনুদাত্ত, এবং তজ্জন্য দুর্ব্বল, দৌর্ব্বল্য হেতু পরাভূত হইয়া ইহা লুপ্ত হইয়াছে।

√হ ন্ হইতে হ ন্তি। এই পদে ধাতুর অর্থাৎ হ নে র অকার উদাত্ত, তাই ইহা ঠিক আছে। কিন্তু উহারই অপর রূপ (প্রথম পুরুষ, বহু বচনে) ঘ্ন ন্তি। এখানে প্রত্যয়-স্বর অ ন্তি র অকার উদাত্ত, তাই তাহা প্রবল বলিয়া ঠিক আছে, কিন্তু ধাতুস্বর হ নে র অকার অনুদাত্ত বলিয়া দুর্ব্বল হওয়ায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হ ন্ ধাতুর পূর্ব্বরূপ ছিল ঘ ন্, প্রথম পুরুষের বহু বচনে সেই জন্যই হ ন্তি না দেখিয়া আমরা ঘ্ন ন্তি দেখিতে পাই। হ ন্ ধাতু হইতে জ ঘা ন প্রভৃতি হওয়ারও ইহাই কারণ। এই সব পদে হ নে র পূর্ব্ব রূপ দেখা যাইতেছে। পরে ঘ স্থানে হ হইয়াছে।

√চি ৎ হইতে চে ত তি পদ হয়, কিন্তু √তু দ্ হইতে হয় তু দ তি, তো দ তি নহে। ইহার একমাত্র ইহাই কারণ যে, ভ্বাদিগণীয় ধাতুর এইরূপ স্থলে ধাতুস্বর উদাত্ত এবং তজ্জন্যই তাহার গুণ হয়; আর তুদাদিগণীয় ধাতুর বিকরণ স্বর উদাত্ত হয়, এবং সেই জন্যই ধাতুস্বরের গুণ হইবার কারণ থাকে না। তুদাদিগণের বিকরণ স্বর হইতেছে অকার (তু দ্‌—অ—তি, এখানে অকার বিকরণ)। অকারের গুণ হয় না। উদাত্তাদি স্বর হেতু রূপভেদ থাকাতেই ভ্বা দি ও তু দা দি নামে দুইটি গণ করিতে হইয়াছে।

√ব চ্ ধাতু হইতে ব চ স্ ও উ ক্ত এই দুই পদই আমরা পাই, কিন্তু একটিতে বকার ঠিকই আছে, অপরটিতে তাহা উকাররূপে পরিণত হইয়াছে। এখানেও সেই একই কারণ, ব চ্‌—অ স্ এখানে ধাতুস্বর ব চে র অকার উদাত্ত, তাই তাহার প্রাবল্য হেতু বকার অবিকৃত ভাবেই আছে। কিন্তু ব চ্‌—ত=উ ক্ত, এখানে প্রত্যয়-স্বর তকারের অকার উদাত্ত, এবং তজ্জন্য প্রবল, আর ধাতুস্বর ব চে র অকার অনুদাত্ত বলিয়া দুর্ব্বল, তাহাতেই তদাশ্রিত বকার বিকৃত হইয়া উকার হইয়া পড়িয়াছে।

দে বী শব্দের প্রথমার এক বচনে দে বী, ইহার অন্ত্য স্বরটি উ দা ত্ত, তাই তাহা ঠিকই আছে। কিন্তু সম্বোধনের এক বচনের রূপ দে বি, শেষের স্বর দীর্ঘ না থাকিয়া হ্রস্ব

হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ, সম্বোধনে শব্দটির প্রথম স্বর, এখানে একার, উদাত্ত হয়, শেষের স্বরটি হয় অনুদাত্ত। তাই প্রথম স্বরটি অবিকল থাকে, কিন্তু শেষের স্বরটি বিকল হইয়া, হ্রস্ব হইয়া পড়ে।

সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত মধুরতর। অনুভবই ইহার পরম প্রমাণ। রাজশেখর বলিয়াছেন, সংস্কৃতবন্ধ কঠোর, প্রাকৃত-বন্ধ সুকুমার; পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে ভেদ, সংস্কৃত ও প্রাকৃতেরও মধ্যে সেই ভেদ। বাক্‌পতি বলিয়াছেন, নব-নব অর্থের দর্শন, আর সন্নিবেশশিশির বন্ধনসম্পদ্ এই সব সৃষ্টিকাল হইতে নিবিড়ভাবে প্রাকৃতেই পাওয়া যায়। তা যাহাই হউক, এই জন্যই যে সংস্কৃত-অনুশীলনকারীকে প্রাকৃত আলোচনা করিতে হইবে তাহা এখানে বলা হইতেছে না। ইহাও বলা হইতেছে না যে, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য আলোচনার জন্য পালি-প্রাকৃত পড়িতে হইবে। পালি-প্রাকৃত না জানিলে সংস্কৃতে প্রযুক্ত অনেক কথারই অর্থ পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় না, এবং সেই জন্য অনেক স্থানে বিকৃত বা ভুল অর্থ করিয়া ফেলা হয়। সেই জন্য উহা আলোচনা করা আবশ্যক। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাউক :—

পূর্ব্বে প শ্চ শব্দের কথা তুলিয়াছি। উহাই লইয়া আর একটু আলোচনা করি। 'লেজ' অর্থে পু চ্ছ শব্দ বৈদিক ভাষাতেও চলিত আছে। ইহার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনে পণ্ডিতগণকে ব্যাকুল হইতে দেখা যায়। কিন্তু একটু প্রাকৃতের জ্ঞান থাকিলে সহজেই বুঝা যায় যে, ইহা প্রাকৃতের ধ্বনিতত্ত্ব-অনুসারে প শ্চ শব্দ হইতে হইয়াছে। সংস্কৃত প শ্চি ম প্রাকৃতে বা ভাষায় প চ্ছি ম। এখানে শ্চ যেমন চ্ছ হইয়াছে, আলোচ্য স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। বলা হইয়াছে—

"পুচ্ছঃ পশ্চাৎপ্রদেশঃ স্যাল্ লাঙ্গুলে পুচ্ছমিষ্যতে।"

অর্থাৎ পুংলিঙ্গে পু চ্ছ শব্দের অর্থ 'পশ্চাৎ প্রদেশ,' আর ক্লীবলিঙ্গে তাহার অর্থ 'লেজ'। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, পু চ্ছ শব্দের অর্থ প্রথমে 'পশ্চাৎ প্রদেশ' হইল, পরে পশ্চাৎ প্রদেশে স্থিত 'লেজ' অর্থ হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, প শ্চ শব্দের পকারে অকার, কিন্তু পু চ্ছ শব্দের পকারে উকার, কিরূপে ইহা হইতে পারে? ইহার উত্তর এইরূপে দিতে পারা যায়। আলোচ্য স্থলে পকার ওষ্ঠ্য বলিয়া তৎসংলগ্ন স্বর কণ্ঠ্য হইলেও ওষ্ঠ্যরূপে পরিণত হইয়াছে, অর্থাৎ পকারের প্রভাবে অকার উকার হইয়াছে। যেমন √ মৃ ধাতু হইতে মু মূ র্ষা, √ পৄ ধাতু হইতে পূ র্ণ; এখানে মকার ও পকার ওষ্ঠ্য বলিয়া ঋকার বা ৠকারের স্থানে ওষ্ঠ্য স্বর উকার বা ঊকার হইয়াছে। আবার কৃ ধাতু হইতে চি কী র্ষা, এখানে চকার তালব্য বলিয়া তৎসংলগ্ন ঋকার তালব্য স্বর অর্থাৎ ইকার হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, পূর্ব্ববর্ত্তী ধ্বনি যেমন কখনো কখনো পরবর্ত্তী ধ্বনিকে প্রভাবিত করে, সেইরূপ পরবর্ত্তীও ধ্বনি কখনো কখনো পূর্ব্ববর্ত্তী ধ্বনিকে প্রভাবিত করে।

'শিখণ্ড' অর্থে সংস্কৃতে পি চ্ছ শব্দের প্রয়োগ আছে। কিন্তু বস্তুত ইহা সংস্কৃত নহে, প্রাকৃত। ইহা প ক্ষ শব্দ হইতে হইয়াছে। সংস্কৃতের ক্ষ প্রাকৃতে তিন আকারে দেখা যায়; (১) খ (অথবা ক্খ), যথা, সং. ভ ক্ষ ণ, প্রা. ভ ক্ খ ণ; (২) ছ (অথবা চ্ছ), যথা, সং. কু ক্ষি, প্রা. কু চ্ছি; (৩) ঝ (অথবা জ্ঝ), যথা, সং. ক্ষা ম, প্রা. ঝা ম। এই নিয়মে প ক্ষ শব্দের প্রাকৃতে দুইটি রূপ দেখা যায়, প চ্ছ ও প ক্ খ। প চ্ছ হইতে পি চ্ছ। পরবর্ত্তী চ্ছ তালব্য হওয়ায় তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অকার কণ্ঠ্য হইলেও তালব্য ইকারের রূপে পরিণত হইয়াছে। আবার পি চ্ছ হইতে প্রাকৃতে যা দৃ চ্ছি ক সা নু না সি কী ক র ণে র (Spontaneous Nazalization) নিয়মে (পরে দেখুন) পিং ছ (অথবা পিঞ্ছ) শব্দও হইয়া থাকে। আর প ক্ খ হইতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পুং খ অথবা পু ঙ্খ হয় এবং ইহাও সংস্কৃতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা (র ঘু ব ং শ, ২.৩১)—

"সক্তাঙ্গুলিঃ সায়ক পু ঙ্খ এব
চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাব ত স্থে।"

ইত্যাদি অনেক। ইহা হইতে ভা গ ব তে ও বাঙলায় সাধারণত প্রচলিত পু ঙ্খা নু পু ঙ্খ শব্দের অর্থ বস্তুত কি তাহা বুঝা যাইবে। উদ্ধৃত সংস্কৃত বাক্যটিতে প্রযুক্ত 'সায়ক-পুঙ্খ' শব্দটির অর্থ বাণের নীচের দিকে বা মূলে বাঁধা পাখীর পালক। একটি পালকের পর আর একটি পালক, তাহার পর আর একটি পালক, এইরূপে যেমন পালকগুলি বাঁধা হয়, তেমনি একটির পর একটি, তাহার পর আর একটি এইরূপ ধারাবাহিক ভাবে কোনো বস্তুর বিভিন্ন অবস্থাকে অনুসরণ

করিয়া বিচার করাকে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করা বলি।

পূর্ব্বে যাদৃচ্ছিক সানুনাসিকীকরণের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ভাষার প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সংযুক্ত বর্ণ-স্থলে যদি পূর্ব্বের বর্ণটির লোপ হয় তবে বহু স্থলে ঐ লুপ্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরটি সানুনাসিক হইয়া যায়। কেন হয় ইহা বলা শক্ত। এই সানুনাসিক করাকেই যাদৃচ্ছিক সানুনাসিকীকরণ বলা হয়। সং. অক্ষি, প্রা. অক্খি। এখানে ককারের লোপ ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অকার (যাহা নিজের গুরুমাত্রাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য আকার হইয়া যায় তাহা) সানুনাসিক হওয়ায় বাংলায় অক্খি হইতে আঁখি হইয়াছে। এই নিয়মেই মূল লক্ষণ হইতে প্রা. লচ্ছণ, ইহা হইতে লাঞ্ছন। কিন্তু ইহা সংস্কৃতে খুবই চলে; যেমন, মৃগলাঞ্ছন 'চন্দ্র'। এইরূপ মার্জন হইতে মজ্জন, এবং তাহা হইতে মঞ্জন। কবিরাজ মহাশয়দের দন্তমঞ্জনের মঞ্জন সংস্কৃত নহে। এইরূপেই ক্রমশ সং. গর্জন > প্রা. গঞ্জন; সং. কর্ত্তক > প্রা. কণ্টক; ইত্যাদি অনেক, অনেক।

সংস্কৃতে বিকট শব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদ হইতেই দেখা যায়। কিন্তু ইহা একেবারে খাঁটি সংস্কৃত নহে। মূল বিকৃত হইতে প্রাকৃতের প্রভাবে বিকট এই শব্দ হইয়াছে। এখানে ঋকার মূর্দ্ধন্য বলিয়া তাহার সংসর্গ ও প্রভাবে দন্ত্য তকার মূর্দ্ধন্য টকারে পরিণত হইয়াছে। ঋগ্বেদে বিকৃত ও বিকট এই দুই পদই পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী শাব্দিকেরা বিকট পদের যথার্থ সমাধান করিতে না পারায় এবং সঙ্কট, উৎকট ইত্যাদি বহু পদ দেখিয়া স্বতন্ত্র √কট্ ধাতু কল্পনা করিয়াছেন। এইরূপেই বস্তুত মূল সংস্কৃত ভৃত (√ভৃ+ত) হইতে ভট, আর বস্তুত উদ্ভৃত হইতেছে উদ্ভট। উদ্ভৃত শব্দের অর্থ 'উদ্ধৃত' (√ভৃ ধাতুর অর্থ 'ধারণ' ও 'পোষণ', এখানে 'ধারণ')। তাই উদ্ভট কবিতার আসল অর্থ 'উদ্ধৃত (quoted) কবিতা।' ব্যাকরণে √ভট নামে একটি স্বতন্ত্র ধাতু কল্পিত হইয়াছে।

√পত্ ধাতুই তকার স্থানে টকার হওয়ায় পট্ আকার ধারণ করিয়াছে। উৎপাতয়তি আর উৎপাটয়তি বস্তুত একই।

√পিষ্ + ত হইতে পিষ্ট, প্রা. পিট্ঠ, ইহা হইতে ক্রমশ পীড়। ইহাই নামধাতুরূপে গৃহীত হয়। তাহা হইতে পীড়য়তি, পীড়ক, পীড়িত প্রভৃতি পদ হইয়াছে।

সংস্কৃতে মনোরথ শব্দ খুবই প্রচলিত। কিন্তু ইহার ব্যুৎপত্তি কি? শাব্দিকেরা বলিবেন "মন এব রথোঽত্র। মনো রথ ইব বা।" এখানে যেমন-তেমন করিয়া শব্দ-সন্নিবেশটা দেখান হইয়াছে, যথাভূত অর্থের দিকে কোনো লক্ষ্য রাখা হয় নাই। মূলত প্রথমে ছিল মনোর্থ (= মনোঽর্থ)। ইহার আক্ষরিক অর্থ মনের প্রার্থনীয় বিষয়। যেমন, দর্শন হইতে দরশন, তর্পণ হইতে তরপণ, ইত্যাদি স্বরভক্তি হেতু বিপ্রকর্ষণে উৎপন্ন, সেইরূপ মনোর্থ হইতে মনোরথ শব্দও উৎপন্ন হইয়াছে।

গেহ শব্দ সংস্কৃতে আছে, বৈদিক ভাষাতেও ইহার প্রয়োগ আছে। কিন্তু বস্তুত ইহা প্রাকৃত। √গ্রহ (< মূল √গ্রভ্) হইতে গৃহ > *গ্রেহ > গেহ। ঋ কখনো-কখনো রে হইয়া উচ্চারিত হয়। যজুর্ব্বেদের এক শিক্ষার অনুসরণে কৃষ্ণোঽসি উচ্চারিত হয় ক্রেষ্ণোঽসি। পালি-প্রাকৃতেও এইরূপ আছে। এই নিয়মে গৃহ হয় *গ্রেহ। পরে প্রাকৃতে রফলার লোপ হয় বলিয়া গ্রেহ হইতে গেহ।

সংস্কৃতে কদন্ন, কদর্থ, কদুষ্ণ ইত্যাদি শব্দ আছে। বৈয়াকরণেরা বলিবেন, এই সকল স্থলে কু শব্দ স্থানে কদ্ আদেশ হইয়াছে (পাণিনি ৬. ৩. ১০১)। কিন্তু ইহার কোনো প্রমাণ নাই। এইরূপ কাপুরুষ, কাপথ, ইত্যাদি স্থলে তাঁহাদের মতে কু শব্দ স্থানে কা আদেশ হইয়াছে। কিন্তু ইহাও কল্পনামাত্র।

যেমন যদ্, তদ্, এতদ্, অন্যদ্ (তুলনীয় অন্যদীয়, ক্লীবলিঙ্গের এক বচনে অন্যদ্), মদ্ (তুলনীয় মদীয়), ত্বদ্ (তুলনীয় ত্বদীয়), ভবদ্, ইত্যাদি সর্ব্বনাম দকারান্ত, তেমনি প্রসিদ্ধ কিম্ শব্দেরই অর্থে দকারান্ত কদ্ শব্দ।

'সে কি সখা?' ইহা বলিলে অনেক সময়ে আমরা বুঝি যে, সে কুৎসিত বা নিন্দিত সখা। এখানে কি শব্দে (বা সংস্কৃত কিম্ শব্দে) নিন্দা প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য, সংস্কৃতে এরূপ প্রয়োগ অনেক; যেমন, ভারবি লিখিয়াছেন—

"স কিংসখা সাধু ন শাস্তি যোঽধিপং
হিতান্ন যঃ সংশৃণুতে স কিংপ্রভুঃ।"

কুৎসিত বা নিন্দিত অর্থে প্রযুক্ত এই কদ্ শব্দের পর অন্ন প্রভৃতি শব্দ যোগ করিয়া কদন্ন প্রভৃতি হইয়াছে।

যদ্ + দৃশ হইতে যাদৃশ, তদ্ + দৃশ হইতে তাদৃশ, মদ্ + দৃশ হইতে মাদৃশ, ইত্যাদি। এই সমস্ত স্থলে যদ্ প্রভৃতির দকারের লোপে যা প্রভৃতি। সেইরূপ কদ্ + পুরুষ, কদ্ + পথ, ইত্যাদি স্থলেও দকারের লোপে কদ্ স্থলে কা হয়, এবং এইরূপে কাপুরুষ, কাপথ, ইত্যাদি শব্দ হইয়াছে।

কদা শব্দ সুপ্রসিদ্ধ। ইহা এই কদ্ হইতেই তৃতীয়ার এক বচনে হইয়াছে, যেমন তদ্ হইতে তদা, যদ্ হইতে যদা, ইত্যাদি।

নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সংস্কৃতে কচ্চিৎ শব্দের প্রয়োগ হয়। "কচ্চিৎ কামপ্রবেদনে"। যেমন, কালিদাস মেঘদূতে লিখিয়াছেন—"কচ্চিদ্ ভর্তুঃ স্মরসি রসিকে," 'হে রসিকে, তুমি স্বামীকে স্মরণ করিতেছ তো?' এই কচ্চিৎ শব্দও কদ্ + চিৎ হইতে। কিম্ শব্দের উত্তর চিৎ ও চন প্রত্যয় সুপ্রসিদ্ধ, যেমন, কিঞ্চিৎ, কিঞ্চন ইত্যাদি।

যদ্, তদ্ ইত্যাদি সর্ব্বনাম হইতে যস্মৈ, যস্মাৎ, যস্য, ইত্যাদি, ও তস্মৈ, তস্মাৎ, তস্য ইত্যাদি পদ হয়। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যদ্ ও তদ্ ইহাদের দকারটি লুপ্ত হয়, আর কেবল যথাক্রমে য ও ত অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে স্থানে-স্থানে কদ্ শব্দের দকারের লোপে কেবল মাত্র ক থাকে। এবং এইরূপেই 'ঈষদ্ উষ্ণ' অর্থে কোষ্ণ পদ হইয়াছে, ক (<কদ্) + উষ্ণ। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও কদ্ শব্দ নিন্দা প্রকাশ করে। কোষ্ণ শব্দের মূল অর্থ 'কুৎসিত উষ্ণ', 'এটা কি উষ্ণ? অর্থাৎ খারাপ উষ্ণ'। ইহা হইতেই ক্রমশ 'ঈষদ্ উষ্ণ' অর্থে উহার প্রয়োগ হইয়াছে।

সংস্কৃতে ইদম্ এই রূপটি সাধারণত ক্লীবলিঙ্গে প্রথমার এক বচনে দেখা যায়। অন্যত্র ইহার মূল রূপ অ; যেমন, অ-স্মৈ, অ-স্মাৎ, অ-স্য, ইত্যাদি। পূর্ব্বে যেরূপ দকারান্ত সর্ব্বনামের কথা বলা হইয়াছে ও আলোচনা করা হইয়াছে তদনুসারে এখানেও স্পষ্টত সর্ব্বনামটি মূলে হইতেছে অদ্ এবং ইহা হইতেই অ। এই অদ্ হইতেই ধা প্রত্যয়ের যোগে অদ্ধা এই পদটি সংস্কৃতে দেখা যায়। ইহার বহু প্রয়োগ আছে। ইহার মূল অর্থ 'এই প্রকারে', পরে 'নিশ্চিত' অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে।

সংস্কৃতে দত্ত পদ √ দা + ত হইতে, এখানে √ দা ধাতুর দ্বিত্ব হয়, অর্থাৎ দদ্ + ত হইয়া দত্ত হয়। আ উপসর্গ থাকিলে ইহা হইতে যেমন আদত্ত, তেমনি আত্ত এই পদও হয়। এইরূপ প্রদত্ত, প্রত্ত; অবদত্ত, অবত্ত; ইত্যাদি। আত্ত, প্রত্ত, অবত্ত, ইত্যাদি পদ নিষ্পন্ন করিবার জন্য ব্যাকরণে বলা হয় (পাণিনি, ৭. ৪. ৪৭) যে, √ দা-স্থানে ত হয়। ইহা কিরূপে হয় তাহা বলা হয় নাই। বস্তুত প্রদত্ত হইতেই প্রাকৃতের প্রভাবে প্রত্ত হইয়াছে। প্রাকৃতে পদের মধ্যে দুই স্বরের মধ্যবর্ত্তী ক, গ, চ, জ, ত, দ ইত্যাদির লোপ হয়। পূর্ব্বে ইহা একটু উল্লেখ করিয়াছি। এই নিয়মে প্রদত্ত>প্রঅত্ত>প্রত্ত। এখানে মধ্যবর্ত্তী অকারের লোপ প্রাকৃতের সন্ধি অনুসারে। অন্য পদগুলিও এইরূপে হইয়াছে। দুই স্বরের মধ্যবর্ত্তী ককারাদির লোপের জন্য তুলনীয় বৈদিক প্রয়োগ প্রউগ<প্রযুগ।

সংস্কৃতের আয়ত্ত শব্দ সকলেরই জানা। ইহা কিরূপে হইল? বৈয়াকরণেরা বলেন আ + √ যৎ + ত হইতে। কিন্তু ইহাতে কোনো প্রকারে শব্দটির সমাধান হয়, তাহার অর্থ হয় কি? উপসর্গের যোগে ধাতুর অর্থ ভিন্ন হইয়া যায়, ইহা এরূপ স্থলে অতিদুর্ব্বল যুক্তি। বস্তুত মূল আদত্ত হইতে প্রাকৃতের প্রভাবে ইহা হইয়াছে; আদত্ত>আঅত্ত> আয়ত্ত। শেষোক্ত পদটিতে যকার হইয়াছে য়-শ্রুতি অনুসারে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই[৩] কিছু বলিয়াছি। এইরূপে আয়ত্ত শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'গৃহীত' অর্থাৎ যাহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা হইতেই ক্রমশ তাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'অধীন'। পরায়ত্ত বলিতে যে পরের দ্বারা গৃহীত, 'পরে যেমন চালায় তেমনি চলে'।

৩। দ্রষ্টব্য শান্তিনিকেতন পত্রিকা, দ্বিতীয় বৎসর, প্রবাসী, ১৩৪১, আষাঢ় (পাণিনি ব্যাকরণ ও সংস্কৃতে প্রাকৃত প্রভাব)।

পূজারিণী

শ্রীস্বর্ণলতা চৌধুরী

বহু বৎসর পূর্ব্বে, একটি তরুণ জাপানী চিত্রকর পদব্রজে কিয়োটো হইতে ইয়োডো যাইতেছিল। পথটি অতি বন্ধুর, সমস্তটাই পর্ব্বতের উপর দিয়া যাইতে হয়। তখনকার দিনে পথঘাট অধিকাংশই এত বিপৎসঙ্কুল ছিল যে জাপানে একটা প্রবাদের উদ্ভব হইয়াছিল "আদুরে ছেলেকে শিক্ষা দিতে হইলে তাহাকে ভ্রমণে পাঠাও।" কিন্তু পথ যেমনই হউক, দেশটার চেহারা এখনকার মতই ছিল। এখনকার মতই বড় বড় সিডার ও ঝাউগাছের বন ও বাঁশের ঝাড় ছিল, খড়ের ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট বাড়ি ছিল, ধানের ক্ষেতে এখনকার মতই খড়ের টুপী পরিয়া কৃষকেরা কাদায় দাঁড়াইয়া কাজ করিত। পথের ধারে বনের মধ্যে, এখনকার মতই বড় বড় বুদ্ধমূর্ত্তির প্রশান্ত হাসি দেখা যাইত এবং নদীর ঘাটে, উলঙ্গ গ্রাম্য শিশু একইভাবে নৃত্য করিত।

এই চিত্রকরটি কিন্তু আদুরে ছেলে ছিল না, সে ইহারই ভিতর বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছে এবং পথ চলার সব রকম কষ্ট সহ্য করিতেই সে ভাল ভাবে অভ্যস্ত। কিন্তু এইবার ভ্রমণে বাহির হইয়া, এক দিন সন্ধ্যার সময় সে এমন এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে রাত্রে আশ্রয় বা আহার সংগ্রহ করিবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না। স্থানটি একেবারে বনভূমি, মনুষ্যের বাসের চিহ্নমাত্র নাই। যুবক বুঝিতে পারিল, পথ সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সে-দিন আবার কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, চারিদিকের ঝাউবনের ঘন ছায়া অন্ধকারকে গভীরতর করিয়া তুলিয়াছে। ঝাউবনের ভিতর বাতাসের মর্ম্মরধ্বনি ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যায় না। চিত্রকর শ্রান্তদেহে চলিতে লাগিল, যদি কোনো নদী দেখিতে পায় এই আশায়। তাহার তীর ধরিয়া চলিলে কোন-না-কোন গ্রামে সে পৌছিতে পারিবে। পথে একটা নদী সে দেখিল বটে, কিন্তু উহাও কিছুদূর গিয়া একটা জলপ্রপাতে পরিণত হইয়া খাদের ভিতর নামিয়া যাইতেছে দেখা গেল। যুবক বাধ্য হইয়া আবার ফিরিল। চারিদিক ভাল করিয়া দেখিবার জন্য একটা চূড়ায় আরোহণ করিল, যদি সেখান হইতে মনুষ্যের বাসের কোনো চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু চতুর্দ্দিকে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইল না।

রাত্রিটা তাহাকে উন্মুক্ত আকাশের তলায়ই কাটাইতে হইবে বলিয়া সে যখন স্থির করিয়াছে, তখন হঠাৎ পাহাড়ের একপাশে, নীচের দিকে তাকাইয়া দেখিল, ক্ষীণ একটি আলোর রেখা দেখা যাইতেছে। বোধ হয় কোনো মনুষ্যের বাসভূমি হইতেই ঐ আলো আসিতেছে, ভাবিয়া যুবক তাড়াতাড়ি সেই দিকটায় নামিতে আরম্ভ করিল এবং কিছুদূর যাইবার পরই ছোট একটি কুটীরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। কুটীরের দ্বার রুদ্ধ, কিন্তু কপাটের একটি ফাটলের ভিতর দিয়া ঐ আলোকরশ্মি বাহিরে বিকীর্ণ হইতেছিল। যুবক ধীরে ধীরে দরজায় আঘাত করিল।

প্রথমবার আঘাতের ফলে কোনই উত্তর পাওয়া গেল না। যুবক বাধ্য হইয়া বার বার ডাকিতে লাগিল এবং দরজায় আঘাত করিতে লাগিল। অবশেষে ভিতর হইতে নারীকণ্ঠে কে একজন প্রশ্ন করিল যে আগন্তুক কি চায়। কণ্ঠস্বরটি অতি মধুর এবং যুবক আশ্চর্য্য হইল এই শুনিয়া যে, নারীটি রাজধানীর শুদ্ধভাষায় কথা বলিতেছে। উত্তরে সে বলিল সে একজন ছাত্র, ইয়োডো যাইতে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে রাত্রে কিছু খাদ্য ও নিদ্রা যাইবার একটু স্থান প্রার্থনা করিতেছে। আর এখানে তাহা লাভ করা যদি একেবারেই অসম্ভব হয়, তাহা হইলে নিকটবর্ত্তী কোনো গ্রামের পথ যেন তাহাকে বলিয়া দেওয়া হয়। তাহার সঙ্গে টাকা আছে, সে পথপ্রদর্শককে বেতনও দিতে পারিবে।

ভিতর হইতে নারীটি তাহাকে আরও কতকগুলি প্রশ্ন করিল; এমন স্থানেও যে কোনো পথিক আসিয়া

জুটিতে পারে, তাহাতে মহিলাটি যেন অত্যন্তই বিস্মিত হইয়াছিল। যুবকের সরল উত্তর শুনিয়া গৃহস্বামিনীর সন্দেহ দূর হইল বোধ হয়, সে বলিল, "আপনি অপেক্ষা করুন, আমি দরজা খুলিতেছি, এই ভীষণ রাত্রে আপনার পক্ষে কোনো গ্রাম খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। পথও অতিশয় বিপৎসঙ্কুল।"

কিছু পরেই দরজাটা খুলিয়া গেল এবং একটা কাগজের লণ্ঠন হাতে করিয়া একটি নারীমূর্ত্তি দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। লণ্ঠনটা সে এমন ভাবে উঁচু করিয়া ধরিয়াছিল যাহাতে সব আলোটা যুবকের মুখে পড়ে এবং তাহার নিজের মুখখানা অন্ধকারেই থাকিয়া যায়। নীরবে কয়েক মুহূর্ত্ত চিত্রকরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া রমণী বলিল, "আপনি অপেক্ষা করুন, আমি জল লইয়া আসিতেছি।" সে তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর হইতে জলের পাত্র ও তোয়ালে লইয়া আসিয়া যুবককে পায়ের ধূলামাটি ধুইয়া ফেলিতে অনুরোধ করিল। যুবক নিজের পায়ের জুতা খুলিয়া পা ধুইল এবং তাহার পর গৃহস্বামিনীর সঙ্গে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। একখানিই মাত্র ঘর, পিছন দিকে শুধু একটি ছোট রান্নাঘর আছে। তরুণী তাহাকে বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দিল এবং হাত পা গরম করিবার জন্য অগ্নিপাত্র লইয়া আসিল।

চিত্রকর এইবার গৃহস্বামিনীর দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল। তাহার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া যুবক একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। তরুণী তাহার চেয়ে দুই-চার বৎসরের বড় হইতে পারে, কিন্তু তখনও সে পূর্ণযৌবনা। সে যে কৃষকের কন্যা নয় তাহা তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়। তরুণী অতি সুমধুর কণ্ঠে বলিল, "আমি এখন একলাই আছি এবং এখানে অতিথি-অভ্যাগতকে কখনও নিমন্ত্রণ করি না। কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রে পথ চলিতে চেষ্টা করিলে আপনি বিপদে পড়িবেন। কিছু দূরে কয়েক ঘর কৃষক বাস করে, কিন্তু কেহ দেখাইয়া না দিলে আপনি কখনও তাহাদের ঘর খুঁজিয়া পাইবেন না। এইখানেই ভোর হওয়া পর্য্যন্ত থাকুন। আপনার হয়ত অসুবিধা হইবে, কিন্তু উপায় নাই। আপনাকে ঘুমাইবার জন্য বিছানা দিতে পারিব এবং খাদ্যও কিছু দিব, কারণ আপনি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন। ঘরে চাল এবং সামান্য শাকসজী ভিন্ন কিছু নাই, আপনি কিছু মনে করিবেন না।"

যুবকের তখন ক্ষুধায় প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে, যাহা হউক, কিছু পাইলেই সে বাঁচিয়া যায়। তরুণী ভিতরে গিয়া উনুন জ্বালিয়া, অল্প সময়ের মধ্যেই ভাত এবং কিছু শাক-সজীর তরকারি প্রস্তুত করিয়া আনিল এবং সযত্নে তাহাকে পরিবেশন করিল। যুবক যতক্ষণ আহার করিল, ততক্ষণ সে প্রায় নীরবেই বসিয়া রহিল। যুবকও কয়েকবার প্রশ্ন করিয়া যখন 'হাঁ' বা 'না' ভিন্ন অন্য কোনো উত্তর পাইল না, তখন অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া গেল।

সে বসিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ঘরখানি পরিষ্কার তক্ তক্ করিতেছে, যে-সকল বাসনে তাহাকে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলিও ঝক্‌ঝকে। ঘরখানিতে মূল্যবান আসবাব কিছু নাই, কিন্তু যা দুই-একটি সামান্য জিনিষ আছে তাহা দেখিতে অতি সুন্দর। দেওয়ালের গায়ে কাপড়চোপড় রাখিবার ও জিনিষ-পত্র রাখিবার যে আল্‌মারীগুলি রহিয়াছে তাহার সম্মুখের পর্দ্দাগুলি শাদা কাগজ মাত্র দিয়া প্রস্তুত। কিন্তু সেই কাগজের উপর আশ্চর্য্য সুন্দর ভাবে ফুল, পাতা, পর্ব্বত, নদী, আকাশ, তারকা প্রভৃতির ছবি আঁকা। ঘরের এক কোণে একটি নীচু বেদী, তাহার উপর একটি 'বুৎসুদান'। উহার গালার কাজ করা ছোট দরজা দুটি খোলা, ভিতরে একটি স্মৃতিফলক দেখা যায়, উহার দুই ধারে পুষ্পের অর্ঘ্য এবং সম্মুখে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। এই বেদীটির উপরের দেওয়ালে একটি অপূর্ব্ব সুন্দর চিত্র ঝোলান; চিত্রটি দয়াদেবীর, তাঁহার মাথায় চন্দ্রকলা, মুকুটের মত শোভা পাইতেছে।

যুবকের খাওয়া শেষ হইতেই তরুণী বলিল, "আমি আপনাকে আরামদায়ক শয্যা দিতে পারিব না এবং মশারীটাও কাগজের তৈরি, তবু এই দুইটিই গ্রহণ করিয়া আপনি বিশ্রাম করুন। শয্যাটা আমারই, কিন্তু আজ রাত্রে আমার অনেক কাজ আছে, ঘুমাইবার সময় আমি পাইব না।"

যুবক বুঝিল যে, এই অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণী কোনো অজ্ঞাত কারণে একাকী এই বনে বাস করিতেছে। সে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজের শয্যাটি অতিথিকে দান করিতেছে, রাত্রে কাজ থাকার কথাটা ছুতামাত্র। যুবক প্রবল আপত্তি করিয়া

বলিল যে তরুণীর এতখানি স্বার্থত্যাগ করিবার কোনোই প্রয়োজন নাই, তাহাকে মাটিতে বিছানা করিয়া দিলে সে স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতে পারিবে, এবং দুই-চারিটা মশায় কামড়াইলে তাহার কিছুই আসিয়া যাইবে না। কিন্তু তরুণী বড় বোনের মত জেদ করিতে লাগিল, যুবককে তাহার কথা শুনিতেই হইবে। তাহার বাস্তবিকই রাত্রে কাজ আছে এবং যথাসম্ভব শীঘ্র সে সে-টি করিবার জন্য ছুটি চায়। যুবককে অগত্যা হাল ছাড়িয়া দিতে হইল। ঘর মাত্র একখানি। তরুণী বিছানা করিয়া, কাগজের মশারীটি টাঙাইয়া দিল এবং একটি কাঠের বালিশ আনিয়া দিল। তাহার পর পাতলা কাঠের একটি লম্বা দাঁড়-করান পর্দ্দা আনিয়া সে বেদীর সম্মুখে রাখিয়া বেদীটি আড়াল করিয়া দিল। যুবক বুঝিল যে, তরুণী এখন একাকী থাকিতে চায়। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে শয়ন করিতে যাইতে হইল। তরুণীকে এতখানি কষ্ট দিতে যে সে বাধ্য হইল, ইহাতে তাহার মনটা ভারী হইয়া রহিল।

কিন্তু মন ভারী থাকা সত্ত্বেও খানিক পরে সে ঘুমাইয়া পড়িল, বিছানাটি এমনই আরামদায়ক ছিল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে সে হঠাৎ চমকাইয়া জাগিয়া উঠিল। ভারি একটা অদ্ভুত শব্দ হইতেছে। উহা মানুষের পায়েরই শব্দ, কিন্তু পায়ে হাঁটিলে যে-রকম শব্দ হয়, সে-রকম নয়। উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া, অত্যন্ত দ্রুততালে কেহ যদি পা ফেলে তাহা হইলে যে-প্রকার শব্দ হয়, ইহাও সেইরূপ। যুবকের ভয় হইল, হয়ত বা ঘরে চোর প্রবেশ করিয়াছে। ভয়টা নিজের জন্য নয়, কারণ তাহার কাছে এমন কিছুই ছিল না যাহা চোরে চুরি করিতে পারে। কিন্তু দয়াবতী তরুণীর জন্য তাহার ভয় করিতে লাগিল। কাগজের মশারীটার দুই ধারে দুটুকরা নেট্ জানালার মত করিয়া বসান, যুবক তাহার ভিতর দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কাঠের পর্দ্দাটা মাঝে পড়াতে ওপাশে যে কি হইতেছে তাহা সে একেবারেই দেখিতে পাইল না। একবার ভাবিল যে, চীৎকার করিয়া উঠিবে, কিন্তু পরে ভাবিয়া দেখিল ব্যাপারটা আসলে কি তাহা না জানিয়া, নিজের উপস্থিতিটা জানাইয়া কোনো লাভ হইবে না। শব্দটা একই ভাবে চলিতেছে ক্রমেই যেন বেশী করিয়া রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। যুবক স্থির করিল তরুণীকে রক্ষা করিবার চেষ্টা সে করিবেই, তাহাতে প্রাণ যায়, সেও স্বীকার। কাপড়চোপড় আঁটিয়া বাঁধিয়া সে ধীরে ধীরে কাগজের মশারীটা তুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কাঠের পর্দ্দার পাশে গিয়া সে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। যে-দৃশ্য তাহার চোখে পড়িল, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

সেই বেদীর সামনে উজ্জ্বল মহার্ঘ বস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া তরুণী একাকী নৃত্য করিতেছে। তাহার পোষাকটি মন্দিরের নর্ত্তকীর পোষাক, যদিও এত মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিতে যুবক কোনো নর্ত্তকীকে দেখে নাই। এই সুন্দর সাজে সজ্জিতা হইয়া তাহাকে অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনী বলিয়া বোধ হইতেছিল, কিন্তু যুবককে তাহার নৃত্য যেন তাহার রূপ অপেক্ষাও অধিক অভিভূত করিয়া ফেলিল। প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার মনে একটা ভয়ের ভাব জাগিয়া উঠিল। কে এই যুবতী? ডাকিনী বা কুহকিনী নয় ত? কিন্তু দয়াদেবীর চিত্র, আর যে বৌদ্ধপূজাবেদীর সম্মুখে তরুণী নৃত্য করিতেছিল, এই দুইটি জিনিষ যুবকের সন্দেহ দূর করিয়া দিল, এমন কি এরূপ সন্দেহ করার জন্যই তাহার রীতিমত লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তরুণীর এই নৃত্য কেহ দেখে তাহা যে তাহার অভিপ্রেত ছিল না, তাহাও যুবক বুঝিতে পারিল। সে তরুণীর গৃহে অতিথি, তাহার উচিত এখনই মশারীর ভিতরে ফিরিয়া যাওয়া, কিন্তু সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যুবক বিস্ময়ের সহিত অনুভব করিতে লাগিল যে, এরূপ অপূর্ব্ব নৃত্য ইতিপূর্ব্বে সে কখনও দেখে নাই। যতই দেখিতে লাগিল, তরুণীর নৃত্যলীলা তাহাকে ততই মোহিত করিয়া ফেলিতে লাগিল। হঠাৎ তরুণী থামিয়া গেল এবং নর্ত্তকীর পরিচ্ছদ উন্মোচন করিবার জন্য ফিরিতেই যুবককে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত চমকাইয়া উঠিল।

যুবক নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিল। সে বলিল, পায়ের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ায় সে ভয় পাইয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। ভয় নিজের জন্য নয়, এই নির্জ্জন বনবাসিনী তরুণীর জন্যই। যাহা সে দেখিয়াছে তাহা যে কি বিস্ময়কর তাহাও সে বলিতে ভুলিল না। সে বলিল, "আপনি আমার কৌতূহল মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু আমি জানিতে চাই যে আপনি কে এবং কিরূপে আপনি

এই আশ্চর্য্য নৃত্যপদ্ধতি শিখিয়াছেন। আমি রাজধানীর সকল বিখ্যাত নটীদেরই দেখিয়াছি, কিন্তু আপনার মত নৃত্য করিতে তাহাদের মধ্যে একজনও পারে না। একবার আপনার দিকে চোখ পড়ার পর, আমি আর চোখ ফিরাইতে পারি নাই।"

প্রথমে তরুণীকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বোধ হইতেছিল, কিন্তু যুবকের কথা শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাহার মুখের ভাব বদ্‌লাইয়া গেল। ঈষৎ হাসিয়া সে যুবকের সম্মুখে বসিয়া পড়িল। তাহার পর বলিল, "আমি আপনার উপর রাগ করি নাই। কিন্তু আপনি যে আমার নৃত্য দেখিয়া ফেলিলেন, ইহাতে আমি দুঃখিত। একাকিনী ঐ ভাবে আমাকে নাচিতে দেখিয়া হয়ত আপনি আমাকে পাগল মনে করিয়াছেন, আমাকে এখন নিজের পরিচয় আপনার কাছে দিতেই হইবে।"

তরুণী আপনার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। যুবক কিশোর বয়সে এই যুবতীর নাম শুনিয়াছে বলিয়া এখন তাহার মনে পড়িল। সে তখন রাজধানীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নর্ত্তকী, তাহার পায়ে রাজার ঐশ্বর্য্য গড়াগড়ি যাইত, তাহার রূপেরও তুলনা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন এই সকলের মায়া কাটাইয়া সে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল, কেহ আর তাহার সন্ধান পাইল না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি যুবকও অদৃশ্য হইল, সে তাহার প্রণয়ী। যুবকের ধনসম্পত্তি কিছু ছিল না, তরুণীর যাহা সঙ্গে ছিল তাহাই সম্বল করিয়া তাহারা পর্ব্বতের উপরে পর্ণকুটীরে সুখে বাস করিতে লাগিল। দু-জনে দু-জনকে ভিন্ন আর কিছু জানিত না। যুবক তরুণীকে সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিত। তাহার নৃত্য দেখাই যুবকের জীবনের সবচেয়ে গভীর আনন্দের বিষয় ছিল। সন্ধ্যা হইলেই সে নিজে কোন একটি প্রিয় সুর বাজাইতে বসিত, আর যুবতী এই সুরের তালে নৃত্য করিত। কিন্তু হঠাৎ শীতকালে অসুস্থ হইয়া পড়িয়া যুবক মারা গেল, তাহার প্রণয়িনীর প্রাণঢালা সেবাও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তখন হইতে তাহার স্মৃতি অবলম্বন করিয়া, তাহারই পূজা করিয়া তরুণী বাঁচিয়া আছে। দিনের বেলা তাহার স্মৃতিফলকের সম্মুখে সে পুষ্প ও দীপের অর্ঘ্য সাজায়, রাত্রে তাহার সম্মুখে পূর্ব্বের মতই নৃত্য করে। শ্রান্ত অতিথিকে জাগাইয়া দেওয়ার তাহার কোনই ইচ্ছা ছিল না, সেই জন্য সে যথাসম্ভব দেরি করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু অতি লঘু ভাবে পদক্ষেপ করাতেও যে যুবক চিত্রকরের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য তরুণী ক্ষমাভিক্ষা করিল।

তাহার পর তরুণী চা প্রস্তুত করিয়া আনিল। যুবক তাহার সহিত চা পান করিবার পর, তরুণীর অনুনয়-বিনয়ে বাধ্য হইয়া আবার শয্যায় ফিরিয়া গেল এবং অবিলম্বেই আবার নিদ্রিত হইয়া পড়িল। সকালে উঠিয়া তাহার ক্ষুধাবোধ হইতে লাগিল। তরুণীও তাহার জন্য খাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। খাবার রাত্রেরই মত অতি সাধারণ। ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও যুবকের পেট ভরিয়া খাইতে সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল, সে ভাবিল হয়ত তরুণী নিজের জন্য কিছুই রাখে নাই। যাত্রা করিবার সময় সে তরুণীকে আহার্য্যের মূল্যস্বরূপ কিছু অর্থ দিতে গেল, কিন্তু তরুণী কোনমতেই তাহা লইতে সম্মত হইল না। সে বলিল, "আমি আপনাকে যাহা খাইতে দিয়াছি, তাহা এত সামান্য যে, তাহার মূল্য বলিতে কিছু নাই এবং অর্থলোভের আশায় আমি উহা দিই নাই, আতিথ্যধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্যই দিয়াছি। আপনার যাহা অভাব-অসুবিধা হইয়াছে, তাহা ভুলিয়া গিয়া শুধু আমার সেবার আগ্রহটুকু যদি মনে রাখেন তাহা হইলেই আমি ধন্য হইব।"

অর্থ দিবার জন্য যুবক আর একবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বার-বার এ-বিষয়ে জেদ করাতে তরুণী ক্লেশ পাইতেছে দেখিয়া সে নিরস্ত হইল, এবং মুখের কথায় যথাসম্ভব নিজের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, তাহার কাছে বিদায় লইয়া সে আবার পথে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার মন যেন এখানেই আটক পড়িয়াছিল, পা নড়িতে চাহিতেছিল না, কারণ যুবতীর রূপ ও গুণ সত্যই তাহাকে অতিশয় মোহিত করিয়াছিল। তাহাকে কোন্ পথে যাইতে হইবে, তরুণী তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিয়া দিল, এবং যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল দাঁড়াইয়া দেখিল। ঘণ্টাখানেক হাঁটিয়া, যুবক একটি সুপরিচিত পথে আসিয়া পৌঁছিল। তখন হঠাৎ তাহার মনে পড়িল যুবতীকে সে নিজের নামটাও বলিয়া আসে নাই। পরক্ষণেই ভাবিল "বলিয়াই বা কি হইত? চিরকালই হয়ত আমি এইরূপ দরিদ্র থাকিব।"

২

বহু বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কত নিয়ম-কানুনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, চিত্রকরও এখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু শুধু বৃদ্ধই হন নাই, অতিশয় খ্যাতিপ্রতিপত্তিও লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আশ্চর্য্য অঙ্কনকুশলতায় মোহিত হইয়া বহু রাজপুরুষ তাঁহাকে যাচিয়া অর্থ-সম্পত্তি দান করিয়াছেন। চিত্রকর এখন ধনী ব্যক্তি, রাজধানীর একটি অতি সুন্দর অট্টালিকায় তিনি বাস করেন। জাপানের নানা অংশ হইতে দলে দলে তরুণ চিত্রকর আসিয়া তাঁহার কাছে শিক্ষালাভ করিতেছে। তাহারা তাঁহার সঙ্গেই বাস করে, সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার পরিচর্য্যা করে। চিত্রকরের নাম দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

একদিন একটি বৃদ্ধা নারী তাঁহার গৃহের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল। ভৃত্যেরা তাহার হীন বেশভূষা এবং দীন ভাব দেখিয়া তাহাকে সাধারণ ভিক্ষুক বলিয়া স্থির করিল এবং অতি কর্কশভাবে তাহাকে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। স্ত্রীলোকটি বলিল, "আমি কেন আসিয়াছি, তাহা কেবলমাত্র তোমাদের প্রভুর নিকটে বলিতে পারি।" ভৃত্যগণ ভাবিল স্ত্রীলোকটি পাগল, সুতরাং চিত্রকর এখানে নাই, কবে ফিরিবেন জানি না, বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল।

কিন্তু স্ত্রীলোকটি রোজই আসিতে লাগিল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া চলিল, তবু তাহার আসার বিরাম নাই। ভৃত্যেরা প্রতিবারেই তাহাকে এক একটা মিথ্যা কথা বলিয়া বিদায় দেয়, "আজ চিত্রকর অসুস্থ," বা "আজ তিনি বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।" তবু স্ত্রীলোকটি রোজই আসে, ছেঁড়া কাপড়ে জড়ান একটি পুঁটলি সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে থাকে।

চিত্রকরের পরিচারকগণ অবশেষে ক্লান্ত হইয়া স্থির করিল, প্রভুর কাছে ইহার কথা বলিয়া দেওয়াই ভাল। তাহারা তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল, "বাহিরের দরজার সামনে একটি বৃদ্ধা অপেক্ষা করিতেছে, তাহাকে দেখিলে ভিখারিণী বলিয়াই বোধ হয়। সে প্রায় দুই মাস ধরিয়া সমানে আসিতেছে এবং আসিবার কারণ আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বলিতে সে অনিচ্ছুক। আমরা তাহাকে পাগল মনে করিয়া বহুবার ফিরাইয়া দিয়াছি। তবুও সে আসে দেখিয়া এ-কথা আপনাকে জানাইলাম। উহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।"

চিত্রকর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এ-কথা আমাকে পূর্ব্বে জানাও নাই কেন?" এই বলিয়া তিনি নিজেই বাহির হইয়া গিয়া অতি সদয়ভাবে সেই স্ত্রীলোকটিকে সম্ভাষণ করিলেন। তিনি নিজেও যে এককালে অতি দরিদ্র ছিলেন, সে-কথা ভুলিয়া যান নাই। তিনি স্ত্রীলোক-টিকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে তাঁহার নিকট কি ভিক্ষা চায়।

স্ত্রীলোকটি বলিল, তাহার খাদ্য বা অর্থের কোনো প্রয়োজন নাই, চিত্রকরের নিকট তাহার শুধু এই ভিক্ষা যে, তিনি যেন তাহার জন্য একটি ছবি আঁকিয়া দেন। চিত্রকর কিছু বিস্মিত হইলেন। যাহা হউক, তিনি স্ত্রীলোকটিকে তাঁহার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। সে তাঁহার পিছন পিছন আসিল এবং ঘরের ভিতর নতজানু হইয়া বসিয়া সঙ্গের পুঁটলিটি খুলিতে আরম্ভ করিল। খোলা হইবার পর চিত্রকর দেখিলেন ভিতরে একটি পুরাতন নর্ত্তকীর পোষাক রহিয়াছে, উহা এখন ছিন্ন ও বিবর্ণ বটে, কিন্তু দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এককালে উহা খুবই উজ্জ্বল ও সুন্দর ছিল।

বৃদ্ধা যখন এক-একটি করিয়া পোষাকের অংশগুলি বাহির করিতেছিল, চিত্রকরের মনের ভিতর তখন একটা আন্দোলন চলিতেছিল। কি যেন তিনি মনে করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, অথচ পারিতেছিলেন না। হঠাৎ তাঁহার সব কথা মনে পড়িল। তিনি মানসচক্ষে সেই পর্ব্বতের উপরের ক্ষুদ্র কুটীরটি দেখিতে পাইলেন, যেখানে তিনি অতি সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন। সেই ছোট ঘরখানি, সেই কাগজের মশারী, সেই পূজার বেদী, সেই গভীর রাত্রে তরুণীর একাকী নৃত্য, সকলই তাঁহার মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিল। তিনি বিস্মিতা বৃদ্ধার সম্মুখে আভূমি নত হইয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনাকে যে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিয়াছিলাম, আমার সে অপরাধ আপনি ক্ষমা করিবেন। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল আপনাতে আমাতে দেখা, তাই এরূপ ভুল সম্ভব হইয়াছে। এখন আপনাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিয়াছি। আপনি

নিজের গৃহে আমাকে অতি সাদরে স্থান দিয়াছিলেন, নিজের শয্যাটি পর্য্যন্ত আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আপনার নৃত্য আমি দেখিয়াছিলাম, আপনার কাহিনীও শুনিয়াছিলাম। আপনার নামটি আমি ভুলি নাই।"

তাঁহার কথায় বৃদ্ধা অতিশয় বিস্মিতা ও সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল। সে প্রথমে কিছুতেই উত্তর দিতে পারিল না, কারণ বার্দ্ধক্য ও দুঃখ-দারিদ্র্যের পীড়নে তাহার স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু চিত্রকর সদয়কণ্ঠে আরও অনেক কথা বলাতে, এবং তাহার পূর্ব্ব বাসস্থানের বর্ণনা দেওয়াতে, তাহারও বিগত দিনের সকল কথা মনে পড়িল এবং সে সজল চক্ষে বলিল, "ভগবানই আমাকে পথ দেখাইয়া এখানে আনিয়াছেন। কিন্তু আপনার পবিত্র পদধূলি যখন আমার ক্ষুদ্র কুটীরে পড়িয়াছিল, তখন আমি এখনকার মত ছিলাম না। প্রভু বুদ্ধের কৃপাতেই কেবল আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন।"

তাহার পর সে নিজের দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিল। চিত্রকর চলিয়া যাইবার পর, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে এবং বাধ্য হইয়া কুটীর-খানি বিক্রয় করিয়া, তাহাকে আবার রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। রাজধানীতে তাহার নাম পর্য্যন্ত সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল। নিজের কুটীরটি ছাড়িয়া আসিতে তাহার মনে অত্যন্তই ব্যথা লাগিয়াছিল, কিন্তু বার্দ্ধক্য ও দুর্ব্বলতাবশতঃ সে যখন বেদীর সম্মুখে নৃত্য করিবার ক্ষমতাও হারাইয়া বসিল, তখন তাহার আর মনে বেদনার সীমা রহিল না। প্রিয়তমের আত্মার সহিত তাহার যেন, নূতন করিয়া বিচ্ছেদ ঘটিল। সে এখন নর্ত্তকীর বেশে এবং নৃত্যের ভঙ্গীতে নিজের একটি চিত্র অঙ্কিত করাইতে চায়, উহা সে বেদীর সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখিবে। যাহাতে তাহার এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তাহার জন্য সে ক্রমাগত প্রার্থনা করিয়াছে। সে সাধারণ কোনো চিত্রকরের নিকট না গিয়া স্বয়ং চিত্রকররাজের নিকট এই কারণেই আসিয়াছে যেন চিত্রটি অতি সুন্দর হয়। নিজের নর্ত্তকীর পোষাকটিও সে লইয়া আসিয়াছে এই আশায় যে, তিনি ইহার সাহায্যে ছবিটি আঁকিতে পারিবেন।

চিত্রকর তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আপনি যেরূপ চিত্র চান, তাহা আমি অতি আনন্দের সহিতই আঁকিয়া দিব। আজ আমি ব্যস্ত, একটি কাজ আমাকে অদ্যকার মধ্যে অবশ্যই শেষ করিতে হইবে। কিন্তু কাল যদি আপনি আসেন, আমার সাধ্যমত যত্ন করিয়া আমি ছবিখানা আঁকিয়া দিব।"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "কিন্তু একটা প্রয়োজনীয় কথা আপনাকে বলা উচিত, বলিতে আমার অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। আপনার পরিশ্রমের আমি কোনো মূল্য দিতে পারিব না, কারণ এই নর্ত্তকীর পোষাকটি ভিন্ন আমার নিকটে আর কিছু নাই। এইটি মাত্র আপনাকে আমি দিতে পারি। এখন ছিন্ন ও বিবর্ণ, যদিও এককালে উহা অতি মূল্যবান ছিল। তবুও আশা করি, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এটি গ্রহণ করিবেন, কারণ পুরাণ জিনিষ হিসাবে ইহার একটা মূল্য আছে। আজকালকার নর্ত্তকীরা এই ধরণের পোষাক আর পরে না।"

চিত্রকর বলিলেন, "এ-বিষয়ে আপনার কিছুমাত্র ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আপনার ঋণের অল্পমাত্রও যে শোধ করিতে পারিব, ইহাতেই আমি অত্যন্ত সুখী। কাল আমি অবশ্যই আপনার চিত্র আঁকিতে আরম্ভ করিব।" স্ত্রীলোকটি তিন বার তাঁহার সম্মুখে আভূমি প্রণতা হইয়া বলিল, "আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমার আরও কিছু বলিবার আছে। আমাকে এখন যেরূপ দেখিতেছেন এই ভাবেই অঙ্কিত করিবেন, ইহা আমি চাই না। আপনি প্রথম আমাকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, সেই ভাবেই অঙ্কিত করিবেন, ইহাই আমি চাই।"

চিত্রকর বলিলেন, "আমার স্মরণ আছে, আপনি অপূর্ব্ব সুন্দরী ছিলেন।"

স্ত্রীলোকটি ধন্যবাদ জ্ঞাপনার্থে আর একবার চিত্রকরকে প্রণাম করিল, তাহার পর বলিল, "আমি যাহা কিছুর জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, সবই তাহা হইলে হইতে পারিবে। আপনার যখন আমার পূর্ব্বকালের আকৃতি স্মরণ আছে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সেই ভাবেই অঙ্কিত করিবেন। দয়া করিয়া আমাকে আবার তারুণ্য ও সৌন্দর্য্য ফিরাইয়া দিবেন, তাহা হইলেই আমি সেই পরলোকবাসী আত্মাকে আনন্দ দিতে পারিব। তাঁহারই জন্য আমি ইহা ভিক্ষা

করিতেছি। তিনি আপনার অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া আমার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।"

চিত্রকর তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি কাল আসিবেন। আপনাকে তরুণী সুন্দরী নর্ত্তকীরূপেই আমি চিত্রিত করিব। দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনীর চিত্র আঁকিতে হইলে আমি যতখানি যত্ন সহকারে আঁকি এই চিত্রখানি তাহা অপেক্ষাও যত্নে আঁকিব। আপনি কোনো দ্বিধা না করিয়া কাল আসিবেন।"

বৃদ্ধা তাহার পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শুভ্র কোমল রেশমের উপর চিত্রকর তাহার ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিলেন। চিত্রকরের ছাত্ররা বৃদ্ধার যে মূর্ত্তি দেখিতেছিল, চিত্রে কিন্তু সে মূর্ত্তি ফুটিল না। ছবিতে তাহার আকৃতি, সে পক্ষিণীর মত উজ্জ্বলনয়না, দেহের গঠন তাহার পল্লবিনী লতার মত, স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদে সে অপ্সরীর মত মোহিনী। চিত্রকরের মায়াতুলির স্পর্শে তাহার লুপ্ত রূপযৌবন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ছবিখানি শেষ হইবার পর চিত্রকর উহাতে নিজের নাম মোহর করিয়া দিলেন এবং পুরু রেশমের উপর ছবিখানিকে বসাইয়া, উপরে ও নীচে সিডার কাঠ ও হস্তিদন্ত যুক্ত করিয়া দিলেন। টাঙাইবার জন্য পাকান রেশমের দড়ি লাগাইয়া দিতেও ভুলিলেন না। একটি শাদা কাঠের বাক্স করিয়া ছবিখানি তিনি বৃদ্ধাকে উপহার দিলেন। তাহাকে কিছু অর্থ দিবারও ইচ্ছা তাঁহার ছিল, কিন্তু অনেক অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও বৃদ্ধা অর্থ লইতে সম্মত হইল না। সে সজলচক্ষে কেবলই বলিতে লাগিল, "আপনি বিশ্বাস করুন, অর্থে আমার কিছুই প্রয়োজন নাই। এই ছবিখানির জন্যই শুধু এতদিন আমি দেবতার কাছে প্রার্থনা করিয়াছি। আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে, এ-জীবনে আমার আর কোনো কামনা নাই। এইরূপ নিষ্কামচিত্তে আমি যদি মরিতে পারি, তাহা হইলে নির্ব্বাণ লাভ করা আমার পক্ষে সহজ হইবে। শুধু এই ভাবিয়াই আমি দুঃখিত হইতেছি যে, এই ছিন্ন পোষাকটি ভিন্ন আমার আর আপনাকে দিবার কিছুই নাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এইটিই গ্রহণ করুন। আপনার ভবিষ্যৎ জীবন যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখের হয়, তাহার জন্য আমি প্রভুর নিকট নিত্য প্রার্থনা করিব। আপনি যে দয়া করিলেন, তাহার তুলনা নাই।"

চিত্রকর হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমি কিই বা করিতে পারিয়াছি? কিছুই নয়। তবে এই পোষাকটি গ্রহণ করিলে আপনি যদি তুষ্ট হন, তাহা হইলে আমি উহা গ্রহণ করিতেছি। ইহাতে পূর্ব্বকালের অনেক মধুর স্মৃতি আমার মনে পুনর্ব্বার জাগরূক হইবে। আপনি কোথায় বাস করেন, আমাকে বলুন। তাহা হইলে আমি গিয়া ছবিটি টাঙান হইলে দেখিয়া আসিতে পারি।" চিত্রকরের একথা জিজ্ঞাসা করিবার ভিতর উদ্দেশ্য ছিল, বৃদ্ধার বাসস্থান জানিতে পারিলে তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিতে পারিতেন।

বৃদ্ধা কিন্তু কোনোক্রমেই নিজের বাসস্থানের সন্ধান দিল না। বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে শুধু বলিল যে, তাহার বাসস্থান অতি দীনহীন, চিত্রকরের ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সেখানে পদধূলি দেওয়া উচিত নয়। তাহার পর তাহাকে আরও নানাভাবে ধন্যবাদ দিয়া স্ত্রীলোকটি চিত্রখানি লইয়া চলিয়া গেল।

চিত্রকর নিজের একজন ছাত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি উহার অনুসরণ কর, এবং সে কোথায় বাস করে তাহা আমাকে আসিয়া জানাও। তুমি এমনভাবে যাইবে যে, বৃদ্ধা যেন জানিতে না পারে।" ছাত্রটি তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল।

বহুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল, "মহাশয়, আমি ঐ স্ত্রীলোকটির পিছন পিছন যাইতে যাইতে শহর অতিক্রম করিয়া নদীর ধারে উপস্থিত হইলাম। যেখানে অপরাধীদিগকে বধ করা হয়, সেই মশানের নিকট এক অতি ভগ্ন জীর্ণ কুটীরে ঐ স্ত্রীলোক বাস করে। স্থানটি অতি জঘন্য, ডাকিনীর বাসস্থান হইবার উপযুক্ত।"

চিত্রকর বলিলেন, "স্থানটি যত জঘন্যই হউক, তুমি কাল আমাকে ঐ স্থানে লইয়া যাইবে, কারণ আমি বাঁচিয়া থাকিতে ঐ স্ত্রীলোকটির অন্ন-বস্ত্রের অভাব যাহাতে না ঘটে তাহা আমাকে দেখিতে হইবে।"

সকলে বিস্মিত হইতেছে দেখিয়া চিত্রকর সেই তরুণী

নর্ত্তকীর কাহিনী বিবৃত করিলেন। তখন সকলেই বুঝিল যে, তাঁহার আচরণ কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

তাহার পর দিন সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে, চিত্রকর ও তাঁহার ছাত্র নগর ছাড়িয়া সেই নদীর ধারের ভয়াবহ স্থানটিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহা সমাজতাড়িতদিগের বাসভূমি।

কুটীরের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া, তাঁহারা বারকয়েক দরজার উপর টোকা মারিয়া সঙ্কেত করিলেন। কোনো সাড়া না পাইয়া দরজা ঠেলিতেই ভিতর হইতে উহা খুলিয়া গেল। তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে বহুদিন পূর্ব্বেকার কুটীর-প্রবেশের দৃশ্যটি অতি উজ্জ্বলভাবে ভাসিয়া উঠিল।

ভিতরে ঢুকিয়া তিনি দেখিলেন বৃদ্ধার জীর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহ মাটির উপর পড়িয়া আছে। কাঠের একটা তাকের উপর তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট 'ব্যুৎস্থদান'টি বিরাজ করিতেছে, তাহার ভিতর সেই স্মৃতিফলকটি এখনও বিদ্যমান। তখনকার মত এখনও সেটির সম্মুখে প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিন্তু দয়াদেবীর ছবিটি আর নাই, তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহার অঙ্কিত নর্ত্তকীর চিত্রটি দেওয়ালের গায়ে টাঙান। ঘরখানির ভিতর আর বিশেষ কিছু নাই, শুধু একটি সন্ন্যাসিনীর পরিচ্ছদ, দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র।

চিত্রকর দুই-তিন বার নর্ত্তকীর নাম ধরিয়া ডাকিলেন, কিন্তু কোনো সাড়া পাইলেন না।

হঠাৎ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধা বাঁচিয়া নাই। তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া তাঁহার বোধ হইল, বৃদ্ধার মুখে যেন পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য ও তারুণ্যের আভাস ফিরিয়া আসিয়াছে, মুখে জরার ও দারিদ্র্যের বলিরেখাগুলি অনেকটাই যেন মুছিয়া গিয়াছে। তাঁহার অপেক্ষাও মহান কোনো চিত্রকরের তুলির গুণে ইহা ঘটিয়াছে বুঝিয়া তিনি সসম্ভ্রমে মস্তক নত করিলেন।*

* লাফ্‌কাডিও হার্ন্‌ হইতে।

অমিতাভ বুদ্ধ
শিল্পী—শ্রীআশু ব্যানার্জ্জী

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালী

অধ্যাপক শ্রীদেবব্রত ———, এম্‌-

১

প্রধানতঃ উদরান্নের সংস্থানের জন্য বাঙালী বহু পূর্ব্ব হইতেই জন্মভূমির শ্যামল ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া দেশ-দেশান্তরে গমন করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান কালে পশ্চিমে বলুচিস্থান, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ, উত্তরে কাশ্মীর এবং দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুড়, এই সীমানার মধ্যে প্রায় সকল স্থানেই বাঙালী দেখিতে পাওয়া যায়। সংখ্যার ন্যূনাধিক্যই একমাত্র পার্থক্য। বঙ্গদেশ হইতে গিয়া পশ্চিমোত্তর ভারতে যাঁহারা অবস্থান করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে নানারূপ সংবাদাদি সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, স্বাস্থ্যলাভ, তীর্থদর্শন প্রভৃতি ব্যপদেশে প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক বাঙালী এ-সকল প্রদেশে গমনাগমন করিয়া থাকেন। এই কারণে ঐ সকল স্থানের বাঙালীদের সম্বন্ধে জ্ঞান বঙ্গদেশবাসী বাঙালীদের ভালই আছে। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের অপর প্রান্তস্থিত বিস্তৃত ভূখণ্ডে যে কত বঙ্গসন্তান গমন করিয়াছেন, তাহার সঠিক সংবাদ কয় জন রাখিয়া থাকেন? অথচ ব্রহ্মদেশ-বাসী বাঙালীদের সম্বন্ধে এত বিষয় জানিবার আছে যে, তাহা স্বদেশে অবস্থান করিয়া সহজে কেহ অনুমান করিতে পারেন না।

প্রধানতঃ চাকুরী লইয়াই শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণ ঐ প্রদেশে গমন করিয়াছেন। কিন্তু অ-শিক্ষিত অথবা অল্পশিক্ষিত বহু বাঙালী (হিন্দু ও মুসলমান) ও যে অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য গমন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে ঐ দেশেই ভূমির অধিকারী হইয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছেন, এ-সকল বিষয় অনেকেই অবগত নহেন। ব্রহ্মদেশে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানগণ যে কত বিভিন্ন রূপ কার্য্যদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইলে সকলেই বিস্মিত হইবেন। প্রত্যুত বঙ্গদেশের বাহিরে অন্য যে-সকল স্থানে বাঙালী গমন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আর কোন একস্থানে এত অধিকসংখ্যক বাঙালী এত অধিক প্রকারের কার্য্যদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন বলিয়া জানা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-সম্বন্ধে এ যাবৎ বিস্তারিত ও সুশৃঙ্খলভাবে কোন আলোচনা হয় নাই। মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকাদিতে দুই-একজন ভ্রমণকারীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা আদৌ যথেষ্ট নহে অথচ এখন হইতেই যদি বিশেষ ভাবে তথ্য সংগ্রহ ও তাহা রক্ষা করার চেষ্টা না হয়, তবে বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে না। এই কার্য্য কোন এক জনের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। তবে এইটুকুমাত্র ভরসা, যে, বিংশতি বর্ষের অধিক কাল ব্রহ্মদেশে বাস করিয়া যে-সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা দ্বারা কার্য্য আরম্ভ করিলে আরও অনেকে উৎসাহান্বিত হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন।

ব্রহ্মদেশে শিক্ষিত, অ-শিক্ষিত, হিন্দু ও মুসলমান ভেদে বাঙালীগণ যে কতপ্রকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই কৌতূহলোদ্দীপক। উচ্চ স্তরে হাইকোর্টের বিচারপতি হইতে নিম্ন স্তরে সাধারণ নৌকার মাঝি, ধোবা, নাপিত প্রভৃতি সকল প্রকার লোকই ব্রহ্মদেশের বাঙালীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। চাকুরী, ওকালতী, চিকিৎসা, ঠিকাদারী কাজ, সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সকল প্রকার কাজই বাঙালীরা যথেষ্ট পরিমাণে করিতেছেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নহে। তজ্জন্য এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ সাধারণভাবে বাঙালীরা কি কি কার্য্য দ্বারা কিভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

প্রথমে চাকুরীজীবী বাঙালীদের কথাই বলা যাক—কারণ বাঙালীর এটিই প্রধান উপজীবিকা। ব্রহ্মদেশবাসী বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে সাড়ে পনর আনাই চাকুরীজীবী। সরকারী ও বেসরকারী চাকুরীতে একাধিক সহস্র বাঙালী ব্রহ্মদেশের

নানাস্থানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই রেঙ্গুন হইতে অতি দূরবর্ত্তী স্থানে আত্মীয়বন্ধুস্বজনবিহীন অবস্থায় বাস করিতে হয়। এমন অনেক স্থানও আছে যেখানে যাইতে হইলে রেঙ্গুন হইতেও চারি-পাঁচ দিন সময় লাগে। সেই সকল স্থানের অর্দ্ধ-সভ্য অধিবাসীরাই প্রধানতঃ তাঁহাদের প্রতিবেশী। খুব বেশী হইলে তথায় ভারতবর্ষেরই অন্য প্রদেশবাসী দু-একটি লোক হয়ত পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বাঙালীর মুখ-দর্শনই অতি দুর্ল্ভ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত স্ত্রীপুত্র-পরিবার লইয়াও বাস করেন। এই সকল সুদূর পার্ব্বত্য অথবা অরণ্যসঙ্কুলস্থাননিবাসী বঙ্গসন্তানদের বিষয় কয় জন অবগত আছেন? তাঁহাদিগকে যেরূপ স্থানে ও অবস্থায় বাস করিতে হয় তাহা সকলেরই সহানুভূতি উদ্রেক করে। বস্তুতঃ ব্রহ্মদেশের এমন একটিও বিশিষ্ট শহর নাই যেখানে অন্ততঃ এক জন বাঙালীও নাই। সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত বাঙালীদের মধ্যে অনেকে খুব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। ইদানীংও রেঙ্গুনে সরকারী দপ্তরখানায় একাধিক বাঙালী খুব উচ্চপদে নিযুক্ত রহিয়াছেন। গত দুই বৎসরের মধ্যে এইরূপ অনেক বাঙালী বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুব যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া রাজসম্মান লাভান্তে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানেও চিকিৎসা-বিভাগে সিভিল-সার্জনের পদে, পূর্ত্ত বিভাগে এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের পদে, শিক্ষা-বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ অধ্যাপক-পদে অনেকে যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিতে-ছেন। তদ্ভিন্ন অপেক্ষাকৃত নিম্নপদেও বহু বাঙালী ব্রহ্মদেশের নানাস্থানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি খুব বেশী নাই। চাকুরীক্ষেত্রে মুসল-মানরা অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ হইলেও অন্যান্য বিষয়ে, বিশেষতঃ ব্যবসাবাণিজ্যক্ষেত্রে, তাঁহাদের অবস্থা হিন্দুদের অপেক্ষা ভাল। শিক্ষা-বিভাগে পূর্ব্বোক্ত কয়েক জন অধ্যাপক ভিন্ন বহু বাঙালী উচ্চবিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের কার্য্য করিতেছেন। পূর্ব্বে এইরূপ শিক্ষকের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। বর্ত্তমানে নূতন কার্য্যে বাঙালী নিযুক্ত হওয়া বন্ধ হইয়াছে বলিলেই হয়। পুরাতন যাঁহারা রহিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও অনেকের ভবিষ্যৎ আশঙ্কাশূন্য নহে। দুইটি উচ্চবিদ্যালয়ে মাত্র দুই জন বাঙালী প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ব্রহ্মদেশের কোন উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদলাভ বাঙালীর পক্ষে একান্তই দুর্ল্ভ বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। তৎসত্ত্বেও যে দুই জন মাত্র ঐরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন তজ্জন্য বাঙালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন। রেঙ্গুন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলিতে পূর্ব্বে অনেক বাঙালী অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। ক্রমে তাঁহাদের অনেককেই চলিয়া আসিতে হইয়াছে এবং একাধিক ব্যক্তিকে অন্যায়রূপে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের ভবিষ্যৎও যে বিপদশূন্য তাহা জোরের সহিত বলা যায় না।

সকল প্রকার চাকুরীতেই ভারতবাসীদের, বিশেষভাবে বাঙালীর, প্রবেশলাভ দুর্ল্ভ হইয়া উঠিতেছে। রেঙ্গুনে এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে পূর্ত্ত ও চিকিৎসা বিভাগে স্থায়ী ভাবে সহজে কোন বাঙালীকে লওয়া হয় না। সাধারণ কেরাণীর কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের পুত্রেরা যে ভবিষ্যতে ঐদেশে কোনরূপ কার্য্যলাভ করিতে সমর্থ হইবে তাহা বলা কঠিন। বস্তুতঃ এখন হইতেই ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদের সন্তানগণের ভবিষ্যৎ গুরুতর চিন্তার কারণ হইয়া উঠিতেছে।

চাকুরী ভিন্ন অপর এক ক্ষেত্রে বাঙালীরা ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্রই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাহা আইন-ব্যবসায়। ব্রহ্মদেশে প্রায় প্রত্যেক জেলার সদরে অথবা মহকুমায় বাঙালী ব্যবহারজীবী আছেন। রেঙ্গুন শহরেই প্রায় এক শত বাঙালী ব্যবহারজীবী রহিয়াছেন। সর্ব্বত্রই ইঁহারা নিজ ক্ষমতাবলে এই কার্য্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। মফস্বলের অধিকাংশ স্থলে বাঙালী ব্যবহার-জীবীরাই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন সরকারী উকীলের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। বস্তুতঃ বাঙালী আইনব্যবসায়ীরা ব্রহ্মদেশে সর্ব্বত্র—বিশেষভাবে মফস্বলে—আইন-ব্যবসায়ের একটি উচ্চ মান (standard) স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই বিষয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা বাঙালীদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন। এই সকল আইনজীবীর অনেকেই প্রথমে ব্রহ্মদেশের

নানা স্থানে অতি সামান্য বেতনে চাকুরী করিতেন। কিন্তু ব্যবসায় বলে ব্রহ্মদেশের বিশেষ বিশেষ আইনবিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এবং ততোধিক কঠিন ব্রহ্মভাষা শিক্ষা করিয়া ও তৎসংসৃষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং নিজ নিজ ক্ষমতাবলে অতি উচ্চস্থান অধিকার করেন। অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীই এই আইনব্যবসায়ী বাঙালীদের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে রেঙ্গুন হাইকোর্টে এক জন বাঙালী বিচারপতি আছেন। পূর্ব্বে এই আইনব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইলেই চলিত। কিন্তু বর্ত্তমানে বিদেশী—অর্থাৎ ভারতবাসী-ব্যবহারজীবীদের অব্যাহত প্রতিরোধ করিবার জন্য এই নিয়ম করা হইয়াছে, যে, ব্যবসায়-প্রার্থীকে তদ্দেশের বাসিন্দারূপে (domiciled) পরিগণিত হইতে হইবে। ইহার জন্য কারণ দর্শাইয়া আবেদন করা আবশ্যক। চিকিৎসা-বিভাগে যে-সকল বাঙালী স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিতেছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই রেঙ্গুনে অবস্থান করেন। মফস্বলে বেশী বাঙালী চিকিৎসক এখনও গমন করেন নাই।

এই সকল ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুরাই অগ্রবর্ত্তী। বাঙালী মুসলমান ব্যবহারজীবী বা চিকিৎসকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। কিন্তু অন্যান্য সাধারণ ব্যবসা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে মুসলমানরা হিন্দুদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী। রেঙ্গুন শহরে স্বর্গীয় শশিভূষণ নিয়োগী মহাশয়ই একমাত্র প্রতিষ্ঠাপন্ন হিন্দুব্যবসায়ী ছিলেন। ঢাকানিবাসী স্বর্গীয় জয়চন্দ্র দত্ত মহাশয় এককালে ঠিকাদারী কাজ করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। তদ্ভিন্ন স্বর্গীয় শিবপদ দাস প্রমুখ আরও অনেক বাঙালী হিন্দু ব্রহ্মদেশের নানা স্থানে ঐ শ্রেণীর কাজ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। কিন্তু ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে বাঙালী হিন্দুদিগের অপেক্ষা মুসলমানরাই বেশী অগ্রবর্ত্তী। দরজীর কাজ, দপ্তরীর কাজ প্রভৃতি মুসলমানদের একচেটিয়া কারবারগুলি ছাড়াও নানারূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে বহু মুসলমান নিযুক্ত আছেন। ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানীর জাহাজের খালাসী প্রায় সকলেই বাংলার মুসলমান। তদ্ভিন্ন রেঙ্গুনে এবং অন্যান্য দু-তিন জায়গায় খেয়-মাঝির কাজেও চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী জিলাগুলির মুসলমানরাই প্রধানতঃ নিযুক্ত আছেন। কারিগর, মিস্ত্রী প্রভৃতির কাজেও বাঙালী মুসলমানই বেশী। তদ্ভিন্ন প্রতিবৎসর ধানকাটার সময়ে বাংলা দেশ হইতে বহু লোক, প্রধানতঃ মুসলমান, ব্রহ্মদেশে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস মাত্র ঐ দেশে অবস্থান করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনান্তে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এইরূপ কার্য্যের জন্য অবশ্য মান্দ্রাজ ও উড়িষ্যা হইতেও অনেক লোক গমন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে দুধ-বিক্রীর কাজ প্রধানতঃ বাঙালীদের হাতেই ছিল। এই সকল দুগ্ধব্যবসায়ী যে সকলেই জাতিতে গোপ ছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু ক্রমে এই ব্যবসায়টি বাঙালীদের হস্ত হইতে হিন্দুস্থানীদের হস্তে গিয়া পড়িয়াছে। তবে এক বিষয়ে বাঙালী হিন্দুরা এখনও ব্রহ্মদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই বিশেষ তৎপরতার সহিত কারবার চালাইতেছেন—তাহা নাপিতের ব্যবসায়। ব্রহ্মদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই যথেষ্টসংখ্যক বাঙালী নাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। রেঙ্গুন শহরে বাঙালী নাপিতরাই কুলীন। মফস্বলের অনেক স্থলে তাহারা চুল কাটিবার দোকান করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। এই সকল ক্ষৌরকার প্রধানতঃ চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলারই অধিবাসী এবং সকলেই জাতিতে পরামানিক নহে।

মফস্বলের অনেক স্থলে নিম্নশ্রেণীর বাঙালীরা—হিন্দু ও মুসলমান—কৃষিকার্য্য করিয়া বিশেষ সচ্ছলতার সহিত বসবাস করিতেছেন। ইহারা একরূপ ব্রহ্মদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাদের মধ্যেও হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী। হিন্দু কৃষিজীবীরা সাধারণতঃ নিম্নব্রহ্মের ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপে কয়েকটি জেলাতেই বাস করে। মুসলমানেরা বহুদূরবর্ত্তী পার্ব্বত্য স্থানেও বসতি স্থাপন করিয়াছে। এই সকল কৃষক প্রধানতঃ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা এবং ময়মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধিবাসী। মুসলমানদিগের অনেকেরই ব্রহ্মদেশীয়া নারীর সহিত বিবাহ হইয়াছে।

গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনা অনুসারে ব্রহ্মদেশে ৩৭৮,০০০ জন বাঙালী ছিল। এই লোক-গণনা ব্যাপারে একটি অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। বাঙালী ভিন্ন চট্টগ্রামবাসী (Chittagonians) বলিয়া একটি ভিন্ন শ্রেণীর বরাবরই উল্লেখ করা হইয়া থাকে। উপরে যে সংখ্যা দেওয়া হইল তাহা বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যা। কিন্তু ঐ লোক-গণনার বিভিন্ন স্থানে হিসাবে বাঙালী ও চট্টগ্রামবাসী বলিয়া দুইটি পৃথক শ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আর এইরূপ অদ্ভুত শ্রেণী-বিভাগ না হয় তাহার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা আবশ্যক। এই বিষয়ে চট্টগ্রামবাসীদিগেরই প্রধান ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। তবে এই সংশ্রবে একটি কথা বলা অবান্তর হইবে না। ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্রই বাঙালী ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা চট্টগ্রামী বলিয়া একটি বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। চট্টগ্রামীরা যে অন্য বাঙালী হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে পারে না, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াও সাফল্যলাভে সমর্থ হই নাই।

প্রাচীন ভারতে বাসগৃহের দিঙ্‌নির্ব্বাচন ও সংস্থাপন ব্যবস্থা

অধ্যাপক শ্রীপ্রসন্নকুমার আচার্য্য, এম্‌-এ, পিএইচ-ডি (লাইডেন), ডি-লিট্‌ (লণ্ডন), আই-ই-এস্‌

কৌটলীয় অর্থশাস্ত্রের গ্রন্থকর্ত্তা চাণক্যের নামে বাসগৃহের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি প্রয়োজনীয় কথা প্রচলিত আছে। ধনী, শ্রোত্রিয়, রাজা, নদী ও বৈদ্য যে-স্থানে দুর্লভ সে-স্থানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা অনুচিত। সেরূপ স্থান যে লোকবসতির অনুপযুক্ত তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ গ্রাম বা নগর এরূপ স্থানেই প্রায় সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছে যেখানে এই পঞ্চবিধ সুবিধা ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। ধনী লোকের অভাবে গ্রাম বা নগর সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে না। ধর্ম্মযাজক না থাকিলে লোকের ধর্ম্মাচরণ অসম্ভব হয়। রাজা বা রাজপ্রতিনিধি না থাকিলে লোকের শান্তিরক্ষাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না। নদীর দ্বারা পানীয় জলের ব্যবস্থা, ভূমির উর্ব্বরতা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাতায়াতের সুবিধা বুঝিতে হইবে। নদীমাতৃক দেশ বা স্থান এই সকল কারণেই সভ্য লোক মাত্রেরই অভীপ্সিত। বৈদ্য বা চিকিৎসকের বর্ত্তমানে ঔষধপথ্যাদি দ্বারা রোগাদির উপশম ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে।

মৌর্য্য-বংশের সংস্থাপক মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী ও দক্ষিণ-হস্ত রূপে চাণক্য পণ্ডিত পরিচিত। মৌর্য্য-সাম্রাজ্য ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনা যাহা মহাবীর আলেকজাণ্ডার ও সেলেউকাস্‌ নিকাটোর প্রভৃতির বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু চাণক্য পণ্ডিতই যে সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে গ্রাম নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে। বৈদিক যুগেও সমৃদ্ধ গ্রাম নগর ছিল তাহারও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে। তাহারও সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদাড়োতে এবং পঞ্জাবের হরপ্পা নামক স্থানে প্রসিদ্ধ গ্রাম নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং এই বিষয়ে বৌদ্ধ যুগ বা রামায়ণ মহাভারতের কাল বা পৌরাণিক কালের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

বাসস্থান-বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের ব্যবস্থা হইতেও বিশদ ও বিস্তারিত বিবরণ মানসারাদি শিল্পশাস্ত্রের মূলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা এস্থলে আলোচ্য বিষয় নহে। এই পঞ্চবিধ সুবিধা লোকবসতির পক্ষে অপরিহার্য্য। বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ অন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থারও বিবেচনা করা হইত। বৌদ্ধগ্রন্থ চুল্লবগ্‌গের (৬, ৪, ৮) ব্যবস্থা অনুসারে আরাম বা বিশ্রামাগার এমন স্থানে নির্ম্মিত হইত যাহা কোলাহলপূর্ণ নগর হইতে বেশী দূরেও নহে, বেশী নিকটেও নহে। তাহা নগর নগরীর এরূপ উপকণ্ঠে হওয়া চাই যেখানে সহজে যাতায়াতের সুবিধা আছে অথচ দিনের বেলায় জনসমূহপূর্ণ নহে এবং রাত্রিতে লোকের কোলাহলে শান্তি ও বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় না, অথবা নির্জ্জনতাহেতু কোন ভয়ের কারণ থাকে না।

চুল্লবগ্‌গ (৬, ৪, ১০) ও মহাবগ্‌গের (৩, ৫, ৯) বর্ণনা অনুসারে সাধারণ বাসগৃহে এবং উপাসকের আশ্রমাগারে নানা প্রকারের প্রকোষ্ঠ থাকিত। সাধারণ বাসগৃহে প্রয়োজনানুরূপ শয়নাগার, বিশ্রামাগার, ভোজনাগার, অগ্নিস্থানযুক্ত আস্থানাগার, দ্রব্যসংস্থাপনাগার, স্নানাগার, বস্ত্রপরিবর্ত্তনগৃহ, পুরীষগৃহ, কূপগৃহ, পুষ্করিণী ও খোলা মণ্ডপ থাকা প্রয়োজন। তথাকথিত আশ্রমাগারেও যথাযথ শয়ন-কক্ষ, অশ্বশালা, শিখরযুক্ত গৃহ, ভূগর্ভস্থ গৃহ, উপাসনা-মন্দির, দ্রব্যাগার, ভোজনাগার, বিপণি, উচ্চকক্ষ, পাকগৃহ, উত্তাপ প্রাপ্তির জন্য অগ্নিগৃহ, পুরীষগৃহ, ভ্রমণাগার, কূপগৃহ, শীতোষ্ণ স্নানের জন্য যন্ত্রগৃহ, পদ্মযুক্ত পুষ্করিণী ও মণ্ডপাদি থাকিত।

শিল্পশাস্ত্র, পৌরাণ এবং আগমাদি শাস্ত্র হইতে কোন্‌ প্রয়োজনের কোন্‌ কোন্‌ গৃহ বাস্তুভিটার কোন্‌ কোন্‌ স্থানে থাকা প্রয়োজন তাহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থপরিবারের জন্য চতুঃসাল ষোড়শকক্ষযুক্ত গৃহ অর্ব্বাচীন কালের বাস্তুশাস্ত্রের যুগে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাস্তুতত্ত্ব (পৃ. ১) নামক এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা কোন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে এই ষোড়শ কক্ষের সংস্থাপন বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে ঈশান বা উত্তর-পূর্ব্ব কোণে (১) দেবগৃহ ; পূর্ব্বে (২) সর্ব্ববস্তু গৃহ, (৩) স্নানগৃহ (৪) দধিমন্থন গৃহ ; অগ্নি বা দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে (৫) রন্ধনগৃহ ; দক্ষিণে (৬) ঘৃতসগৃহ, (৭) শৈলগৃহ ও (৮) পুরীষগৃহ ; নৈঋর্ত বা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে (৯) শাস্ত্রগৃহ ; পশ্চিমে (১০) বিদ্যাভ্যাস-গৃহ, (১১) ভোজনগৃহ ও (১২) রোদনগৃহ ; বায়ু বা পশ্চিম-উত্তর কোণে (১৩) ধান্যগৃহ ; উত্তরে (১৪) সংভোগ-গৃহ, (১৫) দ্রব্যগৃহ ও (১৬) ঔষধগৃহ থাকিবে। গৃহবাস্তুপ্রদীপ নামক অপর পুস্তিকাও সংক্ষেপে এই ষোড়শকক্ষযুক্ত বাস্তুগৃহের বর্ণনা করিয়াছে। *

এই বিবরণ হইতে ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, এই প্রণালীর গৃহ উত্তরমুখী, কেননা পূর্ব্ব-দক্ষিণ ও পূর্ব্বে যে-

---

* বিস্তারিত বিবরণের জন্য লেখকের 'শিল্পশাস্ত্রীয় অভিধান' পৃ. ৬১২-৬১৪ এবং মানসার শিল্পশাস্ত্রের মূল পৃ. ৩২-৫৬, ২৭৪-২৭৯ এবং ইংরেজী অনুবাদ পৃ. ৬৩-৯৮, ৪২৩-৪৩১ দ্রষ্টব্য।

সকল কক্ষ অবস্থিত তাহারা সাধারণ বাসগৃহ নহে। উত্তরমুখী গৃহ উত্তর-ভারতের পক্ষে উপযোগী যেখানে উত্তরস্থ হিমালয় পর্ব্বত হইতে স্বাস্থ্যকর বায়ু প্রবাহিত হয়।

বাস্তুপ্রবন্ধ (২, ২৫, ২৬) নামক অন্য এক পুস্তিকার ব্যবস্থা অনুসারে পূর্ব্বে (১) স্নানগৃহ; অগ্নিকোণে (২) পচনালয়; দক্ষিণে (৩) শয়নাগার; নৈর্ঋতে (৪) শাস্ত্র-মন্দির; পশ্চিমে (৫) ভোজনাগার; বায়ুকোণে (৬) পশু-মন্দির; উত্তরে (৭) ভাণ্ডকোষ; এবং ঈশানকোণে (৮) দেবমন্দির থাকা উচিত।

এই রীতির গৃহ ক্ষুদ্র পরিবারের উপযোগী, সম্ভবতঃ দক্ষিণমুখী এবং দক্ষিণ বা পূর্ব্ব ভারতের যে যে স্থলে দক্ষিণ হইতে মলয়মারুত বা সমুদ্রের হাওয়া প্রবাহিত হয় সে-সকল স্থলের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

শিল্পশাস্ত্র-সারসংগ্রহ (৯, ২৪-২৮) নামক অপর এক সংগ্রাহকের নামহীন ক্ষুদ্র পুস্তিকার নির্দ্দেশ অনুসারে ঈশান কোণে (১) দেবতাগৃহ; পূর্ব্বে (২) স্নানমন্দির; অগ্নিকোণে (৩) পাকসদন; উত্তরে (৪) দ্রব্যাগার; অগ্নিকোণ ও পূর্ব্বদিকের মধ্যে (৫) দধিমন্থন-মন্দির; অগ্নিকোণ ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে (৬) আজ্যগৃহ; দক্ষিণ ও নৈর্ঋত কোণের মধ্যে (৭) পুরীষত্যাগ-মন্দির; নৈর্ঋত কোণ ও পশ্চিম দিকের মধ্যে (৮) বিদ্যাভ্যাস-মন্দির; পশ্চিম ও বায়ুকোণের মধ্যে (৯) রোদনগৃহ; বায়ুকোণ ও উত্তর দিকের মধ্যে (১০) রতি (শয়ন) গৃহ; উত্তর ও ঈশান কোণের মধ্যে (১১) ঔষধার্থ-গৃহ, এবং নৃপতির জন্য বিশেষভাবে নৈর্ঋত কোণে (১২) সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত।

এই সংগ্রহ-পুস্তকের নিয়মানুসারে বাসগৃহের কক্ষ-সংখ্যা, এমন কি নৃপতির পক্ষেও, দ্বাদশমাত্র হইলেই চলিতে পারে। মূলগ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখ নাই বলিয়া এই সংগ্রহ-পুস্তিকার প্রামাণ্যের অভাব। ইহারও ব্যবস্থা উত্তরমুখী বাসগৃহের এবং সম্ভবতঃ উত্তর-ভারতবর্ষের স্থানবিশেষের উপযোগী।

মৎস্যপুরাণের (অধ্যায় ২৫৬, শ্লোক ৩৩-৩৬) ব্যবস্থা অনুসারেও ঈশান কোণে (১) দেবতাগার; ও (২) শান্তিগৃহ; অগ্নিকোণে (৩) মহানস এবং তাহার উত্তরপার্শ্বে (৪) জলস্থান; নৈর্ঋত কোণে (৫) গৃহোপস্করণ স্থাপনের কক্ষ; গৃহগণ্ডীর বাহিরে (৬) বন্ধ (ব বধ) কক্ষ ও (৭) স্নানমণ্ডপ; বায়ুকোণে (৮) ধনধান্যগৃহ; এবং তাহারই বহির্দ্দেশে (৯) কর্ম্মশালা হওয়া উচিত। এই পুরাণের ব্যবস্থা অনুসারে এরূপ বাস্তু-বিশেষ গৃহভর্ত্তার শুভাবহন করে।

এই ক্ষুদ্র বাসগৃহের 'শান্তিগৃহ' সম্ভবতঃ 'শয়নাগার' অর্থে বুঝিতে হইবে, যেহেতু তাদৃশ অপরিহার্য্য কক্ষের উল্লেখ অন্যত্র নাই। সম্ভবতঃ পাঠের ক্রটিবশতঃ শয়নাগার উত্তর দিকে স্থাপিত এই কথার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। বস্তুতঃ প্রধান চতুর্দ্দিকস্থ কক্ষগুলি এই তালিকায় বাদ পড়িয়া গিয়াছে। এই অসম্পূর্ণ তালিকা হইতেও বাস্তুগৃহ উত্তরমুখী বলিয়াই মনে হয়।

অগ্নিপুরাণ (অধ্যায় ১০৬, শ্লোক ১-১২, ১৮-২০) বিশেষ-ভাবে নগরস্থ বাসগৃহ এবং চতুঃসাল, ত্রিসাল, দ্বিসাল ও একসাল গৃহের উল্লেখ করিয়াছে। নগরে স্থানসঙ্কোচবশতঃ সর্ব্বত্র মধ্যে প্রাঙ্গণযুক্ত চতুর্দ্দিক আবৃত কক্ষসমূহের ব্যবস্থা অসম্ভব বা অনভীপ্সিত বলিয়া আলোক ও বায়ুপ্রবাহের সুবিধার জন্য এক দিক, দুই দিক, এমন কি চারি দিক খোলা বাসগৃহেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পুরাণের নির্দ্দেশ অনুসারে পূর্ব্বে (১) শ্রীগৃহ, অগ্নিকোণে (২) মহানস, দক্ষিণে (৩) শয়নাগার, নৈর্ঋতকোণে (৪) আয়ুধ-আশ্রয়, পশ্চিমে (৫) ভোজনাগার, বায়ুকোণে (৬) ধান্যাগার, উত্তরে (৭) দ্রব্যসংস্থানকক্ষ, এবং ঈশানকোণে (৮) দেবতাগৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত।

এই ব্যবস্থাও ক্ষুদ্র পরিবারেরই উপযোগী। এই পুরাণও দক্ষিণ বা পূর্ব্ব ভারতের কোন স্থান লক্ষ্য করিয়া এরূপ ব্যবস্থা দিয়াছে যে, স্থলবিশেষে দক্ষিণের বায়ু দক্ষিণমুখী গৃহের দক্ষিণ দিকস্থ শয়নাগার প্রভৃতির পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও সুবিধাজনক।

কামিকাগমের (অধ্যায় ৩৫, শ্লোক ১৭৭-১৯১) নির্দ্দেশ অনুসারে পূর্ব্বে (১) ভোজনস্থান, অগ্নিকোণে (২) মহানস, দক্ষিণে (৩) শয়নস্থান, নৈর্ঋত কোণে (৪) আয়ুধালয়, তাহারই নিকটে (৫) মৈত্রস্থান, পশ্চিমে (৬) উদকালয়, বায়ু কোণে (৭) গোষ্ঠাগার, উত্তরে (৮) ধনালয়, ঈশান কোণে (৯) নিত্যনৈমিত্তিক পূজার জন্য যাগমণ্ডপ, প্রাগ্-উদক্ দিকে (১০) কাঞ্জি ও লবণের স্থান. অন্তরীক্ষ ও সবিত কোষ্ঠে† যথাক্রমে (১১) চুল্লী ও (১২) উলূখলী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অন্নপ্রাশন বা ভোজনাগার আর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি বা সবিতৃ কোষ্ঠেও হইতে পারে। বিবস্বত কোষ্ঠে (১৩) শ্রবণাগার; মৈত্রকোষ্ঠে (১৪) বিবাদকক্ষ; ইন্দ্রজয়, বায়ু কিংবা সোমকোষ্ঠে (১৫) ক্ষৌদ্র(র) আগার; বিতথ, উপালয় হ), পিতৃ, দৌবারিক, সুগ্রীব বা পুষ্পদন্ত কোষ্ঠে (১৬) প্রসূতিগৃহ; অপবৎসকোষ্ঠে (১৭) কোষাগার; আপকক্ষে (১৮) কুণ্ড; মহেন্দ্রকোষ্ঠে (১৯) অক্ষ(ঙ্গ)ন; মহধির কোষ্ঠে (২০) পেষণী; সেই সেই স্থানে (২১) অরিষ্টাগার এবং (২২) উপস্কারভূমিও হইতে পারে; দ্বারের দক্ষিণে (২৩) বাহনাগার; বরুণকক্ষে (২৪) স্নানশালা, অসুরকক্ষে (২৫) ধান্যাবাস; ইন্দ্ররাজকোষ্ঠে (২৬) ঔষধালয়।

† সাধারণতঃ অষ্ট দিক সুপরিচিত হইলেও গ্রাম নগরে গৃহবিশেষের এবং বাসগৃহের কক্ষবিশেষের যথাযথ স্থানে সংস্থাপনার জন্য নির্ব্বাচিত স্থান দ্বাত্রিংশ নকসার এবং নকসার মধ্যস্থ জমি ১০২৪ পদ বা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হইত যাহা ইন্দ্র সবিতৃ প্রভৃতি দিক্‌পাল বা দেবতাবিশেষের নামে প্রচলিত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য লেখকের সম্পাদিত ও ইংরেজীতে অনূদিত মানসার শিল্পশাস্ত্রের পদবিন্যাস নামক সপ্তম অধ্যায় এবং তত্তৎ চিত্রসমূহ মানসার শিল্পশাস্ত্রের পঞ্চম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

পক্ষান্তরে মিত্রাবাস মিত্রকোষ্ঠে, এবং উলূখলস্থান রোগকোষ্ঠে, কোশগেহ ভূধরকোষ্ঠে, ঘৃত (দধিমন্থন) ও ঔষধালয় নাগকোষ্ঠে হইতে পারে।

ক্রমান্বয়ে জয়ন্ত, অপবৎস, পর্জ্জন্য বা শিবকোষ্ঠে (২৭) বিষের প্রতৌষধিস্থান, (২৮) কূপ ও (২৯) দেবগৃহ, এবং ঋক্ষ, ভল্লাট, বা সোমকক্ষে (৩০) আস্থানমণ্ডপ হওয়া উচিত।

উত্তর-ভারতের পুরাণসমূহের অনুকরণে রচিত দক্ষিণ-ভারতের আগমসমূহ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সংগ্রহ-পুস্তক। পুরাণের ন্যায় আগমেও তাৎকালীন লোকের জ্ঞানের বিষয়ীভূত প্রায় সকল বিষয়ের অল্পবিস্তর বর্ণনা আছে। বস্তুতঃ এই কামিকাগমের ৭৫ অধ্যায়ের মধ্যে ৬০ অধ্যায়ই বাস্তুবিবরণ ও মূর্ত্তিনির্ম্মাণ-ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ। স্থানান্তরে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পৌরাণিক, আগমিক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বিত্রিশত সংখ্যক বাস্তুবিষয়ক গ্রন্থ শিল্পশাস্ত্রের মূলগ্রন্থ মানসার-মূলক।* এই সকল সংগ্রহ-গ্রন্থের বিবরণের অল্পবিস্তর বিভিন্নতা স্থানীয় প্রয়োজনজনিত। মূলগ্রন্থ মানসার শিল্প-শাস্ত্রে সর্ব্ব প্রদেশ ও স্থানের উপযোগী হয় এরূপ সমালোচনা ও নির্দ্দেশ প্রায় সকল প্রস্তুত বিষয়েরই করা হইয়াছে। সকল বিষয়ের উল্লেখ এস্থলে অসম্ভব ও নিষ্প্রয়োজন। কামিকাগম চতুর্দ্দিক ও চতুষ্কোণের অতিরিক্ত যে সকল দিক্‌পালের কোষ্ঠের ঘটনাক্রমে এখানে উল্লেখ করিয়াছে তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ 'পদবিন্যাস' নামক মানসার শিল্প-শাস্ত্রের এক সুবৃহৎ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।† তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে নগর, গ্রাম ও গৃহাদির জন্য নানা পরীক্ষার দ্বারা কোন স্থান মনোনীত হইলে তাহা প্রয়োজন অনুসারে একপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ১০২৪ পদ বা প্রকোষ্ঠে বিভাগ করা যাইতে পারে। এই প্রকোষ্ঠসমূহ দিকপাল-সংজ্ঞক দেবতার নামে পরিচিত। মনোনীত স্থানের বিশেষ কোন স্থান যেখানে বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে তাহা দিকপালের প্রকোষ্ঠের উল্লেখ করিয়া সঠিকভাবে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

কামিকাগমের নির্দ্দেশ অনুসারে একাধিক প্রকোষ্ঠেও বিশেষ কোন কক্ষ স্থাপিত হইতে পারে। বস্তুতঃ মূলগ্রন্থ মানসার শিল্পশাস্ত্র হইতেই সাক্ষাৎভাবে অনুকরণ করিবার ফলে কামিকাগম ও উপরিউদ্ধৃত বাস্তুশাস্ত্রের পুস্তিকা-সমূহের মধ্যে এই প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে। এই সকল ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিশেষ কোন স্থানের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য রচিত হইয়াছিল। সেজন্য এ-সকল পুস্তকে একাধিক স্থানে বিশেষ কোন কক্ষ নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা প্রদান করা হয় নাই। আগম নামক গ্রন্থসমূহ পুরাণের ন্যায় অধিকতর প্রামাণিক হওয়ার অভিপ্রায়ে মানসার শিল্পশাস্ত্রের অনুকরণে একাধিক স্থানে একই কক্ষ নির্দ্দেশ করিয়াছে। কিন্তু মানসার শিল্পশাস্ত্রে উদাহরণস্বরূপ যাহা যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহারই আংশিক বিবরণ কামিকাদি আগম প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ রাজহর্ম্ম্যের যে সাধারণ বিবরণ মানসার শিল্পশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ আগম পুরাণ বা ক্ষুদ্রতর বাস্তুগ্রন্থসমূহে নাই।

রাজহর্ম্ম্য নয় শ্রেণীর রাজার উপযোগী। এই নববিধ রাজহর্ম্ম্য সংস্থাপনে পরস্পরের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে। সম্রাটাদির অভিরুচি, অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে নিম্নে উদ্ধৃত রাজহর্ম্ম্যের সাধারণ সংস্থাপন পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহা মানসার শিল্পশাস্ত্রে (অধ্যায় ৪০, শ্লোক ১৫৫) বিশেষ ভাবে বারংবার বলা হইয়াছে।

সার্ব্বভৌম বা চক্রবর্ত্তী, মহারাজ, নরেন্দ্র, পার্ষ্ণিক, পট্টধর, মণ্ডলেশ, পট্টভাজ, প্রাহারক ও অস্ত্রগ্রাহ এই নয় শ্রেণীর রাজন্যবর্গের বাসোপযোগী নববিধ রাজহর্ম্ম্য এক হইতে সপ্ত প্রাকার বা পরিবেষ্টনীতে বিভক্ত। এই প্রত্যেক গণ্ডী প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং অন্তর্ম্মণ্ডল, অন্তর্নিহার, মধ্যমহার, প্রাকার ও মহামর্য্যাদাদি নামে পরিচিত। এই সকল মণ্ডলের সিংহদ্বার বা গোপুর যথাক্রমে দ্বারশোভা, দ্বারশালা, দ্বারপ্রাসাদ, দ্বারহর্ম্ম্য, ও মহাগোপুর নামে বর্ণিত এবং এক হইতে সপ্তদশতলযুক্ত।* এই মণ্ডলের প্রত্যেকটিতে এক হইতে দ্বাদশতলযুক্ত গৃহ সাধারণতঃ মধ্যে চতুঃসাল প্রণালীতে সংস্থাপিত হইলে এক হইতে দশশালা নামক শ্রেণীতে বিভিন্ন আকারে সুসজ্জিত হইতে পারে।† রাজহর্ম্ম্যের মণ্ডল, শালা ও তলসংখ্যা রাজন্যবর্গের শ্রেণী অনুযায়ী। সাধারণতঃ মধ্যভাগে ব্রহ্মপীঠে রাজমন্দির-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা আছে। প্রধান রাজহর্ম্ম্য ইন্দ্র, বরুণ, যম বা পুষ্পদন্তাদি প্রকোষ্ঠে নির্ম্মাণ করা উচিত। এই প্রধান হর্ম্ম্যের চতুষ্পার্শ্বে রাজমহিষী, রাজকুমারী, প্রভৃতির জন্য গৃহনির্ম্মাণের ব্যবস্থা আছে। স্নানাগার, বস্ত্রপরিবর্ত্তন-গৃহ, শয়নকক্ষ, আস্থানমণ্ডপ, ভোজনগৃহ, রন্ধনশালা প্রভৃতি এবং পরিচারক, পরিচারিকাদির বাসস্থান ও পুষ্করিণী ও উদ্যানাদি সুবিধামত সংস্থাপন করিতে হয়। অন্তঃপুরের পরস্থ মণ্ডলীতে রাজকুমার, রাজপুরোহিত, রাজমন্ত্রী প্রভৃতির জন্য যথোপযুক্ত প্রাসাদ

* লেখকের 'ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্র' নামক গ্রন্থের পৃ. ৪৯-১০৯, ১১০-১৩৩, ১৬১-১৭৪ দ্রষ্টব্য।

† টীকা ২ দ্রষ্টব্য

* বিস্তারিত বিবরণের জন্য পূর্ব্বোক্ত 'ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্রে'র পৃ. ৫১-৫৩ এবং মানসার শিল্পশাস্ত্রের মূল ও ইংরেজী অনুবাদের অধ্যায় ৩১, ৩৩, এবং পঞ্চম খণ্ডস্থ চিত্রাবলী দ্রষ্টব্য।

† বিস্তারিত বিবরণের জন্য মানসার শিল্পশাস্ত্রের অধ্যায় ৩৫ এবং চিত্রাবলী (পঞ্চম খণ্ডে) দ্রষ্টব্য।

নির্ম্মিত করা উচিত। তৎপরস্থ মণ্ডলীতে রাজপরিষৎ, পরিষদের সভ্য ও কর্ম্মচারীসমূহের গৃহনির্ম্মিত হওয়া উচিত। চতুর্থ মণ্ডলীতে যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য যথোপযুক্ত প্রাসাদাদি সংস্থাপিত হওয়া উচিত। প্রমোদোদ্যান, পুষ্পোদ্যান, কুঞ্জ ও দীর্ঘিকাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা উচিত।

উদাহরণস্বরূপ মানসার শিল্পশাস্ত্র (অধ্যায় ৪০, পং ১১৭-২২১) হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে যে, আস্থানমণ্ডপ, রাজদর্শনপ্রাসাদ যম, সোম, বায়ু বা নৈঋ‌র্ত প্রকোষ্ঠে নির্ম্মাণ করা উচিত। বায়ুকোণে পুষ্করিণী, নাগপ্রকোষ্ঠের বামভাগের দক্ষিণে আরামদেশ বা বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করা উচিত। সেই আরাম দশ হইতেই আরম্ভ করিয়া মুখ্য ও ভল্লাট প্রকোষ্ঠে পুষ্পোদ্যান স্থাপন করা হয়। তৎসংলগ্ন প্রদেশ হইতেই নৃত্যাগার ও নৃত্যাঙ্গনার বাসস্থান নির্ম্মাণ করা হয়। তৃতীয় মণ্ডলের বীথির অংশবিশেষে রহস্যাবাসমণ্ডপ করিতে হয় এবং ঈশ বা বিতথ প্রকোষ্ঠে রঙ্গমণ্ডপের স্থান হওয়া উচিত (পং ১৪৭, ১৫২)। বহির্মণ্ডলের সিংহদ্বার পার্শ্বের দক্ষিণ দিকে ব্যাঘ্রাদি জন্তুর আলয় এবং দৌবারিক পদে ময়ূরালয় করিতে হয় (পং ১৪৪-১৪৫)। তৎপার্শ্বে মেষশালা, এবং সত্যক-প্রকোষ্ঠে বানরালয়, সোম-প্রকোষ্ঠে (উত্তর) হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশান কোণ পর্য্যন্ত প্রদেশে বাজিশালা, যম (দক্ষিণ) হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত প্রদেশে গজশালা, তথা হইতে নৈঋ‌র্তান্ত প্রদেশে কুক্কুটালয় এবং বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া মুখ্য প্রকোষ্ঠান্ত প্রদেশে হরিণ ও মৃগ বা অন্য পশুর জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে (পং ১২৮ ১৩২)। কৃত্রিম যুদ্ধ পরিদর্শন করিবার জন্য দ্বারপার্শ্বে উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মাণ করা উচিত (পং ১৪৮-১৫০)। দ্বারসন্নিকটস্থ কোন সর্ব্বজনদর্শনযোগ্য স্থানে প্রাণদণ্ডের জন্য শূলকম্প স্থান নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রাচীরের দূরদেশে ভৃশ বা অন্তরীক্ষ প্রকোষ্ঠে কারাগার স্থান। বহির্মণ্ডলের দূরদেশে শ্মশান ও সমাধি প্রভৃতির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তত্তৎ প্রদেশে দেবতা-বিশেষের মন্দিরও স্থাপন করা উচিত।

নানাবিধ রাজপ্রাসাদের সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য ও সংস্থাপন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রভৃতির যথাযথ ব্যাখ্যা বিশদভাবে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সমালোচিত হইবার স্থান ও অবসর নাই। ক্ষুদ্র পরিবারাগার, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের আবাস এবং ধনশালী ব্যক্তি ও রাজন্যবর্গের প্রাসাদ-নির্ম্মাণে প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রকার আলোক, বায়ুসঞ্চালন ও অপর স্বাস্থ্যরক্ষা উপযোগী বিষয়সমূহ সমভাবেই রক্ষার ব্যবস্থা দিয়াছেন। বর্ত্তমান নগর, নগরী, পুর, বন্দর ও পত্তনাদি, এমন কি গ্রামস্থ গৃহাদির সংস্থাপন দেখিয়া কাহারও পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয় যে, ভারতবর্ষে হিন্দুরাজত্বের সময় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাসগৃহ-সংস্থাপনের ব্যবস্থা ছিল যাহার ফলে লোকের সুখ সুবিধা ও স্বাস্থ্য রক্ষিত হইতে পারিত। হিন্দুরাজত্বের নাশ ও তৎসঙ্গে-সঙ্গে হিন্দুর শাস্ত্রাদির নির্দ্দেশ গ্রীসীয়, শকীয় ও হূণাদির আক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠান, মোগল ও বর্ত্তমান ইউরোপীয়, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজাদির ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপনের ফলে বিজিত হিন্দু একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন দেশীয় বিজেতার স্থানীয় রীতিনীতি ও শাস্ত্রাদির নির্দ্দেশ ভারতবর্ষে গৃহাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে সংমিশ্রিত হওয়ার ফলে আমাদের বর্ত্তমান বাসগৃহ কোন দেশ বা আবহাওয়ারই উপযোগী নহে। গ্রীষ্মপ্রধান মিশর বা গ্রীসদেশীয় গৃহ-প্রণালীর উপর শীতপ্রধান মধ্য-এশিয়ার শকীয়াদি রীতি ভারতের নগর ও গ্রামস্থ গৃহ নির্ম্মাণে প্রযুক্ত হইয়াছিল। তাহারই উপর পাঠান ও মোগলদিগের স্ব-স্ব দেশীয় পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল। পিণ্ডের উপরে বিস্ফোটকের মত পাঠান ও মোগলের ঈদৃশ পরিবর্ত্তিত ভারতীয় নগর, গ্রাম ও গৃহাদিতে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, মধ্য, উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপের বিজেতাদিগের স্থানীয় পদ্ধতির সংমিশ্রণবশতঃ কোন দেশেরই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, বম্বে, লক্ষ্ণৌ, কাশী, কলিকাতা, কটক, পুরী ও মাদ্রাজ প্রভৃতি নগরের গৃহাদির সংস্থাপন-ব্যবস্থা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বোম্বাইয়ের স্থলবিশেষের গৃহ সম্পূর্ণ ইউরোপীয় সমুদ্রতীরস্থ গৃহের পদ্ধতি ধারণ করে, যদিও আবহাওয়া শীতগ্রীষ্মাদিভেদে বোম্বাই ও ইউরোপীয় নগরের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। দিল্লী, মিরাট, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, এমন কি কাশী ও কলিকাতারই স্থানবিশেষ, যে কেবলই 'মোগলপুরা' বা 'পাঠান-

পল্লী' নামে পরিচিত তাহা নহে। সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশ ও অবস্থা সত্ত্বেও সে-সে স্থানে আজ পর্য্যন্ত পাঠান ও মোগল দেশ ও সভ্যতারই উপযোগী গৃহাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্নদেশীয় পদ্ধতির দ্বারা ভারতবর্ষে নির্ম্মিত গৃহাদি আমাদের পক্ষে নানা বিষয়ে অনিষ্টকর। তাহার সম্যক সমালোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। একটিমাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা হইবে। দিঙ্‌ নির্ণয় বা বাসগৃহের সম্মুখ ভাগের যথোপযুক্ত দিক্‌-নির্ব্বাচন বাসগৃহের স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য্য। রোমক শিল্পী বিট্রুভিয়াস্‌ খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে ইতালীয় নগরাদির দিঙ্‌ নির্ণয়-বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে প্রথমতঃ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কেন না, পাশ্চাত্য প্রমাণ না পাইলে আমরা আমাদের শাস্ত্রাদির ব্যবস্থায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

'সমুদ্রতীরস্থ নগর ও গ্রামাদি দক্ষিণমুখী বা পশ্চিমমুখী হইলে লোকের স্বাস্থ্যের হানি হইবে, কেননা এরূপ স্থান গ্রীষ্মকালের প্রাতঃকালেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে এবং মধ্যাহ্নকাল এরূপ উত্তপ্ত হইবে যে, লোকের দেহ দগ্ধ হইয়া যাইতে পারে। পশ্চিমমুখী নগরী সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে, মধ্যাহ্নে ভীষণ উষ্ণ হইবে এবং অপরাহ্ণে উত্তাপাধিক্যে দগ্ধপ্রায় হইবে। সেজন্য এরূপ ক্রমবর্দ্ধিত ও অত্যধিক উষ্ণ বায়ু পরিবর্ত্তন বশতঃ সে-সকল স্থানের অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্যহানি হইবে।'

ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের নগর উপকণ্ঠে অবস্থিত দক্ষিণ ও পশ্চিমমুখী বাংলো নামক গৃহবাসীদের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়াই যেন বিট্রুভিয়াস্‌ এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

বিট্রুভিয়াস্‌ নগর ও গৃহাদির দিঙ্‌ নির্ণয়-বিষয়ে চিকিৎসক প্রভৃতির মতও উদ্ধৃত করিয়াছেন। উত্তরমুখী, ঈশানকোণ-মুখী ও পূর্ব্বমুখী গ্রাম, নগর ও গৃহাদি স্থলবিশেষে স্যাঁৎ-স্যাঁতে স্থানেও নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা তিনি দিয়াছেন। কেন-না জলনিষ্কাষণ প্রভৃতি উপায়ে এরূপ স্থলস্থ গ্রাম-নগরাদির স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভব, কিন্তু দিঙ্‌ নির্ব্বাচনের ক্ষতি কোন প্রকারেরই প্রতিকারসাপেক্ষ নহে। গৃহাদির সংস্থাপন বিষয়েও বিট্রুভিয়াস ব্যবস্থা দিয়াছেন।

''সমুদ্রতীরস্থ গ্রাম নগরাদির বিপণিস্থান বন্দরসংলগ্ন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যে-সকল গ্রাম নগর ভূমধ্যস্থ তাহাদের বিপণিস্থান কেন্দ্রস্থলেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জুপিটার, জুনো ও মিনার্ভা প্রভৃতির মন্দির নগরাদির সর্ব্বস্থান হইতে দৃষ্ট হইতে পারে এরূপ প্রসিদ্ধ উচ্চস্থানে করিতে হয়। মার্করীর মন্দির বিপণি-মধ্যস্থ, ইসিস্‌ ও সেরাপিস্‌ মন্দির সর্ব্বসাধারণের সম্মেলনোপযোগী উদ্যানাদিতে, এবং আপলো, ও বেকাসের মন্দির রঙ্গমঞ্চের সন্নিকটস্থ হওয়া উচিত। মঞ্চ বা ক্রীড়াস্থান যে-সকল গ্রাম নগরে নাই সেই সেই স্থানে হারকিউলিসের মন্দির সার্কাস বা মণ্ডলীর নিকটে করিতে হয়। ভিনাসের মন্দির সিংহদ্বার নিকটস্থ এবং মার্সের মন্দির নগরাদির বহির্ভাগের উপকণ্ঠ প্রদেশে করিতে হয়। সিরিসের মন্দির নগরের বহির্ভাগস্থ এরূপ নির্জ্জন স্থানে হওয়া আবশ্যক যেখানে লোক সাধারণতঃ পূজা ব্যতীত অন্য কারণে গমনাগমন করে না।''

মানসার শিল্পশাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারেও শ্মশানকালিকা, বসন্তরোগ-উপশমকারিণী শীতলাদেবী প্রভৃতির মন্দির নগর ও গ্রাম প্রভৃতির বহির্ভাগে দূরস্থ নির্জ্জন স্থানে নির্ম্মাণ করিতে হয়।

বিট্রুভিয়াসের ব্যবস্থা অনুসারেও চাণক্যের উপদেশরূপে পরিচিত পঞ্চলক্ষণহীন স্থান গ্রামনগরাদি বাসস্থানের উপযোগী নহে। গ্রাম নগরাদি সংস্থাপনের পূর্ব্বে মনোনীত স্থানের বায়ুর বিশুদ্ধতা, খাদ্যসামগ্রীর প্রচুর সরবরাহ, নদী, সমুদ্র ও পথাদি দ্বারা যাতায়াতের ও বাণিজ্যাদির সুবিধা এবং ধনী ও রাজপুরুষাদির উপস্থিতি দ্বারা সংরক্ষণের ব্যবস্থা বিট্রুভিয়সও দিয়াছেন।*

এরূপ পাশ্চাত্য প্রমাণ দ্বারা যদিও আমাদের শাস্ত্রাদির অনুশাসন সপ্রমাণ করিতে পারা যায়, তথাপি লোকের আর্থিক অবস্থা এবং মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞতা ও কুশাসনের ফলে নগরাদির পল্লীসংস্থাপনে এমন কি বিনা ব্যয়ের বায়ুর বিশুদ্ধতার দিকেও লক্ষ্য রাখা হয় না। অত্যন্ত পরিহাস ও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে বড় বড় প্রাচীন নগর-নগরীর টাউন ইমপ্রুভমেণ্ট (নগরসংস্কারক) নামক শাসক-মণ্ডলী দ্বারাই এলাহাবাদ প্রভৃতি নগরে শহরের আবর্জ্জনা ও পুরীষাদির দ্বারা পরিপূরিত গর্ত্তসমূহকে সমতল করিয়া তাহারই উপর নূতন পল্লী সংস্থাপিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, তাদৃশ পল্লীতে বায়ুর বিশুদ্ধতা কখনও হইতে পারে না, ঔষধাদির সংমিশ্রণে ও কালক্রমে ময়লা মাটির সহিত মিশিয়া গেলেও তত্তৎ স্থানের বায়ু সদাসর্ব্বদাই পূতিগন্ধ-মিশ্রিত হইয়া অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্যের হানি অজ্ঞাতভাবে

* বিশেষ বিবরণের জন্য বিট্রুভিয়াস প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত ব্যবস্থার সমালোচনা লেখকের 'ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্র' নামক গ্রন্থের অধ্যায় ৪ পৃ. ১৪২-১৪৩, ১৪৬-১৪৭, এবং অধ্যায় ২, পৃ. ৩৬-৪০ দ্রষ্টব্য।

মানসার শিল্পশাস্ত্রের অধ্যায় ৩, ৪, ৫, ৭, ৯, ১০, ৪০, মূল পৃ. ৬-২৮, ৩২-৫৬, ২৭৪-২৭৯ এবং ইংরেজী অনুবাদ পৃ. ১১-৫৭, ৬৩-৯৮, ৪২৩-৪৩১ দ্রষ্টব্য।

করিতে থাকিবে। আমাদের তথাকথিত ট্রাষ্ট বা বিশ্বাস-ভাজনতা এবং মিউনিসিপাল বোর্ড দ্বারা নগর-রক্ষকতা বস্তুতঃ এরূপ ভাবেই সম্পাদিত হইয়া গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সঙ্গমস্থ ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যকর প্রাচীন তীর্থরাজ প্রয়াগ নগরের মোগলদিগের দ্বারা পরিবর্ত্তিত ফকিরাবাদ বা এলাহাবাদের ইমপ্রুভমেণ্ট বা উন্নতি জগতে সুসভ্য ব্রিটিশ আমলেও নির্ব্বিবাদে হইয়া আসিতেছে। আমাদের বর্ত্তমান রাজশক্তি যে নগর-সংস্থাপন বা তাহাদের প্রকৃত সংস্কার বা উন্নতিবিধান না বুঝিতে পারে তাহা নহে। কিন্তু স্থানীয় লোকের প্রকৃত স্বাস্থ্যবিধান অর্থকৃচ্ছ্রতার দোহাই দিয়া হইতে পারে না। 'রাজকর্ম্মচারী'সমূহ ও 'ধনিক' লোকেরা তাদৃশ পূতিগন্ধময় স্থানে বাস করে না। তাহাদের জন্য সিবিল লাইন, মিলিটরি ক্যান্টন্‌মেণ্ট প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর পল্লী-সমূহ রিজর্ভ থাকে। এমন কি নগর-নগরীর তত্তৎপল্লী-সমূহের বিপণি প্রভৃতিতে পর্য্যুষিত খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহ পর্য্যন্ত হইতে পারে না। কুষ্ঠাদি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত লোকে সেরূপ পল্লীর নিজগৃহেও স্থলবিশেষে বাস করিবার অনুমতি পায় না। নগরশাসক ও সংস্কারকদিগের এরূপ বিশ্বাসভাজনতা রক্ষার ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের নগরস্থ বাসগৃহের স্বাস্থ্যহীনতা অবশ্যম্ভাবী। লোকগণনায় দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় শহরে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা হাজারে পাঁচ-ছয় শত। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গণনা করিয়া হিসাব রক্ষা করিলে খুব সম্ভব দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নগরের অধিকতর স্বাস্থ্যকর পল্লীসমূহের অধি-বাসীদিগের বা তাহাদের শিশুসন্তানগণের অকাল মৃত্যুর সংখ্যা তাদৃশ অধিক নহে।

বিস্তৃতভাবে সমালোচনার অবসর অভাবেও সম্ভবতঃ পাঠকের পক্ষে এই কথা বুঝা শক্ত হইবে না যে, নগর-সংস্থাপনে, নগরস্থ পল্লী, বীথিকাদি ও বাসগৃহ নির্ম্মাণে বৈজ্ঞানিক রীতি ও শাস্ত্রের অনুশাসন প্রায় কোথাও প্রতিপালিত হইতে পারে নাই এবং তাহার ফলে নগর ও গ্রামের অধিবাসীদেরও স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারিতেছে না। বাসগৃহের কক্ষসমূহের সংস্থাপনে ও সরঞ্জামাদির মৌলিক ত্রুটিবশতঃ আমরা কিরূপে ধ্বংসের পথে দিনের পর দিন অগ্রসর হইতেছি তাহা হয়ত অনেকের বোধগম্য নহে।

গ্রাম, নগর ও বাসগৃহের সম্মুখ ভাগ নির্ব্বাচন বিষয়ে বায়ু ও উত্তাপাদির উপযোগিতা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। বাসগৃহের যে-সকল কক্ষে অধিবাসীরা অধিকাংশ সময় যাপন করে সে-সকল কক্ষে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু, সূর্য্যের কিরণ, আলোক ও উত্তাপ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চালিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা মানসারাদি শিল্পশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। শয়ন-মন্দিরের কোন্ দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে নিদ্রিতাবস্থায়ও বিশুদ্ধ বায়ু প্রভৃতির উপকারিতা পাওয়া যাইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। সেজন্য বাসগৃহের দ্বার, গবাক্ষ ও অলিন্দ বিষয়ে মানসার শিল্পশাস্ত্র বিশেষভাবে ব্যবস্থা করিয়াছে।* এমন কি রন্ধনশালার ধূম, মলমূত্র ত্যাগের স্থানের পূতিগন্ধ যাহাতে বাসকক্ষসমূহে প্রবেশ করিতে না পারে সে বন্দোবস্ত মানসার শিল্পশাস্ত্রের অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রকার বাসগৃহেই দ্রব্যাগার ও গৃহপালিত পশু-পক্ষীর স্থানও এমন ভাবে করা হইয়াছে যাহাতে অধিবাসী-দিগের বিশ্রামাদির ব্যাঘাত না হয়। উপরিউদ্ধৃত বাসগৃহের কক্ষসমূহের তালিকা হইতে ইহাও লক্ষিত হইয়া থাকিবে যে পারিবারিক দেবতা-গৃহ বা নিত্যনৈমিত্তিক উপাসনার মন্দির গৃহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কক্ষে স্থাপিত হইত। ইহা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর পক্ষে স্বাভাবিক। উদরসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য লোকের বাস-গৃহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কক্ষে ভোজনাগার স্থাপিত হয়, তাহাও স্বাভাবিক।

এই স্বাস্থ্যানুকূল শাস্ত্রীয় অনুশাসন দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান বাসগৃহের কক্ষসমূহের সংস্থাপন-রীতি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বস্তুতঃ সন্ত্রাস উপস্থিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নগর, গ্রাম ও গৃহাদির দিঙ্‌নির্ব্বাচন বা সম্মুখ ভাগ নির্দ্দেশ বিষয়ে রাজনৈতিক কারণ বা বিভিন্নদেশীয় বিজেতাদের রাজ্য ও কৃষ্টি বিজিতদের উপর দৃঢ়ভাবে সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে শাস্ত্রীয় ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বিত হইতে পারে নাই। তাহার পর মুসলমানাদির রাজত্বকালে ধনসম্পত্তি ও যুবতী রূপসী স্ত্রীলোকের রক্ষার জন্য দ্বার,

* পূর্ব্বোক্ত মানসার শিল্পশাস্ত্রের অধ্যায় ৩৩, ৩৮, ৩৯; মূল পৃ. ২১৯-২২০, ২৬৫-২৭৬, অনুবাদ পৃ. ৩৩৬-৩৩৭, ৪১০-৪২২, এবং শিল্প-শাস্ত্রীয় অভিধানের দ্বার ও গবাক্ষ দ্রষ্টব্য।

গবাক্ষ ও প্রাচীরাদি বিষয়ে অসূর্য্যম্পশ্য করিয়া বাসগৃহ কেবল শহরে নহে গ্রামেও নির্ম্মিত হইয়াছে। বস্তুতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতের যে-সকল স্থানে মুসলমান রাজপুরুষদের যাতায়াত অধিক পরিমাণে ছিল, সে-সকল স্থানের গ্রামসমূহ কারাগার-বিশেষ, গ্রাম ও নগর পল্লীস্থ বাসগৃহসমূহে দ্বার, গবাক্ষ ও অলিন্দাদির একান্ত অভাব। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সংস্থাপনের পর ধনসম্পত্তি ও স্ত্রীলোকের রক্ষা অনেক পরিমাণে উন্নতিলাভ করিয়া থাকিলেও বিস্মৃত শাস্ত্রানুশাসন, বহু শতাব্দীর অভ্যাস, লোকের অর্থের অনটন এবং অন্ধভাবে পাশ্চাত্য রীতিনীতি অনুকরণবশতঃ বাসগৃহের সংস্কার বা কোনরূপ উন্নতিবিধানের আবশ্যকতাবোধ বা চেষ্টা করা হয় নাই। অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণের একটা উদাহরণ অনেকের পক্ষে রুচিকর না হইলেও এখানে দেওয়া প্রয়োজন। 'কমোড' নামক পায়খানা ব্যতীত আমাদের 'আপার' সংজ্ঞক শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অনেকের মলত্যাগ করা অসম্ভব বা অসুবিধাজনক। কিন্তু 'কমোড' প্রথমতঃ জাহাজাদিতে ব্যবহৃত 'ওয়াটার-ক্লোজেট' নামক নির্দ্দোষ যন্ত্রবিশেষের অনিষ্টকর অনুকরণ। জলপ্লাবন হেতু 'ওয়টার-ক্লাজেট' হইতে বায়ু দূষিত না করিয়া ত্যাগমাত্রই ময়লা দূরীকৃত হয়। শুষ্ক 'কমোড' হইতে সেরূপ হইতে পারে না। পাশ্চাত্য নগর-নগরীর যে-যে স্থানে ফ্লাশিং বা জলপ্রবাহদ্বারা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ময়লা দূরীকৃত হইয়া যায়, সে-সকল স্থানেই 'ওয়াটার-ক্লোজেট' ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অভ্যাসবশতঃ পাশ্চাত্য রাজপুরুষেরা জলসঞ্চালনহীন ভারতের নগর গ্রামেও কমোডের প্রচলন আরম্ভ করিয়া দুর্ভাগা লোকদ্বারা মলমূত্র দূরীকরণের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের অনুকরণে আমাদের 'আপার' সংজ্ঞক লোকদের মধ্যে অনেকেই শয়নাগারের সন্নিহিত একই কক্ষে স্নানাগার ও ঈদৃশ মলমূত্র ত্যাগের 'কমোড' সংস্থাপন করে, যাহাতে অর্থানটন বা ব্যয়-সঙ্কোচের ইচ্ছাবশতঃ মেথরের বিরল আগমন হেতু পর্য্যুষিত সঞ্চীকৃত মলমূত্রের উপরেই বারংবার মলমূত্রত্যাগ করা হয় এবং স্নানকার্য্য সমাপ্ত করিয়া দেহের আন্তরিক ও বাহ্যিক মল দূর করা হয়। তদ্দ্বারা কেবল শয়নমন্দির নহে, অপর কক্ষসমূহ এবং সমগ্র বাসগৃহেরই বায়ু দূষিত করিয়া, আমাদের অনুকরণ-তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি করা হয়। হিউমিডিটি বা বায়ুতে জলকণার ন্যায় ঈদৃশ বাসগৃহের বায়ুর মলকণা মাপিবার যন্ত্র থাকিলে বুঝিতে পারা যাইত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নিঃশ্বাসের সহিত কি পরিমাণ মলমূত্র আমরা প্রকৃতপক্ষে গলাধঃকরণ করি।

আহার ও পরিধেয়াদি বিষয়েও আমাদের ঈদৃশ মূঢ়তার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় বাসগৃহের দিঙ্‌নির্ণয় ও সংস্থাপন বিষয়ে প্রথমতঃ আমাদের অজ্ঞতা দূর করিতে না পারিলে যে-যে স্থানে বা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব সে-সে স্থলেও কোনরূপ সংস্কার বা উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। আর্থিক কারণে আমাদের যথোপযুক্ত অন্নবস্ত্রাদির সংস্থান হইতে পারিতেছে না। অজ্ঞতাবশতঃ বাসগৃহ সম্বন্ধে কোনরূপে মাথা গুঁজিবার স্থান ব্যতীত অধিক কিছুর আকাঙ্ক্ষামাত্রই আমাদের নাই। বিশুদ্ধ জল আলোক ও বাতাস যাহা আমাদের অজ্ঞতা না থাকিলে একরূপ বিনাব্যয়েই পাওয়া যাইতে পারে তাহাও পাওয়া যাইতেছে না। এই অজ্ঞতা, অলসতা বা অনিচ্ছার অবশ্যম্ভাবী ফল লোকের স্বাস্থ্য ও বলহীনতা।

এরূপ অজ্ঞতা দূর করিবার অভিপ্রায়ে ইতালীর মিলান প্রভৃতি নগরে প্রতিবৎসরই বিভিন্ন-দলীয় বাসগৃহ-সমূহের আধুনিক উৎকর্ষ সম্বলিত প্রদর্শনী হয় এবং অধিবাসীদিগকে উৎকৃষ্ট প্রণালীর বাসগৃহ-নির্ম্মাণে সরকারী সাহায্য ও পারিতোষিক প্রভৃতির দ্বারা প্রলুব্ধ করা হয়। এই বিষয়ে আমাদের দেশনায়ক ও শাসনকর্ত্তাদিগের মনোযোগ সকাতরে প্রার্থনা করা যাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের পত্র

Butterton Vicarage,
Newcastle,
Staffordshire.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

লণ্ডনের গোলমালের পর কিছুদিনের জন্যে পাড়াগাঁয়ে একজন পাদ্রির বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেচি। জায়গাটি সুন্দর। চারিদিকে পৃথিবীর হৃদয় যেন একেবারে শ্যামলতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেচে—এমন ঘন সবুজ আমি কখনো দেখিনি—এ যেন অতলস্পর্শ বর্ণের গভীরতা—চোখ যেন ডুবে গিয়ে কোথাও আর থই পায় না।

যাঁদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেচি তাঁরা মানুষ যেমন ভালো তেমনই তাদের গৃহস্থালীটি মধুর—চারিদিকের লোকের সঙ্গে এবং প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্বন্ধটি কল্যাণে ভরা। বস্তু থেকে আরম্ভ করে পশু এবং মানুষ পর্য্যন্ত কোথাও তাদের নিরলস যত্নের লেশমাত্র বিচ্ছেদ নেই। এই যে নিজের জীবনকে এবং জীবনের চারিদিককে একান্ত সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করা এটা আমার ভারি ভাল লাগে। কারণ পৃথিবীতে ছোট বড় যারই সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঘটে তার কোনোটিকেই উপেক্ষা করা নিজেরই আত্মাকে উপেক্ষা করা, নিজের শক্তিকে অপমান করা। নিজের প্রতি অশ্রদ্ধার দ্বারাই আমরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র অশ্রদ্ধা বিস্তার ক'রে সমস্তকে শ্রীহীন করে তুলি এবং নিজেকে ভোলাবার জন্যে মনে করি এটাই আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ। আমাদের বোলপুর আশ্রমে ঘরে বাহিরে যে অযত্ন পরিদৃশ্যমান হয়ে আছে, তার দ্বারা আমাদের যে গভীর একটা তামসিকতা প্রকাশ পাচ্চে সে কথা মনে পড়লে বার বার আমার নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মে—আবিঃ যখন আমাদের জীবনের মধ্যে আবির্ভূত হবেন তখন আমাদের ঘরদুয়ার আসন বসন সমস্তই তাঁর সংবাদ জানাতে থাকবে—কোথাও কিছুমাত্র কুশ্রীতা থাকবে না।

রোটেনষ্টাইনের যে একটি চিঠি পেয়েছি সেটি এই সঙ্গে পাঠাই। এর থেকে বুঝতে পারবে আমার লেখাগুলিকে এঁরা সাহিত্যের বিষয় করে রাখেন নি, জীবনের বিষয় করে গ্রহণ করেছেন—সেইটেই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে আনন্দের কারণ হয়ে উঠেচে। চিঠিখানি হারিয়ো না যেমন আদরের সঙ্গে তিনি এটি লিখেছেন তেমনি আদরের সঙ্গে আমি এটিকে রক্ষা করতে ইচ্ছে করি।* ইতি ৬ই আগষ্ট ১৯১২

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

অজিত, মনে করেছিলুম এ-সপ্তাহে তোমাদের কিছু লিখে পাঠাব কিন্তু এখানকার লোকের ভিড়ের মাঝখানে কলম চালানো দুঃসাধ্য। সময়ের অভাব ব'লে নয় কিন্তু মনটা বেশ স্থির হয়ে বসতে চাচ্চে না। বত্রিশ সিংহাসনে না চড়ে আমি সামান্য কিছুও লিখতে পারিনে—সেখান থেকে নামলেই আমার রাখালী ধরা পড়ে। আমার ভিতরকার একটা মন আছে তারই হাতে যখন সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দিয়ে বসি তখনই আমার লেখা এগোয়—আমার বাইরেকার মানুষটা একেবারে কোন কাজের নয়। সে কিছু বোঝেও না, কিছু বলতেও পারে না—সে একটা অশিক্ষিত অক্ষম অজ্ঞ মানুষ—সে সামান্য যা কিছু শিখেচে সে কেবলমাত্র সেই অন্য মানুষটার সঙ্গে থেকে। সেই জন্যই কোনো কাজের মত কাজ করতে গেলে আমার এত অবকাশের দরকার হয়। আমি এক এক বার ভাবি কবিমাত্রকেই কি এমনি জুড়ি হাঁকিয়ে চলতে হয়—না, এই সার্কাসের কসরৎ কেবল আমারই ভাগ্যে ঘটেচে? মোটের উপর দেখা যায় সব দেবতারই বাহনগুলো জন্তু—কারো বা গরু, কারো বা মোষ, কারো বা মেষ—আমার ভিতরকার দেবতারও বাহনটা একটা চতুষ্পদ বিশেষ—সে কেবল গুঁতো খেয়ে চলে এবং শব্দ করে গর্জ্জন করে—না পারে বুঝতে, না পারে বোঝাতে। আমার মনে হয় অক্সিজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেনের মত বোধের সঙ্গে অবোধতার, দেবতার সঙ্গে পশুর জুড়ি মেলানোয় প্রয়োজন আছে—ওতে আক্ষেপ করবার কারণ নেই। দুঃখের বিষয় দেবতার দর্শন পেতে সাধনার দরকার হয় আর বাহনটা আপনি-ই চার পা তুলে দেখা দেয়। ইতি ১৪ই আষাঢ় ১৩৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* চিঠিখানি কোথাও হয়ত রক্ষিত আছে কিন্তু আপাতত অজ্ঞাতবাসে। রবীন্দ্রনাথ

মীনাবাজার

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ, পিএইচ-ডি

যাঁহারা আগ্রা-দুর্গ দেখিয়াছেন মুসলমান পাণ্ডারা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে আকবর বাদশার মীনাবাজারে না লইয়া গিয়া ছাড়ে না; সম্ভবতঃ ঐ বাজার সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা নানারকম সরস গল্পও শুনাইয়া থাকে। আমিও ঐ জায়গা অন্ততঃ পাঁচ-ছয় বার দেখিয়াছি। ঐ স্থানে দাঁড়াইলেই টড-বর্ণিত খুশ্‌রোজের কথা স্বতঃই মনে পড়ে। যমুনা-তীরে মোগলের নব-বৃন্দাবন এই অগ্রবন দুর্গেই নওরোজের উৎসবে রূপের হাট বসিত;—যেখানে দিল্লীশ্বর ছিলেন পার্থিব ও অপার্থিব বস্তুর একমাত্র ক্রেতা—আমন্ত্রিত রাজপুত নারীর সতীত্বাপহারক ঘৃণিত দস্যু। এই মীনাবাজার হইতে একদিন বিকানীর-রাজ রায়সিংহের পত্নী সম্রাট-প্রদত্ত হীরা-জহরতের কলঙ্ক-পসরা মাথায় লইয়া ফিরিয়াছিলেন। এইখানেই রায়সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীর ও কবি পৃথ্বীরাজের স্ত্রীর প্রতি লালসালোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া আকবর একবার বিপদে পড়িয়াছিলেন। সেদিন বিশ্বজয়ী সম্রাটের হৃদয় সতীর তেজোদৃপ্ত চাহনি ও শাণিত ছুরিকার সম্মুখে আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তিনি শপথ করিলেন কোন শিশোদিয়া রাজপুতনীর উপর ভবিষ্যতে কুদৃষ্টি করিবেন না। যাঁহারা পরাজিত হইয়া সম্রাটের বশ্যতাস্বীকার করিতেন, তাঁহাদিগকে নাকি এই মীনাবাজারে কুলস্ত্রী পাঠাইতে হইত। এজন্য বুন্দীপতি রাও সুরজন এবং সম্রাট আকবরের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল, উহাতে অন্যান্য সর্তের মধ্যে ইহাও লিখিত ছিল, হাড়া-বংশীয়েরা কোন দিন মোগলকে কন্যাদান করিবে না, কিংবা নওরোজের উৎসবে স্ত্রীলোকদিগকে পাঠাইবে না।*

আকবর বাদশা ব্রজভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার নামের ভণিতাযুক্ত, কয়েক ছত্র হিন্দী কবিতা পাওয়া গিয়াছে। সংগ্রহকার—"মিশ্রবন্ধু"—টিপ্পনী করিয়াছেন ঐগুলি "সম্ভবতঃ" মীনাবাজারে বলাৎ গৃহীত কোন সুন্দরীর অবস্থা-বিশেষের বর্ণন।* শুনিয়াছি বৃন্দাবনে গেলে নাকি ভক্ত বৈষ্ণব অশ্রু-নদী প্রবাহিত করিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। যাঁহাদের ইতিহাসের বাতিক আছে, প্রথমবার দিল্লী, আগ্রা, সারনাথ, তক্ষশীলা গেলে তাঁহাদের ঠিক ঐ দশা না হইলেও কিঞ্চিৎ ভাবান্তর উপস্থিত হয় সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক কবি হইয়া উঠে, অর্থাৎ তাঁহার বিচার-বুদ্ধি লোপ পায়; যুগ-যুগান্ত ধরিয়া প্রবহমান স্মৃতির উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস প্রাণ আকুল করিয়া তোলে; ভাবের উদ্বেল তরঙ্গ জ্ঞানের বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া অধীত বিদ্যাকে মুহূর্ত্তের জন্য তৃণের মত ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু আগ্রা-দুর্গের ঐ নিতান্ত অপরিসর স্থানে বোধ হয় মীনা-বাজার বসিত না; বসিলেও উহার মধ্যে এতখানি কাব্য কিংবা রোমান্সের অবকাশ ছিল না। পুরাতন বিদ্যা বিচারের কষ্টিপাথরে শাণাইতে গিয়া জ্ঞান হইল জনশ্রুতি-প্রতারিত মহাত্মা টড ইতিহাসের মরুপ্রান্তরে অজ্ঞাতসারে যে-সমস্ত মনোরম মৃগতৃষ্ণিকার সৃষ্টি করিয়াছেন, খুশরোজের বাজার বা মীনাবাজার উহারই অন্যতম।

প্রথম কথা, মীনাবাজার নামটির উৎপত্তি কোথায়? আকবরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক বদায়ূনী নওরোজের উৎসবকে নওরোজ-ই-জলালী এবং বাজারকে দোকানহা-ই-নওরোজী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কোথাও মীনাবাজারের নামগন্ধ নাই।† দরবারি ঐতিহাসিক নিজাম-উদ্দীন আহমদের 'তবকাৎ-ই-আকবরী'‡ গ্রন্থে নওরোজকে নওরোজ-ই-সুলতানী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; মীনাবাজার শব্দটি কোন স্থানে ব্যবহার হয় নাই। আবুল-

* Tod's *Rajasthan*, i. 318, 319; ii. 452. *Vamsa-bhaskar* in Hindi, p. 2264.

* *Misrabandhu Vinode* in Hindi, i 284.

† Badayuni, Pers. text, ii. 321, 338, 342, 356, 365, 390.

‡ *Tabaqat-i-Akbari*, Pers. text, Nowalkishore Press, pp. 353, 354, 365, 371.

ফজলের 'আকবরনামা'তেও* মীনাবাজারের কোন উল্লেখ নাই। জেস্যুইট পাদ্রীরা এবং কয়েক জন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী আকবরের সময় এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও মীনাবাজার কিংবা তৎসম্বন্ধে কোন বাজারী গল্প লিখিয়া যান নাই। আবুল-ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'র স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ কৃত সংস্করণে† আইন-ই-খুশরোজের পাশে ছোট অক্ষরে লেখা আছে—ইয়ানে মীনাবাজার। ব্লকম্যান সাহেবও 'আইন-ই-আকবরী'র ইংরেজী অনুবাদে লিখিয়াছেন—"Khushroz, or Day of Fancy Bazars."‡ কিন্তু যেখানে মূলগ্রন্থে 'মীনাবাজার' শব্দ নাই সে-স্থলেও তিনি অনুবাদে 'Fancy Bazar' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শুধু এ-স্থানে নয়; বদায়ুনী হইতে উদ্ধৃতাংশের অনুবাদে—যেখানে মূলে দোকানাহা-ই-নওরোজী লেখা আছে, তাহার অনুবাদ করিয়াছেন "Stalls of the Fancy Bazar."** ইহাতে সন্দেহ হয়, 'আইন-ই-আকবরী'র মূল পাঠে মীনাবাজার শব্দ ছিল না এবং আকবরের সময় খুশরোজের বাজারকে মীনাবাজার বলা হইত না। আগ্রা-দুর্গের অমরসিং দরওয়াজা ও ফতেপুর-সিক্রির যোধবাঈ-মহলের মত ইহাও লোকপ্রচলিত মিথ্যা নাম। যাহা হউক মীনাবাজার শব্দটি আকবরের সময় অপ্রচলিত ছিল প্রমাণিত হইলেও বাদশার কলঙ্ক ভঞ্জন হয় না। টড্ সাহেব আকবর-চরিত্রের উপর যে কুৎসার মীনাকারী করিয়াছেন, তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা বিচার করা যাক। রাঠোর রায়সিংহের§ পত্নীর সহিত বাদশার ব্যভিচার ও পৃথ্বীরাজের স্ত্রীকে কবলিত করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ কাল্পনিক জনশ্রুতি; মহারাণা প্রতাপের কাছে লিখিত পৃথ্বীরাজের উদ্দীপনাময়ী কবিতা-লিপির ন্যায় সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। 'মিশ্রবন্ধু-বিনোদ' গ্রন্থে উদ্ধৃত পদগুলি আকবরের রচনা হইতেই পারে না।

> সাহি অকব্বর বালকী বাঁহ অচিন্ত গহী
> চলি ভীতর ভৌনে;
> সুন্দরি দ্বারহি দীঠি লগায়কে ভাগিবে কো,
> ভ্রম পাবত গৌণে।

কেননা "সাহি অকব্বর" শব্দকে ভণিতা ধরিলে 'গ্রহণ করা' ক্রিয়ার কর্ত্তাই থাকে না। "অকব্বর শাহ হঠাৎ ললনার বাহু গ্রহণ করিয়া ভিতর ভবন, অর্থাৎ অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন। সুন্দরী দ্বারদেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া পলায়নের চিন্তা করিল; কিন্তু তখন সময় ছিল না।" অবিকৃত চিত্তে স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম লিপিবদ্ধ করা সম্প্রতি ফ্যাশন হইয়াছে। আধুনিক তরুণের সাহস আকবর বাদশার নিশ্চয়ই ছিল না।

মীনাবাজার সম্পর্কে টডের দ্বিতীয় প্রমাণ—রাও সুরজন হাড়ার সহিত আকবরের সন্ধি—যাহাতে অন্যান্য সর্ত্তের মধ্যে ছিল মীনাবাজারে তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা পুরস্ত্রীগণকে পাঠাইবেন না। এই সন্ধি হইয়াছিল, ৯৭৬ হিজরীতে* যখন সুরজন রনথাম্ভোর দুর্গ সমর্পণ করিয়া আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু নওরোজ-উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল ৯৯০ হিজরীতে। অর্থাৎ নওরোজ আরম্ভ হইবার ১৪ বৎসর পূর্ব্বে রাও সুরজন কি মীনাবাজারের কেলেঙ্কারী দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়া এই সর্ত্ত আকবরের নিকট হইতে লিখাইয়া লইয়াছিলেন?

আকবরের সপক্ষে ওকালতী করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তিনি যে জিতেন্দ্রিয় নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ছিলেন এ-কথা আবুল-ফজল ছাড়া আর কেহ বলিতে পারে কিনা সন্দেহ। আকবর বাদশারও বয়সকালে চরিত্র-দোষ ছিল। তাঁহার চরেরা দিল্লী ও আগ্রার সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সুন্দরী স্ত্রী-কন্যাদের খবর আনিত। আগ্রায় তিনি এক শেখজীর (বদাহ্) এক সুন্দরী সধবা পুত্রবধূকে

---

* *Akbarnama*, Eng. trans. Beveridge, pp. 557, 589, 644, 739, 789, 807, 871, 929, 1177.

† Text, p. 150.

‡ *Ain-i-Akbari*, Eng. trans. p. 276.

** *Ibid.*, *Ain-i-Akbari*, p. 204.

§ আকবর রায়সিংহের ভগ্নীকে (৯৭৮ হিঃ) বিবাহ করিয়াছিলেন। রায়সিংহ তাঁহার অধীন লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ চাপা দেওয়ায় দরুণ তিনি সম্রাটের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার দরবারে প্রবেশ নিষেধ ছিল। (Beveridge's *Akbarnama*, pp. 1068-69.

* Badayuni, Eng. trans., Lowe, ii. 111.

আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। বেচারা স্বামী বিবির আঁচলে তিন তালাক বাঁধিয়া দিয়া মনের দুঃখে বিন্ধ্যাচল পার হইয়া গেল। সামাজিক নিন্দা ও অপবাদের ভয়ে শেখজী নীলবর্ণ শৃগালের ন্যায় অন্যান্য লোকেরও নাক-কান কাটাইবার জন্য বাদশাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যেন তিনি দিল্লীতেও নাগরিকদিগের সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করেন। একদিন দিল্লীর বাহিরে বেগম-সাহেবার মাদ্রাসার কাছে বেড়াইবার সময় আকবর গুপ্তঘাতকের হাত হইতে * ভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইয়াছিলেন। অবস্থা বুঝিয়া তিনি সেদিন হইতে বদ্-খেয়াল ছাড়িলেন। আকবর নাকি তাঁহার পীর সলীম চিশ্‌তীর অন্দরমহলে সরাসরি ঢুকিয়া পড়িতেন। ইহাতে শেখজীর পুত্রেরা বাদশার কাছে নালিশ করিয়াছিল, বাদশা এভাবে যাতায়াত করাতে স্ত্রীরা তাহাদের প্রতি উদাসীন হইয়াছে। কিন্তু একবার কোন ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল বলিয়া দ্বিতীয় বার তাহার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ হইলে যদি বিনাবিচারে সোজা তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তবে আইনের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। পাকা ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ মীনাবাজার সম্পর্কে মৌনাবলম্বন করিয়া আকবরের প্রতি সুবিচার না করুন, অন্ততঃ টডের মত অবিচার করেন নাই। যে-সময় আকবর দীন-ই-ইলাহী ও নওরোজ উৎসব প্রচার করেন তখন তাঁহার ধর্ম্মে মতি হইয়াছিল, বৎসরের পরিমাপে তিনি তখন বিগতযৌবন, সুতরাং শেষ-বয়সে তিনি সুন্দরী ধরিবার জন্য মীনাবাজারের মত যে একটি বাদশাহী ফাঁদ পাতিয়াছিলেন, এ-কথা সহজে বিশ্বাস হয় না। তবে অবশ্য রাজচরিত্র স্ত্রীচরিত্রের ন্যায় দুর্জ্ঞেয়। বয়সের অজুহাত রাজা-বাদ্‌শার পক্ষে খাটে না; কেননা কালিদাস বলিয়াছেন, "বিস্তেশাণাং ন খলু বয়ঃ যৌবনা-দন্তদস্তি।"

আকবর বাদশার মীনাবাজার আগ্রা কিংবা ফতেপুর-সিক্রির বাদশাহী মহলের কোন্ অংশে বসিত, ইহা সাব্যস্ত করিতে যাওয়া যে কথা, গড়মান্দারণের মাঠে কোন্ ভগ্ন শিব-মন্দিরে জগৎসিংহের সহিত তিলোত্তমার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করার চেষ্টাও সেইরূপ। নওরোজ সম্বন্ধে সমসাময়িক ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় তাহাতে আকবরের চরিত্রের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই। আকবরের কুৎসা-রটনায় পঞ্চমুখ মোল্লা বদায়ুনীও টড্-বর্ণিত খুশরোজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব; ভয়ে নয়, সত্যের খাতিরে।

* Lowe, ii. 59-60.

এইবার নওরোজ অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করিব।

সম্রাট আকবর ও আবুল-ফজল প্রমুখ সংস্কারপন্থী মুসলমানগণের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা ছিল, হজরত রসুল-আল্লার প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্ম্মের পরমায়ু হাজার বৎসর পূর্ণ হইলেই, হয় উহা বাতিল হইবে, না-হয় যুগানুযায়ী নূতন রূপ ধারণ করিবে।

কোরাণ-শরীফ অবতীর্ণ [নাজেল] হওয়ার তারিখ হইতে এই এক হাজার বৎসর শেষ হইয়াছিল ৯৯০ হিজরীতে। ঐ বৎসরেই নব যুগের ও নব ধর্ম্মের "জগৎগুরু" আকবর বাদশা তাঁহার দীন্-ই-ইলাহী প্রচার করেন। প্রাকৃতজনের পক্ষে পরব্রহ্ম বা অল-হকের উপাসনা ও উপলব্ধি প্রায় অসম্ভব। এজন্য তিনি তেজোব্রহ্মের প্রতীক সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনাই দীন্-ই-ইলাহীর বহিরঙ্গ বা কর্ম্মকাণ্ড রূপে প্রবর্ত্তিত করিলেন। দীন্-ই-ইলাহী বস্তুতপক্ষে প্রাচ্যের ধর্ম্মে ও সমাজে সহস্র বৎসরের বদ্ধমূল সেমেটিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে সনাতন আর্য্য ও ইরাণীয় সভ্যতার প্রথম প্রতিক্রিয়া—যাহা নূতন মূর্ত্তিতে পারস্য ও তুরস্কে সম্প্রতি দেখা দিয়াছে। ৯৯০ হিজরীর পরে ইসলাম হিন্দুস্থানের একমাত্র রাজকীয় ধর্ম্ম রহিল না। ইহার সঙ্গে ইসলামী চান্দ্রমাস, হিজরী সাল রাজানুশাসনে অপ্রচলিত হইয়া গেল। ইহার পরিবর্ত্তে আসিল সৌর মাস, ইলাহি সাল এবং দুই মুসলমানী ঈদের পরিবর্ত্তে প্রাচীন পারস্যের বার মাসের তের ঈদ।

মেষরাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণের দিন ছিল ইলাহি বৎসরের নওরোজ বা New Year's Day. নওরোজ হইতে আরম্ভ হইয়া উনিশ দিন পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যে সার্ব্বজনীন অখণ্ড মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। প্রথম মাসের প্রথম দিনে নওরোজ এবং উনিশ তারিখেই—যেদিন দিবারাত্রি

সমান হইয়া সূর্য্যের উত্তরায়ণ (vernal equinox) আরম্ভ হইত অর্থাৎ (রোজ-ই-শরফ্)—এই দুই দিনে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জাঁকজমক হইত।

৯৯০ হিজরীর নওরোজ (১১ই মার্চ্চ, ১৫৮২ খৃঃ) উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল আকবরের নবনির্ম্মিত রাজধানী ফতেপুর-সিক্রিতে। আগ্রা-দুর্গে কোন বৎসর খুশরোজের বাজার আদৌ বসিয়াছিল কিনা সন্দেহ। কোন ইতিহাসে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে আজকাল নূতন ও পুরাতন দিল্লীর মত আগ্রা ও ফতেপুর আকবরের সময় প্রায় এক শহর ছিল। নওরোজের সময় আগ্রা ও ফতেপুর শহরের দোকানপাট উৎসবের সজ্জায় ও রাত্রে নানা বর্ণের আলোকমালায় সুশোভিত হইত।

প্রথম বৎসর ১৮ দিন ব্যাপী (১১ই মার্চ্চ ১৫৮২—২৯ শে মার্চ্চ ১৫৮২) নওরোজের উৎসব-মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল ফতেপুর-সিক্রির দেওয়ান-ই-আমের ময়দানের চতুষ্পার্শ্বস্থ দুর্গপ্রাচীর-সংলগ্ন ১২০টি বারান্দায়। সম্রাট উৎসব-মণ্ডপের সাজসজ্জা ও তত্ত্বাবধানের ভার আমীরগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। সম্রাট এক-এক দিন এক-এক জন আমীরের 'ষ্টলে' অতিথি হইতেন। সেদিনকার বাদশাহী ভোজের ভার পড়িত সেই আমীরের উপর। নওরোজের বাজার সপ্তাহে একদিন সর্ব্বসাধারণের জন্য খোলা থাকিত।

স্ত্রীলোকেরা নওরোজের উৎসব-মণ্ডপে প্রথমবার আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন দুই বৎসর পরে তৃতীয় নওরোজের সময়। এইবার ফতেপুর-সিক্রি হইতে চার মাইল দূরে হামিদা বানুর উদ্যানে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উৎসবের প্রথম কয়দিন নওরোজের বাজার সর্ব্বসাধারণের জন্য খোলা ছিল। তাহার পরে পুরুষদের যাওয়া-আসা নিষিদ্ধ হইল। [মর্দুম-রা মানা আমদ] সম্রাটের মা হামিদা বানু, পিসি গুলবদন বেগম ও বাদশাহী মহলের অন্যান্য বেগম ও আমীরদের পরিবার উৎসব-মণ্ডপে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে প্রায় এক লক্ষ টাকার নজর ও খেলাৎ দেওয়া হইয়াছিল। বদায়ুনী বলেন, এই সময়ে বেগমেরা তাঁহাদের ছেলেমেয়ের সম্বন্ধ স্থির করিতেন।

নওরোজের প্রথম তিন চারি বৎসরের মোটামুটি বিবরণ আমরা সমসাময়িক ইতিহাসে দেখিতে পাই। ইহার পরে শুধু নওরোজের উল্লেখমাত্র আছে। কিন্তু খুশ্‌রোজ কিংবা মীনাবাজার সম্বন্ধে কোথাও কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে "মিহির জান" নামক এক উৎসবের কথা একোয়াভাইভা (Rudolfo Aquaviva) নামক জেসুইট্ পাদ্রী লিখিয়া গিয়াছেন, যথা—

"A new Easter has been introduced called *Merjan* on which it is commanded that chiefs be dressed out in state and listen to music and dances. The Muhammadans were very much scandalized and would not imitate the observers of the feast."*

মীনাবাজার বা খুশরোজের বাজার কখন্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ঠিক বলা যায় না।

মীনাবাজার বা খুশরোজের বাজার নওরোজ উৎসবের তৃতীয় দিন এবং প্রত্যেক মাসিক ঈদের তৃতীয় দিনে বসিত। ঐ সম্বন্ধে একমাত্র সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায় আবুল-ফজলের 'আইন্-ই-আকবরী' গ্রন্থে। উহার ব্লকম্যান কৃত ইংরেজী অনুবাদের কিয়দংশ—

"On the third feast-day of every month, His Majesty holds a large assembly for the purpose of enquiring into many wonderful things in this world. The *merchants of the age* are eager to attend and lay out articles from all countries. The people of His Majesty's harem come, and the women of other men also are invited, and buying and selling is quite general. His Majesty uses such days to select any articles he wishes to buy, or to fix prices of things....... After the Fancy-bazar for women bazars for men are held. His Majesty watches transactions,......bazar people on such occasions, may lay their grievances before His Majesty without being prevented by the mace-bearers..."†

উল্লিখিত অনুবাদে কোন স্ত্রী-দোকানদার বা দোকানদারের স্ত্রীর কথা নাই। তবে কি অসূর্য্যম্পশ্যা বেগমেরা বেপর্দ্দা হইয়া পুরুষ-দোকানদারগণের নিকট হইতে জিনিষ কিনিতেন? ইহা অতি অসম্ভব ব্যাপার।

ভাবরাজ্যে আকবর বাদশা সেকালের তুলনায়

* *J. A. S. B.*, 1896; paper by E. D. Maclagan, p. 57.

† ব্লকম্যান সাহেবের অনুবাদে ভুল ধরা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা হইলেও এস্থলে কিঞ্চিৎ গোলমাল হইয়াছে। 'আইন-ই-আকবরী'র লক্ষ্ণৌ-সংস্করণে আছে,—*Saudagar-i-zaman bar faraz-i-garam bazari nashinad*. ইহার প্রকৃত অর্থ, জমানার (সময়ের) বাজার গরম হইয়া উঠে। যদি ক্রিয়াপদে একবচন না থাকিয়া বহুবচন থাকিত তবে ব্লকম্যান সাহেবের অর্থ হয়ত কোন রকমে টিকিত। এ স্থলে স্যর সৈয়দ আহমদ্ কৃত সংস্করণের পাঠই শুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। উক্ত পাঠে ক্রিয়া ও বহুবচন আছে। তাঁহার পাঠ *Saudagar-zanan* অর্থাৎ স্ত্রী-ব্যবসায়ীরা। গ্লাডউইন সাহেবের অনুবাদ "সওদাগরগণের" স্ত্রীগণ—যাহা টড গ্রহণ করিয়াছেন—শুদ্ধ নয়।

কামাল পাশা কিংবা আমানুল্লার মত অতি-আধুনিক হইলেও স্ত্রীলোকের পর্দ্দা ও স্বাধীনতা বিষয়ে তিনি ছিলেন সনাতনপন্থী মুসলমান। তাহা না হইলে স্ত্রী-পুরুষের জন্য বিভিন্ন সময়ে মেলার ব্যবস্থা থাকিত না। তবে এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আকবরের ফতেপুর-সিক্রি ত দারজিলিং কিংবা স্ত্রী-রাজ্য ছিল না; স্ত্রী-দোকানদার হঠাৎ আমদানী হইত কোথা হইতে? শুনিয়াছি রামপুর-রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব নবাব বাহাদুর রামপুর প্রাসাদে মীনাবাজার বসাইতেন। সমস্ত ভারতবর্ষের সওদাগর ঐ বাজারে মাল পাঠাইত। প্রত্যেক জিনিষের সহিত দাম লেখা থাকিত। সওদাগরেরা বুড়ী স্ত্রীলোকদিগকে নিজেদের ইজেন্ট প্রতিনিধি রূপে বসাইয়া দিত। বসন্তের মীনাবাজারে বাসন্তী রং কিংবা যে ঋতুতে বাজার বসিত সে ঋতুর অনুযায়ী গোলাপী বা জাফরাণী রঙের কাপড় পরিয়া সকলকে ঐ বাজারে যাইতে হইত। রাজা পিতৃস্থানীয়—সুতরাং রাজার কাছে পর্দ্দার আবশ্যক নাই। সেজন্য নবাব বাহাদুর ছাড়া অন্য পুরুষ মেয়েদের মেলায় যাইতে পারিত না। হয়ত আকবরী মীনাবাজারে রামপুরের মীনাবাজারের মত ব্যবস্থাই ছিল। আকবরের মীনাবাজার সম্বন্ধে কুৎসার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকিলেও মনুষ্য-চরিত্র একটি ব্যাপারে অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে—"যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ।"

বিধবার সজ্জা

শ্রীশান্তা দেবী

শমীন্দ্র বলিল,—"সংসারের এত খরচপত্র সামলে ওঠাই দায়। এর উপর নূতন একটা ভার ঘাড়ে পড়লে কি ক'রে পেরে উঠব বুঝতে পারছি না।"

ঊর্ম্মিলা হাঁটু নাড়া দিয়া কোলের খোকাকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে বলিল, "যে কাজ করতেই হবে, তা খুসী মনে করাই ভাল; তা নিয়ে অত মনমরা হয়ে থাকলে ত চলবে না। এ তোমারই কাজ, সকলের আগে তোমাকেই এগিয়ে যেতে হবে।"

লম্বা চিঠিখানা আগাগোড়া আর একবার পড়িয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শমীন্দ্র বলিল, "বাপের বাড়িতেই বরং কিছুদিন থাকুন। আমার এখানেও খরচ, সেখানেও খরচ, তোমার হ্যাঙ্গামা না বাড়িয়ে আমি তোলা-টাকাটাই না-হয় সেখানে পাঠিয়ে দেব।"

নক্সাকাটা কাঁথার তলায় দুই পাশে দুইটা পাশ-বালিশ গুঁজিয়া দিয়া ছেলেকে ধীরে ধীরে কাৎ করিয়া শোয়াইয়া ঊর্ম্মিলা চাপা গলাতেই বলিল, "না, না, না, ও-সবে কাজ নেই। টানাটানির সংসার থেকে আমরা অতগুলো করকরে টাকা বার ক'রে পাঠাব আর সাত-ভূতে খেয়ে উড়িয়ে দেবে, সে আমি কিছুতেই সইতে পারব না। তুমি কি মনে কর কেবি ছবির পেটে অর্দ্ধেকও যাবে? সব ওই হা-ঘরে হাঙ্গরের গুষ্টির ভোগে লাগবে। বাপ-মাই যখন নেই, তখন আবার বাপের বাড়ি কিসের? এ আমরা ছুটিতে ছেলেপিলে নিয়ে বেশ থাকব। তোমাকে তার জন্য কিছু ভাবতে হবে না।"

অসমাপ্ত দিবানিদ্রা ফেলিয়া চিঠিখানা হাতে করিয়া উঠিয়া শমীন্দ্র বলিল—"যাই তবে, তাই লিখে দি গিয়ে। কিছু দিন ত যাক্, তারপর যেমন দাঁড়ায় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।"

ঊর্ম্মিলাও বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। শরৎকালের অপরাহ্নে অর্দ্ধেক আকাশ জুড়িয়া রৌদ্র ঝলমল করিতেছে, কিন্তু পূর্ব্ব কোণে বর্ষণোন্মুখ ধূমল মেঘ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, যেন ঊর্ম্মিলারই অশ্রু-হাসিভরা মনের ছায়া। তাহার একলার সংসারে

এতদিন পরে বাল্যসখী আসিয়া তাহারই সুখদুঃখের সাথী হইবে, মনের কোণে সঞ্চিত যত কথা তাহার কানে ঢালিয়া দিয়া কি আনন্দে দুই জনে তাহার রস-উপভোগ করিবে ভাবিয়া ঊর্ম্মিলার সঙ্গীহীন মন আপনি হাসিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু মনের একটা কোণে অশ্রু যে জমাট হইয়া আছে আজ দুই মাস ধরিয়া। সখীকে দেখিয়া সে-অশ্রু কি ঊর্ম্মিলা সংবরণ করিতে পারিবে?

সাঁওতাল পরগণার জলহীন বালুতটে শৈশবে যখন তাহারা দুই সখীতে খেলা করিত, শুষ্ক বালুময় নদীগর্ভ পার হইয়া ওপারে শালবন, ধানক্ষেত ও কাঁকুরে টিপি পাহাড়ে প্রজাপতির মত লঘু মন লইয়া চঞ্চল চরণে ছুটিয়া বেড়াইত, তখনকার অনাবিল ভালবাসা লোকে বলে সংসারে টিকে না। কিন্তু দৈবগুণে কিশোর বয়সে সে যখন বাল্যসখী জয়ন্তীরই দেবরের বধূ হইয়া আসিয়া আবার এক-বাড়িতেই উঠিল তখনও সখীতে সখীতে গলাগলি ভাব ও পার্ব্বত্য ঝরণার মত উচ্ছল কলহাসি কিছুমাত্র কমিল না। নবাস্বাদিত প্রণয়ের গল্প তাহাদের সখ্যের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করিয়া তুলিল। দু-জনে দু-জনকে সাজাইয়া তৃপ্তি পাইত না, পরদিন প্রসাধনের প্রশংসা শুনিয়া শুনিয়া পুরাতন হইতে চাহিত না।

ভাসুর লক্ষ্ণৌ চলিয়া গেলেন চাকরি লইয়া, কাজেই জয়ন্তীকেও ঊর্ম্মিলার আশা ছাড়িতে হইল। তারপর জয়ন্তীর দুটি ছেলেমেয়ে কেবি আর ছবি, ঊর্ম্মিলার দুটি ছেলে রুণু ও দীনু হইয়াছে। ছেলেমেয়ে ও সংসারের ঝঞ্ঝাটে সখীদের প্রত্যহ দীর্ঘ পত্রবিনিময় ক্রমে মাসে একখানায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মান অভিমান ভালবাসার গল্পের স্থান জুড়িয়াছে ছেলেমেয়ের সর্দ্দি কাশি হাঁচি। দীর্ঘ অদর্শনের জন্য বিলাপও কখন অকস্মাৎ থামিয়া গিয়াছে; কিন্তু ঊর্ম্মিলা মনের ভিতর চাহিয়া দেখিল ভালবাসার উচ্ছ্বাস না থাকিলেও টান তেমনি সজোর আছে।

আজ এতদিন পরে সখী আসিবে, কিন্তু এ যে তাহার সে স্বামিসোহাগিনী গরবিনী সখী নয়, এ সর্ব্বত্যাগিনী ভিখারিণী। দুই মাস হইল তাহার পার্থিব জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ শেষ হইয়া গিয়াছে, অশ্রুর আবরে আজ তাহাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হইবে। ঊর্ম্মিলা কিন্তু দুঃখের ভিতরেও সুখের মধুর স্পর্শটুকুর আশা ছাড়িতে পারিতেছে না। তাহাদের ভালবাসা ত এক দিনের নয়। এই সম্পর্ক হইবার পূর্ব্বে তাহারা দু-জনে ত শুধু পরস্পরের ছিল। জীবনে এতবড় রূপান্তরের পরেও জয়ন্তীর কঠোর ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তির অন্তরালে শৈশবের সেই স্নেহ-উৎস আবার খুঁজিয়া পাইবে ঊর্ম্মিলার মন বার-বার এই কথা বলিতেছিল।

পুরানো একটা বাগানের মাঝখানে ছোট দুইতলা বাড়ি। একতলায় রান্না ভাঁড়ার চাকর-বাকর ইত্যাদির স্থান সংকুলান করিয়া বাকী আছে শুধু একটি কাজচলা-গোছের বৈঠকখানা। উপরের তিনখানি ঘরেই সংসারের আর সমস্ত দাবি মিটাইতে হয়। সাত বৎসর আগে পূর্ব্ব-দক্ষিণ দুই দিক খোলা যে-ঘরখানিতে বড়বৌ থাকিতেন, তিনি বিদেশে চলিয়া যাইবার পরও ঊর্ম্মিলা তাহা দখল করে নাই, সে আপনার পশ্চিম দিকের ঘরেই এত কাল ছিল। তবে সংসার বাড়িয়াছে, কাজেই ছেলেদের দুধের ডুলী, স্নানের গামলা, ষ্টোভ, ঠেলাগাড়ী, দোলনা ইত্যাদি একে একে সেই ঘরে ভীড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। মাঝের ঘরখানা ভিতর হইতে বন্ধ হয় না; কাজেই তাহা ঊর্ম্মিলা পাড়ার মেয়েদের বসিবার জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছিল। নিজের হাতের গদি, তাকিয়া, পর্দা, ঢাকা ইত্যাদিতে তাহার সৌন্দর্য্য যথাসম্ভব বাড়াইবার চেষ্টায় গৃহকর্ত্রীর বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। অতি-প্রয়োজনীয় কোনো নিতান্ত গদ্যময় জিনিষকে সে সহজে এ-ঘরের ত্রিসীমানায় আসিতে দিত না। এমন কি মেহগনির বুক-কেসটাও সে পাশের ঘরেই রাখিয়া দিয়াছিল। কিন্তু জয়ন্তী যে তাহার পূর্ব্ব নিবাসে ফিরিয়া আসিতেছে এখন আর অন্য কথা ভাবিলে চলিবে না।

পরদিন সকালেই ভোলা ও মোক্ষদা মিলিয়া ঘরের জিনিষপত্র সরাইতে লাগিয়া গেল। শমীন্দ্র আপিসে যাইবার আগে গলার টাইটা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—"পূব দিকের ঘরখানা বদলে নিলে হ'ত না? দিনরাত্তির এদিক বন্ধ থাকবে, পুবের আলো হাওয়া আর তোমার কপালে জুটবে না।"

উর্ম্মিলা জয়ন্তীর খাটের উপর হইতে ছেলেদের ছোট তোষক ও ছেঁড়া লেপের বোঝা সরাইতেছিল। সে বলিল —"তা হোক, আট বছর পশ্চিমের ঘরে যদি বেঁচে থাকি ত পরেও টিকে থাকব।"

মোক্ষদা ঝি ঘোমটার ভিতর হইতে বলিল,—"মা, গরম কাপড়ের বাক্স-টাক্সগুলো এই ঘরেই থাক না; ও ত আর রাত-দিন নাড়ানাড়ি হবে না। তোমার ঘরে রাখলে মিথ্যে ঘর-জোড়া হয়ে থাকবে।"

উর্ম্মিলা বিরক্ত মুখে বলিল—"দেখ্, তিনি বাড়ির বড়-বৌ, আমার চেয়ে তাঁর মান বেশী, সর্ব্বদা একথা বুঝে চল্‌বি।"

উর্ম্মিলার সাধের ড্রইং-রুম অসংখ্য জিনিষে বোঝাই হইয়া উঠিল। দক্ষিণের বারান্দায় দুই দিকে পরদা দিয়া কয়েকটা চেয়ার ও টেবিল গোল করিয়া আপাততঃ সেইখানেই সাজাইয়া রাখা হইল। শমীন্দ্র বলিয়াছে, পরে বারান্দায় কাচ লাগাইয়া দিলে দামী জিনিষপত্রও অনায়াসে রাখা চলিবে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে জয়ন্তীর গাড়ী আসিয়া বাগানের দুই সারি নারিকেল গাছের ভিতর ঢুকিল। উর্ম্মিলা ছুটিয়া নীচে নামিয়া আসিল ছেলেমেয়েদের কোলে তুলিয়া লইতে। সাত ও পাঁচ বছরের ছবি ও কেবি দুইটি আধফোটা গোলাপের মত মুখ জানালার কাছে বাড়াইয়া বসিয়াছিল। এ-ঘরবাড়ি সবই তাহাদের অজানা, তাহাদের বড় বড় চোখে বিস্ময়ের সীমা ছিল না। উর্ম্মিলা দুই হাতে দুই জনকে জড়াইয়া ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া লইল। জয়ন্তীর দিকে তাকাইয়া তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। চোখ মুছিয়া প্রণাম করিয়া দেখিল শুভ্র অবগুণ্ঠনে জয়ন্তীর মুখ ঢাকা, চোখের পাতা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। উর্ম্মিলা বুঝিতে পারিতেছিল না, সাহস করিয়া তাহার হাতখানা ধরিবে কি-না। কত দিনের পর দিন যে হাতে হাত দিয়া অফুরন্ত আনন্দের স্রোতে তাহারা ভাসিয়াছে, এ যেন সেই চিরপরিচিত স্নেহস্পর্শমাখা হাত নয়। একটা মানুষ সংসার হইতে বিদায় লইয়াছে, তাহাতে আর একটা মানুষ যে এমন আগাগোড়া বদ্‌লাইয়া যাইতে পারে কে জানিত? উর্ম্মিলা ভীতভাবে বলিল,—"দিদি, মুখ তুলে চাও। আমাদের দিকেও কি তাকাবে না?" জয়ন্তী মুখের ঘোমটা সরাইয়া উর্ম্মিলার মুখের দিকে চাহিল। উর্ম্মিলা কখন প্রণাম করিয়াছে, এতক্ষণে জয়ন্তী তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া শিরশ্চুম্বন করিল। টপ্ টপ্ করিয়া দুই ফোঁটা জল উর্ম্মিলার কপালের উপর পড়িল।

কিন্তু শুধু হাত দু-খানা নয়, এ সমস্ত মানুষটাই যেন নূতন। আট বৎসর আগে যে ক্ষীণকায়া কিশোরী বধূ বাল্যলীলার মাঝখানেই সবে যৌবন স্বপ্ন দেখিতে শুরু করিয়াছিল তাহার কৈশোর যেন আজ ইতিহাসের কথা। ঝিনুকের বুকের মত কোমল গোলাপী রঙের মুখখানি আজ প্রখর যৌবন দীপ্তিতে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, যেন বিজলী প্রদীপের উপরের শুভ্র কাচের ফানুস। ক্ষীণ দেহ নিটোল হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে, কোথাও এতটুকু অপূর্ণতা নাই। বিগত দিনের সে আনন্দ-উজ্জ্বল চপল চোখের দৃষ্টি বেদনায় গভীর হইয়া উঠিয়াছে। অশ্রুজলে ধুইয়া আঁখিপল্লব ঘনকৃষ্ণ কাজলের মত দেখায়, চোখের কোণের চিন্তারেখাগুলি চোখ দুটিকে যেন আরও আয়ত করিয়া তুলিয়াছে। মর্ম্মরশুভ্র রেখাহীন ললাটের উপর অন্ধকার-সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ঘনকুঞ্চিত কালো চুল। পশ্চিমে থাকিয়া লম্বাতেও যেন সে মাথাঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। কে বলিবে ব্রাহ্মণের ঘরের সুন্দরী বধূ জয়ন্তী এ, এ যেন লক্ষ্ণৌএর কোন্ নবাবের বেগম রঙীন পেশোয়াজ, জরির কাঁচুলি, আশমানি ওড়না ও সুর্ম্মা আতর মেহেদির রং ছাড়িয়া অকস্মাৎ বাঙালীর বিধবা সাজিয়া আসিয়াছে। আধুনিক উপমা দিলে বলিতে হয় য়্যালা-বাষ্টারের ভিনাস মূর্ত্তির ভিতর কে যেন বিদ্যুতের আলো জ্বালিয়া দিয়া উপরে শুভ্র ওড়না জড়াইয়া দিয়াছে। বেশ-পরিবর্ত্তনের সময় বাঁ-হাতের বড় নীলার আংটিটা কেবল সে খুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। বিধবা বড়বৌয়ের অঙ্গে একমাত্র অলঙ্কার ঐটি। ছেলেপিলের মা, কিন্তু তবু গলায় একছড়া সরু হারও নাই। সাদা সেমিজের উপর ফরাসডাঙ্গার সাদা ধুতি পরিয়া সে যখন বাড়ির বারান্দায় নামিয়া দাঁড়াইল, সমস্ত বাড়িটা যেন তাহার রূপে আলো হইয়া উঠিল।

মাসখানেক না যাইতেই জয়ন্তী তাহার গাম্ভীর্য্যের

খোলসটা ফেলিয়া দিল। উর্ম্মিলা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সমস্ত দিন হাসিমুখে কাটানোই তাহার আজন্মের অভ্যাস, জয়ন্তীর ভয়ে এই ক'দিন সে একবারও হাসে নাই। চির-কালের অনেক অভ্যাস তাহার ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। বিকালবেলা চুল বাঁধিয়া গা ধুইয়া রঙীন শাড়ী ও কুঙ্কুমের টিপ পরা তাহার অনেক দিনের সখের অভ্যাস। কিন্তু জয়ন্তী আসিয়া পর্য্যন্ত সকালের মোটা কাপড়েই সে সারা দিন কাটাইতেছে। জয়ন্তী বলিল—"হ্যাঁ রে উর্ম্মি, চুল বাঁধা নেই, কাপড় ছাড়া নেই, এই বয়সে ওকি সং হয়ে উঠেছিস ?"

উর্ম্মিলা বলিল—"তোমার ভাই এত রূপ, তুমি অমনি যোগিনী হয়ে থাকবে আর আমি কি ব'লে পেঁচামুখের আবার বাহার ক'রে বেড়াব ?"

জয়ন্তী তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—"আ গেল যা, আমাতে আর তোতে! আমার পোড়া রূপে ত এখন নুড়ো জ্বেলে দিলেই সব শান্তি হয়। তোকে তাই ব'লে অমনি ধাঙড়ের মত ঘুরতে দিলাম আর কি ? যা শীগ্গির কিতে কাঁটা নিয়ে আয়, আমি বেঁধে দিচ্ছি চুল।"

জয়ন্তী নিজহাতে উর্ম্মিলাকে সাজাইয়া গুছাইয়া কপালে কুঙ্কুমের টিপ দিয়া দিল। উর্ম্মিলা হাসিয়া বলিল—"তোমার মতন এমন ক'রে সাজাতে চুল বাঁধতে আমি আর কাউকে দেখিনি ভাই। ভগবান কি-না তোমারই সাজায় বাদ সাধলেন। তোমার তুটি হাতে ধরি ভাই অমন কালো রেশমের মত চুলগুলোর অযত্ন করো না, আমি একটু বেঁধে দি। দেখে আমার চোখ তুটো সার্থক হোক, তাতে ত কোনো পাপ নেই।"

জয়ন্তী হাসিয়া মাথার কাপড়টা খুলিয়া দিল, কিন্তু কথার কোনো জবাব দিল না। উর্ম্মিলা সেই সুদীর্ঘ কালো চুলে অনভ্যস্ত হাতে যথাসাধ্য পরিপাটি করিয়া বেণী বাঁধিয়া ঘাড়ের কাছে শিথিল কবরী তুলাইয়া দিল। বাগান হইতে চারিটি রজনীগন্ধা ফুল আনিয়া খোঁপায় গুঁজিয়া দিতেই জয়ন্তী "দূর লক্ষীছাড়ী" বলিয়া তাহার পিঠে একটা প্রচণ্ড চড় দিল। উর্ম্মিলা তাহার তুই হাত ধরিয়া বলিল—"মার আর ধর, ফুল কিন্তু ফেল্‌তে দেব না। সরস্বতীর মত রূপে সাদা ফুল কেমন দেখায় জান না ত ?"

শমীন্দ্র আপিসের কাজ সারিয়া সবে বাড়ি ফিরিতেছিল। ঘরে পা দিয়াই এমন প্রসাধনের ঘটা দেখিয়া বলিল—"বাবা, কার মন ভোলাতে তোমাদের এত সাজসজ্জা লেগে গেছে ?"

জয়ন্তী বলিল—"কার আবার ? তুমি খেটেখুটে আপিস থেকে এসে দেখবে বৌ রান্নাঘরের কালী মেখে বেড়াচ্ছে, তাই তোমার সুন্দরী বৌকে একটু সাজিয়ে দিচ্ছিলাম। সাহেবদের হাঁড়িমুখের পর এই সুন্দর মুখখানা কেমন লাগছে ?"

উর্ম্মিলা অত্যন্ত আপত্তি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—"আহা সুন্দরী না বান্দরী! দিদি যেন কি ? হ্যাঁগা, সত্যি ক'রে বল দেখি, দিদি আমার চেয়ে হাজারগুণে সুন্দরী নয়! চুলটা একটু বেঁধে দিতেই মনে হচ্ছে যেন নুরজাহান বেগম।"

শমীন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল, "ও-সব তুলনামূলক সমালোচনা করবার আমার সাহস নেই বাপু! শেষকালে কোন্ ব্রাহ্মণীর কোপানলে পড়ব কে জানে ?"

মুখে যাহাই বলুক শমীন্দ্রের সপ্রশংস রূপমুগ্ধ দৃষ্টি জয়ন্তীর মুখের উপর চকিতের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বধূ-বেশে জয়ন্তীকে প্রতিদিনই সে দেখিয়াছে, কিন্তু জয়ন্তীর অঙ্গে অঙ্গে যে এমন অগ্নিশিখার মত রূপ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে তাহা ত সে কোনো দিন দেখে নাই। রাত্রে উর্ম্মিলাকে শমীন্দ্র বলিল—"বৌদি ছেলেবেলা ত এত সুন্দর ছিল না। বিধবা হয়ে সত্যিই রূপ হয়েছে যেন নুরজাহান বেগম। কিন্তু বেচারীর ভাগ্যলিপি বিধাতা এমন লিখলেন যে কেন ?"

পরের দিন বিকালে চুল বাঁধিবার সময় উর্ম্মিলা জয়ন্তীর হাত তুখানা ধরিয়া বলিল—"আমি ত ভাই ঘরের লোক, আমার কাছে ভয় করবার কিছু নেই। এমন হাত তুখানায় তু-গাছা চুড়ি পরলে কি হয় ? প'র না ভাই লক্ষীটি, কে আর দেখতে আসছে ?"

জয়ন্তী বলিল—"হাজার লোকের হাজার কথা শুনতে হবে ত ? তু-গাছা চুড়ির জন্যে অত সইতে পারব না।"

উর্ম্মিলা বলিল—"আর কোন লোক কিছু বলবে না। শুধু তোমার দেওর বলবে। কাল বলছিল নুরজাহান

বেগম; এর পর উর্ব্বশী কি তিলোত্তমা কিছু একটা বল্‌বে। চল না একবারটি তাকে দেখিয়ে আনি।"

জয়ন্তী তাহার গালে একটা চড় দিয়া বলিল, "চুপ কর পোড়ারমুখী, বিধবা মানুষের ওসব ঠাট্টাতামাসা শুন্‌তে নেই।"

উর্ম্মিলা কিছু বলিল না, শুধু নিজের হাত হইতে দুইগাছা চুড়ি খুলিয়া জয়ন্তীকে পরাইয়া দিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে উর্ম্মিলার হাত ধরিয়া টানিয়া জয়ন্তী বলিল, "একটা জিনিষ দেখবি আয়।"

আপনার ঘরে গিয়া একটা মোড়ার উপর বসিয়া বড় ষ্টিল ট্রাঙ্কটা খুলিতে খুলিতে জয়ন্তী বলিল, "গত বছর ওঁর পঞ্চাশ টাকা মাইনে বেড়েছিল, আর ছেলে-মেয়েদুটো একটু বড় হয়েছে ব'লে দাইটাকে জবাব দিয়েছিলাম। আগে মোটে কিছু বাঁচাতে পারতাম না সংসারের গ্রাস থেকে। গত বছর তাই সাত শ' টাকা বাঁচিয়েছিলাম। ছেলেবেলা ত দেখেছিস্‌ই ভাই, ভাল গয়না শাড়ী কখনও পরিনি। কিন্তু মনে মনে সখটা চিরকালই ছিল। মনে করেছিলাম এর পর ফি-বছরে কিছু কিছু করাব।"

জয়ন্তী বাক্সের ডালাটা তুলিয়া পাতলা কাপড় জড়ানো একটা পুলিন্দা এবং ছোট একটা পিতলের চৌকো কৌটা বাহির করিল। পাতলা কাপড়খানা সরাইয়া বাহির করিল ঘননীল রেশমের উপর ছোট ছোট জরির চৌখুপি করা একখানি শাড়ী, আর লাল ও সোনালী রেশমে টানা-পড়েন দেওয়া ঝলমলে একখানা বেনারসী, শাড়ীটা নাড়িতেচাড়িতে দুইদিক হইতে দুইটা রং ঠিকরিয়া পড়ে।

উর্ম্মিলা হাতে করিয়া সযত্নে কাপড় দুখানা তুলিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "বাঃ কিঃ চমৎকার!" জয়ন্তী বলিল "দুশো টাকা দিয়ে দুখানা কিঃনেছিলাম, কিন্তু একদিনও প'রিনি।"

উর্ম্মিলার মুখে উত্তর যোগাইল না। খানিক ভাবিয়া বলিল, "বড় হয়ে ছবি পরবে এখন। মার কাপড় ত মেয়েরই পরে।"

জয়ন্তী বলিল, "তাই ত রেখে দিলাম। নইলে সবাই যেদিন কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে থান পরিয়ে দিলে সেদিন ইচ্ছা করছিল সবগুলো আগুনের মধ্যে ফেলে দি মাসশ্বশুড়ী বলেছিলেন চুলগুলোও কেটে ফেল্‌তে।"

উর্ম্মিলা নীরবে পিতলের কৌটাটা নাড়িতে লাগিল। জয়ন্তী খুলিয়া দেখাইল দশগাছা মুক্তা-বসানো চুড়ি।" "চার-শ' টাকা দিয়ে গড়িয়েছিলাম। প্রত্যেকটি মুক্তো সমান দেখেছিস্?"

উর্ম্মিলা বলিল, "হ্যাঁ, চমৎকার, এমন নিটোল যেন জলে টল্‌টল্ করছে।"

জয়ন্তী বলিল, "আমার চোখের জলের ফোঁটা। স্যাকরাবাড়ি থেকে চুড়িগুলো যখন এল তরকারি কুটছিলাম। উনি পরিয়ে দিতে চাইলেন তখন প'রি নি। তারপর সেই যে অসুখে পড়লেন আর ওকথা ভাববারও সময় রইল না। এখন এগুলো দেখ্‌লে চোখ জ্বালা করে।"

জয়ন্তী চুড়িগুলি নীল কাগজে জড়াইয়া কৌটায় বন্ধ করিয়া রাখিল। উর্ম্মিলা আর একবার বলিল, "তোমার মেয়ে রয়েছে, দুঃখ কি ভাই? মেয়েকে পরিয়ে সাধ মিটিও।"

জয়ন্তী ঝনাৎ করিয়া বাক্সটা বন্ধ করিয়া দিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চোখ দিয়া মুক্তার মত জলবিন্দু গড়াইয়া পড়িল।

শমীন্দ্র ও উর্ম্মিলা অন্য পাড়ায় বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। বাঙালীর বাড়ির ব্যাপার, খাওয়া-দাওয়া সারিতেই রাত বারোটা বাজিয়া গিয়াছিল, ফিরিতে ফিরিতে প্রায় একটা হইল। বাড়িতে ঢুকিবার পথে বাগানের নারিকেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়া জয়ন্তীর ঘরের আলো দেখা যাইতেছিল। উর্ম্মিলা বিস্মিত হইয়া বলিল, "বাবা, এত রাত্রে দিদির ঘরে আলো কেন? ছেলেপিলের অসুখ-বিসুখ হ'ল না কি?"

দু-জনে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিল। ঘরের ভিতর হাঁটা-চলার শব্দ স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছিল।

শমীন্দ্র বলিল, "দেখ না ঘরে গিয়ে কি হয়েছে।"

উর্ম্মিলা দরজার কাছে গিয়া দেখিল দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। সে কি ভাবিয়া খড়খড়ির একটা পাখী তুলিয়া ধরিল। বিস্ময়ে তাহার চোখ ঠিকরাইয়া পড়িতে-

ছিল। সে দেখিল জয়ন্তী তাহার বাক্স-প্যাঁটরা সমস্ত খুলিয়া ঘরময় ছড়াইয়াছে, নানা রকম রঙের সুন্দর কাপড় ও গহনা বিছানার উপর ছড়ান। জয়ন্তী নিজে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পরণে সেই জরির চৌখুপি ঘননীল রেশমের শাড়ী, ছুই হাতে দশ গাছা মুক্তার চুড়ি, গলায় বিবাহের সাতলহরী। সধবা অবস্থায় ছোটখাট আর যা ছুই-চারিটা অলঙ্কার সে পরিত, সমস্তই আজ আবার পরিয়াছে। মুগ্ধবিস্ময়ে সে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাইয়া আছে, তাহার অধরে স্মিতহাস্যের পিছনে বেদনার রেখা ফুটিয়াছে।

শমীন্দ্র বলিল,, "কি হয়েছে? একেবারে যে জমে গেলে! নড়ছ না কেন, পায়ে কি শিকড় গজিয়েছে?"

ঊর্মিলা চোখ ফিরাইয়া স্বামীকে ইসারা করিয়া ডাকিল, "দেখে যাও।" শমীন্দ্র ছুই পা অগ্রসর হইয়া আসিল। কিন্তু শমীন্দ্রর গলার আওয়াজ পাইয়াই জয়ন্তী খুট করিয়া ঘরের বাতি নিবাইয়া দিল।

শমীন্দ্র ও ঊর্মিলা নিজেদের ঘরে চলিয়া গেল।

ঊর্মিলা গায়ের গহনাগুলা খুলিয়া খুলিয়া ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে বলিল, "কি ব্যাপার বল ত! কিছু বুঝতে পারছি না। ছুপুর রাত্রে গয়না কাপড় প'রে আয়নার সামনে এত সাজগোজ করবার মানে কি?"

শমীন্দ্র বলিল, "মানেটা ঠিক বুঝতে পারছি না আমিও। কিন্তু রূপ যদি কারুর থাকে ত সে তোমার দিদির। অপ্সরীরা কি এর চেয়েও সুন্দরী হয়?"

ঊর্মিলা স্বামীকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, "অপ্সরীদের সঙ্গে ত আমার কারবার নেই, কি ক'রে বলব বল! তবে তুমি ত দেখছি একেবারে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ।"

শমীন্দ্র তাহার নাকের ডগাটা ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল, "তাই বুঝি ভয়ে এক সেকেণ্ডের বেশী দেখতে দিলে না।"

ঊর্মিলা বলিল, "আহা, দিদিই ত আলো নিবিয়ে দিলে। যাই বল, দিদি কিন্তু বড় অদ্ভুত মানুষ। স্বামীর নাম শুনলেই তার ছু-চোখ জলে ভরে ওঠে অথচ এই সামান্য গয়না কাপড়গুলোর ওপরে কি ক'রে ওর এত লোভ? কাল আমাকে নতুন কাপড় গয়নাগুলো দেখাচ্ছিল, বললে যে একদিনও সেগুলো পরেনি। হয়ত খুব পরতে ইচ্ছে করে তাই লুকিয়ে প'রে। কি ক'রে পারল কে জানে?"

শমীন্দ্র বলিল, "কেন, তোমার সুধা-দিদি ত সর্ব্বদা এক-গা গয়না প'রে বেড়ান। তাঁর কি শোক নেই বল্‌তে চাও?"

ঊর্মিলা স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল—"ছিঃ, কি যে তুমি? যা মুখে আসবে তাই বলবে। সুধাদি এয়োস্ত্রী মানুষ, ভগবান ছেলেপিলে কেড়ে নিয়েছেন, কি করবে বল?"

শমীন্দ্র বলিল—"স্বামীকে কি তোমরা সন্তানের চেয়ে বেশী ভালবাস?"

ঊর্মিলা হাসিয়া বলিল—"তোমার বুঝি শোন্‌বার সখ হয়েছে? তা যতই বঁড়শি ফেল, তোমাকে বাবু রুণু দীনুর চাইতে বেশী ভালবাসতে পারব না। কিন্তু তবুও ত স্বামীই স্ত্রীলোকের সব।"

শমীন্দ্র ঊর্মিলার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"উঃ কি নিদারুণ যুক্তি!"

শমীন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িলেও ঊর্মিলার চোখে ঘুম আসিল না। সারারাত্রিই তাহার জয়ন্তীর কথা ভাবিয়া কাটিয়া গেল। জয়ন্তীকে কোন্ সুদূর শৈশব হইতে সে চেনে। তাহাকে ত এমন মনে হয় নাই। সে হিন্দুঘরের মেয়ে, আজন্ম হিন্দুঘরের মত চালচলনে অভ্যস্ত; তারপর বিবাহের পর স্বামীকেও ত সে কম ভালবাসিত না। তাহার মনে পড়ে জয়ন্তীর বিবাহের পর ঊর্মিলা জয়ন্তীর স্বামীর উপর কি বিষম চটা ছিল। কতদিন ছুই সখীতে এই লইয়া তুমুল কলহ হইয়া যাইত। কিশোরী ঊর্মিলা বলিত,—"ওঃ ভারি ত তোমার ছু-দিনের বর, তার জন্যে চিরকালের বন্ধুকেও ভুলে গেলে। ছু-দণ্ড কথা বলবার সময় পাও না।" জয়ন্তী বিজ্ঞের মত হাসিয়া ঊর্মিলাকে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু ছুই-দশ মিনিট পরেই ছল করিয়া স্বামীর সন্ধানে পলায়ন করিত। আর এতদিন পরেই বা কোন্ কম ছিল? এই ত আট বৎসরের মধ্যে ঊর্মিলা

কতবার লিখিয়াছে একবারটি তাহার কাছে আসিতে, কিন্তু জয়ন্তীর এক জবাব—না ভাই, ও:ক একলা ফেলে যেতে পারব না।' বাপের বাড়িও এত দিনের ভিতর মাত্র একবার গিয়াছিল। আজকালকার সাহেবী চালে বিধবাও সধবার মত সাজসজ্জা করিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু তাই যদি হইবে তবে সে সর্ব্বদা ধুতি পাড়ের কাপড়ও পরে না কেন একথানা? সামান্ত ঠাট্টা-তামাসাতেও চটিয়া অস্থির হয় কেন? এ এক হেঁয়ালী।

উর্ম্মিলা সকালবেলাই জয়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাই, তোমার কাছে বড়ঠাকুরের ছবি নেই?" জয়ন্তী বিস্মিত হইয়া বলিল—"থাকবে না কেন? নিশ্চয়ই আছে।"

উর্ম্মিলা বলিল—"কই দাও না দেখি একথানা, বড় ক'রে বাঁধিয়ে আনব। তোমার ঘরে টাঙিয়ে রাখবে এখন।"

জয়ন্তী কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"কি হবে আর ঘরে টাঙিয়ে, ওসব আমার ভাল লাগবে না।"

উর্ম্মিলা এরকম উত্তর মোটেই আশা করে নাই, সে একেবারেই হতভম্ব হইয়া গেল। কোন কথা না বলিয়া সেখান হইতে পলাইল। তাহার বুদ্ধিতে কুলাইতেছিল না। জয়ন্তীর হইল কি? গভীর রাত্রে নির্জ্জন গৃহে বাসকসজ্জার মত সাজসজ্জা আবার স্বামীর ছবির প্রতি এমন ঔদাসীন্য! এই সবে দুই-তিন মাস বিধবা হইয়াছে, এখনও সিঁথির সিঁদুরের চিহ্ন, হাতের লোহার কলঙ্ক মিলাইয়া যায় নাই বলিলেই চলে, ইহারই মধ্যে কি সে স্বামীকে এমন করিয়া ভুলিতে চাহে যে তাহার একটা ছবিও ঘরে রাখিবে না? কি জানি? মানুষ হয়ত মানুষকে কোনোদিনই চিনিবে না। বিধাতা প্রতি মানুষের মনের সম্মুখে যে পর্দা ঝুলাইয়া দিয়াছেন গভীর প্রীতির অন্তর্দৃষ্টি তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে বলিয়া তাহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু দেখা গেল তাহাও মিথ্যা! জয়ন্তীকে সে ভুল বুঝিয়াছে। এই সদাব্রহ্মচারিণীর মন চঞ্চল হইয়াছে। কি জানি কবে সে আবার কি করিয়া বসিবে? বেদনায় উর্ম্মিলার বুকের ভিতরটা টন্ টন্ করিয়া উঠিল। জয়ন্তীকে সে আবাল্য প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহাকে যদি কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করে তবে তাহা দেখিবার আগে উর্ম্মিলার মরণই মঙ্গল। উর্ম্মিলা ছেলেমানুষের মত মনে মনে যত জাগ্রত দেবতার নিকট মানসিক করিতে লাগিল, "ঠাকুর, ইহার শুভমতি দাও, আমি ষোড়শোপচারে তোমার পূজা দিব।"

জয়ন্তীকে চোখে চোখে রাখাই উর্ম্মিলার কাজ হইয়া উঠিল। তাহার চালচলনে বিশেষ যে কোনো পরিবর্ত্তন ধরা যায় তাহা নয়। আগেরই মতন নিজের ও উর্ম্মিলার ছেলেমেয়েদের সেবাযত্নে তাহার দিন কাটিয়া যায়। বিকালে শমীন্দ্র আসিলে তাহাকে আদরযত্ন করিয়া খাওয়ানো, তাহার সহিত হাসিগল্প করা, ইহাও তাহার নিত্য কর্ম্মপদ্ধতির ভিতর। এই বৈঠকে উর্ম্মিলাও প্রত্যহই যোগ দেয়। কিন্তু এক একদিন গল্প যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে, শমীন্দ্রের কথায় জয়ন্তী হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে তখন উর্ম্মিলা অকস্মাৎ ভীষণ গম্ভীর হইয়া উঠে। আনন্দ-সঙ্গীতের তাল কাটিয়া যায়, শমীন্দ্র অন্য কথা পাড়িয়া আবার গল্প ফাঁদিতে চেষ্টা করে। উর্ম্মিলা রাগ করিয়া বলে—"বুড়ো বয়সে সারাক্ষণ হাহা হিহি আমার ভাল লাগে না।" জয়ন্তী হয়ত বলে—"চল ভাই উর্ম্মি আমরা বাগানের গাছে জল দিই গে।" বাগানের গাছে জল পড়ে বটে, কিন্তু দুই সখীর এক জনেরও মুখ ফোটে না। তাহারা আগাগোড়াই নীরবে কাজ করিয়া আবার নীরবে আপন আপন ঘরে ফিরিয়া যায়। জয়ন্তী সাজি ভরিয়া ফুল তুলিয়া অর্দ্ধেক উর্ম্মিলাকে দেয় অর্দ্ধেক নিজে রাখে। উর্ম্মিলা হাত পাতিয়া ফুল গ্রহণ করে বটে, কিন্তু আগের মত সে মিষ্ট হাসির পুরস্কার দিতে পারে না। তাহাদের দুই জনের মাঝখানে যে অফুরন্ত হাসি ও কথার স্রোত এতদিন বহিতেছিল, পরস্পরের চোখে চোখ পড়িতেই বিদ্যুৎপ্রবাহের মত যাহা গতিশীল হইয়া উঠিত, আজ তাহার মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা পাথরের মত বাধা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিছুতেই তাহাকে দুই সখী অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। জয়ন্তীও সেই রাত্রি হইতে উর্ম্মিলার মনের নূতন ধারা চিনিয়া লইয়াছে, কাজেই সে ও কোনো কথা পাড়িতে সাহস করে না।

গভীর রাত্রে উর্ম্মিলার ঘুম ভাঙিয়া যায়, কতদিন সে তন্দ্রালস চক্ষে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া শুনিয়াছে জয়ন্তীর

ঘর হইতে খুটখাট আওয়াজ আসিতেছে। একবার আলো জ্বলে আবার নিবিয়া যায়। অন্ধকারে পা টিপিয়া টিপিয়া দুই-এক দিন সে দেখিয়া আসিয়াছে জয়ন্তী আপনার দেবদুর্লভ রূপকে প্রসাধনে অপরূপ করিয়া তুলিতেছে, তাহার বিপুল কবরীতে পুষ্পমাল, বর্ষাস্নাত তরুর মত তাহার সতেজ সুন্দর দেহযষ্টি বেড়িয়া বিচিত্র বর্ণের সুরভিত শাড়ী। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবার উপায় ছিল না, ঘরের আলো নিমেষে নিবিয়া যাইত। নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া শমীন্দ্রের ঘুম ভাঙাইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িতে হইত; কারণ এই লুকাইয়া দেখাশোনার ব্যাপার শমীন্দ্র মোটেই ভালবাসিত না। উর্ম্মিলা কিছু বলিতে গেলেই সে বিরক্ত হইয়া উঠিত।

তবু একদিন সাহস করিয়া উর্ম্মিলা বলিল, "দেখ, দিদির মতিগতি ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে না। এর একটা উপায় ত করতে হবে। শেষকালে কোথা থেকে কোথায় গড়াবে কে বলতে পারে? তার চাইতে বরং একটা বিয়ের ব্যবস্থা করা ভাল।"

শমীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি যে বল তুমি তার ঠিক নেই। তোমার সম্পর্কে বড়, বয়সে বড় তাও কি ভুলে গেলে? দুটো দুটো ছেলে মেয়ের মা সে, সেটাও ত ভাবতে হবে। গোয়েন্দাগিরি রেখে রাত্রে ঘুমের দিকে মন দিও ত। আমি না-হয় ওঁর অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা করব।"

উর্ম্মিলা বলিল, "অত আর দরদ দেখাতে হবে না তোমাকে। আমার চেয়েও কি তুমি ওর বেশী হিতৈষী নাকি?"

কথাটা বলিয়াই উর্ম্মিলার মনে হইল কি জানি হয়ত ইহার ভিতরও কিছু অর্থ আছে। হয়ত শমীন্দ্রই জয়ন্তীকে এখন বেশী ভালবাসে। যে-শমীন্দ্রর মন তাহার নিকট কাচের মত স্বচ্ছ ছিল সেও কি মনের গহনে কোনো অন্তরাল রচনা করিতে সুরু করিয়াছে? সংসারে সকল অসম্ভবই সম্ভব হয়। জয়ন্তীর ভুবনমোহন সৌন্দর্য্যে শমীন্দ্রর আত্মবিস্মৃত হওয়া কি এতই অসম্ভব? একথা কল্পনা করিতেও উর্ম্মিলার মস্তিষ্কের শিরাগুলা ছিঁড়িয়া আসিতেছিল, হৃৎপিণ্ডের গতি যেন থামিয়া যাইতেছিল। তবু তাহার মনে হইল, কি জানি নাটকে-নভেলে এতদিন যাহা পড়িয়া নানা মত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে, আজ হয়ত তাহার দুরদৃষ্টে তাহাই জীবন্তরূপে দেখা দিল; যে স্বামীর প্রেম তাহার কাছে নিঃশ্বাস-বায়ুর মত সহজ সত্য ও প্রয়োজনীয় ছিল তাহার সম্বন্ধে এমন সন্দেহ যে সে কোনোদিন করিতে পারিবে, এ-কথাই সে ইতিপূর্ব্বে কখনও ভাবে নাই। আবার অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, সংসারে এত মানুষ থাকিতে জয়ন্তীই নায়িকার ভূমিকায় দেখা দিল। মরিবার দিন একমাত্র যাহার হাতে ধন মান সকল সঁপিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিবে এতদিন ভাবিয়া আসিয়াছিল, সেই কি-না বাঁচিয়া থাকিতেই সকলের আগে তাহার সকল ধন মান হরণ করিতে বসিল। না, না, উর্ম্মিলা কিছুতেই এ-সন্দেহকে মনে স্থান দিবে না। একি? সে কি পাগল হইতে বসিয়াছে যে এমন সব অসম্ভব স্বপ্নকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেছে। এ-কথা লইয়া শমীন্দ্রের সহিত আর কোনো কথা তুলিবে না ভাবিয়া উর্ম্মিলা সেখান হইতে চলিয়া গেল।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। একটু আগে আশ্বিনের পাগলা ঝোড়ো বাতাস বাগানের সারি সারি নারিকেল গাছের পাতার ঝুঁটি প্রচণ্ড বেগে নাড়িয়া ক্রুদ্ধ গর্জ্জন করিতে করিতে নীরব হইয়া গিয়াছে। ঘন ধূলার অবগুণ্ঠন খসিয়া নির্ম্মল নীল আকাশ দেখা দিয়াছে। উর্ম্মিলা জানালা দিয়া পথের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমন প্রচণ্ড ঝড়ের সময় শমীন্দ্র না-জানি কোথায় ছিল! এখনও ত তাহার দেখা নাই। উর্ম্মিলার ব্যাকুল মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত বাড়ি কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ জয়ন্তীর জানালা দিয়া এক ঝলক বৈদ্যুতিক আলো বাগানের পথের উপর পড়িল। উর্ম্মিলা সেদিকে চাহিয়া দেখিতে না দেখিতে আলোটা নিবিয়া গেল। কিন্তু কার যেন মৃদু গলার আওয়াজ। কে যেন ঘরের ভিতর কথা কহিতেছে। উর্ম্মিলা কান পাতিয়া শুনিল, জয়ন্তীর গলারই ত স্বর। এত রাত্রে কাহার সহিত সে কথা কহিতেছে? ছেলেরা ত কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এ ত ছেলেভুলানো কথা নয়। উর্ম্মিলা আপনার ঘর

ছাড়িয়া মাঝের ঘরের শেষ দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ঐ ত জয়ন্তীর সুস্পষ্ট সানন্দ কণ্ঠস্বর বীণার মৃদু ঝঙ্কারের মত শোনা যাইতেছে। জয়ন্তী বলিতেছে, "এত কাছে তুমি রয়েছ তবু তোমাকে তেমন ক'রে কাছে পাবার ত যো নেই। সব জায়গাতেই যে নিষেধ। সেই রাত্রির গভীর অন্ধকারে ছাড়া তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলবার যো নেই। কিন্তু তোমার কাছে মনের সব কথা না ব'লে আমি কি বাঁচতে পারি?" জয়ন্তীর কণ্ঠস্বর অশ্রুতে রুদ্ধ হইয়া আসিল। ঊর্ম্মিলা শিহরিয়া উঠিল। কে সে যে এত কাছে থাকিয়াও কাছে নাই! ঊর্ম্মিলা আর ভাবিতে পারে না। আর সে শুনিতে চাহে না কোনো কথা।

আবার জয়ন্তীর কণ্ঠস্বরে আনন্দ জাগিয়া উঠিল, "তুমি না বলেছিলে নীল শাড়ী আর মুক্তার চুড়িতে আমাকে অপ্সরীর মত দেখায়, এখন দেখ দিকি এই আগুন রঙের শাড়ী আর লাল দুল দুটিতে কেমন মানিয়েছে? না, তুমি দেখবে না, কথা বলবে না? কেন কিসের ভয় এত?"

কিসের ভয় তাহা ঊর্ম্মিলা জানে। কথা কহিলেই ত ঊর্ম্মিলা চিনিয়া ফেলিবে তাহার সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর। না কথা কহে ত ভালই, সন্দেহ এমন পরিপূর্ণ রূপে সত্যে পরিণত হইলে ঊর্ম্মিলা বাঁচিবে কি লইয়া? ঊর্ম্মিলা ঘরে ফিরিয়া যাইতে গেল, কিন্তু তাহার পা নড়িল না। সে শুনিল জয়ন্তী আবার বলিতেছে, "দিনের বেলা মানুষ জগতের যে নিয়ম আমাকে পালন করায়, তা আমাকে মেনে চলতেই হয়। কিন্তু সে যে কত বড় মিথ্যা তা আমি জানি আর তুমি জান। তাই রাত্রে আমার এ-সংসার আমি নিজের মত ক'রে সত্যরূপে গড়ে তুলি। তুমি যে মধুর হাসিতে ঘর আলো ক'রে তোল ওতেই আমার সকল দুঃখবেদনা ধন্য হয়ে ওঠে।"

ঊর্ম্মিলা ছুটিয়া গেল জয়ন্তীর দরজার কাছে, দরজা ধাক্কা দিয়া সে দেখিবে কার এত মধুর হাসি। কিন্তু তাহার সম্ভ্রমে শিক্ষায় বাধিল। এ-কাজ সে কি করিয়া করিবে? অবশেষে কাঁদিয়া আপনার ঘরে গিয়া লুটাইয়া পড়িল। কতক্ষণ যে সে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিয়াছিল মনে নাই। চোখ তুলিয়া যখন চাহিল দেখিল সম্মুখে দাঁড়াইয়া শমীন্দ্র। শমীন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, "কি হয়েছে ঊর্ম্মি, কাঁদছ কেন?"

ঊর্ম্মিলা চোখের অশ্রু মুছিয়া বলিল, "তোমাকেও তা বলে দিতে হবে? তুমি এত বড় দুঃখ আমাকে দেবার আগে কেন আমায় এখান থেকে বিদায় দিলে না? আমি অনায়াসে চলে যেতাম, কোনো কথা বলতাম না। স্বামী হয়ে আমার এ মর্যাদাটুকু তুমি রাখতে পারলে না?" শমীন্দ্রর চোখমুখ আগুনের মত লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "ঊর্ম্মিলা, তুমি কি বলছ তা তোমার হুঁস আছে কি? তুমি পাগল?"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "হ্যাঁ, পাগল ত আমাকে এখন হতেই হবে। আমি নিজের কানে সব শুনেছি তোমাদের কথা।"

শমীন্দ্র গর্জ্জিয়া উঠিল, "আমাকে কি কথা তুমি বলতে শুনেছ, যা তোমার সামনে আমি না বলতে পারি?"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "তোমাকে বলতে শুনব কেন? তুমি যে কত বড় বুদ্ধিমান্ তা কি আমি জানি না। যে পাগল হয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়েছে একেবারে তাকেই বলতে শুনেছি।"

শমীন্দ্র গায়ের চাদর জামা রাখিয়া শয়নের আয়োজন করিতে যাইতেছিল, ঊর্ম্মিলার কথায় ঘর ছাড়িয়া ছিটকাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। অন্ধকার রাত্রিতে ঘরবাড়ি ছাড়িয়া সে বাহির হইয়া গেল কি-না ঊর্ম্মিলা তাহাও দেখিল না। আসিবার সময় শমীন্দ্র নিঃশব্দে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়াছিল, যাইবার বেলা ক্রুদ্ধ পবনের মত বেগে দু-পাশে দুইটা দরজা ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল। সমস্ত বাড়িটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। জয়ন্তী ভীতসন্ত্রস্ত ভাবে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার পরণে লাল কালো ফুলতোলা ঢাকাই গুলবাহার শাড়ী। সে কথা ভুলিয়াই সে ঊর্ম্মিলার খোলা দরজার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ঊর্ম্মিলা তখন জানালার ধারে একটা টুলে বসিয়া আছে, জানালার ফ্রেমের উপর হাতে মাথা রাখিয়া। জাগিয়া কি ঘুমাইয়া বোঝা যায় না। তখনও যে বিছানায় কেহ শোয় নাই ঘরে ঢুকিলেই বোঝা যায়। জয়ন্তী ডাকিল, "ঊর্ম্মি, এত রাত্রে এখানে চুপ ক'রে বসে যে?

ঠাকুরপো কোথায় গেল? তোরা আজ ঘুমুবি না? কি একটা আওয়াজ পেয়ে আমি ছুটে এলাম।" উর্ম্মিলা মুখ তুলিয়া একবার শূন্যদৃষ্টিতে জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকাইল।

জয়ন্তী বলিল, "কি হয়েছে? বলবি না?"

উর্ম্মিলার দৃষ্টি হঠাৎ কঠোর হইয়া উঠিল, সে বলিল—"নিজের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছ না, কি হয়েছে? কেন যে ও-বেশ ছেড়ে বেরোবার কথাও ভুলে গিয়েছ তাকি আমি জানি না? তোমাদের সব কথা আমি শুনেছি। আমার কাছে আর ও-মুখ দেখিও না।"

উর্ম্মিলা কাঁদিয়া ফেলিল। জয়ন্তীও চোখের জল সম্বরণ করিতে পারিল না। সে কি বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল। উর্ম্মিলা বলিল, "তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতাম ব'লে তোমার ও সর্ব্বহারা চেহারার দিকে তাকাতে না পেরে দুটো চুড়ি পরিয়ে দিতে কি চুলটা বেঁধে দিতে যেতাম ব'লে এমনি ক'রে তার শোধ নিচ্ছ? চিরকালের সম্বন্ধকে এমনি ক'রে শেষ করছ?"

সাশ্রুনয়নে জয়ন্তী বলিল,—"উর্ম্মি, তোর মুখে এ-কথা আমায় শুনতে হ'ল শেষে! তোকে আমি এর উত্তর কি দেব, ভগবান করুন, এ-কথা তোকে যেন কখনও বুঝতে না হয়।"

পরদিন অনেক বেলায় ঘরের বাহির হইয়া উর্ম্মিলা দেখিল জয়ন্তী বাড়ি নাই।

বাপের বাড়ি হইতে জয়ন্তী উর্ম্মিলাকে চিঠি লিখিয়াছে—

"উর্ম্মি, তোকে যদি প্রথম দিন থেকে মায়ের পেটের বোনের মত না দেখতাম, সন্তানের মত না ভালবাসতাম, তাহলে আজ আর তোকে এ-কয় ছত্র লিখতে পারতাম না।

তোকে আমার বড় দুঃখের দিনে বহুদিন পরে পেয়ে বুকটা জুড়িয়ে গিয়েছিল। যাকে হারিয়ে আমি পৃথিবীটাকে সৃষ্টির বাইরে বিধাতার একটা উপহাস মনে করতাম, তাকে ফিরে পাবার পথ তুই আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলি, কিন্তু তুই জানতিস না। এ বিধবার তপস্যার পথ নয়, বললে কেউ বিশ্বাসও হয়ত করবে না। কিন্তু তুই করবি মনে ক'রে তোকেই একদিন বলব ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু আমার কপাল মন্দ, সে সুখের বলা আজ আমার অপমানের কৈফিয়ৎ হয়ে দাঁড়াল।

স্বামী ত চলে গেলেন। তারপর যখন হিতৈষীরা সবাই মিলে আমার সিঁথির সিঁদুর মুছে, শাড়ীর পাড় ছিঁড়ে, হাতের চুড়ি ভেঙে আমাকে ভিখারী সাজিয়ে ছেড়ে দিলে তখন আমার জ্ঞান ছিল না। কিন্তু চৈতন্য হ'ল কঁদিবার পরে নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল এ ত আমি নয়। কোথায় গেল সেই জয়ন্তী যার প্রতিটি শাড়ীর পাড়ে তার স্বামীর রুচি আঁকা ছিল, যার প্রত্যেক অলঙ্কার ছিল স্বামীর জমাট ভালবাসা, যার সিঁথির সিঁদুর কতদিন স্বামী স্বহস্তে এঁকে দিয়েছে? সে মরে গেছে হারিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সে স্বামী যেন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে সংসার থেকে মুছে গেছে।

তোর কাছে যখন এলাম তখন পাথর হয়ে গিয়েছি। কিন্তু তুই ত পাথরে প্রাণ জাগিয়ে দিলি। যে-চুলের গোছা মাস-শাশুড়ী মুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন তাকে তুই আবার যত্ন ক'রে বেঁধে ফুল দিয়ে দিয়েছিলি মনে আছে? মনে প'ড়ে গেল দু-মাস আগে এলোখোঁপায় ফুল কে দিয়ে দিয়েছিল। আবার যেন ঠিক তোর পাশে এসে দাঁড়িয়ে সে-ই হেসে উঠল। আচারে নিয়মে নিষেধে যাকে একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলাম, ঐ দুটি ফুলের স্মৃতির মধ্যে সে জীবন্ত হয়ে উঠল।

আমার এ-হাত দুখানাকে আমি ত চিনতেই পারতাম না। তুই তোর সোনার চুড়ি পরিয়ে চিনিয়ে দিলি। এই হাতেই বারো বৎসর স্বামীর সেবা করেছি। চুড়ি দু-গাছা প'রে তারা যেন খুঁজে আনলে তাদের এত কালের পরিচিত বন্ধুকে।

ফুলের সঙ্গে যে দেখা দিয়েছিল ক্রমে সে প্রত্যহের সাথী হয়ে উঠল, আমার সকল অপূর্ণ সাধ-আহ্লাদ, আমার সকল কল্পনার সুখ যাকে বেষ্টন ক'রে পূর্ণ হয়ে উঠতে চেয়েছিল একদিন, তাকেই ঘিরে আবার তারা পূর্ণ হয়ে উঠল এবার। আমার সাজে সজ্জায় প্রসাধনে সেই যে আমার শরীর মন পূর্ণ করে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল তাকি তুই বিশ্বাস করবি?

স্বামীকে ত ভালবাসিস, ভেবে দেখ্ দিকি, তোর কোন সাধ-আহ্লাদ, কোন্ সুখ-সৌভাগ্যটা তাকে ঘিরে নেই? সবেতেই ত তোর সে মিশে রয়েছে।

সে কি শুধু তার শরীরটুকু? তোর সমস্ত জীবন জোড়া হয়ে উঠছে সে, আপনার শরীরের চেয়ে সে অনেক বড়।

আমার এতদিনের যে অভ্যস্ত জীবন তাকে নির্ম্মূল ক'রে বাদ দিয়ে নূতন একটা জড় ছবি আর মালা মন্ত্রের মধ্যে ত তাঁকে কোথাও খুঁজে পাই না। ছবি কেবল মনে পড়িয়ে দেয় সে হারিয়ে গেছে। আমি যে সেই হারানটাই ভুলে থাকৃতে চাই। আমার সকল স্মৃতি সকল আবেষ্টনে যদি সে জীবন্ত হয়ে থাকে তবে আমার আচারের ত্রুটি হ'লে কি আমাকে পরে পাগল মনে করলেও গ্রাহ্য করব না।

আর কি লিখব? ঠাকুরপোকে সুখী করিস্। তুই সুখে থাক্।

তোর দিদি জয়ন্তী

জার্ম্মানীর একটি বিদ্যালয়

শ্রীঅনাথনাথ বসু

জার্ম্মানীর বিখ্যাত ব্লাক্ ফরেষ্ট (Schwarzwald)-এর উত্তরাংশ ওডেনভাল্ড (Odenwald) বা ওডেনের বন নামে পরিচিত। এই অঞ্চলটি ব্লাক্ ফরেষ্টেরই মত নয়নাভিরাম। রাইন উপত্যকার পূর্ব্বদিকে ছোট বড় পাহাড়ের শ্রেণী উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। তাহারই পায়ের কাছে সমতলক্ষেত্রের উপর দিয়া রাইন নদী বহিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের দেহ ও চূড়াগুলি ওক্ বীচ ও পাইনে ঢাকা। হেমন্তে যখন গাছের পাতাগুলিতে রং ফেরে তখন সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোরম হয় আবার শীতকালে যখন বরফ পড়িয়া চারিদিক সাদা হইয়া যায় তখন সে সৌন্দর্য্য আর এক রূপ ধারণ করে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ও গায়ের উপর গাছের আড়ালে ছোটবড় গ্রাম। জার্ম্মানীর গ্রাম অঞ্চলে বাড়িগুলি প্রায়ই লাল টালি দিয়া তৈয়ারি; সবুজ পাতার ফাঁকে দূর হইতে সেগুলি বড় সুন্দর দেখায়।

এইখানেই একটি পাহাড়ের গায়ে য়ুরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে সুপরিচিত ওডেনভাল্ড স্কুল (Odenwaldschule) প্রতিষ্ঠিত। এরূপ সুন্দর প্রাকৃতিক অবস্থান আমি খুব কম বিদ্যালয়েরই দেখিয়াছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষয়িত্রী যখন শান্তিনিকেতনে আসেন তখন তাঁহার কাছে ইহার কথা শুনি ও ছবি দেখি। তখন হইতেই বিদ্যালয়টি দেখিবার আগ্রহ ছিল। য়ুরোপে গিয়া সেই আগ্রহ মিটাইবার সুযোগ পাইলাম। ১৯৩১ সালে আমি প্রথম ওডেনভাল্ড স্কুলে যাই; তাহার পর দুই বৎসরে কয়েকবার সেখানে গিয়াছি এবং বিদ্যালয়টি ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

প্রায় চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে, ১৯১০ সালে পল গেহেব তাঁহার পত্নীর সহায়তায় ও সহযোগিতায় ওডেনভাল্ড বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। য়ুরোপে শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিদ্যালয়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং ইহার প্রতিষ্ঠার সহিত সেখানকার শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ত্তমানে যে অভিনব আন্দোলন দেখা দিয়াছে তাহার ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। সুতরাং সেই আন্দোলনের কথা সংক্ষেপে বলি; তাহা হইলে এই বিদ্যালয়ের আদর্শ ও কার্য্যক্রম বোঝা সহজ হইবে।

এই আন্দোলন নিউ স্কুল মুভমেণ্ট (New School Movement) নামে পরিচিত। ১৮৮৯ সালে সেসিল রেডি (Cecil Reddie) ইহার প্রবর্ত্তন করেন। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর প্রতিবাদ করিয়া অভিনব শিক্ষাপ্রণালী সৃষ্টি করাই ইহার উদ্দেশ্য। তখন ইংলণ্ডে যে শিক্ষাপদ্ধতি চলিতেছিল, আমাদের দেশে আজও তাহার একটি অনুকরণ চলিয়া আসিতেছে; সুতরাং একহিসাবে তাহার

সহিত আমাদের কিছু পরিচয় আছে। সেজন্য তাহার ত্রুটিগুলি আলোচনা না করিলেও চলিতে পারে। শিক্ষার এই নবীন আদর্শের মধ্যে কয়েকটি মূলকথা আছে; (১) শিশুর স্বাধীনতা, (২) ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর বিকাশ; (৩) মানুষের বিচিত্র চিত্তবৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলনের জন্য সমগ্রতর শিক্ষার পরিকল্পনা। ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন; এবং সেজন্য মানসিক বৃত্তিগুলির সর্ব্বাঙ্গীন অনুশীলন দরকার। প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীতে ব্যক্তিত্বের বিকাশের বিশেষ আয়োজন ছিল না। সেখানে লেখাপড়ার উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষার এই নূতন আদর্শ অবলম্বনে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে অ্যাবটসহোম (Abbotsholme) নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অল্পদিনেই তাহার কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ডেমোল্যাঁ (Eduard Demolins) ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের অনতিদূরে একোল দে রোস্ (Ecole des Roches) নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জার্ম্মানীতেও এই আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া পৌঁছায়। সেখানে এই আন্দোলনের প্রথম প্রবর্ত্তক হারমান্ লিৎস্ (Hermann Lietz)। তিনি কিছুকাল অ্যাবটস্‌হোমে রেডির সঙ্গে কাজ করিয়াছিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি যে-শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেন সেগুলি লান্‌ডএরৎসিহুংসহাইমে (Land-Erziehungsheime) নামে পরিচিত। এই শব্দটির অর্থ পল্লীঅঞ্চলে স্থিত শিক্ষানিকেতন। নামটির মধ্যেই বিদ্যালয়ের দুইটি আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে; ইহা বিদ্যালয় নহে নিকেতন (Heim); এবং পল্লীঅঞ্চলের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। লিৎস ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইল্‌সেনবার্গে প্রথম লান্‌ড-এরৎসিহুংসুহাইমে প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পরে এই আদর্শে পরিচালিত আরও কয়েকটি বিদ্যালয় জার্ম্মানীতে স্থাপিত হয়।

খোলা জায়গায় অভিনয়ের দৃশ্য

ধীরে ধীরে লিৎসের লান্‌ড-এরৎসিহুংসহাইমের আদর্শও কিছুপরিমাণ রূপান্তর গ্রহণ করে এবং তাহার ফলে জার্ম্মানীতে আর এক শ্রেণীর বিদ্যালয় দেখা দেয়। এগুলি ফ্রাই স্থুল গেমাইণ্ডেন্ (Freie Schulgemeinden) অর্থাৎ স্বনিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়-সমাজ নামে পরিচিত। এই নূতন আদর্শের প্রচারক ছিলেন গুস্তাভ ভিনেকেন (Gustav Wyneken) ও পল গেহেব (Paul Geheeb)। গেহেব কিছুদিন লিৎসের সহকর্ম্মী ছিলেন; কিন্তু কয়েকটি কারণে তাঁহার সহিত মতভেদ হওয়ায় গেহেবকে লিৎসের বিদ্যালয় ছাড়িতে হয়। তখন তিনি ও ভিনেকেন মিলিয়া ভিকার্সডর্ফে (Wickersdorf) প্রথম ফ্রাই স্থুল গেমাইণ্ডে প্রতিষ্ঠা করেন।

রেডির মূল আদর্শে বিদ্যালয়ের সামাজিক দিকটা বিশেষ ফুটিয়া ওঠে নাই। লান্‌ড-এরৎসিহুংসহাইমের আদর্শে সেই ভাবটি প্রথম দেখা দেয়, কিন্তু ফ্রাই স্থুল গেমাইণ্ডের আদর্শেই তাহার পূর্ণ বিকাশ হয়। বিদ্যালয় যে শুধু

বিদ্যালয়েরই কেন্দ্র নহে, ইহা যে একটি বিশেষভাবের সমাজ, বাহিরের বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্রতর সংস্কৃত প্রতিচ্ছবি এইটাই স্কুল গেমাইণ্ডের কেন্দ্রীভূত তত্ত্ব। ভিনেকেন এই তত্ত্বটি স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ফলে বিদ্যালয়ের
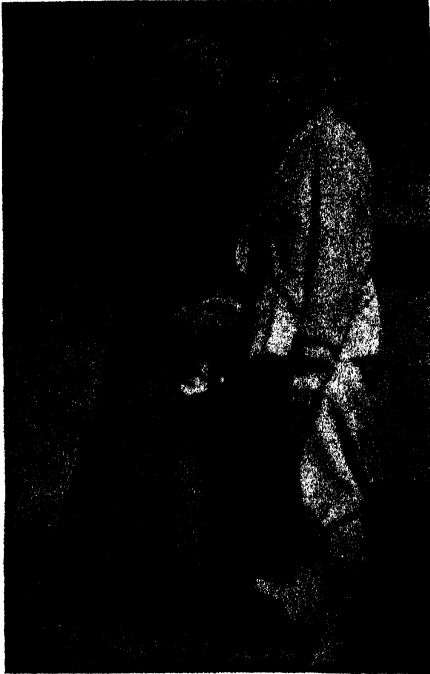
রবীন্দ্রনাথ ও পল গেহেব

যে আমূল রূপান্তর দরকার ছিল, ততদূর পর্য্যন্ত করিতে তিনি সম্মত ছিলেন না। গেহেব মনে করিতেন যে বিদ্যালয়সমাজকে ঠিক সমাজেই পরিণত করিতে হইলে সেখানে সহশিক্ষার প্রবর্ত্তন করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ভিনেকেন সহশিক্ষায় বিশ্বাস করিতেন না। তাহা ছাড়া ফ্রাই স্কুল গেমাইণ্ডে বলিতে যতখানি স্বাধীনতা বোঝায় তিনি ছেলেদের ততখানি স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই সকল কারণে গেহেবকে শেষে ভিকার্সডর্ফ ছাড়িয়া অন্যত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে হইল।

তাহার ফলে ১৯১০ সালে ওডেনভাল্ড স্কুলে প্রতিষ্ঠিত হইল। আকারে-প্রকারে সেটা সাধারণ বিদ্যালয় হইতে এতই স্বতন্ত্র যে, প্রথম দেখিলে সেটাকে বিদ্যালয় বলিয়া মনে করা শক্ত হয়। এ যেন একটা বৃহৎ পরিবার, পাহাড়ের গায়ে কুটীর রচনা করিয়া বাস করিতেছে। সাধারণতঃ বিদ্যালয় বলিতে আমরা একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার কথা ভাবি; এখানে সেরকম কিছুই নাই। ছেলেমেয়েরা সাতটি বিভিন্ন বাড়িতে অধ্যাপকদের সহিত

ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের একটি দৃশ্য

বাস করে। অদূরে উপত্যকায় গ্রামের গৃহগুলি যেমন এগুলিও তেমনি, তবে অপেক্ষাকৃত বড়। প্রত্যেক গৃহেরই এক একটি নাম আছে; যে-সকল মনীষীর চিন্তার ধারা বিদ্যালয়ের আদর্শের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাঁহাদের নামে গৃহগুলির নামকরণ করা হইয়াছে। প্লেটো, গ্যেটে

শালার, হার্ডার, হুম্‌বোল্‌ট ও পেষ্টালৎসি এই কয়জনের নামে বিভিন্ন গৃহগুলি পরিচিত।

শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র কোন বিদ্যালয়গৃহ নাই; যেখানে ছেলেমেয়েরা বাস করে সেইখানেই কয়েকটি ঘর আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে; সেই খানেই পড়ান হয়। ঘরগুলির আসবাবপত্রও সাধারণ বিদ্যালয়ের মত নহে। দেখিলে মনে হয় কোন গৃহস্থের লেখাপড়া করিবার ঘর।

বিদ্যালয়ে তিন হইতে কুড়ি-একুশ পর্য্যন্ত সকল বয়সের ছেলেমেয়েই দেখিলাম।

বিদ্যালয়ের সকল কার্য্যেই ছেলেমেয়েরা সাহায্য করে। ঘর পরিষ্কার করা, পথঘাটগুলি ঠিক রাখা, রন্ধন করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি সকল কাজেই ছেলেমেয়েরা নিয়মিতভাবে যোগ দেয়। এগুলিকে তাহারা বিদ্যাশিক্ষারই অঙ্গ বলিয়া মনে করে। বিদ্যালয়ের বাগানে

পাহাড় ও জঙ্গল কাটিয়া ছাত্রেরা খেলার জায়গা করিতেছে

অধ্যাপনারত পল গেহেব

ছেলেমেয়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী সকলেই কাজ করেন। একস্থানে পাহাড়ের উপরে অনেকখানি মাটি সমতল করিয়া খেলার অঙ্গন তৈয়ারি করা হইয়াছে। শুনিলাম ছেলেমেয়েরা মিলিয়াই এটি করিয়াছে। আমি যখন সেখানে ছিলাম তখন ছেলেমেয়েরা উন্মুক্ত স্থানে একটি রঙ্গমঞ্চ (open-air stage) তৈয়ার করিতেছে। মাঝে মাঝে আমিও তাহাদের কাজে যোগ দিতাম। ছেলেমেয়েরা শিক্ষকদের সহিত কাজ করিতে অভ্যস্ত; তাহারা সহজেই আমাকে তাহাদের দলে লইয়াছিল এই প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল ওডেনভাল্‌ড বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ মিটারবেটার (mitarbeiter) অর্থাৎ সহকর্ম্মী নামে পরিচিত। এ নামের সার্থকতা সেখানে সর্ব্বত্র দেখিয়াছি। শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে সেখানে যেরূপ হৃদ্যতার সম্পর্ক দেখিলাম অন্যত্র সেরূপ দুর্লভ। মোটের উপর এখানে শিক্ষায়, কর্ম্মে, চেষ্টায়, আচারে, ব্যবহারে সর্ব্বত্রই বিদ্যালয়ের সমাজ-রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

য়ুরোপে ও আমেরিকায় অনেক বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা দেখিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে সে আদর্শ যতদূর আচরিত হইয়াছে অন্য কোথাও ততখানি দেখি নাই। ছেলেমেয়েরা একই গৃহে পাশাপাশি কক্ষে বাস করিতেছে, একসঙ্গে লেখাপড়া কাজকর্ম্ম আনন্দ উৎসব করিতেছে, একত্রে বেড়াইতে যাইতেছে, অবাধে মেলামেশা করিতেছে; তাহাদের মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা কুণ্ঠার ভাব নাই;

শিক্ষকেরাও এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদার। ছাত্রছাত্রীদের উপর তাঁহাদের, বিশেষ করিয়া গেহেবের, অগাধ বিশ্বাস। সহ-শিক্ষার ব্যাপারে অনেক সময়ে দুইটি জিনিষ দেখা যায়; কর্তৃপক্ষগণ হয়ত বাহ্যতঃ সহশিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন
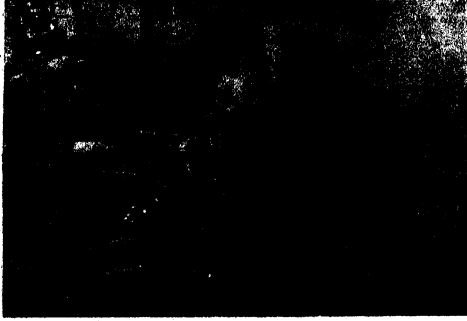
যন্ত্রাগারে একটি বালক কাজ করিতেছে

কিন্তু তাঁহাদের মনে এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না থাকায়, তাঁহারা অত্যধিক মাত্রায় ছেলেমেয়েদের উপর নজর রাখেন। ফলে ছেলেমেয়েদের মনেও বিশ্বাস ও সাহসের অভাব হয়; তাহারা ভাবে, হয়ত ইহার মধ্যে জুগুপ্সার কিছু আছে। এই ভাবে এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় যেখানে সহশিক্ষা চলিতে পারে না। এটিকে যদি সহজ ভাবে লওয়া যায় তাহা হইলেই ব্যাপারটাও সহজ হইয়া ওঠে। অবশ্য আমি নজর রাখার আপত্তি করি না; কিন্তু সে চেষ্টা প্রচ্ছন্ন রাখিতে হইবে, তাহাকে সীমা লঙ্ঘন করিতে দিলে মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সহশিক্ষা সম্বন্ধে আর একটি ব্যাপারও ঘটে। অনেক সময়ে একত্রে লেখাপড়া করাকেই সহশিক্ষা বলা হয়। কিন্তু শিক্ষা ত শুধু লেখা-পড়ারই মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, মূলতঃ তাহার সম্পর্ক আচারের সঙ্গে; বিদ্যা সেই আচারনিয়ন্ত্রণের সাধন মাত্র; সেইজন্য উদারতা অর্থে বিদ্যালয়ে চলাফেরা, আনন্দ উৎসব করা, নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা সকলই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। সহশিক্ষায় যদি তাহার আয়োজন না থাকে তাহা হইলে সেরূপ শিক্ষাকে সহশিক্ষা নামে অভিহিত করা অন্যায়।

সহশিক্ষার সহিত স্বাধীনতার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ওডেন্‌ভাল্‌ড বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাধীনতা-বিকাশের যথেষ্ট আয়োজন আছে। স্বাধীনতার মূল কথা দায়িত্ব ও অধিকার; যে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে শিখিল না, তাহার পক্ষে স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই; অধিকার দায়িত্বেরই অনুরূপ। অধিকার পাইতে হইলে দায়িত্ব স্বীকার করিতে হয় এবং দায়িত্বগ্রহণ করিলেই তবে অধিকার লাভ করা যায়। ওডেন্‌ভাল্‌ড বিদ্যালয়ের কার্য্যপরিচালনায় ছেলেমেয়েরা কতখানি দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া লইয়াছে তাহার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল কার্য্য সুচারু-

ওডেন্‌ভাল্‌ড বিদ্যালয়

রূপে সম্পন্ন করিবার জন্য ছেলেদের মণ্ডলী আছে; তাহা স্কুল গেমাইণ্ডে নামে অভিহিত; ছাত্রছাত্রীরাই তাহার একজন নেতা নির্ব্বাচন করে। সেই মণ্ডলীর নিয়মিত

বৈঠক হয়, সেখানে সকলেই উপস্থিত থাকেন। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় সকল কথাই সেখানে আলোচিত হয়।

তাহা ছাড়া প্রত্যেক গৃহে কয়েক জন বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক রূপে থাকে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত অধ্যাপকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের ভার লইয়া বিভিন্ন গৃহে তাহাদের মধ্যে বাস করিতেন। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে গেহেবের মনে হয় যে, সর্ব্বক্ষণ শিক্ষকগণের এরূপ তত্ত্বাবধান ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে এবং ফলে তাহাদের দায়িত্ব-বোধ কমিয়া যায়, সুতরাং শিক্ষকগণকে দূরে থাকিতে হইবে। তাহার পর হইতে যদিচ শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বাস করিতেছেন তবু তাঁহারা তাহাদের জীবন-যাত্রা-প্রণালীতে সাক্ষাৎ ভাবে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না। সে-ভার সম্পূর্ণরূপে স্কুল গেমাইণ্ডে এবং ছাত্র-অভিভাবক-গণের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ছাত্র-অভিভাবকগণ প্রায়ই একত্র হইয়া তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সে আলোচনায় পরামর্শদাতা রূপে গেহেব বা তাঁহার স্ত্রী উপস্থিত থাকেন এবং কার্য্যপরিচালনায় সহায়তা করেন।

ছেলেদের ব্যায়াম ও খেলা

গেহেব শুধু বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনে স্বনিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্ত্তন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও তিনি এই নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারেও যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। ওডেন্‌ভাল্‌ড বিদ্যালয়ে শিক্ষার এক নূতন প্রণালীর পরিচয় পাইলাম। মাসে মাসে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এক একটা কোর্সের ব্যবস্থা আছে; শিক্ষকগণ সে মাসে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। ছেলে-মেয়েরা তাহাদের প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুযায়ী তাহারই মধ্যে কয়েকটা বিষয় বাছিয়া লয়। তাহাদের নির্ব্বাচনে শিক্ষকগণ সহায়তা করেন কিন্তু এ-বিষয়ে ছাত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। উদাহরণ দিই; মনে করুন অক্টোবর মাসে জীববিজ্ঞান, অঙ্ক, ইংরেজী ও ইতিহাস এই চারিটি বিষয়ে পড়ান হইবে। একজন ছাত্র হয়ত ইতিহাসের পাঠ্য অনেকখানি শেষ করিয়াছে; সে এরূপ ব্যবস্থায় এ মাসে ইতিহাস না পড়িয়া সে-সময়ে অন্য কিছু আলোচনা করিতে পারে। এই কোর্সগুলি এমন ভাবে ব্যবস্থা করা হয় যে, সারা বৎসরেই সকল বিষয়ে যতটুকু পড়ান প্রয়োজন, ততখানি বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে পড়াইয়া শেষ করা হয়। একটানা ভাবে সারা বৎসর ধরিয়া কোন বিষয় পড়ান হয় না। ফলে একজন ছাত্র রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয় বাছিয়া পড়িতে পড়িতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত পড়াই শেষ করে কিন্তু কোন সময়ে বাহিরে শিক্ষকের চাপ বোধ করে না।

এই বিদ্যালয়ে নানারূপ হাতের কাজকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। ছুতারের কাজ, লোহার কাজ, যন্ত্রের কাজ, চিত্রাঙ্কণ, মাটির কাজ, বই বাঁধাই প্রভৃতি

নানা রকম ব্যবস্থা আছে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাহার যেমন রুচি সে তেমন কাজ শিখিয়া লয়। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ছাপাখানায় ছেলেমেয়েরাই কাজ করে। তাহাদের একটি মাসিক পত্র আছে; তাহা পরিচালনার ভারও ছেলেমেয়েদেরই উপর। বাগানের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; য়ুরোপের সকল দেশেই দেখিয়াছি, সেখানকার

বিদ্যালয়ের তিনটি শিশু

লোক ফুল ভালবাসে। অতি দরিদ্র কৃষকও বাড়ির পাশে দুটি ফুলগাছ রাখে। ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ের বাগানে ছেলেমেয়েরা নানারকম ফুলের চাষ করে; তাহা ছাড়া তরিতরকারি শাকসব্জী চাষের ব্যবস্থাও আছে। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ফলবাগানে প্রচুর ফল হয়। সে-গুলির রক্ষণাবেক্ষণের (এবং তাহার চেয়ে বেশী ভক্ষণের) ভারও ছেলেমেয়েরা কিছু পরিমাণে লইয়াছে।

মানুষ সৃষ্টি করিতে চায়; অতি ছোট শিশুর মধ্যেও এই আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করে। সাধারণ বিদ্যালয়ে মানুষের সেই স্বাভাবিক সৃজনীবৃত্তির বিকাশের কোন আয়োজনই নাই। লেখাপড়ার মধ্যে অন্ততঃ বিদ্যালয়-জীবনে কতটুকুই আত্মপ্রকাশ করা চলে। সেইজন্যই যাহাতে এই বৃত্তির বিকাশের সহায়তা হয়, এরূপ প্রচুর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। গেহেব ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ শিক্ষার এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন।

শিক্ষাকে সমগ্রভাবে দেখিলে তাহার মধ্যে খেলার ও আনন্দ-উৎসবের আয়োজন রাখিতে হয়। ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ে খেলার ব্যবস্থা যথেষ্ট আছে; কিন্তু ইংলণ্ডে যেমন সে ব্যবস্থা অনেক সময়ে মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, এখানে তেমন হয় নাই। বাগানে, রঙ্গমঞ্চনির্ম্মাণে, ও অন্যান্য ভাবে ছেলেমেয়েরা একত্রে মিলিয়া যে-সকল কাজ করে, সেগুলিকেও খেলার অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। এরূপ কাজের মধ্যেও খেলার ভাবটি আসিয়া পড়িয়াছে। ফলে ছেলেমেয়েরা আপনার আনন্দে কাজ করে।

বিদ্যালয়ে নানারূপ আনন্দ-উৎসবের আয়োজন আছে। বৎসরের মধ্যে একটি বিশেষ দিন আছে যখন বিদ্যালয়ের সকলে নানারূপ ছদ্মবেশ করিয়া নির্ম্মল আমোদ-কৌতুক করে। তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে অভিনয়ের ব্যবস্থাও আছে। কখনও বা তাহার জন্য গৃহের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করা হয়, কখনও প্রকৃতির সুন্দর বক্ষে উন্মুক্ত স্থানে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। আমি থাকিতে ছেলেমেয়েরা একদিন এইভাবে শেক্সপীয়রের একটি নাট্য অভিনয় করিল। খৃষ্ট-জন্মোৎসবের সময় প্রতিবৎসর ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ে সকলে মিলিয়া খৃষ্টের জন্মকাহিনীর বা জীবনের কোন ঘটনা অবলম্বন করিয়া অভিনয় করেন। গত বৎসরের অভিনয়ের একটি ছবি এই প্রবন্ধে দেওয়া হইল।

জার্ম্মান জাতি গান ভালবাসে। বিদ্যালয়ে প্রায়ই গানের মজলিস বসে ও সকলেই তাহাতে যোগদান করে। য়ুরোপে দুই রকম গান প্রচলিত আছে, এক রকম ক্ল্যাসিক গান, অপর অপেক্ষাকৃত তরলপ্রকৃতির সাধারণ চলিত গান। জার্ম্মানীতে ক্ল্যাসিক সঙ্গীতেরই আদর বেশী। এই বিদ্যালয়েও সেই শ্রেণীর গানেরই ব্যবস্থা আছে।

বিদ্যালয়ের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার প্রণালী একান্ত সহজ ও সরল। ছেলেমেয়েরা ও শিক্ষকগণ সকলেই খুব সাধারণ পোষাক পরিয়া থাকেন। দিনের অধিকাংশ সময়েই তাঁহারা খোলা হাওয়ায় কাটান। তাহাদের খেলাধূলা, ব্যায়াম, এমন কি পড়াশুনাও অনেক সময়েই উন্মুক্ত স্থানেই চলে। বিদ্যালয়ের চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর। প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেমেয়েদের প্রতিমুহূর্ত্তেই পরিচয় হইতেছে। জীবন গঠনের দিক দিয়া এরূপ পরিচয়ের মূল্য কম নহে।

জার্ম্মান ছেলেমেয়েরা বেড়াইতে খুব ভালবাসে। সে-

দেশের ভাণ্ডারফোগেল (wandervogel)-এর কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। ছুটির সময় ছেলেমেয়েরা দল বাঁধিয়া বাহির হইয়া পড়ে, সঙ্গে হয়ত কিছু আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া লয়; তাহার পর কয়েক দিন গান গাহিয়া, খেলা করিয়া, পল্লীঅঞ্চলে বা পাহাড়ে-পর্ব্বতে ঘুরিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কাজে মন দেয়। ইঁহাকে সেখানে ভাণ্ডারুং (wanderung) বলা হয়। ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে এইরূপ ভাণ্ডারুঙের ব্যবস্থা আছে। একবার প্রায় ত্রিশ জন ছেলেমেয়ের সঙ্গে নিকটস্থ পাহাড় অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমাদের দলে নয় বৎসরের বালিকা হইতে প্রবীণ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই ছিল। সকলের পিঠে একটি রুক্স্যাক্ বা ঝুলি; তাহাতে কয়েকটি কাপড় জামা, কিছু খাবার ও রাত্রে শুইবার জন্য থলি। যেখানে বেড়াইতে যাইতেছিলাম সেখানে মাঝে মাঝে চটি আছে; রাত্রে সেইখানেই আশ্রয় লইতে হয়। বিছানা ত সব সময়ে পাওয়া যায় না, তাই এইরূপ শুইবার থলির ব্যবস্থা। কয়েক দিন পাহাড়ে পাহাড়ে খুব ঘুরিলাম; ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিল; কিন্তু শ্রমও কম হয় নাই। ফিরিয়া দুই-এক দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে হইল। আমরা যখন ভাণ্ডারুঙে গেলাম তখন বিদ্যালয়ের আর এক দল অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেমেয়ে, দূরে গ্রামে কৃষকদের আঙুরের ফসল কাটিবার সাহায্য করিতে গেল। চাষীরা এরূপ সাহায্য সাগ্রহে লয়। ছেলেমেয়েরা তাহাদের সঙ্গে মাঠে একত্রে পরিশ্রম করে; কোন কোন দিন দশ-বার ঘণ্টা পর্য্যন্ত খাটিতে হয়। কিন্তু তাহাতেই তাহাদের আনন্দ। এই সময়ে যখন সকলে দলে দলে ভাণ্ডারুঙে বাহির হয়, দু-এক দল ছেলে এইভাবে কোন পল্লীতে গিয়া কাজ করে। জাতীয় জীবন ও চরিত্রগঠনে এরূপ ব্যবস্থার মূল্য কতখানি তাহা উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে।

একটি ক্লাস

এখানে একটি সুন্দর ব্যবস্থা দেখিলাম। বিদ্যালয়ের সকলেই একত্রে ভোজন করে। ভোজনের পূর্ব্বে কিছু-ক্ষণের জন্য শিক্ষকগণ একত্র সমবেত হইয়া ছাত্রদের সম্বন্ধে আলোচ্য কিছু থাকিলে আলোচনা করেন। ভোজনের পরেও সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সকলকে পাঁচ মিনিট কাল উপস্থিত থাকিতে হয়। ভোজনারম্ভের পূর্ব্বে পাওলাস কোন গ্রন্থ হইতে দু-এক লাইন পড়িয়া শোনান। খৃষ্টানদের মধ্যে এই সময়ে নিবেদন করিবার বা গ্রেস (grace) বলিবার প্রথা আছে। এখানে সেই প্রথাই এই রূপ ধারণ করিয়াছে। ভোজনের ব্যবস্থা খুবই সাধারণ, কিন্তু পুষ্টিকর। অন্যান্য বিদ্যালয়ে যেরূপ আড়ম্বর আছে এখানে তাহার কিছুই দেখিলাম না।

এখানকার আর একটি ব্যবস্থা আমার বড় ভাল লাগিল। প্রতি রবিবার প্রাতে সেখানে উপাসনার ব্যবস্থা আছে। এই উপাসনা আন্‌ডাক্‌ট (andacht) নামে অভিহিত হয়। ইহার প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। যাহারা সাধারণভাবে উপাসনা করিতে চাহে তাহারা নিকটস্থ গ্রামের ভজনালয়ে যায়, কিন্তু এরূপ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা

কম। অধিকাংশই আনুডাক্‌টে যোগ দেয়। সেখানে উপাসনার কোন ধরাবাঁধা পদ্ধতিই নাই, এমন কি গোঁড়া মতে সেটাকে উপাসনা বলা চলে কি-না সন্দেহ। কোনদিন হয়ত সেখানে শুধু সঙ্গীতই হইল, কোনদিন গেহেব (তিনি বিদ্যালয়ে পাওলাস্ (Paulus) নামে পরিচিত) কোন পুস্তক হইতে কিছু পড়িয়া শোনাইলেন। এরূপ গ্রন্থ সকল সময়ে যে ধর্ম্মগ্রন্থ হয় তাহা নহে। একদিন দেখি, তিনি টলষ্টয়ের তেইশটি গল্পের একটি গল্প পড়িতেছেন। আর একদিন দেখিলাম, তিনি ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রাণীদের একটি গল্প পড়িয়া শোনাইলেন।

গেহেব আদর্শবাদী, বিশ্বপ্রেমিক। তিনি শান্তিবাদী, যুদ্ধে বিশ্বাস করেন না। ভারতীয় সভ্যতার প্রতি, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা। গেহেব মনে করেন বিশ্বের দুঃখ দূর করিতে হইলে সমাজকে নূতন ভাবে নূতন আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে; সেই সমাজগঠনের মূলকথা স্বাধীনতা ও সহযোগিতা। ভাবীকালের উপযোগী স্বাধীনচিত্ত, চলিষ্ণুমন, বলিষ্ঠদেহ মানুষ গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষার নূতন আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষার সেই আদর্শকেই তিনি ওডেনভাল্‌ড্ বিদ্যালয়ে রূপ দিতে চেষ্টা করিতেছেন।

সংবাদ পাইলাম জার্ম্মানীর বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সহিত মতের মিল না হওয়ায় পর গেহেবকে ওডেনভাল্‌ড্ও ছাড়িতে হইয়াছে।

তন্ত্রের সাধনা

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ

মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্ম ও মদ্য মাংস মৎস্য প্রভৃতি পঞ্চ 'ম'কার—এই সকলের জন্য তান্ত্রিক-ধর্ম্ম আধুনিক যুগে দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতসমাজে বিশেষ ভাবে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান কালে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা জাগরণের ফলে ভারতের প্রাচীন সর্ব্ববিধ সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হইলেও তন্ত্রসাহিত্যের অনুশীলন নিরতিশয় মন্দীভূত। তাহার কারণ একদিকে এই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা, অন্যদিকে তন্ত্রশাস্ত্রের স্বাভাবিক দুর্ব্বোধ্যতা। বস্তুতঃ কিছুদিন পূর্ব্বেও তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনা করা যেন একটা লজ্জার বিষয় ও কুরুচির পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইত। তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক আচারের বিলোপ অনেক চিন্তাশীল মনীষীরও কাম্য ছিল। তন্ত্রশাস্ত্রের নিন্দায় অনেকে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তন্ত্র ছদ্মবেশী কামশাস্ত্র—দুর্নীতি প্রচারের জন্যই এই শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল—এইরূপ নানা কথা তন্ত্র সম্বন্ধে অবাধে প্রচার করা হইত।

সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্র সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া কেহ এই জাতীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন এরূপ বলিতে পারা যায় না। বিশাল তন্ত্রশাস্ত্রের আংশিক আলোচনা এবং কতকগুলি তান্ত্রিক আচারের আপাতদৃষ্টিতে বিচারের ফলেই এই সব মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। একদেশদর্শী না হইয়া এবং পূর্ব্ব হইতেই কোন বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ না করিয়া যে-কেহ ধৈর্য্যসহকারে তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা করিলেই পূর্ব্বোল্লিখিত মতবাদের অসারতা, অন্ততঃ অতিরঞ্জন, স্বতঃই প্রতিপন্ন হইবে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য তন্ত্র নামে যাহা কিছু চলিতেছে এবং তন্ত্রের নামে যে-কোনরূপ আচারই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা সকলই ভাল—তন্ত্রের অতিবড় পৃষ্ঠপোষকগণও এরূপ কথা বলিবেন না। তন্ত্র নামে প্রচলিত সমস্ত গ্রন্থেরই প্রামাণিকতা কোনও তান্ত্রিক আচার্য্যই স্বীকার করেন না। তন্ত্রের নাম দিয়া অনেকে নানা সময়ে যে-সমস্ত কুৎসিত আচরণ করিয়া থাকেন তাহারও কেহ প্রশংসা করেন

না। প্রামাণিক গ্রন্থের মধ্যেও কালক্রমে অনেক অপ্রামাণিক অংশ প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তাহা ছাড়া হিন্দুর সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানের ন্যায় তান্ত্রিক অনুষ্ঠানেরও অধিকারভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে। সকল আচার সকলের পক্ষে বিহিত নহে। অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান কোনও আচার সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য বিহিত হইলে তাহারই জন্য সমস্ত শাস্ত্রকে অসঙ্গত বলা চলে না। তন্ত্র আলোচনার সময় এই সমস্ত গোড়ার কথা ভুলিলে চলিবে না। এই সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি না দিয়া তন্ত্র আলোচনা করিলে পদে পদে বিতৃষ্ণা জাগিতে পারে—ভালমন্দের বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়া চিত্ত সংশয়াকুল হইয়া উঠিতে পারে।

অবশ্য তন্ত্রগ্রন্থের প্রামাণ্য সম্বন্ধে তান্ত্রিকাচার্য্যগণের মধ্যে যে প্রবল মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অনেক সময় সাধারণ পাঠকের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। এক সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী লোক আর এক সম্প্রদায়ের গ্রন্থকে অপ্রামাণিক ও দুষ্ট প্রতিপন্ন করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। একই গ্রন্থ এইরূপে এক দলের মতে প্রামাণিক ও বিশুদ্ধ এবং অন্য দলের মতে অপ্রামাণিক ও দুষ্ট।[১] তবে প্রকৃতপক্ষে ও সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে অপ্রামাণিক গ্রন্থগুলিকে বাছিয়া পৃথক্ করিয়া লওয়াও একেবারে অসম্ভব নয়—একটু অনুশীলন করিলেই তাহা সম্ভবপর হইতে পারে।

এইরূপে তন্ত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তন্ত্রের কতকগুলি এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা আদৌ উপেক্ষার বিষয় নহে। তন্ত্রোক্ত উপাসনা-পদ্ধতি দার্শনিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত। উপাস্য ও উপাসকের—ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্যানুভূতির সহায়তা করা এই উপাসনাপদ্ধতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই বিশ্বজগৎ ভগবানের অভিব্যক্তিমাত্র—এই জগতের সমস্ত পদার্থ, বিশেষতঃ মানব-শরীর, দৈবী শক্তিতে পরিপূর্ণ এইরূপ ধারণা উপাসকের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার জন্যই তান্ত্রিক উপাসনায় ন্যাস ও অন্তর্যাগাদির বিধান করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নিরর্থক শব্দ-সমষ্টি বলিয়া যে তান্ত্রিক মন্ত্রগুলিকে আধুনিক পণ্ডিতগণ উপহাস করিয়া থাকেন সেই মন্ত্রগুলিরও এইরূপ দার্শনিক ব্যাখ্যা তান্ত্রিকসমাজে প্রচলিত আছে। সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক, শব্দরাশিকে তান্ত্রিকগণ বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। শব্দই দেবতার স্বরূপ—শব্দই ব্রহ্ম—এই তাঁহাদের মত। বস্তুতঃ তান্ত্রিক উপাসনার প্রতি অঙ্গেই এইরূপ দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তান্ত্রিক দর্শনও একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক সম্প্রদায়। সংখ্যাদি দর্শনে যেরূপ কতকগুলি তত্ত্ব আছে, তান্ত্রিক দর্শনেও সেইরূপ বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা আছে। বেদান্তাদি দর্শনের সহিত ইহার সম্পর্কও বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। মনে হয়, বেদান্তের সহিতই ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; বেদান্তের অদ্বৈতবাদ তন্ত্রে প্রতিপদে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর হইবে না। পৃথক্ প্রবন্ধে স্বতন্ত্রভাবে সে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

তন্ত্রের উপর সাধারণের যে বিরাগ উহা তন্ত্রোপাসনার উল্লিখিত বা তজ্জাতীয় বিধানসমূহের জন্য নহে। জন-সাধারণের রুচিবিগর্হিত কতকগুলি এরূপ আচার তন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে সর্ব্বসম্মত নীতিমার্গের পরিপন্থী বলিয়া মনে হওয়া মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। যে-শাস্ত্রে পঞ্চ 'ম'কারের নির্বাধ উপভোগের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়—যে-শাস্ত্রে মারণ উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি পরের অনিষ্টসাধক ষট্‌কর্ম্মের বিধান রহিয়াছে, সে শাস্ত্রের প্রতি সাধারণের একটা অবজ্ঞার ভাব উৎপন্ন হওয়া আদৌ বিচিত্র নহে। তবে এরূপ অবজ্ঞা পোষণ করার পূর্ব্বে এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাগুলি ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করা দরকার। এইরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সমস্ত আচারের যতই দোষ থাকুক না কেন, এ-সম্বন্ধে নানা গ্রন্থে যে-সকল বিধি-ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা দুর্নীতির পরিপোষক নহে, জনসাধারণকে অসৎপথে পরিচালিত করাও তাহাদের উদ্দেশ্য নহে। পক্ষান্তরে, এইগুলির মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক

১। এ সম্বন্ধে 'হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা'য় প্রকাশিত মল্লিখিত 'তন্ত্রের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা ছিল শাস্ত্রকারদিগের প্রধান লক্ষ্য। অবশ্য এই জাতীয় আচারের মধ্য দিয়া সাধনার পথে একটুও অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর কিনা সে বিষয়ে মনে স্বতই সংশয় জাগরিত হয়। অথচ, ঈদৃশ আচার কেবল তন্ত্রশাস্ত্রেই যে বিহিত তাহা নহে। বিভিন্ন দেশে আদিম ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ বা ইতোহধিক ঘৃণাকর-জনক আচারের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দেশের কথা জানি না তবে তন্ত্রের এই জুগুপ্সিত আচারের অনুবর্ত্তী প্রকৃত সাধকও একান্ত দুর্ল্লভ নহেন। বামাক্ষেপা সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষের মহত্ত্ব সম্বন্ধে কেহ সন্দিহান নহেন—অথচ তাঁহারা এই সমস্ত আচারের মধ্যে অন্ততঃ কোন কোনটির অনুসরণ করিতেন। শক্তির উপাসক যাঁহারা, তাঁহারা ভোগের মধ্য দিয়াই মোক্ষের পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন—একথাও তন্ত্রশাস্ত্রে স্পষ্টতই পাওয়া যায় (উমাপদাম্ভোজযুগার্চ্চনে তু ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব)। তাই বলা হইয়াছে, 'যৈরেব পতনং দ্রব্যৈর্মুক্তিস্তৈরেব সাধনৈঃ' অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ সাধারণতঃ মানুষের অধঃপতন আনয়ন করে, তন্ত্রশাস্ত্রের মতে, তাহারাই (স্থলবিশেষে) মুক্তি প্রদান করে। অতএব, তন্ত্রের এই পথের রহস্য যোগীদিগেরও অগম্য (কৌলো মার্গঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ।)

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত হার্টল্যাণ্ড (Hertland) তাঁহার Sex-worship নামক প্রবন্ধে (Encyclopaedia of Religion and Ethics গ্রন্থে প্রকাশিত) এই বিষয়গুলিকে উপেক্ষা না করিয়া ইহাদের সশ্রদ্ধ আলোচনার যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যে যাহাই বলুন না কেন, আমাদের সন্দেহ মিটিতে চাহে না—বুঝিয়া উঠিতে পারি না, কি করিয়া অন্যত্র সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঘৃণিত বলিয়া পরিচিত এই সমস্ত আচার মানুষের কোনরূপ উন্নতি সাধন করিতে পারে।

তবে এই আচারগুলি যে অসদুদ্দেশ্যে প্রচারিত হয় নাই তাহার ইঙ্গিত তন্ত্রের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভোগবহুল এই সমস্ত তান্ত্রিক আচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি উচ্ছৃঙ্খলতায় এবং ব্যসনে, তান্ত্রিক আচার্য্যগণ একথা বিশেষভাবেই বুঝিতেন। তাই এ পরিণতি যাহাতে উপস্থিত না হয় এজন্য তাঁহারা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। অসংযম বা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশলাভ করিলে এই আচারগুলি উন্নতির দিকে না লইয়া অবনতির পথে নামাইয়া দেয় এ-কথা তাঁহারা স্পষ্ট উল্লেখ করিতে অনুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। অর্থলোভে, কামনাবশতঃ অথবা সুখলোভে যে-সকল লোক এই সমস্ত আচরণে যোগদান করেন তাঁহাদিগকে রৌরব নরকে গমন করিতে হয়।[১] শুদ্ধমাত্র ভোগলিপ্সায় যিনি মদ্যপান করিবেন তাঁহার জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। উত্তপ্ত মদ্যের দ্বারা যদি তাঁহার মুখ দগ্ধ করিয়া দেওয়া হয় তবেই তিনি শুদ্ধ হইবেন, অন্যথা নহে।[২] ভাগবতপুরাণকার বলিয়াছেন—মদ্যাদি-ব্যবহারের প্রবৃত্তি লোকের মধ্যে স্বতই বর্ত্তমান। ধর্ম্মলাভের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহারের বিধান করিয়া শাস্ত্রকারেরা সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে কতকটা নিয়মিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।[৩]

কিন্তু এ-কথাও স্থির যে, যে-উদ্দেশ্যেই ভোগমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করা হউক না কেন, ভোগলালসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেই থাকে এবং ইহা মানুষকে সমস্ত উচ্চ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট করে। তাই তান্ত্রিক আচার্য্যগণ সাধারণ সাধকের জন্য এই ভোগমার্গের বিধান করেন নাই, চরম সাধকের জন্যই এই চরম মার্গের বিধান। বোধ হয় চরম সাধক লোভমোহাদি রিপুর হস্ত হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারেন তাহারই পরীক্ষার জন্য—

১। অর্থাদ্বা কামতো বাপি সৌখ্যাদপি চ যো নরঃ।
লিঙ্গযোনিরতো মন্ত্রী রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
—তন্ত্রসার (কুলাচার-প্রকরণ)

এই প্রসঙ্গে গন্ধর্ব্বতন্ত্রের ৩৭শ পটলের উক্তিগুলিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য

২। সুরাপানে কামকৃতে জ্বলন্তীং তাং বিনিক্ষিপেৎ।
মুখে তয়া বিনির্দ্দগ্ধে ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥
—কুলার্ণব ২।১২৯

৩। লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥
—ভাগবতপুরাণ ১১।৫।১১

সর্ব্বপ্রকার বিকারের মধ্যেও যিনি আবিকৃত তিনিই প্রকৃত সাধক—প্রকৃত বীর—এই সত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য এইরূপ বীভৎস সাধনপ্রণালীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। যিনি এই সাধনপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে সাহস করিতেন, তাঁহাকে বলা হইত বীর; কারণ, অনন্যসাধারণ শক্তির অধিকারী না হইলে কেহ এ-পথের পথিক হইতে পারে না। যে মদ্য দেবতাগণেরও মত্ততা আনয়ন করে সেই মদ্য যাহাকে বিকৃত করে না তিনিই প্রকৃত তান্ত্রিক।[১] এ-পথে যে প্রতি পদে বিপদ্ ও পতনের সম্ভাবনা, সুতরাং সাধারণের পক্ষে এ-পথ অবলম্বন করা যে শ্রেয়স্কর নহে সেদিকে তান্ত্রিক আচার্য্যগণ বিশেষ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রকৃত অধিকারী ছাড়া—কুলমার্গের অনুবর্ত্তীগণ ব্যতীত আর কেহই এ পথ অবলম্বন করিবেন না—ইহাই হইল সাধারণ নির্দেশ। উপযুক্ত গুরুর নিকট হইতে এই সাধনপদ্ধতির গূঢ় রহস্য ও ক্রম না জানিয়া যে-ব্যক্তি নিজে নিজেই ইহার সাহায্যে সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে ত পারেই না, পক্ষান্তরে শুধু হাতে সাঁতার দিয়া অপার সমুদ্র পার হইতে গেলে যেরূপ উপহাসাস্পদ হইতে হয় সেইরূপ হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে।[২] খড়্গধারার উপর দিয়া গমন করা, বাঘের গলা জড়াইয়া ধরা, সাপ ধরিয়া রাখা প্রভৃতি সমস্ত দুষ্কর কার্য্য অপেক্ষা দুষ্কর—একরূপ অসাধ্য—এই সাধনপথ।[৩] সুতরাং সাধারণের পক্ষে এ-পথ অবলম্বন করা আদৌ বিধেয় নহে। শাস্ত্রের এই সকল স্পষ্ট উক্তি অনুধাবন করিলে কাহারও মনে কি এরূপ সন্দেহ জাগিতে পারে যে সাধারণকে অসৎ পথে প্ররোচিত করিবার জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি?

তারপর, তন্ত্রের এই সমস্ত আপত্তিজনক আচার সকল সম্প্রদায়ের জন্য বিহিত নহে এবং কোন কোন সম্প্রদায় এই সমস্ত আচারের রূপক ও আধ্যাত্মিক অর্থ কল্পনা করিয়া ইহাদের বিরুদ্ধে সকল আপত্তির মূল উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুরশ্চর্য্যার্ণবাদি গ্রন্থের মতে এই সমস্ত আচার ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের স্বাভাবিক নৈতিক উৎকর্ষই বোধ হয় এইরূপ নিষেধের নিদান। বিভিন্ন নিম্নজাতির নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্যই বোধ হয় মূলতঃ এই সব আচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। নানা দেবতার মধ্যে তারার উপাসনায় এই জাতীয় আচার বা বামাচার অবশ্য-পালনীয় এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু নিজ গাত্রের রুধির দান প্রভৃতি কার্য্য আবার এই উপাসনায়ও এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যে শাক্তদিগের মধ্যে এই সকল আচারের একচ্ছত্র আধিপত্য, তাঁহাদেরও সকল সম্প্রদায় ইহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। কাপালিক, ক্ষপণক, দিগম্বর প্রভৃতি কৌল সম্প্রদায়ের আচার তান্ত্রিকাচার্য্য লক্ষ্মীধর তাঁহার আনন্দলহরীর টীকায় বিশেষভাবে নিন্দা করিয়াছেন। তিনি সময়াচারের অনুবর্ত্তী। সময়মতে এবং পূর্ব্বকৌল-মতে আন্তর যাগ বা মানসপূজারই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোনরূপ জুগুপ্সাজনক আচার তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। অনেক স্থলে এই সমস্ত আচারের রূপক অর্থ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সময়মতে তান্ত্রিক পূজার বাহ্যিক অনুষ্ঠান একেবারেই আদৃত হয় নাই। লক্ষ্মীধর বলিয়াছেন—সময়মতে মন্ত্রের পুরশ্চরণ নাই, জপ নাই, বাহ্য হোম নাই, বাহ্য পূজা নাই; এই মতে হৃৎকমল-মধ্যেই সমস্ত পূজার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে, মানস ধ্যানই এই পূজার প্রধান অঙ্গ এবং ইহা যে অতি উচ্চ অঙ্গের উপাসনা ও সকল উপাসনার আদর্শভূত তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তন্ত্রের অনতিপরিচিত পরানন্দমতাবলম্বিগণের সাধনপদ্ধতির মধ্যেও অনেক উচ্চস্তরের বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তান্ত্রিক উপাসনা হইলেও ইহাতে হিংসা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই সম্প্রদায়ের মতবাদগুলি বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

১। অহো পীতং সুরাদ্রব্যং মোহয়েত্ত্রিদশানপি।
তস্মাদ্যং কৌলিকঃ পীত্বা বিকারং নাপ্নুয়াত্তু যঃ।
মন্ত্রাণৈক পরো ভূয়াৎ স ভক্তঃ স চ কৌলিকঃ॥
পরানন্দমত (বরোদা) পৃঃ ১৬

২। কুলধর্ম্মমজানন্ যঃ সংসারান্মোক্ষমিচ্ছতি।
পারাবারমপারং সঃ পাণিভ্যাং তর্ত্তুমিচ্ছতি—
কুলার্ণব ২।৪৭

৩। কৃপাণধারাগমনাদ্ ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ।
ভুজঙ্গধারণান্নূনমশক্যং কুলবর্ত্তনম্॥ —কুলার্ণব ২।

তান্ত্রিক আচারের যে আধ্যাত্মিক অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে তাহাও উল্লিখিত উৎকৃষ্ট সাধনপদ্ধতির প্রতিকূল নহে। মৎস্য, মাংস প্রভৃতি পঞ্চ 'ম'কারেরই এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। তবে এক এক শব্দের নানারূপ অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন যে পরমব্রহ্ম তাঁহার পূর্ণানন্দময় জ্ঞানকেই মদ্য বলে।[১] যে কর্ম্ম দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা হয় তাহারই নাম মাংস।[২] ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যস্থিত বায়ুকে যিনি নিরুদ্ধ করিতে পারেন তিনিই মৎস্যসাধক।[৩] এই সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অসাধু পদার্থকে সাধুভাবে দেখাইবার একটা ব্যর্থ চেষ্টামাত্র মনে হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মধ্যে জ্ঞান ও যোগমার্গের যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা তন্ত্রবিরোধী নহে। সুফী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু শাস্ত্রের নির্দ্দেশ যাহাই হউক না কেন, অনেকেই সেই নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করিতেন না বা করিতে পারিতেন না। তান্ত্রিক আচারের অনুষ্ঠানপ্রসঙ্গে বা এই অনুষ্ঠানের ব্যপদেশে অনেকে উচ্ছৃঙ্খল হইতেন—মদ্য-মাংসাদির অযথা বহুল ব্যবহারে লিপ্ত হইতেন এবং জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করিয়া বিরক্তির ভাজন হইতেন। তারপর, অনেক তন্ত্রগ্রন্থে নানারূপ অতিকুৎসিত অনুষ্ঠানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য নহে—উহ যে অর্থবাদমাত্র; ঐ সব অনুষ্ঠানেই যে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে, অনভিজ্ঞ সাধারণে তাহা বুঝিতে পারিত না। লোকে ভাবিত—মদ্যাদিসেবন তান্ত্রিক উপাসনার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। এক দল অসাধু চরিত্রের লোক এইরূপ মতবাদ যে প্রচার করে নাই তাহাও বলা যায় না। প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের মধ্যে এই জাতীয় কথা প্রক্ষিপ্ত করা অথবা এই সব মতবাদ তন্ত্রাকারে রচিত গ্রন্থের মধ্য দিয়া প্রচার করা খুবই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় এবং অনেকে এরূপ করিতেন বলিয়াও আশঙ্কা হয়। বস্তুতঃ, কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে এ-জাতীয় ব্যাপারের উল্লেখও যে না-পাওয়া যায় এমন নহে। কুলার্ণবে বলা হইয়াছে—সম্প্রদায়বর্জ্জিত ও গুরূপদেশরহিত অনেকে নিজবুদ্ধি অনুসারে কৌলধর্ম্মের কল্পনা করিয়া থাকেন।[১]

যামুনাচার্য্য তাঁহার আগমপ্রামাণ্য নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন[২]—আজও পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ তান্ত্রিকতার ভাণ করিয়া তন্ত্রবিরোধী বস্তুসমূহ প্রচার করিয়া থাকেন। এই সব কারণেই বোধ হয় তন্ত্রে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে অতি নীচ ও কুৎসিত বিষয়সমূহের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে, লক্ষ্মীধর, ভাস্করাচার্য্য প্রমুখ শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিকাচার্য্যগণকর্ত্তৃক একবাক্যে নিন্দিত এই সমস্ত বিষয়ের জন্য সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রকে দোষী সাব্যস্ত না করিয়া তন্ত্রের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য তন্ত্রসাহিত্যের বহুল প্রচার ও সুনিয়ন্ত্রিত, সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনা হওয়া দরকার। এই সমালোচনার ফলে প্রতিগ্রন্থের প্রকৃত স্বরূপ ও সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে ইহার আপেক্ষিক অবস্থান নির্ণীত হইবে—তন্ত্রের নিগূঢ় তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু তন্ত্রসাহিত্য বিশাল—ব্যাপকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত এ-কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। আশার বিষয়, কোন কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান-বিশেষের দৃষ্টি এ-দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং অপাংক্তেয় তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে।

১। যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারং নিরঞ্জনম্।
তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥ (বিজয়তন্ত্র)

২। মাং সনোতি হি যৎ কর্ম্ম তন্মাংসং পরিকীর্ত্তিতম্।
ন চ কায়প্রতীকন্তু যোগিভির্মাংসমুচ্যতে॥ (বিজয়তন্ত্র)

৩। গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥ (আগমসার)

১। বহবঃ কৌলিকং ধর্ম্মং মিথ্যাজ্ঞানবিড়ম্বকাঃ।
স্ববুদ্ধ্যা কল্পয়ন্তীত্থং পারম্পর্য্যবিবর্জ্জিতাঃ॥ কুলার্ণব ২।১১৬

২। অদ্যত্বেঽপি হি দৃশ্যন্তে কেচিদাগমিকচ্ছলাৎ।
অনাগমিকমেবার্থং ব্যাচক্ষাণা বিচক্ষণাঃ॥ (পৃ. ৪)

মুক্তি

শ্রীআশালতা দেবী

(১১)

"না যা হয়েছে তা ফেরাবার যো নেই বটে—" চন্দ্রকান্ত দেখিলেন ঘিয়ের পাত্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুশীলা অনায়াসে বলিয়া যাইতেছেন, "এখন নেই, কিন্তু যখন হাত ছিল তখন এ-সব কথা তোমার আগাগোড়া একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল বইকি। আশীর্ব্বাদ হয়ে গেছে, এখন আর কি করবে? তাই ব'লে মন খারাপ করে থেকেও কোন লাভ নেই। হয়ত আমরা যা মনে করছি তা হবে না, ভালই হবে। অদৃষ্টের কথা কে বলতে পারে? আর মেয়েমানুষের সমস্তটাই যে অদৃষ্টের কাছে বাঁধা দেওয়া। তুমি আমি ভেবে আর কি করতে পারি বল?"

সুশীলা কোন এক সুদূরবর্ত্তী অজানা অদৃষ্টের হাতে সকল ভার সঁপিয়া দিয়া শান্ত মনে গৃহস্থালীর কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু চন্দ্রকান্ত পারিলেন না মনকে শান্ত করিতে। তখন যাহার চিন্তায় তাঁহার মন ভরিয়াছিল, তাঁহার অধীর হৃদয়, উৎসুক দৃষ্টি তাহাকেই যেন খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। নির্ম্মলা নিকটে কোথাও ছিল না, বাহিরের ঘরেও তাহার দেখা মিলিল না। রাত অনেক হইয়াছে, সে তবে বোধ হয় শয়ন করিয়াছে মনে করিয়া চন্দ্রকান্ত একটা চেয়ারে বসিয়া চুপচাপ নিজের মনে সুশীলার কথাগুলি আর একবার উন্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি, তেমন সময়েও বদ্ধঘরে তাঁহার কেমন গরম গরম করিতে লাগিল। ছাদের খোলা হাওয়ায় শয়নের আগে প্রত্যেক দিন তিনি খানিকটা করিয়া বেড়ান। আজ ছাদে আসিয়া দেখিতে পাইলেন ছাদের একপ্রান্তে আলিসায় ভর দিয়া সাদা শাল গায়ে জড়াইয়া নির্ম্মলা অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রকান্ত নিঃশব্দে তাহার পিছনে গিয়া তাহার মাথায় একটি হাত রাখিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দু-জনেই চুপ করিয়া থাকিলেন। তাহার পরে নির্ম্মলা আস্তে আস্তে কহিল, "আমি বুঝতে পারছি কয়েক দিন থেকে তুমি মনে মনে কি যেন ভাবচ। মনে তোমার একটা ভার লেগেই রয়েছে। তুমি কিছুতেই সুস্থির হ'তে পারছ না। কিন্তু কেন তোমার এ ভাবনা বাবা? তুমি ভাল বুঝে আমার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করবে তাতেই আমার ভাল হবে। আমার তাতে কোন মন্দ হ'তে পারে না। কেন একি তুমি বিশ্বাস কর না? কিন্তু আমি যে খুব বিশ্বাস করি। আমি ত এর চেয়ে অন্য রকম ভাবতেই পারিনে।" চন্দ্রকান্তের মনের ভার এক মুহূর্ত্তে লঘু হইয়া গেল। চুপি চুপি কহিলেন, "এ কি তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ মা?"

নির্ম্মলা বলিল, "তাই ত আমার বিশ্বাস।"

(১২)

বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পরের দিন নির্ম্মলা কলিকাতা হইতে স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছে। বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা কখনও না ভাবিয়া, এ-বিয়য়ের কোন আলোচনাতেও কখনও না যোগ দিয়া একেবারেই সে বিবাহ করিয়াছে। এ নূতন জীবন তাহার সম্পূর্ণ অজানা।

আজ ফুলসজ্জা।

ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে, যামিনীর বৌদিদিরা পালঙ্কের গায়ে মল্লিকা যুঁই গোলাপের মালা গাঁথিয়া দোলাইয়া দিয়াছেন। টেবিলে ফুল, বিছানায় ফুল, টিপায়ে ফুলদানিতে করিয়া ফুল। সমস্ত ঘর সুন্দর, সুসজ্জিত, সুরভিত। পালঙ্কের উপর বিছানাতে একটি রূপার রেকাবিতে করিয়া দুই গাছি বেলফুলের গ'ড়ে মালা রহিয়াছে।

আলোকে উজ্জ্বল এবং ফুলভারে আচ্ছন্ন এই কক্ষে একটি মখমল-মোড়া চেয়ারে নির্ম্মলা বসিয়া আছে। ঘরে আপাততঃ কেহ নাই। একটুক্ষণ পূর্ব্বেও যামিনীর বোন এবং বৌদিদিরা ছিলেন, এখন তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন যামিনীকে ডাকিয়া দিতে।

নির্ম্মলা একা বসিয়া খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে। জানালা দিয়া যামিনীদের সুবিস্তৃত বাগানের একপ্রান্তে গাছপালার অন্তরালে শীত-শীর্ণ গঙ্গার একটুখানি রজতধারা দেখা যাইতেছে। আকাশে সবেমাত্র দু-একটি তারা উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। সন্ধ্যার বাতাস মশারির একপ্রান্ত কাঁপাইয়া বহিয়া যাইতেছে। নির্ম্মলা সন্ধ্যার ঠিক এই সূচনাটিতে অন্যমনা হইয়া গিয়াছে। বাহিরে বাগানের ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না, শীর্ণ নদীরেখা—এ-সমস্তই কোন্ মন্ত্রমুগ্ধ অপরিচিত জগৎ হইতে চোখের সম্মুখে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা সুন্দর কিন্তু হৃদয়ে প্রবেশপথ পায় নাই। তাহার নবজীবনের ঠিক আরম্ভেই সে কেমন একরকম শিথিল ক্লান্ত অবসাদ অনুভব করিতেছে। কিন্তু কেন? সে প্রশ্নও সে নিজেকে অনেকবার করিয়াছে, উত্তর পায় নাই। এই ত সেদিন সে বাবাকে বলিয়াছিল, তিনি যাহা করিতেছেন তাহাতে তাহার ভালই হইবে। সেদিন মনের মধ্যে যে আশ্বাস যে পরম নির্ভর সে পাইয়াছিল সে কি ইহারই মধ্যে ফুরাইয়া গেল? কিন্তু আসল এ অবসাদের কারণ বাহিরের কোন ঘটনায় ছিল না, ছিল তাহার মনে। কাব্যে উপন্যাসে প্রেমের কথা সে অনেক পড়িয়াছিল; জীবনে প্রেমের উন্মেষ হয় নাই বলিয়া প্রেম যে সে একেবারেই বুঝিত না তাহা নহে। কিন্তু তাহার বিকাশোন্মুখ মন বিবাহের একেবারে অজানা রাজ্যে আসিয়া পড়িয়া এক মুহূর্ত্তে স্বামী ও দাম্পত্যধর্ম্ম বুঝিয়া লইবার মত প্রস্তুত ছিল না। যে যামিনী বহু দিনের পূর্ব্বরাগের সাধনায় তাহার প্রিয়তম হইয়া উঠিতে পারিত সে একেবারে স্বামী হইয়া আসিয়া নির্ম্মলার প্রেমকে কুসুম-সুরভির মত ধীরে ধীরে জাগিবার সময় দিল না। সংসার ও স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যই তাহার মনে প্রথম দেখা দিল। কর্ত্তব্যের বোঝা ও ভয় মনকে অবসন্ন করিয়া তুলিল।

শ্বশুরবাড়িতে আসিয়া নির্ম্মলা দেখিল মস্তবড় বাড়ি আর তাহার চেয়েও বড় পরিবার। জায়েরা, ননদেরা তাঁহাদের ছেলেপিলে, দাসীপরিজন, আশ্রিত-আশ্রিতা, কুটুম্ব সমস্ত মিলাইয়া একটা বিরাট সংসার। শ্বশুর-বাড়িতে তাহার সমাদরের কোন অভাব ঘটিল না। যদিচ বয়স তাহার আঠারো, কিন্তু গঠনে অত্যন্ত কৃশ এবং তন্বী হওয়ায় তাহাকে বয়সের চেয়ে ছোট দেখাইত। আর তাহার মুখে ছিল এমন একটি সুকুমার কচি লাবণ্য··· যাহা তরুণীর নয়—একান্তই বালিকার। শাশুড়ীর মনে ধরিয়াছে তাহার রূপ, আর তাহার চেয়েও বেশী মনে ধরিয়াছে তাহার বাবার দেওয়া একরাশি দামী জামা কাপড় এবং একরাশ অলঙ্কার। অবশ্য সে সমস্ত অলঙ্কার চন্দ্রকান্ত দেন নাই। যামিনী কিনিয়া তাঁহার কাছে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছিল, তিনি কন্যার সঙ্গে দিয়াছেন মাত্র। কিন্তু এত কথা এবাড়ির কেহ জানে না। সে সকল বধূর পিতার দেওয়া বলিয়াই লোকে জানে।

সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া নির্ম্মলার শাশুড়ী প্রীত হইয়াছেন। মুখে না হউক মনে-মনেও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে তাঁহার অন্য সব বধূদের বেলায় তিনি এত পান নাই।

আরও যে-সব জা-ননদ আছে তাঁহারা এই সুন্দরী তন্বী তরুণী বধূকে দেখিয়া খুশী হইয়া হাসি তামাসা করিতেছে। তাঁহারাও খুশী, কারণ কলেজে-পড়া বিদুষী বড় মেয়ে হইলেও নির্ম্মলা অত্যন্ত বাধ্য। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন আই-এ পাস-করা থার্ড ইয়ারে পড়িতে পড়িতে বিয়ে-হওয়া মেয়ে বোধ করি ঘোমটা খুলিয়া বিনুনীর নীচে লম্বা রেশমের ফুল ঝুলাইয়া পায়ে স্লিপার পরিয়া ফট্ ফট্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে ক্ষণে ক্ষণে এক পোঁচ পাউডার মাখিবে, চট্ করিয়া ছোট আয়নাটা বাহির করিয়া হাত দিয়া সামনের চুল কান ঢাকিয়া নামাইয়া লইবে। কিন্তু তাঁহাদের সে মনগড়া মেয়ের সহিত নির্ম্মলার এতটুকু সাদৃশ্য ছিল না। সে বড় লক্ষ্মীমেয়ে। বড়বৌদিদি পাত কাটিয়া চুলগুলি নামাইয়া যেমন করিয়া খোঁপাটাখানি পরাইয়া দিয়াছিলেন তেমনি পরিয়া আছে। মুখ ফুটিয়া কিছু আপত্তি করে নাই। কিন্তু একটু যেন

বেশী শান্ত। নির্ম্মলার মধ্যে কেমন যেন একটা প্রাণহীন জড়তা। কলের পুতুলের মত যে যা বলিতেছে তাই করিতেছে, কিন্তু তাহার মন যেন এ-সবের মধ্যে নাই। এই সাংসারিক জগৎ তাহার একেবারে অনভ্যস্ত। এই সকল সাধারণ কথাবার্ত্তা, সহজ আনন্দ, তুচ্ছ বিষয় লইয়া আমোদ-আহ্লাদ, মাতামাতি, এ-সবেতে সে কিছুতেই যোগ দিতে পারিতেছে না। ছোট ননদ মালতী যখন তাহার চুলের গোছা ধরিয়া টানিয়া দিয়া আদর করিয়া কহিল, "বল না বৌ ভাই, কথা বল না। ...নাঃ, আমাদের বৌ বড় চালাক। একেবারে ঝিঝুমের মত বসে রয়েছে, কিছুই ফাঁস করবে না, এই ওর পণ। নয় লো, ঠিক ধরেছি কি-না বল্।" তাহার পরই দু-হাতে কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস ফিস করিয়া কহিল, "বল্ না ভাই, তোর বর কাল রাত্রিতে তোকে কি বলেছিল? আমার মাথা খাস্ বল। আমি কারুকে বলব না।" জীবনের যে-পর্ব্বের সহিত আপনাকে খাপ খাওয়াতেই তাহার সময় লাগিতেছিল, তাহা লইয়া এই কৌতূহল ও হাস্যপরিহাস দেখিয়া নির্ম্মলা হঠাৎ প্রবল বিতৃষ্ণায় শিহরিয়া উঠিল। এমনি একটা তরল রসে গদ গদ আবহাওয়ার স্পর্শে তাহার সমস্ত চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। যাহাদের বুকের কোন প্রকার অসুখ থাকে তাহাদের উঁচু পাহাড়ে জায়গার হাওয়ায় নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট বোধ হয়, অস্বস্তি লাগে। নির্ম্মলা এতদিন পর্য্যন্ত আপনার নিঃসঙ্গ মন লইয়া জ্ঞানের এবং ভাবরাজ্যের যে সুদুর্গম গিরিশিখরে বাস করিত সেখান হইতে হঠাৎ নিজেকে সংসারের সাধারণ মনের অতি কোমল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিচ্যুত দেখিয়া ক্লিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

দুয়ার বন্ধ করিবার শব্দ হইল। যামিনী ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া পালঙ্কের বাজু ধরিয়া দাঁড়াইল। নির্ম্মলা নিজের চিন্তায় এত তন্ময় যে দরজা খোলা এবং বন্ধের সেইটুকু শব্দ শুনিতে পাইল না। তাহার স্তব্ধ অন্যমনস্ক মুখের দিকে যামিনী একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিল। সে-মুখের অধিকারিণী এখন কোথায় কতদূরে কোন্ জগতে চলিয়া গিয়াছে, সে-জগতে কি যামিনীর স্থান নাই? চাহিয়া চাহিয়া তাহার একটা নিঃশ্বাস পড়িল। সামনে যে বসিয়া আছে, এতদিন কেবল কাটিয়াছে তাহাকে কি করিয়া পাইবে, কেমন করিয়া জগতের সকল বাধাকে কাটাইয়া তাহাকে একেবারে আপনার করিয়া নিজের জীবনের সংলগ্ন করিয়া লইবে সেই চিন্তায়। আজ প্রথম সেই অবসর আসিল যখন বাহিরের বাধার কথা আর ভাবিতে হইবে না—যখন কেবল দুর্লভতমাকে মৌনতার অবগুণ্ঠন হইতে বাহির করিয়া তাহার হৃদয়স্পর্শ পাওয়ার অপেক্ষা।

যামিনী একটা ছোট চৌকি তাহার কাছে টানিয়া আনিয়া বসিল। তাহার একটি হাত আপন হাতে তুলিয়া লইয়া উদ্বেল কণ্ঠে ডাকিল, "নির্ম্মলা!"

নির্ম্মলার মন একটু নরম হইল। যামিনীর কণ্ঠস্বরে কিছু একটা তাহার ভাল লাগিতেছিল। সে মুখ তুলিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া মুখ নামাইয়া লইল। যামিনী অধীর হইয়া আবার ডাকিল, "নির্ম্মলা!"

নির্ম্মলার ভাল লাগা যামিনীর অধৈর্য্যে আহত হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে বলিল, "কেন ডাকচেন? কিছু বলবেন?"

কিন্তু কিছু বলিবার জন্য তো যামিনী ডাকে নাই। প্রেমের যে অকারণ চাঞ্চল্যে নাম ধরিয়া ডাকিবার আবেগ সেই আবেগেই সে ডাকিয়াছিল, কোন প্রয়োজনে নয়। ভাবিয়াছিল সাড়া পাইবে, যেমন করিয়া বসন্ত আসিয়া কানে কানে ডাকিলে তরুপল্লব সাড়া দেয়, অকারণ আনন্দে নবকিশলয়ে মর্ম্মরধ্বনি জাগিয়া উঠে—তেমনি করিয়া কাহারও কাছে সাড়া পাইবে ভাবিয়াছিল। নির্ম্মলার মনে যে রং ধরিবার উপক্রম হইতেছিল আপনার অধীর আগ্রহে যামিনী তাহা দেখিবার অবসর পায় নাই। কিন্তু নির্ম্মলা যখন প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'কেন ডাকচেন?' তখন তাহার একটা উত্তর দেওয়া চাই। তাই তাহার আঙুলগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল,—"তুমি কেবলই বাবার কথা ভাব, আমার কথা একবারও ভাব না, নয় নীলা?"

"না। তা কেন?" নির্ম্মলার বাবার প্রতি ভালবাসার মূল্য যে বোঝে না, তাহার কাছে আপনার মনঃকষ্ট স্বীকার করিতে সে চাহিল না।

"কিন্তু আমি মনে করেছিলুম বাবার জন্যে প্রথম

প্রথম তোমার ভারি কষ্ট হবে। পরের বাড়ি মন ত কেমন করবেই।"

যামিনী নির্ম্মলার মুখে একটা অন্ততঃ সামান্য ভালবাসার কথাও শুনিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বাবার প্রতি ভালবাসার খোঁটা বার-বার শুনিয়া অভিমানভরে নির্ম্মলা বলিল,—"না, আমি কষ্ট হ'তে দেব না।"

"কেন গো? নিজের উপর এত জুলুম কেন?" যামিনী সস্নেহে একটু ঠাট্টা করিয়া কহিল।

"না না, কষ্ট হ'লে চলবে কেন? এখন থেকে আপনাদের সঙ্গেই যে আমাকে থাকতে হবে। যত ধাক্কাই খাই, তার জন্যে মনে মনে আমাকে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে।"

খুব কর্ত্তব্যের কথা, স্থিরবুদ্ধির কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন হইতে যামিনী যাহা আশা করিয়া ফিরিতেছিল তাহা কিছুতেই পাইতেছে না। যেখানে যে সুরটি আসিয়া লাগিলে সমস্তই অনির্ব্বচনীয় সমস্তই মধুর হইয়া উঠে, তাহা যেন কিছুতেই ঠিক জায়গায় লাগিতেছে না। নির্ম্মলা যদি তাহার কথার উত্তরে বলিত, "হ্যাঁ, আমার বাবার জন্যে খুব মন কেমন করছে, সর্ব্বদাই তাঁকে মনে পড়ে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে," তাহা হইলে যামিনী সেই শোক-কাতরাকে আপনার বিশাল বক্ষে টানিয়া লইত, যেমন করিয়া পারে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে প্রফুল্লিত, আনন্দিত করিয়া তুলিত। যাহাকে ভালবাসে তাহার বেদনা দূর করিবার চেষ্টায় যে আনন্দ সেই বিপুল আনন্দ সে পাইত, তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া সে নির্ম্মলার আরও কাছাকাছি আসিত। কিন্তু তেমন কোন হাওয়া বহিল না। নির্ম্মলা যে বাবার প্রতি ভালবাসার উল্লেখটা খোঁটা মনে করিল তাহাও সে বুঝিল না। কতদিন হইতে সে ভাবিতেছে কবে নির্ম্মলাকে পাইবে, এই পাওয়ার পথে যত বাধা, সে-সব বাধার সহিত কতদিন ধরিয়া সে যুদ্ধ করিয়াছে। কত বিনিদ্র রাত্রি মশারির ভিতর এ-পাশ ও-পাশ করিয়া কাটাইয়াছে এই বাধা দূর করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে। এখন সে-সমস্ত ভাবনা-চিন্তা উপায় নির্দ্ধারণের পালা শেষ হইয়াছে। অকস্মাৎ একটা প্রকাণ্ড চেষ্টা, একটা উগ্র কামনার নিবৃত্তির পর মনে যেটুকু অবসাদ আসে সেইটুকু লইয়া সে নির্ম্মলার কাছে আসিয়াছিল। মনে আশা ছিল স্নেহময়ী মাধুর্য্যময়ী নারী এমন করিয়া নিজেকে ধরা দিবে যাহাতে বসন্তের এক হিল্লোলে যেমন সমস্ত তরুপল্লব মর্ম্মরিত মুখরিত হইয়া উঠে, তাহার রূপপিপাসু হৃদয় তেমনি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে। কিন্তু নির্ম্মলা যে এখনও ঘুমাইয়া আছে; তাহাকে রূপকথার রাজকন্যার মত সোনার কাঠির অতি মৃদু স্পর্শে জাগাইতে হইবে—একথা যামিনী বুঝিত না।

নির্ম্মলার আরও কাছে সরিয়া গিয়া সে তাহার খোঁপায় জড়ান মালতী ফুলের মালাটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে নাড়িয়া চাড়িয়া, আদর করিয়া, উচ্ছ্বসিত প্রেমে আচ্ছন্ন করিয়া এই শুভ্র সুন্দর ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে একান্ত তাহার বলিয়া কাছে টানিয়া লইতে সে একেবারে অধীর হইয়া উঠিল। কিন্তু নির্ম্মলা চুপ করিয়া আকাশের তারার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার মন সাড়া দিতে চায়, কি যেন তাহার ভাল লাগে। কিন্তু কোথায় যেন একটা ভয়, একটা বিতৃষ্ণা তাহাকে কঠোর করিয়া তুলিতেছিল। সন্ধ্যার আলো ক্রমশঃ নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া আসিল। যামিনী উঠিয়া ইলেকট্রিক আলোটা নিবাইয়া দিতেই জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া নিঃশব্দ নারীমূর্ত্তির উপর পড়িল। নির্ম্মলা দৃষ্টি ফিরাইয়া যামিনীর দিকে চাহিল। সেই দুটি চোখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যামিনী এক সময়ে হঠাৎ নির্ম্মলার হাতখানি টানিয়া লইয়া তাহাতেই মুখ লুকাইয়া রুদ্ধস্বরে ডাকিল, "নির্ম্মলা, নির্ম্মলা, নির্ম্মল···"

(১৩)

নির্ম্মলা যদি সহজেই ধরা দিত, হয়ত যামিনী এত অশান্ত, এত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত না। সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর মত বিবাহের পর প্রথম প্রথম দাম্পত্যনীতির সংযম-সীমা সম্বন্ধে কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া তাহার পরে স্বভাবের সহজ নিয়মে আপনি থামিয়া যাইত। কিন্তু নির্ম্মলার মনে যে একটি অনাসক্তির সুর, একটা বিচ্ছিন্নতার ভাব রহিয়াছে, তাহাতেই বাধা পাইয়া যামিনীর প্রতিহত আবেগ দ্বিগুণ বেগে তাহার দিকে ধাবিত হইল।

দুই বোন
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

তাহার শেষ ল'-পরীক্ষার আর যোটে মাস দুই দেরি। তাহার মা তাই একদিন মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,—"হ্যারে যামিনী, বড়বৌমায়ের কাছে শুনতে পাই তুই আজকাল যোটেই মন দিয়ে পড়াশোনা করিস নে। এবারে ত বিয়ের গোলযোগ চুকেছে, এবারে কলকাতায় ফিরে যা। গিয়ে পড়াশোনায় মন দে।"

যামিনী নতমুখে নিরুত্তরে ছিল। তেমনি করিয়াই থাকিল। কিছু বলিল না। তাহার মা আরও দুই-একবার জিদ করিয়া বলায় অবশেষে কহিল, "আচ্ছা, সে-দেখা যাবে।"

বড়বৌদিদিকে ডাকিয়া কহিল, "তুমি বুঝি আমার নামে মা'র কাছে লাগিয়েছ?"

বৌদিদি অবাক হইয়া গালে হাত রাখিয়া কহিলেন, "ওমা, সে কি কথা ঠাকুরপো! তবে তোমার দাদা কাল আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, যে, তোমার পরীক্ষা এগিয়ে এল, তুমি কবে কলকাতা যাবে আমাদের কাছে কিছু বলেছ কিনা? তার উত্তরে আমি বললুম, সে এখন কলকাতা যাবে কি, বৌ নিয়ে যে মহা ব্যস্ত। এই ত ব্যাপার।"

যামিনী রাগ করিয়া কহিল, "আমার বৌকে নিয়ে আমি যদি ব্যস্ত হই, তোমাদের তাতে কি এসে যায়?"

বৌদিদি মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, তোমারই স্ত্রী বইকি ভাই। ভয় নেই, সে-সম্বন্ধে কেউ কোনো আপত্তি করবে না।"

যামিনী আরও রাগিয়া কহিল, "তা না করুক, কিন্তু আমি যদি কলকাতা যাই, জেন বৌকে সুদ্ধ নিয়ে যাব সঙ্গে ক'রে। একলা যাব না।"

"ঠাকুরপো, তুমি হাসালে দেখচি। বেশ তো দু-জনেই একসঙ্গে যেয়ো, একসঙ্গে কলেজে পড়বে।" বৌদিদি মুখে অঞ্চল দিয়া হাস্য নিবারণ করিতে করিতে দ্রুত প্রস্থান করিলেন। যথাসময়ে কথাটা সালঙ্কারে যথাস্থানে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু তখনই তখনই যামিনী ছাদের উপর উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করিতে করিতে আলিসায় ঝুঁকিয়া ডাকিল, "বৌদি, ও বৌদি, আর একবার শুনে যাও।" ডাক-হাঁকে ব্যস্ত হইয়া তিনি আবার ছাদে আসিলেন।

"কি?"

"একবার নির্ম্মলাকে আমার কাছে ডেকে দাও।"

"কখন?"

"এখনই।"

"মাপ কর ভাই, এখন সে আমি পারব না। সেখানে মা ব'সে আছেন, মেজবৌ ঠাকুরের খাবার করছে, নির্ম্মলা সেইখানে ব'সে লুচি বেলে দিচ্ছে। সেখানে গিয়ে আমি কি ক'রে বেহায়ার মত বলি,—ওলো, তোর বর ডাকচে শীগ্‌গীর। ছুটে যা।"

"দেখ বৌদি, তোমাদের এই সেকেলে রসিকতাগুলো কিছুতেই আমি সহ্য করতে পারিনে। আমার এক এক সময় ভয় হয় তোমাদের সংস্পর্শে নির্ম্মলার নিশ্চয় দস্তুর-মত কষ্ট হচ্ছে।"

বৌদিদি কুন্দদন্তে অধর দংশন করিলেন। রাগে, অপমানে, ঈর্ষ্যায় তাঁহার চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। তথাপি সে-ভাব গোপন করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া কহিলেন, "তা তোমার সন্দেহ হয় ত মিছে নয় ঠাকুরপো। আমরা মুর্খ, লেখাপড়া জানিনে, ইতর স্বভাবের। আমাদের সঙ্গে থাকতে ওঁর কষ্ট হবে বইকি।"

যামিনী জোর দিয়া বলিল,—"না বৌদি, তুমি ওকে ডেকে দাও। স্বামী তার নিজের স্ত্রীকে ডাকচে, এর মধ্যে লজ্জা পাবার বিষয়টা আছে কোন্‌খানে? তা ছাড়া তোমরা ওকে দিয়ে কাজই বা করাও কেন? তোমরা জান না ও তার বাবার কাছে এতদিন কি নির্ম্মল আবেষ্টনের মাঝে কত স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ হয়েছে। ও কি পারবে সইতে তোমাদের এই সংস্পর্শ, এই-সব কথাবার্ত্তা।"

বৌদিদি আর সহিতে না পারিয়া দ্রুতপদে পাশের দরজা দিয়া চলিয়া গেলেন। যামিনী ছাদে অনেকক্ষণ অবধি অপেক্ষা করিয়াও আর না পাইল তাঁহার দেখা, না পাইল নির্ম্মলার। তখন সে বিরক্ত হইয়া অধীর চিত্তে নিজেই নীচে নামিয়া গেল। অন্দরের আঙিনায় তখন মেয়েদের বৈকালিক কাজের ভীড় লাগিয়াছে। শ্বশুর কাছারি হইতে ফিরিয়াছেন। বধূরা ক্ষিপ্রহস্তে জলখাবার সাজাইতেছে, কেহ চা করিতেছে। তাঁহার হাতে-পায়ে জল দিয়া তোয়ালে দিয়া মুছিয়া লইয়া মেজবৌ একটি হাত-

পাখা দিয়া তাঁহাকে মৃদু মৃদু বাতাস করিতেছে। নির্ম্মলা নতমুখে বসিয়া লুচি বেলিতেছিল। অনভ্যস্ত হাতে কিছুই পরিপাটি করিয়া হইতেছে না। তবু নিঃশব্দে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল। কলিকাতায় এ-সময়টা সে ছাদে পায়চারি করিয়া বেড়াইত, স্পেন্সার কিংবা বার্গসেঁা লইয়া পড়িত। যেখানটা বুঝিতে পারিত না পিতা আসিয়া বলিয়া দিতেন। কলিকাতার অনুজ্জ্বল ম্লান সূর্য্যাস্তের সময় নির্জ্জন আকাশের তলায় পিতাপুত্রীর মাঝে একটি অখণ্ড ভাবলোক সৃজিত হইয়া উঠিত। আজও হয়ত তেমনি নিঃশব্দ দীপ্তির সমারোহে সূর্য্যাস্ত হইতেছে, ঘোমটার আড়াল হইতে নির্ম্মলা চাহিয়া দেখিল দিবসের শেষ রক্তিম ছটা আঙিনার প্রান্তে সজিনা গাছটার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে ঘরকন্নার এই বাঁধনের মাঝে এই হট্টগোল কোলাহলের মধ্যে অবগুণ্ঠনে বদ্ধ হইয়া থাকিতে তাহার কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু কষ্টের কথা মনেই চাপিয়া রাখিয়াছে, কাহাকেও বলে নাই। কাহাকে বলিবে? সবাই তাহার অপরিচিত। যামিনীও এখন তাহার কাছে অপরিচিত।

অন্তঃপুরের এই ঘরকন্নার কাজের মাঝখানে যেখানে টুকরা টুকরা হাসি গল্প নিন্দা ঠোঁট-বাঁকান, হাতের চুড়ি-বালার রিনি ঠিনি আওয়াজ সব মিলিয়া জড়াইয়া সৃষ্ট হইয়াছে একটা মৃদুমধুর নৃত্য, সেখানে যামিনী হঠাৎ ঝড়ের মত অপ্রত্যাশিত রূপে গিয়া হাজির হইল। একেবারে কর্ম্মনিরতা নির্ম্মলার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "ছাদে চল। কথা আছে।"

নির্ম্মলার মাথা হইতে অবগুণ্ঠন খুলিয়া গেল। বিস্মিত দৃষ্টিতে যামিনীর দিকে চাহিয়া সেই একঘর গুরুজনের সামনেই সে প্রশ্ন করিল, "কেন?"

নির্ব্বোধ তরুণীর এই অসঙ্কোচ প্রশ্নের পরিবর্ত্তে তখনই লজ্জায় মরিয়া গিয়া মাথায় আবার অবগুণ্ঠন তুলিয়া দিবার কথাটাও মনে রহিল না। জায়েরা মুখ টেপাটিপি করিয়া হাসিতে লাগিলেন। যামিনী পুনর্ব্বার প্রবল বেগে তাহার হস্ত আকর্ষণ করিয়া কহিল, "চল, বিশেষ দরকার আছে।"

চাকী বেলুন পড়িয়া রহিল। হাতের কাজ ফেলিয়া বধূ উঠিয়া উপরে গেল। শাশুড়ী মুখ গম্ভীর করিয়া থাকিলেন। অনেকে ঠোঁট বাঁকাইয়া আড়ালে একটু হাসিয়া লইল।

উপরে যামিনীর শয়নঘর-সংলগ্ন ছাদে সামনা-সামনি দু-খানি চেয়ার পাতা ছিল। চারিপাশে টব সাজান। চাকরে পাশে একটি ছোট টেবিল রাখিয়া তাহার উপর শুভ্র আস্তরণ বিছাইয়া দিয়া গিয়াছে। মালী আসিয়া প্রকাণ্ড দুইটা গোলাপ ও ক্রীসান্থীমামের তোড়া রাখিয়া গেল। আয়োজন সুসম্পূর্ণ। সন্ধ্যার রক্তরাগ পশ্চিম দিগন্তে তখনও একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। নির্ম্মলাকে ছাদে আনিয়া যামিনী চেয়ারে বসাইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নির্ম্মলা বলিল, "আমাকে ডেকেছ কেন?"

কেন ডাকিয়াছে আজও তাহার উত্তর যামিনীর জানা নাই। তাই প্রত্যুত্তরে সে কেবল ভাষাহীন নীরব ব্যাকুলতায় নির্ম্মলার বাঁ-হাতখানি নিজের হাতে টানিয়া লইল। ময়দা মাখিতে গিয়া নির্ম্মলার নীলার আংটির পাথরের খাঁজে ময়দা লাগিয়াছিল, কুসুমসুকুমার হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া ঐটুকুতে নজর পড়িতেই যামিনীর সমস্ত মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। কিছুই না, এইটুকু মাত্র একটুখানি ব্যাপার, কিন্তু তাহাতেই যেন খোঁচা খাইয়া তাহার বক্ষের সমস্ত স্নেহ এবং করুণা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে উচ্ছ্বসিত হইয়া ভাবিতেছিল, এ কে? ইহাকে আমি কোথা হইতে আনিলাম? এমন সুন্দর সুকোমল হৃদয়খানি, ইহাকে আমি কেমন করিয়া রক্ষা করিব? সংসারের স্থূল হস্তাবলেপ হইতে তাহাকে যেমন করিয়া পারি আমি দূরে সরাইয়া রাখিবই। সে যেন কোনদিন মনে না করে যে তাহার স্নিগ্ধ জীবনক্ষেত্র হইতে আমি তাহাকে লোভের বশে তুলিয়া আনিয়াছি। যামিনীর সমস্ত মন নির্ম্মলার জন্য কিছু একটা করিতে, কোন একটা দুঃসহ ত্যাগস্বীকার, কোন একটা কঠিনতম পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

নির্ম্মলা বিমনা হইয়া ফুলের তোড়ার দিকে তাকাইয়া ছিল। তাহার স্বামী তোড়াটা খুলিয়া সে-সমস্ত ফুল অঞ্জলি ভরিয়া তাহার আঁচলের উপর রাশীকৃত

করিয়া ঢালিয়া দিল। তাহার পর কহিল, "এ সময়ে তুমি কলকাতায় কি করতে নীলা? আমি প্রায়ই দেখেছি এ সময়টাতে তুমি আর তোমার বাবা দু-জনে মিলে কোন একটি বই পড়তে কিংবা সেই বই সম্বন্ধে আলোচনা করতে। এখানেও তাই কর না কেন? তোমার সঙ্গে মিলে পড়তে আমারও ভাল লাগবে। ভাল বই কি একলা পড়ে সুখ হয়?" যামিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘর হইতে রবীন্দ্রনাথের পূরবী আর মহুয়া লইয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিল, "কিন্তু একটা কথা যে ভুলে গেছি, নির্ম্মলা। তুমি ত বিকেলে বরাবর চা খাও। এখন নীচে নিশ্চয়ই খেয়ে আসনি। বৌদিরা খান না ব'লে নীচে তোমারও বোধ হয় খাওয়া হয়নি। আগে চা খাও, তার পর পড়ব।"

চাকরকে ডাকিয়া যামিনী দু-পেয়ালা চা আনিতে বলিল।

চা আসিল। ফুলের গন্ধ ছুটিতে লাগিল। মহুয়া পড়া চলিতে লাগিল, পশ্চিম আকাশ হইতে সোনালী আভা আসিয়া নির্ম্মলার চুলে, সোনার হারে পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই যামিনীর মন ভরিল না। সে যাহা চায় কিছুতেই তাহার ধরাছোঁয়া পাইল না। এত করিয়াও নির্ম্মলার হৃদয়কে সে ঠিকমত স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, তাহার এমনি বোধ হইতে লাগিল। সে পাগল হইয়া যাইবে! একটা রুদ্ধ লোহার দরজার সামনে দাঁড়াইয়া সে তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও যেন তাহা খুলিতে পারিতেছে না এমনি একটা পরাভবের গ্লানি, নিরাশার উত্তেজনা ভিতরে ভিতরে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

হঠাৎ এক সময়ে পড়া থামাইয়া বলিল, "কই, তুমি শুনচ না ত নির্ম্মলা? তোমার ভাল লাগছে না?"

নির্ম্মলা চমকিয়া উঠিল, "কেন শুনছি বইকি। বেশ ত।" কিন্তু তাহার সেই চমকটা এতই সুস্পষ্ট যে যামিনী একটু রুক্ষ স্বরে বলিল, "না, শুনছ না। মনও দিচ্ছ না। তোমার একেবারেই ভাল লাগছে না। কিন্তু কেন? আমি তোমার বাবার মত পড়ি না ব'লে? আর এটা ক'লকাতা নয় ব'লে?" বই ফেলিয়া দিয়া চটিজুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে সে সেখান হইতে চলিয়া গেল। আবার তখনই ফিরিয়া আসিয়া পিছন হইতে নির্ম্মলার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল, "আমার উপর রাগ করলে?"

"না।" কিন্তু নির্ম্মলার চোখে জল আসিয়া গিয়াছিল।

"ভাল ক'রে কথা বল নির্ম্মল। আমাকে ব'কো ঝকো, আমার উপর রাগ কর, অভিমান কর। আমাকে কটু কথা ব'ল, কিন্তু শুধু 'হু' আর 'না' দিয়ে কথা সেরে দিও না—" বলিতে বলিতে তাহার একটা হাত টানিয়া লইয়া বুকের উপর রাখিয়া কহিল, "ন', ন', ও জিনিষ আমার সহ্য হয় না। দেখতে পাচ্ছ না, বুঝতে পারছ না নির্ম্মল, ওতে বুক আমার ভেঙে যাচ্ছে। তার চেয়ে তুমি আমাকে কাঁদাও, খুব গভীর ব্যথা দাও, কিন্তু নিষ্ঠুর, অমন ক'রে নিঃশব্দ ঘৃণা দিও না।"

নির্ম্মলা অবাক হইয়া গেল। একবার হাতটা ছাড়াইয়া লইবারও চেষ্টা করিল, পারিল না। যামিনী আরও দৃঢ় বলে তাহা চাপিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু একটা অদ্ভুত বিতৃষ্ণায় তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। এই দুর্দ্দমনীয় আবেগে, তাহার স্বামীর এই গদ্ গদ তরলতায় সে যেন মরমে মরিয়া গেল। সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও তাহার ঐশ্বর্য্যশালিনী নারী-প্রকৃতি এই ধূলায় লুটাইয়া পড়া আতুরের প্রেম-নিবেদনে মরমে মরিয়া গিয়া সসম্ভ্রমে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। কিন্তু হায়, এ যে তাহার প্রেমেরই জাগরণ তাহা যামিনী বুঝিল না। নির্ম্মলা আপনার অজ্ঞাতসারে আজ কল্প-লোকের প্রেমের অনুসন্ধানে ফিরিতে আরম্ভ করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

ম্যাডাম কুরী

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীসত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ডি-এস্‌সি

ম্যাডাম কুরীর নাম বিজ্ঞানজগতে সকলেরই সুপরিচিত। সাধারণতঃ বিজ্ঞান-বিভাগে নারীর দান সামান্য। বুদ্ধি-বৃত্তির অপকর্ষতাই যে ইহার কারণ, এমত নহে—সামাজিক আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া তাঁহারা বিজ্ঞানচর্চ্চার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পান না। সুযোগ ও সুবিধা ঘটিলে মহিলারাও যে কত কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন, ম্যাডাম কুরীর জীবনী আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কুরী তাঁহার জীবনকালের অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই বিজ্ঞানজগতে এক অভিনব আবিষ্কার করিয়া এক নূতন দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন।

পোলাণ্ড দেশের ওয়ার্শ নগরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর ম্যাডাম কুরীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ডক্টর সক্লোডাউস্কী অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। অল্প বয়সে মাতার মৃত্যু হওয়ায় কুরী তাঁহার পিতার তত্ত্বাবধানে বাল্যকালে প্রতিপালিত হন। একটু বয়স হইলে তিনি তাঁহার পিতার ল্যাবরেটরীতে কাজ শিখিতে থাকেন। বলা বাহুল্য, বাল্যকালে ম্যাডাম কুরী* তাঁহার পিতার নিকটে যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির মূল কারণ হইয়াছিল।

পোলাণ্ড দেশের যে-অংশে ডক্টর সক্লোডাউস্কী বাস করিতেন তাহা রুশিয়া দেশের অন্তর্গত ছিল। রুশিয়ার জারের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া অনেকে জারের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিত এবং ম্যাডাম কুরী দেশ-প্রেমিক পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই শ্রেণী-ভুক্ত হন। শীঘ্রই একটি বিপ্লবীর দল গড়িয়া উঠিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রুশিয়ার পুলিস এই রাষ্ট্রবিপ্লব-পন্থীদের সন্ধান পায়। এই ঘটনার পরে মেরী সক্লোডাউস্কার পক্ষে পোলাণ্ডে নিরাপদে কালযাপন করা বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। তিনি একাকী রিক্তহস্তে প্যারীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে তাঁহার পরিচিত ব্যক্তির সংখ্যা কম ছিল এবং অর্থের অনটনহেতু মেরী সক্লোডাউস্কা নিতান্ত দরিদ্র ভাবে কালযাপন করিতে থাকেন। অন্নসমস্যা তখন তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল এবং দৈনিক খরচ দশ সেণ্ট যোগাড় করিবার জন্য তাঁহাকে সোর্বনের ল্যাবরেটরীতে শিশি বোতল প্রভৃতি পরিষ্কার করার কার্য্য করিতে হইত। ঘরে আগুন দিবার জন্য অর্থাভাবে তাঁহাকে নিজের কয়লা বহন করিতে হইত এবং দিনের পর দিন তিনি কেবল রুটি ও দুধ খাইয়াই জীবননির্ব্বাহ করিতেন। মাংস ব্রাণ্ডী প্রভৃতির স্বাদ প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলেন।

এই সময়ে সোর্বনের ল্যাবরেটরীর পদার্থবিজ্ঞান-বিভাগের অধ্যক্ষ গেব্রিয়েল লিপম্যান্ এবং হেনরী পোঁয়াকারের সহিত তাঁহার বিশেষ আলাপ হয়। তাঁহার অবস্থা শুনিয়া এবং কার্য্যকুশলতা দেখিয়া লিপ্‌ম্যান্ ও পোঁয়াকারে তাঁহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হন এবং পেরী কুরী নামক একটি মেধাবী ছাত্রের সহকর্ম্মী রূপে কার্য্য করিবার আদেশ দেন। একত্র কার্য্য করিবার ফলে পেরী কুরী এবং মেরী সক্লোডাউস্কা উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। উভয়েই বিজ্ঞান-দেবতার একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন এবং আজীবন পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন।

এই সময়ে পরমাশ্চর্য্য ব্যাপারসকল পরিলক্ষিত হইতেছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম্ ক্রুক্‌স্ দেখাইলেন যে শূন্য কাচনলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইলে ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক দ্বার হইতে (negative pole)

* বাল্যকালে তাঁহার নাম ছিল মেরী সক্লোডাউস্কা।

এক প্রকার আশ্চর্য্য রশ্মি বাহির হয়। তিনি উহার নাম দিলেন বিয়োগ-রশ্মি (cathode rays.)

এই নূতন রশ্মির প্রকৃতি নির্ণয় করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে নানা প্রকার পরীক্ষা ও তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বনামধন্য ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্যর জে. জে. টম্‌সন্‌ এই সমস্যার সমাধান করিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, এই রশ্মিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণতাড়িত কণার সমষ্টিমাত্র। এই ঋণতাড়িত কণা অথবা ইলেক্‌ট্রনের ওজন একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর দুই সহস্র ভাগের একাংশ মাত্র। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক উইল্‌হেল্‌ম্‌ রণ্টজেনের এক্স-রে আবিষ্কারের কথা আসিয়া পড়ে। তিনি দেখাইলেন যে, বিয়োগ-রশ্মি কোনও বস্তুর উপর পতিত হইলে ঐ বস্তু হইতে এক অপূর্ব্ব রশ্মি নির্গত হয়। এই রশ্মি ধাতু, পাথর কিংবা কাঠের আবরণ অনায়াসে ভেদ করিতে পারে। এই রশ্মি মনুষ্য চর্ম্ম ও মাংস ভেদ করিয়া অস্থিতে বাধা পায়। সুতরাং এই রশ্মির সাহায্যে ফটোগ্রাফ তুলিলে মনুষ্যের শরীরের অস্থিতে কোথাও কোন বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইয়াছে কি-না সহজেই ধরিতে পারা যায়।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকেরল্‌ (Becquerel) এক নূতন রশ্মি আবিষ্কার করিলেন। নানা প্রকার প্রস্ফুরণশীল (Phosphorescent) পদার্থের প্রকৃতি পরীক্ষাকালীন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ইউরেনিয়ম এবং উহার যৌগিক পদার্থসমূহ হইতে এক প্রকার রশ্মি নির্গত হয়, যাহা রঞ্জনরশ্মির অথবা এক্স-রে'র সমগুণবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে, এই সকল রশ্মি বায়ু অথবা অন্য কোনও বাষ্পের ভিতর প্রবেশ করিলে উক্ত বাষ্পকে তড়িৎ-পরিবাহক করে। আবিষ্কর্ত্তার নাম অনুসারে এই নূতন রশ্মির নাম হইল বেকেরল্‌ রশ্মি।

বেকেরলের প্রণালী অনুসরণ করিয়া ম্যাডাম্‌ কুরী এই নূতন রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি দেখিলেন যে, ইউরেনিয়ম্‌ ব্যতীত অন্য এক প্রকার পদার্থ হইতেও উক্ত প্রকার রশ্মি নির্গত হয়। ম্যাডাম কুরী এই নূতন পদার্থের নাম দিলেন থোরিয়ম্‌। এই সকল গবেষণা-প্রসঙ্গে ম্যাডাম কুরী লক্ষ্য করিলেন যে, পিচ্‌ব্লেণ্ড নামক ইউরেনিয়মসংযুক্ত খনিজ পদার্থ হইতে যে-রশ্মি নির্গত হয় তাহা বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ম হইতে নির্গত রশ্মি অপেক্ষা চার-পাঁচ গুণ অধিক শক্তিশালী। ম্যাডাম কুরী অনুমান করিলেন যে পিচ্‌ব্লেণ্ডের মধ্যে

ম্যাডাম কুরী

ইউরেনিয়ম ব্যতীত নিশ্চয়ই এমন অন্য জিনিষ আছে যাহা ইউরেনিয়ম হইতে অধিকতর শক্তিশালী রশ্মি নির্গত করিতে পারে। এ-পর্য্যন্ত ম্যাডাম কুরীর কোনও সহকর্ম্মী ছিল না। এক্ষণে তাঁহার স্বামী অধ্যাপক পেরী কুরী তাঁহার সঙ্গে একত্রে এই অজ্ঞাত বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রধান অন্তরায় হইল যে, পিচ্‌ব্লেণ্ডের মধ্যে এই অজ্ঞাত বস্তুর পরিমাণ অত্যন্ত কম। কাজেই তাঁহাদিগকে প্রচুর পরিমাণ পিচ্‌ব্লেণ্ড লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইল। এই কার্য্যের জন্য অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট বোহেমিয়া দেশের অন্তর্গত ইউরেনিয়মের খনি হইতে কুরীদ্বয়কে এক টন পিচ্‌ব্লেণ্ড উপহার দিলেন। সাধারণতঃ পিচ্‌ব্লেণ্ডের মধ্যে নানারূপ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। সুতরাং উহা হইতে

তাঁহাদের অভীপ্সিত বস্তুর সন্ধান পাওয়া অতীব আয়াস-সাধ্য ব্যাপার। এক টন অর্থাৎ ২৭ মণ পিচ্‌ব্লেণ্ড হইতে ১ গ্রাম ওজনের ৬০০ শত ভাগের এক ভাগ অতি শক্তিশালী স্বতঃজ্যোতির্ম্ময় পদার্থ পাওয়া যায়। ম্যাডাম কুরী
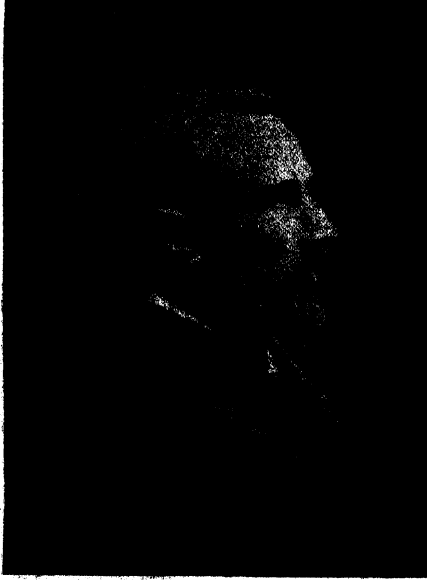
পেরী-কুরী

ইহার নাম দিলেন রেডিয়াম। দীর্ঘ বারো বৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে পরীক্ষা করিবার পর তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বিশুদ্ধ রেডিয়াম ধাতু প্রাপ্ত হইলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, রেডিয়াম আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বে তিনি স্বতঃজ্যোতির্ম্ময় আরও একটি মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। স্বদেশের স্মৃতিরক্ষার্থে উক্ত বস্তুর নাম দিয়াছিলেন,—পলোনিয়াম।

এই প্রসঙ্গে রেডিয়াম সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ক্যান্সার ও কতকগুলি চর্ম্মরোগ হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় রেডিয়াম-চিকিৎসা। রেডিয়াম একটি তীব্র শক্তিশালী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ। সূর্য্য হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হয় বলিয়াই এই আলোক বিকীর্ণ হয় আমাদের চক্ষে তাহা ধরা পড়ে না। অথচ এই আলোক সূর্য্যের আলোক অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী। সূর্য্যের আলোক আমাদের চামড়া ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু রেডিয়াম হইতে নির্গত আলোকের সম্মুখে দাঁড়াইলে শরীরের অন্তঃস্থিত প্রত্যেকটি অংশ-বিশেষ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। রণ্টজেন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এক্স-রে'র বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। এই রেডিয়াম হইতে যে আলোক বিকীর্ণ হয় তাহা এক্স-রে'রই অনুরূপ। মাত্র এক গ্রাম ওজনের রেডিয়াম হইতে এই জ্যোতিরূপে যে শক্তি নির্গত হয় তাহা এক গ্রাম ওজনের কয়লা হইতে প্রাপ্ত তাপশক্তির দশ লক্ষ গুণেরও অধিক।

রেডিয়াম যে কেবল মানুষের উপকারে আসিয়াছে, এমন নহে। বিজ্ঞানজগতে ইহা যে কত গভীর রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বলা বাহুল্য, ম্যাডাম কুরীর আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতের একটি নূতন দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। ম্যাডাম কুরীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য দেশে বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এই স্বতঃজ্যোতির্ম্ময় (Radioactive) পদার্থসমূহ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে রাদারফোর্ড, সডি, র‍্যাম্‌জে ও বোল্‌টউড-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর চতুর্দ্দিক হইতে ম্যাডাম কুরী অভিনন্দিত হইতে লাগিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কুরীদ্বয় ও বেকেরল্ একত্রে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাডাম কুরী অতি উচ্চ সম্মানের সহিত প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর-অফ-সায়েন্স উপাধি প্রাপ্ত হন। বোধ হয় জগতের ইতিহাসে বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডক্টর-অফ্-সায়েন্স উপাধির জন্য যে-সকল মৌলিক গবেষণা দাখিল হইয়াছে ম্যাডাম কুরীর গবেষণা তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আরেনিয়াস কৃত দ্রবীভূত পদার্থের তাড়িৎ বিশ্লেষণ সম্বন্ধীয় গবেষণা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বলা যাইতে পারে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দেই ম্যাডাম কুরী ও তাঁহার স্বামী লর্ড কেল্‌ভিনের আমন্ত্রণে লণ্ডনে উপস্থিত

রেডিয়াম সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন এবং কুরীদ্বয় রয়াল সোসাইটীর ডেভি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। পর-বৎসর ম্যাডাম কুরী সোর্বনের ল্যাবরেটরীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এক মোটর-দুর্ঘটনায় অধ্যাপক পেরী কুরী মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই আকস্মিক বিপদে ম্যাডাম কুরী অত্যন্ত শোকাভিভূতা হইয়া পড়েন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য এতদূর খারাপ হইয়া পড়ে যে তাঁহার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবর্গ তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি দীর্ঘকাল অসুস্থতার পর ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করেন। স্বাস্থ্যলাভ করিবার পর তিনি পুনরায় বিজ্ঞানের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে ম্যাডাম কুরী দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বিজ্ঞানজগতের ইতিহাসে একই ব্যক্তি ইহার পূর্ব্বে আর কখনও দুইবার নোবেল পুরস্কার পান নাই। ম্যাডাম কুরীর পরে অধ্যাপক আইনস্তাইন্ দুইবার নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ যে বৎসর ম্যাডাম কুরী দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার পাইলেন সেই বৎসর ফ্রেঞ্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্য তালিকাভুক্ত করিতে ম্যাডাম কুরীর নাম উত্থাপিত হয়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উক্ত সভার ধুরন্ধর সভ্যেরা ম্যাডাম কুরীর নাম সভ্য-তালিকাভুক্ত করিয়া লইতে রাজি হইলেন না। তাঁহারা এই যুক্তি দেখাইলেন যে এ-পর্য্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক এ-সভার সভ্য হয় নাই এবং এ-নিয়ম এখনও ব্যতিক্রম হইবে না। বলা বাহুল্য, ইহাতে ম্যাডাম কুরীর সম্মানের কোনও হ্রাস হয় নাই—পক্ষান্তরে ফ্রেঞ্চ ইন্‌ষ্টিটিউটেরই সম্মানের লাঘব হইয়াছে।

পেরী কুরীর আকস্মিক মৃত্যুর পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাডাম কুরী সোর্বনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। এই বৎসর তিনি পোলোনিয়াম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন তাহা শুনিবার জন্ত লণ্ডন হইতে লর্ড কেল্‌ভিন্, স্যর্ উইলিয়ম্ র‍্যাম্‌জে, স্যর অলিভার্ লজ প্রমুখ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ প্যারীতে উপস্থিত হয়েন। বিগত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় স্বতঃজ্যোতির্ম্ময় পদার্থসমূহের গবেষণার জন্ত 'রেডিয়াম ইন্‌ষ্টিটিউট' নামে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ম্যাডাম কুরী ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উহার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই গবেষণাগার দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার একটি অংশের নাম 'কুরী ল্যাবরেটরী', অপর

পরীক্ষাগারে ম্যাডাম কুরী

অংশের নাম 'পাস্তুর ল্যাবরেটরী'। কুরী ল্যাবরেটরীতে স্বতঃজ্যোতির্ম্ময় পদার্থসমূহ সম্বন্ধে গবেষণা হয় এবং পাস্তুর ল্যাবরেটরীতে এই পদার্থগুলি কি উপায়ে চিকিৎসাকার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে তদ্বিষয়ে গবেষণা হয়। ফরাসী সামরিক হাসপাতাল বলিতে রেডিয়াম সম্বন্ধীয় যাবতীয় চিকিৎসা ব্যাপারে উক্ত গবেষণাগার হইতে সাহায্য আসে। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ম্যাডাম কুরী এই ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন।

আইরিন্ (Irene) ও ইভ (Eve) নামে ম্যাডাম কুরীর দুই কন্যা বর্ত্তমান। ম্যাডাম কুরী তাঁহার সহস্র কাজের মধ্যেও কন্যাদিগের প্রতি যত্ন লইতে ত্রুটি করিতেন না। কন্যাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও আহারাদি

নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি নিজে আজীবন সাদাসিদা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। বিলাসিতা কখনও তাঁহাকে তিলমাত্র আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

এই মহীয়সী মহিলার মৃত্যুতে বিজ্ঞান-জগতের—বিশেষতঃ ফরাসী জাতির যে বিরাট ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবে না।

মাদাম ক্যুরি

ডক্টর শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, ডি-এস্‌সি

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমরা কয়েক জন প্যারিসে রয়েছি। প্যারিসের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়—সর্বনে (Sorbonne) নোটিস দেখা গেল যে, মাদাম ক্যুরি 'আইসোটোপ' (isotope) সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দিবেন। অনেক দিন হইতেই এই মনস্বিনী মহিলাকে দেখার ইচ্ছা ছিল, সুতরাং নির্দিষ্ট দিনে বক্তৃতা-কক্ষ ফিজিক্স অ্যাম্ফিথিয়েটারে উপস্থিত হওয়া গেল। গ্যালারি শ্রোতায় পূর্ণ। পুরুষ ও মহিলা ছাত্রছাত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ও অনেক সম্ভ্রান্ত নরনারী বক্তৃতায় যোগ দিতে উপস্থিত হয়েছেন। মাদাম ক্যুরি কক্ষে প্রবেশ করতেই শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করলেন। বক্তৃতা সুরু হ'ল। অতিপরিষ্কার ও প্রাঞ্জল ভাষায় মাদাম ক্যুরি তাঁর বক্তব্য বলতে লাগ্‌লেন। তাঁর কাছে তাঁর কন্যা ইরেন্ (Irene) দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আবশ্যকমত মাতাকে পরীক্ষণে সাহায্য করছেন, ও ব্ল্যাকবোর্ড তুলে নামিয়ে বা পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছেন। কর্ম্মজীবনের অবসানের মুখে কর্ম্মক্লান্ত প্রৌঢ়া মাতার সাহায্যে মাতৃভক্ত এই যুবতী কন্যার সমাগম আমাদের কাছে বড় প্রীতিকর লাগ্‌ল।

প্রায় এক বৎসর পরে মাদাম ক্যুরির সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। প্রায় তিন মাস তাঁর গবেষণাগার এঁস্তিত্যু দ্যু রাডিয়মে (Institut du Radium) গবেষণা করার জন্য প্রবেশ করেছিলাম। মাদাম ক্যুরির অতুলনীয় বৈজ্ঞানিক কীর্ত্তি—রেডিয়মের আবিষ্কারের—স্মরণার্থে এই গবেষণাগার ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে রেডিয়াম সম্বন্ধে নানা রূপ গবেষণা হয়। দেশ-বিদেশ হ'তে বহু গবেণষাকারী ছাত্রছাত্রী এখানে সমবেত হয়েছেন। একটা বিশেষত্ব এই যে, প্যারিসের অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চাইতে এখানে মহিলা কর্ম্মীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। সম্প্রতি এই গবেষণাগার হ'তে মাদাম ক্যুরির কন্যা ইরেন ও তাঁহার স্বামী জোলিও (Joliot) নিউট্রন (Neutron) আবিষ্কার ক'রে যশস্বী হয়েছেন। সূক্ষ্ম জড়কণাদের মধ্যে নিউট্রন অন্যতম; পার্থক্য এই যে, অন্যান্য সূক্ষ্ম জড়কণা—যেমন বিদ্যুতিন্ (electron), পজিট্রণ (positron) বা প্রোটন (proton)—প্রত্যেকটিই ধন- বা ঋণ- বিদ্যুতাশ্রিত; নিউট্রন সেরকম বিদ্যুতাশ্রিত নয়। ফলে নিউট্রন কঠিন জিনিষের মধ্য দিয়ে অনেক দূর ছুটে যেতে পারে।

ক্যুরি-দম্পতি কর্ত্তৃক ১৮৯৮ সালে রেডিয়াম ও পলোনিয়াম ধাতুর আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক জগতের এক যুগান্তরকারী ঘটনা। কি অধ্যবসায়ের ফলে পিচব্লেণ্ড হ'তে ইঁহারা রেডিয়াম নিষ্কাশন করতে সমর্থ হয়েছিলেন তা সাধারণকে বোঝান শক্ত। রেডিয়ামের এক আশ্চর্য্য গুণ এই যে, এর থেকে অনবরত তেজ বিকীরণ হচ্ছে,—রেডিয়ামের মধ্যে যেন অফুরন্ত তেজের ভাণ্ডার আছে,—কুবেরের ধন,—দান করলেও ক্ষয় নাই। কোন উত্তপ্ত বস্তু তেজ বিকীরণ ক'রে শীতল হয়—তার তেজের ভাণ্ডার নিঃস্ব হয়ে যায়, কিন্তু রেডিয়ামে যেন তা হয় না। এক

কণা রেডিয়াম থেকে এত তেজ বের হয় যে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে সেই তেজ রেডিয়াম-কণার সমান পরিমাণ জলকে ফুটন্ত অবস্থায় আনতে পারে। অথচ আপাতদৃষ্টিতে তাপবিকীরণের জন্য রেডিয়ামের কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় না। এই তেজের উৎস কোথায়? বৈজ্ঞানিক বলেন যে, রেডিয়ামের এক একটা পরমাণু মাঝে মাঝে বিদীর্ণ হচ্চে—কেন হচ্চে তার কারণ জানা নাই। আর, এইভাবে বিদীর্ণ হওয়ার উপর মানুষের কোনও হাত নাই। মানুষ তার আয়ত্তাধীন কোনও শক্তির প্রয়োগে এই বিদীর্ণ হওয়া নিবারণ করতে বা বাড়াতে পারে না। রেডিয়াম ধাতুর পরমাণু এই রূপে বিদীর্ণ হয়ে অন্য ধাতুর পরমাণুতে পরিণত হয় আর সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি তেজরূপে বিকীর্ণ হয়। রেডিয়াম থেকে যে-তেজ বের হয় তা তিন জাতীয়। প্রথম—আল্‌ফা কণা (হিলিয়ম পরমাণুর বাহিরের বৈদ্যুতিক আবরণ বাদ দিলে ভিতরের যে-অংশ থাকে তাকে আল্‌ফা কণা বলে), দ্বিতীয়—বিদ্যুতিন বা electron, তৃতীয়—গামা রশ্মি (ইহা এক্সরে জাতীয়)। এক কণা রেডিয়মে অসংখ্য পরমাণু আছে, সুতরাং মাঝে মাঝে এক একটা পরমাণু ভাঙলেও রেডিয়াম-কণার আভ্যন্তরীণ শক্তির অপচয় অতি ধীরে ধীরে হয়। তেজবিকীরণ শক্তি অর্দ্ধেক হ'তে প্রায় দেড় হাজার বৎসর লাগে।

প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে রেডিয়াম আবিষ্কারের পর রেডিও য়্যাকটিভ গুণ বিশিষ্ট আরও কয়েকটি ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছে। এইগুলির গুণ অনুশীলন করতে গিয়ে অণু পরমাণুর গঠনের অনেক রহস্য আমরা জান্‌তে পেরেছি। এমন কি, ইচ্ছামত একটা পরমাণুকে ভেঙে আর একটা পরমাণুতে রূপান্তরিত করা—তাও এই রেডিও য়্যাকটিভ জাতীয় ধাতুর সাহায্যে হয়েছে। পারাকে সোনাতে পরিণত করার চেষ্টা আদিম যুগ হ'তে মানুষ করছে—কখনও সফলকাম হয় নি। কিন্তু উপরোক্ত ভাবে পরমাণু ভাঙা-গড়ার কথা ভাব্‌লে মনে হয় যে পারাকে সোনা করা বুঝি অসম্ভব নয়। মানুষ যে শ্রেণীর কাজ করলে "অমর" আখ্যা লাভ করার যোগ্য হয় মাদাম ক্যুরির বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সেই শ্রেণীর। বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের জাতীয়তা-প্রীতি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

দরিদ্র কৃষিজীবীর কুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়াও, নানা সদ্গুণের বলেই স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ধনে-মানে-জ্ঞানে দেশের ও সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহার মত সত্যানুরাগ, সাহস, দৃঢ়চিত্ততা, জ্ঞানানুরাগ ও দেশাত্মবোধ বঙ্গদেশে দুর্লভ। আন্তরিকতায়, সহিষ্ণুতায় ও একাগ্রতায় ডাক্তার সরকার সকলের আদর্শ ছিলেন। অসাধারণ প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও উদ্যমশীলতায় তিনি বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা মহেন্দ্রলালের অতুলনীয় কীর্ত্তি। তিনিই ভারতে সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রথম পথপ্রদর্শক। অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে ডাক্তার সরকারই এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এজন্য লোকে তাঁহাকে হোমিও-প্যাথি চিকিৎসার ভারতীয় অবতার বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। মহেন্দ্রলালের কীর্ত্তি ও গুণাবলির কথা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এখানে কেবল বেশভূষায় জাতীয়তা রক্ষার একান্ত পক্ষপাতী মহেন্দ্রলালের সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিব।

স্বদেশী আন্দোলনের কল্যাণে ও মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগের প্রভাবে, পাশ্চাত্য বেশভূষার মোহ শিক্ষিত ভারতবাসীর

মধ্যে অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু সত্তর-পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে দেশের অবস্থা একেবারে অন্যরূপ ছিল। তখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত দেশবাসী পাশ্চাত্য বেশভূষাকেই আদর্শ মনে করিতেন। অনেক স্থলে এদেশবাসীর বেশভূষা সভ্যজনোচিত বলিয়াই বিবেচিত হইত না। মহেন্দ্রলাল তখনকার দিনের সর্ব্বোচ্চ সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়া, বিজ্ঞান-শিক্ষার্থে মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ লাভ করেন। পরে তথা হইতে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যায় উচ্চতম উপাধি—এম-ডি লাভ করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কালে তিনি সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসকরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। অল্প কয়েক ব্যতিক্রম থাকিলেও, ইউরোপীয় পোষাকই চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর সাধারণ পোষাক ছিল, এখনও তাই আছে। কিন্তু মহেন্দ্রলাল গোড়া হইতেই নিজের জাতীয় পোষাকে অনুরক্ত ছিলেন। থান ধুতি, সাদা জামা ও সাদা চাদর এবং চটিজুতা—এই তাঁহার বেশভূষা ছিল। পোষাকে আড়ম্বর তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। বিদেশীর পোষাক পরিধান তিনি জাতীয়তার পরিপন্থী বলিয়াই মনে করিতেন। তাঁহার জীবনের অজস্র ঘটনা হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

মহেন্দ্রলাল ১৮৭০ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৩ অব্দে নব-নির্ম্মিত বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে যখন 'কনভোকেশন' হয়, তখন সাধারণ পোষাক ছাড়িয়া কিম্ভূতকিমাকার গাউন ইত্যাদি পরিতে অনিচ্ছুক থাকায়, তাহাতে যোগদান করেন নাই। এ-সম্বন্ধে তাঁহার ডায়েরীতে (১২ই মার্চ্চ ১৮৭৩) লিখিয়াছেন—

Convocation day of the Calcutta University at the new University building. Lord Northbrook presides. No mind to attend. Can't put on fantastic dress.

"নবনির্ম্মিত বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনের দিন। লর্ড নর্থব্রুক সভাপতিত্ব করিবেন। যোগ দিতে ইচ্ছা নাই। কিম্ভূতকিমাকার পোষাক পরিতে পারি না।"

1875 31 Days 10 WEDNESDAY March

Honored the Lt Governor with my company on board the [illegible] in the afternoon! This is the first time I appeared before our Governor, having all along resisted the temptation of being a great man of that description on the ground of dress. I put on trousers and Chapkan & a pagri & thus my resolution of years — of a whole life time — broke down at last and I have lost my caste as it were. It appeared from the conversation we had with the Lt Governor that I could appear with my ordinary dress, even with my slippers. What an opportunity I have thus lost, at the importunity of friends, of passing my [illegible] dress. Kristo Das rebuked me much for changing my dress

ডাক্তার সরকারের ডায়েরির এক পৃষ্ঠা

পর বৎসরেও তিনি ঐ কারণে 'কনভোকেশনে' যোগদান করেন নাই। তাঁহার ডায়েরীতে (২০শে মার্চ্চ ১৮৭৪) লিখিত রহিয়াছে—

To-morrow is the Convocation of the Senate of the Calcutta University. Vice-Chancellor E. C. Bayley will preside. Sent a copy of my pamphlet on the Science Association with a letter to Mr. Bayley.

"আগামী কল্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের কনভোকেশন। ভাইস-চান্সেলর ই.সি.বেলি সভাপতিত্ব করিবেন। সায়েন্স এসোসিয়েশন সম্বন্ধে আমার লিখিত পুস্তিকা একখণ্ড ও একখানি পত্র মিষ্টার বেলির নিকট পাঠাইয়াছি।"

তিনি যে কনভোকেশনে যান নাই, তাহা পরের তারিখেই ডায়েরীতে লেখা আছে।

মহেন্দ্রলাল ১৮৬০ অব্দে এল-এম-এস পাস করিয়াই চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৬৩ অব্দে এম-ডি পাস করায় তাঁহার খ্যাতি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তিনি ১৮৭৫ অব্দের পূর্ব্বে কখনও ধুতিচাদর পরিত্যাগ করিয়া অন্য পোষাক পরিধান করেন নাই, ছোট লাটসাহেবের একটি পার্টিতে যোগদান করিতে, ১৮৭৫ অব্দে ১০ই মার্চ্চ তারিখে নিজের সাধারণ পোষাক পরিত্যাগ করিয়া মহেন্দ্রলাল সর্ব্বপ্রথম পায়জামা ও চাপকান পরিধান করেন। এজন্য তিনি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। মহেন্দ্রলাল তাঁহার এই প্রথম বেশপরিবর্ত্তনের বিবরণটি কৌতুকের সহিত আরম্ভ করিয়া অনুশোচনায় শেষ করিয়াছেন। তিনি ডায়েরীতে (১০ই মার্চ্চ ১৮৭৫) লিখিয়াছেন—

Honored the Lt.-Governor with my company on board the Rhotas in the afternoon ! This is the first time I appeared before our Governor, having all along resisted the temptation of becoming a great man of that description on the ground of dress. I put on trousers and chapkan & a pagri & thus my resolution of years—of a whole lifetime broke down at last and I have lost my caste as it were. It appeared from the conversation we had with the Lt.-Governor that I could appear with my ordinary dress, even with my slippers. What an opportunity. I have thus lost, at the importunity of friends, of passing my simple dress. Kristo Dass rebuked me much for changing my dress.

"অপরাহ্ণে 'রোটাসে'র" উপর আমার সঙ্গদান করিয়া ছোটলাট সাহেবকে সম্মানিত করিয়াছি! পোষাক-পরিচ্ছদের কারণেই তথাকথিত বড়লোক হওয়ার প্রলোভন এতদিন সম্বরণ করিয়া, আমাদের লাটসাহেবের সম্মুখে আমি এই প্রথম উপস্থিত হইয়াছি। আমি পায়জামা, চাপকান ও একটি পাগড়ী পরিয়া, আমার বহু বৎসরের—জীবনব্যাপী দৃঢ়তা পরিশেষে ভঙ্গ করিয়াছি এবং মনে হইতেছে আমি যেন জাতিচ্যুত হইয়াছি। ছোটলাট সাহেবের সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি সাধারণ পোষাকে, এমন কি চটি জুতা পরিয়াও হাজির হইতে পারি। কতদূর সুযোগ। বন্ধুবান্ধবদের আগ্রহাতিশয্যে আমার সাদাসিদা পোষাক পরিবর্ত্তনে, এইরূপে আমার পরাজয় ঘটিল। আমার পোষাক পরিবর্ত্তনের জন্য কৃষ্ণদাস† আমায় বিশেষ ভর্ৎসনা করিয়াছেন।*

উপরি উক্ত লেখা হইতেই ডাক্তার সরকারের মনের ভাব স্পষ্ট বুঝা যায়।

পরে মহেন্দ্রলালকে কর্ত্তব্যসাধনের জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্থলবিশেষে পায়জামা ও চোগা-চাপকান পরিধান করিতে হইয়াছে। তিনি ১৮৭৭ অব্দে কলিকাতার অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং জীবনের প্রায় শেষ সময় পর্য্যন্ত অতি নিষ্ঠার সহিত বিচারকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। মহেন্দ্রলাল ১৮৮৭ অব্দে প্রথম বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৩ অব্দে চতুর্থ বার পুনর্নির্ব্বাচিত হওয়ার পর ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। বিচার-বিভাগে ও ব্যবস্থাপক সভা

স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, এম-ডি, ডি-এল, সি-আই-ই

প্রভৃতির কার্য্যে তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু কখনও স্বার্থসিদ্ধি বা অর্থলোভে নিজ জাতীয়তা বলি দিতে স্বীকৃত হন নাই। এ-বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

তখনকার দিনে অবস্থাপন্ন লোকেরা অনেক সময় বাৎসরিক বৃত্তি দিয়া পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করিতেন। দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় শ্রেণীর মধ্যেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ভারত-গভর্ণমেণ্টের তাৎকালিক এক জন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী পারিবারিক চিকিৎসক রূপে ডাক্তার সরকারকে নিযুক্ত করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি যে উপযুক্ত বৃত্তি দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে মহেন্দ্রলাল কার্য্যগ্রহণে সম্মত ছিলেন। সাহেবের এক জন প্রতিনিধি আসিয়া মহেন্দ্রলালকে অনুরোধ জানান যে, ডাক্তার যেন ধুতির পরিবর্ত্তে ইজার পরিয়া তাঁহার আবাসে গমন করেন। মহেন্দ্র

* "রোটাস"—রোটাস ষ্টীমার। ছোটলাট—সার রিচার্ড টেম্পল।
† কৃষ্ণদাস—সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস পাল।

এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মুখের উপর উত্তর দেন, "Not on those terms even if you give me Rupees twenty thousand a year"—"আমাকে বৎসরে বিশ হাজার টাকা দিলেও ঐ সর্ত্তে রাজি নহি।" বাঙালীর যাহা-কিছু জাতীয়তা অবশিষ্ট রহিয়াছে ধুতি চাদরে। যেদিন বাঙালী ধুতিচাদর পরিত্যাগ করিবে, সেদিন বাঙালীর জাতীয়তাও অন্তর্হিত হইবে। ডাক্তার সরকারের অনুমান বোধ হয় এইরূপ ছিল।

বাঙালীত্বের পরিচায়ক সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে আসক্তিই বাঙালীর স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতিপ্রীতি। মহেন্দ্রলাল নিজ জীবনে জাতীয়তা রক্ষা করিবার যেটুকু অবসর পাইয়াছিলেন, তাহা অতি সম্মানসহকারে ও প্রাণপণ যত্নে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

মহিলা-সংবাদ

গত ২রা জুন শ্রীমতী প্রকৃতি দেবী পরলোকগমন করিয়াছেন। চিত্রশিল্প, গালার কাজ, জেসো পেন্টিং, সূচীশিল্প, মীনার কাজ, চামড়ার উপর অলঙ্করণ শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা

শ্রীমতী প্রকৃতি দেবী

অর্জ্জন করিয়াছিলেন। 'প্রবাসী' ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ পত্রিকায় তাঁহার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল-সমিতি, রাজবালা-নারী-মঙ্গল সমিতি, নারী-শিক্ষা-সমিতি প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। শ্রীমতী প্রকৃতি দেবী আইন-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মহীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী।

কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে করাচীর নাট্য ও সাহিত্য সমিতি প্রতিবৎসর নৃত্য গীত ও আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এবারকার উৎসবের সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী বিশিনী জাগাসিয়া উচ্চস্থান অধিকার করিয়া একটি কাপ লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী জাগাসিয়ার বয়স মাত্র বার বৎসর।
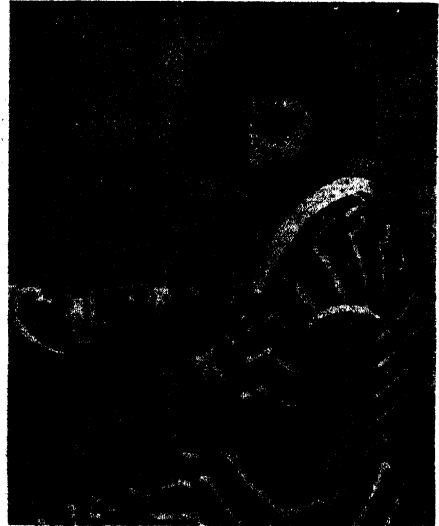
শ্রীমতী বিশিনী জাগাসিয়া

খুলনার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামের পানীয় জলের জন্য রক্ষিত জলাশয়টি আগাছায় পূর্ণ হওয়ায় লোকের অব্যবহার্য্য হইয়াছিল। লোকাল বোর্ডে আবেদন করা সত্ত্বেও ইহার আগাছা তুলিয়া লওয়া হয় নাই। উক্ত গ্রামের প্রায় চল্লিশ জন মহিলা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুষ্করিণীর আগাছা পরিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের নমস্য।

যশোহরের স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী ডাক্তার সুবোধচন্দ্র সেনের পত্নী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী সেন যশোহর মিউনিসিপালিটীর

সেনহাটীর মহিলা-সমিতির সভ্যেরা পুকুর পরিষ্কার করিতেছেন

এক জন কমিশনার মনোনীত হইয়াছেন। গবর্ন্মেণ্টের এই মনোনয়ন উত্তম হইয়াছে। সাধারণ নির্ব্বাচনে তথাকার উকীল মৌলবী আবদুস্ সালামের পত্নী শ্রীমতী আমিনা খাতুন এক জন কমিশনার নির্ব্বাচিত হন। এখন আর এক জন মহিলা কমিশনার হওয়ায় উভয়ে মিলিয়া অনেক ভাল কাজ করিতে পারিবেন। শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী সেন দুই বৎসরের জন্য যশোহর জেলের বেসরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বাড়িতে পড়িয়া এ-বৎসর আই-এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার দুটি কন্যা আছে। বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর।

দিল্লীর ডাক্তার জ্ঞানদাকান্ত সেন মহাশয়ের দৌহিত্রী শ্রীমতী কল্যাণী দেবী আই-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার পর বিবাহিতা হন। তাহার পরও তিনি কিন্তু বিদ্যার্জ্জন ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি এই বৎসর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং উত্তীর্ণ ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয়া হইয়াছেন। প্রথম বিভাগে কেহ উত্তীর্ণ হন নাই।

বিলাত-প্রবাসিনী রামপুরের নবাবের বেগম সাহেবা। ইঁহার বিষয় বিবিধ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

বহির্জগৎ

জার্ম্মানীর নাৎসি-দলে অন্তর্বিপ্লব

হিট্‌লার একদা দম্ভ করে বলেছিলেন যে নাৎসি-রাষ্ট্র এক হাজার বছর স্থায়ী হবে। কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস, গত ৩০এ জুন রাত্রি দুটোর সময় তাঁকে ওয়েষ্টফ্যালিয়ার এক লেবার ক্যাম্প থেকে ছুটে যেতে হয় নাৎসিদের প্রধান আড্ডা মুনিকে তাঁর ক্ষমতা নষ্ট করবার জন্য ষড়যন্ত্র দমন করতে। দৈনিক খবরের কাগজ-

ডক্টর পল গোয়েবলস্‌

গুলিতে হিটলারের এই নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের বীভৎস লীলার কথা অনেকেই পড়েছেন। এই ষড়যন্ত্রের পিছনে কি কারণ বর্ত্তমান সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন।

যাঁরা জার্ম্মানীর আভ্যন্তরিক অবস্থা অনুধাবন করেছেন তাঁরা এইরূপ গোলমালের সম্ভাবনা আশা করছিলেন। হিট্‌লার-পাপেন-হুগেনবুর্গ মন্ত্রিমণ্ডলে এত ভিন্ন প্রকার মতামত সন্নিবিষ্ট হয়েছিল যে, ইহা ভেঙে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। গত বৎসর জুন মাসে হুগেনবুর্গ বিদায় নেন। এবার পাপেনের ও আরও অনেকের পালা। গত জুনের শেষাশেষি ভাইস-চানসেলার ফন্‌ পাপেন মারবুর্গে এক জোর বক্তৃতায় নাৎসি উগ্রপন্থীদের সমালোচনা করেন। বলা বাহুল্য, ডক্টর পল গোয়েবলস্‌ এই বক্তৃতা প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা দেন। শুধু তাই নয়, পাপেন কোনও ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্ট কি না তাহারও অনুসন্ধান লওয়া হয়। এতে বোঝা যায়, হিট্‌লার ও তাঁর অনুচরেরা নিজেদের বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছিলেন। তারপর ৩০এ জুন হিট্‌লার ঝটিকা-বাহিনীর নায়ক ক্যাপ্টেন রোয়েমের শয়নকক্ষে হানা দেন। রোয়েম তাঁর নিজস্ব কর্ম্মচারীবৃন্দ সমেত ধৃত হন। সেই সময়েই জার্ম্মানীর ভূতপূর্ব্ব চান্‌সেলার জেনারাল কুর্ট ফন্‌ স্লাইখার সপত্নীক নিহত হন এবং বার্লিন ও ড্রেসডেনে ঝটিকা-বাহিনীর অন্যান্য অনেক নেতা গ্রেপ্তার হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হের হাইনেস ও হের আর্নষ্ট (দুইজনই তাঁদের দলপতি) এবং হের গ্রেগর ষ্ট্রাসের। এঁরা সকলেই পরে নিহত

হিটলার, হিণ্ডেনবুর্গ ও গোয়েরিং

গোয়েরিং
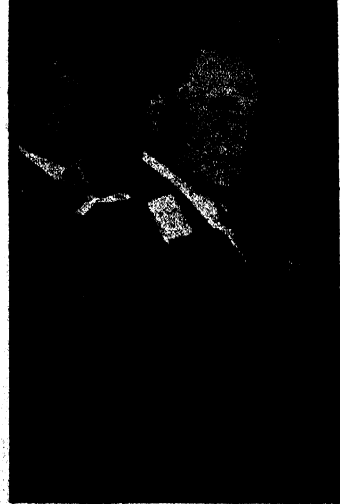
শোভাযাত্রায় হিট্‌লার, গোয়েরিং. রোয়েম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

হয়েছেন। এই ঘটনায় মোট দুই শত সাতাশ জনের প্রাণ গেছে। জার্ম্মানী তথা জগত এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডে স্তম্ভিত হয়েছে।

এই ঘটনার সম্যক আলোচনা করতে হলে নাৎসি আন্দোলনের কথা বলতে হয়। নাৎসি আন্দোলন গত যুদ্ধের একটি বিশেষ ফল। যারা যুদ্ধে সাধারণ সেনানীরূপে প্রাণ দিয়েছিল ও ট্রেঞ্চে যাদের অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল তাদের এই দুঃখ-ভোগের জন্য দায়ী ছিলেন জার্ম্মানীর বৃহৎ কারখানাওয়ালারা—যারা অতি লাভের আশায় দেশের অনেক অনিষ্ট সাধন করেছিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন ইহুদীসম্প্রদায় ভুক্ত। নাৎসি আন্দোলনের জন্ম হয় এই ধনী সম্প্রদায়কে অবস্থাচ্যুত করবার জন্য ও জার্ম্মানীর জাতীয় গৌরব ফিরিয়ে আনবার জন্য। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের মধ্যে ছিল দুটি জিনিষ—প্রথম, ভ্রাতৃভাব; দ্বিতীয়, নিয়মানুগত্য—যাহা নেতৃত্বের প্রধান অবলম্বন। নাৎসিদের মধ্যেও প্রধান লক্ষ্য করবার জিনিষ এই দুটি। হিট্‌লার উন্নতির পথে চলতে গিয়ে নেতৃত্বের (যা তাঁর কাছে শুধু ব্যক্তিগত অনুশাসন নয়, প্রভুত্বও) মূল অবলম্বনটি খুব ভাল ক'রে মনে রেখেছেন, কিন্তু যে-কথাটি সাম্যনীতিমূলক তা ক্রমশঃ ভুলতে বসেছেন। অবশ্য এর কারণ আছে। নাৎসি দল গড়ে তুলবার জন্য এ পর্য্যন্ত অনেক টাকার দরকার হয়েছে, আর সে ব্যয়ভার বহন করেছেন প্রধানতঃ ধনী কলকারখানাওয়ালারা। মার্কসপন্থীদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে অনেক মধ্যবিত্ত লোককে দলভুক্ত করতে হয়েছে। ফলে নাৎসিদের ভিতরে দুই দলের সৃষ্টি হয়েছে। একটি জাতীয় সোসায়ালিষ্ট কর্ম্মিসংঘ (National Socialist Workers' Party of Germany); ইহারা সমাজতন্ত্রের মতবাদগুলির উপর বেশী জোর দেয়, অন্যদল এইগুলি অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। তবুও এই নিয়ে হিট্‌লার শাসনকর্ত্তা হবার পর খুব বেশী বিরোধের সৃষ্টি হয়নি, কারণ নাৎসি দলের কার্য্যক্রম অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু হিটলার ১৯৩৩, ৩০এ জানুয়ারী হুগেনবুর্গ ও পাপেন প্রমুখ মজুরবিদ্বেষী লোকদের
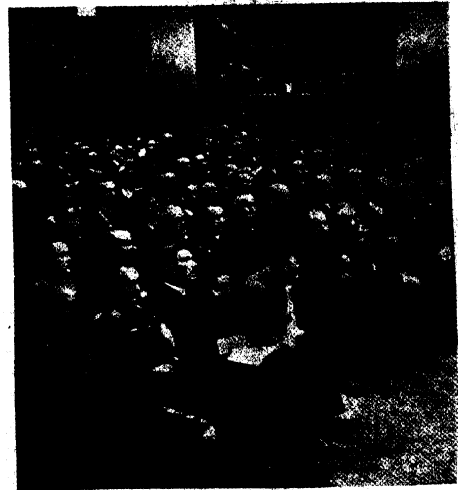
বিসর্জ্জন সভায় নাৎসি-দলের নেতৃবৃন্দ। হিট্‌লার, পাপেন, গোয়েরিং, ডক্টর ফ্রিক প্রভৃতি সম্মুখে উপবিষ্ট

নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করা অবধি নাৎসিদলভুক্ত সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর তাল রেখে চলা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আসলে তখন থেকে হিট্‌লার প্রকৃতপক্ষে দোটানায় পড়েছেন। একদিকে, থাইসেন প্রমুখ ধনীদের কাছে তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ টাকা নিয়ে, এবং হিণ্ডেনবুর্গ ও পাপেন প্রভৃতির সংসর্গে পড়ে তাঁর কার্য্যের স্বাধীনতা খর্ব্বিত, অপর দিকে বিশাল ঝটিকা-বাহিনীর উৎসাহ-উদ্দীপনায় বাধা দিতে নারাজ। এখানে বলা দরকার, ঝটিকা-বাহিনীর যাঁরা কর্ণধার তাঁরা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য-শিক্ষিত, নয় মজুরদল হইতে উদ্ভূত। এই ঝটিকা-বাহিনীর উৎসাহে হিট্‌লার মাঝে মাঝে অবশ্য বাধা দিয়ে এসেছেন, এবং এজন্য ইহাদের ভিতরে প্রভূত ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন অল্পদিন আগে তারা খবর পেল যে, হিট্‌লার ফ্রান্সের সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার মীমাংসা করতে গিয়ে তাদের দল ভেঙে ফেলতে স্বীকার করেছেন তখন অসন্তোষ চেপে রাখা শক্ত হ'ল, কাজেই ষড়যন্ত্র সুরু হ'ল হিট্‌লারের অপ্রতিহত ক্ষমতা নাশ করবার জন্যে। ফন্ শ্লাইসার একজন জবরদস্ত লোক। সেনানীমণ্ডলে এর প্রভূত প্রভাব। নাৎসি ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁর সাহায্য নেন। এমন কি শোনা যাচ্ছে একটি বিদেশী শক্তির সঙ্গেও

ডক্টর গোয়েবলস্ বক্তৃতা করিতেছেন

এই ষড়যন্ত্রকারী দলের যোগসাধন হয়েছিল। যা হোক, হিট্‌লার খুব জোর করেই বিদ্রোহ দমন করেছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক পুরাতন শত্রু নাশ করেছেন; যথা, হের কার—যিনি ব্যাভেরিয়ার প্রধান মন্ত্রীরূপে ১৯২৩ সনে হিট্‌লারের প্রথম উদ্যম দমন করেন; গ্রেগর ষ্ট্রাসের—যিনি ১৯৩২ সালের শেষে শ্লাইশারের সঙ্গে সন্ধি ক'রে হিট্‌লারকে অতিক্রম করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন, ফন্ পাপেনও এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তা ভুল বলেই মনে হয়। তাঁর মারবুর্গের বক্তৃতা তাঁর পুরাতন মতবাদেরই পরিচয় দেয়, তার মধ্যে হিট্‌লারের বিরুদ্ধে কোন আক্রোশ ছিল না। সে যা হোক, হিট্‌লার ব্যক্তিগত ঋণ মনে রেখেই হোক বা হিণ্ডেনবুর্গের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েই হোক তাঁকে প্রাণে মারেন নি। পাপেন অপমানিত হয়ে আর মন্ত্রিসভায় থাকবেন না বলেই মনে হয়।

এই ব্যাপারের এইখানেই যবনিকাপাত হ'ল মনে করা ভুল হবে। লণ্ডন ডেলি টেলিগ্রাফের বার্লিনস্থ প্রতিনিধি বলেছেন তিনি ঝটিকা-

জার্ম্মান জাতীয়তাবাদীদের সভার উদ্বোধন।
হিট্‌লার সভার উদ্বোধন করিতেছেন
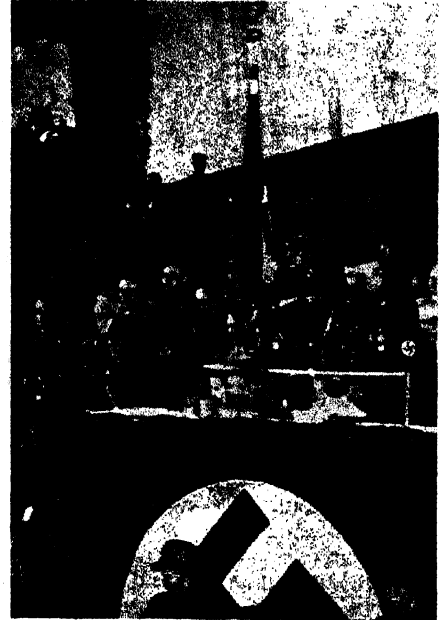
বাহিনী বৈপ্লবিক কমিটি দ্বারা প্রকাশিত এক অবৈধ কাগজ দেখেছেন। তাতে এই মর্ম্মে লিখিত হয়েছে, "আমাদের নেতারা হত হ'লেও বিপ্লবের কার্য্য পুরাদমে চলছে। মৃত নেতারা ঝটিকা-বাহিনীর আদর্শ সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। হিট্‌লার শ্রমিকধ্বংসকারী ধনিকদের ক্রীড়নক হয়ে পড়েছেন।"

ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে বলা কঠিন। ডক্টর গোয়েবলস্ বলেছেন—অন্তর্বিপ্লব পুরাপুরি দমিত হয়েছে। রয়টারের সংবাদদাতা কিন্তু বলেন,—বাহির হ'তে জার্ম্মানীর অবস্থা খুবই শান্ত বলে বোধ হবে, কিন্তু জনসাধারণের মনে একটা অস্বস্তির হাওয়া বইছে। এর প্রধান কারণ—ঝটিকা-বাহিনীর তিন লক্ষ সশস্ত্র সেনানীর ভেতরে অন্ততঃ আধাআধিও এক মাসের ছুটির পরে সৈন্য দলে ফিরে যাবে না।

এরা যদি পূর্ণোদ্যমে হিট্‌লারের ক্ষমতা নষ্ট করবার চেষ্টা করে? ষ্টাল হেল্‌ম দলের (অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ও অন্য কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত) অনেকেই এই আন্দোলনে যোগদান করবে, আর কম্যুনিষ্ট ও সোশ্যালিষ্টরা

কি এ সুযোগ অগ্রাহ্য করবে? হিট্‌লারের পেছনে তাঁর ব্ল্যাক শার্টস দল ও জার্ম্মান সেনাদল আছে। এখানে প্রশ্ন শুধু এই যে, সমগ্র জার্ম্মানীতে দেড় বছরের এই অমানুষিক অত্যাচারের পরও কি কারও হিট্‌লারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি আছে? তবে আব্রাহাম লিঙ্কনের কথাও কেউ অস্বীকার করবে না যে "Public sentin ont is cvorything. With public senti- mont, nothing can fail. Without it, nothing can succeed." অর্থাৎ জনসাধারণের আন্তরিক ইচ্ছায় সকল কার্য্য সাধিত হয়ে থাকে। সাধারণের ইচ্ছায় সকলই সফল হয়, বিনা ইচ্ছায় সকলই বিফল হয়।

শ্রীকরুণা মিত্র

—

কৃষি-বিপ্লব

কৃষি ও কৃষকের দুর্দ্দশা এখন জগদ্ব্যাপ্ত। আমাদের দেশে পাট ও ধানের দর কি রকম নেমে গিয়েছে সেকথা সকলেই জানেন, কেননা তার ফল এই কৃষিপ্রধান দেশের প্রত্যেক লোকেরই ভোগ করতে হচ্ছে। এ অবস্থা এখন সকল দেশেরই। তবে অন্য দেশে প্রতিকারের প্রবল চেষ্টা চলেছে, এদেশে মুখের কথায় এবং হা-হুতাশে যতটা হয়, তাই হচ্ছে!

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গম এবং কার্পাস চাষীর প্রধান আয়কর ফসল। গমের অবস্থা প্রায় তিন-চার বৎসর যাবৎ অত্যন্তই সঙ্গীন হ'য়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র ক্যান্সাস প্রদেশেই প্রায় কুড়ি কোটি মণ গম জন্মায়। এই ফসলের বোনা ও কাটার জন্য ১৯৩১ সালেই ২৮,০০০ হার্ভেষ্টার যন্ত্র এবং ৬০,০০০ ট্র্যাক্টার মোটর ব্যবহার করা হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিবিভ্রাট। ৪০০০ মণ গম চাহিদার অভাবে মাঠে ফেলে দেওয়া হয়েছে

ওদেশে চাষীর ক্ষেত বিশাল, অর্থবলও বেশী, সেইজন্য লাঙ্গল চালান থেকে ফসল কাটা পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি পদেই যন্ত্রের ব্যবহার চলে। কিন্তু এই বিরাট আয়োজন বৃথা হয়ে গেছে চাহিদার অভাবে, কেননা গমের দামে চাষের খরচ পোষায় না। ফলে সে দেশে মানুষের খাদ্য-শস্য দিয়ে শূকরকে খাওয়ান চলেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে গম মাঠের মধ্যে ঢেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ হিসাবে যুক্তরাজ্যের গমের ফসল ৭৫ কোটি মণের

ফিলিপাইন দ্বীপে পাহাড়ের গায়ে ধানের ক্ষেত

কাছাকাছি দাঁড়াত। নূতন যন্ত্রপাতি এবং নূতন জমির আবাদের ফলে সেই ফসল ৯০ কোটি মণের উপর চলে গিয়েছে। এদিকে পৃথিবীর যে-সব দেশে যথেষ্ট শস্য জন্মায় না, সেই দেশগুলিতে বাণিজ্যের ঘাটতির ফলে অর্থাভাব হয়েছে। কাজেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, রুষ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ইত্যাদি গম রপ্তানিকারক দেশে খরিদ্দার ও চাহিদার অভাব চলেছে।

কার্পাসের ব্যাপারও একই প্রকার। ফসল ১ কোটি ২০ লক্ষ গাঁট

থেকে বেড়ে ১ কোটি ৬০ লক্ষ গাঁট পার হয়ে গেছে (১৯৩১)। ফলে দাম ক্রমে নেমে গিয়ে ১৯০৫ সালের দামের কাছে (৬.৭৫ সেণ্ট প্রতি পাউণ্ড) গিয়েছে।

আমাদের দেশে, পাট, গম, চাউল, চা, তৈলবীজ, এসকলেই বিদেশের অর্থাভাবের ছায়া পড়েছে। এই ফসলগুলির মধ্যে একমাত্র চা বোধ হয় অতিমাত্রায় জম্মান হচ্ছে। অন্যগুলিতে বিদেশের চাহিদার অভাব চলেছে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নূতন প্রথায় যন্ত্র সাহায্যে গম কাটা

মালয় দেশের রবার, জাভার ইক্ষু ও চা, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে গম ও তিসি--সবই এইরকমে চাহিদার অভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রতিকারের জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত রাষ্ট্রশক্তিই কেনা-বেচার পিছনে দাঁড়িয়েছে. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমে রাষ্ট্রের তরফ থেকে অতিরিক্ত ফসল নির্দ্দিষ্ট দামে কেনার ব্যবস্থা হয় এবং সেই ফসল বিদেশে বেচার ব্যবস্থাও হয়। কিন্তু ইহার ফলে চাষীর উপকার ক্ষণিকমাত্র হয়েছিল। কেননা একটা ফসল রাষ্ট্রকে বেচে কিছু লাভ করে পরের ফসল বেচার সময় রাষ্ট্রই প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং ফসলের পরিমাণ আগে থেকে নির্দ্দেশ ক'রে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। কিন্তু নির্দ্দেশ করা এক কথা এবং অসংখ্য চাষীকে সে-নির্দ্দেশ মানিয়ে লওয়ান আর এক কথা। কার্য্যতঃ ওদেশের কৃষিসমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই।
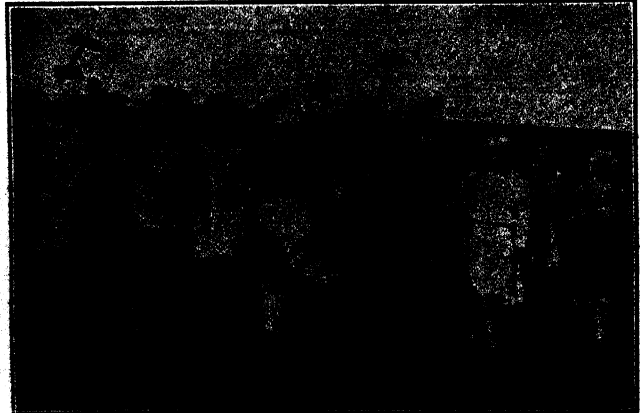
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র। "নূতন" চাষীর দল মাঠে চলেছে

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ঐ ব্যবস্থাই হয়েছে, এবং সেখানে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশী। কেননা এখন ওখানে আবাদ করা জমি প্রায় সমস্তই

ব্যক্তিগত অধিকারচ্যুত হয়ে রাষ্ট্র-অধিকারভুক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাষ্ট্রের জমি রাষ্ট্রের নির্দ্দেশমত চাষ করা হচ্ছে; ফসলও রাষ্ট্রেরই অধিকারে, কাজেই কেনাবেচাও রাষ্ট্রই করছে। এই ব্যবস্থার ফলে চাষী এখন পেটভাতা হিসাবেই খাটছে। তবে তার যেমন নিজস্ব বল্‌তেও

জাপানে ধান কাটা

বিশেষ **কিছুই থাকছে না**, তেমনি ধার বলতেও কিছুই নাই বলা চলে। এবং **আধুনিক** জগতের যে-প্রকার অবস্থা তাতে সোভিয়েটের

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র। যন্ত্রে গম আছড়িয়ে ছাড়ান (নূতন প্রথা)

রাষ্ট্র-অধিকারবদ্ধ চাষীকেই সুখী বল্‌তে হবে—কেননা এখন কৃষক শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছে ঋণক্লিষ্ট ব্যক্তি।

সোভিয়েটের এই নূতন ব্যবস্থায় চাষেরও সুব্যবস্থা হয়েছে। ১৯২৮ সালের পূর্ব্বে ওখানকার সমস্ত জমিই এদেশের মত ছোট ছোট অংশে প্রজাস্বত্বভুক্ত ছিল। কুড়ি-পঁচিশ থেকে আশী-নব্বই বিঘা প্রমাণের ছোটবড় ক্ষেতেই সমস্ত দেশের ফসল জন্মাত। ভূতপূর্ব্ব রুষ সাম্রাজ্যের আমলের বিরাট জমিদারী সবই কৃষাণদের ভূমি-তৃষ্ণার ফলে টুকরা টুকরা করে বিলি হয়ে গিয়েছিল। এইরকম খণ্ড খণ্ড আলবাঁধা জমিতে না চলে নূতন প্রথায় যন্ত্রে চাষ, না হয় যথাযথ ভাবে উপযুক্ত ফসল জন্মান। সুতরাং চাষী নিজের ইচ্ছা ও বিচার মত ভালমন্দ সব জমিতেই আয়কর ফসলের চেষ্টা দেখত এবং শস্যের দাম খরচ-পোষান না হ'লে ক্ষতিগ্রস্ত বা ঋণগ্রস্ত

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র। কৃষকের কাজে উটের ব্যবহার

হয়ে পড়ত। চাষও হ'ত ঘোড়া, বলদ, বা উটের সাহায্যে, নিড়ান ও কাটা হ'ত হাতে। এই কারণে যথাসময়ে ফলন ও সংগ্রহ না হওয়াতেও ক্ষতি হ'ত।

এখন পঞ্চাশ-ষাট হাজার হতে ছয়-সাত লক্ষ বিঘা প্রমাণ

জাপান। শাকসব্জীর ক্ষেত

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র। ঘোড়ার দ্বারা চাষ।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের উজবেকিস্তানে কার্পাসের ফসল তোলা
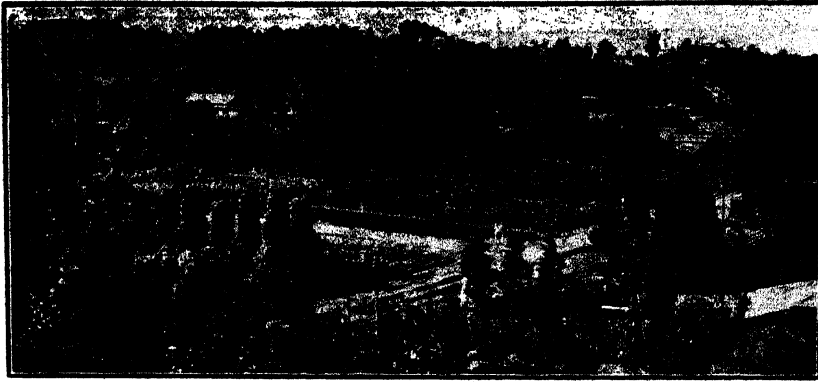
জাপান। শাকসব্জীর ক্ষেত।

এক একটি বিশাল ক্ষেতে, হাজার হাজার ট্র্যাক্টার, হার্ভেষ্টার ইত্যাদি যন্ত্রে (সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দু-লক্ষ ট্র্যাক্টার এই কাজে এখন নিযুক্ত) চাষ, নিড়ান ও কাটা ইত্যাদি চলেছে। যে-জমিতে যে-ফসলের যতটা জন্মালে লাভ হওয়া সম্ভব তাই হচ্ছে। কৃষকও এখন অন্ততঃপক্ষে ঋণের ভাবনা থেকে মুক্ত।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই ব্যাপারের প্রতিকারের প্রধান চেষ্টা চলেছে "পরস্পরের কাপড় কাচা" প্রথায়। অর্থাৎ সাম্রাজ্যের কৃষিপ্রধান অংশগুলি যাতে বাণিজ্যপ্রধান অংশগুলি থেকেই পণ্যদ্রব্য নেয় এবং বিনিময়ে শস্য দেয় এইরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করে বিদেশীর প্রতিযোগিতা ব্যর্থ করার চেষ্টা চলেছে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে যা সামান্য কৃষিকার্য্য চলে, তাকে বাঁচিয়ে রাখাও বিশেষ দরকার, কেননা যুদ্ধ, অবরোধ ইত্যাদিতে ঘরের ফসলই একমাত্র সহায়। সুতরাং সেখানকার কৃষকদের প্রধান খাদ্য ফসলের জন্য নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে ''বোনাস'' দেওয়াও হচ্ছে।

বিনা যন্ত্রে প্রাচীন প্রথায় চাষ আধুনিক দেশ সকলের মধ্যে একমাত্র জাপানেই ভাল চলেছে। তাহার কারণ জাপানী কৃষকের অসাধারণ নৈপুণ্য এবং পরিশ্রমের ক্ষমতা। পণ্য উৎপাদনে জাপানী কলকারখানা যেরূপ দক্ষ, চাষে ওখানকার কৃষকও সেইরূপ হিসাবী ও কুশলী। বস্তুতঃ জাপানী চাষী ঐ অনুর্ব্বর দেশে যেটুকু উর্ব্বর জমি আছে তার কাছ থেকে শেষ ছটাক পর্য্যন্ত শস্য ও শাকসব্জী আদায় ক'রে স্বদেশকে খাদ্যশস্যের বিষয়ে অনেকটা স্বাধীন করে রেখেছে।

আমাদের এ-দেশের ব্যবস্থার কথা? এখন পর্য্যন্ত প্রধানতঃ কথা-মাত্রই হয়ে আছে।

—

কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি

কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় সম্প্রতি পরলোক-গমন করিয়াছেন। তাঁহার মহিমময় জীবনের কার্য্যাবলীর আলোচনা 'বিবিধ প্রসঙ্গে' দ্রষ্টব্য।

পরলোকগত কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি

বাংলা

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চত্বারিংশ-বার্ষিক অধিবেশন—

গত ১৬ই আষাঢ়, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০ টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁহার অভিভাষণে বঙ্গভাষায় শব্দ-দৈন্যের কথা উল্লেখ পূর্ব্বক অধুনা অপ্রচলিত প্রাচীন বাংলা পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের বিষয়ে পরিষৎকে উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করেন। তৎপরে তিনি স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের তৈলচিত্র, স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র, এবং স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র প্রতিষ্ঠা করেন, এবং চিত্র-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ইহার পর বিজ্ঞাপিত হয় যে, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় প্রত্যেকে ২৫০৲ দান করিয়া পরিষদের আজীবন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নিম্নোক্ত সদস্যগণ একচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

সভাপতি—আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়

সহকারী সভাপতিগণ (কলিকাতার পক্ষে)—১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি,* ৩। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ৪। রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর। (মফঃস্বলের পক্ষে)—১। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ৩। স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু।

সহকারী সম্পাদকগণ—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত।

পত্রিকাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা।

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ।

আয়ব্যয়-পরীক্ষকগণ—শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু ও শ্রীযুক্ত দেবীবর ঘোষ।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

লীগ-খেলায় মুসলমানদের জয়লাভ—

কলিকাতার ফুটবল খেলার ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে।

'মহমেডান স্পোর্টিং' দল এবার লীগ খেলায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহারা জয়লাভ করিয়া ভারতীয় দলের সম্মান বর্দ্ধিত করিয়াছেন; ইহাই ভারতীয় দলের প্রথম লীগ-বিজয়।

মহমেডান স্পোর্টিং দল

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের নূতন দোকান প্রতিষ্ঠা—

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী কলিকাতা চৌরঙ্গী রোডে ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের নূতন দোকান প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে নন্দী মহাশয় ইতিমধ্যেই সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। গহনা-শিল্পে বঙ্গদেশ এক সময় খুব উন্নত ছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নূতন নূতন পরিকল্পনা দ্বারা এই শিল্পের উন্নতি-সাধনে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। এজন্য তিনি বাঙালীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী ১৯২৪ সনে লণ্ডনের ব্রিটিশ এম্পায়ার প্রদর্শনীতে ও ১৯৩১ সনে প্যারিস আন্তর্জ্জাতিক ঔপনিবেশিক প্রদর্শনীতে তাঁহার ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের তৈরি গহনার নমুনা স্বয়ং প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার কার্য্যের উন্নতি কামনা করি।

মেয়র-পদে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার—

গত ৪ঠা জুলাই শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ১৯৩৪-৩৫ সনের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র-পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

---

* সম্প্রতি কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের পরলোকগমনে তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার
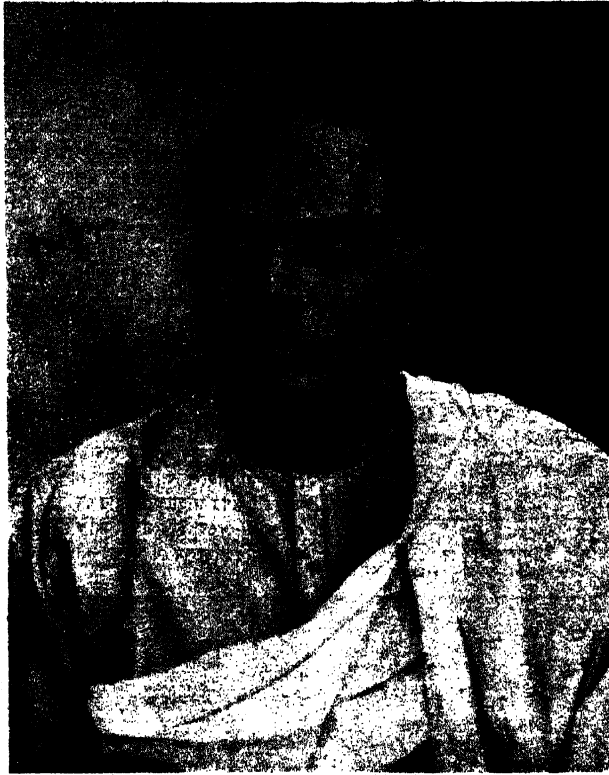
নির্ব্বাচন প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে হইয়া থাকে। এবারকার ব্যতিক্রমের কারণ, কর্পোরেশনের সদস্যদের মধ্যে মেয়র-নির্ব্বাচন সম্পর্কে ঘোরতর গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছিল। এক দলের ইচ্ছা, এবার একজন মুসলমান মেয়র পদে অধিষ্ঠিত হন। অপর দল শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারকেই মেয়র করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সে যাহা হউক, সর্ব্বশেষে সরকার-মহাশয়ই এ-বৎসরের জন্য মেয়র নির্ব্বাচিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। সরকার-মহাশয় একজন কৃতী পুরুষ। অতি সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় কর্ম্মশক্তি বলে লক্ষপতি হইয়াছেন। বীমা-ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিয়া তিনি বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে নিখিল-ভারত ব্যবসায়-সমিতি-মণ্ডলীর (Indian Foderation of Chambers of Commorce) সভাপতি পদেও বৃত হইয়াছিলেন।

বাঙালী ভূপর্য্যটক—

বাঙালী সাইকেল ভূপর্য্যটক শ্রীযুক্ত রামনাথ বিশ্বাস ভূপর্য্যটনের উদ্দেশ্য ১৯৩১ সনের ৭ই জুলাই সিঙ্গাপুর হইতে রওয়ানা হইয়া যথাক্রমে মালয়, শ্যাম, ইন্দোচীন, চীন, কোরিয়া, ও জাপান যান। তথা হইতে কানাডায় যান। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যথেষ্ট অর্থ না থাকায় কানাডা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অবতরণ করিতে না দিয়া পুনরায় সাংহাই এ ফেরত পাঠান; এইরূপে তিনি সাংহাই হইতে ফিলিপাইন, বালী, জাভা ও সুমাত্রা হইয়া আবার সিঙ্গাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং সেখান হইতে বর্ম্মা হইয়া মণিপুর ও আসামের দুর্গম পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া বঙ্গদেশে উপনীত হইয়াছেন। রেঙ্গুন হইতে শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ দে নামক এক অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক এপর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গী হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস সর্ব্বশুদ্ধ এ পর্যান্ত প্রায় ত্রিশ সহস্র মাইল পর্য্যটন করিয়াছেন। এখান হইতে তিনি ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ইউরোপ যাইবেন, এবং সেখানে লণ্ডন হইতে আমেরিকা ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া বৎসর-তিনেকের মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

বিদেশ

দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড় দল—

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস ও শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে

ভারতবাসী এবং দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতবাসীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বজায় রাখিতে হইলে উভয়কেই উভয় দেশ দর্শন ও ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ তথ্য আহরণ করিয়া শিক্ষালাভ করা উচিত। বার-চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ-আফ্রিকার খেলোয়াড় দল ভারত দর্শন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভারতীয় খেলোয়াড় দল দক্ষিণ-আফ্রিকা যাত্রা করিয়া ৬ই জুন ডারবান বন্দরে উপনীত হন। সেইদিন প্রাতে বহু ভারতবাসী তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিবার জন্ম তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বন্দরের কর্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতেই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে দর্শকগণকে তীরে অবতরণ করিতে দিবার জন্য যে-সকল সাধারণ আইন-কানুন আছে, ভারতীয় খেলোয়াড় দলের উপর সেই সাধারণ নিয়ম প্রযুক্ত হইবে না। তদনুসারে তীরস্থিত ভারতবাসিগণ ভাবিয়াছিলেন যে, বোধ হয় এই বিশিষ্ট দর্শকদলকে তখনি অবতরণ করিতে দেওয়া হইবে। বন্দরের হেল্‌থ অফিসার আদেশ দিবা মাত্রই তীরস্থিত ইউরোপীয়গণ তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত জাহাজের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু ভারতীয়গণ 'রিলিজ অর্ডার' (Release order) পাইলেন না, তাঁহারা তীরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; 'পাশ' না পাইলে অতিথি-অভ্যাগতগণকে আপ্যায়িত করিবার জন্য ভারতীয়গণের জাহাজে উঠিবার কোনও অধিকার নাই। এই পাশ দেওয়া-না-দেওয়া ইমিগ্রেশুন অফিসারের উপর নির্ভর করে। সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে 'দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় ফুটবল সমিতি'র

দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড় দল

অন্ততঃ বিশিষ্ট কয়েক জন সভ্যকে জাহাজে অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উঠিতে দেওয়া হইবে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারত সরকারের এজেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ বজমানকে জাহাজের দিকে গমন করিতে দেখিয়া সকলে ক্ষণিকের জন্য উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন—কিন্তু শীঘ্র তাঁহাদের সে ভাব দূরীভূত হইল। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় উদ্বিগ্ন চিত্তে তীরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইউরোপীয়ানগণ ধীরে ধীরে জাহাজ হইতে নামিয়া গেলেন; তখন ভারতীয় ও দেশীয় মজুরগণকে জাহাজে যাইতে দেওয়া হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মিঃ এ, ক্রিষ্টোফার (দক্ষিণ আফ্রিকার ফুটবল ক্লাবের সভাপতি), মিঃ ফকির ইস্মাইল (অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি), মিঃ সিং (ক্লাবের ম্যানেজার) এবং মহাত্মাজীর পুত্র মিঃ এম্, গান্ধী ('ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রের সম্পাদক) প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জাহাজে উঠিতে দেওয়া হইল না। ইঁহারা লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন! ভারতীয় খেলোয়াড়দল এ-দৃশ্য 'বিচলিত না হইয়া সহাস্যে বরণ করিয়া লইলেন। কেননা ইহা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। স্বদেশবাসিগণের এই ঘোরতর দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিবার পর আর কোনও জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে স্থির থাকা সম্ভবপর নয়—তাই তাঁহারা এই ব্যাপারকে তুচ্ছ করিবার জন্য হাস্যরসের অবতারণা করিয়া কেহ বলিলেন, 'যদি আমার একটি মজুরের বাক্স থাক্‌তো'! কেহ বলিলেন, 'যদি আমার চামড়া সাদা হ'ত' ইত্যাদি! দীর্ঘকাল পরে তাঁহারা তীরে অবতরণ করিলেন; তখনও তাঁহাদের লগেজ পরীক্ষা করা হয় নাই। ম্যানেজার একা শুল্ক আপিসের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত দেখা করিতে গেলেন; কিন্তু তাহাতে কিছু ফল হইল না। ভারতীয় খেলোয়াড় দলের সকলকে শুল্ক আপিসে যাইতে হইল। অতঃপর প্রত্যেক লগেজ খুলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করিবার পর প্রায় দুপুর বেলা এই কার্য্য সম্পন্ন হইল!

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকার এই বিশিষ্ট অতিথি-বৃন্দের জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কোনও প্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করেন নাই। ইহা নিতান্ত ঘৃণা ও লজ্জার কথা; ইহা খেলোয়াড় দলের স্বভাবজাত উদার ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতীয় ফুটবল এসোসিয়েশনের কর্ম্মকর্ত্তারা এ বিষয়ের কোনও প্রতীকার করিবার ব্যবস্থা কি করিতে পারেন না?

অতঃপর গ্রীনউড গ্রোভে মিঃ পি, আর, পাথারের গৃহে তাঁহাদিগকে মহা সমাদরে লইয়া যাওয়া হয়। এই সম্মানীয় অতিথিবৃন্দকে আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' ৮ই জুন সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়াছেন,—

"We extend to our distinguished visitors a very cordial welcome on behalf of Indians in South Africa and wish that their visit to this country will not mean the mere playing of soccer but that it will draw the minds of their brethren living in this far off land more towards their motherland and her great ancient culture and thus act as a silken cord that will bind S. A. and India in mutual love and affection."

অর্থাৎ "দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসিগণের পক্ষে আমরা আপনাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছি; শুধু ক্রীড়াই এই পর্য্যটনের মূল উদ্দেশ্য নহে—ইহা দ্বারা দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতবাসিগণের হৃদয় তাঁহাদের জন্মভূমি ও জন্মভূমির আবহমানকালের প্রাচীন কৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, সাগর-বিচ্ছিন্ন, দুই মহাদেশের অধিবাসিগণকে সৌহার্দ্দের সুকুমার সূত্রে আবদ্ধ করুক।'

৯ই জুন শনিবার তিনটা পনর মিনিটের সময় ডারবানে 'কিউরিস ফাউনটেনে' নাটাল সম্মিলিত দলের সহিত প্রথম খেলা হয়। নাটাল, ট্রান্সভাল, ইষ্টলণ্ডন, পোর্ট এলিজাবেথ, কেপটাউন, কিম্বার্লী দলের সহিত এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার সম্মিলিত দলের সহিত (Test Match) তিনটি খেলা হইবে। তাহার একটি যোহানসবার্গে ও অপর দুইটি ডারবানে হইবে স্থিরীকৃত হয়। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ দলে যোগদান করিয়াছেন—

প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় (ম্যানেজার), শিরীষ চক্রবর্ত্তী, নগেন গুহ, অমিয় গাঙ্গুলী, সত্য মজুমদার, সতী চৌধুরী, মন্মথ দত্ত (কাপ্টেন), করুণা ভট্টাচার্য্য, প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিল আমেদ, নাসিম, মীর হোসেন, মহম্মদ হোসেন, রমনা, লক্ষ্মীনারায়ণ এবং মিঃ এন, ঘোষ। নিম্নে সংক্ষেপে ১০ই জুলাই পর্য্যন্ত মোট খেলার ফলাফল দেওয়া হইল—ভারতীয় দলের সহিত

১। নাটাল দলের খেলায়—৬ গোলে জয় (ডারবানে)
২। „ „ „ —২ „ পরাজয় (মেরিটসবার্গে)
৩। ট্রান্সভাল „ „ —৬ „ জয় (যোহানসবার্গে)
৪। „ „ „ —৫ „ „ (প্রিটোরিয়ায়)
৫। দক্ষিণ-আফ্রিকার মিলিত দলের
অর্থাৎ প্রথম টেষ্ট ম্যাচে—২ গোলে „ (যোহানসবার্গ)
৬। ইষ্টলণ্ডন দলের খেলায়—৯ „ „ (কেপটাউনে)
৭। পূর্ব্বপ্রাদেশিক দলের খেলায়—৫ „ „ (পোর্টএলিজাবেথে)
৮। পশ্চিম „ „ „ —২ „ „ (কেপটাউনে)
৯। দক্ষিণ আফ্রিকার দলের „ —৩ „ „ („)

মীরা কহে বিনা প্রেম সে···

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য যে-সময়ে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিলেন, প্রায় ঠিক সেই সময়ে মীরাবাঈ মেবারে গাহিলেন, 'বিনা প্রেম সে না মিলে নন্দলাল'। মহাপ্রভুর সে প্রেম-বন্যায় 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।' মীরার মধুর কীর্ত্তনেও মেবারে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের তুফান বহিয়াছিল। রাজপুতেরা প্রায় সকলেই শৈব-ধর্ম্মাবলম্বী। ভগবান একলিঙ্গজী রাজপুতানার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। উদয়পুরের মহারাণা পৃথিবীতে একলিঙ্গজীর প্রতিনিধি। তাঁহার প্রাসাদের নাম কোটি শিবনিবাস, কোনটি শম্ভুনিবাস। বন্দিগণ যখন মহারাণার জয়গান করে, তখন তাহা শিবস্তোত্রের ন্যায় শোনায়। এক সময়ে রাজপুতেরা যে ঘোর বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিল, ইহা ইতিহাস হইতে জানা যায়। সময়ে সময়ে তাহারা শ্রীবৃন্দাবনের নিরীহ বৈষ্ণবগণকে অত্যন্ত নির্য্যাতন করিত। বৈষ্ণবের বহুদিন প্রতিবেশিগণের এই অত্যাচার সহ্য করিয়া যাইত। একবার তাহারাও লাঠিসোঁটা লইয়া যখন রাজপুতদের তাড়া করিল, সেই হইতে রাজপুতেরা কিছু ঠাণ্ডা হইল। কিন্তু ইহা পরবর্ত্তী ঘটনা। মীরাবাঈ যখন মধুর হরিনামে রাজপুতানার উষর ভূমিতে প্রেমের ঢেউ বহাইতেছিলেন, তাহার হয়ত কিছু পূর্ব্বে শ্রীরূপ সনাতন বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিয়াছিলেন, সুতরাং ইঁহাদিগকে সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত মীরাবাঈয়ের সাক্ষাতের কিংবদন্তী অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই। অথচ মীরাবাঈ যে কৃষ্ণপ্রেম ইঁহাদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন এরূপও মনে হয় না। প্রবাদ হইতে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে উভয়ের মিলনে রূপগোস্বামীই নাকি অধিকতর উপকৃত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনে আসিবার পূর্ব্বেই মীরার হৃদয়-কমল ভগবৎ প্রেমারুণরাগে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।* বস্তুতঃ এই অলৌকিক ভগবৎ-প্রেমই তাঁহার রাজপুতানার বাস ত্যাগ করিবার কারণ। মীরা সদাই কৃষ্ণপ্রেমে ডুবিয়া থাকিতেন, বৈষ্ণব সাধু প্রভৃতির সহিত তন্ময় হইয়া কীর্ত্তন গাহিতেন, ইহাই তাঁহার অপরাধ। এই অপরাধে তিনি চিতোরের রাজপ্রাসাদ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। এ অপরাধ সামান্য হউক বা গুরুতর হউক, ঘটনাটি যে অতি বিচিত্র সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

মীরা মেরতা-রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া কত শত রাজকুমার তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। পরিশেষে চিতোরের রাণা কুম্ভ তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ।† এই প্রবাদ অবশ্য সত্য নহে। মীরার সুমধুর সঙ্গীতের খ্যাতি শুনিয়া আকবর বাদশাহ তানসেনকে লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন এবং দশ লক্ষ টাকার মোতীর মালা তাঁহার ঠাকুরের গলায় দিয়াছিলেন, এ-প্রবাদও সত্য হইতে পারে না।‡ প্রথমতঃ, রাণা কুম্ভ ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ও আকবরের মধ্যে প্রায় ১৩০ বৎসরের ব্যবধান। সুতরাং মীরা রাণা কুম্ভের মহিষী হইলে আকবরের সময় পর্য্যন্ত তাঁহার বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরূপগোস্বামীর সঙ্গে যদি মীরার সাক্ষাৎকার সম্বন্ধীয় প্রবাদ সত্য বলিয়া ধরা যায়,§ তাহা হইলে রাণা কুম্ভের সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়া বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। রূপগোস্বামী চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের কয়েক বৎসর পরে বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। চৈতন্য চব্বিশ বৎসর অর্থাৎ ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর তিনি যখন গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন রামকেলিতে তাঁহার সহিত রূপ-সনাতনের সাক্ষাৎ হয় এবং তাহারও কিছুকাল পরে রূপ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াগে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। রাণা কুম্ভের মৃত্যু হয় ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ বৎসর রাজত্বের পর। সে সময়ে মীরার বয়স পঞ্চাশ বৎসর ধরিলে, রূপের সহিত বৃন্দাবনে তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভবপর নহে। রূপগোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎকালে মীরা যে অতি বৃদ্ধা ছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং মনে হয় মীরাবাঈ সে সময়ে রূপলাবণ্য ও সুকণ্ঠের অধিকারিণী ছিলেন।

* গানশক্তি অসম্ভব অমৃত নিন্দিত।
যাথে দ্রবীভূত হইল শ্রীকৃষ্ণের চিত।—ভক্তমাল।

† Todd's *Annals of Rajasthan*, p. 230.

‡ বাইজীর গানশক্তি আকবর শাহা।
পাতসা শুনিতে মনে করিল উৎসাহা॥
তানসেন সঙ্গে করি বৈষ্ণবের বেশে।
বাইজীর গৃহে গেলা হইয়া উল্লাসে।—ভক্তমাল।

§ বৃন্দাবনে গিয়া বাই আনন্দে মগন।
বাঞ্ছা হইল শ্রীরূপ-গোস্বামী-দরশন।—ভক্তমাল।

মীরা রাণা কুম্ভের পত্নী না-হইলেও তিনি যে চিতোরের কোনও রাজকুমারের বধূ হইয়াছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং রাজার ললনা, রাজার কুলবধূ, রাজস্থানের ললামভূত মীরা অকস্মাৎ কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন, ইহা অসাধারণ ঘটনা। রাজস্থানের বীর রাজপুতের শৈব ছিলেন; শিব যুদ্ধের দেবতা; ডমরু তাঁহার বাদ্য, ডমরুর সেই ঘোর বাদ্যরবে শূলপাণি শম্ভু সংহার করিতে ব্যস্ত, এই মূর্ত্তিই তাঁহারা ধ্যান করিতেন। হঠাৎ শান্তিপ্রিয় প্রেমের দেবতা কিশোর রাখাল বালক রণছোড়জী কেমন করিয়া এই রাজপুতবালার হৃদয়-সিংহাসনে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে।* মীরার দেবতার নাম রণছোড় অর্থাৎ যুদ্ধ হইতে তিনি পলায়নপর। রাজপুতানার সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার এই পলায়নপর দেবতাটির বিরুদ্ধে। তথাপি এই রণছোড়জী রাজপুতের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্বর্গ হইতে প্রেমের মন্দাকিনী আনিয়া রাজস্থানের মরুভূমিতে বহাইয়াছিলেন মীরা। একদিন মেবারের রাজপথে, আরাবল্লীর পর্ব্বত-শিখরে, ভীমা নদীর কূলে কূলে মীরার সঙ্গীতের লহরী ছুটিয়াছিল। তাহা না হইলে মীরার রণছোড়জীর মন্দির চিতোরের দুর্গাভ্যন্তরে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। মীরা যে চিতোরের কোনও রাজকুমারের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছিলেন, তাহাও এই ঘটনা হইতে অনুমান করিতে পারা যায়। আজিও চিতোরের গিরিদুর্গে রণছোড়জীর মন্দির বিরাজ করিতেছে। আজিও সেই মন্দিরে রণছোড়জীর সঙ্গে মীরার মূর্ত্তিও পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কতখানি আবেগ থাকিলে ভক্তির পাত্রকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য অর্চ্চনা করা যায়, তাহা আমরা চিন্তা করিলে বিস্মিত হই। রাজপুত বীরেরা এই প্রেমধর্ম্ম-প্রচারিণী রমণীর পদতলে আত্মসমর্পণ করিতে দ্বিধা করে নাই। বহুদিন পূর্ব্বে একদিন অপরাহ্নে রণছোড়জীর মন্দির-সোপানে দাঁড়াইয়া এই কথাই ভাবিতেছিলাম। মাখন-মিছরি প্রসাদ ভক্তিভরে গ্রহণ করিয়া এই চিন্তাই করিতেছিলাম যে বিধাতার কি রহস্যময় বিধানে রাজপুতানার কঠোর কর্কশ ক্ষেত্রে এই প্রেমময়ীর আবির্ভাব হইল!

প্রেম নহিলে যে ভগবানকে লাভ করা যায় না ইহা ভারতবর্ষে নূতন কথা নহে।

> ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
> ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥*
>
> শ্রীমদ্ভাগবত—একাদশ।

কিন্তু বাংলার প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভু যেমন করিয়া এই তত্ত্ব একদিন বাঙালীকে বুঝাইয়াছিলেন, এমন করিয়া আর কেহ বুঝায় নাই। মীরাবাঈও রাজস্থানে এই বাণী যেমন করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এমন সুন্দর এমন মধুর করিয়া আর কেহ বলে নাই। মীরার গানে এই প্রেমের বাণী বড় সুন্দর ফুটিয়াছে—

> নিত নাহনে সে হরি মিলে ত
> জলজন্তু হোই।
> ফল মূল খাকে হরি মিলে ত
> বাদুড় বাঁদরাই॥
> তিরণ-ভখণসে হরি মিলে ত
> বহুৎ মৃগী অজা।
> স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে ত
> বহুৎ রহে হ্যায় খোজা॥
> দুধ পিকে হরি মিলে ত
> বহুৎ বৎস বালা।
> মীরা কহে বিনা প্রেম সে
> না মিলে নন্দলালা॥

মীরার অনেক কবিতায় এই একই ভণিতা আছে। সব কবিতার মধ্যেই একটি স্বচ্ছ প্রেমের প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। উপরের কবিতাটিতে প্রচলিত সংস্কারগুলি সরাইয়া তাহার স্থলে প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যায়; কাহারও উপর কটাক্ষ আছে বলিয়া মনে হয় না। এই ভাবের একটি দোহাও চলিত আছে—

> তুলসী পিধনে হরি মিলে ত
> ম্যায় পিধে কুঁদা আউর ঝাড়।
> পাথল পূজনে হরি মিলে ত
> ম্যায় পূজে পাহাড়॥

এই দোহাটি কবীরের বলিয়া কথিত আছে। মীরার কবিতাটির সঙ্গে সরোরুহপাদের একটি দোহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। দোহাকোষ প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন গ্রন্থ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "খ্রীষ্টীয় ৮। ৯। ১০। ১১। ১২ শতে এই সকল বহি লেখা হইয়াছিল বলা যায়।" (বৌদ্ধগান ও দোহা)। যদি তাহা হয়, তবে মীরার বহুপূর্ব্বে সরোজবজ্র ইহার আভাস দিয়া গিয়াছেন। সরোজবজ্র বলিতেছেন যে বৌদ্ধ সাধু-সন্ন্যাসীরা নগ্ন হইয়া বেড়ায়, কেহ কেহ তাহাদিগকে দেখিয়া মনে করে যে তাহারা মুক্ত পুরুষ।

---

* The religion of the martial Rajpoot, and the rites of Har, the god of battle, are little analogous to those of the meek Hindus, the followers of the pastoral divinity, the worshippers of kine, and feeders on fruits, herbs and water. The Rajpoot delights in blood: his offerings to the god of battle are sanguinary, blood and wine. Todd. Vol. I. page 57.

* জ্ঞানধর্ম্মে যোগধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ॥
কৃষ্ণ বশ হেতু এক প্রেমভক্তিরস।—চৈতন্য চরিতামৃত
—আদিলীলা।

জই ণগ্গা বিঅ হোই মুক্তি তা ইতি
(যদি নগ্নদিগের মুক্তি হয়, তাহা হইলে)
তা শুনহ শিআলহ ইতি
(কুকুর শৃগালের মুক্তি হয় না কেন ?)
পিচ্ছী গহণে দিঠ্ঠি মোকখ ইতি
(ময়ুরপুচ্ছ গ্রহণ করিলে যদি মুক্তি হইত—যেমন ক্ষপণকের অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা করে—)
তা করিঅ তুরঙ্গহ ইতি
(তাহা হইলে ময়ুরপুচ্ছের দ্বারা যে সকল হস্তী অশ্ব সাজাইয়া দেওয়া হয়, তাহাদের মুক্তি হইবে না কেন ?)
উবর্ভে ভোঅণেঁ হোই জাণ ইতি
(উঞ্ছে ভোজন করিলে যদি জ্ঞান হইত, তাহা হইলে হস্তী, অশ্ব ইত্যাদিরও হইত ; কারণ তাহারাও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ন্যায় শস্যাদি খুঁটিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করে)

সরোরুহপাদ ধর্ম্মের বহিরাবরণ অর্থাৎ আচার প্রক্রিয়া প্রভৃতির প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ক্ষপণকদিগকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু সহজপন্থীরা সহজ-মত ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম্ম-মতকেই মুক্তির উপায় বলিয়া স্বীকার করিত না। সেইজন্য সহজাম্নায়পঞ্জিকায় সরোরুহপাদ শ্লেষের সহিত বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব অমূলক। কেননা প্রথমে যদি বা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়া থাকেন তবে তখনই না-হয় তাঁহাকে প্রধান বলিয়া মান্য করা যাইত। এখন ব্রাহ্মণও যে ভাবে হয়, অন্য লোকও ত সেই ভাবেই হয়। সংস্কারে বা বেদপাঠে যদি ব্রাহ্মণ হয়, তবে অন্য লোকের সংস্কার হইলে এবং সে বেদ পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ হইবে না কেন ? হোম করিলে যদি ব্রাহ্মণ হয়, তবে অন্য লোকে হোম করুক না ! কিন্তু অগ্নিতে ঘি ঢালিলে কেবল ধোঁয়ায় চক্ষুর পীড়া জন্মে মাত্র ! অনেকে গায়ে ছাই মাখে, মাথায় জটা রাখে, প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়া থাকে, ঘরের ঈশান কোণে বসিয়া ঘণ্টা বাজায়, চোখ মিটমিট করে, কানে ফিস ফিস করে (কন্নেহি খুসখুসাই জনবন্ধী) অর্থাৎ পরচর্চ্চা করে—এই সকল লোক কেবল লোককে ফাঁকি দেয়। (লোকস্ত কুহনয়া)

মীরার উদ্দেশ্য ছিল প্রেমের প্রাধান্য স্থাপন করা। প্রেমকে বড় করিতে হইলে আর সকল পদার্থকেই উপেক্ষা করিতে হইবে। কবিরাজ গোস্বামীও এই কথাই বলিয়াছেন :—

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥

কৃষ্ণপ্রেমের নিকট মোক্ষও তুচ্ছ। প্রেমিক মোক্ষ কামনা করে না। দীয়মানং (মোক্ষং) ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। কিন্তু প্রেমের এই উচ্চ ধারণা মীরা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধানযোগ্য। মহাপ্রভুর পূর্ব্বে চণ্ডীদাস প্রেমের বিজয়-বৈজয়ন্তী বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের অমর কাব্যসুধা পান করিয়া মহাপ্রভু প্রেমের মন্ত্র প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু মীরা কি চণ্ডীদাসের কোনও সংবাদ রাখিতেন ?

পূর্ব্বে সহজিয়াদের দোহার সহিত মীরার সঙ্গীতের যে মিল দেখা গেল, তাহা কি আকস্মিক ? একই রকমের ভাব বিভিন্ন কবির মধ্যে প্রস্ফুরিত হইতে দেখা যায়। তাহা হইতে এক জন যে অপরের নিকট ঋণী, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয় না। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে এই যে মীরাকে সহজিয়ারা তাহাদের নিজ দলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবি করে। 'মীরা বাইয়ের করচা' বলিয়া বটতলায় যে পুস্তিকা পাওয়া যায়, তাহা সহজিয়াদের দ্বারা প্রচারিত বলিয়া মনে হয়। ঐ করচায় রূপগোস্বামী মীরার নিকট শিক্ষা-লাভ করিতেছেন এই কথা আছে। ঐ করচার আধুনিক গ্রন্থকর্ত্তা মীরার নামে এই যে বইখানি চালাইয়াছেন, তাহাতে 'নিত্ নাহনে হরি মিলে' কবিতাটি উদ্ধার করিতে ভুলেন নাই।

যাহা হউক, প্রেমের যে বীজ বঙ্গদেশে উপ্ত হইয়াছিল, তাহা বঙ্গের বাহিরে কি করিয়া ছড়াইয়া পড়িল ইহা ভাবিবার বিষয়। সুরদাস গোকুলে বসিয়া এই প্রেমের কবিতা লিখিয়া পুঁথি ভরিয়াছিলেন। রাজপুতানার মরুভূমিতে বাঙ্গলার পদ্মফুল কেমন করিয়া ফুটিল ? ইঁহাদেরও পূর্ব্বে বিদ্যাপতি মিথিলায় বসিয়া বাঙালীর অনুরাগ-রঙে তুলি ডুবাইয়া প্রেমের চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন নয় কি ?
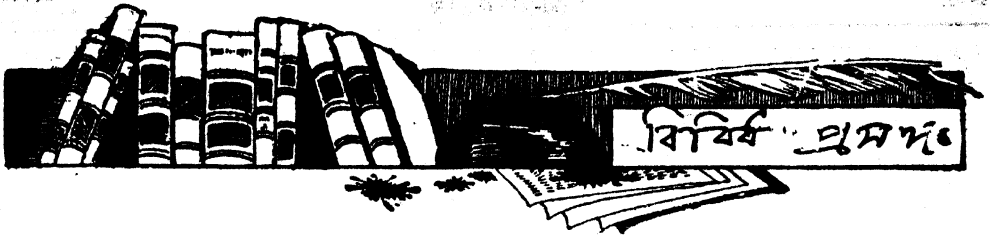
ভারতে রাষ্ট্রনীতি

ভারতবর্ষের লোকেরা যে পরিমাণে জাগিয়া উঠিতেছে এবং, মানুষ যতটা নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা হইতে পারে ততটা, নিজেদের দেশে নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হইতে চাহিতেছে, সেই পরিমাণে তাহাদের স্বারাজ্যলাভচেষ্টায় ব্যাঘাতেরও সৃষ্টি হইতেছে। ইংরেজ জাতির প্রভুত্বে যত দিন সমষ্টিগত ভাবে আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই, যত দিন উহার ন্যায্যতা, অন্ততঃ মৌখিক, অস্বীকৃত হয় নাই, তত দিন ইংরেজের নিরপেক্ষ থাকা সম্ভবপর ও সহজ ছিল। কিন্তু উহাতে আপত্তি যত প্রবল হইতেছে, স্বারাজ্যলাভের ইচ্ছা যত বাড়িতেছে, ইংরেজের ততই এমন কতকগুলি লোকের প্রয়োজন বাড়িতেছে যাহারা নানাবিধ সুবিধার বিনিময়ে ইংরেজের প্রভুত্ব মানিয়া লইবে, ইংরেজের প্রভুত্বে আপত্তিকারীদের দলে যোগ দিবে না, এবং আগে যোগ দিয়া থাকিলে তাহা ছাড়িয়া দিবে। এই জন্য, কোনও সভ্য দেশের আধুনিক মূল শাসনবিধিব্যবস্থায় যেরূপ শ্রেণীগত সম্প্রদায়গত স্বার্থের পার্থক্য স্বীকৃত বা সৃষ্ট হয় নাই, ভারতবর্ষে তাহা হইতেছে। অন্ততঃ কতকগুলি লোককে হাতে রাখিবার প্রয়োজন ইহার কারণ।

আমরা যতই এক হইতে চাহিব, ততই অনৈক্যের কারণ ঘটিতে থাকিবে, ইহা বড় অবসাদজনক বটে; কিন্তু ইহাতে নিরুৎসাহ, নিরাশ বা অবসন্ন হওয়া উচিত নহে। ইহা যে ঘটিবেই, তাহা আমাদের জানা উচিত ছিল এবং এখনও উচিত। যত বাধাই ঘটুক, স্বারাজ্যলাভচেষ্টা আমরা ছাড়িব না। কিন্তু সেই চেষ্টার অঙ্গ ও আয়োজন স্বরূপ, "একতা চাই," "একতা চাই" মুখে বলিলে এবং জোড়াতাড়া দিয়া একতা স্থাপনের চেষ্টা করিলে, ইংরেজ শ্রেণীবিশেষ ও সম্প্রদায়বিশেষকে যে-যে রকম সুবিধা দিতেছে আমরা তদপেক্ষা বেশী দিবার অঙ্গীকার করিলে, একতা আসিবে না, স্বারাজ্যও আসিবে না। সাম্প্রদায়িকতা আমরা ইংরেজের দেখাদেখি যতই মানিয়া লইব, উহা ততই বাড়িয়া চলিবে। আগুনে ঘী ঢালিলে যেমন উহার শিখা বাড়ে, সাম্প্রদায়িকতাতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সায় দিলেও বা উহাকে প্রশ্রয় দিলেও উহা তত বাড়ে। যেমন, সরকার মুসলমানদিগের জন্য শতকরা ২৫টা চাকরীর নিশ্চিত বরাদ্দ করায় স্যর মুহম্মদ ইক্‌বাল বলিতেছেন, মুসলমানদিগকে নিশ্চিত শতকরা ৩৩⅓টা দেওয়া উচিত এবং অধিকন্তু মুসলমান চাকরোদের পদোন্নতি হওয়া উচিত, অর্থাৎ অমুসলমান বেশীদিনের চাকরোদিগকে ডিঙাইয়া মুসলমান অল্পদিনের চাকরোদের বেতনবৃদ্ধি ও পদোন্নতি হওয়া চাই! এই কারণে সাম্প্রদায়িকতা বরাবর সম্পূর্ণ অস্বীকার করা আবশ্যক। অন্ততঃ খুব ছোট একটি দলও যদি থাকে যাহারা সজোরে কোন প্রকার শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত আলাদা স্বার্থ সুবিধার ব্যবস্থা চাহিবে না মানিবে না, তাহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর।

সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধির চেষ্টা যতই হউক না কেন, প্রকৃত দেশহিতৈষীদিগকে এরূপ নানা হিতকর অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে, যাহার উপকার সকল ধর্ম্মের ও সকল শ্রেণীর লোক পাইতে পারে। ইহার মানে এ নয় যে, ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের জন্যই অভিপ্রেত কোন মঙ্গলকার্য্য করিতে হইবে না। তাহাও করিতে হইবে। কারণ, এমন অনেক অহিতকর প্রথা আছে, এমন কুসংস্কার আছে, এমন অকল্যাণ আছে, যাহা সম্প্রদায়বিশেষে বা শ্রেণীবিশেষে আবদ্ধ। তৎসমুদয়েরও বিনাশ আবশ্যক।

যাহারা অন্যায়রূপে অনুগৃহীত হইতেছে মনে হইবে,

তাহাদের প্রতি ঈর্ষ্যা ও অসূয়ার ভাব মনে উঠিতে দেওয়া উচিত নয়—উঠিলে তাহা দমন করা কর্ত্তব্য।

ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে সকল ধর্ম্ম জাতি ও শ্রেণীরই প্রতিনিধি বলিয়া প্রত্যেক সভ্য মনোনীত হন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দেশহিতৈষী—এবং দেশহিতৈষী সকলেরই হওয়া উচিত—তাঁহাদিগকে অনুভব করিতে হইবে, যে, তাঁহারা সকল সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি। হিন্দুকে হিন্দু অহিন্দু সকলের জন্য, মুসলমানকে মুসলমান অমুসলমান সকলের জন্য, খ্রীষ্টিয়ানকে খ্রীষ্টিয়ান অ-খ্রীষ্টিয়ান সকলের জন্য, শিখকে শিখ অশিখ সকলের জন্য খাটিতে হইবে। প্রদেশ হিসাবেও কোনও প্রদেশের প্রতিনিধিদিগকে কেবল নিজ প্রদেশের জন্য খাটিলে চলিবে না, সকল প্রদেশের জন্য খাটিতে হইবে। অবশ্য প্রত্যেকের নিজ শ্রেণী সম্প্রদায় ও প্রদেশের জ্ঞান যত বেশী অন্য সকলের তত বেশী হইবার কথা নয়। কিন্তু সকলেই সব প্রদেশের হিতসাধনচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে পারেন।

জাতীয় ঐক্যস্থাপনের ইহাই একটি প্রকৃত ও প্রধান পন্থা।

—

সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব

ইংরেজ মুসলমান ভারতীয়দের সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির সুবিধা করিয়া দেওয়ায় এবং একবার সাম্প্রদায়িক সুবিধার স্বাদ পাইয়া তাহার জন্য তাহাদের লালসা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলায়, অমুসলমানেরা মুসলমানদিগকেই অনেক সময় প্রধানতঃ দায়ী করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা ভুল। তাহা বুঝাইবার জন্য অদূর অতীতের কিছু ইতিহাসের উল্লেখ আবশ্যক।

যে-সব দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় উপসম্প্রদায় আছে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বত্রই সদ্ভাব অসদ্ভাব আছে। ভারতবর্ষেও ছিল ও আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এখন রাষ্ট্রনীতি ও তৎসংশ্লিষ্ট সব ব্যাপারে যে-ধরণের সাম্প্রদায়িকতা দেখা যায়, তাহার উদ্ভব হয় লর্ড মিণ্টোর আমলে। ঐ বড়লাটের কাছে আগা খাঁ প্রমুখ মুসলমানেরা স্বতন্ত্র ও বিশেষ সুবিধা দাবী করিতে গিয়াছিলেন বটে; কিন্তু গিয়াছিলেন সরকারী হুকুমে বা ইঙ্গিতে। সরকারী হুকুমে বা ইঙ্গিতে তাঁহারা গিয়াছিলেন বলিয়াই যে তাঁহাদের কোন দোষ ছিল না, এমন নয়। তাঁহাদের এই দোষ ছিল, যে, তাঁহারা সমগ্র নেশ্যনের অর্থাৎ মহাজাতির পক্ষে অনিষ্টকর এবং পরিণামে নিজেদের পক্ষেও অনিষ্টকর দাবী সম্প্রদায়গত স্বার্থসিদ্ধির জন্য করিয়াছিলেন। যে প্রলুব্ধ করে ও যে প্রলুব্ধ হয়, উভয় পক্ষই দোষী।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর প্রবল আন্দোলন হয়। তজ্জনিত অসন্তোষ বাংলা দেশেই আবদ্ধ ছিল না। এই অসন্তোষ মন্দীভূত করিবার জন্য, গবন্মেণ্ট দেশের লোকদিগকে কিছু অধিকার দিতেছেন এইরূপ যাহাতে মনে হয় এরূপ কিছু করা আবশ্যক মনে করেন। যে ব্যবস্থা হয় তাহা মর্লী-মিণ্টো শাসনবিধিসংস্কার (Morley-Minto Reforms) নামে পরিচিত। এই সময় মিণ্টো ভেদনীতি প্রয়োগ করেন। অন্য সব সভ্য দেশে যেমন সকল ধর্ম্মের ও শ্রেণীর লোকদের সাধারণ প্রতিনিধিদের নির্ব্বাচন একত্র হয় এবং তদ্দ্বারা জাতীয়তা পুষ্ট হয়, তিনি সেরূপ কিছু হইতে না দিয়া মুসলমানদিগকে বিশেষ কিছু, স্বতন্ত্র কিছু চাহিতে পরোক্ষ ভাবে উৎসাহিত করেন। তাহারই ফলে আগা খাঁ প্রমুখ মুসলমানেরা তাঁহার কাছে যান। এই জন্য মৌলানা মোহম্মদ আলী কংগ্রেসের সভাপতি রূপে তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, যে, আগা খাঁ এই যে দরবার করিয়াছিলেন, তাহা কম্যাণ্ড পার্ফর্ম্যান্স ("command performance") অর্থাৎ উহা উপরওয়ালাদের হুকুমে করা হইয়াছিল। ভারতসচিব লর্ড মর্লীর জীবনস্মৃতির দ্বিতীয় ভল্যুমের ৩২৫ পৃষ্ঠা হইতে নীচে উদ্ধৃত বাক্য দুটি মৌলানা সাহেবের উক্তি সমর্থন করে।

"I won't follow you again into our Mahometan dispute. Only I respectfully remind you once more that it was *your* early speech about their extra claims that first started the M. (Mahometan) hare."

তাৎপর্য্য। "আমাদের মুসলমান সম্বন্ধীয় ঝগড়ায় আমি পুনরায় আপনার অনুসরণ করিব না। আমি কেবল আপনাকে সম্মানসহকারে আর এক বার স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যে, মুসলমানদের অতিরিক্ত দাবী সম্বন্ধে আপনার পূর্ব্বকালিক বক্তৃতাই মুসলমান খরগোসকে সজাগ ও সচেষ্ট করে।"

ভারত-গবন্মেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত একটি সরকারী রিপোর্টেও ইহার প্রমাণ আছে। যথা, ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কমিটির রিপোর্টের (*Report of the Indian Central Committee*) ১১৩ পৃষ্ঠায় আছে—

"58. It was at the time of the Morley-Minto Reforms that the claim for communal electorates was advanced by the Muhammadans, inspired by certain officials."

তাৎপর্য্য। "মর্লী-মিণ্টো শাসনবিধি সংস্কারের সময়েই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর জন্ত দাবী, কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারীর প্ররোচনায়, মুসলমানেরা করিয়াছিল।"

ঐ রিপোর্টের ১১৭ পৃষ্ঠায় আছে—

"It is often said that we must adhere to the promise made by Lord Minto's Government to the Muhammadan Deputation that waited on him in 1907-08. We will not bring forward the fact, which is now established beyond doubt, that there was no spontaneous demand by the Muslims at that time for separate electorates, but it was only put forward by them at the instigation of an official whose name is now well known.

তাৎপর্য্য। "কখন কখন বলা হয়, যে, ১৯০৭-৮ সালে যে মুসলমান প্রতিনিধিসমষ্টি লর্ড মিণ্টোর নিকট দরবার করে, তাহাদিগকে তাৎকালীন গবন্মেণ্ট যে অঙ্গীকার করেন, তাহা রক্ষা করিতে হইবে। আমরা বর্ত্তমানে নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিষ্ঠিত এই তথ্যটি উপস্থাপিত করিতে চাই না, যে, তৎকালে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলীর জন্ত কোন দাবী মুসলমানেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা অধুনা সুবিদিত এক জন রাজপুরুষের প্ররোচনায় এই দাবী করিয়াছিলেন।"

লর্ড মিণ্টোর গবন্মেণ্টের এই "অঙ্গীকার" ("promise") সম্বন্ধে ঐ রিপোর্টেরই ১১৭ পৃষ্ঠায় আছে—

"The promise made by the Government *ex parte* without having heard what the Hindus had to say cannot be pressed against the Hindus if it works injustice and for various reasons is not in the public interest but is harmful in its results."

তাৎপর্য্য। "হিন্দুদের কি বলিবার ছিল তাহা না শুনিয়া গবন্মেণ্ট যে একতরফা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে যদি হিন্দুদের প্রতি অবিচার হয় এবং নানা কারণে যদি তাহা সর্ব্বসাধারণের হিতকর না হইয়া কুফলজনক হয়, তাহা হইলে তাহা হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না।"

অনেক আগেকার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রে অঙ্গীকার ছিল, যে, ধর্ম্ম বা জাতির জন্ত কাহাকেও অনুগৃহীত, নিগৃহীত বা অসুবিধাগ্রস্ত করা হইবে না। সে অঙ্গীকারটার কি হইল ?

মুসলমানেরা যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন আদি চান নাই, তাহার আরও প্রমাণ আছে। পঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য থাকা কালে রাজা নরেন্দ্রনাথের একটি প্রশ্নের উত্তরে তথাকার অন্যতম মন্ত্রী মাননীয় মালিক ফেরোজ খান নুন বলেন—

"But it is not possible to trace any single representation of any particular organized body of Muslims as being the main factor responsible for the introduction of the particular constitution (separate electorates) eventually decided on."

তাৎপর্য্য। "বিশেষ কোন একটিও মুসলমানসমষ্টি বা সমিতির কোনও একটি আবেদনের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নহে যাহা পরিণামে-নির্দ্ধারিত বিধিব্যবস্থার (অর্থাৎ স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলীর) প্রবর্ত্তনের জন্ত প্রধানতঃ দায়ী।"

স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের নিন্দা কোন কোন সরকারী রিপোর্ট পর্য্যন্ত, যেমন মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্টে, আছে। কিন্তু তাহা থাকিলে কি হয় ? কর্ত্তাদের সিদ্ধান্ত কার্য্যতঃ উহারই পক্ষে হইয়া আসিতেছে। কারণ তাঁহারা নাকি "অঙ্গীকার" করিয়া ফেলিয়াছেন ! মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রটা—যাহাতে সকল প্রজার প্রতি সমান ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি আছে এবং যে প্রতিশ্রুতির ব্যপদেশে ভারতীয়দিগের শত্রু ডোমীনিয়নগুলার ঔপনিবেশিকদিগকে পর্য্যন্ত ভারতে ভারতীয়দের সমান অধিকার দিতে ভারতসচিব মনে করেন ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট বাধ্য—সেই ঘোষণা-পত্রটা অঙ্গীকার নয় ?

সরকারী রিপোর্টে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নিন্দা থাকা সত্ত্বেও যখন উহা কায়েম আছে, তখন ইংরেজের লেখা ইতিহাসেও তাহা আছে বলিয়া যে উহা উঠিয়া যাইবে এমন আশা করা দুরাশা। তথাপি মাস দুই আগে প্রকাশিত ইংরেজের লেখা ও ম্যাকমিলন কোম্পানী দ্বারা প্রকাশিত একখানা ভারতেতিহাসে কি আছে দেখুন :—

"The Muslims specifically demanded separate electorates, and the Hindu leaders conceded the principle in the 'Lucknow Pact' of 1916. Their effect was wholly bad. It is not only that they have led Indians to organise along sectarian lines, for this was probably inevitable and caste grouping occurs even within the Hindu constituencies, but the system throws up the worst type of pugnacious fanatic, who loves 'to prove his doctrines orthodox by apostolic blows and knocks.' The feeling that great changes were going to take place and the prospect of some actual transfer of responsibility and control over appointments, have combined to rouse all the meaner political passions, especially in those provinces, like Bengal and the Punjab, where the two communities are nearly equal in number. Middle class unemployment and a family system which elevates nepotism into something like a virtue, have also helped to embitter the politico-religious struggle. A further and very grave disadvantage of the communal electorate is

that an alteration in the parties can only occur through wholesale proselytism or through differences in the birth-rate. And both are stirred to new missionary enterprise, when the reward is not only a soul but also a permanent addition to one's voting strength. The activities of the Arya Samaj amongst the poor Muslims and of the various Mohammedan bodies amongst the lower caste Hindus, have caused the greatest bitterness. The politicians get all the support they need from an irresponsible press, while ill-feeling amongst the educated classes is kept alive by scurrilities like the *Rangita Rasul*. —*Rise and Fulfilment of British Rule in India:* by Edward Thompson and C. T. Garratt.

তাৎপর্য্য। "মুসলমানেরা বিশিষ্ট নির্দ্দেশ দ্বারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী চাহিয়াছিলেন, এবং হিন্দুনেতারা ১৯১৬ সালের 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' দ্বারা স্বতন্ত্রনির্ব্বাচন নীতি মানিয়া লয়েন। ['লক্ষ্ণৌ চুক্তি'তে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ছিল বটে, কিন্তু শাসনবিধি সম্বন্ধে হিন্দুমুসলমানের সম্মিলিত একটা দাবীও ছিল। সেই দাবী গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিলে ভারতীয়দের হাতে কিছু প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেই দাবী সম্বলিত সমুদয় 'চুক্তি' গ্রহণ না করিয়া কেবল নিজেদের পক্ষে সুবিধাজনক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনবিষয়ক অংশটিই লইয়াছেন! তাহার সপক্ষে, যাহা হউক, অন্ততঃ এইটুকু বলিবার আছে, যে, তাহা হিন্দুমুসলমান উভয়েরই স্বীকৃত চুক্তি, কিন্তু ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত উভয় সম্প্রদায়ের স্বীকৃত সিদ্ধান্ত নহে। হিন্দুরা ও শিখেরা উহার বিরোধী এবং স্বাজাতিক ("nationalist") মুসলমানেরা উহার নিন্দা করিয়াছেন। যাহার বিরোধী সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে, এরূপ সিদ্ধান্ত হিন্দুমুসলমানের স্বীকৃত চুক্তির স্থান ন্যায়তঃ অধিকার করিতে পারে না। এইজন্য পুনর্ব্বার হিন্দু-মুসলমানের স্বীকৃত কোন চুক্তি না-হওয়া পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌ চুক্তিই বজায় থাকা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ক্ষমতাশালী লোকেরা নিজেদের সুবিধার বিরোধী যুক্তি কবে শুনিয়াছে? প্রবাসীর সম্পাদক।]

"স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ফল সম্পূর্ণ মন্দ হইয়াছে। ইহা যে ভারতীয়দিগকে কেবল ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে দলবদ্ধ করাইয়াছে তাহা নহে—ইহা হয়ত অনিবার্য্য ছিল, কারণ কোন কোন হিন্দু নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মধ্যেই এক একটা জাত (caste) আলাদা দল বাঁধে—কিন্তু এই প্রথার প্রভাবে এরূপ অধমতম লড়াইবাজ ধর্ম্মান্ধ লোক প্রাধান্য পায় যাহারা নিজেদের মতকে স্বধর্ম্মানুসারী প্রমাণ করিবার জন্য বিপক্ষকে 'শাস্ত্রবিহিত' প্রহার দিতে ভালবাসে। নানা বৃহৎ পরিবর্ত্তন হইতে যাইতেছে এইরূপ অনুভূতি এবং কিছু দায়িত্ব এবং চাকরীতে নিয়োগের উপর কর্তৃত্ব দেশের লোকদের হাতে আসিবার সম্ভাবনা, এই দুইয়ে মিলিত হইয়া যত সব রাজনৈতিক নীচ প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে—বিশেষতঃ সেই সব প্রদেশে যেখানে পঞ্জাব ও বঙ্গের মত দুটি সম্প্রদায় সংখ্যায় প্রায় সমান সমান। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বেকার অবস্থা এবং যে পারিবারিক প্রথা স্বজনপোষণকে প্রায় একটা সদ্গুণের মত উচ্চ আসন দিয়াছে তাহা ধার্ম্মিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে আরও তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর আর একটা এবং গুরুতর অসুবিধা এই, যে, দলগুলির জনসংখ্যায় পরিবর্ত্তন কেবল দলকে দল ধর্ম্মান্তর গ্রহণ বা জন্মের হারের পার্থক্য দ্বারাই ঘটিতে পারে এবং উভয় পক্ষই নিজ নিজ ধর্ম্মে অন্য দলের লোককে দীক্ষিত করিতে নূতন উদ্যমে উত্তেজিত হইতেছে, যেহেতু তাহার পুরস্কার নিজ দলে কেবল এক একটি আত্মার যোগ নহে অধিকন্তু নিজেদের ভোট-বলও স্থায়িভাবে বৃদ্ধি। গরীব মুসলমানদের মধ্যে আর্য্যসমাজের এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে নানা মুসলমান সমিতির কার্য্যকলাপে খুব বেশী তিক্ততার উদ্ভব হইয়াছে। দায়িত্বহীন সংবাদপত্রসমূহ হইতে রাজনৈতিক পাণ্ডারা যত আবশ্যক তত সমর্থন লাভ করে, এবং 'রঙ্গিলা রসুল্'-এর মত কুরুচিপূর্ণ বহির দ্বারা শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অসদ্ভাব জাগ্রত থাকে।"

বাংলা, পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে হিন্দুনারী অপহরণ এবং শেষোক্ত তিন প্রদেশে যে হিন্দু বালকও অপহৃত হয়, তাহারও উদ্দেশ্য অংশতঃ অনেক স্থলে নিজ দলের সংখ্যা বৃদ্ধি।

ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহই দায়িত্বহীনতা একচেটিয়া করিয়াছে কি না, অযোগ্য স্বজনদিগের পোষণ ভারতীয় লোকমাত্রেই কিংবা কেবল ভারতীয়েরাই করে কি না, 'রঙ্গিলা রসুল্'-এর লেখক ও সমাজই এক মাত্র দোষী কি না, তাহার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। কিন্তু আধুনিকতম ভারতীয়-ইতিহাস-লেখক দু-জন ইংরেজ সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধির স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের যে-যে দোষ দেখাইয়াছেন, তাহার সত্যতা স্বীকার করিতেই হইবে।

—

কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা

বোম্বাইয়ে কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি হোয়াইট পেপার বা শ্বেত পত্র অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কিন্তু ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা গ্রহণও করেন নাই, বর্জ্জনও করেন নাই। কমিটির যে প্রস্তাবটি হইতে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার কোন কোন অংশের সহিত অন্য কোন কোন অংশের সঙ্গতি নাই, বরং বিরোধ আছে।

সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা যে স্বাজাতিকতার ও গণতান্ত্রিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত ইহা সুবিদিত। কমিটির প্রস্তাবটিতেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি যে কমিটি তাহা বর্জ্জন করেন নাই, তাহার উদ্দেশ্য অবশ্য ভাল। অধিকাংশ মুসলমান ভোটদাতা ঐ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের পক্ষে। সুতরাং কংগ্রেস ঐ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে মত দিলে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশার্থী কংগ্রেসদলভুক্ত মুসলমানেরা ভোট খুবই কম পাইবেন, ফলে ব্যবস্থাপক সভায় ঢুকিতে পারিবেন না। তাহা হইলে ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস-পক্ষীয় সভ্যের সংখ্যা যথেষ্ট বেশী হইবে না। সুতরাং

করিয়া ইঙ্গ-ভারতীয়দিগকে চাকরী দেওয়াতেই রেল প্রভৃতি বিভাগে তাহাদের এত বাহুল্য ঘটিয়াছে। সরকারী যে অবিচারে তাহা ঘটিয়াছে সরকার সেই অবিচারের ফলকেই হেতু করিয়া অবিচারটা স্থায়ী করিতে চাহিতেছেন!

সরকারী ওকালতীর ঠিক সমতুল্য একটা যুক্তি আমরা দেখাইতেছি। সরকারী অধিকাংশ বিভাগে হিন্দু ভদ্রলোকরা অধিকাংশ চাকরী করিয়া আসিতেছে। এমন বিস্তর হিন্দু পরিবার আছে যাহারা পুরুষানুক্রমে সরকারীচাকরীজীবী। অযোগ্যতার জন্য তাহাদের বংশধরেরা যদি চাকরী না পায়, তাহাতে দুঃখ নাই—তাহা ত হওয়াই উচিত। কিন্তু যোগ্যতা থাকিতেও তাহারা হিন্দু বলিয়াই শতকরা প্রায় অর্দ্ধেক চাকরী হইতে নিশ্চিত বঞ্চিত হইবে, ইহাতে কি "ভায়োলেণ্ট্ ডিস্লোকেশান্ অব দি ইকনমিক্ ষ্ট্রাক্‌চার অব্ দি কম্যুনিটি" অর্থাৎ তাহাদের সমাজের অর্থনৈতিক প্রচণ্ড ভাঙচুর ঘটিবে না?

—

চাকরীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরায় সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি

কতকগুলা চাকরী বিশেষ কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বা বংশের লোককে দিতেই হইবে, এরকম ব্যবস্থায় যোগ্যতরের পরিবর্ত্তে অযোগ্যতর অনেক লোকের কাজ পাওয়া অনিবার্য্য, ইহা অতি সহজবোধ্য। ইহাতে যে দেশে অসন্তোষ অশান্তি বাড়িবে, জাতীয় একতা বিনষ্ট হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য, কিন্তু অন্য গুরুতর ক্ষতিও আছে।

যোগ্যতম লোকদের কাজ পাইবার দাবী সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত ও গ্রাহ্য হইবে, এইরূপ নিয়ম অনুসৃত হইলে দেশের সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিদ্যার চর্চ্চা বাড়ে, নানাবিধ নৈপুণ্য লাভ করিবার চেষ্টা বাড়ে, দৈহিক ও মানসিক শক্তি বাড়াইবার প্রয়াস বৃদ্ধি পায়। তাহাতে সমগ্র জাতি (nation) উপকৃত হয়। ইহার বিপরীত নীতি অনুসৃত হইলে উক্ত উপকার ত হয়ই না, নানাদিকে ঔদাসীন্য আলস্য আদি দোষ বাড়িতে থাকে। রাষ্ট্রের ক্ষতিও খুব হয়। সম্প্রদায় ও বংশ অনুসারে অনুগ্রহের রীতির অবশ্যম্ভাবী ফলে অনেক অযোগ্য লোক রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলে রাষ্ট্রের কোন বিভাগেরই কাজ ভাল করিয়া চলিবে না। তাহাতে বিশৃঙ্খলা, অপরাধ-বৃদ্ধি, রোগবৃদ্ধি, কৃষি শিল্পবাণিজ্যের ক্ষতি এবং রাজস্বহ্রাস ঘটিবে।

—

অনুগৃহীত সম্প্রদায়ের ক্ষতিলাভ

সামরিক সব চাকরী ছাড়িয়া দিয়া (কারণ সরকারী বাঁটোআরা অসামরিক চাকরী সম্পর্কেই হইয়াছে) ব্রিটিশ-ভারতে পুলিসের কাজ করে ২২৪৯৯৬ জন এবং অন্য সরকারী চাকরী ("service of the State") করে ৩৫২৫৬৩ জন—মোট ৫৭৭৫৫৯ জন সরকারী চাকরী করে। সরকারী চাকরীর যে বাঁটোআরা বাহির হইয়াছে, তাহা ভারত-গবর্মেণ্টের অধীনস্থ চাকরীসমূহ সম্বন্ধে, প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট সমূহের অধীনস্থ চাকরী-সমূহ সম্বন্ধে নহে। আমরা উপরে যে সংখ্যা দিলাম, তাহা ভারত ও প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট-সমূহের সব চাকরীর সমষ্টি। শুধু ভারত-গবর্মেণ্টের হস্তস্থিত চাকরী-সকলের আলাদা সংখ্যা পাই নাই। ভারত-গবর্মেণ্ট যেরূপ নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রাদেশিক সব গবর্মেণ্টও নিশ্চয়ই অচিরে সেইরূপ কিছু করিবেন। সুতরাং আমরা সেন্সস রিপোর্ট হইতে উপরে যে সংখ্যা দিয়াছি, তাহাকে ভিত্তি করিয়াই কিছু আলোচনা করি।

৫৭৭৫৫৯টি চাকরীর সিকি মুসলমানেরা পাইলে ১৪৪৩৮৯টি চাকরী তাঁহারা সমুদয় ব্রিটিশ-ভারতে পাইবেন। সেন্সস রিপোর্টে পুলিসের লোকদের পরিবারের গড় বৃহত্ব ৩·৭ জন এবং অন্য চাকরোদের ৩·৯ জন দেওয়া হইয়াছে, গড় ৩·৮। প্রত্যেক মুসলমান সরকারী চাকর্যের পরিবারে, চাকর্যেকেও ধরিয়া, ৪+১ ৫ জন মানুষ আছে ধরা যাউক। তাহা হইলে ১৪৪৩৮৯টি চাকরীতে আবালবৃদ্ধবনিতা ৭২১৯৪৫ জন মুসলমান সাক্ষাৎভাবে প্রতিপালিত ও লাভবান্ হইবে। ব্রিটিশ-ভারতে মোট মুসলমান লোকসংখ্যা ৬,৭০,২০,৪৪৩। ইহা হইতে ৭,২১,৯৪৫ জন বাদ দিলে যে ৬,৬২,৯৮,৪৯৮ মুসলমান বাকী থাকে, তাহারা গবর্মেণ্টের

নূতন চাকরী-বাঁটোআরা হইতে সাক্ষাৎ ভাবে লাভবান হইবে না। কিন্তু সরকারী কার্য্যে সাম্প্রদায়িক নিয়োগনীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় রাষ্ট্রের শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি শিল্পবাণিজ্য বিচার শাসন রেল ডাক টেলিগ্রাফ আদি সব বিভাগের কাজ যে নিকৃষ্টভাবে পরিচালিত হইবে এবং সমাজে দৈহিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় যে ভাঁটা পড়িবে, তাহার দরুন অমুসলমান ভারতীয়দেরই মত অকল্যাণ ও ক্ষতির ভাগী ঐ প্রায় সাত কোটি মুসলমানেও হইবে।

বলিয়াছি, যে, অধিকাংশ মুসলমান সাক্ষাৎভাবে গবন্মে‍ণ্টের চাকরী-বাঁটোআরা দ্বারা লাভবান হইবে না। পরোক্ষভাবে লাভবান হইবে কি? বাংলা দেশের অভিজ্ঞতা অন্য সব প্রদেশে খাটে কি না জানি না। কিন্তু অন্ততঃ বাংলা দেশে দেখিতেছি, লোকসংখ্যা ও সম্পত্তির তুলনায় বঙ্গের মুসলমানেরা, সকল সম্প্রদায়ের জন্য দূরে থাক, নিজ সম্প্রদায়ের জন্যও বিদ্যালয় কলেজ খুব কম স্থাপন করিয়াছেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে খুব সামান্য বৃত্তি পুরস্কার পদক দিয়াছেন, অন্যবিধ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা কার্য্য সম্পাদন খুব সামান্যই করিয়াছেন এবং দুর্ভিক্ষজলপ্লাবনাদিতে বিপন্ন মুসলমানদেরও সাহায্যার্থ অর্থ, শক্তি ও সময় সামান্যই দিয়াছেন। সুতরাং ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না, যে, গবন্মে‍ণ্টের এই নূতন বাঁটোআরা অন্য সব সম্প্রদায়ের মত বিরাট মুসলমান সমাজেরও প্রভূত অকল্যাণ ও ক্ষতিই করিবে। উহার দ্বারা বিশাল মুসলম জনসমষ্টির তুলনায় অল্পসংখ্যক মুসলমানেরই আর্থিক সুবিধা হইবে। তাহার ও তাহাদের সমশ্রেণীস্থ চাকরীর উমেদার ও মসীজীবী হইতে অভিলাষী মুসলমানেরা মুখর হইয়া বাঁটোআরাটার প্রশংসা করিতেছে। কিন্তু বিরাট মুসলমান জনগণ যদি ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিত এবং যদি তাহাদের প্রকৃত প্রতিনিধিসভা ও খবরের কাগজ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা আনন্দিত হইত না, বরং জাতীয় একতা ও স্বরাজলাভের পথে এই নূতন কণ্টক রোপিত হওয়ায় তাহারা সন্তপ্ত হইয়া ইহার প্রতিবাদই করিত।

—

মুসলমানদের মধ্যেই প্রতিযোগিতা চাই

শতকরা ২৫টি চাকরী মুসলমানদিগকে দিবার জন্য যদি গবন্মে‍ণ্ট মুসলমানদেরই মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা সেগুলি যোগ্যতম মুসলমানদিগকে দেন, তাহা হইলে মন্দের ভাল হইবে, কেবলমাত্র "জোহুকুম"-গিরিতে যোগ্যতম মুসলমানেরাই তাহা পাইবেন।

—

চাকরী-বাঁটোআরা ও স্বাজাতিকদের কর্ত্তব্য

যাঁহারা আগে হইতেই নিজেদের আদর্শ অনুসারে সরকারী চাকরী হইতে নিবৃত্ত আছেন ও থাকিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এখন নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যাঁহাদের আদর্শ সরকারী চাকরী করার বিপরীত নহে, চাকরী-বাঁটোআরার দরুন তাঁহাদের সরকারী চাকরীর প্রতি বিমুখ হইবার কোন কারণ নাই, গবন্মে‍ণ্ট যাহাদিগকে অনুগ্রহ করিতেছেন তাহাদের প্রতি ঈর্ষ্যা বা অসদ্ভাব পোষণ করিবারও কোন কারণ নাই।

সরকারী চাকরীর দুটা দিক আছে। এক উপার্জ্জন, দ্বিতীয় দেশের হিত; কারণ আদর্শ অনুসারে কাজ করিতে পারিলে সরকারী সকল বিভাগের চাকরীর দ্বারা দেশের হিত করা যায়—অবশ্য দেশকে স্বাধীন করিবার সাক্ষাৎ চেষ্টা ছাড়া অন্যবিধ হিত। এই জন্য সরকারী চাকরীর অভিলাষী হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি চাকরীপ্রার্থীর প্রতিযোগিতায় উৎকর্ষ প্রদর্শন দ্বারা এবং কেবল সেই উপায়েই চাকরী পাইবার চেষ্টা করিতে পারেন।

দেশসেবার ও ধনোপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট উপায় ও ক্ষেত্র কৃষিশিল্পবাণিজ্যাদি স্বাধীন বৃত্তিতে সকলের জন্য পড়িয়াই আছে।

—

চাকরী-বাঁটোআরা ও শিক্ষার উন্নতি

সমুদয় সরকারী উচ্চ কাজেও কেবল ভারতীয়দিগকেই নিযুক্ত করা হউক, ভারতীয় নেতাদের এই সঙ্গত দাবীর উত্তরে গবন্মে‍ণ্ট বহুবার বলিয়াছেন, সেরূপ সব কাজের জন্য যথেষ্টসংখ্যক যথেষ্ট যোগ্য ভারতীয় পাওয়া যায় না। ইহার সরল অর্থ এই, যে, ভারতীয়েরা শিক্ষায় আরও বেশী উন্নত ও অগ্রসর হইলে ঐ সব কাজ সমস্তই পাইবে। জিজ্ঞাস্য এই, চাকরী-বাঁটোআরা কি শিক্ষাবিষয়ে এই উন্নতি ও প্রগতির অনুকূল না প্রতিকূল? নিশ্চয়ই প্রতিকূল। কারণ, এই বাঁটোআরা মুসলমানদিগকে

[ব]লিতেছি, "শিক্ষায় তোমরা যত অনুন্নতই হও না কেন, শতকরা ২৫টি কাজ তোমরা পাইবেই"; হিন্দুদিগকে ইহা বলিতেছে, "তোমরা শিক্ষায় যত উন্নতই হও না কেন, চাকরীর সমুদয় বা কতকগুলি বিভাগে শতকরা ৪২½ টি চাকরী তোমরা পাইবেই না।"

—

চাকরী-বাঁটোআরা করা এখন ভারত-গবন্মেণ্টের অধিকার-বহির্ভূত

প্রথম তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকে নিযুক্ত একটি সব-কমিটির উপর ভবিষ্যৎ শাসনবিধি অনুসারে সব রকম চাকরীতে নিয়োগাদি বিষয় আলোচনা করিবার ভার দেওয়া হয়। সেই সব-কমিটি সুপারিশ করেন, যে, কার্য্যনির্ব্বাহের উৎকর্ষের ক্ষতি না করিয়া এবং আবশ্যক যোগ্যতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে সব সম্প্রদায়ের লোক যথাযোগ্য রূপে চাকরী পায় তাহার ব্যবস্থা পব্লিক সার্ভিস কমিশন-সমূহ দ্বারা করাইতে হইবে। এই সুপারিশ এখন পার্লেমেণ্টের জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির বিচারাধীন আছে। উক্ত কমিটি রিপোর্ট করিলে তাহা পার্লেমেণ্টে বিবেচিত হইবে। পার্লেমেণ্টের রায় বাহির হইলে তবে গবন্মেণ্ট কিছু করিতে অধিকারী। পার্লেমেণ্টের কোন কমিটির বিচারাধীন কোন বিষয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত করিবার অধিকার ভারতসচিব ও ভারত-গবন্মেণ্টের আছে কি? নিশ্চয়ই নাই।

—

পুনায় মহাত্মাজীর প্রতি (?) বোমা নিক্ষেপ

মহাত্মা গান্ধী পুনায় যখন অভিনন্দন-সভায় যাইতে-ছিলেন, তখন তিনি নির্দিষ্ট ভবনে পৌঁছিবার আগে [প]থায় একটি মোটরকে লক্ষ্য করিয়া একটা বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এই মোটরে তিনি ছিলেন না। অন্য যাঁহারা [ছি]লেন তাঁহারা আহত হন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে [কে]হ মারা পড়েন নাই। প্রথমেই খবর রটে, যে, [গা]ন্ধীজীকে লক্ষ্য করিয়া বোমা ছোঁড়া হইয়াছিল। কিন্তু [ত]াহার চেহারা এত সুপরিচিত যে ভ্রম করিয়া অন্য [গা]ড়ীতে বোমা নিক্ষেপ সম্ভবপর নহে বলিয়া বোমা [ত]াহারই উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল কি-না সে বিষয়ে [সে]রে সন্দেহ প্রকাশিত হইয়াছে।

তথাকথিত সনাতনীরা মহাত্মাজীর বিরোধিতা [ক]রিতেছে, বৈদ্যনাথে তাহারা তাঁহার গাড়ীর উপর [ল]াঠি মারিয়াছিল, অন্যত্র তাঁহাকে কৃষ্ণ তাকা দেখাইয়া [অপ]মানিত করিতেছে, ইত্যাদি কারণে সন্দেহ হইয়াছে, যে, পুনার বোমা কোন সনাতনী বা সনাতনীদের নিযুক্ত কোন চর ছুঁড়িয়াছিল। কিন্তু যত ক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃত দোষী ধরা না পড়িতেছে, ও তাহার দোষ নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত না হইতেছে, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও বা কোন দলের উপর দোষ আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত হইবে না। এমনও ত হইতে পারে, যে, সনাতনীদের গান্ধীবিরোধী প্রচেষ্টার সুযোগে, লোকে তাহাদিগকেই দোষী করিবে ভাবিয়া, অন্য কোন কুচক্রী পক্ষ এই কাজ করাইয়াছে।

যাহা হউক, যে বা যাহারাই এই দুষ্কার্য্য করিয়া থাকুক, সাধারণ ভাবে দুই-একটি কথা বলা যাইতে পারে।

হিন্দু শাস্ত্রে, বৌদ্ধ শাস্ত্রে এবং খ্রীষ্টিয়ান শাস্ত্রে এই উপদেশ আছে, যে, ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা, দ্বেষকে প্রীতির দ্বারা, অকল্যাণকে কল্যাণ দ্বারা জয় করিতে হইবে। সুতরাং মহাত্মাজী যদি ক্রোধমূলক বিদ্বেষমূলক বলপ্রয়োগসাপেক্ষ কিছু করিতেন, তাহা হইলেও তাহার বিপরীত সাত্ত্বিক অহিংস উপায়েই তাহার বিরোধিতা করা উচিত হইত। কিন্তু তিনি অহিংস উপায়ই অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে অহিংস উপায়ই অবলম্বন আরও যুক্তিযুক্ত। তাঁহার সহিত যাঁহারা যুদ্ধ করিতে চান, তাঁহারা তর্ক-যুদ্ধ করুন এবং তদতিরিক্ত সেবা-যুদ্ধ করুন। তিনি হরিজনদিগের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। সনাতনীরা যে-সকল শাস্ত্র মানেন, তাহাতেও সকল জীবের কল্যাণ করিবার উপদেশ আছে। অতএব সনাতনীরা হরিজনকল্যাণকর্ম্মে মহাত্মাজীকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করুন।

—

মহাত্মাজী বঙ্গে স্বাগত

মহাত্মাজীর বাংলা দেশে আগমন উপলক্ষ্যে তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাইতেছি। তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য ও হরিজনদিগের মানবোচিত সকল অধিকার ও সুবিধা লাভের জন্য যে দুই প্রচেষ্টা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ সায় আছে।

—

গান্ধীজীর আবার উপবাসের সঙ্কল্প

আজমীরে পণ্ডিত লালনাথ নামক একজন সনাতনীর দেহে হস্তক্ষেপ আঘাতআদি হওয়ায় মহাত্মাজী মনে করিয়াছেন, যে, হরিজন আন্দোলনের মধ্যে হিংসার ভাব আসিয়াছে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তিনি সাত দিন উপবাস করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ইহা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও ইহাতে আমাদের দুঃখবোধ ও আশঙ্কা হইতেছে।

পণ্ডিত লালনাথের অভিযোগ সত্য বলিয়া মনে করিয়া গান্ধীজী এই সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু রাজপুতানা হরিজন-বোর্ডের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ চৌধুরী তদন্তের ফলে এই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, ঐ অভিযোগ মিথ্যা।

—

কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচন

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হওয়ার দ্বারা মেয়রনির্ব্বাচনঘটিত অশোভন দ্বন্দ্ব ও প্রহসনের যবনিকাপাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। মেয়র অসীম ক্ষমতাশালী একাধিপিতি (dictator) নহেন। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিলেও বেশী কিছু করিতে পারেন না। তাহার উপর নলিনীরঞ্জন বাবু কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য এক বৎসরের পরিবর্ত্তে কেবল নয় মাস সময় পাইবেন। তথাপি তাঁহার মত কর্ম্মিষ্ঠ ও আর্থিকআয়ব্যয়সম্পৃক্ত-ব্যাপার পরিচালনে সুদক্ষ ব্যক্তি হয়ত নয় মাসেও কিছু সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে এবং কলিকাতা মিউনিসি-পালিটীর আদর্শকে কিয়ৎপরিমাণে আরও অধিক বাস্তবে পরিণত করিতে পারিবেন। তাহা পারিলে তাঁহার নির্ব্বাচন ঠিক হইয়াছে প্রমাণিত হইবে। তবে যদি আইন মেয়রকে কোন কার্য্যকরী ক্ষমতা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে কোন মেয়রের কাছেই কিছু প্রত্যাশা করা উচিত নয়।

—

বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের অস্থায়ী পদোন্নতি

বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় যে অল্প সময়ের জন্যও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহা কিঞ্চিৎ সন্তোষের বিষয়। কিন্তু তাঁহার মত সুযোগ্য ব্যক্তি যে স্থায়ী প্রধান বিচারপতি হইতে পারিলেন না, ইহা তদপেক্ষা অসন্তোষের বিষয়।

—

প্রাচীন ভারতে বাসস্থান নির্ম্মাণ পদ্ধতি

এই মাসের প্রবাসীতে প্রাচীন ভারতে বাসস্থান নির্ম্মাণ বিষয়ে অধ্যাপক প্রসন্নকুমার আচার্য্য যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলে বুঝা যায়, পুরাকালে এদেশে রাজারাজড়া ও সাধারণ লোকদের প্রাত্যহিক জীবনে কিরূপ বৈচিত্র্য ছিল এবং তাহাদের বাসগৃহ তাহার কিরূপ উপযোগী ছিল। এই রূপ বৈচিত্র্য সভ্যতার একটি লক্ষণ।

প্রাচীন ভারতীয় স্থপতিরা বিজ্ঞানানুমোদিত ভাবে কত দিকে দৃষ্টি রাখিতেন, তাহারও কিছু পরিচয় এই প্রবন্ধে আছে।

কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের বিশেষ পরিচয় পাইতে হইলে দুই-চারিটা "নবা-প্রাচীন" দরজা জানালা ও কীর্ত্তিমুখ দেখা যথেষ্ট নহে। আচার্য্য মহাশয়ের টীকা ভূমিকা ও ইংরেজী অনুবাদ সম্বলিত "মানসারে"র পাঁচ ভল্যুমে সমাপ্ত মূল্যবান্ সচিত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করা আবশ্যক। তাহা অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

—

আসামে ও বঙ্গে জলপ্লাবন

আসামে ও বঙ্গে অনেক জেলায় বন্যা হওয়ায় বহু লক্ষ লোক বিপন্ন ও নিরাশ্রয় হইয়াছে। অনেক শত লোকের প্রাণ গিয়াছে। গবাদি পশু এবং অন্য সম্পত্তির নাশও প্রভূত হইয়াছে। যে-সকল সভা সমিতি বিপন্নদের দুঃখ মোচন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে সর্ব্ববিধ সাহায্য পাইলে তাঁহাদের চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে সফল হইবে।

আমরা শোকার্ত্ত ও বিপন্নদের জন্য ব্যথিত।

—

বিদেশভ্রমণ দ্বারা শিক্ষার্থী

বিদেশভ্রমণ দ্বারা শিক্ষালাভার্থ একদল ভারতীয় ছাত্র পূর্ব্বে বিদেশ যাত্রা করিয়াছিল। তাহার পর এক দল ভারতীয় ছাত্রী গিয়াছে। গত ১১ই জুন দ্বিতীয় দল ছাত্র ইউরোপ গিয়াছে। এই সমুদয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাঙালী কেহ নাই। সম্ভবতঃ আর্থিক অভাব ইহার একটি কারণ। যে-সকল বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীর টাকায় কুলাইবে, তাঁহাদের কিন্তু বিদেশ দেখিয়া আসা উচিত।

—

হিন্দু বিধবাদের প্রতি সমাজের কর্ত্তব্য

বোম্বাইয়ের অন্যতম হিন্দু নেতা শ্রীযুক্ত মুকুন্দ রাও জয়াকর সম্প্রতি বলিয়াছেন, যে, তিনি যতদূর তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে,

> "ভারতে প্রত্যহ গড়ে ত্রিশ জন হিন্দু বিধবা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। গত পনর দিনে বোম্বাই প্রদেশের ১১ জন হিন্দু মহিলার অপহরণ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় বিধবাদের জন্য বহু আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"

হিন্দু বিধবারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করুন বা না-করুন, তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি একান্ত আবশ্যক। আশ্রম স্থাপন, শিক্ষার দ্বারা তাঁহাদিগকে স্বাবলম্বী করা, এ সবই আংশিক উপায় বটে; কিন্তু প্রধান উপায় তাঁহাদিগের সৎপাত্রের সহিত

বিবাহ দেওয়া। বালবিধবাদের বিবাহ দেওয়া মহা পুণ্যের কাজ। ইহা খুব উৎসাহের সহিত চালান উচিত। অনেক অন্তঃপুরে সধবা ও বিধবার উপর জঘন্য অত্যাচার হয়। ইহার দমন ও নিবারণ চাই।

কাগজে দেখিলাম, কলিকাতার বিধবাবিবাহসহায়ক সমিতি ১৯২৫ সাল হইতে ১৯৩৩ পর্য্যন্ত কয় বৎসরে ৪২৯৬টি বিধবার বিবাহ দিয়াছেন। ইহা ভাল, কিন্তু ইহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক বিধবার বিবাহ হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমানে সমিতির সন্ধানে ৩৫০ জন পাত্র ও ১৭০ জন বিধবা পাত্রী আছে।

—

নারীহরণ সম্বন্ধে ভাই পরমানন্দ

সম্প্রতি ভাই পরমানন্দ বলিয়াছেন—

"যে পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত না হয় এবং যে-পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজ গুণ্ডার কবল হইতে হিন্দু বালিকাদিগকে রক্ষা করিবার মত শক্তি অর্জ্জন না করে, তত দিন হিন্দু বালিকাদিগকে পরদার আড়ালে রাখা ও অশিক্ষিত রাখা উচিত।"

ভাই পরমানন্দের উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু তাঁহার পরামর্শ গ্রহণীয় নহে। যে-সকল পুরুষ নারীরক্ষার জন্য প্রাণপণ করে না, তাহারা মানুষ নামের যোগ্য নয়। সে-সকল পুরুষের দরজা ভাঙিয়া বাড়ির ভিতর হইতেও গুণ্ডারা নারীহরণ করিতে পারে এবং কোন কোন স্থলে করেও অবশ্য, অপহৃতা প্রত্যেক নারীর আত্মীয়েরাই যে কাপুরুষ তাহা নহে। অনেক সময় তাঁহাদের অনুপস্থিতির সময় নারী অপহৃতা হন এবং কখন কখন তাঁহাদিগকে আঘাত দ্বারা অসমর্থ করিয়া নারী হরণ করা হয়।

নারীহরণ অধিকাংশ স্থলে পল্লীগ্রামে হয়। পল্লীগ্রামে কি মেয়েদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব?

পুরুষদের পৌরুষ জাগ্রত করা এবং তাঁহাদের দেহমনের শক্তি বৃদ্ধি করা যেমন আবশ্যক, নারীদেরও দেহমনের শক্তি বৃদ্ধি সেইরূপ আবশ্যক। তাঁহারা ত জড়সম্পত্তিবৎ কিছু নহেন। তাঁহাদেরও আত্মরক্ষার সামর্থ্য জন্মান ও বাড়ান দরকার। ইহা নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক শিক্ষা-সাপেক্ষ। বালিকা ও নারীদিগকে অশিক্ষিতা রাখিলে নারীহরণ কমিবে, এ বড় অদ্ভুত কথা। যত বালিকা ও নারী অপহৃতা হন, তাহার সমস্ত বা অধিকাংশ কি শিক্ষিতা?

—

বঙ্গীয় মহিলাদের কৌন্সিল

বঙ্গীয় মহিলাদের কৌন্সিল বঙ্গীয় অশ্লীল সিনেমাচিত্র ও সিনেমার অশ্লীল বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সাফল্য কামনা করি।

—

বেথুন কলেজ ও বঙ্গে নারীশিক্ষা

বাংলা দেশে নারীদিগকে কতকটা উচ্চশিক্ষা দিবার ইচ্ছা যে ক্রমশঃ বাড়িতেছে, তাহা ছেলেদের অনেক কলেজে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে বুঝা যায়। অথচ গবন্মেণ্ট নারীশিক্ষায় কোন উৎসাহ দেখাইতেছেন না, ইহা বড় পরিতাপের বিষয়—যদিও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমেরিকার মত দেশে, যেখানে অবরোধপ্রথা নাই, সেখানেও মেয়েদের জন্য আলাদা কলেজ অনেক আছে, আবার ছাত্রছাত্রীর একই প্রতিষ্ঠানে পড়িবার ব্যবস্থাও বহু স্থানে আছে। তাহার কারণ, মেয়েদের কোন কোন প্রকার শিক্ষা কেবলমাত্র ছাত্রীদের জন্যই অভিপ্রেত কলেজেই হইতে পারে। আমাদের দেশে ত শুধু মেয়েদের জন্য অভিপ্রেত বিদ্যামন্দির আরও দরকার। সেই জন্য, ছেলেদের কলেজে মেয়েদের শিক্ষালাভের বিন্দুমাত্রও বিরোধিতা না করিয়া, আমরা গবন্মেণ্টকে এবং দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে বেথুন কলেজের উপযোগিতা ও উপকারিতা অধিক পরিমাণে বাড়াইতে অনুরোধ করিতেছি।

ঢাকাতে যে সামান্য বন্দোবস্ত আছে, তাহা ছাড়িয়া দিলে, বেথুন কলেজ বঙ্গের একমাত্র সরকারী মহিলা-কলেজ। অথচ দুঃখের বিষয়, আমরা শুনিলাম, ইহার ছাত্রী-নিবাসে ১ম ও ৩য় বার্ষিক ছাত্রীদের জন্য মোটে ৮ জনের জায়গা আছে। কলেজের ক্লাস-কক্ষাদির ব্যবস্থাও নিকৃষ্ট ও অপ্রচুর। বেথুন কলেজের সন্নিহিত ক্রাইষ্ট চার্চ স্কুলের জায়গা ও বাড়ি গবন্মেণ্ট অনেক বৎসর হইল তিন লক্ষ টাকা দিয়া কিনিয়া রাখিয়াছেন—তাহার প্রকাশিত উদ্দেশ্য বেথুন কলেজের বিস্তৃতিসাধন। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত ত কিছুই করা হইল না। তবে কি পাদ্রি সাহেবদিগকে তিন লাখ টাকা পাওয়াইয়া দিবার জন্য উহা কেনা হইয়াছিল? কলেজের পশ্চাৎ দিকেও ত বড় একটা খালি জায়গা কলেজের আছে। তাহাতেই বা ঘরবাড়ী নির্ম্মিত কেন হইতেছে না?

—

সেনহাটী মহিলা-সমিতির সৎকার্য্য

সেনহাটীর মহিলা-সমিতির একটি পুকুর পরিষ্কার করিবার যে ছবি অন্যত্র প্রকাশিত হইল, তাহার জন্য আমরা উহার সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লীলা দাসগুপ্তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

—

নিখিল ভারত নারীসম্মেলনের কলিকাতা শাখা

নিখিল ভারত নারীসম্মেলনের কলিকাতা শাখার দুটি প্রস্তাব বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। প্রথমটি সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মণিকা মহলানবীশ উত্থাপিত করেন। যথা—

নিখিল ভারত নারী-সম্মেলনের কলিকাতা শাখা তাঁহাদের এলাকার মধ্যে হিন্দুনারীর উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা করিবেন; এবং সে-বিষয়ে একটি বেসরকারী কমিশন বসাইবার জন্য আবেদন-আন্দোলন করিবেন, যাহাতে সে আইন ক্রমে সংশোধিত হইয়া ন্যায়সঙ্গত ও সমদর্শী হয়, সে-বিষয়ে যত্নবান হইবেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, সমর্থন করেন শ্রীমতী হেমলতা মিত্র ও পোষকতা করেন শ্রীমতী কুমুদিনী বসু। তাহা এই

নারীহরণের পাপ বাংলা দেশময় ব্যাপ্ত হওয়ায় এই লজ্জাকর কলঙ্ক অপনোদনের নিমিত্ত নিখিল-ভারত নারীসম্মেলনের কলিকাতা শাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

জাপানে, ভারতবর্ষে ও রুশিয়ায় শিক্ষাবিস্তার

ভারতবর্ষের উচ্চবেতনভোগী ইংরেজ শিক্ষাকর্ম্মচারীরা বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট লিখিয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদনের চেষ্টা করেন। বিস্ময় হয় বটে, কিন্তু সেটা উল্টা রকমের। আমরা ভাবি, এই যে অকিঞ্চিৎকর কৃতিত্ব এবং অতিবিশাল অকৃতিত্ব, ইহা তাঁহারা কোন্ লজ্জায় লোকচক্ষুর গোচর করেন!

আমরা কিছুদিন আগে দেখাইয়াছিলাম, জাপানে শুধু প্রাথমিক শিক্ষাই পাইতেছে মোট লোকসংখ্যার শতকরা কুড়ি জন এবং তথাকার শতকরা প্রায় ৯৯ জন লিখনপঠনক্ষম। ভারতবর্ষে সর্ব্ববিধ শিক্ষা মোট লোকসংখ্যার শতকরা কত জন কোন্ প্রদেশে পাইতেছে দেখুন। সংখ্যাগুলি সম্প্রতি প্রকাশিত ভারত-গবন্মেণ্টের শিক্ষা-কমিশনার স্যর জর্জ এণ্ডার্সনের লেখা ১৯২৭-৩২ পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট হইতে গৃহীত। মান্দ্রাজ ৬.২৫, বোম্বাই ৬.১১, বাংলা ৫.৫৫, আগ্রা-অযোধ্যা ৩.১৩, পঞ্জাব ৫.৬১, ব্রহ্মদেশ ৪.২৮, বিহার-উড়িষ্যা ২.৯০, মধ্যপ্রদেশ ২.৯৬, আসাম ৪.৩২, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৩.৬০। ভারতবর্ষে লিখনপঠনক্ষম শতকরা আট জন এবং নিরক্ষর শতকরা ৯২ বিরানব্বই জন!

রুশিয়া ও ভারতবর্ষে শিক্ষার বিস্তার কিরূপ হইতেছে দেখুন।

বর্ত্তমান বৎসরে প্রকাশিত জোসেফ ষ্টালিন প্রণীত সোভিয়েট ইউনিয়নের অবস্থা ("The State of the Soviet Union") নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, যে, ১৯৩০ সালের শেষে শতকরা ৬৭ জন লিখনপঠনক্ষম ছিল, ১৯৩৩ সালের শেষে হইয়াছে শতকরা ৯০ জন। ১৯২৯ সালে সকল রকম স্কুলে শিক্ষা পাইত ১৪৩৫৮০০০ জন ছাত্রছাত্রী, ১৯৩৩ সালে পাইত ২৬৪১৯০০০। তা ছাড়া, স্কুলে যাইবার আগেকার শিক্ষা ("Pre-school education") ১৯২৯ সালে ৮,৩৮,০০০টি শিশু পাইত, ১৯৩৩ সালে পাইত ৫৯,১৭,০০০টি শিশু। ভারতবর্ষে উহার তুলনায় শিক্ষার "দ্রুত" গতি কিরূপ দেখুন। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ হইতে পাঠশালা পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ বিদ্যামন্দিরে ব্রিটিশ-ভারতে ১৯২৭ সালে পড়িত ১১১৫৭৪৯৬ এবং ১৯৩২ সালে পড়িত ১২৭৬৬৫৩৭। মনে রাখিতে হইবে, সোভিয়েট রুশিয়ার লোকসংখ্যা ১৬১০০৬২০০, ও উহার বিস্তর জাতির নিজের কোন বর্ণমালা ও সাহিত্য এ-যাবৎ ছিল না; এবং সুসভ্য বহুবিস্তৃতসাহিত্য-বিশিষ্ট ব্রিটিশ-ভারতের লোকসংখ্যা ২৭১৫২৬৯৩৩। অর্থাৎ ব্রিটিশ-ভারতের লোকসংখ্যা রুশিয়ার প্রায় দ্বিগুণ, কিন্তু রুশিয়ার শুধু স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর ও বয়সের সব ছাত্রছাত্রীর দ্বিগুণের অনেক বেশী।

জার্ম্মেনীতে অশান্তি ও হত্যাকাণ্ড

জার্ম্মেনীর অনিয়ন্ত্রিতক্ষমতাবিশিষ্ট একাধিপতি হিটলারের বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ বাড়িতেছিল এবং তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, বোধ হয়। সেই জন্য তিনি তাঁহার বিরোধী বিস্তর লোককে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাদের প্রাণবধ করিয়াছেন! এরূপ রক্তাপ্লুত ভিত্তির উপর কোন দেশের স্বাধীনতা ও শ্রী প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। এবং বস্তুতঃ এখন জার্ম্মেনী বিদেশী কোন জাতি বা ব্যক্তির অধীন না হইলেও স্বাধীনও নহে, কিন্তু একজন যথেচ্ছাচারীর অধীন।

চীনা তুর্কিস্থানে চীনাধিকার পুনঃস্থাপিত

সংবাদ আসিয়াছে, যে, কাশ্মীর আফগানিস্থান ও রুশিয়ার সীমা পর্য্যন্ত কাশগড় ও ইয়ারকন্দ প্রভৃতি চীনা তুর্কিস্থানের সব অঞ্চল তুঙ্গানরা পুনরায় দখল করিয়াছে। অসামরিক চীনা গবর্ণরের সাহায্যে তাহারা ইহা করিতে পারিয়াছে। এই প্রকারে চীনা তুর্কিস্থানের অধিকাংশ চীন-গবন্মেণ্ট পুনরায় দখল করিয়াছে এবং বিদ্রোহী মুসলমানেরা পলায়ন করিয়াছে। চীনকে টুকরা টুকরা করিবার চেষ্টা এক দিকে যেমন জাপান করিতেছে, অন্য দিকে তেমনি মুসলমান অধিবাসীদিগকে বিদ্রোহী করিয়া ও যুদ্ধসরঞ্জাম জোগাইয়া একটি ইউরোপীয় শক্তি চীনা তুর্কিস্থানকে চীন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

গুজরাটের ও মেদিনীপুরের কৃষক

অহিংস আইনলঙ্ঘন আন্দোলন প্রচেষ্টায় যোগ দেওয়ায় কয় বৎসর গুজরাটের কৃষকদের খুব ক্ষতি হইয়া থাকায় টাকা তুলিয়া তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিবার চেষ্টা বোম্বাইয়ে হইতেছে। মহাত্মা গান্ধী এই চেষ্টার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। মেদিনীপুরের কৃষকেরাও সমতুল্য কারণে

সমধিক দুঃখ ভোগ করিয়াছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাদের ক্ষতিপূরণের কোন চেষ্টা হইতেছে বলিয়া অবগত নহি।

—

ভারতবর্ষে বিদেশী চাল

ধানের জমী ভারতবর্ষে অনেক আছে, চালও অনেক হয়। তথাপি শ্যাম ও ইণ্ডোচীন হইতে খুব সস্তা দরে ভারতে চাল আমদানী হইতেছে। জাপানী চালও কিছু দিন খুব সস্তা দরে এদেশে বিক্রী হইতেছিল। এখন হয় কি না জানি না। ভারতের বাজার দখল করিবার জন্য হয়ত ঐ সব দেশের রাজশক্তির সাহায্যে তথাকার চাল এদেশে সস্তায় নীত ও বিক্রীত হয়। ভারত-গবর্ন্মেণ্ট প্রতিকারের চিন্তা করিতেছেন। হয়ত বিদেশী চালের উপর শুল্ক বসিবে। কিন্তু শুধু এই উপায়ের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। ভারতের সব ধানচাষের জমীর উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইয়া এখানেই অধিকতর ধান্য উৎপন্ন করিয়া চাল খুব সস্তা করা যাইতে পারে।

—

বিনা বিচারে স্থায়ী ভাবে বন্দী রাখিবার ফন্দি

যে অস্থায়ী আইনের বলে বিনা বিচারে বন্দী অনেক বাঙালী যুবককে আজমীরের দেওলী জেলে চালান দিয়া আটক রাখা হইতেছে, তাহাকে স্থায়ী আইনে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্রসচিব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে একটি বিল পেশ করিবেন। আইনটি যখন হইয়াছিল, তখন তিন বৎসরের জন্য করা হইতেছে বলা হইয়াছিল। সে-কথা কোথায় রহিল? অবশ্য, গবর্ন্মেণ্টের পক্ষে ইহা বলা হইতে পারে, যে, গবর্ন্মেণ্ট দেখিলেন, যে, তিন বৎসরে বাংলা দেশ ঠাণ্ডা হইল না, এবং ভবিষ্যতেও হইবার আশা নাই, তাই স্থায়ী আইন চাই। তাহা সত্য হইলে, এতাদৃশ একটি স্থায়ী আইন প্রণয়নের চেষ্টা করিয়া গবর্ন্মেণ্ট ব্রিটিশ শাসনকে খুব উচ্চ সার্টিফিকেট দিতেছেন।

—

সারদা আইনকে ফাঁকি দেওয়া

বঙ্গে যাহারা সারদা আইনকে ফাঁকি দিয়া ১৪ বছরের কম বয়সের মেয়ের বিবাহ দিতে চায়, তাহারা ফরাসী চন্দননগরে গিয়া বিবাহ দেয়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোকানাডা শহরের নিকটবর্ত্তী য়ানাম নামক ফরাসী অধিকৃত স্থানে সারদা-আইনকে ফাঁকি দিয়া গত ১লা জুলাই ৫ হইতে ১০ বৎসরের মেয়েদের সহিত ১৫ হইতে ১৮ বৎসরের ছেলেদের ৯০ টা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অনেকে রাজপুতানায় গিয়া এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বাল্যবিবাহপ্রিয় লোকেরা নিজামের রাজ্যে গিয়া বাল্য-বিবাহ দেয়। সারদা আইন সংশোধন করিয়া এইরূপ সব বিবাহও দণ্ডনীয় করা উচিত।

বঙ্গে অবাঙালী এঞ্জিনীয়ার

কর্ম্মপ্রার্থী খুব যোগ্য বাঙালী এঞ্জিনীয়ার অনেক থাকা সত্ত্বেও আগে বরিশালে মুসলমানপ্রধান ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড একজন পঞ্জাবী মুসলমান এঞ্জিনীয়ারকে চাকরী দিয়াছিলেন। সম্প্রতি পাবনার মুসলমানপ্রধান ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডও ঠিক্ সেই অবস্থায় আর একজন পঞ্জাবী মুসলমানকে চাকরী দিয়াছেন। এই সকল মুসলমান বাঙালীর বঙ্গপ্রীতি ত নাই-ই, অধিকন্তু মুসলমান বাঙালীদের সমষ্টিগত স্বার্থও তাঁহারা ভুলিয়া যান। মুসলমান বাঙালীর দুঃখমোচনে অন্য বাঙালীরাই অগ্রসর হয়, পাঞ্জাবী মুসলমানরা হয় না।

—

কলিকাতায় মাছ যোগান

কলিকাতার মৎস্যাশী লোকদের জন্য বৎসরে ১১,২০,০০০ মণ মাছের দরকার। কিন্তু ইহার অর্দ্ধেক মাছও কলিকাতায় আসে না, এবং যাহা আসে তাহার অধিকাংশ আমদানি হয় বাংলার বাহির হইতে। মধ্য পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে মাছের অভাব নাই, প্রাচুর্য্যই আছে। বাঙালী যুবকেরা দল বাঁধিয়া তাহা আমদানি করুন না? অবশ্য তাঁহারা বর্ত্তমান মাছ-বিক্রীর বাজারগুলিতে আমল পাইবেন না—সেগুলি সেই সব পাইকারদের দখলে যাহারা মাছের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া ধনী হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু যুবকেরা উদ্যোগী হইলে বাড়িতে বাড়িতে মাছ সরবরাহ করিতে পারেন।

জমীদারদের সভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যন বেকার যুবকদের জন্য কিছু করিবেন ভাবিতেছেন, শুনা যায়। তাঁহাদের অনেকের জমীদারী মৎস্যবহুল নানা অঞ্চলে। তাঁহারা এই ব্যবসাতে যুবকদিগকে প্রবৃত্ত করিয়া সাহায্য করুন না?

—

কায়স্থদের ভাল প্রস্তাবগুলির অনুযায়ী কাজ চাই

সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিল বঙ্গ কায়স্থসম্মেলনের অধিবেশনে অনেকগুলি ভাল প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে। কিন্তু তদনুযায়ী কাজ না হইলে সেগুলির কোন মূল্য নাই। বরং ভাল কথা বার-বার বলিয়া কাজে কিছু না করিলে তাহাতে ক্ষতিই হয়। যে-যে বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, নীচে তাহার কয়েকটি উল্লিখিত হইল।

বিবাহে পণপ্রথার উচ্ছেদসাধন এবং পূজাপার্ব্বণ ও বিবাহাদিতে ব্যয়বাহুল্য নিবারণ।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, বিধবাবিবাহ, স্বদেশী শিল্পদ্রব্য ব্যবহার, ব্যায়াম ও বিভিন্নপ্রদেশীয় নানাশ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে বিবাহ প্রচলন।

দুর্বৃত্তদের দ্বারা নিপীড়িতা হিন্দু নারীদের পুনরায় সমাজে গ্রহণ করা। নারীনিগ্রহ নিবারণ কল্পে পল্লীগ্রামে কায়স্থদের দ্বারা কমিটি গঠন।

কায়স্থ যুবকদের সমর বিভাগে প্রবেশ করিবার জন্য উৎসাহিত করা এবং স্ত্রীলোকদের ব্যায়াম চর্চার জন্য বন্দোবস্ত করা।

উপনিবেশস্থাপন না দ্বীপচালান ?

দক্ষিণ-আফ্রিকায় চুক্তিবদ্ধ, দাসকল্প ভারতীয় শ্রমিকদিগকে খাটাইয়া তথাকার শ্বেতকায়েরা নিজেদের কাজ উদ্ধার করিয়াছে। ভারতীয়েরা এখন সেখানে বাণিজ্যাদি ক্ষেত্রে শ্বেতকায়দের সহিত প্রতিযোগিতা করে। এই জন্য তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া দরকার। তাহাদের সামাজিক নানা লাঞ্ছনা সেখানে আছে, আইন করিয়া তাহাদিগকে নানা অসুবিধায় ফেলা হইয়াছে, যাহারা ভারতবর্ষে আসিতে চায় তাহাদিগকে আসিতে ও এখানে জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতে আর্থিক সাহায্যের বন্দোবস্তও শ্বেতদের গবর্মেণ্ট করিয়াছে। তথাপি ভারতীয়দের অধিকাংশ (দক্ষিণ-আফ্রিকাই যাহাদের জন্মভূমি) সে দেশ ছাড়িয়া আসিতে চায় না। তাই তথাকার ভারতীয়দের জন্য—এবং এদেশের ভারতীয়দের জন্যও বটে—দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতরা "দয়া" করিয়া ভারতীয়দিগকে উপনিবেশ স্থাপনের সন্ধান দিতেছেন! বোর্ণিও দ্বীপের ব্রিটিশাধিকৃত অংশ, ব্রিটিশ গিয়ানা এবং নিউ-গিনিতে ভারতীয়দিগকে উপনিবেশ স্থাপনা করিতে বলা হইতেছে। যেমন আইনানুসারে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে জোর করিয়া আণ্ডামানে পাঠান হয়, জোর করিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দিগকেও পরে ঐ তিনটি ভূখণ্ডে সেইরূপ পাঠান হইবে কি না বলা যায় না। কিন্তু জায়গাগুলি স্বাস্থ্যকর ও বসবাসের জন্য লোভনীয় নহে—তাহা হইলে ত ইউরোপীয়েরাই তথায় বসবাস করিত। ভারতীয়েরা যদি স্বাধীন হইত এবং নিজ শক্তিতে নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক তাহা নিজ অধিকারে রাখিতে পারিত, তাহা হইলে উপনিবেশ নামটা ব্যবহার করা সার্থক হইত। কিন্তু এখন যে-যে দেশকে ভারতীয় উপনিবেশ বলা ও করা হইবে, তাহা তাহারা নিজেদের শ্রম, নৈপুণ্য ও প্রাণ দিয়া সভ্য জনের বাসোপযোগী করিবার পর শ্বেতকায়েরা আবার তাহাদিগকে যে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? বরং ইহাই খুব সম্ভব, যে, তাড়াইয়া দিবে।

অতএব, প্রস্তাবটা বাস্তবিক উপনিবেশ স্থাপনের নহে, দ্বীপচালান বা দ্বীপান্তর করিবার ষড়যন্ত্র।

আসামে জন্মের হার ও জন্মনিরোধ

সম্প্রতি আসামের ব্যবস্থাপক সভায় এক জন সভ্য প্রশ্ন করেন, আসামের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে জন্মের হার বড় বাড়িয়াছে, অতএব গবর্মেণ্ট জন্মনিরোধের ব্যবস্থা করিবেন কি না। সরকারপক্ষ হইতে ইহার উত্তরে বলা হয়, ভারতবর্ষের নয়টি প্রদেশের মধ্যে জন্মের হারে আসাম সপ্তমস্থানীয়, সুতরাং অতিরিক্ত জন্মহার এখনও আসামের সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় নাই; তাহা হইলেও, গবর্মেণ্ট আইন দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ না করিয়া প্রচার-কার্য্য দ্বারা তাহা করিবেন।

কিন্তু আসামে তাহারই বা কি প্রয়োজন? সেখানে বহুবিস্তৃত ভূমি পড়িয়া আছে, আরণ্য ও খনিজ সম্পত্তিতে আসাম ঐশ্বর্য্যশালী। গবর্মেণ্ট চাষবাস ও নানা শিল্পকার্য্য দ্বারা আসামের লোকদিগকে সঙ্গতিপন্ন হইবার সাহায্য করুন না? জন্মের হার কমাইবার চেষ্টা না করিয়া মৃত্যুর হার কমাইবার চেষ্টা করুন। আসামে এখনও লক্ষ লক্ষ লোকের স্থান স্বচ্ছন্দে হইতে পারে। বসতির ঘনতা বঙ্গে প্রতি বর্গমাইলে ৬৪৬, বিহার-উড়িষ্যায় ৪৫৪, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ১৭৭, মান্দ্রাজে ৩২৮, পঞ্জাবে ২৩৮, আগ্রা-অযোধ্যায় ৪৫৬, কিন্তু আসামে ১৫৭।

কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের আমরা পক্ষপাতী নহি। কেন, তাহার আলোচনার স্থান ইহা নহে। "সভ্য" জগৎও এ-বিষয়ে একমত নহে। ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব্ ইকনমিক্সের এপ্রিল সংখ্যায় অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের প্রবন্ধের ৫৮৭-৫৯৮ পৃষ্ঠা এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। তাহাতে পাঠক লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সমর্থকদের কিছু উল্লেখ দেখিতে পাইবেন।

বহুসন্তানবতী নারীদের উদ্দেশে অত্যাধুনিক মহিলারা নাক সিঁটকাইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহু সুস্থ সুসন্তানের জননী যাঁহারা তাঁহারা সম্মানেরই যোগ্য।

সুভাষচন্দ্র বসুর নূতন পুস্তক

সুভাষ বাবু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি পুস্তক লিখিতেছেন। তাহা শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। তাহার আমেরিকান ও ফরাসী সংস্করণও বাহির হইবে। ভারতবর্ষে প্রকাশিত বহিতে অনেক সত্য কথার সন্নিবেশ আইন-বিরুদ্ধ। ইংলণ্ডে প্রকাশিত বহিতে সত্যের প্রকাশে তত বেশী বাধা না থাকিলেও, মনে রাখিতে হইবে, যে, ডক্টর সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ তথায় প্রকাশিত হইবার বন্দোবস্ত হইবার পর তাহা বন্ধ হইয়া যায়। আমেরিকায় ও ফ্রান্সে প্রকাশিত সংস্করণে সত্য কথা বাদ দিবার প্রয়োজন না হইতে পারে।

—

চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা

চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটিতে অবৈতনিক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টে দেখিয়া প্রীত হইলাম, যে, ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা এবং উপরের ক্লাসগুলিতে সংখ্যা বাড়িতেছে। বালকদের সংখ্যা ১৯০০, ১৯২৭, এবং ১৯৩২ সালে যথাক্রমে ২৮৪, ১৬৬৩, এবং ২৬৬৬ ছিল। বালিকাদের সংখ্যা ১৯১০ সালে ২১ হইতে ১৯৩২ সালে ১৩৮৭ হইয়াছিল। সংখ্যাগুলি মিউনিসিপালিটির প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রছাত্রীদের।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিদ্যার্থী

শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"
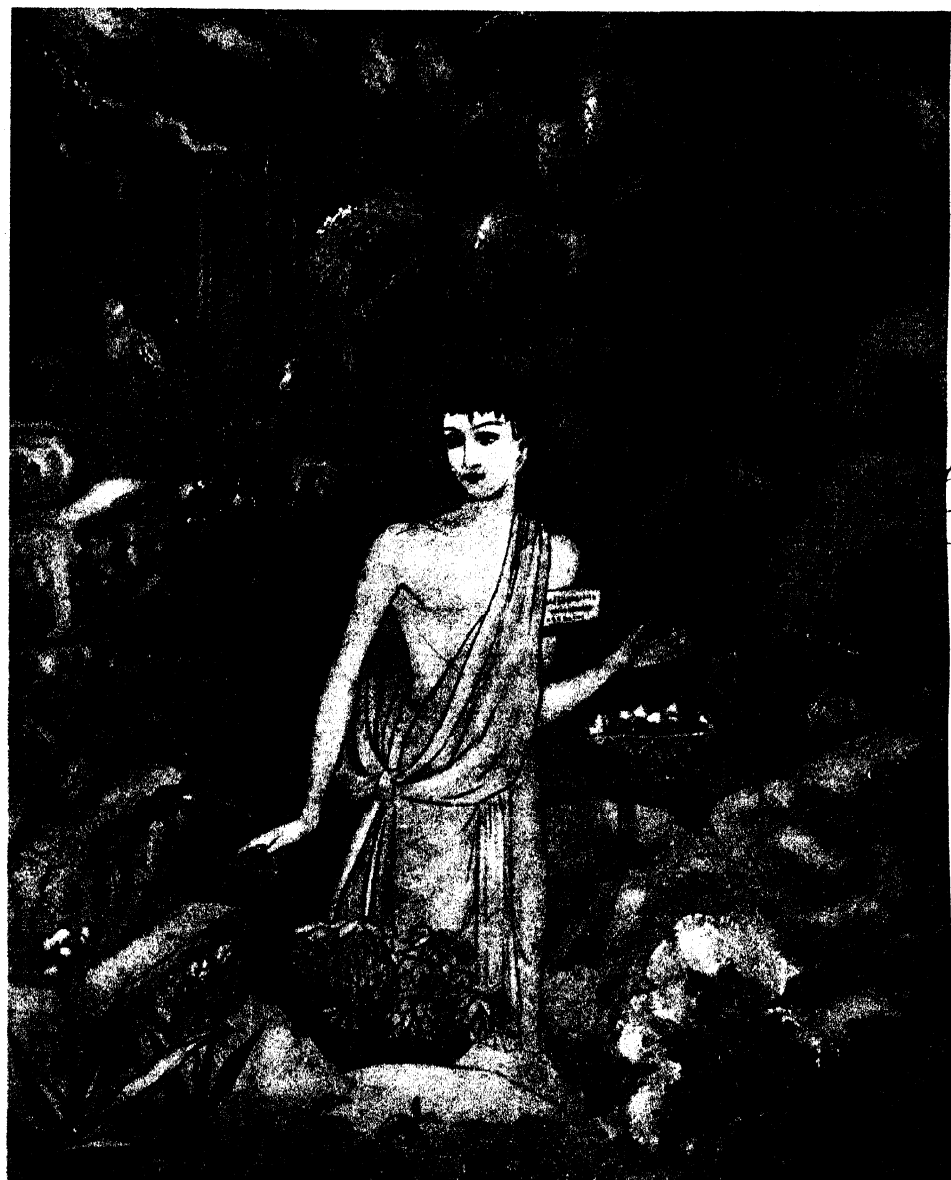
৩৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৪১

৬ষ্ঠ সংখ্যা

যক্ষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে যক্ষ তোমার প্রেম ছিল বদ্ধ কোরকের মতো,
একান্তে প্রেয়সী তব সঙ্গে যবে ছিল অনিয়ত
সঙ্কীর্ণ ঘরের কোণে, আপন বেষ্টনে তুমি যবে
রুদ্ধ রেখেছিলে তারে দু-জনের নির্জ্জন উৎসবে
সংসারের নিভৃত সীমায়, শ্রাবণের মেঘজাল
কৃপণের মতো যথা শশাঙ্কের রচে অন্তরাল,
আপনার আলিঙ্গনে আপনি হারায়ে ফেলে তারে,
সম্পূর্ণ মহিমা তার দেখিতে পায় না একেবারে
অন্ধ মোহাবেশে। বর তুমি পেলে যবে প্রভুশাপে,
সামীপ্যের বন্ধ ছিন্ন হ'ল, বিরহের দুঃখতাপে
প্রেম হ'ল পূর্ণ বিকশিত : জানিল সে আপনারে
বিশ্বধরিত্রীর মাঝে। নির্বাধে তাহার চারিধারে
সান্ধ্য-অর্ঘ্য করে দান বৃষ্টিজলে সিক্ত বনযূথী
গন্ধের অঞ্জলি ; নীপনিকুঞ্জের জানালো আকুতি
রেণুভারে মন্থর পবন। উঠে গেল যবনিকা
আত্মবিস্মৃতির, দেখা দিল দিকে দিগন্তরে লিখা

উদার বর্ষার বাণী, যাত্রামন্ত্র বিশ্বপথিকের
মেঘধ্বজে আঁকা, দিগ্বধূ-প্রাঙ্গণ হ'তে নির্ভীকের
শূন্যপথে অভিসার। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
দীক্ষা পেলে অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদের ; নিত্য রসে
আপনি করিলে সৃষ্টি রূপসীর অপূর্ব্ব মূরতি
অন্তহীন গরিমায় কান্তিময়ী। এক দিন ছিল সেই সতী
গৃহের সঙ্গিনী, তারে বসাইলে ছন্দশঙ্খরবে
অলোক-আলোকদীপ্ত অলকার অমর গৌরবে
অনন্তের আনন্দ-মন্দিরে। প্রেম তব ছিল বাক্যহীন,
আজ সে পেয়েছে তার ভাষা, আজ তার রাত্রিদিন
সঙ্গীত-তরঙ্গে আন্দোলিত। তুমি আজ হ'লে কবি,
মুক্ত তব দৃষ্টিপটে উদ্ঘাটিত নিখিলের ছবি
শ্যামমেঘে স্নিগ্ধচ্ছায়া। বক্ষ ছাড়ি' মর্ম্মে অধ্যাসীনা
প্রিয়া তব ধ্যানোদ্ভবা লয়ে তার বিরহের বীণা।
অপরূপ রূপে রচি বিচ্ছেদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
তোমার প্রেমের সৃষ্টি উৎসর্গ করিলে বিশ্বজনে ॥

দার্জ্জিলিং
১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০
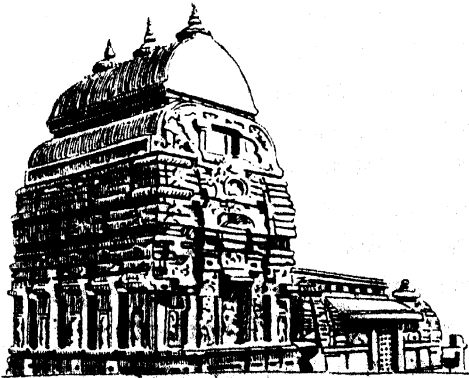
ঝাড়খণ্ডে কবীর ও চৈতন্যদেব প্রভৃতির প্রভাব

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

কবীর সারাজীবনের বাণীতে ও সাধনায় আঘাত করিয়া গিয়াছেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। সাম্প্রদায়িকতার অর্থ ধর্ম্মের নামে দল বাঁধিয়া মানুষের সঙ্গে মানুষের চিরন্তন ভেদ ও বিরোধ চালাইয়া যাওয়া। ইহা ছিল কবীরের অসহ্য। কিন্তু মানুষের এমনই দুরদৃষ্ট যে যখনই কোনো মহাপুরুষ এই ভেদ দূর করিতে গিয়াছেন তখনই তাঁহার নামেই পরে এই সাম্প্রদায়িকতা আরও কঠিন হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

কবীরের মৃত্যুর পর একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহার ভক্ত শিষ্যরা আসিয়া ধরিলেন কবীরের পুত্র কমালকে। কমাল কহিলেন, আমার পিতা চিরদিন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেই গেলেন যুদ্ধ করিয়া। তাঁহার নামেই যদি সম্প্রদায় স্থাপন করি তবে তা আমার পক্ষে পিতৃহত্যাই করা হইবে। তাই কবীরের ভক্তের দল কহিলেন—"কমালই কবীরের বংশ ডুবাইল!"

ধর্ম্মের সব সঙ্কীর্ণ দলাদলি না মানিলেও কবীর মানিতেন যে মানবচিত্তের ভাব, হৃদয় হইতে হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। চিত্ত হইতে চিত্তে ভাবের রং লাগে।

জড়জগতে দেখা যায় প্রত্যেক দ্রব্যই থাকে তাহার আপন আপন বিশেষ স্থান জুড়িয়া। তাহার মধ্যে অন্য দ্রব্যের ঠাঁই হওয়া অসম্ভব। কিন্তু ভাব-জগতে দেখা যায় ইহার বিপরীত। যে-চিত্তে যত বেশী ভাবের স্থান, সেখানেই তত সহজে নূতন নূতন ভাবের ঘটে সমাগম। তাই দাদূ বলিয়াছেন—

রসহী মৈ রস বরষিহৈ ধারা কোটি অনংত।

(পরচা অংশ, ১১২)

—রসের মধ্যেই রসের বর্ষণ হয় অনন্ত কোটি ধারায়।

প্রেম ও ভাবের ক্ষেত্রে এই কথা সত্য হইলেও অনেক সময়ে দেখা যায় জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই কথা খাটে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ দর্শনাদি সব শাস্ত্রের কঠিন প্রাচীর এমন করিয়া গড়িয়া তোলে যে সেখানে নূতন জ্ঞানের প্রবেশ প্রায় দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। জ্ঞানের জগতেও কি জড়-জগতের মত ঠেকাইয়া রাখাই বিধি? ভাব-জগতের মত সেখানে কি সহজে স্বীকার করার কোন উপায় নাই? তাই যেন বড় দুঃখে কবীর কহিলেন—

কারী কমড়িয়া পর রঙ্গ নাহি চঢ়ৈ।

—কালো কম্বলের উপর আর নূতন রং ধরে না।

কথিত আছে মৃত্যুর পূর্ব্বে কবীর কাশী ত্যাগ করিয়া মগহরে গিয়া বাস করেন। কে নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিল, "কাশী মুক্তি-ক্ষেত্র। যাহাই কর না কেন, এখানে মরিলে মুক্তি হইবেই। তাই তুমি নির্ভয়ে ধর্ম্মের বিরুদ্ধতা করিতেছ।" কবীর বলিলেন, "এই রূপ মুক্তি আমি বিশ্বাস করি না। আমি আমার ইচ্ছামত কোথাও গিয়া আপন সাধনায় মুক্তি অর্জ্জন করিব।" ইহাই কবীরের মগহর-যাত্রার কারণ। কিন্তু কাশীর জ্ঞানী ও শাস্ত্রপন্থীদের বিরুদ্ধতার সঙ্গে কি ইহার কিছুই সম্পর্ক নাই?

কাশীতে জ্ঞানই প্রধান কথা হইলেও সেখানে ভাব যে একেবারে ছিল না এ-কথা অসম্ভব। তাই কাশীর চিত্তেও ক্রমেই কবীরের ভাবের রং ধরিতেছিল; যদিও পণ্ডিতেরা শাস্ত্র ও দর্শনাদির কঠিন প্রাচীর তুলিয়া সর্ব্বভাবে সাবধান ছিলেন, যেন এই রং না লাগে।

কবীরের তিরোধানের পর কমাল যখন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিতে অসম্মত হইলেন, তখন প্রধানতঃ তাঁহার দুই শিষ্য তাঁহার ভাবকে আশ্রয় করিয়া সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিলেন। সুরত গোপাল বসিলেন কাশীতে কবীর চৌড়ায়, ধর্ম্মদাস গেলেন ঝাড়খণ্ডে।

সুরত গোপাল কাশীতে প্রভাব যতটা বিস্তার করিলেন তাহার অপেক্ষা বেশী নিজেই প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িলেন। কাশীর কালো কম্বলের উপর নূতন রং ধরিতে চাহিল না, বরং দেখা গেল যে ষড়দর্শনাদির সঙ্গে কবীর চিরদিন যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ক্রমে তাহারই পতাকাতলে সুরত গোপালী দল আশ্রয় খুঁজিতেছে। গুরুর যাহা ছিল

নিন্দিত, অনুবর্ত্তীগণের তাহাই হইয়া উঠিল বন্দিত! কালো কম্বলের রংই বরং চাহিল ফিরিয়া লাগিতে!

যাক্, ধর্ম্মদাস এই বিপদ এড়াইলেন ঝাড়খণ্ডে গিয়া। তাই আজ দেখা যায় সুরত গোপালী সম্প্রদায়ে ভক্ত-সংখ্যা খুবই কম,—এক লক্ষের বেশী হইবে না। কিন্তু ধর্ম্মদাসী শাখায় ভক্ত-সংখ্যা নাকি ৪০ লক্ষ।

ধর্ম্মদাস ছিলেন জাতিতে বাণিয়া, বাঁধোগড় নগরে তাঁহার বাস। তাঁহার পিতা ছিলেন এক জন মহাধনী, অষ্টাদশ লক্ষপতি। বালককাল হইতেই ধর্ম্মদাস ধর্ম্মপ্রাণ ও সদাচারী। যদিও তিনি পণ্ডিতদের তর্ক ও যুক্তির সূক্ষ্ম জাল ভাল করিয়া বুঝিতেন না, তবু তিনি সনাতন পথেরই পথিক ছিলেন। তিনি কবীরের প্রাণস্পর্শী সরল প্রবল বাণী শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন ও তাঁহার কাছে দীক্ষা চাহিলেন। কবীর কহিলেন, "প্রতীক্ষা কর।" উভয়ের আবার মথুরাতে দেখা হইলে ধর্ম্মদাস তাঁহাকে অন্তরের কয়েকটি গভীর সংশয়ের কথা বলিলেন। কবীর তাহা খণ্ডন করিলে ধর্ম্মদাস আবার দীক্ষা চাহিলেন। তবু কবীর কহিলেন, "প্রতীক্ষা কর।" আবার উভয়ের দেখা হইল কাশীতে এবং বাঁধোগড়ে।

ধর্ম্মদাসের স্ত্রীর নাম ছিল আমিন। তাঁহার ভয় ছিল সাধুর শিষ্য হইলে হয়ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর সম্পর্ক থাকিবে না। কিন্তু তিনিও যখন দেখিলেন কবীর গৃহস্থ হইয়াই সাধনার পক্ষপাতী তখন তিনিও কবীরের উপদেশে আকৃষ্ট হইলেন। আমিনের সঙ্গে কবীরের পত্নী লোইর বিশেষ প্রীতি ও যোগ ঘটিয়াছিল।

কাশীতে রহিলেন সুরত গোপাল। তাঁহার অনুবর্ত্তীরা কাশীর অন্যান্য সম্প্রদায়ী সাধুর মত থাকেন অবিবাহিত। গুরুর তিরোধানের পর শিষ্যদের মধ্যে কেহ গুরুর গদীতে বসেন। ধর্ম্মদাসের ধারাতে ব্যবস্থা অন্য রকম। তাঁহার ধারাতে ইহাই নিয়ম যে, গুরুকে বিবাহ করিতেই হইবে এবং তাঁহার পুত্রই পিতার আসনে বসিবেন। তাই এই গদীকে বলে "বংশ গদী।" কবীর নাকি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন এইভাবে বিয়াল্লিশ জন গুরু হইবার পর এই ধারার অবসান হইবে। এই মর্ম্মে "আগম সংদেশ" একখানি গ্রন্থ ভারত-পথিক যুগলানন্দজী প্রকাশও করিয়াছেন। কারণ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইঁহাদের শেষ গুরু দয়ানাম সাহেব অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। যুগলানন্দের নাকি ইচ্ছা ছিল তিনি গুরু হন। কিন্তু বংশ-গুরু ছাড়া গুরু হয় না বলিয়া তাঁহার ইচ্ছা সফল হয় নাই। "আগম সংদেশ" গ্রন্থখানি সকলে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকারও করেন না।

অনেকেই মনে করেন ধর্ম্মদাসজী বাঁধোগড়ের এক ঐশ্বর্য্যশালী বণিকের ঘরে ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করেন, আর ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুকালে ধর্ম্মদাস রীতিমত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। রিওয়াঁ রাজগৃহে যে বীজক আছে তাহা নাকি ১৪৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম্মদাসকর্ত্তৃক লিখিত।

বাল্যকালে ও যৌবনে ধর্ম্মদাস দেবদ্বিজে শাস্ত্রে পুরোহিতে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। গভীর শ্রদ্ধার সহিত তিনি মূর্ত্তি শিলা প্রভৃতি পূজা করিতেন। ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের দলে তিনি অহর্নিশি পরিবৃত থাকিতেন।

ক্রমে তিনি কবীরের দেখা পাইলেন ও তাঁহার বাণী শুনিলেন। তাঁহার অন্তরের মধ্যে কবীরের উপদেশ এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল যে, তখনই তিনি কবীরের কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কবীর তিন বার তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া পরে তাঁহাকে দীক্ষা দিতে বাধ্য হইলেন।

"অমরসুখনিধান" গ্রন্থে কবীর ও ধর্ম্মদাসের কথাবার্ত্তা চমৎকার ভাবে লিখিত আছে।

> "ধর্ম্মদাস ছিলেন রাম ও কৃষ্ণের স্মরণে নিরত, তীর্থব্রতে দৃঢ়চিত্ত। মথুরায় যখন তিনি তীর্থপ্রসঙ্গে গেলেন তখন হইল তাঁহার কবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ।"
>
> রাম কৃষ্ণ কো সুমিরে, তীরথ বরত দৃঢ় টেট্।
> মথুরা পরসত জব গয়ে তে কবীর সো ভেঁট॥

কবীর কহিলেন,—

> ধর্ম্মদাস তুম হো বড় জ্ঞানা।
> পরম ভক্ত ভক্তি মৈ জানী॥
> তুম সা ভক্ত ন দেখোঁ আনা।
> ধর্ম্ম তুমহারা কবন স্থানা॥
> কবন দিসা সে তুম চলি আয়ে।
> জৈহো কহাঁ কহাঁ মন লায়ে॥
> কাকী ভক্তি করো চিত লাঈ।
> সো কিত বসৈ কোন সে ঠাঁঈ॥
> পূছত মন মেঁ দুখ জনি মানো।
> করতা আদি পুরুষ পহিচানো॥

কা ভে মালা তিলক কে দীন্হে।
কা ভে তীরথ বরত কে কীন্হে॥
কা ভে সুনত ভাগবত গীতা।
চিংতা মিটী ন মন কে জীতা॥
জেহি কর্ত্তা সে উপজে, সো বসৈ কৌনে দেস।
তাহি চিন্হ পরিচয় করো, ছোড় সকল ভ্রম ভেস॥

"হে ধর্ম্মদাস, তুমি মহাজ্ঞানী, তুমি পরম ভক্ত; তোমার ভক্তি আমি বুঝি। তোমার মত ভক্ত আর ত দেখি না। কিন্তু তোমার ধর্ম্মের আশ্রয়স্থান কোথায়? কোন্ দিক হইতে তুমি আসিয়াছ চলিয়া? যাইবেই বা তুমি কোথায়? কোথায় লইয়া গেলে তোমার মন? চিত্ত দিয়া কাহাকে তুমি কর ভক্তি? তিনি কোথায় করেন বাস, কোথায় তাঁহার ঠাঁই?

এই সব যে পুছিলাম তাহাতে যেন মনের মধ্যে দুঃখ করিও না, আদি পুরুষ আদি কর্ত্তাকে লও চিনিয়া। তিলকমালা ধারণ করিলেই বা কি, তীর্থব্রত আচরণ করিলেই বা কি, ভাগবত গীতা শুনিলেই বা কি? মনকে জয় না করিলে চিন্তা কেন মিটিবে?

যে কর্ত্তা হইতে উপজিলে তিনি করেন কোথায় অবস্থিতি? তাঁহাকে চিনিয়া তাঁহার সঙ্গে কর পরিচয়, ছাড়িয়া দেও সকল ভ্রম সকল ভেখ।"

সুনি ধর্ম্মদাস অচংভো ভয়উ।
ঐসো বচন কাহু না কহেউ॥

"এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মদাস স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এমন কথা আর কেহই ত কহেন নাই।"

ধর্ম্মদাস কহিলেন,—

পারব্রহ্ম সোঁ চিত লাঈ।
সীতা রাম জপোঁ সুখ দাঈ॥
বিরথা বচন ন সুনোঁ না কহউ।
প্রেম ভক্তি মে নিস দিন রহউ॥
মোহে সংকা কছু নাহীঁ, সেঁ শ্রী রঘুনাথ।
ধ্রুপহলাদ জিন উধারিয়া সো হরি মেরে সাথ॥

"চিত্ত একাগ্র করিয়া পরব্রহ্মের করি সেবা, পরব্রহ্ম সীতারামের নামই করি জপ। বৃথা বচন আমি না শুনি না বলি, প্রেমভক্তির মধ্যে নিশিদিন করি বাস।

আমার ত কোন শঙ্কা নাই; শ্রীরঘুনাথকে করি সেবা। ধ্রুব প্রহ্লাদকে যিনি করিলেন উদ্ধার, সেই হরি আমার সাথে সাথে।"

কবীর কহিলেন,

ধর্ম্মদাস সুনু বচন হমারা।
তুম জনি হোহু কাল কে চারা॥
কাহে ন সুরতি করো ঘট মাহীঁ।
চীনহ চীনহ, বুড়ো ভব মাহী॥

"হে ধর্ম্মদাস, বচন আমার শোনো, তুমি যেন কখনও কালের কবলিত না হও। অন্তরের মধ্যেই কেন না প্রেম কর? (সার সত্য) চিনিয়া লও, চিনিয়া লও; ভবসাগরে যে ডুবিতে বসিয়াছ!"

কবীর আবার কহিলেন,—

জ্ঞান দৃষ্টি সে চিহ্নউ বাণী।
পাথংড পাহন পাথংড পানী॥
করতা পাথংড কবহু ন হোয়।
যহ ন সংসব ডুবী বিগোয়॥

"জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা বাণী (সার সত্য) লও চিনিয়া। এই যে পূজা কর পাষাণ তাহা ঝুঠা। পূজা কর যে তীর্থের জল তাহা ঝুঠা। কর্ত্তা কি কখনও ঝুঠা হইতে পারেন? এই ধোঁকাতেই সকল দুনিয়া দিল সব গোঁয়াইয়া।"

ধর্ম্মদাস এই সব শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন—

ধরমদাস মসূটি রহে।

"জীবন্ত সেই মহাপুরুষের কথার কোনো উত্তর ধর্ম্মদাস দিলেন না।"

জিংদ উতর নহিঁ দীন্হ।

দুঃখে ধর্ম্মদাস আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। তখন কবীর বুঝাইয়া কহিলেন—

হরি না মিলৈঁ অন্নকে ছাড়ে।
হরি না মিলৈঁ ডগরহী মাঁড়ে॥
হরি না মিলৈঁ ঘরবার তিয়াগে।
হরি না মিলৈঁ নিসু বাসর জাগে॥

"অন্ন ছাড়িলেই কিছু হরি মেলে না, কোনো একটা বিশেষ পথ আশ্রয় করিয়া চলিলেই হরি মেলে না, ঘর-দুয়ার ত্যাগ করিলেই হরি মেলে না, নিশি-বাসর জাগিলেই হরি মেলে না।"

দয়া ধরম জহঁ বসৈ সরীরা;
তহঁ খোজিলে কহৈ কবীরা॥

"যেখানে মানবের মধ্যে দয়া ধরম বাস করে সেখানে কর খোঁজ। এই কথাই কহেন কবীর।"

ধর্ম্মদাস সেখানে সকল সম্প্রদায়ের সাধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া মহোৎসব করিলেন। মন তৃপ্ত হইল না। কাশী আসিয়া পণ্ডিত জ্ঞানী সকলের কাছে আশ্রয় খুঁজিলেন। কোথাও যেন আশ্রয় মিলিল না। তখন আবার কাশীতে কবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন অতলস্পর্শ কবীরের উপদেশবাণী। কেহই তাহার তল পায় না।—

থাহ কবীর কা কোই নহি পায়ে।

ধর্ম্মদাস মনে মনে কহিলেন, "প্রথম ত ইঁহাকে মথুরাতেই দেখিয়াছিলাম, তখন ত অনেক তর্কই করিয়াছিলাম। যাহা উনি বলিয়াছেন সবই ত সত্য সত্য উপদেশ, তাহাতেই ত মন আমার ইনি লইলেন হরিয়া।"

পিরথম মোহিঁ মথুরা মিলে বহু বাদ হম কীন্হ।
সাঁচ সাঁচ সব উন কহী মন হমার হর লীন্হ॥

ধর্ম্মদাস ও কবীরের মধ্যে এই সব আলাপ চমৎকার। "অমরসুখনিধানে" তাহা সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

কবীরের সঙ্গে ধর্ম্মদাসের সাক্ষাতে যে পরমানন্দ তাহা ধর্ম্মদাসের নিজের ভাষাতেই দেখা যাউক—

আজ মেরে সতগুর আয়ে মিহমান।
তন মন জিবয়া করোঁ কুরবান॥ (বিরহ প্রেম অংগ)

"আজ সদ্গুরু আসিয়াছেন অতিথি। তনু মন জীবন আজ করিলাম উৎসর্গ।"

আজ ঘড়ী আনংদকী
সদগুর আয়ে মোর ধাম হো।
দিয়ো দরসন মন লুভায়ো
কহ্যো বচন অমোল হো।

করেন ও "চৌকা" প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানে মৃতদের প্রতি কর্ত্তব্য পূর্ণ করেন। কবীরপন্থী ওরাওঁরা নিজেদের সম্প্রদায়ের বাহিরের ওরাওঁদের সঙ্গেও বিবাহাদি সম্বন্ধ করেন। ইঁহারা তাঁহাদের "মতুয়া" অর্থাৎ মদ্যপ ওরাওঁ বলেন। মতুয়া-ঘরের কন্যা আসিলে তাহাকে দীক্ষিত করিয়া লন। সে কন্যা তখন শুদ্ধাচার মানিয়া চলেন। মতুয়া-ঘরে কন্যাকে দিলে পিতামাতা তাঁহার হাতে খান না।

এই কবীরপন্থের প্রভাবে ঝাড়খণ্ডে এই সব জাতির মধ্যে এমন একটি নৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে যে পরে মুণ্ডাদের মধ্যে বীরশা ভগত ও ওরাওঁদের মধ্যে বিখ্যাত টানা ভগতের উপদেশ সম্ভব হইয়াছে। রাঁচী জেলায় ঘাঘরা থানায় বাটকুরী গ্রামে এক নারীও ধর্ম্মগুরুর স্থান গ্রহণ করিয়াছেন।

টানা ভক্তদের কথা অতিশয় চমৎকার। এ-বিষয়ে শ্রদ্ধেয় শরৎ চন্দ্র রায় মহাশয় বিস্তৃত ভাবে লিখিয়াছেন। যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা তাঁহারা তাঁহার ওরাওঁ ধর্ম্ম ও সামাজিক প্রথা (*Oraon Religion and Customs*) নামক ইংরেজী গ্রন্থখানির মধ্যে তাহা পাইবেন।

এই ঝাড়খণ্ডে যে শৈব ও বৈষ্ণব ভক্তদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে তাহারও মূলে কতকটা কবীরপন্থী প্রভাব।

মোট কথা, দেখা যাইতেছে ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম ভাগে বিলাসপুরেরও পশ্চিমে কবীরের আদর্শ ও ধর্ম্ম লইয়া ধর্ম্মদাস সাধনা ও প্রচার করিতে থাকেন। সেখান হইতে তাহা ক্রমে পূর্ব্ব দিকে প্রসারিত হইতে থাকে।

ইহার প্রায় ৫০ বৎসর পর অর্থাৎ ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি মহাপ্রভু চৈতন্যের সংস্পর্শে রাঁচীর দক্ষিণ-পশ্চিমে বুংডু প্রভৃতি মঠ স্থাপিত হয়। পরে মানভূম প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ঝাড়খণ্ডে ভক্তিসাধনা প্রচার করিতে থাকেন। তাই ঝাড়খণ্ডে রাঁচীর কাছাকাছি এখনও সেখানকার আদিম অধিবাসী ভক্তদের মুখে বাংলা কীর্ত্তন শুনা যায়। প্রথমে মনে হয় গানগুলি বুঝি সেই দেশীয় ভাষায়। একটু স্থির হইয়া শুনিলে ক্রমে বুঝা যায় সেই সব গানের পদ বাংলা।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি নারায়ণ ও জানকীদাসের অনুবর্ত্তী রামানন্দী বৈরাগীর দল ঝাড়খণ্ডে আসিয়া মঠ ও আখড়া স্থাপন করেন। রামানন্দীরা প্রায়ই গয়া ও পালামৌ পথে আসেন। শেরশাহী রাজপথের দুই দিকে চটি বা অতিথিশালার ভার লইয়া অনেক বৈরাগী ঝাড়খণ্ডের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। ইঁহারা অনেকে রাম-উপাসনা প্রচার করেন।

১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর কাশী হইতে শৈব-সাধুরা দুই-এক জন করিয়া ঝাড়খণ্ডে আসিতে থাকেন। তাঁহারা কতকগুলি নিয়ম দিয়া ঝাড়খণ্ডের সরল অধিবাসীদের মধ্যে প্রচার আরম্ভ করেন। সেই সমস্ত শিষ্যদের নাম "নেমহা" অর্থাৎ নিয়মধারী।

কাশী হইতে আগত শৈব-সাধুদের মধ্যে ত্রিলোচন ও ভীমদেব ছিলেন তান্ত্রিক সাধনাতেও প্রবীণ। তাঁহাদের পরে আসেন বীরভদ্র ও বামদেব। তাঁহাদের শিষ্যরা অনেকে ঝাড়খণ্ডেই বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি এক জন স্থানীয় অধিবাসীকে তাঁহাদের শৈবমতে দীক্ষা দেন। এই ওরাওঁ শিষ্যের নাম গুরু রাখিলেন, "ভৈরব"। এই ভৈরব ভগতের বাড়ি রাঁচী থানার অধীন তুম্বাপুরী গ্রামে। ভৈরবের পুত্র কৃষ্ণ ভগতও শৈব ও তান্ত্রিক সাধনায় প্রবীণ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ভৈরব ও কৃষ্ণ ভগতের সম্মান এমন বিস্তৃত হইল যে, ছোটনাগপুরের রাজা দেওনাথ শাহী ও তাঁহার পত্নী ইঁহাদের শরণাগত হইলেন। ইঁহাদের শিষ্যরা এখন অনেক স্থানে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ নামে শিবশিলা পূজা করেন। সেই শিবকে এখানে ভুঁইফোঁড় শিব বলে। ভুঁইফোঁড় ভগতরা জটা রাখেন ও অনেক নিয়ম পালন করেন। তাঁহাদের অলৌকিক শক্তিও হয়।

উত্তর-পশ্চিম গোকুলের ও বৃন্দাবনের গোসাঁইরাও কেহ কেহ এই ঝাড়খণ্ডে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করিয়াছেন। যে-সব ওরাওঁ ইঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। গোসাঁইরা মাংসাহারী ওরাওঁদের গো-দান করাইয়া শুদ্ধ করিয়া তবে দীক্ষা দেন। এই সব দীক্ষিত বৈষ্ণবেরা রথযাত্রা জন্মাষ্টমী প্রভৃতি তিথি পালন করেন। তাঁহারা ওরাওঁ ভাষাতে ভক্তি ও প্রেমের গানও করেন।

শ্রীশান্তা দেবী

১

পীতাম্বরের কন্যা নারায়ণী সাধারণ গৃহস্থঘরে জন্মিয়াছিল। মা'র কোলে উপরি-উপরি তিন কন্যার শুভাগমনের পর এই চতুর্থীর আবির্ভাব হওয়াতে নারায়ণীর অদৃষ্টে আদর-যত্ন বিশেষ জোটে নাই। তিন বোনের ছাড়া ছেঁড়া জামা-কাপড় তালি দিয়া পরিয়াই তাহার শৈশবটা কাটিয়া গিয়াছিল। নূতন শাড়ী জামা দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে চোখে দেখে নাই। এমন কি পূজার সময়েও তাহাকে একখানা নূতন কাপড় বাবা কিনিয়া দিতে পারিতেন না। মা ধরিয়া বসিলে বলিতেন, "সেজ্‌কীর গতবারের জরিপেড়ে কাপড়খানা যে ছোট হয়ে যাচ্ছে, ওটা পরবে কে শুনি? ওখানা কি পয়সা দিয়ে কিনতে হয় নি? বছর বছর যে মেয়ে বিয়োচ্ছ ত তার আগাগোড়াটাই কি লোকসানের মামলা? একটা কিছু খরচ বাঁচাও। ছেলে হ'লে ধুতি ত কিনে দিতেই হ'ত। মেয়েই যখন হ'ল, ওই এক কাপড়ে পর-পর চার জনের চালাতে হবে, যত দিন না ছিঁড়ে যায়।"

মা চোখের জল মুছিয়া বছরের পর বছর মেয়েকে পুরানো কাপড়ই পরাইতেন। কেবল বিজয়া দশমীর দিন চাহিয়া-চিন্তিয়া জায়েদের কাছ হইতে একখানা নূতন কাপড় আনিয়া নারায়ণীকে একবারটি পরাইতেন। মা হইয়া মেয়েকে এই শুভদিনে পুরানো কাপড় কি করিয়া পরাইবেন? কিন্তু নারায়ণীর চিরদিন মনে ছিল যে ভাসানের পর যখন ঘুমে কাতর হইয়া সে শয্যা গ্রহণ করিতে আসিত, মা তখন ধীরে ধীরে নূতন কাপড়খানি খুলিয়া লইয়া সযত্নে পাট করিয়া বাক্সে তুলিতেন। পরদিন আর সে কাপড় দেখা যাইত না। আবার সেই দিদিদের পরিত্যক্ত ছেঁড়া কাপড়।

কাপড়ে না হয় হিসাব করিয়া চলা সহজ; কিন্তু পেটের ক্ষুধায় ত হিসাব চলে না। তবু নারায়ণী বড় হইবার পর তাহার বাবা দুধের খরচ কি মাছের খরচ বাড়াইতে রাজি হইলেন না। যেদিন নারায়ণী মাতৃস্তন্য ছাড়িয়া গরুর দুধ খাইতে সুরু করিল সেই দিন হইতেই তাহার বালিকা সেজ্‌দির দুধের পাট উঠিয়া গেল, যদিও সে বেচারীর বয়স তখন মাত্র দুই বৎসর। সেজ খুকী আন্নামণি খাইত মাড় ভাত—নারায়ণী পাইল তাহার দুধের অংশ। মেয়েরা আর একটু বড় হইল, কিন্তু সেজখুকী কি নারায়ণী কাহার জন্যই মাছ বরাদ্দ হইল না; কাজেই তাহারা মাছ খাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মাকে মাছ ছাড়িতে হইল। মা'র দুই বেলার দুইখানা মাছ মেয়েরা দুই জনে একবেলা খাইত। মা স্বামীর অমঙ্গলের ভয়ে মাছের তেল ও কাঁটা দিয়া আলুর খোসার চচ্চড়ি রাঁধিয়া ভাত খাইবার ব্যবস্থা করিতেন।

শিশু বালিকা মাত্রেরই পুতুলখেলার সখ আছে; নারায়ণীর যে ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কে তাহাকে পুতুল কিনিয়া দিবে? মা ছেঁড়া কাপড়কে সলিতার মত পাকাইয়া তাহাই দুই পাট করিয়া মেয়েদের পুতুল গড়িয়া দিতেন। কালি দিয়া ন্যাকড়ার গায়ে চোখ-মুখ আঁকিয়া দিলে মেয়েদের আনন্দ ধরিত না।

যদি চিরকালই এই ভাবে কাটিয়া যাইত, হয়ত নারায়ণী বড় বয়সে আপনার শৈশবের লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া যাইত; হয়ত মনে করিত তিন সন্তানের পরে জন্মাইলে কোনো শিশুর ভাগ্যেই আদর-অভ্যর্থনা বিধাতা লিখেন না। কিন্তু তাহা হইল না। নারায়ণীকে চেতনা দিতে বিধাতা তাহার মাতার কোলে আবার আর একটি শিশু পাঠাইয়া দিলেন। এবার আর কন্যা নয়, পিতামাতার বহুকালের কামনার ধন বংশধর পুত্র। চারি সন্তানের পর জন্মাইলেও তাহার অভ্যর্থনা হইল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। বাড়িতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, শাঁকের শব্দে কোনোদিকে কান পাতা যায় না। আত্মীয়-স্বজন দাসদাসী সকলের মুখে হাসি। সকলেই বলিতেছে, "এত দিনে বিধাতা মুখ তুলে চাইলেন।" এমন কি অনাদৃতা নারায়ণীকেও আজ পাঁচ জনে

কোলে করিয়া আদর করিয়া বলিতেছে, "থাক্, নারাণী তোর পয় ভাল। তুই ত খোকা ভাইকে ডেকে আন্‌লি।"

নারায়ণী আদর পাইয়া খুশী হইল বটে; কিন্তু তাহার তখন পাঁচ বৎসর বয়স; এই আদরের কারণ বুঝিতে তাহার বেশী দিন দেরি হইল না, এবং আদরটা যে কত ক্ষণ স্থায়ী তাহাও সে অচিরেই বুঝিয়া গেল।

এবার পূজায় খোকার নূতন জুতা জামা কাপড় আসিল। নারায়ণী বলিল, "মা, আমাকে ত তুমি কখ্‌খনো একটা নূতন কাপড় দাও না। ঐ একরত্তি ছেলেটা কাপড়ই কোনো দিন পরে না, ওকে দিতে পার নূতন ধুতি, আর আমার বেলা সব ছেঁড়া! আমি আর তোমায় ভালবাস্‌ব না, যাও!"

হাসিয়া মা বলিলেন, "ও ব্যাটাছেলে কি না, মেয়েদের [illegible]র ও পরবে না, তাই ধুতি দিতে হ'ল।"

[illegible]রের সুরে নারায়ণী বলিল, "আহা, ধুতি কই [illegible] ও ত লাল কাপড়। অমন ত সেজ্‌দির ছিল, ওকে কেন দিলে না সেটা?"

মা বলিলেন, "সরুপাড় হ'লে ধুতি বলে।"

নারায়ণী মুখ নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু মা'র কথা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করিল না। সেই দিন হইতেই সে লক্ষ্য করিতে সুরু করিল যে, খোকা চাহিতে শিখিবার আগেই অযাচিত ভাবে কত খেলনা কাপড় পাইতেছে এবং সে হাজার চাহিয়াও বড়বোনদের ভিক্ষার দান ছেঁড়া কাপড় ও ভাঙা খেলনা লইয়াই দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে।

তাহার বড় দুই বোনের গলায় সরু এক-একটা সোনার হার ছিল বলিয়া সে ও সেজখুকী আন্না প্রায়ই এক ছড়া হারের জন্ত কান্নাকাটি করিত; কত দিন দিদিদের সঙ্গে ওই হার লইয়া মারামারি হইয়া গিয়াছে; পরস্পরের নখের আঁচড়ে চার বোনের মুখ একেবারে রক্তারক্তি হইয়া যাইত। কিন্তু তবু তাহাদের ছোট দুই বোনকে মা কোনোদিন হার গড়াইয়া দিলেন না, অর্থাৎ বাবা টাকা বাহির করিলেন না।

কিন্তু এদিকে খোকার [illegible] পড়িল পূজার পরেই। আগের দিন সন্ধ্যার খেলা করিতে করিতে নারায়ণী দেখিল স্যাকরা নীল কাগজে মোড়া এক ছড়া বিছেহার ও এক জোড়া রুপাকের বালা বৈঠকখানা ঘরে বাবার হাতে দিয়া গেল। বাবা খুলিয়া দেখিয়া আবার মুড়িয়া-সুড়িয়া মাকে গিয়া দিলেন।

সেজখুকী আন্নামণি ও নারায়ণী মহানন্দে কলরব করিয়া ছুটিয়া মা'র কাছে গেল, এই বুঝি এতদিন পরে তাহাদের জন্ত গহনা আসিল। মা ত বলিয়াছিলেন, "আর একটু বড় হ'লে পাবি।" এখন ত তাহারা মস্তবড় হইয়াছে! আন্না বলিল, "মা, আমি হারটা নেব, বালাটা নারাণীকে দিও।"

নারায়ণী আন্নাকে ঠেলিয়া মা'র কোল হইতে সরাইয়া দিয়া বলিল—"হ্যাঁ, তা বইকি? আমি এত দিন ধ'রে হার হার করে আস্‌চি আর আজকে উনি এলেন বালাটা নারাণীকে দিতে! কিছুতেই আমি বালা নেব না।"

তাহাদের থামাইয়া মা বলিলেন, "কাল খোকার ভাতটা হ'য়ে যাক্ তারপর দিন তোদের হার বালা ভাগ করে দেব এখন। আজ মিথ্যে ঝগড়া করিস নে বাছা!" নারায়ণী তাহার ক্ষুদ্র হাতের তর্জ্জনী নাড়িয়া বলিল— "ও বুঝেচি, ওগুলো খোকারই রইল, আমাদের শুধু একটু পরতে দেবে। আমি সব বুঝতে পারি।"

আন্না বলিল, "আমি জানি গো জানি, ভজু বলেচে —তোরা মেয়ের উপর মেয়ে, তোদের আবার গয়না কাপড় কেন? ব্যাটাছেলেদেরই গয়না দিতে হয়, না মা?"

নারায়ণী মাকে-সুদ্ধ একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, "মা, তুমি কি দুষ্টু! ছেলেরা গয়না চায় না, পরে না, খোকা ত গয়না দেখলেই চিবোয়, তবু তুমি ছেলেকেই গয়না দেবে। আর মেয়েরা গয়না পরে ব'লে তুমি হিংসে ক'রে আমাদের দেবে না। আমরা তোমার কেউ নই বুঝি?"

মা বলিলেন—"মা গো মা, কোথায় যাব গো, ছ-বছরের মেয়ের এমন পাকা পাকা কথা।"

পিতা পীতাম্বর বলিলেন—"হবে না? হাজার হোক মেয়েমানুষ ত! কথার জোরেই দুনিয়া জয় করতে হ'বে। স্ত্রীজাতির অশিক্ষিত পটুত্বের কথা সংস্কৃত কবিরাও ব'লে গেছেন।"

নারায়ণী পিতার গুরুগম্ভীর কথার একটাও অর্থ

বুঝিল না। কিন্তু এ-কথা বেশ বুঝিল যে, তাহার ন্যায্য দাবিটা পিতামাতার কাছে অন্যায় আবদার ছাড়া আর কোনো নামই পাইবে না। খোকাই সংসারের সব।

খোকার অন্নপ্রাশন হইয়া গেল। কাকা, জ্যাঠা মাসি, পিসি সকলেই নারায়ণীর লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে খোকাকে সোনারূপার অলঙ্কার পরাইলেন। নারায়ণী আজ আর কাঁদিলও না, চাহিলও না কিছু। পরদিন মা যখন খোকার পায়ের মল ও গলার হার খুলিয়া লইয়া আদর করিয়া তাহাকে পরাইতে আসিলেন, নারায়ণী রাগ করিয়া দুইটা গহনাই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার টানের চোটে হারটা ছিঁড়িয়া হইল দুই টুকরা, আর আছাড় খাইয়া মলের চারটা ঘুঙুর গেল ছিটকাইয়া পড়িয়া। মা রাগের মাথায় তাহাকে ধরিয়া খুব দুই-চার ঘা দিলেন। পিঠে তাহার মায়ের পাঁচ আঙুলের দাগ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল। তবু নারায়ণীর চোখে জল দেখা গেল না। সে কেবল বলিল, "খোকার বেলা গয়না, আর আমার বেলা মেরে মেরে হাড়ভাঙা। তুমি নিশ্চয় আমার সৎমা।" সারা দিনরাত্রি নারায়ণীর মুখে কেহ অন্ন তুলিতে পারিল না। সে মুখ গুঁজিয়া নীরবে শুইয়া রহিল।

শিশু নারায়ণী সত্যাগ্রহ করে নাই, কাজেই ক্ষুধার তাড়নায় দ্বিতীয় দিন মা-বোনের পাত-কুড়ানো অন্ন তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইল। ক্ষুদ্র শিশুর অভিমানের কোনো মূল্য কেহ দিল না। খোকার আদর ও খুকীদের অনাদরে কোনোই পরিবর্ত্তন হইল না।

২

সে পুরাকালের কথা, তখন দশ বৎসরের পরে কন্যা সম্প্রদান বড় কেউ করিত না। সুতরাং চতুর্থী কন্যা হইলেও নারায়ণীর বিবাহের সম্বন্ধ খুঁজিতে পীতাম্বরকে অন্যান্য পিতার মতই আদাজল খাইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি সুরু করিতে হইল। যত বার বিফল হইয়া বাবা ঘরে ফিরেন, তত বারই মা মেয়েকে খোঁটা দিয়া বলেন, "কেন এসেছিলি বাছা, তিন মেয়ের পিঠে গরিবের ঘরে জন্মাতে? ঘুরে ঘুরে পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেল, ভেবে ভেবে মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেল, তবু মেয়ের বর জুটল না।"

নারায়ণীর মুখের জোর এখনও ছেলেবেলার মতই ছিল। তাছাড়া সত্য কথা বলিতে কি, দশ বৎসর বয়সে ত আর তাহার শৈশব ফুরাইয়া যায় নাই? সে রাগিয়া বলিত, "কে বলেছিল তোমাদের আমার বিয়ের ভাবনা ভাব্‌তে? আঁতুড়-ঘরে নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পার নি?"

মা গালে হাত দিয়া বলিলেন—"ধন্যি পাকা মেয়ে বাছা তুই! দেখিস্ পরের ঘরে গিয়ে অমনি কট্‌কট্ ক'রে কথার হুল ফোটাস্ নে, তাহ'লে শাশুড়ী-ননদ উনুন-কাঁদায় মুখ ঘষে দেবে।"

নারায়ণী ঠোঁট উল্টাইয়া তুড়ি দিয়া বলিল, "তোমরা বড় আদরে রেখেচ, তার আবার শাশুড়ী-ননদের ভয় দেখাচ্চ! এখানেও পরের পাত কুড়িয়ে খাই, ছেঁড়া কাপড় পরি, সেখানেও তাই করব।"

মা বলিলেন, "দুঃখী মায়ের পেটে জন্মেছিস্ বাছা, দুঃখটাই কেবল বুঝ্‌লি। মায়ের প্রাণটা ত দেখ্‌তে শিখ্‌লি না। যে থেকে তোরা খেতে শিখেচিস নিজের মুখের গ্রাস যে তোদের মুখে দু-বেলা তুলে দিচ্চি, তা আজ বুঝবি না, মেয়ের মা হ'লে বুঝ্‌বি। আশীর্ব্বাদ করি ধন-দৌলতে তোর ঘর ভরে যাক্, তবু মেয়ের মা হ'লে বুঝ্‌বি মায়ের ভালবাসাটা কি।"

মায়ের প্রথম আশীর্ব্বাদ শীঘ্রই ফলিল; তিন মেয়ের চেয়ে নারায়ণীর সম্বন্ধই ভাল আসিল। খুড়ী জ্যেঠী বলিলেন, "যাই বল, পোড়া বিধাতারও ত কিছু দয়ামায়া আছে। মেয়ের এমন রঙের চটক, এমন মুখের কাট, গরিবের ঘরে জন্মেচে তাই না গোবর-কালি মেখেই দিন কাট্‌চে। এতদিনে বিধাতা মুখ তুলে চাইলেন, এবার দেখো, খেয়ে মেখে মেয়ে আমাদের পদ্মফুলের মত ঘর আলো ক'রে থাকবে।"

মা বলিলেন, "তোমরা তাই আশীর্ব্বাদ কর ভাই। নারাণী আমার বড় দুঃখের ধন, একটি দিনের জন্য তাহাকে আমার হাতে তুলে কিছু দিতে পারি নি, মা হয়ে কোনো আদর-সোহাগ করি নি। নিজের ঘরে মা আমার রাণী হয়ে থাক, দেখেই আমার চোখ জুড়োবে।"

বড় ঘরে মেয়ে যাইতেছে, তাহারা কিছুই দাবি করে নাই। তবু আজ আর পীতাম্বর তাহার চতুর্থী

কন্যা হইয়া জন্মানোর অপরাধ লইলেন না। আজ মেয়ের জন্ম নূতন রাঙা চেলি, সোনার চুড়ি, আবাল্যের ঈপ্সিত হার, সিঁথিপাটি, মল, ঝুম্‌কো—নানা গহনা আসিল। গৃহস্থের ঘরের মতই অল্পস্বল্প হাল্কা অলঙ্কার, তবু নারায়ণীর চক্ষে ইহাই ত আলাদিনের ঐশ্বর্য্য। জীবনে এত অলঙ্কার সে স্পর্শ করে নাই কোনোদিন।

এত দিনের অভিমান ভুলিয়া আজ নারায়ণীর কচি মুখে মধুর হাসি ফুটিয়াছে। রক্তাম্বরে দেবীপ্রতিমার মত সাজিয়া মায়ের কোল হইতে নারায়ণী শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল। যে-গৃহে দুঃখের অন্ন খাইয়া সে মানুষ হইয়াছিল, সেখান হইতে পরগৃহে যাইতে এই শিশুর বয়সেও যে বুকের প্রত্যেকটি শিরায় টান পড়িবে বিবাহের সময় বস্ত্র-অলঙ্কার পাইবার আনন্দে নারায়ণী তাহা ভাবে নাই। কিন্তু কন্যা-বিদায়ের বেলা আশীর্ব্বাদ করিয়া বাপ জ্যাঠা মা সকলে যখন বরের হাতে তাহার পুষ্পকলির মত ক্ষুদ্র হাতখানি বার-বার সঁপিয়া দিলেন, মা আগতপ্রায় অশ্রু কোনোপ্রকারে সামলাইয়া বলিলেন, "বাবা, দুঃখিনীর মেয়ে তোমাকেই চিরকালের মত সঁপে দিলাম। দুধের বাছা ও, কোনো অপরাধ যদি করে, তোমার আপনার ব'লে ক্ষমা ক'রো। আদর কখনও পায় নি জীবনে, আদরে যত্নে বশ ক'রে মায়ের দুঃখ ভুলিয়ে দিও বাছাকে।"

তখন নারায়ণী মায়ের বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্র শিশুর মত কাঁদিতে সুরু করিল। এই চিরঅনাদৃতা বালিকাও অজানার ভয়ে মা'র কোলের আশ্রয়টুকু বার-বার আঁকড়াইয়া ধরিতে লাগিল। তাহার এই একটি দিনের সুখের হাসি আজই চোখের জলে ম্লান হইয়া গেল। নূতন গহনা-কাপড়গুলা খুলিয়া দিলে যদি আর শ্বশুর-বাড়ি না-যাইতে হইত, তাহা হইলে বিনা বাক্যব্যয়ে এখনই সে সমস্ত খুলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়িয়াছে, আর যে উপায় নাই, তাহা এই কচি বয়সেও বুঝিয়াছিল। মা'র অন্তরের ভালবাসা ও বাহিরের অনাদরের স্মৃতিটুকু সম্বল করিয়া গরিবের মেয়ে নারায়ণী ধনীর ঘরের বধূ হইয়া চলিয়া গেল। সংসারে শাশুড়ী নাই, দুই দিন না-যাইতেই নারায়ণী আপন গৃহ-সংসার বুঝিয়া লইল।

৩

দশ বৎসর বয়সেই নারায়ণীর প্রতি পিতৃকর্ত্তব্য পীতাম্বর শেষ করিয়া ফেলিলেন। বিবাহের সময়ের শ-পাঁচ টাকা এবং জন্মিবার সময় গোটা-দশ এই হইল নারায়ণীর দশ বৎসরব্যাপী জীবনে তাহার পিতার মোট খরচ। কারণ তখনকার কালে কন্যার বিবাহে পণ এখনকার মত হাজারের নামতা পড়িত না, কুড়ির নামতা পড়াই রেওয়াজ ছিল। মেয়েদের বিবাহে গায়ে ইউরোপীয় প্রথায় হীরার কিংবা অভাবপক্ষে মুক্তার গহনা দেওয়ার তখন প্রয়োজন হইত না, আটপৌরে রূপার এবং পোষাকী দুই-একখানা সোনার গহনা হইলেই পরিবারের মানসম্ভ্রম অনায়াসে বজায় থাকিত। নকল হীরা ও নকল মুক্তার ব্যবসা করিয়া অবাঙালী ব্যবসাদারেরা বাঙালীর কষ্টার্জ্জিত টাকাগুলি লুঠ করিতেও পারিত না।

সে যাহাই হউক, পীতাম্বরের কুলপাবন পুত্র কিন্তু তাঁহাকে এত অল্পে নিস্তার দিল না। সে পুরুষছেলে, তাহার কাপড়, জামা, জুতা, মোজা, ছাতা, বই, খাতা সকল কিছুর খরচ ত ছিলই, তদুপরি পাঠশালা সাঙ্গ হইতেই আসিল জেলা-স্কুলের খরচ। একমাত্র পুত্রকে মূর্খ করিয়া রাখা ত চলে না?

পুত্র বিষ্ণুচরণ সেকালের এণ্ট্রান্স পাস করিতেই পীতাম্বর বলিলেন, "জমিদারী সেরেস্তায় একটা কাজ খালি আছে; বাবু বল্‌ছিলেন, বারো টাকা মাইনে, বিষ্ণুকে বসিয়ে দিতে।"

চটিয়া বিষ্ণু মাথা নাড়া দিয়া বলিল, "হ্যা, বারো টাকা মাইনের কাজ করব বইকি! তোমাদের মতন চিরকাল নুন আর লঙ্কাগোলা দিয়ে ভাত খাবার সখ আমার নেই। বেঁচে যদি থাক্‌তে হয় মানুষের মত খেয়ে-প'রে বাঁচ্‌ব, নয়ত যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যাব।"

মা বলিলেন, "ষাট ষাট, অমন কথা বলে না। বাবা, তুমি আমার আঁধার ঘরের মাণিক, বাপ-মায়ের কোল-জোড়া ক'রে থাক, তোমাকে বারো টাকা মাইনের কাজ করতে হবে না।"

গাল ফুলাইয়া আঁধার ঘরের মাণিক বলিলেন, "বাপ-মায়ের কোলে বসে থাকলে ত আর চারটে হাত-পা বেরোবে

না। আমায় ক'রে খেতে হবে, আমাকে কলকাতার কলেজে ভর্ত্তি ক'রে দাও।"

পীতাম্বর মহাবিপদে পড়িলেন। তাঁহার সামান্ত আয়। বাড়িটা গরুবাছুর, ধানচাল আছে বলিয়া আর বাগানের তরকারি ও পুকুরের মাছে ভাত খাওয়া চলিয়া যায় বলিয়া ধারকর্জ্জ করিতে হয় না। কিন্তু যদি প্রতি মাসে ছেলের কলেজের মাইনে ও বাসা-খরচ জোগাইতে হয়, তাহা হইলে সেইখানেই ত মাসে অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ টাকা খরচ। এমন করিলে ঘরের ঘটিবাটিও যে বাঁধা পড়িয়া যাইবে।

পীতাম্বর বলিলেন—"ও সব বাপু, তোমার এ গরিব বাপের দ্বারা হবে না। গাঁয়ে থেকে কিছু করতে হয় কর, নয়ত আমাকে আর দ্বিতীয় কথাটি ব'লো না।"

বিষ্ণু বলিল—"বেশ তাই হবে। এর পর তোমাদের যদি কোনো কারণে আপশোষ করতে হয় ত তার জন্তে আমাকে দায়ী ক'রো না।"

মা বিষ্ণুচরণকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"বাছা, দুঃখিনী মাকে অমন ক'রে কথার দাগা কেন দিচ্চিস মিথ্যে? তুই আমার সাতটা নয় পাঁচটা নয়, অনেক দেবতার দোর-ধরা একটা মাত্র ছেলে; তোর বাবা যদি তোকে কলেজের খরচা নাই দেয়, আমিই আমার গয়নাগাটি বেচে খরচ যোগাব। তুই যা পড়তে চাস্ পড়্, ওর জন্তে মনে কোনো দুঃখ রাখিস্ নে।"

ছেলেরই হাতে মা গলার হার খুলিয়া দিলেন। বিক্রী করিয়া দেড় শত টাকা বিষ্ণুচরণ মাকে আনিয়া দিল। মা বলিলেন, "হাঁ রে, হার ত গড়াতেই দেড়-শ টাকা লেগেছিল কি না মনে পড়ে না। বেচ্‌তেও কি অত কখনও পাওয়া যায়?"

বিষ্ণুচরণ হাত নাড়িয়া বলিল, "কি জানি মা, সোনার দর বোধ হয় তখনকার চেয়ে এখন বেশী। তাছাড়া তোমার জিনিষটা এত ভাল আছে, যে, ঘরোয়া খদ্দের দেখেই লুফে নিয়েছে, নিক্তি কোন্ দিকে ঝুঁকেচে তা অত দেখেনি।"

মা বলিলেন, "তুই লোকের কাছ থেকে ঠকিয়ে টাকা নিস্ নি ত, বাবা? তাহ'লে কিন্তু বড় অধর্ম্ম হবে। অধর্ম্মের টাকা কখনও সুফল দেয় না, সে টাকায় কেনা বিদ্যা সব বৃথা যায়।"

বিষ্ণুচরণ বিরক্ত হইয়া বলিল, "না, না, তোমার অত ভাবতে হবে না, আমি ঠিক টাকাই এনেচি।"

মা বলিলেন, "তোর মুখের কথাই সত্যি হোক বাবা। এখন এই টাকাতে কিন্তু তোকে অন্তত ছ-মাস চালাতে হবে। তার মধ্যে আমি আর কিছু দিতে পারব না।"

ছ-মাস পরে গৃহিণীর হাতের কঙ্কণজোড়াও বিষ্ণুর হাত দিয়াই বিক্রী হইয়া গেল। বৎসর দুই ধরিয়া গৃহিণী এমনি করিয়া খরচ চালাইয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। বিষ্ণু কিন্তু পরীক্ষায় ভাল পাস করিল, এই একটা মস্ত সান্ত্বনা।

গৃহিণী স্বামীর হাতে ধরিয়া বলিলেন, "দেখ, যে-বয়সে মানুষ স্বামীর কাছে পাঁচটা গয়না কাপড় আবদার ক'রে চায়, সেই ছেলেবয়সে তোমার কাছে কখনও কিছু চাই নি; আজ বুড়ো বয়সে একটা জিনিষ চাইব, তুমি কিন্তু না বলতে পাবে না।"

পীতাম্বর বিস্মিত দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাইলেন, শেষে কি গৃহিণী পাগল হইয়া গেলেন? নাতি-নাত্‌নীর দিদিমা হইয়া এত দিনে আবার নূতন কি সখ প্রাণে জাগিল? ভয়ে ভয়ে বলিলেন—"কি চাই বল। যদি সাধ্যে কুলোয়, না বল্‌ব না। তোমার সব গয়নাই ছেলেটা খেয়েচে জানি, কিন্তু সে-সব দিতে ত আমি বার-বার বারণ করেছিলাম।"

গৃহিণী বলিলেন, "গয়না আমি চাই না। কিন্তু ছেলেটা ভাল পাস করেচে, তুমি ওকে পড়াবে আর ক-বছর, আমার মাথায় হাত দিয়ে এই কথা বল। ছেলে ডাক্তার হ'তে চায়।"

পীতাম্বর আমৃতা-আমৃতা করিয়া বলিলেন, "মাথায় হাত-টাত আবার কেন? আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব ওকে পড়াতে। সেজন্তে বেশী ভেবো না। তবে ডাক্তারী পড়ার খরচ একটা তালুক কেনার সমান এ বুঝে রেখো।"

পীতাম্বর চেষ্টা করিবেন বলিলেন, কিন্তু নিজের রোজগারের সামান্ত কয়টা টাকা হইতে পড়ার খরচ জোগাইবার ইচ্ছা কিংবা শক্তি কোনটাই তাঁহার ছিলনা।

নানা ভাবনায় চিন্তায় তিনি বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। ডাক্তারী পড়াইবার খরচ ত সামান্য নয়, তাহার উপর সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা কাত্যায়নীর এখনও বিবাহ হয় নাই। আর সব মেয়েদের দশ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এ-মেয়ের তের বৎসর চলিতেছে, তবু আজ পর্য্যন্ত বিবাহের কোনো জোগাড়ই হইল না।

সকাল-সন্ধ্যা তিনি হুঁকা-হাতে অন্যমনস্ক ভাবে দাওয়ায় বসিয়া থাকেন, কলিকার আগুন নিবিয়া যায়, তবু তাঁহার হুঁস থাকে না। কোনো রকমে একবার দুপুর বেলা জমিদারী কাছারীতে হাজির দিয়া আসেন। দিন-পনের এমনি একটানা চিন্তাতেই কাটিয়া গেল।

গৃহিণী চিন্তিত মুখ করিয়া বলেন, "হ্যাঁ গা, ভেবে ভেবে কি পাগল হবে নাকি ?"

কর্ত্তা বলেন, "কি করি বল ? এ ত একটা বোঝা নয়, এ যে দুটো বোঝা। মেয়েটাকে ঘাড় থেকে না নামিয়ে ছেলের জন্যে ত কিছুই করতে পারব না দেখ্‌চি।"

৪

কাত্যায়নীর বিবাহ দূর গ্রামে ঠিক হইয়াছে। পীতাম্বর বলিলেন, "তিন দিনের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেল্‌তে হবে। বেশী আয়োজন করবার সময় নেই। এর বিয়েটা হয়ে গেলে তবে ছেলের পড়াশুনোর ভাবনা সুরু করব। তাড়াতাড়ি না সেরে ফেল্‌লে কলেজ খুলে যাবে।"

মা বলিলেন, "এত তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ির মধ্যে জিনিষপত্র কখনও হয় ? গয়না কাপড় করতেও ত দু-দিন সময় লাগবে।"

পীতাম্বর বলিলেন, "ও-সব, কিছু দিতে হবে না। তাদের অবস্থা ভাল, গরিব মানুষের গলা টিপে তারা কিছু নিতে চায় না। শুধু শাঁখা শাড়ী পরিয়ে মেয়েটি দান করলেই হবে।"

বাবার কথা শুনিয়া কাত্যায়নীর মুখ একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। তাহার তের বৎসর বয়স হইয়াছে, কাজেই সঙ্গী সাথী সকলেরই তাহার আগে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। যার যেমনই অবস্থা হউক, বিবাহের দিনে মেয়েকে লোকে বস্ত্র-অলঙ্কারে যথাসাধ্য সাজাইয়া দেয়, চিরকাল কাত্যায়নী তাহা দেখিয়া আসিয়াছে। আর তাহার বিবাহের বেলা তাহার এত দিনের সকল সাধ অপূর্ণ রাখিয়া বাবা শুধু শাঁখা পরাইয়া তাহার বিবাহ দিবেন ?

কাত্যায়নী মাকে কিছু বলিতে পারিল না, দিদিকে গিয়া বলিল—"দিদি ভাই, তুমি মাকে গিয়ে বল, আমার বিয়ের কাজ নেই। আমি অমনি থাক্‌ব, বাপের বাড়ির দাসীগিরি করেই দিন কাটিয়ে দেব।"

নারায়ণী তাহার ফোলা গালদুটি টিপিয়া দিয়া বলিল, "কেন রে কাতু, বিয়ের নামেই এমন যৌবনে যোগিনী সাজবার ইচ্ছে হ'ল কেন তোর ? কার সঙ্গে ঝগড়া হয়েচে, কে কি বলেচে তোকে ?"

কাত্যায়নী ঠোঁট ফুলাইয়া মুখ ভার করিয়া বলিল, "বল্‌বে আবার কে ? দাদার পড়ার বেলা মা গায়ের সব গয়না বেচ্‌তে পারলেন, আর আমার বিয়ের বেলা শুধু শাঁখা শাড়ী ! কেন, এত হেনস্থা কিসের জন্যে ? বাবা কি মেয়ের জন্যে দু-শ টাকাও খরচ করতে পারেন না ? ধান ভেনে চাল ঝেড়ে বাসন মেজে বাবার যা খরচ বাচিয়েচি এত বছর, তাতেও দু-শ টাকার গয়না হয়।"

নারায়ণী বলিল, "কাকে আর শোনাচ্চিস্‌ ভাই ? ওসব আমি তোর চেয়ে অনেক আগেই জেনেচি। ছেলেবেলা বাপ-মায়ের 'ছেলে ছেলে' বাতিকের চোটে মনে একটি দিন সুখ পাই নি। তবে তোর মতন একেবারে ন্যাড়াবোচা ক'রে আমার বিয়ে হয় নি, এটা সত্যি ! তা কি আর করবি দিদি ? আমি ছিলাম চার নম্বর, তুই যে আবার পাঁচ নম্বর। এখন ও নিয়ে রাগারাগি করিস নে, তোর হাতের চুড়ি আমি দেব এখন। গড়াবার সময় হবে না, আমারই চুড়ি পরিয়ে দেব, দেখিস্‌ বেশ নতুন। তা ছাড়া বর ত শুনছি টাকাওয়ালা, বিয়ের পর বাড়ি নিয়ে গিয়ে গা ভরে গয়না দেবে বলচে।"

কাত্যায়নী আর কিছু বলিল না, কিন্তু নারায়ণী মাকে গিয়া বলিল, "মা, বরের যদি টাকা-পয়সা আছে, তবে গায়ে-হলুদের তত্ত্বেও ত দু-একখানা গয়না দিতে পারত, তাহ'লে আর কাতিটার অমন ছিরি ক'রে বিয়ে দিতে হ'ত না ! শুধু কানে ফুল আর পায়ে মল দিয়ে মেয়ের বিয়ে হয়, এ বাপু কখনও দেখি নি।"

মা চোখে আঁচল দিয়া বলিলেন, "কি করব বল মা, সবই আমার কপাল! নইলে আমার গয়নাগুলো বিকিয়ে যায়? ছেলে যে শহরে বাবু হবেন, মেয়ের জন্যে কিছু রাখব আমার সাধ্যি কি? তবু ত উনি শাঁখা শাড়ী দিয়ে সারছিলেন, আমি ফুল আর মল না দিয়ে ছাড়লাম না। সোনা-রূপো না হ'লে কখনও কন্যাদান শুদ্ধ হয়? বিয়েই অশুদ্ধ থেকে যাবে যে। আর বরের বাড়ির ত সবই আজগুবি। দু-দিনের মধ্যে বিয়ে চাই, নিজেদের সব আছে, অথচ তাঁদের নাকি বিয়ের আগে কনেকে কিছু দেওয়া বারণ। ওদের কি না-কি দোষ হয়।"

নারায়ণী তুড়ি দিয়া বলিল, "দোষ না কচু! যা বুঝচি, তাদের আধ পয়সারও মুরোদ নেই। বাবাকে ফাঁকি দিয়ে মেয়েটি নিয়ে যাচ্চে। বাবাও ভাবচেন—নিখরচায় মেয়ের বিয়ে, এমন বর পেলে ছাড়ব কেন? আর সবাইকে যা হোক ক'রে দু-তিন-শ টাকারও জিনিষ দিতে হয়েছিল। অবিশ্যি কিছু না দিতে পারেন, না দিন, কিন্তু একেবারে ভিখিরী কি আকাট মুখ্যুর সঙ্গে যেন মেয়েটার বিয়ে না দেন, এ-কথা এখনও বাবাকে বুঝিয়ে বোলো। সে সময় আছে।"

নারায়ণীর কথা শুনিয়া পীতাম্বর বলিলেন, "না গো না, তুমি মেয়েদের বুঝিয়ে ব'লো সে ছেলের বাড়িঘর বাগান ধান চাল সব আছে। তা ছাড়া বাপ-পিতামহ টাকাকড়িও কিছু রেখে গেচেন। হাঘ'রের ঘরে আমি মেয়ে দিচ্চি না। তোমাদের ভয় নেই।"

বিবাহের আয়োজন বাড়ির মেয়েরা যেমন করিয়া পারে নিজেরাই করিতে লাগিল। পীতাম্বর কানের ফুল ও পায়ের মল ছাড়া নগদ পয়সা দিয়া কিছু কিনিলেন না। বড়বোন রাধারাণী পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থের বধূ, কোনোরকমে একখানা নূতন চেলির কাপড় আনিল। মেজবোন বিনোদিনী বলিল, "একা গয়না দিতে পারি এমন ক্ষমতা ত ভাই আমার নেই। তবে আমি, তুই যদি ভাই কিছু দিস্, আর মাও কিছু বার করে, তবে তিন জনে মিলে তিন ভরি ছিরের একটা সরু দড়ি হার করানো যেতে পারে।"

আয়াদশি সেজবোন ... যে লুকাইয়া-চুরাইয়া ধান বিক্রী করিয়া গোটাকতক টাকা করিয়াছিল, তাহা হইতেই এক ভরি সোনার দাম দিল। মা'র কানে এক ভরির দুটা ফুল ছিল, তাহাই খুলিয়া দিলেন। সরু ফিন্‌ফিনে এক গাছা দড়ি হার হইল। সেকালে মেয়েদের চক্ষে এত সরু হার যেন অলঙ্কারের নামে পরিহাস। তবু কি করা যায়? একেবারে শুধু গলায় মেয়েকে বাহির করিতে মা-বোন কাহারও ইচ্ছা করিল না।

বাড়িতে রসুনচৌকি বসিল না, আলোর মালা জ্বলিল না, উঠানে ভিয়ান বসিল না, পাড়ায় পাড়ায় নিমন্ত্রণ হইল না, শুধু পাড়ার দুই-চার জন ভাল রাঁধিয়ে মেয়েকে যোগাড় করিয়া নমঃ নমঃ করিয়া বরযাত্রীর আহারের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। ময়রা-বাড়ি হইতে এক বাঁক দই ও এক বাঁক বোঁদে আনাইয়া মিষ্টান্নের কাজ সারা হইল।

সন্ধ্যাবেলা উঠানে গ্রামের বারোয়ারীর তালি-দেওয়া একটা লাল চাঁদোয়া টাঙাইয়া এবং একটি ময়লা সতরঞ্চি পাতিয়া বিবাহ-সভা সাজানো হইল। তাহারই উপরে একটা পুরানো গালিচার আসন পাতিয়া দিল বরের বসিবার জন্য।

সামান্য অলঙ্কার ও চেলী পরিয়া একটা দুই আনা দামের কাজললতা হাতে করিয়া কাত্যায়নী পিঁড়ির উপর বসিয়া ঝিমাইতেছিল। বিয়ে-বাড়িতে এতটা গোলমালও নাই যে, তাহার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে। হঠাৎ পাড়ার ছেলেরা ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, "বরের পাল্কী দেখা যাচ্চে রে, আলো ধর্, আলো ধর্; এখুনি বর এসে পড়বে।" দুটো তেল-ন্যাকড়ার মশাল ও দুটো-তিনটে লণ্ঠন আনিয়া সভার সম্মুখে খুঁটি পুঁতিয়া উঁচু করিয়া রাখা হইল, মেয়েরা তিন-চারটা শাঁক একসঙ্গে বাজাইয়া কোনোরকমে বিয়ে-বাড়ির মান রাখিতে চেষ্টা করিল। কন্যাপক্ষের পোষাক-পরিচ্ছদের ঘটার মধ্যে নারায়ণীর ছয় বৎসরের পুত্র নিরঞ্জনের সাটিনের পোষাক এবং তিন বৎসরের শিশুকন্যা কল্যাণীর এক গা গহনা। তাহাদের দুই জনকে সভা জাঁকাইতে সকলের আগে বসানো হইল।

মাত্র জন-পঁচিশ-ত্রিশ বরযাত্রী লইয়া বর আসিয়া পড়িল। অল্প হইলেও বিয়ে-বাড়িতে যত মেয়ে পুরুষ ছিল সকলেই বর দেখিতে ভীড় করিয়া ছুটিয়া আসিল। ভিন্ন গ্রামের অচেনা বর, না-জানি কেমন চেহারা, কেমন

ধরণ-ধারণ! ছোট মেয়েরা পুরুষদেরও ঠেলিয়া আগে গিয়া হাজির হইল।

বরের মামা, মেসো প্রভৃতি দুই-তিন জন ভদ্রলোক একসঙ্গে বরকে নামাইতে অগ্রসর হইলেন। কন্যাপক্ষের লোকেরা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ওকি মশায়, আপনারা কেন? আমাদের বাড়ি বর এসেচে, আমরা নামিয়ে নিচ্চি, আপনারা সরুন।"

বরের মামা বলিলেন, "না না, অত লোক-লৌকিকতার দরকার কি? আপনারাও যা, আমরাও তা, নিলামই বা আমরা নামিয়ে! ওতে কিছু দোষ নেই।"

বিষ্ণুচরণ বলিল, "না দেখুন, বিয়ের একটা নিয়ম ত আছে। যা চিরকাল হয়ে আস্‌চে, আজ তার অন্যথা কেন হবে? আমাদের কাজ আমাদের করতে দিন।" বিষ্ণুরা সদলে অগ্রসর হইতেই বরের মামা শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "দেখো, দেখো, রাতে-ভিতে অন্ধকারে ছেলেটাকে যেন ফেলে দিও না। সাবধানে নামিও।"

বিষ্ণু বলিল, "কেন মশাই, আমরা কি কানা না খোঁড়া যে বরকে ফেলে দেব?"

অগত্যা মামা চুপ করিলেন। বর নামাইতে গিয়া একটা ছেলে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে, তোদের বরই যে খোঁড়া দেখচি, পা এগোতে পারে না।"

পীতাম্বর বলিলেন, "চুপ্ কর। অনর্থা বেয়াদপি ক'রো না।"

কিন্তু সত্য সত্যই বরকে অনেক কষ্ট করিয়া নামাইতে হইল। সকলেই দারুণ কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করিতে লাগিল, "কি হয়েচে, কি হয়েচে? বর পা বাড়াতে ভয় পায় কেন? কোনো চোট্ লেগেচে কি?"

রাগিয়া মামা বলিলেন, "কিছু না, কিছু না, পা ঠিক আছে। ক-দিন আগে চোখ উঠেছিল, তাই অন্ধকারে ভাল ঠাহর করতে পারচে না। তোমাদের ত এমন বিয়ে-বাড়ি যে একটু জোর আলোও নেই!"

মেয়েমহলে মহা চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল, "আলো আবার নেই! বর কি সত্তর বছরের যে এই আলোতে দেখ্‌তে পায় না!"

নারায়ণী বিরক্ত মুখ করিয়া মাকে বলিল, "মা ও চোখ-ওঠা-টোটা কিছু নয়। আমি বল্‌চি নিশ্চয় বরের চোখ কানা, নইলে আগে থেকে মামা অত ব্যস্ত হয়ে ঢাক্-ঢাক্ গুড়-গুড় করত না। আমি নিজে যাব, সাম্‌নে গিয়ে দেখে আসব, বর চোখে দেখ্‌তে পায় কি না।"

মা চোখে আঁচল দিয়া কান্না সুরু করিলেন, "ওরে আমার কাতু, তোর কপালে মা শেষে এই ছিল!"

নারায়ণী গলা উঁচু করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "কানা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কত লাখ টাকা বাঁচালে, বাবা? নিজের মেয়ের উপরও একটু মায়া হ'ল না? ওই ত তোমার শেষ, আর ত কেউ জ্বালাবে না।"

মা বলিলেন, "ওরে বাছা, থাম্ আর গোলমাল বাধাস্ নে। মেয়েটার অদৃষ্টে যা আছে তা ত হবেই। এর পর আর লগ্নভ্রষ্ট ক'রে জাতজন্ম খোয়াস্ নে।"

নারায়ণী বলিল, "অদৃষ্ট অদৃষ্ট ক'রো না মা। বেশ জান যে তোমরাই ওর অদৃষ্ট। কই—বাবা, বলুন দেখি জেনে-শুনে কানা ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেন নি।"

পীতাম্বর অত্যন্ত মিহি-সুরে বলিলেন, "হ্যাঁ, চোখ একটু খারাপ তা শুনেইছিলাম, কিন্তু তখন ত দেখে বুঝ্‌তে পারি নি যে একেবারে এত কম দেখে।"

পীতাম্বর কি বলিলেন না-শুনিতে পাইলেও বরের মামা আন্দাজে বলিলেন, "আপনি মশায় সমস্তই জানতেন। জেনে-শুনেই মেয়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন; আমরা কাউকে ঠকাই নি। এখন এরকম বলা অত্যন্ত অন্যায়।"

নারায়ণী স্ত্রীজাতির লজ্জাধর্ম্ম ভুলিয়া পিতার হইয়া জবাব দিল, "ঠকান বা নাই ঠকান, ওছেলের সঙ্গে বিয়ে আমরা দেব না। আপনারা বর তুলে নিয়ে যান। বিয়ে আমরা ভেঙে দিলাম। ন্যায়-অন্যায় বুঝি না।"

মা ছুটিয়া তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন, "ওরে কি বল্‌তে কি বল্‌চিস্, কিছু কি হুঁস নেই তোর? বর তুলে নিয়ে গেলে জাত যাবে কি ওদের, না আমাদের? ও পোড়াকপালীকে নিয়ে তখন আমি কি করব?"

নারায়ণী বলিল, "তোমাদের ধোপা-নাপিত সব কি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে অন্ধের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে পারছিলে না!"

বরযাত্রীর দলের একটা ছেলে চীৎকার করিয়া বলিল, "ধোপা-নাপিত বন্ধ হবে কেন, রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়া বোধ হয় বন্ধ হয়েছিল। হাজার টাকায় রফা হয়েছে, তা বুঝি কর্ত্তা বাড়ি এসে বলেন নি! আগাম পাঁচ-শ এখনও ট্যাঁকে হাত দিলে দেখা যায়। এখন বিয়ে দেব না বল্‌লে শুধু কি জাত যাবে, মাথাও যাবে সঙ্গে সঙ্গে।"

সভা জুড়িয়া হুড়াহুড়ি চেঁচামেচি পড়িয়া গেল।

লণ্ঠনের আলোগুলা কাহারা আছাড় দিয়া ভাঙিয়া দিল। অন্ধকারে অন্ধ-বর ও ঘরের ভিতর অশ্রুমুখী ক'নে নীরবে বসিয়া রহিল। বাকী স্ত্রীপুরুষ যে যেখানে ছিল সকলেই উত্তেজিত হইয়া চেঁচামেচি করিতে লাগিল। অস্পষ্ট আলোতে মুখ দেখা যায় না বলিয়া গলার স্বর সকলেরই সপ্তমে চড়িতে লাগিল। কন্যাপক্ষীয়েরাও এখন পীতাম্বরকে ধিক্কার দিতে ছাড়িল না, "শেষে টাকার লোভে মেয়ে বেচা, ছিঃ!"

বরের মামা আস্ফালন করিতেছেন, "আমাদের টাকা ফিরিয়ে দিন, আমরা বর তুলে নিয়ে যাই। কনের বাড়ি এসে এমন অপমান আমরা সহ্য করব না।"

নারায়ণী তখন একেবারে সভার মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে। ছেলেদের ডাকিয়া সে বলিতেছে, "তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই ভাই, যে, আমার বোনটার জাত রক্ষা করতে পারে?"

কেহ জবাব দিল না, কেহ কাছে আসিল না।

নারায়ণী বলিল, "আমি যত দিন খেতে পাব, কাতু আর কাতুর বরের তত দিন অন্নের অভাব হবে না, এ আমি ধর্ম্ম-সাক্ষী ক'রে বল্‌ছি, তবু কি আমার বোনের বিয়ে আজ হবে না? দেখ আমি ছেলেপিলের মা, মিথ্যা বড়াই করবার সাহস আমার নেই।"

গ্রামের একটি দরিদ্র পিতৃমাতৃহীন বালক আসিয়া নারায়ণীর সম্মুখে দাঁড়াইল। নারায়ণী তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া অন্তঃপুরে কাত্যায়নীকে আনিতে চলিল। অশ্রুধারায় কাত্যায়নীর বুক তখন ভাসিয়া যাইতেছে।

অন্ধ বরের দলবলেরা এদিকে বিপুল কোলাহল করিয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে। পীতাম্বর কম্পিত হস্তে বরের মামার হাতে টাকা গণিয়া দিতেছেন। আর সকলে চীৎকার করিতেছে, "ওরে ছোটলোকের বাড়ি বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে মানসম্ভ্রম সব গেল।" কেহ বলিতেছে, "মেয়েবেচা বামুনের আবার জাঁক দেখ। পদ্মলোচন বর চাই।" কেহ বলিতেছে, "একেবারে জোচ্চোর, সব জেনে-শুনে টাকা নিয়ে এখন আবার সাধু সাজা হচ্ছে।"

অর্দ্ধ অন্ধকারে ভাঙা সভায় মহা কলরবের মধ্যে সজলনয়না কাত্যায়নীর বিবাহ হইয়া গেল।

পীতাম্বর নারায়ণীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "কাতুর গতি ত মা, তুমিই করলে, এখন ছেলেটারও একটা ব্যবস্থা তুমি ছাড়া আর কে করবে? তোমাদের বিরক্ত করব না ব'লেই এ-সম্বন্ধটা করেছিলাম, ছেলেটার খরচ ওরাই চালিয়ে দিত। তা আমার কপালে সবই মন্দ হ'ল। এখন তুমি ছাড়া আর কার ভরসা করব মা?"

নারায়ণী বলিল, "বাবা ছেলের জন্য মেয়েটাকে বলি দিচ্ছিলে—আর এখন ও-ছেলের কথা তুলো না।"

পীতাম্বর বলিলেন, "তোরও ত মা ছেলেমেয়ে আছে। দেখ্‌বি বড় হ'লে নিরঞ্জনের আগে কল্যাণীকে বসাতে পারবি না। মেয়েসন্তান হাজারই হোক্ পর বইত নয়। তাই লাখ টাকা থাক্‌লেও বাপ ভিখিরী। নিজের মেয়ে হ'তেই এ-জ্ঞান তোর হবে এই আশীর্ব্বাদ আমি করচি।"

নারায়ণী বলিল, "আমিও বাবা, তোমার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌চি আমার ছেলেতে মেয়েতে কোন প্রভেদ নেই এ আমি তোমাদের দেখাব।"

সে বলিতে পারিল না, "তোমার ছেলের জন্তে মুখে কালি মাখ্‌ছিলে, ভাগ্যিস্ এই মেয়ে ছিল তাই রক্ষে করল।"

বিষ্ণু শুধু মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, "বাবা, মার গয়না-গুলো বেশী দাম দিয়ে ছোটদিই কিনেছিল। নইলে ও মরা-সোনা কে অত দাম দিয়ে নিত?"

বাংলা-সাহিত্যে 'মহাকাব্য'

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম-এ

১

আধুনিক বাংলা-সাহিত্য লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, মাঝে মাঝে তাঁহাদের নিকটে একটা মন্তব্য শোনা যায়,—বাংলা-সাহিত্যে মহাকাব্য রচিত হইল না, ইহা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের কথা ও অক্ষমতার পরিচয়। গীতিকাব্যে খণ্ডকাব্যে কবিত্বপ্রবণ বাঙালী জগতের দরবারে নিজের একটা বিশেষ স্থান গড়িয়া লইয়াছে, এবং বাঙালীর এই স্বাভাবিক কবিপ্রাণতা তাহাকে ভারতীয় অন্যান্য জাতির নিকট বোধ ও গুণের অদ্ভুত সংমিশ্রণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে; কিন্তু কাব্য ছাড়াইয়া মহাকাব্য পর্য্যন্ত সে উঠিতে পারে নাই, বাঙালী সমাজেও এইরূপ অভিযোগের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বাংলার উপর যথেষ্ট পড়িয়াছে, সাহিত্যের রূপের উপর, ভাবের উপর একটা দাগ রাখিয়াছে, তাহা সহজে মুছিবার নয়। গীতিকাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব অবিসম্বাদিত; বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় নাট্যসাহিত্য সাক্ষাৎভাবে পাশ্চাত্য প্রভাব বক্ষে ধারণ করিতেছে। "কিন্তু সে সব লঘুসাহিত্য, খানিকটা চাপল্যমাত্র-প্রণোদিত; মহাকাব্যের মহাভাব তাহাতে কোথাও নাই।" পাশ্চাত্য 'এপিক' কি তবে সমঝদার সুরসিক কবিজয় বাঙালী লেখকের কোনও কাজে আসে নাই? পাশ্চাত্য প্রভাবে পুষ্ট বাংলা-সাহিত্যে মহাকাব্যের বা পাশ্চাত্য এপিকের ছাপ কই?

২

আমাদের দেশে প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা মহাকাব্যের গঠন সম্বন্ধে খানিকটা ধরা-বাঁধা নিয়ম রচনা করিয়া গিয়াছেন। অষ্টাদশ-ভাষা-বারবিলাসিনী-ভুজঙ্গ সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে—

> সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ।
> সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ॥
> একবংশভবা ভূপা কুলজা বহবোঽপি বা।
> শৃঙ্গারবীরশান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে॥
> অঙ্গানি সর্ব্বেঽপি রসাঃ সর্ব্বে নাটকসন্ধয়ঃ।
> ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্।
> চত্বারস্তস্য বর্গাঃ স্যু স্তেষ্বেকং চ ফলং ভবেৎ॥
> আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্ব্বা বস্তুনির্দ্দেশ এব বা॥
> কচিন্নিন্দা খলাদীনাং সতাং চ গুণবর্ণনম্।
> একবৃত্তময়ৈঃ পদ্যৈরবসানে ঽন্যবৃত্তকৈঃ॥
> নাতিস্বল্পা নাতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাধিকা ইহ।
> নানাবৃত্তময়ঃ কাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে॥
> সর্গান্তে ভাবিসর্গস্য কথায়াঃ সূচনং ভবেৎ।
> সন্ধ্যাসূর্যেন্দুরজনীপ্রদোষধ্বান্তবাসরাঃ।
> সম্ভোগবিপ্রলম্ভৌ চ মুনিস্বর্গপুরাধ্বরাঃ।
> রণপ্রয়াণোপযম-মন্ত্র-পুত্রোদয়াদয়ঃ।
> বর্ণনীয়া যথাযোগ্যং সাঙ্গোপাঙ্গা অমী দশ॥
> কবেবৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা।
> নামাস্য সর্গোপাদেয়কথয়া সর্গনাম তু॥

বহু সর্গ লইয়া মহাকাব্য রচিত হয়, তাহার মধ্যে প্রধান এবং দেবতাস্বভাব নায়ক থাকিবেন এক জন, তিনি সদ্বংশসম্ভূত, ক্ষত্রিয়, এবং ধীরোদাত্তগুণযুক্ত। কাব্যের নায়ক হইবেন প্রধান কোন বংশের রাজা, অথবা সৎকুলোৎপন্ন বহু ভূপাল; এবং অঙ্গী বা প্রধান রস হইবে শৃঙ্গার, বীর, শান্ত ইহাদের মধ্যে একটি রস, অন্য সকল রস হইবে তাহার অঙ্গ মাত্র। ইহার মধ্যে নাটকের পঞ্চসন্ধি বিরাজিত থাকিবে, এবং ইতিহাসের, অথবা সজ্জন লইয়া, কোনও ব্যাপার আশ্রয় করিয়া ইহার রচনা হইবে। ইহার সামনে থাকিবে চতুর্ব্বর্গ এবং কাব্য তাহার একটি ফল প্রসব করিবে। নমস্কার, আশীর্ব্বচন বা মঙ্গলাচরণ—ইহাদের মধ্যে কোন একটি দিয়া ইহার আরম্ভ হইবে; কোথাও থাকিবে খলের নিন্দা কোথাও বা সজ্জনের গুণবর্ণনা। এক এক সর্গে একই বৃত্ত থাকিবে, শুধু সর্গান্তে বৃত্ত-পরিবর্ত্তন ঘটিবে। সর্গগুলি খুব ছোটও হইবে না, খুব বড়ও হইবে না, সংখ্যায় আটটির বেশী হইবে। কোথাও কোথাও এক সর্গের মধ্যেই নানা বৃত্তের অবতারণা।

এক সর্গের শেষে পর সর্গের কথা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে। সন্ধ্যা, সূর্য্য, চন্দ্র, রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, দিন, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ, মুনি, স্বর্গ, নগর, অধ্বর, রণপ্রয়াণ, বিবাহ, মন্ত্র, পুত্রের জন্ম—এই সকল সবিস্তরে বর্ণনা করিতে হইবে। সর্গের নামকরণ হইবে কবি, তাঁহার ছন্দ, তাহার নায়ক বা অন্য কাহারও নামে, অথবা সর্গস্থিত কোন উপাদেয় কথা অনুসারে সর্গের নাম হইবে।

কোন বিশেষ সাহিত্যকে সংজ্ঞা দিয়া বর্ণনা করিয়া ঠিক বোঝান যায় না, সাহিত্যের রস তো নিতান্তই সহৃদয়বেদ্য, তবু ভিন্ন ভিন্ন রীতির পার্থক্য বুঝাইতে গেলে এইরূপ সংজ্ঞা বা বর্ণনা ভিন্ন উপায় নাই। অবশ্য কার্য্যতঃ এই সংজ্ঞা সর্ব্বত্র রক্ষিত হইত না, বিষয়-গৌরবে শ্রীজয়-দেবের গীতগোবিন্দও মহাকাব্য। যাহা হউক, কৌতূহলী পাঠক অধীত পাশ্চাত্য মহাকাব্যের সহিত ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দ্দেশ মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

৩

ইউরোপীয় 'এপিক্' কথাটার মূলেও 'বৃত্ত' বা 'ব্যাপার' রহিয়াছে; উপাখ্যান এরূপ কাব্যের প্রাণ। 'ইপ্‌স্' শব্দটার অর্থ গল্প, এপিক কথাটার অর্থ 'গল্প-সম্বন্ধীয়'। গম্ভীরভাবে গুছাইয়া যে-কোন উপাখ্যান গল্প করা হয় তাহারই নাম এপিক। ইহার পিছনে যে শুধু বীর-রসের ভাব রহিয়াছে তাহা নয়, প্রাচীন গ্রীসে ব্যক্তিগত অবদানের সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্মের অনুযায়ী আদর্শও প্রচুর ছিল। হোমারের পূর্ব্বেও গ্রীসে এপিক ছিল, তবে সেই সকল এপিক-রচয়িতা কবিদের নাম পাওয়া যায় না। খ্রীঃ-পূঃ সপ্তম শতকে এক জন স্ত্রী মহাকবি ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন। তিনি কবিপ্রতিভায় হোমারের সমকক্ষ ছিলেন এরূপ মন্তব্যও শুনিতে পাওয়া যায়। ভর্জ্জিল খ্রীঃ-পূঃ ৩০ অব্দে তাঁহার মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই মধ্যে মূলগত এপিক-প্রবৃত্তি বা মহাকাব্যের প্রেরণা ছিল। মধ্যযুগে এই প্রবৃত্তি কমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু লুইজি পুল্‌চি, বইয়ার্দো, অ্যারিওস্টো ও ট্যাসো প্রভৃতি কবিগণ মূল এপিক আদর্শে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের পরে খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ কবি মিল্‌টনের আবির্ভাব। হোমার-ভর্জ্জিলের মত মিল্‌টনের মনেও এপিকের গম্ভীর মূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল; অনন্ত আকাশ, মহাশূন্য, অপরিসীম ব্যোম,—তাঁহার কল্পনার রঙ্গভূমি। এপিকের উদার আদর্শ লেখকের সম্মুখে জাজ্বল্যমান থাকা উচিত; নতুবা গুরুগম্ভীর শব্দ বা শব্দের কারণভূত ভাব কি করিয়া স্ফূর্ত্ত হইবে?

ইউরোপীয় এপিকের মধ্যে মোটামুটি তিনটি উপাদান লক্ষ্য করিতে পারা যায়। তাহার ভাবাধার, তাহার শব্দ-সম্পদ, তাহার শব্দের বাঁধুনী। এপিকের পক্ষে তিনটিই অপরিহার্য্য, একটিকেও বাদ দিলে চলে না। প্রথমতঃ, এপিকের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা চাই, নাটকের প্রাণ যে ঘটনা তাহা থাকা চাই; আরিস্ততল বলিয়া গিয়াছেন, নাটকীয় গুণ সঙ্গে সঙ্গে না থাকিলে এপিক উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কথার বাঁধুনী থাকা চাই, বাছিয়া বাছিয়া শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে ধ্বনিতেই মনের মধ্যে একটা গম্ভীর উদাত্ত ভাব জাগিতে পারে; কীট্‌স্ যেমন শব্দ-বন্ধনকে প্রেমিকের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, এপিক কবিও তেমনি দেখেন। কাব্য ত শুধু ভাবের সমষ্টিমাত্র নহে, ভাব না-হয় তাহার প্রাণ হইল, কিন্তু সে প্রাণের উপযুক্ত দেহ করিতে হইবে, এমন দেহ করিতে হইবে যাহাতে প্রাণের সুষমা, শক্তি, মাধুর্য্য সকলই অভিব্যক্ত হয়। এইরূপে ভাবাধার, শব্দসম্পদ ও শব্দবিন্যাস—এই তিনটির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কবিরা মহাকাব্য রচনা করেন। এই তিনটির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতি আপনিই উন্নত হইবে।

৪

বর্ত্তমান যুগে বাংলা-সাহিত্যে যে-সব কাব্য বিরচিত হইয়াছে তাহাদের উপর প্রাচীন ইউরোপ ও প্রাচীন ভারত উভয়েরই প্রভাব কাজ করিয়াছে, এ-কথা বলা যায়। ইংরেজী ১৮৬৩ সালে পয়ার ছন্দে ইলিয়াডের বাংলা অনুবাদ হয়। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এই কবিত্রিতয় বাংলা-সাহিত্যে এপিকের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যথাক্রমে ইঁহাদের কাব্যরচনারীতির আলোচনা করিব।

মধুসূদন তাঁহার বাংলা কাব্যের মধ্যে 'তিলোত্তমাসম্ভব'ই

সর্ব্বপ্রথমে রচনা করেন। এই কাব্যের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা, উহা ঠিক ঠিক এপিক নয়, তবু বাংলা ভাষায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'খণ্ড এপিক'। তাহার পরে মেঘনাদবধ; এখানে রাম-রাবণ ও ইন্দ্রজিতের চরিত্রই ছিল তাঁহার প্রধান উপজীব্য; ইহাকেও তিনি খণ্ড এপিক বা epicling বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।*

পৌরাণিক চরিত্র আশ্রয় করিয়া ইউরোপীয় এপিকের আদর্শে তিনি সেই চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইউরোপীয় মহাকবিদের মধ্যে তাঁহার আদর্শ ছিলেন মিল্‌টন, হোমার নহেন। তাই বলিয়া কি তিনি অন্য কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই? মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গে "কোন্ দেব মোহের শৃঙ্খলে" ইত্যাদি কথা মেঘের কথা ইলিয়াড চতুর্দ্দশ ভাগ হইতে, রতির পরিকল্পনা অ্যাফ্রোদিতে হইতে, প্রমীলা-চরিত্র ট্যাসোর মহাকাব্য জেরুশালেম-উদ্ধারের চতুর্থ সর্গ হইতে, দশরথের নরকদর্শন ভর্জিলের মহাকাব্য হইতে অল্পবিস্তর গৃহীত। তিলোত্তমা-সম্ভব লিখিতে গিয়া কবির মনে বিদ্রোহভাব তেমনধারা জাগে নাই, কিন্তু মেঘনাদবধ আরম্ভ করিয়া তিনি যেন প্রাচীন ভারতীয় কাব্যাদর্শ হইতে নিজের দূরত্ব বোধ করিতে লাগিলেন। যে-দেশে সাহিত্য-রচনার নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে,—"রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যম্, ন তু রাবণাদিবৎ" —সেখানে বন্ধুর নিকট সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন, Ravan inspires me with enthusiasm; he is a Grand Fellow; মধুসূদন নিজে যেমন বিদ্রোহী ছিলেন, তেমনি বিদ্রোহকে ভাল করিয়া বুঝিতেও পারিতেন।

মেঘনাদবধের পর মধুসূদন খণ্ডকাব্যাদি লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মনে বরাবরই এপিক লিখিবার একটা আগ্রহ ছিল, মেঘনাদবধ ত তাঁহার শুধু হাত পাকাইবার উপায় মাত্র। অবশেষে যে সনেট বা খণ্ডকাব্য লিখিয়া তাঁহাকে দিন কাটাইতে হইবে, সে-চিন্তা তাঁহার অসহ্য ছিল। তাঁহার বন্ধু রাজনারায়ণ বাবু সিংহল-বিজয় লইয়া মহাকাব্য রচনা করিবার জন্য পূর্ব্বেই তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কারণ মেঘনাদবধের ভিত্তি ছিল রামায়ণ-কথা, তাহা পৌরাণিক কাহিনী, সুতরাং রাজনারায়ণ বাবুর মতে তাহার ঐতিহাসিকতা কিছুই ছিল না। সিংহল-বিজয় মহাকাব্যে বাঙালীর জাতীয়তার ক্ষুধা মিটিবে, ঘটনাও বাঙালীর অতীত জাতীয় গৌরবের নিদর্শন, এবং তাহার ঐতিহাসিক ভিত্তিও আছে,—অন্ততঃ রাজনারায়ণ বাবু তাহাই মনে করিয়াছিলেন; মধুসূদনও পরে এক সময়ে সিংহল-বিজয় লইয়া মহাকাব্য রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মহাকালের আহ্বানে তাঁহাকে সংসারের কর্ম্ম হইতে অসময়ে অবসর লইতে হইল।

রঙ্গলাল (১৮২৬-৮৭) কিন্তু মাইকেলের মত মিল্‌টনের মহাকাব্যে আকৃষ্ট হন নাই। তিনি বাংলা-সাহিত্যের উন্নতি বিষয়ে আস্থাবান ছিলেন; বাংলা কাব্য যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে তাঁহার Defence of Bengali Poetry তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পদ্মিনী উপাখ্যান রচিত হয়; তাহাতে "আধুনিক রুচি" মানিয়া চলিবার ইচ্ছা স্বীকার করা হইয়াছে। বিশুদ্ধ ইংরেজী রুচিকে তিনি ব্যঙ্গ করেন নাই, বরং কর্ম্মদেবীতে (১৮৬২) স্কটের Lay of the Last Minstrel-এর ছায়া পড়িয়াছে। শূরসুন্দরীতেও (১৮৬৮) স্কট-বাইরণের প্রভাব দেখা যায়। সাত সর্গে সমাপ্ত কাঞ্চীকাবেরী শুধু 'ঐতিহাসিক কাব্য', কিন্তু কুমারসম্ভব 'মহাকাব্যে'র সাত সর্গ তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট অংশ হইতে বাছাই করিয়া কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ করেন, তাহা পরিশিষ্টে স্থান পাইয়াছে। পুরাণ ত্যাগ করিয়া আধুনিক ইতিহাস হইতে উপাখ্যান কেন তিনি গ্রহণ করিলেন, তাহার কৈফিয়ৎ তিনি পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকাতেই দিয়াছেন।* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ

* "Let me write a few Epiclings and thus acquire a *pucca* Hand"—যোগীন্দ্রনাথ বসু-কৃত জীবনী, ৪র্থ সংস্করণ, ৩৫৪ পৃঃ।

* "পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্ব্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়, বিশেষতঃ ঐ সকল উপাখ্যান মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের তত্তাবৎ শ্রদ্ধার্হ নহে এবং এতদ্দেশীয় জনসমাজে বিদ্যা-বুদ্ধির বান্ধব মহানুভবদিগের মতে তদ্রূপ অদ্ভুত-রসাশ্রিত কাব্যপ্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের অত্যুর্ব্বর চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্ত্তব্য নহে।—স্বদেশীয় লোকের গরিমাপ্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বন পূর্ব্বক মৎ কর্ত্তৃক রচিত হইল।"

তাঁহার মধ্যে যুগপৎ মিলিয়াছে; এক দিকে তিনি লৌকিক সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রাচীন ও মধ্য যুগের ধর্ম্মসাহিত্য নয়, অন্য দিকে আবার তিনি প্রাচীনকালসুলভ অনুপ্রাসের বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন—"দিল্লীর দোর্দ্দণ্ড দর্প দীপ্ত দশ দিশি।" রঙ্গলাল মহাকাব্য রচনা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার কবিতা পাশ্চাত্য আদর্শের অনুসরণ করিয়াছে, এবং তিনি মহাকাব্য-রচনার পথে চলিয়াছেন, ইতিহাসের ঘটনা ও সজ্জনের জীবনকথা আশ্রয় করিয়া বাছিয়া বাছিয়া শব্দপ্রয়োগ করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন, তাঁহার রচনার সংক্ষিপ্ত আকার ভুলিয়া গেলে মহাকবিদের সঙ্গে এক পর্য্যায়ে তাঁহাকে ফেলা যাইত।

মাইকেলের পর হেমচন্দ্র (১৮৩৮-১৯০৩) মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। হেমচন্দ্র ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বৃত্রসংহারের প্রথম ভাগ প্রকাশিত করেন। দুই ভাগে ইহার সর্গ-সংখ্যা চব্বিশ। কাব্যকে কবি যে রূপ দিয়াছেন তাহা পাশ্চাত্য-ঘেঁষা, সন্দেহ নাই। সর্গের সংখ্যা অর্থাৎ কাব্যের দৈর্ঘ্য লইয়া আলোচনা করিলে তাহা বুঝা যাইবে। প্রথম সর্গে বর্ণিত অসুর-মন্ত্রণাসভা মিল্‌টনের অসুর-সভারই অনুরূপ; দ্বাদশে সরস্বতীর আহ্বান,—ইহাতে হেমচন্দ্র মিল্‌টনের ও তদনুগামী মাইকেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন; ত্রয়োদশে, যে সোনার আপেল স্বর্গের দেবীদের মধ্যেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার অবতারণা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া শচীহরণ, ট্যাসোর কাব্যে সফ্রোনিয়াকে অপহরণ করার ভাব লইয়াই লিখিত, এবং হেমচন্দ্রের নিয়তিদেবী গ্রীক "ফেট্"-এর প্রতিচ্ছায়া। বৃত্রসংহারের অন্তর্নিহিত ভাবও অতি গম্ভীর;—বীরবাহু, ছায়াময়ী, আশাকানন,—ইহারা মৌলিক হউক আর অনুবাদ হউক, কাব্য মাত্র, কিন্তু বৃত্রসংহার, মহাকাব্য।

যে বৎসর বৃত্রসংহারের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়, সেই ১৮৭৫ অব্দেই নবীনচন্দ্র (১৮৪৬-১৯০৯) পলাশীর যুদ্ধ রচনা করেন। জুলিয়াস সীজার, রিচার্ড দি থার্ড ও প্যারাডাইস লষ্ট, চাইল্‌ড হ্যারল্ড,—শেক্সপীয়ার, মিল্‌টন, বাইরণ,—ইঁহাদের ছায়া পলাশীর যুদ্ধে রহিয়া গিয়াছে। তাহা ভিন্ন নবীনচন্দ্র রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস এই তিন ভাগে কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বন করিয়া হিন্দু জাতীয়তার যে কাব্যময় ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে রসিক বাঙালী পাঠকের এপিক পাঠ করিবার স্পৃহা চরিতার্থ হইবার কথা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য লীলা যথাক্রমে ইহাদের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যত্রিতয়ের সমাবেশে আর্য্য-অনার্য্য-সঙ্ঘর্ষের এক মহান্ ইতিহাস, ব্রাহ্মণ-দ্রাবিড় সভ্যতার বিরোধের বার্ত্তা নিহিত রহিয়াছে; সে ইতিহাসের গণ্ডী সুবৃহৎ, তাহার দৃষ্টি উদার। ইউরোপীয় মহাকাব্যে যে বিশালতার ভাব রহিয়াছে সেই বিশালতা, কাব্যত্রিতয়ে সম্পূর্ণ এই মহাকাব্যে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইবে। ভারতীয় সভ্যতার এক অত্যুজ্জ্বল যুগের আনন্দ, সঙ্কট ও দুঃখ কবি মনশ্চক্ষে দেখিয়াছিলেন, এবং অতীতের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সে যুগের দার্শনিক চিত্র তাঁহার লেখনীর সাহায্যে পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছিলেন। কবি নিজে পাশ্চাত্য ভাবের কঠোর সমালোচক ছিলেন; সে কঠোরতা এত দূর ছিল যে বঙ্কিমের উপন্যাসে ভারতীয় আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, বঙ্কিম-সাহিত্যে আদর্শ চরিত্রের একান্ত অসদ্ভাব, তাহাও বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি নিজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয় দৃষ্টির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং এইরূপ চেষ্টায় অগ্রণী না হইলেও যথাসাধ্য দুই দিকের আলোকে পথ চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ ভাবে নূতন সাহিত্যের আদি যুগে মহাকবিগণ এপিকের আদর্শে কাব্য রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং যথাসম্ভব সিদ্ধিলাভও করিয়া গিয়াছেন।

৫

মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের পর নানাবিধ-বিহগ-কাকলীমুখর বাংলার বিশাল সাহিত্যোদ্যানে এপিকের কি আর সৃষ্টি হয় নাই? বাংলার কাব্যকুঞ্জে এপিক সম্বন্ধে কি গভীর নীরবতাই বিরাজ করিয়াছে? আজও বাংলার প্রধান গর্ব্ব তাহার সাহিত্য, তাহার প্রধান আশ্রয় কাব্য-সাহিত্য। তবে কেন এই এপিক-ভীতি, এই মহাকাব্যে বিরাগ? যিনি আমাদের কবিসম্রাট তিনি নিজেই যে, এমন কি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দ্দেশ - সত্ত্বেও, জীবনযাত্রার প্রথম মুহূর্ত্তে মহাকাব্যের কথা সাহিত্য-সাধনা হইতে বাদ

দিয়াছেন। ক্ষণিকায় তিনি বলিয়াছেন, মহাকাব্য রচনা করিবার কথা তাঁহার মনে উঠিয়াছিল,—

আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে,—

এমন সময় তাঁহার মানসী সুন্দরী আসিয়া বিরোধের সূচনা করিল, কবি তাঁহার অপূর্ব্ব জীবন্ত ছন্দে সে অন্তর্ব্বিরোধের কথা বলিয়া গিয়াছেন,—

ঠেক্‌ল কখন্ তোমার কাঁকণ
কিঙ্কিণীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে ;
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।
আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে।

মহাকাব্যের বিধিনিয়ম সবই তাঁহার জানা ছিল, তবু প্রেমের কথায় তাঁহার প্রাণ ভরিয়া গেল, যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা লিখিবার আর অবসর রহিল না।

হায় রে কোথা যুদ্ধ কথা
হৈল গত
স্বপ্ন মত !
পুরাণ-চিত্র বীর-চরিত্র
অষ্ট সর্গ
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন-খড়্গ !
রৈল মাত্র দিবা রাত্র
প্রেমের প্রলাপ
দিলেম ফেলে ভাবী-কেলে
কীর্ত্তি-কলাপ !
হায় রে কোথা যুদ্ধ কথা
হৈল গত
স্বপ্ন মত।

উপন্যাস রচনা করিতে গিয়াও রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ঐতিহাসিক ঘটনা আশ্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু 'ভাবী-কেলে কীর্ত্তি-কলাপ' তাঁহাকে বেশী দিন বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না—তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনার স্থূল আবরণ ত্যাগ করিয়া মানব-হৃদয়ের গূঢ়তম রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে থাকিলেন, মানবহৃদয়ের রহস্যলোক তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল,—মহাকাব্য বা এপিক্ তাঁহাকে পাইল না, কবির বাঁশরীতে গীতিকাব্য অপূর্ব্ব শক্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ করিল।

৬

বাংলা-সাহিত্যের এই সকল যশস্বী কবির কথা ছাড়িয়া দিলে আরও বহু কবির কথা আমরা জানিতে পারি ; তাঁহারা প্রধানতঃ মধুসূদন নবীনচন্দ্রের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন, কেহ বা নবীনচন্দ্রের আদর্শে, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে, রচনা করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে Paradise Lost-এরও বাংলায় অনুবাদ হইয়াছিল—'ত্রিদিব-চ্যুতি' মহাকাব্যের পুঁথি-সন্ধান পর্ব্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। গৌরীভার রাখালদাস সেন স্কটের Lay of the Last Minstrel-কে 'শেষবন্দীর গান' নাম দিয়া অনুবাদ করেন ; মূলের সহিত এই অনুবাদ প্রতি চরণে মিলাইয়া দেখিতে পারা যায়।

সুদীর্ঘ সে পথ বাতাস শীতল,
প্রাচীন দুর্ব্বল গায়ক তায় ;
লোল গণ্ডদেশ কুন্তল ধবল,
ছিল ভাগ্যবান প্রকাশ পায়।
একমাত্র বীণা তাঁহার সম্বল,
রয়েছে অনাথ শিশুর করে,
একমাত্র তিনি গায়ক কেবল
জীবিত আছেন গীতের তরে।

কিম্বা অন্যত্র,—

আছে কি মানব কেহ হেন মৃতমতি,
আপনারে নিজে যেই বলেনি কখন,
এই দেশ, এই মোর দেশ, হর্ষমতি,
অন্তরে হৃদয় যার জ্বলেনি তখন,
গৃহমুখে পদ যবে করে সঞ্চালন,
দূরস্থিত বহুদেশ করিয়া ভ্রমণ ?
... ...
দেখিতে যদ্যপি চাও মেলরোজ কেমন,
যাও, দেখ গিয়া এরে কৌমুদী উৎসবে,
কেননা প্রখররশ্মি সূর্য্যের কিরণ,
সেথায় ইহার যত দোষগুণ সবে,
কাল হয়ে শোভে যত খিলান যখন,
তত্রস্থ দুই হয় কিম্বা শাখারা।

ইংরেজী মূলের সহিত বাংলা অনুবাদের চমৎকার মিল আছে ; বাঙালী অনুবাদকের নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও ইংরেজী কাব্যানুরাগের পরিচয় আমরা এখানে পাই, যদিও পাঠককে ইহা বলিয়া দিতে হইবে না যে ইহা মহাকাব্য নহে।

মেঘনাদবধ কাব্যের অনুসরণ অথবা অনুকরণে কয়েকখানি কাব্য রচিত হয়। দুই জন কবি তাহার পরিশিষ্ট পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছেন; এক জনের নাম রাজকৃষ্ণ কুণ্ডার, এবং তাঁহার সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গিয়া কেহ এত দূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে ইঁহার কাব্য বাংলা ভাষায় বিদেশীয় যুদ্ধকৌশল বর্ণনায় মেঘনাদবধকেও পরাস্ত করিয়াছে। প্রথম সর্গ হইতে কয়েক চরণ উদ্ধৃত করিলে পাঠক ইহার ছন্দের ধরণ সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিবেন :—

> পুত্রের সৎকার করি দশানন বলী,
> উতরিল মণিময় ভবনে কাতর,
> শূন্যময় রাজালয় হেরিলা চৌদিকে,
> অধোমুখে ধরাসনে ত্যজি দীর্ঘশ্বাস,
> কপোল বিন্যাস করি করতলে, যেন,
> মূর্ত্তিমান শোক আসি ধরাতলে, ধরি
> রক্ষ রূপ বসিয়াছে স্বর্ণ লঙ্কাধামে।

ইত্যাদি

আর একখানি পরিশিষ্টের নাম 'দশাননবধ মহাকাব্য'। ১৩০০ সনে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় কিন্তু প্রচার হয় না, সুতরাং ১৩১০ সনে সাহিত্যসভা হইতে ইহা যখন পুনরায় প্রকাশিত হয় তখন ইহার কার্য্যতঃ দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছিল। মেঘনাদবধের পরিশিষ্ট হইলেও ইহা অনেকটা প্রাচ্য আদর্শে রচিত। ইহা দশ সর্গে সম্পূর্ণ, এবং যথারীতি মঙ্গলাচরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। কবি ছন্দোনির্ম্মাণে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, নিজে ২১ প্রকার ছন্দ রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার রচিত গীতিচ্ছন্দে (বর্ণনাদিতে এই ছন্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন) প্রথম সর্গের সূচনা করিয়াছেন :—

> চমকি বিশ্ব নববীর্য্য-সূর্য্য-নৃপ রজনি-রাজ্য অবসয়ে,
> উদিত উদয়গিরি-কনক-মঞ্চ'পরি গঞ্জি মহামণিবর্ণে।
> দীপ্তরশ্মিচয় সৈন্যনিচয়ময়, (বিষময়ুগাধি বিনিন্দে)
> জম্ভিল হতকর-পতিত-রজনিকর-যোদ্ধনিকর উডুবৃন্দে

ইত্যাদি

আর একখানি বাংলা মহাকাব্যের নাম উল্লেখযোগ্য; দিনাজপুরবাসী পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি নিবাতকবচবধ নামে সপ্তদশ সর্গে এক মহাকাব্য রচনা করেন, তাহাকে তিনি "An Epic" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। প্রকাশকাল ৩০ আষাঢ়, ১৭৯১ শকাব্দ। রচনা কিন্তু সংস্কৃত মহাকাব্যের লক্ষণানুসারেই হইয়াছে। মেঘনাদবধ প্রথম প্রকাশিত হইলে যখন সংবাদপত্রে তাহার ভূয়সী প্রশংসা হয়, মহেশচন্দ্র তখন তাহার প্রতিবাদ করেন এবং 'সোমপ্রকাশে' লেখেন যে দত্ত মহাশয় নূতন ভাষা 'আবিষ্কৃত করিয়াছেন' এবং মেঘনাদবধ কাব্যে অলঙ্কার-শাস্ত্রমতে দোষও বহুতর। মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচবধ পণ্ডিতমহাশয়-রচিত এই অভিনব মহাকাব্যের মূল; উর্ব্বশীর অভিশাপ যে অঙ্গী বীররসের পরিপন্থী বলিয়া বর্জ্জিত হইল, গ্রন্থকার তাহা জানাইয়াছেন। "নব্যপ্রথা" তাঁহার আদৌ মনঃপূত ছিল না, তাহা উৎসর্গ-পত্রের কথায় বিবৃত করিয়াছেন; "নব্যপ্রথানুসারে গ্রন্থখানি কাহারও নামে উৎসর্গ করা আমার কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না যে, গ্রন্থের কোন্ অংশ আমি উৎসর্গ করিব। গ্রন্থের স্বত্ব তো আমারই থাকিবে।" এই যুক্তি আমাদের নিকট অভিনব ঠেকিবে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার মনোভাবের পরিচয় পাই। কবি সরস্বতীকে বন্দনা করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন এবং অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে সর্গান্তে ছন্দ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কবির ছন্দোনৈপুণ্যের পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত পদ্যাংশ হইতে পাওয়া যাইবে :—

> এ হেন বচন শুনি পুনরপি ফাল্গুনি
> প্রণমি পুরন্দর পদযুগলান্তে,
> বিশ্বাবসু-সুত-সহিত হরিষযুত
> পশিল গিয়া দ্রুত দিব্য নিশান্তে।
> সমরসাজ সব পরিহরি পাণ্ডব
> সৌধতলে বসি কোমল তল্পে।
> শ্রান্তি করিল হত হইয়া অভিরত
> বন্ধুসনে রণ-বিষয়ক জল্পে॥

৭

বিংশ শতাব্দীতেও বাংলা-সাহিত্যে যে উৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচিত হইতে পারে তাহা কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রমাণ করিয়া দিলেন। যোগীন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, জীবনের সায়াহ্নে তিনি পর-পর 'পৃথ্বীরাজ' ও 'শিবাজী' নামে দুইটি মহাকাব্য রচনা করেন। উভয়েরই উদ্দেশ্য, স্বদেশপ্রেমিক হিন্দুকে তাহার সমাজের পতন ও উত্থানের ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া, আশা,—যদি কোন হিন্দু "জাতীয় অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধানে ও প্রতি-

বিধানের উপায় অবলম্বনে” প্রবৃত্ত হন। বিষয়-নির্ব্বাচনে ও কাব্য-রচনায় কবির ঐতিহাসিক জ্ঞান ও জাতীয়তাবোধের পরিচয় এইরূপে পাওয়া যাইতেছে। আর মহাকাব্যের বীজস্বরূপ যে মহাভাব, তাহাও আভাসে আভালে পড়িতে গেলে ক্রমেই পরিস্ফুট হয়। “ভৌতিক শকতি নহে নিয়ন্ত্রী বিশ্বের”—ইহা তিনি অন্তরে বিশ্বাস করেন। পৃথ্বীরাজের প্রস্তাভাসে তিনি মহাশূন্যে কম্পহীন স্পন্দহীন প্রসারিত ব্যোমে সপ্ত মহাঋষির মন্ত্রণাসভার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা কল্পনার পরম উৎকর্ষ সূচিত করিতেছে। কবি সর্গে সর্গে ছন্দের বৈচিত্র্য আনিতে চাহিয়াছেন, এবং ছন্দ যাহাতে ভাবানুগামী হয়, সে-দিকেও তাঁহার দৃষ্টি আছে। সর্ব্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য এই যে, কবি আশাবাদী; মিল্‌টন যেমন মানবজাতির চরম মুক্তির কথা বলিয়াছেন, যোগীন্দ্রনাথও তেমনি আর্য্য হিন্দু জাতির নিকট ভবিষ্যতে মুক্তির কথা বলিয়াছেন,—তবে প্রায়শ্চিত্ত চাই, সে প্রায়শ্চিত্তের জন্য পশ্চিমে মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, ঝটিকা আসিতেছে। ভাষা, ভাব, ঝঙ্কার—সকল বিষয়ে যোগীন্দ্রনাথ মহাকবির আসনে বসিবার যোগ্য, এবং তাঁহার জাতীয়তা শুধু ক্ষণিকের পুলক নহে, তাহা দীর্ঘদিন অনুভবের ফলে ভাবঘন হইয়া অন্তরে বিরাজ করিতেছে,—

> ত্রিংশ বর্ষকাল, দেবি!
> নামচিত্র তব
> রাখিয়াছি চোকে চোকে;
> পূজেছি গোপনে;
> জানে না অপর কেহ,
> কিন্তু জানো তুমি।

শিবাজী রচিত হয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে। ইহা কুড়ি সর্গে বিভক্ত; প্রস্তাভাসে কবি সমস্ত কাব্যটির সুর বাঁধিয়া দিয়াছেন,—সহ্যাদ্রিশিখরে গভীর রজনীতে পুরাণমতে সপ্ত চিরজীবীর অন্যতম ভার্গব, গৌরীশঙ্করের পূজা করিতেছেন, হিন্দুর লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে চাহিতেছেন, কিন্তু অশরীরী বাণী নৈতিক বিধানের প্রতি অঙ্গুলি-সঙ্কেতে হিন্দুর পুনরুত্থানের কথা সঙ্কেতে জানাইতেছেন,—আর নূতন যুগের বাণী ফুটিয়াছে বৃদ্ধ তেজস্বী ব্রাহ্মণের মুখে,—

> স্বদেশ-স্বজাতি-রক্ষা সর্ব্বধর্ম্মোত্তম।

৮

যোগীন্দ্রনাথের মহাকাব্য বর্ত্তমান শতাব্দীর অমূল্য সম্পদ হইলেও পাঠকসমাজে ইহার তেমন আদর সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না কেন, তাহার কারণ চিন্তা করিলে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কথা মনে হয়,—“মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী এ-কালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে।” আমাদের সমাজে পিরামিডের দিন চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই মুখে তাহার প্রশংসা করি, কিন্তু অন্তরে তাহার সাড়া পাই না। এখানে মহাকাব্যের মধ্যে অবশ্য রামায়ণ মহাভারত হোমরকেই ধরা হইয়াছে। আমরা যে-সকল মহাকাব্যের প্রধানতঃ আলোচনা করিলাম, তাহাদের বাদ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধেও এই মন্তব্য সমান ভাবে প্রযোজ্য। ব্যক্তিত্বকে নানা প্রকারে ফুটাইয়া তোলা, আর সমস্ত সমাজের মুখপাত্র হইয়া কবি হইয়া তাহার আদর্শ স্পষ্ট ও সর্ব্বজনগ্রাহ্য করিয়া ধরা,—এই দুইয়ে প্রভেদ রহিয়াছে, এবং এই প্রভেদের জন্যই আমরা বর্ত্তমান যুগে মহাকাব্যের প্রশংসা করি, কিন্তু আদর করি না।

অবোধ

শ্রীশশধর রায়, এম-এ, বি-এল

সকলেই সুবোধ নহে, মানবসমাজে অবোধ অনেক আছে। অবোধগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:— প্রথম শ্রেণীর অবোধগণের প্রকৃত বয়স যাহাই হউক, তাহারা বুদ্ধিতে, বিশেষতঃ আত্মরক্ষা করিবার শক্তিতে, দুই বৎসর অথবা তাহার কম বয়সের শিশুর ন্যায়। ইহাদিগকে প্রায় জড় বলিলেই হয়। আমেরিকায় এই প্রথম শ্রেণীর অবোধগণকে ঈডিয়ট (Idiot) নাম দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধগণ সাত বৎসর অথবা তাহার কম বয়সের বালকের ন্যায়। ইহাদিগকে ইম্বেসিল (Imbecile) নাম দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর অবোধগণ বার বৎসর অথবা তাহার কম বয়সের বালকের ন্যায়। ইহাদিগের নাম দেওয়া হইয়াছে মোরন (Moron)। অনেক ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর অবোধগণের কথা ভাল করিয়া ফুটে না। ইহারা সামান্য কারণে রাগে, কাঁদে এবং প্রায়শঃ আহার বেশী করে। ইহাদিগের মলমূত্র ত্যাগের স্থান অস্থান বিবেচনা নাই, লজ্জার ভাব হয় নাই, ভয় কিছু হইয়াছে, বিশেষ নহে। ইহাদিগকে কিছুই শিক্ষা দেওয়া যায় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধগণকে হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া যায়, যদিও অত্যন্ত কঠিন। যে-সকল হাতের কাজে বুদ্ধি খাটাইতে হয় না, শুধু নকল করিলেই চলে সেই সকল হাতের কাজ প্রায়শঃ শিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে অনেক সময় লাগে। ইহাদিগের মতের বিরুদ্ধে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। ইহারা সকল কথাই বলিতে পারে এবং ইহাদিগকে একটু পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর অবোধগণকে মোটামুটি ভালই লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দেওয়া যায়, এমন-কি ইহাদিগের দ্বারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধগণকে শিক্ষা দেওয়ার কার্য্য ভালই চলিতে পারে, কারণ ইহাদিগের ধৈর্য্য খুব বেশী।

তিন শ্রেণীর অবোধগণই মনে শিশুর ন্যায়। দেহে ও বয়সে যত বড়ই হউক না কেন ইহাদিগের মন বয়সের অনুরূপ বাড়ে না। দেহ বাড়ে, মন বাড়ে না। সচরাচর যে-সকল খর্ব্বাকার ব্যক্তিগণকে বামন বলা হয়, তাহারা দেহে বাড়ে না, কিন্তু মনে বাড়ে। তাহাদিগের মন অনেক ক্ষেত্রে বয়সের অনুরূপই হইয়া থাকে।

গত জার্ম্মান-যুদ্ধে আমেরিকা যখন যোগ দিয়াছিল তখন সৈনিক-বিভাগে ভর্ত্তি করিয়া লইবার সময় যে-সকল ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল তাহাতে জানা গিয়াছিল যে, সতের লক্ষ পরীক্ষার্থীর মধ্যে শতকরা পঁয়তাল্লিশটি তৃতীয় শ্রেণীর অবোধ ছিল। অর্থাৎ সতের লক্ষ লোকের মধ্যে ৭,৬৫,০০০ হাজার লোক বুদ্ধিতে এবং আত্মরক্ষা-শক্তিতে বার বৎসর বয়স্ক বালক অপেক্ষা অধিক উন্নত ছিল না। এই সকল ব্যক্তি কথাবার্ত্তায় আচার-ব্যবহারে সাধারণ লোকের মতই ছিল; তাহারা অবোধ বলিয়া সাধারণে পরিচিত ছিল না। দশ জনের মতই আমেরিকার যখন এই প্রকার অবস্থা তখন এতদ্দেশে উহা অপেক্ষাও অনুন্নত অবস্থা মনে করা যাইতে পারে। আমরা যে অর্দ্ধেকের অধিক লোক দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালকের প্রকৃতির ন্যায় তাহা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, কোন কোন কবি ও উপন্যাস-লেখকগণ, কোন কোন নাট্যকার ও সিনেমা ও টকী প্রদর্শকগণ উত্তমরূপেই জানেন। কবি কৃত্তিবাস বানর ও তাহার লেজ বিষয়ে নানারূপ হাস্যকর ভঙ্গী লিখিয়া লোক-চরিত্রের অভিজ্ঞতা এত দূর দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থ আজি আমাদের ঘরে ঘরে। কাশীরাম দাসের মহাভারত অপেক্ষা কৃত্তিবাসী রামায়ণের কাটতি অনেক অধিক। বিজ্ঞাপনদাতাগণ প্রায় সকলেই সংবাদ-পত্রে অথবা পথে পথে যেরূপ ঢং ও ভঙ্গী করিয়া বিজ্ঞাপন দেয় তাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহারাও আমাদিগকে বার বৎসর বয়সের অধিক বয়স্ক মনে করেন না।

মোটামুটি সঙ্গত-অসঙ্গত কার্য্যের জ্ঞান পিতা মাতা ভ্রাতা অথবা অন্যের সহিত আচার-ব্যবহারে সুনীতি, দুর্নীতি, ধর্ম্মাধর্ম্ম বার বৎসর বয়স্ক বালক একরূপ

শিখিয়া উঠে। সে যে-পরিবারে ও যে-সমাজে প্রতিপালিত হয় তদনুরূপ হইয়াই গড়িয়া উঠে। ঐ বয়সের পরে সাধারণ বালকগণ অধিক কর্ম্মকুশলতা শিক্ষা করিয়া থাকে, সত্য। কিন্তু বার-তের বৎসরের মধ্যেই বয়োবৃদ্ধগণের ভাব ও কর্ম্ম অনুকরণ করতঃ বালকগণ অনেক শিক্ষা করে। তৎপরে উল্লিখিত বিষয়ে তাহাদের আর অধিক শিক্ষা করিবার থাকে না।* এ-কথা শুনিতে কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কিন্তু কথা সত্য।

আমরা দেখিলাম মানবসমাজের কমবেশী প্রায় অর্দ্ধাংশ ব্যক্তি বালক-প্রকৃতি, বৎসর গণিলে তাঁহাদিগের বয়স যাহাই হউক। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ অনেকেই ঐরূপ। তাঁহারা কবি হইলে এবং কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক হইলেও বালকের ন্যায়ই কিছু অস্থিরমতি এবং বাল্য-সংস্কারাবদ্ধ হইয়া থাকেন।

এইরূপ হইবার কারণ কি? পূর্ব্বে ইহার অনেক কারণ অনুমান করা হইত, কিন্তু এক্ষণে প্রধান প্রধান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে, অবোধগণ দুর্ব্বলমনা; তাহাদিগের মস্তিষ্কের কোন কোন কেন্দ্র দুর্ব্বল অর্থাৎ বয়সের অনুরূপ পুষ্টিপ্রাপ্ত হয় না। এইরূপ হইবার প্রধান কারণ বংশানুক্রম। দুর্ব্বলমনা অবোধগণের দুই-তৃতীয়াংশ বংশানুক্রমের ফল। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সম্ভবতঃ শিশুকালে কোন কঠিন পীড়ায় পীড়িত হইয়াছিল অথবা কোন দৈবদুর্ঘটনায় [অর্থাৎ হঠাৎ উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যাওয়া কিংবা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণে] এইরূপ হইয়া থাকিবে। এইরূপ অজ্ঞাত কারণমধ্যে পিতামাতার অতিরিক্ত মদ্যপান অথবা উপদংশ পীড়ায় পীড়িত হওয়াকে ধরা যাইতে পারে না। এই দুইটি এখন আর অপত্যের অবোধ অবস্থার কারণ বলিয়া গণ্য হয় না।

মানব বংশানুক্রম ও বেষ্টনীর ফল। ডারুইনের সময় যাহাই বিবেচিত হইয়া থাকুক, পণ্ডিতবর ভাইজম্যানের (Wiseman-এর) সময় হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে যে, বেষ্টনীর ফল বংশানুগত হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে জাতকের দেহে ও মনে বাহিরের ক্রিয়ার ফলে যত প্রতিক্রিয়াই হয় তাহাকে বেষ্টনীর ফল বলা যায়। বেষ্টনী বলিতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝা যায়। জাতক জীবিতকালমধ্যে দেহে ও মনে যে প্রতিক্রিয়া প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যাহা লাভ করে বা অর্জ্জন করে, তাহা বংশানুগত হয় না। আমেরিকার অল্পসংখ্যক জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ব্যতীত শীর্ষস্থানীয় জীবতত্ত্ববিদ্গণ এই মত এক্ষণে অঙ্গীকার করিতেছেন। স্বোপার্জ্জিত লক্ষণ-সকল বংশানুগত নহে, ইহাই এ-মতের স্থূল কথা।

বংশানুক্রম পুংকীট* ও স্ত্রী-ডিম্বের † সংমিশ্রণের ফল। জরায়ু-মধ্যে পুংকীট ও স্ত্রী-ডিম্বের মিশ্রণ-সময়ে ভ্রূণের দেহে ও মনে যে উপকরণ সঞ্চিত হইল জাতক সমস্ত আয়ুষ্কালমধ্যে তদতিরিক্ত এমন কিছুই পাইতে পারে না যাহা তাহার পুত্র-পৌত্রাদিতে সংক্রমিত হইবে, এবং ঐ উপকরণ হইতে কিছু বাদ দেওয়াও অসম্ভব। ভ্রূণ-তত্ত্বের আলোচনায় পণ্ডিতগণ এ-কথা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পুংকীট ও স্ত্রী-ডিম্বের কেন্দ্রবিন্দু‡ মধ্যে যে-সকল বক্র আঁশ§ থাকে তন্মধ্যস্থ বিন্দু বিন্দু পদার্থই বংশানুক্রমের নিয়ামক। কিন্তু এ-সকল কথা আর বিশেষ ভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই।

মস্তিষ্ক একটি যন্ত্র নহে। বহু যন্ত্রের সম্মিলনে মস্তিষ্ক গঠিত হয়। মস্তিষ্কের যে অংশ যে ক্রিয়া করে সেই অংশে ঐ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবার উপযোগী কেন্দ্র আছে। যথা— দৃষ্টিকেন্দ্র, শ্রবণকেন্দ্র, বুদ্ধিকেন্দ্র** প্রভৃতি। এই কেন্দ্রগুলি মস্তিষ্কের সর্ব্বোচ্চ ধূসরবর্ণ স্তরে নিহিত থাকে। কোন একটি কেন্দ্রের ক্রিয়া নষ্ট অথবা মন্দ হইয়া গেলেও অন্য কেন্দ্রের ক্রিয়া উত্তম থাকিতে পারে। মস্তিষ্ক পদার্থই জীবাত্মার বাহ্য বিকাশের যন্ত্র। সুতরাং মস্তিষ্কের যে কেন্দ্র নষ্ট অথবা মন্দ হইয়া যায়, সেই কেন্দ্রের উপযোগী কর্ম্ম সম্বন্ধেই

---

* We have had time before 13 to take over the standardized sentiments of our elders, to learn all that they know, to accept their views of religion, politics, manners, general proprieties and respectabilities. The common run of mankind can, however, be taught tricks as time goes on and acquire special expertness. But a great part of our childish conceptions retain a permanent hold on us.—*Encyl. Brit.* 14 Edition. Vol. 5, article "Civilization."

* Spermatozoon. † Ovum
‡ Nucleus § Chromosome.
** Glan-kinaesthetic centre.

ব্যক্তি অবোধের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে পারে, অন্য কেন্দ্রের কর্ম্ম সম্বন্ধে নহে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে প্রথম শ্রেণীর অবোধগণের প্রায় সকল কেন্দ্রেরই ক্রিয়া অতীব মন্দ হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও কর্ম্মেন্দ্রিয় সবল থাকিতে পারে, যদিও জ্ঞানেন্দ্রিয় জড়বৎ হইয়া যায়। মস্তিষ্কের প্রত্যেক কেন্দ্রের সহিত তদুপযোগী স্নায়ু-তন্তুর যোগে কতিপয় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পেশীমণ্ডল সংযুক্ত থাকে এবং তাহাতেই স্নায়ুর ক্রিয়ানুসারে পেশী ক্রিয়াবান হয়। এই হেতু পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় স্ব-স্ব উপযুক্ত স্নায়ু-তন্তুর অধীন। সুতরাং স্নায়ু-তন্তুর জড়ত্বহেতু পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ই জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রথম শ্রেণীর অবোধগণের এই ভাব।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধগণের মস্তিষ্ক-কেন্দ্রসকল এত দূর নিষ্ক্রিয় নহে। তাহাদিগের মস্তিষ্ক-কেন্দ্রস্থ কতিপয় স্নায়ু কর্ম্মঠ। তৃতীয় শ্রেণীর অবোধ আমরা প্রায় সকলেই। আমাদিগের সকল মস্তিষ্ক-কেন্দ্রই কর্ম্মঠ। কিন্তু বার-তের বৎসর বয়সের মধ্যেই উহাদিগের প্রতিক্রিয়া জ্ঞান সম্বন্ধে প্রায় শেষ হইয়া আসে; যদিও কর্ম্মকুশলতা সম্বন্ধে তাহাদিগের ক্রিয়া গড়ে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসর পর্য্যন্ত সবল থাকে। তৎপর অনেক ক্ষেত্রেই দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়ে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধগণের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে লিখিতে বা পড়িতে শিখিবার যোগ্যতা নাই; কিন্তু গত এক শত বৎসরের মধ্যে কোন্ মাসের কোন্ তারিখে কি বার ছিল তাহা মুখে মুখে শুদ্ধরূপে বলিয়া দিতে পারে। কেহ-বা সহস্র বা অযুত সংখ্যক রাশিকে ঐরূপ রাশি দিয়া গুণন করিলে গুণফল কি হইবে তাহা অতি অল্প সময়মধ্যে মুখে মুখে বলিয়া দিতে পারে; অন্যে কাগজ-কলম লইয়াও তত অল্প সময়ে বলিতে পারে না।*

প্রথম শ্রেণীর অবোধকে আমরা মানুষের মধ্যে গণ্য করিতে পারি না। দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধকে আমরা অত্যন্ত বেকুব বলি। তৃতীয় শ্রেণীর অবোধদিগকে প্রথমে চেনা যায় না; কারণ তাহারা দশ জনের মতই। কিছু দিন দেখিবার পর তাহাদিগকে বোকা বলিয়া চেনা যায়। তিন শ্রেণীর অবোধই প্রধানতঃ বংশানুক্রমের ফল। এ-কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। যদি বর এবং কন্যা কিংবা বর এবং কন্যার বংশ অযোগ্য অথবা অতি-অযোগ্য হয় তবে তাহাদিগের অপত্য কম-বেশী অবোধ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যে-বংশে কৃতী ব্যক্তি জন্মেই নাই, যে-বংশের ব্যক্তিকে স্বগ্রামের লোকেরাও যোগ্য বলিয়া মনে করে না, যে-বংশের লোক পুঁথিগত শিক্ষা অথবা কোন প্রকার কর্ম্মশিক্ষায় কিংবা কর্ম্মকুশলতায় স্বগ্রামেও কখনও প্রশংসা লাভ করে নাই তেমন বংশের বর অথবা কন্যা হইতে পর বংশ গঠিত করিতে গেলে সেই পর বংশে কেহ ন্যূনাধিক অবোধ হইবেই। অতি-যোগ্য ও কৃতী বংশের সহিত উপরে লিখিত অযোগ্য বংশের উদ্বাহিক সংমিশ্রণে অপত্য জাত হইলেও এ-ফল ফলিতে প্রায় সর্ব্বদাই দেখা যায়। আর যদি দুই বংশই উপরের লিখিত অর্থে অযোগ্য হয়, তবে ঐ দুই বংশজাত ব্যক্তির যৌন-সংমিশ্রণে প্রথম শ্রেণীর অবোধ জন্মিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। আমি ইহার কতিপয় দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। কিন্তু নাম উল্লেখ করা সঙ্গত হইবে না। আমি একটি ক্ষেত্রে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টান্তও দেখিয়াছি। পিতা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কৃতী, মাতাও বুদ্ধিমতী, কিন্তু ভয়ানক নিষ্ঠুরা। ইহাদিগের অপত্য সকলেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও কৃতী; কিন্তু একটি পুত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধ অর্থাৎ অত্যন্ত বেকুব হইয়াছিল।

যাহা হউক, ব্যক্তির উন্নতি করিতে গেলে, সুতরাং সমাজকে উন্নত করিতে হইলে যোগ্য বংশ হইতেই বরকন্যা বাছিয়া লইয়া বিবাহ দিতে হয়। নচেৎ অন্য পন্থা নাই। আমাদিগের ন্যায় যে-সমাজে বিবাহক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং যোগ্য বংশের বরকন্যা বাছিয়া লইবার অবসর ও সুবিধা নাই, সে-সমাজকে উন্নত করিবারও পন্থা নাই। যত শীঘ্র বিবাহক্ষেত্রকে প্রশস্ত করা যায় ততই আমাদিগের মঙ্গল।*

* Thus an imbecile who had not learned to read or write was able to give accurately the day of the week for any date in the past century. Another was able to multiply mentally four or six place numbers in less time than most normal persons could do with pencil and paper. *Ency. Brit.* 14th Edition, Vol. 21, 499.

* এই প্রবন্ধে গ্রন্থিরস (Endocrine Secretion) মাত্রাভেদে যে-ভাবে ব্যক্তির বুদ্ধির হ্রাস-বৃদ্ধি করে তাহার উল্লেখ করিলাম না। পূর্ব্বে পত্রান্তরে তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম।

স্রোত-বদল

শ্রীপারুল দেবী

অন্নদা লেখে ভাল। ছোট গল্প লেখায় তার হাত বেশ পাকা। সেই আই-এ ক্লাস থেকেই সে ছোট গল্প লিখে আসচে, এখন চাকরিতে ঢুকেও ছোট গল্প লেখায় তার লেখনীর মুক্ত ধারা বাধা পায় নি। 'বিজলী' মাসিক-পত্রিকার সম্পাদক মাসের প্রথম সপ্তাহ যেতে-না-যেতেই অন্নদাকে তাগাদা পাঠান লেখা পাঠাবার জন্য। আগে আগে চার পয়সার খামে ক'রে তাগাদার পত্র আসত, সম্প্রতি খামগুলির পাঁচ পয়সা দাম হওয়াতে পোষ্টকার্ডই আসে। অন্য এক মাসিক-পত্রে 'বিজলীর' সমালোচনা বাহির হইয়াছিল,—"এ-মাসে বিজলীতে যে-সকল গল্প কবিতা প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমালোচনা করিতে গেলে কেবল নিন্দাই করিতে হয়, অতএব সে অপ্রিয় কার্য্য না করাই ভাল। ভাগ্যে অন্নদা বাবুর 'চোখের জল' গল্পটি ছিল, তাই বিজলী এবারকার মত তরিয়া গিয়াছে। সম্পাদক মহাশয় দেখিতেছি পত্রিকার নামটি সার্থক দিয়াছিলেন। ঘন অন্ধকারের মধ্যে পাঠক যখন দিশাহারা হইয়া যায়, তখন 'চোখের জল' গল্পটির পাতারূপ আকাশে একবার ক্ষণিকের জন্য বিজলী-প্রভা চমকাইতে দেখিয়া চোখ একটু আলো দেখিয়া বাঁচে—অবশ্য তাহার পরেই আবার নিবিড় অন্ধকার।"

অন্নদা সমালোচনা পড়ে বোনকে ডেকে শোনায়; বললে, "দেখচিস্, কি লিখচে?" বোনটি হাসিমুখে বললে, "সত্যি দাদা, তোমার 'চোখের জল' গল্পটা পড়ে চোখের জল না-ফেলে থাকা যায় না, এত ভাল হয়েচে। তা আর ভাল বলবে না?"

অন্নদার লেখনী 'চোখের জল' থেকে 'বিষাদের রাত্রি'—'বিষাদের রাত্রি' থেকে 'মৃত্যুপারে'তে অগ্রসর হয়ে চলতে থাকে। বিজলীর সম্পাদক মহাশয় লেখককে উৎসাহিত ক'রে চিঠি লেখেন, পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করেন না। মাঝে মাঝে করুণ-হৃদয়া পাঠিকা-সম্প্রদায়ের নিকট হ'তেও অভিনন্দন-পত্র আসে—"আপনার বিষাদপূর্ণ লেখা পড়ে মনে হয়, না-জানি আপনার গভীর হৃদয়ের মাঝে কত ব্যথাই লুকান আছে। আপনার সেই গভীর দুঃখ আপনার লেখনীর ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। এই অপরিচিতার সহানুভূতি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন।" অন্নদা উত্তরে লেখে, "আপনার করুণাপূর্ণ সহৃদয়তায় আমি ধন্য হইয়াছি। এ পৃথিবীর মধ্যে দুঃখই কেবল চিরস্থায়ী, নিজের জীবনে আমি তাহা অত্যন্ত সত্য বলিয়া জানিয়াছি। সুখ, হাসি, আনন্দ সকলই দু-দিনের—কিন্তু অনাদি কাল হইতে যে মৃত্যুশোক ও বিচ্ছেদ-ব্যথার চোখের জলে এ বিরহী পৃথিবী ভাসিয়া গেল, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার সেই প্রাণের ব্যথাই যদি নিজের মর্ম্ম দিয়া অনুভব না-করিতে পারিলাম, তাহা হইলে বৃথাই জন্মগ্রণ করিয়াছি—" ইত্যাদি ইত্যাদি। পৃথিবীর সকল দুঃখ ও শোকের কাহিনী অপরকে শোনাবার ভার ঘাড়ে নিয়ে অন্নদা একটা মহা আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

সে-বারে অন্নদার জ্বর হয়েছিল, সময়-মত গল্প পাঠান হয় নি। সম্পাদকের তাগাদার পর তাগাদার পত্র বোনটি দাদাকে তার জ্বরের মধ্যেই পড়ে শোনায়। মা বলতেন, "হাঁ রে, কিসের এত চিঠি? ছেলেটা ক-দিন জ্বরে বেহোঁস, এখন কেন ওসব দিস্ ওকে?" বোনটি মাকে বুঝিয়ে বলত, "দাদার লেখা না হ'লে কাগজখানা যে চলে না মা। দেশের এই অবস্থায় একখানা মাসিক-পত্র চালান বড় সহজ কথা নয়ত—এই সেদিন কাগজে দেখলাম 'বাণী' উঠে গেল; আবার কাল শুনি 'সেবা' ব'লে মাসিক-পত্রটাও না-কি উঠে যাচ্ছে। 'বিজলী' কাগজখানা এই দাদার লেখার জন্যেই টিকে আছে—তাজেই দাদাকে না-জানিয়ে কি করি? পরের দিকেও ত তাকাতে হয়।"

মা অতশত বোঝেন না—রেগে বলেন, "রেখে দে

বাছা তোদের বিজলী-ফিজলী। মাথার কষ্টে ছেলেটা খুন হচ্ছে, তার উপর দিনরাত ঐ লেখা আর লেখা—জ্বর সারবে কি ক'রে? কাগজ উঠে গেল ত বয়েই গেল। কাগজ নিয়ে ত বাড়িতে ধ্বজা দেব না।"

অন্নদা বললে, "সুনি, তুই ঐ চেয়ারটা খাটের কাছে টেনে বোস, দরজাটা ভেজিয়ে দে। লিখে নে, আমি বলি। মাকে ভাই বলিস নে কিছু, বকবেন। দেখচিসই ত একটা কাগজের ভার আমার হাতে, কি ক'রে চুপ ক'রে থাকি বল? মা ত বোঝেন না এ-সব।"

'দুঃখে সান্ত্বনা' নাম দিয়ে গল্প সুরু হয়ে গেল। গল্পের শেষের দিকটা লিখতে লিখতে সুনীতির চোখের পাতা ভিজে আসে। সে চোখ মুছে হেসে বললে, "দাদা তুমি বড় দুঃখের কথা লিখতে ভালবাস কিন্তু। একটাও গল্প কি বাপু সুখে-স্বচ্ছন্দে শেষ করতে নেই?"

অন্নদা বললে, "জানিস্ নে, Sweetest songs are those that tell of saddest thoughts?"

জ্বর সারল। গল্প-লেখা অবাধেই চলছিল; ভাই লিখ্‌ত বোনকে পড়ে শোনাত, বোন চোখের জল আঁচলে মুছে হেসে বলত, 'কি সুন্দর লিখেচ দাদা।' দাদা হাসিমুখে গল্পটা বিজলীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিত। ঠিক সময়ে গল্পটি ছাপার অক্ষরে কাগজে বাহির হ'ত—নানা দিক থেকে নানা রকম চিঠিপত্র আসত—কোনও গোল ছিল না। গোল বাধালে বৌ এসে।

অন্নদার বিয়ে অনেক দিন হয়েচে। কিন্তু এত দিন তার বিরহের যুগ চলছিল। গল্পের বিষাদের যুগের সমস্তটা কালই বৌটি ছিল বাপের বাড়ি। ছোট মেয়ে, অন্নদার বাপ বললেন, "আহা থাক্ কিছু দিন বাপ-মার কাছে। এ-ঘর তো চিরদিনই করবে—তাড়া কি?" কিন্তু এবার বৌ এল। এখনও ছোটই আছে। নাম লীলা। নূতন শ্বশুরবাড়ি এসে মাঝে মাঝে কাঁদে, জিজ্ঞাসা করলে গাল ফুলিয়ে বলে, "মার জন্য আর টুলুর জন্যে মন কেমন করচে।"

বৌ বাপের বাড়ির জন্য কান্নাকাটি করচে শুনে অন্নদার মনটা খুব প্রসন্ন হয়ে উঠল না সত্য, কিন্তু সে ভাবুক মানুষ, মনকে বোঝালে—তা হোক এই ত ভাল। যে-মেয়ে আজন্মের বাস, আজন্ম-পরিচিত মা-বাপ ভাই-বোনকে ছেড়ে এসে দু-দিনে তাদের ভুলে যায়, নূতন গৃহকে আপনার ক'রে মনের মধ্যে নিতে যাদের দু-দিনও লাগে না, তাদের মনের গভীরতা কোথায়? দু-দিনে যারা বাপের বাড়ির স্নেহ ভুলতে পারে, আবার দু-দিনে যে তারা শ্বশুরবাড়ির মায়াও ভুলবে এ আর আশ্চর্য্য কি? তার চেয়ে এই ভাল। লীলার হৃদয় আছে, হৃদয়ে করুণা আছে, করুণার গভীরতা আছে। হাল্‌কা মন অন্নদা ভালবাসে না।

সুনীতিকে ডেকে পুরানো 'বিজলী'র তাড়া বাহির ক'রে তার হাতে দিয়ে অন্নদা বললে, "সুনি, এগুলো দিস তোর বৌদিকে পড়তে। তার মনে খুব মায়া—আমার লেখাগুলো বেছে দিস, পড়ে তার ভাল লাগবে নিশ্চয়।"

বিকালে আপিস থেকে এসে জলখাবার খেয়ে এ-মাসের বিজলীর জন্য লেখা সদ্য শেষ করা গল্পটায় আর একবার অন্নদা চোখ বুলোচ্চে, এমন সময় সুনীতি ঘরে ঢুকে বললে, "দাদা, বৌদি তোমার 'চোখের জল' আর 'মৃত্যুপারে' গল্প দুটো পড়ে এমন বান্-ডাকানো কান্না কাঁদছিল যে কি বলব। বাবা কান্না শুনে এ-ঘরে এসে রেগে কত বকলেন তোমাকে—তুমি ত ছিলে না—শোন নি। সব বিজলীগুলো নিয়ে গিয়ে কোথায় চাবি বন্ধ ক'রে রেখে দিয়েচেন নিজের ঘরে। বৌদিকে সার্কাস দেখাতে নিয়ে গেচেন এখন। এমন মেয়ে বাবা, তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।"

অন্নদার মনটা ধড়াস ক'রে উঠল। শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করলে, "কি বলছিলেন রে বাবা?" সুনীতি বললে, "বললেন, দু-বছর ধরে আপিসে প্রোমোশন বন্ধ, সেদিকে ছেলের খেয়াল নেই, এদিকে এই সব ছাই-পাঁশ বস্তু থিয়েটারী গল্প লেখা হচ্ছে। ভারী লিখিয়ে হয়ে উঠেচে দেখতে পাচ্চি। তা যা লেখে নিজেই যেন পড়ে ব'সে। মেয়েটা একেই কেঁদে সারা, কোথায় ছেলেমানুষকে একটু ভুলিয়ে রাখবে তা না এই-সব চোখের জল রে মৃত্যুপারে রে এনে ঘাড়ে এসে চাপাল!—এই সব কত কি। বৌদি বেচারী অতশত বোঝে না দাদা, তুমি কেন

ওকে ও-সব পড়তে দিতে গেলে? সাহিত্য কি সবাই বোঝে?"

হৃদয়ে এত বেশী করুণা, করুণার আবার এত বেশী রকম গভীরতা অন্নদার ভাল লাগল কি-না ঠিক বলা যায় না। রাত্রে নূতন লেখা 'মনের ব্যথা' গল্পটা হাতে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল; লীলাকে নিজে পড়ে শুনিয়ে তাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবে যে ব্যথার 'টাচ্' না থাকলে গল্প কখনও ভাল হয় না।

লীলা ঘরে এলে অন্নদা তাকে যত্ন ক'রে খাটে বসিয়ে নিজে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। পকেট থেকে লেখা কাগজগুলো বার ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, লীলা একটা গল্প শুনবে? লীলা ঘাড় নেড়ে জানাল শুনবে।

অন্নদা বললে, "কিন্তু তুমি আজ শুনলাম বিজলীতে লেখা আমার গল্প প'ড়ে নাকি বড় কেঁদেছ? আবার এখন কাঁদবে না ত?"

লীলা কথার উত্তর দেওয়া বোধ করি আবশ্যক বিবেচনা করলে না। কিন্তু অন্নদা থামে না, কেবলই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "কি লীলা কাঁদবে না ত? বল না, কাঁদবে না ত?"

শেষটা লীলা উত্তর দিলে, "দুঃখের কথা শুনলেই আমার বড় কান্না পায় যে। আমি কি করব, চোখের জল সাম্‌লাতে পারি না।"

অন্নদা সান্ত্বনার সুরে বললে, "দুঃখের কথায় কান্না আসে সে ত ভাল কথাই লীলা। যারা ভাল লেখক তারা সকলেই দুঃখের কথা লেখে, আর যারা ভাল পাঠক, তারা সকলেই দুঃখের কথা প'ড়ে কাঁদে, কিন্তু তাই ব'লে কি এমন কান্না কাঁদতে হয় যে ঘরে লোক জড় হয়ে যায়? ছিঃ!" লীলা চুপ করেই রইল। ভাব দেখে মনে হ'ল যে বুঝি আবার কাঁদবার কথাই ভাবচে।

অন্নদা বুঝিয়ে বললে, "আমি এই রকম করুণ গল্প ভাল লিখতে পারি ব'লে সব কাগজে দেখ আমার লেখার কত প্রশংসা করে। হাসিকৌতুকের লেখা হ'ল থেলো লেখা—যাদের মন গভীর, তারা কখনও ও-রকম হালকা লেখা লিখে আনন্দ পায় না। তুমি কি চাও না যে আমি এক জন ভাল লেখক ব'লে লোকসমাজে আদর পাই?"

লীলা ঘাড়টি নেড়ে বললে, "হ্যাঁ।"

উৎসাহিত হয়ে অন্নদা বললে, "আচ্ছা, তাহ'লে এই গল্পটা প'ড়ে তোমাকে শোনাই, কেমন? দেখবে একটি মেয়ে মনের ব্যথা মনে রেখে রেখে শেষে আর সহ্য করতে না পেরে কি রকম ক'রে আত্মহত্যা ক'রে দুঃখের হাত এড়াল। পরের দুঃখ নিজের হৃদয় দিয়ে বুঝে তবে এ-সব লেখা লিখতে হয় লীলা, এ বড় শক্ত জিনিষ। তুমি বড় হ'লে বুঝবে সব। এখন গল্পটা পড়ি, শোন। মন দিয়ে মেয়েটির মনের ব্যথা বুঝতে চেষ্টা কর, কিন্তু কেঁদো না, কেমন?"

লীলার কাছ থেকে সাড়া পাওয়া গেল না।

অন্নদা পড়তে লাগল—মলিনা গরিবের মেয়ে; উদয়াস্ত সংসারের খাটুনি খাটে। মা-বাপ পয়সার অভাবে মেয়ের বিবাহ দিতে পারে না। সেজন্য তারা মেয়েকেই দোষী মনে করে, নানা কটু কথা শোনায়। মেয়েটি ভাল খেতে পায় না, পরতে পায় না, একটু ভাল কথাও কারুর কাছে শুনতে পায় না। শেষে একটি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক হ'ল। মলিনা অনেক আশা করছিল এইবার তার বাপ-মায়ের ভার কমবে, তার নিজেরও হয়ত দুঃখ ঘুচবে। সমস্ত দিনের অবিশ্রান্ত খাটুনির মধ্যে, কষ্টের মধ্যে, অভাবের মধ্যে সে ঐ আশাটুকু মনে আঁকড়ে ধরে দিন কাটাত। এমন সময়ে হঠাৎ সে খবর পেল যে, সেই ছেলেটির তারই এক বন্ধুর সঙ্গে বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেচে। সে মেয়েটি সকল দিক দিয়েই মলিনার চেয়ে ভাল পাত্রী, তাই ছেলেটি এখানে বিয়ে করবে না ব'লে পাঠিয়েচে। একখানা ক্ষুদ্র চিঠিতে নিজের তুচ্ছ ও অনাদৃত জীবনের পরিসমাপ্তির কারণ অত্যন্ত করুণ ভাবে মা-বাপকে জানিয়ে মলিনা বিষ খেয়েচে—এইখানেই গল্পেরও পরিসমাপ্তি।

কিন্তু শেষ অবধি অন্নদার আর এগোন হ'ল না। মলিনার দুঃখে লীলার এখন থেকেই প্রাণ কাঁদছিল, তবু কোনও রকমে চুপ ক'রে নিজেকে সামলে ছিল এতক্ষণ। কিন্তু যেই মলিনা চিঠি আরম্ভ করেচে, "মা জন্মাবধি আমি কেবলই তোমাদের কষ্ট দিয়াছি—" লীলার অশ্রু আর বাধা

মানিল না; সে আচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অন্নদা লেখা ফেলে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, "আরে চুপ, চুপ, চুপ। ও লীলা, ও কি করচ? মা-বাবা এই পাশের ঘরে—থাম থাম, ছিঃ! এ যে গল্প—এ যে মিথ্যে—বানান কথা। কাঁদছ কেন? ও লীলা—"

লীলা কাঁদতে কাঁদতে বললে, "তুমি মলিনাকে বিষ খাওয়ালে কেন? শুধু শুধু একটা প্রাণ নষ্ট করা। কেন তুমি ত ইচ্ছা করলেই ওর সঙ্গে সেই ছেলেটার বিয়ে দিয়ে দিতে পারতে। তুমি বড় নিষ্ঠুর—তোমার কেবল সকলের মনে কষ্ট দিতেই ভাল লাগে—হ্যাঁ, আমি বুঝেচি। তোমার মায়া নেই মোটে—!"

লীলা কাঁদতেই লাগল। অন্নদা ত্রস্তভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কি যে করবে ভেবে পেলে না। পাশের ঘরেই মা-বাবার গলা শোনা যাচ্চে—দুপুরে একবার বকুনির পালা হয়ে গেচে, আবার যদি বাবার কানে এখন এই কান্না যায় তাহলে এই বুড়ো বয়েসে বৌয়ের সামনে বাপের কাছে মার খাওয়া কপালে থাকা কিছু বিচিত্র নয়। অন্নদা লীলার পাশে ব'সে প'ড়ে অত্যন্ত সান্ত্বনার স্বরে বললে, "না, না, লীলা তুমি বুঝতে পারচ না। আচ্ছা, সে তোমায় আমি আর এক দিন এমন ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেব, তুমি এখন চুপ কর লক্ষ্মীটি। বাবা কান্নাকাটি মোটে ভালবাসেন না, জানই ত—এই পাশের ঘরে রয়েচেন, এখনই শুনতে পাবেন। কেঁদো না ছিঃ! একটা গল্প শুনে এত কান্না! বড় মুস্কিল বাধালে তুমি। শেষে কি তোমার পায়ে ধরতে হবে।"

পাশের ঘরে শ্বশুর-মহাশয়ের উপস্থিতির কথা জেনেও লীলার মনে কোনরূপ ভাবান্তর হ'ল না। স্বামী যখন সত্যই পায়ে হাত দিল সে সমানে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ভাঙা গলায় বললে, "তুমি ও-গল্প বদলে দাও। মলিনার শীগ্গীর ঐ ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও। তা হলেই ত সব সুখের হয়—কেমন খাসা গল্পটি হয়। ও মরামরি কান্নাকাটি আমি মোটে সইতে পারি নে। তুমি ও-সব ছিঁড়ে ফেল, ও-রকম গল্প আর কখনও লিখো না।"

লীলার ফোঁপানি কিছুতে থামে না দেখে নিরুপায় হয়ে অন্নদা কাগজগুলো তুলে নিয়ে বললে, "আচ্ছা বাপু আচ্ছা, দিচ্চি সব কেটে; এখন দয়া ক'রে থাম তুমি লীলা। মরবে না মলিনা—হবে তাহ'লে? বাপ রে, বাপ রে, ভাল লোককে লেখা প'ড়ে শোনাতে এসেছিলাম!—এই নাও, এই দেখ, কেটে দিয়েচি, হ'ল?"

লীলা চোখ মুছে বললে, "বেশ করেচ। এ-রকম দুঃখ-কষ্টের কথা আর লিখবে না ত?"

অন্নদা বললে, "অবুঝ হয়ো না লীলা। এটা না-হয় তোমার কষ্ট হবে ব'লে বদলে দিচ্চি, কিন্তু চিরকাল আমি এই রকম করুণ ধরণেরই গল্প লিখে আসচি—এইতেই আমার নাম—এ-রকম গল্প লিখে আমি কত প্রশংসাপত্র পেয়েচি, তোমার এক দিন দেখাব সব। এখন একেবারে হঠাৎ লেখার ধারা বদলাব কি ক'রে? এটা দেখ, এই কেটে দিয়েচি—মলিনার বিয়ে দিয়ে দেব এবার, তাহ'লে খুশী ত?"

লীলার গলা আবার কান্নায় ভেঙে এল—"এত ক'রে বলছি, তবু শুনবে না? অন্য লোককে কষ্ট দিয়ে দিয়ে যত নাম কেনা—কি হবে অমন নাম নিয়ে? তোমার কি দয়ামায়া নেই একটুও? নাম বড়, না মানুষ বড়?"

কান্নার শব্দ আবার পাশের ঘরে পৌঁছবার উপক্রম দেখে অন্নদা হতাশ হয়ে বললে, "আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। আমি হাল ছেড়ে দিচ্চি, তুমি আর কেঁদো না লীলা, থাম। এবার না-হয় আর কষ্টের কথা লিখব না। 'সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল' ব'লে গল্প শেষ ক'রে দেব সব, তুমি চুপ করলে এখন বাঁচি—বাপ রে, এমন জেদী মেয়েও ত দেখি নি কোথাও। যা ধরবে তাই, আর না হলেই চীৎকার কান্না। ভাল বিপদেই পড়েচি। আমার যশমান সব গেল।"

সেই থেকে অন্নদার স্রোত ফিরেচে। অপরিচিত সহৃদয়া পাঠিকার কাছ থেকে চিঠি এসেচে, "আপনার গভীর হৃদয়ের অতলস্পর্শী দুঃখের অন্ধকারের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে যে বিজলী-চমকের ন্যায় আনন্দের আভা আজকাল দেখা যায়, তাহা হইতে মনে হয় আপনি এত দিনে বুঝি এ-পৃথিবীর সুখের খনির সন্ধান খুঁজিয়া পাইয়াছেন।"

বাবার বকুনি ও লীলার কান্নার ভয়ে কত দুঃখে যে তাকে সুখের খনির সন্ধান করতে হয়েচে তা অন্নদাই বোঝে।

নাক্ষত্রিক জগৎ

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ, এম-এ, পিএইচ্-ডি

কোন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সমগ্র আকাশকে অসংখ্য জ্যোতিষ্কণাখচিত অতি বিস্তীর্ণ একখানি চিত্রপটের ন্যায় দেখা যায়। যে-সকল জ্যোতিঃকণা আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে 'নক্ষত্র' বা 'তারা' কহে। নক্ষত্রগণের আলোক অতি ক্ষীণ; যখন আকাশে চন্দ্র উদিত হয়, তখন তাহার আলোকে পৃথিবী আলোকিত হয়, কিন্তু চন্দ্রের অভাবে অসংখ্য তারা একত্র মিলিত হইয়াও পৃথিবীকে তাহার শতাংশের একাংশ আলোকিত করিতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে তারাসকল চন্দ্র অপেক্ষা অল্প উজ্জ্বল নহে। উহারা বহু দূরে অবস্থিত বলিয়া উহাদের আলোক ক্ষীণ দেখায় এবং অন্য কোন তীক্ষ্ণ আলোকের নিকট উপস্থিত হইলে উহাদিগকে একেবারেই দেখা যায় না; এই কারণে দিবাভাগে সূর্য্যের আলোকে আকাশে কোনও তারকা দৃষ্ট হয় না। অন্ধকার রাত্রিতে যত তারা দেখিতে পাওয়া যায়, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে তত দেখা যায় না; তাহার কারণ তারার আলোকের তুলনায় চন্দ্রের আলোক তীক্ষ্ণতর। বৎসরের মধ্যে কোন কোন সময়ে সন্ধ্যাকালে একটি তারাগ্রহকে পশ্চিমাকাশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দীপ্তিমান্ দেখা যায়, ইহাকে 'সন্ধ্যাতারা' কহে। ইহার দীপ্তি সকল সময়ে সমান থাকে না; যখন ইহা অত্যন্ত প্রখর হয়, তখন উহাকে সূর্য্য অস্ত যাইবার বহু পূর্ব্বে মুক্ত নেত্রে দেখা গিয়া থাকে। আবার কোন কোন সময়ে একটি উজ্জ্বল তারাকে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে দীপ্তি পাইতে দেখা যায়, ইহাকে 'শুকতারা' বা 'প্রভাতী-তারা' কহে। কিন্তু আসলে 'শুকতারা' ও 'সন্ধ্যাতারা' উভয়েই এক। উহার গতিবশতঃ উহা সূর্য্যের নিকটে থাকিয়া কখনও সূর্য্যের অগ্রবর্ত্তী হয় এবং কখন-বা সূর্য্যের পশ্চাদ্গামী থাকিয়া যায়। যখন সূর্য্যের অগ্রগামী হয়, তখন উহা সূর্য্যের পূর্ব্বে উদিত হয়, এই সময়ে উহা 'প্রভাতী-তারা' বলিয়া অভিহিত হয়। কখন কখন প্রভাতী-তারাকে সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ কাল পরেও আকাশে দেখা যায়। পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে সূর্য্যের তেজ মধ্যাহ্নের ন্যায় প্রখর নয় বলিয়া, সূর্য্যোদয়ের পরে ও সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কিছু ক্ষণ সূর্য্যালোকের আপেক্ষিক ক্ষীণতা হেতু 'শুকতারা' দিবালোকেও দেখা যাইতে পারে।

সকল নক্ষত্র সমান উজ্জ্বল দৃষ্ট হয় না। গগনমণ্ডলে সাধারণ চক্ষুর্দ্বারা মোটামুটি ৫০০০ নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। দূরবীক্ষণ-সাহায্যে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক নক্ষত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা আকাশের তারাদিগকে উজ্জ্বলতা অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারাকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হয়; তদপেক্ষা কম উজ্জ্বল তারাকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হয়; ইহা অপেক্ষা কম উজ্জ্বল তারাকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হয়; এই প্রকারে কম কম উজ্জ্বল তারাকে অধিকতর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাধারণতঃ যত তারা মুক্ত নেত্রে দেখা যায়, তাহাদিগকে ছয় শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। উত্তর-ধ্রুব হইতে বিষুববৃত্তের ৩৫ অংশ দক্ষিণ পর্য্যন্ত যে শ্রেণীর যতগুলি তারা সাধারণতঃ মুক্ত নেত্রে দেখা যায়, তাহার শ্রেণী-বিভাগ এইরূপ—

প্রথম শ্রেণী	২০টি নক্ষত্র
দ্বিতীয় শ্রেণী	৬৫টি নক্ষত্র
তৃতীয় শ্রেণী	১৯০টি নক্ষত্র
চতুর্থ শ্রেণী	৪২৫টি নক্ষত্র
পঞ্চম শ্রেণী	১১০০টি নক্ষত্র
ষষ্ঠ শ্রেণী	৩২০০টি নক্ষত্র
মোট তারা	৫০০০টি নক্ষত্র

দূরবীক্ষণ-যন্ত্র ব্যবহার করিলে আকাশে ইহা অপেক্ষা

অধিকসংখ্যক নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, এবং তাহাদিগের শ্রেণী-বিভাগও হইয়া থাকে। এই শ্রেণীবিভাগ অনেকটা ইচ্ছাকৃত, কারণ এক শ্রেণীর নক্ষত্রেরাও আকারে ও বর্ণে বিভিন্ন। আবার সকল মানুষের দৃষ্টিশক্তিও সমান নহে, কাহারও দৃষ্টিশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে তাহারা সপ্তম, অষ্টম এমন কি দ্বাদশ শ্রেণীর নক্ষত্র পর্য্যন্ত মুক্ত নেত্রে দেখিতে পায়। অপর পক্ষে এমন লোকও আছে, যাহাদের দৃষ্টিশক্তি এত ক্ষীণ যে তাহারা পঞ্চম শ্রেণীর নক্ষত্র দেখিতেও চক্ষুর পীড়া অনুভব করে।

আকাশে এমন নয়টি নক্ষত্র আছে যাহারা ঔজ্জ্বল্যে অপর সকল নক্ষত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু পরস্পরের তুলনায় উহাদের দীপ্তি এত বিসদৃশ যে, তাহাদিগকে কিছুতেই একশ্রেণীভুক্ত করা যায় না, এই কারণে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহাদিগের কোন শ্রেণীবিভাগ না করিয়া, ইহাদিগের নাম 'বিশিষ্ট তারা' রাখিয়াছেন। 'কালপুরুষ' (Orion) নামে একটি নক্ষত্রমণ্ডল আছে, তাহার পশ্চাৎপদপ্রান্তে একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়, ইহা বিশিষ্ট নক্ষত্র-দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার নাম 'লুব্ধক' (Sirius)। হিন্দুদিগের বেদ ও পুরাণে কালপুরুষের দুইটি কুকুরের উল্লেখ আছে, এই নক্ষত্র তাহাদিগের অন্যতর বলিয়া পরিচিত। ইউরোপীয় জ্যোতিষেও ইহাকে 'কুকুর-তারা' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

যে-যে সময়ে জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রচলন যে-যে দেশে হইয়াছে, সেই সময়ে সেই-সেই দেশে নক্ষত্রের তালিকা ও তাহাদিগের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য-মতে সর্ব্বপ্রথম নক্ষত্র-সারণী টলেমির (K. Ptolemaios, আনুমানিক ১৪০ খ্রীঃ) 'আল্‌মাজেষ্ট' পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। আল্‌মাজেষ্টের নক্ষত্রগুলি টলেমির গুরু হিপার্কসের (Hipparchus, ১৮০-১০০ খ্রীঃ-পূ) দ্বারা লক্ষিত হইয়াছিল। হিপার্কসের নক্ষত্রাদি দর্শনের এই উদ্দেশ্য ছিল যে, পুরাকালের নক্ষত্রগুলি ঠিক ঠিক সেই স্থানে আছে না সরিয়া গিয়াছে, তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া এবং তাঁহার পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদেরাও যেন তাঁহাদিগের সময়ে নক্ষত্রসকল কি রকম স্থানে অবস্থিত আছে তাহা জানিতে পারেন। হিপার্কসের তালিকায় ১০৮০ নক্ষত্র দেওয়া আছে। আল্‌মাজেষ্ট পুস্তকে ১০৩০টি নক্ষত্রের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পরের

কাসিওপিয়া, স্বাতি ও পেগাসস্

নক্ষত্র-সারণী যাহা আমরা জানি, তাহা উলুবেগের (Ulu Beg) দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। ইনি তাতার-রাজ তৈমুরলঙ্গের পুত্র। ১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই তালিকার নক্ষত্র প্রায় টলেমির নক্ষত্রের সহিত মিলিয়া যায়। এই উলুবেগ সমরখন্দে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নক্ষত্রের অবস্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। ১০১৯টি নক্ষত্রের অবস্থান ইঁহার সারণীতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইঁহার পরে টাইকোব্রাহী (Tycho Brahe, ১৫৪৬-১৬০১ খ্রীষ্টাব্দ) পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা ১০০৫টি নক্ষত্রের স্থান ঠিক সূক্ষ্মভাবে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। আধুনিক সময়ে নক্ষত্র-সারণী দুই প্রকারের হইয়া থাকে। যে-সকল নক্ষত্রের অবস্থান (বিষুবাংশ ও ক্রান্তি) যতদূর পারা যায় সঠিক নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা প্রথম প্রকার সারণীর অন্তর্ভুক্ত; আর যে-সকল নক্ষত্রের অবস্থান অনেকটা কাছাকাছি স্থানে দেওয়া আছে, যাহার দ্বারা নক্ষত্রকে যথাসম্ভব চিনিতে পারা যায়, তাহারা দ্বিতীয় প্রকার সারণীর অন্তর্গত। প্রথম প্রকার সারণীতে কুড়ি হাজার নক্ষত্র দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাদিগের অবস্থান অনেকটা সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বিভাগে এক লক্ষ নক্ষত্র দেওয়া

হইয়াছে এবং ইহাদিগের অবস্থান যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বিভাগের নক্ষত্রের মধ্যে আর্‌জিল্যাণ্ডারের (Argelander, ১৭৯৯-১৮৭৫ খ্রীঃ)

কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ

তালিকাই সর্ব্বপ্রধান। উত্তর-ধ্রুব হইতে বিষুবাংশের দুই অংশ দক্ষিণ পর্য্যন্ত যে-সকল নক্ষত্র আছে তাহাদিগের মধ্যে নবম শ্রেণীর পর্য্যন্ত নক্ষত্র দেওয়া আছে। দক্ষিণ-ধ্রুবের নিকটস্থ দক্ষিণ-মেরুর নক্ষত্র সম্প্রতি গোল্ড সাহেবের দ্বারা (Dr. Gould) দক্ষিণ-আমেরিকার কর্ডোবায় দৃষ্ট হইয়াছিল।

আকাশে নক্ষত্রদিগকে চিনিয়া লইবার জন্য তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলে বিভক্ত করা হইয়াছে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কিংবা কোন দ্রব্যবিশেষের আকারে ঐ সকল মণ্ডল কল্পনা করিয়া, তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে, যথা—সপ্তর্ষিমণ্ডল, সাতভাই, কালপুরুষ, মিথুন, মেষ, কর্কট, সিংহ, ধনুঃ, কুম্ভ প্রভৃতি। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম তিনটি মণ্ডল সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত। অপর কয়েকটিকে পুঞ্জে পুঞ্জে বিভক্ত করিয়া 'রাশি' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আকাশের নক্ষত্রগুলি গগনমণ্ডলে সমভাবে বিক্ষিপ্ত নাই। যেন স্থানে স্থানে একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই পুঞ্জীভূত নক্ষত্রগুলিকেই এক এক 'রাশি' কহে। পুরাকালে লোকেরা এই নক্ষত্রগুলিকে জীবজন্তুর আকারের ন্যায় কল্পনা করিয়া ইহাদিগের নামকরণ করিয়াছিল, যথা—বৃষের চক্ষু (The eye of the Bull), বৃহৎ ঋক্ষের পুচ্ছ, ওরায়ণের দক্ষিণ স্কন্ধ প্রভৃতি। আরবরা প্রত্যেক উজ্জ্বল নক্ষত্রের এক একটি নাম দিয়াছিল, অথবা গ্রীকদের নিকট হইতে ঐ নাম গ্রহণ করিয়াছিল, যথা—সিরিয়স্ (Sirius), আর্কটিউরস্ (Arcturus), প্রোসিয়ন্ (Procyon), আল্‌ডিবারান্ (Aldebaran) ইত্যাদি। আরও স্থানে স্থানে অনেকগুলি নক্ষত্র এত কাছাকাছি এবং এরূপভাবে মিলিয়া থাকিতে দেখা যায় যে, তাহাদিগকে নক্ষত্রপুঞ্জ বলা হইয়া থাকে, যেমন, কৃত্তিকা-নক্ষত্র। সাধারণ লোকেরা ইহা অনুমান করিতে পারে যে, কোন এক মণ্ডলে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী যে-সকল নক্ষত্র দেখা যায় তাহারা বুঝি ঐরূপ সম্বদ্ধভাবে একটি মণ্ডলাকারে অবস্থিত; বাস্তবিকপক্ষে এই অনুমান অমূলক। কারণ প্রত্যেক মণ্ডলে যে-সকল নক্ষত্র সংস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা পরস্পর হইতে বহু দূরে বিচ্ছিন্নভাবে বিশাল আকাশে অবস্থান করিতেছে। আমাদিগের নেত্র হইতে ঐ সকল নক্ষত্রে দৃষ্টিরেখা টানিলে তাহাদিগের মধ্যবর্ত্তী কোণ (angle) যত সংকীর্ণ হইবে ঐ নক্ষত্রগুলিকে ততই পরস্পরের নিকটবর্ত্তী দেখাইবে। যেমন, কোন বহুক্রোশব্যাপী সুদীর্ঘ সরল পথের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া উহার অপর প্রান্তের দিকে নেত্র স্থাপিত করিয়া ক্রোশাধিক দূরে অবস্থিত এক জন মানুষ ও তাহা হইতে আর এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী অপর এক জন মানুষকে দেখিলে দূরত্ববশতঃ কেবল যে তাহারা ক্ষুদ্রাকার দেখাইবে তাহা নহে, পরন্তু তাহাদিগের পরস্পরের দূরত্বও অনুভব করা যাইবে না, মনে হইবে যেন তাহারা পরস্পরের নিকটে অবস্থিত রহিয়াছে। নক্ষত্রদিগকেও মুক্ত নেত্রে সেইরূপ কাছাকাছি দেখায় বলিয়া তাহাদিগের দৃষ্ট অবস্থান হইতে মণ্ডল কল্পিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ঐ সকল মণ্ডল সম্পূর্ণরূপেই মনুষ্যকল্পিত। পরস্পরের তুলনায় নক্ষত্রদিগের কোন গতি সহজে প্রত্যক্ষ করা যায় না, এই কারণে তাহাদিগকে 'স্থির নক্ষত্র' বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগের দূরত্ব এত অধিক যে, বহু শত বৎসর অধ্যবসায়ের সহিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ ও গণনা না করিলে উহাদিগের কোন স্বকীয় গতি আবিষ্কৃত হইতে পারে না। নক্ষত্রদিগের দূরত্বের তুলনায় সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব অতি অকিঞ্চিৎকর; কোন নক্ষত্র হইতে যদি সূর্য্য ও পৃথিবীকে যুগপৎ দৃষ্টিগোচর করিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে দেখা যাইত যে, পৃথিবী যেন সূর্য্যের গাত্রে প্রায় সংলগ্ন রহিয়াছে।

সম্প্রতি 'আলোক-দূরত্ব' পরিমাপ করিবার নিয়ম উদ্ভাবিত হইয়াছে; ফুকো (Foucault) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় প্রমাণিত হইয়াছে যে আলোক গতিশীল এবং উহার বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল। আমরা যখন একটা আলোক দেখি, তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ আলোকাধার হইতে আলোক একটা পথে সঞ্চরণ করিয়া আমাদের নেত্রে প্রবেশ করিতেছে। যতক্ষণ না এইরূপ ঘটিতেছে, ততক্ষণ আমাদের চক্ষু ঐ আলোকের ও আলোকাধারের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না। গতিমাত্রই সময়সাপেক্ষ, অতএব আলোক-রশ্মিরও চলিতে সময় লাগিতেছে। প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল রশ্মির বেগ এইরূপ মানিয়া লইয়া গণনা করিলে দেখা যায় যে, সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে প্রায় ৮ মিনিটের কিঞ্চিন্ন্যূন সময় অতিবাহিত হয়, অর্থাৎ কোনও মুহূর্ত্তে আমরা সূর্য্যকে ঠিক যে-স্থানে দেখিতে পাই, সূর্য্য তাহার প্রায় ৮ মিনিট পূর্ব্বে ঐ স্থানে অবস্থিত ছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে পৃথিবীর কক্ষব্যাসের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আলোক পৌছিতে ১৬ মিনিটের অধিক ও ১৭ মিনিটের কিঞ্চিৎ কম সময় লাগিয়া থাকে। ইহাকে গণনার ভিত্তি ধরিয়া ইহার সহিত তুলনায় কোন নক্ষত্র হইতে আলোক আসিতে যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহার দ্বারা ঐ নক্ষত্রের দূরত্বের পরিমাপ হয় এবং ঐ দূরত্বকে সাধারণতঃ আলোক-দূরত্ব বলা হয়। যে-সকল নক্ষত্র মুক্ত নেত্রে দেখা যায় তাহাদিগের আলোক পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, সৌরজগতের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী যে নক্ষত্র, তাহা হইতে এই জগতে আলোক আসিয়া পৌছিতে প্রায় ৪½ বৎসর অতিবাহিত হয়। কোন কোন নক্ষত্র হইতে আলোক আসিতে প্রায় বিশ, ত্রিশ, এমন কি পঞ্চাশ বর্ষ পর্য্যন্ত অতিবাহিত হয়। আকাশে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্র 'লুব্ধক' (Sirius) হইতে সৌরজগতে আলোক আসিতে প্রায় ৮½ বৎসর ব্যয়িত হইয়া থাকে এবং যে নক্ষত্রে 'ধ্রুবতারা' রহিয়াছে, উহা হইতে সৌরজগতে আলোক আসিতে প্রায় ৪৬½ বৎসর অতিবাহিত হয়। সুতরাং আলোক-দূরত্ব গণনা করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, নাক্ষত্রিক জগৎ কত দূর বিস্তৃত এবং উহার বিস্তৃতির তুলনায় সৌরজগৎ কত ক্ষুদ্র, আর ইহাও অনুমান করা যায় যে নাক্ষত্রিক জগৎ যেমন বিশাল, তেমন নক্ষত্রগণও আমাদিগের সূর্য্যাপেক্ষা বহু গুণ বৃহৎ। এই

ধ্রুবতারা ও ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রপুঞ্জ

যে ছোটবড় নানা শ্রেণীর নক্ষত্র দেখা যায়, তাহাদিগের আপেক্ষিক আকারের পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে। অনেক নক্ষত্র আকারে বৃহত্তর হইয়াও দূরত্বের আধিক্যবশতঃ ক্ষুদ্রতর দেখা যায়। বাস্তবিকপক্ষে নক্ষত্রজগতের সীমা নির্দ্ধারণ করা এখনও পর্য্যন্ত মানুষের সাধ্যাতীত রহিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আকাশের মধ্যে মধ্যে নক্ষত্রগুলি পুঞ্জীভূত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং সেই ধারণায় উহাদিগের আকার, নাম ইত্যাদি কল্পনা করা হইয়াছে। এই একত্রস্থিত নক্ষত্রগুলিকে নক্ষত্ররাশি বলা হইয়াছে। এই নক্ষত্ররাশিদিগের নামকরণ কি প্রকারে হইল এবং কখন, কোথায় ও কি অভিপ্রায়ে এই নাম দেওয়া হইল তাহা জানিবার বাসনা স্বতঃই মনে জাগে। কিন্তু উহার সন্তোষজনক উত্তর এ-পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া বিচার করিলে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর অনেকটা পাইতে পারা যায়। প্রথম, জনশ্রুতি (folk-lore); দ্বিতীয়, লিপিবদ্ধ প্রমাণ (documentary evidence); তৃতীয়, আসিরিয়া দেশে এই সম্বন্ধে কি মূল প্রমাণ পাওয়া যায়, ইউফ্রেটিজ্ উপত্যকায় সম্প্রতি যে স্মৃতিমন্দির বা খোদিত প্রস্তরাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে যাহা জানা যায়; চতুর্থ, নক্ষত্ররাশির নিজেদের মধ্যেই কি প্রমাণ পাওয়া যায়।

সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় আকাশের অধিকাংশ নক্ষত্র

প্রতিদিন পূর্ব্বদিকে উদিত হয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। বস্তুতঃ, তাহারা যে দল বাঁধিয়া এইরূপ ভাবে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে এমত নহে; পৃথিবীর স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্ত্তনই ইহার কারণ। কিন্তু
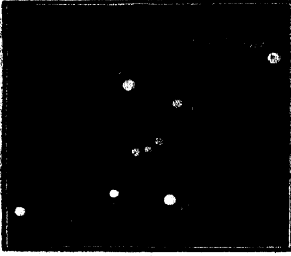
লুব্ধক, কালপুরুষ, রোহিণী

আকাশের উত্তর-ভাগে পৃথিবীর ক্ষিতিজ হইতে কিঞ্চিদূর্দ্ধে একটি নক্ষত্র দেখা যায়, তাহার কখনও উদয়াস্ত ঘটে না বলিয়া মনে হয়, উহা নিয়ত একস্থানে থাকে; ইহাকে 'ধ্রুবতারা' বলা হয়। যেমন কেহ নিজে নিজে ঘুরিবার সময়ে তাহার মাথার উপরিস্থিত কোনও দ্রব্যের দিকে তাকাইলে দেখিতে পায় যে, সে যত দ্রুতবেগেই ঘুরিতে থাকুক না কেন, সেই দ্রব্যটিকে আদৌ ঘুরিতে দেখা যায় না; সেইরূপ ধ্রুবতারাকেও ঘুরিতে দেখা যায় না বলিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, পৃথিবী ঐ ধ্রুবতারার দিকে মাথা রাখিয়া ঘুরিতেছে। ইহার নিকটে যে-সকল নক্ষত্র আছে তাহাদিগের উদয়াস্ত ঘটিতে দেখা যায় না; তাহারা এক অহোরাত্রে একবার ধ্রুবতারাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলে, এই কারণে ইহাদিগকে 'ধ্রুবচর-তারা' (circumpolar stars) বলা হয়। ধ্রুবচর-তারাদিগের মধ্যে সপ্তর্ষিমণ্ডল (The Great Bear or the Dipper) সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারাই অতি সহজে চিনিয়া লওয়া যায় এবং ধ্রুবতারার জ্ঞান না থাকিলে এই মণ্ডলের সাহায্যেই ধ্রুবতারার সন্ধান জানিতে পারা যায়।

(আকাশে নক্ষত্ররাশির সহিত পরিচয় নিম্নলিখিত উপায়ে লাভ করা যাইতে পারে। প্রথমে, উত্তর-ধ্রুবের নক্ষত্রগুলি দেখিতে হয়। দেখিবার সময়ে প্রথমেই সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা চাই। এই সপ্তর্ষিকে ঋক্ষ (The Great Bear or the Dipper) বলা হইয়া থাকে; ইহার মধ্যে ক্রতু ও পুলহ নক্ষত্র যোগ করিয়া যে সরল রেখা হইবে, তাহা পুচ্ছের যে-দিকে উন্নতোদর সেই দিকে বর্দ্ধিত করিলে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রে আসিয়া মিলিত হইবে, সেই নক্ষত্রই ধ্রুবতারা (Pole Star)। এই মণ্ডলটি দিগ্‌নির্ণয়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, কারণ ধ্রুব-নক্ষত্র জানিতে পারিলে উত্তর দিক জানা গেল এবং অন্য দিকগুলিও জানিবার অসুবিধা রহিল না।) এই মণ্ডলটির একটি চিত্র প্রদর্শিত হইল; ইহাতে তারকাদ্বয় যোগ করিয়া রেখা টানিলে দেখা যায় যে, ঐ রেখা ধ্রুব-নক্ষত্রে আসিয়া মিলিয়াছে।

ইহার পর লঘুসপ্তর্ষি (The Little Bear) বা ছোট ঋক্ষ দেখিতে হয়; এই ছোট ঋক্ষের পুচ্ছের শেষের তারা ধ্রুব-নক্ষত্র। পরে কাসিওপিয়া দেখিতে হয়; ইহাকে লেডি ইন্ দি চেয়ার (Lady in the chair) বলা হইয়া থাকে। ইহা দেখিতে ঠিক W অক্ষরের ন্যায়। পাশ্চাত্য পৌরাণিক মতে সিফিয়সের (ইহাও একটি নক্ষত্ররাশি) রাণী কাসিওপিয়া; আকাশে ইনি যেন একটি প্রকাণ্ড সিংহাসনে বসিয়া হুকুমজারি করিতেছেন। পরে পার্সিয়ুস (Perseus), সিফিয়স্, কামেলোপার্ড, সিংহ, ড্রেকো (দৈত্য) ও লাসর্টা (টিকটিকি) দেখিতে হয়। কতকগুলি নক্ষত্ররাশি কয়েকটি বিভিন্ন সময়ে দেখিবার সুবিধা হয়। ২১ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রি, ২১ জানুয়ারি রাত্রি দশটা, ২০শে ফেব্রুয়ারি রাত্রি আটটা ও ২১শে মার্চ্চ সন্ধ্যা ছয়টায় সিগ্‌নস্ (রাজহংস), সিফিয়স্, কাসিওপিয়া, পার্সিয়ুস, অরীজা (সারথি), বৃষ, মিথুন, কালপুরুষ, কেনিস্ মাইনর (ছোট কুকুর), কেনিস্ মেজর (বড় কুকুর), আর্গো নেভিস্ (আর্গো জাহাজ) ও কর্কট নক্ষত্ররাশি দেখিতে হয়। কালপুরুষ এখন প্রায় মাধ্যাহ্নিকে স্থিত। ইহাতে প্রথম শ্রেণীর দুইটি নক্ষত্র ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চারিটি নক্ষত্র আছে, মধ্যে তিনটি নক্ষত্র এক রেখায় অবস্থিত; এই মধ্যের তিনটি নক্ষত্রকে ইষুত্রিখণ্ড অর্থাৎ যোদ্ধার কটিদেশ (belt) বলা হইয়া থাকে; প্রথম শ্রেণীর একটি নক্ষত্রকে আর্দ্রা-নক্ষত্র (Betelguege) নামে অভিহিত করা হয়,

দ্বিতীয় উজ্জ্বল নক্ষত্রটিকে Regel আখ্যা দেওয়া হয়। প্রথমটি যোদ্ধার স্কন্ধের দিকে, আর দ্বিতীয়টি যোদ্ধার পায়ের দিকে। কেনিস্ মাইনর নক্ষত্র রাশিতে প্রোসিয়ন্ (প্রশ্বা) উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কেনিস মেজরে সিরিয়াস্ (লুব্ধক) নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্র। বৃষ রাশিতে কৃত্তিকা-নক্ষত্র (Pleiades) অবস্থিত, ইহাকে সাত- ভাই চম্পা কহে। আবার ২১শে মার্চ্চ মধ্যরাত্রিতে, ২০শে এপ্রিল ১০টা রাত্রিতে, ও ২১শে মে ৮টা রাত্রিতে কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, কোমা বেরেণিসী (রাণী বেরেনিসীর কেশদাম), বুটীজ (ভল্লুক পাল), কেনিস্ ভেনাটিসি (শিকারী কুকুর), করোণা বোরিয়ালিস্ (উত্তর দিকের মুকুট) দেখিতে হয়। আর ২১শে জুন মধ্যরাত্রিতে, ২১শে জুলাই রাত্রি ১০টার সময়ে ও ২১শে আগষ্ট রাত্রি ৮টার সময়ে সিগনস্, লায়রা (বীণা), ভাল্পেকিউলা (শৃগাল), সাগিটা (ধনু), আকুইলা (ঈগল), বৃশ্চিক, ধনু, মকর, হারকিউলিস্, ড্রেকো (দৈত্য) দেখিতে হয়। আর ২১শে সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রিতে, ২১শে অক্টোবর ১০টা রাত্রির সময়ে, ২০শে নবেম্বর ৮টা রাত্রে ও ২১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় কাসিওপিয়া, সিফিয়স্, সিগনস্, লায়রা, আকুইলা, পার্সিয়ুস্, অরীজা, পেজাসস্ (Flying Horse), এণ্ড্রোমিডা (স্বাতি), সেটুস্ (হোয়েল্ মৎস্য) দেখিতে হয়।

আকাশে নক্ষত্রদিগের গঠনে বিশেষ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন নক্ষত্রের অবয়ব সূর্য্যের মত জমাট বাঁধিতেছে, কিন্তু কোন নক্ষত্র আবার এখন পর্য্যন্ত বাষ্পাকারে অবস্থিতি করিতেছে। এইরূপ প্রাকৃতিক বিভিন্নতা অনুসারে নক্ষত্রদিগকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করা যায়। দূরবীক্ষণের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির উপরই নক্ষত্রদিগের এই জাতি-নির্ব্বাচন নির্ভর করিয়া থাকে। সাধারণতঃ সকল নক্ষত্রই এক-একটি আলোক-বিন্দুরূপে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু তীক্ষ্ণশক্তি দূরবীক্ষণেও যখন কোন নক্ষত্র একটি পরিস্ফুট বিন্দুরূপে দৃষ্ট হয় না এবং অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ধূমশিখার মত দৃষ্টিগোচর হয়, তখনই উহার বাষ্পীয় অবয়ব উপলব্ধি করা যায়। এমন নক্ষত্রও দেখা গিয়াছে, যাহা ঠিক আলোক-বিন্দুরূপে নয়নগোচর না হইয়া একখণ্ড ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম মেঘের ন্যায় প্রতিভাত হয়; ইহাদিগকে 'নক্ষত্র' না বলিয়া 'নীহারিকা' বলা হইয়া থাকে। অনেকে অনুমান করেন যে, উহাদের গঠনকার্য্য
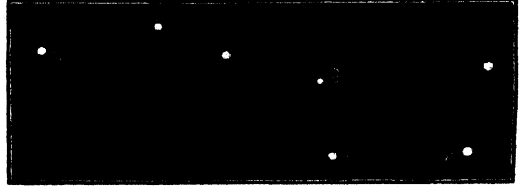
সপ্তর্ষি নক্ষত্রপুঞ্জ

এখনও শেষ হয় নাই, ইহারা এখনও অসম্বদ্ধ বাষ্পকণারূপে অবস্থিত এবং ক্রমশঃ জমাট বাঁধিয়া অবশেষে এককালে নক্ষত্রে পরিণত হইবে। আকাশে কোন-কোন স্থানে আবার এমন এক-একটি নক্ষত্র দেখা যায় যাহাকে সাধারণতঃ নীহারিকার মত দেখায়; কিন্তু বিশেষ তীক্ষ্ণশক্তি দূরবীক্ষণের দ্বারা নেত্রগোচর করিলে দেখা যায় যে, তাহা বাস্তবিক অনেকগুলি নক্ষত্রের সমষ্টি মাত্র। মনে হয়, যেন বহুসংখ্যক নক্ষত্র একটি সঙ্কীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া পরস্পরের নিকট ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছে, ইহাদিগকে 'নক্ষত্র-স্তূপ' (star clusters) বলা হইয়া থাকে। ইহারা প্রকৃতই পরস্পর সন্নিকটস্থ বলিয়া অথবা ইহাদের দৃষ্টিরেখা প্রায় এক দিকে স্থাপিত বলিয়া এইরূপ স্তূপাকৃতি দেখা যায় কি না, তাহা সকল সময়ে স্থির করা সম্ভবপর নহে। হয়ত অনেক-স্থলেই নক্ষত্র-স্তূপ আমাদিগের দৃষ্টিবিভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এইরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত বা সত্য প্রতিপন্ন হইবে না। কৃত্তিকা-নক্ষত্রটি (Pleiades) মুক্ত নেত্রে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, উহাতে ছয়টি নক্ষত্র রহিয়াছে, কিন্তু দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে উহাতে পঞ্চাশটির উপর নক্ষত্র রহিয়াছে দেখা যায়। পার্সিয়ুস-নক্ষত্র আর একটি দৃষ্টান্ত, দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের প্রয়োগে দেখা যায় ইহাতে বহুসংখ্যক নক্ষত্র ঘনসন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, উহা একটি চমৎকার দৃশ্য।

ইহা ভিন্ন আকাশে যুগ্ম নক্ষত্র বা যমক নক্ষত্র (double stars), ত্রিস্র, চতুরস্র প্রভৃতি বহুযঙ্গিক নক্ষত্র (multiple stars), পরিবর্ত্তক নক্ষত্র বা বহুরূপী নক্ষত্র (variable stars) দৃষ্টিগোচর হয়। আকাশে এমন কতকগুলি নক্ষত্র আছে যাহাদিগকে মুক্ত নেত্রে দেখিলে একটি নক্ষত্র মনে হয়, কিন্তু তীক্ষ্ণশক্তি দূরবীক্ষণ-সাহায্যে উহারা দ্বিখণ্ড হইয়া দুইটি নক্ষত্ররূপে প্রকাশ পায়। বহুকালের পর্য্যবেক্ষণে এইরূপ নক্ষত্রের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে, ইহাদিগকে যুগ্ম বা যমক নক্ষত্র বলা হয়। উইলিয়ম হর্শেল প্রথমে এই জাতীয় নক্ষত্রের স্বরূপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং পঁচিশ বৎসর পর্য্যবেক্ষণের পর ইহাদের যমকত্ব সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিদর্শন-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, লুব্ধক (Sirius) নামক উজ্জ্বল নক্ষত্রটির একটি ক্ষীণ সহচর এবং সপ্তর্ষিদিগের মধ্যে এক জনের একটি অতি ক্ষীণ সহচর আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আকাশে কয়েকটি নক্ষত্র এমন আছে যে, উহাদিগকে বিশ্লেষণ করিলে তিন বা তদধিক সংখ্যক নক্ষত্র দৃষ্ট হয় এবং তাহারা যে তাহাদিগের মধ্যবর্ত্তী কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দুকে বেষ্টন করিয়া চলিতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, উহারা যুগ্ম বা যমক নক্ষত্রের ন্যায় কেবলমাত্র দ্বিখণ্ড না হইয়া বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের আকর্ষণে পরিক্রমণ করিতেছে; ইহাদিগকে বহুযঙ্গিক বলা হইয়া থাকে। নিদর্শনস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, লাইরা (বীণা) নক্ষত্রটিতে চারিটি নক্ষত্র পরিলক্ষিত হইয়াছে,—তিনটি শুভ্রাকৃতি, আর একটি লোহিতাকার; আবার কালপুরুষের অন্তর্গত একটি নক্ষত্রকে বিশ্লেষণ করিয়া উহাতে ছয়টি নক্ষত্র দেখা গিয়াছে। আকাশে আরও এক প্রকার নক্ষত্র আছে, তাহাদের ঔজ্জ্বল্য স্থির নহে; উহাদিগকে বহুরূপী বা পরিবর্ত্তক নক্ষত্র নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলির নির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারে ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্ত্তন হয়। এই শ্রেণীর নক্ষত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত দুই প্রকারই বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা—মিরা (Mira = আশ্চর্য্য) ও আলগল (Algol)। মিরা-শ্রেণীর নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য-পরিবর্ত্তনের কাল ৩১ দিন। এই সময়ের মধ্যে উহা দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র হইতে একবারে ষষ্ঠ শ্রেণীর নক্ষত্রে পরিণত হয়, তারপর প্রায় পাঁচ মাসকাল উহা একেবারে অদৃশ্য হয় এবং পরে আবার ক্রমশঃ পূর্ব্বাবস্থায় উপনীত হয়। আলগল-শ্রেণীর নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য-পরিবর্ত্তনের মোট সময় দুই দিন, কুড়ি ঘণ্টা, আটচল্লিশ মিনিট, পঞ্চান্ন সেকেণ্ড; এই সময়ের মধ্যে পার্সিয়ুস নক্ষত্ররাশির আলগল-নক্ষত্র দুই দিন ১৩ ঘণ্টার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র থাকে, তার পর সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে ইহা ক্রমশঃ চতুর্থ শ্রেণীর নক্ষত্রে পরিণত হয়, কুড়ি মিনিট চতুর্থ শ্রেণীর নক্ষত্র থাকিয়া ইহা পুনরায় ক্রমশঃ উহার পূর্ব্বের ঔজ্জ্বল্য লাভ করে এবং সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র হইয়া যায়।

নাক্ষত্রিক জগতের পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনা অতি চিত্তাকর্ষক এবং দূরবীক্ষণের সাহায্যে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, নাক্ষত্রিক জগৎ সৌরজগতের তুলনায় কত বিশাল ও কত অদ্ভুত।

দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৩

এই ঘটনার পরে আমার ভয় হ'ল আমার সেই রোগ আবার আরম্ভ হবে। ও যখন আসে তখন উপরি-উপরি অনেক বার হয়—তার পর দিনকতকের জন্যে আবার একেবারেই বন্ধ থাকে। এই বার বেশী ক'রে সুরু হ'লে আমার চাকুরী ঘুচে যাবে—সীতার কোন কিনারাই করতে পারব না।

মেজবাবু হিসেবের খাতা লেখার কাজ দিলেন নবীন-মুহুরীকে। তার ফলে আমার কাজ বেজায় বেড়ে গেল—ঘুরে ঘুরে এঁদের কাজে খিদিরপুর, বরানগর, কালীঘাট করতে হয়—আর দিনের মধ্যে সতের বার দোকানে বাজারে যেতে হয় চাকরকে সঙ্গে নিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময় নেই, দিনে রাতে শুধু ছুটোছুটি কাজ। এই দোকানের হিসেব নবীন-মুহুরীকে বুঝিয়ে দেওয়া একটা ঝঞ্চাট—রোজ সে আমাকে অপমান করে ছুতোয়-নাতায়, আমার কথা বিশ্বাস করে না, চাকরদের জিজ্ঞেস করে আড়ালে সত্যি সত্যি কি দরে জিনিষটা এনেচি। সীতার মুখ মনে ক'রে সবই সহ্য ক'রে থাকি।

কার্ত্তিক মাসে ওঁদের দেশের সেই মহোৎসব হবে —আমাদের সকলকে দেশে পাঠানো হ'ল। আমি অনেক আগে থেকেই শুনে আসচি—অত্যন্ত কৌতূহল দেখ্‌ব ওঁদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুষ্ঠান কি রকম। গ্রামে এঁদের প্রকাণ্ড বাড়ি, বাগান, দীঘি, এঁরাই জমিদার। তবে বছরে এই একবার ছাড়া আর দেশে আসেন না। কুঞ্জ-নায়েব বাকী দশ মাস [illegible]র মালিক।

খুব বড় ফাঁকা মাঠে মেলা বসেচে—এখানকার [illegible]দারই বেশী। অনেকগুলো খাবারের দোকান, [illegible]নার দোকান, মাদুরের দোকান।

একটা বড় বটগাছের তলাটা বাঁধানো, সেটাই না-কি পীঠস্থান। লোকে এসে সেইখানে পূজো দেয়—আর বটগাছটার ডালে ও ঝুরিতে ইট বাঁধা ও লাল নীল নেকড়া বাঁধা। লোকে মানত করবার সময় ওই সব গাছের গায়ে বেঁধে রেখে যায়, মানত শোধ দেওয়ার সময় এসে খুলে দিয়ে পূজো দেয়। বটতলায় সারি সারি লোক ধর্ণা দিয়ে শুয়ে আছে, মেয়েদের ও পুরুষদের ধর্ণা দেওয়ার জায়গা আলাদা আলাদা।

বড়বাবু ও মেজবাবুতে মোহান্তের গদীতে বসেন—কর্ত্তা নীলাম্বর রায় আসেন নি, তাঁর শরীর সুস্থ নয়। এঁদের বেদীর ওপরে আশপাশে তাকিয়া, ফুল দিয়ে সাজানো, সাম্‌নে ঝক্‌ঝকে প্রকাণ্ড রূপোর থালাতে দিন-রাত প্রণামী পড়চে। দুটো থালা আছে—একটাতে মোহান্তের নজর, আর একটাতে মানত শোধ ও পূজোর প্রণামী।

নবীন-মুহুরী বেচারাম ও আমার কাজ হচ্চে এই সব টাকাকড়ির হিসেব রাখা। এর আবার নানা রকম রেট বাঁধা আছে, যেমন—পাঁচ সিকের মানত থাক্‌লে গদীর নজর এক টাকা, তিন টাকার মানতে দু-টাকা ইত্যাদি। কেউ কম না দেয় সেটা মুহুরীদের দেখে নিতে হবে, কারণ মোহান্তরা টাকাকড়ির সম্বন্ধে কথা বল্‌বেন না।

কাজের ফাঁকে আমি বেড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম চারি ধারে, সবারই সঙ্গে মিশে এদের ধর্ম্মমতটা ভাল ক'রে বুঝ্‌বার আগ্রহে যাদের ভাল লাগে তাদেরই নানা কথা জিজ্ঞাসা করি, আলাপ ক'রে তাদের জীবনটা বুঝবার চেষ্টা করি।

কি অদ্ভুত ধর্ম্মবিশ্বাস মানুষের তাই ভেবে অবাক্ হয়ে যাই। কতদূর থেকে যে লোক এসেচে পোট্‌লাপুট্‌লি বেঁধে, ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়েও এসেচে অনেকে। এখানে থাক্‌বার জায়গা নেই, বড় একটা মাঠে লোকে

এখানে-ওখানে এই কার্ত্তিক মাসের হিমে চট, সতরঞ্চি, হোগলা, মাতুর যে যা সংগ্রহ করতে পেরেচে তাই দিয়ে থাকবার জায়গা তৈরি ক'রে তারই তলায় আছে—কেউবা আছে শুধু গাছতলাতে। যে যেখানে পারে, মাটি খুঁড়ে কি মাটির ঢেলা দিয়ে উনুন বানিয়ে রান্না করচে। একটা সজ্‌নে-গাছতলায় এক বুড়ী রান্না করছিল—সে একাই এসেচে হুগলী জেলার কোন গাঁ থেকে। তার এক নাতি হুগলীর এক উকিলের বাসায় চাকর, তার ছুটি নেই, বুড়ী প্রতিবছর একা আসে।

আমায় বললে—বড্ড জাগ্রত ঠাকুর গো বটতলার গোঁসাই। মোর মাল্‌সি গাছে কঁ্যাটাল মোটে ধরতো নি, জালি পড়ে আর খসে খসে যায়। তাই বল্লু বাবার থানে কঁ্যাটাল দিয়ে আস্‌বো, হে ঠাকুর কঁ্যাটাল যেন হয়। বললে না-পেত্যয় যাবে ছোটয়-বড়য় এ-বছর সতেরো গণ্ডা এঁচড় ধরেচে গোঁসাইয়ের কিরপায়।

আর এক জায়গায় খেজুরডালের কুঁড়েতে একটি বৌ ব'সে রাঁধচে। আর তার স্বামী কুঁড়ের বাইরে ব'সে খোল বাজিয়ে গান করচে। কাছে যেতেই বস্‌তে বললে। তারা জাতে কৈবর্ত্ত, বাড়ি খুলনা জেলায়, পুরুষটির বয়েস বছর চল্লিশ হবে। তাদের ছোট্ট একটি ছেলে মায়ের কাছে ব'সে আছে, তারই মাথার চুল দিতে এসেচে।

পুরুষটির নাম নিমচাঁদ মণ্ডল। স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই বড় ভক্ত। নিমচাঁদ আমার হাতে একখানা বই দিয়ে বললে—পড়ে শোনাও তো বাবু, দু-আনা দিয়ে মেলা থেকে কাল কেন্‌লাম একখানা। বইখানার নাম 'বটতলার কীর্ত্তন'। স্থানীয় ঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক তাতে অনেকগুলো ছড়া। বটতলার গোঁসাই ব্রহ্মার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এখানে এসে আস্তানা বেঁধেচেন, কলিরাজ ভয়ে তাঁর সঙ্গে এই সন্ধি করলে যে বটতলার হাওয়া যত দূর যাবে তত দূর পর্য্যন্ত কলির অধিকার থাকবে না। বটতলার গোঁসাই পাপীর মুক্তিদাতা, সর্ব্বজীবের আশ্রয়, সাক্ষাৎ শ্রীহরির একাদশ অবতার।

কলিতে নতুন রূপ গুন মন দিয়া
বটতলে স্থিতি হৈল ভক্তজন নিয়া
খেদে কহে কলিরাজ, এ বড় বিষম কাজ
মোর দশা কি হবে গোঁসাই
ঠাকুর কহিলা হেসে, মনে না করিহ ক্লেশে
থান ত্যজি কোথাও না যাই।
শ্রীদাম সুবল সনে হেথায় আসিব
বটমূলে বৃন্দাবন সৃষ্টি করি নিব।

নিমচাঁদ শুন্‌তে শুন্‌তে ভক্তিগদগদকণ্ঠে বললে—আহা! আহা! বাবার কত লীলেখেলা!

তার স্ত্রীও কুঁড়ের দোরগোড়ায় এসে বসে শুনচে। মানে বুঝলাম এরা নিজেরা পড়তে পারে না, বইপড়া শোনার আনন্দ এদের কাছে বড্ড নতুন, তা আবার যার ওরা ভক্ত, সেই বটতলার গোঁসাই সম্বন্ধে বই।

নিমচাঁদ বললে—আচ্ছা, বটতলার হাওয়া কত দূর যায় দা-ঠাকুর?

—কেন বল তো?

—এই যে বল্‌চে কলির অধিকার নেই ওর মধ্যি, তা কত দূর তাই শুধুচ্চি।

—কত দূর আর, ধর আধ কোশ বড়জোর—

নিমচাঁদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কি ভেবে বললে—কি করবো দা-ঠাকুর, দেশে লাঙল-গরু ক'রে ফেলেচি, কুড়ো-দুই জমিতে এবার বাগুন রুইয়ে রেখে এসেচি—নয়ত এ বাবার থান ত বিন্দাবন, আপনি পড়লেন—এ স্বগ্‌গো ছেড়ে বিলির মোষের মত বিলি ফিরে যাই দা-ঠাকুর? কি বলিস রে তুই, সরে আয় না এদিকে, দা-ঠাকুরকে লজ্জা কি, উনি তো ছেলেমানুষ।

নিমচাঁদের স্ত্রী গলার সুরকে খুব সংযত ও মিষ্টি ক'রে অপরিচিত পুরুষ-মানুষের সাম্‌নে কথা বল্‌তে গেলে মেয়েরা যেমন সুরে কথা বলে, তেম্‌নি ভাবে বললে—হ্যাঁ ঠিক তো। বাবার চরণের তলা ছেড়ে কোথাও কি যেতে ইচ্ছে করে?

নিমচাঁদ বললে—দু-মণ কোষ্টা ছিল ঘরে, তা বিক্রী ক'রে চল বাবার থানে বাবার ছিচরণ দর্শন ক'রে আসি আর অম্‌নি গঙ্গাচ্ছেনটাও সারবো। টাকা যোগাবেন, সেজন্যে ভাবিনে। ওরে শোন্, কাল তুই ধন্না দিবি সকালে, আজ রাতে ভাতে জল দিয়ে দিস্—

জিগ্যেস ক'রে জান্‌লাম ছেলের অসুখের জন্যে ধন্না দেবার ইচ্ছে আছে ওদের।

শিবাজী ও মুসলমান বন্দিনী

শ্রীশোভামল গেহলোট
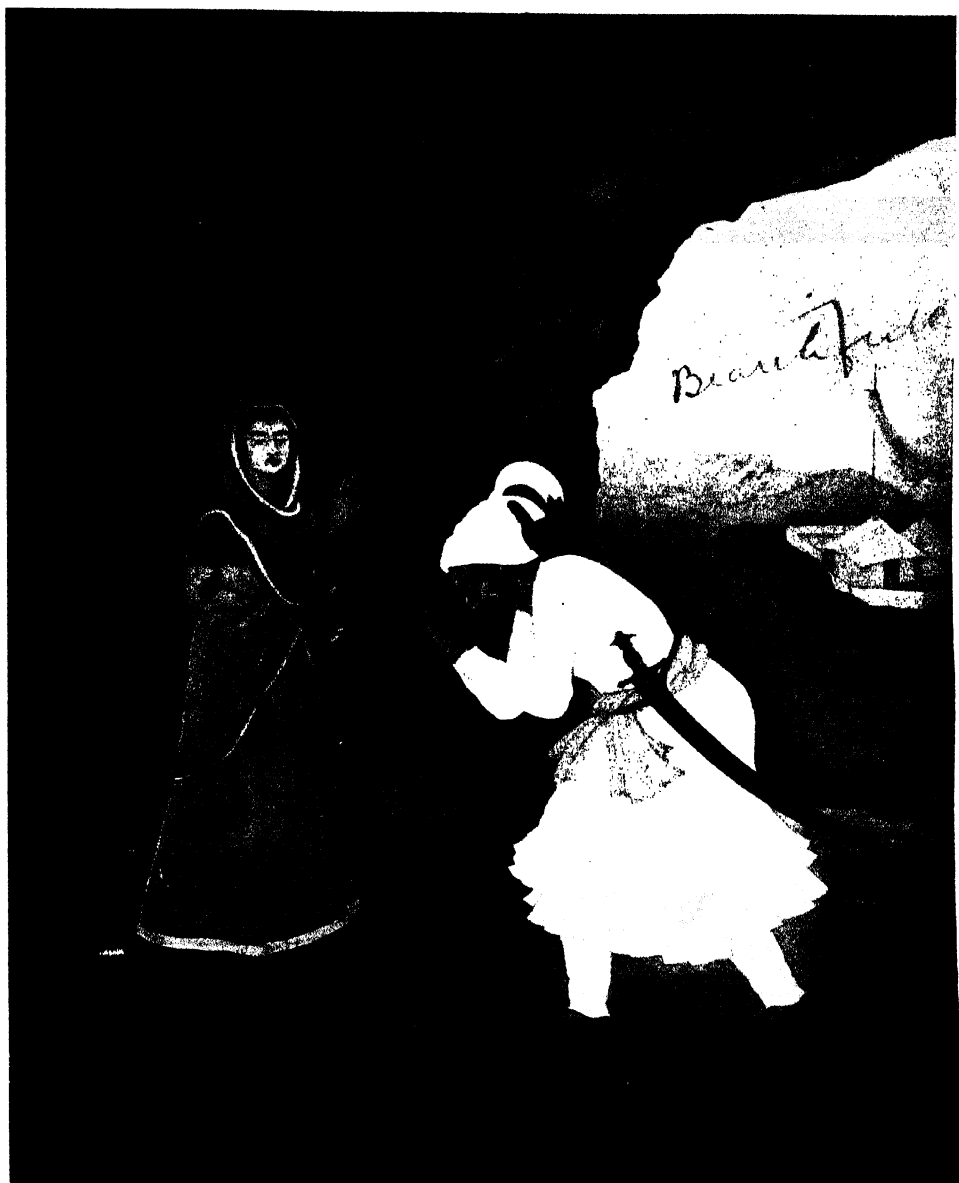
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নিমচাঁদের বৌ বললে—বুঝলেন দাদাঠাকুর, খোকার মামা ওর মুখ দেখে তিনটে টাকা দিলে খোকার হাতে। তখন পয়সার বড় কষ্ট যাচ্ছে, কোষ্টা তখন জলে, কাচলি তো পয়সা ঘরে আসবে? তো বলি না, এ টাকা খরচ করা হবে না। এ রইল তোলা বাবার থানের জন্যি। মোহন্ত-বাবার গদীতে দিয়ে আসব।

সেই দিন বিকালে নিমচাঁদ ও তার বৌ পূজো দিতে এল গদীতে। নবীন-মুহুরী তাদের কাছে রেট-মত প্রণামী ও পূজোর খরচ আদায় করলে অবিশ্যি—তা ছাড়া নিমচাঁদের বৌ নিজের হাতে সেই তিনটে টাকা বড়বাবুর সাম্‌নের রূপোর থালায় রেখে দিয়ে বড়বাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে কোলের খোকার মাথায় মুখে দিয়ে দিলে।

তার পর সে একবার চোখ তুলে মোহান্তদের দিকে চাইলে এবং এদের ঐশ্বর্য্যের ঘটাতেই সম্ভব অবাক হয়ে গেল—বুদ্ধিহীন চোখে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে টাকা-পয়সাতে পরিপূর্ণ ঝক্‌ঝকে রূপোর আলোটার দিকে বার-কতক চাইলে, রঙীন শালু ও গাঁদাফুলের মালায় মোড়া থামগুলোর দিকে চাইলে—জীবনে এই প্রথম সে গোঁসাইয়ের থানে এসেচে, সব দেখে-শুনে লোকের ভিড়ে, মোহান্ত মহারাজের আড়ম্বরে, অনবরত বর্ষণরত প্রণামীর ঝম্‌ঝমানি আওয়াজে সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। কতক ক্ষণ হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, বাইরে থেকে ক্রমাগত লোক ঢুকচে, তাকে ক্রমশঃ ঠেলে একধারে সরিয়ে দিচ্ছে, তবুও সে দাঁড়িয়েই আছে।

ওকে কে এক জন ঠেলা দিয়ে এগিয়ে আসতে গেল, আমি ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারি নি। ওর মুখচোখের মুগ্ধ ভক্তিপ্লুত দৃষ্টি আমারও মুগ্ধ করেচে—এ এক নতুন অভিজ্ঞতা আমার জীবনের, এই বাজে শালুর বাহার আর লোকের হৈ চৈ আর মেজবাবু, বড়বাবুর চশমামণ্ডিত দাম্ভিক মুখ দেখে এত ভাব ও ভক্তি আসে!—যে ঠেলা দিয়ে এদিকে আস্‌ছিল, আমি তাকে ধমক দিলুম। তার পর ওর চমক ভাঙ্‌তে ফিরে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ওরা চলে গেলে একটি বৃদ্ধা এল, তার বয়েস অনেক হয়েচে, বয়েসে গলার সুর কেঁপে গিয়েচে, হাত কাঁপচে, সে তার আঁচল থেকে একটি আধুলি খুলে থালায় দিতে গেল। নবীন-মুহুরী বললে—রও গো, রাখ—আধুলি কিসের?

বুড়ী বললে—এই-ই ঠা-কুরে-র মা-ন-ত শো-ধে-র পে-র্-ণা-মী—

নবীন-মুহুরী বললে—পাঁচ সিকের কমে ভোগের পূজো নেই—পাঁচ সিকেতে এক টাকা গদীর নজর—

বুড়ী শুনতে পায় না, বললে—কত?

নবীন আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে বললে—এক টাকা—

বুড়ী বললে—আর নে-ই-ই, মা-হু-র কি-নে-লা-ম ছ-আ-না-র, আর—

নবীন-মুহুরী আধুলি ফেরৎ দিয়ে বললে—নিয়ে যাও, হবে না। আর আট আনা নিয়ে এস—

বড়বাবু একটা কথাও বললেন না। বুড়ী কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গেল এবং ঘণ্টাখানেক পরে সিকিতে, দুআনিতে, পয়সাতে একটা টাকা নিয়ে এসে প্রণামীর থালায় রাখলে।

ওরা চলে গেলে আমার মনে হ'ল এই সরল, পরম বিশ্বাসী পল্লীবধূ, এই বৃদ্ধা ওদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ কাকে দিয়ে গেল—মেজবাবুকে বড়বাবুকে? এই এত লোক এখানে এসেচে, এরা সবাই চাষী গরিব গৃহস্থ, কি বিশ্বাসে এখানে এসেচে জানি নে—কিন্তু অম্লান বদনে খুশীর সঙ্গে এদের টাকা দিয়ে যাচ্চে কেন? এই টাকায় কল্‌কাতায় ওঁদের স্ত্রীরা গহনা পরবেন, মোটর চড়বেন, থিয়েটার দেখ্‌বেন, ওঁরা মামলা করবেন, বড়মানুষী সাহেবিয়ানা করবেন—ছোটবাবু বন্ধুবান্ধব নিয়ে গানবাজনার মজলিসে চপ-কাটলেট্ ওড়াবেন, সেই জন্যে?

পরদিন সকালে দেখলাম নিমচাঁদের স্ত্রী পুকুরে স্নান ক'রে সারাপথ সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করতে করতে ধুলোকাদা-মাথা গায়ে বটতলায় ধর্ণা দিতে চলেচে—আর নিমচাঁদ ছেলে কোলে নিয়ে ছলছল চোখে তার পাশে পাশে চলেচে।

সেই দিন রাত্রে শুনলাম মেলায় কলেরা দেখা দিয়েচে। পরদিন দুপুরবেলা দেখি বটতলার সাম্‌নের মাঠটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েচে, অনেকেই পালিয়েচে। নিমচাঁদের কুঁড়েঘরের কাছে এসে দেখি নিমচাঁদের স্ত্রী বসে—আমায় দেখে কেঁদে উঠ্‌ল। নিমচাঁদের কলেরা হয়েচে কাল রাত্রে—মেলার যারা তদারক করে, তারা ওকে কোথায় নাকি নিয়ে যেতে

চেয়েচে, মাঠের ওদিকে কোথায়। আমি ঘরে ঢুকে দেখি নিমচাঁদ শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করচে, খুব ঘামচে।

নিমচাঁদের স্ত্রী কেঁদে বললে—কি করি দাদাঠাকুর, হাতে শুধু যাবার ভাড়াটা আছে—কি করি কোথা থেকে—

মেজবাবুকে কথাটা বললাম গিয়ে। তিনি বললেন—লোক পাঠিয়ে দিচ্চি, ওকে সিগ্রিগেশন্‌ ক্যাম্পে নিয়ে যাও—মেলার ডাক্তার আছে সে দেখ্‌বে—

নিমচাঁদের বৌ-এর কি কান্না ওকে নিয়ে যাবার সময়। আমরা বোঝালুম অনেক। ডাক্তার ইন্‌জেক্‌সন দিলে। মাঠের মধ্যে মাদুর দিয়ে সিগ্রিগেশন্‌ ক্যাম্প করা হয়েচে—অতি নোংরা বন্দোবস্ত। সেখানে সেবাশুশ্রূষার কোনো ব্যবস্থাই নেই। ভাব্‌লুম চাকুরী যায় যাবে, ওকে বাঁচিয়ে তুলব, অন্ততঃ বিনা তদারকে ওকে মরতে দেবো না। সারারাত জেগে রোগীকে দেখাশুনো করলুম একা। সিগ্রিগেশন্‌ ক্যাম্পে আরও চারটি রোগী এল—তিনটে সন্ধ্যার মধ্যেই মারে গেল। মেলার ডাক্তার অবিশ্যি নিয়ম-মত দেখলে। এদের পয়সা নিয়ে যারা বড়-মানুষ, তারা চোখে এসে দেখেও গেল না কাউকে। রাত্রিটা কোনো রকমে কাটিয়ে বেলা উঠ্‌লে নিমচাঁদও মারা গেল। সে এক অতি করুণ ব্যাপার! ওদের দেশের লোক খুঁজে বার ক'রে নিমচাঁদের সৎকারের ব্যবস্থা করা গেল। নিমচাঁদের স্ত্রীর দিকে আমি আর চাইতে পারি নে—বটতলায় ধর্ণা দেওয়ার দিন থেকে সেই যে সে উপবাস ক'রে আছে, গোলমালে আর তার খাওয়াই হয় নি। রুক্ষ চুল একমাথা, সেই ধূলিধূসরিত কাপড়—খবর পেয়ে সে ধর্ণা ফেলে বটতলা থেকে উঠে এসেচে—চোখ কেঁদে কেঁদে লাল হয়েচে, যেন পাগ্‌লীর মত দৃষ্টি চোখে। এখন আর সে কাঁদচে না, শুধু কাঠের মত বসে আছে, কথাও বলে না, কোন দিকে চায়ও না।

মেজবাবুকে বলাতে তিনি ওকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার খরচ দু-টাকা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু সে আমি যথেষ্ট বললাম ও অনুরোধ করলাম ব'লে। আরও কত যাত্রী এ-রকম মরে গেল—বা তাদের কি ব্যবস্থা হ'ল এ-সব দেখবার দায়িত্ব এদেরই তো। ওরাই রইল নির্ব্বিকার ভাবে ব'সে। আমার কাছে কিছু ছিল, যাবার সময় নিমচাঁদের স্ত্রীর হাতে দিলুম। চোখের জল রাখ্‌তে পারি নে, যখন সে চলে গেল।

দিন-দুই পরে রাত্রে বসে আমি ও নবীন-মুহুরী হিসেব মেলাচ্চি মেলার দেনা-পাওনার। বেশ জ্যোৎস্না রাত, কার্ত্তিকের সংক্রান্তিতে পরশু মেলা শেষ হ'য়ে গিয়েচে, বেশ শীত আজ রাত্রে।

এমন সময় হঠাৎ আমার কি হ'ল বলতে পারিনে—দেখ্‌তে দেখ্‌তে নবীন-মুহুরী, মেলার আটচালা ঘর সব যেন মিলিয়ে গেল। আমি যেন এক বিবাহ-সভায় উপস্থিত হয়েচি—অবাক হয়ে চেয়ে দেখি সীতার বিবাহ-সভা। জ্যাঠামশায় কন্যাসম্প্রদান করতে বসেচেন, খুব বেশী লোকজনের নিমন্ত্রণ হয় নি, বরপক্ষেও বরযাত্র বেশী নেই। দাদাকেও দেখলুম—দাদা ব'সে ময়দা ঠাসচে।...আরও সব কি কি···যেন কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেন সবটা দেখ্‌চি—খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট।

চমক ভাঙ্‌লে দেখি নবীন-মুহুরী আমার মাথায় জল দিচ্চে। বললে—কি হয়েচে তোমার, মাঝে মাঝে ফিট্‌ হয় না-কি ?

আমি চোখ মুছে বললুম—না। ও কিছু না—

আমার তখন কথা বলতে ভাল লাগ্‌চে না। সীতার বিবাহ নিশ্চয়ই হচ্চে, আজ এখুনি হচ্চে। আমি ওকে বড় ভালবাসি—আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে জ্যাঠামশায় ওর বিবাহ দিতে পারবেন না। আমি সব দেখেচি।

নবীন-মুহুরীকে বললাম—তুমি আমাকে ছুটি দাও আজ, শরীরটা ভাল নেই, একটু শোব।

পরদিন বড়বাবুর চাকর কলকাতা থেকে এল। মায়ের একখানা চিঠি কলকাতার ঠিকানায় এসে পড়েছিল, মায়ের জবানি, জ্যাঠামশায়ের লেখা আসলে। ২রা অগ্রহায়ণ সীতার বিয়ে, সেই জ্যাঠামশায়ের ঠিক-করা পাত্রের সঙ্গেই। তিনি কথা দিয়েচেন, কথা খোয়াতে পারেন না। বিশেষ, অত বড় মেয়ে ঘরে রেখে পাঁচ জনের কথা সহ্য করতে প্রস্তুত নন। আমরা কোন্‌ কালে কি করব তার আশায় তিনি কতকাল বসে থাকেন—ইত্যাদি।

বেচারী সীতা! ওর সাবান-মাখা, চুলবাঁধা, মিথ্যে

সৌখীনতার অক্ষম চেষ্টা মনে পড়ল। কত ক'রে ওর মুখের দিকে চেয়ে এত কাল কিছু গ্রাহ্য করিনি! বেশ দেখ্‌তে পেলাম ওর ঘন কাল চুলের সিঁতিপাটি ব্যর্থ হয়ে গেল—ওর শুভ্র, নিষ্পাপ জীবন নিয়ে সবাই ছিনিমিনি খেল্‌লে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

এখান থেকে কল্‌কাতা যাবার সময় হয়ে এল। বিকেলে আমি বটতলার পুকুরের ঘাটে বসে মাছ-ধরা দেখছি, নবীন-মুহুরী এসে বললে—তোমায় ডাক্‌চেন মেজবাবু। ওর মুখ দেখে আমার মনে হ'ল গুরুতর একটা কিছু ঘটেচে কিংবা ও-ই আমার নামে কি লাগিয়েচে। নবীন-মুহুরী এ-রকম বার-কয়েক আমার নামে লাগিয়েচে এর আগেও। কারণ তার চুরির বেজায় অসুবিধে ঘটচে আমি থাকার দরুণ।

মেজবাবু চেয়ারে বসে, কুঞ্জ-নায়েবও সেখানে দাঁড়িয়ে।

মেজবাবু আমাকে মানুষ বলেই কোনো দিন ভাবেন নি। এ-পর্য্যন্ত আমিও পারতপক্ষে তাঁকে এড়িয়েই চলে এসেচি। লোকটার মুখের উগ্র দাম্ভিকতা আমাকে ওর সাম্‌নে যেতে উৎসাহিত করে না। আমায় দেখে বললেন—শোনো এদিকে। কল্‌কাতায় গিয়ে তুমি অন্য জায়গায় চাকুরীর চেষ্টা করবে। তোমাকে এক মাসের নোটিশ দিলাম।

—কেন, কি হয়েচে?

—তোমার মাথা ভাল না, এ আমিও জানি, নবীনও দেখেচে বল্‌চে। হিসেব-পত্রে প্রায়ই গোলমাল হয়। এ-রকম লোক দিয়ে আমার কাজ চল্‌বে না। ষ্টেটের কাজ তো ছেলেখেলা নয়?

নবীন এবার আমায় শুনিয়েই বললে—এই তো সেদিন আমার সাম্‌নেই হিসেব মেলাতে মেলাতে মৃগীরোগের মত হয়ে গেল—আমি তো ভয়েই অস্থির—

মেজবাবুকে বিদ্বান ব'লে আমি সম্ভ্রমের চোখেও দেখতাম। বললাম—দেখুন, তা নয়। আপনি তো সব বোঝেন, আপনাকে বলচি। মাঝে মাঝে আমার কেমন একটা অবস্থা হয় শরীরের ও মনের, সেটা ব'লে বোঝাতে পারি নে—কিন্তু তখন এমন সব জিনিষ দেখি, সহজ অবস্থায় তা দেখা যায় না। ছেলেবেলায় আরও অনেক দেখতুম, এখন কমে গিয়েচে। তখন বুঝতাম না, মনে ভয় হ'ত, ভাবতাম এ-সব মিথ্যে, আমার বুঝি কি রোগ হয়েচে। কিন্তু এখন বুঝেচি ওর মধ্যে সত্যি আছে অনেক।

মেজবাবু কৌতুক ও বিদ্রূপ মিশ্রিত হাসি-মুখে আমার কথা শুনছিলেন—কথা শেষ হ'লে তিনি কুঞ্জ-নায়েবের দিকে চেয়ে হাস্‌লেন। নবীন-মুহুরীর দিকে চাইলেন না, কারণ সে অনেক কম দরের মানুষ। ষ্টেটের নায়েবের সঙ্গে তবুও দৃষ্টি-বিনিময় করা চলে। আমার দিকে চেয়ে বললেন—কত দূর পড়াশুনা করেচ তুমি?

—আই-এ পাস করেছিলাম শ্রীরামপুর কলেজ থেকে—

—তাহ'লে তোমায় বোঝানো আমার মুস্কিল হবে। মোটের ওপর ও-সব কিছু না। নিউরোটিক যারা—নিউরোটিক বোঝ? যাদের স্নায়ু দুর্ব্বল তাদের ওই রকম হয়। রোগই বইকি, ও এক রকম রোগ—

আমি বললাম—মিথ্যে নয় যে তা আমি জানি। আমি নিজের জীবনে অনেক বার দেখেচি—ও-সব সত্যি হয়েচে। তবে কেন হয় এইটেই জানি নে, সেইজন্যেই আপনাকে জিগ্যেস করেচি। আমি সেণ্ট ফ্রান্সিস্ অফ্ আসিসির লাইফ্-এ পড়েচি তিনিও এ-রকম দেখতেন—

মেজবাবু ব্যঙ্গের সুরে বললেন—তুমি তাহ'লে সেণ্ট হয়ে গিয়েচ দেখচি? পাগল কি আর গাছে ফলে?

নবীন ও কুঞ্জ দু-জনেই মেজবাবুর প্রতি সম্ভ্রম বজায় রেখে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

আমি নানা দিক থেকে খোঁচা খেয়ে মরীয়া হয়ে উঠলাম। বললাম—আর শুধু ওই দেখি যে তা নয়, অনেক সময় মরে গিয়েচে এমন মানুষের আত্মার সঙ্গে কথা বলেচি, তাদের দেখতে পেয়েচি।

নবীন-মুহুরীর বুদ্ধিহীন মুখে একটা অদ্ভুত ধরণের অবিশ্বাস ও ব্যঙ্গের ছাপ ফুটে উঠল, কিন্তু নিজের বুদ্ধির ওপর তার বোধ হয় বিশেষ আস্থা না থাকাতে সে মেজবাবুর মুখের দিকে চাইলে। মেজবাবু এমন ভাব দেখালেন যে, এ বদ্ধ উন্মাদের সঙ্গে আর কথা ব'লে লাভ কি আছে! তিনি কুঞ্জ-নায়েবের দিকে এভাবে চাইলেন যে একে আর

এখানে কেন? পাগলামি চড়ে বসলেই একটা কি ক'রে ফেল্‌বে এক্ষুনি!

আমি আরও মরীয়া হয়ে বললাম—আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন আর নাই করুন তাতে যে-জিনিষ সত্যি তা মিথ্যে হয়ে যাবে না। আমার মনে হয় আপনি আমার কথা বুঝতেও পারেন নি। যার নিজের অভিজ্ঞতা না হয়েচে, সে এ-সব বুঝতে পারে না, এ-কথা এতদিনে আমি বুঝেচি। খুব বেশী লেখাপড়া শিখলেই বা খুব বুদ্ধি থাক্‌লেই যে বোঝা যায়, তা নয়। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে বলি, আমি যে-ঘরটাতে থাকি, ওর ওপাশে যে ছোট্ট বাড়িটা আছে, ভাঙা রোয়াক, যার সাম্‌নে—ওখানে আমি এক জন বুড়োমানুষের অস্তিত্ব অনুভব করতে পেরেচি—কি করে পেরেচি, সে আমি নিজেই জানি নে—খুব তামাক খেতেন, বয়েস অনেক হয়েছিল, খুব রাগী লোক ছিলেন, তিনি মারা গিয়েচেন কি বেঁচে আছেন তা আমি জানি নে। ওই জায়গাটায় গেলেই এই ধরণের লোকের কথা আমার মনে হয়। বলুন তো ওখানে কেউ ছিলেন এ-রকম?

কুঞ্জ-নায়েবের সঙ্গে মেজবাবুর অর্থসূচক দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। মেজবাবু শ্লেষের সঙ্গে বললেন—তোমাকে যতটা সিম্পল্ ভেবেছিলাম, তুমি তা নও দেখ্‌চি। তোমার মধ্যে ভণ্ডামিও বেশ আছে—তুমি বল্‌তে চাও তুমি এত দিন এখানে এসেচ, তুমি কারও কাছে শোন নি ওখানে কে থাকতো?

—আপনি বিশ্বাস করুন আমি তা শুনি নি। কে আমায় বলেচে আপনি খোঁজ নিন্?

—ওখানে আমাদের আগেকার নায়েব ছিল, ওটা তার কোয়ার্টার ছিল, সে বছর-চারেক আগে মারা গিয়েচে, শোন নি এ কথা?

—না আমি শুনি নি। আরও কথা বলি শুনুন, আপনার ছেলে হওয়ার আগের দিন কল্‌কাতায় আপিসে আপনাকে কি বলেছিলুম মনে আছে? বলেছিলুম একটি খোকা দাঁড়িয়ে আছে—দরজা খুলে মেজবৌরাণী এসে তাকে নিয়ে গেলেন—এ-কথা বলেছিলুম কি না? মনে ক'রে দেখুন।

—হ্যাঁ আমার খুব মনে আছে। সেও তুমি জান্‌তে না যে আমার স্ত্রী আসন্নপ্রসবা ছিল? যদি আমি বলি তুমি একটা বেশ চাল চেলেছিলে—যে কোনো একটি সন্তান তো হ'তই—তুমি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছিলে, দৈবাৎ লেগে গিয়েছিল। শার্লাটানরা ও-রকম বুজরুকী করে—আমি কি বিশ্বাস করি ওসব ভেবেচ?

—বুজরুকী কিসের বলুন? আমি কি তার জন্যে আপনার কাছে কিছু চেয়েছিলুম? বা আর কোনোদিন সে-কথার কোনো উল্লেখ করেছিলুম? আমি জানি আমার এ একটা ক্ষমতা—ছেলেবেলায় দার্জ্জিলিঙের চা-বাগানে আমরা ছিলাম, তখন থেকে আমার এ-ক্ষমতা আছে। কিন্তু এ দেখিয়ে আমি কখনও টাকা-রোজগারের চেষ্টা তো করিনি কারোর কাছে? বরং বলিই নে—

মেজবাবু অসহিষ্ণুভাবে বললেন—অল্ ফিডলষ্টিক্—মনের ব্যাপার তুমি কিছু জানো না। তোমাকে বোঝাবার উপায়ও আমার নেই। ইট্ প্লেজ্ কুইয়ার্ ট্রিক্‌স্ উইথ্ আস্—যদি ধরে নিই তুমি মিথ্যেবাদী নও—ইউ মে বি এ সেল্‌ফ্ ডিলিউডেড্ ফুল্ এবং আমার মনে হয় তুমি তাই-ই। আর কিছু নয়। যাও এখন—

আমি চলে এলাম। নবীন-মুহুরী আমার পিছু পিছু এসে বললে—তোমার সাহস আছে বল্‌তে হবে—মেজবাবুর সঙ্গে অমন ক'রে তর্ক আজ পর্য্যন্ত কেউ করে নি। না! যা হোক্, তোমার সাহস আছে। আমার তো ভয় হচ্ছিল এই বুঝি মেজবাবু রেগে ওঠেন—

আমি জানি নবীনই আমার নামে লাগিয়েছিল, কিন্তু এ নিয়ে ওর সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করবার প্রবৃত্তি আমার হ'ল না। কেবল একটা কথা ওকে বললাম। দেখ, নবীন-দা, চাকুরীর ভয় আমি আর করি নে। যে-জন্যে চাকুরী করছিলাম, সে কাজ মিটে গিয়েচে। এখন আমার চাকরী করলেও হয়, না-করলেও হয়। ভেবো না, আমি নিজেই শীগগির চলে যাবো ভাই।

ক-দিন ধরে একটা কথা ভাবছিলাম। এই যে এতগুলো পাড়াগেঁয়ে গরিব চাষীলোক এখানে পূজো দিতে এসেছিল—এরা সকলেই মূর্খ, ভগবানকে এরা সে ভাবে জানে না, এরা চেনে বটতলার গোঁসাইকে। কে

বটতলার গোঁসাই? হয়ত এক জন ভক্ত বৈষ্ণব, গ্রাম্য লোক, বছর-পঞ্চাশ আগে থাকত ওই বটতলায়। সেই থেকে লৌকিক প্রবাদ এবং বোধ হয় মেজবাবুদের অর্থ-গৃধ্নুতা দুটোতে মিলে বটতলাটাকে করেচে পরম তীর্থস্থান। কোথায় ভগবান, কোথায় প্রথিতবশাঃ ঐতিহাসিক অবতারের দল—এই বিপুল জনসঙ্ঘ তাঁদের সন্ধানই রাখে না হয়ত। এদের এ কি ধর্ম্ম? ধর্ম্মের নামে ছেলেখেলা।

কিন্তু নিমচাঁদকে দেখেচি। তার সরল ভক্তি, তাদের ত্যাগ। তার স্ত্রীর চোখে যে অপূর্ব্ব ভাবদৃষ্টি, যা সকল ধর্ম্মবিশ্বাসের উৎসমুখ—এ-সব কি মূলহীন, ভিত্তিহীন জলজ শেওলার মত মিথ্যার মহাসমুদ্রে ভাসমান? এ-রকম কত নিমচাঁদ এসেছিল মেলায়। জ্যাঠাইমাদের আচারের শেকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ঐশ্বর্য্যের ঘটা দেখানো দেবার্চ্চনার চেয়ে, এ আমার ভাল লেগেচে। ঘুঘুড়ির সেই ষষ্ঠীমন্দিরের মত।

কোন্ দেবতার কাছে নিমচাঁদের তিনটে টাকার ভোগ অর্ঘ্য গিয়ে পৌঁছুলো জীবনের শেষনিঃশ্বাসের সঙ্গে পরম ত্যাগে সে যা নিবেদন করলে?

আর একটা কথা বুঝেচি। কাউকে কোনো কথা ব'লে বুঝিয়ে বিশ্বাস করানো যায় না। মনের ধর্ম্ম মেজবাবু আমায় কি শেখাবেন, আমি এটুকু জেনেচি নিজের জীবনে মানুষের মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না সে জিনিষকে, যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরের। আমি যা নিজের চোখে কতবার দেখলুম, বাস্তব ব'লে জানি—ঘরে-বাইরে সব লোক বললে ও মিথ্যে। পণ্ডিত ও মূর্খ এখানে সমান—ধরাছোঁয়ার গণ্ডীর সীমানা পার হয়ে কারুর মন অনন্ত অজানার দিকে পাড়ি দিতে চায় না। যা সত্যি, তা কি মিথ্যা হয়ে যাবে?

২

কলকাতায় ফিরে এলাম বড়বাবুর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে। জামাইকে বিয়ের রাত্রে বেবি অষ্টিন্ গাড়ী যৌতুক দেওয়া হ'ল—বিবাহ-মণ্ডপের যেরূপ বাঁধতে ও ফুল দিয়ে সাজাতেই ব্যয় হ'ল আট-শ টাকা। বিয়ের পরে ফুলশয্যায় তত্ত্ব সাজাতে আট-দশ জন লোক হিমসিম খেয়ে গেল। ছোটবাবুর বন্ধুবান্ধবদের এক দিন পৃথক ভোজ হ'ল, সেদিন সখের থিয়েটারে হাজার টাকা গেল এক রাত্রে। তবুও তো শুনলাম এ তেমন কিছু নয়—এরা পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ জমিদার মাত্র, খুব বড়মানুষী করবে কোথা থেকে।

ফুলশয্যায় তত্ত্ব সাজাতে খুব খাটুনি হ'ল। দু-মণ দই, আধ মণ ক্ষীর, এক মণ মাছ, লরি-বোঝাই তরি-তরকারী, চল্লিশখানা সাজানো থালায় নানা ধরণের তত্ত্বের জিনিষ—সব বন্দোবস্ত ক'রে তত্ত্ব বার ক'রে ঝি-চাকরের সারি সাজাতে ও তাদের রওনা করতে—সে এক রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার!

ওদের রঙীন কাপড়-পরা ঝি-চাকরের লম্বা সারির দিকে চেয়ে মনে হ'ল এই বড়মানুষির খরচের দরুণ নিমচাঁদের স্ত্রী তিনটে টাকা দিয়েচে। অথচ এই হিমবর্ষী অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রে হয়ত সে অনাথা বিধবার খেজুর-ডালের ঝাঁপে শীত আটকাচ্চে না, সেই যে বুড়ী যার গলা কাঁপছিল, তার সেই ধার-করে দেওয়া আট আনা পয়সা এর মধ্যে আছে। ধর্ম্মের নামে এরা নিয়েচে, ওরা স্বেচ্ছায় হাসিমুখে দিয়েচে।

সব মিথ্যে। ধর্ম্মের নামে এরা করেচে ঘোর অধর্ম্ম ও অবিচারের প্রতিষ্ঠা। বটতলার গোঁসাই এদের কাছে ভোগ পেয়ে এদের বড়মানুষ ক'রে দিয়েচে, লক্ষ গরিব লোককে মেরে—জ্যাঠামশায়দের গৃহদেবতা যেমন তাদের বড় ক'রে রেখেছিল, মাকে, সীতাকে ও ভুবনের মাকে করেছিল ওদের ক্রীতদাসী।

সত্যিকার ধর্ম্ম কোথায় আছে? কি ভীষণ মোহ, অনাচার ও মিথ্যের কুহকে ঢাকা পড়ে গেছে দেবতার সত্যরূপ সেদিন, যেদিন থেকে এরা হৃদয়ের ধর্ম্মকে ভুলে অর্থহীন অনুষ্ঠানকে ধর্ম্মের আসনে বসিয়েচে।

দাদার একখানা চিঠি পেয়ে অবাক্ হয়ে গেলাম। দাদা যেখানে কাজ করে, সেখানে এক গরিব ব্রাহ্মণের একটি মাত্র মেয়ে ছিল, ওখানকার সবাই মিলে ধরে-পাকড়ে মেয়েটির সঙ্গে দাদার বিয়ে দিয়েচে। দাদা নিতান্ত ভালমানুষ, যে যা বলে কারও কথা ঠেলতে তো পারে না? কাউকে জানানো হয় নি, পাছে কেউ বাধা দেয়, তারাই জানাতে

দেয় নি। এদিকে জ্যাঠামশায়ের ভয়ে বাড়িতে বৌ নিয়ে যেতে সাহস করচে না, আমায় লিখেচে সে বড় বিপদে পড়েচে, এখন সে কি করবে? চিঠির বাকী অংশটা নব-বধূর রূপগুণের উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতিতে ভর্ত্তি।

"...জিতু, আমার বড় মনে কষ্ট, বিয়ের সময় তোকে খবর দিতে পারি নি, তুই একবার অবিশ্যি অবিশ্যি আস্‌বি, তোর বউদিদির বড় ইচ্ছে তুই একবার আসিস্‌। মায়ের সম্বন্ধে কি করি আমায় লিখবি। সেখানে তোর বৌদিদিকে নিয়ে যেতে আমার সাহসে কুলোয় না। ওরা ঠিক কুলীন ব্রাহ্মণ নয়, আমাদের স্বঘরও নয়, অত্যন্ত গরিব, আমি বিয়ে না করলে মেয়েটি পার হবে না সবাই বললে, তাই বিয়ে করেচি। কিন্তু তোর বৌদিদি বড় ভাল মেয়ে, ওকে যদি জ্যাঠামশায় ঘরে নিতে না চান কি অপমান করেন, সে আমার সহ্য হবে না।..."

পত্র পড়ে বিস্ময় ও আনন্দ দুই-ই হ'ল। দাদা সংসারে বড় একা ছিল, ছেলেবেলা থেকে আমাদের জন্যে খাটচে, জীবনটাই নষ্ট করলে সেজন্যে, অথচ ওর দ্বারা না হ'ল বিশেষ কোনো উপকার মায়ের ও সীতার, না হ'ল ওর নিজের। ভালই হয়েচে, ওর মত স্নেহপ্রবণ ত্যাগী ছেলে যে একটি আশ্রয়নীড় পেয়েচে, ভালবাসবার ও ভালবাসা পাবার পাত্র পেয়েচে, এতে ওর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলুম। কত রাত্রে শুয়ে শুয়ে দাদার দুঃখের কথা ভেবেচি!

মাকে কাছে নিয়ে আসতে পত্র লিখে দিলাম দাদাকে। জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে রাখবার আর দরকার নেই। আমি শীগগিরই গিয়ে দেখা করবো।

* * * *

মাঘ মাসের প্রথমে আমি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মনে কেমন একটা উদাস ভাব, কিসের একটা অদম্য পিপাসা। আমার মনের সঙ্গে যা খাপ খায় না, তা আমার ধর্ম্ম নয়। ছেলেবেলা থেকে আমি যে অদৃশ্য জগতের বার-বার সম্মুখীন হয়েচি, অথচ যাকে কখনও চিনি নি, বুঝি নি—তার সঙ্গে যে-ধর্ম্ম খাপ খায় না, সেও আমার ধর্ম্ম নয়।

অথচ চারিদিকে দেখচি সবাই তাই। তারা সৌন্দর্য্যকে চেনে না, সত্যকে ভালবাসে না, কল্পনা এদের এত পঙ্গু যে, যে-খোঁটায় বদ্ধ হয়ে ঘাসজল খাচ্ছে গরুর মত—তার বাইরে ঊর্দ্ধের নীলাকাশের দেবতার যে-সৃষ্টি বিপুল ও অপরিমেয় এরা তাকে চেনে না।

বছরখানেক ঘুরে বেড়ালুম নানা জায়গায়। কত বার ভেবেচি একটা চাকুরী দেখে নেবো, কিন্তু শুধু ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কিছু ভাল লাগতো না। যেখানে শুনতাম কোনো নতুন ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, কি সাধু-সন্ন্যাসী আছে, সেখানে যেন আমায় যেতেই হবে, এমন হয়েছিল। কাল্‌নার পথে গঙ্গার ধারে এক দিন সন্ধ্যা হয়ে গেল।

কাছেই একটা ছোট গ্রাম, চাষী কৈবর্ত্তদের বাস। ওখানেই আশ্রয় নেবো ভাবলাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খড়ের ঘর, বেশ নিকোনো-পুছোনো, উঠোন পর্য্যন্ত এমন পরিষ্কার যে সিঁদুর পড়লে উঠিয়ে নেওয়া যায়। সকলের ঘরেই ধানের ছোটবড় গোলা, বাড়ির সাম্‌নে পিছনে ক্ষেত-খামার। ক্ষেতের বেড়ায় মটরশুঁটির ঝাড়ে শাদা গোলাপী ফুল ফুটে মিষ্টি সুগন্ধে সন্ধ্যার অন্ধকার ভরিয়ে রেখেচে।

একজন লোক গোয়াল-ঘরে গরু বাঁধছিল; তাকে বললাম—এখানে থাকবার জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে? সে বললে—কোথেকে আসা হচ্চে? আপনারা? ব্রাহ্মণ শুনে নমস্কার ক'রে বললে—ওই দিকে একটু এগিয়ে যান—আমাদের অধিকারী-মশাই থাকেন, তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁর ওখানে দিব্যি থাকবার জায়গা আছে।

একটু দূরে গিয়ে অধিকারীর ঘর। উঠোনের এক পাশে একটা লেবুগাছ। বড় আটচালা ঘর, উঁচু মাটির দাওয়া। একটি ছোট ছেলে বললে, অধিকারী বাড়ি নেই, হলুদপুকুরে কীর্ত্তনের বায়না নিয়ে গাইতে গিয়েচে—কাল আসবে।

আমি চলে যাচ্ছি এমন সময়ে একটি মেয়ে ঘরের ভেতর থেকে বললে—চলে কেন যাবেন? পায়ের ধুলো দিয়েচেন যদি রাতে এখানে থাকুন না কেনে?

কথার মধ্যে রাঢ় দেশের টান। মেয়েটি তার পর এসে দাওয়ায় দাঁড়াল, বয়েস সাতাশ-আটাশ হবে, রং ফর্সা, হাতের টেমির আলোর কপালের উল্কি দেখা যাচ্ছে।

মেয়েটি দাওয়ায় একটা মাতুর বিছিয়ে দিয়ে দিলে, এক ঘটি জল নিয়ে এল। আমি হাত-পা ধুয়ে সুস্থ হয়ে বসলে মেয়েটি বললে—রান্নার কি যোগাড় ক'রে দেব ঠাকুর?

আমি বললাম—আপনারা যা রাঁধবেন, তাই খাবো।

রাত্রে দাওয়ায় শুয়ে রইলাম। পরদিন তুপুরের পরে অধিকারী-মশাই এল। পেছনে জন-তিনেক লোক, এক জনের পিঠে একটা খোল বাঁধা। তামাক খেতে খেতে আমার পরিচয় নিলে, খুব খুশী হ'ল আমি এসেচি বলে।

বিকেলে উল্কি-পরা স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কি নিয়ে তার ঝগড়া বেধে গেল। স্ত্রীলোকটি বলচে শুনলাম—অমন যদি করবি মিন্সে, তবে আমি বলরামপুরে চলে যাব। কে তোর মুখনাড়ার ধার ধারে? একটা পেট চলে যাবে রে, সেজন্যে তোর তোয়াক্কা রাখি ভেবেচিস্ তুই!

আগুনে জল পড়ার মত অধিকারীর রাগ একদম শান্ত হয়ে গেল। রাত্রে ওদের উঠোনে প্রকাণ্ড কীর্ত্তনের আসর বসল। রাত তিনটে পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হ'ল। আসরসুদ্ধ সবাই হাত তুলে নাচতে সুরু করলে হঠাৎ। দু-তিন ঘণ্টা উদ্দণ্ড নৃত্যের পরে ক্লান্ত হয়ে পড়ার দরুণই হোক বা বেশী রাত হওয়ার জন্যেই হোক্, তারা কীর্ত্তন বন্ধ করলে।

আমি যেতে চাই, ওরা—বিশেষ ক'রে সেই স্ত্রীলোকটি—আমায় যেতে দেয় না। কি যত্ন যে করলে! আর একটা দেখলাম অধিকারীকেও সেবা করে ঠিক ক্রীতদাসীর মত—মুখে এদিকে যখন-তখন যা-তা শুনিয়ে দেয়, তার মুখের কাছে দাঁড়াবার সাধ্যি নেই অধিকারীর।

যাবার সময় মেয়েটি দিব্যি করিয়ে নিলে যে আমি আবার আস্‌বো। বললে—তুমি তো ছেলেমানুষ, যখন খুশী আসবে। মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাবে। তোমাদের খাওয়ার কষ্ট হচ্চে এখানে—মাছ মিলে না, মাংস মিলে না। বোশেখ মাসে এস, আম দিয়ে দুধ দিয়ে খাওয়াবো।

কি সুন্দর যে লাগল ওর স্নেহ!

আমার সেই দর্শনের ক্ষমতাটা ক্রমেই যেন চলে যাচ্চে। এই দীর্ঘ এক বছরের মধ্যে মাত্র একটি বার জিনিষটা ঘটেছিল।

ব্যাপারটা যেন স্বপ্নের মত। তারই ফলে আটঘরায় ফিরে আসতে হচ্চে। সেদিন তুপুরের পরে একটি গ্রাম্য ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারী-ঘরে বেঞ্চিতে শুয়ে বিশ্রাম করচি—ডাক্তারবাবু জাতিতে মাহিষ্য, সর্ব্বদা ধর্ম্মকথা বলতে ও শুনতে ভালবাসে ব'লে আমায় ছাড়তে চাইত না, সব সময় কেবল ঘ্যান ঘ্যান ক'রে ওই সব কথা পেড়ে আমার প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তুলছিল—আমি ধর্ম্মের কথা বলতেও ভালবাসি না, শুনতেও ভালবাসি না—ভাবছি শুয়ে শুয়ে কাল সকালে এর এখান থেকে চলে যাব—এমন সময় একটু তন্দ্রামত এল। তন্দ্রাঘোরে মনে হ'ল আমি একটা ছোট্ট ঘরের কুলুঙ্গি থেকে বেদানা ভেঙে কার হাতে দিচ্চি, যার হাতে দিচ্চি সে তার রোগজীর্ণ হাত অতিকষ্টে একটু ক'রে তুলে বেদানা নিচ্চে, আমি যেন ভাল দেখতে পাচ্চি নে ঘরটার মধ্যে ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশা—বারকতক এই রকম বেদানা দেওয়া-নেওয়ার পরে মনে হ'ল রোগীর মুখ আর আমার মায়ের মুখ এক। তন্দ্রা ভেঙে মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল এবং সেই দিনই সেখান থেকে আঠারো মাইল হেঁটে এসে ফুলসরা ঘাটে ষ্টীমার ধ'রে পরদিন বেলা দশটায় কলকাতা পৌছুলাম। মায়ের নিশ্চয়ই কোনো অসুখ করেচে, আটঘরা যেতেই হবে।

শেয়ালদহ ষ্টেশনের কাছে একটা দোকান থেকে আঙুর কিনে নেবো ভাবলাম, পকেটেও বেশী পয়সা নেই। পয়সা গুণচি দাঁড়িয়ে, এমন সময় দূর থেকে মেয়েদের বিশ্রাম-ঘরের সামনে দণ্ডায়মানা একটি নারীমূর্ত্তির দিকে চেয়ে আমার মনে হ'ল দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা আমার পরিচিত। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পারলাম না—আঙুর কিন্‌তে চলে গেলাম। ফিরবার সময় দেখি ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডের কাছে একটি পচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে শ্রীরামপুরের ছোটবৌ-ঠাকরুণ! আমি কাছে যেতেই বৌঠাকরুণ চমকে উঠলেন প্রায়। বললেন—আপনি! কোত্থেকে আসচেন! এমন চেহারা!

আমি বললুম—আপনি কি একটু আগে মেয়েদের ওয়েটিং-রুমের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন?

—হ্যাঁ, এই যে আমরা এখন এলাম এই যোগবাণীর গাড়ীতে—আমরা শ্রীরামপুরে যাচ্চি। ইনি মেজদা—এঁকে দেখেন নি কখনও?

যুবকটি আমায় বল্‌লে—আপনি তা হ'লে একটু দাঁড়ান দয়া ক'রে—আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি—এখানে ধরে বসুচে না—

সে চলে গেল। ছোটবৌ-ঠাকরুণ বললেন—মাগো, কি কালীমূর্ত্তি চেহারা হয়েচে! বড়দি বলছিল আপনি নাকি কোথায় চলে গিয়েছিলেন, খোঁজ নেই—সত্যি?

—নিতান্ত মিথ্যে কি ক'রে বলি! তবে সম্প্রতি দেশে যাচ্চি।

ছোটবৌ-ঠাকরুণ হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন একটু, তার পর বললেন—আপনার মত লোক যদি কখনও দেখেচি। আপনার পক্ষে সবই সম্ভব। জানেন, আপনি চলে আসবার পরে বড়দির কাছ থেকে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞেস্ ক'রে ক'রে শুনেচি। তখন কি অত জানতাম? বড়দি বাপের বাড়ি গিয়েচে আশ্বিন মাসে—আপনার সঙ্গে দেখা হবে'খন। আচ্ছা, আর শ্রীরামপুরে গেলেন না কেন? এত ক'রে বললাম, রাখলেন না কথা? আমার ওপর রাগ এখনও যায় নি বুঝি!

—রাগ কিসের? আপনি কি সত্যি ভাবেন আমি আপনার ওপর রাগ করেছিলাম? ছোটবৌ-ঠাকরুণ নতমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

—বলুন!

ছোটবৌ-ঠাকরুণ নতমুখেই বললেন—ও কথা যাক্। আপনি এ-রকম ক'রে বেড়াচ্চেন কেন? পড়াশুনো আর করলেন না কেন?

—সে সব অনেক কথা। সময় পাই তো বলব এক দিন।

—আসুন না আজ আমাদের সঙ্গে শ্রীরামপুরে? দিনকতক থেকে যান, কি চেহারা হয়ে গিয়েচে আপনার! সত্যি, আসুন আজ।

—না, আজ নয়, দেশে যাচ্চি, খুব সম্ভব মায়ের বড় অসুখ—

ছোটবৌ-ঠাকরুণ বিস্ময়ের সুরে বললেন—কই, সে কথা তো এতক্ষণ বলেন নি! সম্ভব মানে কি, চিঠি পেয়েচেন তো, কি অসুখ!

একটু হেসে বললাম—না চিঠি পাই নি। আমার ঠিকানা কেউ জান্‌তো না। স্বপ্ন দেখেচি—

ছোটবৌ-ঠাকরুণ একটু চুপ ক'রে থেকে মৃদু শান্ত সুরে বললেন—আমি জানি। তখন জান্‌তাম না আপনাকে, তখন তো বয়েসও আমার কম ছিল। বড়দি তার পর বলেছিল। একটা কথা রাখবেন? চিঠি দেবেন একখানা? অন্ততঃ একখানা লিখে খবর জানাবেন?...

ছোটবৌ-ঠাকরুণ আগের চেয়ে সামান্য একটু মোটা হয়েচেন, আর চোখে সে বালিকাসুলভ তরল ও চপল দৃষ্টি নেই, মুখের ভাব আগের চেয়ে গম্ভীর। আমি হেসে বললাম—আমি চিঠি না দিলেও, শৈলদির কাছ থেকেই তো জানতে পারবেন খবর—

এই সময় ওঁর মেজদাদা ট্যাক্সিতে চড়ে এসে হাজির হ'লেন। আমি বিদায় নিলুম।

ক্রমশঃ
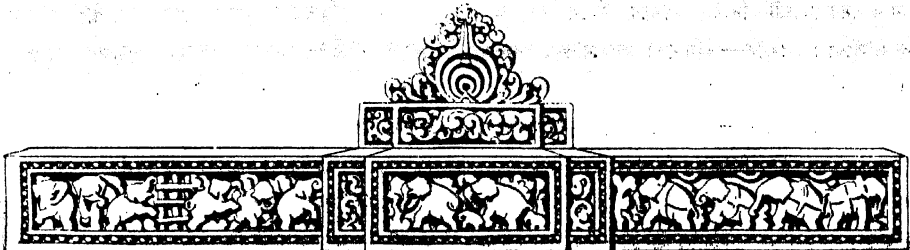
বাংলার মৃৎশিল্প ও কুম্ভকার জাতি

শ্রী—

বাংলার মৃৎশিল্প আজ নূতন নহে—বহু যুগ হইতে বঙ্গদেশীয় মৃৎশিল্পিগণ নানা প্রকারের মৃন্ময়-মূর্ত্তি, নানা প্রকারের দেবদেবী গঠন করিয়া বাঙালীর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন যুগেও এই মৃৎশিল্পে চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। আমাদের বাংলার মাটি মাটি নয়,—সোনা; আমাদের দেশে পূর্ব্বে এরূপ বৃহদাকার মৃৎপাত্র নির্ম্মিত হইত, যাহা দুই তিন মণ তরল পদার্থ ধারণ করিত। মাটির বাসন এরূপ মজবুত হইত যাহা বহুদিন যাবৎ উত্তাপ সহ্য করিয়াও ভাঙিত না। মোটের উপর বাংলার অভাব বাংলার মাটিতেই মোচন হইত—বিদেশী

স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন ও বুদ্ধ-মূর্ত্তি

এলুমিনিয়মের বাসন আমদানী করিয়া এরূপ বেকার-সমস্যা উৎপাদনের প্রয়োজন হইত না। বাংলার মাটিতে বাঙালী কারিগর কত প্রকার শিল্পকৌশল দেখাইয়া লোককে স্তম্ভিত করিত, যাহার নমুনা এখনও কোন কোন প্রাচীন মন্দিরগাত্রে যুগ-যুগান্ত ঝঞ্ঝা-বৃষ্টির আঘাত সহ্য করিয়াও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এখনও প্রাচীন গৌড়ে এবং বাকুড়া ও বিষ্ণুপুর অঞ্চলে এমন অনেক ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন সুবৃহৎ মন্দির দেখা যায় যাহার অন্যান্য অংশ ভাঙিয়া পড়িলেও

রিইন্‌ফোর্স্‌ড পদ্ধতিতে নির্ম্মিত যমুনা-মূর্ত্তি

মৃন্ময়মূর্ত্তি-সমন্বিত টালিগুলি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রহিয়া বাংলার কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। প্রাচীন মৃৎশিল্পিগণের মধ্যে নদীয়ার কুম্ভকারগণই চিরপ্রসিদ্ধ। এই বঙ্গদেশীয় কুম্ভকার-গণ বহু প্রাচীন যুগ হইতে অতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বলিয়া

ইন্দ্র-সভা

ইন্দ্র-সভা

ইন্দ্র-সভা

পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন। কথিত আছে, স্বয়ং মহাদেব মঙ্গলঘটের প্রয়োজন হওয়ায়, তাঁহার জটা হইতে রুদ্রপালকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সেই অবধি হিন্দু ধর্ম্মের প্রত্যেক কার্য্যেই ইঁহার বংশধরগণ সংশ্লিষ্ট। ইঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় সমস্ত দেবদেবীর ধ্যান, রূপ, গঠন ইত্যাদির জন্য শাস্ত্র-অভিজ্ঞ ছিলেন এবং শাস্ত্রানুযায়ী দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের অক্ষুন্নতা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কুমারটুলীস্থ শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ পাল মহাশয় ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ নদীয়ার মৃৎশিল্পী। বিশেষ ব্যাপকভাবে দেশবাসীর নিকট পরিচিত না হইলেও কার্য্যকলাপে ইঁহারা ক্রমেই প্রীতিভাজন হইয়া উঠিতেছেন। হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলি যাহাতে ধ্যানসম্মত হয় এবং তৎসঙ্গে প্রাচীন শিল্পকলাপদ্ধতি বজায় থাকে সে-বিষয়ে ইঁহারা বিশেষরূপ সচেষ্ট: ইতিপূর্ব্বে সরস্বতী-মূর্ত্তি গঠন করিয়া তাহার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ও শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রাচীনকলাশিল্পী ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইঁহারা প্রাচীন স্থাপত্যকলার অন্তর্গত নানারূপ খোদিত মূর্ত্তির অনুকরণে আধুনিক পদ্ধতিতে (concrete) নানারূপ মূর্ত্তি নিম্মাণ করিয়া শিল্পনৈপুণ্য দেখাইতেছেন। কলিকাতা শ্যামবাজারে 'চিত্রা' রঙ্গমঞ্চের উপরিস্থ ইন্দ্রসভা তাহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন এবং কলিকাতা নগরীতে যে-কয়েকটি অট্টালিকা প্রাচীন পদ্ধতিতে সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশ কারুকার্য্য ইঁহাদেরই সৃষ্ট। শুনিলাম ইঁহারা জাপান, জার্ম্মানী ইত্যাদি দেশ হইতে আনীত বহু উন্নত ধরণের

দগ্ধ মৃত্তিকা নির্ম্মিত গণেশ-মূর্ত্তি

নানারূপ আদর্শের (মডেলের) অনুকরণে সচেষ্ট হইয়াছেন, যথা—'পেপার পাল্পে'র রিলিফ ম্যাপ, সেলুলয়েড ও কাঠের গুঁড়া দ্বারা প্রস্তুত নানারূপ পুতুল ইত্যাদি।

লুই পাস্তয়র ও তাঁহার গবেষণা

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ডি-এস্‌সি

৩

জেনার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত টীকা লইবার প্রণালী প্রচারিত হইবার প্রায় এক শতাব্দী পরে পাস্তয়র পরীক্ষাগারে টীকা লইবার সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন।* জেনারের আবিষ্কারের সহিত পাস্তয়রের আবিষ্কারের প্রধান পার্থক্য এই যে, জেনারের পদ্ধতি অনুসারে টীকা দেওয়ার জীবাণুগুলি কোনও জীবন্ত প্রাণীর শরীরের মধ্যে কাল্‌চার করিতে হয়, কিন্তু পাস্তয়র কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রণালী দ্বারা জীবাণুগুলি কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষাগারে কাচের পাত্রের মধ্যে প্রস্তুত করা সম্ভব।

পাস্তয়রের এই আবিষ্কারের সহিত কতকগুলি তত্ত্ব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। প্রথমতঃ বেশ বোঝা গেল যে, উপযুক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা কোনও রোগের জীবাণুগুলির তীব্রতা ইচ্ছামত কমান সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এই যে এই মন্দীভূত জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইবার পরে প্রাণীর শরীরে সাময়িকভাবে যে সামান্য প্রকারের রোগ উৎপন্ন হয় তাহা ঐ প্রাণীকে ভবিষ্যতে উক্ত শ্রেণীর তীব্র জীবাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। যে জীবাণুর দ্বারা টীকা দেওয়া হইয়াছে তাহা ক্রমান্বয়ে যত তীব্র এবং যত বেশী টাট্‌কা হয় উহার উপকারিতাও তত অধিক। পাস্তয়র পরে দেখাইয়াছিলেন যে, বিভিন্ন প্রকারের জীবাণু প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিভিন্ন রকমের।

য়্যানথ্র্যাক্স (Anthrax) রোগে তখন ফরাসী দেশের গৃহপালিত গবাদি পশুদিগের মধ্যে শতকরা ১০টি মারা যাইতেছিল। চিকেন্ কলেরার (chicken cholera) জীবাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় জয়লাভ করিয়া পাস্তয়র য়্যান্‌থ্র্যাক্স রোগের (গোবসন্তের প্রকার-ভেদ) প্রকৃতি-নির্ণয়ের জন্য নূতন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করিলেন। তিনি য়্যান্‌থ্র্যাক্সের জীবাণুগুলিকে (Bacillus anthracis) কাল্‌চার করিলেন এবং উহা নানাপ্রকার জীবজন্তুর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন।

এই প্রসঙ্গে টীকাতত্ত্বের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে এক নূতন পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিল। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, যদি পঁচিশটি মেষশাবকের শরীরে য়্যান্‌থ্র্যাক্স রোগের মন্দীভূত জীবাণু (attenuated virus or vaccine) দ্বারা টীকা দেওয়া যায় এবং কিছুকাল পরে ঐ পঁচিশটি মেষশাবকের শরীরে এবং তৎসঙ্গে 'টীকা লয় নাই' এরূপ ২৫টি মেষশাবকের শরীরে অতি তীব্র য়্যানথ্র্যাক্স রোগের জীবাণু প্রবেশ করান হয়, তাহা হইলে প্রথম পঁচিশটি ভেড়া—যাহাদের টীকা দেওয়া হইয়াছিল—তাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, কিন্তু শেষোক্ত পঁচিশটি মেষশাবক—যাহা দর টীকা দেওয়া হয় নাই—তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

পাস্তয়রের সহযোগী ও ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার এই অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশেষ বিচলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাস্তয়র ইহাতে আশাহত হন নাই। সত্য ও বিজ্ঞানের প্রতি অটল বিশ্বাস থাকায় তিনি স্থির করিলেন যে, সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীকে জয়যুক্ত করিতে হইবে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৫ই মে পুইয়ি ল্যা ফোর (Pouilly le Fort)-এর কৃষিক্ষেত্রে তাঁহার বিপক্ষবাদী বহুসংখ্যক কৃষক, চিকিৎসক ও পশুবৈদ্যের সম্মুখে তিনি তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিপন্ন করিবার জন্য সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার বিপক্ষবাদীরা তাঁহাকে অবিশ্বাসের ভয় প্রদর্শন এবং অসংখ্য বিদ্রূপবাণী বর্ষণ করিতে ত্রুটি করে নাই। সেই দিন পঁচিশটি মেষশাবককে একটি মন্দীভূত জীবাণুর কাল্‌চার দ্বারা টীকা দেওয়া হইল। বারো দিন পর্য্যন্ত ঐ মেষশাবকগুলি ভাল থাকিবার পর ১৭ই মে তারিখে তাহাদের শরীরে পুনরায় আরও তীব্র জীবাণু

* সর্ব্বপ্রথমে কুক্কুটশাবকদিগের বিসূচিকা রোগের প্রতিকার-স্বরূপ তিনি এই প্রণালী ব্যবহার করেন।

প্রবেশ করান হইল। পূর্ব্বের প্রতিষেধক টীকা না দেওয়া হইলে দ্বিতীয় বারের টীকার তীব্র জীবাণু দ্বারা অন্ততঃ অর্দ্ধেক মেষশাবক মারা যাইত। কিন্তু পাস্তয়র ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে মেষশাবকগুলির শরীরে মন্দীভূত জীবাণু থাকার দরুণ উহাদের তীব্র জীবাণুগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়—এবং সেই জন্য পরে শক্তিশালী জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেও কোনও অপকার বা অনিষ্ট হইবে না। সকলেই শঙ্কিত চিত্তে উক্ত ফলাফলের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। এক পক্ষ কাল অতীত হইল, কিন্তু একটি মেষশাবকও অসুস্থ হইল না। চারি দিকে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। ৩১শে মে তারিখে শেষবার টীকা দেওয়ার জন্য পুনরায় সকলে সমবেত হইলেন। পাস্তয়রের বিরুদ্ধবাদিগণের ভিতরে অনেকেই তাঁহাকে সন্দেহ করিতেন। সেই সময়ে কেহ কেহ বলিলেন যে, পাস্তয়র তীব্র জীবাণুর বদলে মন্দীভূত জীবাণু ব্যবহার করিতেছেন এবং যে স্থলে মন্দীভূত জীবাণু দেওয়ার কথা সেই স্থলে তিনি তীব্র জীবাণু ব্যবহার করিতেছেন। পরীক্ষাস্থলে কেহ কেহ জীবাণু রাখিবার পাত্রটিকে 'ঝাঁকাইয়া' দিলেন। কিন্তু পাস্তয়র তাহাদের এই বিদ্রূপ ও কটুক্তিতে তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাঁহার এই-রূপ দৃঢ় নিষ্ঠা দেখিয়া ক্রমে অনেক শত্রুপক্ষীয় লোক তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিলেন। অবশেষে এই পরীক্ষার শেষ ফল দেখিবার জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে ২রা জুন দিন নির্দ্দিষ্ট হইল।

নির্দ্দিষ্ট তারিখে সকলে একত্র হইয়া ফলাফল দেখিবার নিমিত্ত কৃষিক্ষেত্রে আগমন করিলেন। তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। যে-পঁচিশটি মেষশাবককে পূর্ব্বে মন্দীভূত জীবাণু দ্বারা টীকা দেওয়া হয় নাই, কিন্তু প্রথমেই তীব্র জীবাণু দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে বাইশটি গতায়ু হইয়াছে, দুইটি মুমূর্ষুপ্রায় এবং বাকী একটি অসুস্থ, তবে মৃতপ্রায় নহে; আর যে পঁচিশটি মেষশাবককে প্রথমে মন্দীভূত জীবাণু দিয়া পরে তীব্র জীবাণু দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা সকলেই সুস্থ। কেহ কেহ বা পরস্পরের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় ব্যস্ত।

'প্ল্যাস্ দ্য ব্রতই' নামক স্থানে আন্তর্জ্জাতিক চাঁদার সাহায্যে নির্ম্মিত পাস্তয়রের মূর্ত্তি

এই ফল দেখিয়া উপস্থিত সকলেই সমস্বরে এবং উৎসাহ সহকারে পাস্তুয়রকে অভিনন্দিত করিল। সত্যের জয় এবং অসত্যের পরাজয় ঘটিল।

পাস্তুয়র কর্তৃক প্রবর্তিত য়্যানথ্র্যাক্স রোগের চিকিৎসা-প্রণালী ফরাসী দেশের কি প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে তাহা ফরাসী গভর্ণমেণ্টের ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট হইতে জানা যায়। ইহাতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাস্তুয়রের প্রণালী দ্বারা গবাদি পশুদিগের য়্যানথ্র্যাক্স রোগের চিকিৎসা করার ফলাফল লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে দেখা যায় যে, ৩,৪০০,০০০ ভেড়ার মধ্যে মাত্র শতকরা একটি এবং ৪৩৮,০০০ গবাদি পশুদিগের ভিতরে হাজারের মধ্যে একটিরও কম য়্যানথ্র্যাক্স রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, পাস্তুয়রের এই আবিষ্কারের ফলে উক্ত দশ বৎসরে ফরাসী দেশের মোট দুই লক্ষ আশী হাজার পাউণ্ড (প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা) লাভ হইয়াছিল।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যেমন কৃত্রিম উপায়ে রোগের জীবাণুগুলি মন্দীভূত করা হয় সেইরূপ কোন কৃত্রিম উপায় দ্বারা রোগের জীবাণুগুলিকে তীব্রতর করা সম্ভব কিনা? ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পাস্তুয়র এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি দেখাইলেন যে য়্যানথ্র্যাক্স রোগের জীবাণুগুলির তীব্রতা নষ্ট করিবার পরে নবজাত কোমলাঙ্গ ইঁদুরের দেহের মধ্যে এই মৃতপ্রায় জীবাণু সঞ্চারিত করিলে জীবাণুগুলি অধিকতর সতেজ হইয়া উঠে। তখন এই নবজাত ইঁদুরের রক্ত একটি অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক ইঁদুরের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় এবং ক্রমান্বয়ে খরগোস, ভেড়া এবং পরিশেষে গরু অথবা অশ্বের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে জীবাণুগুলির তীব্রতা ও তেজ বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। নানাপ্রকার রোগের জীবাণুকে এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে তীব্র হইতে তীব্রতর করার পদ্ধতি জীবাণুতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে।

জীবাণু-তত্ত্ব-বিষয়ে উপরি উক্ত আবিষ্কার পাস্তুয়রের এক অতুল কীর্ত্তি। পাস্তুয়র তাঁহার সমস্ত জীবনে যদি কেবলমাত্র এই একটি বিষয়ে গবেষণা করিয়া যাইতেন তাহা হইলেও তিনি পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কিন্তু পাস্তুয়রের প্রতিভা বহুশাখামুখী। তাঁহার প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতের এক একটি স্তম্ভ-স্বরূপ।

পাস্তুয়রের জীবাণু-সম্বন্ধীয় গবেষণা ও আবিষ্কার পৃথিবীতে যে কি মহদুপকার সাধন করিয়াছে আধুনিক খাদ্যদ্রব্য রক্ষণপ্রণালী তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। জীবাণুতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে, কোনও প্রকার আহার্য্য দ্রব্য যে নষ্ট হইয়া যায় তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে, যে, যতই সময় যায় ততই পচনকার্য্যে সহায়ক জীবাণুগুলি ক্রমে আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। জলীয় বাষ্প ও উষ্ণতা—এই উভয়বিধ অবস্থা ঐ জীবাণুগুলির পোষণের ও বর্দ্ধনের পক্ষে অনুকূল। দশ হইতে চল্লিশ সেণ্টিগ্রেড্ ডিগ্রির উত্তাপের মধ্যে এই জীবাণুগুলি বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ৬৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিলেই জীবাণুগুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকেই জানেন যে, সাধারণ অবস্থায় কোনও পাত্রের মধ্যে দুধ বেশী ক্ষণ রাখিয়া দিলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, ব্যাসিলাস্ এসিডি ল্যাক্টিসি (Bacillus acidi lactici) নামক এক প্রকার জীবাণু দুধের মধ্যে সংখ্যায় ও আকৃতিতে ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু দশ সেণ্টিগ্রেড্ ডিগ্রির উত্তাপের কমে ইহারা আদৌ সংখ্যায় বর্দ্ধিত হয় না। পনের ডিগ্রির উত্তাপের সময় হইতে ইহারা ধীরে ধীরে দুগ্ধাম্ল (lactic acid) প্রস্তুত করিতে থাকে এবং ৩৫ হইতে ৪০ ডিগ্রির মধ্যে এই জীবাণুগুলি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী হয়। ৪৬ ডিগ্রির উত্তাপের উপরে এই জীবাণুগুলির শক্তি একেবারে কমিয়া যায়। সুতরাং যদি আহার্য্য দ্রব্যকে অল্পক্ষণের জন্য ১০০ ডিগ্রির উত্তাপে গরম করা যায় এবং তাহার পরে এরূপভাবে রক্ষিত করা হয় যাহাতে কোনও জীবাণু ঐ আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা হইলে চিরকালের জন্য ঐ আহার্য্য দ্রব্যকে অবিকৃত ও সুখাদ্য অবস্থায় রাখা যাইতে পারে। আহার্য্য দ্রব্যকে সংরক্ষিত রাখিবার এই প্রথাকে ইংরেজী কথায় 'sterilization' বলে। এই প্রণালী প্রধানতঃ

টিনের কৌটা করিয়া নানা প্রকার ফল ও খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আহার্য্য দ্রব্যকে অবিকৃত ও সুখাদ্য অবস্থায় সংরক্ষিত রাখিবার দ্বিতীয় প্রথাকে ইংরেজী ভাষায় pasteurization বলে। এই প্রণালী অনুসারে আহার্য্য দ্রব্যকে ৬৫ হইতে ৭০ ডিগ্রিতে ত্রিশ মিনিট ধরিয়া গরম করিতে হয়। ইহাতে আসল জীবাণু সমস্তই বিনষ্ট হইবে এবং ঐ সকল অপেক্ষাকৃত বড় বড় জীবাণু হইতে জাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুগুলি (spores) মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। তাহার ফলে গাঁজন (fermentation) ও পচন (decomposition) প্রক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে এবং নূতন জীবাণু আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে ঢুকিয়া বর্দ্ধিত না হওয়া পর্য্যন্ত, অথবা শেষোক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুগুলি অঙ্কুরিত না হওয়া পর্য্যন্ত গাঁজন বা পচন প্রক্রিয়া দ্বারা আহার্য্য দ্রব্য নষ্ট হইবে না। য়্যানথ্রাক্স, টিটেনাস ও সম্ভবতঃ অতিসার উদরাময় (epidemic diarrhoea) ব্যতীত সকল প্রকার ব্যাধির জীবাণুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু উৎপন্ন করে না। সুতরাং উপরি উক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা তাহারা বিনষ্ট হইবে। ব্রাণ্ডি প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য, বিশেষতঃ দুগ্ধ রক্ষণার্থে, এই প্রণালী সকল দেশেই ব্যবহার করা হয়। এই প্রণালী দ্বারা রক্ষিত দুগ্ধ ব্যবহার করিলে ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে অজীর্ণতা অথবা স্কর্ভি রোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা কম।

আহার্য্য দ্রব্য সংরক্ষণের আরও একটি প্রণালী আছে। ১০ সেন্টিগ্রেড্ ডিগ্রির নীচে আহার্য্য দ্রব্যকে রাখিলে জীবাণুগুলি সংখ্যায় ও আকৃতিতে বাড়িতে পারে না এবং উত্তাপ আরও বেশী না-বাড়া পর্য্যন্ত জীবাণুর প্রক্রিয়া সম্ভব হইবে না। এই প্রণালী সাধারণতঃ মৎস্য ও মাংসের পচন নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই যে দূর-দূরান্তর হইতে নানা প্রকার মৎস্য বরফের সাহায্যে ঠাণ্ডা করিয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করা হয়। বরফ দেওয়া মাছ ও মাংস টাটকা মাছ ও মাংসের মতই পুষ্টিকর ও সুপাচ্য। ইউরোপে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দুধ সরবরাহ করিবার সময় এই প্রণালী বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

এইখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, উপরি উক্ত তিন প্রকার প্রণালী ব্যতীত নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া আহার্য্য দ্রব্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। এই উদ্দেশ্যে লবণের ব্যবহার বহুকাল হইতেই চলিয়া

সোরবণে পাস্তয়রের মূর্ত্তি

আসিতেছে। মৎস, মাংস, মাখন, পনির প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য রক্ষণের জন্য প্রচুর পরিমাণে লবণ ব্যবহৃত হয়। কোন কোনও স্থলে লবণ ও সোরা (saltpetre) একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হয়। অনেক সময়ে সোহাগা, বোরিক্ এসিড্ ও ফরম্যালডিহাইড্ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুধ, মাখন, মাছ ও মাংসের তৈরি নানা প্রকারের আহার্য্য দ্রব্য ও ঘনীভূত দুগ্ধ (condensed milk) এই উপায়েই সাধারণতঃ রক্ষিত হয় এবং এক দেশ হইতে অন্য দেশে প্রেরিত হইতে পারে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পাস্তুয়র জলাতঙ্ক রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে থাকেন। কিন্তু এই জীবাণু অত্যন্ত বিষাক্ত বলিয়া ইহা লইয়া কাজ করা বিপজ্জনক, তদুপরি আরও একটি বিশেষ অন্তরায় এই যে এই বিষ প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করাইবার পরে রোগ প্রকাশ হইতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। পাস্তুয়রের সময়ে লোকের ধারণা ছিল যে লালাস্রাবের সহিত এই জীবাণু নিঃসৃত হয়, কিন্তু পাস্তুয়র দেখাইলেন যে, এই জীবাণু মস্তিষ্কে ও মেরুদণ্ডে অধিষ্ঠান করে। তিনি প্রমাণ করিলেন, যে-কুকুর জলাতঙ্ক রোগে মরিয়াছে তাহার ঘাড়ের শিরদণ্ড (Medulla Oblongata) লইয়া অন্য প্রাণীর দেহে ঢুকাইলে সেই প্রাণীতে এই রোগ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহাতেও আশানুরূপ ফল হইল না, কারণ ইহাতেও দেখা গেল যে, কোন কোনও ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিলেও এই রোগ প্রকাশিত হয় না। পাস্তুয়র স্থির করিলেন, এই জীবাণু দেহের অন্য কোন স্থানের পরিবর্ত্তে যদি মাথার ভিতর ঢুকাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে অবশ্যই এই রোগ প্রকাশিত হইবে, কিন্তু ইহাতে পশুটির অত্যন্ত যন্ত্রণা হইবে ভাবিয়া তিনি নিজ হাতে এ-কার্য্যটি করিতে পারিলেন না। এক দিন তিনি পরীক্ষাগার হইতে বাহির হইয়া গেলে তাহার সহকর্ম্মী রাউক্স (Roux) এই কার্য্য সাধন করিলেন। এই প্রক্রিয়া দ্বারা উক্ত জন্তুটির শরীরে রোগ অনিবার্য্য প্রকাশিত হয়, এবং রোগ প্রকাশ হইতে কখনও বিশ দিনের বেশী লাগে না। পরে পাস্তুয়র বিভিন্ন প্রকার শক্তিসম্পন্ন জলাতঙ্কের জীবাণু প্রস্তুত করিয়া কুকুরের দেহে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, এই মন্দীভূত জীবাণু ইহার শরীরে প্রবেশ করাইবার পর ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনে কোন অপকার হয় না; কিছু দিন পরে তিনি আরও দেখিলেন যে, ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের পরেও উক্ত জীবাণু আহত কুকুরের দেহে প্রবেশ করাইয়া দিলে আর কোনও অপকার হয় না।

প্রায় এক বৎসর ধরিয়া পাস্তুয়র পশুদেহের শরীরে এইরূপ পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু মনুষ্যদেহের উপর পরীক্ষা করিবার সাহস তাঁহার হইল না; অবশেষে ঘটনাচক্রে তাঁহার এক সুযোগ মিলিয়া গেল। যোসেফ্ মাইষ্টার নামে বৎসর-নয়েকের একটি ছেলেকে পাগ্লা কুকুরে দংশন করিয়া তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল। ঐ বালকটির মাতা বালকটিকে লইয়া ভাল্‌পিয়া (Vulpian) নামক একটি বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকটে চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইলেন। সমস্ত বিবরণ শুনিয়া তিনি বলিলেন

রাখাল বালক ও পাগ্লা কুকুর

যে ইহার কোনও চিকিৎসা নাই—তবে পাস্তুয়রের প্রবর্ত্তিত মতে চিকিৎসা করিলে বালকটি বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। কিন্তু পাস্তুয়র ইহাতেও দ্বিধা বোধ করিতেছিলেন। অবশেষে তাহাদের একান্ত অনুরোধে উপরি উক্ত জীবাণু দ্বারা চিকিৎসা করিতে স্বীকৃত হইলেন। দুই তিন দিন তাহার শরীরে জীবাণু প্রবেশ করাইবার পর বালকটির ক্ষতস্থান শুকাইতে আরম্ভ করিল এবং সে উঠিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু দুশ্চিন্তায় পাস্তুয়রের নিদ্রা হইত না। কারণ যতই প্রবিষ্ট জীবাণুসমূহ তীব্র হইতে

তীব্রতর হইতে লাগিল—পাস্তুয়রের ভয়ও তত বাড়িতে লাগিল। অবশেষে বালকটিকে যে দিন সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র জীবাণুর দ্বারা টীকা দেওয়া হইল সেদিন রাত্রিতে পাস্তুয়রের চক্ষুতে আর নিদ্রা আসিল না। সমস্ত রাত্রি তিনি ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইলেন। কেবলই মনে ভয় হইতে লাগিল—যদি কল্য প্রত্যূষে গিয়া দেখি যে ছেলেটি জলাতঙ্ক রোগের দারুণ জ্বালায় চীৎকার করিতেছে, তবে কি করিব? কিন্তু ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান হইল। গিয়া দেখিলেন যে, ছেলেটি দিব্য নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে। বহুদিন পরে পাস্তুয়রও সুখে নিদ্রা গেলেন।

অনতিকাল মধ্যে এই অভিনব চিকিৎসা-প্রণালীর খ্যাতি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল এবং ছয় মাসের মধ্যে ৩৫০টি রোগী এই প্রণালী দ্বারা চিকিৎসিত হইল। তন্মধ্যে কোন-একটি রোগী কুকুর-দংশনের সাঁইত্রিশ দিন পরে চিকিৎসার্থ আসিয়াছিল বলিয়া রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ২৬৭১টি রোগীর মধ্যে মাত্র পঁচিশটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই চিকিৎসায় আশাতীত সাফল্য দর্শনে ফরাসী দেশের বিজ্ঞান সমিতি (Academie des Sciences) দ্বারা গঠিত এক কমিটি প্যারী শহরে পাস্তুয়রের ইন্‌স্টিটিউট্‌ (Pasteur Institute) স্থাপন করিবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এক বিরাট গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম দিলেন 'পাস্তুয়র ইন্‌স্টিটিউট্‌'। এই বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্দেশ্য হইল জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা করা এবং সেই প্রসঙ্গে অন্যান্য বহুপ্রকার রোগের জীবাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষা করা।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৮শে সেপ্টেম্বর অসংখ্য নরনারীর আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া পাস্তুয়র মহাপ্রস্থান করেন।

পাস্তুয়র শত শত সহযোগী বৈজ্ঞানিক ও ছাত্রকে সত্যের সন্ধানে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। আজ পৃথিবীর সকল দেশেই পাস্তুয়র ইন্‌স্টিটিউটের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়া সহস্র সহস্র রোগীকে নীরোগ করিতেছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে পাস্তুয়র মানবজাতির যে মহদুপকার করিয়া যে প্রভাব বিস্তার করিয়া গেলেন তাহা প্রবল পরাক্রান্ত শত শত সম্রাট, সেনাপতি বা রাজনৈতিকের প্রভাবের তুলনায় সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

প্রান্তর-লক্ষ্মী

শ্রীআশুতোষ সান্যাল, বি-এ

কে দিয়েছে তারে পরায়ে আদরে
গোধূম-যবের শাড়ী?
সবুজ আঁচল কাঁপে হাওয়া লেগে,
প্রাণ লয় মোর কাড়ি!
দেহের উজল রংটুকু কিবা—
নয় সে ফুলের কাঞ্চন বিভা!
মরি মরি আহা রূপের বিথার—
নিখিলের মনোহারী!

তিসির কুসুম নয় নয় কভু,
পান্নার খাঁটি দুল,
ধূম্রধূসর ঐ মেঘথর—
কুঞ্চিত কালো চুল।

হিজলের তরু সে যে অনুখন,
আল্‌তার রাগে রাঙায় চরণ,
খেজুর-রসের মদির গন্ধে
আঁখি দুটি ঢুলু ঢুলু।

যৌবন বুঝি দিয়েছে তাহার
বুকের দুয়ারে দোল্‌,
এ কি মধুরিমা! শুধু শ্যামলিমা—
সবুজের হিল্লোল!
অপরূপ রূপ! প্রকৃতির হিয়া,
নিবিড় পুলকে উঠেছে নাচিয়া,
তার সনে যেন পরাণ আমার
হ'ল আজ উতরোল।

জয়, না পরাজয় ?

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘোষ

ছেলেবেলা হইতে তাহার ডাকনাম ছিল উল্কা—স্বভাবটাও ছিল তেমনি। যেখানে-সেখানে যখন-তখন ছুটোছুটি করিয়া বেড়াইত।

অপরূপ সুন্দরী সে—পাড়াগাঁয়ে ঘনবিন্যস্ত বনজঙ্গলের মধ্যে যখন সে প্রজাপতির পিছনে তাড়া করিয়া বেড়াইত, তখন তার দিকে চাহিলে চোখ ফিরানো যাইত না।

তার বাবা ছিলেন বড় গরিব—অখ্যাতনামা কোন-একটা মহকুমা কোর্টের সামান্য উকিল। পৈতৃক বাড়িটা থাকাতে কোন রকমে মাথা গুঁজিবার ঠাঁই ছিল। কিন্তু মন তাঁর তেজস্বী ছিল। তিনি কোন দিন তাঁর অর্থকষ্টের কথা বলিয়া কাহারও সহানুভূতি উদ্রেক করিবার চেষ্টা করেন নাই।

কিন্তু ভগবান তাঁকে সাহায্য করিতে কার্পণ্য করেন নাই। উল্কার বয়স যখন আট বছর, তখন গ্রামের প্রাজ্ঞ জমিদার অবিনাশ বাবু তাঁর ছেলে অচলেশের সঙ্গে উল্কার বিবাহের প্রস্তাব করেন; বাগ্‌দান হইয়া যায়। উল্কা তখন বিবাহ কি বুঝিত জানি না, কিন্তু বিয়ে যে বাজী-বাজনার সঙ্গে একটা মজার জিনিব এই ভাবিয়া সে ভারি আনন্দ পাইয়াছিল। গ্রামের অন্যান্য লোকে তখন দয়ার্দ্র হইয়া বলিল, "বড়লোক কি আর গরিবের সঙ্গে সম্বন্ধ করে? দু-একটা বছর যেতে-না-যেতেই এ মতলব বদ্‌লে যাবে।"

কিন্তু দুই-একটা বছর যাইতে-না-যাইতেই অবস্থা বদ্‌লাইয়া গেল। আকস্মিক একটা রোগে অবিনাশ বাবু মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বালক অচলেশেরও গ্রহবৈগুণ্য আরম্ভ হইল। পার্শ্ববর্তী গ্রাম মনোহরপুরের চৌধুরীরা অবিনাশ বাবুর পুরাতন কর্ম্মচারীদের সহায়তায় অনভিজ্ঞ বালকের হাত হইতে সবই আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। এদিকে উল্কার বাবা উমাশঙ্কর বাবুরও পসার-প্রতিপত্তি হইতে আরম্ভ হইল।

সে আজ অনেক দিনের কথা। উমাশঙ্কর বাবু এখন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাবান্ উকিল। উল্কা এখন বড়লোকের মেয়ে। সে এখন নব্যতন্ত্রের অষ্টাদশী। সর্ব্বদা বড়লোকের সমাজে মেলা-মেশা—গমনাগমন। পুরাতনের কথা সে বড়-একটা মনে করে না—সর্ব্ববিষয়ে বাংলার নব্যতন্ত্রে দীক্ষিত ধনীসমাজের অনুগামিনী।

পুরাতনের একটা জিনিষ তাহাকে এখনও আঁকড়াইয়া আছে—সে অচলেশ। বাল্যবয়সে তাহার বিবাহের বাগ্‌দানের কথা তাহার মনে ছিল। তাই সে মনে মনে ভাবিত বিবাহ করিতে হইলে অচলেশকেই সে বিবাহ করিবে।

অচলেশ পুরাতনতন্ত্রী হইলেও উল্কাকে বাস্তবিকই ভালবাসিত। তাহার কারণ বোধ হয় তাহার আবাল্যের অর্জ্জিত সংস্কার, উল্কার আনন্দময়ী প্রকৃতি, সর্ব্বোপরি তাহার লীলাচঞ্চল স্বচ্ছ সরল গতি। উল্কা নিজের মনোভাব কোন দিনই তাহার কাছে গোপন করে নাই। তাই বোধ হয় আয়াসলভ্য বস্তুর দিকে অচলেশ আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়িত; মনে মনে ভাবিত নিজের ভালবাসা দিয়া সে উল্কাকে জয় করিবে।

অচলেশের নিরাড়ম্বর প্রাণের তেজস্বিতা, নিরহঙ্কার সরলতা উল্কার ভালই লাগিত। কিন্তু তাহার পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা সে মোটেই পছন্দ করিত না। সর্ব্বোপরি অচলেশের হাসিমুখে দৈন্যবরণ তাহার কাছে অসহ্য লাগিত। সর্ব্বপ্রকার উচ্চাশাকে বিদায় দিয়া, শান্ত নির্ব্বিকারভাবে দীন জীবনযাপন—ইহাতে বাহাদুরী কি?

এক দিন সে অচলেশকে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছিল—গরিব লোককে সে কোন দিন বিবাহ করিবে না। অচলেশ যদি তাহাকে যথার্থ ভালবাসে তাহা হইলে সে যেন প্রথমে বড় হইবার চেষ্টা করে।

উত্তরে অচলেশ শুধু হাসিয়াছিল; বলিয়াছিল, "উল্কা, অর্থে লোক কোন দিনই বড় হয় না। বড় হয় মনের সম্পদে।"

উল্কা রাগিয়া উঠিয়া জবাব দিয়াছিল, "কিন্তু হাত-পা থাক্‌তেও যে অক্ষম, মানুষ হওয়া তার পক্ষে বিড়ম্বনা। আর যে নিজের জিনিষ পরে কেড়ে নিয়ে গেলেও রক্ষা করবার চেষ্টা না-করে, সে একটা কাপুরুষ।"

অচলেশ উল্কার রোষবহ্নি তেমনি প্রশান্তভাবে সহিয়া বলিয়াছিল, "ঠিক বলেছ উল্কা, কিন্তু একের দোষে যে অন্যে কষ্ট পায় তা আমি চাই না। যিনি আমাদের সম্পত্তি নিয়েছিলেন, তিনি আর এখন জীবিত নেই। যারা আছে, তারা এ-সব তাদের নিজেদের জিনিষ মনে ক'রে পরম শান্তিতে আছে। সে পুরনো বিষয় খুঁচিয়ে তুলে কেন সে বেচারীদের আবার বিপন্ন করি?"

উল্কা কোনমতেই অচলেশের সাধুত্ব সহিতে পারে নাই; বলিয়াছিল, "কিন্তু আমি হ'লে কোনদিনই নিশ্চেষ্ট হয়ে

থাকতে পারতাম না। আপনার ভালমানুষি আপনাতেই থাক্। শুধু আমায় একবার বলুন্ ত কে সে যে আপনাদের সমস্ত সম্পত্তি লুটে নিয়েছে?"

অচলেশ জবাব দিয়াছিল, "সে কথায় আর প্রয়োজন কি, উল্কা? আমি যে সে সম্পত্তি, সেই ঐশ্বর্য্য, এখন আর চাই না, এই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়?"

উল্কা দারুণ রোষে মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গিয়াছিল।

তাই অচলেশ উল্কা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সে ধীর, চিন্তাশীল,—নিরুপদ্রব শান্তিতে থাকিতে চায়। উল্কা এখনও ঘূর্ণিহাওয়ার মত প্রবলোচ্ছ্বাসে ছুটিয়া বেড়ায়। অচলেশ দৈন্যের মধ্যে অপৌরুষ দেখিতে পায় না, উল্কার কাছে দারিদ্র্য একটা মহাপাপ। অচলেশ সমস্ত পুরাতনের মধ্যে দোষ, আর সমস্ত নূতনের মধ্যে গুণ দেখিতে পায় না। উল্কার কাছে প্রত্যেক পরিবর্ত্তন, নূতনত্ব, কেবল কল্যাণের মূর্ত্তি।

এহেন উল্কার উপর অচলেশ প্রভুত্বের দাবি করে না, বন্ধুত্বটা তাহার সঙ্গে চলে মাত্র।

অচলেশ এম-এ পাস করিয়াছে। সে এখন কি-একটা বিষয়ে রিসার্চ করে ও কলিকাতার কোন-একটা কলেজে নামমাত্র বেতনে অধ্যাপনার কার্য্য করে। সম্প্রতি তাহার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাইবার একটা সুযোগ আসিয়াছিল। উল্কা তাহাকে সে পদ গ্রহণ করিতে অনেক অনুরোধও করিয়াছিল। কিন্তু সে কাজ তাহার পোষাইবে না বলিয়া অচলেশ তাহা ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহা লইয়া উল্কা তাহাকে ঠাট্টা করিয়াছে—শেষে বিরক্তও হইয়াছে। কিন্তু উল্কার বিরক্তি অচলেশকে টলাইতে পারে নাই।

দিনের পর দিন সে কলেজে যায়, কর্ম্মান্তে জলযোগ সারিয়া খেলিতে বাহির হয়। আবার ফিরিয়া আসিয়া নিজের নিভৃত কোণটিতে পড়াশুনা করিতে বসে।

এইরূপ একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবনে সে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু হঠাৎ এক দিন তাহার প্রাণে নূতন সাড়া আসিয়া পড়িল। প্রতিদিনের মত সেদিনও কলেজের পথে যাইতে যাইতে অকস্মাৎ নূতন আম্রমুকুলের সৌরভ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখিল অদূরে দেওয়ালের ধারে সামুন্নত আম্রশাখায় চূতমুকুল মুঞ্জরিত হইয়াছে। মনে পড়িয়া গেল আজ ফাল্গুন মাস—নব বসন্তের আগমন-সূচনা। তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন আম্র-মুকুলের সৌরভের ভিতর দিয়া বসন্তের আহ্বান অনুভব করিল। শিরায় শিরায় সমস্ত অনুভূতি যেন চূতমঞ্জরীর সহিত মিশিয়া গিয়া বাসন্তী সৌন্দর্য্যে বিলীন হইয়া গেল।

আজ যেন প্রাণ আর একাকী থাকিতে চায় না, এত অসীম আনন্দ উপভোগ করিবার এক জন সাথী চায়! তাই সে কোন রকমে দু-এক ঘণ্টা কলেজে থাকিয়া বাহির হইয়া পড়িল উল্কার কাছে।

দ্বিপ্রহরের রৌদ্র খাঁ-খাঁ করিতেছে—পিচ্‌ঢালা রাস্তা রৌদ্রতাপে গলিয়া উঠিয়াছে—সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহার মনে হইল, ধরণী আনন্দ-সাগরে স্নান করিয়া উঠিয়া হাসিতেছে। জনবিরল রাস্তায় দু-এক জন যাহাকে দেখিল, ইচ্ছা হইল তাহার কাছে দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে আনন্দের খবর দেয়। বড় রাস্তার সামনে আসিয়া দেখিল, একখানা ট্রাম চলিয়া যাইতেছে। কোন রকমে ছুটিয়া গিয়া ট্রাম ধরিয়া ফেলিয়া এক লম্ফে ভিতরে প্রবেশ করিল।

আলিপুরের অভিজাত পল্লীর নির্জ্জনতার মাঝে উল্কাদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা। বৃহৎ সদরদ্বারের ফটকের পার্শ্বে জমাদার লছমন সিং আহারের পর খাটিয়া পাতিয়া বসিয়া 'খৈনি' ডলিতেছিল। লছমন সিং অনেক দিনের পুরানো চাকর—অচলেশকে দেখিয়া সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। অচলেশ নিকটে আসিয়া ফটকের পার্শ্বে বিলম্বিত একটি ক্ষুদ্র বাক্সের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জানিতে পারিল, উল্কা বাড়িতে নাই। লছমন সিং তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বলিল,—দিদিমণি, আরও কয়েক জন সা.হব, মেমসাহেবের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক হ'ল বাইরে গেছেন। সন্ধ্যার আগে চা খেতে ফিরবেন। দাদাবাবু কি তত ক্ষণ বস্‌বেন? উল্কার অনুপস্থিতি তাহার মন রিক্ততায় ভরিয়া দিয়াছিল। তাই সে লছমন সিংকে অন্য কথা না বলিয়া শুধু "না, লছমন্, আমি আর বস্‌ব না" বলিয়া যেমনই আসিয়াছিল, তেমনই বাহির হইয়া গেল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে জগতের সমস্ত আনন্দ তাহার চোখে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। দ্বিপ্রহরের রুদ্রহাস্তে বাসন্তী সৌন্দর্য্য তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। মনে হইল, এত আগ্রহ এত আনন্দ সব ব্যর্থ সব শূন্য। অন্যমনে ঘুরিতে ঘুরিতে সে ময়দানে আসিয়া পৌঁছিল। এখানে-ওখানে বসিয়া, এদিক-সেদিক চলিয়া কার্জ্জন-পার্ক ছাড়াইয়া গিয়া ইডেন উদ্যানের ছায়াশীতল এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল।

দ্বিপ্রহর গড়াইয়া আসিয়াছে—সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িয়াছেন। বৃক্ষপত্র মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে—শীতল জলকণাবাহী সমীরণ নদী হইতে আসিয়া মাঝে মাঝে মন্দ মন্দ বহিয়া যাইতেছে। অদূরে নদীগর্ভে ষ্টীমারের বংশীধ্বনি মাঝে মাঝে বিরাট দৈত্যের হুঙ্কারের মত শুনা যাইতেছে।

অচলেশের কোন দিকে সংজ্ঞা নাই—যেন সে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। মনে হইতেছে জীবন তাহার উদ্দেশ্যহীন নিরর্থক—তাহার কেহ নাই, কেহ তাহাকে চায় না। উল্কা

কর্ত্তব্যবোধে তাহার সহিত আলাপ করে মাত্র—তাহাকে ভালবাসে না।

কত ক্ষণ সে এমনই অভিভূতের মত বসিয়া রহিল, নিজেই তাহা জানে না। হঠাৎ একটা ঘটনা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে দেখিল, কিয়দ্দূরে—অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে—যেখানে সর্পাকৃতি কৃত্রিম জলপ্রণালী ব্রহ্মদেশীয় দারুময় কারুকার্য্যখচিত প্যাগোডার পাদমূল ধৌত করিয়া যাইতেছে সেখানে দুই জন নরনারী ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিছু ক্ষণ পরে দুইটি গোরা সৈনিক পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া ভদ্রলোকটির সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করিল। তর্কবিতর্কের শেষ হইল হাতাহাতিতে।

ব্যাপার সুবিধাজনক নয় বুঝিয়া অচলেশ যখন তাঁহাদের সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে তখন পুরুষটিকে অক্ষম করিয়া বীরপুঙ্গবদ্বয় স্ত্রীলোকটির দিকে ধাবমান হইতেছিল। স্ত্রীলোকটি চীৎকার করিয়া উঠিল, পুরুষটি "help, help" বলিয়া যথাসাধ্য শক্তিতে সাহায্য প্রার্থনা করিল। ঠিক এমনি সময় অচলেশের বজ্রমুষ্টি সজোরে এক জনের নাসিকার উপর পড়িল। অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া দারুণ ব্যথা পাইয়া সে বসিয়া পড়িল। আর এক জন তত ক্ষণে ব্যাপার বুঝিয়া অচলেশের দিকে ছুটিয়া আসিল। ইতিমধ্যে দু-এক জন করিয়া লোক আসিয়া জমিতেছিল। গোরা দুইটি অবস্থা বুঝিয়া উঠিয়া পড়িয়া গায়ের ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে তাহার দিকে একবার রক্তচক্ষে চাহিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে প্রস্থান করিল। চারি দিক হইতে অজস্র প্রশংসার বাক্য অচলেশের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল—ভদ্রলোকটি গভীর কৃতজ্ঞতায় তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। বিপন্মুক্ত রমণী ডাগর ছলছল চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অচলেশ যখন তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া যাইতে চাহে তখন তাঁহারা কিছুতেই তাহাকে ছাড়িতে চান না। ভদ্রলোক কেবলই বলিতে থাকেন, "আপনি আমার পরম বন্ধু, ভাই; আপনি আজ আমার সম্মান রক্ষা করেছেন।" বিপন্ন ভাব কাটিয়া গেলে রমণী হাসিয়া স্বামীকে বলেন, "দেখ, সাহেবীয়ানার ফলেই তোমার আজ পরম শিক্ষা হ'ল। আর দাদার দলে ভিড়বে—সাহেব সাজবে, বীরপুরুষ?" পরে অচলেশের দিকে চাহিয়া বলেন, "আমি আসবার আগেই ওঁকে বলেছিলাম—দু-এক জন চাকর-দারোয়ান সঙ্গে নিয়ে এস—তা উনি শুনবেন কেন? উনি চান সাহেব-মেমদের মত বেড়াতে। ভাগ্যে আপনি ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলেন—নইলে কি হ'ত বলুন তো?"

প্রশংসায় অচলেশের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল—সে এখন কোনমতে পলাইতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু উপকৃতেরা একেবারে নাছোড়বান্দা। শেষে যখন কোনমতেই তাঁহারা অচলেশকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিলেন না, তখন তাহাকে তাঁহাদের নিজেদের নাম ও ঠিকানার কার্ড দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে কাল অপরাহ্নে সে নিশ্চয়ই তাঁহাদের বাড়ি যাইবে।

অচলেশের মন তখনও স্থির হয় নাই। মন বলিতেছে, সব শূন্য, সব ব্যর্থ; পরক্ষণেই অন্তরের তৃপ্তি বলিতেছে, না, না, আত্মপরতায় সুখ নাই, আত্মদানেই আনন্দ, নিজেকে বিলাইয়া দেওয়াই চরম সার্থকতা। অনেক ক্ষণ পরে অচলেশের মনের ঝটিকা শান্ত হইয়া আসিল। আর সে উল্কাকে নিজের জন্য বিরক্ত করিবে না—তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া কষ্ট দিবে না। তাহাকে সুখী করিবার জন্য সে নিজের দাবি ছাড়িয়া দিতেও প্রস্তুত আছে!

* * *

মনোহরপুরের নবীন ভূম্যধিকারী শ্যামলবিকাশ বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে বালিগঞ্জের সৌখীন পল্লীতে বাস করিতেছেন। তিনি অকৃতদার,—তবে বন্ধুমহলে তিনি এক জন অদ্বিতীয় মহিলা-মনোরঞ্জক (ladies' man) বলিয়া খ্যাত; এবং বিলাতে কয়দিনে তিনি কয়টি মহিলার মস্তক চর্ব্বণ করিয়াছিলেন, এ-বিষয়েও তাঁহারা সময়ে সময়ে গভীর গবেষণা করিয়া থাকেন। বাড়িতে আত্মীয়ের মধ্যে তাঁহার একমাত্র ভগিনী সুশীলা ও ভগিনীপতি সুরেশ থাকেন। মিঃ সুরেশ রায় কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট্‌। তিনি ব্যারিষ্টারী-শিক্ষা মানসে কোনরকমে বাপমায়ের বাক্স ভাঙিয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কিন্তু পরে অর্থাভাবের দরুণ দারুণ মনোকষ্টে বোম্বাই হইতেই ফিরিতে হয়। তিনি শ্যামলবিকাশের উচ্চ আদর্শের আদর্শ অনুকরণ। একত্র থাকিয়া আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে শ্যামলবিকাশের সাহেবীয়ানার উৎকট আদর্শ তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছেন। দু-জনেরই বড় ইচ্ছা—সুশীলাকে মনের মত করিয়া তোলেন। কিন্তু সে কিছুতেই মেম-সাহেব হইতে রাজী হয় না।

তখন শ্যামলবিকাশ ঘর ছাড়িয়া দেশকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ভারতের ঘরে ঘরে মুক্তির বাতাস বহিবে—নর-নারী যথেচ্ছা আলাপ-আচরণ করিবে, বিলাতী অনুকরণে প্রতি গৃহে আনন্দ-নৃত্যের উৎসব বহিবে, যুবক-যুবতী স্বাধীন প্রেমের সুখ আস্বাদন করিবে! এই না হইলে জীবন?

শ্যামলবিকাশ যে-সময় এমনি দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিল, সেই সময় হঠাৎ একদিন উল্কার সঙ্গে দেখা।

ব্যারাকপুরের রেসের পর উল্কা বাড়ি ফিরিতেছিল। একা সে মোটর লইয়া পবনের বেগে চলিয়াছে।

গতিবেগে তাহার আনন্দ—ক্রমশঃ সে মোটরের গতি বর্দ্ধিত করিয়া দিল। খানিক ক্ষণ পরে পিছন ফিরিয়া দেখে একটা মোটর তাহার অনুসরণ করিতেছে। পরাজিতা হইবার পাত্রী উল্কা নয়—সে গতিশক্তি আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল অনুসরণকারীও দ্রুততর বেগে আসিতেছে। উল্কা আরও দ্রুত চলিল।

হঠাৎ পায়ের নীচে ভীম রবে যেন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল—বিরাটকায় ধাবমান দৈত্য সহসা প্রচণ্ড ভাবে টল্‌মল্ করিয়া উঠিল—উল্কা বুঝিল, টায়ার ফাটিয়াছে। এক মুহূর্ত্ত সে চক্ষু মুদ্রিত করিল—কিন্তু পরক্ষণেই অতি ক্ষিপ্র, কৌশলী চালকের মত দৃঢ় হস্তে মোটরের গতিবেগ কমাইয়া দিল। ভগবানের কৃপায়ই হোক, কিংবা নিজের ক্ষমতাতেই হোক, সে-যাত্রা উল্কা রক্ষা পাইয়া গেল।

তত ক্ষণে অনুসরণকারীরা নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি নামিয়া শ্যামলবিকাশ উল্কার কাছে গিয়া বলিল, "উঃ, আপনার সাহসকে ধন্যবাদ; আমি পুরুষ হয়েও আপনার কাছে হেরে গেছি। আশ্চর্য্য—আপনার একটুও ভয় হ'ল না?—ভাগ্যে গাড়ীটা খুব ভাল, আর আপনার মত সুদক্ষ চালনা, সেইজন্যই যা ওল্টোয় নি! কিন্তু তা না-হ'লে কি হ'ত মনে করুন ত?"

হাসিয়া উল্কা বলিল, "মনে আর করবো কি? মরতেই যদি হ'ত, তো এই ভেবে মরতাম যে আমি জয় ক'রে মরেছি—সেইটাই আমার আনন্দ—সেই আনন্দই আমার জীবন।"

আনন্দে শ্যামলবিকাশ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "ব্রেভো! এত দিনে একটা মানুষ পেলাম! এত দিন আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম। দয়া ক'রে কিছু যদি মনে না করেন ত আমি আমার কার্ড আপনাকে দিচ্ছি—আপনিও যদি আমাকে আপনার সঙ্গে সময়-মত দেখা করতে অনুমতি দেন—"

সেই দিন থেকে উল্কার সঙ্গে শ্যামলবিকাশের আলাপ।

জনবিরল বালিগঞ্জের রাস্তা বহিয়া অচলেশ প্রায় গোধূলি-বেলায় পূর্ব্বদিনের কথামত উপকৃতের দ্বারে উপস্থিত হইল। বেহারা লম্বা সেলাম করিয়া রূপার ট্রেতে সুরেশ রায়ের নামাঙ্কিত কার্ডখানাই লইয়া গেল। অচলেশ নিজের নামের কার্ড রাখে না—বিশেষতঃ যাঁহার কার্ড এখন তাঁহার কাছে ফেরৎ পাঠাইলে নিজের আর কোন পরিচয়ের দরকার হইবে না, এই ভাবিয়া অচলেশ এইরূপ কাজ করিল।

সুশীলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুরেশ ড্রয়িং-রুমের প্রবেশ-দ্বারে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু সুসজ্জিত কক্ষের ভিতরে আসিয়া অচলেশ একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল—সম্মুখে উপবিষ্টা উল্কাকে দেখিয়া। উল্কাও তাহাকে দেখিয়া প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া গেল; কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। পরক্ষণেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে অচলেশকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য!—আপনিই কালকের 'হিরো'? আপনার পেটে এত বিদ্যে, তা তো জানতাম না?"

অচলেশ খানিক থামিয়া উত্তর দিল, "বিদ্যে তো আর দেখিয়ে বেড়াবার দরকার হয় না? সময়-মত কাজে লাগাতে পারলেই হ'ল।"

সুশীলা আগাইয়া আসিয়া বলিল, "এই যে, আপনার দেখছি ওঁর সঙ্গে আগে থেকেই চেনা-শুনা আছে?"

অচলেশ শুধু বলিল, "হাঁ"।

উল্কা কিন্তু সেখানেই থামিল না। বলিল, "চেনা-শুনা আজকের নয়; অনেক দিনের। কিন্তু উনি যে কি, আজও তা বুঝলাম না। এতদিন আমি জান্‌তাম উনি নেহাৎ নিরীহ, গোবেচারী; কিন্তু আজ দেখছি আবার adventurous-ও বটে! এ আমার কাছে একটা নূতন আশ্চর্য্য!"

সুশীলা বলিল, "যাক্, কথা কাটাকাটি পরে হবে। আসুন, আগে দাদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

শ্যামলবিকাশের সঙ্গে অচলেশের পরিচয় হইল। "ইনিই আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা—মিষ্টার—" অচলেশ একটা নমস্কার করিয়া হাসিয়া কহিল, "মিষ্টার-টিষ্টার নই। পুরো বাঙালী—শ্রীঅচলেশ রায়, পিতা ৺অবিনাশ রায়; পৈতৃক নিবাস—মাধবগঞ্জ; আপাততঃ—নং বীডন ষ্ট্রীট।"

হঠাৎ শ্যামলবিকাশের মুখের ভাবান্তর হইল। কিন্তু হাসি-ঠাট্টার মধ্যে কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না।

সুশীলা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—"কেমন দাদা? এখন কেমন জব্দ? কি ক'রে পরিচয় দিতে হয়, শুনলে? কই, আর যে কথা বলছ না?" বলিয়া সুশীলা দাদার পরিচয় দিল—"ইনি শ্রীশ্যামলবিকাশ চৌধুরী, পিতা ৺নিমাইদাস চৌধুরী, মনোহরপুরের নূতন জমিদার। নূতন বিলাত-ফেরৎ ব্যারিষ্টার।"

অচলেশ হঠাৎ যেন চমকিয়া উঠিল।

সুশীলা বলিয়া উঠিল, "বা, রে, আপনি আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। ছেলেবেলায় আপনার বাবার নামও শুনেছি। অথচ এত দিন আপনাকেই জানি না?"

অচলেশ বলিল, "আমাকে জানবেন কোথা থেকে—আমি কি আর জানবার মত লোক? বাবা হয়ত নাম-করা লোক ছিলেন, তাই তাঁর নাম শুনেছিলেন।"

অচলেশ ও সুশীলার কথায় বাধা দিয়া উল্কা সকৌতুকে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, আপনি বেশ ত, মিসেস্ রায়?—আমরা যে এতগুলো লোক ব'সে রয়েচি, আমাদের সঙ্গে

কথাই কইছেন না? আজ দেখছি, অচলেশ বাবুর সঙ্গেই মেতে গেছেন?”

সুশীলা সভ্রূভঙ্গে বলিল, “যাঃ, এতদিন পরে এক জন দেশের লোকের মুখ দেখলাম, দুটো কথা বলব না?”

উল্কা তেম্নি কৌতুকভরা হাস্যে বলিল, “আমি ভাবলাম বুঝিবা কৃতজ্ঞতার আবেগে এত কথা বল্‌চেন। তা আমরাও ত দেশের লোক, আমাদের সঙ্গেই বলুন না?”

—কি, আপনি দেশের লোক?

পলকের জন্য পুরাতনের ছবি উল্কার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। পরিহাস-তরল হাসি অকস্মাৎ থামিয়া গেল; বলিল, “হাঁ, উনি আর আমি ত এক গাঁয়েরই লোক।”

শ্যামলবিকাশ ও সুরেশ একসঙ্গে সোজা হইয়া উঠিলেন। উল্কাকে লক্ষ্য করিয়া শ্যামলবিকাশ বলিলেন “কি, আপনারা এক গাঁয়ের লোক? আপনি যে কোনদিন পাড়াগাঁয় থাক্‌তে পারতেন, এ ত আমি ধারণাও করতে পারি না?”

* * *

বাস্তবিক আজকার এই উল্কাকে ছেলেবেলার সেই অভাবশিষ্ট উল্কা বলিয়া চিনিবার কোন উপায় ছিল না। সে এখন মহানগরীর সর্ব্বসুসভ্য কাজের অগ্রণী—আধুনিক শিক্ষিতা নারীসমাজের হালফ্যাশ্যনের প্রবর্ত্তিকা।

অচলেশের সহিত উল্কার বড়-একটা দেখা হইবার সুযোগ হয় না। দৈবাৎ কোনদিন দেখা হইয়া গেলেও তাহাকে একাকী পায় না। উল্কা তাহার হস্তস্খলিত হইতেছে—এই রকম একটা কথা মাঝে মাঝে অচলেশের মনে হয়। তাহার দৈন্যে, তাহার প্রতি উল্কার আচার-ব্যবহার আজকাল যেন একটা গোপন কাঁটার মত প্রায়ই তাহাকে বিঁধিতে থাকে।

দু-এক দিন প্রকাশ্যভাবে সে উল্কার সহিত আলাপ করিতে গিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। মনে হয়, যেন সে এখন অচলেশের সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতে চায়। অচলেশের অভিমানক্ষুণ্ণ হৃদয় প্রতিবারেই বিরক্তিতে ঘৃণায় বলিয়া উঠে, “না, আর না, এখন আর উল্কার ছায়া মাড়ানো উচিত নয়; সে যাহা করিতে চায়, করিতে দাও।” কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে আবাল্যের সুদীর্ঘ অধিকারের সংস্কার মনের কোণে উঁকি মারে।

সেদিন অচলেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উল্কার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। কিন্তু বাহিরের ঘরে আসিয়া যে তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিল সে সুশীলা। একটা ছোট্ট নমস্কার করিয়া সহাস্যে সুশীলা বলিল, “এই যে অচলেশবাবু, আসুন, বসুন। সেদিনের পর তো আর আপনার দেখাই পাই নি?”

প্রতিনমস্কার করিয়া অচলেশ বসিল; কোন কথা বলিল না।

তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সুশীলা কহিল, “কিন্তু আপনি যাঁর খোঁজে এসেচেন, অচলেশবাবু, তিনি তো এখন এখানে নেই? তাঁরা তো সবাই নাটকের রিহার্শেলে গেছেন। তাঁদের ডেকে পাঠাব কি?”

অচলেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, “না, আর ডাকবার দরকার নেই। তাঁদের না-আসা পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো। কিন্তু আমি কার খোঁজে এসেচি, আপনি জান্‌লেন কি ক'রে?” হাসিয়া সুশীলা কহিল, “সে কথা কি আর জানবার দরকার হয়? তারা যে আপনা থেকেই আপনাকে জানিয়ে দেয়?”

একটু দ্বিধাভরে অচলেশ বলিল, “বাঃ, তাহ'লে এর মধ্যে এ-সব কথা আপনাদের মধ্যে আলোচনা হয়ে গেছে?”

সুশীলা উত্তর দিল, “হাঁ, সে তো অনেক দিন আগেই হ'য়ে গেছে?—উল্কা তো সবই বলেছেন? সেইজন্যই তো দাদার সঙ্গে কোন কথা এখনও ঠিক হয় নি?”

বিব্রতভাবে অচলেশ বলিল, “আমিই তাহ'লে শুভকাজের প্রতিবন্ধক? কিন্তু আমি তো তাঁকে কোন বাধা দিই নি—কোন কথাতেও তাঁকে আবদ্ধ করিনি।”

সুশীলা বলিল, “ঠিক্ কথা; কিন্তু এখনও হয়ত তিনি নিজের মনের কাছে জবাবদিহি করতে পারেন নি—হয়ত বিবেক এখনও তাঁকে মাঝে মাঝে খোঁচা দেয়!”

অচলেশ যাহা শুনিতে আসিয়াছিল, আজ স্পষ্টভাবে সে-কথা শুনিতে পাইল। ক্ষণেক সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। হায় রে, দুর্ব্বল মানুষের মন। মনের মধ্যে যে-সন্দেহ অহর্নিশ গোপন আক্রমণ করিতেছে, আজ তাহার স্পষ্ট প্রকাশে সে রুদ্ধবাক্ হইয়া রহিল।

ব্যথা পাইয়া সুশীলা বলিল, “বড় দুঃখ পেয়েছেন, অচলেশবাবু? আমার বড় দুর্ভাগ্য যে আমার কাছ থেকে আপনাকে এ-কথা শুনতে হ'ল। কিন্তু আপনি এ-সব জানেন, কি জানেন না, ভেবে আমি নিজেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো, ভেবেছিলাম। সময় থাক্‌তে আপনাকে সাবধান ক'রে দেবার ইচ্ছাও ছিল।”

অচলেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, “না, আমাকে সাবধান করবার দরকার নেই। কারও নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ আমি চাই নে। এখন আমি চললাম। তিনি এলে বল্‌বেন, তাঁর ইচ্ছার অনুযায়ী কাজ যেন তিনি করেন—আমি সেটা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করবো। তাঁর ওপরে আমার কোন রকম দাবি আছে, এ যেন তিনি মনে না করেন।”

অকস্মাৎ অচলেশকে বাধা দিয়া সুশীলা বলিল, “এরই মধ্যে চলে যাবেন কি, অচলেশবাবু?—আপনাদের

এত দিনের পরিচয়, তাঁর মুখের একটা কথা না-শুনে কি করে যাবেন ? তিনি যদি একটা ভুলই করতে যান—হীরে ফেলে আঁচলে কাচ বাঁধেন তাহলে কি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করবেন না ?”

—এ কি কথা বল্‌ছেন আপনি ?

—বল্‌ছি ঠিক কথাই। যাঁকে নিয়ে কথা হচ্ছে, তিনি আমার বড় ভাই, আমার পূজ্য, তাঁকে আমি জানি। কিন্তু যেখানে এক জন নারীর সমস্ত জীবন নির্ভর করছে, সেখানে তিনি যত বড় পূজ্যই হ'ন, তাঁর সম্বন্ধে সত্য বলাই উচিত। এ-সব কথা নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক অপ্রীতিকর প্রসঙ্গও আমাদের মধ্যে হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি আর একটু বসুন। উল্কাও আপনাকে সমস্ত কথা বলবেন বল্‌ছিলেন—তিনি তো গোপন করতে চান্ না ?”

অচলেশ একটু শুষ্ক হাসিয়া বলিল, “তাই তো এত দিন আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম—উল্কার স্বভাবে তো গোপনতা নেই ?”

“কি গোপনতা দেখলেন তবে আজ ?” বলিয়া উল্কা সুশীলা ও অচলেশের সম্মুখে আসিয়া পড়িল।

পলকের জন্য অচলেশের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, বলিল, “তা কি তুমি জান না ?”

—হাঁ, কতকটা আন্দাজ করছি। কিন্তু আমি তো কারও কাছে সমস্ত কথা বল্‌তে বাধ্য নই ?

—তা আমি জানি। সেইজন্যই আমি এঁকে বলছিলাম তোমায় বলতে যে আমি তোমার উপর কোন দিন কোন দাবি করি নি, আর তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ না কর, এই আমার ইচ্ছা।

শ্লেষের হাসি হাসিয়া উল্কা বলিল, “উপদেশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার অসাক্ষাতে আমার কোন গোপন কথা নিয়ে কেউ আলোচনা করে।”

নির্ব্বিকার শান্ত অচলেশ এত দিনে সহসা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; বলিল, “কার কাছে তোমার কোন্ কথা গোপন হ'ল, উল্কা ?—এঁর কাছে তো নয় ? তবে আমার কাছেই আজ তোমার সব কথা গোপন হয়েছে ?”

মুখের কথা লুফিয়া উল্কা পাল্টা জবাব দিল—“যদি বলি তাই ?”

অচলেশ ধৈর্য্যহারা হইয়া বলিয়া উঠিল, “কিন্তু সেদিন আমার কাছে তোমার কোন্ কথা গোপন ছিল, উল্কা, যেদিন তোমার পিতা আমার হাতে তোমায় স'পে দিয়েছিলেন ? যেদিন গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তিনি আমায় বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন ? তার পরে অনেক বদলে গিয়েছে—তোমরা বড়লোক হয়েছ—আমায় আগে বড়লোক হতে তার পরে তোমায় বিয়ে করতে চাইতে বলেছ; সবই জেনেছি, বুঝেছি—কিন্তু তখনও তো তোমার কোন কথা আমার কাছে গোপন ছিল না ? আজ দু-দিন নূতন বন্ধু পেয়ে সবই ভুলে গেছ ?”

ঝঙ্কার দিয়া উল্কা বলিল, “তাই বুঝি নির্জ্জনে নূতন বন্ধুনীর কাছে পুরানো বন্ধুত্বের বাহাদুরী করছিলে ?”

অচলেশ গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, “উল্কা,—চুপ ! আর কোন কথা নয়। আমি চললাম। প্রার্থনা করি শ্যামলবিকাশকে বিয়ে ক'রে তুমি সুখী হও।”

অচলেশ চলিয়া গেল। তাহার গমনপথের দিকে উল্কা রুদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মনে হইল হঠাৎ কি যেন হইয়া গেল ! যাহা নিকটতম, চির আপনার, তাহাই যেন আজ দূরে—চিরবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইচ্ছা হইল একবার ডাক ছাড়িয়া কাঁদে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলবিকাশের মোটরের হর্ণ তাহার কানে প্রবেশ করিল। আজ পুরাতনের বিদায়, নূতনের আহ্বান !

* * *

মাস-কয়েক কাটিয়া গিয়াছে। শ্যামলবিকাশের সহিত উল্কার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহাদের ইহাতে আনন্দে উৎফুল্ল হইবার কথা, তাহাদের মুখে বিশেষ আনন্দের আভাস দেখা যায় না। উল্কা যেন সর্ব্বদাই উন্মনা, শ্যামলবিকাশ চিন্তামগ্ন। সুশীলারও যেন দূরে দূরে সরিয়া যাইবার ভাব। অথচ মুখে কেহ কিছুই প্রকাশ করে না।

সুশীলা যেন ইহাদের কাছে আর একটা রহস্য। সে উল্কাকে আর কোন কথা বলে নাই বটে, কিন্তু সে যে তাহাদের বিবাহ বিশেষ অনুমোদন করিতেছে না, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। কিছু দিন পরে উল্কার অসাক্ষাতে শ্যামলবিকাশের সহিত তাহার মস্ত একটা বোঝাপড়া হইয়া গেল।

শ্যামলবিকাশ স্থির থাকিতে না পারিয়া এক দিন সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, তোর ব্যাপারখানা কি, বল দেখি ?”

—কেন, কি দেখলে ?

—সর্ব্বদাই একটা আড়াআড়ি, ছাড়াছাড়ি ভাব, কি যেন মনের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে চল্‌ছিস ?

—এ আর আজ তোমায় নূতন ক'রে কি বলব দাদা ? তোমায় তো কোনদিন কোন কথা লুকোই নি ?

—ওঃ, আজও তোর সে ভাব গেল না ? কেন, আমাদের এ-বিয়েতে তুই খারাপটা কি দেখলি, বল দেখি ?

সুশীলা কথা কহিল। স্থির আয়ত নেত্রে শ্যামলবিকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, “দাদা, এই আমার শেষ অনুরোধ রাখ। উল্কাকে তুমি বিয়ে ক'রো না।”

—কেন ?

—এতে তোমরা দু-জনেই অসুখী হবে।

—তার কারণ?

—তার কারণ—উল্কা শুধু উত্তেজনার বশেই তোমায় বিয়ে করছে। আর সত্য কথা বল্‌ছি, মাফ্ করো দাদা, তুমি উল্কার উপযুক্ত নও।

শ্যামলবিকাশ রোষবহ্নি দমন করিয়া একটু হাসিল, বলিল, "কিসে আমায় এমন অনুপযুক্ত দেখ্‌লি?"

—তোমার জীবনের সমস্ত কাজের মধ্যে—আমার তো কিছুই অজানা নেই দাদা? নূতনত্ব, পরিবর্ত্তনত্বের দোহাই দিয়ে কি কাজই না এত দিন করেছ? শুধু বিদেশে নয়, এখানেও তো বড় কম করো নি?—তোমার সারাজীবন যে মিথ্যার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত? আমার খালি ভয় হয় যে কোন্‌দিন তোমার ছদ্মবেশের মুখোস খুলে গিয়ে আসল রূপ বেরিয়ে পড়বে—সেদিন আর অপমানের অন্ত রইবে না।

বিকৃত স্বরে শ্যামলবিকাশ বলিল, "বটে?"

সুশীলা বলিয়া যাইতে লাগিল, "তার চাইতে তোমার পায়ে ধ'রে বলছি, দাদা, তাকে ছেড়ে দাও। এর চাইতে অনেক ভাল সুন্দরী মেয়ে তুমি পাবে—কিন্তু এ-মেয়ে তোমার জন্য নয়। এর মনোভাব, তোমার আচার-ব্যবহার, দু-দিনে তোমাদের জীবন বিষময় ক'রে তুল্‌বে। এর সঙ্গে মিল্‌তে দাও তাকে, যে এর জন্য সৃষ্ট হয়েছিল—যে আকাশের মত নির্ম্মল, স্বচ্ছ, অসীম।"

—কে সে?

—যে তার আবাল্যের বাগ্‌দত্ত—ওই চিরদরিদ্র অচলেশ। ভগবান্ জানেন, কেন আমার মনে হচ্ছে, তার ওপর আমরা বড় অবিচার করছি। তাকে আমরা সর্ব্বস্বহারা ক'রে ফেল্‌ছি।

এবার শ্যামলবিকাশ ধৈর্য্যহারা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "কি, আবার অচলেশের হয়ে ওকালতী করতে এসেছ? যার খাও, তারই ঘর পোড়াও! জান, এখনও তুমি আমার আশ্রয়ে আছ। এ-সব বল্‌তে হয়ত বাইরে গিয়ে বল, আমার ঘরে নয়।"

সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "তুমি, দাদা, আজ আমায় এমন কথা বল্‌লে? কেন তোমায় এ-সব বল্‌লাম, বুঝলে না?"

দুঃখে, অভিমানে সুশীলা চলিয়া গেল।

শ্যামলবিকাশের সম্বিৎ ফিরিল তখন, যখন গাড়ী ডাকাইয়া আনিয়া জিনিষপত্র তুলিয়া দিয়া স্বামীর সহিত সুশীলা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া তাহার পায়ে প্রণাম করিল, বলিল, "মনের দুঃখে অনেক কথা ব'লে ফেলেছি দাদা, আমার মাপ ক'রো।"

শ্যামলবিকাশ তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "একি রে, সুশী, তুই যাচ্ছিস্ কোথায়?"

সুশীলা নিরুত্তর রহিল।

শ্যামলবিকাশ তাহার হাত দুখানা চাপিয়া বলিল, "ছোট বোনটি আমার, এবারকার মত দাদার দোষগুলো ক্ষমা কর্ দিদি।"

ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া সুশীলা বলিল, "দাদা, দোষ কারও একলার নয়, সবই আমাদের অদৃষ্টের। তবে আমাদের যে আর একসঙ্গে থাকা হ'তে পারে না, এটা ঠিক্।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া শ্যামলবিকাশ বলিল, "বুঝেছি, তোর আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। কিন্তু এটা দু-দিন পরে করলে হ'ত না? আজই তোরা আমায় একলা ফেলে গেলি?" সুরেশের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি হে, সুরেশ, তুমিও কি এর সঙ্গে পাগল হ'য়ে গেলে? আমার হ'য়ে দুটো কথাই বল না?"

মিঃ সুরেশ রায় কি বলিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া শুধু মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

এবার সুশীলা হাসিয়া ফেলিল, শ্যামলবিকাশের পানে চাহিয়া বলিল, "আমরা কি তোমায় ফেলে যাচ্ছি, দাদা? তবে মনটা একটু খারাপ হয়েছে, তাই ভাব্‌ছি কয়েকটা দিন একটু ঘুরে আসি।"

—তবে এ-সব কাজকর্ম্ম করবে কে?

—কিসের? বিয়ের? তোমাদের তো সাহেব, মেমসাহেবের বিয়ে, দাদা, এতে আর কাজকর্ম্মের কিসের দরকার হবে? বিয়ের সময়-সময় খবর দিও। যেখানেই থাকি না কেন, তখন এলেই তো হ'ল?"

দাদার পদধূলি লইয়া সুশীলা ও সুরেশ বাহির হইয়া গেল।

উল্কা যখন শ্যামলবিকাশকে সুশীলাদের চলিয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তখন শ্যামলবিকাশ বলিল, "তাহারা দিন-কয়েকের জন্য বেড়াতে গেছে।"

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে যখন তাহারা ফিরিল না, তখন উল্কা একটু সন্দিগ্ধ হইয়া শ্যামলকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল তো, কেন তারা চলে গেল?"

উল্কার সন্দেহে ভীত হইয়া শ্যামলবিকাশ খানিকটা অর্দ্ধসত্য না বলিয়া পারিল না; বলিল, "সত্যিই তারা বেড়াতে যাচ্ছে ব'লে গেল। কিন্তু তার আগে তার সঙ্গে আমার একটু বচসা হয়েছিল।"

—কি নিয়ে?

—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে, অথচ এখনও আমি তোমার কাছে একটা সত্য গোপন করছি, এই নিয়ে।

—কি সত্য গোপন করছো, আর কেনই বা করছো তাকে?

—কিছুই তোমার কাছে গোপন করার ইচ্ছে ছিল না, উল্কা; নাইও।" বলিয়া একটু থামিয়া শ্যামলবিকাশ পুনরায় বলিল, "এ-সব কথা অনেক দিন আগে থেকেই তোমায় বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু একটা সঙ্কোচ, কেমন একটা লজ্জা, সর্ব্বদাই আমায় বাধা দিত। এত দিন সে-কথা বল্‌তে পারি নি বলে আমায় ক্ষমা ক'রো, উল্কা।"

একটু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া উল্কা বলিল, "এখন বল।"

শ্যামলবিকাশ একটা ঢোক্ গিলিয়া আরম্ভ করিল, "দেখ, আমি যখন বিলাত যাই, তখন আমার প্রথম যৌবন, পৃথিবীকে আমি সেই সর্ব্বপ্রথম সুন্দর চোখে দেখ্‌ছি। সে-সময় প্রথম প্রেমের নেশায় আমি এক ইংরেজ বালিকাকে ভালবেসেছিলাম।"

—তার পর ?

—আমার সঙ্গে তার বিয়ের কথা সব ঠিক্‌ঠাক্ হয়েছিল। কিন্তু বিয়ে হবার আগেই বাবা সে-কথা জানতে পেরে প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন। তার ফলে তাকে পরিত্যাগ ক'রে আমাকে ভারতবর্ষে ফিরে আস্‌তে হয়—বিয়ে হয় নি।

—বেশ বীরপুরুষ তো ?—তোমরা সবাই দেখ্‌চি এক ছাঁচে গড়া ?

—আমার সে অসহায় অবস্থার দিনকার দুর্ব্বলতা মাপ্ করো উল্কা। কিন্তু তার পরে খবর নিয়ে জান্‌তে পেরেছি যে, তাকে বিয়ে না-করে আমি ভালই করেছি। এক জন ইংরেজ যুবককে বিয়ে ক'রে সে এখন সুখেই আছে।

উল্কা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল—কথা কহিল না। মনের গোপন কোণে তাহার কি কোন সন্দেহ জাগিয়া উঠিতেছিল ? হয়ত সমস্ত সত্য এখনও সে জানে নাই।

উল্কাকে নিরুত্তর দেখিয়া শ্যামলবিকাশ পুনরায় কহিল, "আমার সেই একটিবারের দুর্ব্বলতা মাপ্ ক'রো, উল্কা; যা হয়েছে, ভালর জন্যই হয়েছে। তার সঙ্গে বিয়ে হ'লে তো আর তোমায় পেতেম না। আর আমার মনে কোন ময়লা নেই, গোপনতা নেই। সব ধুয়ে পুঁছে ফেলে এখন আমি তোমারই মিলনপ্রতীক্ষায় বসে আছি—আমার সব কথাই তোমায় বল্‌ছি, উল্কা!"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শ্যামলবিকাশের পানে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া উল্কা বলিল, "তোমার সব কথাই বলেছ ? আর তো কোন কথা গোপন নেই ?"

দৃঢ়স্বরে শ্যামলবিকাশ বলিল, "না, কিছু গোপন নেই ; আমায় তুমি বিশ্বাস করতে পার, উল্কা।"

উল্কা হাসিল, বলিল, "বেশ, স্বীকারোক্তির পুরস্কার-স্বরূপ তোমার একটিবারের দুর্ব্বলতা মার্জ্জনা ক'রে নিলাম। কিন্তু দেখো, আর যেন অসত্য, গোপনতা, কিছু তোমার মধ্যে না থাকে ; আবার যেন কোন দুর্ব্বলতা না আসে।"

* * *

সুশীলা ও সুরেশ এখানে-সেখানে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছে। সম্প্রতি তাহারা মনোহরপুরে গিয়াছে—শ্যামলবিকাশ এ-সংবাদ পাইয়াছে। সে একটু চিন্তিত হইল। মনোহরপুরে সুশীলার পিতৃদত্ত একখানা বাড়ি ও আশপাশের দু-চারখানা গাঁয়ে কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে। সে-সব এতাবৎকাল শ্যামলবিকাশই রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছে।

কিন্তু শ্যামলবিকাশের চিন্তা চরমে পরিণত হইল তখন, যখন তাহার কাছে সংবাদ আসিল যে, সুশীলা তাহার ওকালতনামা (Power of Attorney) খারিজ করিয়াছে। কেন এ চিরপ্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম হইল ? সুশীলা চায় কি ? দারুণ দুশ্চিন্তায়, সংশয়ে শ্যামলবিকাশের মুখ মসীময় হইয়া উঠিল।

দু-এক দিন পরে হঠাৎ একখানা প্রকাণ্ড মোটরকার এক দিন অচলেশের জরাজীর্ণ দ্বারের সম্মুখে থামিল। অচলেশ শ্যামলবিকাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া প্রথমে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

শ্যামলবিকাশের মুখ ম্লান—কপালে চিন্তার রেখা। ছোট একটা নমস্কার করিয়া সে একটা গোলাপী রঙের খাম অচলেশের হাতে দিয়া বলিল, "আমি নিজেই আমার বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি, অচলেশবাবু, আশা করি আপনি আস্‌বেন—কোন বিবাদ-বিসম্বাদ মনে রাখবেন না।"

অচলেশ বলিল, "না, বিবাদ-বিসম্বাদ আর কি—তবে আমি ভেবেছিলাম, আপনাদের কাছে আমার আর না-যাওয়াই ভাল।"

অতি আগ্রহে শ্যামলবিকাশ বলিল, "না, সে কি হয়, সে কি একটা কথা ? আর আপনি যে আমাদের কি, তা কি আমরা জানি না ?"

উত্তরে অচলেশ শুধু মাথা নাড়িল।

শ্যামলবিকাশ বলিয়া যাইতে লাগিল, "আজ বিশেষ ক'রে আপনার একটা দয়াভিক্ষা চাইতে এসেছি। বলুন, আপনি আমার কথা রাখ্‌বেন ?"

অচলেশ বলিল, "সাধ্য হ'লে রাখবো না কেন ?"

শ্যামলবিকাশ মৃদুস্বরে কি যেন বলিল।

তার পর শ্যামলবিকাশ অচলেশের হাত-দুখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বলুন, তাহ'লে এসব কথা ঘুণাক্ষরেও উল্কার কাছে বলবেন না ? সুশীলা অনেকটা সন্দেহ করেছে বোধ হয়, কিন্তু সমস্ত কথা জানে না।"

একটু থামিয়া শ্যামলবিকাশ অচলেশের মুখপানে চাহিল; অচলেশ কোন কথা কহিল না। শ্যামলবিকাশ পুনরায় বলিল, "সুশীলা বোধ হয় সমস্ত না জানলে কোন কথা বলবে না; বল্‌লেও উল্কা শুনবে না। কিন্তু আপনার মুখ থেকে কোন কথা শুনলেই উল্কা বেঁকে দাঁড়াবে। আপনি তো জানেন, সে বড় অভিমানিনী, জেদী ধরণের মেয়ে। বলুন, আপনি কোন কথা বল্‌বেন না—আমার জীবনের প্রধান সুখশান্তি নষ্ট করবেন না?"

অচলেশ স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার বুকের মধ্যে যেন সহস্র হাতুড়ি একসঙ্গে ঘা দিতে লাগিল। ক্ষণেক শ্যামলবিকাশের মুখপানে চাহিয়া ভাবিল—লোকটা বলে কি? কাহার কাছে এ-কথা বলিতেছে, কি পরিমাণে আত্মত্যাগ তাহার কাছে চাহিতেছে সে কি জানে না? অথবা এই হয়ত তাহার প্রকৃতি—হয়ত তাহার আত্ম-সুখের কাছে অপরের হৃদয় কিছুই নয়! যাই হোক্‌, উল্কাকে সে তো বলিয়াছে, তাহার উপর কোন দাবি রাখে না—আর এত দিন পরে সে কি ঘৃণিত স্বার্থের জন্য এমন বর্ব্বরোচিত কাজ করিবে?

অচলেশের নীরবতায় শ্যামলবিকাশ ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িল—তাহার হাত দুখানা আবার সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কি, আমায় কি এই দয়াটুকু করবেন না?"

অচলেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইল; বলিল, "কোন দয়ার কথা নয়, শ্যামলবাবু! আমি ত উল্কাকে অন্য কিছুর জোরে কোন দিনই আপনার করতে চাই নি?"

শ্যামলবিকাশ তথাপি বলিল, "তাহ'লে উল্কাকে এর কোন কথাই বল্‌বেন না, প্রতিজ্ঞা করুন।"

অচলেশের সহ্যের সীমা উত্তীর্ণ হইল; বলিল, "ভদ্রলোকের কথাই প্রতিজ্ঞা—এর বাড়া আর কিছু বল্‌তে পারি না।"

* * *

কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ শ্যামলবিকাশ এত শীঘ্র বিবাহের দিন স্থির করায় উল্কা তাহাকে অনুযোগ করিল। হাসিয়া শ্যামলবিকাশ বলিল, "এটা তোমাদের জন্য একটা 'সারপ্রাইজ্‌'। আরও তোমার জন্য কত কি করবো, ঠিক করেছি, তার তুমি কি জান?"

নবীনত্বের নেশায় উল্কা নাচিয়া উঠিল, বলিল, "বলোই না একবার?"

ঘাড় নাড়িয়া শ্যামলবিকাশ বলিল, "উঁহু; তা বলবো কেন?—তা'হলে আর মজাটা কি হ'ল? সময় বুঝে সব বল্‌তে হয়ে তো?"

তারপরে কয়েকটা দিন যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল, উল্কা তাহা জানে না। সর্ব্বদাই ছুটাছুটি, হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়া হু হু করিয়া দিনগুলা চলিয়া গেল। সুশীলা এখনও আসে নাই—বাধা-বিপত্তি ঘটাইবার কেহ নাই। শ্যামলবিকাশের মুখেও হাসি ফুটিয়াছে। উল্কাকে লইয়া দোকান দোকান ঘুরিয়া সে প্রায় কাপড়-চোপড় অলঙ্কারপত্রে লাখ্‌খানেক টাকা খরচ করিয়া ফেলিল। এত টাকা খরচ করাতে উল্কা কৃত্রিম অনুযোগ করিল। সহাস্যে শ্যামলবিকাশ তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, "বেশ করছি, গো, বেশ করছি; আমার টাকা আমি খরচ ক'রে যদি তোমায় মনের মত সাজাই, তাতে তোমার বল্‌বার কি আছে?"

উল্কা কৃত্রিম রোষে সভ্রূভঙ্গে শ্যামলবিকাশের পৃষ্ঠদেশে ছোট্ট একটা কিল মারিল।

সম্পূর্ণভাবে দ্বিধা ত্যাগ করিয়া উল্কা এখন আপনাকে শ্যামলবিকাশের সহিত মিলাইয়া দিয়াছে। আর অচলেশ? —হ্যাঁ, অচলেশ বলিয়া কেহ ছিল বইকি! মাঝে মাঝে তাহার কথা মনে হয় বইকি! তাহাকে লইয়া শ্যামলবিকাশ তাহার সহিত মাঝে মাঝে ঠাট্টাও করে! উল্কা অভিমান করিলে শ্যামলবিকাশ তাহাকে খোঁচা দেয়—

"কি গো, অচলেশ-বিরহিণি!"

ভ্রূকুটি করিয়া উল্কা বলে, "ও আবার কি কথা?"

তরল হাসি হাসিয়া শ্যামলবিকাশ জবাব দেয়, "কেন, ঠিক কথাই বলেছি ত? তুমি ত অচলেশেরই?"

পরিহাসের সুরে উল্কা বলে, "তাই যদি বোঝো, তবে পরস্ব অপহরণ কর কেন? আমি কিন্তু ও-জিনিষটা একদমই সইতে পারি না, তুমি যাই বল না কেন!"

শ্যামলবিকাশের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠে!

উল্কা ভাবে,—আহা, বেচারী! সে বড় কষ্টে আছে, না? কিন্তু উল্কা নিরুপায়, তাহার জন্য কি করিবে? মন ত তাহাকে চায় না? হ্যাঁ সত্যই কি তাই? উদ্গত একটা দীর্ঘশ্বাস উল্কা চাপিয়া যায়। আহা কি কষ্টেই না সে আছে? কিন্তু তাহার কষ্ট সে নিজেই বোঝে না—এমন অপদার্থ, অক্ষম সে! যাই হোক, উল্কা তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। শ্যামলবিকাশকে বলিয়া তাহার ভাল একটা কাজকর্ম্মের সংস্থান করিয়া দিবে—নিজে একটি সুন্দরী মেয়ে দেখিয়া তাহার বিবাহ দিবে।

আজ উল্কার বিবাহ। অচলেশ গোলাপী রঙের খামখানা একবার গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল; তারপর অতিসন্তর্পণে সেটা বুকপকেটে রাখিল। বরাবর ছাদে উঠিয়া আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। কি তাহার হইয়াছে—কি তাহার গিয়াছে—সে তাহা উপলব্ধি করিতেও পারিল না! সর্ব্বহারা হইলেও মানুষ কি এমনি উদাস, আপনহারা হইয়া বসিয়া রয়?

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল, এখন হয়ত উল্কার বিবাহ হইতেছে। সে কি করিবে, যাইবে কি? একবার ভাবিল, না, যাইব না। পরক্ষণেই মনে হইল, না গেলে উল্কা তাহাকে কাপুরুষ মনে করিবে; এ-চিন্তা অচলেশের অসহ্য। না, উল্কা দেখুক, অচলেশ কাপুরুষ নয়।

অচলেশ প্রস্তুত হইয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় ডাকপিওন আসিয়া তাহার হাতে একখানা পত্র দিয়া গেল। খামের উপরকার হাতের লেখা সম্পূর্ণ অপরিচিত। পত্র আসিয়াছে, তাহার কলেজের ঠিকানায়, সেখান হইতে ঘুরিয়া দুই-এক দিন পরে তাহার ঘরে পৌঁছিয়াছে। খাম খুলিয়া অচলেশ দেখিল, চিঠি লিখিয়াছে—সুশীলা। সুশীলা লিখিয়াছে যে সে অচলেশের ঠিকানা জানে না বলিয়া এত দিন চিঠি লেখে নাই। সম্প্রতি তাহার কলেজের নাম মনে পড়ায় সেই ঠিকানাতেই সে চিঠি দিতেছে। অন্যান্য কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করার পরে সুশীলা লিখিয়াছে যে, সে এত দিন পরে নিঃসন্দেহে জানিয়াছে তাহাদের প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই অচলেশের। সুশীলার দুর্ভাগ্যক্রমে তার পিতাই সে-সম্পত্তির অপহারক। সুশীলাও সে-সম্পত্তির কতক অংশ পাইয়াছে। কিন্তু সুশীলা তাহার পিতার, তাহার পিতৃবংশের এ কলঙ্ক অপনোদন করিবে। অন্ততঃ তাহার অংশে অচলেশের যে-সম্পত্তি আছে তাহা তাহাকে ফিরাইয়া দিবে। তাই সে সমস্ত দলিলপত্র সংগ্রহ করিতেছে। অপহৃত দলিল ফিরিয়া পাইলে অচলেশ বুঝিতে পারিবে যে, সে-সমস্ত একবার কোর্টে দাখিল করিলেই সম্পত্তি যে অচলেশের তাহা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইবে।

অচলেশকে যেন একসঙ্গে সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিল। হা ভগবান্, একি করিলে? আজ নিরাশার দ্বারে দাঁড়াইয়া এ আলোক কেন, দয়াময়? সবই তো চলিয়া গিয়াছে, তবে এখন আর এ প্রলোভন কেন? আপনা হইতে যদি দিলে, তবে সময় থাকিতে একবার দিলে না কেন? অচলেশ উন্মত্তের মত হাসিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গেই সে চমকিয়া উঠিল! একি, কি করিতেছে সে, পাগল হইয়া গেল নাকি? সে অচলেশ, অচলেশই রহিবে। ভগবান বল দাও, সে দুর্বলতা জয় করিবে। কিন্তু আজ নয়—আজ আর তাদের কাছে যাওয়া হবে না। কি জানি, আমিও তো মানুষ—যদি কিছু ক'রে বসি?

* * *

শ্যামলবিকাশ বরবেশে বিবাহসভায় আসিয়াছে। মুখে তাহার হাসি খেলিয়া গেলেও সে যেন শঙ্কিত ভাবে এক-একবার এদিক-ওদিক্ চাহিতেছে। যাহারা তাহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ, তাহাদের মধ্যে একটা কি গুজব শোনা যাইতেছে। —সে যাই হোক্, সংবাদটা তখন অন্দরের মধ্যেই রহিয়া গেল। কেহ সেই কথা প্রকাশ করিয়া বিবাহের সময় গণ্ডগোল করিতে দিল না।

নির্ব্বিঘ্নে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

* * *

পরদিন—তখনও অরুণোদয় হয় নাই। নিশান্তের শীতল বাতাসে রাত্রিজাগরণক্লিষ্ট অচলেশের চোখে সবেমাত্র একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। এমন সময় বৃদ্ধ লছমন সিং আসিয়া অতি সন্তর্পণে তাহার উপাধান-নিম্নে কি একটা জিনিষ রাখিয়া দিল।

অচলেশের তন্দ্রা কাটিয়া গেল; সে উঠিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন সানাইয়ের বিদায়রাগিণী তাহার কানে প্রবেশ করিল—মনে পড়িল, আজ উল্কার নূতন জীবনের প্রথম প্রভাত।

লছমন সিং দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করিতেছিল। অচলেশ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে, রে?"

—দাদাবাবু আমি, লছমন্।

—কি হয়েছে, রে, লছমন্?

লছমন্ সরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "দিদিমণি এক্ঠো চিঠ্ঠি ভেজা। হাম্ হুঁয়ে পর রাখ্ দিয়া। আপ্ কাল্ কাহে নেহি আ রহা, দাদাবাবু? দিদিমণি রোওনে লাগা।"

অচলেশ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, রে?"

—মালুম্ নেহি, দাদা! সাদি-ওদি হো যানেসে, হাম রাত দো বাজে থোড়া কাম্‌কা ওয়াস্তে ছাদে পর গিয়া; দেখা দিদিমণি এক কোণামে খাড়া রহা। নগিজ্‌মে গিয়ে হাম দেখ্‌লো দিদিমণি রোতা। হামি পুছ্‌লো, 'কি হইয়েছে, দিদি?' বল্‌লো, 'কুছু হয়নি, তুই যা'। ব'লে নীচে চলে গেল।"

—বটে?

লছমন্ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার মৃদুস্বরে কহিল, "আপ্ চিঠি উঠ্‌ঠি পড়্‌কে থোড়া আস্‌বেন, দাদাবাবু; দিদিমণিকো থোড়া দেখ্‌বেন; গোস্‌সা রাখবেন না।" বলিয়া বৃদ্ধ লছমন্ সিং আভূমি প্রণত সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

অচলেশ চিঠি খুলিয়া পড়িল; উল্কা লিখিয়াছে—

চিরবন্ধু আমার, আবাল্যের সখা,

আজ তোমায় চিঠি লিখছি, আমার আনন্দের সংবাদ দিতে, আর তোমায় এ-আনন্দের অংশীদার করতে।

কাল তুমি আসবে ভেবেছিলাম, আসোনি কেন? তুমি নির্ব্বিকার, দার্শনিক। ছিঃ, তোমার এখনও এ কাপুরুষতা কেন? সুখ, দুঃখ, হতাশা তো তোমায় স্পর্শ করতে পারে না—তবে কেন তুমি কাল স'রে দাঁড়িয়েছিলে?

আজ প্রথম যাত্রার পথে তুমি এসে আমায় আশীর্ব্বাদ করবে না?

তুমি হয়ত অনুযোগ করবে, আমি তোমায় ভুলে গেছি। কিন্তু তা নয়; বাল্যের বন্ধু, কৈশোরের সহচর আমার, তোমায় কি আমি ভুলতে পারি?

তোমায় আমরা সুখী করতে চাই, বিশ্বাস কর কি?

আজ আমরা এখান থেকে বেরিয়েই চ'লে যাচ্ছি—একেবারে কয়েক মাসের জন্য য়ুরোপ-ভ্রমণে। সকলে কি 'সায়প্রাইজ'টাই না পাবে?—দেখ তো, কি নবীনত্ব, কি প্রাণবন্ত জীবন এখানে?

অবিশ্যি ক'রে একটি রাত্রের জন্য দেখা দিয়ে যেও—দেখে যেও, নির্ব্বাচনে আমি ভুল করেছি কি না।

তোমার চিরস্নেহের
উল্কা

পত্র যেন অচলেশের পরাজয় বহিয়া আনিয়াছিল। কাল রাত্রে আবার এই উল্কাই নাকি কাঁদিয়াছিল? কি হৃদয়হীনা, প্রহেলিকাময়ী এই নারী!

উল্কা ও শ্যামলবিকাশের বিদায়ের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। গৃহের কর্ত্রীস্থানীয় সকলে তাহাদের প্রবাসগমনের সব উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া দিবার জন্য বাহির হইয়া গিয়াছেন। পুরস্ত্রীদের মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন হইলে বরবধূ বিদায় লইবে।

অচলেশ আসিয়াছে—একবার শেষদেখা সে উল্কাকে দেখিবে! হৃদয়কে প্রাণপণ শক্তিতে সংযত করিয়া নিশ্চল পাষাণমূর্ত্তির মত সে দাঁড়াইয়া—তবু যেন তার সর্ব্বাঙ্গে অবসাদের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। চক্ষু দুটি শ্রান্ত, তবুও শান্ত, হাসিমাখা।

মঙ্গলাচার সমাপ্ত হইলে শ্যামলবিকাশ একটা শান্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাহিরে আসিল—দুই চোখে তার সাফল্যের দীপ্তি, মুখে জয়গর্ব্বের হাসি। সুসজ্জিত গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া অচলেশের সহিত দু-একটা কথা বলিতে লাগিল।

উল্কা আসিল—মহামহিমময়ীর মত। নব-অভিষিক্তা সম্রাজ্ঞীর মত দৃপ্ত চরণ-ভঙ্গীতে—কমলার মত লীলাচঞ্চল হাসিমুখে—শ্যামলবিকাশের পার্শ্বে দাঁড়াইল। দরিদ্র অচলেশ কি বলিবে?

দু-একটা কথা বলিয়া শ্যামলবিকাশ গাড়ীতে উঠিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। দুই জন ভদ্রলোক তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন—মুহূর্ত্তের জন্য শ্যামলবিকাশের মুখ শবের মত পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সে তাহা দমন করিয়া সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি চাই মশায়?"

—আপনি এঁদের কোম্পানীর টাকা আত্মসাৎ ক'রে আজ বিলেত পালাচ্ছিলেন—আপনার নামে জরুরী সমন আছে।

উত্তেজনায় উল্কার মুখ লাল হইয়া গেল; তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "কি?"

একই সঙ্গে শ্যামলবিকাশ সরোষে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "মুখ সামলে কথা বলবেন, মশায়!"

ভদ্রলোক সহাস্যে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, "অনর্থক গণ্ডগোল করবেন না, মশায়; তাহ'লে আমরা আপনাকে পুলিস দিয়ে ধরে নিয়ে যেতে বাধ্য হবো।"

শ্যামলবিকাশের গর্জ্জন স্তব্ধ হইল। উল্কা স্বামীর মুখ চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "কি, তুমি ভণ্ড, প্রতারক?"

শ্যামলবিকাশ উল্কাকে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া বলিল, "চুপ্ করো, উল্কা। যে কাজ তোমার নয়, তাতে কথা ব'লো না।"

উল্কা বেতসপত্রের মত কাঁপিতে লাগিল।

বিষদন্তহীন সর্পের মত শান্তভাবে শ্যামলবিকাশ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহ'লে কি করতে চান আপনি?"

—হয় অপহৃত পাঁচ লাখ টাকা ফেরৎ দিন, নতুবা আমাদের সঙ্গে ফাটকে আসুন। এখনও মিটিয়ে ফেলা যায়।

"দেখুন, প্রতারণা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, সে-টাকা আমি ঋণ-স্বরূপ নিয়েছিলাম।" বলিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি শ্যামলবিকাশ একপার্শ্বে গিয়া একখানা দলিল লিখিয়া আনিয়া তাঁহার হাতে দিল।

ভদ্রলোক সেটা পড়িয়া দেখিলেন। সমাগত অন্য দু-চার জন ভদ্রলোককে ব্যাপারটা বুঝাইয়া সাক্ষ্য-স্বরূপ তাঁহাদের স্বাক্ষর লইয়া দলিল পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

"আমি শ্রীশ্যামলবিকাশ চৌধুরী, পিতা ৺নিমাইদাস চৌধুরী, পৈতৃক নিবাস মনোহরপুর, মৎ কর্তৃক কোম্পানীর ক্যাশ্ হইতে গৃহীত পাঁচ লাখ টাকা, সুদসমেত প্রতিশোধ দেওয়া-স্বরূপ আমার বড় তরফ মাধবগঞ্জের সমস্ত সম্পত্তি উল্লিখিত—কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিলাম। অতঃপর উক্ত মাধবগঞ্জের সম্পত্তির উপর ভবিষ্যতে আমার আর কোন দাবি-দাওয়া রহিল না—"

"দাবি-দাওয়া ছেড়ে মাধবগঞ্জ কাকে বিক্রী করছো, দাদা, তা তো তুমি বিক্রী করতে পার না?" বলিয়া তন্মুহূর্ত্তে সুশীলা উল্কা ও শ্যামলবিকাশের নিকট আগাইয়া আসিল।

সম্মুখে মাথার উপর উদ্যতফণা বিষধর সর্প দেখিলে লোকে যেমন বিবর্ণ হইয়া যায়, শ্যামলবিকাশ তেমনি বিবর্ণ হইয়া গেল।

উল্কা এতক্ষণ স্বপ্নাভিভূতের মত চুপ করিয়া ছিল। কিন্তু হঠাৎ, কি জানি কেন, জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"কেন মাধবগঞ্জ বিক্রী করতে পারেন না?"

"কারণ সম্পত্তি দাদার নয়, অচলেশ বাবুর—এই দেখুন তার প্রমাণ।" সুশীলা ঝটিতি কতকগুলা কাগজপত্র বাহির করিয়া ফেলিল।

ময়নামতীর চর—বন্দে আলী মিয়া। ডি-এম-লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

একই গ্রামোফোন রেকর্ড দুই মেশিনে দুই জন বাজাইলে স্বরের যে তারতম্য হয় জসীম উদ্দীনের কাব্য ও বন্দে আলী মিয়ার দুইটি কাব্যের তফাৎ প্রায় ততখানিই। জসীম উদ্দীনের মেশিনে মাঝে মাঝে অপরূপ শুনাইলেও স্থানে স্থানে রেকর্ডটি কর্ণপীড়া জাগায়, বন্দে আলীর মেশিনের আওয়াজ ততটা মিঠা না হইলেও সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট করিয়া তোলে। রস-উপভোগের কোথাও বাধা হয় না।

বাংলা কাব্যসাহিত্যে Narrativo কাব্যের অভাব নাই—বোঝার উপর শাকের আটি তবুও গ্রাহ্য।

'ময়নামতীর চরে' 'ময়নামতীর বটগাছ' প্রভৃতি কবিতায় ছন্দ-গোলাযোগ আছে।

শ্রী সজনীকান্ত দাস

দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক—ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহার সহিত শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কথোপকথন। হৃষীকেশ সিরিজ নং ১৫। ১০৭, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল, বি-এ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা চার আনা। ১৯৩০ সাল। ২৯১ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধাই।

বাংলা ভাষাতে অর্থনীতি সম্বন্ধে বই বেশী নেই। ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে বই ত আরও বিরল। "দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক" এই অভাব অনেকটা দূর করবে। মার্কিন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, ইটালী, জার্ম্মানী, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে নানা তথ্য এই বইখানিতে আছে। ভাষা সহজ এবং সাবলীল। "Big fivo banks"-এর তর্জ্জমা "বাঘা ব্যাঙ্ক" বেশ সুন্দর লাগল। কঠিন বিষয় সহজ ক'রে বোঝানর ক্ষমতা গ্রন্থকারযুগলের বেশ আছে। নানা বিষয়ের অবতারণা না ক'রে মূল তথ্যগুলি নির্ব্বাচন ক'রে সেই বিষয়গুলি বুঝিয়ে বলাতেই বইখানি এমন সুপাঠ্য হয়েছে। কলেজে কিমিতি (Chomistry) পড়বার সময়ে একখানা জার্ম্মান বইয়ের তর্জ্জমা পড়েছিলাম। মাষ্টারে এবং ছাত্রে পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথনের ভিতর দিয়ে সমগ্র রসায়নশাস্ত্রের মূলতথ্য সেই গ্রন্থখানিতে আলোচিত হয়েছিল। মাষ্টারই বেশী পণ্ডিত কিংবা ছাত্রই বেশী পণ্ডিত এই সন্দেহ বার-বার মনে হয়েছিল। আলোচ্য বইখানিতেও প্রশ্নকর্ত্তা সব সময়ে মামুলী প্রশ্ন করেন নি। তাঁর জিজ্ঞাসার ফলেই উত্তরগুলি শুষ্ক বর্ণনা মাত্র হয়নি এবং এইজন্যেই বইখানি চিত্তাকর্ষক হয়েছে, সন্দেহ নাই।

"দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক" এতই ভাল লেগেছে যে, নিছক সমালোচনার খাতিরে এর দোষের কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আবার এটিও মনে হচ্ছে যে, এর পরবর্ত্তী সংস্করণে এই ত্রুটিগুলি দূর হ'লে ভাল হয়।

প্রথম অধ্যায়ে "ভারতে ব্যাঙ্কের প্রসার" সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ে দেশী ব্যাঙ্কিঙের কথা মনে রাখা হয়নি। যৌথ কারবার না হ'লেও এবং নামে ব্যাঙ্ক না হ'লেও অনেক দেশী ব্যবসায়ী অন্যের টাকা আমানত রাখেন, মুদ্দতি হুণ্ডী ডিস্কাউণ্ট করেন, এক জায়গা থেকে অন্যত্র হুণ্ডীর সাহায্যে টাকা পাঠান ইত্যাদি। এঁদের ব্যাঙ্কার বলা উচিত বোধ হয়, যদিও এ-কথা মানতেই হবে যে শুধু নিজের নিজের টাকা কর্জ্জদাদন যে-সব ব্যবসায়ীরা করেন তাঁদের ব্যাঙ্কার বলা উচিত নয়।

আর একটা কথা এই যে, ১৯৩০ সালে প্রকাশিত বইতে ১৯২৫ সালের তথ্য দেওয়া হয়েছে। Banking Almanac, Statist এবং Economist-এর Banking Supplements বা যে-কোনও জায়গাতেই আরও আধুনিক তথ্য এবং Statistics পাওয়া যেতে পারত। এটি না করার দরুণ কিছু কিছু ভুলও হয়েছে। সিকিউরিটি রেখে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে ১৯৩০ সালে যে নোট ছাপান যেত তার পরিমাণ ১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড নয় (২৬৫ পৃষ্ঠা), ২৬ কোটি পাউণ্ড (Currency and Bank Notes Act, 1928.) এরূপ ছোটখাট ভুল অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও দু-চারটি চোখে প'ড়ল। এগুলি পরবর্ত্তী সংস্করণে তিরোহিত হবে আশা করি এবং এই সব নানা দেশের ব্যাঙ্কিঙের পর্য্যালোচনার ফলে আমাদের দেশে ব্যাঙ্কিঙের কি কি দিকে উন্নতি করা যেতে পারে সে-সম্বন্ধে একটি অধ্যায় যেন দেওয়া হয় গ্রন্থকার-যুগলের কাছে এই প্রার্থনাটাও জানাচ্ছি।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ

ঢেউয়ের পর ঢেউ—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। কাত্যায়নী বুক ষ্টল, ২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

বিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত নারীর নবীনতম চেতনা—আত্মোপলব্ধি। এর জন্য সে আজ বিদ্রোহী, কেন-না, যুগ-যুগের শত আচারের শৃঙ্খল, মানুষ হিসাবে নারীর যে অসীম সম্ভাব্যতা, সেটাকে উপলব্ধি করিতে দিতেছে না। কিন্তু শুধু মৃত বিধি-আচারই নয়, আত্মপ্রসারের উন্মাদনায় নারী আজ প্রাণপূর্ণ প্রেমকেও অস্বীকার করিয়া উঠিতেছে। "ভালবাসাটা মনের একটা আবহাওয়া, কতো দিন গুমোট ক'রে থেকে কোনোদিন বা ঝড় উঠে যেতে পারে।"

একটি বিবাহিতা আর একটি অনূঢ়া আধুনিকার জীবন-মনের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া লেখক তাঁহার প্রতিপাদ্যটি ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর স্ত্রী ললিতার বিদ্রোহটা বরাবরই সুসঙ্গত, এবং গরীয়ানও; কিন্তু সুমনার ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি, যাহা তাহার অমন সহিষ্ণু প্রেমকেও নিমেষে ম্লান করিয়া দিল—তাহাকেও কি গৌরবের আসন দেওয়া চলে? যে-নারী ললিতার প্রখর আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে মহীয়সী হইয়া উঠিতেছিল, সুমনার মধ্যে সেই যেন সঙ্কুচিত নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে

ভাষার দিক দিয়া বইখানি এক-এক জায়গায় ক্লেশপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমাগত নূতনত্বের উৎকট প্রয়াসের মধ্যে পাঠকের মন হাঁফাইয়া ওঠে। লেখক এক-একটা শব্দের মোহে পড়িয়া গেছেন যেন;—'নিরাভ' 'নিভাঁজ', 'নরেখ', 'নিরবয়ব'—সবই তিন-চার বার করিয়া পাওয়া গেল; 'প্রেতায়িত' পাঁচ-ছয় বার পাইলে একটা বিভীষিকার মতই হইয়া পড়ে; এর উপর যখন আবার 'নিষ্প্রাণ গলা' কয়েক পাতা ওল্টাইলেই আসিয়া হাজির হয়, তখন সত্যসত্যই প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া ওঠে। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ—সবই অনিন্দ্য।

গোধূলি—শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। সুশীল বুক ষ্টল, ৫২-এ, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ছয় আনা।

ক্ষুদ্র একটি রূপক নাটিকা; ২৩ পাতায় তিনটি অঙ্কে শেষ। দিনের শেষে আলো-আঁধারের ক্ষণিক মিলনে একটি পরম মুহূর্ত্ত জাগিয়া ওঠে। আলোর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বলিয়াই এই মুহূর্ত্তটুকু বিষাদে মধুর; সৌন্দর্য্যে বিধুর।

কাঁচা হাত হইলেও লেখক গোধূলির এই ভাবরূপটি অনেকটা

ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শেষ করিবার পরও বইয়ের সুরটি মনে খানিক ক্ষণ লাগিয়া থাকে। ছাপা, বাঁধাই মামুলী।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রূপ-সায়র—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ, ১২ নং পদ্মনাথ লেন, কলিকাতা। ১৫২ পৃষ্ঠা। দাম দুই টাকা।

এই পুস্তক পাঁচটি গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি পূর্ব্বে "পুষ্পপাত্রে" ছাপা হইয়াছিল। গল্পগুলি নিতান্তই মামুলী। 'মহাকাব্য রচনা' গল্পে গ্রন্থকার তাঁহার ভাবুকতা প্রকাশ করিয়াছেন। 'প্রেমের অভিষেকে' নায়িকা অনর্থক মনোবিদ্যার বুলি আওড়াইয়াছেন। স্থানে স্থানে গ্রন্থকারের সুরুচির অভাব লক্ষিত হয়।

গৃহস্থের-সাধনা—ডাক্তার শ্রীচণ্ডীচরণ পাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ১২ নং বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২০৭। মূল্য বার আনা।

গৃহস্থের সংসারের অন্তর্গত সকলে যাহাতে ধর্ম্মপথে চলিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার কতকগুলি শ্লোককে ভিত্তি করিয়া গ্রন্থকার প্রাঞ্জল ভাষায় নিজ উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নারী স্বাধীনতা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মত অনুধাবন-যোগ্য। পুস্তক সুখপাঠ্য হইয়াছে।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

অভিমান—শ্রীআশালতা দেবী প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য দেড় টাকা।

ছোট গল্পের বই। বিভিন্ন গল্পের ভিতর দিয়া লেখিকা আধুনিক যুগের নারী-চিত্তের চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সে চেষ্টা তাঁহার নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু যে-বিষয় লইয়া স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখা চলে, ছোট গল্পের স্বল্প পরিসরে তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিলে গল্পের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং অনাবশ্যক ইংরেজী শব্দ প্রয়োগও রচনার শক্তি বা সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে না। কোন কোন গল্পে এই ত্রুটি বিদ্যমান। সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁহার লেখা আমাদের ভাল লাগিয়াছে। তাঁহার সাবলীল ভাষার অপূর্ব্ব বিন্যাস-ভঙ্গী ও চিন্তাশক্তির প্রখরতা সত্যই উপভোগ্য। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত—কোথাও কষ্ট-কল্পনার লেশ-মাত্র মনকে পীড়া দেয় না। বইয়ের ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি—৺প্রিয়নাথ সেন। প্রকাশক—শ্রীপ্রমোদ-নাথ সেন, ৮, মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা। মূল্য ২৷৹ টাকা।

স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন ১৩২৩ সালে পরলোকগমন করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা ৫।৬ বৎসরের বড় ছিলেন এবং শুধু রবীন্দ্রনাথ নহেন, দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁহার সুমধুর ঘনিষ্ঠতা ছিল। দ্বিজেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র, বলেন্দ্র, রবীন্দ্র,—সকলেরই সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় সহিত তাঁহার গভীর সহানুভূতি ছিল বলিয়া তিনি তাঁহাদের প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যে তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল, ফরাসী সাহিত্যে ছিল অতিশয় অনুরক্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে ও তাহার অব্যবহিত পরে সমাজে যে বৈদগ্ধ্যের আদর্শ সম্মান পাইয়াছিল, প্রিয়নাথ সেন তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন। প্রিয়নাথের পত্র ও প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে সাহায্য করিবে, কবির প্রথম জীবনের কাব্যসৃষ্টির উপযুক্ত ব্যাখ্যা তো এখনও হয় নাই; আর সেই সঙ্গে আমরা সমগ্র বাংলা দেশের কিশোর-মন সে-যুগে কি করিয়া ফুটিয়াছিল তাহাও আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

নূতন পথে—শ্রীকনকলতা ঘোষ। জ্ঞান পাবলিশিং হাউস, ৪৪, বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট কলিকাতা। পৃঃ ১৬২। মূল্য দেড় টাকা।

আটটি গল্পের সমষ্টি। গল্প কোনটিই হয় নাই, পাত্র-পাত্রীর মুখে কতকগুলি দীর্ঘ আলোচনা বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কিন্তু ভাবের সারল্যে ও সুস্নিগ্ধ শুচিতায় এই আলোচনাগুলি অতি মনোরম, হইয়াছে। ছাপা বাঁধাই চলনসই।

ভাগ্যলক্ষ্মী—শ্রীশরৎ চন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক—শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, ৩৬।৪।৩, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। পৃঃ ১৭৩। মূল্য দেড় টাকা।

ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টসের তোলা 'ভাগ্যলক্ষ্মী' ছবির উপন্যাস-সংস্করণ। বায়স্কোপের বইয়ের একটা বিপদ,—প্রচুর ঘটনা সমাবেশ করিতে গিয়া অনেক সময় উহা অস্বাভাবিকত্বের কোঠায় গিয়া পৌঁছায়। আলোচ্য বইটিতে কোথাও সে দোষ ঘটে নাই। ভাষাও বেশ ঝরঝরে। গতানুগতিক উপন্যাস-সমুদ্রের মধ্যে এই বইটি কিছু বৈচিত্র্যের সঞ্চার করিবে বলিয়া মনে হয়।

ঝিকিমিকি—শ্রীযতীন সাহা প্রণীত। শ্রীসমর দে কর্ত্তৃক চিত্রিত। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃঃ ৮২। দাম দশ আনা।

শিশুদের উপযোগী পাঁচটা গল্প। লেখক ও চিত্রকর উভয়েরই সুনাম আছে, এই বইটিতে সে সুখ্যাতি কমিবে না। যেমন লেখা তেমনি ছবি—পাশাপাশি চলিয়াছে। ঝকঝকে বাঁধাই। শিশুরা এই বই পাইয়া সুখী হইবে।

রাজ সিংহাসনে—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত। প্রকাশক—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ২০৮।১, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৭০। মূল্য এক টাকা।

অদ্ভুত ভাষা। হঠাৎ মনে হয়, অমিত্রাক্ষর ছন্দকে গদ্যে ঢালা হইয়াছে। কিন্তু তাহারও কোন রকম সঙ্গতি নাই। ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণগুলিকে যথেচ্ছ উল্টাপাল্টা করিয়া সাধু-অসাধু উভয় রূপের নির্ব্বিচার সংযোগে বইটা অপূর্ব্ব বস্তু হইয়াছে। তার উপর পাতায় পাতায় বিশ্রী রকমের ছাপার ভুল। ভাষার ব্যূহ ভেদ করিয়া গল্প পর্য্যন্ত পৌঁছানো একেবারেই দুষ্কর।

প্রেম ও প্রতিমা—শ্রীরমেশচন্দ্র দাস। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম এক টাকা। পৃঃ ৪৪।

কবি রমেশচন্দ্রের কবিতা অনেক দিন হইতে নানা মাসিকে বাহির হইয়া থাকে। শব্দ-বিন্যাসের নিপুণতায় ও রসমাধুর্য্যে তাঁহার অধিকাংশ কবিতা এমন মায়াময় হইয়া উঠে যে, বহুকালের ব্যবধানেও তাহারা স্মৃতিতে থাকিয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছুকাল আগে 'প্রবাসী'তে ছাপা 'বিরহিণী' কবিতার উল্লেখ করা যায়।

বইখানিতে মোট আঠারোটি কবিতা। এক 'প্রাত ভিখারী' ছাড়া

বাক্যগুলিতে প্রেম ও প্রিয়ার কথা। কিন্তু বিষয়-বস্তু মোটামুটি এক ধরণের হইলেও কবিতাগুলি একঘেয়ে নয়। উদার কবি-দৃষ্টি উহারই মধ্যে বিভিন্ন আলোকপাত করিয়াছে। সেই প্রিয়া কখনও নিগূঢ় রহস্যাচ্ছন্ন, আবার কখনও তাহাকে দেখা যায় নিতান্ত সরলা পল্লীবালিকার রূপে। কখনও আসন্ন মাতৃত্বের গরিমায় সে দেবী-প্রতিমার মত স্নিগ্ধোজ্জ্বল—কখনও সে নির্মম কঠোর দেবতার মত—প্রেমিকের স্তব-গুঞ্জন তার প্রতি নিয়ত উৎসারিত হইতেছে, তবু সে ফিরিয়া চাহে না; তারপর প্রিয়া ক্রমে অশরীরী ধ্যানমূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'রাত ভিখারী' কবিতাটি অন্য ধরণের হইলেও বিশেষত্ব আছে—রাত্রির পুঞ্জীভূত রহস্য যেন একটি ভিখারীর কণ্ঠে মুখর হইয়া উঠিয়াছে! বইখানির বহিরাবরণও প্রশংসনীয়।

শ্রীমনোজ বসু

ভক্তবাণী—শ্রীশিশিরকুমার রাহা প্রণীত। প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৩০। মূল্য ⁄১০।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে Thomas á Kempis-এর বিখ্যাত ভক্তিগ্রন্থ Of the Imitation of Christ-এর কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে। অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে। ভক্ত-পাঠক ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

মন্দির—শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। প্রকাশক শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; মুন্‌সেফ ডাঙ্গা, পুরুলিয়া। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৫।

সাধক ও ভক্তকবি কিরণচাঁদ দরবেশের 'মন্দির' গ্রন্থটি বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুপরিচিত। ইহার তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে। সুতরাং বোঝা যাইতেছে, গ্রন্থখানি বাংলার পাঠক-সমাজে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিয়াছে।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

নূতন সমাজের ইঙ্গিত—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত ও ৮ডি, মোহনলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বিজলী সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত। দাম চার আনা।

পুস্তিকাখানিতে লেখক মুক্তি চাহিয়াছেন, 'শুধু রাজনৈতিক মুক্তি নয়, ধর্ম ও সমাজের মুক্তি,' আরও বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে নারীর মুক্তি। 'হিন্দুর আজ ম'রে বাঁচবার দিন এসেছে, সব ধ্বংস ক'রে নব কলেবর ধরবার দিন এসেছে···আজও সামাজিক কম্যুনিজম···নারীদ্রোহ ও ভ্রাতৃদ্রোহের বিরুদ্ধে অভিযান।' কিন্তু সামাজিক বিপ্লব ঘটিলেই কি রাজনৈতিক পূর্ণ অধিকার লাভ করা যাইবে? মুক্তি কথাটি সব জায়গায় খাটে বটে, কিন্তু রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই শব্দটি নূতন তাৎপর্য্য গ্রহণ করে। যে-দেশে রাষ্ট্র ও সমাজ এক হইয়া গিয়াছে, সেখানে একের পরিবর্ত্তনে অন্যের পরিবর্ত্তন সহজ এবং স্বাভাবিক। যেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ বিভিন্ন, সেখানে উদ্যম দ্বিধা-বিভক্ত হয়। নূতন সমাজের স্পষ্ট রূপ কি, আদর্শ কি?

যুগ-শঙ্খ—শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত ও কুমিল্লা রামমালা ছাত্রাবাস হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

বইখানিতে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি বহু দেশনায়ক ও চিন্তানায়কের বাণীর সঙ্কলন আছে। কিছু বেদ-বাণী, কয়েকটি গীতার শ্লোক, বুদ্ধদেবের বচন এবং বিদেশী মনীষীদের বাণীও সঙ্কলিত হইয়াছে। সঙ্কলিত বাণীর ভাব অনুসারে স্বদেশ, সাধনা, সমাজ, সেবা প্রভৃতি নামে বইয়ের দশ অধ্যায়ের নামকরণ করা হইয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

চিকিৎসা-সঙ্কট—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন কর্ত্তৃক নাটিকায় রূপান্তরিত। প্রকাশক—এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ।⁄০ আনা।

পরশুরামের চিকিৎসা-সঙ্কট গল্পটির সঙ্গে পরিচয় নাই, এমন পাঠক শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে অল্পই আছেন। চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয় ছবি আঁকিয়া মূল গল্পটিতে লোকগুলির রূপ দিয়াছিলেন। তিনিই আবার ইহা নাটিকায় রূপান্তরিত করিয়া লোকগুলির জীবন্ত রূপ দিয়াছেন; ফলে ইহা পরম উপভোগের বস্তু হইয়াছে। এজন্য তিনি রসজ্ঞ পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। এই অতি চমৎকার ক্ষুদ্র নাটিকাটি, শুধু বাংলায় কেন, বাংলার বাহিরেও কোন-কোন ক্লাবে একাধিক বার অভিনীত হইয়াছে। ইহার অভিনয়-দর্শনকালে এমন লোকেরও মুখে হাসি দেখা গিয়াছে—যিনি অত্যন্ত গম্ভীর, অর্থাৎ সহজে যিনি হাসেন না।

নাটিকাটির তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে, সুতরাং ইহা যে যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

মাতৃ-ঋণ—শ্রীসীতা দেবী। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ৩১৭, মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানি 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার গল্পাংশটি পাঠকের মনে এমন কৌতূহল জাগায় যে পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না-করিয়া বই রাখিয়া দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। লেখিকার নিপুণ তুলিতে প্রতাপের দারিদ্র্যময় মেসের জীবন অতি সুন্দর ফুটিয়াছে, আর ফুটিয়াছে ভবানীপুরে প্রতাপের পিসিমার গৃহস্থালীর ছবি। সমস্ত বইখানিতে প্রতাপ ও পিসিমার বাড়ির ছবি সত্যই যেন জীবন্ত। সামান্য দু-পাঁচটা কথাবার্ত্তার ভিতর দিয় পিসিমা একেবারে রক্ত-মাংসের জীব হইয়া আমাদের চোখের সামনে দেখা দেন; আর এ-জাতীয় পিসিমার কাছে পাঠকেরা যতটুকু আশা করে, তিনি তার বেশীও নন, কমও নন। যামিনীর চরিত্র মধুর ও সরল বটে, কিন্তু বৈশিষ্ট্যহীন। মনে বিশেষ দাগ রাখিয়া যায় না। এদের সংসারের মধ্যে জ্ঞানদার ছবি ফুটিয়াছে ভাল। জ্ঞানদা ধন-গর্ব্বিতা ও মুখরা, কিন্তু সত্যিকারের মা। সুরেশ্বর একেবারেই অস্পষ্ট।

বইখানিতে লেখিকার নিপুণ বর্ণনাভঙ্গী, ভাষার সজীবতা ও সংযম, ঘটনাবলীর স্বাভাবিকতা আমাদিগকে অত্যন্ত আনন্দ দান করিয়াছে। প্রচ্ছদপটখানি সুদৃশ্য।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুক্তি

শ্রীআশালতা দেবী

১৮

যামিনী সেখান হইতে ঝড়ের বেগে আপন ঘরে আসিয়া আবার চলিয়া গেল। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সে অধিক রাত্রে যখন শয়নকক্ষে আসিল তখন উৎসব-অন্তে সকলে যে যাহার বাড়ি গিয়াছে। তাহার নিজের ঘরেও আলো নাই; অন্ধকার। সেই অন্ধকারে জানালার গরাদে ধরিয়া নির্ম্মলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মনও আজ ভাল নাই। নিমন্ত্রিতা মহিলা যাঁহারা আসিয়াছিলেন, বড়বৌ তাঁহাদের কি যেন জানাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহ কেহ এ উহার কানে-কানে ফিস-ফাস করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে নির্ম্মলার এক-একখানা গহনা হাত দিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া কহিতেছিলেন, "এখানি কে দিয়েছেন ভাই? তোমার বাবা, না তোমার উনি?"

সে যে দরিদ্রের কন্যা, তাহার পিতা যে ধনী নহেন এ-সকল কথা নির্ম্মলা আগে কোনদিন ভাবে নাই। সে এত দিন তাহার বাবার সঙ্গে যে-জগতে ছিল, যে-সকল বিষয়ের আলোচনা করিত, তাহার বিষয় দেশ-দেশান্তের ব্যাপ্ত, যুগ-যুগান্তের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে হঠাৎ কেমন করিয়া জোয়ার আসিয়াছিল, রোমাণ্টিসিজ্‌মের অতি গদগদ আইডিয়ার তাপে ইউরোপীয় সাহিত্যের কোন্ কিনারে কতটুকু আবিল বাষ্প সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাদের আলোচনার স্রোত সংসার ছাড়া সেই সকল খাতেই বহিত। সেই জনহীন সংসার-সীমানার প্রান্তে কেবল পিতা এবং কন্যা প্রতিদিন পরস্পরকে সঙ্গ দিত। সেখানে আর কোন সঙ্গ ছিল না। এমনি করিয়া সংসারে যেখানে বহুজনতার সংঘর্ষ, যেখানে অনেকের স্বার্থ, অনেক ভাল মন্দ ঈর্ষা কুটিলতা মেশামেশি হইয়া পাশাপাশি রহিয়াছে সেখানকার সহিত নির্ম্মলার কোনও পরিচয় ঘটে নাই। সে বড়লোকের বাড়িতে জন্মিয়াছে, না গরিবের গৃহে—এ-কথাটা ভাবিবারও প্রয়োজন তাহার কোনদিন হয় নাই।

কিন্তু আজ উপরের হলে যে-সব মহিলারা আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এক দল নির্ম্মলাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন যে নির্ম্মলা দরিদ্রের কন্যা। এ-বাড়িতে তাহার প্রবেশাধিকার কিরূপে ঘটিল সেই কথাটাই তাঁহারা বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া ভাবিতেছেন, এবং তাঁহাদের এই বিস্ময়ের কথাটা খুব ভাল করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য যামিনীর বড়বৌদি উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা সার্থক হইয়াছিল। নির্ম্মলা গভীর বেদনার সহিত বুঝিয়াছিল শ্বশুরবাড়িতে তাহার অন্য জায়েদের মত কোনো মর্য্যাদা কি সসম্মান অধিকার তাহার নাই।

নির্ম্মলার মনে আজ প্রথম ধাক্কা লাগিল। সে আস্তে আস্তে সেখান হইতে উঠিয়া নিজের শয়ন-ঘরে আসিল। আলো জ্বালাইয়া চারিদিকে চাহিল। দামী মেহগ্‌নির পালঙ্কের উপর দামী নেটের মশারির ঝালর সন্ধ্যার বাতাসে একটু একটু কাঁপিতেছে। আল্‌নায় নির্ম্মলার কাপড়ের জরির কল্কাগুলা বিদ্যুতালোকে ঝলমল করিতেছে। ঘরের যেদিকে সে চায় সেইদিকেই আরাম এবং বিলাসের উপকরণ। সুখস্পর্শ সোফা তাহারই জন্য যেন নীচু করিয়া বাঁধান। অর্গ্যানের কাছে মিউজিক্ টুলের উপর সেই মাপের একটা ভেল্‌ভেট্-দেওয়া কুশান্ যামিনী কালই বিকালে দর্জ্জিকে দিয়া করাইয়াছে। তাহার উপর নির্ম্মলার জরির কাজ-করা মখমলের লক্ষ্ণৌ চটি জুতাটা রহিয়াছে। বোধ হয় বেয়ারাটা ঘর ঝাঁট দিবার সময় ধুলা লাগিবার ভয়ে ঐখানে তুলিয়া রাখিয়াছে। নির্ম্মলা স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল, এই ঘরের কোন-কিছুকে

আজও সে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক করিয়া দেখে নাই। ঐ সোফাতে বসিয়া সে যামিনীকে বই পড়িয়া শুনাইয়াছে, টুলে বসিয়া গান গাহিয়াছে, ঐ জানালার কাছের কাউচ্‌টায় বসিয়া সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্বের সঙ্গে এই ঘরখানার সত্তা এমন করিয়া এই কিছুদিন মিশিয়া ছিল যে, নিজের প্রয়োজনের বাহিরে তাহাকে কোন ছলেই মনে পড়ে নাই। আজ মনে হইতে লাগিল এ শুধু বড়লোকের বাড়ির একখানা সাজান ঘর। কিন্তু বড়লোকের বাড়িরই এক জন যে সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া ইহা সাজাইয়াছে, আপনার আদর দিয়া তাহাকে আবৃত করিয়াছে এ-কথাটাও নির্ম্মলা আজ আর ভাবিল না। কারণ এ-কথাটা ভাবিতে হইলে আর এক জনকে সর্ব্বান্তঃকরণে যতটা গ্রহণ করিতে হয় নির্ম্মলা তাহার স্বামীকে এখনও তাহা করিতে পারে নাই। বিবাহের ...কাব্য ছাড়া বাস্তব জীবনে প্রেম কি বিবাহ লইয়া সে কোন দিন মাথা ঘামায় নাই। এ-সম্বন্ধে এই বয়সের মেয়ের হৃদয় সচরাচর যতটা সচেতন হয় নির্ম্মলার মন বিবাহের পূর্ব্বে তাহা হয় নাই। যেটুকু সচেতন তাহার হৃদয় হইয়াছিল, আজিকার প্রচণ্ড আঘাতে তাহার সব সাড়ই যেন চলিয়া গেল।

যামিনী দরজার বাহিরে থমকিয়া দাঁড়াইল। আশা করিয়া আসিয়াছিল নিজের মনোভার প্রেয়সী নারীর কাছে নিবেদন করিয়া ধরিবে। আসিয়া দেখিল ঘরে আলো নাই, শোকপরায়ণা নারী আপন মনোব্যথা লইয়া স্তব্ধ হইয়া মূর্ত্তিটির মত জানালার গরাদেতে একটা হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তখন সে নিজের কথা ভুলিয়া গেল। কাছে আসিয়া নির্ম্মলার কাঁধের উপর পিছন হইতে একটি হাত রাখিয়া স্নিগ্ধ স্বরে কহিল, "অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে কি করছ নির্ম্মলা?" নির্ম্মলা মুখ ফিরাইল। চাঁদের আলোয় তাহার চোখের জল চিক্‌-চিক্‌ করিতেছে।

"কি হয়েছে?"

"কিছু না।"

যামিনী তাহার মাথার চুল আঙুল দিয়া নাড়িয়া দিতে দিতে কহিল, "কি হয়েছে আমাকে বলো না। আমার কাছে কোন দিন কিছু লুকিও না। আমি যে তোমার জন্যে কত ব্যাকুল।" তাহার কণ্ঠস্বরে কাতর স্নেহ প্রকাশ পাইতেছিল।

নির্ম্মলা দৃঢ় পরিষ্কার স্বরে কহিল, "আচ্ছা, আমার বাবা যে খুব দরিদ্র সে-কথা কি তোমরা জানতে না?" যামিনীর কোন কথাই যেন তাহার কানে যায় নাই।

যামিনী অবাক হইয়া কহিল, "আজ হঠাৎ এ-কথা কেন? কিন্তু তোমার বাবা তো দরিদ্র নন। তাঁর মত হৃদয়ের প্রাচুর্য্য এবং মানসিক ঐশ্বর্য্য ক'টা লোকের আছে?"

"সে-বিচার আমি তোমাদের সঙ্গে করতে চাইনে। কিন্তু তিনি যে দরিদ্র, তাঁর যে যথেষ্ট অর্থ নেই, এ-কথাটা কি তোমরা জানতে না?"

স্ত্রীর কঠোর কথায় যামিনী আহত হইল। নির্ম্মলা যত দিন এ-বাড়িতে আসিয়াছে কখনও তাহার মুখে এমন কথা শোনে নাই। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া যামিনী কহিল, "আজ হঠাৎ এমন প্রশ্ন করবার প্রয়োজন তোমার কেন হ'ল?"

নির্ম্মলা আর কোন কথা না বলিয়া সামনের চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। তাহার অশ্রুব্যাকুল ঘন নিঃশ্বাসে সন্ধ্যার স্তব্ধ আবরণ যেন উতলা হইয়া উঠিল। যামিনী সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল।

আরও একটা চৌকি টানিয়া তাহার পাশে বসিল। গম্ভীর স্বরে কহিল, "শোন নির্ম্মলা, আমি আজ প্রতিজ্ঞা করেছি যত দিন না নিজে উপার্জ্জন ক'রে তোমাকে প্রতিপালন করতে পারব তত দিন তোমাকে আর এ-বাড়িতে আনব না। তত দিন তোমার বাপের বাড়িতে থাকতে পারবে তো?"

নির্ম্মলা কাঙালের মত বলিয়া উঠিল, "আমি কি আমার বাপের বাড়ি যেতে পাব? আমার বাবার কাছে থাকতে পাব তো?" যেন জীবনের এই নূতন সম্বন্ধের কথা সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে এমনই ভাবে ব্যাকুল হইয়া সে প্রশ্ন করিল। তাহার এই ব্যাকুলতার কারণ ছিল। আজই সন্ধ্যাবেলায় অলঙ্কারের প্রসঙ্গে সমস্ত কথা জানিতে পারিয়া শাশুড়ী দাঁতে দাঁত চাপিয়া কটু কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু আর কোন সূত্রেও সেই ছোট

লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছিনে। বৌ যেন বাপের বাড়ি যাবার নামও আর না করে।" কিন্তু যামিনী সে-কথা জানিত না। নির্ম্মলার ব্যাকুলতার কারণ সে বুঝিল না।

যামিনী কিছুকাল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে নির্ম্মলার দিকে চাহিয়া কহিল, "নির্ম্মলা, এতই স্বচ্ছন্দে মায়া কাটালে? আমার কোনও কিছুর 'পরেই কি তোমার মায়া নেই? নির্ম্মলা, তোমাকে যখন বিয়ে করি নি তারও আগে থেকে তোমার জন্যে এই ঘর সাজিয়েছি। এর সমস্তর সঙ্গে আমি এমন ক'রে জড়িয়ে গেছি যে কোথাও যদি একটা রাত্রি বাইরে কাটাতে হয়, তা'হলে আমার এই ঘরের জন্যে মন কেমন করে। নির্ম্মলা, আমার এ ঘর কি তোমারও ঘর নয়?"

নির্ম্মলা চারি দিকে একবার শুষ্কদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "না। এ ঘরে আমার কোনো অধিকার নেই।"

"কেন?"

"এত সব দামী জিনিষ দিয়ে সাজান ঘর আমি কোন কালে দেখি নি। এর কোন-একটা জিনিষ কিনে দিতে হ'লেও হয়ত বাবার টাকায় কুলোবে না।"

"কেবল জিনিষের ভীড়টাই দেখলে, কিন্তু এই-সব জিনিষের ঠেশাঠেশির পিছনে এক জন যে তার যা-কিছু সমস্তই তোমার হাতে তুলে দিতে চায় তাকে কি একটুও দেখতে পেলে না?"

নির্ম্মলা ভাবিতেছিল, "আমার দরিদ্র পিতার সম্মান কি তাতে একটুও রক্ষা পাবে?" দু-জনেই কিছুকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর যামিনী ধীরে ধীরে কহিল, "তোমাকে আজ যা সহ্য করতে হয়েছে, সে সমস্তই আমি শুনলুম। কিন্তু এইটুকু তুমি জেনে রাখ, আমিও তার চেয়ে কিছু কম সহ্য করি নি। চল নির্ম্মলা, আমরা এখান থেকে চলে যাই। কিন্তু···কিন্তু—"

"কিন্তু কি বল?"

"কিন্তু যেখানে তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন, যেখানে আমার আত্মীয়-পরিজনেরা তোমাকে অসম্মান করবে না, সেখানে, সেখানেও কি নির্ম্মলা, তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় আমার দিকে মেলে ধরতে পারবে না?"

নির্ম্মলা অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "ক্ষমা ক'রো, যদি কোন অপরাধ করে থাকি। কিন্তু আমি বার-বার চেষ্টা ক'রেও বার-বার আপনাকে স'পে দিতে গিয়েও বার-বারই নানা আঘাত পেয়ে আপনার মধ্যে ফিরে এসেছি। এ কি আমি বুঝতে পারছি না।"

"কি বুঝতে পারছ না?"

"মনে হচ্ছে কোথায় যেন টান পড়ছে। কোথায় যেন বাধা রয়ে গেল। ঈশ্বর জানেন আমার কোন অপরাধ নেই। আমার যা কর্ত্তব্য, শেষ পর্য্যন্ত আমি তার কোনখানে ত্রুটি রাখতে চাই নে।"

"থাক ওসব কথা—" যামিনী উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "ওসব কথার মীমাংসা হবার জন্যে সমস্ত জীবনটাই পড়ে রয়েছে। আপাততঃ তুমি জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখো, কাল বেলা ন'টার ট্রেনে আমি ক'লকাতা যাব, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। মাকে বলে আসি গে।"

যামিনী দুয়ারের কাছ অবধি গিয়াছিল, নির্ম্মলা ডাকিল, "শোন!"

সে ফিরিল। নির্ম্মলা হাতের বালাটা খুঁটিতে খুঁটিতে কহিল, "আর দেখ, এই গয়নাগুলো···" বলিতে গিয়া সে থামিল। যেন সঙ্কোচে বাধিল। "এই গয়নাগুলো কি?" যামিনী একটা চেয়ারের উপর ভর দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই গয়নাগুলো তুমি নেবে না। এই তো?"

"হাঁ, তাই। এইগুলোর জন্যেই আমার বাবাকে ওঁরা এত অপমান করেছেন। তা ছাড়া এ-সব জিনিষের উপর আমার বিন্দুমাত্র টান বা লোভ নেই।"

"বেশ, নিয়ো না। সেই ভাল। কিন্তু যদি জানতে, ওই গয়নাগুলোর জন্যে তোমার বাবার চেয়ে আমাকে ঢের বেশী অপমান সহ্য করতে হয়েছে, তবুও তবুও—কিন্তু থাক সে-সব কথা। সে-কথা তুমি বুঝতে পারবে না। আমি যাই নির্ম্মলা। রাত্রির মধ্যে তুমি ঠিক ক'রে নিও কি নেবে আর কি নেবে না"

যামিনী নিজের অশান্ত ব্যথিত চিত্ত লইয়া স্ত্রীর কাছে সান্ত্বনার জন্য আসিয়াছিল, কিন্তু নির্ম্মলা তাহার জগতে প্রবেশ করিতে পারিল না। কোন কথা না বলিয়া কোন প্রশ্ন না করিয়া এক জনের হৃদয়-মনের সমস্ত বেদনা নিঃশব্দে অনুভব করিবার, এক জনের সমস্ত চিত্তদাহ আপন প্রশান্ত
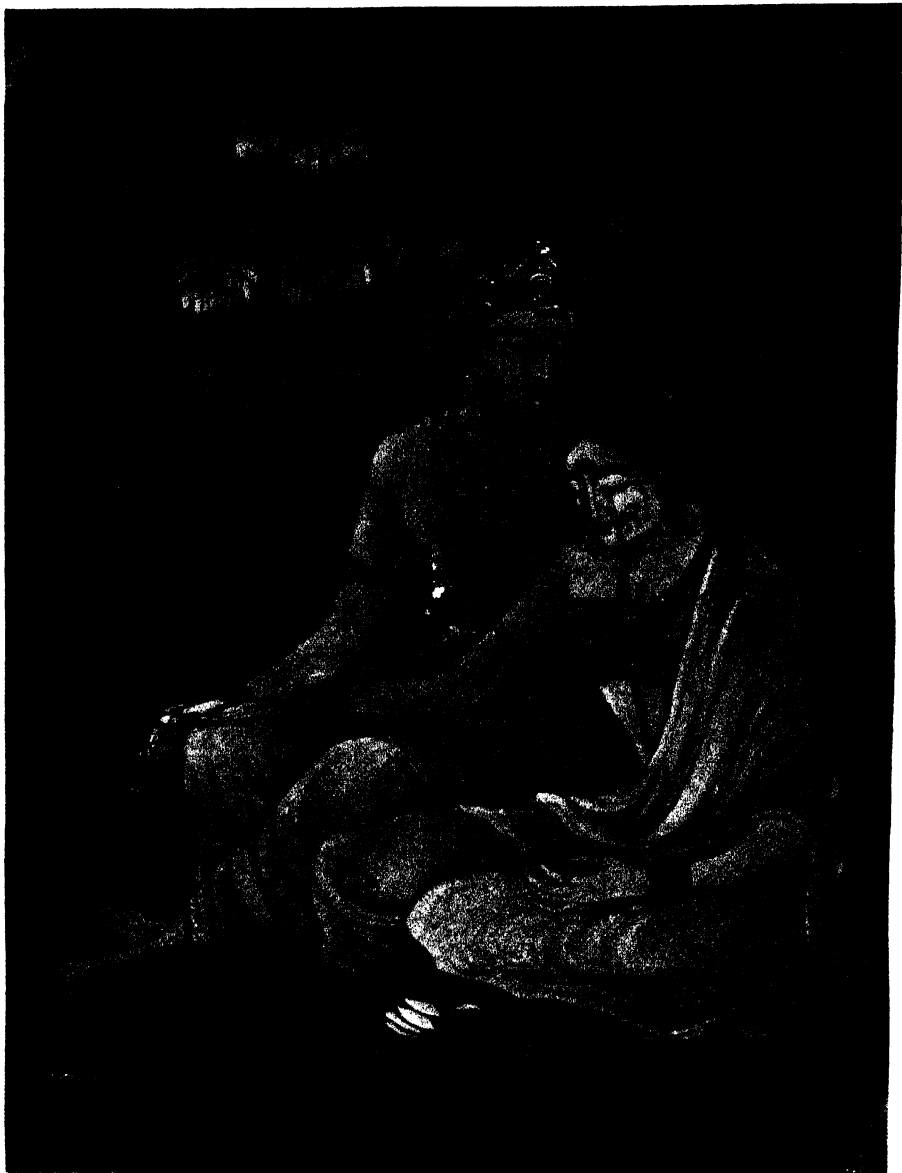
মিলন

শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

হৃদয় সাগরে নিমজ্জিত করিয়া লইবার যে দুর্লভ শক্তি নারীর আছে, তাহারই কাছে প্রসাদপ্রার্থী হইয়া যামিনী আসিয়াছিল, কিন্তু নারী সাড়া দিতে পারিল না। সে আপন হৃদয়ভার লইয়া বাতায়ন-প্রান্তে একাকী দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকেও কেহ বুঝিল না, তাহারও হৃদয়ের দ্বন্দ্ব কেহ দেখিল না।

১৯

সুশীলা সেই সবেমাত্র গোয়ালঘরে ঘুঁটের আগুনের ধোঁয়া দিয়া, তুলসীমূলে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া দিয়া, হাতমুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বঁটি পাতিয়া তরকারী কুটিতে বসিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ নিত্যকার মত তাঁহার পড়িবার ঘরে আলো জ্বালাইয়া চশমার খাপ হইতে চশমাখানা বাহির করিয়া কোঁচার খুঁট দিয়া মুছিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন এমন সময় বাহিরে একটা মোটর দাঁড়াইবার আওয়াজ পাওয়া গেল। হর্ণের আওয়াজ ঘন ঘন হইতে লাগিল। চন্দ্রনাথ চশমা পরিয়া তাড়াতাড়ি বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলেন নির্ম্মলা ও যামিনী সিঁড়িতে উঠিতেছে। তাহাদের আসিবার কোনরূপ কথা ছিল না, এমন অপ্রত্যাশিতরূপে নির্ম্মলাকে দেখিয়া বৃদ্ধ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। নির্ম্মলা নত হইয়া সেই বারান্দাতেই তাঁহাকে প্রণাম করিতেছিল, তাহাকে দুই হাতে উঠাইয়া ধরিয়া একসঙ্গে তিনি অজস্র প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, "এস মা এস। কখন এসেছ? কোন্ ট্রেন ধরেছিলে? হঠাৎ এমন ক'রে আসা হ'ল যে···হঠাৎ বুঝি বুড়ো বাপকে মনে প'ড়ে গেল? এই যে যামিনী, থাক···থাক আর প্রণাম করতে হবে না। তারপর কি খবর?"

যামিনী সংক্ষেপে বলিল, "কলেজ খুলেছে। আসতেই হচ্ছিল তাই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলুম। জানি ওকে আনলেই আপনি খুশী হবেন। কিন্তু এবারে তো আপনার জিনিষ আপনার হাতে পৌঁছাল, এবারে আমি যাই।"

তাহার কণ্ঠস্বরে শেষের দিকে বেদনার আভাস। সমস্ত মুখে ক্লান্তির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। ঘরে ঢুকিয়া আলোতে চন্দ্রকান্তবাবুর নজরেও তাহা পড়িল। নির্ম্মলার সঙ্গে বিবাহের আগে যামিনীর প্রতি তাঁহার মনোভাব যেমন ছিল এখন যেন তাহার চেয়ে অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার প্রতি একটি সুমিষ্ট সুকোমল স্নেহরস ভিতরে ভিতরে কখন উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। সে কেবল আজ তাহার পানে চাহিবামাত্র তিনি টের পাইলেন। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "সে কি, যাবে কি? নির্ম্মলা, যা ত মা, তোর মাকে বাড়ির ভিতর খবর দে।" প্রতিমাসুন্দরী কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল। নির্ম্মলাকে দেখিবামাত্র হাসিমুখে কহিল, "ঠাকুরঝি ভাই, এলে? এরই মধ্যে ঠাকুরজামাইটিকে এমন বশ ক'রে নিয়েছ যে যেখানে যখন যান, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান। দু-দিনের অদর্শন সহ্য হয় না। সত্যি ভাই, তোর ক্ষমতা আছে অস্বীকার করবার জো নেই।" প্রতিমার কথার সুরে একটা অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সুর। সে বেচারার দোষ নাই। বিবাহের পরই মেয়েদের পরস্পরের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রপাত হয়। তখন আর বয়স বা সম্পর্কের জন্য বড়-একটা আসিয়া যায় না। প্রতিমা তাই উচ্ছ্বসিত হইয়া মনে করিয়াছিল এই দু-তিন মাসের মধ্যেই নির্ম্মলার নিশ্চয় একটা বড় রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। আগেকার সেই স্তব্ধ, সমাহিত, পুস্তকলীন নির্ম্মলা কখনই নাই। এখন সপ্তদশবর্ষীয়া যে-তরুণীকে প্রতিমা কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল সে বসন্ত-ব্রততীর মত প্রেমে, চাঞ্চল্যে, অকারণ পুলকের হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কথায়, হাসিতে, দৃষ্টিপাতে আনন্দ ঝরিয়া পড়িতেছে।

প্রতিমার সহিত নির্ম্মলা ভিতরে আসিল। আলোতে ভাল করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া কিন্তু প্রতিমার ভুল ভাঙিল। তাহার মনশ্চক্ষের সেই তরুণীর সঙ্গে কই নির্ম্মলার ত কোথাও মিল নাই। বরঞ্চ সে যেন আগেকার চেয়ে আরও অনেক নিস্তব্ধ। সাজসজ্জাও তাহার যেমন অনাড়ম্বর তেমনি সাদাসিধা। হাতে আগেকার সেই সরু প্লেন বালা দু-গাছি ছাড়া আর কোথাও কোন অলঙ্কারের চিহ্নমাত্র নাই।

প্রতিমা অবাক হইয়া ভাবিল, ইহাদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। আজকাল সে শাশুড়ীর নির্দ্দেশমত কাজকর্ম্মে খুব তৎপর হইয়াছে। তাড়াতাড়ি ষ্টোভ ধরাইয়া চায়ের জল বসাইয়া দিয়া যামিনীর জন্য জলখাবার সাজাইতে প্রবৃত্ত হইল।

নির্ম্মলা মাকে প্রণাম করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল। আলো না জ্বালাইয়াই অন্ধকারের মধ্যে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া তাহাদের ত্রিতলের ছাদের এক কোণে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠে নাই। মাথার উপর তারাগুলি অত্যন্ত দীপ্ত হইয়া ফুটিয়াছে। নক্ষত্রস্পন্দিত নিঃশব্দ অন্ধকারে নির্ম্মলা তাহার মাথার অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দাঁড়াইল, তাহার আশৈশব-অভ্যস্ত এই অবারিত মুক্তিকে সমস্ত হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিতে চাহিল। অন্ধকারে কত ক্ষণ এমনই করিয়া দাঁড়াইয়াছিল খেয়াল নাই। পায়ের শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিল যামিনী আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে। দু-জনেই অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। নির্ম্মলা প্রথমে কথা কহিল, "আমাকে কিছু বলবে ?"

"কিছু বোলো না। অন্ধকারের মধ্যে কেবল তোমাকে অনুভব করতে দাও।"

"আমি এক-এক সময় ভাবি, অবাক হয়ে কিছুতেই ভেবে পাইনে—" নির্ম্মলা যেন আপন-মনে তন্ময় হইয়া বলিয়া চলিল, "আমার মধ্যে..."

"তোমাকে মিনতি করছি নির্ম্মলা, চুপ করো। কত সুদূর থেকে তারার আলো এসে তোমার মুখে পড়েছে। রাত্রি স্তব্ধ, অন্ধকার। এরই মাঝখানে আমার সমস্ত তোমাকে দিয়ে ভরিয়ে নিতে দাও। এখন কথা কওয়া সইবে না। আশ্চর্য্য, আমি তোমার কাছে এলুম, নিজেকে উন্মোচিত ক'রে তোমার সামনে ধরলুম অথচ তুমি যে আমার মাঝে কিছুই খুঁজে পেলে না সে-কথাটা আজ এই অন্ধকারে চুপ ক'রে তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যতটা টের পেয়েছি এর আগে কোনদিন তা পাই নি।"

নির্ম্মলা চুপ করিয়া ছাদের আলিসায় ভর দিয়া যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেমনই থাকিল। যামিনী বলিল, "এবারে আমি যাই।"

"কোথা যাবে ?"

"আমার সেই সাবেক মেসে। নিখিলকে ব'লে রেখেছি আমার ঘর দু'টো খুলিয়ে রেখেছে।"

নির্ম্মলা যামিনীকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিত, কিন্তু তাহার যে-মন নবাবিষ্কৃত সংসার হইতে মুক্তির জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মনই যেন যামিনীর প্রতি স্বল্পানুরক্ত নববধূর মন হইতে প্রবল হইল। নির্ম্মলা শুধু বলিল, "মেসে কেন যাবে ? এখানেও তো থাকতে পার।"

"না, পারি নে। নির্ম্মলা তুমি রাগ ক'রো না, কিন্তু আজ একটা কথা বলব। তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে গেলুম, মনে আশা ছিল আমার ঘর তোমারও ঘর হয়ে উঠবে। ভুল ভাঙলো। টের পেলুম সে তোমার হ'ল না। তাই আজ তোমারও আমন্ত্রণে সাড়া দিতে পারছি নে। তোমাদের ঘরে নিজের মনে ক'রে থাকতে বাধছে। কোথায় রয়ে গেল একটা অদৃশ্য বাধা। কোনদিন এটা কাটবে কি না জানি নে; কিন্তু এইটুকু আমার মনে সান্ত্বনা থাকবে মিথ্যাকে আমি চাই নি। যাকে চেয়েছিলুম তাকে সর্ব্বতোভাবে সত্য ক'রে পাব ব'লেই প্রতীক্ষা ক'রে এসেছি আজও যদি প্রতীক্ষার দিন না ফুরিয়ে থাকে তাহ'লে জানব এখন আমার সাধনার পালা ফুরোয় নি। কিন্তু অভিযোগ করব না কারও কাছে। আমি চললুম নির্ম্মলা।"

যাইবার সময়ে সে নির্ম্মলার হাত দুইখানি আপনার হাতে টানিয়া লইয়া তাহাতে অধর স্পর্শ করিয়াই দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া যাইবার পরে ছাদে আবার তেমনি অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। অন্ধকার ছিন্ন করিয়া সারি সারি বাড়ির ছাদগুলার এক প্রান্ত হইতে কৃষ্ণপক্ষের এক খণ্ড চাঁদ উঠিল। কিন্তু নির্ম্মলার মনে তাহার পূর্ব্বদিনের প্রশান্তি আর ফিরিল না। মনে হইতে লাগিল কে যেন অধীর বেদনায় ফিরিয়া গিয়াছে। তাহার সেই বেদনার ছায়ায় প্রকৃতি স্তম্ভিত, ভারাক্রান্ত। তাহাকে সমস্ত দিয়া গ্রহণ করিতে চাহিলেও মনের একটা দিক অতৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে, মনে হয় মুক্তির অপরিসীম আকাশ হইতে যেন কাহার লালসাজীর্ণ অন্ধকার কারাগারের মধ্যে ঢুকিতে হইতেছে, আবার তাহারই নিরন্তর ব্যাকুলতায় তাহাকে ছাড়িয়া দিতেও মনের আর একটা দিক উদাস হইয়া যাইতেছে।

নির্ম্মলা একাকী ছাদে ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মনের ভিতর যুগল নির্ম্মলার দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল।

২০

সকালবেলায় চায়ের পেয়ালায় চিনি মিশাইতে মিশাইতে যামিনীর পূর্ব্বতন সহপাঠী বন্ধু নিখিল কহিল, "ব্যাপারখানা

কি বলো দেখি? কাল অত রাত্রিতে হুটোপুটি ক'রে এসে হাজির। এদিকে চেহারাখানা দাঁড়িয়েছে যেন ঝোড়ো কাকের মত। কি হয়েছে? ঝগড়া? কিন্তু কার সঙ্গে? মা-বাপের সঙ্গে না নববধূর সঙ্গে? শেষেরটাই অবশ্য বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কারণ তা না হ'লে শুধু মা-বাপের কাছে দু'টো বকুনি খাওয়ায় চেহারার উপর এতটা চিহ্ন থাকত না।"

যামিনী ক্ষীণ হাসিয়া কহিল, "ঝগড়া আবার কি? ফেল করেছি পরীক্ষায়, বাজে কথার সময় নেই। উঠে পড়ে লাগতে হবে।"

এই বলিয়া চা খাওয়া শেষ হইবামাত্র সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজায় খিল দিল। নিখিল যামিনীর রুচি এবং প্রকৃতি জানিত। তাই দু-তিন দিন আগে খবর পাইলেও তাহার দুইখানা ঘর যথাসাধ্য সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখিয়াছিল। টেবিলের উপর সজ্জিত পুস্তকের কাছে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া যামিনী বসিল। খুব নিবিষ্ট চিত্তে একটা বই টানিয়া লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মনে পড়িতে লাগিল নির্ম্মলার কথা। সেই প্রথম তাহার সহিত কেমন করিয়া আলাপ হয়। কেমন করিয়া এক দিন তাহাকে হ্যাম্লেটের কিয়দংশ আবৃত্তি করিতে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেই তাহার সরল আত্মবিস্মৃত ভাব। পূব দিকের জানালাটা খোলা ছিল সেই দিকে নজর পড়িতে চোখে পড়িল সামনের যে দোতালা বাড়িটা এতদিন খালি ছিল তাহারই উপরের মাঝখানকার ঘরটায় জানালায় জানালায় জাফরানি রঙের পর্দ্দা উড়িতেছে, খোলা দুয়ারের অবকাশ-পথ দিয়া সাজান ঘরের কিয়দংশ চোখে পড়িতেছে। পালঙ্কের উপর দুগ্ধশুভ্র বিছানা, মাটিতে ঢালাও বিছানার উপর জরির মছলন্দ পাতা— পায়ের দিকে কাহার এক জোড়া লাল মখমলের চটি। কে এ-ঘরের অধিবাসিনী যামিনী তাহা জানে না, কিন্তু সেই ঘরখানার পানে চাহিবামাত্র তাহার মনটা হু হু করিয়া উঠিল। মনে পড়িয়া গেল তাহার সেই ঘরের স্মৃতি। নিজের হাতে সে সাজাইয়াছিল, দেয়ালের কোন্ দিকে কোন্ ছবি টাঙাইবে, পর্দ্দার রঙ কেমন হইবে এ লইয়া কত জল্পনা-কল্পনা কত আলোচনা, নিজের মনে সে কত ভাঙাগড়া। সারেঙের শব্দের সহিত স্ত্রী-কণ্ঠের কোমল স্বরের আওয়াজ আসিল। যামিনী কিছু কিছু হিন্দী জানিত, গানের প্রথম লাইনটা ঘুরিয়া-ফিরিয়া গীত হইতে শুনিতে লাগিল

"পল্‌পল্ সো পাগে ঝরোরীম্…
যব ঘর আওয়ে প্যারে মোরি…"

অনেক ক্ষণ ধরিয়া বৃথা পড়িবার চেষ্টা করিয়াও যখন কিছুতেই মন বসিল না তখন বিরক্ত হইয়া যামিনী সশব্দে দরজাটা খুলিয়া নিখিলের কাছে গিয়া বলিল, "এ কোন্ হতভাগা ঘর ঠিক করলে আমার জন্যে? সামনের ওই বাড়িটা যে জানালার গায়ে লাগাও, আর গান-বাজনার শব্দ উঠছে অহর্নিশি।"

নিখিল মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "জানি নে ভাই, আজ ক'দিন থেকে দেখছি কে একটা পার্সি মেয়ে ঐ ঘরটা ভাড়া নিয়েছে। তা তোমার আর এমন অসুবিধে কি? যে-স্বপ্নে এখন তোমার দিন কাটছে তাতে আইন মুখস্থ করার চেয়ে গানের ঝঙ্কার এমন কি মন্দ লাগবে?"

দরোয়ান একটা রেকাবীতে করিয়া একরাশ খাম ও পোষ্টকার্ড লইয়া সকালের ডাক বিলি করিয়া বেড়াইতেছিল। "চিট্‌ঠি আপকা ভি হ্যায় একঠো" যামিনীর কাছে আসিয়া সে থামিল। যামিনীর বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধ্বক্ করিয়া উঠিল। নির্ম্মলা চিঠি লেখে নাই তো তাহাকে? কথাটা মনে হইতেই একটা মধুর সম্ভাবনায়, অধীর আগ্রহে তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল।

চিঠিখানা হাতে লইতেই কিন্তু আশা নিবিয়া গেল। নির্ম্মলার চিঠি নয়। বাড়ি হইতে মা লিখিয়াছেন রাগ করিয়া যে, বৌ যখন এখানে থাকিতেই পারে না তখন তাহাকে আর এখানে না-আনাই ভাল। তাঁহারা যামিনী বা নির্ম্মলা সম্বন্ধে কিছু জানেন না। যামিনী যতদিন নিজে উপার্জ্জন করিয়া তাহার স্ত্রীকে প্রতিপালন না করিতে পারে তত দিন সে যেন নিজের বাপের বাড়িতেই থাকে।

যামিনী চিঠিটা দলা পাকাইয়া জানালার বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ওবাড়ি হইতে গানের সুরের সঙ্গে অনেকের একত্র-মিলিত একটা হাসির গর্‌রা উঠিতেছিল। যামিনী বিরক্ত হইয়া ঘরের ওইদিককার

সমস্ত জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হাতের কাছে যে বইটা পাইল টানিয়া লইয়া এধারের ঈজিচেয়ারটার উপর আসিয়া বসিল।

২১

ঘরের আলো জ্বলিতেছিল, নির্ম্মলা পিতলের জয়পুরী ধূপদানিতে করিয়া ঘরে ধূপধুনা দিতেছিল। কাজ শেষ হইয়া গেলে শেল্‌ফের উপর হইতে একটা বই বাছিয়া লইয়া পড়িতে বসিল। চন্দ্রকান্তও অনেকক্ষণ হইতে একটা পুঁথি খুলিয়া অন্যমনস্কের মত বসিয়াছিলেন। এইবারে আস্তে আস্তে সেটা হইতে চোখ তুলিয়া ডাকিলেন, "নির্ম্মল!"

"কি বলছ বাবা?"

কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া চন্দ্রকান্ত কহিলেন, "তোদের মধ্যে কি যেন একটা হয়েছে, মা। সেদিন অত রাত্রিতে বিস্তর অনুরোধ সত্ত্বেও যামিনী তাড়াতাড়ি মেসে চলে গেল। তার পরে একটি দিনও আর আসে না। চিঠিপত্র লেখে তো?"

নির্ম্মলা মাথা নাড়িয়া কহিল, "না।"

"তবেই তো।" চন্দ্রকান্ত নিজের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে কহিলেন, "তা হ'লেই যে দেখছি..."

নির্ম্মলা হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তা হ'লে কি বাবা? আচ্ছা, তোমার আজ হঠাৎ এসব কথা মনে হচ্ছে কেন? তিন-চার মাস আগে যখন তুমি আর আমি এই ছোট্ট টেবিলটির দু-পাশে ব'সে পড়াশোনা করতুম তখন তো কেউ আমাদের চিঠিপত্র লিখত না। তখন তো আমরা নিজেদের মধ্যেই বেশ ছিলুম। আমরা কি আবার আগেকার মত হ'তে পারি নে?" চন্দ্রকান্ত চাহিয়া দেখিলেন তাহার মুখমণ্ডল শান্ত। নির্ম্মল স্বচ্ছ ললাট-খণ্ডটুকুতে কোন চিন্তা কিংবা অশান্তির ছায়া পড়িয়াছে কিনা বোঝা যায় না।

তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "আগেকার মত কেন হ'তে চাইছ নির্ম্মল? আগে তো কেবল একমাত্র আমিই তোমার জীবনকে আবৃত করে ধরেছিলুম। কিন্তু আমার যা-কিছু দেবার, তোমাকে যা-কিছু শেখাবার সে সমস্তই নিঃশেষ ক'রে এখন যে আমি চাইছি সংসারের মাঝে তুমি সার্থক হয়ে ওঠ। এক-এক সময় আমি অবাক হয়ে ভাবি..." চুলের মধ্যে তাঁহার আঙুলগুলা থামিয়া গেল। চিন্তিত মুখে বৃদ্ধ উজ্জ্বল বিজলি বাতির দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিবার জন্য চুপ করিলেন।

"আমার জন্যে আজকাল তুমি মনে মনে কেন এত ভাব বাবা?"

"আমি এক-এক সময় ভাবি—" নিজের চিন্তার সূত্র ধরিয়া তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "হয়ত তোমার উপর আমি অন্যায় করেছি, নির্ম্মলা।"

"অন্যায় কি করেছ, বাবা? আমাকে তুমি যত ভালবেসেছ, এত ভাল কেউ কাউকে বাসে না।"

"সে কথা নয় মা। আমি নিজেকে দিয়ে তোমাকে বড্ড বেশী ঢেকেছি নির্ম্মলা। তোমার নিজের যথার্থ বিকাশ হয়ত তাতে বাধা পেয়েছে। তা নইলে..."

"তুমি আজ কথা বলতে বলতে এত থেমে যাচ্ছ কেন বাবা? তা নইলে কি?"

"তা নইলে যামিনীর মত ছেলের প্রতিও তোমার মন আকৃষ্ট হ'ল না কেন? তা ছাড়া যে-পরিবারে তুমি বধূ হয়েছ সে-পরিবারের প্রতিও তোমার কিছু কর্ত্তব্য রয়েছে।"

"সে কি কর্ত্তব্য আমাকে বলে দাও না। আমি ত কিছুই বুঝতে পারি নে। তুমিও তো আমাকে এ-সম্বন্ধে আগে কিছু বল নি।"

"না, আগে আমি ভাবতেও পারতেম না তোমাকে বাদ দিয়ে আমার নিজের জীবনকে কখনও কল্পনা করতে হবে। কিন্তু এখন ক্রমশঃ বুঝতে পারছি তোমারই সুখের জন্যে তার প্রয়োজন। আমি কেন আমার ব্যর্থ জীবনের সমস্ত সন্তাপ নিয়ে অহর্নিশি তোমাকে ঘিরে থাকব? তুমি যে ফুলের মত সৌন্দর্য্যে, কল্যাণে, প্রেমে ফুটে উঠেছ। তোমাকে কত লোকে কামনা করছে। আমার জীর্ণ জীবনকে ত্যাগ ক'রে তুমি কি তোমার লক্ষ্মীর আসন অধিকার ক'রবে না মা?" বলিতে বলিতে আবেগভরে চৌকি হইতে উঠিয়া তিনি নির্ম্মলার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার মাথায় হাত রাখিলেন। তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতে

লাগিল। নির্ম্মলার চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিছু ক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া কহিল, "বাবা, সংসার তুমি কাকে বলছ? সংসার মানে যা বোঝায় তা আমি বুঝতে চাই নে। সেখানে কেবল কুশ্রীতা, শুধু হিংসা, দ্বেষ, নীচতা। যে কয়েক মাস আমি শ্বশুরবাড়িতে ছিলাম সন্ধ্যে হ'লেই আমার মন ছটফট ক'রত। মনে হ'ত খুব একটা বন্ধ কারাগারের মধ্যে কে যেন আমাকে বেঁধে রেখেছে। তোমার এই ছোট্ট ঘরখানির জন্যে এত মন কেমন করত। এই শান্ত নির্জ্জনতায় আলোটি জ্বালিয়ে তুমি আর আমি বসে থাকি। তোমার মুখে আলো পড়েছে মধ্যে মধ্যে সেই মুখের দিকে চেয়ে দেখি। নেই সেই মুখে কোন বিকার কোন মলিনতা। বাবা, এর পরেও আর কি চাইবার থাকতে পারে? মনে মনে এইটুকুর জন্যেই যে আমি পিপাসার্ত্ত হয়েছিলুম।"

চন্দ্রকান্ত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আমারই ভুল হয়েছে নির্ম্মলা। তোমার বিয়ের পরে তুমি যখন চলে গেলে তখন নিজের এই অসহ্য কষ্টে বিস্মিত হয়ে একা বসে অনেক কথাই ভেবেছি। সেই সমস্ত ভাবনার কথা আজ তোমাকে বলি। প্রথম বয়সে সংসারের দিক থেকে খুব বড় রকম একটা ঘা খেয়েছিলুম। নিজের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ফলে হিন্দুধর্ম্মের নানারকম অর্থহীন লোকাচার, নানা ক্ষুদ্রতা অসাম্য আমাকে পীড়া দিত। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আমি আকৃষ্ট হলুম। সংসার হ'ল আমার উপর বিরূপ। তোমার মায়ের সঙ্গে ঘট্‌ল আমার মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ। যদিও প্রকাশ্য ভাবে কোন দিন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা নিইনি তবুও সংসারের অনুকূলতা কখনও পেলুম না। মাঝখানে যে বিদরণ-রেখা পড়ল তার এক দিকে রইলুম আমি একা, অন্য দিকে তাঁর ছেলেপিলে লোক-লৌকিকতা ঠাকুরদেবতা সমস্ত সংসার নিয়ে তোমার মা। চিরদিনই এমনি একলা কাটিয়ে আসছিলুম, কিন্তু যেদিন একমুঠো ফুলের মত সুন্দর শুভ্র তোমাকে দেখলুম সেদিন কি যে লোভ হ'ল আবার আস্তে আস্তে নিজেকে জড়িয়ে ফেললুম। পুরুষের পক্ষে একলা থাকা তেমন শক্ত নয় মা। কিন্তু নিজের মধ্যেই নিজে চিরকাল আবদ্ধ হয়ে থাকা বড় কষ্টকর। সেই সঙ্কীর্ণ অবরুদ্ধ অন্ধকার থেকে তুমিই আমাকে মুক্তি দিয়েছিলে, মা। নিজেকে তিলে তিলে এক জনের কাছে দান করবার যে দুর্ল্লভ আনন্দ সেই আনন্দে আমার দিন রাত্রি ভরেছিলে। কিন্তু……" চন্দ্রকান্ত উঠিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "কিন্তু তোমাকে এত ভালবাসি নির্ম্মলা, যে তোমার জন্যেই আমার এখন দিবারাত্রি ভাবনা। কিসে তুমি সুখী হবে, কেমন ক'রে তোমার সমস্ত জীবন আনন্দময় কল্যাণপূর্ণ হবে? এই ভাবনাতেই আমার দৃষ্টিকে করেছে তীক্ষ্ণ, মনকে করেছে সজাগ। আমি এই তোমাকে বলছি মা, আমি তোমাকে দিলুম, উৎসর্গ ক'রে দিলুম! তোমাকে আমার জীবন থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে, আমার জীবনের জাল থেকে সকল গ্রন্থি মোচন ক'রে তোমাকে তোমার জীবন-বিধাতার হাতে সমর্পণ করলুম। তোমার বিধাতার যে অভিপ্রায় তোমার জীবনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে উঠতে চায় তাই সফল হোক নির্ম্মলা। তুমি সুখী হও, সুখী হও মা। আর আমি কিছু চাই না। আমার দিক থেকে কোন দায় কোন বন্ধন মনের মধ্যে রেখো না।"

নির্ম্মলা কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার নিমীলিত চক্ষুর কোণ দিয়া অজস্র অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। কোন্ এক রহস্যময় অজানা ভবিষ্যতের ছায়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছিল আর তাহারই সঙ্গে অনির্দ্দেশ্য একটা তীব্র বেদনা। নিজের জন্য নয়, কাহার জন্য তাহাও সে ঠিক বলিতে পারে না। কিন্তু চোখের উপর দিয়া বায়োস্কোপের ছবির মত ছোটবেলাকার কত ঘটনাই না একে একে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সেই তাহার বাবার চিরকাল চুপচাপ একলা বসিয়া থাকা। তাহাকে বিপুল আবেগ-ভরে কাছে টানিয়া লওয়া। মনে হইতে লাগিল তিনি যেন চিরদুঃখী, কেহ তাহাকে কোনদিন কাছে টানিয়া লয় নাই, কোনদিন বুঝিতে চায় নাই। নির্ম্মলার সঙ্গেও আজই যেন তাঁহার চিরবিচ্ছেদের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। কিছু ক্ষণ পর চোখ মুছিয়া সে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "বাবা, তোমার জীবন থেকে আমাকে বিদায় দিলে কেন? আমাকে তোমার কাছে ধরে রাখলে না কেন চিরদিনই?"

"গাছ কি ফলকে চিরকাল ধরে রাখে মা? নিজের

প্রাণরস দিয়ে তাকে সে যখন নিটোল পরিপক্ক ক'রে তোলে তখন প্রকৃতির নিয়মেই তো গাছ থেকে সে খসে পড়ে যায়, আসে তার বিচ্ছেদের সময়। সেই বিচ্ছেদেই যে তার সার্থকতা। তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদও সেই রকম।"

"বেশ, তাই হবে। তুমি আমাকে যা বলবে আমি তাই মেনে চলবার চেষ্টা ক'রবো। কিন্তু এইটুকুমাত্র তোমাকে মিনতি তুমি আমার জন্য রাতদিন ভেবো না বাবা।"

"তোমার জন্যে যে ভাবতে পাই সেই তো আমার সুখ মা। কিন্তু মেনে চলার কথা কেন বলচ? আমি কামনা করি জীবনের বিধান কেবল মেনে চলে নয়, আনন্দময় স্বতঃউৎসারিত স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই তাকে তোমার জীবনে সার্থক ক'রে তোল তুমি। আমি এখন একটু ছাদে যাই নির্ম্মলা। তুমি ব'সে এই বইখানার বাকীটুকু পড়ে নাও। যদি কোনস্থান বুঝিয়ে দেবার দরকার হয়, ফিরে এসে বুঝিয়ে দেব।"

চন্দ্রকান্ত চলিয়া যাইবার পরে নির্ম্মলা টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আজ ক'দিন হইতে সুশীলার জ্বর হইয়াছে তাই রান্না করিবার জন্য এক জন রাঁধুনি রাখিতে হইয়াছে। অন্দর হইতে ঠিকা ঝিয়ের সহিত রাঁধুনির কলহের সুর ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে চড়িতেছে। নির্ম্মলা যে-ঘরে করতলের ভিতর মস্তক রাখিয়া বসিয়াছিল সেখানেও আওয়াজ আসিতেছে, "...ইঃ লো বড় আমার দরদ রে! বাবুদের পাতে মাছভাজা কম পড়েছিল কেন? বলি ও বামুন ঠাকরুণ, বলি শুনছ, কার চোখে ধুলো দেবে তুমি?...রাসু তেমন বাপের বিটি নয় বুঝলে? ভাতের মধ্যে মাছভাজা গুঁজে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।"

নির্ম্মলা গোলমালে বিরক্ত হইয়া একবার দুয়ারের কাছ পর্য্যন্ত আগাইয়া গেল তাহার পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসিল। সংসারের এই সকল নিরতিশয় কুশ্রী গোলযোগ, অসুন্দর কলহ, ইতর বাক্যবিনিময় তাহাকে গভীর করিয়া বিঁধিল। কোথাও কি ইহার হাত হইতে রক্ষা নাই! গোলমাল ক্রমশঃ প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছে। না, অবহেলা করা চলিবে না। সংসারের প্রতিও যে তাহার একটা কর্ত্তব্য আছে। যেমন করিয়া পারে এ সকল সে থামাইবে। নির্ম্মলা উঠিয়া ভিতরে গেল। পাচিকার কাছে গিয়া কহিল, "কি হয়েছে নালুর মা? এত গোলমাল কিসের?"

পাচিকা হাত-মুখ নাড়িয়া ঝিয়ের উদ্দেশ্যে কহিল, "শতেকখোয়ারি আবাগির মেয়ে, আমার নামে চোর অপবাদ দেয় গো! তোর নোলা খসে যাবে না!"

প্রত্যুত্তরে রাসু ঝিও গর্জ্জন করিয়া উঠিল। নির্ম্মলা স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। দুই পক্ষ হইতে অতঃপর যে-সকল উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতে লাগিল তাহার ভাষা যেমনই কদর্য্য তেমনই অশ্লীল। সংসার-নাট্যশালার এই যে একটি টুক্‌রা অকস্মাৎ তাহারই চোখের সামনে অভিনীত হইতে থাকিল সেই দিক পানে চাহিয়া নির্ম্মলা বিমনার মত স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল, সংসারে এ-সকলেরও প্রয়োজন আছে। এই-সব লইয়াই সংসার। সেখানে যাহারা থাকে এই ধরণের অসহ্য ইতরতার মাঝেই অহরহ তাহাদের বাস করিতে হয়। নির্ম্মলা এইমাত্র রবীন্দ্রনাথের হিবার্ট-লেকচারের রিলিজন্ অফ্ দি ম্যান্ পড়িতে পড়িতে উঠিয়া আসিয়াছিল। যাহার মধ্যে সে মগ্ন হইয়াছিল সে কি সুন্দর, কি গভীর। সেই কূলহীন প্রশান্তির মাঝখান হইতে উঠিয়া আসিয়া এইখানে দাঁড়াইবামাত্র তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। বহুক্ষণ অসাড়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে যাইবার সময় ঝিকে সম্বোধন করিয়া অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, "ভদ্রলোকের বাড়িতে এ-সব কি কাণ্ড বল ত? যাও মুখ বুজে কাজ করো গে। ছিঃ, এখানে দাঁড়িয়ে অমন অভদ্র কাণ্ড করতে নেই।"

ঝি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল, "ভদ্রলোকের বাড়ি কি দেখাচ্ছ গা দিদিঠাকরুণ। আজই কি নূতন তোমাদের বাড়িতে কাজ করছি। কলকাতায় অমন দশ-বিশটা ভদ্দর নোকের বাড়ি কাজ করেছি। কেন কি করেছি আমি?" (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) "কেন আমি কি নাচউলি না আমি বাজারের মেয়ে যে তুমি আমায় কথায় কথায় ভদ্দর লোকের বাড়ির খোঁটা দিচ্ছ, দিদি?" নির্ম্মলা অপরিসীম ঘৃণায় সেখান হইতে সরিয়া গেল। সে চোখের অন্তরাল হইবামাত্র ঝি বামুনির দিকে ফিরিয়া আপন-মনেই বলিতে লাগিল, "ভদ্দরলোকের বাড়ির কাণ্ডটা আমার সব জানা আছে। জানতে আর কিছু বাকী আছে কি এই রাসুর।"

তাহাকে চক্ষে অঞ্চল দিতে দেখিয়াই বামুন-ঠাকুরাণীর মন গলিয়াছিল। এখন সমস্ত ঝগড়াবিবাদ বিস্মৃত হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল, "কেন কি হয়েছে রে রাসু? হাঁ তাই বল ত ভাই। আমাদের মধ্যে আর লুকোছাপা কি? তোদের এই দিদিমণির কাণ্ডকারখানা আমারও যেন কেমন-কেমন ঠেকে। তবে বলতে তো আর পারিনে কিছু, নূতন লোক।"

"সব জানি, সব জানি। আমার চাকরি এই নিয়ে আজ দশ বছরের হ'ল। বিয়ের আগেও দেখেছি। সে কি কাণ্ড, পাত্তর গাঁথবার জন্তে! এই তখনই মোটরে করে গে বেড়িয়ে নিয়ে আসছে। তখনই আসছে রাশ রাশ গয়নাপত্তর। তার পরে মা দু-দিনও গেল না, সব কেড়েকুড়ে নিয়ে বাপের বাড়িতে দুম্ ক'রে ফেলে দিয়ে গেল। দেখিস নে (খুব নিম্নকণ্ঠে) সারা অঙ্গে সেই আইবুড়ো বেলাকার লিক্‌লিকে দু-গাছি বালা ছাড়া আর অন্য কিছুই নেই।"

হাতের বইটা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। যাইতে যাইতে সেইটা কুড়াইয়া লইবার জন্য নির্ম্মলা দাঁড়াইল, হেট হইয়া সেটা তুলিয়া লইবার সময় তাহারই বাড়ির পরিচারিকা-মহলে তাহার সম্বন্ধে কি আলোচনা হইতেছে কানে আসিল। নিমেষের জন্য পাষাণ-মূর্ত্তির মত সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

ক্রমশঃ

শবরীর প্রতীক্ষা

শ্রীবীণা দেবী

আনন্দে সারাটি প্রাণ উঠিছে শিহরি
আসিবেন আসিবেন আসিবেন হরি।
আসিবেন আসিবেন আসিতেই হবে তাঁর
বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া দীন কুটীরে আমার।
এ যে ভকতের ডাক প্রাণের আহ্বান
এর চেয়ে দেবতার কোথা আছে স্থান।
হে আমার উপাসিত হে আমার নারায়ণ
কখন আসিবে তুমি কোন্ সেই মহাক্ষণ।
কোন্ ভাবে কোন্ বেশে দাঁড়াবে সমুখে এসে
উছলি বিমল জ্যোতি আলোকিবে প্রাণমন।
শৈশব উন্মেষ হ'তে বসে আছি প্রতীক্ষায়
অগণিত কত শত সময় বহিয়া যায়।
গ্রীষ্মশেষে বর্ষা আসে, শরত হেমন্তে মিশে,
শীতান্তে বসন্ত আসি কত শোভা পায়,
ফলে ফুলে ভরি ডালা ধরণী সাজায়।
তারি সনে মম চিত্ত নবসাজে সাজে নিত্য,
তোমারি পূজার তরে ওগো প্রেমময়,
আশাপথ পানে চাহি দিন বহে যায়।
নারায়ণ নারায়ণ পূর্ণ কর প্রাণমন
দুঃখ দূর করি কর চিত্ত ভরপুর
দয়া কর দয়াময় প্রাণের ঠাকুর।
বালিকা-বয়সে আমি শুনেছিনু ঋষিবাণী
"নারায়ণ আসিবেন দুয়ারে তোমার
শবরী সাজায়ে রাখ পূজার সম্ভার।"
জানি নাথ! জানি আমি চণ্ডালতনয়া আমি
অপবিত্র দেহ মম পরশে না কেহ,
নীচ জাতি নাহি পাব মানবের স্নেহ।
তুমি ত গড় নি জাতি, তুমি ত দিয়েছ প্রাণ
তুমি কেন আসিবে না ভগবান ভগবান।
না না তিনি আসিবেন টলিবে আসন তাঁর
প্রাণের আহ্বান এ যে নহে ব্যর্থ হইবার।
শৈশবে ডেকেছি তোমা শিশুর সরল মন
ভেবেছি খেলার সাথী তুমি বুঝি নারায়ণ।
যৌবনে তুলেছি ফুল এনেছি নদীর জল
পরাব ফুলের মালা ধুয়ে দেব পদতল।
তুমি ফুল ভালবাস আপনি সেজেছি ফুলে,
তোমার মধুর নাম শিখায়েছি পাখীকুলে।
আজিও বিহগদল আজিও নদীর জল
তোমার মধুর নামে করিতেছে ছলছল।
যৌবন অতীত এবে জরা আসিয়াছে নামি।
পূজার সম্ভার লয়ে এখনও বসিয়া আমি।
নয়ন সমুখে মম নামিয়া আসিছে ঘোর,
কতদূরে আছ তুমি প্রাণের দেবতা মোর।
এখনও প্রভাতে উঠি বনে বনে যাই ছুটি
পথের মলিন ধূলি দূর করি তায়,
কাঁটাটি কুড়ায়ে রাখি যদি বাজে পায়।
এই পথে আসিবেন আমার প্রাণের হরি
উথলিবে নদী জল চরণ পরশ করি।
প্রকৃতি সাজিবে ফুলে পাখীরা গাহিবে গান,
সে চরণ বুকে ধরি সার্থক হইবে প্রাণ।
আগ্রহ উৎসুক প্রাণে চেয়ে আছি পথপানে
পদতলে প্রাণমন করিয়াছি নিবেদন,
তুলে লও বনফুল নারায়ণ নারায়ণ।

লণ্ডনের পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু—

অজিত, তোমাদের ওখানে এক বাক্স বই পাঠানো গেছে। তার মধ্যে একটা বই আছে বর্গসোঁ সম্বন্ধে, একটা অয়কেনের মত নিয়ে। পড়ে দেখো এবং যদি লিখতে চাও লিখো। অয়কেনের সঙ্গে আমার মতের যথেষ্ট মিল আছে; কিন্তু একটা বিষয়ে আমার মজা লাগে। অয়কেন খৃষ্টের দিব্যত্ব মানেন্ না, ত্রিত্ববাদ মানেন্ না, মধ্যস্থবাদ মানেন্ না, খৃষ্টের পুনরুত্থান মানেন্ না, বাইবেলের বর্ণিত অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করেন না, অথচ বলেন তিনি খৃষ্টান এবং খৃষ্টান ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। অর্থাৎ অন্যান্য ধর্ম্মকে অতীতের ইতিহাসে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেখেন এবং তার সঙ্গে এমন একটা ধর্ম্মের তুলনা করেন যেটাকে তিনি নিজের আদর্শের দ্বারা গড়ে তুলচেন। অবশ্য হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আমারও এই রকমের মনোভাব। আমি বলচি যা কিছু মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শের সঙ্গে মেলে তাই হিন্দুধর্ম্ম। কেন-না, হিন্দুধর্ম্মে জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম তিন পন্থাকেই ঈশ্বরের সঙ্গে যোগের পন্থা বলেচেন। খৃষ্টান ধর্ম্মের চেয়ে হিন্দুধর্ম্মের একটা জায়গায় শ্রেষ্ঠত্ব এই দেখি, হিন্দুধর্ম্ম সন্ন্যাসবাদের ধর্ম্ম নয়। খৃষ্টের উপদেশের ভিতরে যে ত্যাগের অনুশাসন আছে সেটা, নিশ্চয়ই পূর্ণতার বিরোধী। হিন্দুধর্ম্মে গৃহধর্ম্মকে একটা খুব আদরের স্থান দিয়েচে—অথচ তাকে দিয়েই সমস্ত জায়গা জোড়ে নি—তাকেও যথানিয়মে যথাকালে অতিক্রম করবার দ্বার খোলা রেখেচে। অতএব হিন্দুধর্ম্মকে বাইরের দিকে যে-সব স্থূল আবরণে আবৃত করেচে তাকে বাদ দিয়ে যে জিনিষটাকে পাই সে ত কোনো ধর্ম্মের চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়। কেন-না, এতে মানুষের হৃদয় মন আত্মা এবং কর্ম্মচেষ্টা সমস্তকেই ভূমার দিকে আহ্বান করেচে। আমি এই জন্যেই হিন্দুনাম ছাড়তে পারি নে—ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম থেকে স্বতন্ত্র করতে পারি নে—কেন-না, হিন্দুধর্ম্মই যদি নিজের প্রাণশক্তির দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম হয়ে উঠে এ-কথা সত্য না হয় তবে এ মরীচিকা টিকবে না, কারো কোনো কাজে লাগবে না। অয়কেনের খৃষ্টান ধর্ম্ম জিনিষটা যেমন, আমার হিন্দুধর্ম্মও তেমনি; অর্থাৎ ওর মধ্যে যেটা নিত্য সত্য সেইটের দ্বারাই ওকে বিচার এবং গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যাবে বিজ্ঞান হাজার হাজার ভুলের ভিতর দিয়ে চলে এসেচে। সেই ভুলগুলোর দিকেই যদি তাকাই তাহ'লে ফিসিক্স মিথ্যা, কেমিষ্ট্রী মিথ্যা, সত্য বিজ্ঞান নেই বললেই হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রাণের মূলে সত্য আছে। সেই দিকেই তাকিয়ে তাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু ঘোরতর বৈজ্ঞানিক যখন ধর্ম্মকে বিচার করে তখন তারা ধর্ম্মকে স্থির ক'রে দাঁড় করায় এবং বিজ্ঞানকে চলনশীল ক'রে দেখে। যেমন জীবনের গতি বন্ধ হবামাত্র এই বিকৃতির বোঝা ভারি হয়ে ওঠে, অথচ জীবন চলবার পথে যতক্ষণ থাকে সমস্ত রোগ বিকার অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়েও তার স্বাস্থ্য প্রতিভাত হয়—ধর্ম্মও ঠিক সেই রকমই, তাকে দাঁড় করিয়ে দেখলেই মুস্কিল। হিন্দুধর্ম্মের শত্রু ও মিত্র উভয়েই তাকে দাঁড় করিয়ে দেখতে চায়—শশধর তর্কচূড়ামণিও তাকে খাড়া ক'রে ধরে ফুলচন্দন দেয় আর মিশনরি সাহেবও তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে চুণকালি মাখায়। কিন্তু আমি তাকে চলবার মুখে দেখি, তখন সে তার সমস্ত পাক এবং দূষিত পদার্থের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে, তখন সে যথার্থই পতিতপাবনী স্রোতস্বিনী। আমার মুস্কিল হয়েচে এই যে আমাকে গোঁড়া হিন্দুও একঘরে করে আমাকে গোঁড়া ব্রাহ্মও জাতে ঠেলে।

হঠাৎ এক বৈজ্ঞানিক ব'লে বসেচে প্রাণ জিনিষটাকে এক দিন নিশ্চয়ই ল্যাবরেটরীতে তৈরি করতে পারবে—শুনে ধার্ম্মিক লোকের চিত্ত অত্যন্ত উদ্বেজিত হয়ে

উঠেচে। অন্তত এ-জায়গায় আমরা নিশ্চিন্ত। বিজ্ঞান এমন কিছুই বের করতে পারবে না যাতে আমাদের ধর্ম্মকে থামকা চমকে উঠতে হবে। মানুষশিল্পী ত নানা বস্তুর যোগাযোগ করে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করচে, সেটাতে যদি আঁৎকে ওঠবার কিছু না থাকে তবে মানুষ-বৈজ্ঞানিক অণুপরমাণুর যোগাযোগে প্রাণ সৃষ্টি করলেই বা বিপদ কোন্‌খানে? না-হয় এক দিন প্রমাণ হবে ধুলার মধ্যেও প্রাণ আছে—তাতে ধুলো বড় হয়ে উঠবে প্রাণ ছোট হয়ে যাবে না।

য়েটস্ যে বইটা এডিট্ করচেন তা বাদে আরো অনেক তর্জ্জমা জমে উঠেচে—রোটেনষ্টাইন সেইগুলো দিয়ে আর একটা বই ছাপাতে চাচ্চেন—তার মধ্যে তোমার তর্জ্জমাগুলোও যেতে পারবে। রোটেনষ্টাইন বলেন, আমার তর্জ্জমার নীচেই তোমার তর্জ্জমা তাঁর সব চেয়ে ভাল লাগে। ইংরেজি তর্জ্জমায় তোমাকে ছাড়াবার অভিপ্রায় আমার কোনোদিন ছিল না—এবং ছাড়িয়েছি ব'লে কোনোদিন কল্পনাও করিনি—গ্রহের চক্রান্তে গোলেমালে কোন্‌দিন কেমন করে ঘটে গেছে তা জানি নে—অতএব এতে আমার কোনো দোষ নেই।

আশ্বিন, ১৩১৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

21, Cromwell Road.
South Kensington
S. W.

কল্যাণীয়েষু—

সন্তোষ, দুই তিন মেল তোমার চিঠি পাইনি তাই তোমাকে লিখিনি, জানি যে আমার চিঠি তোমরা কোনো না কোনো নামে পাচ্চ। আমার এ চিঠি যখন শান্তি-নিকেতনে পৌঁছবে তখন শিউলি ফুলের গন্ধে তোমাদের বন আমোদিত হয়ে উঠেচে এবং সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত, শারদশ্রীর সোনার পদ্মবনের আশ্চর্য্য শোভা ধরে দেখা দিচ্চে। সেই চিরপরিচিত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে এখানকার আকাশের বিরুদ্ধে আমার মাথায় অত্যুক্তি জাগচে। আমার মন বলচে, এখানকার আকাশের মধ্যে রূপের খেয়াল নেই, সে মানুষের মন ভোলাতে চায় না। এখন জ্যোৎস্না-রাত্রি কিন্তু সে কেবল পাঁজিতেই দেখি—নিশ্চয়ই আকাশে তারা আছে কেন-না অ্যাষ্ট্রনমিতে তার বিবরণ পাওয়া যায় এবং মেঘ যে আছে সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করবার লেশমাত্র হেতু নেই। এখানকার আকাশ এই রকম কালো ফ্রক-কোট্ এবং কালো চিম্‌নিপট্ টুপি প'রে অত্যন্ত ভব্যভাবে থাকে বলেই এখানকার লোকের কাজকর্ম্মের কোনো ব্যাঘাত হয় না। আমাদের দেশের আকাশ আমাদের কাজ ভোলায়; শরৎকালের সোনালি আলোয় আপিস আদালত মাটি করে দেয়—আকাশ আপনার সমস্ত জানালা দরজা এমন ক'রে অহোরাত্র খুলে রেখে দিয়েছে যে মন সে আমন্ত্রণ একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারে না। আমাদের বৈষ্ণব কাব্যে সেইজন্যেই যে বাঁশি বাজে সে বাঁশি কুল-বধূর কুলের কাজ ভুলিয়ে দেয়—সে আমাদের সমস্ত ভালো-মন্দ থেকে বাহির ক'রে আনে। কিন্তু এমন কথা এদেশের লোকে মুখে আনতেই পারে না—এমন কি ভগবান আমাদের ভোলাচ্চেন এ কথা শুনলে এরা কানে হাত দেয়। কেন-না এদের আকাশে এই বাণী অবরুদ্ধ। আমাদের আকাশ যে ছুটির আকাশ, এদের আকাশ আপিসের আকাশ। এদের আকাশে ঘণ্টা বাজে আমাদের আকাশে বাঁশি বাজায়। সেই জন্যে এরা বলে জীবনসংগ্রাম, আমরা বলি জীবলীলা। ভগবানের লীলার রূপ এখানে আবৃত হয়ে রয়েচে। এই জন্যেই এরা বলতে চায় তিনি নিজেকে পাবার জন্যে নিজে যুঝচেন। তার মধ্যে কোনখানে বিরাম নেই। কিন্তু আমরা যে নিজের চক্ষে দেখতে পাচ্চি সমস্ত কাজকে ছাড়িয়ে একটি মনোমোহন আনন্দরূপ আপনার অহৈতুক সৌন্দর্য্যের মধ্যেই প্রকাশ পাচ্চে। সেই কাজের বাড়াকে যদি না দেখতে পাই তাহ'লে কাজের বেড়ি আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ধরে। কাজের চেয়ে বড়কে হৃদয়ের পদ্মাসনে বসিয়ে তবে কাজ করতে হবে। আমরা সেই বিরামকে দেখেছি, সেই সুন্দরকে দেখেছি, আমরা সেই বাঁশি শুনেচি। কিন্তু বাঁশি যখন আমাদের টেনে আনে তখন যে পথ দিয়ে আমাদের নিয়ে আসে, সেই দুর্গম পথটাকে আমরা এড়িয়ে চলতে চেয়েচি। এইখানেই আমরা একেবারে ঠকে গেছি। কেবল বাঁশি শুনলেই তো হয় না, বাঁশি

শুনে যে চলতে হবে; তখন যে দুঃখের ভিতর দিয়ে যেতে হবে বাঁশির সুরের মোহনমন্ত্রে সেই দুঃখই যে গলার হার হয়ে উঠবে। কাঁটা পায়ে ফুটবে—কিন্তু তাই যদি সহ্য করতে না পারব তবে বাঁশির সুর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করলে কই? আজ পর্য্যন্ত দুঃখের পথেই আনন্দের অভিসার হয়ে এসেচে, আর কোন পথ নেই। আরামের শয্যা থেকে আমাদের যে ডাক দিচ্চে সে তো শমনের পিয়াদা নয়, সে বাঁশির সুর। তবে আর ভাবনা কিসের? দুঃখ না-হয় পেলুম, যথাসর্ব্বস্ব না-হয় দিলুম কিন্তু পরিপূর্ণতার মোহন রূপ যে অমৃত রূপ ঢেলে দিচ্চে সে তো কিছুমাত্র ম্লান হয়নি। আকাশ ভরে যে বাঁশি বাজচে সেইটেকে জীবনে বাজিয়ে নেবার শক্তি জেগে উঠুক—সেই শক্তিই প্রেম। সে কোনো বাধা-বিপত্তি মানে না, সে সব বইতে চায়, সব সইতে এগোয়—তাকে ঘরের কোণে বসিয়ে রাখে কার সাধ্য! আলস্যে তাকে ঘুম পাড়ায় না, বিলাসে তাকে মদ খাওয়ায় না। সেই প্রেমের কর্ম্ম, সেই সৌন্দর্য্যের শক্তি, সেই দুঃখের আনন্দ পরিণামটি উপলব্ধি করবার জন্যেই মন ব্যাকুল হয়ে আছে। মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও! আমাদের কাজকর্ম্ম সমস্তই ক্ষুধার দ্বারা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত—তাকে অমৃতের মধ্যে উত্তীর্ণ ক'রে দাও—তার থেকে লোহার শিকলের ঝঙ্কার একেবারে ঘুচে যাক—বীণার তারই বাজ্‌তে থাক।

৯ই আশ্বিন, ১৩১৯

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত

বর-চুরি

শ্রীসীতা দেবী

সত্তর-আশী বৎসর আগের কথা। তখনকার দিনের কথা এখন উপকথার মত শোনায়, তবু ঘটনাটা উপকথা নয়, সত্যই।

দুই জমিদার বংশ—গুহ এবং মিত্র। পরস্পরের প্রতি দ্বেষ এবং হিংসাটা ইঁহারা পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়া আসিয়াছেন। কবে কি কারণে এই শত্রুতা প্রথম ঘটিয়াছিল, দোষটা কোন্ পক্ষে ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে এই শত্রুতাটাকেও ধরিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কাজ কি না, ইহা লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না। বাড়ির কর্ত্তা হইতে নববিবাহিতা ছোট বধূটির মনেও এই বৈরিতার ভাব সমান বদ্ধমূল।

পাশাপাশি দুই জেলাতে ইঁহাদের জমিদারী, সুতরাং সংঘর্ষ হইবার অবকাশ ছিল প্রচুর এবং উভয় পক্ষের কেহই কোন দিন এদিককার কোন সুবিধাকে তুচ্ছ করিতেন না। আদালতে মোকদ্দমা লাগিয়াই ছিল, লাঠিয়ালে লাঠিয়ালে মাথাফাটাফাটিটাও ঘটিত তাহার চেয়ে বেশী বই কম নয়। আধ হাত জমি লইয়া মামলা করিয়া লক্ষ টাকা খরচ করিয়া দেওয়া বা দশ-বিশটা মানুষের প্রাণ নষ্ট করার মধ্যে ইঁহারা গৌরব বই অগৌরবের কারণ কিছু খুঁজিয়া পাইতেন না। দেখা-শুনা ইঁহাদের মধ্যে ছিলই না প্রায়, তবু সামাজিক বিবাহ শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির গৃহে মধ্যে মধ্যে এই দুই কুলের প্রদীপদের সাক্ষাৎ হইয়াও যাইত। সেস্থলেও ভদ্রতার বালাই অপেক্ষা শত্রুতার বালাই বেশী হইয়া উঠিত এবং নিমন্ত্রণকর্ত্তাকে শঙ্কাকুল করিয়া তুলিয়া তাঁহারা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে উভয়ে উভয়কে যত রকমে পারেন অপদস্থ ও অপমানিত করিবার চেষ্টা করিতেন। প্রাণে অনেকখানি ভরসা না থাকিলে এই দুইটি বংশের মানুষকে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ করিবার কথা কেহ ভাবিতও না।

মেয়েদের ঘরের বাহির হওয়ার রীতি তখন ছিল না, নিতান্ত আত্মীয় ঘর না হইলে এই দুই বনিয়াদী ঘরের বধূ বা কন্যারা উৎসব উপলক্ষ্যেও অন্যত্র যাইতেন না। তবু শত্রুর গোষ্ঠীর সকল খবরই ইঁহারা ঘরে বসিয়াই রাখিতেন। কার কয় ছেলে কয় মেয়ে, কোথায় তাহাদের বিবাহ হইতেছে, নূতন কুটুম্ব কিরূপ অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী, এ সকল খবর ত বাড়ির পুরুষদের নিকট হইতেই তাঁহারা পাইতেন। ইহা অপেক্ষাও অন্দরমহলের খবর যাহা, যথা, কোন্ বধূ কত অলঙ্কার লইয়া আসিল, কোন্ মেয়ের শ্রী কিরূপ, স্ত্রীপুরুষে কোথায় মনের মিল আছে এবং কোথায় নাই, তাহাও ইঁহারা নানা উপায়ে জানিয়া রাখিতেন। নিম্ন শ্রেণীর প্রজা যাহারা, তাহাদের ঘরের মেয়েরা ত অন্দরমহলবাসিনী নয়, কাজের খাতিরে সর্ব্বত্রই তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইত। জমিদার-বাড়ির অন্তঃপুরেও ইহাদের গতিবিধি অবাধ ছিল। জেলেনী মাছ লইয়া, তাঁতিনী শাড়ী লইয়া, যখন-তখন দেউড়ির দরোয়ানকে অগ্রাহ্য করিয়া সোজাসুজি ভিতরে চলিয়া যাইত। সুতরাং বেশ সহজেই এক বাড়ির হাঁড়ীর খবর আর এক বাড়িতে গিয়া পৌঁছিত।

যে-সময়কার কথা হইতেছে, তখন গুহ-বংশ উজ্জ্বল করিয়া আছেন চন্দ্রকান্ত গুহ এবং মিত্র-বংশের মৈত্রীর অভাব সবচেয়ে জোরগলায় প্রচার করিতেছেন করালীকিঙ্কর মিত্র। পূর্ব্বেকার ধনবল এবং জনবল অনেকটাই কমিয়া গিয়াছে, আশা আছে এই ভাবে চলিতে থাকিলে, যাহা-কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাও শেষ হইতে বিলম্ব হইবে না, বড়-জোর আর দুই পুরুষ চলিবে। কিন্তু তাই বলিয়া পিতৃপিতামহের নাম ডুবাইয়া দেওয়া চলে না, তাঁহারা যে ভাবে যাহা করিয়া গিয়াছেন, ইঁহাদের আমলেও ঠিক সেই ভাবেই তাহা চলিতেছে।

করালীকিঙ্করেরই অবস্থা এই দুই বংশের মধ্যে একটু বেশী কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। উপরি-উপরি কয়েকটা ভারি মামলায় তিনি হারিয়া গিয়াছেন, এবং ছয়টি কন্যার বিবাহে বহু ব্যয় করিয়াছেন, দুইটি পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহার ব্যয়াংশের একাংশও ঘরে ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই। সনাতন প্রথা অনুযায়ী তিনি উঁচতি ঘর দেখিয়া কন্যা দিয়াছিলেন, এবং পড়তি ঘর হইতে বধূ আনিয়াছিলেন। সুতরাং কন্যাগণ শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময় অলঙ্কারে ও অর্থে উঁচতি ঘরের বধূর উপযুক্ত ভাবেই গেলেন, বধূরা আসিলেন শুধু বিপুল কুলগৌরব লইয়া। এখনও এক পুত্র ও এক কন্যার বিবাহ বাকী। পুত্রটি দুর্ভাগ্যক্রমে পরিবারের উপযুক্ত নয়। দেখিতে সে ভাইদের চেয়ে ঢের কালো ও দুর্ব্বল, আভিজাত্যের অন্য অনেক গুণ হইতেও বঞ্চিত। অল্প বয়স হইতেই মহিষ-বলি দেখিলে সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়, বাপের চাবুকের ভয়ও তাহাকে সেখানে ধরিয়া রাখিতে পারে না। উৎপীড়িত প্রজাকে লুকাইয়া অর্থসাহায্য করিয়া আসে, দণ্ডিত প্রজাকে রাতারাতি জমিদারীর সীমানা পার করিয়া দিয়া আসে। শিকার-খেলা, বাঈনাচ দেখা, ও আনুষঙ্গিক আমোদ-প্রমোদে তাহার কোনই উৎসাহ দেখা যায় না, দিবারাত্রি বই পড়া ও বাগান করা লইয়াই তাহার দিন কাটিয়া যায়। বাড়িতে সকলেই তাহাকে কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, এক তাহার মা ছাড়া। মা ছেলের ব্যবহারে একটু যে লজ্জিত নয়, তাহা নয়, তবে তাহার প্রতি সহানুভূতির ভাবটাই বেশী। তাঁহারই বংশের কোনো এক পূর্ব্বপুরুষ শাক্ত-বংশের মুখে কালি দিয়া বৈষ্ণব হইয়া নবদ্বীপে চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। এই ছেলে তাঁহারই স্বভাব পাইয়াছে বলিয়া সকলে তাঁহাকেই খোঁটা দেয়। যাহার জন্য অত কথা সহিতে হয়, তাহাকে একটু বেশী রকম ভাল না বাসিয়া মা পারেন না। ছেলের সব আবদার তাঁহারই কাছে; এ-ছেলে পারতপক্ষে যেমন বাপের ছায়া মাড়ায় না, অন্য ছেলেরাও তেমনি মায়ের সংসর্গ অনেকখানি এড়াইয়া চলে। বিমল যে মায়েরই গোপন প্রশ্রয়ে এত-খানি মাটি হইয়াছে, এ-বিষয়ে কাহারও কোনো সন্দেহ নাই। ভাইরাও খোলাখুলি ভাবে তাহাকে বোষ্টম ঠাকুর বলিয়া ডাকে, এবং মালা তিলক ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যাইতে উপদেশ দেয়।

অন্য ভাইদের সব ষোল-সতের বৎসর বয়সেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিমলের বয়স কুড়ি পার হইয়া একুশে চলিতেছে, তবু এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। মায়ের ইচ্ছা বিবাহ শীঘ্রই হয়, নয়ত ছেলে সত্যই হয়ত কোনদিন সন্ন্যাসী হইয়া

বাহির হইয়া যাইবে। বাপ বলেন, সমান ঘরে বিমলের সম্বন্ধ করতে তাঁহার লজ্জা বোধ হয়, ইহাকে নিজের পুত্র বলিয়া লোকের সম্মুখে তিনি বাহির করিবেন কিরূপে? ছেলের যেমন চেহারা, তেমনি গুণ। দেখিলে বোধ হয় ঠিক যেন চালকলাভোজী ভট্টাচার্য্যের পুত্র, দিনরাত বই মুখে করিয়াও ঠিক তেমনই বসিয়া থাকিতে পারে। কেরাণীর কাজে ইহাকে মানাইবে ভাল, জমিদারী করা ইহার কর্ম্ম নয়। মা বলেন, "না-হয় অসমান ঘর থেকেই বউ আন, এমনও ত ঢের হয়। প্রথম দুই ছেলেরই বিয়েতে কুল ত ঢের দেখা গেছে, এবার না-হয় থাক।"

করালীকিঙ্কর বলেন, "আমি থাকতে ত নয়। ও-সব চন্দ্রকান্ত গুহর দ্বারা হয়, করালী মিত্তিরের দ্বারা হয় না। টাকার লোভে সে নাকি নাপিতের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়েছে।" চন্দ্রকান্তের নামে এই অপবাদটি প্রচার করিয়া বেড়াইতে করালীকিঙ্করের বড়ই ভাল লাগে। ক্রমাগত বলিয়া বলিয়া তিনি কথাটাকে প্রায় সত্য বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। চন্দ্রকান্ত সত্যই অবশ্য নাপিতের ঘরে ছেলের বিবাহ দেন নাই। অর্থের লোভে কিছু নীচু ঘরের মেয়ে তিনি আনিয়াছিলেন বটে। বধূর কুলগৌরবের অভাব, তাহার পিতা অর্থ দিয়া এমন ভাবে মিটাইয়া দিয়াছিলেন, যে, চন্দ্রকান্ত কোনদিন এ-কার্য্যের জন্য অনুতাপ করেন নাই। প্রধানতঃ বেহাইয়ের নিকট হইতে লব্ধ অর্থের সাহায্যেই তিনি করালীকিঙ্করকে উপরি-উপরি দুইটি বড় মামলায় হারাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং বেহাইটিকে নাপিত প্রতিপন্ন করার দিকে করালীকিঙ্করেরই সবচেয়ে বেশী ঝোঁক ছিল। বিবাহ করিতে বিমলের ইচ্ছা আছে কি অনিচ্ছা আছে, তাহা অবশ্য কেহ কোনদিন জানিবার চেষ্টা করে নাই। এ-সকল কথা বর বা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রথা তখন ছিল না।

চন্দ্রকান্ত করালীকিঙ্কর অপেক্ষা বয়সে অনেকটাই বড়। তাঁহার নিজের ছেলে-মেয়েদের বিবাহ অনেক কালই চুকিয়া গিয়াছে, এখন সবে নাতনীদের পালা সুরু হইয়াছে। বড়ছেলের বড়মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এখন মেজ ছেলের একটি মেয়ে এবং একটি দৌহিত্রী বিবাহ-যোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের জন্য পাত্র অনুসন্ধান করা হইতেছে। দৌহিত্রীর মা, তাঁহার তৃতীয়া কন্যা। অল্পবয়সেই বিধবা হইয়া এই কন্যাটি মাত্র লইয়া সে আবার মা বাপের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। শ্বশুরবাড়িতে যে তাহাকে ভাত দিবার মত অবস্থা নাই, তাহা নহে। তবে মেয়ে ভরসা করিয়া সেখানে থাকিতে পারে না। শ্বশুর-শাশুড়ী বাঁচিয়া নাই, ভাসুর-দেওরগুলি অতি দুর্দ্দান্ত, তাহাদের নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। মেয়ের বিবাহের ভার তাহার মাতামহের উপরেই পড়িয়াছে। তিনি অবশ্য ইহাতে কিছু কাতর ন'ন। মেয়েটির রূপের খ্যাতি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রূপ দেখিয়া মাতামহই সাধ করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন পূর্ণিমা। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান, ইহাকে পরের ঘরে পাঠাইবার নামেই মায়ের বুক কাঁপিয়া উঠিত। তাই তখনকার দিনের আন্দাজে মেয়ের বয়স যথেষ্ট হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাহার তখনও বিবাহ হয় নাই। বাড়ির লোকে অবশ্য তাহার বয়স দশের বেশী হইয়াছে তাহা স্বীকার করিত না, কিন্তু পূর্ণিমা বাস্তবিক তখন ত্রয়োদশী। তাহার চেয়ে দুই বৎসরের ছোট মামাতো-বোন কনকলতারও যখন বিবাহের সম্বন্ধ প্রায় স্থির হইয়া আসিল তখন আর পূর্ণিমার বিবাহ না-দিয়া কি করিয়া চলে? সুতরাং চন্দ্রকান্ত ঘটক-ঘটকীকে দৌহিত্রীর জন্যও পাত্র খুঁজিতে বলিয়া দিলেন। পৌত্রীর বিবাহ অপেক্ষা দৌহিত্রীর বিবাহে তিনি যে খরচ কিছুই কম করিবেন না, তাহাও জানাইতে ক্রটি করিলেন না। দুই-একটি করিয়া এধার-ওধার হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল।

কিন্তু পূর্ণিমার মা উমাশশীর কোনো সম্বন্ধই আর পছন্দ হয় না। রকম দেখিয়া তাহার মা বলিলেন, "অত খুঁৎ-খুঁৎ করলে কি আর ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় বাছা? একেবারে নিখুঁৎ মানুষ কি আছে? ওরই মধ্যে মন্দটুকু বাদ দিয়ে, ভালটুকুর দিকে তাকিয়ে কাজ করতে হয়। বাকী দৈবের হাত।"

উমাশশী বলিল, "মা, দৈব তোমার প্রতি সদয়, ভগবান করুন সদয়ই থাক, তাই এ-কথা বলতে পারছ। আমি যে দৈবের মার খেয়েছি মা, আমার অত ভরসা

নেই। সাতটা নয় পাঁচটা নয়, এই একটি ত মেয়ে, ওর অদৃষ্টে দুঃখ আর আমি দেখতে পারব না। তাই যতটা পারি ভাল দেখে দিতে চাই। বাংলা দেশে কি এই চারটি পাত্র ছাড়া পাত্র নেই ?"

মা বলিলেন, "থাকবে না কেন ? তবে শুধু ছেলে হলেই ত হয় না, আমাদের করণীয় ঘরও ত হওয়া চাই ? সেরকম আর ক'টা আছে ? তোমার বাবার মাথা হেঁট করে যেখানে-সেখানে মেয়ে দিয়ে দেওয়া যায় না ত ?"

উমাশশী জানিত বাবার হেঁটমাথা টাকা পাইলেই আবার সোজা হইয়া যায়। কিন্তু সে-কথা ত আর মাকে বলা যায় না। সে শুধু বলিল, "তবু আর একবার ঘটক-ঘটকীদের একটু ঘুরতে বল। ছেলের বয়স খুব বেশী আমি চাই না, স্বাস্থ্যও যেন ভাল হয়। লেখাপড়া জানা হ'লে ভালই, একেবারে মূর্খ মানুষের স্বভাবচরিত্র প্রায়ই ভাল হয় না।"

মা মেয়ের ব্যথা কোথায় জানিতেন, নিজেরা তাহার জন্য যে বরটি আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহার না ছিল যৌবন, না ছিল স্বাস্থ্য ; স্বভাবচরিত্রেরও বিশেষ গৌরব করা চলে না। হাঁ, তবে অর্থ ছিল, কুলগৌরব ছিল, এ না দেখিলে তাঁহাদের ত চলে না। হতভাগিনী মেয়ের অদৃষ্ট খারাপ, তা এখন অর্থ, বা কুলগৌরবের উপর রাগ করিলে কি হইবে ? তিনি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "তা বেশ, ঘটকীদের বলে দেব আমার রাঙা দিদিমণির জন্যে টুলো ভট্‌চায ধরে আনতে।"

করালীকিঙ্করের বাড়িতেও খবর পৌঁছিয়া গেল যে, চন্দ্রকান্ত গুহের পরিবারে জোড়া বিবাহের আয়োজন হইতেছে। তিনি হাসিয়া গোঁফে চাড়া দিয়া বলিলেন, "এবার গুহমশায় গোয়ালা কি তাঁতি কার বাড়ি কাজ করেন দেখা যাক। সৎ কায়স্থের জাত না মারলেই ভাল, তবে টাকায় আজকাল সব হয়।"

অন্দরমহলেও ইহা লইয়া খুব আলোচনা চলিতে লাগিল। বিমলের বিধবা পিসীমা ভ্রাতৃজায়াকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন, "ও বৌ, গুহরা ত ঢাক বাজিয়ে জেলাসুদ্ধ সরগরম ক'রে তুলছে, বাড়িতে জোড়া বিয়ে। তোমাদের ঘরে কি ছেলে-মেয়ে নেই, একেবারেই চুপ ক'রে থাকবে ?"

করালী-গৃহিণী মুখ আঁধার করিয়া বলিলেন, "ও কথা আমায় শুনিয়ে কি হবে ঠাকুরঝি ? আমি ত বিয়ে দেবার মালিক নই, যে মালিক তাকে শোনাও।"

ঠাকুরঝি বলিলেন, "এ-সব মেয়েদেরই ব্যাপার, তারা পিছন থেকে ঠেলা না দিলে কি বেটাছেলেয় এগোয় ? তোমার গিরিজাও বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে বাপু, আর চোখে দেখা যায় না, আমরা ও-বয়সে চার বছর শ্বশুর-ঘর ক'রে এসেছি, আর বিমলের ত বয়সের গাছপাথর নেই। ওর কি তোমরা বিয়ে দেবেই না ? সত্যিই কণ্ঠি তিলক ধারণ করাতে চাও নাকি ?"

ভ্রাতৃজায়া ননদের হুল ফুটানোর চেষ্টা দেখিয়া মুখ ভার করিয়া উঠিয়া গেলেন। রাত্রে স্বামীকে বলিলেন, "হ্যাঁ গা, তুমি ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবে না, আর খোঁটা খেয়ে মরব কি আমি ?"

করালীকিঙ্কর বলিলেন, "এ ত বিনা-পয়সায় হবার ব্যাপার নয়, পয়সা আসে কোথা থেকে ? অবস্থা ত তোমার অজানা নেই। টাকা ধার করার কতরকম চেষ্টা করছি, পাচ্ছি কই ?"

গৃহিণী বলিলেন, "তা বিমলেরই বিয়ে দাও না হয়, তাতে ত টাকা লাগ্‌বে না ? বরং ঘরে কিছু আসতেও পারে। গিরির বিয়ে পরের বছর দিলেও হবে, তোমার বোন যাই বলুন, সে এমন কিছু অরক্ষণীয়া হয়ে ওঠে নি। বিমলের বিয়ে ভাল দেখে দিলে, গিরির বিয়ের খরচের ভাবনাও কিছু কমতে পারে।"

করালী ঠোঁটটা প্রায় উল্টাইয়া ফেলিয়া বলিলেন, "পাগল হয়েছ ? তোমার ঐ ছেলের জন্যে কেউ টাকা দেবে ? ওকে জমিদারের ছেলে ব'লে বিশ্বাসই কেউ করবে না।"

গৃহিণীর মুখ একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল দেখিয়া, তাঁহাকে আবার একটু সুর বদলাইতে হইল। খোঁটা দিবার লোভটুকু ছাড়া যায় না, বড় মধুর জিনিষ, আবার খুব বেশী চটাইয়া দিতেও সাহস হয় না।

অগত্যা বলিলেন, "দেখা যাক, ঘটকচূড়ামণি বামাপদকে একবার ডাক দিই। বউ কি রকম চাও ? অন্য বউদের মত কি আর পাবে ?"

গৃহিণী বলিলেন, "অন্যগুলিই বা কি এমন স্বর্গের অপ্সরী যে তাঁদের জুড়ি মিলবে না।"

কর্ত্তা বলিলেন, "অপ্সরী ত খোঁজা হয়নি, ভাল ঘরের মেয়ে কি না সেইটাই দেখা হয়েছিল।"

গৃহিণী বলিলেন, "ভাল ঘরে আরও ঢের মেয়ে আছে, খোঁজ করলেই মিলবে। হাতের পাঁচটা আঙুল কিছু সমান হয় না, আর বিমল আমার কিই বা মন্দ ছেলে? গায়ের রং একটু শ্যাম এই ত তার দোষ? তা কালো কি তোমাদের গুষ্টিতে কেউ নেই না কি? ঐ যে তোমার সেজকাকা ছিলেন, তিনি ত বিমলের চেয়েও কালো।"

করালী বলিলেন, "হুঁ, কিসে আর কিসে। সেজকাকা ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের শিং ধরে দাঁড় করিয়ে দিতে পারতেন, আর তোমার ছেলে ত বেড়ালের ডাক শুনলে চমকে ওঠে। পুরুষের দেহে-মনে শক্তি যদি না থাকে তবে কিসের মরদ? তোমার ছেলের আসল খুঁৎ ত সেইখানেই।" বিমলের উল্লেখ করিতে হইলে কর্ত্তা সর্ব্বদাই বলিতেন, "তোমার ছেলে।" গিন্নী মনে মনে রাগিলেও প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিতেন না।

যাহা হউক, ঘটকচূড়ামণির আগমন দু-চার দিনের মধ্যেই ঘটিল এবং বিমলের পাত্রী খুঁজিতে তাঁহাকে বলিয়াও দেওয়া হইল। গৃহিণী লোকমারফতে বলিয়া পাঠাইলেন মেয়ে যেন সুন্দরী হয়, কারণ তাঁহার ছেলেটি কিছু শ্যামবর্ণ। কর্ত্তা ভাল ঘর দেখিতে ত বলিলেনই, টাকার কথাও বলিতে ভুলিলেন না। টাকার এখন প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী, ছেলের মাকে যতই খোঁটা দিন, বিমলকেও টাকা দিয়া জামাই করিতে সব মেয়ের বাপই রাজী হইবে, তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন।

পাত্রীর সন্ধান অবশ্য অবিলম্বেই মিলিল, একটি নয় গুটি দুই তিন। গৃহিণী সবগুলির বর্ণনা শুনিয়া বলিলেন, "মেয়ে একটিও ত বিশেষ সুশ্রী মনে হচ্ছে না?"

কর্ত্তা বলিলেন, "এখন সাক্ষাৎ উর্ব্বশী না হ'লে বিয়ে দেবে না যদি পণ ক'রে ব'সো, তাহ'লেই বিপদ। বাঙালীর ঘরে অত সুন্দরী মেয়ে কি ছড়াছড়ি যাচ্ছে? আমি ত রায়েদের বাড়ির সম্বন্ধটা কিছু খারাপ মনে করছি না, তারা দেবেথোবেও বেশ।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা ত হ'ল। তারপর একে ছেলে কালো, তার একটি কালো পেত্নী বউ এনে দাও, আর কালো-জিরের ক্ষেত হয়ে উঠুক আমার বাড়িতে। তখন খোঁটা খেতে আমিই ত খাব?"

কর্ত্তা উত্তর না দিয়া উঠিয়া বাহির বাড়িতে চলিয়া গেলেন। গৃহিণী তাঁহার খাস দাসী মাধবীকে ডাকিয়া বলিলেন, "যা ত মাধী, বামাপদ ঘটকের কাছে।"

মাধবী চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "ওমা তাঁকে আমি কোথায় পাব গিন্নীমা?"

"কোথায় আবার পাবি, বার-বাড়িতেই পাবি। এখনই কি আর সে বিদায় হয়ে গেছে? সারাদিন বসে তামাক টানবে আর কত্তার সঙ্গে ফুসুর্-ফুসুর্ গুজুর্-গুজুর্ করবে তবে ত? বলবি যে ঘর আলো করা বউ এনে দিতে পারেন ত ঘটক-গিন্নীকে আমি সোনার নথ গড়িয়ে দেব। হাতের কাছে প্রথমেই যা আসবে, তাই যদি শুধু এগিয়ে দেবে ত ঘটকের ব্যবসা নিয়েছে কেন? আগেকার দিনে ক'নে খুঁজতে খুঁজতে কাশী-কাঞ্চীসুদ্ধ তারা পার হয়ে যেত।"

মাধবী হেলিতে দুলিতে চলিয়া গেল। খানিক পরে হাসিয়া লুটাইতে লুটাইতে ফিরিয়া আসিল। গৃহিণী বলিলেন, "আ মর, রকম দেখ্। অত হেসে মরছিস্ কেন লা?"

মাধবী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, "ওমা, এত রঙ্গও জানে বিট্‌লে বামুন, হেসে আর বাঁচি না মা!"

বামুন যাহাই রঙ্গ করিয়া থাক্, তাহা না শুনিয়াই সকলে হাসিতে লাগিল, মাধবীর রকম দেখিয়া। করালীর দিদি খালি তাড়া দিয়া বলিলেন, "আ গেল যা, কথাটা কি হয়েছে তাই বল না মাগী, তোর হাসি শুনে কি আমাদের পেট ভরবে?"

মাধবী বলিল, "বললে পেত্যয় যাবে না পিসীমা, আমাকে বামুনটা বলে কিনা 'গিন্নীমাকে বল গিয়ে অত যদি সুন্দরী বৌয়ের সখ থাকে ত চন্দ্রকান্ত গুহ বাবুর নাত্নীকে বৌ করতে, তার মত সুন্দর মেয়ে ত এ বাংলা দেশে কারও ঘরে নেই।' ওমা কথা শুনে আমি আর কোথায় আছি, যেন বিশ বাঁও জলের তলায় চলে গেলাম।"

পিসীমা মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "কথার ছিরি দেখ!

চালকলা-খেকো বামুন, কতই আর বুদ্ধি হবে? করালীর তেমন শাসন নেই, আমার বাপের আমলে হ'লে এ-কথা মুখে আর উচ্চারণ করতে হ'ত না বামুনের পোকে।"

গৃহিণী বলিলেন, "যাক্ গে দাসী-চাকরের সঙ্গে ঠাট্টা করেছে, আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ত বলে নি? শুনেছি বটে গুহদের নাত্‌নী ভারি ডাকসাইটে সুন্দরী, সেদিন ব্রজ-তাঁতির বউও বল্‌ছিল।"

বয়সকালে পিসীমারও সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি ছিল, তাই পারতপক্ষে তিনি কাহাকেও সুন্দরী বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিলেন, "ওগো যার গান শুনি নি সে বড় গাউনি, আর যার রান্না খাই নি সে বড় র'াধুনি। বাংলা দেশে না-কি আবার অমন মেয়ে নেই? বামাপদ-ঘটক বাংলা দেশের সব মেয়েকে দেখেছে না-কি? বিয়ে দিতে হবে, বাপমরা মেয়ে, কাজেই ও-রকম ভাল মন্দ দু-চার কথা না রটালে চল্‌বে কেন?"

বিমলের মা বলিলেন, "না গো ঠাকুরঝি, মেয়ে সুন্দর হওয়ারই কথা, ছোটবেলায় ওর মাকে দেখেছি খাসা দেখতে, এ ত তারই মেয়ে, সুন্দর হবে না কেন?" ননদিনী বার্দ্ধক্যের দরজায় পৌঁছিয়াও যে অতীত রূপের জ'াক করিয়া বেড়ান, ইহা করালী-গৃহিণীর ভাল লাগিত না।

যাহা হউক, দুই পরিবারেই আসন্ন উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। চন্দ্রকান্তের ত দুইটিই কন্যাদানের ব্যাপার, সুতরাং জোগাড়টা খুব রাজকীয় ভাবেই হইতে লাগিল। উমাশশী নিজের যথাসর্ব্বস্ব বাহির করিয়া দিল, গহনাতে টাকাতে তাহা নিতান্ত মন্দ হইল না। তা ছাড়া পূর্ণিমার মাতামহও ত্রুটি রাখিবেন না বোঝা গেল। মেয়ের অকালবৈধব্য খানিকটা যে নিজের দোষে ঘটিয়াছে, তাহা অন্ততঃ নিজের কাছে তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইত, সুতরাং নাতনীর বিবাহে যথাসম্ভব খরচ করিয়া তিনি সে ত্রুটিটার প্রায়শ্চিত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাত্রটি পছন্দ হইলেই হয়, আর সব আয়োজন এক রকম সম্পূর্ণই হইয়া গেল।

বিমলের জন্যও এদিকে পাত্রীর পর পাত্রী আসিয়া জুটিতে লাগিল। দশ-বারোটিকে নামঞ্জুর করার পর একটি পাত্রীর কথা বিমলের মায়ের একটু মনে লাগিল। মেয়েকে অবশ্য তিনি দেখেন নাই, বহুদিন পূর্ব্বে কোন এক কুটুম্বের বাড়িতে তাহার মা-মাসীদের দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের ত চোখে ভালই লাগিয়াছিল, মেয়ে সেই রকম হইলে মন্দ হইবে না।

বিমলের পিসীমা বলিলেন, "মা-মাসীর মতই যে হবে এমন কি কথা আছে? তাই যদি সবাই হ'ত, তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না।"

কথাটার ঠেশ্ কোথায়, তাহা আর কেহ বুঝুক বা নাই বুঝুক বিমলের মা বুঝিলেন। মনে মনে বলিলেন, "তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখনও ঠসক দেখ না। রূপ ত আর কারও হয় না?" প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না, কারণ ননদের মুখের উপর কথা বলার নিয়ম তখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

পিসীমা নিজেই বলিয়া চলিলেন, "নিজেরা একবার দেখতে পারলে হ'ত। বেটাছেলেরা ওসব বোঝেও না, ওদের চোখে ধুলো দিতে কতক্ষণ? সেই যে আমার সেজদেওরের বিয়ের সময় কি ঠকানটাই না ঠকালে।"

ভ্রাতৃজায়া বলিলেন, "নিজেরা কি ক'রে আর দেখা যায়? সেই কোন্ রাজ্যে তাদের বাড়ি, ধারে কাছে হ'লে না-হয় ছুতো-নাতা ক'রে দাসী-টাসী পাঠিয়ে দেখা যেত।"

ননদ বলিলেন, "ওদের বাড়ি সেই জোড়তলা গাঁয়ে ত? আমাদেরও ত বাগানবাড়ি রয়েছে তার খুব কাছেই। চল না একটা ছুতো ক'রে দিন-কয়েক সেখানে থেকে আসি। তারপর মেয়ে দেখতে কত ক্ষণ? কাছেই জগদ্ধাত্রী-মন্দির আছে, সেখানে পূজো দিতে গেলেই হ'ল?"

বিমলের মা মুখভার করিয়া বলিলেন, "তোমার ভাই যেতে দিলে ত? জোড়তলা যে গুহদের জমিদারীর মধ্যে বল্‌লেই হয়, সেই জন্যে ওদিকে আমাদের কোনদিনই যেতে দেন না।" ননদ বলিলেন, "তারা আছে নিজেদের বিয়ের ভাবনা নিয়ে, তোরা কোথায় যাচ্ছিস, না-যাচ্ছিস, তাই দেখতে আসছে আর কি? হ'লই বা তাদের জমিদারীর কাছে? এখন কোম্পানীর মুলুক, সে দেশ আর নেই যে যখন যার খুশী ঘরে ঢুকে মাথাটা কেটে

নেবে। আচ্ছা দেখি, আমি করালীর মত করাতে পারি কি না।”

ভাইয়ের পিছনে বিধিমত লাগিয়া তিনি তাঁহাকে প্রায় রাজী করিয়া আনিলেন। দিন-কতক পরিবার-পরিজনকে দূরে পাঠাইয়া দিতে তাঁহার খুব বেশী আপত্তি হইল না। উপযুক্ত পরিমাণে দরোয়ান লাঠিয়াল অবশ্য সঙ্গে চলিল। এই মেয়েটি গৃহিণীর পছন্দ হইলে যথেষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা ছিল, সেটাও আপত্তি না করার একটা কারণ। নিজেও দিন-কতক গিয়া বাগান-বাড়িতে থাকিয়া আসিবেন বলিয়া সকলকে তিনি আশ্বাস দিয়া রাখিলেন।

পূর্ণিমার এদিকে বিবাহ ঠিক হইয়া গেল। পাত্র, উমাশশীর খুব যে পছন্দ হইল তাহা নহে, কিন্তু এদিকে যে প্রায় ঠক্ বাছিতে গাঁ উজাড় হইবার জোগাড়। পূর্ণিমার বিবাহ হইতেছে না বলিয়া কনকলতার বিবাহও পিছাইয়া যাইতেছে, এবং বাড়ির লোক চটিয়া খুন হইতেছে।

করালীকিঙ্কর ঘরে বসিয়া বসিয়া এই সম্বন্ধের কথা শুনিয়া রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। এই পাত্রটিকে তাঁহার নিজের কনিষ্ঠা কন্যা গিরিজার জন্য মনে মনে বহুদিন হইতে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। শুধু হাতে টাকা না থাকায়, সম্বন্ধ করিতে অগ্রসর হন নাই। পাত্রটি কুলগৌরবে অতিশয় গরীয়ান্, কিন্তু আর্থিক অবস্থা মোটেই সে অনুপাতে সচ্ছল নয়, সুতরাং কন্যার সঙ্গে যথেষ্ট রজতকাঞ্চন যোগ না করিলে এ হেন পাত্রের আশা করা বৃথা। পাত্রটির শারীরিক শক্তি ও সাহস তখনকার দিনে দেশবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। চব্বিশ বৎসর বয়সেই অনেকগুলি ব্যাঘ্র শিকার করিয়া সে “বাঘা সুরেন” নাম পাইয়াছিল। এমন পাত্র কিনা শেষে চন্দ্রকান্ত গুহ কয়েকটা টাকা বেশী দিয়া ভাঙাইয়া লইল? করালীকিঙ্কর একলা ঘরে বসিয়া আপনমনে গর্জাইতে লাগিলেন।

কিন্তু শুধু ঘরের কোণে বসিয়া গর্জন করিয়াই নিরস্ত থাকিবার মানুষ তিনি নহেন। মনে মনে মতলব স্থির করিয়া, তিনি কাজে লাগিয়া গেলেন। পাত্রটির বাড়ি তাঁহার ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত বাগানবাড়ির খানিকটা কাছে পড়ে, অন্ততঃ এ-বাড়ি হইতে ত কাছে বটে। কথাবার্ত্তার সুবিধা হইবে বলিয়া কিছুদিনের মত বড় ছেলের উপর জমিদারী-সংক্রান্ত সব কাজের ভার দিয়া তিনি বাগানবাড়ি যাত্রা করিলেন। গৃহিণী ও বিমল, তাঁহার দিদিকে লইয়া দিন দশ-বারো আগেই ওখানে গিয়া গুছাইয়া বসিয়াছিলেন।

করালীকিঙ্কর বাগানবাড়িতে পৌঁছিয়াই আর সময় নষ্ট না করিয়া চন্দ্রকান্ত গুহের যে জাতমান কিছুই নাই, তাহা প্রমাণ করিতে বসিয়া গেলেন। গৃহিণী ও দিদি তখন বিমলের ভাবী বধূটিকে কি উপায়ে দেখা যায়, তাহারই ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত ছিলেন, করালী কি করিতেছেন না-করিতেছেন সেদিকে তাঁহাদের খেয়াল ছিল না। অবশ্য তাঁহারা জানিলেই যে করালীকিঙ্করকে নিবৃত্ত করিতে পারিতেন তাহাও নয়।

মানুষের নিন্দাটা প্রশংসা অপেক্ষা সহজে লোকে বিশ্বাস করে, সুতরাং করালীর চেষ্টা একেবারে বিফল হইল না। পূর্ণিমার সম্বন্ধটা একেবারে পাকা হইয়া আসিয়াছিল, আবার যেন কাঁচিয়া যাইবার উপক্রম করিল। দেনাপাওনা একপ্রকার স্থির হইয়াছিল, আবার তাহা লইয়া তর্কাতর্কি সুরু হইল। কিন্তু করালীকিঙ্কর যেমন পণ করিয়াছিলেন এ-বিবাহ ঘটিতে দিবেনই না, চন্দ্রকান্ত তেমনি বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এই বিবাহ ঘটাইবেনই, কাজেই দুই পক্ষের প্রচণ্ড টানাটানির মধ্যে পড়িয়া, পাত্রের বাড়ির লোকেরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া যাইবার জোগাড় করিল।

কিন্তু তর্কাতর্কি, ঝগড়াঝাঁটির মধ্যেই পূর্ণিমার বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল, নিমন্ত্রণ-পত্রও বিতরণ হইয়া গেল। চন্দ্রকান্ত ভাবিলেন পাত্রপক্ষ এবার আর কথা ঘুরাইতে ভরসা করিবে না। চন্দ্রকান্ত গুহকে অতখানি অপদস্থ করিতে সাহস করিবে, বাংলা দেশে এমন মানুষ আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাসই করিতেন না।

বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। প্রকাণ্ড সাতমহলা বাড়ি লোকজনে গমগম্ করিতেছে। নহবৎখানায় নহবৎ বসিয়াছে তিন-চার দিন আগে হইতে। বরযাত্রীদের আদর-

অভ্যর্থনায় যাহাতে কোন খুঁৎ না থাকে তাহা তদারক করিবার জন্য বৃদ্ধ কর্ত্তা নিজেই আসরে নামিয়াছেন, অন্য কাহারও উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। নানারকম সুখাদ্যের আয়োজন হইয়াছে, স্থানীয় পাচকে সব যদি না পারে, এজন্য নানা স্থান হইতে পাচক ও ময়রা জোগাড় করিয়া আনা হইয়াছে। বিকাল হইতে পূর্ণিমারূপিণী পূর্ণিমা রক্তাম্বরে মাল্যচন্দনে ও রত্নালঙ্কারে সাজিয়া বসিয়া আছে, সখীর দল তাহাকে ঘিরিয়া কলরব করিতেছে। চারি দিকেই উৎসবের আনন্দ ও শোভা, শুধু উমাশশীর মনে আশঙ্কা ও আনন্দ যেন পাশাপাশি রাজত্ব করিতেছে। চার হাত এক হইয়া না-যাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার আর শান্তি নাই।

সন্ধ্যার পরেই প্রথম লগ্ন। এখনও বরপক্ষীয়দের দেখা নাই। সকলেই একটু যেন উদ্বেগ অনুভব করিতে লাগিল। বাড়ি ত তাহাদের বেশী দূরে নয়, সময়মত বাহির হইলে এতক্ষণে আসিয়া পড়ার কথা। কি ব্যাপার কেহ বুঝিতে পারে না। চন্দ্রকান্তের মুখের দিকে তাকাইয়া সবাই ভয়ে ভয়ে এধার-ওধার সরিয়া যাইতে লাগিল, সাহস করিয়া কে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে যাইবে? বর যেন আসিয়া পড়িল বলিয়া, এমন ভাবে তিনি সকলকে কাজ করিতে হুকুম করিয়া যাইতেছেন, তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার কথাও কেহ ভাবিতেছে না।

লগ্ন আসিয়া পড়িল, কাহারও দেখা নাই। সকলের মানা অগ্রাহ্য করিয়া উমাশশী আসিয়া বাপের পায়ের উপর আছাড় খাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "বাবা, আমার খুকীর কি দশা হবে?"

চন্দ্রকান্ত প্রলয়মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কাঁদিস নে, আরও লগ্ন আছে। বর এল ব'লে, তুই ভিতরে যা।"

উমাশশী ভিতরে চলিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত একবার কাছারি-বাড়িতে গিয়া কাহার সহিত কি পরামর্শ করিলেন শোনা গেল না, তাহার পর বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "আলো যেন একটি না নেবে, বাজনা যেন এক মুহূর্ত্ত না থামে, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে বর নিয়ে আসছি।"

উৎসব-ভবন কি এক নিদারুণ অজানা আশঙ্কায় যেন রুদ্ধ-শ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিল। পাঁচ-শ সশস্ত্র ল্যাঠিয়াল, ঘোড়া ও হাতি লইয়া চন্দ্রকান্ত বাহির হইয়া গেলেন। অন্দরমহলে ক্রন্দনের রোল উঠিল, তাহাকে ডুবাইয়া নহবৎ সমানে বাজিতে লাগিল।

কিন্তু এক ঘণ্টা শেষ হইতে না-হইতে বর আসিয়া পড়িল। তুমুল শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে আকাশ যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, প্রচণ্ড শব্দে বোমা পটকা ফুটিয়া পশুপক্ষীকেও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। কান্নাকাটি ভুলিয়া মেয়েরা দলে দলে ছাদে ও জানলার ধারে ছুটিল বর দেখিবার জন্য।

বরের হাতী ঐ যে। চন্দ্রকান্তের গৃহিণী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "ওমা ও কে গো? এ ত আমাদের সুরেন নয়? কর্ত্তা কোথা থেকে এ শুক্‌নো কালো ছোঁড়াকে নিয়ে এলেন?"

পাশ হইতে দাসী আন্না বলিয়া উঠিল, "হায়, হায়, কোথায় যাব মা! এ যে মিত্তিরদের ছোট ছেলে বিমল! কর্ত্তা একে কি ক'রে আনলেন গো গিন্নিমা? এখুনি যে খুনোখুনি বেধে যাবে? হায় হায় আমাদের রাঙা দিদিমণির একি হ'ল মা?"

কিন্তু সকল আর্ত্তনাদ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তরের মধ্যে বিবাহ হইয়া গেল। চন্দ্রকান্ত পূর্ণিমাকে নিজে নামাইয়া লইয়া সভাস্থলে চলিয়া গেলেন। অন্দরমহলে আবার কান্না উঠিল, "ওমা, স্ত্রী-আচার হ'ল না, কিছু না, একি বিয়ে গো মা!"

সম্প্রদান আদি হইয়া গেল। কন্যা জামাতাকে তুলিয়া আনিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "নাও, এবার কত স্ত্রী-আচার করতে পার কর।" বিমলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "নাতজামাই, ডাকাতি ক'রে এনেছি বটে তোমায়, তবে তুমিও আমার ঘরের সব সেরা রত্ন লুটে নিয়ে চললে।"

পাঁচ-শ লাঠিয়াল সারারাত বাড়ি ঘিরিয়া রহিল। প্রতি মুহূর্ত্তে সকলের মনে আশঙ্কা জাগিতে লাগিল এই বুঝি পুত্র-হরণের প্রতিশোধ লইবার জন্য করালমূর্ত্তি করালীকিঙ্করের আবির্ভাব হয়। আসন্ন সংঘর্ষের জন্য সকলে প্রস্তুত হইয়া রহিল। বাসর-ঘরেও সকলে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া, শুধু বিমল এক-একবার চোরা চাহনীতে নবপরিণীতা পত্নীর অপূর্ব্ব সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে।

ভোরের সঙ্গে সঙ্গে করালীকিঙ্করও দলবল লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাঁকিয়া বলিলেন, "বের কর আমার ছেলে, নইলে একটিরও ঘাড়ে মাথা থাকবে না।"

চন্দ্রকান্তের লাঠিয়ালরা কাহার যেন আদেশে দুই ফাঁক হইয়া পথ করিয়া দিল। বিমল ও তাহার বধূ, ধীর পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

করালীকিঙ্কর মুগ্ধ বিস্ময়ে পূর্ণিমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বধূও অশ্রুসজল বিস্ফারিত নেত্রে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

খানিক পরে করালীই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "যাক্‌, খুব চাল চাললেন গুহ-মশায়। কিন্তু জিতেছি ত আমিই। এস মা, তোমার নূতন ছেলের বাড়ি যেতে হবে যে?"

বর ও বধূ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। উভয় পক্ষের লাঠিয়ালের দল তুমুল জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। উমাশশী সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্ণিমার হাত বিমলের হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিল, "মা লক্ষ্মী, আশীর্ব্বাদ করি ঐ ঘর তোর চিরদিনের ঘর হোক। সব অশান্তি চিরদিনের মত তোদের মিলনে যেন দূর হয়ে যায়।"

মাহুতের আজ্ঞায় করালীর হাতী অগ্রসর হইয়া আসিয়া বসিয়া পড়িল। বরকনেকে তুলিয়া লইয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মাঙ্গলিক হুলু ও শঙ্খ ধ্বনির ভিতর দিয়া ফিরিবার পথে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। উমাশশী অশ্রুঅন্ধ চোখে যাত্রাপথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী এস্‌, এ, হুসেন ইক্‌বাল-উন্‌-নিসা বেগম মহীশূর সরকারের শিক্ষা-বিভাগে নিযুক্ত আছেন। তিনি সম্প্রতি বিলাতে লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষাবিষয়ক উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি স্যুইট্‌সারল্যাণ্ডে অন্তর্জ্জাতিক বালিকা-গাইড-সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী এস্‌, এ, হুসেন

পৃথিবীর বৃহত্তম জন্তু

শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু, বি-এ

পৃথিবীর বৃহত্তম জীবের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে অনেকেই হয়ত হস্তীর বিষয় চিন্তা করিবেন, কিন্তু হস্তীর অপেক্ষাও বৃহদাকার প্রাণী যে পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে তাহা বোধ হয় অনেকেই প্রথম চিন্তায় ধারণা করিতে পারিবেন না। এই বৃহত্তম জীবের পূর্ব্বপুরুষেরা স্থলচর হইলেও ইহারা এক্ষণে মহাসমুদ্রে আশ্রয় লইয়া পৃথিবীর সর্ব্ববিধ জীবজন্তুর মধ্যে আকার-আয়তনে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর এই বৃহত্তম জীবের সাধারণ নাম তিমি এবং বৈজ্ঞানিক নাম সিটেসিয়া (Cetacea)। দেহের বিপুলতায় স্থলচর জলচর সর্ব্ববিধ প্রাণীকে অতিক্রম করিয়া ইহারা মহাজলধির কুক্ষিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

তিমি ও সীলকে সাধারণতঃ মৎস্য বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বাদুড়কে পক্ষী বলিলে যেরূপ ভ্রম হয় তিমি ও সীলকে মৎস্য বলিলেও তদ্রূপ ভ্রমে পড়িতে হয়। জলে অবস্থান করিলেও তিমিরা আদৌ মৎস্য-জাতীয় নহে। চতুষ্পদ জীবের সহিত ইহাদের বাহ্যিক কোন সাদৃশ্য না থাকিলেও দেহের আভ্যন্তরিক গঠনে অনেক বিষয়ে উহাদের সহিত তিমির মিল আছে। তিমির ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড, প্লীহা, যকৃত, পাকস্থলী, অন্ত্র, মূত্রনালী এবং জননেন্দ্রিয় চতুষ্পদ প্রাণীদের অনুরূপ। চতুষ্পদ প্রাণীদিগের মত ইহারা ফুসফুসের দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস-কার্য্য সম্পন্ন করে। চতুষ্পদ জীবের মতই ইহাদের হৃৎপিণ্ড চারিটি কোষে বিভক্ত। এই হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া ইহাদের বিপুল কলেবরে উষ্ণ শোণিত ধারা প্রবাহিত হয়। ইহাদের 'পাখ্‌না,' পাঁজর, মস্তক প্রভৃতির অস্থির সহিত চতুষ্পদের কঙ্কালের সাদৃশ্য আছে। ইহাদের দেহের দুই পার্শ্বের পাখ্‌নার অস্থিগুলি লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, উহা মৎস্যের সাধারণ পাখ্‌নার মত নহে। এই পাখ্‌নার কঙ্কাল দেখিতে আমাদের হস্তের কঙ্কালেরই মত। ইহার মধ্যে স্কন্ধাস্থি, ঊর্দ্ধ ও নিম্ন বাহুর অস্থি, এবং পঞ্চাঙ্গুলির অস্থিসকল স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। পাখ্‌না দুইটিকে ইহারা হস্তের মতই ব্যবহার করে। স্তন্যপান করাইবার সময় স্ত্রী-তিমিরা শাবককে পাখ্‌নার দ্বারা টানিয়া লয় এবং ভীত বা তাড়িত হইলে ইহা দ্বারা শাবককে ধরিয়া পলায়ন করে। চতুষ্পদদিগের মতই তিমিরা শাবক প্রসব করে এবং উহাকে এক বৎসরকাল স্তন্যপান করাইয়া থাকে। এই সকল কারণে মনে হয় তিমিদের পূর্ব্বপুরুষেরা স্থলচর জীব ছিল এবং সেকালের অতিকায় গোধা, অতিকায় সরীসৃপ এবং অতিকায় চতুষ্পদদিগের মত পৃথিবীর শৈশবে মেদিনী বিকম্পিত করিয়া বিচরণ করিত। যে আদিম মানবের অত্যাচারে ম্যামথ বা অতিকায় হস্তী প্রভৃতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে সেই অসভ্য মৃগয়াজীব আমমাংসভোজী মনুষ্যের তাড়নাতেই বোধ হয় সে-যুগের তিমিরা সাগরগর্ভে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। শেষে যুগযুগান্তরের ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে তাহাদের পূর্ব্বাকৃতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া জলে বাসোপযোগী হইবার নিমিত্ত মৎস্যের মত হইয়া গিয়াছে এবং হস্ত দুইটি পাখ্‌নায় ও দেহের শেষাংশ মৎস্যপুচ্ছের মত রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে।

জলে আসিয়া বাস করার নিমিত্ত তিমির দেহের আকার-পরিবর্ত্তনের সহিত উহাদের অস্থিসমূহের গঠনও বিভিন্নরূপ হইয়াছে। ৬০ ফুট দীর্ঘ তিমির ওজন প্রায় ১,৯০০ মণ বলিয়া অনুমান করা যায়। গ্রীনল্যাণ্ড-তিমিদের ওজন প্রায়ই এক শত টন বা প্রায় ২,৭৫০ মণ হইতে দেখা যায়। হস্তীর সহিত তুলনা করিলে এই প্রকার একটি তিমিকে প্রায় ৮৮টি হস্তী অথবা ৪৪০টি বৃহৎ ভল্লুকের সহিত ওজনে সমান হইতে দেখা যায়। ইহাপেক্ষা বৃহৎ তিমির ওজন যে কিরূপ তাহা অনুমানসাপেক্ষ। এই প্রকার বিপুল দেহের অস্থিগুলি হস্তিকঙ্কালের মত নিরেট হইলে তিমিকে জলে আর সন্তরণ দিতে হইত না। এই বিপুল দেহকে সমুদ্রের জলের মধ্যে ভাসমান রাখিবার

নিমিত্ত ইহাদের দেহের অস্থিগুলি ছিদ্রময় এবং চর্ম্মের নিম্নে খুব পুরু বসার উৎপত্তি হইয়াছে। সুপারি বা নারিকেল গাছ কাটিলে গাছের গুঁড়িকে যেমন সছিদ্র দেখায় তিমির অস্থিগুলিও সেইরূপ ছিদ্রময়। এই

স্পার্ম বা তৈলতিমি

ছিদ্রগুলি আবার তৈলে পূর্ণ থাকে। কলিকাতার যাদুঘরে তিমির যে-সকল কঙ্কাল রক্ষিত হইয়াছে সে-গুলি লক্ষ্য করিলেই ইহাদের অস্থির গঠন উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

জলে আসিয়া বাস করার ফলে অস্থির গঠন-পরিবর্ত্তনের সহিত যে বসার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এক ইঞ্চি পুরু চর্ম্মের নিম্নে প্রায় ১০ হইতে ১৫ ইঞ্চি পুরু বসা ইহাদের সমস্ত দেহটিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। কর্ক যেমন বৃক্ষের কাণ্ডকে চারি দিকে আবৃত করিয়া শীতাতপের আধিক্য হইতে গাছকে রক্ষা করে তিমির পুরু বসাও সেইরূপ ইহাদিগকে সহজে ভাসমান থাকিবার উপযোগী করিয়া জলের শৈত্য হইতে ইহাদের অঙ্গতাপ রক্ষা করে। তিমি ব্যতীত সীল এবং সিন্ধুঘোটকদের দেহে এই উদ্দেশ্যে পুরু বসার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্রাণিতত্ত্ববিদেরা তিমিকে সাতটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। তিমিদের মধ্যে কতকগুলির দন্ত থাকিতে এবং কতকগুলিকে দন্তহীন হইতে দেখা যায়। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে বিষুবমণ্ডলের অন্তর্বর্ত্তী সমুদ্র-সমূহের 'স্পার্ম হোয়েল' বা তৈলতিমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিমিরা আকারে সাধারণতঃ ৫৫ ফুট হইতে ৬০ ফুট অবধি দীর্ঘ এবং প্রায় ১৬ ফুট উচ্চ। ৭৬ ফুট দীর্ঘ তৈলতিমি ধৃত হইবার কথাও শুনা গিয়াছে। স্ত্রী-তৈল-তিমিরা কিন্তু এরূপ বৃহৎ হয় না। খুব বৃহৎ হইলেও স্ত্রী-তৈলতিমিকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুটের অধিক দীর্ঘ হইতে দেখা যায় না। এই তিমিদের কেবল মাত্র নিম্ন চোয়ালের মাড়িতে দন্তের শ্রেণী থাকিতে দেখা যায়। উপর চোয়ালে দন্ত থাকে না। নিম্ন-চোয়ালে দন্ত বসিবার নিমিত্ত উপরকার চোয়ালে অনেকগুলি গহ্বর থাকিতে দেখা যায়। বৃহৎ তৈলতিমির এক একটি দন্ত ওজনে প্রায় এক সের হইতে দুই সের অবধি হইয়া থাকে।

তৈলতিমি ব্যতীত উত্তর-হিমকোটি-মণ্ডলের সমুদ্র-বাসী নার্ব্বালদিগেরও উপর-চোয়াল হইতে অদ্ভুত আকারের একটি পাকান দন্ত দেহের সহিত সমান্তরালে বাহির হইয়া থাকে। নার্ব্বালেরা মাত্র বিশ-পঁচিশ ফুট দীর্ঘ হইলেও ইহাদের দন্ত ৯ হইতে ১৪ ফুট অবধি দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই দন্ত ফাঁপা এবং দেখিতে গোলাকার সূক্ষ্মাগ্র দন্তের মত। ইহার বর্ণ হস্তিদন্তের মত শুভ্র এবং অগ্রভাগ সূচের মত তীক্ষ্ণ। এইরূপ আকারের নিমিত্ত

গ্রীনলাণ্ডের বৃহৎ তিমি

ইহাকে নার্ব্বালের দন্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা উহাদের উপর-চোয়ালের রূপান্তরিত ছেদনদন্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সাধারণতঃ নার্ব্বালদের একটিমাত্র দন্ত থাকিলেও

দুই দন্তযুক্ত নার্ব্বালেরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীরই উপর-চোয়াল হইতে এই প্রকার দন্ত বাহির হইয়া থাকে। কখন কখন এই দন্ত পাকান-ভাবের না হইয়া বেশ মসৃণ হইয়া থাকে। আবার অনেক সময় এই দন্তকে ঈষৎ বক্রাকারেও বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। বর্ণ এবং গঠনে গজদন্তের মত হইলেও বস্তুহিসাবে ইহা গজদন্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ। গজদন্ত যেরূপ কালক্রমে হরিদ্রাভ হইয়া যায়, নার্ব্বালের দন্ত সেরূপ হয় না। পূর্ব্বে এই দন্ত মূল্যবান সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইত। এই দন্ত নার্ব্বালের আকৃতিকে ভীতিপ্রদ করিয়া দিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহারা অতি নিরীহ প্রাণী। দন্ত দ্বারা শত্রু আক্রমণ করিতে বা আত্মরক্ষায় এই দন্ত ব্যবহার করিতে ইহাদিগকে বড় দেখা যায় না। কি উদ্দেশ্যে যে ইহাদের মুখে এই সুদীর্ঘ দন্তের উদ্ভব হইয়াছে তাহা এখনও বিশেষ বুঝিতে পারা যায় নাই। সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থায় ইহাদের ক্রীড়া-কৌতুক লক্ষ্য করিলে এই দন্তকে ইহাদের পক্ষে নিগ্রহ-স্বরূপ বলিয়াই গণনা করা যাইতে পারে।

তিমি-জাতীয় ক্রীড়াশীল ডলফিন

দন্তের সংরক্ষণে ইহাদের বিশেষ যত্ন দেখা যায় না। এই দন্তকে প্রায়ই সমুদ্র-শৈবালে জড়িত ও অপরিষ্কৃত অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। গ্রীনলাণ্ডের বৃহৎ তিমিরা প্রায়ই ইহাদের অনুসরণ করিয়া থাকে। এই কারণে সে-দেশের লোকেরা নার্ব্বালকে তিমির অগ্রদূত বলিয়া থাকে। ডেভিস্-প্রণালী ও ডিস্কো-উপসাগরে বহু নার্ব্বাল দেখিতে পাওয়া যায়।

দন্তহীন তিমির মধ্যে গ্রীনলাণ্ডের বৃহৎ তিমি এবং নীল তিমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রীনলাণ্ডের তিমির দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ হইতে ৭০ ফুট। তিমি বলিতে সাধারণতঃ গ্রীনলাণ্ডের তিমিকেই বুঝাইয়া থাকে।
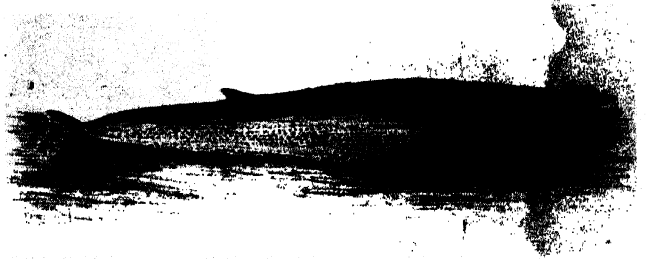
ররকোয়াল বা নীল তিমি
মূকবধির শ্রীমণীন্দ্রনাথ পাল কর্ত্তৃক অঙ্কিত

ইহাদের মুখে দন্তের পরিবর্ত্তে পঞ্জরাস্থির মত অনেকগুলি লম্বা লম্বা হাড় থাকিতে দেখা যায়। এই হাড়গুলি উপরকার চোয়াল হইতে চিরুনীর দাঁতের মত নীচের চোয়ালে নামিয়া আসে। এই হাড়গুলিকে ইংরেজীতে 'হোয়েল্ বোন' বলে। পূর্ণবয়স্ক তিমির মুখে হোয়েল্ বোনের সংখ্যা প্রায় ৫০০। ঝাঁজ্‌রির শিকের মত এই হাড়গুলি ১/৪ ইঞ্চি অন্তরাল করিয়া সাজান থাকে। ইহাদের মধ্যে মাঝের হাড়গুলিকে দীর্ঘাকার এবং দুই পার্শ্বের হাড়গুলিকে ক্ষুদ্র হইতে দেখা যায়। হোয়েল বোনের এই সকল হাড়ের মাঝে মাঝে আবার ঘন পুরু রোমাবলীর উৎপত্তি হইয়া ইহাকে একটি প্রকাণ্ড চাঁকনির মত করিয়া দিয়াছে দন্ত না থাকায় এই তিমিরা হোয়েল বোনের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক শম্বুকাদি ধরিয়া আহার করে। গ্রীনলাণ্ডের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্র এবং স্পীট্‌সবার্জ্জন দ্বীপের জনহীন তুষার-সমুদ্রই ইহাদের প্রিয় বাসস্থান। পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধের ৭৪ এবং ৮০ ডিগ্রির মধ্যে ইহাদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। উষ্ণ সমুদ্র স্রোতের তাপে এই স্থানে অত্যধিক মাত্রায় ক্ষুদ্র সামুদ্রিক শম্বুকাদির

উদ্ভব হয় বলিয়া এই স্থানেই ইহাদিগকে বহুসংখ্যায় দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতে দেখা যায়। উত্তর-আমেরিকার নদীগুলির মুখেও বহু তিমি দেখিতে পাওয়া যায়।

সমুদ্রের উপর এক জাতীয় পক্ষযুক্ত ক্ষুদ্র পতঙ্গকে

ভোঁতামুখো তৈলতিমি

ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহাদের বর্ণ কালো এবং আকার সীমবীজের মত ক্ষুদ্র। সমুদ্রের উপরিভাগে ইহারা পুঞ্জীভূত ভাবে অবস্থান করে। লিনিয়স এই পোকার নাম দিয়াছিলেন 'মেডুসা'। পক্ষদ্বারা মেডুসারা উড়িতে পারে না। এই পক্ষ ইহাদিগকে সন্তরণে সহায়তা করিয়া থাকে। তিমিরা, বিশেষতঃ গ্রীনলাণ্ডের তিমিরা, পুঞ্জীভূত অবস্থায় ভাসমান এই মেডুসাকে ধরিয়া আহার করে। ইহাদের চোয়ালে প্রায় সকল সময়েই এই পোকাকে সংলগ্ন থাকিতে দেখা যায়। এই পোকা এবং পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র সামুদ্রিক শম্বুকাদিই ইহাদের প্রধান আহার। ইহাদের পাকস্থলী বিদীর্ণ করিলে তন্মধ্যে সর্ব্বদাই ননী বা মলমের মত এক প্রকার মেদবৎ পদার্থ থাকিতে দেখা যায়। নার্ব্বালরাও গ্রীনলাণ্ডের তিমির মত সমুদ্রের পোকামাকড় খাইয়া জীবনধারণ করে।

তৈলতিমি বা স্পার্ম হোয়েলরা কিন্তু এরূপ পোকা ভক্ষণ করে না। ইহাদের জিহ্বার আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও ইহাদের গলনলী বিশেষ প্রশস্ত। এই গলনলীর আকার এরূপ বৃহৎ যে ইহারা অনায়াসে একটি বৃহৎ বৃষকে গলাধঃকরণ করিতে পারে। ইহারা বহু পরিমাণে নানা জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য ও কটল্-ফিশ্ ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের পাকস্থলী বিদীর্ণ করিলে তন্মধ্যে সর্ব্বদা সদ্যোগলাধঃকৃত বা অর্দ্ধজীর্ণ ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু মৎস্য ও কটল্-ফিশ্ থাকিতে দেখা যায়। ইহাদের পাকস্থলীর মধ্যে অনেক সময়েই আট-নয় ফুট লম্বা মৎস্য থাকিতে দেখা গিয়াছে। মৎস্য ব্যতীত শুশুক ও ডলফিনকেও ইহারা খাদ্যবোধে অনেক সময় তাড়া করিয়া থাকে। ইহাদের গলনলীর আকার ও মৎস্যাহারের পরিমাণ হিসাব করিলে ইহাদিগকে সমুদ্রের রাক্ষস না বলিয়া থাকা যায় না। আক্রান্ত হইলে বা মৃত্যুর পরেই ইহারা কটল্-ফিশ প্রভৃতিকে পাকস্থলী হইতে উদ্গীর্ণ করিয়া থাকে। কাৎ অথবা চিৎ হইয়া ইহারা শিকার ধরিয়া থাকে। ক্রুদ্ধ হইলে ইহারা নৌকা প্রভৃতি দংশন করিয়া চূর্ণ করিয়া দেয়।

দন্তহীন তিমির প্রসঙ্গে যে নীল তিমির উল্লেখ করিয়াছি তাহার ইংরেজী নাম Rorqual, তিমিদের মধ্যে ইহারা আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহারা আকারে

নার্ব্বাল বা খড়্গদন্তী তিমি

৮০।৮৫ ফুট হইতে ১০০ ফুট অবধি দীর্ঘ হইয়া থাকে। সিবল্ডস্ ররকোয়াল (Sibbald's rorqual) বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর বৃহত্তম জীব বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। আফ্রিকার ১১ ফুট উচ্চ বৃহত্তম হস্তীর সহিত এই তিমির তুলনা করিলে গজরাজকে একটি ক্রীড়নক বলিয়া বোধ হইবে। নীল তিমিরা তৈলতিমি এবং গ্রীনলাণ্ডের তিমির মত স্থূলকায় না হইয়া অপেক্ষাকৃত সরু ও লম্বাকার হইয়া থাকে।

উত্তর-য়্যাটলাণ্টিক মহাসমুদ্র ইহাদিগের প্রধান বাসস্থান। বঙ্গোপসাগরেও নীল তিমির মত এবং উহাদের নিকট-গোত্রীয় এক জাতীয় তিমি বাস করে। কলিকাতার যাদুঘরে নীল তিমির একটি বৃহৎ মস্তকাস্থি রক্ষিত

হইয়াছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সন্দ্বীপের তটে একটি ছোট 'ররকোয়াল' আসিয়া পড়িয়াছিল। বঙ্গোপসাগরে গ্রীনলাণ্ডের তিমির মত দন্তহীন তিমিও বাস করে। ইহার নাম 'বেলিন' তিমি। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে আরাকান প্রদেশের নিকটবর্ত্তী আমহার্ষ্ট দ্বীপে ৮৪ ফুট দীর্ঘ একটি 'বেলিন' তিমির মৃতদেহ আসিয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতার যাদুঘরে ঐ তিমির নিম্ন-চোয়ালের অস্থি দুইখানি একটি দ্বারের দুই পার্শ্বে রক্ষিত হইয়াছে। অস্থি দুইখানির আকার দেখিলেই ঐ তিমির বিশাল কলেবরের বিষয় কিঞ্চিৎ অনুমান করা যাইতে পারে। এখানকার যাদুঘরে ক্ষুদ্র 'বেলিন' তিমির একটি সম্পূর্ণ কঙ্কালও রক্ষিত হইয়াছে। এই তিমিটি ব্রহ্মদেশের থেবুচং নামক স্থানে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহার হস্তাঙ্গুলির সংখ্যা চারিটি। আরব-সমুদ্র, মালাবার এবং সিংহলের উপকূলেও 'বেলিন' তিমিকে দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের কোলাবা-পয়েণ্টের তটে একটি পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ বেলিন তিমির মৃতদেহ আসিয়া পড়িয়াছিল। মস্তক ব্যতীত তিমির দেহের অবশিষ্ট অংশ সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত ছিল। দুই-তিন দিন এই ভাবে জলের মধ্যে পড়িয়া থাকায় উহার পুচ্ছের অধিকাংশ অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিমিটি মুখ ব্যাদান করিয়া পৃষ্ঠোপরি শয়ান থাকায় উহার বৃহৎ মুখগহ্বরের আয়তনাদির কতক পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইহার মুখগহ্বর এরূপ বৃহৎ ছিল যে, তাহার মধ্যে ছয় জন মানুষ অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিত। কিছুকাল পূর্ব্বে সিন্ধুদেশের উপকূলে আর একটি তিমির মৃতদেহ ভাসিয়া আসিয়াছিল। উহার মস্তক প্রায় ১৭ ফুট ৮ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ ছিল। তিমিটির মস্তকের অস্থিখানি করাচী শহরের যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

নীল তিমি নাম হইলেও ইহাদের বর্ণ আদৌ নীল নহে। সাধারণ তিমিদের মত ইহাদের পৃষ্ঠের বর্ণ কালো এবং উদরের বর্ণ শ্বেত। বিশেষত্বের মধ্যে ইহাদের চোয়ালের নিম্নভাগ হইতে উদরের মাঝামাঝি কতকগুলি ঘোর লাল বর্ণের 'ডোরা' অঙ্কিত থাকিতে দেখা যায়। গ্রীনলাণ্ডের তিমির মত ক্ষুদ্র শম্বুকাদি ভক্ষণ না করিয়া নীল তিমিরা হেরিং, ম্যাকেরেল প্রভৃতি সামুদ্রিক মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করে।

করাত মাছ—তিমির শত্রু

উত্তর-সমুদ্রে আর এক জাতীয় শ্বেত বর্ণের ক্ষুদ্র তিমি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আর একটি নাম 'বেলুগা'। ইহারা বারো হইতে ষোল ফুট অবধি দীর্ঘ হইয়া থাকে। গ্রীনলাণ্ডের চারি ধারে, সেণ্ট-লরেন্স উপসাগর ও সেণ্ট-লরেন্স নদীতে ইহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতে দেখা যায়।

তিমিরা এরূপ প্রকাণ্ড প্রাণী হইলেও তিন-চারি ফুট দীর্ঘ শুশুকও তিমির গোষ্ঠীভূত জীব। নীল তিমি ব্যতীত অপর তিমিদের মস্তক উহাদের দেহের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। তৈলতিমির মস্তক অনেক সময় উহাদের দেহের প্রায় অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়া থাকে। এইরূপ প্রকাণ্ড মস্তকে মস্তিষ্কের আকারও খুব বৃহৎ হইয়া থাকে। ইহাদের মস্তিষ্ক দেখিতে গোলাকার ও তাহার উপর অনেক খাঁজকাটা থাকিতে দেখা যায়। এইরূপ প্রকাণ্ড মস্তকে মুখগহ্বরটিও অত্যন্ত বিশাল। মুখগহ্বর এরূপ বৃহৎ হইলেও তৈলতিমি ব্যতীত অপর তিমির গলনলী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। বৃহৎ গ্রীনলাণ্ড-তিমির গলনলী এরূপ ক্ষুদ্র যে, তাহার মধ্যে ছেলেদের বাহুও প্রবেশ করান যায় না। এই কারণে ইহারা সমুদ্রের ক্ষুদ্র গেঁড়ী গুগলী, শামুক, 'কটল ফিশ', 'স্কেট মাছ', ক্ষুদ্র চিংড়ী এবং পোকামাকড় ব্যতীত আর কিছুই ভক্ষণ করিতে পারে না।

তিমির মুখগহ্বর যেরূপ বৃহৎ ইহার জিহ্বাও সেইরূপ প্রকাণ্ড। এই জিহ্বা সাধারণতঃ আঠার ফুট দীর্ঘ ও দশ ফুট প্রশস্ত হইয়া থাকে। ইহাদের জিহ্বা নিম্ন-চোয়ালের

সঙ্কিত এরূপ ভাবে সংযুক্ত থাকে যে, তিমিরা ইহাকে প্রায় সঞ্চালন করিতে পারে না। ইহাকে জিহ্বা না বলিয়া একটি প্রকাণ্ড পুরু চর্ব্বির গদি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই জিহ্বা হইতে বহু পরিমাণ চর্ব্বি পাওয়া

শ্বেত ভল্লুক—তিমির শত্রু

যায়। ইহাদের মুখের মধ্যে লালানিঃসারক গ্রন্থি নাই বলিলেই হয়।

তিমিদের চক্ষু উহাদের দেহের অনুপাতে এরূপ ক্ষুদ্র যে, তাহা লক্ষ্য করাই যায় না। ইহাদের চক্ষু বৃষচক্ষু অপেক্ষা বৃহৎ নহে। ৭৬ ফুট দীর্ঘ এবং ৩৮ ফুট উচ্চ তিমির মস্তকে এই প্রকার চক্ষু থাকিলে তাহা সহজে দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভবপর নহে। মৃত্যুর পর এই চক্ষু শুকাইয়া মটরের আকার ধারণ করে। চতুষ্পদদিগের মত তিমির চক্ষুতে 'পাতা' থাকে এবং সেই পাতা হইতে অক্ষিপক্ষ্ম বাহির হয়। ইহাদের চক্ষু দুইটি মস্তকের পিছনে এমন স্থানে উদ্গত হয় যে, সম্মুখ পশ্চাৎ এবং ঊর্দ্ধ দিকের দর্শনে কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। ইহাদের দৃষ্টিশক্তিও নিতান্ত মন্দ নহে।

ইহাদের শ্রবণশক্তি বিশেষ তীক্ষ্ণ। বহুদূরের সামান্ত শব্দও ইহারা আশ্চর্য্যরূপে অনুভব করিতে পারে। মস্তকের উপর ইহাদের কর্ণের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। বাহিরের চর্ম্মাবরণ তুলিয়া ফেলিলে চক্ষের পিছনে কালো দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দাগের নিম্নেই ইহাদের শ্রবণরন্ধ্র বর্ত্তমান থাকে। প্রখর শ্রবণশক্তির নিমিত্ত ইহাদের নিকট অগ্রসর হওয়া সকল সময় সম্ভবপর হয় না। ইহারা যখন সমুদ্রের উপর লাফাইয়া ক্রীড়া করে বা নাসারন্ধ্র দিয়া বেগে মুখমধ্যস্থ জলকে উৎসাকারে বাহির করিয়া দেয় শিকারীরা তখনই সন্তর্পণে ইহাদের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকে।

ইহাদের নাসারন্ধ্র মস্তিষ্কের পুরোভাগে অবস্থিত। অধিকাংশ তিমির মস্তকের উপরে একটি মাত্র নাসারন্ধ্র থাকিতে দেখা যায়। এই রন্ধ্রটি ভিতরে দুই ভাগে বিভক্ত। গ্রীনলাণ্ড-তিমির মস্তকের দুই পার্শ্বে দুইটি নাসারন্ধ্র আছে। ইহাদের নাসিকার রন্ধ্রগুলির আকার গোলাকার নহে। বেহালার খোলের উপরকার গর্ত্তটির আকার যেরূপ বক্রভাবের ইহাদের নাসারন্ধ্রের আকৃতিও কতকটা সেইরূপ। শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যতীত এই রন্ধ্রদ্বারা ইহারা মুখমধ্যস্থ জলকে বেগে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বাহির করিয়া দেয়। জলে নিমজ্জিত হইবার সময় ইহারা নাসারন্ধ্রকে একটি মাংসপেশী দ্বারা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারে।

তিমিরা সাধারণতঃ দুই-তিন মিনিট অন্তর শ্বাস-গ্রহণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে ক্ষণে ক্ষণে জলের উপর

তলোয়ার মাছ—তিমির শত্রু

ভাসিয়া উঠে। ভীত বা তাড়িত হইলে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অবধি ইহারা সিন্ধুগর্ভে ডুবিয়া থাকিতে পারে। প্রশ্বাস-ত্যাগকালে ফুস্‌ফুসের উষ্ণ বায়ুরাশিকেও ইহারা ছয় হইতে আট ফুট ঊর্দ্ধে বাষ্পাকারে ফোয়ারার মত বাহির করিয়া দেয়। নাসাপথে ইহাদের জলোৎক্ষেপণের শব্দ দুই-তিন মাইল দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। আহত তিমির ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও ঝড়ের মত বহুদূর হইতে শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে।

ইহাদের তিনটির অধিক 'পাখ্‌না' থাকে না। এই পাখ্‌না যে বাস্তবিকপক্ষে ইহাদের হস্ত তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। দেহের দুই পার্শ্বে দুইটি এবং

পৃষ্ঠের উপর মাত্র একটি করিয়া ইহাদের পাখ্না থাকে। পার্শ্বের পাখ্না দুইটি প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই পাখ্নার সাহায্যেই ইহারা ইচ্ছামত বামে বা দক্ষিণে ফিরিয়া থাকে। কোন কোন তিমির পৃষ্ঠের উপরকার পাখ্নাটি থাকে না। তৈলতিমির পার্শ্বের পাখ্না ত্রিকোণাকার। দেহের তুলনায় ইহাদের পাখ্না দুইটি অতি ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

ইহাদের চর্ম্ম অত্যন্ত মসৃণ। পৃষ্ঠের উপরিভাগের চর্ম্মের বর্ণ কৃষ্ণ এবং উদরের চর্ম্মের বর্ণ শ্বেত হইয়া থাকে। চর্ম্মের উপর আবার কখন কখন শ্বেত ও হরিদ্রা বর্ণের বহু দাগ থাকিতে দেখা যায়। পুচ্ছ ও পাখ্নার উপরেই এই বর্ণচিত্রণ বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। এই চিত্রণের মধ্যে কখন কখন ঘরবাড়ি ও গাছপালার মত অঙ্কিত থাকিতে দেখা যায়। একবার এক জন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ একটি তিমির পুচ্ছের উপর ইংরেজী সংখ্যায় ১২২-এর মত চিত্রাঙ্কন থাকিতে দেখিয়াছিলেন।

তিমিদের দেহের উপরকার চর্ম্ম তুলট কাগজের মত পুরু। এই চর্ম্মের নিম্নে এক ইঞ্চি পুরু আর একটি চর্ম্ম; এই শেষোক্ত চর্ম্মটিই ইহাদের প্রকৃত চর্ম্ম। এই পুরু চর্ম্মের নিম্নেই ইহাদের দেহে দশ-পনের ইঞ্চি স্থূল বসার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই বসা তুষারাবৃত উত্তর-মেরু-সমুদ্রে ইহাদের দেহতাপ রক্ষা করে। এই বসার স্তর তুলিয়া ফেলিলেই ইহাদের মাংস ও মাংসপেশীসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মাংসপেশীগুলি দেখিতে অবিকল চতুষ্পদদিগের মত। তিমির স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে ইহাদের বসা বেশ সুন্দর হরিদ্রা বর্ণের দেখাইয়া থাকে। তৈলতিমির মস্তকে ও গ্রীনলাণ্ড-তিমির দেহে অত্যধিক পরিমাণে বসার উৎপত্তি হইয়া থাকে। বসার নিমিত্তই কেবল মাত্র এই দুই জাতীয় তিমিকে অত্যধিক পরিমাণে শিকার করা হয়। ৬০ ফুট লম্বা একটি তিমির দেহ হইতে অন্যূনাধিক ৮০০ মণ বসা প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটি সুবৃহৎ গ্রীনলাণ্ড-তিমি হইতে প্রায় ৩৭৮০ মণ হইতে ৪৫৯০ মণ অবধি তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৈলতিমির সুবৃহৎ মস্তকটি বসায় পরিপূর্ণ থাকে। এক-একটি তৈলতিমির মস্তক হইতে প্রায় ৫০০ গ্যালন বসা বাহির করা হয়। ইহাদের মস্তকের বসাকে ইংরেজীতে 'স্পার্ম্মাশেটি' (Spermaceti) বলে। বর্ত্তিকা ও গন্ধ-দ্রব্যাদি নির্ম্মাণের জন্যই তৈলতিমির মস্তকের বসা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ভাবে বসায় পরিপূর্ণ না থাকিলে এই
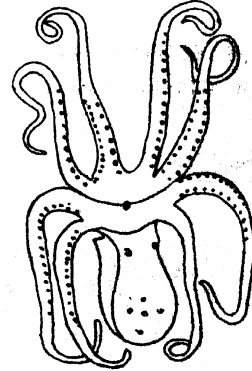
কটল্ ফিশ
তিমির খাদ্য

বৃহৎ মস্তক লইয়া চলাফেরা করা ইহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিত। বসায় পরিপূর্ণ থাকায় ইহাদের মস্তকটি লঘু হইয়া ভাসিবার উপযোগী হইয়াছে।

তৈলতিমির দেহ হইতে য়্যাম্বারগ্রিস্ (ambergris) নামক একপ্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। ইহাদের অন্ত্রমধ্যে পিত্ত পাথরীর মত এই পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা একটি তিন-চারি ফুট লম্বা থলির ভিতর তৈলাপেক্ষা এক প্রকার তরল পদার্থের মধ্যে বলের মত ভাসিতে থাকে। এই বলের বর্ণ হরিদ্রাভ এবং এক-একটি বল ওজনে অর্দ্ধ সের হইতে দশ সের অবধি হইয়া থাকে। থলির মধ্যে চারিটির অধিক 'য়্যাম্বারগ্রিসের' বল থাকিতে দেখা যায় না। এক শ্রেণীর জীবতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, য়্যাম্বারগ্রিস্ পীড়িত তৈলতিমির যকৃতজ পদার্থবিশেষ। সকল তিমির উদরে য়্যাম্বারগ্রিস্ থাকে না। সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ও বয়স্ক তিমিদের উদরেই ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই পদার্থকে তিমিরা মধ্যে মধ্যে দেহ হইতে বিষ্ঠার মত বাহির করিয়া থাকে। ইহার গন্ধ ঈষৎ মিষ্ট ও 'মেটে' ভাবের। য়্যাটলাণ্টিক

মহাসমুদ্রে, ব্রেজিল ও আফ্রিকার উপকূলে, ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের সন্নিকটে ভারত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের তটদেশে এবং চীন ও জাপানের উপকূলে এই পদার্থকে ভাসিতে দেখা যায়। নানাবিধ গন্ধদ্রব্য নির্ম্মাণে ইহার বিশেষ ব্যবহার হইয়া থাকে।

তিমির পুচ্ছ ইহাদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র ও সন্তরণের প্রধান অবলম্বন। ইহাদের পুচ্ছের আকার
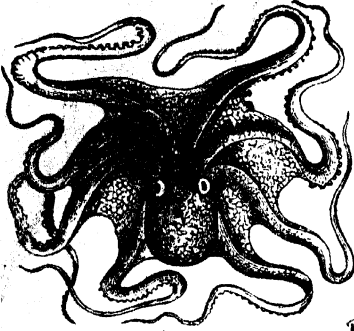
কটল্ ফিশ
তিমির খাদ্য

অনেকটা চিংড়ি মাছের লেজের মত। মৎস্যের পুচ্ছ সাধারণতঃ যেভাবে থাকে তিমির পুচ্ছ ঠিক তাহার বিপরীত ভাবে উদ্গত হইয়া থাকে। জলের উপর ইহাদের লেজ সমান ভাবে পড়িয়া থাকে। মৎস্যেরা যেমন লেজকে বামে ও দক্ষিণে সঞ্চালন করিয়া সন্তরণ দেয় তিমিরা তাহার বিপরীত পদ্ধতিতে পুচ্ছকে ঊর্দ্ধ ও অধঃ ভাবে চালনা করিয়া অগ্রসর হয়। শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহারা পুচ্ছের আঘাতে তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা করে। ইহাদের পুচ্ছের আঘাত এরূপ ভীষণ যে, ইহার এক আঘাতেই বৃহৎ বৃহৎ হাঙ্গর, করাত মাছ, তলোয়ার মাছ প্রভৃতির প্রাণবিয়োগ ঘটিয়া থাকে। এই সকল প্রাণী তিমিকে আক্রমণ করিলে ইহারা পুচ্ছের দ্বারা এরূপ ভাবে আঘাত করিতে থাকে যে, সমুদ্রের উপর সে-আঘাতের শব্দ দুই-তিন মাইল দূরেও বজ্রনির্ঘোষ বা কামানের শব্দের মত প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ইহাদের পুচ্ছ প্রসারে প্রায় ২৪ ফুট অবধি হইয়া থাকে। এই লেজের দ্বারা ইহারা শিকারীদের নৌকা প্রভৃতিও জলমগ্ন করিয়া দেয় এবং ইহার সাহায্যে তিমিরা জলের মধ্য হইতে অনায়াসে ঊর্দ্ধে লাফাইয়া থাকে।

তিমি-জাতি, বিশেষতঃ তৈলতিমিরা, সর্ব্বদা দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহাদের এক-একটি দলে বিশ হইতে পঞ্চাশটি তিমিকে থাকিতে দেখা যায়। স্ত্রী-তিমি এবং তাহাদের শাবকদ্বারাই এই ক্ষুদ্র দল পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। এক-একটি দলে একটিমাত্র পুরুষ-তিমি দলের রক্ষকস্বরূপ অবস্থান করে। এই তিমিটির আকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া থাকে। ভয় বা তাড়না পাইয়া পলায়ন করিবার কালে পুরুষ-তিমিটি দলের একেবারে পশ্চাদ্ভাগে চলিয়া যায় এবং পিছনে থাকিয়া সমস্ত দলটি চালনা করিয়া পলায়ন করে। দলের মধ্যে একটি তিমি আহত হইলে দলের অন্য তিমিরা ভয়ে পলায়ন না করিয়া আহত তিমির চারি দিকে ঘুরিতে থাকে এবং এইরূপে বহু তিমি এককালে সহজেই নিহত হয়। গ্রীনলাণ্ড-তিমিদের

কটল্ ফিশ
তিমির খাদ্য

মধ্যে কিন্তু এইরূপ দল বাঁধিয়া সন্তরণ করার রীতি লক্ষিত হয় না। ইহাদের মধ্যে মাত্র স্ত্রী ও পুরুষ তিমিকে একত্র হইয়া ভ্রমণ করিতে দেখা যায়।

আকারে বড় হইলেও তিমিরা, বিশেষতঃ গ্রীনলাণ্ড-তিমিরা, অত্যন্ত ভীরু। সমুদ্রে 'ডল্ফিন্' নামে

তিমি-জাতীয় এক প্রকার জীব আছে। ইহারা মাত্র ১০ ফুট অবধি দীর্ঘ হইয়া থাকে। গ্রীনলাণ্ডের তিমিরা ইহাদের নিকটে দেখিতে পাইলেই একেবারে ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করে। ১০ ফুট দীর্ঘ ডল্‌ফিনকে দেখিয়া ৬০।৭০ বা ৮০ ফুট দীর্ঘ তিমির পলায়ন অবশ্যই হাস্যকর। স্থলের বৃহত্তম জন্তু হস্তীরা নির্ভয়ে ব্যাঘ্রাদির সম্মুখীন হইলেও সামান্য মূষিক ও শশককে বিশেষ ভয় করে এবং ইহাদের দর্শনে একেবারে অধীর হইয়া পড়ে। এ-বিষয়ে হস্তী-চরিত্রের সহিত তিমি-প্রকৃতির কতক সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিপদের কোনও আশঙ্কা না থাকিলে তিমিরা সমুদ্রের উপর অনেক সময় স্থির ভাবে ভাসিয়া থাকে বা লম্ফ দান করিয়া এবং নাসারন্ধ্র দ্বারা উৎসাকারে ঊর্দ্ধে জলোৎক্ষেপণ করিয়া ক্রীড়াশীলতার পরিচয় দিয়া থাকে। কখন কখন আবার বৃদ্ধকে ঘিরিয়া ছেলেদের লাফালাফি করার মত তিমিকে ঘিরিয়া সীলদের সমুদ্রে লাফালাফি করিতে দেখা যায়।

ইহাদের গতি সাধারণ অবস্থায় ঘণ্টায় চারি মাইলের অধিক নহে। কিন্তু শিকারীর বল্লমে বিদ্ধ হইলে ইহারা এরূপ বিদ্যুৎ-বেগে সমুদ্রগর্ভে নামিতে থাকে যে, সে-সময়ে নৌকার গায়ে বল্লমের দড়ির ঘর্ষণ লাগিয়া নৌকার কাঠে আগুন লাগিয়া যায়। এই কারণে বল্লম বিদ্ধ করিয়াই শিকারীরা বল্লমের দড়ির উপর জল ঢালিতে থাকে। বর্ত্তমানকালে নূতন পদ্ধতিতে তিমি শিকার করা হয়। তিমিরা যখন সমুদ্রের উপর স্থিরভাবে ভাসিয়া থাকে তখন কামানের মুখ হইতে তিমি-শিকারের বর্শাসকল বারুদের সাহায্যে নিক্ষেপ করিয়া ইহাদিগকে নিহত করা হয়।

তিমিদের আচরণে দাম্পত্য প্রেমের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তিমি-দম্পতীর মধ্যে একটিকে আহত করিলে অপরটি আহত তিমির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে না। তাহার সহিত শেষ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রণয়াসক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। পুরুষ-তিমিরা নিজ নিজ শ্রেণীর স্ত্রী-তিমির সঙ্গান্বেষণ করিয়া থাকে। স্বশ্রেণী ব্যতীত ভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রী-তিমির সহিত ইহারা সম্মিলিত হইতে চাহে না। নয়-দশ মাস গর্ভধারণের পর স্ত্রী-তিমি শাবক প্রসব করে। গর্ভধারণকালে, বিশেষতঃ শাবক-প্রসবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, ইহাদিগকে অন্য সময় অপেক্ষা স্থূলতর দেখা যায়। গর্ভের মধ্যে ভ্রূণের বর্ণ প্রথমে সাদা থাকে। প্রসবকালে শাবকের বর্ণ কিন্তু কাল দেখাইয়া থাকে। জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণকে প্রথমে মাত্র ১৭ ইঞ্চি দীর্ঘ দেখা যায়। এই ভ্রূণ জরায়ুর মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়া প্রসবকালে ১০ ফুট দীর্ঘ আকার ধারণ করে। স্ত্রী-তিমি সাধারণতঃ এককালে একটির অধিক শাবক প্রসব করে না। এই শাবকের পালন ও সংরক্ষণে স্ত্রী-তিমি অপত্য-স্নেহের বিশেষ পরিচয় দিয়া থাকে। শাবক আহত হইলে স্ত্রী-তিমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে না। ইহারা সর্ব্বদা শাবককে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করে। শিকারীর দ্বারা তাড়িত হইলে পাখনার মধ্যে শাবককে ধরিয়া পলায়ন করে। শাবক সঙ্গে থাকিলে অন্য সময় অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র ইহারা সমুদ্রের উপর শ্বাস গ্রহণের জন্য উঠিয়া আসে।
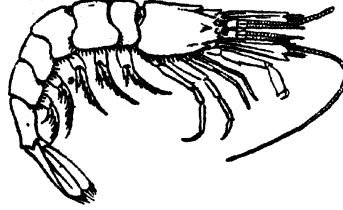
ইহাদের দুইটিমাত্র স্তন থাকে এবং স্তনের আকার গবাদি পশুর মতই হইয়া থাকে। সাধারণতঃ স্তন দুইটি উদরের মধ্যে গুটান থাকে। স্তন্যদানকালে এই স্তনকে ইহারা দেড় ফুট হইতে দুই ফুট অবধি বাহির করিয়া

১। চিংড়ি মাছ
২। শুশুক

১। শম্বুক
২। তিমি উকুন

থাকে। সমুদ্রের উপর কাৎ ভাবে অবস্থান করিয়া ইহারা শাবককে স্তন্যপান করাইয়া থাকে। স্তনে দুগ্ধের পরিমাণও বড় কম থাকে না। গবাদির দুগ্ধের সহিত এই দুগ্ধের অনেক সাদৃশ্য আছে। তিমিশাবক প্রায় এক
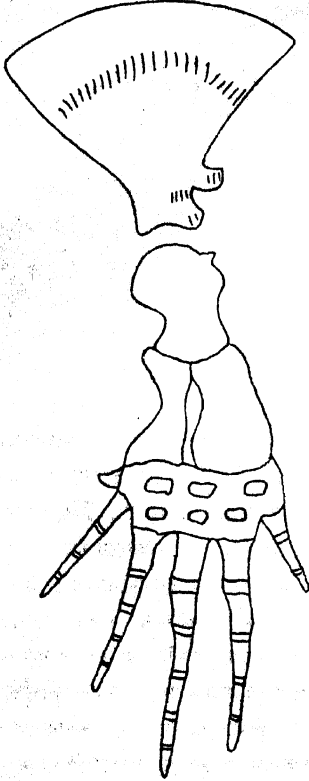
তিমির হস্তাস্থি
নরহস্তাস্থির সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

বৎসর কাল স্তন্যপান করিয়া থাকে। এই সময় সাধারণ চতুষ্পদদিগের শাবকের মত ইহারা বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয় এবং ইহাদের দেহে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মেদ সঞ্চিত হইয়া থাকে। এক-একটি শাবকের দেহ হইতে এই সময়ে প্রায় পঞ্চাশ ব্যারেল বসা পাওয়া যাইতে পারে। অত্যধিক স্তন্যদান করার ফলে স্ত্রী-তিমি কিন্তু অপেক্ষাকৃত কৃশ হইয়া পড়ে। স্তনত্যাগের পর তিমি-শাবকের দেহ আর সেরূপ শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় না।

জীব-জন্তুর শরীরের উকুনের মত তিমিদের দেহে এক প্রকার পরভোজী কীট থাকিতে দেখা যায়। ইহারা তিমির পৃষ্ঠদেশ ও পাখনার নিম্নে সংলগ্ন হইয়া রস রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। এই সকল রসশোষক কীট হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেও তিমিরা ইহাদিগকে কোনও মতে বিদূরিত করিতে পারে না। এক জাতীয় সামুদ্রিক পক্ষী এই সকল কীটকে উদরস্থ করিয়া তিমির প্রভূত কল্যাণ সাধন করে।

জাহাজের খোলে যেমন শামুক ও গেঁড়ী লাগিয়া থাকে তিমিদের দেহেও সেইরূপ এই উকুন ব্যতীত এক জাতীয় পুরুভুজকে সংলগ্ন থাকিতে দেখা যায়। ইহারা এরূপ ভাবে তিমিদের শরীরে লাগিয়া থাকে যে, তিমির নীলাভ বা কৃষ্ণ নীল চর্ম্ম একেবারে ইহাদের শ্বেত বর্ণে আবৃত হইয়া পড়ে। অনেক সময়ে তিমিদের চোয়ালে বিস্তর সামুদ্রিক তৃণাদি সংলগ্ন থাকে। এইরূপ তৃণসংলগ্ন তিমিকে অনেক সময় এক অদ্ভুত শ্মশ্রুল জীব বলিয়া ভ্রম হয়। এরূপ বিশাল আকার এবং এরূপ শক্তিশালী জীব হইলেও তিমিদের শত্রুসংখ্যা বড় কম নহে। সমুদ্রের তলোয়ার মাছ (Sword fish) ইহাদের সর্ব্বপ্রধান শত্রু। তলোয়ার মাছেরা প্রায় ১০ হইতে ১৫ ফুট অবধি দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহাদের মুখের উপর চোয়ালটি তলোয়ারের মত লম্বাকারে বর্দ্ধিত হয় বলিয়াই ইহাদের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহাদের মুখের তলোয়ারটি প্রায় চার-পাঁচ ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে এবং ইহার অগ্রভাগ অত্যন্ত ধারাল। এই তলোয়ারের দ্বারাই ইহারা তিমিকে আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া থাকে। অনেক সময় ইহাদের সম্মিলিত আক্রমণের ফলে তিমির জীবননাশ ঘটিয়া থাকে।

গ্রীনলাণ্ডের তিমিকে উত্তর-আর্টিক্-সমুদ্রের এক জাতীয় হাঙর আক্রমণ করিয়া সংহার করে। এই হাঙরের নাম গ্রীনলাণ্ড শার্ক। ইহারা জীবন্ত তিমির দেহ হইতে মাংসখণ্ড ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করে এবং তাহার ফলে শেষে তিমির প্রাণবিয়োগ ঘটিয়া থাকে।

তলোয়ার মাছের মত সমুদ্রের করাত মাছেরাও তিমির

বিশেষ শত্রু। ইহাদিগকে মাছ না বলিয়া হাঙ্গর বলা উচিত। দৈর্ঘ্যে ইহারা প্রায় ১৫ ফুট অবধি হইয়া থাকে। তলোয়ার মাছের মত ইহাদের উপর চোয়ালটি অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়া করাতের আকার ধারণ করে। কলিকাতার যাদুঘরে করাত মাছ রক্ষিত হইয়াছে। তিমিকে দেখিতে পাইলেই উহার দেহে ইহারা করাত বিদ্ধ করিয়া দেয়। ইহারা এমন বেগে তিমির অঙ্গে করাত বিদ্ধ করে যে, অনেক সময়েই উহাকে আর বাহির করিতে পারে না এবং করাত তিমির শরীরের মধ্যে ভাঙিয়া রহিয়া যায়।

তিমির আর একটি প্রবল শত্রু গ্র্যাম্‌পস্‌ (grampus)। ইহারা তিমি-জাতির অন্তর্ভুক্ত জীব। দৈর্ঘ্যে গ্র্যাম্‌পসেরা প্রায় বিশ-একুশ ফুট হইয়া থাকে। ইহারা হাঙ্গরের মতই হিংস্র। বৃহদাকার তিমিকে দেখিতে পাইলে ইহারা বৃকের মত দলবদ্ধ হইয়া উহাকে আক্রমণ করে। বারংবার আক্রমণের ফলে শেষে তিমির প্রাণবিয়োগ ঘটিলে উহার মেদ-মাংসে ইহারা উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে। তলোয়ার মাছ, করাত মাছ এবং গ্র্যাম্‌পস্‌দের ভয়ে তিমিদের সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়।

মেরুপ্রদেশের শ্বেত ভল্লুককেও তিমির শত্রুমধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। সীল ও ওয়ালরাসের মাংস যেমন ইহাদের প্রিয় আহার, তিমির বসা ও মাংসও তেমনই ইহাদের বিশেষ প্রলোভনের সামগ্রী। সমুদ্রের তীরে তিমি আসিয়া পড়িলে বা সমুদ্রের জল জমিয়া বরফের মধ্যে তিমি ধরা পড়িলে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে।

উত্তরমেরু প্রদেশের ও উত্তর-ইউরোপের শিকারীরা তিমির সর্ব্বপ্রধান শত্রু। তিমির বসা ও মাংস গ্রীনলাণ্ড-বাসী এস্কিমোদের প্রধান খাদ্য। ল্যাপলাণ্ডবাসীরাও জীবন-ধারণের জন্য তিমির মেদ ও মাংসের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। ইহাদের অবিরাম হননের ফলে তিমির সংখ্যা বিশেষ ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে সমুদ্রের যে-সকল অংশে বহু তিমি দৃষ্ট হইত, এক্ষণে সে-সকল স্থানে ইহারা একেবারেই বিরল। সপ্তদশ শতাব্দীতে দিনেমারেরা অসংখ্য তিমি বধ করিয়াছিল। তিমি শিকারের জন্য তাহাদের ২৬৬ খানি জাহাজ ও চৌদ্দ হাজার শিকারী নাবিক এক সময় নিযুক্ত ছিল। তাহার পরে অন্যান্য জাতিরাও বসার লোভে ইহাদের শিকারে প্রবৃত্ত হয়।

সুইডেনের একেবারে দক্ষিণে বল্‌টিক সমুদ্রের উপর ইষ্টাড্‌ নামে একটি বন্দর আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে এই বন্দরের নিকট একটি ষাট ফুট দীর্ঘ তিমির প্রস্তরীভূত দেহ মৃত্তিকামধ্য হইতে বাহির করা হইয়াছিল। উহার দেহ আধুনিক যুগের ঐ আকারের তিমি-দেহের প্রায় সাতাশ গুণ বৃহৎ এবং ভারী।

তিমির সহিত স্থলের বৃহত্তম জীব হস্তীর কতকটা চরিত্রগত সাদৃশ্য আছে। উভয় প্রাণীই বেশ শান্ত ও নিরীহ, কিন্তু ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হইলে উভয়েরই প্রকৃতি অতীব ভীষণ হইয়া উঠে। একটি তৈলতিমি একবার আক্রান্ত হওয়ায় নয়খানি নৌকা দংশন করিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। আক্রান্ত তিমির পুচ্ছাঘাতের দৃশ্য দেখিলে পরম নির্ভীকেরও হৃদয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠে। আবার সাধারণ অবস্থায় এই উভয় জীবই অনেকটা ভীরু-প্রকৃতির। হস্তী ও তিমি উভয়ের দেহ হইতেই মূল্যবান্‌ সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃত হস্তীর মূল্য লক্ষ টাকা হইলে একটি তিমির মূল্য সে-হিসাবে কোটি টাকা ধার্য্য করা যাইতে পারে।

মনের গহনে

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

এ-পাশে শিবের মণ্ডপ। মাঝখানে একটা ডোবা। ও-পাশে নদাই ঘোষের ছোট্ট কুঁড়ে ঘর।

শিবের মণ্ডপ জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ছাদের খানিকটা অংশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। থামগুলা সরু হইয়া আসিয়াছে, গাজনের ঢাক বাজিলে বুড়া মানুষের দাঁতের মত হল্ হল্ করিয়া নড়ে। তথাপি যে ভাঙিয়া পড়ে না, সে নিশ্চয় বাবা ধর্ম্মরাজের মহিমা। প্রতি বৎসর গাজনের সময় মণ্ডপের মাতব্বরেরা মণ্ডপ সংস্কারের জন্য চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা করে। গাজন কাটিয়া যায়, কিন্তু চাঁদা ওঠে না। আবার যে কে সেই। এমনি করিয়া বছরের পর বছর কাটে। মণ্ডপের অবস্থা জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হয়। মণ্ডপের 'দেয়াসীন' ঢাকের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে মাথা কোটে। বাবা ধর্ম্মরাজ অবশেষে তাহার স্কন্ধে ভর্ করেন। 'দেয়াসীন' মণ্ডপের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দেয়। ভক্তেরা ঘন ঘন 'বলো শিবো ধর্ম্মরাজ' বলিয়া চীৎকার করে, কেহবা দেয়াসীনকে বাতাস করে, কেহবা বেতের ছড়িটা দিয়া ভিড় সরায়।

—বাবা, কি অপরাধ হয়েছে বলুন?

দেয়াসীন পাশের গ্রামের চাঁড়ালদের একটি আধা-বয়সী মেয়ে। পরণে রক্তাম্বর। গলায় এবং হাতে অনেকগুলি রুদ্রাক্ষের মালা। মাথায় জটা। কথা কহিলেই ভক্ ভক্ করিয়া মদের গন্ধ বাহির হয়। বাবা সম্বোধন করা হইল তাহাকে নয়, তাহার মাথায় যে দেবতা ভর্ করিয়াছেন তাঁহাকে।

বাবা দেয়াসীনের মুখ দিয়া বলিলেন—আমার ঘরের কি করলি? কতদিন থেকেই তো বলছি। কি করলি? কি করলি? জল হবে ভেবেছিস? হবে না ত। তোদের ধান হবে বলে কি আমি ভিজব নাকি? হবে না তো? আমার ঘরের কি করলি বল্?

বাবা বহুদিন হইতে এমনি ধারা শাসাইয়া আসিতেছেন। গ্রামের ঘোলে আনার বাবার উপর শ্রদ্ধাও অটুট। কিন্তু তথাপি মণ্ডপের সংস্কার আর এই কয়েক বৎসরে কিছুতে হইয়া উঠিতেছে না। তবু এ-পর্য্যন্ত এই অপরাধে বাবার রুদ্ররোষ কাহারও উপর নামে নাই। গ্রামের লোকে বাবার মন্দিরের ধূলা জিহ্বার অগ্রভাগ হইতে ললাট পর্য্যন্ত ভক্তিভরে স্পর্শ করে। বলে,—বাবা আমাদের সদাশিব। নইলে এত অপরাধের বোঝা নিয়ে কোন দিন ভরাডুবি হয়ে যেত। ছেলেপুলে নিয়ে ...

না, বাবার সদাশিবত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। এতগুলি সন্তানের সম্বৎসরের সমস্ত অপরাধের বিষ তিনি নিজের কণ্ঠে তুলিয়া লইয়া গাজনের কয়টা দিন বিনা আপত্তিতে রৌদ্রে পোড়েন এবং বৃষ্টিতে ভেজেন। তাঁহার পক্ষে সুখের কথা এই যে, বেশী দিন এই ভাঙা মণ্ডপে তাঁহাকে বাস করিতে হয় না। বারো মাসই পুরোহিত-গৃহে থাকেন।

মণ্ডপের অবস্থা এইরূপ।

ডোবার অবস্থাও তাহার চেয়ে ভাল নয়। এ-পাড়ার এইটিই খিড়কী বলিলে খিড়কী, সদর বলিলে সদর। বাসনমাজা, হাত-পা ধোওয়া এই জলেই হয়। মুখে দিবার উপায় থাকিলে মুখ ধোওয়াও চলিত। কিন্তু সে উপায় নাই। শুধু এই ঘাটের দিকটা ছাড়া বাকী সাড়ে তিন দিকে দুর্ভেদ্য বাঁশের ঝাড় এমন অন্ধকার করিয়া আছে যে, জলে সূর্য্যালোক পড়িবার কোন প্রকার আশঙ্কা নাই।

এ-কথা শুনিয়া শহরের লোকে নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সমস্ত ব্যাপার ত তাঁহারা জানেন না। পাড়াগাঁয়ে বাঁশ নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু। ঘর ছাওয়া, খুঁটি তৈরি করা আছেই। বাঁশের পাতা জলে পড়িয়া জল নষ্ট করে এ-তথ্য তাহাদের নিজেদেরও অবিদিত নয়। কিন্তু উপায় কি? প্রতিবেশীরা কেহই

ভাল লোক নয়। চোখের সুমুখ হইতেই বাঁশ চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছে; দূরে চোখের আড়াল হইলে কি আর ঝাড়ের চিহ্ন রাখিত?

শুধু তাহাই নয়। এই অতি তুচ্ছ ডোবাটিই এ-পাড়ার একটি মূল্যবান সম্পত্তি। সম্বৎসরের শাক ইহাতেই উৎপন্ন হয়। তাহা তুচ্ছ করিবার বিষয় নয়। ঘাটের উপর সম্মুখ দিকে হাত দুই মাত্র স্থান ছাড়া বাকী সমস্তই শাক, শাক, শাক—জল নজরে পড়ে না। এক-এক পরিবার এক-একটি মাত্র কঞ্চির সাহায্যে অদ্ভুত কৌশলে নিজের নিজের শাক আটকাইয়া রাখিয়াছে। এদিকের শাক ওদিকে যাইবার উপায় নাই। তাও কি আর যায় না! কিন্তু সে কচিৎ! তখন এই শাক লইয়াই একটা ফৌজদারী বাধিয়া যায়।

কিন্তু শুধুই কি শাক! আপনি নয়টা-দশটার সময় যদি এদিকে আসেন, দেখিবেন,—অবশ্য একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে,—দেখিবেন, একটি বৃদ্ধ সেই বাঁশবনের নীচে অন্ধকারে অন্ধকারে বকের মত সন্তর্পণে পা ফেলিয়া মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার বাঁ-হাতে একটা ভাঙা এনামেলের বাটিতে কতকগুলা কেঁচো এবং একটা সরু তালপাতায় গাঁথা কতকগুলি ল্যাটা, মাগুর ইত্যাদি মাছ। তিন-চারিটি মাত্র। এই কয়টি সংগ্রহ করিতেই তাহাকে বার-দুই ডোবার ধারে ধারে পরিক্রমণ করিতে হইয়াছে।

এই লোকটিই নদাই ঘোষ!

বয়স পঞ্চাশের বেশী হইবে না। কিন্তু দেখিলে মনে হয় ষাটের কাছাকাছি। মাথার চুলগুলি সব পাকিয়া গিয়াছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শীর্ণ, দীর্ঘ দেহ,—কোমর বাঁকিয়া গিয়াছে। চোখ কোটর-প্রবিষ্ট, চর্ম্ম লোল এবং কর্কশ। বাঁ-পাখানা অস্বাভাবিক রকম সরু। সেজন্য খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটে। মুখে দাঁত বলিতে একটিও নাই। শীর্ণ, ভাঙা গাল একেবারে মুখের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে।

ডোবার ওধারে তাহার বাড়ি এবং এই ডোবাটি শুধু শাক নয়, তাহার সম্বৎসরের মাছও সরবরাহ করে। অভাব কেবল অন্নের এবং বস্ত্রের। কিন্তু সে আর কতই বা! এক জোড়া বস্ত্রে তাহার দিব্য একটা বৎসর চলিয়া যায়। আর অন্ন? একটা পেটে কতইবা লাগে? সপ্তাহে দুইটা দিন মুনিষ খাটিলেই সে-অন্নের সংস্থান হইত। যত দিন শরীরে সামর্থ্য ছিল তার বেশী সে কখনও খাটেও নাই। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যদি কখনও কেহ মাঠে খাটিবার জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিত, পেটের ব্যথার অজুহাতে প্রায়ই তাহাকে সে ঘুরাইয়া দিত। লোকটা উহারই মধ্যে একটু শয্যাবিলাসী। বেলা নয়টার আগে আর তাহার অতি-পুরাতন ছিন্ন মলিন শয্যার বাহিরে পারতপক্ষে আসে না। যখন শরীরে সামর্থ্য ছিল তখনও আসিত না, এখনও না।

অবশ্য শরীরে সামর্থ্য ছিল বলিতে এ-কথা বুঝিলে ভুল হইবে যে, এককালে তাহার শরীরে যথেষ্ট সামর্থ্য ছিল। যথেষ্ট সামর্থ্য তাহার কোন কালেই ছিল না। চিরদিনই অমনি ঢ্যাঙা এবং লিকলিকে দেহ, কোমরের কাছে কুঁজো। গত পঁচিশ বৎসর কাল বছরে ছয় মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগিলে সামর্থ্য আর থাকে কি করিয়া? তা নয়, তবে পেটের ভাতের সংস্থানের জন্য সপ্তাহে দুই তিন দিন মাঠে খাটিতে যেটুকু সামর্থ্যের প্রয়োজন হয় সেটুকু সামর্থ্য এতকাল ছিল। কিন্তু গত দশ বৎসর হইতে আর তাহাও নাই। এখন আর মাঠে খাটিতে পারে না।

সে একপক্ষে ভালই হইয়াছে। সকালবেলায় মাঠে খাটিতে যাইবার জন্য এখন আর কেহ অকালে নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বিরক্ত করিতে আসে না। বেলা নয়টা পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে ঘুমটা হয়। ডোবার মাছ এবং শাক ত আছেই। আর আছে ডোবার ধারে কয়েক ঝাড় বাঁশ। তাহা বিক্রয় করিয়া তাহার বৎসরের কাপড় দুখানির দাম ওঠে। আর…

এইখানেই তাহার ভাগ্যকে অসাধারণ বলা চলে।

যৌবনে নদাই ঘোষের বিবাহ হয় নাই। কতকটা কন্যাপক্ষীয়দের দোষে। পণ না লইয়া কেহই এই সুপাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হয় নাই। কতকটা তাহার নিজের অলসতায়। তাহার নিজের তরফ হইতেও কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই। আর কতকটা আত্মীয়-

জনের অভাবে। মা-বাপ ছেলেবেলাতেই হারাইয়াছে। বড় কিংবা ছোট একটা ভাই পর্য্যন্ত নাই, যে খুঁজিয়া-পাতিয়া ভায়ের জন্য একটি বধূ সংগ্রহ করিয়া আনিবে। যৌবনটা এমনি করিয়াই কখন যে কাটিয়া গেল বোঝাই গেল না। অবশেষে, চল্লিশ বৎসর বয়সের সময়, ম্যালেরিয়ার হাতে পড়িয়া শরীর যখন জীর্ণ, একমাত্র প্লীহাবিপুল উদরপ্রদেশ ছাড়া দেখাইবার মত কিছুই যখন অবশিষ্ট নাই, তখন অকস্মাৎ এক শুভলগ্নে তাহার বিবাহ হইয়া গেল। ছোটবাবুর বহু কীর্ত্তির মধ্যে এই এক কীর্ত্তি। পাত্র এবং পাত্রী দেখা, লগ্নপত্র সম্পাদন, আশীর্ব্বাদ, গাত্রহরিদ্রা, শোভাযাত্রা, বিবাহ, বাসরশয়ন, পাকস্পর্শ, ফুলশয্যা,—এক কথায় সংবাদপত্রে সংবাদটি প্রকাশিত হওয়া ছাড়া সমারোহ বলিতে আর যাহা-কিছু বোঝায় তাহার কোথাও ত্রুটি ছিল না। নহবৎ বসিল। ঢাক, ঢোল, সানাই, কাঁশি বাজিল। এমন কি ছেলেরা তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া শেষে কতকগুলা টিন আনিয়া বাজাইতে লাগিল। এজন্য একটি পয়সাও নদাইকে ব্যয় করিতে হয় নাই। সমস্ত ছোটবাবু নিজের পকেট হইতে দিয়াছেন। পাঁচ জনের কাছে কিছু টাকাও উঠিয়াছিল। নদাই মনে মনে খুশী হইলেও খুব লজ্জিতই বোধ করিতেছিল। এ-বয়সে আর কেন এ-সব?

নদাই মিথ্যা বলে নাই। সত্যই এ-বয়সে আর এ-সবের প্রয়োজন ছিল না, এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই কথার সত্যতাই প্রমাণিত হইল ফুলশয্যার সকালে বহুকষ্টে অনেক খোঁজাখুঁজির পর কেবল নদাইকে পাওয়া গেল,—হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় খাটের নীচে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। বধূ নাই। ঘরে, বাহিরে, কোথাও নাই। এমন কি ছোটবাবু নিজে লোক নামাইয়া ডোবার জলে পর্য্যন্ত খোঁজ করিলেন। সেখানেও নাই। সম্ভব অসম্ভব সকল স্থানেই খোঁজ করা হইল। কোথাও পাওয়া গেল না।

নদাইয়ের জ্ঞান যখন হইল তখন বেলা দশটা। এই রকম সময়েই সাধারণতঃ তাহার ঘুম ভাঙে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল।

তখনও তাহার কথা কহিবার শক্তি নাই। বেচারার ভয়ানক ভয় হইয়াছে। দুই চোখের কোণ বাহিয়া কেবল অশ্রু গড়াইতেছে। উত্তরে সে শুধু হাতের তালু উল্টাইয়া জানাইল, বধূ নাই।

কোথায় গেল?

জানে না।

তাহাকে এমন হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিয়া গেল কে?

নদাই আঙুল দিয়া খাটের নীচেটা দেখাইয়া দিল।

আরও বেলা হইলে কথাটা স্পষ্ট করিয়া জানা গেল:

বৌভাতের হাঙ্গাম মিটাইয়া এমনিতেই ফুলশয্যার দেরি হইয়া গিয়াছিল। বর-বধূর শুইতে রাত্রি এগারোটা কি বারোটাই হইবে। নদাই বধূর একটা হাত ধরিয়া প্রীতি-সম্ভাষণ করিতে যাইবে, বউ এক ঝট্‌কা দিয়া হাত টানিয়া লইল। ঠোঁটে হাত দিয়া ইঙ্গিতে বলিল, চুপ।

নদাই ভাবিল, বোধ করি কেহ জানালার গোড়ায় আড়ি পাতিতেছে। সেই ভয়েই বধূর এই সতর্কতা। আড়ি পাতিবার অবশ্য তাহার কেহ নাই। তবু পাড়ার মেয়েরা কি আর ছাড়িবে?

বধূ পা ঝুলাইয়া খাটের উপর নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। নদাইও আর কথা না কহিয়া যেমন ছিল তেমনি বসিয়া রহিল।

এমনি বোধ করি ঘণ্টাখানেক কাটিল।

নদাই আর থাকিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে ডান হাতখানি বধূর কাঁধের উপর রাখিল।

—এই—বলিয়া বধূ কাঁধের এক ঝাঁকুনীতে নদাইয়ের হাতটা ফেলিয়া দিল।

আরও অনেক ক্ষণ কাটিল। ছোটবাবুদের বালাখানার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে নদাইয়ের চোক ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু বধূ ঠায় তেমনি বসিয়া আছে।

নদাই ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার ঘুম পায় নি?

বধূ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না, পায় নাই।

—ছুটো বাজে যে।

—বাজুক।

—হ্যা, বাস্তবে বইকি? এস—বলিয়া নদাই যেমন বধূকে বাহুপাশে বাঁধিতে যাইবে অমনি বধূ তড়াক্ করিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িয়াই ফস্ করিয়া আলো নিবাইয়া দিল। তারপর কোথা দিয়া কি হইল, ভাবিলে এখনও হৃৎকম্প হয়, যম-দূতের মত কতকগুলো লোক পট্ পট্ করিয়া তাহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া বোধ হয় বউ লইয়া চলিয়া গেল। নইলে বউ গেল কোথায়? মোট কথা, ইহার পরে ঠিক কি যে হইল তাহা আর স্মরণ নাই।

ছোটবাবু অনেক ভাবিয়া বলিলেন সেই যমদূতগুলো নিশ্চয় এর নীচে ছিল। বলিয়া আঙুল দিয়া খাটের নীচেটা নির্দ্দেশ করিলেন।

নিতান্ত ভালমানুষের মত নদাই বলিল—বোধ হয়।

সে যাহাই হউক, সময় এবং স্রোতের মত বধূও একবার গেলে আর ফিরিয়া আসে না। বধূ আর কোন দিন স্বামীর ঘর করিতে আসিল না। নদাইও ঘৃণায় লজ্জায় তাহার কথা আর জিজ্ঞাসা করিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বধূ না-আসিলেও বধূর পিতৃগৃহ হইতে মাসের মধ্যে দুইবার কোন-না-কোন পর্ব্ব উপলক্ষ্যে চাল, ডাল, নুন, তেল হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষের নিত্যব্যবহার্য্য প্রত্যেক দ্রব্য এত পরিমাণে আসিতে লাগিল যে, নদাইয়ের অন্নসমস্যার চিহ্নমাত্র রহিল না। এইজন্যও বধূর বিয়োগব্যথা নদাইয়ের বুক হইতে অনেকটা দূর হইল। আর বাকীটা দূর হইল ছোটবাবুর আশ্বাসে।

ছোটবাবু এ-গ্রামের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ-গ্রামের ষোলো আনারই তিনি জমিদার। বছর চল্লিশ বয়স। দিব্য সুপুরুষ চেহারা। লেখাপড়া বিশেষ করেন নাই। কিন্তু গানে, বাজনায়, বক্তৃতায় অদ্বিতীয়। বস্তুতপক্ষে এখানকার থিয়েটার পার্টির ইনিই প্রাণ-স্বরূপ। অত্যন্ত আমুদে লোক,—যাহাকে বলে মজলিসী। নদাই তাঁহার অত্যন্ত স্নেহভাজন।

কিছু দিন নদাই মুখ বুজিয়াই কাটাইল। পাড়ার লোকেরা তাহার স্ত্রী-ভাগ্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং শ্বশুর-ভাগ্যের জন্য আনন্দ জ্ঞাপন করে।

—মেয়েমানুষের কথা ছেড়ে দাও ঘোষ, ওদের চরিত্র দেবতারা পর্য্যন্ত বুঝতে পারেন না। কিন্তু এমন শ্বশুর ক'জনের হয় বল ত? মাসে দু-বার তত্ত্ব করা কি এই বাজারে সোজা ব্যাপার না কি?

নদাই হাঁ না কোন কথাই বলে না। কিন্তু আলোচনাটা শুনিবার জন্য বসে। লোকে এই দুষ্কার্যের পাণ্ডা কে কে তাহা অনুমান করিবার জন্য বহুলোকের নাম করে। তাহারা পাড়ারই ছেলে-ছোকরা। কথাটা নদাই ঘোষের মনে লাগিলেও সে মুখ ফুটিয়া সমর্থন করিতে ভয় পায়। ছেলেগুলা সত্যই দুশমন-প্রকৃতির। নদাই চুপ করিয়া থাকে। মনে মনে ভাবে, অমন সুন্দরী মেয়ে তাহার কপালে সহিবে কেন? মেয়ের মুখ সে দেখিয়াছে।

অবশেষে নদাই এক দিন ছোটবাবুকে ধরিয়া বসিল। বিবাহ না করিলে তাহার একটি দিনও চলিতেছে না। এই বয়সে নিজের হাত পোড়াইয়া রান্না করার ঝকমারি কি সহজ!

এই কথা!

ছোটবাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশ্বাস দিলেন, এক পক্ষের মধ্যে বিবাহ দিয়া তবে তাঁহার অন্য কাজ।

ছোটবাবু ইচ্ছা করিলে, কি না হয়। এক পক্ষও অপেক্ষা করিতে হইল না। দুই-তিন দিনের মধ্যেই কোথাকার কে এক জন আসিয়া পাত্র দেখিয়া গেল। দেখামাত্র পাত্র পছন্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে আশীর্ব্বাদ এবং দিন স্থির।

পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতার মনে খুশী আর ধরে না। কেবল নদাই নিজে একটু খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল। মেয়েটি নাকি কালো। নদাইয়ের স্মৃতিপটে তখনও তাহার প্রথমা পত্নীর অপরূপ রূপলাবণ্য ভাসিতেছিল। কিন্তু এ-আপত্তির কথা মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিতে সাহস করিল না।

শুভদৃষ্টির সময় মনে হইল, মুখ ফুটিয়া বলিলেই ভাল ছিল। প্রথমা পত্নীর শুধু রংটাই ফর্সা ছিল না, মুখখানিও বেশ কচি কচি। এ-মেয়ে যেমন কালো, তেমনি কুৎসিত। মুখের গড়ন একেবারে পুরুষালি। গাল ভাঙিয়া গিয়াছে। চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে,

ছোটবাবু উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এত দিনের অভ্যাসে তিনিও যেন কোথায় একটু ফাঁক অনুভব করিতেছিলেন। নদাই তাহার চিরদিনের বিনীত হাসি হাসিয়া নিজের জায়গাটিতে গিয়া বসিল।

গোটা-দুই কন্‌সার্টের পরেই অভিনয় আরম্ভ হইয়া গেল,—ধ্রুব চরিত্র। জীমূতবর্ণ, বিপুলকায় মহারাজা ধীরগম্ভীর পদক্ষেপে প্রবেশ করিয়া আসরেই গড় হইয়া মা-দুর্গাকে প্রণাম করিয়া চেয়ারে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে দীর্ঘগ্রীব, অত্যন্ত শীর্ণকায় মন্ত্রী এবং বাম পার্শ্বে বেঁটে, কাঠ-কাঠ গড়নের সেনাপতি আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজার দৃষ্টি সম্মুখে স্থির ভাবে নিবদ্ধ। মন্ত্রীবর নিতান্ত নিরীহ স্বভাব ভালমানুষ ভদ্রলোক। আসরে আসিয়া সেই যে চোখ নামাইলেন আর তুলিলেন না। সেনাপতির বয়স অল্প। আসিয়াই একবার চারি দিকে চাহিয়া লইলেন। উপরের আলো এবং তরবারির দৈর্ঘ্য মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন, রণোন্মত্ততায় তরবারির খোঁচা লাগিয়া আলোটা ভাঙিয়া যাইতে পারে কিনা। অন্য আসরে একবার সে-দুর্ঘটনাও ঘটিয়াছে।

রাজা জলদগম্ভীরকণ্ঠে রাজ্যের বিবরণ জানিতে চাহিলেন। মন্ত্রীবর আধ-আধ শীর্ণকণ্ঠে তাহার যথাযথ উত্তর দিয়া থামিতেই সেনাপতি অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিশুদ্ধ বাংলায় প্রায় পাঁচ মিনিটকাল অনর্গল এত কথা বলিয়া গেলেন এবং তরবারিটা এতবার আস্ফালন করিলেন যে, সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া গেল। আসর নিস্তব্ধ। মাছিটি নড়িলে জানিতে পারা যায়।

ছোটবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়া শুইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—নাঃ! গান এরা জমাবে দেখছি।

মৃদুকণ্ঠে সকলেই সে-কথায় সায় দিলেন। বস্তুতপক্ষে সেনাপতির বীররসোদ্গারের পরে সে-বিষয়ে আর কাহারও মনে সংশয় ছিল না।

রাজা সেনাপতির মতেই মত দিলেন। তাহাই হয়। পৃথিবীতে কোন কালেই ভালমানুষের জয় হয় না। দর্শকদেরও মন্ত্রীর উপর সহানুভূতি ছিল না। লোকটার একটা ভাল পোষাক পর্যন্ত নাই।

সে যাহাই হউক, কিয়ৎক্ষণ বাদানুবাদের পর মন্ত্রী এবং সেনাপতি উভয়েই প্রস্থান করিলেন এবং ম্যানেজার বংশীধ্বনি করিবামাত্র সুয়োরাণী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। নদাই চমকিয়া ছোটবাবুর পায়ে হাত দিল।

—কি হ'ল?

—কিছু নয়। বলিয়াই নদাই হাতখানি সরাইয়া লইল।

আশ্চর্য্য মিল! অবিকল তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর মত! তেমনই ভাঙা গাল, কোটর-প্রবিষ্ট জলন্ত চোখ যেন দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে; মুখের গড়নও তেমনি পুরুষালি। সুয়োরাণী আসিয়াই চেঁচাইতে লাগিলেন। ধ্রুব এবং তাহার জননীর সম্বন্ধে তাঁহার যাহা কিছু অভিযোগ ছিল তাহা এমন হাত নাড়িয়া বিবৃত করিতে লাগিলেন যে, দর্শকেরা পর্য্যন্ত তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। নদাই কিন্তু সে-সকল কথার এক বর্ণও শুনিতেছিল না। তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর কণ্ঠস্বর সে একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিল। ইহার চীৎকার শুনিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, দ্বিতীয়া স্ত্রীর কণ্ঠস্বরও অবিকল এইরূপ। এমনি করিয়া কটমট করিয়া চাহিয়া সে এক দিন তাহাকেও ধমকাইয়াছিল। আশ্চর্য্য মিল বটে!

অনেক ক্ষণ ধরিয়া চীৎকার করিয়া অবশেষে সুয়োরাণী চলিয়া গেল। গান জমিয়া গিয়াছে। আসর নিস্তব্ধ। নদাই উঠিয়া বসিয়াছিল, সুয়োরাণী চলিয়া যাইতে আবার পাশে ঠেস দিল।

অতঃপর আসিলেন দুয়োরাণী, ধ্রুবের হাত ধরিয়া। এ ছোকরার বীররসের বক্তৃতা নয়, করুণ রসের। 'মহারাজ' বলিয়াই ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। কিন্তু করুণ রসের বক্তৃতা ইহাকে মানায় ভাল। রংটি ফরসা মুখখানি বেশ ঢলঢলে, গলার স্বরও মিষ্টি। এক নম্বর বক্তৃতা করিয়াই মাতা-পুত্রে গান আরম্ভ করিল। সে গানের সুরে পাষাণও দ্রব হইল।

কিন্তু নদাই একবার আলজ্জভরে আড়চোখে তাহার দিকে চাহিয়াই সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। স্থান-কাল-পাত্র সমস্তই সে বিস্মৃত হইয়া গেল। এই বিচিত্র আলোকমালা, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের বিবিধ বর্ণের রঙীন পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্রের মধুর ধ্বনি, সমস্ত মিলিয়া তাহাকে যে কোন্ কল্পলোকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল।

বাংলা
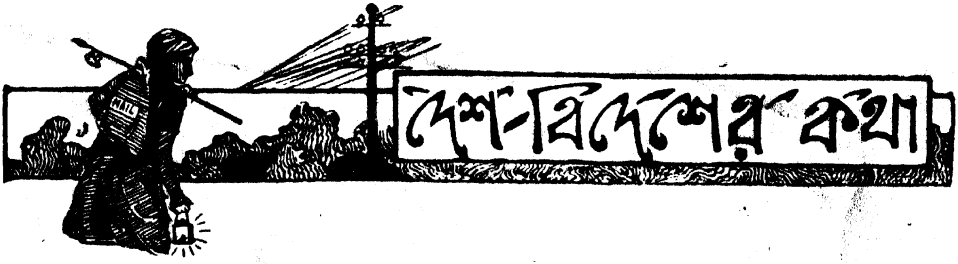
কৃতী প্রবাসী বাঙালী

শ্রীযুত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন কৃতী ছাত্র। তিনি সম্প্রতি 'মীরকাসিম' সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা

শ্রীযুত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়

করিয়া লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন।

বিলাতে সামরিক শিক্ষায় বাঙালী বালকের কৃতিত্ব—

শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী বিলাতের স্কুলে অধ্যয়ন কালে ও-টি-সি অর্থাৎ 'অফিসার্স ট্রেনিং কোর'-এ যোগ দিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ সম্প্রতি ও-টি-সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া লণ্ডনে সমর বিভাগ হইতে সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে। অতঃপর সে পরিপূরক রিজার্ভ টেরিটরিয়াল আর্মি, টেরিটরিয়াল আর্মি রিজার্ভ অফিসার্স, বা এ্যাক্টিভ মিলিশিয়া অব ক্যানাডা নামক সেনাদলে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। আকস্মিক বিপৎপাতের সময় যখন নানা সেনাদলকে সম্মিলিত হইতে হইবে তখন শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথও সমর-বিভাগের অণ্ডার সেক্রেটারীর নিকট সৈনিকের কার্য্যের জন্য যাহাতে পত্রব্যবহার করে সেইজন্য সার্টিফিকেটে অনুরোধ করা হইয়াছে।

যে-সব বালক এ-বৎসর ও-টি-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সমর-বিভাগ হইতে সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ বয়ঃকনিষ্ঠ। দেবেন্দ্রনাথ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বন্দুক-ছোঁড়া প্রতিযোগিতায়' প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই সংবাদ

শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তদবধি প্রতি বারই বন্দুক-চালনা প্রতিযোগিতায় দেবেন্দ্রনাথ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইতেছে।

ফরিদপুরে ব্রতচারী-বিদ্যালয়—

শ্রীযুত গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস, ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। আদর্শ নাগরিক প্রস্তুত করিয়া সমাজ-সেবায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ফরিদপুরেও গত ২২এ জানুয়ারী একটি ব্রতচারী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

ব্রতচারী বিদ্যালয়—ফরিদপুর

ব্রতচারী বিদ্যালয়—ফরিদপুর
(১) মিঃ এ. ই. পোর্টার, আই-সি এস্ (সভাপতি) (২) শ্রীযুক্ত নবনীধর বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রধান পর্য্যবেক্ষক)
(৩) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)। শিক্ষার্থিগণ দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট।

সমিতির সভাপতি ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ. ই. পোর্টার, সম্পাদক ফরিদপুর হিতৈষী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত, এবং জেলার ত্রিশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহার সভ্য।

ব্রতচারীর আদর্শ ব্যাপকভাবে বিস্তারের জন্য গত ২১এ মার্চ্চ ফরিদপুরে একটি ব্রতচারী শিক্ষা-কেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছিল। মাসাধিক কাল যাবৎ জেলার সাতাশটি স্কুল হইতে চৌত্রিশ জন শিক্ষক ও তেতাল্লিশ জন ছাত্র ইহাতে যোগদান করেন। এখানে ব্রতচারী ব্যায়াম, সমষ্টি-সঙ্গীত, রাইবেঁশে নৃত্য ও সঙ্গীত, জারী নৃত্য ও সঙ্গীত, বাউল নৃত্য ও সঙ্গীত, রাইবেঁশে কসরৎ প্রভৃতি বিষয় ঢোল, গুব-গুবা-গুব, মাদল ও কাঁশির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। নিখিল-বঙ্গ ব্রতচারী শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান পরিবেক্ষক শ্রীযুক্ত নবনীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, বি-টি এখানে থাকিয়া শিক্ষাদানে সহায়তা করেন। শিক্ষার্থিগণের মধ্যে ষোল জন শিক্ষক ও উনিশ জন ছাত্র প্রথম শ্রেণী, এগার জন শিক্ষক ও সাত জন ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণী, ছয় জন শিক্ষক ও দুই জন ছাত্র তৃতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। বিগত ২৪এ এপ্রিল বাংলার শিক্ষা-বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর মিঃ জে. এম্. বটম্লি শিক্ষার্থিগণকে যোগ্যতানুসারে ট্রেনিং সার্টিফিকেট, পদক ও ব্রতচারী ব্যাজ প্রদান করেন।

শিল্প-কলা প্রদর্শনী—

গত ২৯এ আগষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর চারি দিবস কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের স্ত্রীশিক্ষা-বিভাগের প্রযত্নে একটি শিল্পকলা প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

বাংলার অন্যতম শিল্পী শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার নাগ মহাশয়ের ঐকান্তিকতায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। নাগ মহাশয়ের বহু ছাত্র ও ছাত্রী তাঁহাদের শিল্প-কলার নিদর্শন স্বরূপ মনোরম শিল্পসম্ভার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যথা—মাছের আঁস, ঝিনুক, কড়ি, সামুক, ছেঁড়া কাগজ, গাছের পাতা, মোম, মাটি, রঙীন পাথর, ভাঙ্গা কাচ প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু সমূহ হইতে প্রস্তুত নানারকম উৎকৃষ্ট ও মনোমুগ্ধকর শিল্পকার্য্য। তুলা হইতে প্রস্তুত তাজমহল, পশু, পক্ষী প্রভৃতি বস্তুসমূহ, রেশম ও পশম হইতে জাত বিভিন্ন সূচী-শিল্প ও গালিচা, আসন প্রভৃতিতে বিচিত্র চিকণের কাজও প্রদর্শনী অলঙ্কৃত করিয়াছিল। ইহা ছাড়া নাগ-মহাশয়ের চিত্রকলা, দেশীয় ফুল ও ফল হইতে চিকণের কাজের কাল্পনিক রঙীন নক্শা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র্যময়ী ও পরিবর্ত্তনশীল রাগ-রেখার চিত্রণ প্রদর্শনীতে দেখান হয়।

বিদ্যাসাগর কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ স্ত্রীশিক্ষা-বিভাগে শিল্পকলা-শিক্ষা প্রবর্ত্তনের মহান উদ্দেশ্য লইয়াই প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। জীবিকা সংস্থানের উপযোগী এইরূপ একটি শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্র দেশের কল্যাণকর হইবে সন্দেহ নাই।

—

ভারতবর্ষ

এলিফ্যাণ্টা গুহায় ত্রিমূর্ত্তি শিব—

প্রবাসী ১৩৪০, শ্রাবণ সংখ্যায় পঞ্চ-শস্য বিভাগে চতুর্ম্মুখ শিবের উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—"শিবকে আমরা পঞ্চমুখ বলিয়া জানি। তবু প্রাচীনকালে সময়ে সময়ে তাঁহার চতুর্ম্মুখ মূর্ত্তিও গঠিত হইত। মধ্যভারতের অজয়গড় রাজ্যে নাচনা নামক

ত্রিমূর্ত্তি শিব

ত্রিমূর্ত্তি শিব

ত্রিমূর্ত্তি শিব

স্থানে চতুর্মুখ শিবের একটি অতি সুন্দর মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিটি অনুমান ৩২০–৩৫০ খৃঃ অব্দে গঠিত হয়।" এলাহাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার সেন সম্প্রতি আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, এলিফান্টা গুহায় একটি ত্রিমূর্ত্তি বা তিন-মুখো শিবও দেখিতে পাওয়া যায়। এই ত্রিমূর্ত্তি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের প্রতীক-স্বরূপ। এলিফান্টার ত্রিমূর্ত্তি শিবের সহিত অজয়গড়ের চতুর্মুখ শিব-মূর্ত্তির সাদৃশ্য আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই শিব-মূর্ত্তি ৬০০–৮০০ খৃষ্টাব্দে খোদিত।

অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ

ওট্টাওয়া চুক্তি সম্পর্কে ভারতীয় কমিটির রিপোর্ট—

ওট্টাওয়া চুক্তি সম্পর্কে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষৎ যে কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহার রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটী একমত হইতে পারেন নাই। স্যর জোসেফ ভোর, ক্যাপ্টেন লালচাঁদ, স্যর ফ্রাঙ্ক নয়েস, ভাই পরমানন্দ, ডাঃ ডি সুজা, মিঃ এইচ পি মোদী, মিঃ আর পি বাগলা, মিঃ এফ ই জেমস্‌, ও শেঠ হাজি আবদুল্লা হারুণ, ইঁহারা রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মত এই যে,

(ক) যুক্তরাজ্যে (ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ওয়েলস ও নর্থ আয়ারলণ্ড) যে সমস্ত পণ্য আমদানির জন্য "সুবিধা" ভোগ করে, সেগুলি ভারতের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে প্রধান।

(খ) অন্যান্য দেশ অপেক্ষা যুক্তরাজ্যই "সুবিধা ভোগী" ও অন্যান্য পণ্যের ভাল বাজার বলিয়া দেখা যাইতেছে—

(গ) এই "সুবিধা" বন্দোবস্ত (preferential scheme) প্রচলিত হইবার পর হইতে, ভারতে যুক্তরাজ্যের পণ্য আমদানির অধোগতি রুদ্ধ হইয়াছে ও বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে।

(ঘ) প্রথম বৎসরেই বিনিময়ের পারস্পরিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(ঙ) সুবিধার বন্দোবস্ত ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের সম্পর্কে মূল্যবান।

(চ) ভারতবর্ষে যে সুবিধা প্রদান করিতেছে তাহাতে ইংলণ্ডেরও বেশ সাহায্য হইতেছে।

(ছ) ভারতবর্ষ যে সুবিধা দিয়াছে তাহাতে ভারতের রাজস্বের কোনই ক্ষতি হয় নাই,

(জ) ভারতবর্ষ যে সুবিধা দিয়াছে তাহাতে ভারতের কোন পণ্যের অসুবিধা হয় নাই।

অর্থাৎ কমিটির মত এই যে সুবিধা দান ব্যবস্থা ভারতবর্ষ ও যুক্তরাজ্য উভয়েরই উপকার করিতেছে।

এই কমিটির দুইজন বাঙালী সদস্য স্যর আবদার রহিম ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী স্বতন্ত্র বিবৃতিতে বলেন যে, যুক্তরাজ্য ভারতবর্ষের কৃষিজাত দ্রব্যে যে সুবিধা দিয়াছে তাহাতে ভারতের উপকার হয় নাই কিন্তু ভারতবর্ষ যুক্তরাজ্যকে যে সুবিধা দিয়াছে তাহাতে ভারতের বহির্বাণিজ্যের ক্ষতি হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের মন্তব্য এই যে যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য বিদেশ সম্পর্কে "কোটা" প্রথা প্রচলিত হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত সীতারাম রাজু বলেন যে চুক্তির ফলে ভারতে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ বাড়ে নাই, যে পণ্য উৎপন্ন হয় তাহারও ব্যবসায় বৃদ্ধি পায় নাই কিন্তু কতিপয় ভাল ভাল ক্রেতার সহিত কলহ বাধিয়াছে মাত্র! তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, যুক্তরাজ্যের বাজারই আমাদের একমাত্র প্রধান বিক্রয় স্থান, তবুও ভারত যে দেশের অধীন তাহারই উপর একান্ত নির্ভর করা এবং পৃথিবীর অন্যান্য বাজারকে লোপ করা ভারতের অর্থনৈতিক সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক হইবে না।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে কেহ-কেহ কোন-কোন বিষয়ে স্বতন্ত্র মত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ডাঃ ডি সুজা বলেন—এই সুবিধা ভারতের চাউল, কফি ও নারিকেলের ব্যবসায়কে আঘাত করিয়াছে। ভাই পরমানন্দ বলেন এ অনুসন্ধান বড়ই তাড়াতাড়ি হইয়াছে—আরও এক বৎসর পরে হইলে ফলাফল আরও ভাল বুঝা যাইত। মিঃ এফ, ই, জেমস্ বলেন যে এই ব্যবস্থায় ভারতে চাউল ব্যবসায়ের ক্ষতি হইয়াছে।

পাটের সংশোধিত পূর্ব্বাভাষ—

সম্প্রতি পাটের সংশোধিত পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে যথা:—

জিলা	পরিমাণ—চাষের (অনুমান) হাজার একর		উৎপন্নের (অনুমান) হাজার বেল (১বেল = ৪০০পাউণ্ড)	
বাংলা	গত বৎসর	এ-বৎসর	গত বৎসর	এ-বৎসর
২৪ পরগণা	৬১	৫৭·১	২০০	১৭৮·৭
নদীয়া	৩৬	৩০	৯৫	৮৪
মুর্শিদাবাদ	২১	১৭·৮	৬৫	৫০
যশোহর	৭০	৬৬	২১৫	২০৩
খুলনা	৩১	২৩	৮৫	৬০
বর্দ্ধমান	৩	১·৫	১১	৫
মেদিনাপুর	৫	৩·২	১৫	১২
হুগলী	৩৪	২৯	১২৭	৮৯
হাওড়া	৪	৩	৯	৯
রাজশাহি	৯১	৮৬·৬	২৮০	২৭০
দিনাজপুর	৫৯	৫৫	১৯০	১৭১
জলপাইগুড়ি	৩২	৩২	১১০	১০২
দার্জ্জিলিং	২	২	৭	৬·৫
রংপুর	২৫২	২৫২	৮৫০	৮৮২
বগুড়া	৮৫	৮৪·৭	২৫৫	৩০১
পাবনা	৮০	৮২·২	২৭০	২৯৬
মালদহ	৩০	২৩	৮০	৫০
কোচবিহার	২৫	২৪·৩	৪৪·২	৭০
ঢাকা	২৬৫	২৯০	৮৭৫	৯৮৬
ময়মনসিংহ	৫৬৬	৫৯৬	১,৯২৪·৪	২,০২৭
ফরিদপুর	১৫০	১৪০	৫০১	৫০০
বাখরগঞ্জ	৩২	৩২	১০০	১০০
চট্টগ্রাম	·৩	·৩	১·২	১·২
ত্রিপুরা	১৮৩	২০৪	৬২৫	৬০০
নোয়াখালী	৫০	৫০	১৫৫	১৬০
ত্রিপুরা রাজ্য	১·৪	১·৪	২·৩	২·৬
মোট বাংলা প্রদেশ	২,১৬৮·৭	২,১৮৬·১	৭,০৯২·১	৭,২১৬
বিহার-উড়িষ্যা	১৯২·১	১৬৫·৬	৪৭৩·২	৪৫০
আসাম	১৫৬·৭	১৪৫·৩	৪৪৬·৮	২৯৭·৮
মোট	২,৫১৭·৫	২,৪৯৭	৮,০১২·১	৭,৯৬৩·৮

পূজার সময় নানা কারণেই নগদ টাকার প্রয়োজন বলিয়া কৃষকগণ পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিতে ব্যগ্র হয়, তাহাতে দর অতি নিম্নস্তরেই থাকে তদুপরি এই পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ পাইলে ক্রেতাগণ দর কমাইয়া লইবার আরও সুযোগ পায়। এই সকল পূর্ব্বাভাষ যে নির্ভুল এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। পাট তদন্ত কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ উভয় দলই এই পূর্ব্বাভাষ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে ইহা কল্পিত এবং সত্য হইতে দূরে।

পাটের মাসিক রপ্তানি—

পাটের দরের জন্য কৃষকগণ দালাল, ফরিয়া বা আড়তদারের দয়ার উপরই নির্ভর করেন। তাহারা পাটের চাহিদা নির্ণয় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম কারণ তাহারা জানেন না যে কোন মাসে কি পরিমাণ পাট বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। নিম্নের তালিকা হইতে কাঁচা পাটের রপ্তানির হিসাব পাওয়া যাইবে— (হাজার টন)

মাস	১৯২৯–৩০	১৯৩০–৩১	১৯৩১–৩২	১৯৩২–৩৩	১৯৩৩–৩৪
এপ্রিল	৫০·৫	৪২·৯	৪৫·৫	৩৪·৪	৪২·০
মে	৩৫·৭	৪১·৫	৩৮·০	৩০·৭	৪৬·৬
জুন	৩৯·৯	৪০·৫	৩১·৭	১৯·৫	৬০·৫
জুলাই	৩৫·৭	৩১·১	৪৩·৮	৩০·৪	৫৭·২
আগষ্ট	৪১·৮	২৪·৭	৩৩·৭	২৭·২	৪৮·১
সেপ্টেম্বর	৮৮·৫	৩৬·৫	৪০·২	৪৮·৪	৪৯·৯
অক্টোবর	১০৯·১	৬৬·১	৬১·৩	৬২·২	৬৭·৩
নবেম্বর	১৩৬·৮	৭৮·৮	১০৩·১	৬৪·৮	১১২·৩
ডিসেম্বর	৯২·৩	৮৬·৯	৯৪·১	৮২·২	৮২·৩
জানুয়ারী	৭৪·৩	৬৮·৯	৪৩·৭	৬২·৯	৬৬·০
ফেব্রুয়ারী	৫৭·৬	৫০·৩	২১·৬	৫১·৮	৬০·২
মার্চ্চ	৪৪·৮	৫১·৪	২৯·৯	৪৮·৬	৫৫·৯
	৮০৬·৯	৬১৯·৬	৫৮৬·৬	৫৬৩·১	৭৪৮·৩

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পূর্ব্ব তিন বৎসর অপেক্ষা ১৯৩৩-৩৪ কাঁচা পাটের রপ্তানি অধিক হইয়াছে কিন্তু পাটের দর বৃদ্ধি পায় নাই। অর্থাৎ দর সম্পূর্ণরূপে চাহিদার উপর নির্ভর করে নাই। এই বৎসর এপ্রিল ও মে মাসে যথাক্রমে ৬০·৩ ও ৫৯·৮ হাজার টন পাট রপ্তানি হইয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের এপ্রিল ও মে মাসের তুলনায় বেশী সুতরাং আশা করা যায় যে এই ভাবে চলিলে এ-বৎসরও রপ্তানির পরিমাণ বাড়িবে। কিন্তু দর দেখা যাইতেছে তুলনায় অনেক কম।

গত বৎসর কলিকাতায় পাটের দরের কিরূপ উঠ্‌তি-পড়তি হইয়াছিল তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। (এক বেলের দর)

	প্রথম শ্রেণী,	লাইটনিং	রেড (ঢাকাস্)
মে ১৯৩৩	৩৩।০	৩২	৩৫
জুন	২৯॥০	২৮	৩৩
জুলাই	২৯৵০	২৭॥০	৩৩
আগষ্ট	২৮।০	২৬॥০	৩১॥০
সেপ্টেম্বর	২৫	২৩	২৮
অক্টোবর	২৫	২২৸০	২৮
নবেম্বর	২৪	২১	২৬॥০
ডিসেম্বর	২৬	২৩	২৭॥০
জানুয়ারী ১৯৩৪	২৮৸০	২৫।০	৩১
ফেব্রুয়ারী	২৯॥০	২৬	৩১॥০
মার্চ্চ	২৮।০	২৫	৩০॥০
এপ্রিল	২৭	২৩॥০	৩০
মে	২৪৸৵০	২২	২৭॥০

গত নবেম্বর মাসেই পাট রপ্তানী হইয়াছে সব চেয়ে বেশী কিন্তু তখনই দর ছিল সব চেয়ে কম।

বাংলা দেশে যৌথ-মণ্ডলী—

গত চারি মাসে—এপ্রিল হইতে জুলাই—ভারতীয় কোম্পানী আইনের বিধান মতে অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ একানব্বইটি যৌথ-মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। যথা—

	মণ্ডলীর সংখ্যা					মূলধন (হাজার টাকায়)				
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	মোট	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	মোট
ব্যাঙ্কিং	১	-	৬	১	৮	১০০	-	৩,২০০	২০	৩৩২০
জীবন, অগ্নি, সামুদ্রিক বীমা	১	-	-	-	১	২০	-	-	-	২০
'প্রভিডেণ্ট' বীমা	৪	৮	৪	৩	১৯	২৪০	৪৮০	২০০	১৪০	১১০০
মুদ্রণ, পুস্তক-প্রকাশ ইত্যাদি	১	১	১	৩	৬					
রাসায়নিক দ্রব্য ও তদানুসঙ্গিক ব্যবসায়	৩	-	১	-	৪	১০০	১০০	৫০	৬০	৩১০
লৌহ, ইস্পাত, জাহাজ নির্ম্মাণ প্রভৃতি	১	-	-	-	১	১৪০০	-	৩০	-	১৪৩০
মাটি, পাথর, সীমেণ্ট, চূণ ও অপরাপর দ্রব্য	১	-	-	-	১	২০	-	-	-	২০
এজেন্সী (ম্যানেজিং এজেন্সী) কোম্পানী সহ	৩	৪	১	২	১০	১০০	-	-	-	১০০
						১৪০	৮০	২	১২০	৩৪২
কয়লার খনি	১	-	-	-	১	১৫০০	-	-	১০০	১৬০০
হোটেল, নাট্যশালা, প্রমোদ-স্থান	১	-	২	-	৩	৩০০	-	২০০০	-	২৩০০
মোটর গাড়ীর সংক্রান্ত	-	১	-	১	২	-	১০০	-	১০০	২০০
ইন্‌জিনীয়ারিং	-	১	-	১	২	-	৫০	-	৪০	৯০
পিত্তল, তামা প্রভৃতি	-	১	-	-	১	-	৩০০	-	-	৩০০
কাপড়ের কল	-	১	-	-	১	-	১৫০০	-	-	১৫০০
সোনার খনি	-	১	-	-	১	-	৪০০০	-	-	৪০০০
জমিদারী, ভূমি	-	১	-	১	২	-	১৫০	-	৬০০	৭৫০
টেনারি ও চামড়ার ব্যবসায়	-	-	১	-	১	-	-	২০০	-	২০০
বরফ ও এয়িরেটেড জল	-	-	১	-	১	-	-	১৫	-	১৫
পাটের কল	-	-	১	-	১	-	-	১৬০০	-	১৬০০
পাটের প্রেস	-	-	১	-	১	-	-	৭০০	-	৭০০
অন্যান্য মিল ও প্রেস	-	-	১	-	১	-	-	২০	-	২০
নেবিগেশন	-	-	-	১	১	-	-	-	১০০০০	১০০০০
কাঁচ	-	-	-	১	১	-	-	-	১০০	১০০
"স" ও কাঠের মিল	-	-	-	১	১	-	-	-	১০০	১০০
অন্যান্য ব্যবসায়	২	২	১০	৫	১০	৩০০	৬৫	১৫২৫	৪৪০	২৫৩৫
মোট	১৯	২১	৩০	২১	৯১	৪২,২০	৬৮,২৫	৯৫,৮২	১,১৯,২০	৩,২৫,৪৭

বাংলা দেশে গঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রত্যেকটিই যে বাঙালীর মূলধনে বা উদ্যোগে গঠিত তাহা নহে সবগুলির কর্ম্মক্ষেত্রও বাংলা দেশে সীমাবদ্ধ নহে। সবগুলি যে নূতন তাহাও নহে, কতকগুলি পূর্ব্ব হইতেই কার্য্যক্ষেত্রে ছিল, নূতন ভাবে গঠিত হইল মাত্র। সব চেয়ে বেশী মূলধন লইয়া গঠিত হইয়াছে একটি নেবিগেশন কোম্পানী ইহা বাঙালীর নহে। সব চেয়ে বেশী সংখ্যক গঠিত হইয়াছে প্রভিডেণ্ট কোম্পানী।—মোট উনিশটি। এগুলি অবশ্য সবই বাঙালীর। দেশের শিল্প উৎপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত কোম্পানীতে এখনও বাঙালীর আগ্রহ আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

নৃত্যরতা ভারতী

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

সভ্যতার বিকাশের সময় মানুষের কোন ধর্ম্ম কিংবা কোন জাতি ছিল না। অপরিচিত অপরিচিতায় দেখা হ'লে জিজ্ঞেস করত, "কি নাচ তুমি নাচ?"

নৃত্যের ভঙ্গী দিয়ে তারা বুঝত কে কোন্ দলের, কোন্ পাহাড় বা কোন্ দ্বীপে থাকে। তার পর সভ্যতার প্রথম আলোকে তাদের মনে ধর্ম্মভাব জেগে উঠল, নৃত্যের সঙ্গে ধর্ম্মকেও তারা জড়িয়ে ফেলল এবং এর মধ্য দিয়ে তারা জানত কে ভূতপ্রেতের উপাসনা করে যা কে দেবদেবীর উপাসনা করে। উপাসনা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানই ছিল তাদের নৃত্য।*

জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কাজেও বীজ-রোপণ, শস্য-কর্ত্তন, পরিণয়ে নৃত্য ছিল তাদের একটি অপরিহার্য্য অনুষ্ঠান। মহেনজোদাড়োতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন বহু নৃত্যপরা নগ্ন নারীমূর্ত্তি পাওয়া গেছে—এইরূপ আদিম যুগ থেকেই ভারতে নৃত্যকলার নানা রূপ চর্চ্চা হয়ে আসছিল।

তার পর ঐতিহাসিক যুগে আর্য্যসন্তানেরা ভারতের নিবিড় বিজন ঘন বনপ্রান্তর, প্রভাতের নবোদিত সূর্য্যের স্বর্ণাভ আকাশ, মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত ভাস্করের রুক্ষ ও গম্ভীর রূপ আর অস্তায়মান দিনের অন্ধকারভরা নিস্তব্ধ আকাশের বৈচিত্র্যের মধ্যে তাদের অন্তর-দেবতার বিকাশ উপলব্ধি করেছিলেন।

তাই দেখি বৈদিক যুগে প্রথম ঋক্ থেকে নৃত্য, তার পর সাম থেকে গীত, যজু থেকে অভিনয় এবং অথর্ব্ব থেকে রস। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা একটি নাট্যশালা তৈরি করলে এর প্রয়োগভার ভরতের ওপর গিয়ে পড়ে। প্রয়োগকালে শিব সেখানে ছিলেন। সকলের অনুরোধে শিব তণ্ডুকে ডেকে এনে ভরতকে অঙ্গহারগুলোর প্রয়োগ দেখাতে আদেশ দেন। সেখানে তণ্ডু যে-সব নৃত্য দেখান তাই বিশ্ববিখ্যাত প্রসিদ্ধ তাণ্ডব। এদিকে পার্ব্বতী সন্তুষ্ট হয়ে

উদবহিত এবং একপদ ভ্রমরী ভঙ্গী—বরবুদর

লাস্য নামে কমনীয় নৃত্য ভরতকে দেখান। ভরত এই তাণ্ডব নৃত্য মনুষ্যলোকে আনেন আর পার্ব্বতী নিজে বাণ-

*"The dance was, in the beginning, the expression of the whole man, for the whole man was religious. Thus dancing was born with religion and worship. The other intimate association of dancing was with love."—(Westermarck . *History of Human Marriage*)

উষা'কে লাস্য নৃত্য শিখিয়ে দেন। ওদের নিকট থেকে রমণীরা ঐ নৃত্য শিক্ষা করেন। ক্রমে ক্রমে ...র সমস্ত জায়গার ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু নটরাজের ...ধ হয় আর্য্য-অনার্য্যের যুদ্ধ এবং শিবকে বৈদিক

সুন্দরী এবং পরিবাহিত ভঙ্গী—অজন্তা

রুদ্রের সঙ্গে এক ক'রে নেওয়া। সে যা হোক, শিব যে ভারতের নৃত্যজগতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে এসেছেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তিনি ভারতের মহানট, নটরাজ, নটেশ্বর। তাঁর তাণ্ডব নর্ত্তনে ত্রিভুবন কম্পিত; ছিন্নভিন্ন আলোড়িত জটাজাল দূর দিগন্তে প্রসারিত হ'য়ে এঁকে বেঁকে মহাঢেউ তুলছে; ডান হাতের ডমরুর গুরু গুরু শব্দ মহাব্যোমে ব্যাপ্ত; বাঁ-হাতের যজ্ঞাগ্নি হু হু শব্দে জ্বলছে—এ যেন মহাকালের বিরাট ধ্বংসের প্রলয় নাচন।

তার পর ভারতে ধর্ম্মনৃত্যের বেশী প্রচলন হয় পুরাণের সময়। কালীর অপূর্ব্ব নৃত্য, গণপতি-নৃত্য, পুরাণের ঘটনাবলী নিয়ে শিল্পকুশলীরা নিত্য নূতন নৃত্য উদ্ভাবন করতে লাগলেন। প্রাচীন ভারতের এই-সব শিল্পীরা যেমন নৃত্যকুশলী ছিলেন তেমনি এক-এক জন মনোবিদও

প্রণয়-নৃত্য

ছিলেন। একটি ভৈরবী কিংবা পূরবীর রূপকে নৃত্যে কি ভাবে রূপান্তরিত করা যায় তা তাঁরা জানতেন। দেবসভায় অপ্সরাদের সৃষ্টি হ'ল সেই সময়। শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিয়ে এই যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত ভারতে নৃত্যের বহুল প্রচলন চলেছে।

এই সময় ভারতে বহুল পরিমাণে প্রণয়-নৃত্যের বিকাশ হয়, এ-নৃত্যের প্রধান ভঙ্গী দোলন। এখন বাংলার পাড়াগাঁয়ে যে বিবাহ-নৃত্য হ'য়ে থাকে বোধ হয় ইহা প্রাচীনের প্রণয়-নৃত্যেরই রূপান্তর। সাঁওতাল কিংবা ঐরূপ অনেক প্রাচীন জাতির মধ্যে এখনও অনেক কুমারী শিথিল কবরীকে কটি-সঞ্চালনে গানের তালে তালে নাচায়।

যাহা বৈদিক যুগে প্রথমে ধর্ম্ম ও আনন্দ বিকাশের

জন্য করা হ'ত, অভাবের তাড়নায় তারই দৌলতে অর্থসমস্যার সমাধান হ'তে লাগল। উপাসনার অঙ্গ রূপে তখন যে-নৃত্যের প্রচলন ছিল এবং যে-নৃত্যের দ্বারা পূজার বিধান আছে,

> "নৃত্যং দত্বা তথাপ্নোতি রুদ্রলোক অসংশয়ম্
> স্বয়ং নৃত্যেন সংপূজ্য তস্যৈবানুচরো ভবেৎ।"
>
> (বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর)

ইহা এখন দেবদাসীর নৃত্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

নৃত্যের এই ওলটপালটের ফলে আগন্তুক নট ও অভ্যাগতা নটীরা দেশের প্রত্যেককে নৃত্যগীত শোনাতে লাগল। যাদের আগেই ঠিক করা হ'ত তারা বেতনভোগী ব'লে নিজেদের কলানৈপুণ্য নির্দ্দিষ্ট দিনে দেখাত (বাৎস্যায়ন)। রামায়ণে দেখতে পাই, কুশীলব নৃত্য ও গীতের সাহায্যে সমস্ত রামায়ণের উপাখ্যান ব'লে বেড়াত। ভারতের নৃত্যের ইতিহাসে এই বোধ হয় প্রথম কুশীলব নৃত্যের সঙ্গে গীতিকার যোগ হয় এবং উহা অর্থকরীও বটে। এই অর্থকরী নৃত্যবিদ্যার মধ্যে আবার দুইটি রূপ আছে—একটি উদ্দেশ্যসাধন (indirect) আর একটি অভাবপূরণ (direct)।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনার জন্য যে-সব রমণী পাঠান হয়েছিল তারা সবাই নৃত্য দিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলিয়েছিল, এদিকে সুন্দরী উর্ব্বশী যখন বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙলেন সেও নৃত্য দিয়ে। এরূপ পেশাদার নর্ত্তক-নর্ত্তকীদের কথা দু-হাজার বছর পূর্ব্বের কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' দেখতে পাওয়া যায়।

মহাভারতে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন চমৎকার নৃত্যকলা শিখেছিলেন। তিনি রণ-তাণ্ডব অর্থাৎ যুদ্ধ-নৃত্যেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। বৈদিক যুগে আর্য্য-অনার্য্য যুদ্ধেও কিছু কিছু যুদ্ধ-নৃত্যের প্রচলন ছিল, কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের সময়েই ইহার সমধিক উৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল। পঞ্চপাণ্ডবের ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জ্জুন বৃহন্নলা নামে নর্ত্তকীর বেশ ধারণ ক'রে বিরাট-অন্তঃপুরে নৃত্যশিক্ষা দিতেন। মহাভারতের সময় পুতুল-নাচ ভারতে প্রচলিত হয়। রাবণ সীতার প্রতিমূর্ত্তি পুতুল-নাচে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

ভারতীয় নৃত্য [illegible] এবং এর দুটি রূপ—তাণ্ডব ও লাস্য। তাণ্ডবের দুটি রূপ 'পেবলি' ও 'বহুরূপ'। লাস্যেরও তাই 'স্ফুরিত' ও 'যৌবত'। ভারতীয় নৃত্য অত্যন্ত অনুষ্ঠানবহুল এবং আগাগোড়াই ব্যবহারে ও সুসংযত। পেবলি নৃত্যে অভিনয় কম,. কিন্তু অঙ্গসঞ্চালন বেশী।

উদয়শঙ্কর

বহুরূপ ভাবপ্রধান এবং চোখ-মুখের নানারূপ ভঙ্গীর সমাবেশ। স্ফুরিত নৃত্য আলিঙ্গন ও চুম্বন আর যৌবত তাল-লয়-মান দ্বারা নিয়মিত হয়। আবার ভারতীয় নৃত্যের অঙ্গসঞ্চালন অনেক রকম, শুধু মাথার হেলনই চব্বিশ রকম। যেমন, অধোমুখম্, আধুত, কম্পিত, সম, অকম্পিত, পরাবৃত, উৎক্ষিপ্ত, লোলিত, আলোলিত, দোধূয়, প্রকম্পিত ইত্যাদি।

(১) সম—যখন মস্তক নত কিংবা উত্থিত নয়—অচঞ্চল, তখন তাহাকে সম-মস্তক বলা হয়। সম-মস্তক—

নৃত্যের প্রারম্ভে প্রার্থনা, কার্য্যবিরতি কিংবা প্রণয়ে কপট-ক্রোধ প্রকাশ করবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

(২) অধোমুখম্—যখন মস্তক নত করা হয়, তাহাকে

নর্ত্তকী নর্ত্তকী

(শ্রীপূরণচাদন ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে)

অধোমুখম্ বলা হয়। অধোমুখম্—লজ্জা, দুঃখ, উদ্বেগ, মূর্চ্ছা ইত্যাদি ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়।

দৃষ্টি চল্লিশ রকম। যেমন ধীর, রৌদ্র, তৃপ্ত, করুণ, বিস্ময়, শঙ্কিত, শূন্য, উগ্র, শান্ত, মলিন, ম্লান, মুকুল, কুঞ্চিত, মদির, লজ্জিত, হৃষ্ট, সাচী ইত্যাদি।

সাচী—চক্ষুর মণি যখন এক কোণে আনা হয় তখন তাহা সাচী-দৃষ্টি। সাচী-দৃষ্টি কোন বিষয় সম্বন্ধে আন্দাজে কিছু বলা, কোন কাজ স্মরণ করা ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে।

(২) নিমীলিত—অৰ্দ্ধনিমীলিত চক্ষুকেই নিমীলিত বলা হয়। নিমীলিত দৃষ্টি, প্রার্থনা, ধ্যান, ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে।

গ্রীবার দোলন চার রকম। যেমন, সুন্দরী, তিরশ্চিন, পরিবর্ত্তিতা এবং প্রকম্পিতা।

প্রকম্পিতা—ময়ূরের ন্যায় পিছনে এবং সামনে দোলন করার নাম প্রকম্পিতা। প্রকম্পিতা দোলনে 'তুমি ও আমি' এই অস্ফুট মর্ম্মরধ্বনি প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া মুখের পরিবর্ত্তন চার রকম, ভ্রূ-বিকার সাত রকম এবং বাহু-সঞ্চালন আটাশ রকম।

বাহুসঞ্চালন, যেমন অৰ্দ্ধপতাক, পতাকা, ত্রিপতাকা, ময়ূর, অরাল, চন্দ্রকলা, মুকুল, ত্রিশূল ইত্যাদি।

যখন উক্ত হস্তের সমভাবে বক্র এবং অঙ্গুলীগুলি বিস্তৃত থাকে তাহার নাম পতাকা। পতাকা—মেঘ, বন, নদী, বায়ু, প্রখর সূর্য্যরশ্মি, সমুদ্র, বৎসর, মাস ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে।

অরাল—যখন পতাকার তর্জ্জনী-অঙ্গুলী বক্র ভাবে অবস্থান করে তাহাকে অরাল বলা হয়। অরাল—বিষপান, অমৃত এবং ঝটিকা ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।

নৃত্যে ভাবপ্রকাশক অঙ্গুলী-বিন্যাসকে বলা হয় হস্তক। সংযুক্ত হস্তক আটত্রিশ রকমের। যেমন—সূচীমুখম, মৃগশীর্ষম, শিখরম, মুকুলম, অঞ্জলি, নিতম্ব, লতা, কেশবন্ধ, নলিনী পদ্মকোষ, বৰ্দ্ধমান, মীনমুদ্রা দোল ইত্যাদি।

সাওতাল নৃত্য

অঞ্জলি—যখন পতাকা হস্তদ্বয় সংযুক্ত করা হয় তাহাকে বলা হয় অঞ্জলি। অঞ্জলি নম্র, নমস্কার, বিনয় প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

দোল—যখন পতাকা হস্তদ্বয় উরুর উপর স্থাপন করা হয় তখন দোল হস্ত হয়। ইহা নৃত্যের প্রথম ভঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়।

অসংযুক্ত হস্তক ও নৃত্য হস্তক বত্রিশ রকমের। বাঁশী, ধানদূর্ব্বা, বস্ত্র, ফুল ইত্যাদি নিয়ে যে নৃত্যের অনুষ্ঠান হয় তাকে বলা হয় চালক। হাতে হাতে, পায়ে পায়ে বা হাতে পায়ে যে মিলন তার নাম করণ। করণ ও রেচক সংযুক্ত হয়েই অঙ্গহারের সৃষ্টি। এই অঙ্গহারগুলো নৃত্যের মধ্যে প্রধান জিনিষ। অঙ্গহার বত্রিশ রকমের। যেমন—অপরাজিত, ভ্রমর, অলাতক, গতিমণ্ডল, বৈশাখরেচিত, বিদ্যুৎভ্রান্ত ইত্যাদি। করণ আবার এক শত আট রকমের। যেমন—ললাটতিলক, গঙ্গাবতরণ, বলিতরু, সমনখ, লীন, কটিসম, উর্দ্ধজানু, নিকুঞ্চিত, বলিত, লোলিত, চতুর, তালবিলসিত, দোলপাদক, সর্পিত, নিতম্ব, জনিত, নিবেশ ইত্যাদি।

এই এক শত আটটি করণ নৃত্যে, যুদ্ধে, নিযুদ্ধে সর্ব্বত্রই প্রযুক্ত হবে। আবার যে-সমস্ত হাত নৃত্যে চালনা করা হয়ে থাকে তাকে বলা হয় মাতৃকা। কটিদেশ যখন কর্ণসম এবং বক্ষ উন্নত হবে তাকে বলা হয় সৌষ্ঠব। করণের এই এক শত আটটি ভঙ্গী নৃত্যে প্রধান স্থান অধিকার ক'রে এসেছে। এই করণ মুগ্ধভাব বুঝানোর জন্যই করা হয়ে থাকে। বলিতরুতে হাত দুটি শুকতুণ্ড অবস্থায় ঘুরিয়ে নেওয়া চলবে এবং উরুদ্বয় দৃঢ় করতে হবে, শুকতুণ্ড আবার ঠিক এইরূপ,

> "অঙ্গুষ্ঠমূলতা কার্য্যা, কুঞ্চিতোঙ্গুষ্ঠ কস্তথা।
> শেষা ভিন্নর্ব বলিতা হ্যঙ্গা লেহন্নলয়ং করে॥"

বক্ষস্থলে পতাকাঞ্জলি, মস্তক ও অধর সংপ্রসারিত এবং অসংকুট কুঞ্চিত থাকলে লীনকরণ হয়। নৃত্যের এই অঙ্গবিক্ষেপ ছাড়া আরও কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে বিশেষ ভঙ্গী করতে হয়। যেমন—বিষ্ণুকে নৃত্যে দেখাতে হ'লে ত্রিপতাকা হস্তদ্বয়ে ধারণ করতে হয়, পার্ব্বতীকে বোঝাতে

নৃত্য—(কুমারী অমলা নন্দী)

হ'লে ডান হাত উঁচু ক'রে অর্দ্ধচন্দ্র এবং বাঁ-হাত নীচু ক'রে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করতে হয় এবং এই হস্তদ্বয় অভয়া ও বরদা ভাবে স্থাপন করতে হয়। এই ভাবে ব্রহ্মা, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, বায়ু প্রভৃতি প্রত্যেক দেবদেবীকে নৃত্যে দেখাতে হ'লে স্বতন্ত্র ভাব সন্নিবেশিত করতে হয়।

দশ অবতারের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বুদ্ধ (বলরাম), কৃষ্ণ এবং কল্কি প্রভৃতি ভঙ্গীতেও স্বতন্ত্র ভাবে নৃত্য করতে হয়। যেমন বাঁ-হাত কটিতে এবং অর্দ্ধপতাকা ডান হাতে থাকলে পরশুরাম মনে করতে হবে। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, চন্দ্র, সূর্য্য, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহ, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা পুত্রকন্যা, ভাই-ভগ্নী ইত্যাদিও বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রত্যেকের ভাব প্রস্ফুটিত করতে হয়।

ভারতীয় নৃত্যে পদসঞ্চালন প্রধান চার ভাগে বিভক্ত। যথা—মণ্ডল, উৎপ্লাবন, ভ্রমরী এবং পদচারী। মণ্ডল পদসঞ্চালন আবার দশ ভাগে বিভক্ত। যেমন—সোথিত, প্রেঙ্খণ, প্রেরিত, স্বস্তিক ইত্যাদি।

স্বস্তিক—পদবিক্ষেপে ডান পা বাঁ-পায়ের উপরে স্থাপিত

বরণ-নৃত্য—(কুমারী অনুরূপা রায়)

ক'রে ডান হাত বাঁ-হাতের উপর রাখতে হয়। উৎপ্লাবন পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যেমন—অলত, কর্ত্তরি, সোথিত ইত্যাদি।

ভ্রমরী পদবিক্ষেপ সাত ভাগে বিভক্ত। যেমন—উৎপ্লুত, চক্র, একপাদ, কুঞ্চিত, অঙ্গ ইত্যাদি।

কুঞ্চিত—হাঁটুকে নির্ভর ক'রে নৃত্য করার নাম কুঞ্চিত ভ্রমরী।

পদচারী আট ভাগে বিভক্ত। যথা—চলন, বিষম, লোলিত ইত্যাদি।

লোলিত—পৃথিবীকে পদস্পর্শ করেও করে না অথচ পা কাঁপতে থাকার নাম লোলিত।* ইহা ছাড়া বহু প্রকার পদ স্থাপন আছে। যেমন—ময়ূর, মৃগ, হস্তি, অশ্ব, সিংহ, সর্প, ভেক, বীরোচিত প্রভৃতি। আবার নৃত্যের উদ্দেশ্য হবে,

"দেবরুব্যা প্রতীতো যথালমান
রসাশ্রয়ঃ সবিলা সোহঙ্গঃ
বিক্ষোপা নৃত্যমিত্যুচ্যত বুধিঃ
লয়াচ্ছুত্তিষ্ঠতে বাদ্যং
বাদ্যাচ্ছুত্তিষ্ঠতে লয়ঃ
লয়ঃ তাল সমারব্ধং
ততো নৃত্য প্রবর্ত্ততে।" (সংগীত দামোদর)

আবার নৃত্য যে করবে সে হবে,

"নৃত্যে নালমরূপেন সিদ্ধিন টাস্ত রূপতঃ
চার্ব্বধিষ্ঠান বন্নত্যং নৃত্যমস্তবিড়ম্বনা।"
(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

যেহেতু রূপহীনের নৃত্য বিড়ম্বনা। রূপবতীর দেহ হবে ক্ষীণ, সুন্দর, এবং নবীন মন হবে আত্মবিশ্বাসী, প্রফুল্ল। বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে তাল-লয়-মান ঠিক রাখবে এবং সুমোহন পরিচ্ছদে ভূষিত হবে তবেই সে নর্ত্তকী।

"সুনীলস্নিগ্ধবিস্তীর্ণকেশপাশনিবেশিতঃ।
গ্রন্থিবিলুলিত পৃষ্ঠে লসত্ পুষ্পাবতং সকঃ॥
বেণী বা সরলা দীর্ঘা মুক্তাজালবিরাজিতৈঃ।
কলিতং পুণ্ডলৈর্ভালং কস্তুরীচন্দনাদ্বিনা॥
রচিতং চিত্রকং ভালে নেত্রে স্বঞ্জনাঞ্জিতে।
উল্লসত্ কান্তিবলয়ে তাড়পত্রে চ কর্ণয়োঃ॥"—ইত্যাদি।

আবার নর্ত্তকীর এই দশটি গুণ থাকাও প্রয়োজন। সে দৃঢ়চেতা, ভ্রমরী গতিতে অভিজ্ঞা, রেখাসুন্দরী, মেধাবী, সঙ্গীতনিপুণা হবে; তার চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, চারুকলার প্রতি একাগ্রতা ও সদ্‌গুণ থাকা চাই। এই সব গুণ যে-নর্ত্তকীর মধ্যে আছে শুধু সে-ই কাংসনির্ম্মিত কিঙ্কিণী পায়ে নৃত্যের প্রারম্ভে পুষ্প অঞ্জলি দিয়ে নৃত্য আরম্ভ করতে পারে।

ভারতীয় শিল্পসাধনায় ভারতে যেরূপ একটি নিজস্ব আধ্যাত্ম সাধনার বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় সেরূপ ভারতের

* এইগুলির অনেক বিষয় শ্রীমনোমোহন ঘোষ সম্পাদিত নন্দিকেশ্বর-বিরচিত 'অভিনয়দর্পণ' থেকে সাহায্য পেয়েছি।

এই নৃত্যও ভাবপ্রধান। ভারতের এই যুগে নৃত্যকলার চর্চ্চা প্রায় ঘরে ঘরেই হ'ত, জীবনের অন্যান্য নানারূপ অনুষ্ঠানের সঙ্গে ইহা অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ছিল। এরই ফলে ভারতে নৃত্যের চরম উন্নতি হয়।

আজকাল যেমন গণিকাদের স্থান সমাজের নিম্নস্তরে, তখন ছিল এর বিপরীত। বাৎস্যায়ন বলেন যে স্ত্রী-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-সব কলাবিদ্যা আবদ্ধ হয়ে আছে সেগুলি জেনে নেবার জন্যেই গণিকাদের গোষ্ঠীতে স্থান দেওয়া উচিত। গোষ্ঠী সমবায়ের প্রধান অঙ্গ ছিল গণিকা। কারণ তারা নৃত্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল এবং তাদের নৃত্য ও কলানৈপুণ্য দেখার জন্যে তাদের ঘরে যাওয়া একটা সামাজিক প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মহর্ষি দত্তক অনেক দিন গণিকাদের ঘরে থেকে তাদের বৃত্তিরহস্য ও সাম্প্রদায়িক কলানৈপুণ্য নিজে আয়ত্ত করেছিলেন। এমন কি বৌদ্ধ যুগেও মহারাজ অশোক যখন দেশভ্রমণে যেতেন তখন তাঁর সঙ্গে এক বিরাট গণিকাবাহিনী থাকত।

মরণ যখন মানুষের আসে তখন না-কি চার দিক থেকেই আসতে সুরু করে দেয়। ভারতের জীবনসন্ধ্যা যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল ততই তার দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, কলা ধীরে ধীরে তমসাচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য্যের

নটরাজ

বিষয়, এই অধঃপতনের যুগেও কৃষ্ণলীলার উৎসব ভারতের জনসাধারণ বহুল পরিমাণে ক'রে আসছিল। শিব বহুদিন থেকেই ভারতের নৃত্যের আসর থেকে উঠে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এই কৃষ্ণলীলা তখনও নেবে নাই। শ্রীহর্ষ-রচিত 'রত্নাবলী' নাটকে মদনোৎসবের বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, কত প্রাচীন যুগ থেকেই কৃষ্ণলীলা এইরূপ উৎকর্ষ লাভ ক'রে আসছিল।

"কেহ নৃত্য করিতে করিতে পিচকারীর জল ছুঁড়িয়া মারিতেছে, কেহ তাঁর শিথিল দেহ লইয়া গাছে দোল

রাস-নৃত্যে রাধাকৃষ্ণ
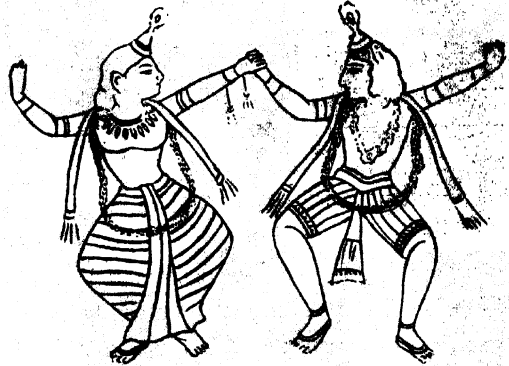
খাইতেছে, কেহ কেহ আবার নৃত্যে মাতামাতি সুরু করিয়াছে—কাহারও খোঁপা এলোমেলো, পায়ের নূপুর নৃত্যের তালে তালে এদিকে-সেদিকে ঝন্ ঝন্ শব্দে ছিটকাইয়া পড়িল। কিছুই আজ লক্ষ্য নাই, নৃত্যে তারা মাতোয়ারা, ক্রমাগত দোদুল্যমান দেহে গলার হার বুকের 'পর আছড়াইয়া পড়িল।"

কিন্তু পৌরাণিক আখ্যানের অধিকাংশ রূপসাধনা ভারতের পরবর্ত্তীকালে যে ধীরে ধীরে লোপ পেতে বসেছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হিন্দু রাজত্বের শেষভাগে ভারতের ইতিহাসে বৈদেশিক রাজাদের বার-বার আক্রমণে ভারতকে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে, প্রায় পাঁচ শত বৎসর শুধু নৃত্যকলা নয় কোন দিকেরই অনুশীলন মোটেই হ'তে পারে নি।

তার পর মোগল-রাজত্বের সময় মুসলমানী নাচ ঢুকে পড়ে। মোগল-রাজত্বের সময় নৃত্যের আদর্শ একেবারে ক্ষুণ্ণ হ'লেও, মোগল সম্রাটগণ চারুকলার চর্চ্চায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। মোগল আমলে সঙ্গীত ইত্যাদির ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়, কিন্তু নৃত্য-সম্বন্ধে এরূপ কিছু বিশেষ পাওয়া যায় না। তবে মোগল

আমাদের খুব মূল্যবান্‌ দুর্লভ কয়েক খানি নৃত্যের ছবি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ নাহার মহাশয়ের নিকট আছে। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সময় নৃত্যকলা খুব পিছনে পড়ে। সে এসে দাঁড়াল বাহ্যিক চাকচিক্যে, মানুষের মন ভুলানোর জন্যে।

দিনের পর দিন দেশ যখন এলোমেলো, তখন বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হ'ল। তিনি সারা বাংলার মাঠে ঘাটে বইয়ে দিলেন এক নূতন আবহাওয়া, সহজধারায় দিলেন প্রাণ মাতিয়ে। ভাগবতের মন্ত্রই ছিল,

"যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা ভাবৈ বহুসুভক্তিতঃ
স নির্দহতি পাপানি জন্মান্তর শতেষপি।"

এই বৈষ্ণবমূলক নৃত্যে দেখতে পাই বাউল, কীর্ত্তন, জাগের গান, ধামালী, শ্লোকনৃত্য, ঝুমুর, ইত্যাদি। ঝুমুর চার ভাগে বিভক্ত, ব্রজলীলা, আগম (ভবানী বিষয়ক), লহর (কৌতুক), খেউড় (অশ্লীল)। তার পর সৃষ্টি হ'ল কুশল, গম্ভীরা ইত্যাদি গান ও নাচ। অধুনা এই সব গান ও নাচকে পল্লী-নৃত্য ও গীত এবং মেয়েদের সংক্রান্ত ব্যাপারকে বলা হয় ব্রত নিত্য ও ব্রতকথা।

পল্লীনৃত্যে আজকাল কোন কোন গানের সঙ্গে নাচ আছে অথবা নাচ আছে গান নাই। সব গানেরই একটি নিজের রূপ ও একটি ধারা আছে, সব গানের সঙ্গে সব নাচ কিংবা সব নাচের সঙ্গে সব গান মেশে না। বাংলার ঘরবিরাগী বাউল ঘুরে ঘুরে নেচে বলে,

আমার দুখের কথা বলব কোথা
শোনরে ও ভাই সকল।
এ দলের আগম নিগম কেউ জানে না রে
আমি তাই ভেবে হ'লাম পাগল।
এসেছিলি খালি হাতে
এ দলের আসে বন্দী হলিস রে,
তোর আসা যাওয়া সমান হ'ল।
হলি দিনে কাণা মিছে তোর ভুলো নাম
সাধের জনম বৃথাই দিলি রে
টানলে টুনলে তোর রথ চলে না
হয়েছিস অচল।
জায়গায় বসে ন'ড়ে চড়ে
তাই দেখে পাগলা কানাই হেসে মরে
ওরে নেচে নেচে আপন মনে
দেখলি না রূপ নেহার করে
ও ভাই সকল।
(নদিয়া গ্রাম থেকে সংগৃহীত)

"সূর্য্য নাচে চন্দ্র নাচে আর নাচে তারা
পাতালে বাসুকী নাচে বলি গোরা গোরা।"

বৈষ্ণব যুগে পুরাণের ঘটনাবলী নিয়ে নৃত্যের প্রচলন হয়েছিল দেখতে পাই দশ অবতারের নৃত্যে—যাহা আজও প্রচলিত। 'ঝুমুর' নৃত্য বহুধা বিভক্ত। বোধ হয় ঝুমুর ঝুমুর শব্দ থেকেই 'ঝুমুর'-নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং এই 'ঝুমুর' নৃত্য থেকে বাংলা দেশে বহু নৃত্য ও গীত প্রচলিত হয়েছিল—আবার ঝুমুর নামে একটি সুর হ'তেও 'ঝুমুর'-নৃত্যের সৃষ্টি হতে পারে, যেমন,

"মদন মোহন হেরি মাতল মনসিজ
যুবতী যূথশত গায়ত 'ঝুমুরী'।" (পদকল্পতরু)

কিংবা

"চরণে চরণ বেড়া ত্রিভঙ্গ হইয়া
ঝুমরী গায়িছে শ্যাম বাঁশরী বাজাইঞা।"

আমাদের অনেকের ধারণা পুরুষ ও নারীর একসঙ্গে নৃত্য করা পাশ্চাত্য দেশের সৃষ্টি; কিন্তু আমাদের দেশেও প্রাচীন কাল থেকেই পুরুষ-প্রকৃতির, শিবভবানীর, কৃষ্ণ রাধার যুগ্মনৃত্য সুরু হয়েছে। বৈষ্ণব যুগেও দেখতে পাই,

যতেক গোপিনী আছিল তত হৈল কানু
নাচিতে লাগিল সবে ডগমগ তনু
পায়ের নেপুর বাজে হাতের কঙ্কণ
মধুর বাঁশরী বাজায় মদনমোহন
নাচিতে নাচিতে ওঠে গানের তরঙ্গ
গভীর শবদে বাজে রসের মৃদঙ্গ
ভুবন ভরিয়া গেল এ রসের গানে
ভাঙিল শিবের ধ্যান উঠে দেবী মনে
পঞ্চমুখে গান গায় ডম্বরু বাজায়
নাচে শিব ঠ্যাস দিয়া ভবানীর গায়।

বৈষ্ণব-যুগে মেয়েদের ব্রতনৃত্য ও ব্রতকথা ছাড়াও তাদের জীবনকে মধুর ও সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলবার জন্যে বহু ছড়া, গাথা ও নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিবাহিত জীবনে বাংলা দেশে পরিণয়-উৎসবে যে নৃত্যগীত হয়ে থাকে তা সর্ব্বজনবিদিত। শুধু বাংলায় নয়, ভারতের অন্যান্য দেশেও লোকনৃত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন গুজরাটী গরবা, ও ব্রহ্মদেশের নৃত্য। বাংলায় বরণ-নৃত্যের খুব উৎকর্ষ হয়, বরণের ভঙ্গীর তালে তালে মেয়েরা বলে ওঠেন,

কি রূপ বরেলো ও রামের সোহাগিনী।
সোহাগী বরণ বরে

হাতের কঙ্কণ ঝিকমিক করেলো
কি বরণ বরেলো ও রামের সোহাগিনী।
সোহাগী বরণ বরে
হেলকে চুলে মাজা পড়েলো
কি বরণ বরেলো ও রামের সোহাগিনী।
সোহাগী বরণ বরে
গলায় হার টলমল করে,
মুখেতে মধুর হাসি
দশনেতে খেলে দামিনীলো
কি বরণ বরেলো ও রামের সোহাগিনী।
সোহাগী বরণ বরে
বুকের কাপড় খসে পড়ে
পৃষ্ঠেতে খোপা দোলে
পায়ের নূপুর খসে পড়েলো
কি বরণ বরেলো ও রামের সোহাগিনী।

(নলিয়াগ্রাম থেকে সংগৃহীত)

প্রথম বাঙালী নৃত্যকে শ্রদ্ধার চোখে দেখলেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। তাঁর 'নববৃন্দাবন' নাটকে নৃত্যের স্থান অতি উচ্চে ছিল। তার পর রবীন্দ্রনাথ শুধু চোখের দেখা দেখলেন না, তার প্রচলন সুরু ক'রে দিলেন তাঁর শান্তিনিকেতনে। বর্ত্তমানে উদয়শঙ্কর ও তিমিরবরণের। প্রভাবে দেশে নৃত্যের একটা নবজাগরণ সুরু হয়েছে। উদয়শঙ্করের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত কুমারী অমলা নন্দীও কলিকাতার কোন-একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠানে নৃত্য শিক্ষা দিচ্ছেন।*

* এই প্রবন্ধের সাঁওতাল নৃত্য, প্রণয়-নৃত্য ছবি দুখানি শিল্পী শ্রীকুলজারঞ্জন চৌধুরী কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

আলোচনা

"পরলোকে পুরুলিয়ার হরিপদ দাঁ"

'হরিপদ সাহিত্য-মন্দিরে'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার সেন জানাইয়াছেন :—

বর্ত্তমান ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে পুরুলিয়ার ৺হরিপদ দাঁ মহাশয়ের সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়টির উল্লেখ থাকা উচিত ছিল—

গত ১৩৩১ সালে হরিপদ দাঁ মহাশয় পুস্তকাগারটি নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং সাধারণ পাঠাগার গৃহটি কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপন ব্যয়ে তাঁহার মৃতপত্নী সুশীলা দেবীর স্মৃতি রক্ষার্থ গত ১৩৩৯ সালে প্রস্তুত করিয়া দেন। সেই কারণে পুস্তকাগারের নাম "হরিপদ-সাহিত্য-মন্দির", ও "সাধারণ পাঠাগার" গৃহে "সুশীলা দেবীর-স্মৃতি" নামক একটি প্রস্তর ফলক সংলগ্ন রহিয়াছে।

"অস্পৃশ্যতা"

কুমার সত্যজিৎ দাশ খুলনা হইতে লিখিয়াছেন :—গত আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত শশধর রায় 'অস্পৃশ্যতা' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, বারুই জাতি পূর্ব্বে সর্ব্বত্র অচল ছিল, বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই আচরণীয় হইয়াছে।

বাংলা দেশে বস্তুতঃ দুই জাতি আছে বলা যায়—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। শূদ্রের কতিপয় জাতি জল-চল, কতিপয় জল-অচল। বারুজীবী জাতি কখনই কোথাও জল-অচল শূদ্র নহে। তথ্যের দিক দিয়া এ-কথা বলিতে পারি যে বারুজীবী জাতি অবিসংবাদিত ভাবে নবশাখ বলিয়া সর্ব্বত্রই পরিগণিত এবং নবশাখ জল-চল-শূদ্র। আচারে, ব্যবহারে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে বারুজীবী জাতি হিন্দুসমাজের প্রচলিত সমাজ-সংস্থানে জল-চলের সম্মান পাইতেছেন, তাহাকে জল-অচল বলিলে তথ্যের অবমাননা করা হয়।

স্পষ্ট কথা

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

ওগো-ও সমাজ-রাজা,
দশের দেওয়া মুকুট যে নেওয়া—
রাজারও হয় সাজা!
শুচি-বাই-রোগী, ছুঁতের বাতিক
আর ত চলে না!—দেখি' বেগতিক
শাস্ত্রে শস্ত্র [illegible] আধুনিক
ভুল-ইতিহাস অতীতের!
দেশটা বানাবে পণ্ডিতের?

[illegible]নিলাম দ্বারে!
[illegible] অন্ধের আঁখি,
দ্বন্দ্বের অন্ধকারে।
[illegible] গ্লানি চির-অপযশের
সব বয় যারা সারা দেশের!
তারা যে বন্ধু দিন-শেষের—
যারা না-মানে সে ঋণ
[illegible] ত তারাই হীন!

যোগের সহস্র খোপ
পুরুষেরই খেলা! নারী নিয়ে খেলা?
নিজ-দোষে তার বিলোপ!

অবলা নাম-ত কিনেছ ঢের,
বাড়ালে অত্যাচারেরই জের
তুমি যে মুক্তি শক্তি দেশের
যদি নিজ মূর্ত্তি ধর
দানবে মানব কর!

চেতন, না অচেতন?
হাসি পায় রোষে, সহিছ কি দোষে
অপমান-অপহরণ?
বোচকা-পুঁটলী পরের অধীন—
নও যে তুমি,—দেখাবে যে দিন,
হাতে হাতে শোধ পীড়নের ঋণ!—
সেই-ত তোমার রূপ!
পশুর কসুর চুপ!

আত্মঘাতিনী দল!
ভাঙাবে মান পায়ে ধ'রে আজ
কবির অশ্রু-জল!
ভাত-কাপড়ের অলীক-মালিক তোরে
রূপ-যৌবন তত্ত্ব-যৌতুক ধ'রে
দেয় ছুটি, যাও নিজ পায়ে ভর ক'রে
বাঁচো, কত কাজ শত খাতে!
মরে ভেবে, কেউ মরে ভাতে!

চিত্র-পরিচয়

শিবাজী ও মুসলমান বন্দিনী

মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষ আবাজী কল্যাণ-দুর্গ অধিকার করিলে বিজাপুরী কিল্লাদার আহমেদের পরিজনবর্গ বন্দী হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে আহমেদের পুত্র-বধূর রূপ-লাবণ্য আবাজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি ঐ তরুণী রূপসীকে মারাঠারাজ ছত্রপতি শিবাজীর নিকট প্রেরণ করেন। তরুণীর সৌন্দর্য্য শিবাজীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিল। শিবাজী বলিয়া উঠিলেন—আমার মাতা যদি তোমার ন্যায় রূপবতী হইতেন তবে আমিও রূপবান হইতাম।

অসংকোচিত ব্যবহারে আপ্যায়িত করিয়া শিবাজী প্রচুর উপঢৌকনসহ এই তরুণীকে বিজাপুরে প্রেরণ করেন।

জাপানে মহিলা প্রগতি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মহিলারা শিক্ষা-দীক্ষায় পুরুষের ন্যায় অগ্রসর হইতেছে। পরিবারের গণ্ডীর ভিতরে তাহাদের কার্য্য এখন আবদ্ধ নয়। সমাজ-সেবার বিভিন্ন বিভাগে তাহা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। জাপান বর্ত্তমান জগতের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্র। সে দেশের নারীগণও কর্ম্মের নানা ক্ষেত্রে যোগদান করিতেছে।

জাপানী মহিলা পূজা-নিবেদন করিতে মন্দিরে গমন করিতেছেন।

জাপানী মহিলারা নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিলেও তাহাদের সহজ বৈশিষ্ট্যগুলি এখনও সম্পূর্ণ অব্যাহত আছে। জাপানী মহিলা পিতৃকুল ও পতিকুল উভয়কেই সমান সম্মানের চক্ষে দেখে। তাহার মত পিতৃভক্ত, পতিব্রতা নারী অন্যত্র বিরল। সন্তান-প্রতিপালনেও তাহার সমধিক আগ্রহ। মধ্যযুগের মত বর্ত্তমানেও জাপানী মহিলা পরিবারের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিয়া থাকে।

কুমারী এম্ শিম্পো লস্ এন্‌জেলেসের বিশ্ব-অলিম্পিক ক্রীড়ায় বর্শা ছোড়া প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

কুমারী এইচ মিহাতা লস এন্‌জেলেসের বিশ্ব-অলিম্পিক ক্রীড়ায় সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ফুজি পর্ব্বতে জাপানী বালিকারা চায়ের পাতা তুলিতেছে।

উতামারো (১৭৫৪-১৮০৬) অঙ্কিত জাপানী জেলেনী (কাঠ খোদাই)।

জাপানী নারীগণকে রীতিমত গৃহস্থালী শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা গৃহমধ্যেই আবদ্ধ থাকে না। তাহারা গৃহের বাহিরে নানা শ্রমসাধ্য কার্য্যেও লিপ্ত হয়। জাপানী কৃষক কুলবধুরা চাষ-আবাদের সময় ভোর হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে কার্য্য করে। সেখানকার কতকগুলি কার্য্যে পুরুষের অপেক্ষা নারী পরিশ্রম করে বেশী। জাপানী জেলেনীরা সমুদ্রে ডুব দিয়া মণি-মুক্তা আহরণ করে। এই কার্য্য তাহাদের একরূপ একচেটিয়া।

প্রাচীন কালের ভারতীয় মহিলারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিত। অন্ততঃ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার জাপানী মহিলারাও যে এইরূপ বিদ্যার চর্চ্চা করিত তাহার নিদর্শন আছে। সে-যুগে রাজপ্রাসাদে মহিলা কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। মহিলারা শুধু কেরাণীগিরি করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, প্রাসাদের দৈনন্দিন ঘটনাবলী—রাজা-রাণী কি বলিতেন করিতেন সকলই তাহারা লিখিয়া রাখিত। এই সকল কাহিনী এখন বড়ই আদরের সামগ্রী। একত্রিশ ছত্র পরিমিত 'ওয়াকা' কবিতা রচনায়ও সে-যুগের মহিলারা সিদ্ধহস্ত ছিল। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এই কবিতার আদান-প্রদান হইত। রাজ-দরবারের মহিলারা সকলেই কবি। এই সকল রোজ-নামচা, কবিতা ও কাহিনীর কতকাংশ মাত্র এখন পাওয়া যায়। ইহাদের সাহিত্যিক উৎকর্ষ সেকালের পুরুষের রচনা অপেক্ষা মোটেই নিকৃষ্ট নয়। সে-যুগের মুরাসাকী শিকিবুর 'গেঞ্জী কাহিনী' এবং শিশোনাগনের 'মাকুরানোসোশী' নামক সংকলন-পুস্তক জাপানী সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

নাটকের অভিনয়েও ইহারা কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল। চা

শতাব্দী পূর্ব্বে ইজুমো-নো-ওকুনি নামে এক অভিনেত্রী ছিল। 'ওকুনি কাবুকি' অভিনয়ে ইহার বেশ সুনাম হয়। জাপানের বর্ত্তমান 'কাবুকি' অভিনয় 'ওকুনি কাবুকি' হইতে উদ্ভূত।

জাপানী মহিলার শারীরিক শক্তির আভাস ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছি। ইদানীং ইহাদের শরীর চর্চ্চার কথাও প্রকাশ পাইয়াছে। কুমারী হিতোমি ও কুমারী মিহোতার কথা সকলেরই অল্প-বিস্তর জানা। হিতোমি এক জন প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি এখন পরলোকে। কুমারী মিহোতা সন্তরণে বহু বিদেশী সন্তরণ-বীরকেও হারাইয়া দিয়াছেন। জাপানী নারীরা জুজুৎসু ও অস্ত্রবিধ ক্রীড়া-কৌতুকের চর্চ্চা বহুদিন ধরিয়া করিয়া আসিতেছে। আমরা সম্প্রতি তাহা সবিশেষ জানিতে পারিয়াছি।

টোকিওতে বৌদ্ধ মহাসম্মেলন

গত ১৮ই জুলাই হইতে ২৫এ জুলাই পর্য্যন্ত জাপানের টোকিও নগরে বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধগণের এক মহাসম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে অন্যূন সাত শত প্রতিনিধি সমবেত হন। ভারতবর্ষের পক্ষ হইতেও দুই জন প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করেন। সম্মেলন সম্পর্কীয় তিনখানি চিত্র এখানে দেওয়া হইল।

জাপানী মহিলারা নৃত্য-গীত-সহকারে বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের বিদেশী প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিতেছেন।
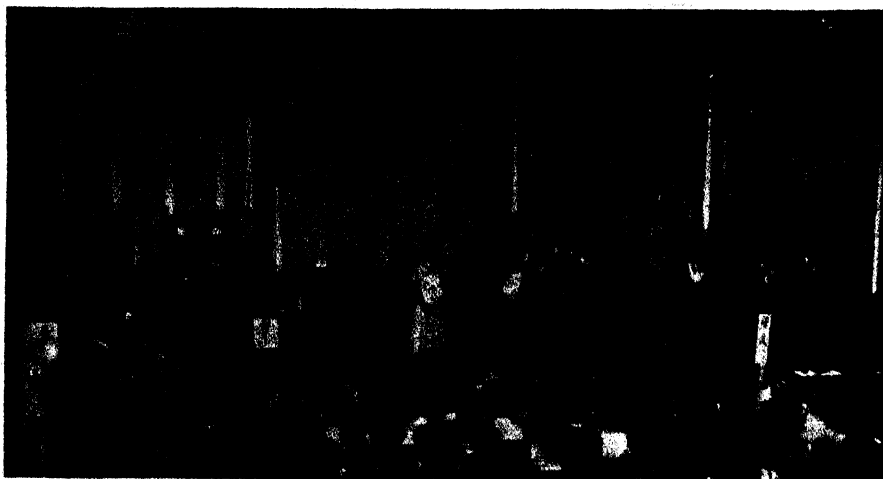
১। বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের উদ্বোধন-উৎসব।
২। সম্মেলন-মণ্ডপ
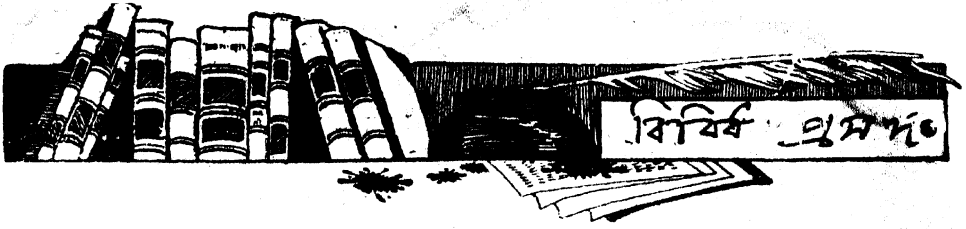
রাজস্ব সম্বন্ধে বঙ্গের প্রতি অবিচার

বাংলা দেশে যত রাজস্ব আদায় হয়, তাহার অধিকাংশ—মোটামুটি দুই-তৃতীয়াংশ—ভারত-গবন্মেণ্ট গ্রহণ করেন এবং তাহা প্রধানতঃ ভারতবর্ষের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশে স্থিত প্রদেশসমূহে ব্যয় করেন। প্রথমতঃ, বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের এত অধিক অংশ ভারত-গবন্মেণ্টের লওয়া অনুচিত, এবং দ্বিতীয়তঃ, তাহা লইয়া যে-যে বিভাগে ও যে-যে প্রকারে তাহা ব্যয়িত হয় তাহা হইতে পরোক্ষভাবে বাঙালীদিগকে বঞ্চিত রাখা অনুচিত। ভারত-গবন্মেণ্টের সর্ব্বপ্রধান ব্যয় সামরিক। সৈন্যদলে এবং সৈন্যদের অনুচরদের মধ্যে বাঙালী নাই বলিলেই হয়। সুতরাং তাহাদের বেতন বাবতে প্রদত্ত সরকারী টাকার কোন অংশ বঙ্গে আসে না বলিলেই হয়। সৈন্যদলের জন্য নানাবিধ সাজ সরঞ্জাম পোষাক ইত্যাদি ক্রয় করিতে গবন্মেণ্টের অনেক টাকা খরচ হয়। এই সকল জিনিষ বঙ্গে প্রস্তুত করান হয় না। সুতরাং সেদিক দিয়াও বাংলা দেশ লাভবান্ হয় না। যদিও আমরা ইহা স্বীকার করি না, যে, বরাবর বাঙালীদিগকে সৈন্যদলে লইলে তাহারা যুদ্ধ করিতে পারিত না, তথাপি যদি ইহা মানিয়া লওয়া যায়, যে, বাঙালী রণনিপুণ নহে, তাহা হইলেও বাঙালীকে সামরিক এইরূপ অনেক বিভাগে কাজ দেওয়া যায়, যুদ্ধ করা যে-সকল বিভাগের কর্ম্মচারীদের প্রধান কাজ নহে। যেমন, হিসাব বিভাগ, নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক বিভাগ, রসদসংগ্রহ ও বণ্টন বিভাগ, এবং নানা প্রকার কেরানীর কাজ। গবন্মেণ্ট কোন প্রদেশের বা ধর্ম্মের লোকদিগকে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া অন্যান্য প্রদেশের ও ধর্ম্মের লোকদের প্রতি অবিচার করুন, ইহা আমরা চাই না। কিন্তু এরূপ দাবি ন্যায়সঙ্গত, যে, কোন প্রদেশের প্রতি কোন দিকে ও কোন প্রকারে অবিচার হইয়া থাকিলে ও হইতে থাকিলে, অন্য দিকে ও অন্য প্রকারে সেই অবিচার-জনিত ক্ষতি পূরণ করা হউক। সেই জন্য আমরা বলি, ভারত-গবন্মেণ্টকে বাংলা দেশের গবন্মেণ্টের বলা উচিত, সামরিক বিভাগের জন্য আবশ্যক জিনিষপত্র যথাসম্ভব বাংলা দেশে প্রস্তুত করান ও বাংলা দেশ হইতে সংগ্রহ করা হউক, সামরিক হিসাব বিভাগ, নানা বৈজ্ঞানিক বিভাগ, রসদ-সংগ্রহ ও বণ্টন বিভাগ প্রভৃতিতে এরূপ বাঙালীদিগকে নিযুক্ত করা হউক যাহারা অন্য দেশ বা প্রদেশের প্রার্থীদের সমকক্ষ বা তাহাদের চেয়ে যোগ্যতর।

সামরিক ব্যয় ছাড়া বঙ্গের বাহিরে ভারত-গবন্মেণ্টের আরও নানা রকম ব্যয় আছে যাহা হইতে বাংলা দেশ লাভবান্ হয় না। সেই সব ব্যয়ের বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক, এবং কি করিলে বাংলা দেশ ও বাঙালী লাভবান হইতে পারে, তাহারও পথ এই সকল বিষয়ের বিশেষজ্ঞেরা প্রদর্শন করিলে ভাল হয়।

—

মহিলা "বেদতীর্থ"

বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশ্যনের সংস্কৃতপরীক্ষামানদান-পরিষদের গত অধিবেশনে, অর্থাৎ, চলিত কথায়, সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে উপাধিদানের সভায়, সভাপতি মাননীয় বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় স্বীয় সংস্কৃত অভিভাষণে বলেন,

"এতদস্মাকং বর্ষেঽস্মিন্ মহদ্গৌরবকারণং জাতং যদেকা ব্রাহ্মণকুমারা সংস্কৃতমহাবিদ্যালয়স্থগবেষণাবিভাগীয়ান্তেবাসিনী 'বেদতীর্থ' ইত্যুপাধিনা সমলঙ্কৃতা। ইতঃ প্রাক্ কদাপি কাঽপি মহিলা পরীক্ষার্থিনী অনেনোপাধিনা নৈব ভূষিতাঽভবৎ।"

"এই বৎসর আমাদের এই মহৎ গৌরবের কারণ হইয়াছে, যে, সংস্কৃতমহাবিদ্যালয়ের গবেষণাবিভাগের ছাত্রী ব্রাহ্মণকুমারী 'বেদতীর্থ' উপাধিতে সমলঙ্কৃতা হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে কখনও কোন মহিলা পরীক্ষার্থিনী এই উপাধির দ্বারা ভূষিতা হন নাই।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ইংরেজী অভিভাষণে অধিকন্তু বলেন, যে, ছাত্রীটি অক্সফর্ডে ডক্টর অব ফিলসফি ("দর্শনাচার্য্য") উপাধি লাভের জন্য ইংলণ্ড যাইতেছেন এবং তন্নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ঘোষ ভ্রমণবৃত্তি"

শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী

চারি হাজার টাকা পাইয়াছেন; মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে এই বৃত্তি পাইয়াছেন।

এই মহিলা শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী, এম্, এ। ইনি ইংরেজী ও সংস্কৃত এই দুই বিষয়ে এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং "শাস্ত্রী" উপাধি লাভের জন্য রীক্ষা দিয়াছেন। তিনি প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলনে নিযুক্ত য়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসিক এক শত টাকা বৃত্তি াছিলেন। তিনি যেমন বিদুষী, সর্ব্বপ্রকার গৃহকর্ম্মে া নিপুণা। পিতা স্বর্গগত আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার র বহুবর্ষব্যাপী পীড়ায় অসাধারণ সেবা করিয়া ভক্তি রায়ণতারও পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অতুলপ্রসাদ সেন

লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে অযোধ্যা, আগ্রা-অযোধ্যা, ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ও শিক্ষালাভ করিয়া পরে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যান। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পর দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করেন। পরে তিনি লক্ষ্ণৌ চীফ কোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে যান। কালক্রমে তিনি তথাকার প্রধান আইনজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হন, এবং সেখানকার বার-এসোসিয়েশ্যনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। লক্ষ্ণৌতেই তিনি স্থায়ী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। যে রাস্তায় তিনি বাড়ি করেন, লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপালিটি তাঁহার সম্মানার্থ তাহার নাম রাখেন অতুলপ্রসাদ রোড্। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, দানও তদ্রূপ করিতেন। কোনও সৎকর্ম্মের আবেদন, কোন বিপন্নের প্রার্থনা তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি ধনী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন নাই।

আইনজ্ঞান ও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনের জন্যই যে তিনি লক্ষ্ণৌয়ে সম্মান পাইতেন তাহা নহে, তিনি লক্ষ্ণৌয়ের প্রধান নাগরিক ("First Citizen") বলিয়া স্বীকৃত হইতেন (এবং মৃত্যুর পর বহু শোকসভায় ঐ নামে অভিহিত হইয়াছেন) এই জন্য, যে, তিনি মানুষটি অতি সহৃদয়, অমায়িক, সজ্জন, বিদ্বান্, সমুদয় হিতপ্রচেষ্টার ও সকল সদনুষ্ঠানের সহায় এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুর অভাব ছিল না, শত্রু কেহ ছিল না। তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে উদারনৈতিক ছিলেন, এবং সমগ্রভারতীয় উদারনৈতিক সংঘের এক অধিবেশনের সভাপতি, আগ্রা-অযোধ্যার প্রাদেশিক উদারনৈতিক সভার সভাপতি এবং উক্ত প্রদেশের উদারনৈতিক কন্‌ফারেন্সের দুই অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি খাঁটি "স্বদেশী" ছিলেন এবং স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন।

শিক্ষাবিস্তারকার্য্য তাঁহার প্রিয় ছিল। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

তাঁহাকে উহার ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদ দিবার প্রস্তাব হয়। তিনি তাহা গ্রহণ না-করিয়া ডক্টর রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জপেকে উহা দিতে বলেন। তদনুসারে পরাঞ্জপে মহাশয় উহাতে নিযুক্ত হন।

তিনি যেমন আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশকে নিজের বাসভূমি করিয়াছিলেন, তথাকার লোকেরাও তেমনি তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্য দিকে তিনি আবার সেই প্রদেশের প্রবাসী বাঙালীদের এক জন নেতা ও লক্ষ্ণৌয়ের বাঙালীদের নেতা ছিলেন। তাঁহাদের সব সামাজিক কাজে, সব সংস্কৃতিমূলক কাজে, বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদে, শিক্ষায় তাঁহারা তাঁহার সহযোগিতা লাভ করিতেন। প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, এবং ইহার দুই অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রবাসী বাঙালীদের মাসিকপত্র 'উত্তরা'র তিনি প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের মধ্যে তাঁহার স্মৃতি জাগরূক থাকিবে গানরচয়িতা, সুগায়ক, এবং কবি বলিয়া। তিনি প্রাণের গভীর আবেগে গান ও কবিতা রচনা করিতেন, এবং তিনি যে গান করিতেন তাহাতে তাঁহার প্রাণের ও মর্ম্মবেদনার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার গান ও কবিতার "কাকলী" "কয়েকটি গান" ও "গীতিকুঞ্জ" এই তিনখানি বহি মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার অনেকগুলি গান বাঙালী সমাজে সুপরিচিত। তাহার দুই একটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। এগুলি "জাতীয়-সঙ্গীত"-শ্রেণীর। একটি এই :—

হও ধরমেতে বীর, হও করমেতে ধীর,
হও উন্নতশির, নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান—হবে জয়।
তেত্রিশ কোটি মোরা, নহি কভু ক্ষীণ,
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন,
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন ;
ঐ দেখ প্রভাত উদয়।
নানা ভাব, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান ;
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান, জগজন মানিবে বিস্ময়।
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে, বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে,
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে, সত্যের নাহি পরাজয়।

আর একটি এইরূপ—

বল বল বল সবে, শত বীণা বেণু-রবে,
ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
কর্ম্মে মহান হবে, ধর্ম্মে মহান হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।

অতুলপ্রসাদ সেন

আজো গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী,
এখনো অমৃতবাহিনী,
প্রতি প্রান্তর প্রতি গুহাবন, প্রতি জনপদ,
তীর্থ অগণন,
বহিছে গৌরবকাহিনী।
বিদুষী মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী,
সতী, সাবিত্রী, সীতা, অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্রপ্রসূতি,
আমরা তাদেরি সন্ততি,
অনলে দহিয়া যারা রাখে মান,

পতিপুত্র তরে সুখে ত্যজে প্রাণ,
আমরা তাদেরি সন্ততি।

নিম্নোদ্ধৃত তৃতীয় গানটি খুব বেশী সভাসমিতিতে গীত হইয়া থাকে।

উঠগো ভারতলক্ষ্মী, উঠ আদি জগতজনপূজ্যা,
দুঃখদৈন্য সব নাশি কর দূরিত ভারতলজ্জা,
ছাড়গো ছাড় শোকশয্যা কর সজ্জা,
পুন [illegible]
জননীগো লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বনাবাস দেহ তুলে চক্ষে.
কাঁদিছে তব চরণতলে,
ত্রিংশতি কোটি নরনারীগো।
কাণ্ডারী নাহিক কমলা
দুখলাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী,
কালসাগরকম্পন দর্শে,
তোমার অভয়পদস্পর্শে, নব হর্ষে
পুনঃ চলিবে তরণী শুভলক্ষ্যে ;
জননীগো ইত্যাদি।
ভারতশ্মশান কর পূর্ণ,
পুনঃ কোকিলকূজিত কুঞ্জে,
দ্বেষ হিংসা করি চূর্ণ,
কর পুরিত প্রেম অলিগুঞ্জে.
দূরিত করি পাপপুঞ্জে. তপঃতুঞ্জে
পুনঃ বিমল কর ভারত পুণ্যে,
জননীগো ইত্যাদি।

"জাতীয়-সঙ্গীত" এবং অন্য সাধারণ সঙ্গীত ছাড়া তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত অনেকগুলি আছে। তাহার মধ্যে একটি উদ্ধৃত করিব। তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির মধ্যে তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নহে, কারণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোনটি বলা কঠিন, কিন্তু এই বলিয়া, যে, তিনি, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ অনুসারে, উপেক্ষিত অনাদৃত অনুন্নত লোকদের সেবা বহুপূর্ব্ব হইতেই করিয়া আসিতেছিলেন, যখন হরিজনদের সেবার আধুনিক আন্দোলন আরব্ধ হয় নাই, এবং এই গানটিতে তাঁহার দীন-সেবক হৃদয়ের ছাপ পড়িয়াছে।

নীচুর কাছে নীচু হ'তে শিখলি না রে মন!
(তুই) সুখী জনের করিস্ পূজা, দুখীর অযতন, (মূঢ় মন)!
লাগেনি যার পায়ে ধূলি, কি নিবি তার চরণধূলি.
নয়রে সোনায়, বনের কাঠেই হয়রে চন্দন, (মূঢ় মন)!
প্রেমধন মায়ের মতন, দুঃখী সুতেই অধিক যতন,
এই ধনেতে ধনী যে জন, সেই ত মহাজন, (মূঢ় মন)!
বৃথা তোর কৃচ্ছ্র সাধন, সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ সাধন!
মানবের পরম তীর্থ দীনের শ্রীচরণ, (মূঢ় মন)!
মতামতের তর্কে মত্ত, আছিস্ ভু'লে পরম সত্য,
সকল ঘরে সকল নরে আছেন নিরঞ্জন, (মূঢ় মন)!

এই গানটি অতুলপ্রসাদের "কাকলী" নামক গ্রন্থে আছে। বাউলের সুর, দাদ্‌রা।

প্রদেশসমূহে শিক্ষার সরকারী ব্যয়

বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের অধিকাংশ ভারত-গবন্মেণ্ট গ্রহণ করায় একটি কুফল এই হইয়াছে, যে, বাংলা দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক বিভাগে ব্যয় অত্যন্ত কম হয়। বঙ্গের রাজস্ব প্রধানতঃ বঙ্গেই ব্যয়িত হইলেও এই সব বিভাগ রাজস্বের ন্যায্য অংশ পাইত কি না, তাহা অনুমান করিয়া আলোচনা করা নিষ্ফল। সুতরাং তাহা করিব না।

শিক্ষার জন্য বঙ্গে সরকারী ব্যয় কিরূপ কম হয়, তাহা ভারত-গবন্মেণ্টের আধুনিক পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট হইতে দেখাইব। ইহা ১৯২৭-৩২ সালের রিপোর্ট। নীচের তালিকার অঙ্কগুলি ঐ রিপোর্ট হইতে গৃহীত। ব্যয় ১৯৩১-৩২ সালের।

প্রদেশ।	লোকসংখ্যা।	সরকারী শিক্ষা-ব্যয়
মান্দ্রাজ	৪,৬৭,৪০,১০৭	২,৫৫,৭১,৭১৫
বোম্বাই	২,১৮,৫৪,৮৬৬	১,৯০,০১,৬৪৪
বাংলা	৫,০১,১৪,০০২	১,৪৪,৫০,০৩৯
আগ্রা-অযোধ্যা	৪,৮৪,০৮,৭৬৩	২,১৭,৯৭,০৩৩
পঞ্জাব	২,৩৫,৮০,৮৫২	১,৬৪,৯২,৬৮১
বিহার-উড়িষ্যা	৩,৭৬,৭৭,৫৭৬	৫৫,৬৭,৮২৩
মধ্যপ্রদেশ	১,৫৫,০৭,৭২৩	৪৭,৬২,২২৭
আসাম	৮৬,২২,২৫১	২৮,৮২,৬০৬

বঙ্গের লোকসংখ্যা সব প্রদেশের চেয়ে বেশী। অথচ এখানকার সরকারী শিক্ষাব্যয় মান্দ্রাজ, বোম্বাই, আগ্রা-অযোধ্যা ও পঞ্জাবের চেয়ে কম। বঙ্গের লোকসংখ্যা বোম্বাইয়ের আড়াই গুণ, কিন্তু বোম্বাই-গবন্মেণ্ট বাংলা-গবন্মেণ্টের চেয়ে শিক্ষাব্যয় বেশী করেন। বঙ্গের লোকসংখ্যা পঞ্জাবের দ্বিগুণের অধিক। পঞ্জাবেও বঙ্গের চেয়ে সরকারী শিক্ষাব্যয় বেশী। এই সব প্রদেশের প্রত্যেকটিতেই মোট রাজস্ব আদায় বঙ্গের চেয়ে কম হয়, এবং ভারত-গবন্মেণ্ট কোন প্রদেশ হইতেই বঙ্গের রাজস্বের মত এত বেশী অংশ গ্রহণ করেন না।

বিহার-উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের লোকসংখ্যা ও সরকারী শিক্ষাব্যয় বঙ্গের চেয়ে কম ; কিন্তু এই সব প্রদেশে রাজস্ব-আদায়ও বঙ্গের চেয়ে খুব কম হয়।

১৯২৬-২৭ সালে বঙ্গে সরকারী শিক্ষাব্যয় ছিল ১,৪৭,৯৪,৬৮৬ টাকা। পাঁচ বৎসর পরে ১৯৩১-৩২ সালে তাহা কমিয়া হয় ১,৪৪,৫০,০৩৯ টাকা। অর্থাৎ শিক্ষার ব্যয় কোথায় ক্রমাগত বাড়িবে, তাহা না হইয়া ৩,৪৪,৬৪৭ টাকা কমিয়াছে! ভারত-গবর্ন্মেণ্টের পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টে ১৯৩১-৩২ সালে বঙ্গের সরকারী শিক্ষাব্যয় ১,৪৪,৫০,০৩৯ লেখা হইয়াছে, কিন্তু ১৯৩২-৩৩ সালের বঙ্গীয় শিক্ষারিপোর্টে তাহা ১,৪৪,৪৬,৮৫১, অর্থাৎ আরও কম, লিখিত হইয়াছে। সরকারী শিক্ষাব্যয়ের হ্রাস এখানেই থামে নাই। ১৯৩২-৩৩ সালে উহা আরও কমিয়া ১,৩৫,২১,৪৩৩ টাকা হইয়াছিল—আরও নয় লক্ষের উপর কমিয়াছিল!!

—

শিক্ষাব্যয়ের ছাত্রদত্ত অংশ বঙ্গে অধিকতম

বাংলা দেশে ১৯৩১-৩২ সালে মোট শিক্ষাব্যয় হয় ৪,২২,৮৭,০৩৬ টাকা। ইহার মধ্যে গবর্ন্মেণ্ট দেন ১,৪৪,৫০,০৩৯, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি দেন ১৬,৪৮,৬৬২, মিউনিসিপ্যালিটিগুলি দেন ১৫,০৪,৯৪৩ (মোট পব্লিক টাকা ১,৭৬,০৩,৬৪৪), ছাত্রেরা বেতন বাবতে দেন ১,৮০,০২,৫৭৯ এবং আয়ের অন্যান্য সংস্থান হইতে পাওয়া যায় ৬৬,৮০,৮১৩ টাকা। অন্য কোন প্রদেশেই ছাত্রদের নিকট হইতে এত বেশী টাকা আদায় হয় না। নীচের তালিকা দেখুন।

১৯৩১-৩২ সালের হিসাব—

প্রদেশ।	ছাত্রদত্ত বেতন।	প্রদেশ।	ছাত্রদত্ত বেতন।
মাদ্রাজ	৯৭৪১৯৪০	পঞ্জাব	৭২১৫০২৭
বোম্বাই	৮১১৭৫৩০	বিহার-উড়িষ্যা	৪০৬০৫০৭
বাংলা	১৮০০২৫৭৯	মধ্যপ্রদেশ	১৭৫৪৮৫৭
আগ্রা-অযোধ্যা	৬৭৫৭৬১৭	আসাম	৮৩৩৯৪৯

১৯৩২-৩৩ সালের বঙ্গীয় শিক্ষারিপোর্ট এই বৎসর জুলাই মাসে বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখিতেছি, ছাত্রদত্ত বেতনের সমষ্টি ১৯৩২-৩৩ সালে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বাড়িয়া, ১,৮০,০২,৫৯৭ টাকার জায়গায় ১,৮২,৬৫,১৭৭ টাকা হইয়াছে। অর্থাৎ গবর্ন্মেণ্ট ক্রমশঃ শিক্ষাব্যয়ের নিজ অংশ কমাইতেছেন, এবং ছাত্রদের অভিভাবকেরা ক্রমশঃ অধিকতর দিতেছেন। তাহার আর একটি প্রমাণ এই, যে, ১৯২৬-২৭ সালে বঙ্গে ছাত্রদের প্রদত্ত বেতনের সমষ্টি ছিল ১,৬২,১৯,৫৯৩, এবং তাহা বাড়িয়া ১৯৩২-৩৩ সালে হয় ১,৮২,৬৫,১৭৭ টাকা। অবশ্য ইহা ঠিক্ বটে, যে, ছাত্রের সংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়া তাহাদের প্রদত্ত বেতনের সমষ্টিও বাড়িতেছে। কিন্তু ছাত্র যেমন বাড়িতেছে, গবর্ন্মেণ্টেরও তেমনি শিক্ষাব্যয়ের নিজ অংশ বাড়ান উচিত; নতুবা শিক্ষার উৎকর্ষ কি প্রকারে সাধিত হইবে? এক হাজার ছাত্রের জন্য গবর্ন্মেণ্ট যত ব্যয় করেন, বার শত ছাত্রের জন্য তার চেয়ে কম ব্যয় করিলে শিক্ষার উন্নতি কেমন করিয়া হইবে?

—

শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গের স্থান

বঙ্গে শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষার উন্নতি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গের অগ্রণীত্ব প্রধানতঃ বাঙালীদের শিক্ষানুরাগ ও শিক্ষার জন্য দানে ঘটিয়াছে বা ঘটিয়াছিল। শিক্ষানুরাগ বাঙালীর এখনও আছে, যদিও শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশী হওয়ায় সেই অনুরাগে প্রবল আঘাত লাগিতেছে। কিন্তু শিক্ষানুরাগ সমান থাকিলেও শুধু অনুরাগেই ত শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি হইতে পারে না; তাহার জন্য ব্যয় করিবার সামর্থ্য থাকা চাই। আগেই দেখাইয়াছি, বঙ্গের গবর্ন্মেণ্ট শিক্ষাব্যয়ের নিজ অংশ কমাইতেছেন। ছাত্রদত্ত বেতনের সমষ্টি বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু অভিভাবকদের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে। বঙ্গে দীর্ঘকাল ধরিয়া ধনী ছিলেন জমিদারেরা। ধনী জমিদার কিছু এখনও আছেন। কিন্তু শ্রেণী হিসাবে এখন জমিদারেরা দুরবস্থাপন্ন। আগে যে-সব জমিদার শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধরদের সে ব্যয় করিবার ক্ষমতা নাই। বঙ্গের বাণিজ্যও প্রধানতঃ অবাঙালীদের হস্তগত—অনেক ছোট ছোট ব্যবসা পর্য্যন্ত অবাঙালীদের হাতে গিয়াছে। এই জন্য শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয় করিবার ক্ষমতা বঙ্গে বাঙালীদের চেয়ে অন্যান্য প্রদেশে তথাকার লোকদের বেশী।

এই কারণে দেখিতে পাইতেছি, লোকসংখ্যা হিসাবে বঙ্গে ছাত্রছাত্রীর মোটসংখ্যা অন্য যে-কোন প্রদেশের চেয়ে বেশী হওয়া উচিত হইলেও বস্তুতঃ অন্য প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে বেশী নয়। নীচের তালিকায় তাহা দেখাইতেছি। ইহা ১৯৩২ সালের হিসাব।

প্রদেশ।	মোট ছাত্রছাত্রী।	লোকসংখ্যার শতকরা কয় জন।
মাদ্রাজ	২৯,২৪,৮৮২	৬.২৫
বোম্বাই	১৩,৩৫,৫৪৭	৬.১১
বাংলা	২৭,৮৩,২২৫	৫.৫৫
আগ্রা-অযোধ্যা	১৫,১৭,৯৮৮	৩.১৩
পঞ্জাব	১৩,৩৩,৫৬৭	৫.৬১

এই তালিকায় দেখা যাইতেছে, যে, বঙ্গের লোকসংখ্যা অন্ত প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে বেশী হইলেও, ইহার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মাদ্রাজের চেয়ে কম। মোট লোকসংখ্যার শতকরা কয় জন কোন-না-কোন শিক্ষালয়ে শিক্ষা পাইতেছে, তাহার হিসাবেও দেখিতে পাই, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও পঞ্জাব বাংলা দেশের চেয়ে অগ্রসর।

ভারতের কোন প্রদেশেই উচ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বা প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার হয় নাই। সুতরাং উচ্চশিক্ষা বা মাধ্যমিক শিক্ষা স্থগিত রাখিয়া বা কমাইয়া প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে আরও মন দেওয়া হউক, আমরা মোটেই এরূপ ইচ্ছা করি না। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার ভিত্তি বলিয়া উহার যথেষ্ট বিস্তার হইতেছে কি না, তাহা দেখা একান্ত আবশ্যক। বালিকাদের মধ্যে উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার সামান্তই হইয়াছে; অধিকাংশ বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। এই জন্য প্রাথমিক শিক্ষার হিসাবে কেবল বালকদের সংখ্যা দেখাইব। সকল বয়সের ও শিক্ষাশ্রেণীর ছাত্রীদের সংখ্যা একত্র দেখাইব। ১৯৩১-৩২ সালের সংখ্যা দিব।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পাইতেছে মাদ্রাজে ২২,৬৫,৯৬০ জন বালক, বোম্বাইয়ে ৯,৭৫,৮৬৬, বঙ্গে ১৬,৮২,৫০৩, আগ্রা-অযোধ্যায় ১১,৩৬,৬৪৯, পঞ্জাবে ৩,৮৬,৪৭০। প্রাথমিক শিক্ষাতেও মাদ্রাজ অগ্রণী। জনবহুলতম বাংলা অগ্রণী নহে।

নারীরাও মানুষ বলিয়া তাহাদের জ্ঞানলাভ শিক্ষালাভ আবশ্যক। তদ্ভিন্ন, যে-পরিবারের গৃহিণী শিক্ষিতা সে-পরিবারে বালকবালিকা সকলকেই শিক্ষা দিবার প্রয়াস থাকে। এই জন্য কোন্ প্রদেশ কত অগ্রসর তাহার খবর লইতে হইলে নারীশিক্ষার বিস্তার কোন্ প্রদেশে কিরূপ হইতেছে তাহা জানা দরকার।

১৯৩২ সালের হিসাবে দেখিতে পাইতেছি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাথমিক পাঠশালা পর্য্যন্ত মোট ছাত্রীর সংখ্যা মাদ্রাজে ৭,৪২,৫৩৬, বোম্বাইয়ে ২,৯২,৬৫৮, বঙ্গে ৫,৫৯,৭১২, আগ্রা-অযোধ্যায় ১,৬৭,৬১১, পঞ্জাবে ২,১৩,২৮৭। এক্ষেত্রেও মাদ্রাজ প্রথমস্থানীয়, বাংলা নহে। মোট নারীসংখ্যার শতকরা কয় জন শিক্ষা পাইতেছে, সে-হিসাবে দেখি, মাদ্রাজে শতকরা ৩·১ জন, বোম্বাইয়ে ২·৮, বঙ্গে ২·৩। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে বঙ্গের চেয়ে পর্দার প্রকোপ কম, এবং স্ত্রীশিক্ষানুরাগী হিন্দুদের অনুপাত বেশী। তা ছাড়া, ঐ দুই প্রদেশে সহশিক্ষার চলন বেশী। মাদ্রাজে ছেলেদের শিক্ষালয়ে শিক্ষা পায় ৩,৭৯,৪৩৪ জন মেয়ে, বোম্বাইয়ে ১,০৫,৮৭৮ জন, এবং বঙ্গে ৯৭,৯২৬ জন।

বঙ্গে মেয়েদের শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। ১৯৩২ সালে উহা ছিল মাদ্রাজে ৪৪,৭১,০৯১ টাকা, বোম্বাইয়ে ২৫,৬৩,১১২, বঙ্গে ১৮,০৯,৩২৮, আগ্রা-অযোধ্যায় ১৫,৪৮,৭৭৯, এবং পঞ্জাবে ১৭,৬৭,১২২।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষায় বঙ্গের স্থান স্থির করিতে হইলে জানিতে হইবে, যে, বঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় দুটির ও কলেজগুলির ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২৭,৬২৩, মাদ্রাজে ২০,৯৭৬, বোম্বাইয়ে ১৪,৪৯৯ এবং পঞ্জাবে ১৬,৯৭১। শুধু সংখ্যা দেখিয়া মনে হইতে পারে, বাংলা এক্ষেত্রে অগ্রসরতম, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বঙ্গের লোকসংখ্যা বোম্বাইয়ের প্রায় আড়াই গুণ। সুতরাং বোম্বাইয়ের হিসাবে বঙ্গের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোটামুটি পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হাজার হওয়া উচিত ছিল। পঞ্জাবের লোকসংখ্যা বঙ্গের অর্দ্ধেকের কম। সুতরাং পঞ্জাবের হিসাবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসকলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ন্যূনকল্পে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার হওয়া উচিত ছিল।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়সকলে ছাত্রসংখ্যা ১৯৩১-৩২ সালে মাদ্রাজে ছিল ২,০৬,৩২২, বোম্বাইয়ে ১,২৪,১৬৭, বঙ্গে ৪,৫১,৬৭২, আগ্রা-অযোধ্যায় ২,১৭,১২০ এবং পঞ্জাবে ৬,৭৯,৫৮০। প্রদেশগুলির প্রত্যেকটির লোকসংখ্যা মনে রাখিলে বুঝা যাইবে, যে, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও বঙ্গের আরও উন্নতি হওয়া উচিত। পঞ্জাবের হিসাবে আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে চৌদ্দ-পনের লক্ষ ছাত্রছাত্রী হওয়া উচিত।

আমরা তুলনার জন্য যে-সব সংখ্যা দিয়াছি, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি সকলকেই ধরা হইয়াছে। সকলের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হইলে তবে সে দেশ বা প্রদেশকে উন্নত বলা যায়। বঙ্গে হিন্দুরা শিক্ষায় মুসলমানদের চেয়ে কিছু অগ্রসর বলিয়া বাংলা দেশটাই উন্নত, এরূপ মনে করা ভুল।

আমরা আগেই বলিয়াছি, শিক্ষাবিষয়ে বঙ্গের উন্নতি প্রধানতঃ বঙ্গের লোকদের—বিশেষতঃ হিন্দুদের—চেষ্টায় হইয়াছে। গবর্ন্মেণ্ট শিক্ষার ব্যয়ের নিজের অংশ ক্রমশঃ কমাইতেছেন। গবর্ন্মেণ্ট নিজের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট শিক্ষাদান বিষয়ে নিজের কর্ত্তব্য করুন বা না-করুন, আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য আমাদিগকে করিতে হইবে। একা একা বা অন্য দশ জনের সহিত মিলিত হইয়া আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া সাধ্যানুসারে উচ্চতর শিক্ষালয় স্থাপন ও পরিচালন করিতে পারি। প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত পুরুষ ও নারীরা ত শিক্ষাবিস্তারকল্পে অনেক কাজ করিতে পারেনই; যে-সব ছেলেমেয়ে বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়াছে, তাহারা পর্য্যন্ত নিরক্ষর ছেলেমেয়ে ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকদিগকে অ আ ক খ চিনাইয়া দিতে পারে।

—

শারদীয় অবকাশে কর্ত্তব্য

শারদীয় অবকাশে হাজার হাজার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলা এবং হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী নিজেদের গ্রামে ও শহরে যাইবেন। তাঁহারা ছুটির আনন্দ উপভোগ করুন। সেই সঙ্গে নিরক্ষর লোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কিছু চেষ্টা তাঁহারা করিতে পারিলে তাঁহাদের আনন্দ বাড়িবে।

—

বঙ্গে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী জ্ঞাপনী

বঙ্গে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য ও মন্তব্য বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট প্রেস-অফিসারের মারফৎ খবরের কাগজের সম্পাদকদিগকে জানাইয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে, যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা প্রকার সুবিধা সত্ত্বেও ছাত্রসংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। ইহা দুঃখের বিষয়। ঢাকায় শিক্ষার ব্যয় কম; অথচ ভাল ভাল অধ্যাপক আছেন, লাইব্রেরী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণার বন্দোবস্ত ও সরঞ্জাম বেশ আছে। স্বাস্থ্যও ভাল। আমরা এ-সব কথা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, যে, ঢাকায় ছাত্র ও ছাত্রী আরও বেশী হওয়া উচিত। তাহা না হইবার কারণ সম্বন্ধে আমাদের অনুমান এই, যে, অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়াছে, এবং কতকগুলি ঘটনা ও সরকারী ব্যবস্থার দরুন ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক আশঙ্কা আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগে ছাত্র বেশ বাড়িয়া আবার যে কমিয়া গিয়াছিল ও ধীরে ধীরে বাড়িতেছে, সরকারী মতে তাহার কারণ আর্থিক ও রাজনৈতিক।

১৯৩২ সালে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগে ছাত্রীসংখ্যা ৫৬ ছিল। তাহা ১৯৩৩ সালে দ্বিগুণ হয়। ইহা সন্তোষের বিষয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজসমূহে ১৯৩২-৩৩ সালে ২০,৩২৩ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে হিন্দু ১৭,০৯০, মুসলমান ২,৮১৮ এবং অন্যান্য ৪১৫ ছিল। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আরও বেশী হওয়া উচিত—বিশেষতঃ মুসলমানদের মধ্যে।

কলেজগুলিতে ১৯২৭ সালে ২২,২৪০ জন ছাত্রছাত্রী ছিল, তাহা কমিয়া ১৯৩২ সালে ১৯,৭৪৪ হয়। সরকারী মতে ইহার প্রধান কারণ কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্যহ্রাস ও তজ্জনিত অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থার অবনতি।

সরকারী কাগজটিতে বলা হইয়াছে—

"It will be seen, therefore, that, taking all colleges together, more than half the cost of educating a student comes from provincial revenue."

তাৎপর্য্য। "অতএব, ইহা দৃষ্ট হইবে, যে, সব কলেজ একত্র লইলে, এক-একটি ছাত্রকে শিক্ষা দিবার ব্যয়ের অর্দ্ধেকেরও বেশী প্রাদেশিক সরকারী রাজস্ব হইতে আসে।"

সরকারী কলেজগুলির ছাত্রসমূহের শিক্ষাব্যয় ১৩,৩৬,০৩২ টাকার দুই-তৃতীয়াংশ—৯,১৬,৯৮৪ টাকা—গবর্ন্মেণ্ট দেন। সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলির ছাত্রদের শিক্ষাব্যয় ১২,১১,২৮৭ টাকার মধ্যে ২,১৭,৮০৫ অর্থাৎ প্রায় ষষ্ঠ অংশ গবর্ন্মেণ্ট দেন। বেসরকারী কলেজগুলির

ছাত্রদের শিক্ষাব্যয় ৭,৭৭,৫৬৪ টাকার মধ্যে সরকার কিছু দেন নাই। সব রকম কলেজের সব ছাত্রদের শিক্ষাব্যয়ের মোট পরিমাণ ১৯৩২-৩৩ সালে ছিল ৩৩,২৪,৮৮৩ টাকা। তাহার মধ্যে গবর্মেণ্ট দিয়াছেন ১১,৫৫,৪৯১ টাকা এবং ছাত্রেরা বেতন বাবদে দিয়াছে ১৮,৭৫,৪৫৮ টাকা। সুতরাং গবর্মেণ্ট অর্দ্ধেকের উপর দিয়াছেন কি প্রকারে, বুঝা গেল না। সরকারী কলেজে অর্দ্ধেকের উপর দিয়াছেন সত্য, অন্য কোন কলেজে নহে। এই সমস্ত সংখ্যা সরকারী জ্ঞাপনীতেই আছে।

উপসংহারে এই সরকারী মত প্রকাশ করা হইয়াছে, যে,

"So far as higher education is concerned, Bengal has no reason to be anything but proud of her record."

তাৎপর্য্য। "উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা দেশ তাহার কৃতিত্বের জন্য গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে।"

"শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গের স্থান" প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি, যে, লোকসংখ্যা ধরিলে, বোম্বাই ও পঞ্জাবে উচ্চশিক্ষার বিস্তার বাংলা দেশ অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গের গর্ব্বিত হইবার বিন্দুমাত্রও কারণ নাই।

—

ব্রিটেনে ও বঙ্গে উচ্চশিক্ষা

উচ্চশিক্ষায় ভারতবর্ষের মধ্যেই বঙ্গের কৃতিত্ব সর্ব্বাধিক নহে, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি ও বলিয়াছি। বিলাতের তুলনায়, যে, উহা কত কম, তাহা এখন বাঙালীদিগকে এবং বাংলা-গবর্মেণ্টকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

কারখানায় শিল্পদ্বারা নানাবিধ পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য ইস্কুল বঙ্গে নাই বলিলেই চলে, তদ্বিষয়ক উচ্চশিক্ষার কলেজ মোটেই নাই। ইংলণ্ডে, ওয়েল্‌সে ও স্কটল্যাণ্ডে এরূপ স্কুল-কলেজ অনেক আছে। তাহাদের সংখ্যা ও তাহাদের ছাত্রদের সংখ্যা সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব না। আমাদের কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন প্রধানতঃ কেতাবী বিদ্যা শিখান হয়, তাহার প্রয়োগ শিখান হয় না, বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়-সকলেও প্রায় সেইরূপ। বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা দ্রব্য উৎপাদন শিখাইবার বন্দোবস্ত বিলাতে আলাদা আছে।

এখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে ও তাহাদের অঙ্গীভূত কলেজগুলিতে কত ছাত্র আছে, এবং বিলাতী ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে কত ছাত্র আছে, তাহা বলিতেছি। তাহার আগে জানান দরকার, যে, বঙ্গের লোকসংখ্যা পাঁচ কোটির উপর, এবং ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স্ ও স্কটল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ৪,৪৭,৯০,৪৮৫, অর্থাৎ বাংলা দেশের চেয়ে কম।

১৯৩২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার কলেজগুলিতে ২৭,৬২৩ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রী ১৯৩০-৩১ সালে বিলাতে কত ছিল, ১৯৩৪ সালের হুইটেকার্স য়্যালম্যানাক অনুসারে (পৃষ্ঠা ৪০৫) তাহার হিসাব এই—

ইংলণ্ডের ১১টি	বিশ্ববিদ্যালয়ে	৩৪,৯৬০
ওয়েলসের ১টি	”	৩,০৭০
স্কটল্যাণ্ডের ৪টি	”	১১,৬৫০
১৬	”	৪৯,৬৮০

অর্থাৎ বঙ্গের চেয়ে কম লোকসংখ্যাবিশিষ্ট ঐ তিনটি দেশে—ব্রিটেনে—বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজসমূহে বঙ্গের প্রায় দ্বিগুণ ছাত্রছাত্রী পড়ে। তা ছাড়া, ব্রিটেনে নানাবিধ শিল্প ও বৃত্তি শিখিবার উচ্চ বহুসংখ্যক শিক্ষালয়ে যত ছাত্রছাত্রী শিক্ষা পায়, বঙ্গে যাহার সমতুল্য কিছু নাই, তাহাদের উল্লেখ করিলাম না।

অতএব, গর্ব্বিত হইবার মত কিছু বাংলা দেশ ও তাহার গবর্মেণ্ট করেন নাই।

—

সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতের সরকারী শিক্ষাব্যয় শুধু লণ্ডনের চেয়ে কম!

সমগ্র ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ২৭,১৭,৮০,১৫১। লণ্ডন কৌণ্টী অর্থাৎ লণ্ডন জেলার লোকসংখ্যা ৪৩,৯৬,৮২১। পাঠশালার ছেলেমেয়েরাও জানে, লণ্ডন ইংলণ্ডের ও ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের রাজধানী। এই রাজধানীর আশপাশের কিছু শহরতলী তাহাতে যুক্ত করিয়া একটি কৌণ্টী বা জেলা গঠিত হইয়াছে, এবং তাহার শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কীয় কাজ লণ্ডন কৌণ্টী

কৌন্সিল বা লণ্ডন জেলাবোর্ড দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। তাহার শিক্ষাসম্বন্ধীয় কাজের বিষয়ে ১৯৩৪ সালের হুইটেকার্স্ অ্যালম্যানাকের ৬৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—

"The Education service involves an annual expenditure of nearly £ 13,000,000."

"কৌন্সিলের শিক্ষাবিষয়ক কাজে বার্ষিক প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ পৌণ্ড খরচ হয়।"

এই বহির ৬৭৪ পৃষ্ঠায় লণ্ডন কৌণ্টী কৌন্সিলের শিক্ষাবিষয়ক ব্যয়ের ঠিক পরিমাণ দেওয়া আছে। তাহা ১,২৭,১৭,৩৫৪ পৌণ্ড। বিলাতী এক পৌণ্ড আমাদের ১৩⅓ টাকার সমান। ১,২৭,১৭,৩৫৪ পৌণ্ড আমাদের ১৬,৯৫,৬৪,৭২০ টাকার সমান। তাহা হইলে লণ্ডন জেলা বোর্ড ৪৩,৯৬,৮২১ জন অধিবাসীর শিক্ষার জন্য প্রায় সতর কোটি টাকা খরচ করেন।

ভারত-গবর্ন্মেণ্টের এডুকেশ্যন্যাল কমিশনার স্যর জর্জ এণ্ডার্সন ১৯২৭-৩২ সালের যে পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা-রিপোর্ট লিখিয়াছেন, তাহার দ্বিতীয় ভল্যুমের ৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশের ১৯৩১-৩২ সালের শিক্ষাব্যয়ের যে-অংশ গবর্ন্মেণ্ট দেন, তাহার পরিমাণ ১২,৪৬,০৭,০৯৩ টাকা। এই বার কোটি টাকা লণ্ডন জেলার ষোল কোটির চেয়ে কম। কথা উঠিতে পারে, যে, জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটিসমূহ শিক্ষার জন্য যাহা ব্যয় করেন, তাহাও সরকারী টাকা এবং তাহাও সরকারী শিক্ষাব্যয় বলিয়া গণিত হওয়া উচিত। তথাস্তু। ব্রিটিশ-ভারতের সমুদয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি ২,৮০,০১,৩১৩ টাকা এবং মিউনিসিপালিটিগুলি ১,৫৮,১৭,২২২ টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন। এই দুটি টাকা গবর্ন্মেণ্টের টাকার সহিত যোগ করিলে মোট সরকারী শিক্ষাব্যয় হয় ১৬,৮৪,২৫,৬২৮ টাকা। কিন্তু সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতের সরকারী শিক্ষাব্যয় এই ১৬,৮৪,২৫,৬২৮ টাকাও লণ্ডন জেলাবোর্ডের শিক্ষাব্যয় ১৬,৯৫,৬৪,৭২০ টাকার চেয়ে কম।

ব্রিটিশ-ভারতের ২৭,১৭,৮০,৩৫১ জন অধিবাসীর শিক্ষার নিমিত্ত এদেশে সরকারী ব্যয় যত হয়, বিলাতের একটি জেলাবোর্ড তাহার চুয়াল্লিশ লক্ষ লোকের জন্য তাহা অপেক্ষা বেশী ব্যয় করেন। এক দিকে সাতাশ কোটি মানুষ, অন্য দিকে চুয়াল্লিশ লক্ষ মানুষ!

বিলাতে শিক্ষার জন্য যে এত বেশী খরচ হইতে পারে, তাহার কারণ তথাকার লোকেরা ধনী ও স্বশাসক; তাহারা বেশী ট্যাক্স দিতে সমর্থ এবং এই ট্যাক্সের টাকা কিরূপে খরচ হইবে, তাহার চূড়ান্ত নির্দ্দেশ তাহাদের প্রতিনিধিরাই করে। আমাদের দেশে শিক্ষার জন্য বেশী খরচ হইতে পারে না এই জন্য, যে, আমরা ধনী ও স্বশাসক নহি; বেশী ট্যাক্স দিতে পারি না এবং যাহা দিই, তাহা কিরূপে ব্যয়িত হইবে তদ্বিষয়ে চূড়ান্ত নির্দ্দেশ করিতে আমরা বা আমাদের প্রতিনিধিরা অসমর্থ। ব্রিটেনের ধনী হইবার একটি কারণ, ভারতবর্ষ অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহার অধিকারে আসিয়াছিল এবং এখনও অধিকারে আছে। যে-দেশ ব্রিটেনের অধিকারে আসা ও থাকা ব্রিটেনের ধনী হইবার একটি কারণ, সে-দেশের নিজেরও ধনী হইবার সম্ভাবনা আছে। এবং পৃথিবীর কোনও দেশের পক্ষেই স্বশাসক হওয়া অসম্ভব নহে। উদ্যোগ ও একাগ্র চেষ্টা থাকিলে আমরা স্বশাসক ও ধনী হইতে পারি, এবং শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যয় নিজেরা করিতে পারি ও গবর্ন্মেণ্ট, মিউনিসিপালিটি ও জেলাবোর্ড প্রভৃতিকে করাইতে পারি।

শিক্ষার উপর এত জোর আমরা দিতেছি এই জন্য, যে, শিক্ষা ব্যতিরেকে আমরা পৃথিবীর অন্য সভ্য ও বড় জাতিদের সমকক্ষ কখনও হইতে পারিব না। অতএব, আমরা দরিদ্র হইলেও, সুস্থ সবল থাকিবার খরচ ছাড়া অন্য সব খরচ কমাইয়া বা ছাঁটিয়া দিয়া, শিক্ষাতে অর্থ, সময় ও শক্তি নিয়োগ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

—

নারীহরণাদি অপরাধ বৃদ্ধি

১৯৩৩ সালের বঙ্গীয় পুলিস রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, যে, ঐ সালে নারীহরণাদি অপরাধ বাড়িয়াছে। ১৯৩২ সালেও যে উহা বাড়িয়াছিল, তাহাও প্রসঙ্গতঃ ঐ রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে। ১৯৩২ সালের পুলিস রিপোর্টে তাহা লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই সালের বঙ্গীয় শাসন রিপোর্টে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, যে, ঐরূপ অপরাধ বাড়ে নাই।

১৯৩৩ সালের পুলিস রিপোর্টের উপর সকৌন্সিল গবর্ণর বাহাদুরের মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে :—

"It is deplorable that offences against women coming under sections 366 and 354 of the Indian Penal Code, again show an increase. There were 52 cases more compared with the figure of the previous year, or an increase of 7·5 per cent. The increase reported in 1932 as compared with 1931 was 94 or 15.7 per cent, so that, though the position is far from satisfactory, the rate of increase has declined."

তাৎপর্য্য। "ইহা শোচনীয়, যে, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৬৬ ও ৩৫৪ ধারা মতে দণ্ডনীয় নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ আবার বাড়িয়াছে। ১৯৩২এর তুলনায় ১৯৩৩ সালে ৫২টা মোকদ্দমা, অর্থাৎ শতকরা ৭·৫টা বাড়িয়াছে। ১৯৩১এর তুলনায় ১৯৩২ সালে ৯৪টা অর্থাৎ শতকরা ১৫·৭ বাড়িয়াছিল। অতএব, অবস্থাটা সন্তোষজনক না হইলেও, অপরাধ-বৃদ্ধির হার কমিয়াছে।"

এরূপ অপরাধ দমন সম্বন্ধে সরকারী মন্তব্যে বলা হইয়াছে—

"The matter is one which continues to engage the attention of Government, and the question whether the Whipping Act of 1909 should not be amended so as to make persons convicted of offences against women liable to the punishment of whipping is now under examination. The attention of local officers will be drawn to the necessity of putting down the evil in those districts where the number of cases shows an increase."

তাৎপর্য্য। "এই বিষয়টি গবর্ন্মেণ্টের মনোযোগ পাইয়া চলিতেছে। ১৯০৯ সালের বেত্রাঘাত আইন এরূপভাবে সংশোধিত হওয়া উচিত কিনা, যাহাতে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধীদিগকে বেত্রাঘাত দণ্ড দেওয়া চলে—এই প্রশ্নটি এখন বিবেচিত হইতেছে। যে-সব জেলায় এই অপরাধ বাড়িয়াছে, তথাকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী-দিগকে ইহা দমন করিবার দিকে মন দিতে বলা হইবে।"

বঙ্গের অস্থায়ী গবর্ণর স্যর জন উড্‌হেড্‌ ঢাকায় পুলিস-কর্ম্মচারী ও কনেষ্টবলদিগকে পুরস্কারদানকালে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলিয়াছেন—

"There is a particular form of crime to which Sir John Anderson made special reference last year and which still gives cause for anxiety, and that is crime against women. I have noticed with concern that there was an increase in this class of crime during 1933. It is not possible to say how far the increase is real or how far it may be due to a greater readiness on the part of interested parties to report cases of this kind, but it is clear that a remedy is called for. The matter is one which continues to engage the attention of Government and, as has already been announced in the resolution on the working of the Police Department for the year 1933, the question of making offences against women punishable by whipping is under consideration. But, whatever decision is arrived at on that thorny question, there is much that the police can do to discourage and prevent these despicable crimes. I do not doubt that you are already fully alive to this fact, but it is evident that there is room for improvement and I look to all ranks to co-operate in removing what is rapidly becoming a serious blot on this province."

তাৎপর্য্য। "বিশেষ রকমের একটা অপরাধের বিষয় স্যর জন এণ্ডার্সন গত বৎসর বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন, যাহা এখনও উদ্বেগ জন্মাইতেছে; তাহা নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ। ১৯৩৩ সালে এই শ্রেণীর অপরাধ বাড়িয়াছিল, ইহা আমি উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। এই বৃদ্ধি কতটা প্রকৃত, কতটাই বা ইহা, যাহারা এইরূপ দুষ্কর্ম্ম দমনে ইচ্ছুক তাঁহারা আগেকার চেয়ে তাহার খবর দিতে বেশী প্রস্তুত হইয়াছেন বলিয়া তাহার ফল, বলা সম্ভব নহে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট, যে, ইহার প্রতিকার চাই। এই বিষয়টিতে গবর্ন্মেণ্ট আগেকার মত মনোযোগ করিতেছেন, এবং, পুলিস রিপোর্টের উপর সরকারী মন্তব্যে যেমন বলা হইয়াছে, নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধে বেত্রাঘাত দণ্ড দেওয়া হইবে কিনা তাহা বিবেচনাধীন আছে। কিন্তু এই বিঘ্নসঙ্কুল প্রশ্নটি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, পুলিস এরূপ অনেক কিছু করিতে পারে, যাহাতে এই ঘৃণিত দুষ্কর্ম্মসকলের দমন ও নিবারণ হইতে পারে। আমার সন্দেহ নাই, যে, আপনারা এ-বিষয়ে ইতিমধ্যেই সচেতন আছেন; কিন্তু ইহাও সুস্পষ্ট, যে, আপনাদের কর্ত্তব্যসাধনে অনেক উন্নতির অবসর আছে। এবং আমি সর্ব্বশ্রেণীর পুলিস কর্ম্মচারীর নিকট ইহা আশা করিতেছি, যে, তাঁহারা, যাহা বঙ্গের একটা গুরুতর কলঙ্কে পরিণত হইতে চলিয়াছে, তাহা দূরীকরণে সহযোগিতা করিবেন।"

উড্‌হেড্‌ সাহেব প্রবীণ সিভিলিয়ান। অনেক জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিয়া পুলিসের কার্য্যকারিতা এবং অবহেলা বা অকর্ম্মণ্যতা দুই দিকই ভাল করিয়া জানেন। তিনি, উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলির শেষের দিকে যাহা ভদ্রভাষায় বলিয়াছেন, তাহার সোজা অর্থ এই, যে, নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমনে পুলিসের যাহা কর্ত্তব্য তাহা পূর্ণমাত্রায় সাধিত হয় না, অনেক কিছু করিবার আছে যাহা পুলিস করে নাই কিন্তু তাহাদের করা উচিত। অবশ্য পুলিস-বিভাগের উচ্চকাজে নিযুক্ত এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা এই শ্রেণীর অপরাধের গুরুত্ব বুঝেন এবং তাহার দমন ও নিবারণ চান। নীচের দিকেও এরূপ কর্ম্মচারী একেবারেই নাই, এমন বলা যায় না। কিন্তু মোটের উপর স্যর জন উড্‌হেডের এ-কথা সত্য, যে, পুলিসের দ্বারা এই-সব দুষ্কর্ম্ম দমন ও নিবারণকল্পে যাহা হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। এখন যদি তাহা হয়, তাহা হইলে মঙ্গল।

"সঞ্জীবনী"র সম্পাদক বার্দ্ধক্যসত্ত্বেও নারীহরণাদি

নিবারণ ও দমনকল্পে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। এই বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অনতিক্রান্ত। তিনি লিখিয়াছেন—

পুলিশের সাহায্য না পাইলে নারীহরণ বাঙ্গলাদেশ হইতে কখনও দূর করা যাইবে না। সার জন তাহা জানেন, সুতরাং পুলিশকে এই দুষ্কর্ম নিবারণে বিশেষ মনোযোগ দিতে বলিয়াছেন। অনেক সময়ে নিম্নশ্রেণীর পুলিশ নারীহরণ অপরাধ দমন করিতে অবহেলা করে, নারীহরণ যে অপরাধের বিষয়, তাহা দমন করা যে পুলিশের কর্ত্তব্য, তাহাও তাহারা মনে করে না। ভূতপূর্ব্ব পুলিশ-ইনস্পেক্টার জেনারেল মিঃ লোম্যান ও গবর্ণর সার জন এণ্ডার্সন প্রভৃতি অনেকে পুলিশকে তাহাদের কর্ত্তব্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি উচ্চ শ্রেণীর পুলিশ কর্ম্মচারীরা নারীহরণ যেমন গুরুতর অপরাধ বলিয়া মনে করেন, নিম্নশ্রেণীর অনেক কর্ম্মচারী তেমন মনে করেন না। কোন কোন স্থলে থানায় খবর দিতে গেলে পুলিশ এজাহার গ্রহণ না করিয়া অভিযোগকারীদিগকে তাড়াইয়া দেন। সে যাহা হউক, আমরা অতীতের কথা আলোচনা করিতে চাই না। ভবিষ্যতে বাঙ্গলার সমস্ত থানায় পুলিস নারীহরণ দমনের জন্য মনোযোগী হইবেন এবং সার জন উডহেড যেমন বাঙ্গলার কলঙ্ক দূর করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, ছোট বড় সকল শ্রেণীর পুলিশ সেইরূপ প্রয়াসী হইবেন। গবর্ন্মেণ্টের নিকট আমাদের অনুরোধ এই, শীঘ্র অপরাধীদিগকে বেত্রদণ্ড দানের ব্যবস্থা করুন। কিন্তু কেবল বেত্রদণ্ড নয়, তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করিলে তাহাদের মনে ভয় হইবে না।

অপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করাও যে উচিত, আমরাও তাহা আগে আগে লিখিয়াছি। অনেক সময় অপহৃতা নারীকে গোপনে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, গৃহ হইতে গৃহান্তরে লইয়া রাখা হয়। যাহারা এইরূপে বদমায়েসদের সহায় হইয়া অপহৃতা নারীকে নিজ নিজ গৃহে লুকাইয়া রাখিতে দেয়, তাহাদেরও শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত, ইহাও আমরা অনেক বার লিখিয়াছি।

এক সময়ে অষ্ট্রেলিয়ায় দলবদ্ধ ভাবে নারীহরণ ও নারীধর্ষণের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় তথাকার গবর্ন্মেণ্ট অপরাধীদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। তাহাতে এই অপরাধ বন্ধ হইয়া যায়। কলিকাতা হাইকোর্টের পরলোকগত জজ সৈয়দ আমীর আলী এদেশেও দলবদ্ধভাবে নারীর উপর অত্যাচারের জন্য প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা চাহিয়াছিলেন। আমরা সাধারণতঃ প্রাণদণ্ডের পক্ষপাতী নহি। কিন্তু এইরূপ অপরাধে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড নিশ্চয়ই হওয়া উচিত।

—

নারীনিগ্রহের প্রতিকারে সামাজিক কর্ত্তব্য

নারীদের উপর অত্যাচার দমন ও নিবারণের জন্য গবর্ন্মেণ্ট কি করিতে পারেন, তাহার আলোচনা রাজপুরুষেরা করিয়াছেন, গবর্ন্মেণ্টের প্রধান ব্যক্তি বক্তৃতায় ও পুলিস রিপোর্টের উপর মন্তব্যে করিয়াছেন। এই আলোচনায় প্রধানতঃ পুলিস কি করিতে পারে এবং অপরাধীদের শাস্তি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাই আলোচিত হইয়াছে। গবর্ন্মেণ্টের এবং সর্ব্বসাধারণের আর এক দিকেও কর্ত্তব্য আছে। নারীদিগকে আত্মরক্ষায় সমর্থ করিবার চেষ্টা যত করা যাইবে, এই কর্ত্তব্য ততই সাধিত হইবে।

অনেক স্থলে দেখা যায়, কোন বালিকা হয়ত শ্বশুরালয়ে উৎপীড়িতা, তাহাকে পিতৃগৃহে লইয়া যাইবার লোভ দেখাইয়া দুর্বৃত্ত লোকেরা তাহাকে শ্বশুরালয় হইতে লইয়া যায় এবং তাহার উপর অত্যাচার করে। কখনও বা কোনও বধূকে দুর্বৃত্ত লোকেরা এই মিথ্যা সংবাদ দেয়, যে, তাহার পিতা, মাতা, বা অন্য স্বজন পীড়িত, এবং তাঁহার সহিত দেখা করিতে লইয়া যাইবার ছলে তাহার সর্ব্বনাশ করে। শিক্ষিতা বালিকা বা মহিলাকে এই প্রকারে ঠকান সহজ হয় না। সুতরাং নারীশিক্ষার বিস্তার এইরূপ প্রতারণা ও প্রতারণার দ্বারা অত্যাচারের একটা প্রতিকার। যেখানে অন্তঃপুরে বধূদের উপর অত্যাচার হয়, সেখানে পিতৃগৃহে লইয়া যাইবার ছল চলে। অতএব সমাজের এরূপ সংশোধন ও সংস্কার আবশ্যক যাহাতে অন্তঃপুরে বধূদের উপর অত্যাচার না-হয়। বিবাহে বরপক্ষ বাঞ্ছিত বরপণ ও যৌতুক না পাইলে অনেক সময় বধূর উপর অত্যাচার করে। বিবাহ সম্বন্ধে নীচ ধারণা থাকায় এবং কতকটা আর্থিক কারণে এইরূপ অত্যাচার হয়। এ-বিষয়ে লোকমতের উন্নতিসাধন আবশ্যক।

বালিকা ও তরুণী বিধবাদিগকে প্রেমের প্রলোভন দেখাইয়া পরে দুর্বৃত্তেরা তাহাদের উপর অত্যাচার করে। বালবৈধব্য ঘটিতে পারে না যদি বাল্যবিবাহ না-থাকে। অতএব বালবৈধব্যের প্রতিকার দ্বিবিধ—বাল্যবিবাহ বন্ধ করা এবং যাহাদের বাল্যে বিবাহ ও পরে অল্পবয়সেই বৈধব্য ঘটিয়াছে, তাহাদের পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া। বালিকা ও তরুণী বিধবাদের বিবাহ আগেকার চেয়ে বেশী প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার আরও অধিক প্রচলন দরকার।

অনেক স্থলে কোন প্রকার প্রলোভন না দেখাইয়া, কোন রকম ছল প্রতারণা না-করিয়া বলপূর্ব্বক বাড়ির বাহিরে বা বাড়ির মধ্য হইতে হরণ করিয়া কুমারী, সধবা ও বিধবাদের উপর দুর্বৃত্ত লোকে অত্যাচার করে। এসকল স্থলে, যদি আত্মীয়-স্বজন বা অন্য লোক কেহ থাকেন, তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম হইলেও দুর্বৃত্তদের কাজে বাধা দেওয়া উচিত। তাঁহাদের সংখ্যা ও শক্তি যথেষ্ট হইলে দুষ্ট লোকেরা পরাজিত ও ধৃত হইবে। যথেষ্ট না-হইলে হয়ত তাঁহারা আহত বা হতও হইতে পারেন। এরূপ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বদমায়েসদের কাজে বাধা দেওয়া উচিত। এই কর্ত্তব্যবোধ মুসলমান সমাজে ও হিন্দু সমাজে সর্ব্বত্র জাগ্রত হওয়া আবশ্যক। যে-যে গ্রামে ও শহরে ঐরূপ দুর্বৃত্ত লোক আছে বলিয়া জানা যাইবে বা সন্দেহ হইবে, সেখানেই নারীরক্ষক দল গঠিত হওয়া কর্ত্তব্য।

দুর্বৃত্তদের দুষ্কর্ম্মে বাধা দিবার লোক থাকিলে যদি তাঁহারা হত বা আহত ও অক্ষম হন, কিংবা যদি সেরূপ লোক না-থাকেন, কিংবা অন্য যে-কোন অবস্থায়, নারীর উপর অত্যাচারের উপক্রম হইলেই, তিনি যাহাতে প্রাণপণে তাহাতে বাধা দিতে পারেন, সামাজিক মতের দ্বারা ও শিক্ষার দ্বারা নারীদের মনে তদনুরূপ যথেষ্ট সাহস ও শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা করা আবশ্যক, এবং তাঁহাদের শরীরও পটু করিয়া তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রব্যবহারে দক্ষ ও অভ্যস্ত করা উচিত। অস্ত্রও সর্ব্বদা তাঁহাদের কাছে থাকা চাই। এ-সব কথা নিতান্ত পুরাতন, নূতন নয়। কিন্তু পুরাতন কথা পুনঃপুনঃ স্মরণ করিবার প্রয়োজন আছে।

অন্তঃপুরে বা বাহিরে, সম্পর্কিত লোক বা নিঃসম্পর্ক লোক যাহারা নারীদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করে, তাহাদের বিরুদ্ধে জনমত খুব প্রবল হওয়া উচিত। দুষ্ট-লোকেরা ধনী ও পদমর্য্যাদাবিশিষ্ট হইলে তাহাদের সামাজিক শাসন হয় না। ইহা নিতান্ত লজ্জার বিষয়।

নারীরক্ষাবিষয়ে হিন্দুসমাজের কতকগুলি লোক ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে (অর্থাৎ সভা সমিতি আদি গঠন করিয়া) উদ্যোগী হইয়াছেন। আরও অধিক লোকের উদ্যোগী হওয়া উচিত। নারীরক্ষাকল্পে যে-কয়টি সভাসমিতি গঠিত হইয়াছে, অর্থাভাবে তাঁহারা যথেষ্ট কাজ করিতে পারেন না। আমরা তাঁহাদিগকে অর্থ-সাহায্য করি না। ইহা গুরুতর ত্রুটি।

মুসলমান সমাজের কেহ কেহ ব্যক্তিগত ভাবে নারীরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইয়াছে, কেহ কেহ নিজেকে বিপন্ন করিয়াও নারীরক্ষা করিয়াছেন, এরূপ সত্য সংবাদ খবরের কাগজে পড়িয়া প্রীত হইয়াছি, এবং এই সৎলোকগুলির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা অনুভব করিয়াছি। যে-সব বিপন্না বা আক্রান্তা নারীর সাহায্য ইঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে হিন্দুনারী। ইহাতে আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, যে, তাঁহারা নারী বলিয়াই নারীকে সম্মান করিতে, বিপন্ন মানুষের সাহায্য বিপন্ন বলিয়াই করিতে জানেন।

সমষ্টিগতভাবে অর্থাৎ সভাসমিতি গঠন করিয়া মুসলমান সমাজের লোকেরা এ-বিষয়ে কোন কর্ত্তব্য করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেহ আমাদের অজ্ঞতা দূর করিলে উপকৃত হইব।

একবার একটি মুসলমান কাগজে পড়িয়াছিলাম, যে, মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকায় এবং নারীহরণাদি না-হওয়ায় বা খুব কম হওয়ায় এ-বিষয়ে কিছু করিবার প্রয়োজন সে-সমাজে অনুভূত হয় নাই। কিন্তু সরকারী বিবরণে যে-সব সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায়, অত্যাচরিতা নারীদের মধ্যে মুসলমান নারীর সংখ্যাই অধিক। অতএব, যদি সাম্প্রদায়িক ভাবেই এ-বিষয়টির আলোচনা করা যায়, তাহা হইলেও মুসলমানদের সমষ্টিগতভাবে, দলবদ্ধভাবে, কিছু করা উচিত। হিন্দুসমাজে, সকলের দ্বারা অনুসৃত ও পালিত না-হইলেও, যেমন "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ," "যেখানে নারীরা পূজিত হন সেখানে দেবতারা আনন্দ পান," এই বাক্য প্রচলিত আছে, তেমনি মুসলমান সমাজে, "স্বর্গ জননীর পদতলে" বা এতদ্রূপ বাক্য শুনিতে পাওয়া যায়।

আমরা মুসলমান সমাজে শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যেই নারীরক্ষার বিষয়ে অগ্রণীত্ব দেখিবার আশা করি।

হিন্দুসমাজ সভাসমিতি গঠন করিয়াছেন বলিয়া যে বলিয়াছি, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগকেও ধরিয়াছি। যে নারীরক্ষাসমিতির প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র,

তাহা হিন্দুমুসলমান-নির্বিশেষে সকল অত্যাচরিতা নারীর সহায় হইয়া থাকেন।

আগে অত্যাচরিতা হিন্দুনারীদের স্থান হিন্দুসমাজে প্রায়ই হইত না। এখন অনেক স্থলে স্থান হয়। সব স্থলে হয় কিনা বলিতে পারি না। সব স্থলেই হওয়া উচিত ও আবশ্যক।

উপরে প্রসঙ্গতঃ নারীর উপর অত্যাচারের কারণ যে প্রধানতঃ দুর্বৃত্ত লোকদের পাশব দুষ্প্রবৃত্তি তাহা পরোক্ষভাবে বলা হইয়াছে। তা ছাড়া, অন্য কারণও আছে। পৃথিবীর সব মহাদেশের বিস্তর দেশে পাপ-ব্যবসা চালাইবার জন্য অনেক বালিকা ও তরুণীকে ছলে-বলে-কৌশলে সংগ্রহ করা হয়। ভারতবর্ষে এবং বাংলা দেশেও হয়। বঙ্গে অপহৃতা অনেক নারীর যে আর কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহার কারণ, হয় তাহাদিগকে কোন দুর্বৃত্ত লুকাইয়া রাখিয়াছে, কিংবা সামাজিক পাপের দালালদের কাছে দূরে বিক্রী করিয়াছে, কিংবা প্রাণবধ করিয়াছে। বালিকা ও তরুণীদিগকে পাপব্যবসার জন্য পণ্যদ্রব্যের মত ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে লীগ অব্ নেশুন্সের বিস্তৃত রিপোর্ট আছে। ইহা দমন করিবার চেষ্টা নানা দেশে হইতেছে। আমাদের দেশে একবারেই হইতেছে না, এমন নহে। ভারতের মহিলাদেরও দৃষ্টি এদিকে পড়িয়াছে।

কোন কোন নারীহরণের আর একটি উদ্দেশ্য, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইয়া সেই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

বোধনা-নিকেতন

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে স্থাপিত বোধনা-নিকেতনের নাম প্রবাসীর পাঠকেরা জানেন। ইহা জড়বুদ্ধি ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য যাহা করিতে চায়, তাহা পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রবাসীতে লিখিত হইয়াছিল। ইহার দ্বিতীয় বার্ষিক রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহা সচিত্র এবং ইংরেজীতে লিখিত। বাঙালী ছাত্র ভিন্ন বাংলা দেশের বাহির হইতে অবাঙালী দুটি ছাত্র এখানে ভর্ত্তি হইয়াছে। ইহাতে যে-কাজ আরব্ধ হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনীয়তা এবং কাজ কিরূপ চলিতেছে, তাহা যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা ইহা পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। বঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বটমলী সাহেব ইহা দেখিয়া কি বলিয়াছিলেন, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগের অন্যতম কর্ম্মচারী অধ্যাপক ওআর্ড্‌সোআর্থ ইহা দেখিয়া কি লিখিয়াছেন, এবং এইরূপ অন্যান্য লোকদের মত এই রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে। ছাত্রদের কিরূপ উন্নতি হইতেছে, চিত্রের দ্বারা বুঝান হইয়াছে। যাঁহাদের বাড়িতে জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়ে আছে, তাঁহাদের এই রিপোর্টটি দেখা উচিত। জনহিতৈষী অন্য লোকদেরও ইহা দ্রষ্টব্য। ৬১৫ বিজয় মুখুজ্যে গলি, ভবানীপুর, কলিকাতা, এই ঠিকানায় ইহা সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট বিনামূল্যে পাওয়া যায়। যাঁহারা ইহা ডাকে লইতে চান তাঁহারা তাঁহাকে পাঁচ পয়সার ডাক-ষ্ট্যাম্প পাঠাইবেন। এই প্রতিষ্ঠানটির খুব অর্থের প্রয়োজন, এবং ইহা সাহায্যের যোগ্য। যাঁহারা সাহায্য করিতে চান, তাঁহারা টাকাকড়ি গিরিজাভূষণ বাবুর নামে পাঠাইবেন।

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের সম্বর্দ্ধনা

শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রথমতঃ হিমালয়ে ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আমরা যখন তাঁহার ভ্রমণকাহিনীর কথা, "চড়াই উৎরাই" প্রভৃতির কথা, আগ্রহের সহিত "সাহিত্যে" পড়িতাম, সেদিন এখনও মনে পড়ে। পরে তিনি অন্যান্য রচনার দ্বারা খ্যাতিলাভ করেন। সম্পাদকের কাজও তিনি বহু বৎসর করিতেছেন। তাঁহার পঁচাত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায় যথাযোগ্যভাবে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। ইহা ঠিকই হইয়াছে। গবর্ন্মেণ্টও তাঁহার সমাদর করিতে ত্রুটি করেন নাই—তাঁহাকে রায়-বাহাদুর খেতাব দিয়াছেন।

মিস্ মেয়োর আবার ভারত-ভ্রমণ ?

কেহ কেহ খবর পাইয়াছেন, কুখ্যাতা মিস্ মেয়ো আবার ভারতভ্রমণ করিতে আসিতেছে। তাহার আগেকার দুটি কীর্ত্তি আছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা ৩৫।৩৬ বৎসর আগে আমেরিকানদের অধীন হয়। অবধি তাহারা স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে।

আমেরিকার কতক লোক তাহাদের এই চেষ্টার বিরোধী, কারণ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার অধীন থাকিলে তাহারা ধনী হইতে পারে। মিস্ মেয়ো এই দ্বীপগুলিতে বেড়াইয়া এক খানা বহি লিখিয়া দেখায়, যে, তথাকার লোকেরা হেয় ও স্বাধীনতার অযোগ্য, যদিও সত্য কথা তাহা নহে। যাহা হউক, এই ভাড়াটিয়া লেখিকার লেখা সত্ত্বেও আমেরিকার ব্যবস্থাপক সভায় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতার অনুকূল আইন পাস্ হইয়া গিয়াছে। কারণ, আমেরিকার অধিকাংশ লোক—কতক লোক তাহাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং কতক লোক খাঁটি নরহিতৈষণা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা বশতঃ—এখন ফিলিপিনোদের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে।

মিস্ মেয়োর দ্বিতীয় কীর্ত্তি ভারত-ভ্রমণের পর "মাদার ইণ্ডিয়া" ("ভারত জননী") নামক পুস্তক রচনা। ইহাতে ভারতীয়দের প্রাচীন ও আধুনিক বহু কুৎসা আছে। এরূপ বহি লিখিবার কারণ, কয়েক বৎসর হইতে ভারতীয়দের স্বরাজলাভ আন্দোলন প্রবল হইয়াছিল এবং ইংলণ্ডের অল্পসংখ্যক লোক ভারতবর্ষকে স্বরাজ দিতে চায় এই রকম একটা আভাস রটিত হইয়াছিল; কিন্তু অগণিত ইংরেজ ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের বিরোধী ছিল এবং এখনও আছে। পরোক্ষ প্রমাণ হইতে ইহা অনুমিত হইয়াছে, যে, মিস্ মেয়ো ইহাদের চর রূপে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল ও "মাদার ইণ্ডিয়া" লিখিয়াছিল। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে ইহার খুব কাট্‌তি হইয়াছিল এবং ইহা ফ্রেঞ্চ জার্ম্মান প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। এ-দেশের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু এবং তাহারাই প্রধানতঃ স্বরাজলাভের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এই জন্য মিস্ মেয়ো বিশেষ করিয়া তাহাদেরই দোষোদ্ঘাটন করিয়াছে। কোন দেশের কোন জাতিই নিখুঁত নয়—আমরাও নই। কিন্তু অবিমিশ্র দোষের আকরও কোন জাতি নয়। যাহা হউক, মিস্ মেয়োর বহি পড়িয়া অনেক ইংরেজ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির লোকদের ধারণা হইয়াছে, যে, ভারতীয়েরা—বিশেষতঃ হিন্দুরা—অতি অধম জাতি এবং স্বরাজের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

শ্বেতপত্র অর্থাৎ হোয়াইট পেপারে এবং সম্ভবতঃ তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্টে ত ভারতবর্ষকে স্বরাজ দিবার কোন আভাস নাই। সুতরাং তাহাতে বাধা দিবারও কোন প্রয়োজন নাই। অতএব, মিস্ মেয়োর দ্বারা আবার বহি লিখাইয়া ভারতীয়দিগকে হেয় ও স্বরাজের অযোগ্য বলিয়া পুনর্ব্বার প্রমাণ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না। অথবা, একটা প্রয়োজন থাকিতেও পারে। জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর একবার, এবং তদনুসারে পার্লেমেণ্টে ভারত-শাসন আইনের খসড়া উপস্থাপিত হইবার পর আর একবার ভারতীয়দের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে স্বরাজ দেওয়া হইল না বলিয়া আন্দোলন হইতে পারে। এই দুই সময় ইংলণ্ডের কতিপয় ভারত-স্বরাজ-পক্ষপাতীকে এবং ইংলণ্ডের বাহিরের ভারত-স্বরাজের পক্ষপাতী লোকদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে, যে, ভারতীয়েরা অতি অধম, মনুষ্য নামের অযোগ্য।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব বলিয়াছেন, মিস্ মেয়োর পক্ষ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার কোন অনুমতির দরখাস্ত গবর্মেণ্ট পান নাই। কিন্তু দরখাস্ত আসিলে তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে কি না, তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি খবরের কাগজে পড়িয়া থাকিবেন, যে, কয়েক দিন পূর্ব্বে নোবেল-প্রাইজ-প্রাপ্ত আমেরিকান ঔপন্যাসিক সিন্‌ক্লেয়ার লুইসের পত্নীকে জার্ম্মেনী হইতে চলিয়া যাইবার আদেশ হইয়াছে, যেহেতু জার্ম্যান কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা, তিনি সাংবাদিকরূপে খবরের কাগজে জার্ম্মেনীর নিন্দা রটাইতেছিলেন। ভারতবর্ষ জার্ম্মেনীর মত স্বাধীন দেশ হইলে মিস্ মেয়োর প্রতি কি ব্যবস্থা হইত, সিন্‌ক্লেয়ার লুইসের পত্নীর প্রতি জার্ম্মেনের আদেশ হইতে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। নোবেল-প্রাইজপ্রাপ্ত লেখকের পত্নী মিস্ মেয়োর মত যে-সে লোক নহেন।

অথচ তাহার গত বারের ভারতভ্রমণের সময় এই স্ত্রীলোককে গবর্মেণ্ট প্রাসাদে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল।

এবং গবর্ণমেণ্টের লোকদের ও সরকারী কাগজপত্রের সাহায্য সে পাইয়াছিল। বঙ্গে তখন লর্ড লিটন লাট্সাহেব ছিলেন। তাঁহার প্রাসাদ হইতে এক জন ইংরেজ কর্ম্মচারী মিস্ মেয়োর কোন কোন স্থান দর্শন করিবার সুবিধা করিয়া দিবার নিমিত্ত ব্যক্তিবিশেষকে যে চিঠি লেখা হইয়াছিল, আমরা মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীতে তাহার ফোটোগ্রাফিক নকল ছাপিয়াছিলাম। স্বরাষ্ট্রসচিব বলিয়াছেন, ভ্রমণকারীদিগকে যে-সব সুবিধা দেওয়া হয়, মিস্ মেয়োর জন্য তার বেশী কিছু করা হয় নাই। সব বা অধিকাংশ বিদেশী ভ্রমণকারীকে কি গবর্মেণ্ট প্রাসাদে রাখা হয় এবং সরকারী উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীরা কি তাহাদের ভ্রমণ দর্শন প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া দেন?

মিস্ মেয়ো আমাদের কুৎসা করিলেই আমরা ছোট হইয়া যাইব না। প্রকৃত ছোট বা বড় হওয়া আমাদের নিজের হাতে। কিন্তু আমাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের পরোক্ষ সাহায্যে আমাদের অপমান হয়, ইহা আমরা চাই না। পরোক্ষ সাহায্য বলিতেছি এই জন্য, যে, গবর্মেণ্ট প্রাসাদ ও অন্য সমুদয় সরকারী বাড়ি ভারতবর্ষের টাকায় নির্ম্মিত হইয়াছিল ও রক্ষিত হইতেছে এবং এদেশের উচ্চতম হইতে নিম্নতম সরকারী কর্ম্মচারী ভারতবর্ষের টাকা হইতে বেতন পান; ভারতীয়েরা চায় না, যে, তাহাদের প্রদত্ত টাকায় নির্ম্মিত ও রক্ষিত বাড়িতে আশ্রয় পাইয়া তাহাদের বেতনভোগী লোকদের সাহায্যে তাহাদের মিথ্যা কুৎসা প্রচারিত হয়।

—

শরৎচন্দ্র চৌধুরী

সাতাশী বৎসর বয়সে ময়মনসিংহের শরৎচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে ময়মনসিংহের শিক্ষিত সমাজের প্রাচীনতম ব্যক্তির তিরোভাব ঘটিল। তিনি গত কয়েক বৎসর বার্দ্ধক্য বশতঃ অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যখন সামর্থ্য ছিল, তখন নানা সমাজহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। বিদ্যালয়পাঠ্য কয়েকখানি ভাল বহি তিনি লিখিয়াছিলেন। ময়মনসিংহে তিনি একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহা বর্ত্তমান বিদ্যাময়ী বালিকা-বিদ্যালয়ের সূত্রপাত করে। তিনি স্বাধীনচিত্ততা ও উদার হৃদয়ের জন্য পরিচিত ছিলেন।

—

বৈপ্লবিক অপরাধের হ্রাস

১৯৩৩ সালের বঙ্গীয় পুলিস রিপোর্ট ও তাহার উপর সকৌন্সিল গবর্ণর বাহাদুরের মন্তব্য এবং ঐ সালের কলিকাতার পুলিস রিপোর্ট ও তাহার উপর সকৌন্সিল গবর্ণর বাহাদুরের মন্তব্যে দেখিলাম, যে, বঙ্গে বৈপ্লবিক অপরাধ ঐ বৎসর আগেকার চেয়ে অনেক কমিয়াছে।

বঙ্গীয় পুলিস রিপোর্টের উপর গবর্মেণ্টের মন্তব্যে আছে—

"Excluding cases that occurred within the jurisdiction of the Calcutta Police, there were 41 outrages and other crimes committed in Bengal by terrorists against 74 in the previous year."

"কলিকাতা পুলিসের এলাকার মধ্যে যাহা ঘটে তাহা বাদে সন্ত্রাসকরা এ বৎসর ৪১টা অপরাধ করে, পূর্ব্ব বৎসর ৭৪টা করিয়াছিল।"

কলিকাতা পুলিস রিপোর্টের উপর গবর্মেণ্টের মন্তব্যে আছে—

"The year under review was one of notable success against terrorist organizations."

"এই বৎসর সন্ত্রাসকদলসমূহের বিরুদ্ধে সাফল্যের বিশেষ একটা বৎসর।"

এই প্রকারে কমিয়া বঙ্গে বর্ত্তমান হিংসামূলক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ লোপ পাইলে নানা দিক্ দিয়া দেশ লাভবান্ হইবে। এইরূপ কাজের দ্বারা দেশের স্বাধীনতালাভের বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। অথচ এইরূপ কাজ করিতে গিয়া অনেক বালক ও যুবক নরহত্যা ও ডাকাতি করিতেছে, এবং প্রাণদণ্ডে, কারাদণ্ডে, ও নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে। ইহাতে অন্যের প্রাণ ও সম্পত্তি নষ্ট হইতেছে, তাহাদের নিজের জীবনও ব্যর্থ হইতেছে। অধিকন্তু, বিস্তর লোক সন্দেহভাজন হইয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতেছে। আর একটি ক্ষতি এই হইতেছে, যে, বঙ্গের অযথেষ্ট প্রাদেশিক রাজস্বের বৃহৎ একটি অংশ হিংসামূলক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা দমনে নিযুক্ত পুলিস কর্ম্মচারীদের বেতনাদি বাবতে ব্যয়িত হইতেছে। এই প্রচেষ্টা লুপ্ত হইলে এই টাকা শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতি, কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতি প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয়িত হইবার অন্ততঃ সম্ভাবনা ঘটে, কিন্তু এই প্রচেষ্টা থাকিতে সে সম্ভাবনাও নাই।

—

বাঞ্ছনীয় রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা

পুলিস এবং সৈন্যদলের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে প্রযুক্ত হইলে বর্ত্তমান হিংসামূলক বৈপ্লবিক সন্ত্রাসক কার্য্যাবলীর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হইতে পারিবে, এইরূপ ধারণা

মাদের থাকায় আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিক বার তাহা প্রকাশ রিয়াছি। কিন্তু আমরা ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু, ারও কিছু, চাই। আমরা চাই, দেশের এরূপ রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, এবং আর্থিক ব্যবস্থা ও অবস্থা যাহা থাকায় কশোর ও যৌবনে উপনীত ব্যক্তিরা হিংসামূলক কার্য্য রিতে প্ররোচিতও হইবে না। এরূপ অবস্থা একদিনে ানা যায় না। তাহার জন্য সময় চাই, বুদ্ধিমত্তা সহকারে রিশ্রম করা চাই। সেরূপ পরিশ্রম করিতে হইলে াফল্যের আশাও চাই।

সন্ত্রাসক প্রচেষ্টার একটা প্রধান কারণ নৈরাশ্য। বর্ণমেণ্ট সরকারী ব্যবস্থা ও কার্য্য দ্বারা এই আশার উদ্রেক রুন, যে, দেশের যুবা বয়সের লোকদের সমুদয় শক্তি । পৌরুষ অহিংসার পথ দিয়াই উপযুক্ত কার্যাক্ষেত্র াইবে যেমন অন্য সব সভ্যদেশের ঐ বয়সের লোকেরা াইয়া থাকে।

—

জামশেদপুরে বাঙালী

ইহা সত্য নহে, যে, জামশেদপুরে লোহা-ইস্পাতের কারখানা ও তৎসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে বাঙালীর অতি-াধান্য ঘটিয়াছে, যদিও রাষ্ট্রপরিষদের (কৌন্সিল অব্ ষ্টেটের) এক জন মুসলমান সদস্য দিল্লীতে এই মর্ম্মের ুস্তিকা বিতরণ করিয়াছেন, যে, জামশেদপুরে বাঙালীরাই একচেটিয়া প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। কেমন করিয়া করিবে? কারখানাটার মালিক, উহার অধিকাংশ অংশের ালিক, বাঙালীরা নহে। বেশীর ভাগ অংশ বোম্বাই-ওয়ালাদের। প্রধান ম্যানেজার বাঙালী নহেন, আমেরিকান্। সুতরাং বাঙালীরা যত কাজ সেখানে পাইয়াছে, তাহা যোগ্যতার জোরে আর, অধিকাংশ কাজ যদি বাঙালীরা পাইত, তাহাতেই বা অন্যায় কি হইত? রাজনৈতিক কারণে জামশেদপুর এখন বিহারের অন্তর্ভূত করা হইয়া থাকিলেও উহা বঙ্গের অংশ। বঙ্গেও বাঙালীর প্রাধান্য কোন দিকেই থাকা কি অন্যায়?

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের লোহার খনি হইতে লোহা আনিয়া এই কারখানা চলে। খনি আবিষ্কার করেন স্বর্গীয় প্রমথনাথ বসু। স্বর্গীয় জামশেদজি টাটা কারখানা অন্যত্র স্থাপন করিতে চান। বসু মহাশয় তাঁহাকে তথ্য ও যুক্তি সহকারে বুঝাইতে সমর্থ হন, যে, বর্ত্তমান জামশেদপুরেই উহা স্থাপন করা সমীচীন হইবে। জামশেদজি টাটা মহাশয় প্রমথবাবুর পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন। স্থানটি অরণ্যাবৃত ও াপদসঙ্কুল ছিল। তখন কারখানার কাজে অভিজ্ঞ শিক্ষিত লোকও ভারতবর্ষে এখনকার চেয়ে কম ছিল। সেই সময়ে বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ইন্সটিটিউটের শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েক জন বাঙালী যুবক ইহাতে কাজ করিতে যান।

গোড়া হইতেই, গোড়ার পূর্ব্ব হইতেই, এই কারখানার সঙ্গে বাঙালীদের যোগ রহিয়াছে।

বাঙালীর প্রতি ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ খুব বিস্তার লাভ করিতেছে যাহারা ঈর্ষ্যা করে, বিদ্বেষ করে, তাহাদের পক্ষে ইহা ভাল নয়; ভারতীয় মহাজাতি গঠনের পক্ষেও ইহা ভাল নয়।

আমরা যদি বলি, বঙ্গের বাণিজ্যে বাঙালীর স্থান এখন অতি সামান্য; উত্তরে শুনিতে পাই, তোমরা অযোগ্য বলিয়াই যোগ্যতর লোকদের দ্বারা ঐ ক্ষেত্র হইতে তাড়িত হইয়াছ। আমরা যদি বলি, বঙ্গের ব্যাঙ্কিঙে প্রধান স্থান বাঙালীর নাই; উত্তরে বলা হয়, তোমাদের যোগ্যতা না-থাকায় তোমরা উহা দখল করিতে পার নাই। আমরা যদি বলি, বঙ্গের প্রধান পণ্যশিল্প পাটের কারখানায় বাঙালীর স্থান নগণ্য; উত্তর পাই পূর্ব্ববৎ। যদি বলি, সৈন্যদলে বাঙালীর স্থান নাই; উত্তর পাই, তোমরা অযোগ্য।

এই সমস্ত উত্তর সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও ইহা স্বীকার করা যায় না, যে, বাঙালী কোনও কাজের যোগ্য নহে, কোনও দিকেই তাহার যোগ্যতা নাই, সুতরাং জামশেদপুরে যতগুলি বাঙালী কাজ পাইয়াছে তাহারা অযোগ্যতার জোরেই বা অযোগ্যতা সত্ত্বেও কাজ পাইয়াছে, ইহাও স্বীকার করা যায় না।

যদি ইহা সত্য হইত, যে, বাঙালীরা জামশেদপুরে খুব বেশী পরিমাণে কাজ পাইয়াছে, তাহা কি একটা অসাধারণ দোষের বিষয় হইত? বাণিজ্যে কোন কোন জাতির প্রাধান্য ঘটিয়াছে, ব্যাঙ্কিঙে কাহারও কাহারও ঘটিয়াছে, সৈন্যদলে কাহারও কাহারও ঘটিয়াছে তথাপি কেবল একটা শহরের একটা কারখানায় বাঙালীদের সত্য বা কল্পিত প্রাধান্য লোকেদের চোখ টাটাইবার কারণ হইয়াছে!

বাঙালীদিগকেও ত বাঁচিয়া থাকিতে হইবে যোগ্যতার দ্বারাও তাহারা কাজ পাইবে না? বাঙালীরা যদি একেবারে নিঃস্ব ও কপর্দ্দকহীন হয়, তাহা হইলে যাহারা তাহাদের জন্মভূমিতে ব্যবসায়াদি দ্বারা লাভবান হয়, সে-লাভের পথ কোথায় থাকিবে, তাহাও ত ভাবিয়া দেখা উচিত।

—

কাশীতে বাঙালী বালিকা-বিদ্যালয়

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে লক্ষ্ণৌর চেয়ে বেশী বাঙালী থাকেন কাশীতে। যাহারা সেখানে স্থায়ী